পায়ের তলায় সর্ষে ১

ভ্রমণ সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের তলায় সর্ষে ১

ভ্রমণ সমগ্র

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পত্র ভারতী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পায়ের তলায় সর্ষে

ভ্রমণ সমগ্র

প্রথম খণ্ড

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১১

PAYER TALAY SARSHE—VRAMAN SAMAGRA 1
by
Sunil Gangopadhyay

ISBN No. 978-81-8374-076-0

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সুব্রত মাজি

মূল্য
২৭৫.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com
Website : bookspatrabharati.com
Price ₹ 275.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

জার্মানির প্রবাসী কবি ও সাহিত্যপ্রেমী

দীপঙ্কর দাশগুপ্তকে

খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ভ্রমণের নেশা। সব সময় মনে হতো, এই পৃথিবীতে জন্মেছি, যতটা পারি তা দেখে যাবো না? কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও পয়সা তো ছিল না, তাই জমানো কুড়ি-তিরিশ টাকা হাতে পেলেই চলে যেতাম কাছাকাছি কোথাও। এক সময় জাহাজের নাবিক হবারও স্বপ্ন ছিল আমার। তা অবশ্য হতে পারিনি। তবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত গেছি কয়েকবার। দেশের মধ্যে সব কটি রাজ্যে, পশ্চিমবাংলার মধ্যেও সব কটি জেলা এবং মহকুমা, এমনকী অনেক গ্রামে গ্রামেও ঘুরেছি! কখনো রাত কাটিয়েছি গাছতলায়, কখনো নদীর বুকে নৌকোয়, কখনো পাঁচতারা হোটেলে। এই সব ভ্রমণ নিয়ে লেখালেখিও করেছি অনেক। এখন দেখতে পাচ্ছি সেইসব লেখা জমে জমেও প্রায় পাহাড় হয়ে গেছে।

প্রায় সব ভ্রমণ কাহিনি নিয়ে (কিছু হারিয়ে গেছে) পত্র ভারতীর ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ করছেন ভ্রমণ সমগ্র। এই দু'খণ্ডের আয়তন দেখে আমি নিজেই বিস্মিত। সব লেখা যদি সংগ্রহ করা যেত, তা হলে আরও কত বড় হতো। এবং আরও তো ভ্রমণ বাকি আছে এবং এর মধ্যে ঘুরে আসা অনেক দেশের কথা লেখাও হয়নি। তৃতীয় খণ্ড হবে? হতেও পারে!

১৯ জানুয়ারি ২০১০

পত্র ভারতী প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

তারপর কী হল

পায়ের তলায় সর্ষে ১ ও ২

বারোটি উপন্যাস

ভালোমন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব

কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

সুনীলের সেরা ১০১

সম্পাদিত বাবা

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ১

সম্পাদিত শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস ২
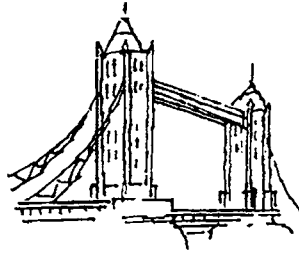
সূ চি প ত্র

আমার ভ্রমণ ১১

ভ্রাম্যমানের বিন্দু বিন্দু দেখা ১৬

মধ্যরাতের মেলায় ২৫

কাশ্মীরে দিনকয়েক ২৮

আন্দামান—সাতাশ বছর আগে, পরে ৩১

আন্দামান জায়গাটা আমার ভারী পছন্দের ৩৪

আচমকা এক টুকরো ১ ৩৫

আচমকা এক টুকরো ২ ৪০

আচমকা এক টুকরো ৩ ৪৩

হঠাৎ এক টুকরো ৪৬

মনে রাখার মতো মধুযামিনী ৪৮

জেনিভায় দোল ৫০

জয়ন্তী নদীর কাছে, পরির আশায় ৫২

মনোহরণ অরণ্যে বারবার ৫৫

জ্যোৎস্নায় সুবর্ণরেখার ধারে ৬২

কৈশোরের গঙ্গা নদী ৬৬

পায়ের তলায় সরষে ৬৯

পাহাড় যেখানে ডাকে ৭৬

পরিব্রাজক, তুমি কোথায়? ৭৯

শৈল শিখরে শীতের সন্ধ্যা-সকাল ৮৩
অনেকদিন পর ৮৫
বাংলাদেশে আমার বন্ধুরা ৯৩
স্বদেশীমেলা থেকে বিশ্বমেলা ৯৮
খুব কাছে খুব দূরে ১০৩
খুব কাছে, অনেক দূরে ১০৮
তেরো মিনিটের বেশি সময় তাঁর নষ্ট করিনি ১১০
কফি বানিয়ে দিচ্ছিলেন দালি নিজে ১১৩
সাগর থেকে পাহাড় ১ ১১৬
সাগর থেকে পাহাড় ২ ১১৮
এ যেন পাহাড় নয় প্রাকৃতিক ভাস্কর্য ১২০
আমাদের ছোট নদী ঃ অজয় ১২৯
আমাদের ছোট নদী ১৩৩
বিজনে নিজের সঙ্গে ১৭৭
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী পারের বঙ্গ সংস্কৃতি ২৫৩
আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে ২৫৫
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী ৩৭৭
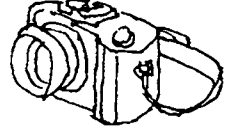
আমার ভ্রমণ

কম বয়সে ভ্রমণের একটা ভীষণ তীব্র ইচ্ছা ছিল। ইচ্ছে হত যখন-তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি, কোথাও-না-কোথাও চলে যাই। কিন্তু পয়সা ছিল না। বিদেশে যাওয়ার কথা তো তখন কল্পনার বাইরে। কখনও হয়তো ভাবতাম, জাহাজে চাকরি নিয়ে বিদেশে—মনে-মনে এইরকম একটা শখ ছিল। দেশের মধ্যে খুব বেশি দূরে কোথাও যাওয়ার সংস্থান ছিল না। তবু দু-একবার গেছি, যেমন হায়দরাবাদ বা সিমলায়। গেছি—বলতে গেলে বিনা টিকিটে। একদম বিনা টিকিটে সাহস করে যাওয়া যায় না। তবে, আমার এক বন্ধুর বাবা রেলে চাকরি করতেন। তিনি তাঁর দুই ছেলের নামে পাস পেতেন। আমি ওই পাস নিয়ে চলে যেতাম। সবসময় বুকের মধ্যে একটা ধড়ফড় ধড়ফড় ভাব—এই বুঝি ধরে ফেলল। আর একটা ভয় হত, যদি বাবার নাম জিগ্যেস করে! ওদের পদবি ছিল দাশগুপ্ত। লোকে নিজের নামটা মিথ্যে বলতে পারে, কিন্তু বাবার নামটা মিথ্যে বলতে মনের মধ্যে একটা দ্বিধা থাকে। অবশ্য ওভাবে ভ্রমণে কখনও ধরা পড়তে হয়নি আমাকে। এইভাবে গিয়েছিলাম একবার সিমলা পর্যন্ত, আর একবার হায়দরাবাদ পর্যন্ত।

ঘুরতে যেতাম কুড়ি টাকা পঁচিশ টাকা সম্বল করে। সঙ্গে হয়তো কোনও বন্ধু থাকত—দুটো পাস পাওয়া যেত আগেই বলেছি। ওই পাসের সুবিধা হল, টিকিটের খরচ তো বাঁচতই, আর যতদূর পাস, তার আগে যে-কোনও স্টেশনে নেমে পড়া যেত। কোনও স্টেশনে নেমে মালপত্র যা থাকত সঙ্গে, ওখানকার লকারে জমা করে দিতাম। তারপর ঝাড়া হাত-পায়ে সারা দিন ঘুরে বেড়িয়ে রাত্তিরে স্টেশনেই এসে শুয়ে থাকতাম। হোটেল খরচটাও বেঁচে যেত। এইভাবে ঘুরেছি তখন কলেজ-টলেজ পড়ার সময়ে। এরপর আরও বহু জায়গা ঘুরেছি। কিন্তু এখন যখন ভাবি, তখন মনে হয় ওই সবই যেন বেশি ভালো লাগত। তখন হয়তো কষ্ট হয়েছে। মাঝে মাঝে হত কি—আমার এক বন্ধু ছিল—মহাপাজি, সে ট্রেনে উঠেই বলত, ওই যাঃ মানিব্যাগটা আনতে ভুলে গেছি। সবই ইচ্ছে করে করত। ফলে, একজনের টাকাতেই দুজনকে যেতে হত। এবং তাতেও শেষ পর্যন্ত কুলিয়ে যেত।

সিমলাতে গিয়ে কালীবাড়িতে উঠেছি, কিন্তু টাকা ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেছি। খুবই সামান্য ভাড়া ছিল—তখনকার হিসেবে চার টাকা। কিন্তু আমাদের তো সম্বলই মাত্র পঁচিশ টাকা। কিছু খেতে হবে তো! আর সেই বয়সে তখন সাংঘাতিক খিদে পেত। কালীবাড়িতে দু-তিন দিন থাকার পরে হিসেব করে দেখলাম, ওদের ভাড়া মেটাতে গেলে তার পরের অন্তত দু-তিন দিন—ট্রেনে ফেরার সময়টুকুতে আর কিচ্ছু খেতে পাব না। দুপুরের দিকে কালীবাড়ি সুনসান থাকত, ওদের পাহারা দেবার লোকটোক থাকত না, টুক করে সুটকেসটা নিয়ে তখন বেরিয়ে পড়েছি, ভাড়াটাড়া না দিয়ে। সোজা স্টেশনে গিয়ে বসে আছি। সবসময় ভয়, এই বুঝি তাড়া করে আসবে। এই সবই তো ছিল প্রথম দিকের ভ্রমণ কাহিনী।

বিনা টিকিটে অনেক ঘুরেছি। এ-বেলায় তো তবু সঙ্গে একটা পাস ছিল। পরে আমরা বিহারের সাঁওতাল পরগনার দিকে অনেকবার গিয়েছি। তখন আমাদের প্রথাই ছিল, পাঁচজন হলে তিনজনের টিকিট কাটব, দুজনের কাটব না। কী করে যেন তালেগোলে ঠিক চলে যেত। অনেক সময় টিকিটচেকার

উঠলে দু-জন নেমে গিয়ে প্ল্যাটফর্মে ঘোরাঘুরি করতাম, বা হয়তো একজন বাথরুমে ঢুকে পড়ত।

একবার এরকম হল, কোথায় যেন যাচ্ছি ট্রেনে করে, একজন বন্ধু চেকারকে দেখে বাথরুমে ঢুকে লুকিয়ে রয়েছে। শীতের রাত্রি ছিল, প্ল্যাটফর্মে নেমে ঘোরাঘুরি করাটা সুবিধার ছিল না মোটেই। টিকিট চেকার এদিক থেকে ওদিকে টিকিট চেয়ে-চেয়ে ঘুরছে। হঠাৎ দেখি, সে কানে পৈতে গুটোচ্ছে। মানে, সে-ও যাবে বাথরুমে। বাথরুম বন্ধ। কিন্তু সে যদি বোঝে বাথরুমে একজন কেউ রয়েছে, সে হয়তো অপেক্ষা করবে তার টিকিট দেখার জন্য। তখন কী করা! আমাদের এক বন্ধু করল কি, টিকিট চেকারটাকে ঠেলে সরিয়ে ওই বাথরুমটাতেই ঢুকে গেল। ভাবটা এমন যেন সে আর হালকা না হয়ে থাকতে পারছে না।

যদি কখনও চেকার ধরত, ধরা পড়েছিও বেশ কয়েকবার, বিশেষ কিছু অবশ্য করত না। আমরা শুনতাম জেলে-টেলে দেয়। তা কিন্তু দিত না। প্ল্যাটফর্মে বসিয়ে রাখত অনেকক্ষণ। তারপর বলত দু-টাকা দাও, কি তিন টাকা দাও। তারপর ছেড়ে দিত। দু-টাকা দিয়ে যদি দশ-বারো টাকার টিকিট খরচা বাঁচানো যেত তো ভালোই হত ব্যাপারটা। জানি না, এখন কী শাস্তি দেয়, অথবা ঘুষের রেটটা কত বেড়েছে।

আমাদের সব থেকে প্রিয় জায়গা ছিল সাঁওতাল পরগনা। একটু একটু পাহাড়, একটু জঙ্গল—ফাঁকা ফাঁকা—খুব ভালো লাগত। ট্রেনে চক্রধরপুর অবধি চলে যেতাম। সেখান থেকে রাঁচি—পাহাড়ি রাস্তা। ওই রাস্তায় অনেক ট্রাক চলে। হাত দেখিয়ে থামানো হত। উঠে বসতাম ট্রাকের ওপরে। অনেক সময় পয়সাও নিত না বা একটাকা কি দুটাকা দিলেই চলত—কখনও বা সিগারেটের প্যাকেট। ভরতি ট্রাক, তার মাথায় চড়ে যাওয়া। বৃষ্টি এলে আর রেহাই ছিল না। পাঁঠাভেজার মতো ভিজতে হত। ওপর থেকে হাজার চেঁচিয়ে ডাকলেও ট্রাকওয়ালা শুনতে পেত না।

এই রাঁচি-চক্রধরপুর রাস্তাটার ওপরে জায়গায় জায়গায় অনেক ফরেস্ট বাংলো আছে। জায়গার নামগুলো খুব সুন্দর—টেবো, বদগাঁও, হেশাডি। কাছাকাছি অনেক ঝরনা ছিল, তখন জঙ্গলও ছিল খুব ঘন। হাতি বেরত প্রায়ই। লেপার্ড ছিল, ভালুক আসত—খুব রোমাঞ্চকর ছিল সে সব জায়গা। আদিবাসীদের গ্রাম মাঝে মাঝে—তারা মহুয়া তৈরি করে খাওয়াত। খাবারদাবারও সস্তা ছিল; তখনকার দিনে শহর বা আধা শহরের চাইতে সত্যিই জঙ্গলের অঞ্চলের খাবারদাবারের দাম কম ছিল।

ফরেস্ট বাংলোগুলোয় উঠতাম বটে, তবে বুক করতাম না। বুক করলে পয়সা লাগবে তো। আমরা উঠে পড়তাম—চৌকিদারের হাতে দু টাকা পাঁচ টাকা দিলেই চলত। অবশ্য যদি ফাঁকা থাকত, তবেই। কখনও সন্ধেবেলায় এসে পৌঁছেছি। বাংলোয় লোক আছে। তখন আর কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। চৌকিদারের ঘরেই থাকতে হত, কি বাংলোর বারান্দায়। গরমকাল হলে বারান্দাটা ভালোই, কোনও অসুবিধা ছিল না। একবার কোনও এক জাঁদরেল অফিসার এসেছিল হয়তো, বারান্দায় জায়গা হল না, চৌকিদারের ঘরেই যেতে হল। কিছু পয়সা দিলে ওরাই রান্নাটান্না করে দিত। অল্পবয়সে অনেক কষ্ট সহ্য করা যায়। তখন সব কিছুই ভালো লাগে।

একবার মনে আছে, আমরা চার-পাঁচজন গেছি হেশাডির বাংলোতে। সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। রাত্রিবেলায় মনে হচ্ছে যেন একটা সিগারেট না পেলে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় সিগারেট পাওয়া যায়! তখন মনে পড়ল, কাছেই, চৌকিদারের ঘরের পাশে আর একটা ছোট্ট ঘর—সেই ঘরে একটা লোক উঠেছিল। তার পেশা ছিল অদ্ভুত। পিচ ঠেলে রাস্তা সমান করার যে রোডরোলার, ওই যন্ত্র সে ডেলিভারি দিত। সেই গাড়ি গুড়গুড় গুড়গুড় করে এগোয়। ঘণ্টায় দু-মাইলও যায় কি না সন্দেহ। একখান থেকে আরেকখানে পৌঁছতে ওর ক'দিন লাগত কে জানে। ও যেত, আবার কোথাও বিশ্রাম নিত, আবার যেত, এই রকম। দিনের বেলা লোকটার সঙ্গে দু-একবার কথাও হয়েছে। রাত্রিতে সেই সময়ে খেয়াল হল লোকটা তো সিগারেট খায়! লোকটা বেশ

ভালো মানুষ মতন ছিল। তাকে ডেকে তুলে বললাম, দাদা আমাদের কয়েকটা সিগারেট ধার দেবেন? আমরা পাঁচজন ছিলাম। লোকটা বলল, পাঁচটা তো দিতে পারব না। তিনটে আছে। কাল সকালে একটা তো আমার লাগবেই, দুটো দিতে পারি। সিগারেট পাওয়া গেল। তখন মনে হচ্ছিল, ওই সিগারেট দুটোই না জানি কী অমূল্য সম্পদ—একটা লোক কী দারুণ উপকার করল আমাদের।

হেশাডির কাছে একটা সুন্দর ঝরনা ছিল—তার নামটা হয়তো শক্তির—মানে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মনে থাকতে পারে। শক্তি একবার ওখানে গিয়ে বেশ কিছুদিন থেকে গিয়েছিল। আমাদের এক বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী চাইবাসায় কাজ করত। চাইবাসা থেকে বাসে করে ওখানে যাওয়া যায়। শক্তি গিয়ে থেকে গেল অনেকদিন। আমরা ভাবলাম শক্তি বোধহয় নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। তখন আবার গেলাম শক্তির খোঁজ করতে। এইভাবে অনেকবার গেছি ওইসব দিকে। ওখানকার মানুষজনও ছিল ভারী সুন্দর। জঙ্গল আর পাহাড় তো ছিলই।

পাহাড়ের প্রসঙ্গে বলি, বিহারে তখন একটা ব্যাপার ছিল, আমাদের কাছে যেটা বেশ রোমান্টিক বলে মনে হত—ওখানে অনেক পাহাড় বিক্রি হত। পাহাড় মানে ছোট ছোট টিলা। চাইবাসার কাছে দেখেছি মাঝে-মাঝে নিলাম হচ্ছে, লোকে কিনে নিচ্ছে। আমাদের তখন মনে হত, আঃ, যদি পয়সা থাকত একটা পাহাড় কিনে নিতাম। তিন হাজার চার হাজার টাকায় এক-একটা পাহাড় বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। তখনকার হিসেবে সেটা অনেক টাকা, অন্তত আমাদের কাছে। খালি মনে হত, ইস্ যদি কিনতে পারতাম একটা পাহাড়।

বেড়াতে বেরিয়ে বহু বিচিত্র ঘটনা ঘটে। একবার মধ্যপ্রদেশের একটা জায়গায় যাব বলে বেরিয়েছি। জায়গাটার নাম অবুঝমার। পাহাড় আছে। জিপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে যে রাস্তাটা দিয়ে সেটা হয়তো মান্ধাতার আমলে তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু তারপরে ওটার কথা কেউ আর মনে রাখেনি। তার মাঝে-মাঝে বিরাট-বিরাট খাদ, খাদ পেরিয়ে আবার কিছুটা ভালো রাস্তা—আবার আর একটা ঝকমারি কিছু। রাস্তার দুপাশে বেশ ঘন জঙ্গল। এইরকম একটা জঙ্গলের মাঝখানে জিপটা একসময় খারাপ হয়ে গেল। প্রথমে আমরা চিন্তা করলাম হেঁটে এগানো যায় কি না। যেখানে জিপটা খারাপ হয়ে গেল, সেখান থেকে অবুঝমার কুড়ি মাইল, যেখান থেকে রওনা দিয়েছি সেটাও কুড়ি মাইল। প্রথমে ভাবলাম অবুঝমারের দিকেই যাওয়া যাক। কিন্তু পরে মনে হল অচেনা জায়গা, অতদূর হেঁটে-হেঁটে গিয়ে হয়তো দেখব রাত্রিতে থাকারও জায়গা নেই। তখন ফেরাই সাব্যস্ত করলাম।

ফিরতে গিয়ে বুঝলাম—অসম্ভব। উঁচু-নীচু পাহাড়ি রাস্তা। সেই পথে এক ঘণ্টা হেঁটে দেখা গেল দেড় মাইলের বেশি এগোনো যায়নি। কুড়ি মাইল হাঁটতে দিন কাবার হয়ে যাবে। হেঁটে কোনও লাভ নেই। ঠিক করলাম ওখানে রাত কাটাতে হবে।

কিছু আদিবাসী অবুঝমারের দিক থেকে হেঁটে আসছিল। তারা যাবে রায়পুরের দিকে হাটে। কিন্তু তাদের সঙ্গে হেঁটে আমরা পারব কেন? তারা গ্রামের লোক, ওদের হেঁটে যাওয়া অভ্যাস আছে। যেখানে যাচ্ছে, সেখানে হয়তো পৌঁছবে মাঝরাতে। থাকা-শোওয়ার জন্য কোনও দুর্ভাবনা নেই ওদের। সেই লোকগুলোকে আমরা বলে দিলাম, ওরা ওখানকার এস.ডি.ও-কে যেন বলে যে, আমরা এখানে আটকে পড়েছি। ওখানকার এস.ডি.ওর সঙ্গে তার আগে আমাদের ঘটনাচক্রে একবার আলাপ হয়েছিল। সেই লোকগুলো অবশ্য আমাদের ভাষা ভালো বুঝল না। তখন তাদের হাতে একটা চিঠি লিখে দেওয়া হল।

এত সব কিছু করা হল বটে, কিন্তু আমাদের বিশেষ ভরসা ছিল না। কিছু গ্রামের লোক, তারা এস.ডি.ও-র সামনে যেতেই ভয় পায় এবং কোনওদিন তার মুখোমুখি হয়েছে বলে মনে হয় না। তাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হতেই চিঠি তুলে দিলাম, সে চিঠি গন্তব্যে পৌঁছবে এমন ভরসা কম। খুব সহজ সেই চিঠি রাস্তাতেই ছিঁড়ে ফেলা। আবার চিঠি যদি দেয়ও, এস.ডি.ও ভদ্রলোকটি কতটুকু গুরুত্ব দেবেন তাতে সন্দেহ ছিল, কারণ সামান্য একটু আলাপের সূত্রই আমাদের সম্বল।

আমরা আন্দাজের ওপর বসে রইলাম। আস্তে-আস্তে সন্ধে হতে থাকল।

যেই অন্ধকারটি হয়েছে অমনি জঙ্গলটাকে ভয়ানক বিপজ্জনক মনে হতে লাগল। তার আগে অবধি বেশ উপভোগ করছিলাম। একটা লোককে আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভাই এ জঙ্গলে কি বাঘ আছে? শুনে লোকটা ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে বলেছিল, জঙ্গলে বাঘ থাকবে না তো, কি তোমার বাড়িতে বাঘ থাকবে? আর সেই থেকে আমরা ভাবছি এই বুঝি অন্ধকারে বাঘের চোখ দেখব। অস্ত্রশস্ত্র কিছু সঙ্গে ছিল না, থাকলেও কী হত কে জানে। কিন্তু সে যাত্রায় আমাদের কোনও বিপদে পড়তে হয়নি। রাত বারোটা নাগাদ এস.ডি.ও. দু-দুটো গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন আমাদের উদ্ধার করতে। আমাদের উদ্ধার করে শহরে পৌঁছে দিলেন। এমনকি তিনি তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাওয়ালেন শেষ পর্যন্ত। এমন নয় যে, তিনি আমাদের লেখক হিসেবে চিনতে পেরে সৌজন্যসূচক ব্যবহার করছেন। যে-মানুষ চিরকুট পৌঁছে দিয়েছিল, এবং এস.ডি.ও ভদ্রলোক—এরকম মানুষের দেখা বোধহয় এইসব জায়গাতেই একমাত্র পাওয়া সম্ভব।

এই অবুঝমার পাহাড়টা ছিল বাস্তার জেলায়। আমার এক বন্ধু সেখানে জঙ্গলে-জঙ্গলে ঘুরে বুনো পাট আর চা-গাছের খোঁজ করত। ও দেখত, কীভাবে কী বৈশিষ্ট্যের জন্য এই বুনো প্রজাতির গাছগুলো, চাষ করা প্রজাতিগুলোর তুলনায়, বিনা যত্নে, বিনা সারে, বিনা কীটনাশকে বেঁচে থাকে। ও যেমন-যেমন ঘুরত, আমরাও তার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরতাম।

বাস্তারে আমরা ঘোঁটুল দেখতে পেয়েছিলাম। মারিয়া বা মুরিয়াদের মধ্যে এইরকম ঘোঁটুলের ব্যবহার আছে। এটা হল গ্রামের মধ্যে একটা ঘর—যেখানে সেই গ্রামের যুবক-যুবতীরা এক সঙ্গে রাত কাটায়। তারা এক-একদিন এক-একজন পছন্দ মতো সঙ্গীকে নিয়ে শোয়, বলা বাহুল্য যৌনসম্পর্কও স্থাপিত হয় পরস্পরের মধ্যে। কিন্তু কোনও ব্যাভিচার চলে না। কোনও নোংরামো নেই কোথাও। একসময় কোনও একটি ছেলের সঙ্গে কোনও একটি মেয়ের পাকাপাকি সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। তখন যে-যার পছন্দের মানুষটিকে বিয়ে করে আলাদা সংসার পাতে। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে কী সাংঘাতিক ব্যাপার! বিয়ের আগে ছেলেমেয়েরা এক সঙ্গে শুচ্ছে! কিন্তু আসলে এই প্রথাটা ওদের ওখানে খুবই উপকারী। ওখানে এ নিয়ে কোনও লাম্পট্য বা মারামারি অশান্তি কিছুই শোনা যায় না। ভেরিয়ার এলুইনের একটা বই আছে—'ওয়ার্ল্ড অফ দ্য ইয়ং'। সেখানে এ-সম্পর্কে অনেক কথা পড়েছি। বাইরের লোক গেলে ওরা কিছু মনে করে না। খেতেটেতে দেয়, থাকতে দেয়। আমরা এরকম বেশ কয়েকটা ঘোঁটুল দেখতে পেয়েছিলাম।

বাস্তারের এক জায়গায় একবার গেছি, তখন সেখানে একটা হাট হচ্ছে। হাটে তেমন কিছুই পাওয়া যায় না, সামান্য কিছু তরিতরকারি, মেটে আলুটালু, একটু গাজর, কি শালগম, এইসব। মাছটাছ পাওয়া যায় না। গরিব দেশ। মধ্যপ্রদেশের মতো গরিব বোধহয় আর কোথাও নেই, জিনিসও পাওয়া যায় না। খিদে পেয়েছিল বলে সেখানে একটা ভাতের হোটেলে ভাত খেতে গেছি। এরকম হোটেলও বোধহয় ভারতের আর কোথাও নেই, যেখানে ভাত আর ডাল ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। মাছমাংস চাই না একটা ভাজা বা তরকারি তো দেবে! তা-ও নেই। ওখানকার লোকেরা তাই-ই খাচ্ছে।

সেখানে একটা বোবা মতো লোক, অন্তত প্রথমে তাই মনে হয়েছিল, ভাতের থালাটালা এনে দিচ্ছিল। খেতে খেতে আমরা যখন 'পানি' 'পানি' বলে চেঁচাচ্ছি সে লোকটা একটা জলের গ্লাস টেবিলে নামিয়ে বলল 'জল'। ওর মুখে 'জল' শুনে আমরা একটু চমকে উঠেছিলাম। পরে জেনেছিল, সে হল দণ্ডকারণ্যের রিফিউজি। লোকটাকে পরে জেরা করতে ও বলল, দীর্ঘদিন বাংলা না বলতে-বলতে ও বাংলা প্রায় ভুলে গেছে। লোকটা অবশ্য খুব বুদ্ধিমানও নয়। মাঝে-মাঝে দু-চারটে বাংলা শব্দ বলে ফেলে। সেইরকম একবার রায়পুরে রিকশায় চেপে মনে হল রিকশাওয়ালার হিন্দি কথাগুলো যেন কানে কেমন লাগছে! বেরিয়ে পড়ল, সেই রিকশাওয়ালাও বাঙালি। ভাবতেই

কেমন অবাক লাগে। বাস্তারের আদিবাসীদের হাটে কোনও বাঙালি ছেলে হোটেলে কাজ করছে, রায়পুরে রিকশা চালাচ্ছে।

একবার খুব অবাক হয়েছিলাম—যুগোস্লাভিয়ার বেলগ্রেড শহরে গেছি, মাত্র এক রাতের জন্য থাকব সেখানে, পরদিন সকালে অন্য কোথাও যেতে হবে। রাত্তিরটা কী করে কাটাই ভাবতে-ভাবতে পথে বেরিয়ে পড়েছি। ওই সব জায়গায় সন্ধের পর বেশ নিঝুম হয়ে যায়, কোনও জীবন থাকে না। কোথায় যাই ভাবতে-ভাবতে একটা লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কাছাকাছি কোনও নদী আছে? সে বলল, হ্যাঁ—এই তো এইখান দিয়ে হেঁটে যাও, একটু এগোলেই নদী পাবে। তা ভালোই। জিগ্যেস করলাম, নদীর কী নাম? সে বলল, ড্যানিয়ুব। শুনেই রক্ত চঞ্চল হয়ে উঠল। সেই ড্যানিয়ুব! ইতিহাস-বিখ্যাত নদী! সেই বিখ্যাত গান 'ব্লু ড্যানিয়ুব' যাকে নিয়ে হয়েছে, সেই নদী? এত কাছে?

সিংভূমের কাছে কারো নামে একটা নদী আছে। ভারী সুন্দর। তখন প্রচুর জল থাকত। একটা নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সেটা বয়ে গেছে। সারাণ্ডার জঙ্গল। এই জঙ্গলটার একটা গাম্ভীর্য আছে। গাছগুলো অনেক লম্বা লম্বা, মনে হয় অনেক পুরনো, ভেতরে ঢুকলে বেশ রোমাঞ্চ হয়। সেই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কারো নদীটা এঁকেবেঁকে বয়ে গেছে। বেশ মনে হয় যেন কয়েক হাজার বছর ধরে একই রকম আছে জায়গাটা। এরকম আদিম অরণ্য আর দেখেছি আন্দামানের কয়েকটা দ্বীপে। ঝিনুক-মুক্তো দিয়ে গয়না-টয়না বানানোর ব্যাবসা ছিল আন্দামানের এক ভদ্রলোকের। তাদের একটা ছোট জাহাজ ছিল। ওদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে এরকম কয়েকটা দ্বীপে আমি গিয়েছিলাম। এখানকার জঙ্গলগুলোর একটা মজার ব্যাপার হল কোনও হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। কোথাও কোথাও কিছু হাতি আছে। সেগুলো একসময় পোষা হাতি ছিল। রায় কোম্পানি নামে একটা টিম্বার কোম্পানি জঙ্গল থেকে কাঠ টেনে আনার জন্য বেশ ক'টা হাতি ওখানে নিয়ে যায়। কিন্তু একসময় ব্যাবসাতে ফেল্ পড়ে। অতগুলো হাতির খরচ চালানোও তো চাট্টিখানি কথা নয়! তখন ওরা হাতিগুলোকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়। তাদেরই কোনও-কোনওটাকে এখনও দেখা যায়।

হাতির প্রসঙ্গে বলি, উত্তরবঙ্গে লঙ্কাপাড়া টি-এস্টেটে একবার দেখেছিলাম একটা মাতাল হাতি। ওখানে মদেসিয়াদের বস্তিগুলোতে যেখানে মদ চোলাই হয়। গন্ধ পেয়ে হাতিরা সেখানে হাজির হয়। কোনও বাধাই মানে না, ঘরের বেড়া-টেড়া ভেঙে শুঁড় নামিয়ে দিয়ে চোঁচোঁ করে মদ খেতে থাকে। তাতে বেশ নেশা হয়ে যায়। আমরা লঙ্কাপাড়ায় গিয়ে শুনতে পাচ্ছি ভারী একটা চেঁচামেচি হচ্ছে। তখন দেখি একটা হাতি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঢুলছে আর চারপাশ থেকে যে-যা পারছে তাই দিয়ে পেটাচ্ছে হাতিটাকে। হাতিটার নড়ারও শক্তি নেই। নেশা হয়ে গেছে।

বহুবার এমন হয়েছে, বাস বা জিপ দাঁড়িয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। একপাল হাতি রাস্তা পেরোচ্ছে। যেমন দেখেছি কেনিয়ায়। জেব্রা রাস্তা পেরোচ্ছে বলে গাড়িঘোড়া দাঁড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও জেব্রা দিয়ে গাড়িও টানত। যদিও এখন তা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। জেব্রার মাংসও খায়। কেনিয়ার কোনও কোনও বারে মদের সঙ্গে মাংসের চাঁট হিসেবে পাওয়া যায় জেব্রা বা জিরাফের মাংস।

নাইরোবি থেকে একটা ছোট এরোপ্লেনে করে যাচ্ছি কেনিয়ার মাসাইমারা ন্যাশনাল পার্কে। ছোট্ট প্লেনটিতে মাত্র ষোলো-সতেরো জনের জায়গা হয়েছে। মাসাইমারায় পৌঁছে প্লেনটা আর কিছুতেই নামতে পারে না। সেখানে অল্প একটু জায়গা পরিষ্কার করে সরু ফিতের মতো একটা এয়ারস্ট্রিপ তৈরি করা হয়েছে। দেখি সেই এয়ারস্ট্রিপের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে দুটো বিশাল হাতি!

এয়ারস্ট্রিপের কাছে কিছু লোক পটকা-টটকা ফাটিয়ে সেগুলোকে তাড়ানোর চেষ্টা করল। হাতিগুলো খুব যে ভয় পেল তা নয়। একটু বিরক্ত হয়ে কয়েক পা মাত্র সরে দাঁড়াল। তারপর নামল প্লেন। মাসাইমারা ন্যাশনাল পার্কে থাকার জায়গা হল জঙ্গলের মধ্যে এক একটা তাঁবু। তাঁবুগুলো

একটা থেকে আরেকটা বেশ দূরে-দূরে, আর এমনভাবে সাজানো, কোনওটা থেকেই কোনওটাকে দেখা যায় না, মনে হয় জঙ্গলের মধ্যে একা আছি। ট্যুরিজমটা ওসব দেশে বেশ উন্নত। কোনও কোনও দেশ গোটা ট্যুরিজম দপ্তরের ভার দিয়ে দিয়েছে বিদেশি কোনও সংস্থাকে। এই মাসাইমারাও চালায় একটা সুইস কোম্পানি। নিশ্চয়ই গভর্নমেন্ট কিছু লভ্যাংশ পায় এর থেকে। এইসব তাঁবুতে থাকলে এত জন্তুজানোয়ারের ডাক, তাদের চলাফেরার আওয়াজ চারদিক থেকে আসতে থাকে যে রাতে ঘুম-টুম মাথায় উঠে যায়। মাসাই গার্ড আছে। সশস্ত্র। তাদের সাহায্যে রাত্রে চলাফেরা করতে হয়। একা বেরনো যায় না। খাওয়ার জন্য স্বতন্ত্র একটা তাঁবুতে সবাইকে যেতে হত। এরকম এক রাত্রে খেয়ে দেয়ে নিজের তাঁবুতে ফিরছি, হঠাৎ দেখি আমার তাঁবুর সামনে কী একটা জন্তুর চোখ জ্বল জ্বল করছে। ভাবছি এটা আবার কী রে বাবা! মাসাই গার্ডকে জিজ্ঞাসা করে লাভ নেই, ওরা ভাষা বোঝে না। ওকে দেখলাম টর্চের আলো ফেলছে জন্তুটার চোখে। মস্ত বড় চেহারা দেখে একসময় ভাবলাম গণ্ডার নাকি! পরে জানা গেল ওটা গণ্ডার নয়, জলহস্তী। বিশাল চেহারা। কাছেই জলা জায়গা আছে। সেখান থেকে রাত্রে উঠে এসেছে। মাসাই গার্ডরা জানে কীভাবে এদের মোকাবিলা করতে হয়। তার চোখে বার বার টর্চের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে বিরক্ত করে ওটাকে তাড়িয়ে দেওয়া হল।

পরদিন ম্যানেজারকে এই ঘটনার কথা জানাতে, তিনি আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, জলহস্তীকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। নিরীহ প্রাণী, কিচ্ছু করে না। আদৌ মাংসাশী নয়। তবে একেবারে মুখের সামনে পড়ে গেলে একটু কামড়ে দেয়। আর কামড়ে দিলেই—মানুষ দু'খণ্ড হয়ে যায়। বলাই বাহুল্য! বিরাট বড় মুখ তো!

ভ্রাম্যমাণের বিন্দু বিন্দু দেখা

বন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, ঘড়ি দেখলে মনে হয় রাত হয়ে গেছে, অথচ বাইরে ফটফটে দিনের আলো, এখানে পৌনে নটার আগে অন্ধকার নামে না। আগে এরকম বিলম্বিত বিকেল দেখেছি কাশ্মীরে, লেনিনগ্রাদে, তখন ওই নামই ছিল, এখন সেন্ট পিটার্সবার্গ। সেখানে রাত এগারটা পর্যন্ত বিকেল ছিল। বাংলা বাক্য হিসেবে এটা অদ্ভুত শোনালেও আর কীভাবেই বা বলা যায়!

এই অঞ্চলটির নাম এজাক্স, টরন্টো শহরের অদূরে। কাল বেশ শীত ছিল, আজ আর গায়ে সোয়েটার লাগছে না। গাড়িতে ওঠার আগে খানিকটা হেঁটে আসার প্রস্তাব দিলেন বন্ধুটি। প্রায় সবই একরকম বাড়ি, রাস্তার দুপাশে সবুজ মখমল, কোনও কোনও বাড়ির সামনে বড়-বড় পিউনি ফুল ফুটে লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে, এ এক এমনই ফুল যে নিজের ভার নিজে বইতে পারে না।

দৃশ্য হিসেবে এমন কিছু বৈচিত্র্য নেই, কিন্তু রাস্তায় একবার বাঁক নিতেই চোখে লাগল বিস্ময়ের ঘোর। সামনেই অকূল জলরাশি, এ দেশের হ্রদগুলি সমুদ্রেরই মতন, পরপার দেখা যায় না, জাহাজ চলে। যেন নীল আকাশ উল্টো হয়ে শুয়ে আছে, এই উপমাটা আমার বারবার ব্যবহার করতে ইচ্ছে হয়। যে অজস্র সাদা রঙের পাখি উড়ছে, সেগুলিকে প্রথম দৃষ্টিতে বক মনে হলেও বক নয়, এ দেশে বক দেখিনি, ওগুলি সিন্ধুসারস বা সিগাল। নীলের পটভূমিকায় ওরা অনবরত নতুন নতুন রেখাচিত্র রচনা করে যাচ্ছে।

পুকুর, নদী, হ্রদ বা সমুদ্র উপভোগ করার শ্রেষ্ঠ উপায় অবগাহন। বন্ধুকে জিগ্যেস করলাম, আপনার বাড়ির এত কাছে, গরম কালে এখানে এসে সাঁতার কাটেন?

কান্তি হোর বললেন, ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। কাছেই পারমাণবিক তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, তাই বিপজ্জনক বলে এখানে জলে নামাই নিষিদ্ধ।

এখানে কেউ মাছ ধরে না?

ওই একই কারণে এখানে মাছ ধরাও বেআইনি।

সামনে এতখানি সুদৃশ্য জল, অথচ সেখানে স্নান করাও যায় না, মাছ ধরাও যায় না জেনে আমার পূর্ববঙ্গীয় মানসিকতায় একটা জোর ধাক্কা লাগে। অন্টারিও হ্রদের রূপ অনেকটা ম্লান হয়ে যায়।

তবু যা হোক সিন্ধুসারসগুলির ওড়াউড়ির রেখাচিত্র মনে থেকে যাবে।

॥ দুই ॥

বাহাউদ্দিন সাহেবের জন্ম ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়, বহুকাল প্রবাসী। কিন্তু তিনি তাঁর বাংলা ভাষায় ইচ্ছে করেই জন্মস্থানের বিশেষ উচ্চারণ বজায় রেখে দিয়েছেন। এবং মৎস্যপ্রীতি। অনেক বছর কাটিয়েছেন আরব দেশে, সেখানে আশা মেটেনি। উত্তর আমেরিকায় প্রচুর মাছ পাওয়া যায়, আগে স্যাড মাছ খেয়ে ইলিশের সাধ মিটত, এখন আসল পদ্মার ইলিশের ছড়াছড়ি বাংলাদেশি দোকানগুলিতে।

বাহাউদ্দিন সাহেব গ্রামের জীবনের মতন কানাডাতেও নিজে মাছ ধরেন। মাছ ধরার নির্দিষ্ট এলাকা আছে, ছিপ ফেলতে হলে লাইসেন্স নিতে হয়। বাহাউদ্দিন খুব সফল মৎস্যশিকারি, মাঝে মাঝেই নানারকমের ছিপ ও হাত-জাল নিয়ে অভিযানে বেরিয়ে পড়েন এবং প্রচুর মাছ ধরে আনেন। একরকমের ছোট মাছ তাঁর খুব প্রিয়, এখানে তার নাম সান ফিস। গ্রাম বাংলার পুকুরে সূর্য পোনা নামে এক ধরনের মাছ থাকে, সেগুলি খুবই ছোট ও অখাদ্য, এই সান ফিস বেশ সুস্বাদু, অনেকটা কই মাছ ও তেলাপিয়ার মাঝামাঝি আকৃতি, একদিন বাহাউদ্দিন আমাদের সেই মাছ খাওয়ালেনও, বলাই বাহুল্য আরও অনেকরকম আহার্য ছিল, আমি সূর্য মাছই বেশি খেলাম।

সূর্য মাছ ধরা খুব মজার খেলা। এতই অজস্র মাছ যে, বাংলার অনেক গ্রামের পুকুরের পুঁটি মাছের মতন, ছিপ ফেললেই পটাপট ওঠে, তা দেখে বাহাউদ্দিনের স্ত্রী, যিনি নিজে কখনও ছিপ হাতে নেননি, তিনিও ছিপ ফেলা শুরু করলেন এবং সার্থকতার সীমা নেই! দুজনে মিলে ঝুড়ি-ঝুড়ি মাছ ধরে এনে ডিপ ফ্রিজে রেখে দেন, তিন-চার মাস চলে যায়, প্রায় বিনা পয়সার মাছ। মাঝে মাঝে বঁড়শিতে দু-একটা অন্য জাতের বড় মাছও গেঁথে যায়। একবার সেরকম একটি বিশেষ ধরনের লোভনীয় চেহারার বড় মাছ টেনে তুলতেই কাছাকাছি অন্য চিপধারীরা শশব্যস্ত সাবধান করে দিল, ওটা রাখবেন না, রাখবেন না, জলে ছেড়ে দিন!

ও মাছ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে যদি পুলিসের নজরে পড়ে, তা হলে অন্তত দুশো ডলার জরিমানা! কারণ, ওই বিশেষ প্রজাতির মাছেরা গ্রীষ্মের তিন মাস ডিম প্রসব করে। তাদের বংশরক্ষার জন্যই ওই সময়কালে মানুষের লোভ সংবরণ করাই সংগত নীতি।

আমাদের ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গের গ্রামে রীতি ছিল, দুর্গাপুজোর বিজয়া দশমীর পর আর ইলিশ মাছ খেতে নেই। আবার সেই সরস্বতী পুজোর দিন জোড়া ইলিশ এনে সেই মৎস্যশ্রেষ্ঠকে বাড়িতে স্বাগত জানাতে হয়। মাঝখানের কয়েকটি মাস ইলিশের ক্রেতা থাকত না বলে জেলেরাও অন্য কাজে মন দিত। আইনের প্রয়োজন ছিল না, পুলিস পাহারারও প্রশ্ন নেই, এটা সামাজিক প্রথা, সেই সময়ে ইলিশের ঝাঁক নির্বিঘ্নে ডিম ভাসিয়ে দিত নদীর স্রোতে।

এখন সে সামাজিক প্রথা উঠে গেছে, অনেকে জানেই না, ইলিশ সংরক্ষণ ও বংশবৃদ্ধির কথা কেউ চিন্তা করে না, নদীগুলি রুগ্ন ও কলুষিত, পদ্মা-গঙ্গা-আড়িয়েল খাঁ-র বিখ্যাত ইলিশের সংখ্যা ক্রমশই কমে যাচ্ছে, স্বাদও আর তেমন নেই।

মাদারিপুর শহরের পাশে আড়িয়েল খাঁ নদীতে ইলিশ মাছ ধরা দেখতে যেতাম আমরা বর্ষাকালে। অনেক নৌকো ভাসছে, মাঝে মাঝে তোলা হচ্ছে জাল, টুকরো-টুকরো বিদ্যুতের মতন তাতে লাফাচ্ছে রুপোলি ইলিশ। খুব সম্ভবত বুদ্ধদেব বসুই একমাত্র বাঙালি কবি, যিনি ইলিশ বিষয়ে লিখেছেন একটি সম্পূর্ণ কবিতা। ইলিশের বিশেষণ দিয়েছিলেন, 'জলের উজ্জ্বল শস্য'।

আমাদের ছেলেবেলায় ইলিশের ওজনদর ছিল না, আকার-আকৃতি অনুযায়ী দাম। আমার কাকা একদিন সাত পয়সা দিয়ে একটি অপূর্ব সুন্দর ইলিশ কিনেছিলেন, যার ওজন হবে অন্তত আড়াই কিলো। আমার তখন মাত্র সাত বছর বয়েস, বিস্ময়ে ভরা চোখ নিয়ে সব দেখছি, একটি জেলে আমার হাতের সাইজের একটি ইলিশ আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল, এইটা দা ঠাউরের জন্যি ফাউ! (দা ঠাউর, অর্থাৎ দাদাঠাকুর, বাচ্চাদের প্রতি এরকম সম্বোধন তখন প্রচলিত ছিল।) সেই দৃশ্যটি এখনও ফ্রেমে বাঁধানো ছবি হয়ে আছে স্মৃতিতে।

ইলিশ বিষয়ে একটি মজার অনুমান কাহিনী লিখে গেছেন সৈয়দ মুজতবা আলি। ভারতের ইতিহাসে মুহম্মদ বিন তুঘলক একজন খেয়ালি ও পাগলা ধরনের সম্রাট হিসেবেই পরিচিত, যদিও তাঁর অনেক গুণ ছিল এবং স্বভাবে ছিলেন বেপরোয়া। এক সময় তিনি বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য গুজরাটের উপকূল অঞ্চলে স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করছিলেন, নৌকো করেও ঘুরেছেন। একদিন তাঁর নৌকোতে হঠাৎ একটি অতি সুদৃশ্য রুপোলি রঙের মাছ উঠে পড়ে। মাছটি দেখে সম্রাট এমনই মুগ্ধ হলেন যে হুকুম দিলেন, তখুনি রান্না করে দেওয়া হোক, তিনি মাছটির স্বাদ নেবেন। তখন রোজার মাস, সারাদিন তাঁর কিছুই আহার করার কথা নয়, তার ওপর এটা অচেনা মাছ, বিষাক্ত কি না কে জানে, সাঙ্গোপাঙ্গরা ইতস্তত করতে লাগল, কিন্তু সম্রাটের জেদের ওপর আর কথা চলে না। মুহম্মদ বিন তুঘলক মাছটি এমনই পছন্দ করলেন যে খেয়ে ফেললেন অনেকখানি, তারপর তাঁর সাংঘাতিক পেটের পীড়া হল এবং সেই রোগেই তাঁর মৃত্যু হল অচিরে। মুজতবা আলির অনুমান, মুহম্মদ বিন তুঘলক যে মাছটি খেয়েছিলেন, সেটি নিশ্চিত ইলিশ (গুজরাটেও ইলিশ পাওয়া যায়, স্থানীয় নাম পাল্লা) এবং ইলিশ ভক্ষণ করে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি নিশ্চিত বেহেস্তে গেছেন।

এখন আর এরকমভাবে কেউ ইলিশ-বন্দনা করে না। আমি নিজেও আর তেমন ইলিশ-ভক্ত নই, আগেকার মতন স্বাদ পাই না।

বাহাউদ্দিন সাহেব আপসোস করে বললেন, অত বড় মাছটাকে ধরেও ছেড়ে দিতে হল, আপনাকে খাওয়াতে পারছিলাম না, সে মাছের স্বাদ আরও চমৎকার!

ধরা-পড়া মাছের চেয়ে পালিয়ে যাওয়া মাছ তো সব সময়ই বেশি ভালো হয়!

।। তিন ।।

জীবনের বছরগুলি হাঁটতে-হাঁটতে অনেক মানুষের অনেকরকম ট্রাজেডির কথা জানতেই হয়। কিন্তু এই মানুষটির ট্রাজেডি একেবারে অন্যরকম। নামটা বদল করা দরকার। ধরা যাক, এঁর নাম ওয়াহিদ করিম, পরিচিত মণ্ডলীতে সবাই ডাকে করিম ভাই। হৃষ্টপুষ্ট, হাসিখুশি প্রৌঢ় মানুষটিকে সকলেই পছন্দ করে। পঞ্চাশের দশকে দেশ ছেড়ে এসে অন্তত সাত-আটটি দেশে নানারকম চাকরি করেছেন, এখন স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন কানাডায়। চারটি ছেলেমেয়ে, স্ত্রীও বর্তমান, দুটি ছেলে উত্তম চাকরি পেয়েও আলাদা বাসায় উঠে যায়নি, করিম সাহেবের নিজেরও কিছু জমানো টাকা

আছে, সুখের সংসার।

করিম সাহেব অবসর নিয়েছেন, ঘুরে-ঘুরে বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন পরিবারে দেখাসাক্ষাৎ করতে যান, যে-কোনও আড্ডায় তিনি স্বাগত, কারণ তাঁর গল্পের স্টক অফুরন্ত। কথায় কথায় উচ্চহাস্য করে তিনি আসর মাতিয়ে দেন।

দিব্যি সময় কাটছিল, হঠাৎ সব গোলমাল করে দিল করিম ভাইয়ের ছোট ছেলে পিন্টু ওরফে আসরাফ। সে বিয়ে করে ফেলল এক হিন্দু মেয়েকে। এটা অসরাফের মা নীলোফারের একেবারেই পছন্দ নয়। আসরাফ শুধু যে হিন্দু মেয়ে বিয়ে করেছে তাই-ই নয়, সে আপাতত বেকার, বেঙ্গলি ক্লাবে নাটকের অভিনয় করার ব্যাপারে তার যত উৎসাহ, চাকরি খোঁজার উৎসাহ তেমন নেই, এ সময় বিয়ে করে ফেলাটা অসমীচীনই বলতে হবে। তার স্ত্রীর নাম বিউটি, এ দেশেই বর্ধিত, তার আচারে-ব্যবহারে হিন্দুত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু তার প্রকৃত নাম আরতি সেনগুপ্ত। নাটকের মহলার সময়ই পিন্টুর সঙ্গে বিউটির পরিচয় ও প্রণয় এবং দ্রুত গোপন বিবাহ, সেই জন্য নীলোফার বেগম থিয়েটার ব্যাপারটাই দু-চক্ষে সহ্য করতে পারেন না। কোন কুক্ষণে আসরাফ বেঙ্গলি ক্লাবে থিয়েটার করতে গিয়েছিল!

এ বিষয়ে করিম ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর মতভেদ বিস্তর। করিম ভাই থিয়েটার-গান বাজনা পছন্দ করেন খুব, ছেলে তার মনের মতন মেয়েকে বিয়ে করেছে, তা নিয়ে আপত্তি জানাবার তিনি কারণ খুঁজে পান না। হিন্দু মেয়ে বলে তো আর এ বাড়িতে পুজো-আচ্চা শুরু করেনি, খাওয়া-দাওয়ার বাছবিচার নেই, থাকুক না ওরা ওদের মতন। এর চেয়ে কোনও সাদা মেয়েকে বিয়ে করলে কি ভালো হত? ইংরেজি বলতে হত সর্বক্ষণ, তার সামনে লুঙ্গি পরে আসা যেত না। কিংবা ইহুদি মেয়ে?

পিন্টু এখন চাকরি করে না বটে, তবে পেয়ে যাবেই। পিন্টুর বউ ব্যাংকে চাকরি করে, সকাল সকাল বেরিয়ে যায়, ফেরে সন্ধের সময়, তারপরেও এক-একদিন ক্লাবে যায়, তাতে সংসারের তো কিছু বিঘ্ন হচ্ছে না।

নীলোফার বেগম এসব কিছুই জানেন না। তিনি আসরাফের বউকে অবিলম্বে ধর্মান্তরিত করে নাম দিতে চেয়েছিলেন আয়েষা, কিন্তু বিউটি তাতে রাজি নয়, সে মেয়েও খুব তেজি। আসরাফের সঙ্গে তার আগেই কথা হয়ে আছে, তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা হলে সে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে।

প্রায় প্রতিদিনই খিটিমিটি লেগে রইল। করিম ভাই সব সময় কথা বলেন ছোট ছেলে আর তার বউয়ের পক্ষ নিয়ে। নীলোফার বেগমের মেজাজ এক-এক সময় খুব উগ্র হয়ে ওঠে। ছেলের চেয়েও স্বামীর ওপরেই তাঁর রাগ হয় বেশি। এক সন্ধ্যায় পিন্টু আর বিউটি তাদের ঘরে বসে, দরজা বন্ধ করে থিয়েটারের পার্ট রিহার্সাল দিচ্ছে, বেশ শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকে, নীলোফার বেগমের গায়ে নাটকের সংলাপগুলি শূলের মতন বিঁধছে। বাড়িতে এ অনাচার তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না। এক সময় তিনি অতিষ্ঠ অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, আজ রাতেই তিনি ও মেয়েকে বেরিয়ে যেতে বলবেন, তাতে ছেলেও যদি ভেড়ুয়ার মতন বউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে যায় তো যাক। তিনি ওদের ঘরের দিকে ধেয়ে যেতেই বাধা দিলেন করিম ভাই। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে স্ত্রীকে শান্ত করতে গেলেন, কিন্তু তা হল না, বরং শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি, এক সময় আকস্মিকভাবে করিম ভাইয়ের ধাক্কায় নীলোফার বেগম পড়ে গেলেন খাওয়ার টেবিলের ওপর, কোনায় লেগে তাঁর ঠোঁট কেটে রক্ত পড়তে লাগল। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নীলোফার বেগম টেলিফোনে ঘোরালেন নশো নম্বর।

অবিলম্বে এসে গেল পুলিশ।

এসব ব্যাপারে পুলিশের বিধান তাৎক্ষণিক। করিম ভাই তাঁর স্ত্রীর গায়ে হাত তুলেছেন, রক্তপাত হয়েছে, সুতরাং এ বাড়িতে তাঁর থাকার আর অধিকার নেই। এক্ষুনি বাড়ি ছেড়ে যেতে

হবে। এবং যতদিন না অন্য ব্যবস্থা হয়, ততদিন তিনি এ বাড়ির হাজার গজের মধ্যে আসতে পারবেন না। জোর করে বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁর শাস্তি হবে কঠিনতর।

করিম ভাই অনেকভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ছেলেরাও এসে বলল, এটা তুচ্ছ পারিবারিক ব্যাপার, কিন্তু পুলিস তাতে কর্ণপাত করতে রাজি নয়। রক্তপাত হয়েছে! করিম ভাইকে পুলিশ বলল, আমরা থাকতে-থাকতে তোমার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।

এইরকম সময়েই করিম সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয়।

প্রথমে তিনি একটা মোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন। পরিচিতরা জানতে পেরে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। একদিন এ বাড়ি, একদিন অন্য বাড়ি। আড্ডায় সময় তিনি একটি কথাও বলেন না। কী অসহায়, বিষণ্ণ তাঁর মুখ।

একদিন কয়েকজনের সঙ্গে গাড়ি করে যাচ্ছি, একজন বলল, আরে ওখানে করিম ভাই না?

একটা পার্কের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছেন করিম ভাই। এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন দূরের দিকে। পার্কের ও পাশেই তাঁর বাড়ি, মাঝখানের দূরত্ব হাজার গজের বেশিই হবে।

জোর করে তাঁকে তুলে নেওয়া হল গাড়িতে।

করিম ভাই ম্লান গলায় বললেন, আমার মাথার বালিশটা নিয়ে আসিনি। অন্যের বাড়িতে, অন্য বালিশে আমার ঘুমই আসে না।

।। চার ।।

পোল্যান্ড থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর শোপ্যাঁ ইউরোপের যেখানেই গেছেন, তাঁর সঙ্গে নিয়ে ঘুরতেন একটি ছোট ভাণ্ডে খানিকটা মাটি, পোল্যান্ডের মাটি, তাঁর জন্মভূমির সঙ্গে এইভাবে রেখেছিলেন যোগাযোগ।

কথাটা মনে পড়ল বাংলাদেশিদের এক পার্টিতে।

অতি সুদৃশ্য অ্যাপার্টমেন্ট সাতাশ তলার ওপরে, নানারকম খেলনা দিয়ে সজ্জিত, জানলা দিয়ে আলো ঝলমল নিউ ইয়র্ক নগরের অনেকখানি দেখা যায়। একটা বেশ চওড়া বারান্দাও আছে।

অল্প শীত থাকলেও আমাকে মাঝে মাঝে সেই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এখন আর ঘরের মধ্যে সিগারেট টানা চলে না। এক-একটা আসরে দেখা যায়, আমিই একমাত্র অপরাধী।

বারান্দায় অনেকগুলি ফুল গাছের টব। নানা রঙের ফুল, অনেকগুলিরই নাম জানি না। একটি ফুল গাছের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। জবা! এ দেশে জবা আগে দেখিনি, তিনটি ফুল ফুটে আছে।

গৃহস্বামী আলতাফ আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

তাকে জিগ্যেস করলাম, জবা কোথায় পেলে? দেশ থেকে নিয়ে এসেছ নাকি?

সে বলল, না, জবা গাছ এখানে পাওয়া যায়। তিরিশ ডলার দাম, একটা ডাল একটু ভাঙা বলে কুড়ি ডলারে পেয়েছি।

তারপর সে বলল, তবে, এই টবের মাটি আমি এনেছি বাংলাদেশ থেকে। তিনবার অ্যাপার্টমেন্ট বদলেছি, এই মাটি সব জায়গায় সঙ্গে নিয়ে গেছি। এক-এক সময় যখন দেশের জন্য খুব মন কেমন করে, আমি এই মাটি একটু ছুঁই।

তুলনাটা ঠিক হল না। অসাধারণ পিয়ানোবাদক ও সুরস্রষ্টা শোপ্যাঁ হয়েছিলেন নির্বাসিত, আমরা তো তা নয়, আমরা যখন ইচ্ছে দেশে ফিরে যেতে পারি। তবু এত আবেগ বা হা-হুতাশ কেন?

আলতাফ বলল, বাধা নেই বলছেন? তা ঠিক, তবু অনেকরকম বাধা আছে, নিজেদের তৈরি করা।

ঘরের মধ্যে ফিরে এসে এটাই হল প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফেরা, না-ফেরা। আমি কোনও পক্ষেই নেই, তাই নীরব শ্রোতা।

উপস্থিত আমন্ত্রিতদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশেরই মত এই যে, দেশ ছেড়ে এসে তারা ঠিক কাজই করেছে, দেশ তাদের চাকরি দিতে পারে না, সুখস্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যব্যবস্থা অতি নীচু স্তরের, জীবনের নিরাপত্তা নেই...দুরে থেকে তারা বরং দেশের উপকারই করছে, ডলার পাঠায়, কেউ গ্রামের স্কুলের উন্নতির জন্য টাকা দিয়েছে, কেউ ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছে বাবা-মায়ের জন্য...

এদের গলার জোরই বেশি।

অন্য পক্ষ খানিকটা মিনমিন করে বলল, আরে মশাই, ভালো গাড়ি চড়া, ভালো বাড়ি, ইচ্ছেমতন যে-কোনও খাবার, এমনকি সাদা বান্ধবী, এ সবই কয়েক বছর পর একঘেয়ে হয়ে যায়, এখন বুঝতে পারি, মনটা পড়ে আছে নিজের দেশে... মনটা সেখানে আর শরীরটা এখানে। এ এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা... এক-একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ মনে হয়, দূর ছাই, সামনের মাসেই দেশে ফিরে যাব, পাকাপাকি লক স্টক অ্যান্ড ব্যারেল... কিন্তু পরদিন সকালে আবার মনে পড়ে কত পিছুটান।

অন্য পক্ষ থেকে একজন বলল, দাদা, যে-রাতে বেশি মাল খান সে রাতেই দেশের জন্য মনটা বেশি উতলা হয়, তাই না?

একজন আমাকে জিগ্যেস করল, এ বিষয়ে আপনার কী মত?

আমি বললাম, অমি তো এ দেশে থাকতে আসিনি। তাই আমার এ বিষয়ে কোনও মতামত থাকতে পারে না। তবে আমেরিকা-কানাডায় ঘোরাঘুরি করতে-করতে যখন দেখি হাজার-হাজার মাইল জমি খালি পড়ে আছে, মানুষ কত কম, তখন মনে হয়, আমাদের দেশ থেকে কয়েক কোটি লোককে এনে এখানে ছেড়ে দেওয়া উচিত...

এ উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে সে সরাসরি প্রশ্ন করল, আপনি যদি সুযোগ পান, আপনি এ দেশে থেকে যেতে রাজি হবেন?

একজনের গেলাস উল্টে গেল। তাতে মনোযোগ সেদিকে চলে যাওয়ায় তার সুযোগ নিয়ে আমি উত্তর এড়িয়ে সিগারেট টানতে চলে গেলাম বারান্দায়।

আড্ডায় একটা কোনও বিশেষ প্রসঙ্গ বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। এর মধ্যেই ঘুরে গেছে অন্য দিকে। এখন আলোচনার নায়ক একটি সাতাশ বছরের যুবক, সে অবশ্য এখানে অনুপস্থিত।

ছেলেটির নাম লতিফ, তার মতন মেধাবী ছাত্র ভারতীয় বা বাংলাদেশিদের মধ্যে ইদানীংকালে আর দেখা যায়নি। আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পূর্ণ স্কলারশিপ নিয়ে পড়েছে। অতি কম বয়সে এম এস করার পর সে চাকরি নিল, কয়েক বছর বাদে পি এইচ ডি করবে এই ইচ্ছে নিয়ে।

সেই লতিফ এখন মনোরোগী। চাকরি ছেড়ে দিয়েছে, কারোর সঙ্গে কথা বলে না, খেতে চায় না, দরজা-জানলা বন্ধ করে অন্ধকার ঘরে শুয়ে থাকে। এ জন্য তার বাবা দারুণ উদ্বিগ্ন, মা প্রায় ভেঙে পড়েছেন।

লতিফের কেন এরকম অবস্থা হল? না, প্রেমের ব্যর্থতাজনিত নয়। কলেজ জীবনে সে টের পায়নি, চাকরিতে ঢোকার পরই সে প্রথম বুঝতে পারল, তার গায়ের চামড়ার রঙের জন্য সে তার শ্বেতাঙ্গ বন্ধুদের সমান হতে পারবে না। একই চাকরিতে ঢুকেছে তার এক সহপাঠী, কিন্তু সাদা চামড়া বলেই তার মাইনে ও সুযোগ-সুবিধে বেশি। চাকরি বদলাল, সেখানেই ওই একই ব্যাপার। এটা সে মেনে নিতে পারেনি, প্রতিবাদ করতে গিয়ে লাভ হয়নি। তার ফলেই এসেছে দারুণ মানসিক

অবসাদ। ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার উপক্রম, অথচ কিছুতেই সে ডাক্তারের কাছেও যাবে না।

অমন একটি ভালো ছেলের এরকম পরিণতির কথা শুনে সবাই দুঃখিত।

একজন বলল, ছেলেটি লেখাপড়ায় ব্রিলিয়ান্ট হতে পারে, কিন্তু তার বাস্তব বুদ্ধি বড় কম। শুধু লেখাপড়া করলে এইরকমই হয়। এ দেশে যে এরকম ডিসক্রিমিনেশন আছে, তা সে আগে বোঝেনি কেন? আমরা সবাই তা জানি, প্রত্যেকেই কখনও না কখনও ভুগেছি, তবু মেনে নিতে হয়, মেনে না নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। আরে বাবা, আমরা বাইরে থেকে এখানে টাকা রোজগার করতে এসেছি, একটু-আধটু লাথি-ঝাঁটা তো খেতেই হবে। যে গরু দুধ দেয়, সে গরু চাঁট মারে না?

আমাদের দীপ্তেন্দু চক্রবর্তী বজ্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল, বাজে কথা! শুধু এ দেশে কেন, ডিসক্রিমিনেশন কোন দেশে নেই, আমাদের নিজেদের দেশে নেই? আরও বেশি আছে। ফিফটি পার্সেন্ট গরিবদের তুলনায় মধ্যবিত্তরা সব ব্যাপারে বেশি সুযোগ-সুবিধে পায় না? গ্রামের তুলনায় শহরের লোক কী পায়? এমনকি গায়ের রঙ... খবরের কাগজে পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনে বেরয় ফরসা পাত্রী চাই... বরং এ দেশেই ওরকম বিজ্ঞাপন বেরলে জেল হয়ে যেত! কালো মেয়েদের বিয়েই হয় না। প্রতিভা থাকলে এ দেশেও যে সাদা চামড়াদের থেকে ওপরে ওঠা যায়, তার আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারি... ওই ছোকরাটাকে কোনও মেয়ের সঙ্গে ভিড়িয়ে দাও, ও সব ডিপ্রেশান-ফিপ্রেশান হাওয়া হয়ে যাবে!

এরপর যে তর্ক শুরু হল, তাতে যুক্তির চেয়ে চেঁচামেচিই বেশি। এরকম সময়ে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়াই ভালো।

লতিফকে আমি দেখিনি। তবু যেন দেখতে পেলাম, একটা অন্ধকার ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে একটি সাতাশ বছরের যুবক। কত যত্ন ও পরিশ্রমে সে লেখাপড়া শিখেছে, অথচ কী বিমর্ষ তার মুখখানি। সে নিজের দেশেও ফিরে যেতে পারবে না।

॥ পাঁচ ॥

মন্ট্রিয়েল নগরটি ভারী রূপবান। কোনও কোনও অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরলেও চক্ষের আরাম হয়।

বাংলায় নগর ও নগরী দুটোই চলে। নদীরা যেমন পুং লিঙ্গ ও স্ত্রী লিঙ্গ। এ দেশের বৃহৎ অট্টালিকাবহুল শহরগুলি দেখলে আমার পুরুষই মনে হয়, নগরী বলা যায় না।

মন্ট্রিয়েলে একটা ব্যাপার মিলিয়ে দেখার জন্য আমার কৌতূহল ছিল।

কানাডায় কুইবেক রাজ্যটি ফরাসি প্রধান। মাঝে-মাঝে এরা কানাডা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন হতে চায়। একবার শার্ল দ্য গল এসে সেই মনোভাব উস্কে দিয়ে গিয়েছিলেন।

মন্ট্রিয়েলের ফরাসি নাগরিকরা উগ্র ভাষাবাদী। আগেই শুনেছিলাম, এই শহরের সমস্ত বিল বোর্ড, সাইন বোর্ড, পোস্টারে ফরাসি ভাষা রাখতেই হবে। এ জন্য ভাষা-পুলিশ আছে, তারা ঘুরে ঘুরে দেখে, কোথাও কোনও সাইন বোর্ডে শুধু ইংরেজি থাকলে তারা টেনে নামিয়ে দেয়।

যা শুনেছি, তা সত্যি। মন্ট্রিয়েলের যে-কোনও রাস্তায় চোখ ঘোরালেই বোঝা যায়, সেটা ফরাসিদের শহর। ঢাকায় যেমন বোঝা যায়, সে শহরটা বাঙালিদের। দুঃখের বিষয়, কলকাতায় তা বোঝা যায় না। কলকাতাতে ভাষা-পুলিশ তৈরি করতে হবে।

মন্ট্রিয়েলে আমি সবচেয়ে বেশি চমৎকৃত হয়েছি কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ি দেখে!

আমার এক ডাক্তার বন্ধু বলেছিলেন, আমাদের দেশে পঞ্চাশ ভাগ লোক খালি পায়ে হাঁটে। দেশসুদ্ধ সবাইকে যদি জুতো পরানো যেত, তা হলে সবাই স্বাস্থ্যবান হয়ে যেত!

জুতো পরার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক আছে অবশ্যই।

গ্রামেগঞ্জে, এমনকি শহরের বস্তিতেও শৌচাগার নেই। অধিকাংশ মানুষ গাড়ু কিংবা মগে পানি কিংবা জল ভরে মাঠে-ঘাটে মল-মূত্র ত্যাগ করতে যায়। খোলা পড়ে থাকা পুরীষে জন্মায় হুক ওয়ার্ম, অতি সূক্ষ্ম সেই বীজাণু খালি পায়ে হাঁটা মানুষের পায়ের তলা দিয়ে ঢুকে যায় শরীরে। তার ফলে সারা জীবন তারা পেটের ব্যামোতে ভোগে। গ্রামের বহু মানুষের এ জন্য রোগা ডিগডিগে চেহারা।

কিছু কিছু জন্তু-জানোয়ারের পুরীষ আরও মারাত্মক। বিশেষত ঘোড়ার। কলকাতা শহরে এক সময় ঘোড়ার গাড়ি চলত অনেক, এখনও কিছু কিছু আছে। ঘোড়ার পুরীষ থেকে ছড়ায় টিটেনাস। শহরের রাস্তায় আছাড় খেয়ে হাত-পা ছড়ে গেলেই অ্যান্টি-টিটেনাস ইঞ্জেকশন নিতে হয়। আমি নিজেই নিয়েছি তিনবার।

মন্ট্রিয়েলের ঘোড়ার গাড়িগুলি প্রধান যানবাহন নয়, নিছক শখের ভ্রমণবিলাসীদের জন্য। যেমন অনেক বড় শহরেই হোটেলগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে থেকে পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে চায়। এখানকার জুড়ি গাড়িগুলি ভারী সুন্দরভাবে রঙ করা, ঘোড়াগুলিও তেজি। প্রত্যেকটা ঘোড়ার পেছন দিকে একটা থলি বাঁধা আছে। প্রথমে অদ্ভুত লেগেছিল, দু-তিনবার দেখার পরেই সেই থলি-রহস্য প্রাঞ্জল হয়ে গেল। ঘোড়ারা চলন্ত অবস্থায় যখন-তখন অপকর্ম করে। তাদের পুরীষে যাতে রাস্তাঘাট দূষিত না হয়, সেই জন্য এরকম থলি বেঁধে রাখার ব্যবস্থা।

আমাদের দেশে ঘোড়ার ব্যবহার হচ্ছে হাজার-হাজার বছর। কিন্তু রাস্তাঘাট ঘোড়ার পুরীষমুক্ত রাখার এত সহজ ব্যবস্থাটা কারোর মাথায় আসেনি? আমরা টিটেনাস রোগ পুষে রেখেছি।

॥ ছয় ॥

এ দেশটা যৌবনের। বুড়ো-বুড়িরা টিকে থাকে কোনওক্রমে সমাজের প্রান্তসীমায়। ছেলেমেয়েরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে নানা জায়গায়, বছরে একবার তাদের মুখ দেখা গেলেই যথেষ্ট। অনেকে প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেই কবরখানার জমি কেনার জন্য টাকা জমায়।

অবশ্য যাদের অপরিমেয় অর্থবল থাকে তারা ব্যতিক্রম। বার্ধক্যে শিথিল পেশিতে কিছুটা শক্তি জোগাতে পারে টাকাপয়সা। অর্থ থাকলে হুকুম দেওয়ার অধিকারও থাকে।

প্রবাসী পুত্রকন্যাদের কাছে দেশ থেকে যে-সব বাবা-মা কিছুদিনের জন্য থাকতে আসে, তাদের নানা করুণ কাহিনি প্রচলিত আছে। অল্প দিনের জন্য বেড়িয়ে যাওয়া ভালো, বেশিদিন থাকলেই বন্দিদশা। গাড়ি-নির্ভর দেশ, দেশ থেকে বুড়ো-বুড়িরা এসে গাড়ি চালাতে পারে না। শনি-রবিবার ছাড়া অন্যদিন তাদের কে গাড়িতে চড়াবে? অতি ভক্তিমান-ভক্তিমতী পুত্র-কন্যার পক্ষেও সম্ভব নয়। ফলে দিনের পর দিন বাড়ি থেকে তারা এক পা-ও বেরতে পারে না।

মাঝে মাঝেই আমার মনে হয়, আমি নিজেই যেন আমার আগেকার লেখা কোনও গল্পের চরিত্র হয়ে গেছি। আমি আর স্বাতী কিছুদিনের জন্য থাকতে এসেছি আমাদের পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে। তবে নিজেদের এখনও বুড়ো ভাবতে কিছুতেই রাজি হতে পারি না, বড় জোর প্রৌঢ়ত্ব পর্যন্ত টেনে নেওয়া যায়। আর একটা তফাতও আছে, যেহেতু এ দেশটা আমার যথেষ্ট পূর্বপরিচিত, রীতি-নীতি জানি, তাই গাড়ি ছাড়াও রাস্তায় বেরতে কিংবা বাসে-ট্রামে চড়তে আমার অসুবিধে হয় না। এ বাড়িটার কাছেই অনেক দোকানপাট আছে, সিনেমা হল, লাইব্রেরি আছে। সুতরাং বন্দিদশার প্রশ্ন নেই।

পুপলু আর চান্দ্রেয়ী কাজে বেরিয়ে যায় সকাল সাতটার মধ্যে। ওদের সঙ্গে দেখা ও গল্পটল্প

হয় শুধু সন্ধেবেলা। অবশ্য দুপুরে, কাজের ফাঁকে ওরা দুজনেই টেলিফোন করে।

সকালে ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা চা-টা খাই। তারপর স্বাতী এটা-সেটা করে, কখনও রান্না করে, কখনও টিভির সামনে, কখনও বই হাতে। আর আমি বাধ্য ছাত্রের মতন লেখাপড়ায় বসে যাই। কলকাতার মতন তো এখানে যখন-তখন লোকেরা দেখা করতে আসে না। আর অত বেশি টেলিফোনও বাজে না, তাই নিরুপদ্রবে কাজকর্ম করা যায়।

এক-এক বিকেলে স্বাতী ও আমি বেরিয়ে পড়ি। একদিন গেলাম সিনেমা দেখতে। ভি সি আর-এ বহু ফিল্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু টাটকা, নতুন ছবি দেখতে হলে হলে যেতেই হয়। তা ছাড়া, বড় পর্দায় ছবি দেখার স্বাদই আলাদা। পত্রপত্রিকায় একটি স্প্যানিশ ছবির সমালোচনায় বেশ সুখ্যাতি পড়েছি, সেটাই চলছে পায়ে-হাঁটা দূরত্বে একটা মুভি হাউসে।

প্রথম চমক লাগল টিকিট কাটতে গিয়ে।

লেখা আছে, টিকিটের দাম আট ডলার, সেই অনুযায়ী ষোলো ডলার দিতে কাউন্টারের বৃদ্ধা মহিলাটি বললেন, মঙ্গলবার সন্ধেয় দাম কম থাকে, দশ ডলারই যথেষ্ট।

মঙ্গলবারের কী এমন বৈশিষ্ট্য যে শুধু সেদিনই টিকিটের দাম সস্তা, তা আমার বোধগম্য হল না।

সেই মহিলাই কাউন্টার থেকে বেরিয়ে এসে ভেতরের দরজা খুলে দিলেন।

সওয়া পাঁচটায় ছবি আরম্ভ হওয়ার কথা, আমরা একটু আগে এসে পড়েছি। এখনও পর্যন্ত আর কোনও দর্শক নেই। শুধু আমরা দুজন।

আমি বললাম, এ দেশে সিনেমা হল খুব ভালো প্রেম করার জায়গা।

স্বাতী বলল, যাঃ, আশপাশে লোকজন থাকে।

আমি বললাম, এ দেশে প্রেম করার জায়গার অভাব নেই। গাড়ি আছে, কত ফাঁকা জায়গা, কত জনশূন্য পার্ক, কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট তো আছেই। তবু সিনেমা হলের মধ্যে প্রেম করায় অল্পবয়সীরা বিশেষ মজা পায়। মোরাভিয়া উপন্যাসে পড়েছি, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আগে আগে এসে একেবারে পেছনের সারিতে বসে পড়ে। তারপর আলো নিভলে তারা কিছুই করতে বাকি রাখে না। অর্থাৎ সিনেমা দেখা ছাড়া তারা আর সব কিছুই করে।

আমি স্বাতীর কাঁধে হাত রাখতেই সে বলল, এই যাঃ, কেউ এসে পড়বে।

যথা সময়ে ছবি শুরু হয়ে গেল। এবং আর কোনও দর্শক এল না। একজনও না। এ যেন অলীক, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এত বড় একটা হলে শুধু দুজনের জন্য একটা ফিল্ম চালানো হচ্ছে? মাত্র দশ ডলার পেয়েছে, এদের খরচ হবে কত? আমাদের দেশে কি শুধু দুজনের জন্য ছবি দেখানো হত? নিশ্চয়ই টিকিটের দাম ফেরত দিয়ে বলত, অন্যদিন আসবেন।

শেষ পর্যন্ত আর একজনও এল না। ঝড়-বৃষ্টি নেই, টিকিটের দাম সস্তা, ভালো ছবি, তবু মঙ্গলবার বিকেলে কেউ আসে না? আমরা যে প্রৌঢ়ত্ব ছাড়াতে চলেছি, তার প্রমাণ, আমার হাতখানা স্বাতীর কাঁধেই শুধু রইল, আর কোনও ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত হল না।

শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে আসতেই সেই বৃদ্ধা মহিলা মিষ্টি হেসে জিগ্যেস করলেন, কী, উপভোগ করেছ তো?

মাথা ঝুঁকিয়ে বললাম, অবশ্যই।

এরকমভাবে সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে এই প্রথম। এবং এই প্রথম আপসোস হল বয়স বাড়ার জন্য।

মধ্যরাতের মেলায়

জয়দেবের মেলায় আমি কয়েকবারই গেছি, কিন্তু কোনওবারই, আসল মেলা যাকে বলে, আমার দেখা হয়নি। শুনেছি, এই মেলাতে প্রায় ছ' সাত শো দোকানপাট বসে, নাগর-দোলা, সার্কাস-ম্যাজিকের তাঁবু, মণিহারি, প্লাস্টিকের খেলনা, পাথরের জিনিসপত্র, নকশা-কাটা মাদুর—এসবই পাওয়া যায়, কিন্তু আমি কোনওদিন চক্ষে দেখিনি সে সব। সিগারেট-দেশলাই ছাড়া কোনও কিছুই সওদা করিনি এই মেলা থেকে।

প্রতিবারই পৌঁছতে-পৌঁছতে রাত এগারোটা সাড়ে-এগারোটা বেজে যায়। তখন দোকানগুলি সব ঘুমন্ত, এদিকে-সেদিকে চাদর বা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে কাতারে-কাতারে মানুষ, এবং তাদের গা ঘেঁষাঘেঁষি করে পারিবারিক বন্ধুর মতন, গরু, কুকুর, ছাগল।

কোনওবার গেছি বাসে, কোনওবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে গাড়িতে। দূর থেকে দেখা যায়, ফুটফুটে অন্ধকারের মধ্যে ছড়ানো-ছিটানো জোনাকির মতন আলো। পাকা রাস্তা ছেড়ে এগোলাম কদমখণ্ডীর শ্মশানঘাটের দিকে। এবড়ো-খেবড়ো মেঠো পথ, কবেকার শুকনো কাদা এখন শুকিয়ে ঢেউ খেলানো পাথর, টর্চ জ্বেলে পথের নিশানা ঠিক করতে হয়। হু-হু করে বইছে উত্তুরে বাতাস, কলকাতার তুলনায় এই প্রান্তরটিকে মনে হয় হিমালয়ের একেবারে পায়ের কাছে। প্যান্ট-শার্টের ওপর সোয়েটারেও শীত মানে না, একটা আলোয়ান জড়িয়ে মাথাটাও মুড়ি দিয়ে নিই।

মাঠটা পার হওয়ার পর মোটামুটি একটা আলোয় সাজানো পথ পাওয়া যায়। এর দুপাশে গাদা-গাদা মিষ্টির দোকান। আমি প্রত্যেকবারই দেখেছি, শুধু এই মিষ্টির দোকানগুলিই সারারাত জেগে থাকে। উঃ, কত রকমের মিষ্টি। এত বিরাট-বিরাট আকারের চমচম কাঁচাগোল্লা আর কোথাও দেখিনি। রাজভোগগুলির নাম দৈত্যভোগ হওয়া উচিত। একসঙ্গে এত মিষ্টি দেখলে আমার গা গুলোয়। দ্রুত সেই জায়গাটা পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। ততক্ষণে গানের সুর কানে আসতে শুরু করেছে।

কদমখণ্ডীর শ্মশানঘাটের আশেপাশে অনেকগুলি বিরাট-বিরাট বটগাছ। অনেকে বলেন, এই সব বটগাছ নাকি পাঁচ-সাতশো বছরের পুরোনো—আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য কিছু না, প্রবীণ বৃক্ষ পরিবারে এরা প্রায় ছেলেমানুষই বলতে গেলে, ষোলো হাজার বছরের পুরোনো একটি গাছের মৃত্যুসংবাদে বিভূতিভূষণ শোক প্রকাশ করেছিলেন। অজয় নদীর তীর। ওপাশে বর্ধমান, এপাশে বীরভূম। বীরভূমের এদিকের নদী-তীরবর্তী গ্রামটির নাম কেঁদুলি। জনশ্রুতি, লক্ষ্মণ সেনের আমলে কবি জয়দেব এই গ্রামে জন্মেছিলেন। তা হলে অন্তত আটশো বছর আগেকার কথা—কে জানে সত্যি কি না, আমাদের দেশে ইতিহাস বড় ন্যালাখ্যাপা, প্রমাণ রাখতে ভুলে যায়। তবে ইতিহাসের চেয়ে প্রবাদ প্রসিদ্ধি অনেক সময় বেশি মধুর। মনে পড়ে যায় সেই গল্পটা। জয়দেব গীতগোবিন্দ রচনার সময় এক জায়গায় আটকে গেছেন। 'স্মরগরল খণ্ডনম, মম শিরশি মণ্ডনম—' এইটুকু লেখার পর পরের লাইনটা আর মাথায় আসছে না। অসমাপ্ত কাব্যের পুঁথি খোলা রেখে কবি গেলেন নদীতে স্নান করতে। ফিরে এসে দেখলেন, তাঁর অসমাপ্ত শ্লোকের নীচে মুক্তাক্ষরে কে যেন পরের লাইনটি লিখে রেখে গেছেন, 'দেহি পদপল্লব মুদারম্'! ভক্তেরা বলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এসে লিখে গিয়েছিলেন লাইনটা, অন্যদের ধারণা কবির স্ত্রী, কিংবা মতান্তরে রাজনর্তকী প্রণয়িণী পদ্মাবতীই গোপন কৌতুকে রচনা করেছিলেন

ওই অপূর্ব পংক্তিটি। যাই হোক, ঘটনাটি নিশ্চয়ই শীতকালে ঘটেনি, কারণ, শীতকালে অজয় নদীতে স্নান করা প্রায় অসম্ভব। জল প্রায় নেই বললেই চলে, নোংরা-কাদায় প্যাচপেচে। এই নদীটিকে আমি কখনও পছন্দ করতে পারিনি। নদী যদি স্বাস্থ্যবতী না হয়, তা হলে তার সঙ্গে প্রণয় জন্মায় না। ভরা বর্ষায় অজয়কে দেখার সুযোগ হয়নি। ও, আর একটা ভুলও করেছি এতক্ষণ, অজয় তো নদী নয়, নদ, প্রণয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

জানি, ওড়িশার একটি জায়গার দাবি আছে, জয়দেবের জন্মস্থান হিসেবে, হয়তো জয়দেব ছিলেন উৎকল রাজের সভাকবি, গীতগোবিন্দ রচিত হয়েছিল সেখানেই, কেন-না রাজসভার কাব্যের অনেক চিহ্ন আছে ওই রচনায়, ওড়িশার সমসাময়িক মন্দিরগাত্রের আদিরসের সঙ্গে চরিত্রের মিল আছে এই ভক্তিরসের ছদ্মবেশী আদিরসের কাব্যটির। হয়তো কেঁদুলির ব্যাপারটা পুরোটাই গুজব, তবু একটা বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই শত শত বছর ধরে একজন কবির স্মরণে এখানে মেলা জমে ওঠে। শুনেছি, বাংলার খুব পুরোনো মেলার অন্যতম এটি, এবং গঙ্গাসাগর ছাড়া, এত বেশি মানুষ আর কোনও মেলায় আসে না। একজন কবির স্মরণে এই মেলা, তাই এর এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা আর কোথাও নেই।

এই মেলায় নিছক সাধুসন্ন্যাসীরা আসে না, আসে কবি ও গায়কেরা। পৌষসংক্রান্তির দিনে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে দলে-দলে এসে জড়ো হয় আউল, বাউল, সাঁই, কর্তাভজা, দরবেশ, কীর্তনীয়া। কেউ-কেউ আসে গরুর গাড়িতে, অনেকেই পায়ে হেঁটে, বিভিন্ন দিক থেকে, শীর্ণ নদ পেরিয়ে মহা বট গাছগুলির ঝুপসি ঘুপসি অন্ধকারে আস্তানা গেড়ে বসে। তারপর শুরু হয় প্রাণের আনন্দে গান।

মিষ্টির দোকানগুলো পেরিয়ে আসতে-আসতে প্রথম আসরটি থেকে ভেসে আসা গান শুনে মনে হয় নারীকণ্ঠের। ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে দেখলাম, একটি কিশোর, বারো-তেরো বছর বয়েস, এখনও কণ্ঠস্বর ভাঙেনি, রিনরিনে গলায় সে তান তুলেছে ঃ

আজ মোরা জল ভরিতে
দেখে এলাম নবীন গোরা
সে তো হাসে কাঁদে নাচে গায়
থাকে সদা বাউল পারা।...

রাত এখন সাড়ে বারোটা, সেই সময় এই বাচ্চা বাউলটি নেচে-নেচে ঘুরে ঘুরে গাইছে আর একজন 'বাউল পারা'র কথা, চকচক করছে আর মুখ, তার চোখে যে একটা তীব্র মনোযোগ, ওই বয়েসি আর কোনও ছেলের এমন দেখেছি কি? গানের মধ্যে এমন ডুবে যাওয়া—এর মধ্যেই ছেলেটি শিখল কী করে? গান শেখার চেয়েও এটা যে অনেক শক্ত।

এক আসরে বহুক্ষণ বসে থাকলে অনেক কিছুই দেখা হবে না। এখানে সেখানে বিভিন্ন আসর, ঘুরলেও সব ক'টা শোনা হবে না। এখন মেলার সময় সাময়িকভাবে বিজলী আসে, অনেকেই মাইক্রোফোন ব্যবহার করে। আবার বড় বড় আখড়ার গমগমে মাইকের পাশেই আছে নিরিবিলি ছোটখাটো আখড়া, যেখানে তিরিশ পঞ্চাশজন গোল হয়ে বসে গুনগুন করে গান গাইছে। আপন মনে গান, গানের জন্যই গান।

বাউলের সংখ্যা বেশি হলেও কোথাও-কোথাও জমেছে কীর্তন, কোথাও লালন ফকিরের গান। মনোহর ক্ষ্যাপার আখড়ার পাশেই এবার সবচেয়ে বড় আসর, সেখানে চলেছে পালাকীর্তন, দু-তিনজন একসঙ্গে নেচে-নেচে গাইছে দানখণ্ড। বাবাজি নিজে সেখানে উপস্থিত নেই, তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ, বিশেষ বিশেষ নারী ও পুরুষ ভক্তরা ভেতের ঢুকে আবার নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

তার পাশেই একটি ছোট আখড়ায় বিনা মাইকে চলছে লালন ফকিরের গান ঃ

একদিন না দেখিলাম তারে

আমার বাড়ির কাছে আরশি নগর
সে এক পরম বিরাজ করে।...
লালন কি জাত চিনলি না মন
শুধু জাতের বড়াই কর...

এরকমভাবে একে-একে পার হয়ে যাই কাঙাল ক্ষ্যাপার আখড়া, খেঁটরে বাবার আখড়া, জয় ক্ষ্যাপার আশ্রম—আরও কত নাম-না-জানা আশ্রম।

এবার নবীন দাসের সুযোগ্য পুত্র পূর্ণ দাসের আসর বসেনি। গতবারেও দেখেছি বেশ উঁচু করে বাঁধা স্টেজের ওপরে পূর্ণ দাসের বড় আসর; অল্প বয়েসি থেকে থুরথুরে বুড়ো বাউলরাও তাতে অংশ নিয়েছে। পূর্ণ দাস বাবাজি বেশ কয়েকবার বিদেশ ঘুরে আসায়, তাঁর এখন অনেক বিদেশি ভক্ত, গতবার পর্যন্ত দেখেছি, অন্তত দেড়শো দুশো অল্প বয়েসি সাহেব-মেম প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও প্রায় ছিন্নকন্থা পরিধান করে রাত জেগে-জেগে গান শুনছে, কারুর-কারুর পাশে টেপ রেকর্ডার। এবার পূর্ণ দাস আসেনি। সাহেব মেমরাও উধাও, শুধু দুটি টকটকে লাল সোয়েটার পরা শ্বেতাঙ্গিনী, রাত্রির আলেয়ার মতন, যখন-তখন যেখানে-সেখানে দপ করে জ্বলে উঠছে। শহুরে দর্শকদের ভিড়ও এবারের মেলায় বেশ কম। শুনলাম, পূর্ণ দাস তাঁর দলবল নিয়ে আলাদা একটা মেলা করবেন।

এত শীত, তবু খানিকটা পরে শীত বোধ চলে যায়। কয়েক হাজার মানুষের গায়েরও একটা উত্তাপ আছে তো! হাতে ঘড়ি থাকলেও সময় খেয়াল থাকে না. এইসব গানের সুর একটা নেশার মতন। যদিও বাউল গানের বিশেষ সুরবৈচিত্র্য নেই। বড় জোর দু-তিন রকমের ধরতাই। 'ভোলা মন' বলে কোথায় তান বিস্তার হবে, তা প্রায় মুখস্থ বলা যায়। কথার বৈচিত্র্যও খুব বেশি নয়। রাধাকৃষ্ণ, নিমাই আর দেহতত্ত্ব, যার উপমা রূপকগুলি এখন বহু ব্যবহৃত। তবু, ওরা যেমন প্রাণের আনন্দে গায়, সেই রকম শুনতে শুনতেও একটা নেশা ধরে যায়।

কোথাও-কোথাও ঠিক কবির লড়াই না হলেও পরপর গানের নির্বাচনে একটা নাটক জমে ওঠে। যেমন, একজন গাইল 'দশটা ইঁদুর, ছ'টা ছুঁচো, আমায় ঘর বাঁধতে দিল না...' ইত্যাদি, এর পরেই আর একজন উঠে ধরল, 'কালো বেড়াল কে পুষেছে পাড়ায়'। কিম্বা সেই বহু বিখ্যাত 'গোলেমালে গোলেমালে পিরিত কোরো না'—এর পরেই আর এক দলের 'প্রেম করা তো সময় জানে না!'

ঘুরতে-ঘুরতে একটা সরু পথ ধরে আমরা একটা ছোট আস্তানায় এসে হাজির হই। রাত্তিরের তখন তিন প্রহর পেরিয়েছে। এখানে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। আসরের শ্রোতারা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, যেখানে বসে ছিল, সেখানেই এখন গড়ানো, জায়গার অভাবে এর গায়ের ওপরে ওর পা, অধিকাংশই দীন দরিদ্র গাঁয়ের মানুষ, বিশেষ কিছু শীত বস্ত্র নেই, নারী ও পুরুষেরা তাই পরনের শাড়ি বা ধুতিটাই মুড়িসুড়ি দিয়ে কুকুরকুণ্ডলী। এই ঘুমন্ত শ্রোতাদের মাঝখানে বসে আসে দুজন বাউল, গেরুয়া আলখাল্লা ও দাড়িতে ঠিক ছবির বাউলের মতন, গুপী যন্ত্র বাজিয়ে গুন গুন করে গান গেয়ে যাচ্ছে। শ্রোতারা কেউ শুনছে না, তবু গান গেয়ে যাওয়া, এর ব্যাখ্যা আমরা করব কী করে!

আখড়ার দাওয়ায় একজন নীরব সন্ন্যাসী, পাশে চুল্লি জ্বলছে। সাধুবাবা হাতের ইঙ্গিতে আমাদের বসতে বললেন। আমরাও আগুনের লোভে তাঁর পাশেই বসলাম। কাছাকাছি আর একজন মাত্র জাগ্রত ভক্ত, তাঁর হাতে গাঁজার কল্কে, তিনি আমাদের প্রসাদ দিলেন। কল্কেটা নিয়ে দুবার দম দিতেই শরীরটা বেশ চাঙ্গা লাগল। আবার কল্কে সাজা হল, পালাক্রমে তাতে টান দিতে-দিতে আমরা সেইখানেই বসে গান শুনলাম আরও অনেকক্ষণ।

এইসব গান কে লিখেছে, সে সুর দিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার কোনও ঠিক নেই। সব

গানই সকলের সম্পত্তি। মেলার যতগুলো আসরে ঘুরলাম, শুনলাম যত জনের গান, তার মধ্যে আছে যুবক, বৃদ্ধ, কিশোর, নারী—সব জায়গাতেই একটা কথা মনে হয়, এরা কেউই গায়কের মতন গায় না, প্রতিটি গানই যেন নিজের উপলব্ধি। অন্য কারুর না, নিজের গান। না হলে এই তন্ময়তা আসে না—সারারাত ধরে, কোনও রকম পার্থিব প্রাপ্তির আশা না রেখে গান গেয়ে যাওয়া—এর তো আর কোনও মানে নেই। বাউলেরা বিবাগি ঘর-ছাড়া হয়, কিন্তু তাদেরও তো ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে, কে মেটায় সেইসব দাবি। এ-কথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখন অনেক বাউলকে ট্রেনে গান গেয়ে ভিক্ষে করতে হয়। কিন্তু এই মেলায় কোনও বাউল কারুর কাছে কিছু চায় না। তা ছাড়া জয়দেবের মেলাই আমার অভিজ্ঞতায় একমাত্র জায়গা, যেখানে একজনও ভিখিরি দেখিনি আমি।

দূরে বড় বড় আখড়ার মাইকের জোরালো গান সত্ত্বেও এই ছোট্ট আসরে গুন-গুন করে গাইছিল একজন মধ্যবয়েসি বাউল ঃ

আহা যাকে পথে করোয়া হাতে
তিন দিনের উপবাসী
দেখলাম গো নিমাই সন্ন্যাসী...

শুনতে-শুনতে মনে হয়, এই সামান্য কথার মধ্যে, 'তিন দিনের উপবাসী' এই জায়গাটাতেই বেশ চকিত কবিত্ব আছে, শুধু উপবাসী বলার বদলে তিন দিনের উপবাসী বলায় যে পর্যবেক্ষণের আভাস...। পরক্ষণেই মনে হয়, যে বাউলটি গাইছে, সে নিজেই তিন দিনের উপবাসী নয় তো?

মেলা যখন ছাড়লাম, তখন ভোরের আলো ফুটছে। তখনও বহু আসরের গান থামেনি। এই এক গান-পাগলের মেলা। একটু পরেই আবার চলবে কুঞ্জভঙ্গ গান, দুপুরে ধূলট, তারপর দধিহরিদ্রা।

প্রতি বৎসরই মেলা ছেড়ে যাওয়ার সময়, এই তো সব কিছু দেখা হল, অনেক গান শোনা হল, আগামী বছর আর শীতের মধ্যে কষ্ট করে আসব না। যদিও জানি, আবার আসতেই হবে।

কাশ্মীরে দিনকয়েক
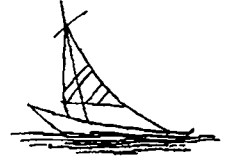
অনেক উদ্যোগ আয়োজন, অনেক জল্পনা-কল্পনার পর শেষে সত্যিই একদিন আমরা বইয়ে পড়া, ছবিতে দেখা কাশ্মীরের দিকে যাত্রা করলাম। আমরা দলে ছিলাম সবশুদ্ধ ১৫ জন, নানা বয়সের আমরা, দলপতি ৪০ বছরের কমলদা থেকে ১২ বছরের বিপুল পর্যন্ত। ১৪ জুন রাত্তিরবেলা হাওড়া স্টেশনে অনেক আত্মীয়স্বজন আমাদের বিদায় দিতে এল—যেন আমরা কোনও বিদেশে যাচ্ছি। এক হিসেবে কাশ্মীর যেতে আমাদের প্রায় বিদেশ যাওয়ার মতোই স্বাদ লাগছিল, কারণ কাশ্মীর যেতে পুলিশের ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হয় এবং কাশ্মীর প্রদেশে ঢুকবার আগে সেটা দেখাতে হয়। তা ছাড়া একসঙ্গে এত দূরের পথ এর আগে আমরা কেউ-ই ভ্রমণ করিনি।

কলকাতা থেকে প্রায় দেড় হাজার মাইল দূরে পাঠানকোট স্টেশন। সেখানেই আমাদের রেলযাত্রা শেষ। তারপর আবার ২৬৭ মাইল যেতে হবে বাসে চড়ে। সেখানে তাড়াতাড়ি আহার শেষ করে, আমরা বাসে চড়ে বসলুম। পাঠানকোট থেকে একটু দূরে কাশ্মীর-সীমান্ত—সেখানে আমরা পুলিশের ছাড়পত্র দেখালুম। তারপরই কাশ্মীর! আমরা কাশ্মীর পৌঁছলুম—কিন্তু যে 'শ্রীনগর' শহরে

আমরা থাকব—তা এখনও আড়াইশো মাইল দূর। বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাবের ওপর দিয়ে আমরা যখন এসেছি, তখন অসহ্য গরমে আমাদের একেবারে ঝলসে দিয়েছে। তাই কাশ্মীর সীমান্তে পৌঁছেই আমরা শীতের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম। কিন্তু কোথায় শীত। চারপাশে মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে মাঠ, মাঝে ছড়ানোভাবে উট, মোষ ঘুরছে, আর চামড়া পুড়িয়ে ফেলছে রোদ। আমাদের হরিদা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে গরমে—অনবরত ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে মুখে-চোখে রুমালে হাঁটুতে দিচ্ছে। বাস কন্ডাক্টরকে আমরা বললুম যে শীত কখন আসবে। শুনলুম যে, জম্মু শহর পার হওয়ার পর, আরও কিছু দূরে 'কুদ' বলে একটি জায়গা থেকে শীত আরম্ভ হবে। 'কুদ' নাম শুনেই আমরা চিনতে পারলুম। কারণ খবরের কাগজে প্রায়ই এই নামটি চোখে পড়ে। এখানে কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে বন্দি করে রাখা হয়েছে।

জম্মু থেকে পাহাড় আরম্ভ হল। পাহাড়ের গা দিয়ে সরু রাস্তা। তার ওপর দিয়ে অসংখ্য বাঁক ঘুরে ঘুরে বাস চলছে। মাঝে সুড়ঙ্গ, এখানে সেখানে ঝরনা ঝরছে। সন্ধের সময় এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেল—আমরা পাহাড়ের অনেক ওপরে চলে এসেছি। একটু পরেই আমরা কুদে পৌঁছে গেলাম। সেখানে ঠান্ডা শীতের হাওয়া। এখানে আমাদের রাত কাটাতে হবে—রাত্রে বসে চলে না। কুদ শহরটা ভারী সুন্দর। মনে হয় পাহাড়ের গায়ে আঠা দিয়ে কে যেন কয়েকটা ঘরবাড়ি আটকে দিয়েছে। একটা ঝরনা দিয়ে খুব তোড়ে জল ঝরছে, আর তারই আশেপাশে হোটেল-দোকান। পরদিন ভোরবেলা আবার আমাদের যাত্রা আরম্ভ হল।

কাশ্মীর ভ্রমণের প্রধান আনন্দ হল পাঠানকোট থেকে শ্রীনগরের পথ। এই পথ যেমন সুন্দর, তেমন ভয়ঙ্কর। এরোপ্লেনে গেলে এসব কিছুই দেখা হয় না। ঘুরে ঘুরে বাস ক্রমশ ওপরে উঠছে—তারপর পাহাড়ের পর পাহাড় পেরিয়ে যাচ্ছে। নীচের দিকে তাকালে তল কোথায় দেখতে পাওয়া যায় না—মাঝে মাঝে শুধু দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে দাবার ছকের মতো ফসলের খেত। সামনে পাহাড়গুলোর মাথায় সাদা বরফ জমে আছে। আর এখানে-সেখানে অজস্র বুনো ফুল। কখনও কখনও দেখা যাচ্ছে। দুর্দান্ত বন্য পাহাড়ি নদী ভয়ঙ্কর স্রোতে ছুটে চলেছে। একটু পরেই হারিয়ে যাচ্ছে চোখের আড়ালে। আমাদের জীবন এখন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বাস ড্রাইভারের হাতে—সে একটু অসতর্ক হলেই একেবারে নিশ্চিত মৃত্যু। বানিহাল বলে একটা জায়গায় এলাম—সেখানে উচ্চতা প্রায় ন'হাজার ফিট। দার্জিলিঙের কাছে ঘুম বলে একটা জায়গা অছে, যেখানকার উচ্চতা আট হাজার ফিট—সেখানে কী শীত, মেঘের মধ্য দিয়ে যেতে হয়, আর আমরা এখন ন'হাজার ফিট দিয়ে বাসে চড়ে যাচ্ছি। বানিহালের কাছে একটা সুড়ঙ্গ কাটা হচ্ছে—এটা শেষ হলে—পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হলুম শ্রীনগর পৌঁছে। এত ভয়ঙ্কর পাহাড় পেরিয়ে এসে দেখলাম—শ্রীনগর শহর একেবারে সমতল ভূমিতে। কোথাও উঁচু-নীচু নেই। পাহাড়গুলোর মাঝখানে এক বিশাল উপত্যকায় এই শ্রীনগর শহর। শঙ্করাচার্য পাহাড়ের পায়ের কাছে এই শ্রীনগর—এর একদিকে ডাল হ্রদ আর একদিকে ঝিলাম নদী। ডাল হ্রদটা অনেক ভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে গলির মতো শহরে ঢুকে পড়েছে। সেসব জায়গায় নৌকো করে বেশ বেড়ানো যায়। ঝিলাম নদীর ওপর সাতটা ব্রিজ আছে।

আমরা যে হাউসবোটে ছিলাম তার নাম গুড লাক। হাউস বোট হচ্ছে জলের ওপর ভাসমান হোটেল। এগুলো খুব সুন্দর করে সাজানো হয়। শুয়ে জানলা দিয়ে দেখা যায় ডাল লেকে জলের খেলা। দূরে বরফের মুকুটপরা পাহাড়। এখানকার নৌকোগুলোকে বলে শিকারা—তাতে চড়ে ফেরিওয়ালারা জিনিস বিক্রি করতে আসে। ফুল আর ফল যে কত রকম কাশ্মীরে পাওয়া যায় তা গুণে শেষ করা যায় না। ফলের মধ্যে আপেল, ন্যাসপাতি, আঙুর, আখরোট, আলুবোখরা, বাদাম, পিচ, বেরি খোবানি, স্ট্রবেরি—কত কী!

আমাদের কাশ্মীর ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল দুটি। এক, দেশভ্রমণ—এবং যেখানে যা কিছু শিক্ষণীয় আছে, সব গ্রহণ করা। বই-এর পাতায় সবকিছু জানাশোনার শেষ নয়। অচেনা অজানা দেশের মানুষের

মধ্যে, প্রবৃত্তির মধ্যে অনেক কিছু শিক্ষা নেওয়ার আছে। আর আমাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল—কী করে স্বাবলম্বী এবং সময়ানুবর্তী হয়ে সব কাজ করতে হয়—স্কাউটদের তা শিক্ষা দেওয়া। সেইজন্য দলের নেতা কমলদা নিজে কোনও ব্যাপারে হস্তেপেক্ষ না করে—হিসেব, খরচপত্র এবং কাজের প্রোগ্রাম করবার জন্য দুজন স্কাউট কর্মীকেই ম্যানেজার করে দিয়েছিলেন। দীর্ঘায়িত চেহারার দুই ম্যানেজার—মৃত্যুঞ্জয় আর দুর্গাচরণ—একজন বলিষ্ঠ আর হৃষ্টপুষ্ট, অপরজন রোগা আর লম্বা। এরা খুব নিপুণভাবে সবকিছু ব্যবস্থা করেছে। আর সহকারী স্কাউট মাস্টার দ্বারিকদা এদের তত্ত্বাবধান করেছেন মাঝে-মাঝে। অবশ্য সে তত্ত্বাবধানের মধ্যে টিকাটিপ্পনীর ভাগই বেশি ছিল। আর ছিল সময়ানুবর্তিতা। আমরা যখন যে জায়গায় যাব ভেবেছি—সেই সময়ই যাওয়া হয়েছে। এক মিনিটও দেরি হয়নি। সেজন্য আমরা ওই শীতের মধ্যে ভোর চারটের সময় উঠতেও দ্বিধা করিনি। আর এইজন্যই বোধহয় আমরা যেখানে যেটুকু উপভোগ করবার তা পরিপূর্ণভাবে করেছি।

শ্রীনগর থেকে আবার বাসে করে অনেক দূরে দূরে দর্শনীয় জায়গাগুলোতে যেতে হয়। যেমন, পহলগাম, গুলমার্গ, সোনমার্গ, উলার লেক, বারমুডা ইত্যাদি। আমরা শুধু শেষেরটা ছাড়া সবগুলোতেই গিয়েছি। দীর্ঘ বাসজার্নিতে আমরা কোরাস গান করতে করতে যেতাম। এ বিষয়ে সমীর আমাদের নেতা। সমীর আগে শুরু করত—সকলে গলা মেলাত যতীনদা, গোপালদা দ্বারিকদা এবং আর সকলে। বাসের মধ্যেই আমাদের চিরকালের কোয়ার্টার মাস্টার বিশুদা আমাদের খাবার সাপ্লাই দিতেন। আমরা সকলে এমন হইচই করতে করতে যেতুম যে, সকলেই কৌতূহল নিয়ে আলাপ করতে আসত আমাদের সঙ্গে। এমনি করে আলাপ হয়েছিল—কেনিয়া থেকে আসা এক স্কাউটের সঙ্গে এবং ধানবাদের একজন প্রাক্তন স্কাউট আর তাঁর বোন দুজন গার্ল গাইডের সঙ্গে।

কাশ্মীরে দেখার জায়গার শেষ নেই। পথ ঘাট সবকিছুই দর্শনীয়। তবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পহলগাম—পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট জায়গা। মাঝখানে তীব্র স্রোতে বয়ে চলেছে এক পাহাড়ি নদী। বরফ গলে কী করে ঝরনা হচ্ছে, পহলগামে গেলে স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে অনেক ভ্রমণকারী থাকে। তাঁবুর মধ্যে হোটেল। পহলগাম থেকে অমরনাথ তীর্থে যাওয়া যায়। সোনমার্গ থেকে লাডাক যাওয়ার রাস্তা। সেখানে আমরা ঘোড়ায় করে—কয়েকটা ঝরনা পেরিয়ে একেবারে বরফের ওপর গিয়েছিলাম। বরফের ওপর সবচেয়ে মজা লাগে এই যে—আছাড় খেলে লাগে না, জামা ভেজে না। আছাড় খাওয়ার কথায় মনে পড়ল, আছাড় খাওয়ার প্রতিভা আছে আমাদের দলের শরৎদার। কাশ্মীরে যে কতবার তিনি আছাড় খেয়েছেন তার আর কিছু ঠিকঠিকানা নেই। দু-একবার প্রাণসংশয় হয়েছিল—কিন্তু আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেছেন প্রত্যেকবার।

বরফের ওপর সবচেয়ে ভালো অভিজ্ঞতা হয়েছিল খিলানমার্গে। এখানেও ঘোড়ায় করে গুলমার্গ থেকে অনেকটা দূর যেতে হয়। ঘোড়ার পিঠে অনেকটা দূর পথ—স্কাউট নবীন, রবিন আর অসিতের কী উৎসাহ। ওই বিপজ্জনক রাস্তাতেও ওরা ঘোড়ার রেস দিয়েছে। পথে একবার বরফের বৃষ্টি হল—আমরা গা থেকে মজা করে বরফগুলো ঝেড়ে ফেলে দিলুম—জামা-কাপড় ভিজল না। খিলানমার্গে আবার বরফের ওপর স্কেটিং করলাম—যা এতকাল আমরা সিনেমাতেই দেখে এসেছি। ভারী মজা লাগল। বরফের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড জোরে কাঠের ওপর বসে গড়িয়ে আসা। যে যতবার আছাড় খাচ্ছে, সে তত আনন্দ পাচ্ছে। শরৎদা, বিশুদা আর অসিত যে কতবার আছাড় খেলো তা আর গুনে শেষ করা যায় না।

শ্রীনগরের আর দেখবার জিনিস মোগল সম্রাটদের তৈরি বাগানগুলো—নিসাশ বাগ, শালিমার, শমাসাহী প্রভৃতি। ধাপে ধাপে নেমে আসা ঝরনার সামনে কী অপূর্ব সুন্দর বাগান। ফল আর ফুলের মেলা চারিদিকে। এর মধ্যে চশমা সাহীর একটি বস্তিতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মারা যান।

কাশ্মীরের লোকগুলো দেখতে খুব সুন্দর হয়। যেমন রং, যেমন নাক চোখ—তেমন স্বাস্থ্য।

কিন্তু লোকগুলোর মন ভারী সরল আর অতিথিপরায়ণ। এখানে বেশিরভাগ লোক মুসলমান— কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা পাণ্ডিত্যের জন্য খুব বিখ্যাত। এখানকার লোকেরা সাধারণত খুব শান্তিপ্রিয়।

কাশ্মীরের কথা লিখে শেষ করা যায় না। আর না দেখলে এর সৌন্দর্যও ঠিক বোঝা যায় না। যাই হোক, শেষে আবার আমাদের ফেরবার সময় হল। ফেরার পথে আবার অমৃতসর, দিল্লি, আগ্রা হয়ে আসতে হবে। একদিন আমরা ফেরার বাসে চেপে বসলুম। আবার আসবেন, আবার আসবেন, বলল আমাদের গাইড রহমান। আবার আসব, আবার আসব, বললাম আমরা সকলে।

এই ক'দিনে কাশ্মীরের মানুষজন আচার-ব্যবহার বা দেশের অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের যা জ্ঞান হল, কাশ্মীর সম্বন্ধে হাজার বই পড়লেও তা আমরা শিখতে পারতাম না। এইজন্যই ভ্রমণকেই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপায় বলা হয়ে থাকে।
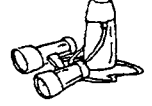
আন্দামান—সাতাশ বছর আগে, পরে

আমি প্রথমবার আন্দামানে যাই সাতাশ বছর আগে। তখন কেন্দ্রীয় প্রশাসন থেকে আন্দামানের দ্বীপগুলিতে ভ্রমণ-পার্টিকে উৎসাহ দেওয়া হত না, সে রকম কোনও ব্যবস্থাও ছিল না। মূল ভূখণ্ড থেকে আন্দামানে যেতে হলে সেখানকার প্রশাসনের কাছ থেকে অগ্রিম অনুমতি নিতে হত। আমি হঠাৎ একা সেখানে বেড়াতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ায় আমার বন্ধুরা খুব অবাক হয়েছিল। অনেকেই প্রশ্ন করেছিল, কেন যাচ্ছ? মাউন্ট এভারেস্ট সম্পর্কে এই প্রশ্নের যে বিখ্যাত উত্তরটি আছে, আন্দামান সম্পর্কেও সেটা বলা যায়, Because, it is there !

ভ্রমণ আমার নেশা। আন্দামান যাবার আগে দুটি গোলার্ধের অনেক দেশই আমার দেখা হয়ে গেছে। আগে দেশ বিদেশে যাওয়া হত জাহাজে, সে-রকম জাহাজ-যাত্রার কত রকম চমৎকার বর্ণনা আমরা পড়েছি, তাতে অনেক রোমাঞ্চ ও প্রেমকাহিনী ছিল, কিন্তু সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের সৌভাগ্য আমার হয়নি। বিমান যাত্রায় অনেক সময় বাঁচে বটে, কিন্তু তাতে রোমাঞ্চ নেই, আর প্রেমের তো প্রশ্নই ওঠে না।

আন্দামানের দিকেই আমার প্রথম জাহাজ ভ্রমণ। সময় লাগে মাত্র চারদিন। কিন্তু সেবারে বঙ্গোপসাগরে প্রবল ঝড় উঠেছিল, সেই ঝড়ে জাহাজ চালানো বিপজ্জনক বলে পুরো একদিন জাহাজটা থেমে ছিল মধ্য-সমুদ্রে। তার ফলে আমাকে অতিরিক্ত একদিন জাহাজের খাবার খেতে হয়েছিল। অধিকাংশ যাত্রীই ভুগছিল সমুদ্র-পীড়ায়। কিছু না খেয়েও তারা বমি করছিল অনবরত। একজন কেউ আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই দু-ঢোঁক ব্র্যান্ডি খেয়ে একটা কোনও জমজমাট রহস্য কাহিনী পাঠ করলে সি-সিকনেস হয় না। সত্যিই তাই, আমি ব্র্যান্ডি, আগাথা ক্রিস্টির বইয়ের সঙ্গে জাহাজের প্রত্যেক দিনের খাদ্যই উপভোগ করেছি। সেবারেই আমি ঝাঁক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ দেখি। চড়াইপাখির মতন ডানাওয়ালা মাছগুলো সমুদ্র থেকে লাফিয়ে উঠে কিছুক্ষণ হাওয়ায় ওড়াউড়ি করে আবার জলে ডুব দেয়। পরে আমি পোর্ট ব্লেয়ারের একটা হোটেলে সেই উড়ুক্কু মাছ ভাজাও খেয়েছি।

আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের প্রধান শহর পোর্ট ব্লেয়ারে তখন ভদ্রগোছের হোটেল ছিল মাত্র একটিই, সেটি সরকারি। তাতে আমি একটি ঘর পেয়েছিলাম অদ্ভুত শর্তে, দুপুরবেলা তিন ঘণ্টার জন্য প্রত্যেক দিন ঘর ছেড়ে দিতে হবে। সেই সময় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের পাইলট ও অন্যান্য কর্মীরা সব

ঘরগুলো নিয়ে স্নান-খাওয়া করে বিশ্রাম নেয়, বিকেলে ফিরে যায়।

আন্দামানে আমার পরিচিত কেউ ছিল না, আমি ঘুরে বেড়িয়েছি আপন মনে, একলা একলা। বহু দেশ দেখার অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও আমার মনে হয়েছিল, এমন সুন্দর জায়গা আমি আগে দেখিনি। শহর ছাড়িয়ে একটু বাইরে গেলেই মনে হত, এখানকার প্রকৃতিতে রয়েছে আদিম, অস্পর্শিত, পবিত্রতার ছাপ। সমুদ্রের জল বেশি গাঢ় নীল, অরণ্য বেশি গাঢ় সবুজ। যখন তখন হুড়মুড়িয়ে বৃষ্টি নামে, আবার একটু পরেই আকাশ পরিষ্কার।

সুইডেনের স্টকহল্‌ম শহরের কাছেই সমুদ্রে হাজার হাজার দ্বীপে অনেক মানুষ থাকে, তারা প্রতিদিন শহরে চাকরিবাকরি বা ব্যাবসার প্রয়োজনে যাওয়া-আসা করে, কিন্তু আন্দামানের মাত্র কয়েকটি দ্বীপই মনুষ্যবাসের যোগ্য, অন্যগুলিতে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অনেক দ্বীপ শুধু নিবিড় অরণ্যে ছেয়ে আছে, মনে হয় সেখানে কখনও মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি। একসময়, কয়েকটি দ্বীপে কিছু হরিণ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তার পর তাদের বিপুল বংশবৃদ্ধি হয়। কারণ বাঘ-সিংহের মতন কোনও হিংস্র জানোয়ার নেই। মায়া বন্দর নামে একটি চমৎকার জায়গায় যাওয়ার পথে আমি একসঙ্গে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি হরিণকে রাস্তা পার হতে দেখেছিলাম। ঘরের দেওয়ালে দেখেছি সবুজ রঙের টিকটিকি, একরকম কাঁকড়া এতই বড়ো যে—যেন ডাবের মতন, তারা নাকি সত্যিই গাছে উঠে ডাব পেড়ে খায়। তাদের নাম কোকোনাট থিফ ক্র্যাব। একরকমের চিংড়ির নাম টাইগার লবস্টার। সেগুলি প্রকাণ্ড তো বটেই, ওপরের খোসার রং হলদে-কালো ডোরাকাটা।

কয়েকটি দ্বীপের ধারে কাছে যাওয়াই ছিল বিপজ্জনক, সেগুলি জারোয়া নামে আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত, এই জারোয়ারা সভ্য মানুষদের সংস্পর্শেই আসতে চায় না। তাদের সঙ্গে থাকে বিষাক্ত তীর। ওঙ্গে নামে আর-একটি আদিবাসী সম্প্রদায় আছে, তারা হিংস্র নয়, অনেকটা সহজভাবে মিশে গেছে। আর আন্দামানিজ নামে আরও একটি সম্প্রদায়, যাদের সংখ্যাটি ছিল সবচেয়ে বেশি, তারা এখন প্রায় নিঃশেষিত, এই তিন সম্প্রদায়ের মানুষেরই গায়ের রং কয়লার মতন কালো আর মাথার চুল কুঞ্চিত। অনেক দূরের একটি দ্বীপে সেন্টিনেলিজ নামে আর একটি সম্প্রদায় আছে শুনেছি, যারা লম্বা ও ফরসা, তারা ওখানে কী করে এল, তা একটা রহস্য। আমি তাদের দেখিনি।

শুধু প্রকৃতি দেখার জন্যই আমি আন্দামানে যাইনি। একটা অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। তখন আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীদের মধ্যে যাঁরা আন্দামানে জেল খেটেছেন, তাঁদের কয়েকজনকে নিয়ে একটি উপন্যাস লেখার পরিকল্পনা করেছিলাম। সে জন্য, আন্দামানের সেলুলার জেলটি স্বচক্ষে দেখার প্রয়োজন ছিল। সেটি দেখতে গিয়ে আমি হতবাক হয়ে গেছি। ভারতীয়দের শাস্তি দেবার জন্য কি বিশাল ও ভয়ংকর জেল বানিয়েছিল ইংরেজরা! সারা ভারতে এত বড়ো জেল আর আছে কি না আমি জানি না। এ জেলের বৈশিষ্ট্য হল, প্রতিটি বন্দির জন্যই একটি পৃথক সেল, অর্থাৎ সারাক্ষণই তাকে একলা থাকতে হবে। অন্যদের সঙ্গে কথা বলারও কোনও উপায় নেই। এইজন্যই এখানকার বেশ কয়েকজন বন্দি উন্মাদ হয়ে যায়, কেউ-কেউ আত্মহত্যা করে। আদিতে ছিল এই জেলের সাতটি উইং, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানি বোমায় অনেকটা ধ্বংস হয়ে যায়। এখন এর কিছুটা অংশ হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়, দর্শকদের জন্য যতখানি উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, তাও বিশাল। সারা ভারতের বন্দিদের সুদীর্ঘ তালিকা দেখলে বোঝা যায়, স্বাধীনতার আহ্বানে হাজার-হাজার তরুণ এই সুদূর দ্বীপে আয়ুক্ষয় করেছে, অনেকে ফিরতেই পারেনি।

নেতাজি সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কিছুদিনের জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই দ্বীপে স্বাধীনতার পতাকা উড়েছিল। কলকাতা ও চেন্নাই বন্দর থেকে পোর্ট ব্লেয়ার প্রায় সম দূরত্বে। তাই দ্বীপগুলিতে বহিরাগতদের মধ্যে বাঙালি এবং তামিল ও তেলুগুদের সংখ্যাই বেশি। দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি ও ব্যাবসা-বাণিজ্যের জন্য অনেক পাঞ্জাবি এবং উত্তর ভারতের মানুষও আন্দামানে দেখা যায়। দেশ বিভাগের পর অনেক বাঙালি উদ্বাস্তুদের আন্দামানের বিভিন্ন দ্বীপে পাঠানো হয়েছিল

বলে, বাঙালিরাই এখন এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। উদ্বাস্তুরা আন্দামানে গিয়ে খুব তাড়াতাড়ি স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে, সরকারের বোঝা হয়ে থাকেনি।

সাতাশ বছর পর দ্বিতীয়বার আন্দামানে গিয়েছি সম্প্রতি। প্রথম দিন পোর্ট ব্লেয়ার শহর দেখে দারুণ চমকে গিয়েছিলাম। সব-কিছুই অচেনা মনে হয়েছিল। এত অল্প সময়ে কোনও জায়গার এতখানি পরিবর্তন অকল্পনীয়। বাড়ি, গাড়ি ও মানুষের সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ, অনেক বড়ো বড়ো হোটেল হয়েছে। অনেক দোকানপাট। ভারত সরকারের নীতির বদল হয়েছে, আগে বহিরাগতরা এখানকার জমি কিনতে পারত না। এখন আর সে বাধা নেই। ট্যুরিস্টও আসে অনেক। বেশ কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি বা ট্যুর অপারেটররা এদের অফিস খুলেছে। ট্যুরিস্টদের মধ্যে অনেক বিদেশিও চোখে পড়ে।

পোর্ট ব্লেয়ার শহরটি আর আগের মতন নিরিবিলি নেই, এখন অনেক ভারতীয় শহরেরই মতন। কিন্তু শহরের বাইরে যে প্রকৃতির রূপ তা তো সহজে বদল করা যায় না। সমুদ্র সেরকমই আছে। দ্বীপগুলিতে জঙ্গল তেমনই নিবিড়। কল-কারখানা এখনো বিশেষ নেই। তাই বাতাস বিশুদ্ধ।

পোর্ট ব্লেয়ারে অবশ্য দ্রষ্টব্য সেলুলার জেল। দর্শকদের সুবিধের জন্য এখন অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে, গাইডরা সঙ্গে নিয়ে সবকিছু দেখায় ও বিপ্লবীদের সম্পর্কে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনায়। এ ছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ভাষায় লাইট অ্যান্ড সাউন্ড-এর অনুষ্ঠান, তাতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অতীত ইতিহাস জীবন্ত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয়বার এসে এমন একটি অভিজ্ঞতা হল, যা সারাজীবন মধুর স্মৃতি হয়ে থাকবে। প্রথমবার একা-একা ঘুরে :বড়িয়েছি বিভিন্ন দ্বীপে, খুব বেশি যানবাহনের ব্যবস্থা ছিল না, নির্জন দ্বীপগুলিতে যাবার কোনও উপায় ছিল না। এখন অনেক জাহাজ, স্টিমার স্পিড বোট চলে। টুর অপরেটররা অনেক সুন্দর-সুন্দর বিচে নিয়ে যায়, এক-এক জায়গার বালির রং সাদা। আন্দামানের কোরাল রিফ বিশ্ববিখ্যাত। অগভীর সমুদ্রে, কোনও-দ্বীপের কাছাকাছি নৌকোয় বসে সেই সামুদ্রিক স্বপ্নপুরী স্পষ্ট দেখা যায়। অনেক নৌকো গ্লাস বটম্‌ড়্। এবারে আমার স্ত্রী স্বাতীও সঙ্গে গেছে, সে কখনও কোরাল রিফ দেখেনি, নৌকোয় বসেই পায়ের তলায় এই রঙিন জগৎ আর কত রকম নানা বর্ণের মাছ ও সামুদ্রিক প্রাণীদের খেলা দেখে সে একেবারে অভিভূত। কিন্তু জায়গাটায় অনেক নৌকোর ভিড়, অনেকে বেলাভূমিতে পিকনিক করছে, তাতে মনে হয় আমরা যেন এমন রমণীয় স্থানের শান্তি ও পবিত্রতা নষ্ট করতে এসেছি।

আমাদের বিরক্তির কারণ বুঝে একজন টুর অপারেটর বলল, চলুন, আপনাদের এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছি, যেখানে আর কেউ যায় না। তার স্পিড বোটে কিছুক্ষণ পর আমরা উপস্থিত হলাম অন্য একটি দ্বীপে। যেখানে বড়ো বড়ো গাছপালা ছাড়া আর কোনও চলন্ত প্রাণী নেই। চতুর্দিকে বিশুদ্ধ নিস্তব্ধতা। ছেলেটি বলল, এখানে কয়েক মাইল জুড়ে কোরাল রিফ আছে, আপনারা জলে নেমে দেখবেন? তার কাছে অক্সিজেন মাস্ক ও অন্যান্য ব্যবস্থা আছে। স্বাতী সাঁতার জানে না, তবু সে জলে নামবার জন্য প্রবল উৎসাহী। ঠিক মতন সেজেগুজে আমরা নেমে পড়লুম জলে। শুরু হল যাকে বলে Snorkelling—যেসব দৃশ্য আমরা ডিসকভারি চ্যানেলে অনেকবার দেখেছি, এখন আমরা নিজেরাই সশরীরে সেই দৃশ্যের মধ্যে উপস্থিত। এ যেন বিশ্বাসই করা যায় না। অনেক কোরাল জীবন্ত, একটু হাত ছোঁয়ালেই নড়ে যায় বুঝতে পারি। আর কী অপূর্ব বর্ণবাহার। সমুদ্রের নীচে এমন রঙের সম্ভার কী করে সম্ভব, তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। আর এখানকার মাছগুলিও যেন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য ঘটিয়ে বহুরকম রঙে সেজে আছে। বড়ো বড়ো মাছ গায়ের পাশ দিয়ে চলে যায়, তারা ভয় পায় না। সমুদ্রের তলার জগৎ এখনও আমাদের অনেকটাই অচেনা। আর আমাদের জল ছেড়ে উঠতেই ইচ্ছে করে না। স্থলভূমিতে মানুষের হিংসা, লোভ, রক্তপাত, টাকাপয়সার ঝনঝনানি, এ-সব কিছুই আর মনে পড়ে না।

আন্দামান জায়গাটা আমার ভারী পছন্দের

বয়স যখন কম ছিল, হোটেল-বাংলো কোনও কিচ্ছু ঠিক না করেই বেরিয়ে পড়তাম। অনেক সময় এমনও হয়েছে, থাকবার কোনও জায়গা পাইনি, সারা রাত কাটিয়ে দিয়েছি গাছতলায়। কখনও বা কোনও রেল স্টেশনে। ভিখারি, ভবঘুরের সঙ্গে। মনে আছে একবার সারা দিন হায়দরাবাদ শহর ঘুরে বেড়িয়ে, রাত্রে শুয়েছি স্টেশনে। খুব শীত করছিল। বেশি রাতে আর থাকতে না পেরে, শেষে স্টেশনের এক ভিখারির কাছ থেকে কম্বল নিয়ে গায়ে দিয়েছিলাম।

সেভাবে এখন আর বেড়িয়ে পড়া সম্ভব নয়। এখন নানা জায়গা থেকে আমন্ত্রণ আসে। তাঁরাই থাকবার যথাযথ ব্যবস্থা করে রাখেন। তবে কোনও আমন্ত্রণ ছাড়া এখনও বেড়াতে যাই বছরে দুবার। একবার বিদেশে, একবার স্বদেশে। এবং কোনও না কোনও কারণে প্রতি বছরই বিদেশ যাওয়াটা আমার ঘটেই যায়। আমরা কয়েক বন্ধু গাড়ি নিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার দু-একটা দেশ ঘুরে আসি। এ দলে রয়েছে অসীম (ফ্রান্স), কান্তি (কানাডা), দীপ্তেন্দু (কানাডা), ভাস্কর আর ভিক্টোরিয়া (লন্ডন), প্রীতি (ফ্রান্স) এবং আমি, স্বাতী।

এ দেশেও বছরে একবার বাইরের বন্ধুরা আসে। ফলে তাদের নিয়েও চলে কোথাও না কোথাও আমাদের বেরিয়ে পড়া। দিন কয়েকের জন্য। যেমন দু বছর আগেই গেছিলাম আন্দামান। যদিও তার আগে আমার দুবার ঘোরা হয়ে গেছে। যার জন্য আমাকে 'আন্দামান এক্সপার্ট' বলা যেতে পারে। বন্ধুদের অনুরোধে আবার যেতে হল। তবে আমার কোনও আপত্তি ছিল না। কেন-না সত্যি বলতে, জায়গাটা আমার ভারী পছন্দের। ফলে ওদের পথপ্রদর্শক হয়ে আবার গেলাম সেখানে। সঙ্গে ছিল বিদেশি বন্ধু দীপ্তেন্দু, অসীম, এখান থেকে বাদলবাবু আর আমি।

গত বছর বিদেশে 'বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব'-এ গেছিলাম। ওই ভ্যাঙ্কুভারেই আমন্ত্রিত হয়ে গেছিল আমার বাল্যবন্ধু, চিত্রতারকা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আমাদের সঙ্গে শুধু আড্ডা মারার জন্য সেখানে উড়ে এল অসীম আর কানাডা থেকে কান্তি, রবীন। একটা গাড়ি ভাড়া করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। দলে একমাত্র মহিলা সদস্য বলতে স্বাতী। কানাডার বিখ্যাত রকি মাউন্টেনের পাশ দিয়ে শুরু হল সেই যাত্রা। টানা পাঁচ দিন। আমরা ওই পর্বতমালার কখনও অন্দরে, কখনও বাইরে ঘুরেছি। সন্ধের পর ছোট ছোট সরাইখানায় রাত্রিবাস। বলাই বাহুল্য, ও দেশে ওই সব সরাইখানাতেও আরামদায়ক শয্যা এবং আধুনিকতার সমস্ত সরঞ্জামই মজুত! রকি মাউন্টেনের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই সব পাহাড়ে কখনও গাছপালা গজায় না! নগ্ন, রুক্ষ তার চেহারা। তবু তার সৌন্দর্য অসাধারণ। এক-একটা চূড়াকে মনে হয় যেন এক-একটা ভাস্কর্য। তবে পাঁচ দিন আমরা কখনও হিমালয়ে ঘুরিনি। কারণ সেখানে ভালো রাস্তা নেই। ও দেশেরও পাহাড়ের ওপর দিয়ে রাস্তা অতি মসৃণ। এক জায়গায় দেখলাম এক গ্লেসিয়ার বা হিমবাহ লক্ষ লক্ষ বছরের পুরনো। সেই হিমবাহের ওপরেও মানুষকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা আছে!

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাকাওয়ালা গাড়ি অতি দুর্গম পথ দিয়ে সহজেই চলে যায়। সত্যিকারের একটি গ্লেসিয়ারের ওপর দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা এই প্রথম। প্রকৃতির এমনই বিচিত্র খেয়াল। চতুর্দিকে তুষারময় সেই অঞ্চলের [illegible] এক উষ্ণ প্রস্রবণ, যেখানে বড় বড় [illegible] আছে। দেখা মাত্র তো আমরা

সব্বাই খালি গায়ে, জাঙ্গিয়া পরে নেমে গেলাম সেই উষ্ণ জলে।

পাঁচ দিন ধরে গিরিপথে সেই যে যাত্রা, তাতে আমরা একটুও ক্লান্ত বোধ করিনি। নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা-গল্পগুজব করেই কাটিয়েছি। সৌমিত্র নানা গল্প-গানে মাতিয়ে রেখেছিল সারাটা ক্ষণ। অভিযানের সবচেয়ে বয়স্ক সদস্য ছিল কান্তি হোড় (৭৪)। আর ওর উৎসাহই ছিল যেন সবচেয়ে বেশি! কান্তির কোনও ক্লান্তি নেই! অদ্ভুত! তবে সে টিমে সকলেই ছিল অদ্ভুত। রবীন, বহুকাল প্রবাসী। এক মনে গাড়ি চালাল টানা পাঁচ দিন! অসীম হাজার হাজার ছবি তুলল, কিন্তু তার একটাও আমরা দেখতে পাব কি না সন্দেহ। কারণ, ও মানুষের ছবি তোলে না। প্রকৃতির মধ্যে কী যে খুঁজে বেড়ায়, কে জানে!

গত বছরটা আমাকে যেন পাহাড়ই টেনেছে। পাঁচ দিনের সেই অভিযানের পর আমরা গেছিলাম আর একটা আশ্চর্য পাহাড়ে। বস্টন থেকে কয়েক শো মাইল দূরের ওয়াশিংটন মাউন্টেনসে। তার একটা চূড়া অতি বিস্ময়কর। তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। পাহাড়ের তলা রীতিমতো গরম। গায়ে মোটে একটা জামা। কিন্তু মাত্র মিনিট কুড়ি গাড়ি চড়ে শিখরে উঠলেই অসম্ভব ঠান্ডা! আর সব সময় দারুণ জোরে হু হু করে হাওয়া। সে হাওয়ার এতই জোর, দাঁড়িয়ে থাকা শক্ত। ওখানে যে ঠিক কী কারণে হাওয়ার এত প্রাবল্য, তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। সেই হাওয়ায় ওই কুড়ি মিনিটের গাড়ি চালানোটাও বেশ কঠিন। কিন্তু আমার ছেলে শৌভিক গাড়িতে বসিয়েই উপরে নিয়ে গেল আমায়, স্বাতীকে আর চান্দ্রেয়ীকে।

গত নভেম্বরে আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছিলাম পাহাড়ের টানে। প্রথমে গ্যাংটক, সেখান থেকে পেলিং। পেলিং জায়গাটার দুপাশের প্রকৃতি খুউব সুন্দর, কিন্তু রাস্তাগুলো দুর্বিষহ। আর সেই রাস্তায় যেতে-যেতে গাড়ির লম্ফঝম্প দেখলে ভয় হয়। যদিও একবার পেলিং পৌঁছে গেলে চোখ, মন জুড়িয়ে যায়। ওখান থেকে কাঞ্চনজঙঘার ধবল চূড়া মনে হয় যেন খুব কাছে। হোটেলের বিছানায় শুয়েও দেখা যায় কিছু দূরের কাঞ্চনজঙঘা। ভোরবেলা স্বাতী আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। আর তখন আর এক চমক। কাঞ্চনজঙঘার সেই ধবল রূপ আর নেই! চারদিকে যেন ছড়িয়ে সোনা আর সোনা। কে ছড়াল ভোরবেলায় এত সোনা! এই কাঞ্চনবর্ণ তো আমি আগে কখনও দেখিনি!

আচমকা এক টুকরো ১

মিহির বিশ্বাস ও তার স্ত্রী ভারতী, বাবলু সিরাজী ও তার স্ত্রী রুমা আমাকে ট্রেনে তুলে দিল। স্টেশনে পৌঁছতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল, প্রায় শেষ মুহূর্তে ছুটতে-ছুটতে এসে উঠে পড়লুম কামরায়। ওই দম্পতির কাছে ভালো করে বিদায় নেওয়া হল না।

শুরু হল আমার স্টকহলম থেকে অসলো যাত্রা।

ধুমপায়ীদের জন্য আলাদা ছোট ছোট কিউবিকল থাকে, আমার টিকিট সেইরকম একটি খোপে। আমি ছাড়া আর পাঁচজন যাত্রী ও যাত্রীণী। ট্রেন ছাড়ার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকে, কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলে না। আমি আমার সহযাত্রীদের ভালো করে লক্ষ করলুম। এদের মধ্যে আমিই যে একমাত্র বিদেশি, তা আমার গায়ের রঙেই স্পষ্ট। সুইডিসরা বর্ণ-বিদ্বেষী না মোটেই, বিদেশিদের তারা অপছন্দ করে না। কিন্তু তারা স্বভাব-গম্ভীর, অন্যদের সঙ্গে সহজে কথা বলতে

চায় না, বিশেষত দিনের বেলা।

দু-জোড়া নারী পুরুষ ও দুজন আলাদা পুরুষ। আমার বাঁ পাশে যে লোকটি বসে আছে, তার চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। হাতে একগুচ্ছ বই, দেখলেই কেমন যেন অধ্যাপক-অধ্যাপক মনে হয়। তার উলটোদিকে গোলাপি স্কার্ট পরা যে যুবতীটি বসে আছে, তার মুখখানা হাসি মাখানো। এক একজনকে দেখলেই ভালো লাগে, এই মহিলাটি সে রকম। চশমা পরা পুরুষটি এবং এই মহিলা পূর্ব পরিচিত, উঠেই তারা একটা থলি থেকে দুটো আপেল নিয়ে খেতে লাগল, কিন্তু কেন যেন মনে হল এরা স্বামী-স্ত্রী নয়, হয়তো একই কলেজে পড়ায়, কিংবা প্রতিবেশী। আমার এ রকম মনে হওয়ার কোনও যুক্তি নেই, তবে ট্রেনের কামরায় সময় কাটাবার জন্য আমি অচেনা নারী পুরুষদের চরিত্র, জীবিকা ও পাশাপাশি দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়ে কতকগুলো ধারণা তৈরি করে নিই, অনেকসময় তা মেলে, তার চেয়েও বেশিরভাগ সময় আমার ধারণা মেলে না। তবু মনে মনে এই রকম অনুমানের খেলা খেলতে দোষ তো কিছু নেই।

এবারে এই ট্রেন যাত্রার অভিজ্ঞতা আমার কাছে বিশেষ স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আমার ডানপাশে যে যুবকটি বসে আছে, তাকে দেখে মনে হয় কোনও কারখানার শ্রমিক, মাথার চুল রুক্ষ, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, জিনসের ওপর হলুদ গেঞ্জি পরা, ট্রেন ছাড়তে না ছাড়তেই সে একটা মোটা চুরুট ধরিয়ে জানালা দিয়ে চেয়ে রইল বাইরে।

আমি ধাঁধায় পড়লুম আমার সামনের একজোড়া নারী পুরুষকে নিয়ে। এদের পেশা কিংবা পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আন্দাজ করা শক্ত। পুরুষটির মতন এমন রূপবান মানুষ আমি খুব কম দেখেছি। ছ-ফুটের চেয়েও বেশি লম্বা মনে হয়, নিখুঁত স্বাস্থ্য, মাথার চুল সোনালি, চোখের মণি দুটি নীল। তার খয়েরি পোষাকটিও বেশ মুল্যবান। সুইডিসরা সকলেই প্রায় স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর হয়, তবু তাদের মধ্যেও এমন সুন্দর পুরুষ দুর্লভ। এর বয়েস পঁয়তাল্লিশের বেশি হতেই পারে না।

তার পাশের মহিলাটি প্রায় বুড়ি, মুখে ভাঁজ পড়ে গেছে, চোখের নীচে ক্লান্তির ছাপ, কোনও রকম প্রসাধন নেই, নস্যি রঙের চুল, একটা দোমড়ানো মোচড়ানো হলদে গাউন পরা। সে ওই রূপবান পুরুষটির মাসি-পিসি বা বড়জোর বউদি হতে পারে, কিন্তু সে প্রেমিকার ভঙ্গিতে পুরুষটির কাঁধে মাথা হেলিয়ে বসেছে।

ট্রেন ছাড়ার মিনিট পাঁচেক পরেই রূপবান পুরুষটি, ধরা যাক তার নাম ইংগমার, এই সুইডিস নামটি আমাদের কাছে পরিচিত, সে তার ঝোলা থেকে একটি ওয়াইনের বোতল ও কয়েকটি কাগজের গ্লাস বার করল। কর্ক স্ক্রু দিয়ে ছিপিটি খুলে, গেলাসে ঢালতে-ঢালতে আমার দিকে চেয়ে পরিষ্কার ইংরিজিতে জিগ্যেস করল, তুমি একটু নেবে কি?

আশ্চর্য, কামরায় অন্য কারুকে জিগ্যেস করল না, শুধু আমাকেই সাধল কেন? আমি বিদেশি বলে? কিংবা আমি তার মুখোমুখি বসে আছি, সেইজন্য চক্ষুলজ্জায়?

আমি বোতলের লেবেলটা দেখে নিয়েছি, ফরাসি বোর্দো ওয়াইন, সাদা রঙের। এই সুরা আমার বিশেষ প্রিয়, কিন্তু ওই লোকটি আমার সঙ্গে ভদ্রতা করেছে, আমার পক্ষেও ভদ্রতা হবে প্রত্যাখ্যান করা। ওদের দুজনের পক্ষে একটি বোতল এমন কিছু বেশি নয়, তাতে ভাগ বসানো উচিত নয়।

আমি সবিনয়ে বললুম, ধন্যবাদ। আমি খাব না।

সে তবু জিগ্যেস করল, তুমি বুঝি অ্যালকোহল স্পর্শ করো না।

আমি বললুম, অন্য সময়ে পান করি, এখন ইচ্ছে করছে না।

সুইডিসরা কেউ কেউ চমৎকার ইংরিজি বলে, কেউ কেউ কিছুই জানে না প্রায়। ইংগমারের পাশের প্রৌঢ়াটি সুইডিস ভাষায় আমার সম্পর্কে কিছু জিগ্যেস করলেন। ইংগমার আমার কোনও পরিচয় জিগ্যেস না করেই তার সঙ্গিনীকে বলল, এই বিদেশিটি ভারতীয়। ওরা অনেকেই মদ্য বা

মাংস খায় না।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে ইংগমার বলল, আমি দুবার বোম্বাই শহরে গেছি, জাহাজে। ভারতীয়দের দেখলেই চিনতে পারি। অথবা তুমি কি পাকিস্তানি?

আমি সহাস্যে বললুম, না তুমি ঠিকই ধরেছ, আমি ভারতীয়। তুমি জাহাজে করে বোম্বাই গিয়েছিল, তুমি কি নাবিক?

সে বলল, না। তখন শখ হয়েছিল, সে প্রায় দশ বারো বছর আগের কথা।

প্রৌঢ়াটি তৃষ্ণার্তের মতন তার গেলাসটি এক চুমুকে শেষ করে আবার সেটি ভরতি করার জন্য বাড়িয়ে দিল। ইংগমার তাকে দ্বিতীয়বার গেলাস দেওয়ার আগে তার ঠোঁটে প্রগাঢ় চুম্বন দিল একটি।

এই সময় অন্যদিকে তাকাতে হয়। আমি বাঁ-পাশের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলুম। চশমা পরা লোকটি এবং গোলাপি স্কার্ট পরা সুন্দরী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলে চলেছে, কিন্তু একটুও শব্দ হচ্ছে না। ওদের দুজনের হাতের আঙুলগুলো নানা রকম খেলা করছে। বোবারা এ রকম আঙুলের চিহ্ন দিয়ে কথা বলে। এরা দুজনই বোবা? চশমা পরা তরুণটি যদি বোবা হয়, তা হলে তো সে অধ্যাপক হতে পারে না। আর ওই হাস্যমুখী সুন্দরীটি, যাকে দেখলে মনে হয় জীবন সম্পর্কে তার কোনও অভিযোগই নেই, সে কি বাক্যহীনা হতে পারে? সে একবার শব্দ করে হাসল। যার হাসির আওয়াজ এত মিষ্টি, সে কথা বলতে পারে না?

আমার ডানপাশের চুরুট-ফোঁকা যুবকটি বাইরের দিকেই তাকিয়ে আছে, অন্য কারুর সম্পর্কে তাঁর কোনও আগ্রহই নেই।

আমি সিগারেট ধরালুম। ইংগমার আমার প্যাকেটটা চেয়ে নিয়ে দেখল। তারপর বলল, ভারতীয় সিগারেট।

তার সঙ্গিনীটি তাকে কিছু বলল। তখন ইংগমার আমার দিকে তাকিয়ে জানাল যে তার বান্ধবী এই বিদেশি সিগারেট একটু চেখে দেখতে চাইছে, সে কি একটি নিতে পারে?

আমি ধন্য হয়ে বললুম, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আমার কাছে আরও অনেক আছে। তোমরা পুরো প্যাকেটটাই নিতে পারো।

ইংগমার জানাল যে সে ধূমপান করে না। সে একটিই সিগারেট নিয়ে তার বান্ধবীকে দিয়ে প্যাকেটটা আমাকে ফেরত দিল।

ইংগমার ধূমপান করে না। অথচ এই কামরায় উঠেছে, শুধু তার বান্ধবীর জন্য। কী না ওই বান্ধবীর ছিরি। এমন রূপবান পুরুষ এদেশে অসংখ্য তরুণী বান্ধবী পেতে পারে। সে ওই বিচ্ছিরি বুড়িটাকে এত আদর যত্ন করছে কেন, বুড়িটার কি অনেক টাকা আছে?

ইংগমার বলল, সে নাবিক নয়। তা হলে তার-জীবিকা কী? চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, সে বেশ সচ্ছল। সিনেমায় নামলে সে অনেক নামকরা নায়কদের ভাত মেরে দিতে পারত। এমন সুপুরুষ হলিউডের নায়কদের মধ্যেও কম আছে।

ওদের ওয়াইনের বোতল এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে, আর একটি খোলা হয়েছে। কিন্তু প্রৌঢ়াটি এর মধ্যেই বেশ বেচাল। এক বোতল সাদা ওয়াইনের এমন কিছু নেশা হওয়ার কথা নয় এত তাড়াতাড়ি। নিশ্চয়ই ওই প্রৌঢ়াটি ট্রেনে ওঠার আগে খেয়ে এসেছে অনেকটা। এখন দুপুর তিনটে বাজে, এর মধ্যেই মাতাল।

সুইডেনে মদ খাওয়ার চল বেশি। শুক্রবার-শনিবার সন্ধের পর অনেক রাস্তায় মাতালদের ঢলাঢলি দেখা যায়। স্বভাব-গম্ভীর সুইডিসরা মদ খাওয়ার পর বেশ খোলামেলা হয়ে যায়। অচেনা লোকের গলা জড়িয়ে ধরে কথা বলে, স্টকহলমের রাস্তায় এরকম অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। কিন্তু দিনের বেলায় এই কাণ্ড?

বোধহয় যাত্রাপথে নিয়ম নাস্তি।

চশমা পরা লোকটি ও গোলাপি স্কার্ট পরা তরুণী অনবরত হাত নেড়ে চলেছে, মাঝেমাঝে আড়চোখে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। এমন নিঃশব্দ আড্ডা আমি আগে কখনও দেখিনি। তারা আমাদের সম্পর্কেই আলোচনা করছে কি না, তা বোঝবার উপায় নেই। তরুণীটি শুধু হেসে উঠছে এক একবার।

ইংগমারের প্রৌঢ়া বান্ধবীটি হঠাৎ আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে জোরেজোরে কী যেন বলল। বেশ রাগ রাগ ভাব। কী ব্যাপার, এ কি বিদেশিদের পছন্দ করে না? আমার সিগারেটটা ভালো লাগেনি? পুরোটাই তা শেষ করল, এখন আমাকে ধমকাচ্ছে। ইংগমার আমাকে বলল, আমার বান্ধবী বলছে, তুমি ওকে সিগারেট দিয়েছ। তুমি আমাদের ওয়াইন একটু খাবে না কেন?

ওদের দ্বিতীয় বোতলটাও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শুধু এক ঢোঁক ওয়াইন খেয়ে আমার কী হবে? অমি বিনীতভাবে বললাম, না, থাক।

প্রৌঢ়াটি আমার প্রত্যাখ্যান বুঝতে পেরে ফুঁসে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে, টলতে টলতে আমার কাছে এসে গেলাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খা খা।

এদেশে কেউ এঁটোকাটা মানে না। সুরা ও নারীর ওষ্ঠ কখনও এঁটো হয় না। অপরের গেলাসে চুমুক দিতে আমি অন্য সময়ে আপত্তি করি না। কিন্তু এই মাতাল মহিলাটির ঠোঁটের কোণে গ্যাঁজলা, এর আগে দু-একবার থুতু ফেলেছে মাটিতে। সব মিলিয়ে একটা নোংরা নোংরা ভাব, আমার ঘেন্না করল। আমি বললুম, প্লিজ প্লিজ আমি খাব না।

আমাকে জোর করে খাওয়াবার জন্যে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল আমার গায়ে। তার পাতলা পোষাকের আড়ালে বিশাল দুটি স্তন বেশ শিথিল, আমার মনে হল দুটো নরম বালিশ কেউ চেপে ধরেছে আমার গায়ে। আমি মুখ সরিয়ে নিলেও খানিকটা ওয়াইন ছলকে পড়ল আমার গায়ে। খুবই বিরক্তি বোধ হলেও তা প্রকাশ করার নিয়ম নেই এদেশে, আমি রুমাল দিয়ে গা মুছতে লাগলুম।

ইংগমার টেনে সরিয়ে নিল তার বান্ধবীকে, তাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে লাগল। ফিসফিস করে বলতে লাগল কত কী প্রেমের কথা।

একটু পরেই সেই প্রৌঢ়া বমি করে ভাসিয়ে দিল ইংগমারের পোষাক।

ইংগমার একটুও রাগ করল না, সে পেপার ন্যাপকিন দিয়ে পরিষ্কার করতে লাগল নিজেকে। কামরায় কেউ একটা কথা বলল না। ইউরোপীয়দের এই এক চমৎকার স্বভাব, অন্যের ব্যাপারে কিছুতেই নাক গলায় না, অকারণে কোনও মন্তব্যও করে না। সুইডিসরা আরও বেশি নিস্পৃহ ধরনের।

বমি করার পরেও প্রৌঢ়াটি হাত বাড়িয়ে বোতলটি নিয়ে বাকি ওয়াইনটুকু শেষ করতে যাচ্ছিল, ইংগমার জোর করে সেটি কেড়ে নিল। রমণীটি শুরু করে দিল চিৎকার।

তখুনি ট্রেন এসে থামল একটা স্টেশনে। ইংগমাররা সেখানে নামছে। তার বান্ধবী কিছুতেই নামতে চায় না। সে সমানে হাত-পা ছুড়ছে ও ওয়াইন চাইছে। ইংগমার এবার সাহায্য চাইল আমার ডান পাশের চুরুট-ফোঁকা ছোকরাটির। সে উঠে প্রৌঢ়াটির দু-হাত চেপে ধরল। দুজনে মিলে প্রায় চ্যাংদোলা করে মাতালিনীকে নামিয়ে দিল প্ল্যাটফর্মে।

নীরব বাক্যালাপকারী দুই নারী-পুরুষও নেমে গেল এই স্টেশনে। আমাদের সঙ্গে তারা কোনও কথা বলেনি। কিন্তু যাওয়ার সময় তারা ছুড়ে দিয়ে গেল খানিকটা হাসি।

আবার ট্রেন চলার পর আমার একমাত্র সহযাত্রীটি এতক্ষণ বাদে মুখ খুলল। নম্রভাবে জিগ্যেস করল, তুমি ভারতের কোন শহরে থাকো?

আমি কলকাতার নাম বলতেই সে জানালো যে সে কলকাতায় তিনবার গেছে বিশেষ গবেষণার কাজে। সে একটু একটু বাংলাও জানে। মাছের বংশ বিবর্তন নিয়ে তার গবেষণা। সে সুন্দরবন অঞ্চলে কয়েকটা মাছের ভেড়িতেও কাজ করেছে।

হা কপাল, আমি যাকে শ্রমিক ভাবছিলুম, সে একজন উচ্চাঙ্গের গবেষক।

এই কলকাতা-ফেরত যুবকটির সঙ্গে আগে পরিচয় হলে আমি অনেক গল্প করতে পারতুম।

আমি তাকে জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, ওই যে ওই পাশের দুজন এতক্ষণ হাত নেড়ে আঙুলের ভাষায় কথা বলছিল, ওরা কি ইয়ে.... মানে.... বোবা?

ছেলেটি বলল, না, না। ওরা তো প্ল্যাটফর্মে নেমেই স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে লাগল। ওই চশমা পরা পুরুষটি একজন সেলসম্যান। সে আমাকে এখানকার একটা হাসপাতালের কথা জিগ্যেস করল।

তা হলে ওরা এখানে শুধু হাত নেড়ে কথা বলছিল কেন?

বোবা না হলেও আজকাল অনেকে সাইন ল্যাঙ্গোয়েজ শিখে নেয়। তাতে সুবিধে কত বলো। ট্রেনের কামরায় সবাই মিলে কথা বললে গোলমাল হয়, ওদের কথা বলার কোনও শব্দ নেই। ওরা অনেক গোপন কথা আলোচনা করতে পারে। আমিও ওই ল্যাঙ্গোয়েজ একটু একটু জানি। ওদের কথা কিছু কিছু বুঝতে পারছিলুম। ওরা তোমাকে নিয়েও আলোচনা করছিল।

তাই নাকি, কী বলছিল?

তোমার গায়ে যখন বয়স্কা মহিলাটি ওয়াইন ঢেলে দিল, তখন ওরা বলল ভারতীয়রা খুব ভদ্র হয়, তাই কিছু বলল না। ওই বুড়িটার উচিত ছিল ভারতীয়টির কাছে ক্ষমা চাওয়া। ছি ছি, কী লজ্জার কথা।

না, না, তাতে কী হয়েছে। ভদ্রমহিলার বেশি নেশা হয়ে গিয়েছিল।

ওরা মাদাম টুনিলকে চিনতে পারেনি। তুমি তোমার সামনের ব্যক্তিটিকে চিনতে পেরেছিলে? কাগজে ছবি দেখোনি?

আমি তোমাদের দেশে মাত্র কয়েকদিন আগে এসেছি, কারুকেই চিনি না। ওই সুদর্শন পুরুষটি খুব বিখ্যাত ব্যক্তি বুঝি?

মোটামুটি বিখ্যাত। ওর নাম ওলাফ গোল্ডবার্ন। স্টকহলম থিয়েটারে বেশ নাম করা অভিনেতা। দু-একটি ফিল্মেও নেমেছে। আর ওর সঙ্গের মহিলা—

ওই বয়স্কা মহিলা ওর বান্ধবী?

ওই মহিলার নাম মাদাম টুনিল। উনি এককালে আরও বেশি বিখ্যাত ছিলেন। মঞ্চে বহু নাটকের নায়িকা হতেন। সিনেমায় ইচ্ছে করে নামেননি কখনও। গানও গাইতেন চমৎকার। একবার অসুস্থ হয়ে দুবছর আর মঞ্চে নামতে পারেননি। সেই অসুখে গলা নষ্ট হয়ে যায়। তারপর পরপর দুটো নাটক একবার জমেনি, দর্শকরা ওঁকে আর চায় না। এখন স্টেজ থেকে একেবারে বাদ পড়ে গেছেন। কেউ চান্স দেন না। মদ খেয়ে, অত্যাচার করে উনি নিজেকে নষ্ট করে ফেলেছেন, দুবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। ওর আর কোনও বন্ধু নেই। ওলাফ ওকে এখানে একটা হাসপাতালে ভরতি করে দিতে এনেছে। আমি মাদাম টুনিলের ভক্ত ছিলাম একসময়, খুব বড় অভিনেত্রী ছিলেন, এখন কী অবস্থা হয়েছে! দেখে কষ্ট হচ্ছিল।

আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললুম।

আমার একটিমাত্র অনুমান কাছাকাছি গেছে। ওলাফ অর্থাৎ মনে মনে আমি যার নাম দিয়েছিলুম ইংগমার, তাকে দেখে আমার সিনেমার অভিনেতাদের কথা একবার মনে হয়েছিল, সে সত্যিই একজন অভিনেতা।

ওই আধ-বুড়ি, মাতাল, পাগলাটে স্বভাবের প্রাক্তন অভিনেত্রীকে কত যত্ন করে, কত আদরে সে নিয়ে আসছিল, একবারও রাগ করেনি। কোনও নাম করা সুদর্শন অভিনেতা কি কোনও বাতিল, প্রাক্তন, অসুন্দরী বুড়ির জন্য এতটা করে?

কিংবা এটাও ছিল ওই রূপবান পুরুষটির অভিনয়।

আচমকা এক টুকরো ২

আগে থেকে ভেবেচিন্তে, এক-দেড়মাস আগে ট্রেনের টিকিট কেটে, গন্তব্যে পৌঁছবার আগেই থাকার জায়গার বন্দোবস্ত করে ভ্রমণে বেরুনো আমার ভাগ্যে বিশেষ ঘটে না। উঠল বাই তো কটক যাই এবং কটক যেতে যেতেও চলে গেলুম কাঠমান্ডু, এরকমও হয়েছে বহুবার। ট্রেনে যেতে যেতে একটা বেশ সুন্দর স্টেশন দেখে পছন্দ হয়ে গেলে সেখানে নেমে পড়তেই বা বাধা কী? সেই রকমভাবেই আমি একবার নেমে পড়েছিলুম ধলভূমগড়ে। তার আগে আমি আমার চেনাশুনো কারওর কাছ থেকে ধলভূমগড়ের নামও শুনিনি। সেই হিসেবে আমার নিজের কাছে অন্তত, ধলভূমগড় জায়গাটি আমারই আবিষ্কার।

আমার মুখে এরকম দু'একটা জায়গার গল্প শুনে দু-একজন প্রশ্ন করেছিল, লোকে তো ট্রেনে চাপে কোনও বিশেষ জায়গায় যাবে বলেই সেখানকার টিকিটি কেটে। তুমি কি অনেক দূরের জায়গার টিকিট কেটে মাঝপাথে নেমে পড়ো? এর উত্তর খুব সহজ। টিকিট না কেটেও তো ট্রেনে চাপা যায়! বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণ একটা সামাজিক অপরাধ? তা কি আর আমি জানি না! কিন্তু কে বলেছে যে আমি একখানা বিরাট দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন সমাজ সেবক? যে-সমাজ লক্ষ-লক্ষ বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি দিতে পারে না, যে-দেশ এখনও লক্ষ-লক্ষ ভূমিহীন কৃষক আর কর্মহীন মজুরকে বছরের অর্ধেক দিন অভুক্ত রাখে, সেখানে বহু লোক তো ট্রেনের ভাড়া ফাঁকি দেবেই! আমার মুখে একটু বেশি বড়-বড় কথা হয়ে গেল? তা, কুঁজোরও তো মাঝে-মাঝে চিত হয়ে শুতে সাধ হয়!

একবার ঠিক ট্রেনে চেপে নয়, গাড়িতে আসতে আসতে একটা বেশ চমৎকার অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

সেবার আমি ঝিলিমিলি, মুকুটমণিপুর, শুশুনিয়া পাহাড়ের দিকটা ঘোরাঘুরি করে এসে পৌঁছেছি বাঁকুড়া শহরে। এবার কলকাতায় ফেরার পালা। সন্ধে হয় হয়, বাস ডিপোতে কী কারণে যেন প্রচণ্ড ভিড়, আজ আর ফেরার আশা নেই। বাঁকুড়া শহরে আমার ঠিক রাত্রিবাসের জায়গা নেই, কিন্তু কাছাকাছি বেলেতোড় গ্রামে, শিল্পী যামিনী রায়ের এক নাতির সঙ্গে ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্রে থাকার জায়গা পাওয়া যেতে পারে।

বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে কীভাবে বেলেতোড় যাব তাই নিয়ে সাত-পাঁচ ভাবছি, এমন সময় একটা জিপগাড়ি আমাকে ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে থেমে গেল, আবার ব্যাক করে চলে এল আমার কাছে। পূর্বপরিচিত মুরুব্বি দাদাগোছের একজন মুখ বার করে বলল, কী রে হা করে আকাশের দিকে চেয়ে তারা গুনছিস নাকি?

আমাকে যেমন বিনা দোষে পুলিশে ধরে নিয়ে মেরেছে, একবার আমাকে একজন অন্যলোক ভেবে একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে অপমান করা হয়েছিল, সেই রকমই হঠাৎ হঠাৎ এমন সৌভাগ্যেরও উদয় হয়। আমার সেই দাদাটি তাঁর এক পরিচিত ব্যক্তির জিপে কলকাতায় ফিরছেন। জিপের আসল মালিকের মতামত না নিয়েই তিনি আমাকে বললেন, উঠে পড়, উঠে পড়! পেছন দিকে সর্বাঙ্গে চাদর মুড়ি দিয়ে একজন লোক বসে ঢুলছিল, আমার স্থান হল তার বিপরীত দিকে। লোকটি একবার আমার দিকে তাকালও না। আমি দুটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলুম। কলকাতায় ফেরার জন্য আমার কোনও

ভাড়া লাগছে না। ঘণ্টা-পাঁচেকের রাস্তা, মাঝখানে এরা খাবারের জন্য নিশ্চয়ই কোথাও থামবে, তখন আমাকেও খেতে ডাকবে নিশ্চয়ই। সুতরাং আমার সম্মুখের লোকটির দৃষ্টান্তে অমিও ঘুমিয়ে পড়তে পারি! অন্ধকার রাস্তায় জিপের পিছন দিকে বসলে আর কীই-বা করার থাকতে পারে।

বেশ কিছুক্ষণ পর আমার ঘুম ভেঙে গেল। জিপটা থেমে আছে একটা ঘুরঘুট্টি জায়গায়। আমার দাদাটি বললেন, এই নেমে আয়, নেমে আয়, গাড়ি ঠেলতে হবে।

তাতে আমার আপত্তি নেই। গাড়ি যারা চাপে, তাদের সকলকেই কোনও না কোনওদিন গাড়ি ঠেলতেই হয়। গাড়ির মালিকরাও বাদ যায় না। এটা হচ্ছে গাড়ির কৌতুক। বেশি কৌতুকপ্রবণ গাড়িগুলো ইচ্ছে করে খুব গণ্ডগোলের জায়গায় খারাপ হয়ে বসে।

বাঁকুড়া থেকে বিষ্ণুপুর আসার পথে খানিকটা ঘন জঙ্গল আছে। সেখানে ডাকাতির বেশ সুখ্যাতি আছে। প্রাইভেট গাড়ি জিপ তো আকছার, এমনকী সেই অকুতোভয় ডাকাতরা যাত্রী-ভরতি বাসেও হামলাও করে মাঝেমাঝে। শুনলুম, জিপটা সেই জঙ্গল পেরিয়ে এসেছে। একটু নিরাশই হলুম বলতে গেলে, আমাদের জীবনে রোমাঞ্চের এত অভাব মাঝেমাঝে একটু ডাকাতি-ফাকাতির অভিজ্ঞতা বেশ ভালোই তো!

এই জাগয়গাটি নির্জন দুপাশে বড় বড় গাছ রয়েছে, কিন্তু জঙ্গল নয়। অনেক দূরে মিটমিট করছে কোনও গ্রামের আলো।

আসলে জিপটি খারাপ হয়েছে প্রায় আধঘন্টা আগে। জিপের ড্রাইভার এতক্ষণ খোঁচাখুচি করেও ইঞ্জিনটা সচল করতে পারেনি। এখন উদ্দেশ্য হচ্ছে গাড়িটাকে ঠেলে ঠেলে কোনও লোকালয়ে পৌঁছনো। রাস্তার মাইলপোস্টে কোনও অত্যুৎসাহী বঙ্গ প্রেমিকের দল আলকাতরা লেপে দিয়েছে। আমরা যে ঠিক কোথায় আছি, তা বোঝা যাচ্ছে না। দূরে যে আলোর বিন্দু দেখে গ্রাম মনে হয়েছিল; সেটা অবশ্যই মরীচিকা, কেন না, গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে গদলঘর্ম হতে হতে মনে হচ্ছিল, এইভাবেই এক সময় কলকাতায় পৌঁছে যাব।

একটা বাঁক ঘুরতেই অবশ্য একটা জনপদ চোখে পড়ল। খুব ছোটখাটো জায়গাও নয়, সেখানে বিদ্যুতের বাতি জ্বলছে। একটি দুটি দোকানও খোলা রয়েছে। তাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সেখানে কোনও গাড়ি সারাবার ব্যবস্থা নেই, একজন মেকানিক আছে বটে, কিন্তু রাত্তিরে তাকে দিয়ে কোনও কাজ হবে না।

সেই শহরে একটি ডি ভি সি-র অফিস এবং সংলগ্ন গেস্ট-হাউসও রয়েছে, রাত্তিরের জন্য জায়গা পাওয়া গেল সেখানে। ডিমের ঝোল এবং গরম ভাতেরও ব্যবস্থা হল, তারপর মশার গান শুনতে-শুনতে ঘুম।

সকালে উঠে, একটুখানি বাইরে এসেই আমি যাকে বলে চমৎকৃত।

ছোট্টখাট্টো, অপূর্ব সুন্দর, ছিমছাম একটি রেল স্টেশন। জায়গাটার নাম সোনামুখী। সেই স্টেশানের প্রাঙ্গণেই বড় বড় সরল, উন্নত শাল গাছ। এমন পরিচ্ছন্ন স্টেশন আমি বহুকাল দেখিনি।

সোনামুখী নামটা তো আগে শুনেছি নিশ্চয়ই, কিন্তু জায়গাটা যে কীরকম সে সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল না, কোনওদিন সোনামুখীতে বেড়াতে যাওয়ার উপলক্ষও ঘটেনি বা সেরকম পরিকল্পনাও আমার মাথায় আসেনি। কিন্তু দিনের আলোয় প্রথম দর্শনেই আমার জায়গাটা ভালো লেগে গেল।

পশ্চিমবাংলায় মফস্‌সল শহর মানেই সরু সরু রাস্তা, গরুর গাড়ি ও সাইকেল রিক্সার যান জট, খোলা ড্রেন নীল ডুমো মাছি, বাতাসে পেঁকো-পেঁকো গন্ধ, ভ্রমণের পক্ষে আকর্ষণীয় কিছুই থাকে না। সোনামুখী যে সেই তুলনায় বিরাট কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম তা নয়, কিন্তু এই পুরোনো শহরটির রাস্তাঘাট তেমন নোংরা নয়, গোলমাল কম। প্রাতরাশের জন্য একটা মিষ্টির দোকানে গিয়ে কয়েকটা জিলিপি ও সিঙারা খেয়ে চমকে উঠলুম, খাবারগুলোতে কেমন যেন অচেনা খাঁটি খাঁটি স্বাদ। এরপর দুটো রসগোল্লা খেয়ে চক্ষু ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। মাত্র চার আনায় এমন সাইজের

এমন সুস্বাদু রসগোল্লা পৃথিবীতে এখনও কোথাও থাকা সম্ভব?

গাড়ি সারাবার নিয়ম হল, একজন মেকানিক খুঁটখাট করবে আর পাঁচজন সেখানে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করবে। আমি গাড়ির কলকবজা বিষয়ে কিছুই জানি না। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী করব। কিন্তু আমি একটু অন্যদিকে পা বাড়াতে গেলেই আমার সেই দাদাটি ধমকে ওঠেন, অ্যাই, কোথায় যাচ্ছিস। এক্ষুণি গাড়ি ঠিক হয়ে গেলে আমরা স্টার্ট করব।

মেকানিকটি যে-পরিমাণ যন্ত্রপাতি খুলে ফেলেছে, সেসব আবার জোড়া লাগাতে যে খুব কম সময় লাগবে না, সেটুকু অন্তত আমি বুঝি। মাঝেমাঝে ওখান থেকে পালিয়ে গিয়ে এক ঝলক করে সোনামুখী শহরটা দেখে আসি। একবার বাজারের মধ্যে দিয়ে যেতে গিয়ে একটা মাটির হাঁড়ি-কলসির দোকানে কিছু পুতুল দেখে আকৃষ্ট হয়ে পড়লুম। বাঁকুড়ার লম্বা কানওয়ালা ঘোড়ার খ্যাতি সুবিদিত, সোনামুখীতে দেখলুম রয়েছে মাটির হাতি। তারও বেশ বৈশিষ্ট্য আছে। এই হাতিগুলোও এখানে কোনও একটা পুজোয় লাগে, কিন্তু ঘর সাজাবার পক্ষেও অনবদ্য। বেশ শস্তা দেখে কিনে ফেললুম এক জোড়া। তাই দেখে জিপ গাড়ির দাদারা কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল, আমার ওপর অর্ডার হল আরও গোটা ছয়েক হাতি কিনে আনার। হাতিগুলো নেহাত ছোট নয়, ছ'খানা আমি আনব কী করে?

'খেলার ছলে ষষ্ঠীচরণ হস্তি লোফেন যখন তখন'-এর স্টাইলে নিয়ে আসব? তার চেয়েও ভালো উপায় আছে, সেই ফাঁকে সোনামুখীর মন্দিরটা দেখে এসে জানালুম, যাঃ, সব হাতি শেষ!

এইরকম ভাবে একটু একটু সোনামুখী দেখতে লাগলুম আর মনেমনে জোর প্রার্থনা চালালুম, হে বাবা, বিশ্বকর্মা, আজ যেন কিছুতেই ওই জিপ গাড়িটা ঠিক না হয়। আরও জখম করে দাও বাবা, আরও একটা দিন সোনামুখীতে থেকে যাই।

তা অবশ্য হল না। সোনামুখীর একমাত্র দক্ষ মেকানিক দুপুরের দিকে সবকিছু জোড়াতালি দিয়ে জিপটাকে এক অদ্ভুত অবস্থায় দাঁড় করাল। জিপটা অতি আস্তে, প্রায় শম্বুক গতিতে ধক ধক শব্দ করে চলতে পারে।

সেই অবস্থায় জিপটাকে কলকাতায় নিয়ে যেতে গেলে অন্তত দু'তিন দিনের ধাক্কা, তা ছাড়া মাঝপথে আবার সবকিছু খুলে পড়ে যেতে পারে। গিয়ার বক্সে নাকি গুরুতর কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, ইঞ্জিন ডাউন করতে হবে, সে সাধ্য সোনামুখীর মেকানিকের নেই। কাছাকাছির মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুপুরে সারাবার ব্যবস্থা হতে পারে। বিষ্ণুপুর মানেই আবার পিছিয়ে যাওয়া। অগত্যা তাই যেতে হল। সেখানেও লেগে গেল দুতিন ঘন্টা। আমি আবার বিষ্ণু পুরের আটচালা ও টেরাকোটার কাজ করা মন্দির দেখে নিলুম।

আগের দিন বিকেল-সন্ধের সন্ধিক্ষণে, ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিটে বাঁকুড়া শহরের বাস ডিপোর কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমি যদি না দাঁড়াতুম, সেই সময় কোথাও চা খেতে যেতুম বা বাসে উঠে পড়তুম, তাহলে আমার সোনামুখী দেখা হত না। আমার জীবনের ম্যাপে সোনামুখী নামটা যুক্ত হয়ে গেল, আবার সেখানে যাওয়া পাওনা রইল।

আচমকা এক টুকরো ৩

ছেলেবেলা থেকেই সবকিছু অবিশ্বাস করতে শিখেছিলাম।

দ্বিজেন জ্যাঠামশাইর বাড়ির বারান্দায় লণ্ঠন জ্বেলে আমরা কয়েকজন গল্প শুনতুম ওঁর কাছে। হঠাৎ বাইরে কীরকম অস্বাভাবিক শব্দ হতে আমরা সবাই ভয় পেয়ে হুড়মুড় করে জ্যাঠামশাইর সামনে এসে বসতাম। দ্বিজেন জ্যাঠা গম্ভীর হয়ে বলতেন, যা দেখে আয় তো ওটা কীসের শব্দ। কে যাবে আমাদের কারুর সাহস নেই, কিন্তু জ্যাঠামশাই জোর করে একজন না একজনকে পাঠিয়ে দিতেন। হয়তো সেন্টু ফিরে এসে মুখ চুন করে বলত, কিছু তো দেখলুম না। জ্যাঠামশাই চোখ বুঁজে গড়াগড়া টানতে টানতে বলতেন, সে কী আর এতক্ষণ থাকে।

কে সে? আমরা একেবারে শিউরে উঠতুম! জ্যাঠামশাই হাসতে হাসতে বলতেন, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। চোখে দেখতে না পেলেও কীসে কী হচ্ছে বুঝে নিতে হয়। আমাদের বাড়ির চাল থেকে তোদের বাড়ির রান্নাঘরের চালে লাফিয়ে লাফিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল মদনমোহন, পারেনি ঠিক মতো, ফসকে গিয়ে অতিকষ্টে রান্নাঘরের চাঁচের দেয়ালটা ধরে ফর ফর করে নেমেছে আর দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ছিল রুটি সেঁকার চাটুটা—সেটা পড়ে গিয়ে ওরকম শব্দ হল।

মদনমোহন জ্যাঠামশাইর আদরের হুলো বেড়ালটার নাম। ঘর থেকে এক পা না বেরিয়ে ওরকম ছবির মতো ঘটনাটা তিনি কী করে বললেন—ভেবে আমরা অবাক হয়ে যেতুম। কিন্তু বিশ্বাস করতুম জ্যাঠামশাইকে। ওইরকম ভাবেই আমরা ভূত প্রেত অবিশ্বাস করতে শিখেছিলুম। সন্ধেবেলা এক-একদিন আড়িয়াল খাঁ নদীর পাড়ে বেড়াতে যেতুম। ফেরার সময় ঘুটঘুটে অন্ধকারে আদিগন্ত পাটখেতের পাশ দিয়ে আসতে আসতে দূরের একটা সাদা দিঘি মতন দেখিয়ে জ্যাঠামশাই বলতেন, ওই দ্যাখ পেতনি দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাঠামশাই যখন বলছেন, তখন নিশ্চয়ই ওটা পেতনি নয়। কারণ জ্যাঠামশাই বলেছেন যে, ভূত-পেতনি বলে কিছু নেই। সুতরাং তাঁর কথার মর্যাদা রাখতেই আমরা তাঁর একথার প্রতিবাদ করতুম। তবে ওটা কী, এখান থেকে বল তো? তিনি জিগ্যেস করতেন। তখন আরম্ভ হত আমাদের অনুমানের খেলা। কেউ বলতো কলাগাছ, কেউ বলত—ওখানে একগোছা পাট শুকিয়ে ইন্দ্রপুজোর জন্য ধ্বজা করে তোলা। আমি বলেছিলুম ঃ ধোপাদের বউ ওখানে দাঁড়িয়ে হারানো গাধাটাকে খুঁজছে। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, আমরটাই ঠিক। আমরা আর কেউ মিলিয়ে দেখতে যায়নি। অন্য গল্প করতে-করতে বাড়ি চলে গেছি।

এই ভাবেই যে কোনও কাজের পিছনে যুক্তি খোঁজার বদ অভ্যাস আমার দাঁড়িয়ে গেছে। এখন মনে হয়, সত্যি সত্যিই হয়তো অনেক ভূত-প্রেত অলৌকিক রহস্যকে যুক্তি দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু কোনও একটা অলৌকিক দৃশ্য দেখতে পাওয়ার আজকাল খুব ইচ্ছে হয়। আমার দৃষ্টিশক্তি এখনও খুব ভালো। কিন্তু ইচ্ছে হয় অকারণে চশমা-টশমা নিয়ে চোখ দুটো একটু খারাপ করে ফেলি। তবু যদি কখনও কোনও সত্যিকারের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটে। এসব চেনা জিনিস দেখতে দেখতে একঘেয়ে হয়ে গেছে। এখন আমি যুক্তি ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

মনে পড়ে, শ্যামপুকুরের বাড়িতে যখন থাকতুম, নীচের তলাটা ছিল সম্পূর্ণ ফাঁকা, শুধু

একটা ঘরে শুতুম আমি, বাড়ির আর সবাই দোতলায়। ওই বাড়িতে ভূতের ভয় ছিল। শুনেছি। আমাদের আগের ভাড়াটেদের বড় মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল ও বাড়িতে গলায় দড়ি দিয়ে। কতজন তাকে দেখেছে। ছাদের ওপর চুল এলো করে বসে কাঁদত—কেউ দেখতে পেলেই এক মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যেত। আমি কতবার চেষ্টা করেছি তার দেখা পাওয়ার।

একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। জানালার ওপর টক-টক আওয়াজ শুনলুম।

ঘুমের ঘোর কাটার আগে শব্দটা কোথা থেকে আসছে কিছুই বুঝতে পারিনি। আমার পাতলা ঘুম চট করে ভেঙে যায়। বুঝতে পারলুম, শব্দ হচ্ছে আমরা পায়ের কাছের জানালার পাল্লায়। অল্প-অল্প জ্যোৎস্নায় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি জানলার বাইরেটা-সেখানে কোনও মানুষের মুখ নেই। কিন্তু শব্দটা হাওয়ার নয়, স্পষ্টত মানুষের। একটু থেমে থেমে শব্দ হচ্ছে ঠক ঠক ঠক।

আমার বালিশের তলায় বেড স্যুইচ। তা ছাড়া ইঁদুরের উৎপাতের জন্য পাশে একটা মোটা বেতের লাঠি রেখে দিতাম। সুতরাং সশস্ত্র ছিলাম। তবু আলো জ্বালিনি, শুরু করেছি যুক্তির খেলা। প্রথমে ভেবেছিলাম, আমারই কোনও বন্ধু-বান্ধব ডাকতে এসেছে। দীপকের ফ্ল্যাট বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হয়ে গেলে মাঝেমাঝে রাত্রে এসে ও আমার সঙ্গে শুত। কিন্তু দীপক তো চুপ করে থেকে জানলা নক করার ছেলে নয়। এতক্ষণে ওর কম্বুকণ্ঠে সারা পাড়া নিনাদিত হয়ে উঠত। তবে কি কোনও চোর? আমি জেগে আছি কিনা দেখার জন্য আওয়াজ করছে? আমি খর চোখে তাকিয়ে রইলুম—জানালার পাল্লায় আবার আওয়াজ ঠক ঠক ঠক। কিন্তু কোনও মানুষের হাত বা মুখ দেখা গেল না। অথচ জানালাতেই যে শব্দটা করা হচ্ছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। জানালার কপাট দুটো ঘরের মধ্যে ঢোকানো—সুতরাং কেউ আওয়াজ করলে তার হাত দুটো আমি দেখতে পাবই। এমন মূর্খ আমি, কোনও অদৃশ্য বা অলৌকিক অস্তিত্বের কথা তখন আমার মাথাতেই আসেনি। আমার পক্ষে সবচেয়ে সহজ ছিল—আলো জ্বেলে উঠে গিয়ে দেখা। কিন্তু ওই যে—অনুমান এবং ডিডাকশান করার লোভ। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে নানান যুক্তি ভাবতে লাগলুম। শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলুম সমাধান। টিকটিকিতে আরশোলা ধরেছে। আরশোলাটাকে মারার জন্য টিকটিকি অনেকবার ঝাপটা মারে। টিকটিকির যা স্বভাব—অসীম ধৈর্য নিয়ে থেমে ঝাপটা মারতে মারতে ওকে শেষ করবে। কাঠের জানলায় ওইরকম আওয়াজ হচ্ছে ঝাপটা মারার। আমার এই সিদ্ধান্তে আমি এতদূর নিশ্চিন্ত হয়ে গেলুম যে, উঠে গিয়ে মিলিয়ে দেখারও ইচ্ছে হল না। ঘুমিয়ে পড়লুম পাশ ফিরে।

আজ সে জন্য কত অনুতাপ হয়। হয়তো টিকটিকি নয়—সেই আত্মহত্যাকারিনী অষ্টাদশী মেয়েটি আসতে চেয়েছিল আমার ঘরে। দুটো কথা বলতে এসেছিল। আসবার আগে ভদ্রভাবে অনুমতি চেয়েছিল। আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি। আজকাল ভূত আর ভগবান তো একই—অবিশ্বাসীর কাছে আসে না একেবারেই। ভয় দেখাতেও আসে না।

কিন্তু আমি যদি কোনও অলৌকিকের দেখা না পেয়ে থাকি তবে এ লেখাটা লিখছি কেন? না, পেয়েছিলাম একবার। একটি অসম্ভব অলৌকিক দৃশ্যের রাত্রি।

চক্রধরপুর থেকে রাঁচি যাওয়ার রাস্তায়, পাহাড়ের ওপর হেশাডি ডাকবাংলোয় একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম কয়েক বন্ধু। চারপাশে জঙ্গল—সন্ধের পর ভাল্লুক আর চিতাবাঘের ভয় আছে। রাস্তার পাশে এই বাংলো—আর চতুর্দিকে ১৫ মাইলের মধ্যে কোনও জনমানব নেই। সন্ধ্যের পরই অন্ধকার এবং স্তব্ধতা একসঙ্গে ছেয়ে আসে। মাঝেমাঝে শুধু দু-একটা ট্রাক তীব্র আলো জ্বেলে ঝড়ের বেগে ছুটে যায়—ডাকাতির ভয়ে কোথাও না থেমে।

কয়েকদিন তাসটাস খেলে হই-হুল্লোড় করে কাটল। তারপর আর সন্ধে কাটতে চায় না। কী বিপুল দীর্ঘ সন্ধেগুলো। সুতরাং একদিন ১৮ মাইল দূরে ওঁরাওদের গ্রামে হাট হবে শুনে আমরা দুপুরবেলাই একটা ট্রাক ধরে চলে গেলাম। চাল, হাস, মুরগি, কাচের চুড়ি, আয়না আর হাঁড়িয়া ও জুয়ার আড্ডা নিয়ে ছোট্ট গ্রাম্য হাট। সন্ধের পরই ভেঙে গেল। তখন সমস্যা হল আমাদের

ফেরা নিয়ে। কী করে অতখানি রাস্তা ফিরে যাব—কোনও ট্রাক আমাদের নিতে রাজি হয় না। শেষ পর্যন্ত একটা সিমেন্টের ট্রাক আমাদের পৌঁছে দিতে রাজি হল বাদগাঁও পর্যন্ত। সেখান থেকে আমাদের বাংলো ৪ মাইল। হেঁটে ছাড়া যাওয়ার আর কোনও উপায় নেই। জমাট অন্ধকারে পাকা পিচের রাস্তা ধরে চুপচাপ হাঁটছিলুম আমরা খুব সাবধানে। যে-কোনও সময় ছুটন্ত ট্রাক আমাদের চাপা দিয়ে যেতে পারে—এখানে আর কে দেখছে। হাঁটতে একদম ভালো লাগছিল না। শেষে, কে এই হাটে আসার প্রস্তাব দিয়েছিল সেই নিয়ে খিটিমিটি বেধে গেল। তারপর তুমুল ঝগড়া। আমি ঝগড়ায় এমন উন্মত্ত হয়ে গেলাম যে পাহাড়ের ধার দিয়ে নীচে নেমে যাওয়া একটা পায়ে চলা রাস্তা দেখে বললাম, আমি ওই রাস্তায় যাব—এটাই শর্টকাট। কেউ আমার সঙ্গে যেতে রাজি হল না। দু-একজন আমাকে বারণ করল। আমি তখন নামতে শুরু করেছি।

খানিকটা বাদে বুঝতে পারলুম, কী ভুল করেছি। পায়ে চলা পথ আর দেখা যায় না, মিলিয়ে গেছে জঙ্গলে। আমি নামার ঝোঁকে অনেকখানি নেমে এসে দাঁড়ালুম, বুঝতে পারলুম, ফেরার আর উপায় নেই। খাড়া পাহাড়—অতি কষ্টে ঝোঁক সামলে নীচে নামা যায়। কিন্তু ওপরে ওঠা যায় না, খানিকটা ওঠার চেষ্টা করে হাঁপিয়ে গেলুম। তাকিয়ে দেখলাম এতদূরে নেমে এসেছি যে ওপরের রাস্তাটা আর দেখা যায় না। পায়ের কাছে অনেকটা সমতল হয়ে এসেছে—শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল। কোথাও এক বিন্দু আলোর চিহ্ন নেই। আমার সঙ্গে হাট থেকে কেনা বাঁশের ছড়ি—আর কিছু না, একটা টর্চ পর্যন্ত নেই। আমি জঙ্গলে পথ হারালাম।

মনে আছে সেই রাত্রির কথা। ভাল্লুক আর চিতাবাঘ বেরোয় ওই জঙ্গলে শুনেছিলাম, তার চেয়েও ভয়ংকর পাহাড়ে চিতিবোড়া সাপ, যার একটা আমরা আগের দিন নিজেরাই দেখেছিলাম। বন্ধুদের নাম ধরে ডাকলুম। কোনও সাড়া নেই। ওরা শুনতে পাচ্ছে না বা এগিয়ে গেছে। বেশি ডাকতেও সাহস পেলুম না—শব্দ করতে যেন ভয় করছিল। পাগলের মতো হন্যে হয়ে ছুটতে লাগলুম। তারপর একবার ক্লান্ত হয়ে বসলাম একখণ্ড পাথরের ওপর। ছড়িটা দিয়ে চারপাশ পিটিয়ে দেখে নিলাম সাপ আছে কি না কাছে। বসে থেকে এমন অসহায় লাগতে লাগল। কোনও গাছের ওপর বসে যে রাত কাটাব তারও উপায় দেখলুম না। লম্বা-লম্বা শালগাছগুলো অনেকদূর উঠে গেছে সিধেভাবে—তারপর ডালপালা ছড়িয়েছে। ও গাছে চড়া আমার সাধ্য নয়।

চুপ করেই বসে রইলুম। হঠাৎ এক ঝলক হাওয়া দিল, কেঁপে উঠল গাছের পাতাগুলো। আমি স্পষ্ট গলায় আওয়াজ শুনতে পেলুম, আহা-হা, লোকটা লোকটা। ফিসফিস করে কেউ বলল আমার মাথার ওপরের গাছটা থেকেই। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। আবার এক ঝলক হাওয়া দিতে সামনের গাছ থেকে ফিসফিস শব্দ হল, আহা-হা, লোকটা লোকটা। আমি ওপরের দিকে তাকালুম। দুটো গাছ যেন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বলছে, আহা-হা, লোকটা লোকটা।

তারপর বেশ জোরে হাওয়া দিল একবার—আশেপাশের সবগুলো গাছ বলে উঠল, আহা-হা, লোকটা লোকটা।

মনের ভুল তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু এরকম মন বা কানের ভুল হবেই বা কেন? শুনেছি মরুভূমিতে অনেক লোক পাগল হয়ে যায়, আমিও শেষে জঙ্গলে? উঠে হাঁটতে আরম্ভ করলুম। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আবার ফিসফিস সুর...আহা-হা...। লোকটা! নিষ্ঠুর কৌতুকের নয়, করুণ সহানুভূতিময় সেই সুর, যেন শতশত বৃক্ষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে—আমি ছুটতে লাগলুম।

হঠাৎ একবার বাতাস থেমে গেল। তারপর আর এক ঝলক বাতাস বইতেই আমি অন্যরকম কথা শুনতে পেলুম। এইখানেই অলৌকিক দৃশ্যের আরম্ভ। আমি থেমে দাঁড়ালাম। এবার শুনতে পেলুম—ওদিকে নয়, ওদিকে নয়! এই প্রথম শিহরণ হল। গাছের পাতাগুলো দুলে-দুলে সরসর শব্দ করে আমাকে বলছে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। এক মুহূর্তে দ্বিধা করে আমি পিছন ফিরে হাঁটতে লাগলুম। আবার শুনতে পেলাম, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়!

চিৎকার করিনি, কিন্তু মনে মনে জিগ্যেস করলুম, কোন দিকে? বোবা বৃক্ষেরা কথার উত্তর দেয় না, শুধু নিজেরা কথা বলে, ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। কীরকম বোবা ওরা কী জানি।

আমি ডানদিকে ঘুরলুম, আর কোনও কথা নেই। হাওয়া থেমে গেছে। এবার সবাই আমাকে দেখছে, আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম। ডানদিকেই হাঁটতে লাগলুম। বেশ কিছুটা হাঁটার পর আবার হাওয়া উঠল। আবার শব্দ উঠল, ওদিকে নয়। থেমে দাঁড়িয়ে আবার ডানদিকে বাঁক নিলুম। তখনও শব্দ ওদিকে নয়, ওদিকে নয়। দাঁড়িয়ে বাঁদিকে বাঁক নিলুম। শব্দ থেমে গেল।

তারপর যতক্ষণ হেঁটেছি ভুলে গিয়েছিলুম বাঘ ভাল্লুক বা সাপের কথা। শুধু উৎকর্ণ হয়ে শুনেছি গাছের পাতার সরসরানি। মাঝেমাঝে থেমে ওদের নির্দেশ মতো চলেছি। একটু পরেই দেখতে পেলুম, দূরে ডাকবাংলোর আলো, শুনতে পেলুম বন্ধুদের গলায় আওয়াজ।

মনের ভুল? কানের ভুল? আর যাচাই করে দেখতে চাই না। এরপর যখনই সেই রাত্তিটার কথা ভাবি, আমার যেন একটা অলৌকিক সুখানুভূতি হয়।

হঠাৎ এক টুকরো

আমি যখন কলকাতার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই, তখন গাড়িওয়ালা লোকদের ওপর আমার খুব রাগ হয়। কলকাতার রাস্তায় এত লোক যে ভালোভবে হাঁটাই যায় না। এই বর্ষার সময় যেখানে সেখানে জলকাদা জমে থাকে, তারই মধ্যে গাড়িগুলো এমন বেপরোয়াভাবে যায় যে সবসময় প্রাণটা হাতে নিয়ে থাকতে হয়। গাড়ির চাকায় ছেটকানো জল কাদা আমাদের গায়ে লাগে, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভাররা তা গ্রাহ্যও করে না। অথচ রাস্তাগুলো তো আসলে পদাতিকদের জন্যই!

আবার আমিই যখন গাড়ি চড়ে যাই, তখন মনে হয় কলকাতা শহরের রাস্তায় লোকগুলো অতি অদ্ভুত। এরা কোনওরকম শহুরে নিয়মকানুন মানে না। ফুটপাথ ছেড়ে এরা যখন তখন রাস্তার মাঝখানে চলে আসে, এর মধ্যে দিয়ে গাড়ি চালানো যে কত অসুবিধে তা এরা বুঝবে না। প্রায়ই দু'তিন বন্ধু রাস্তার মাঝখান দিয়ে গল্প করতে করতে যাচ্ছে, পেছনে গাড়ির হর্ন শুনলে একবার ফিরেও তাকায় না! হঠাৎ হঠাৎ এক একজন লোক ট্রাফিক কনস্টেবলের মতন হাত তুলে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে দেয় নিজে রাস্তা পার হওয়ার জন্য। অন্য যে-কোনও দেশ হলে এইসব লোককে অ্যারেস্ট করা হতো! যে-সব লোক রাস্তা দিয়ে ঠিকমতন হাঁটতে পারে না, তাদের শহর থেকে বার করে দেওয়া উচিত!

একবার দুর্গাপুর স্টেশনে এসে দেখি আমার ট্রেনটা সদ্য ছেড়ে দিয়েছে। পরের ট্রেন অনেক পরে, সেইজন্য আমি মরিয়া হয়ে ছুটতে ছুটতে চলন্ত ট্রেনেই উঠে পড়লুম। কামরাটার দরজা ভেতর থেকে বন্ধ, আমি দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে ভেতরের যাত্রীদের বলতে লাগলুম, খুলে দিন! খুলে দিন! ভেতর থেকে এক সঙ্গে তিন চারজন বললেন, জায়গা নেই, জায়গা নেই!

যে-হেতু আমি কখনও, চিনেবাদাম বিক্রি করিনি কিংবা গান গেয়ে ভিক্ষে করিনি, সেইজন্য ট্রেনে ঝুলে ঝুলে যাওয়ার অভ্যেস আমার নেই। আমার রীতিমতন ভয় করছিল, যে-কোনও মুহূর্তে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লেগে মাথাটা ফেটে যাবে এই আশঙ্কা হচ্ছিল। ভেতরের লোকগুলো কী

স্বার্থপর! আমি কাতরভাবে অনুরোধ করতে লাগলুম, দাদা, খুলে দিন, দয়া করে খুলে দিন, আমি পড়ে যাচ্ছি!

একটু পরে দরজাটা কেউ একটু ফাঁক করল, আমি কোনওরকমে বাঁদরের মতন শরীরটাকে বাঁকিয়ে চুরিয়ে ঢুকে পড়লুম ভেতরে। এইভাবে চলন্ত ট্রেনে ওঠার জন্য অনেক লোকই বকুনি ও উপদেশ দিতে লাগল আমাকে। আমি চুপ করে সব মেনে নিলুম। ভেতরে সত্যিই খুব ভিড়, দাঁড়বারও জায়গা নেই। অধিকাংশ ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা যে-রকম হয়।

পরের স্টেশনে কোনও লোককে সেই কামরায় উঠতে দেওয়া হল না। কিন্তু ট্রেন চলতে শুরু করার পরই একাধিক লোক বন্ধ দরজায় দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে অনুরোধ করতে লাগল, দাদা, খুলে দিন, খুলে দিন! ভেতরের লোকেরা ধমকে বলতে লাগলেন, জায়গা নেই, জায়গা নেই!

আমি চুপ করে রইলুম। এই লোকগুলোকে দরজা খুলে দিতে বলার সাহস আমার নেই। তা ছাড়া আমি এখন ভেতরের লোক হয়ে গেছি, আমার মানসিকতাও যেন সঙ্গেসঙ্গে বদলে গেছে। এখন আমার মনে হচ্ছে, এর মধ্যে আবার দু'জন বাইরের লোকের জায়গা কী করে হবে? আমি চুপ করে থাকি, বাইরের দু'জন লোক অবিরাম দরজায় ধাক্কা দিয়ে চলে!

অফিসে আমার ঘরে প্রায়ই খুব ভিড় হয়। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোকই কাজের কথা সংক্ষেপে সেরে নিতে জানে না। আবার অনেক লোক জানেই না, তারা সঠিক কী চায়, সেইজন্য তারা শুধু ভূমিকাই করে চলে, আসল কাজের কথা আর বলেই না, সেইজন্য মাথা ঠান্ডা রাখা এক এক সময় খুব শক্ত হয়। একদিন আমার টেবিলের সামনে এই রকম তিন-চার জন ভিজিটর রয়েছে, এরই মধ্যে নীচ থেকে আমাদের রিসেপশনিস্ট ফোন করে জানালেন, একজন আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছে, নাম বলছে না, বলছে, আপনার সঙ্গে চেনা আছে।

আমি বিরক্তভাবে বললুম, অপেক্ষা করতে বলুন! খালি হলে আমি ডাকব!

এরপর দু'ঘণ্টা কেটে গেছে। আমি কাজে ব্যস্ত ছিলুম, সেই লোকটির কথা আর আমার মনেই পড়েনি। হঠাৎ খেয়াল হতেই রিসেপশনিস্টকে ফোন করলুম। সে বলল, সেই ভদ্রলোক তো প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে চলে গেছেন! আপনি ডাকেননি। ভদ্রলোক কিছু না বলেই চলে গেলেন।

সামান্য অনুতপ্ত হলুম। কে ছিল লোকটি? সে বলেছিল আমার চেনা, কিন্তু নাম জানায়নি কেন? সে বোধহয় রাগ করে চলে গেছে। আমার যে ঘর ভরতি লোক ছিল, তা-কি সে বুঝবে? অনেক লোক এসে একসঙ্গে বিরক্ত করলে মাথার ঠিক রাখা যায়? একটু পরেই অবশ্য ভুলে গেলুম লোকটির কথা।

হঠাৎ একদিন আমায় বিশেষ জরুরি কাজে পাসপোর্ট অফিসে যেতে হয়। দু'দিন বাদেই আমাকে বিদেশে যেতে হবে, শেষ মুহূর্তে আমি আবিষ্কার করেছি যে আমার পাসপোর্টের বয়েস পাঁচ বছর পেরিয়ে গেছে, সেটা রিনিউ না করালে যেতে পারব না। ব্যাপারটা অতি সামান্য, একটা রাবার স্ট্যাম্পের ছাপ দেওয়া শুধু।

কিন্তু পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে দেখি সেখানে বিরাট ভিড়, মস্তবড় লাইন, হুলুস্থুলু ব্যাপার। এই লাইনে দাঁড়ালে আমার সারাদিন কেটে যাবে, এতটা সময় দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব।

ওই অফিসের একজন অফিসারের সঙ্গে আমার কিছুটা চেনাশুনো আছে, দেখা করতে চাইলুম তার সঙ্গে, কিন্তু ভিতরের মহলের দরজায় একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, সে আমায় ভেতরে যেতে দেবে না। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া কোনও অফিসারের সঙ্গে দেখা করা যানো না। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট করব কী করে? আসবার আগে আমি অন্তত পনেরো বার টেলিফোনে সেই অফিসারটিকে ধরবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কলকাতা শহরে সবচেয়ে দরকারের সময়েই তো টেলিফোনগুলো মৃত হয়ে যায়। পাসপোর্ট অফিসের ফোন একবারও বাজেনি! দ্বাররক্ষীটিকে আমার জরুরি দরকারের কথা বোঝাতে গেলুম, সে পুরোটা না শুনেই বলল, পাসপোর্ট জমা দিয়ে যান, সাহেবের সঙ্গে দেখা হবে না।

তখন আমি একটা স্লিপ লিখে খুব কড়া গলায় তাকে বললুম, তোমার সাহেবকে এটা দেখাও, তিনি আমায় চিনতে পারবেন।

আমার মুখের ওপরেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভেতরে চলে গেল। এবং একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, সাহেব বলেছেন, আজ দেখা হবে না, পরে আসবেন!

আমি এমনই অপমানিত বোধ করলুম যে আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল, মনে হল, সেই মুহূর্তে আমি অজ্ঞান হয়ে যাব। এরকম আমার হয়, কেউ অপ্রত্যাশিতভাবে অপমান করলে আমি চোখে অন্ধকার দেখি। দেয়াল ধরে অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিলুম। অফিসারটি আমার নাম দেখেও চিনতে পারল না? তার সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে, তাও সে একবার ডাকল না আমাকে?

এমনও হতে পারে অবশ্য যে বেয়ারাটি আমার স্লিপটা দেখায়ইনি অফিসারটিকে। এমনিই ফিরে এসেছে। কিন্তু এর সঙ্গে তো ঝগড়া বা মারামারি করে কোনও লাভ নেই? এখন আমি কী করব?

সৌভাগ্যবশত পাসপোর্ট অফিসের একজন মহিলা অফিসার সেদিন আমায় দেখে চিনতে পেরেছিলেন এবং অনেক সাহায্য করেছিলেন।

কাজ সেরে বেরিয়ে আসবার পর আমার মনে পড়ল সেই লোকটির কথা, আমার অফিসে যাকে আমি নীচে বসিয়ে রেখেছিলাম, পরে তাকে ডাকতেই ভুলে গেছি। সে কী ভেবেছিল আমার সম্পর্কে?

মনে রাখার মতো মধুযামিনী

পিটার নামে আমার পরিচিত একজন একদিন বেলা এগারোটায় এসে বলল, জ্যাক আজ বিয়ে করছে, চলো, চলো, তোমাকে নিয়ে যাব। চটপট তৈরি হয়ে নাও।

আমি অবাক। জ্যাকের সঙ্গে আলাপ মাত্র দুদিন আগে। তার বিয়েতে আমি যাব কেন? তা ছাড়া জ্যাক নিজে নেমন্তন্ন করেনি। পিটার আমার কোনও আপত্তিই শুনল না, হাত ধরে টানাটানি করতে লাগল।

বিয়ে তো হয় সন্ধেবেলা: এই দুপুর রোদ্দুরে কোথায় যাব? বিয়ের উৎসবে যোগদান করার জন্য বিশেষ সাজপোশাক দরকার, আমার সেসব কিছু নেই। আমার কুণ্ঠাকেও পাত্তা দিল না পিটার। পোশাকের কথা একটু উল্লেখ করতেই ধমক দিল। পিটার নিজে অবশ্য পরে আছে জিনস ও গেঞ্জি।

পিটার নিয়ে এসেছে একটা জিপ গাড়ি। তার মধ্যে আরও তিন চারটি ছেলে মেয়ে বসে আছে, কারুকেই চিনি না, তবু তারা আমাকে দেখেই হাসি মুখে সম্ভাষণ করল। জিপটা ছুটল শহর পেরিয়ে।

আরিজোনার এই টুসন শহর থেকে খানিকটা দূরেই মরুভূমি। এই মরুভূমির মধ্যেও কোথাও কোথাও দু-একটা বাড়ি আছে, সেরকম কোনও বাড়িতেই বিবাহবাসর নাকি?

মরুভূমি বলতে যে ধু-ধু করা বালুকাময় প্রান্তরের ছবি মনে পড়ে, এ মরুভূমি ঠিক সেরকম নয়। এখানে মাইলের পর মাইল ঊষর প্রান্তর। পাথুরে মাটির মাঝেমাঝে বালি। ছোট ছোট পাহাড়।

কিছু কিছু ঘাস জন্মায়, আর আছে ক্যাকটাস। সেরকম ক্যাকটাস আমি আগে কখনও দেখিনি। বিরাট লম্বা লম্বা ক্যাকটাস, কোনও কোনওটা দেড়তলা, দুতলা বাড়ির সমান। আরও একটা ব্যাপার এই, এখানে গরমও বেশি নয়। বরং বেশ মোলায়েম আবহাওয়া।

মরুভূমির মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ যাওয়ার পর একটা বাড়ি চোখে পড়ল। এখানে মিউজিয়াম আছে, আগে দেখেছি, এ বাড়িটা অন্য মনে হয়, হোটেল। সেখানে আরও কুড়ি-পঁচিশটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। তাদের মধ্যে দেখতে পেলাম জ্যাককে। সে-ও জিনস ও গেঞ্জি পরা, ব্যস্তভাবে কথা বলছে অন্যদের সঙ্গে।

আমি প্রথমে ভাবলাম, এই হোটেলেই বোধ হয় বিবাহ অনুষ্ঠান হবে সন্ধের পর। কিন্তু একটু বাদেই সবাই উঠে পড়ল কয়েকখানা গাড়িতে, আমরা যেতে লাগলাম মুরুভূমির আরও ভেতরের দিকে।

একটা ছোট্ট পাহাড়ের কোলে আবার নেমে পড়লাম সবাই। এখানে সারিবদ্ধ ক্যাকটাসগুলোকে দূর থেকে মনে হচ্ছিল সৈনিকের মতন। কাছে এসে দেখলাম, জায়গাটা ভারী মনোরম। ছায়া ছায়া ময়। সবুজ গালিচার মতন ঘাসে পাথর ঢাকা। এই মরুভূমিতে জল পাওয়া যায় না, সেটাই জানতাম, কিন্তু এখানে কোথা থেকে যেন একটা জলের ধারা বইছে।

একটা গাড়ি থেকে নামল দুধ-সাদা পোশাক পরা একটি যুবতী, একেবারে খ্রিস্টান বিয়ের কনের মতন সাজ। মেয়েটিকে দেখে চমকে উঠলাম। এ মেয়েটিকেও তো চিনি, এর নাম জেনি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশের একটি পাব-এর পরিচারিকা। খুব হাসিখুশি মেয়ে, আমাদের বিয়ার সার্ভ করে, আমরা খুব ইয়ার্কি মশকরা করি ওর সঙ্গে। জেনি অবশ্য পড়াশুনোয় খুব ভালো, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে পি এইচ ডি করছে।

এখন অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে নিয়ে মাথাই ঘামায় না। দু'জনের মধ্যে যদি ভাব-ভালোবাসা হয়, তখন তারা একসঙ্গে থাকতে আরম্ভ করে, তাতে কোনও অসুবিধে নেই, কেউ ভুরু তোলে না। বিয়ে না করা অবস্থায় সন্তান হলেও তারা বৈধ হতে পারে। এখানে যে-সব যুবক-যুবতী উপস্থিত, তারা অনেকেই বিয়ে করেনি!

কিন্তু জেনির হঠাৎ ইচ্ছে হয়েছে বিয়ে করার। এবং পুরো কনের মতন সেজেগুজে বিয়ে করবে। জ্যাক তাতে রাজি, কিন্তু সে কিছুতেই গির্জায় যাবে না, রেজিস্ট্রি অফিসেও যেতে চায় না। জ্যাক মরুভূমি ভালোবাসে, এখানে সে প্রায়ই সোনা খুঁজতে আসে। এখানেই হবে জ্যাক ও জেনির বিবাহবাসর।

সবাই মিলে গোল হয়ে বসা হল ঘাসের ওপর। মাঝখানে দাঁড় করানো হল ওদের দু'জনকে। জ্যাকের বয়েস সাতাশ, অত্যন্ত সুঠাম তার স্বাস্থ্য, এখন তার মুখখানা একটু লাজুক-লাজুক দেখচ্ছে। সেই তুলনায় জেনি খুব সপ্রতিভ। সে একটা আংটি আনতে ভুলে গেছে। সবাই হেসে উঠল হো-হো করে। আংটির বদলে জ্যাক একটি চুম্বন দিল জেনিকে।

এরপর জেনি সকলের দিকে চেয়ে বলল, আমাদের বিয়েতে শুভেচ্ছা জানিয়ে তোমরা প্রত্যেকে কি একটা করে কবিতা শোনাবে?

আগে থেকেই এটা ঠিক ছিল। সবাই কবিতার বই এনেছে। পছন্দমতন প্রিয় কবিদের। কেউ কেউ নিজেও লিখেছে। জ্যাক আর জেনি রেড ওয়াইন দিতে লাগল সকলের হাতে হাতে, আর একটার পর একটা কবিতা পড়া হতে লাগল। সবই ছোট-ছোট কবিতা। এইসব অত্যাধুনিক ছেলে মেয়েদেরও রোমান্টিক কবিতার প্রতি বেশ ঝোঁক আছে দেখা গেল।

বিয়ের মন্ত্রের বদলে এই কবিতা পাঠ আমার মোটেই অস্বাভাবিক লাগল না। আমাদের হিন্দু বিয়েতে যেসব মন্ত্র পড়ানো হয়, সেগুলোও তো আসলে কবিতাই। সেগুলো সংস্কৃততেই হতে হবে, আর ব্রাহ্মণ পুরোহিতরাই শুধু পড়াবে, এরকম একটা অদ্ভুত নিয়ম এখনও চলে আসছে। এখনকার

বর-কনেরা সেইসব সংস্কৃত কবিতার অর্থ বোঝে না এক বিন্দু, খুব সম্ভবত অনেক পুরুতও বোঝে না, শুধু মুখস্ত বলে যায়।

আমি বই-টই কিছু আনিনি। অন্যদের পেড়াপিড়িতে অগত্যা একটা বাংলা কবিতাই বলে দিলাম।

এর পর কিছুক্ষণ নাচ ও খাওয়াদাওয়া। একটি ছেলে ভালো স্প্যানিশ গান গায়। সে গান শোনাতে লাগলো একটার পর একটা। আকাশে ঘনিয়ে এলো ছায়া, পড়ে এল বেলা। খুব জমকালোভাবে পশ্চিম দিগন্তে সূযাস্ত হল। তখন জ্যাক আর জেনি বৃত্ত থেকে বেরিয়ে হাসি মুখে বলল, এবার আমরা চলি? অন্ধকার হয়ে এসেছে, এখন শুরু হবে আমাদের হানিমুন। কোনও গাড়ির দিকে না-গিয়ে ওরা ছুটতে ছুটতে চলে গেল পাহাড়টার আড়ালে।

ওরা কোথায় যাচ্ছে? পিটার বলল, ওরা আজ ফিরবে না। জ্যাকটা এত মরুভুমি ভালোবাসে, আজ বিয়ের রাতটা এখানেই কাটাবে ঠিক করেছে। খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকবে। আজ পৃথিবীটাই ওদের বিছানা।

ফেরার পথে খানিকবাদে দেখলাম, মস্ত একটা চাঁদ উঠেছে। রূপোলি আলোয় ভরে গেল সেই প্রান্তর। আমি কল্পনায় দেখতে পেলাম, সম্পূর্ণ নির্জন মরুভূমিতে হাত ধরাধরি করে হেঁটে যাচ্ছে জ্যাক ও জেনি, যেন ওরা এই পৃথিবীর আদি মানব-মানবী। এই চাঁদের নীচে, ভূমিশয্যায় হবে ওদের মিলন। এমন মধুযামিনী বুঝি আর হয় না।

জেনিভায় দোল

১৫ আগস্ট খ্রিস্টানদেরও একটি পবিত্র উৎসবের দিন। এইদিন ক্যাথলিক-প্রধান দেশগুলিতে ছুটি থাকে ও খুব উৎসব হয়।

এক ১৫ আগস্টে আমি সুইটসারল্যানডের জেনিভায়, ওইদিন দেশে নানান উৎসব ও হইহই হচ্ছে ভেবে একটু মনমরা লাগছিল। আমার বন্ধু বিমান বললেন, চলো হে, সন্ধেবেলা আজ লেকের ধারে মেলা আছে। দেখবে রঙের বাহার। সেজেগুজে বেরোলুম সন্ধেবেলা। বিখ্যাত জল-হাওয়ার দেশ। আমি অবশ্য কাশ্মীরের সঙ্গে কোনও তফাৎ পাইনি, তবু যা পেয়েছি সেই মুহূর্তে তো তার তুলনা নেই। ফুরফুর করে অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছে, চলেছি হ্রদের দিকে। ছোট শহর জেনিভার সন্ধেবেলার একমাত্র আকর্ষণ হ্রদের তীরে, সেখানে ভিড় ভেঙে পড়ে। হ্রদের পাড়ে মানুষ, হ্রদের ওপর নৌকোয় মানুষ।

সেদিন গিয়ে দেখি, হ্রদের পাড়ে অনেকখানি জায়গা ঘিরে দেওয়া হয়েছে। সেই ঘেরা জায়গায় ঢুকতে হলে পাঁচ ফ্রাংকের (পাঁচ টাকা) টিকিট কিনতে হবে। সেখানে সন্ধেবেলা কনসার্ট হবে, একটু রাতে পোড়ানো হবে বাজি। টিকিটের কথা শুনেই বিমান আর আমি চোখাচোখি করলুম। চোখে চোখেই কথা হয়ে গেল, টিকিট? কাটতে হবে, পাগল হয়েছ? কনসার্ট আর বাজি দুটোই দূর থেকে শোনা আর দেখার জিনিস। ওর জন্য টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকার কী দরকার!

কিন্তু দলে-দলে মেয়ে পুরুষ ঢুকছে সেখানে। মানুষের মাথায় বহুদূর দেখা যায় না। এত লোক ঢুকছে কেন, বিশেষ কোনও আকর্ষণ আছে ওখানে। বিমানের সঙ্গে আবার চোখে-চোখে কথা

হল, কী বিনা টিকিটে ঢোক যায় না? দেশে থাকতে কত জলসায়, পাড়ার থিয়েটারে গেট ভেঙে ঢুকেছি। আর এই সামান্য পুঁচকে দেশে? তক্ষনি ঠিক করে নিয়েছি বিনা টিকিটে ঢুকতে হবে।

অবিবাহিত বাঙালি যুবক, এর মতো মারাত্মক চিজ নাকি দুনিয়ায় দুটি নেই, অনেকের মুখেই শুনেছি। বিমান আর আমি তখুনি মতলব এঁটে ফেললুম। এদিকটাই প্রধান ঢোকার পথ, নিশ্চয়ই উলটোদিক থেকে ঢোকা সহজ হবে। শহরের নানান গলি-ঘুঁজি ঘুরে কয়েকবার পথ হারিয়ে, উৎসব প্রাঙ্গণের অপর পাড়ে লেকের ধারে যখন এসে পৌঁছেছি, তখন কনসার্ট প্রায় শেষ। টুক করে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়েছি।

তখন শুরু হল বাজি পোড়ানো। এ-রকম বাজি পোড়ানো উৎসব আমি আগে আর কখনও দেখিনি। এত রং-বেরঙের অদ্ভুত রকমের বাজির সমাবেশ দেখলে চমৎকৃত হতে হয়। তখন বুঝতে পারলুম, কেন পাঁচ টাকার টিকিট। এই বাজির তৈরির খরচের তুলনায় পাঁচ টাকার টিকিট তো কিছুই নয়। এরকম বাজি তৈরি করতে যখন পারে, তখন সুইটসারল্যানড চাঁদে রকেট পাঠায় না কেন? একজন বিখ্যাত লেখক বলেছিলেন, সুইটসারল্যানড তিনশো বছর ধরে শ্রেষ্ঠ ঘাড়ি তৈরি করছে, অথচ পৃথিবীতে সময়ের দিক থেকে সবচেয়ে বেশি পিছিয়ে আছে সুইসরাই। কিন্তু না, এ-রকম বাজির বাহার দেখে, শূন্যে মিলিয়ে যাওয়া অসংখ্য ফুলঝুরি দেখে মনে হয়, এ-জাতের পক্ষে চাঁদে রকেট পাঠানোও ছেলেখেলা।

এরপরই কিন্তু আরম্ভ হল আসল উৎসব। সেই উৎসবের বর্ণনা দেওয়ার জন্যই এই লেখা। ১৫ আগস্ট আমাদের স্বাধীনতা দিবস, সেদিন আমি সুইটসারল্যানডে বসে দোল খেললুম। এর চেয়ে সুন্দর দোল খেলা আর হয় না।

বাজি উৎসবের পরেই সমস্ত লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আরম্ভ হল দোল খেলা। এ-দোলে জল রং নেই। আবির-ফাগও নেই জামাকামড় নষ্ট হওয়ার। টুকরো-টুকরো কুচি-কুচি নানারঙের কাগজ। সেই কাগজের কুচো বড় বড় প্যাকেটে বিক্রি হচ্ছে। সমস্ত ছেলেমেয়ের হাতে সেই প্যাকেট, এ ওর মুখে, মাথায়, পিঠে, বুকে মুঠো-মুঠো কাগজের কুচি ছুঁড়ে মারছে। অবিকল আমাদের ফাগ খেলা, শুধু ফাগের বদলে কুচি কাগজ। চেনা-অচেনা, মেয়েপুরুষ, ছেলে-বুড়ো কোনও ভেদ নেই, হো-হো হাসির মধ্যে ছুঁড়ে মারছে এ ওকে। কেউ হয়তে কানের ফুটো থেকে কাগজ কুচি বার করছে, আর একটা মেয়ে হাসতে-হাসতে এসে অন্য কানের ফুটোয় ঢুকিয়ে দিচ্ছে। কেউ হয়তো প্রতিবাদ করার জন্য মুখ খুলছে—অমনি খোলা মুখের মধ্যে ঢুকে গেল এক মুঠো কাগজ। অসম্ভব ভিড়, ঠেলে এগুনো যায় না। পথে এক ফুট প্রায় কাগজের কুচি জমে গেছে। মাঝে-মাঝে ঠিক রথের মেলার মতন আলুর চপ, ফুলুরির দোকান (অর্থাৎ স্টেক আর হট ডগ)। হঠাৎ দেখলুম, আমি বিমানকে হারিয়ে ফেলেছি ভিড়ের মধ্যে।

একা-একা রং কানার মতো ঘুরছি। মাথায় মাঝে-মাঝে ঠকাস-ঠকাস করে মার খাচ্ছি। রঙিন কাগজ ছোঁড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আর একটা জিনিস আছে। জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডারা যেসব বেতের ছপটি মারে, সেইরকম ওখানে অনেকের হাতে একটা করে ফাঁপা, হালকা, কাঠের হাতুড়ি। ঠকাস-ঠকাস করে মাথায় মারছে, লাগে না। মেয়েরা মারছে ছেলেদের, ছেলেরা মেয়েদের। একজনের বান্ধবীকে মারছে অন্যপুরুষ, এক পুরুষ মারছে অপরের বান্ধবীকে। সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছল, অজস্র হাসি। একজন পিছন থেকে মাথায় মারলে, সেই দিকে তাকাতেই সামনে থেকে আরেকজন, আবার সামনে ঘুরে দাঁড়াতেই পাশ থেকে। হো-হো হাসিতে হ্রদের জলে যেন অনেক বেশি তরঙ্গ উঠছে।

আমি একা-একা ঘুরছি। আর মাথায় ঠাকাস-ঠকাস করে মার খেয়ে যাচ্ছি। খুব বেশি মুখ খুলে হাসার উপায় নেই, তাহলেই মুখের মধ্যে ঢুকে পড়ছে এক মুঠো কাগজ। দাঁড়িয়ে মুখ থেকে কাগজ বার করতে আবার কোটের পাশ দিয়ে পিঠের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে কাগজ। খলখল করে হাসতে-হাসতে সুইস-সুন্দরীরা আমাকে দেখেই বলাবলি করছে, ইস এ-লোকটার চুলগুলো কী কালো রে।

দে দে আরও রং দে। অবশ্য অন্য কথাও বলতে পারে (আমার ক্ষীণ ফরাসি বিদ্যেয় ওই রকমই বুঝেছিলাম)।

আমার চুল অবশ্য তখন আর কালো কোথায়। লাল-নীল রঙে ভরতি। একবার করে চিরুনির মতো আঙুল বোলাচ্ছি আর ফরফর করে রাশি রাশি রঙিন কাগজ উড়ছে। আমিও তখন কাগজ ছুঁড়ে মারছি, ওইসব রূপালি মেয়েদের সোনালি চুলে।

কত রাত পর্যন্ত ওইভাবে ঘুরেছিলাম মনে নেই। এক সময় বেশ শীত করতে লাগল। ঘড়ির দেশ, আশেপাশে কোনও ঘড়ি পাই না, কে জানে কটা বাজে। একটা লোককে থামিয়ে জিগ্যেস করলুম, আপনার ঘড়িতে কটা বাজে?

এই যে, এতক্ষণ তুই কোথায় ছিলি?

তাকিয়ে দেখি বিমান, রঙিন কাগজ মেখে এমন চেহারা হয়েছে যে চিনতেই পারিনি আগে।

জয়ন্তী নদীর কাছে, পরির আশায়

প্রথমবার গিয়েছিলাম ট্রেনে। দ্বিতীয়বার গাড়িতে। বলাইবাহুল্য, প্রথমবারের রোমাঞ্চ অনেক বেশি ছিল।

বিচিত্র নামের জায়গা রাজা-ভাত-খাওয়া। সেখান থেকে ট্রেন। রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত হলেও জায়গাটি অকিঞ্চিৎকর, কিছুই নেই বলতে গেলে। জায়গাটি আমার বিশেষ কারণে মনে আছে। ওখানেই আমি তক্ষক নামে প্রাণীটি প্রথম দেখি। ছোটবেলা থেকে তক্ষকের ডাক অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সচরাচর প্রাণীটিকে চোখে দেখা যায় না। অনেক পুরোনো বাড়িতে তক্ষক লুকিয়ে থাকে। ওদের ডাকও নির্দিষ্ট থাকে, কোনওটা প্রত্যেকবার পাঁচবার ডাকে, কোনওটা সাতবার। বেশ জোরে, তক্কো তক্কো করে ডাকে, সেই থেকেই নামটা এসেছে। লোকের ধারণা, তক্ষক একটা সাপ, মহাভারতে অতি বিষধর তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করেছিল। রাজা-ভাত-খাওয়া স্টেশনের বাইরে খুব কাছেই সেই ডাক শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা শালগাছের গায়ে উলটোদিকে মুখ করে আছে, সাপ মোটেই না, একটা গিরগিটির মতন প্রাণী আরও একটু লম্বাটে ধূসর। আমরা কাছে যেতেই সড়াৎ করে ডালপাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তক্ষক কারুকে কামড়েছে বা তক্ষকের কামড়ে কেউ মারা গেছে, এমন কখনও শুনিনি। মনে হয়, টিকটিকির মতনই নিরীহ প্রাণী।

রাজা-ভাত-খাওয়া থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রেন চলেছিল। ছোট ট্রেন, প্রধানত মাল বহনের জন্য। কাঠ ও ডলোমাইট নিয়ে যায়। যাত্রীর সংখ্যা সামান্য। বৃষ্টি পড়েছিল বলে যাত্রাটা আরও উপভোগ্য হয়েছিল। জঙ্গলে বৃষ্টি, আঃ তার চেয়ে মাদকতাময় আর কী হতে পারে। মাত্র ষোলো কিলেমিটার পথ, কু ঝিক ঝিক করে ট্রেনটি চলছিল, ঠিক ছেলেবেলার মতন, এখন ট্রেনের শব্দ বদলে গেছে।

সেই ট্রেন এখনও চলে কি না জানি না। দ্বিতীয়বার যখন যাই, তখন সেই ট্রেন বন্ধ ছিল সাময়িকভাবে, যেতে হয়েছিল গাড়িতে, গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল পর্যটন দপ্তরের সৌজন্যে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ির পথও মনোরম। কিন্তু বৃষ্টি পড়েনি। গাড়িতে শুধু স্বাতী আর আমি, যেহেতু আমার দ্বিতীয়বার, তাই আমি প্রথমবারের সঙ্গে তুলনা করছিলাম। কিন্তু স্বাতীর প্রথম দর্শনের

জন্য মুগ্ধতা বেশি।

জয়ন্তী-তে পৌঁছলাম দুপুরের আগেই। পি ডব্লু ডি বাংলোটি আগে থেকেই আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পুরোনো আমলের বাড়ি... দোতলায় দুটি ঘর, সামনে বারান্দা। এবং সেখান থেকে দৃশ্যটি প্রথাসিদ্ধ সুন্দর। সামনেই নদী, ওপারে নিবিড় জঙ্গল, পটভূমিকায় পাহাড়। এরকম দৃশ্য কখনও পুরোনো হয় না।

নদীর নামও জয়ন্তী। জঙ্গলের ওপাশেই ভুটান, সেখানকার কোনও পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। কিছু দূর বয়ে মিশে গেছে রাইডাক নদীতে। জয়ন্তীর মতন ছোট নদী সারাদেশে কত যে ছড়িয়ে আছে। ছোট হলেও নগণ্য নয়। লিটল ম্যাগাজিনের মতন, তেজ আছে। আগেরবার বর্ষার সময় এসে দেখেছি, বেশ লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছিল। নৃত্যপরাও বলা যায়। মনে হয়েছিল, যখন তখন গতি পালটে ফেলতে পার। এখন অবশ্য শরৎকাল, জল অনেক কম, মাঝে-মাঝে পাথর জেগে আছে, তবে ধারাটি ঠিক প্রবাহিত।

জয়ন্তীতে এসে একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। কেমন যেন নিঃশব্দ। জনশূন্য ভাব। আগেরবার ডিনামাইটের কোয়ারির জন্য অনেক লোকজন দেখেছি। মাঝেমাঝে ডিনামাইটের বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যেত। এখন এত শুনশান কেন?

চৌকিদারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত-কী-একটা মামলায় ডলোমাইট খোঁড়া সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। ট্রেনও চলছে না। লোকজন আসবে কোথা থেকে?

নির্জনতাই তো বেশি পছন্দ হওয়ার কথা। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আজকাল তো প্রসিদ্ধ সুন্দর জায়গাগুলিতে একেবারেই যেতে ইচ্ছে করে না, সেখানে লোকজন গিসগিস করে, আর বাঙালিদের এমনই সঙ্গীত-প্রীতি যে জঙ্গলে গিয়েও ট্রানজিস্টার বাজাতে হয়। তবে জায়গাটা এত ফাঁকা ফাঁকা দেখে স্বাতীর মুখে-চোখে যেন খানিকটা অস্বস্তির ভাব। তার কারণ, আলিপুরদুয়ারে এতজন স্বাতীর কানেকানে বলে দিয়েছে, জয়ন্তীর পুরোনো বাংলোটায় ভূত আছে।

দুপুরটা আর বেরুনো হল না। বিকেলবেলা চা-পানের পর আমরা ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়েছিলাম। সঙ্গে গাড়ি থাকলে একটা মুশকিল এই যে, পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরির সুখ পাওয়া যায় না, গাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে আসে। আমরা গাড়ি নিতে না চাইলে সে মনে করে, তার ডিউটিতে বুঝি কিছু গাফিলতি হচ্ছে।

জয়ন্তী নদী হেঁটেই পার হওয়া যায়, গাড়ি চলার জন্যও একটা ফেয়ার ওয়েদার ব্রিজ মতন করা আছে, ওপারের জঙ্গলের মধ্যেও প্রশস্ত রাস্তা! আগেরবার লরি চলাচল করতে দেখেছি। এখন সব বন্ধ।

কিছুদুর গিয়ে ভুটানে ঢুকলে মহাকালের মন্দির দেখা যেতে পারে। মন্দির মানে কয়েকটি গুহা। সেখানে স্ট্যালাগটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের কিছু-কিছু আকৃতি আছে, সেগুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, ভক্তরা মনে করে ঠাকুর-দেবতা। কাশ্মীরে অমরনাথের বরফের পিণ্ডটাকে যেমন অনেকে মনে করে শিবলিঙ্গ।

আমাদের সে পর্যন্ত যাওয়া হল না। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল। এখনই সন্ধে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আকাশে ঘনিয়ে এসেছে মোষের গায়ের রঙের মেঘ। হেডলাইট জ্বালাতে হল গাড়িতে। ড্রাইভারটি গম্ভীর ধরনের, কিছু জিগ্যেস করলে শুধু হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়, এক সময় সে বলে উঠল, স্যার হঠাৎ হাতির পাল এসে পড়লে মুশকিল হবে। আগে একবার এরকম হয়েছিল, তখন গাড়ি ঘোরাতে এমন অসুবিধে হয়—

এখানে হাতির সংখ্যা প্রচুর। ছুটকো-ছাটকা দু-একটা বাঘও থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাঘদের ভয় পাওয়ার বিশেষ কারণই নেই, সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতন তারা অত চতুরও নয়। হিংস্রও নয়। চা বাগানের আশেপাশে যেসব লেপার্ডগুলো ঘুরে বেড়ায়, তারাও গাড়ি দেখলে

ভয়ে পালিয়ে যায়। আসল সমস্যা হাতির পাল নিয়ে। তারাও যে তেড়ে এসে আক্রমণ করে তা নয়, কিন্তু জঙ্গলের মধ্য দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় তারা কোনও বিঘ্ন পছন্দ করে না, কাছাকাছি গাড়ি দেখলে খেলাচ্ছলে উলটে দিতেও পারে। আগেরবার আমি হাতির পালের গতি ফেরাতে জঙ্গল কর্মীদের পটকা ফাটাতে দেখেছি।

ঝুঁকি না-নিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম।

সন্ধে সন্ধে হয়েছে। এখনই ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। অত মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি এল না। কিছুক্ষণ বসে রইলাম নদীর ধারে। দূরের পাহাড়ের রেখা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। অন্ধকার হলে সব জঙ্গলকেই গম্ভীর আর রহস্যময় মনে হয়।

যে-কোনও নদীর কাছে গেলে স্বাতী তার জল ছোঁবেই। বালিকার মতন লঘুপায়ে পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে সে জলধারার কাছে গিয়ে আঁজলা করে জল মাথায় ছোঁয়াল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। কাছাকাছি সর-সর শব্দ হচ্ছে মাঝে-মাঝে। এখনে সাপ থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

এইসব বাংলোয় তাড়াতড়ি খেয়ে নিতেই হয়। খাওয়াদাওয়া চুকিয়ে দিতে পারলেই চৌকিদারের ছুটি। ভাত, ডাল, ট্যাঁড়শের তরকারি আর মুরগির ঝোল, এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাই যায় না।

খেতে-খেতে স্বাতী ফস করে চৌকিদারকে জিগ্যেস করল, এই বাংলোয় ভূত আছে?

চৌকিদার উত্তর না-দিয়ে আমাদের দিয়ে চেয়ে রইল। তার এই নৈঃশব্দ্যই রহস্যময়।

আরও একবার জিগ্যেস করায় সে বলল, কী জানি। আমি তো কখনও ওপরের ঘরে থাকিনি। তবে, দু'একজন বাবু বলেছে—

চৌকিদারকে আরও জেরা করে জানা গেল, ইংরেজ আমলে নাকি এখানে এক মেমসাহেব খুন হয়েছিল, সে অনেককাল আগের কথা, সেই মেমসাহেবকে নাকি এখনও কেউ-কেউ দেখে।

এরকম গল্প থাকলে স্থানটি আরও রোমাঞ্চকর হয়। ভূত নয়, পেতনি, মেম পেতনি।

স্বাতী যে ভূতে ঠিক বিশ্বাস করে তা নয়, কিন্তু ভূতের ভয় পেতে খুব ভালোবাসে। গা ছমছমানিটাই উপভোগ করে মনে হয়।

ভূতের কাহিনি যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে ও রাত্তিরে বাথরুমে যেতেও ভয় পায় রীতিমতন। সত্যিসত্যি কোনও ভূতের সামনে পড়লে ও মূর্ছা যাবে নিশ্চিত, আমার কোনও একদিন একটা ভূত দেখে ফেলার ইচ্ছেও আছে পুরোপুরি।

আমি অবশ্য ভূত বা ভগবানের দেখা কখনওই পাব না, তা জেনে গেছি অনেক কম বয়সেই।

রাত্তির বেলা দূরের শব্দও খুব কাছের মনে হয়। হঠাৎ একটা জানলা যেন দড়াম করে অকারণেই বন্ধ হয়ে যায়। এইসব নিয়ে খানিকটা রোমহর্ষকভাবে কেটে গেল অনেকটা সময়, কিন্তু কোনও মেমসাহেবের ছায়া বা কায়া উঁকিঝুঁকি মারল না।

স্বাতী ঘুমিয়ে পড়ার পরও আমার ঘুম এল না। আমি বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম। এর মধ্যে সব মেঘে অদৃশ্য হয়ে গেছে, পুটুস করে একটা চাঁদও উঠেছে। বেশ ঝলমলে জ্যোৎস্না।

নদীটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। এখানে-সেখানে জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে জল। পাথরগুলো দেখা যায় না। জয়ন্তী নদীর এ-রূপ দিনের বেলার চেয়ে একেবারে অন্যরকম। যেন, এ এক মায়ানদী। দিনের বেলা শব্দ শুনিনি। এখন শুনতে পাচ্ছি কলকল ধ্বনি। জলের মধ্যে যেন চাপা আলো জ্বলছে, এক-একবার এক জায়গার জল সরে যাচ্ছে অন্যখানে।

হঠাৎ মনে হল, এই নদীতে বোধহয় রাত-দুপুরে পরি নামে।

আমি ভূতে বিশ্বাস করি না বটে, তবে পরি বা অপ্সরিদের সম্পর্কে বেশ বিশ্বাস আছে। কোনও না কোনওদিন অকস্মাৎ তাদের দেখা পেয়ে যাব। এরকম আশা করে আছি।

মনোহরণ অরণ্যে বারবার

আমার জন্ম জলের দেশে। খুব ছোটবেলায় আমি বড় কোনও জঙ্গল দেখিনি। কৈশোরে কলকাতা শহরে এসে এত মানুষের জঙ্গল দেখে হকচকিয়ে গেছি।

আমি প্রথম মনোহরণ অরণ্য দেখি সাঁওতাল পরগনায়। স্কুলের গণ্ডি পেরুতে না পেরুতেই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রায়ই ছুটে গেছি সিংভুম, মানভূমের নানান ছোট-ছোট জায়গায়। ধলা ভূম গড়, গালুডি প্রভৃতি অঞ্চল থেকে খানিকটা গেলেই চোখে পড়ত শাল-মহুয়া-সেগুনের ঘন বন, তেমন বিখ্যাত কিছু না, কিন্তু একবার ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না। কুসুম নামে যে কোনও বড়সড় গাছ থাকতে পারে, তা আমার ধারণাতেই ছিল না। কোনও বইতেও আগে পড়িনি, সে গাছ প্রথম দেখি সাঁওতাল পরগনায়।

চাইবাসাকে কেন্দ্র করে অনেকবার গেছি হেশাডি, টেবো, বরাইবুরু, একবার কারও নামে একটি নদী দেখতে পেয়ে মনে হয়েছিল জঙ্গলের মধ্যে সেই নদীটিকে আমরাই প্রথম আবিষ্কার করলুম। ছোট-ছোট টিলার গায়ে মাখা জঙ্গল, লাল রঙের পাকদণ্ডি, অপ্রত্যাশিত সুখবরের মতন হঠাৎ হঠাৎ একটা ঝরনা, এই জায়গাগুলিকে মনে হত বড় আপন, বড় মাদকতাময়। নির্জন ফরেস্ট বাংলোগুলিতে অনাহুত ও রবাহুত হয়ে উঠে পড়েছি প্রায় জোরজার করে, কখনও হোমরাচোমরাদের আগমনে শয্যাচ্যুত হয়ে আশ্রয় নিয়েছি চৌকিদারের ঘরে। এমনকী এক গ্রীষ্মে সরাসরি জঙ্গলের মধ্যে গাছতলায় রাত কাটাবার সৌভাগ্যও ঘটে গেছে, সে জঙ্গলে বাঘের উপদ্রব ছিল না অবশ্য, ভাল্লুক ও হাতির পাল সম্পর্কে অনেক গুজব শোনা গেছে। কিন্তু তারা সশরীরে এসে জ্বালাতন করেনি। মনেই পড়েনি সাপের কথা। সেই একটা বয়েস, যখন মৃত্যুকে মনে হয় খেলার সঙ্গী।

পশ্চিম বাংলার বিখ্যাত তরাই অঞ্চল উত্তর বাংলায়, আর কলকাতার খুব কাছেই ভুবনবিদিত সুন্দরবন। কিন্তু আমি বিহার-উড়িষ্যার প্রচুর জঙ্গল চষে বেড়ালেও পশ্চিম বাংলার এই দুই অরণ্য আমার দেখা হয়নি অনেকদিন। স্বাধীনতা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গের পর উত্তরবঙ্গ বেশ দুরধিগম্য হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় বার দু-এক দার্জিলিং যাওয়ার অভিজ্ঞতা মনে আছে। বড় ট্রেনে মনিহারি ঘাট, তারপর ফেরিতে গঙ্গা পার, তারপর ওপারে নেমেই বালির ওপর দিয়ে মালপত্র সমেত দৌড়োতে হত মিটার গেজের ট্রেনে জায়গা দখল করার জন্য। শিলিগুড়িতে নেমে আবার দেশলাই-এর বাক্সের মতন ছোট ট্রেন। তখন এত বেশি ট্যাক্সি-মিনিবাসের চল ছিল না ওদিকে। শিলিগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে মোড় নেওয়ার সুযোগ হয়নি একবারও, কারণ চেনাশুনো না থাকায় কোথায় রাত্রিবাস করব, কীভাবে জঙ্গলে ঘুরব, তার কোনও হদিশ জানা ছিল না। আর সুন্দরবন এত কাছে হলেও কলকাতার খুব কম লোকেই নিছক বেড়াবার জন্য সুন্দরবন যাওয়ার চিন্তা করত তখন। সুন্দরবন নামটা শুনলেই নরখাদক বাঘ, কুমির ও সাপের ছবি ভেসে উঠত এবং গোটা সুন্দরবনে তখন কোথাও বাইরের লোকের কোনও থাকবার জায়গা ছিল না। ক্যানিং শহরটি সারারাত জেগে থাকে। এই কথা শুনে আমরা একবার দলবেঁধে ক্যানিং-এ গিয়ে সারা রাত্রি মাছের বাজারে ঘুরেছি। সকালবেলা স্টিমার ঘাটে দাঁড়িয়ে প্রবল মাতলা নদীর দিকে তাকিয়ে সুন্দরবনের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছি দীর্ঘশ্বাস।

বিভূতিভূষণের আরণ্যক উপন্যাস পড়ে আমি পুর্ণিয়ায় গিয়েছিলাম সেই অরণ্য দেখতে। কিন্তু কোথায় সেই লবটুলিয়া? পুর্ণিয়ার ধারেকাছে গভীর জঙ্গল নেই। বিভূতিভূষণের অরণ্যটি বোধহয় অনেকখানিই কাল্পনিক, সেই জন্যই ওই উপন্যাসের গাছপালার চেয়েও মনুষ্যচরিত্রগুলিই আমাদের মনে বেশি দাগ কেটে যায়। ভিকি বাম-এর লেখা গ্রিন ম্যানসন-এর অরণ্যের অনুভূতি আমি প্রথম পাই আসামে গিয়ে। টুকরো-টুকরো হয়ে যাওয়ার আগে গোটা আসাম রাজ্যটাই যেন ছিল অরণ্যময়। কাজিরাঙা-র মতন নামজাদা জঙ্গলের চেয়েও আমার বেশি ভালো লাগত পাহাড়ি রাস্তার দু-ধারে নামহীন বিস্তীর্ণ অরণ্য। শিলচর শহর থেকে লামডিং যাওয়ার ছোট ট্রেনে বসে দু'দিকে অরণ্য দেখতে দেখতে প্রথম শরীরে অনুভব করেছিলাম অকৃত্রিম আদিমতার শিহরণ। জাটিংগা নামের একটি দুর্দান্ত স্রোতস্বিনী নদীর কাছেই হারাংগাজাও নামে একটি ছোট্ট স্টেশন। তার মাঝামাঝি অকারণে দাঁড়িয়ে গেছে ট্রেন। দু'দিকে সবুজ অরণ্যের ঢেউ, তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, কোনওদিন যেন ওখানে মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ইচ্ছে করছিল, ট্রেন থেকে নেমে দৌড়ে চলে যাই।

সংরক্ষিত অরণ্যগুলির মধ্যে মানস-এর তুলনা নেই। বরপেটা রোড ধরে এসে জঙ্গল এলাকায় ঢোকার পরেই দুপাশে অজস্র কাঞ্চন ফুলের গাছ। যেন একটি কাঞ্চন সরণি। সাদা কাঞ্চন আমার প্রিয় ফুল। আমি প্রথম যে-বার মানসে যাই সে-বারে আসামে কিছু একটা গোলযোগ ছিল। সেই জন্য আমি ছাড়া আর কোনও যাত্রী ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যে আমি পৌঁছেছিলাম জঙ্গলের অভ্যন্তরের বাংলোয়। সে অভিজ্ঞতার কথা আমি অন্যত্র লিখেছি। এই মানসেই আমি প্রথম চিড়িয়াখানার বাইরে বাঘের ডাক শুনতে পাই, খুব কাছ থেকে। যদিও চোখে দেখা যায়নি। এখানেই প্রাতঃভ্রমণকারী একা একটি বিশাল হাতিকে দেখে কিপলিং-এর উপন্যাসের হাতি-চরিত্রটির কথা মনে পড়েছিল। মানসের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে দীর্ঘ দিনের ব্যবধানে সেখানে আবার গেলেও একটুও হতাশ হতে হয় না, বড়-বড় বৃক্ষের আন্দোলিত শিখর, ময়ূর ও ধনেশ পাখির ডাক মনে হয় অবিকল একই রকম আছে। বহু দূর বিস্তৃত ঘাস বনে হরিণের পালের অন্দোলন দেখে দেখে তৃষ্ণা মেটে না। কালের হস্তাবলেপ মানসের রূপ বিশেষ ঝরাতে পারেনি।

সে কথা কিন্তু হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক কিংবা বেতলা সম্পর্কে খাটে না। কয়েক বছর অন্তর-অন্তর ওইসব জায়গায় গেলে পুরোনো চেনাশুনো অনেক গাছ দেখতে পাওয়া যায় না। তাছাড়া ইদানীং কেমন যেন বাণিজ্যিক-বাণিজ্যিক ভাব। ছুটির দিনে বাস ভরতি লোকজন আসে, তারা মাইকে তারস্বরে হিন্দি গান বাজায়, পিকনিক করে, কয়েকটা পোষা হরিণ দেখার পর তারা রেডিমেড বাঘ কিংবা হাতি না পেয়ে অতিশয় বিরক্ত হয়।

উত্তরবঙ্গ সুগম হয় ফরাক্কায় সেতু তৈরি হওয়ার পর। তার কিছু আগে আমি উত্তরবঙ্গে প্রথম যাই চা-বাগানের সূত্রে। লঙ্কাপাড়া টি এস্টেটটি একেবারে ভুটান সীমান্তে, খাড়া প্রাচীরের মতন পাহাড়ের গা থেকে নেমে এসেছে এক ঝটিকার মতন নদী, স্থানীয় নাম পাগলিনী। চা-বাগান সংলগ্ন প্রচুর জমিতে জলা-জঙ্গল হয়ে আছে। মধেশিয়া বস্তির পাশ দিয়ে মাঝরাতে চলে যায় হাতির পাল। ভুটান পাহাড় থেকে শুধু পাগলা ঝোরা বা হাতির পালই আসে না, নেমে আসে কাজের খোঁজে গরিব নেপালিরা। তারা চা-বাগানের কিনারায় কিংবা সরকারি খাস জমিতে ঝোপড়ি বানিয়ে কোনওরকমে মাথা গুঁজে থাকে। জঙ্গলের কাঠ-পাতার ওপর জীবিকা নির্বাহ করে। জ্যোৎস্না রাত্রে বারান্দায় বসে দূরের সেই নেপালি বস্তিগুলির দিকে আঙুল দেখিয়ে সেই চা-বাগানের ম্যানেজার বলেছিলেন, দেখবেন, এদিকে নেপালিদের সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, শিগগিরই একদিন ওরা নেপালিস্থান দাবি করবে।

চা-বাগানে বছরের পর বছর চাকরি করতে কেমন লাগে তা আমি জানি না, তবে দিন সাতেকের জন্য বেড়াতে যাওয়ার জন্য এমন আদর্শ স্থান আর হয় না। চা-গাছের উচ্চতা একবুক, মাঝে-মাঝে থাকে লম্বা-লম্বা শেড ট্রি। এই কাননে দু-বেলা ভ্রমণ করলে চোখ ও মস্তিষ্কের বড়

আরাম হয়। আমি তিন-চারটি চা-বাগানে কয়েকবার গেছি, এখনও সুযোগ পেলেই যেতে ইচ্ছে করে।

প্রথম প্রথম গিয়ে পুরো উত্তর বাংলাটাই অরণ্যময় মনে হত। জলদাপাড়া, গোরুমারা ইত্যাদি নাম করা জঙ্গল তো আছেই, তা ছাড়াও আরও কত জঙ্গল। এ যেন বাংলার এক নতুন রূপ। কলকাতা-কেন্দ্রিক সমতলের বাঙালিরা এই রূপটা খুব কম জানে। বাংলা সাহিত্যেও এইসব জঙ্গল নিয়ে তো প্রায় কিছুই লেখা হয়নি। বিভূতিভূষণও বাংলার অরণ্য নিয়ে কিছু লেখেননি। জিম করবেট উত্তরবঙ্গ কিংবা সুন্দরবনে আসেননি, বিহার পর্যন্ত এসে ফিরে গেছেন। তাই তাঁর অনবদ্য শিকার-কাহিনীগুলিতে বাংলার কোনও স্থান নেই।

আমি একবার বাসে চেপে মাদারিহাট যাচ্ছি, হঠাৎ বাসটা থেমে গেল। কেন? না, সামনেই তিনটি বুনো হাতি রাস্তা পার হচ্ছে। ওখানে এমন প্রায়ই হয়। আর একবার গিয়েছিলাম জয়ন্তী নামে একটি ছোট্ট জায়গায়, আলিপুরদুয়ার থেকে ছোট ট্রেন। মাঝখানে একটি স্টেশনের নাম রাজা-ভাত-খাওয়া। একজন সহযাত্রী বললেন, মাঝেমাঝে হাতির উপদ্রবে এখানকার স্টেশনমাস্টার ও অন্যান্যরা সন্ধের পরই পালিয়ে যায়। ট্রেন লাইনটি শেষ হয়ে গেছে জয়ন্তী-তে এসে। আমরা সাধারণত জানি যে ট্রেন লাইন একটা বড় স্টেশনে শুরু হয়ে দূরের আর একটা কোনও বড় স্টেশনে শেষ হয়। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন লাইন যে ফুরিয়ে যায়, তা আগে ধারণা ছিল না। স্টেশনটির অদূরে একটি পায়ে হেঁটে পার হওয়ার মতন ঝরনা, তার ওদিকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে কিছু দূর এগোতেই দুম-দুম করে শব্দ পাওয়া গেল। গুলির নয়, বোমার। আমার সঙ্গী আমার হাত চেপে ধরে বললেন, আর এগোনো ঠিক হবে না, হাতির পাল বেরিয়েছে।

জানলুম যে বক্সাইট না ডালোমাইট কী যেন আনতে ওই জঙ্গলের মধ্যে লরি ঢোকে। সামনে বুনো হাতির পাল এসে গেলে পটকা ফাটিয়ে তাদের ভয় দেখানো হয়। সেখানে তখন প্রচুর হাতি। প্রমথেশ বড়ুয়ার ভাই প্রকৃতীশ বড়ুয়া ওরফে লালজি, যিনি হাতি বিক্রির ব্যাবসা করেন, তিনি বাচ্চা হাতি ধরার জন্য কাছেই ক্যাম্প করে আছেন। আমি ভাবলুম, বাঙালির জীবনে যদি হাতির এতখানি ভূমিকা থাকে, তাহলে হাতি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি কেন? প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি পোষা হাতির গল্প ছাড়া আর তো উল্লেখযোগ্য কিছু মনে পড়ে না।

জয়ন্তীর কথা আর একটি কারণে মনে আছে। ওখানেই আমি প্রথম তক্ষক দেখি। ছেলেবেলা থেকে তক্ষকের ডাক শুনে আসছি। কিন্তু এই প্রাণীটি বড়ই গোপন সঞ্চারী, সহজে দেখা যায় না।

এখন উত্তর বাংলায় গেলে মনটা হু-হু করে। কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা ভাব। সেই নিবিড় লতাগুল্মময় বনরাজি কোন চুলোর গর্ভে হারিয়ে যাচ্ছে? কুচবিহার থেকে একবার চিলাপাতার জঙ্গলে গিয়ে যে প্রগাঢ় বাঙ্ময় নিস্তব্ধতা অনুভব করেছিলাম বহুক্ষণ ধরে। কয়েক বছর পরে সেখানে ফিরে গিয়ে তা কিছুই পেলাম না। শোনা গেল শুধু কাঠ কাটার একটা বিশ্রী শব্দ।

বাঁকুড়া-মেদিনীপুরেও এখানে সেখানে ছড়ানো অনেক জঙ্গল দেখেছি। এখন কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে জঙ্গল বাঁচাবার চেষ্টা হচ্ছে। কিছুদিন আগে একবার মুকুটমণিপুর থেকে যাচ্ছিলাম ঝিলিমিলির দিকে। পথের দুপাশে দেখি সার বেঁধে অগণন নারী-পুরুষ আসছে। তাদের প্রত্যেকের মাথায় কাঠের বোঝা। তারা জঙ্গল খালি করে আসছে। বাধা দেওয়ার কেউ নেই। প্রথমে খুব রাগ হয়েছিল, মনে-মনে আমিও জার্মানির গ্রিন ক্লাবের সদস্য। কোথাও কারুকে গাছ কাটাতে দেখলেই ক্ষুব্ধ হই। কিন্তু পরে মনে হল, এরা গাছ কাটছে বাধ্য হয়ে। জঙ্গলের কাঠ এনে বিক্রি করাই এই জীর্ণ-শীর্ণ মানুষগুলির বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন, এদের ওপর রাগ করা যায় না। অদূরদর্শী সরকার তো এদের জীবিকা কিংবা জ্বালানির কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করেনি।

একবার কারুকে কিছু না জিগ্যেস করে আন্দামান যাওয়ার জন্য একখানা জাহাজের টিকিট কেটে ফেলেছিলুম। সেখান থেকে কোনও নেমন্তন্ন পাইনি। সেখানকার কারুকেই চিনি না। শুভার্থীরা

জিগ্যেস করেছিল, হঠাৎ একা একা আন্দামান যাবে কেন? এর উত্তরে এভারেস্ট প্রসঙ্গে যে বিখ্যাত উক্তি আছে, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার', সেটি বলতে ইচ্ছে করে। যদিও এভারেস্টের সঙ্গে আন্দামানের কোনও তুলনাই চলে না। তবু বাঙালির ছেলে আন্দামান দেখব না কেন? জাহাজে আন্দামানের ভাড়াও এমন কিছু বেশি নয়, দিল্লি-বম্বে যেতে পারলে আন্দামান না যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে? যারা কাশ্মীর কিংবা গোয়া বেড়াতে যায়, তারা আন্দামানের কথা চিন্তাও করে না। তাহারা কী হারাইতেছে তাহা তাহারা জানে না।

অবিভক্ত বাংলায় কত বিরাট সমুদ্র-উপকূল ছিল। তবু বাঙালি জাতি সমুদ্রবিমুখ, একমাত্র সিলেটের খালাসিরাই যা সমুদ্র চিনেছে। পশ্চিমে বাংলাতেই সমুদ্র তটরেখা কম নেই। তবু বাঙালিরা সমুদ্র দর্শনে ছুটে যায় পুরীতে। এখন দীঘা আর বকখালি টিমটিম করছে। তাও যারা সেখানে যায় তারা অনেকেই জলে নামে না। সমুদ্রভ্রমণ তো দূরের কথা আর আন্দামান তো কালাপানির দূরত্বে।

বঙ্গোপসাগরের জল কিন্তু কালো নয় মোটেই, গাঢ় নীল। এমনই নীল যে মনে হয় রয়াল ব্লু কালির মতন, কলম ডোবালেই লেখা যাবে। জাহাজে যেতে চারদিন লাগার কথা, আমার বেলায় লাগল পাঁচদিন। একদিনের প্রবল ঝড়ে জাহাজ এক জায়গায় ঠায় থেমে রইল। আমারও বেশ বিনা পয়সার মধ্য সমুদ্রে সাইক্লোন দেখার অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের 'কর্তা কাপ্তেন কইছে ছাইক্লোন হতি পারে,' এই লাইনটা মনে পড়ছিল বারবা। কিন্তু ভয় হয়নি। জাহাজডুবির ঘটনা পৃথিবীতে এখন অতি বিরল। সেই ঝড় থামার পর ঝাঁকের পর ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ দেখেছিলাম।

আন্দামানের সৌন্দর্য শ্বাসরুদ্ধকর যাকে বলে। গ্রিসের দ্বীপপুঞ্জ। কিংবা ইটালির ক্যাপরির তুলনায় আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ কোনও অংশে ন্যূন নয়। আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি এখানকার অরণ্য দেখে। আন্দামানের জঙ্গল সম্পর্কে আমার আগে কোনও আন্দাজ ছিল না। আসামের জঙ্গল দেখে আমার যে অনুভূতি হয়েছিল, তা বদলে যায় আন্দামানে এসে। মনুষ্যবর্জিত এক একটি দ্বীপের ঘন, দুর্ভেদ্য বন দেখে মনে হয়, এই বনই সত্যিকারের আদিম ও অস্পৃষ্ট! এইসব বন দেখে আরও রোমাঞ্চ লাগে, কারণ অধিকাংশ গাছই চিনি না। জলের কাছাকাছি ম্যানগ্রোভ-এর ঝাড় চিনতে পারি। কিন্তু একটু গভীরে যে-সব বিশাল বিশাল মহিরুহ, সেগুলি আমার অদৃষ্টপূর্ব। পাহাড়ি-পাইন ছাড়া এত লম্বা গাছও আমি আগে দেখিনি।

নিকোবর বাদ দিয়ে শুধু আন্দামানেই দ্বীপের সংখ্যা দুশোর বেশি। সুপেয় জলের অভাবে অধিকাংশ দ্বীপেই মানুষের বসতি নেই। কিন্তু আকাশের জলে বৃক্ষসংসার জমজমাট।

একটি-দুটি দ্বীপে নেমেছি একপ্রকার গা ছমছমানি নিয়ে। পরিষ্কার বালিতে নানা রকম নুড়ি, ঝিনুক ছড়ানো, যা সবই সংগ্রহযোগ্য মনে হয়। পাশের জঙ্গল দিনের বেলাতেই অন্ধকার, বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দেই ভয় লাগে। যদিও এইসব জঙ্গলে বাঘ-ভাল্লুক নেই, বিষাক্ত সাপও নেই, কিন্তু জারোয়া নামে নিবাবরণ, অরণ্যচারী আদিবাসীদের সম্পর্কে অনেক রোমহর্ষক কাহিনি শোনা আছে। যারা সভ্য মানুষদের ঘোরতর অপছন্দ করে। আমি নিজেকে তেমন সভ্য মনে করি না। কিন্তু জারোয়ারা তা বুঝবে কী করে। আমার জামা-কাপড় দেখেই যদি তারা বিষাক্ত তীর মেরে দেয়?

নৌকোয় বা লঞ্চে বসেই এইসব দ্বীপ-জঙ্গলের শোভা দেখা নিরাপদ। অন্তত এই রকমই অবস্থা ছিল, আমি যখন যাই সেই সময়ে।

একদিন পোর্ট ব্লেয়ার থেকে লঞ্চ নিয়ে রঙ্গত নামে একটা দ্বীপে গিয়েছিলাম। সকালবেলা যাত্রা করে পৌঁছেছিলাম প্রায় সন্ধের সময়, সারাদিন ঠায় দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছে লঞ্চের ওপরে খোলা ডেকে। আন্দামানে যখন তখন বৃষ্টি আবার তার পরের মুহূর্তেই খটখটে রোদ। সুতরাং আমি পর্যায়ক্রমে বৃষ্টিতে ভিজেছি ও রোদে পুড়েছি।

এই রকম কষ্টকর জার্নির মধ্যেও চোখ জুড়িয়েছে দু'ধারের দৃশ্য। সমুদ্র সেখানে মরুভূমির মতন ধু-ধু নয়, একটু দূরে-দূরেই ছোট-বড় দ্বীপ। কোনও দ্বীপই নগ্ন নয়, গাছপালায় ঠাসা। মনে

হয় যেন প্রকৃতির কুমারী উদ্যান। একসঙ্গে এত নীল ও সবুজ রং আর কখনও দেখিনি।

রঙ্গত দ্বীপটি বেশ বড়, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বাস চলাচল করে। অন্য প্রান্তের জাহাজঘাটার নামটি বড় সুন্দর, মায়া বন্দর। প্রগাঢ় বনানীর মধ্য দিয়ে একটিই মাত্র পথ। আমি কেন যেন মাঝপথে নেমে পড়েছিলাম। মাঝে-মাঝে জঙ্গল সাফ করে উদ্বাস্তুদের বসতি, ধান জমি। ইস্কুল। আমি যেখানে নেমেছি, সেখানেও দু-চারখানা ঘরবাড়ি রয়েছে, পোষা কুকুরের ডাক শোনা যায়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেলাভূমিতে পৌঁছে এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলাম। চার পা বাঁধা অবস্থায় একটা বিশাল হরিণ পড়ে আছে সেখানে। তখনও জীবন্ত। হরিণটির নীচের পায়ের দিকটা ডুবে গেছে জলে। শরীরের অর্ধেকটা বালির ওপর। জোয়ারের জল একটু-একটু করে বাড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমুদ্র ওপরে উঠে এসে হরিণটাকে গ্রাস করবে। আমাকে দেখতে পেয়ে হরিণটির দু-চোখের তারা কেঁপে উঠল।

আন্দামানের কোনো কোনও বনে হরিণের সংখ্যা অজস্র। মূল ভূখণ্ড থেকেই কিছু হরিণ নিয়ে এক সময় ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বাঘ নেই বলে হরিণদের দ্রুত বংশবৃদ্ধি হয়েছে। পোর্টব্লেয়ারে তখন হরিণের চামড়ার দাম তিন-চার টাকা, মাংসের কিলোর দামও ওইরকম। অন্যান্য দ্বীপে পয়সা দিয়ে কেউ হরিণের মাংস কেনে না। যেখানে উদ্বাস্তুরা চাষবাস করছে, সেখানে হরিণের পাল এসে ফসল নষ্ট করে। হরিণ একটা উপদ্রব। কোনও এক সময় কেউ একটা হরিণ মারলে সরকার থেকে একটাকা করে বকশিশ দেওয়া হত।

তবু হাত-পা বেঁধে একটি জীবন্ত হরিণকে জলে ফেলে দেওয়া হবে। এ দৃশ্য আমার কাছে অসহ্য বোধ হয়। আমি ছুটে গিয়ে একটি বাড়িতে ডাকাডাকি করে এক ভদ্রলোককে ঘটনাটি জানালুম। ভদ্রলোক আমার চাঞ্চল্য দেখেও গা করলেন না। বললেন, ওই হরিণগুলো মহা হারামজাদা!

আমি আবার ফিরে এলুম বেলাভূমিতে। হরিণটির চোখের ভাষার মিনতি অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি চেষ্টা করলুম ওর সামনের পায়ের বাঁধন খুলে দিতে। কিন্তু কাজটা মোটেই সোজা নয়। আমার কাছে—ছুরি-টুরি কিছুই ছিল না। হরিণটির মাথায় বড় বড় ডালপালার মতন ছড়ানো, ধারালো শিং, আমি কাছে যেতেই হরিণটি আরও ভয় পেয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। সে আমাকে উদ্ধারকারী হিসেবে চিনতে পারছে না। আর একজন আততায়ী ভাবছে। আমার চেষ্টা ব্যর্থ হল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ তাকে গ্রাস করে নিয়ে গেল। আমার জীবনে সেটি একটি অবিস্মরণীয় মৃত্যুদৃশ্য।

ওই রঙ্গত দ্বীপের জঙ্গলেই একদিন আচমকা গোটা তিনেক হাতি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম। সে হাতিগুলো অবশ্য ঠিক বুনো হাতিও নয়, পোষাও নয়। মাঝামাঝি। এক সময় কোনও একজন কাঠ-ব্যবসায়ী বড়-বড় কাঠের গুঁড়ি বহন করবার জন্য মূল ভূখণ্ড থেকে অনেকগুলি হাতি নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে তাঁর ব্যাবসা ফেল করলে তিনি আর হাতিগুলো ফিরিয়ে আনার ঝামেলা নিতে চাননি। সেগুলোকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন। দু-এক পুরুষের মধ্যেই যে তারা আবার পুরোপুরি বুনো হাতি হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী!

আন্দামান ভ্রমণের দু-তিন বছর পর আমি প্রথম সুন্দরবনে বেড়াতে যাই। কলকাতার সবচেয়ে কাছে যে জঙ্গল সেখানে যেতে আমার এত দেরি হল। পরিচিত একজনের সূত্রে একজন যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। যে চাকরিবাকরি ছেড়ে সুন্দরবনে চাষবাসের কাজ আত্মনিয়োগ করেছে। অবশ্য আগে থেকেই সাতজেলিয়া গ্রামে তাদের পারিবারিক জমি ও একটি বাড়ি ছিল। হ্যামিলটন সাহেবের কাছারি বাড়ি ছিল এই সাতজেলিয়ায়। সেখানে সেই আমলেই দু-একটি পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। সাতজেলিয়ার আস্তানা গেড়ে সেখান থেকে নৌকো ভাড়া করে শুরু হয় সুন্দরবন পরিভ্রমণ।

সুন্দরবন এমনই একটি জঙ্গল, যেখানে পায়ে হেঁটে ঘোরার কোনও উপায়ই নেই। কাঠুরে ও মধু সন্ধানীরা বাধ্য হয়েই পায়ে হেঁটে জঙ্গলে ঢোকে বটে, তাদের দল থেকে একজন দুজন প্রায়ই

ফেরে না। বাইরের লোকরা এভাবে জঙ্গলে ঢোকার অনুমতিই পাবে না। লঞ্চে চেপে নদীর দুধারের জঙ্গল দেখা আর সিনেমার জঙ্গল দেখা প্রায় একই রকম। সুন্দরবনের জল-জঙ্গলের সঙ্গে যতটা সম্ভব নিবিড় পরিচয় নৌকোতেই হয়, তাতে রোমাঞ্চ আছে। সেই প্রথমবারেই নৌকো নিয়ে ঘুরতে-ঘুরতে গভীর রাতে আমরা রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। রাস্তা মানে, নদীপথ। জঙ্গলের মধ্যে-মধ্যে অসংখ্য নদী আর খাঁড়ি। কিছুতেই আর ফিরে আসার পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে শুনেছিলাম, বাঘের মুখে না পড়লেও ডাকাতের পাল্লায় যে পড়িনি তা আমাদের সাত পুরুষের ভাগ্য। ওখানকার ডাকাতরা নৌকোটা তো নেয়ই, তা ছাড়া জামাকাপড় পর্যন্ত খুলে নিয়ে উলঙ্গ নৌকো-যাত্রীদের জঙ্গলের কিনারে নামিয়ে নিয়তির হাতে ছেড়ে দেয়।

সাতজেলিয়ার একটু আগে রাঙাবেলিয়া মোটামুটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, সেখানে পরিচয় হয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং ওই অঞ্চলে টেগোর প্রজেক্টের কর্ণধার তুষার কাঞ্জিলালের সঙ্গে। ফলে সুন্দরবনে আমার আস্তানার সংখ্যা বাড়তে থাকে। এরপর আমি নানা দিক দিয়ে সুন্দরবন গেছি, কিছুতেই সুন্দরবনের আকর্ষণ পুরোনো হয় না।

আমি কোনওবারই সুন্দরবনে বাঘ দেখিনি, দেখতেও চাই না। জংলী জানোয়ার দেখার একটা উদগ্র বাসনা নিয়ে আমি কখনও জঙ্গলে যাইনি, এমনি যে-কোনও জঙ্গলে গেলেই শরীরে একরকম মাদকতা বোধ হয়। তা সে যত ছোট জঙ্গলই হোক। তা ছাড়া একবার আমি একটি জঙ্গলে গিয়ে এত জন্তু-জানোয়ার দেখেছি যে পেট ভরে গেছে। সারা জীবনে আর না দেখলেও চলবে। হয়তো শুনলে এখানে অনেকের কাছেই অবিশ্বাস্য মনে হবে যে আমি একসঙ্গে অন্তত পাঁচ সাত শো হরিণের ঝাঁক দেখেছি। খোলা আকাশের নীচে দশ ফুট দুরত্ব থেকে দেখেছি দশ-বারোটি সিংহ, দুটি লেপার্ড দু'দিক থেকে তাড়া করে হরিণ ধরছে এই দৃশ্য দেখেছি অনেকক্ষণ ধরে। হাতির পাল গণ্ডার ও জিরাফ বহু। এমনকী রাত্তিরে আমার তাঁবুর পাশে ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনে জেব্রার পাল ভেবে উঁকি মেরে দেখি দুটি প্রকাণ্ড জলহস্তী। এসব সিনেমার দৃশ্য নয়। কল্পনাও নয়, এই সবই আমি দেখেছি কেনিয়ার মাসাইমারা অরণ্যে। এক সময় আমার মনে হয়েছিল, উঃ যথেষ্ট হয়েছে, আর জন্তু-জানোয়ার দেখতে চাই না! তবে সেখানে অরণ্য বিশেষ ছিল না। এখানে আমি বিদেশের অরণ্যের প্রসঙ্গ আনছিও না।

সুন্দরবনে বাঘের চেয়েও অনেক বিপজ্জনক হচ্ছে সাপ। শীতকালের দুমাস ছাড়া সুন্দরবনে সাপের ভয় সব সময়। যতবারই সাপ দেখি, বুক কেঁপে ওঠে,—বোধহয় সামনাসামনি কোনও নরখাদককে দেখলেও এত ভয় পাব না। একবার সুন্দরবনে একটি খামার বাড়িতে বসে সন্ধেবেলা গল্পগুজব করছি, হঠাৎ একটু দূরে ধানখেতে কীসের যেন একটা গোলমাল হল। আমরা দৌড়ে গেলুম। একটি জোয়ান ছেলে আগাছা নিড়োচ্ছিল। হঠাৎ তাকে সাপে কামড়েছে। ছেলেটি অত্যন্ত তেজি। তার ধারণা সাপটা ঠিক বিষ ঢালতে পারেনি, সে বাপ-মা তুলে গালগাল দিতে দিতে হাতের কাস্তেটা দিয়ে সাপটাকে কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলল, তারপর হাসতে হাসতে বাড়ি চলে গেল।

পরদিন দুপুরে আমরা নৌকো নিয়ে জঙ্গল দেখতে বেরিয়েছি, রায়মঙ্গল নদী দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম ভেসে আসছে একটি কলার মান্দাস। তাতে মশারি টানানো, ফুলের মালা দিয়ে সাজানো, সামনে নাম-ঠিকানা লেখা কাগজ আঁটা, মশারির মধ্যে সেই ছেলেটির শরীর, গতকাল সন্ধেবেলা যাকে জলজ্যান্ত দেখেছিলুম।

তখনই মনে মনে শপথ করেছিলুম, আর কোনওবার গ্রীষ্মকালে সুন্দরবনে যাব না। সে শপথ রক্ষা করা যায়নি, আরও কয়েকবার গেছি। সুন্দর রহস্যময় ওই অরণ্যের যেন একটা নিজস্ব ডাক আছে।

'দা সিক্রেট লাইফ অফ প্ল্যান্টস' বইটি পড়ার পর আমি ভুল করেও কক্ষনো গাছের একটা পাতা ছিঁড়ি না। গাছ যে মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়, তা সত্যি সত্যি অনুভব করি এখন।

গাছ মাধ্যাকর্ষণকে অগ্রাহ্য করে যত খুশি মাথা উঁচু করে, গভীর বনে কোনও অতিকায় শিমুল গাছ দেখলে মনে হয়, এই গাছের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখন জঙ্গলে গেলে যে-কোনও সুযোগেই কোনো গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসি, মুনি-ঋষিদের মতন তপস্যা করি না বটে তবু কিছুক্ষণ চুপ থাকলেই মাথার মধ্যে শান্তি পাই।

বহু অরণ্যে ঘুরেছি, এখনও না দেখা রয়ে গেছে কত বনভূমি। জঙ্গলে গিয়ে কখনও সেরকম বিপদে পড়িনি, বরং অনেক বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছি। এখন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে গাছেরাই নিঃশব্দ বার্তা পাঠিয়ে বাঁচিয়েছে।

একটা মজার ঘটনা দিয়ে শেষ করি। কয়েক বছর আগে আমাদের এক বন্ধু ও বৃক্ষলতাগুল্মতাত্ত্বিক শম্ভুলাল বসাক-এর সঙ্গে মধ্যপ্রদেশের বস্তার জেলার জঙ্গলে ঘুরছিলাম আমি, শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সমীর সেনগুপ্ত। নারায়ণপুর শহর থেকে একদিন একটা ভাড়া করা জিপে আমরা রওনা হলুম অবুঝমারের দিকে। কেন যে আমরা অবুঝমারের দিকে যাচ্ছি, তার কোনও কারণ নেই। অনেক জঙ্গল এর মধ্যেই ঘোরা হয়েছে। তবু আর একটি জঙ্গল যাওয়া।

রাস্তাটি এত খারাপ যে কহতব্য নয়। কোথাও কোথাও রাস্তাই নেই। মস্ত বড় বড় খাদ। কোথাও হাঁটু-গভীর নদী, তবু আমরা চলেছি অবুঝমারের দিকে। দুপাশে নিশ্ছিদ্র জঙ্গল, তাতে রয়েছে অনেক বাঁশঝাড়, আমলকি গাছ, তেজপাতা ও লবঙ্গ গাছ। আরও বহু নাম না জানা গাছ। এমন কিছু কিছু ফুল, যা শম্ভুলালও চেনে না। কিছুক্ষণ পরে জিপটি গোলমাল করতে লাগল। তাতে জিপটিকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না, রাস্তার অবস্থার জন্য তার একটুআধটু বিদ্রোহ জানানো স্বাভাবিক। ড্রাইভারের ওপর জিপটিকে দুরস্ত করার ভার দিয়ে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরতে লাগলুম জঙ্গলের মধ্যে, প্রচুর আমলকি পাড়া হল, হাসির আওয়াজে বন কাঁপানো হল। তখনও আমরা ভাবতেই পারিনি যে জিপগাড়ির ড্রাইভারটি এক অতি আনাড়ি মেকানিক। সে সমস্ত যন্ত্রপাতি খুলে ফেলে কিছুই আর ঠিকমতন লাগাতে পারছে না। জিপটি আগে যদি বা একটু আধটু চলছিল, এখন একেবারে অনড়, ইঞ্জিনও কোনও শব্দ করে না।

জঙ্গলের মধ্যে বিকেল হতে না হতেই এক রকমের গাঢ় ছায়া নেমে আসে। অপ্সরাদের তখন ঝরনার জলে স্নান করার জন্য নেমে আসার সময়। তখন আমাদের খেয়াল হল ফিরব কী করে? যেখানে আমরা গাড়িভ্রষ্ট হয়েছি, সেখান থেকে অবুঝমার কুড়ি-বাইশ মাইল, নারায়ণপুরও সেই রকম দূরত্ব, মাঝখানে আর কোনও জনবসতি নেই। প্রথমে আমরা হেঁটেই ফিরে যাব বলে বেশ মনের জোর নিয়ে হাঁটতে শুরু করলুম। এই পথে আমরা আর কোনও গাড়ি দেখিনি। তবে পায়ে হাঁটা মানুষ কিছু দেখেছি। এরা সকালবেলা অবুঝমার থেকে রওনা দিয়েছে। সন্ধেবেলা নারায়ণপুরে পৌঁছবে, পরদিন হাটে যাবে। কিন্তু ওদের মতন কি আমরা হাঁটতে পারি? পাহাড়ি চড়াই-উতরাই রাস্তা। ঘণ্টাখানেক বীরদর্পে হাঁটার পর দেখা গেল আমরা আড়াই-তিন মাইলের বেশি যেতে পারিনি। এই গতিতে চললে আমাদের অন্তত সাত-আট ঘণ্টা লাগবে পৌঁছতে। তা-ও যদি একটানা সাত আট ঘন্টা হাঁটার সামর্থ্য থাকে। বোঝা গেল, সেটা অসম্ভব। রাত্তিরটা জঙ্গলেই কাটাতে হবে।

ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসছে। তখন খেয়াল হল, এই জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার-টানোয়ার নেই তো? শক্তি একজন পথচারীকে জিগ্যেস করল। ভাই, এই জঙ্গলে বাঘ-টাঘ নেই তো? লোকটি খুব অবাক হয়ে উত্তর দিল, জঙ্গলে বাঘ থাকবে না তো কি শহরে থাকবে?

আমরা কাছাকাছি গোল হয়ে বসলুম। মাঝখানে জ্বাললুম আগুন। সঙ্গে অস্ত্র কিছু নেই, খাবারদাবারও নেই। কেন যেন আমরা ভেবে রেখেছিলুম, অবুঝমারে পৌঁছে আমরা সবকিছু পেয়ে যাব। এখন আমাদের সারারাত পেটে কিল মেরে জেগে থাকতে হবে। অন্ধকারের মধ্যে জোনাকি দেখলেও মনে হচ্ছে বাঘের চোখ। আবার জোনাকি বলে উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। সত্যিই তো

সে জঙ্গলে বাঘ আছে এবং ওদিককার ভাল্লুকগুলোও বড্ড হিংস্র। ব্যাপারটা বড্ড গল্প গল্প অথচ সত্যি আমাদের জীবনে ঘটছে, এখনও যেন ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না।

হাটের যাত্রীদের একজনের হাতে আমরা আমাদের বিপদের কথা জানিয়ে নারায়ণপুরের এস ডি ও কে একটি চিঠি দিয়ে দিয়েছি। সেই লোকটি চিঠিটা দেবে কি না। কিংবা কখন দেবে, কিংবা এস ডি ও অন্য জায়গায় ট্যুরে গেছেন কি না। কিংবা আমাদের চিঠি পেলেও তিনি গুরুত্ব দেবেন কি না, এরকম অনেকগুলো অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। সুতরাং এক্ষেত্রে বিপদের ব্যাপারটা একেবারে তুচ্ছ করে সারারাত হাসি ঠাট্টা করে কাটাই ঠিক কাজ। কিন্তু তেমনভাবে হাসা যাচ্ছে না। বিপদের ঝুঁকিটা বড়ই বেশি। আকাশে জ্যোৎস্না নেই, জঙ্গল একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। একটা পাতা খসে পড়ার আওয়াজও ভয়ঙ্কর মনে হয়।

খানিকবাদে পেলাম একটা যান্ত্রিক আওয়াজ, এবং গাড়ির আলো। সারাদিন সে রাস্তায় আমরা আমাদের জিপ ছাড়া দ্বিতীয় গাড়ি দেখিনি, এই গাড়িটার আলোও আসছে রাস্তা দিয়ে নয়। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। আমরা হই হই করে উঠে দাঁড়ালুম। সেটা একটা বাঁশ বোঝাই ট্রাক, জঙ্গলের মধ্যে একটা পাহাড়ের চূড়ায় প্রচুর বাঁশঝাড় আছে। এই ট্রাকটি সেই বাঁশ আনতে যায় দিনে একবার। আমাদের দ্বিতীয়বার অনুরোধ করতে হল না, ট্রাক ড্রাইভারটি আমাদের তুলে নিল। যে-রাস্তায় জিপ চালানোই শক্ত, সে রাস্তায় অতবড় একটা ভারী ট্রাক চালানো যে কত বিপজ্জনক তা বলে বোঝাতে হবে না। আমরা ড্রাইভার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখানে প্রত্যেক দিন ট্রাক নিয়ে আসেন, ফিরে যান কী করে? ড্রাইভার দার্শনিকের গলায় উত্তর দিল, মানুষ পয়সা রোজগারের জন্য কত কী-ই তো করে!

মাঝরাস্তায় আমরা আর একটা জিপের দেখা পেলুম, সেটি এস ডি ও পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের উদ্ধারের জন্য প্রচুর বন্দোবস্ত। তবু নারায়ণপুরে ফিরে আসবার পর আমাদের মনে হল, সারারাত জঙ্গলে কাটালেই বোধহয় বেশ হত! এখনও আমরা দেখা হলেই আলোচনা করি। বাস্তারের ওই জঙ্গলে আবার ফিরে যেতে হবে, আগুন জ্বেলে একটা রাত কাটাতে হবে ওখানে।

জ্যোৎস্নায় সুবর্ণরেখার ধারে

একেকটা নদীকে আমরা নানান অঞ্চলে দেখি। সেসব জায়গায় নদীর পটভূমিকা বদলে বদলে যায়।

এমন বেশকিছু মানুষ আছেন, যাঁরা গঙ্গা নদীকে দেখেছেন একেবারে উৎসে, গোমুখ-গঙ্গোত্রীতে, আবার একেবারে গঙ্গাসাগর মোহনায়। আমার অবশ্য হিমালয়ের সেই উৎসমুখে গঙ্গাকে এখনও দেখা হয়নি, প্রথম দর্শন হৃষীকেশ-হরিদ্বারে। মাঝখানে কালী বা ভাগলপুরে কিংবা রাজমহলেও দেখেছি বেশ কয়েকবার, মোহনায় মেলার সময় ছাড়াও অন্য ঋতুতে। যখন বিশেষ কেউ যায় না, তখনও একাধিকবার রাত্রিবাস করেছি।

সেইরকম সুবর্ণরেখা নদীটিও দেখেছি নানান বয়েসে, নানান অঞ্চলে। খুব চমৎকার-চমৎকার স্মৃতি আছে।

সুবর্ণরেখা নদীটি বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। এককালে অনেক গল্প-উপন্যাস লেখা হয়েছে ঘাটশিলার পটভূমিকায়। সেখানে ছিল প্রচুর বাঙালির নিবাস, আর ভ্রমণপিপাসু বাঙালিরাও

কাছাকাছির মধ্যে চলে যেতেন ঘাটশিলা, মধুপুর, গিরিডি ইত্যাদি অঞ্চলে। সুতরাং গল্প-উপন্যাসেও এইসব জায়গাগুলি এসে যেত। সুবর্ণরেখা নদী আমি ঘাটশিলায় দেখেছি নানা ঋতুতে। নামটি যেমন সুন্দর, একমাত্র বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় নদীটি কিন্তু তেমন সুদৃশ্য নয়। জল কমে গিয়ে বড়-বড় পাথর জেগে ওঠে। অবশ্য তারও সৌন্দর্য আছে। কিন্তু তা সুবর্ণরেখা নামটির সঙ্গে মানায় না। বর্ষার সময়ই শুধু এই নদীর অন্য একটা রূপ খোলে। তখন মনে হয় এই নদীর তটরেখায় সত্যিই যেন ছড়িয়ে আছে স্বর্ণরেণু।

বাঙালিদের প্রিয় হলেও সুবর্ণরেখা ঠিক বাংলার নদী নয়। প্রধানত বিহার ও ওড়িশার। মেদিনীপুরের সীমান্তে সামান্য একটু ছুঁয়ে গেছে। সেখানেই আছে হাতিবাড়ির ডাকবাংলো। সেখানকার কথা বলার আগে, জামশেদপুরের এক সন্ধ্যার অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে চিরকালীন হয়ে আছে।

জামশেদপুরের বাঙালিদের উদ্যোগে সেবারে একটি খুব বড় আকারের বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উৎসব হয়েছিল তিনদিন ধরে। অনেককাল আগের কথা, তবু বছরটি আমার মনে আছে দুটি কারণে। ১৯৬২ সাল, সেই বছরেই হিন্দি-চিনি ভাই ভাই স্লোগানের এবং বিশ্বাসের ওপর একটা বড় আঘাত লেগেছিল, অকস্মাৎ শুরু হয়েছিল চিন-ভারত যুদ্ধ। তাতে অনেকেরই স্বপ্নভঙ্গ হয়। আর, সেই বছরেই ১ জুলাই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মারা যান। ওইদিনই তাঁর জন্মদিন। তখনই আমরা ছিলাম জামশেদপুরে।

এই উৎসবে কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন বহু কবি, লেখক, শিল্পী, নাট্যকার বুদ্ধিজীবী। বিরাট একটি দল। সেই সময় কলকাতায় এসেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ ও তাঁর সঙ্গী পিটার অরলভস্কি। অ্যালেনের সঙ্গে কলকাতার কফিহাউসে, গঙ্গার ঘাটে ও আরও অনেক জায়গায় আড্ডা দিতাম রোজই। আমরা জামশেদপুরে কয়েকদিনের জন্য যাচ্ছি শুনে অ্যালেন কৌতূহলী হয়েছিল। তখন আমি বলেছিলাম, 'তোমরা দুজনেও চলো আমাদের সঙ্গে। ওখানকার সেক্রেটারির সঙ্গে আমার চেনা আছে। তাকে বলে দেব!'

পরে বুঝেছিলাম। ওভাবে অ্যালেনকে নিয়ে যাওয়া আমার খুবই ভুল হয়েছিল। সে একজন বহু আলোচিত, একইসঙ্গে কুখ্যাত এবং সুখ্যাত কবি, তার 'হাউল' নামের কাব্যগ্রন্থ এক মাসে এক লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছে, তাকে কোনও সাহিত্যসভায় নিয়ে যেতে হলে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো উচিত। রবাহুত হয়ে উপস্থিত হওয়া তার পক্ষে একেবারেই মানায় না।

সেখানে অ্যালেন ও পিটারের প্রতি বেশ খারাপ ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বইছে উৎকট অতি বামপন্থী হাওয়া। যারা তথাকথিত 'প্রগতিশীল', তারা যে-কোনও আমেরিকানকেই মনে করে শত্রু, আর এখানকার কারুর যদি কোনও আমেরিকান বন্ধু থাকে, তবে সে সি আই এ-র চর। জামশেদপুরের উদ্যোক্তারা অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের কোনও কবিতা পড়েনি, তারা জানে না যে এই আমেরিকান কবি আমেরিকার রাষ্ট্রশক্তির ঘোর সমালোচক। সে একজন শ্বেতাঙ্গ এবং আমেরিকান, সেটাই যেন শুধু তার পরিচয় আর সেটাই তার অপরাধ।

অ্যালেন অবশ্য তার প্রতি দুর্ব্যবহারের কোনও প্রতিবাদ করেনি, মুখ বুজে সব সহ্য করেছে আমাদের কথা ভেবে। কিন্তু আমি অপরাধবোধে ভুগছিলাম এবং অন্য প্রসঙ্গে সম্মেলনের মধ্যে খুব রাগারাগি করেছিলাম মনে আছে। যাই হোক, সে প্রসঙ্গ থাক।

একটা গাড়ি জোগাড় করে আমরা কয়েকজন বেড়াতে গিয়েছিলাম এদিক ওদিক। একসময় আমরা এক জায়গায়, জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ দেখতে পেলাম সুবর্ণরেখা নদী। স্থানটি খুব নির্জন, আমাদের দলটি ছাড়া আর কেউ নেই। নদীর ওপারে তখন সূর্যাস্ত।

অসংখ্য সোনালি রশ্মি আকাশ থেকে নেমে এসে মিশেছে সেই নদীর তরঙ্গে। ধীরভাবে ডানা দুলিয়ে উড়ে যাচ্ছে বকের ঝাঁক। দৃশ্যটি অপ্রত্যাশিতভাবে সুন্দর।

একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর অ্যালেন আমাকে জিগ্যেস করল, 'নদীতে নামবে না?'

শুনে বেশ অবাক হলাম। সন্ধেবেলা জলে নামার কথা আমাদের মনে আসে না। সঙ্গে আলাদা জামাকাপড় আনিনি, মাথা মোছার জন্য তোয়ালে নেই।

সে কথা অ্যালেনকে জানাতেই সে বেশ সহজভাবে বলল, 'জামা-প্যান্ট এখানে খুলে রাখো।'

তার মানে কি উলঙ্গ হয়ে? আমাদের দলে রয়েছেন একজন রমণী। কবিতা সিংহ, তাঁর সামনে ওসব করা যায়? তা ছাড়া এখন জলে নামতেই বা হবে কেন?

আমাদের আপত্তির কথা জেনে অ্যালেন আর পিটারের চোখে-চোখে কিছু কথা হল। তারপর ওরা পায়েপায়ে এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

দুজনেরই পরনে সাধারণ প্যান্ট-শার্ট আর চটি। শুধু চটি খুলে ওরা নেমে গেল জলে। মাঝনদীতে গিয়ে সাঁতার কাটল কিছুক্ষণ। আমরা তীরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম।

খানিকবাদে দুজন ওপরে উঠে এল।

অ্যালেন বলল, 'চমৎকার নদী।' পিটার বলল, 'ভারী স্বচ্ছ আর হালকা জল।'

অ্যালেন বলল, 'ভারতীয় সভ্যতা আর আমাদের এটাই তফাত। তোমরা দূরে দাঁড়িয়ে, শুধু চোখ দিয়ে একটা নদীর শোভা উপভোগ করতে পারো। আর আমাদের জলে নেমে, সারা শরীর দিয়ে সেই নদীকে চিনতে হয়।'

সেই জবজবে ভিজে পোশাক নিয়েই ওরা ফেরার জন্য প্রস্তুত। আমরা ভাবছি, ওদের ঠান্ডা লেগে অসুখ করে যাবে। ওরা বলছে, কিচ্ছু হবে না।

কবিতা সিংহ তখন বললেন, 'আমি উলটো দিকে ফিরে দাঁড়াচ্ছি। তোমরা ওই ঝোপের আড়ালে গিয়ে জামা-প্যান্ট খুলে একবার অন্তত ভালো করে নিংড়ে নাও। প্লিজ।'

তাই-ই করল ওরা।

আবার ফিরে আসতেই কবিতা সিংহ নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে ওদের মাথা মুছিয়ে দিলেন।

অ্যালেন বলল, 'আমাদের দেশে এরকম কেউ দেয় না। এটাও ভারতীয় সভ্যতা!'

এবার হাতিবাড়ির কথা। হাতিবাড়ি ডাকবাংলোর কথা প্রথম আমাদের জানায় ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ মজুমদার।

এই ইন্দ্রনাথের সুবর্ণরেখা নদীর প্রতি এমনই প্রীতি যে নিজের বইয়ের দোকান ও প্রকাশনীর নামও দিয়েছে সুবর্ণরেখা। কলেজ স্ট্রিটে আর শান্তিনিকেতন, এই দু-জায়গায় আছে তার সুবর্ণরেখা দোকান।

দুর্লভ বই আর বিশিষ্ট ধরনের প্রকাশনা নিয়ে সারাজীবন কাটালেও ইন্দ্রনাথ আবার প্রচণ্ড খাদ্যরসিক। কোথায় কোন বিশেষ স্বাদের খাবার পাওয়া যায়, এসব তার নখদর্পণে। একবার ওড়িশার পুরী থেকে কোনারকে যাওয়ার পথে ইন্দ্রনাথ হঠাৎ মাঝপথে আমাদের তাড়া দিয়ে বলল, ' নেমে পড়ো, শিগগির নেমে পড়ো'—

'কেন?'

সেই অখ্যাত জায়গায় নাকি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ তেলেভাজা আলুর চপ পাওয়া যায়!

বালেশ্বরের একটা ছোট্ট হোটেলে যেমন কচি পাঁঠার ঝোল হয়, তার নাকি তুলনা নেই। তা চেখে দেখতে চলে গেছি বালেশ্বরে। এইরকম খাদ্য অভিযানে আমরা কয়েক বন্ধু ইন্দ্রনাথের সঙ্গে গেছি অনেক জায়গায়। যেমন গেছি বহু প্রাচীন দুর্লভ বইয়ের সন্ধানে।

ইন্দ্রনাথ একবার বলল, 'বাংলা ও ওড়িশার সীমান্তে হাতিবাড়ি নামে জায়গায় একটি বাংলো আছে, সে একেবারে অপূর্ব!' কেন সেই বাংলোবাড়ির অপূর্বত্ব? সুবর্ণরেখা নদীর ধারে অতি নির্জন পরিবেশ, কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম তেমন বেশি নয়। আসল কারণ ওখানে সুবর্ণরেখা নদীতে বড় বড় চিতলমাছ পাওয়া যায় এবং বাংলোর কুক চিতলমাছ এমন রান্না করে, তার আর জবাব নেই।

হাইওয়ে দিয়ে গিয়ে ঝাড়গ্রামের রাস্তাটা পাশ কাটিয়ে কিছুক্ষণ যাওয়ার পর বাঁদিকে ওড়িশার দিকে বেঁকলে পৌঁছনো যায় হাতিবাড়ি।

বাংলোটি তখন নতুন তৈরি হচ্ছে। কিছু-কিছু কাজ বাকি আছে। মিস্ত্রিরা খাটছে। আশপাশে আর কোনও বাড়ি নেই এবং সত্যিই খুব কাছে সুবর্ণরেখা নদী। বড়-বড় পাথরের খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নদীতে বেশ জল আছে। এই নদীতে বড় মাছ থাকা অসম্ভব কিছু নয়।

অল্প বয়েস থেকেই আমার বিভিন্ন বাংলোতে ঘোরাঘুরির নেশা। অনেকে যেমন স্ট্যাম্প জমায়, আমি তেমনই ডাকবাংলোর অভিজ্ঞতা জমিয়েছি। প্রত্যেকটি বাংলোরই অবস্থান ও ব্যবহারের কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। আবার কিছু কিছু বাংলোতে বারবার আসতে ইচ্ছে হয়, অবশ্য অধিকাংশ জায়গাতেই ফেরা হয় না। অনেক বছর পর সেরকম কোনও একটিতে ফিরে গেলেও আশাভঙ্গ হতে পারে। একসময় যেটি ছিল নিরিবিলি নির্জন, সেখানে হয়তো অনেক বাড়িঘর গজিয়ে গেছে! একবার রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটি আকর্ষণীয় একতলা বাংলোটি দোতলা হয়ে গেছে আর নীচের তলায় একটা সরকারি অফিস হয়েছে দেখে খুবই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

হাতিবাড়িতে কখনও হাতি আসে কি না জানি না, তবে বাংলোটি বেশ উপভোগ্য। দুপুরবেলা পৌঁছে প্রথমেই আমরা নদীটি দেখতে গেলাম। ওপর থেকে নেমে যেতে হয় অনেকখানি।

কিছুক্ষণ পরেই যে যার কাজে লেগে পড়ল। ইন্দ্রনাথ গেল চিতলমাছ জোগাড় করতে আর শক্তি গেল মহুয়া কিংবা হাঁড়িয়ার খোঁজে।

অনেক চেষ্টা করেও চিতলমাছ অবশ্য পাওয়া গেল না। ইন্দ্রনাথ সত্যিই আগেরবার এসে চিতলমাছ খেয়েছিল কি না তা নিয়ে আমাদের মধ্যে কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করলেও আমি ইন্দ্রনাথের সমর্থনে বললাম, নদীর একটা বিশেষ বাঁকে প্রতিদিন চিতলমাছ আসবেই, তার কি কোনও গ্যারান্টি আছে? চিতলমাছেরাও বোধহয় রোজ রোজ ধরা দিতে চায় না।

সুতরাং মাছের বদলে মুরগি। মুরগি তখনও এত অখাদ্য হয়নি, অর্থাৎ পোলট্রির মুরগি সর্বত্র ছড়ায়নি। দেশি মুরগিও পাওয়া যেত। রান্নায় বেশ স্বাদ হয়েছিল।

শক্তি ঠিকই জোগাড় করে এনেছিল মহুয়া।

এ ব্যাপারে শক্তির কৃতিত্ব অসাধারণ। বাংলা-বিহার ওড়িশার এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে গেলে শক্তি আধঘণ্টার মধ্যে কিছু না কিছু মদ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। অনেক সময় শক্তি গর্ব করে বলত, 'আমি মাটিতে পা ঠুকলে মাটি ফুঁড়ে মদের ফোয়ারা উঠবে।' অর্থাৎ সে অর্জুনের সমতুল্য।

মহুয়ার অল্প নেশায় ও আড্ডায় চমৎকার কাটতে লাগল সময়। আমাদের খুশি করার জন্যই যেন সন্ধের খানিকটা পরে মেঘে ভেঙে বেরিয়ে এল চাঁদ। চারদিক ফটফট করতে লাগল জ্যোৎস্নায়।

এমন জ্যোৎস্নায় ঘরের মধ্যে বসে থেকে লাভ কী?

তখন রব উঠল, 'চলোর যাই নদীর ধারে।'

বড়-বড় পাথরের ওপর বসা যায়। নদী এখন রুপোলি স্রোত। কোনও শব্দ নেই।

সেই নদী দেখে কারুর মনে গান আসে, কারুর মনে অন্য চিন্তা।

ইন্দ্রনাথ বলল, এই সময়টা নিশ্চয়ই এখানে চিতলমাছ আসে। কোনও একটা জেলেকে যদি ডেকে আনা যেত।

আমরা হেসে উঠলাম। চিতলমাছের মোহ তখন আমাদের মন থেকে ঘুচে গেছে। বরং নদী ও জ্যোৎস্না বিষয়ে কে কটা গান জানে, শুরু হল তার প্রতিযোগিতা।

রবীন্দ্রনাথ নদী এবং জ্যোৎস্না, এই দুটি বিষয়েই অকৃপণ। এখানে যত ইচ্ছে চিৎকার করে গান গাওয়া যায়।

অনেকগুলি গানের পর শক্তি আমাকে বলল, 'চলো, জলের ধারে যাই।'

নীচে নেমে গিয়ে জলে পা ডোবাবার পর আমার মনে পড়ল অ্যালেন গিনসবার্গের সেই কথা।

এতক্ষণ আমরা নদীকে অনেক গান শুনিয়েছি। এবার শুরু হোক না উপভোগের দ্বিতীয় পর্ব। অবগাহন।

এবারে আমাদের দলে কোনও মহিলা সদস্য নেই। সুতরাং আব্রুর প্রশ্নও নেই। জামা-প্যান্ট অনায়াসে খুলে ফেলা যায়। জ্যোৎস্নার মধ্যে পুরুষের নগ্নতাও অন্য রূপ পায়।

সুবর্ণরেখা খরস্রোতা নয়। কুমির-টুমির কিছু নেই। সুতরাং বিপদের সম্ভবনাও কিছু ছিল না। আমরা সবাই সাঁতার জানি। শুধু পাথরে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেরকম কিছুও হয়নি। সেই জ্যোৎস্নায় জলের সঙ্গে খেলা চলেছিল অনেকক্ষণ।

বিপদের সম্ভাবনা ছিল অন্য একবার কোনারকে।

কোনারকের বিচে এমনিই স্নান করা বিপজ্জনক, তাও আমরা গিয়েছিলাম মধ্যরাত্রে, কিঞ্চিৎ নেশার ঝোঁকে। কথা নেই বার্তা নেই, বেলাল চৌধুরী নেমে পড়েছিল জলে। তার দেখাদেখি শক্তি আর ইন্দ্রনাথও। আমি ওদের বারণ করতে লাগলাম বারবার।

তার কিছুদিন আগেই 'জস' সিনেমাটা দেখেছি। আরও নানান জায়গায় পড়েছি, রাত্তিরবেলা সমুদ্রস্নান একেবারেই উচিত নয়। রাত্তিরে হাঙরগুলো তীরের কাছাকাছি চলে আসে।

বন্ধুরা কেউ আমার নিষেধ মানল না। সুতরাং আমি আর একলা ওপরে দাঁড়িয়ে কাপুরুষ হয়ে থাকি কী করে? আমাকেও পোশাক খুলে নামতে হল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি অন্যদের তাড়িয়ে-তাড়িয়ে উঠিয়ে আনলাম ওপরে। কোনও বিপদই ঘটেনি।

পরদিন সকালে আবার সেখান এসেছি মাছের খোঁজে। দেখি যে, ভালো মাছ বিশেষ কিছু ওঠেনি, কিন্তু উঠেছে ছ'ঝুড়ি হাঙরের বাচ্চা!

বড় হাঙরগুলো যে কেন আগের রাত্রে আমাদের দয়া করেছিল, তা কে জানে!

কৈশোরের গঙ্গা-নদী

নদীর ধারে উঁচু ঘাটের ওপর বসে আছে একটি বছর দশেকের বালক। সঠিক বলতে গেলে দশ বছর তিন মাস। আমি তাকে কলকাতার এক দশতলার হর্ম্যের জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। আমি এখন সত্তর বছরের এক নাবালক।

বারাণসীর গঙ্গা, দশাশ্বমেধ ঘাট। প্রায় সন্ধ্যা, যদিও কোথাও এখনও বাতি জ্বলেনি। আকাশে কিছুটা আলোর রেশ রয়ে গেছে। এই দশাশ্বমেধ ঘাটে প্রায় সব সময়েই বহু মানুষের ব্যস্ততা, তবু কোথাও একা বসে থাকারও স্থান পাওয়া যায়।

নদীটি নৌকা-বহুল, ঘাটের কাছে কয়েকটি বড় বড় বজরা বাঁধা। দূরে মণিকর্ণিকার ঘাটে জ্বলছে কয়েকটি চিতা। গাঢ় অন্ধকার না হলে আগুন ঠিক স্বাস্থ্য পায় না। তাই জ্বলন্ত চিতাগুলি কিছুটা ফ্যাকাসে।

ছেলেটি নদীর দিকে চেয়ে কী দেখছে? ওই বয়েসে কি সৌন্দর্যের ভোক্তা হওয়ার মতন তৈরি হয় মন? বালকের একাকিত্বে অনেক সময় অভিমান থাকে। যে-দোষ সে করেনি, তেমন

কোনও দোষের জন্য মিথ্যে শাস্তি পেলে সে বিদ্রোহ করতে শেখে। আমি বহু বছরের দূরত্বেও দেখতে পাচ্ছি ছেলেটিকে। কিন্তু কেন সে অন্যদের সঙ্গ থেকে বিচ্যুত হয়ে একা বসে আছে, তা আমার মনে নেই।

দশাশ্বমেধ ঘাটে যে দৃশ্যটি আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত, তা পুরুষ-শরীরের দলাই-মলাই। সারাদিন ধরেই কিছু দামড়া ধরনের লোক ল্যাঙট পরে শুয়ে তেল মাখাত অন্যদের দিয়ে। সেদিকে তাকালেই চোখ ফিরিয়ে নিতাম।

ভালো লাগত রামায়ণ-মহাভারতের কথকতা। সেই সময় কাশী ছিল বাঙালি বিধবাদের ডিপো। বাংলাদেশে অনেক পরিবারেই অল্প বয়েসি বিধবাদের চালান করে দেওয়া হত কাশীতে, কারণ এখানে পরিবারের মধ্যে বিধবারা থাকলে ব্যাভিচারের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। তখন গর্ভনাশের ব্যবস্থা আইন-সঙ্গতও ছিল না। সুবিধেজনকও ছিল না। অনেক গর্ভবতী বিধবার পেট খালাস করতে গিয়ে খুনের দায়ে পড়তে হত পরিবারের কর্তাকে। বেনারসে চোখের আড়ালে যা হয় হোক। সেই সব বিধবাদের জন্য মাসিক বরাদ্দ ছিল দশ-পনেরো টাকা, প্রতিমাসে সেই মানি অর্ডারও পৌঁছত না। কেউ তাদের খোঁজ খবরও নিত না। যুদ্ধের সময় সব জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও বাড়ত না বিধবাদের মাসোহারা। অনেক অসহায় বিধবা বাধ্য হয়েই বেশ্যাবৃত্তি এবং যৌবন ফুরিয়ে গেলে ভিক্ষাবৃত্তি নিত। এরা ছাড়াও অনেক সম্পন্ন বাঙালিদের পুরুষানুক্রমে বসবাস ছিল বেনারসে।

কাছেই বাঙালিটোলা, দশাশ্বমেধ ঘাটে বিকেলের দিকে ছিল অধিকাংশ বাঙালিদের ভিড়, শোনা যেত বাংলা কথা। তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কথকতার বসত আসর, এক একজন কথককে ঘিরে গোল হয়ে এক একটি শ্রোতৃমণ্ডলী। এইসব কথকরা ছিলেন প্রফেশনাল। গল্প বলার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁরা গান গেয়ে উঠতেন, নেচেও দিতেন কয়েক পাক। বিভূতিভূষণ এবং সত্যজিৎ রায়ের 'অপরাজিত'র হরিহরের ছিল এটাই জীবিকা।

সেই কথকতা শুনেই রামায়ণ-মহাভারত সম্পর্কে আমার গভীর আগ্রহ জাগে, ওই বই দুটি আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে যায়। এখনও আমি সময় পেলেই মহাভারতের যে-কোনও পৃষ্ঠা খুলে পড়তে শুরু করি।

ওই কথকরা শুধু মহাগ্রন্থ দুটির গল্পই শোনাতেন না। ব্যাখ্যা করতেন, অনেক সময় নিজস্ব মন্তব্যও জুড়ে দিতেন। একটি মন্তব্য এখনও আমার মনে দাগ কেটে আছে।

রামায়ণের সীতাহরণ, স্বর্ণমৃগের ধান্দায় ছুটে গেছেন রাম, পাহাররত লক্ষ্মণকেও সেদিকে যেতে বাধ্য করলেন সীতা, তারপরই সন্ন্যাসীর বেশে রাবণের আগমন এবং সবলে সীতাকে তুলে নিয়ে শূন্যে উড্ডীন। এ কাহিনি সকলেরই জানা। কথক এখানে মন্তব্য করলেন, এখানে রাবণের সবচেয়ে বড় অপরাধ কী? সীতাহরণ নয়। সুন্দরী রমণীদের তো চিরকালই ক্ষমতাশালী পুরুষরা নিজের ভোগের জন্য নিজের বক্ষে স্থান দেওয়ার বাঞ্ছা করে, তাতে নতুনত্ব কিছু নেই। কিন্তু রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করলেন কেন? অতবড় দুর্ধর্ষ বীর রাজা রাবণ, তিনি আর কোনও ছলে-বলে-কৌশলে সীতাকে কুক্ষিগত করতে পারলেন না? সন্ন্যাসীকে দেখেই তো সীতা লক্ষ্মণের গন্ডি অতিক্রম করেছিলেন সরল বিশ্বাসে। হে রাবণ, তুমি যে সন্ন্যাসী সেজে এই অপকর্মটি করলে তার ফলে ভবিষ্যতে সমস্ত সঠিক সন্ন্যাসীদেরও কি মানুষ অবিশ্বাস করবে না? সংসার ত্যাগী স্বার্থজ্ঞানহীন চিরকালের সন্ন্যাসীদের গায়ে তুমি এই অপবাদ দেগে দিলে? ছি ছি ছি....

ওই ব্যাখা শোনার পর আমি নিজে সারা জীবন কোনও সন্ন্যাসীকেই ভক্তি-শ্রদ্ধা করতে পারিনি।

বেনারসে আমার এক পিসিমা-পিসেমশাই থাকতেন, সেই সূত্রেই আমাদের আসা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমরা কিছুদিন ছিলাম পূর্ব বাংলার এক গ্রামে। সেখানে এক সময় খাদ্যশস্য একেবারেই অকুলান হয়ে গেল, পয়সা থাকলেও কিছু মেলে না। একেবারে অনাহারের সম্মুখীন হওয়ার মতন অবস্থা। কলকাতায় ফিরে গিয়েও থাকার উপায় নেই। কারণ বাবা তখন প্রায়

উপার্জনহীন। চাকরি নেই, টুকটাক ব্যাঙ্কের চিঠি অনুবাদ করে দু-পাঁচ টাকা পান। তখন স্থির হল, বেনারস খুব সস্তার জায়গা, কম খরচে বেঁচে থাকা যায়। তাই বাবা আমাদের বেনারসে রেখে গেলেন। পিসেমশাইয়ের সঙ্গে থাকিনি, তিনি তখন জুয়া খেলা কিংবা ওই ধরনের কোনও ঝুঁকিবহুল ব্যাপারে ঢুকে পরে সর্বস্বান্ত, সুতরাং আমাদের আলাদা ঘর ভাড়া নিতে হয়েছিল, আলাদা সংসার। এখানেও মায়ের দশ বছরের ছেলেটিই প্রধান পুরুষ অভিভাবক। মায়ের বয়স তখন বড়জোর সাতাশ। বেনারস শহরেও বহু রাবণের অবতার ঘুরে বেড়ায়।

তখনকার বেনারসে যুদ্ধের কোনও ছায়া নেই। এখানকার আকাশ দিয়ে কোনও বিমানও উড়ে যায় না। এবং জিনিসপত্র সত্যিই সস্তা। বিশেষত মনে আছে একটি জিনিসের কথা, রাবড়ি। বিশ্বনাথের গলিতে মাত্র দু-পয়সায় পাওয়া যেত ছোট এক খুড়ি ভরতি অতি লোভনীয় রাবড়ি। সেই দু-পয়সাও রোজ রোজ ব্যায় করার মতন বিলাসিতা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এক একদিন কিনে, সেই খুড়ির অর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা দিতাম আমার ছোট দু-ভাইকে। মাঝে-মাঝে একটাও পয়সা হাতে না থাকলে সেই গলি দিয়ে এমনিই হেঁটে যেতাম। রাবড়ির গন্ধ তো পাওয়া যেত! ঘ্রাণেন অর্ধভোজনং কথাটা একেবারেই মিথ্যে, সেই গন্ধ পেলে মনের মধ্যে জেগে উঠত ভিখিরিপনা।

আর ছিল অতি উপাদেয়, স্বাস্থ্যবান, মিষ্টি কলা। সেই একটা কলা খেলেই প্রায় পেট ভরে যেত। অনেক পরবর্তীকালে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ যখন বেনারসে গিয়ে অনেকদিন ছিল, তখন সে কাশীর এই কলা প্রসঙ্গে আমায় লিখেছিল, খোসা ছাড়িয়ে এই কলায় প্রথম কামড় দিয়েই মনে হল কী অপূর্ব স্বাদ। তখন বলতে ইচ্ছে হল, গড ইজ আ গুড কুক। আরও একটু খাওয়ার পর আমার বলতে ইচ্ছে হল, নো গড ইজ দা বেস্ট কুক।

আমাকে শাসন করার বিশেষ কেউ ছিল না বলে, আমি একা একা দুপুরবেলা বেনারসের গলি-ঘুঁজিতে ঘুরে বেড়াতাম। নিজের পাড়া ছেড়ে বেপাড়াতেও। তখন কাশীতে বেণী-মাধবের ধ্বজা নামে পাশাপাশি দুটি মনুমেন্টের মতন স্তম্ভ ছিল, তার একটার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠাও যেত। সেই স্তম্ভদুটো দেখা যেত বহু দূর থেকে, ওপরে উঠলেই দেখা যেত সমগ্র কাশী ছাড়িয়েও দিগন্ত এবং অনেকখানি গঙ্গা। ওপারের রামনগরের রাজবাড়ি। এখন সেই বেনীমাধবের ধ্বজার চিহ্নমাত্র নেই। কোনও এক সময় ঝড়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বেনারসে থাকতে থাকতে স্থানীয় কিছু ছেলেদের সঙ্গে মিশে আমি ভাঙা ভাঙা হিন্দি বলতেও শিখেছিলাম। ঘুড়ি ওড়াবার নেশা ছিল, রাস্তায় কাটা ঘুড়ি উড়তে দেখলেই ছুটতাম অন্য ছেলেদের সঙ্গে। প্রায় সব সময়ই লম্বা ছেলেরা আগে ধরে নিত। সেই ঘুড়ির পেছনে ছোটা অনেকটা আমার জীবনের প্রতীক হয়ে আছে।

একটা হিন্দি রসিকতা আজও মনে আছে। আপ তো আপহি হ্যায়, কৃপা করকে হঠ যাইয়ে। একটু ব্যাখ্যা দরকার। বারাণসীর সব গলির মধ্যেও এক একটা পেল্লায় চেহারার ষাঁড় শুয়ে থাকত। ষাঁড় শিবের বাহন, বেনারস শিবেরই শহর। সুতরাং ষাঁড়কে মারধোর করা যায় না। ডিঙিয়ে যাওয়াও পাপ। অনেক সময় একটি-দুটি ষাঁড়ের জন্যই হয়ে যেত ট্রাপিক জ্যাম। কিছু প্রতিকারের উপায় ছিল না। একদিন এক মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গঙ্গায় স্নান সেরে ফিরতে-ফিরতে দেখলেন এক সরু গলির মধ্যে পথ জুড়ে শুয়ে আছে একটি গাধা! ষাঁড় তবু সহ্য করা যায়, তা বলে গাধাও সেই স্থান নেবে। লোকে বলত, কাশীতে কেউ মরলে সরাসরি স্বর্গে যায়, রামনগরে কেউ মরলে পরজন্মে গাধা হয়! ধর্মভীরু সেই ভদ্রলোক কোনও জীবজন্তুকেও মারেন না। গাধাটা এমনভাবে শুয়ে আছে যে পাশ দিয়ে যাওয়ারও উপায় নেই। ডিঙিয়ে যাওয়াও অশালীন ব্যাপার। তাই তিনি হাতজোড় করে বললেন, আপ তো আপহি হ্যায়, কৃপা করকে হঠ যাইয়ে। অর্থাৎ অন্য কেউ এভাবে শুয়ে থাকলে বলতাম, এই গাধা, সরে যা। কিন্তু গাধাকে তো গাধা বলেও গাল দেওয়া যায় না। আমি এখনও কোনও কোনও ব্যক্তির এঁড়ে তর্ক শুনলে অস্ফুট স্বরে বলি। আপ তো আপহি হ্যায়...রসিকতা একাই উপভোগ করি।

ওই বয়েসে শ্মশানের প্রতি কোনও আকর্ষণ থাকার তো কথা নয়। তবু মণিকর্ণিকার ঘাটে যেতাম মাঝে-মাঝে। একদিনের কথা বিশেষভাবে মনে আছে।

একটি চিতায় সদ্য চাপানো হয়েছে এক তরুণীকে। সারা শরীরের ওপর কাঠ চাপানো। শুধু বেরিয়ে আছে তার মুখ আর পা দু-খানি। আলতা মাখিয়ে দেওয়া পা। এক সময় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল। কয়েকজন গ্রাম্য পোশাকের নারী পুরুষ জড়াজড়ি করে বসে আছে পাশে, তারা কেউ শোক করছে না, ফিসফিস করে কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। ছোঁড়া ছেঁড়া সেই কথা শুনে বোঝা গেল, তরুণীটি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সে কিছুদূরের এক গাঁয়ের বউ, বেঁচে থাকতে সে একবারও বেনারসে আসেনি। গ্রামের বাইরেই কোথাও যায়নি।

কী গভীরও দুঃখে এই বয়েসে নিজের প্রাণ নষ্ট করে দিল এই মেয়েটি? তা জানবার কোনও উপায় নেই। মুখখানা দেখলেই বোঝা যায়, সে কুরূপা ছিল না। মেয়েদের চেহারার ওপরেই যে তাদের জীবনের অনেক কিছু নির্ভর করে, তা কি সেই বয়েসেই বুঝতে শুরু করেছি একটু একটু?

কেন যেন হঠাৎ বুকটা মুচড়ে উঠে চোখে জল এসে গিয়েছিল। ওই মেয়েটি আমার কেউ না, তবু খুব কষ্ট হচ্ছিল ওর জন্য। একবার ইচ্ছে হল, ওর পা দুটো ছুঁয়ে প্রণাম করি। পট পট করে শব্দ হচ্ছে আগুনের, পুড়ে যাচ্ছে ওর বুক, পেট। এখনও পায়ের কাছে পৌঁছয়নি।

ইচ্ছে করলেই কি সব কিছু করা যায়? আমি ওর পা ছুঁলে যদি কেউ কিছু বলে? যদি আমার জাত-টাত নিয়ে প্রশ্ন তোলে?

আমি দূরে দাঁড়িয়েই দু-হাত জোড় করে ঠেকালাম আমার কপালে।

পায়ের তলায় সরষে

পায়ের তলায় সরষে, আমি বাধ্য হয়েই ভ্রমণকারী!

আমার ভ্রমণের শখ নেই। এখন পর্যন্ত ভ্রমণ আমার জীবন যাপনেরই একটা অঙ্গ। কিছুদিন এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকলেই আমার মন উচাটন হয়। মাথার মধ্যে একটা ক্যারা নড়াচড়া করে। প্রতিদিন একই মানুষজনের সঙ্গ, খুব ঘনিষ্ঠ হলেও আর উত্তাপ দেয় না; একইরকম সব মুখ, খুব প্রিয় হলেও, দেখতে-দেখতে চোখ খরখরে হয়ে যায়। তখন ইচ্ছে করে, কিছুদিনের জন্য অন্য নদীতে ডুব দিয়ে আসি, অন্য হাওয়ায় আচমন করি।

ছোটবেলায় আমার দিদিমা বলতেন, এ ছেলেটার একেবারে পায়ের তলায় সরষে, একদণ্ড ঘরে মন টেঁকে না! এ এমন কিছু আহামরি গুণপনা নয়, অনেক ছেলেরই এমন হয়, বিশেষত আমার মতন যাদের অল্প বয়েস থেকেই পড়াশুনোয় মন নেই। যে বয়েসটায় সারা গায়ে ইস্কুল-ইস্কুল গন্ধ থাকে সেই বয়েসে আমি মাঝে মাঝেই বাড়ি থেকে পালাতুম। আমার ইস্কুল পালানোর উপায় ছিল না, কারণ আমার বাবা ছিলেন স্কুল-শিক্ষক আর সেই স্কুলেরই আমি ছাত্র।

এমনকি খুচরো দুষ্টুমি কিংবা আমার তুলনায় দুর্বল কোনও ছাত্রের সঙ্গে মারামারি করার সুখও আমি পাইনি। কারণ, একটু কিছু শুরু করলেই সবাই বলত, তোর বাবাকে বলে দেব। সেই দুঃখে, ছুটিছাটার দিনে, বাড়ির লোকজনদের খানিকটা দুশ্চিন্তায় ফেলার জন্য আমি পালিয়ে যেতুম দূরে কোথাও। অবশ্য বেশিক্ষণের জন্য নয়, দু-তিন ঘণ্টা মাত্র। তারপর আবার নিজেই নিজেকে

খুঁজে পেয়ে বাড়ি ফিরিয়ে আনতুম।

বাল্যকালে আমাদের পরিবারে সারা বছরে দু-তিনবার বাধ্যতামূলক ভ্রমণ ছিল। আমার বাবা কাজ করতেন কলকাতার ইস্কুলে আর আমাদের দেশের বাড়ি ছিল ফরিদপুরের এক গণ্ডগ্রামে। বছরে দু-বার অন্তত আমরা এই দু'জায়গা যাতায়াত করতুম। দূরত্বের হিসেবে হয়তো মাত্র শ দেড়েক মাইল তবু সে কী লম্বা যাত্রা। প্রথমে নৌকোয় কয়েক ঘণ্টা, তারপর স্টিমারে এক রাত, তারপরে ট্রেনে একবেলা। নদী খাল বিলের দেশ থেকে শান বাঁধানো কলকাতায় এসে মনে হত অন্য গৃহে চলে এসেছি। নদীর চড়ায় দেখেছি পোড়া কাঠের মতন রোদ-পোহানো কুমির, স্টিমারটা কাছে এলেই তারা ঝুপঝুপ করে নেমে পড়ত জলে; রাশি-রাশি সাদা বককে দেখেছি স্বর্গের দিকে উড়ে যেতে। রাত্রিবেলা স্টিমারের ডেকে দাঁড়িয়ে নদীতে ও আকাশে দু-খানি চাঁদ দেখা, তার ঘোর চোখে লেগে থাকত বেশ কয়েকদিন।

আমাদের স্টিমার ঘাটার নাম ছিল গোয়ালন্দ। সেইখানে প্রথম আমার বাবা আমাকে মিথ্যে কথা বলতে শেখান। তারপর থেকে গুরু-মারা বিদ্যের মতন, বাবার সামনে আমিও যে কত মিথ্যে গল্প বানিয়ে বলেছি তার ঠিক নেই, বাবা তার অনেকগুলো বিশ্বাসও করে ফেলতেন। ব্যাপারটা হল এই, আমার তখন ন-দশ বছর বয়েস, বাবার হাত ধরে নৌকো থেকে নেমেছি গোয়ালন্দে। তখন সকাল ন'টা, এক ঘণ্টা পরে স্টিমার ছাড়বে। স্টিমারে খাবার পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ, পাওয়া গেলেও দাম বেশি। বাবা গোয়ালন্দেই খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে চান। সেখানে শুধু মুসলমানের হোটেল আর হিন্দুর হোটেল নয়, হিন্দুদের মধ্যেও বামুনের হোটেল, কায়স্থের হোটেল আলাদা আলাদা। বামুনের হোটেলে তখনও চুলো ধরেনি। কায়স্থের হোটেল থেকে গরম-গরম ভাত আর বিউলির ডালের মন হু-হু করা গন্ধ ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ দ্বিধা করে বাবা আমায় নিয়ে গটগট করে ঢুকে গেলেন কায়স্থের হোটেলে। ডাল-ভাত আর ইলিশমাছ ভাজা, কাঁচালঙ্কা সহযোগে, অতিশয় পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া হল। বেরিয়ে আসবার পর বাবা চুপিচুপি বললেন, এই কথাটা কারুকে বলবার দরকার নেই। যদি কেউ জিগ্যেস করে তো বলবি যে বামুনের দোকানেই খেয়েছি।

প্রথম সেই মিথ্যে বলার দীক্ষায় আমি দারুণ রোমাঞ্চিত বোধ করেছিলুম। পরবর্তী কালে আমার পিতার এই শিক্ষা আমার জীবনে খুবই কাজে লেগেছে।

অবশ্য, এর কয়েক বছর পর স্টিমারের মুসলমান খালাসিদের রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত আমরা সপরিবারে উপভোগ করেছি। অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার বাবা প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিলেন।

গোয়ালন্দ হোটেলের একটা গল্প এখানে শোনানোর লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নয়। তবু যেন মনে হয় দেখেছি-দেখেছি। কানে শোনাও তো এক রকমের দেখা। রাজারা যেমন কর্ণেন পশ্যতি। গোয়ালন্দের এক হোটেলে তিনরকম খাওয়ার রেট ছিল। ডাল-ভাত আর একটা তরকারি তিন আনা, এর সঙ্গে দু-পিস মাছ নিলে ছ-আনা। মাঝখানে একটা চার আনার রেট ছিল, তাতে ঝোল-ভরতি একটা মাছের বাটি সামনে রেখে দেওয়া হতো, মাছের ঝোলটা শুধু ঢেলে নিয়ে মাছ দুটির দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে ভাত খাওয়া একে বলা হত মাছের দেখনাই। একজন খদ্দের সেই দেখনাই রেটের খাবার নিয়েছে। খাওয়াদাওয়া শেষ হওয়ার পর সে কাউন্টারে গিয়ে এক টাকার নোট দিয়েছে, দোকানের মালিক তার থেকে নিল পাঁচ আনা! খদ্দেরটি বলল, এ কী! বেশি নিচ্ছেন কেন, আমি তো মাছ ফেরৎ দিয়েছি। দোকানদারটি একগাল হেসে বলল, তুই যে চষছস্ (চুষেছিস)!

এই রকম দেখনাই-এর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা আমার জীবনেও অনেকবার ঘটেছে। প্রথমবার যেখানে ঘটেছিল, তা কোনও এলেবেলে জায়গায় নয়, ভারতের গ্রীষ্ম-রাজধানী সিমলা নগরীতে। তখন সবেমাত্র কলেজে উত্তীর্ণ হয়েছি। সিমলার আপার বাজারের এক মহার্ঘ হোটেলের কাচের শো

কেসের সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি আর এক বন্ধু। বারবিকিউ করা আস্ত-আস্ত মুরগির দিকে তাকিয়ে আমাদের জিভে জল আসছে, কিন্তু সে হোটেলের ভেতরে ঢোকার কোনও উপায় আমাদের নেই। একটা পয়সাও নেই আমাদের পকেটে। কথাটা একেবারে আক্ষরিক অর্থে সত্যি, একটিও পয়সা নেই আমাদের কাছে।

আমরা উঠেছিলুম সিমলা কালীবাড়ির অতিথিশালায়। অতিথিশালা মানে তো বিনামূল্যে থাকা খাওয়া নয়, চার টাকা করে ঘর ভাড়া, আর খাওয়ার ব্যাপারটা বাইরে। ঘর ভাড়া দেওয়ার সামর্থ্যও আমাদের নেই, সেখানে আমরা বেয়ারিং হয়ে আছি।

কলকাতা থেকে সুদূর সিমলা যাওয়ার জন্য যারা খরচপত্তর করে তারা কি এত দরিদ্র হয়? আসলে বিনা রেলভাড়ায় সারা ভারত চষে চেড়ানোর এক অপূর্ব সুযোগ তখন আমরা পেয়ে গিয়েছিলুম। আমাদের এক বন্ধুর বাবা রেলে চাকরি করতেন। তাঁর দুই ছেলের জন্য তিনি বছরে দুবার পেতেন রেলের পাস, কন্যাকুমারিকা থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত। আমি ও আমার আর এক বন্ধু নাম ভাঁড়িয়ে সেই পাস ব্যবহার করতুম। রেলের পাস তিন মাস মেয়াদি হয়। এমনও হয়েছে, সেই এক জোড়া পাস নিয়েই আমাদের বন্ধুদের দল থেকে দুজন দুজন করে একাধিকবার ভ্রমণ করে এসেছি।

বাড়িতে স্বেচ্ছায় রেশান আনা কিংবা বাজার করার ভার নিয়ে, তার থেকে প্রতিদিন কিছু-কিছু পয়সা সরিয়ে পঁচিশ-তিরিশ টাকা জমলেই বেরিয়ে পড়তুম আমরা। সেবারে আমি ও আমার বন্ধু দীপক রেরিয়েছি। প্রথমে আমার টাকা, তারপর দীপকের টাকা খরচ করবার কথা। দিল্লি পার হয়ে সিমলার পথে যাওয়ার সময়ই দীপক ঘোষণা করেছিল যে ওর ম্যানি ব্যাগটা চুরি গেছে! আমি ম্যানি ব্যাগ ব্যবহার করি না কখনও, তাই চুরি যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। দীপকের সেই বার্তা শুনে আমার তো মাথায় হাত। আমার কাছে তখন আর মোটে পাঁচ টাকা আর কয়েক পয়সা আছে। এই সম্বল নিয়ে আমরা সিমলায় পৌঁছে বাঁচব কী করে?

সিমলার কালীবাড়িতে আশ্রয় নিয়েই দুখানা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলুম কলকাতায় ও দিল্লিতে বন্ধুদের কাছ থেকে কিছু সাহায্য চেয়ে। বাড়িতে কিছু জানাবার সাহস ছিল না। আর বাকি পয়সা দিয়ে আমরা তখুনি কয়েকখানা পাঁউরুটি আর কিছু চিনি কিনে নিয়েছিলুম। দিন দুয়েক শুধু সেই চিনি পাঁউরুটি খেয়ে কাটানোর পর মনে হয়েছিল, ফাঁসির আসামিরাও আমাদের তুলনায় অনেক ভালোভাবে থাকে। তারপর আমরা সেই পাঁউরুটি সঙ্গে নিয়ে ঘুরতুম। ভালো-ভালো হোটেলের বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে, উত্তম আমিষ-আহার্যের দৃশ্য ও ঘ্রাণ নিয়ে তারপর স্যান্ডাল পয়েন্টে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিবোতুম সেই পাঁউরুটি। ঠান্ডার দেশ বলে পাঁউরুটিগুলো পচে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, এই যা সৌভাগ্য।

সেবারের সেই ভ্রমণযাত্রার উপসংহারটিও বলা যায় এতদিন পর নির্ভয়ে। চারদিনের মধ্যে আমাদের কাছে কোনও টাকা এসে পৌঁছয়নি। তখন আমাদের অবস্থা সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে আর সিমলায় থাকতে ভরসাও পাচ্ছি না। মনের অবস্থা এমন যে যে-কোনও ছুতোনাতায় দুই প্রাণের বন্ধু তেতোভাবে ঝাগড়া করছি। শেষ পর্যন্ত অতিথিশালার ভাড়া না মিটিয়েই এক দুপুরে চুপিচুপি চম্পট দিলুম। ট্রেন ধরার জন্য যতক্ষণ স্টেশানে থাকতে হয়েছিল, বাথরুমের মধ্যে লুকিয়ে থাকলেও সর্বক্ষণ বুক টিপ-টিপ করেছে, এই বুঝি কালীবাড়ির লোকজনেরা এসে চড়াও হয়!

আর একবার এক ভিখিরি দম্পতিকে খুবই ঈর্ষা করেছিলুম আমি। সেটাও ওইরকম বিনা রেলভাড়ায় ভ্রমণের সময়কার ব্যাপার। আমাদের কাছে যে পাস ছিল, তা নিয়ে আমরা যে-কোনও স্টেশনে ব্রেক জার্নি করতে পারতুম। সেবারে যাচ্ছি দক্ষিণের দিকে। এবারেও আমার সঙ্গী দীপক। আগেরবারে দীপকের মানি ব্যাগ হারানোর গল্পটি আমার কাছে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়নি বলে এবারে প্রথম থেকেই ঠিক করে নিয়েছি, একদিন আমার খরচ, পরের দিন দীপকের খরচ। এই নিয়মে

চলবে। পয়সা বাঁচাবার জন্য আমরা আরও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলুম, যেসব স্টেশনে আমরা নামব, সে সব জায়গায় আমরা হোটেল ভাড়া দেব না। সারাদিন শহরে ঘোরাঘুরি করে রাত্রে এসে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে শুয়ে থাকা যাবে চমৎকার।

ঘুরতে-ঘুরতে আমরা এসে পৌঁছেছি হায়দ্রাবাদ স্টেশনে। সদ্য শীতকাল বলে আমাদের সঙ্গে মালপত্র একটু বেশি। সোয়েটার, আলোয়ান, কম্বল এসবই আনতে হয়েছে। হায়দ্রবাদ শহরে দিনের বেলা বেশ গরম। তা ছাড়া ঝাড়া হাতপায় ঘুরে বেড়ানো অনেক আরামদায়ক বলে আমরা সব গরম জামা-কাপড় সুটকেস বন্ধ করে জমা দিয়ে গেলুম লেফ্‌ট-লাগেজে। রাত্রে এসে ছাড়িয়ে নিলেই হল।

হায়দ্রাবাদে দ্রষ্টব্য জায়গা অনেক। এক সালোয়ারজং মিউজিয়াম দেখতেই তো সারাদিন লেগে যাওয়ার কথা। সময় বাঁচাবার জন্য আমরা একই দিনে ওই মিউজিয়াম আর গোলকুণ্ডার দুর্গ দেখার উদ্যোগ নিয়েছিলুম। গোলকুণ্ডা থেকে ফেরবার পথে বাসে কী সব গোলমাল হল, ফিরতে-ফিরতে বেজে গেল রাত সাড়ে দশটা। স্টেশনের বাইরের দোকানে অতি উত্তম গো-মাংসের কাবাব ও গরম-গরম রুটি খেয়ে পেট ভরিয়ে ফিরে এসে এক নিদারুণ দুঃসংবাদ পেলুম। লাগেজ অফিস রাত এগারোটায় বন্ধ হয়ে গেছে, কেরানিবাবু চাবি নিয়ে বাড়ি চলে গেছেন, আমাদের সুটকেস সে রাতে ফেরত পাওয়ার কোনও উপায় নেই।

হায়দ্রাবাদের দিন ও রাত্রির চরিত্রের কোনও মিলই নেই। দিনের বেলা যেখানে পাতলা জামাই যথেষ্ট ছিল এবং তাতেও মাঝে-মাঝে ঘাম হচ্ছিল, সেই শহরেই রাত্তিরের বাতাসে হাড় কেঁপে যাচ্ছে। বিনা শীতবস্ত্রে আমাদের রাতে কাটাতে হবে, এই চিন্তাতেই আমাদের আরও বেশি শীত করেছিল। আমাদের সবই আছে, অথচ কিছুই নেই। তখনও আমরা সিগারেট ধরিনি, হুইস্কি-ব্র্যান্ডি বা গাঁজা-গুলিরও স্বাদ পাইনি, সুতরাং শীত কাটাবার উপায়ান্তরও জানি না।

লাগেজ-রুমের খুব কাছেই একটা কাঠের বেঞ্চে আমরা দুজনে ঠায় বসে রইলুম। মাঝে-মাঝে পরস্পরের দিকে আমরা রোষকষায়িত নেত্রে তাকাচ্ছি, অর্থাৎ দেরি করে ফেরার জন্য আমরা পরস্পরকে নীরবে দায়ী করছি। ক্রমশ তিনকেলে বুড়োর মতন আমাদের হাত-পা গুটিয়ে দ-হয়ে যাওয়ার মতন অবস্থা! সত্যিই একেবারে অসহ্য শীত!

একটা কোনও ট্রেন ছেড়ে চলে যাওয়ার পর অনেকগুলো আলো-টালো নিভে স্টেশনটা একেবারে নিঝুম হয়ে গেল। আমাদের ঘুম আসবার কোনও উপায় নেই। এই সময় একটি ভিখিরি-পরিবার, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও একটি বাচ্চা, হাজির হল আমাদের সামনে। আমাদের অবস্থা দেখে করুণাবশত তারা ভিক্ষে চাইল না, কাছেই মেঝেতে তারা তাদের বিছানা পাততে শুরু করল। স্টেশনের ভিখিরিদেরও কিছু সম্বল থাকে। প্রথমে তারা জায়গাটি পরিষ্কার করল পা দিয়ে, তারপর দুটি মাদুর পাতল। তাদের বালিশও রয়েছে। শুয়ে পড়ার পর তারা তিনজনে মিলে দু-খানি শতচ্ছিন্ন কম্বল চাপা দিল গায়ে। এবং একটু বাদেই ঘুমিয়ে পড়ল।

দ্বেষ-অভিমান ভুলে আমি ও দীপক পরস্পরের দিকে চুম্বক আকৃষ্টের মতন চেয়ে রইলুম। আমাদের দুজনেরই চোখের ভাষা এক। আমাদের চেয়ে এই ভিখিরি পরিবারটি কত সুখী!

এই কাহিনিরও একটা উপসংহার আছে। পরদিন সকালে ঘুম ভাঙার পর আমরা আবিষ্কার করেছিলুম যে আমরা দুজনে ওই ভিখিরি পরিবারের সঙ্গে জাপটা-জাপটি করে ওদেরই কম্বলের নীচে শুয়ে আছি। মাঝরাত্রে কোনও এক সময় আমরা বেপরোয় হয়ে উঠেছিলুম, ওরাও বিশেষ আপত্তি করেনি।

একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেদের তাদের বাবা-মা কোনও অনাত্মীয়দের সঙ্গে বাইরে যেতে দেন না। আমি কিন্তু সেইরকম বয়েস থেকেই পরিবার-বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘুরতে শুরু করেছি। আস্তে-আস্তে সইয়ে নিতে হয়েছে। প্রথম-প্রথম বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়ে ফিরে আসার পর বকুনি খেতে খেতে

রোমহর্ষক সব গল্প বলতুম বানিয়ে। তারপর যেতে শুরু করলুম কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। চিলড্রেন্স ফ্রেশ এয়ার অ্যান্ড এক্সকারশান সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতার দরিদ্র ছেলেমেয়েরা যাতে কিছুটা অন্তত মুক্ত বায়ু সেবনের সুযোগ পায় সেই জন্য বছরে দুবার করে একদল ছেলেমেয়েকে বাইরে বেড়াতে নিয়ে যেত। কিছু সদাশয় ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানটি গড়েছিলেন এবং মিসেস সোম নামে এক সহৃদয়া রমণী ছিলেন এর পৃষ্ঠপোষক। রেল কোম্পানি, রেডক্রস ইত্যাদি সংস্থাও অনেক জিনিসপত্র দিয়ে এই উদ্যোগকে সাহায্য করত। যেসব ছেলেমেয়ে নির্বাচিত হত, তাঁদের দিতে হত মাত্র পাঁচ টাকা। স্কুল শিক্ষকের ছেলে হিসেবে আমার নির্বাচনের খুব সহজ যোগ্যতা ছিল। এই রকম পাঁচ টাকা চাঁদা দিয়ে আমি স্কুল-জীবনে অনেকবার এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দেওঘর মধুপুর রাঁচি ইত্যাদি জায়গা ঘুরে এসেছি। শুধু যে তিন-চার সপ্তাহের জন্য বেড়ানো হত তাই-ই নয়, সেই সঙ্গে টুথপেস্ট-টুথব্রাশ, কম্বল, চিরুনি, হাওয়া দিয়ে ফোলানো বালিশ, গুঁড়ো দুধের প্যাকেট এসব উপহারও পেতুম।

এ ছাড়া আমি ছিলুম বয়েজ স্কাউটের সদস্য। দার্জিলিং-কাশ্মীর সমেত প্রত্যেকটি স্কাউট ক্যাম্পে আমি যোগ দিয়েছি, খরচও যৎসামান্য, পনেরো-কুড়ি টাকার বেশি ছিল না তখন। বয়েস স্কাউট ক্যাম্পগুলি ছিল দারুণ আনন্দের, অনেকরকম নিয়ম কানুনের কড়াকড়িতেও একটু আনন্দ উপভোগ বোধ করতে পারত না। এই সব ক্যাম্প থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছিও বটে। যেমন রান্না। স্কাউটদের রান্নার পরীক্ষা দিতে হয়, তাতে বুকিং ব্যাজ পাওয়া যায়। মুসুরির ডাল ও বেগুনের ভাজা রান্নায় আমি সতীর্থদের মধ্যে বেশ বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলুম।

নিজের বাক্স-বিছানা নিজেই গুছিয়ে এই রকম বাইরে-বাইরে ঘোরার অভ্যেস করে ফেলেছিলুম বলে, স্কুল বয়েসের শেষ দিকে কিংবা কলেজে উঠেই যখন বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে কোথাও যাওয়ার দাবি তুলেছি তখন অভিভাবকরা আর বিশেষ আপত্তি করেননি। সেইসময় থেকেই আমি টিউশানি করা শুরু করি। এবং সেই টাকায় আমার সফরের ব্যায় নির্বাহ হত। অবশ্য এই সময় স্বাবলম্বী হওয়ার আগেই আমার আগ্রা-দিল্লি-কাশ্মীর-বোম্বাই-দার্জিলিং-শিলং ইত্যাদি বিখ্যাত জায়গা প্রায় সবই দেখা হয়ে গেছে।

তখন আমার চোখ পড়ল ছোটখাটো জায়গার দিকে। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখা ছোট ছোট টিলার সারি, কিংবা একটা কোনও নগ্ন-নির্জন গিরি-নদী কিংবা কোনও নাম-না-জানা জঙ্গল, অমনিই ইচ্ছে করে সেখানে নেমে যেতে। কোনও অ্যাডভেঞ্চারের নেশা নয়, এমনিই যাওয়া, যেন কেউ হাতছানিতে ডেকেছে। সেই বয়েসে হৃদয় সবসময়েই যে-কোনও বিস্ময়বোধের জন্য উন্মুখ, যা প্রথম দেখি, তাই-ই মনে হয় নতুন, তখনও মনে-মনে ভালো লাগা, মন্দ লাগার কোনও সংজ্ঞা তৈরি হয়নি। মনে আছে, একবার আমার বন্ধু আশুতোষ ঘোষের সঙ্গে বহরমপুরের একটা খুব ছোট হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে কয়েকদিন ছিলুম। প্রথমিক উদ্দেশ্য ছিল মুর্শিদাবাদের নবাব বাড়ি ও খোসবাগ ইত্যাদি দেখা। কিন্তু ওসব দেখার জন্য তো একটা দিনই যথেষ্ট, তবু আরও দিনের পর দিন সেই হোটেলে থেকে যাওয়ার কোনও কারণই ছিল না, শুধুমাত্র একটা অচেনা জায়গায় জীবনযাপন করে আমরা অপূর্ব আনন্দ পেয়েছিলুম।

একবার আমরা চার-পাঁচ বন্ধু ট্রেনে যেতে-যেতে (বিনা টিকিটে অবশ্যই, পরে ধরা পড়ে দণ্ড দিতে হয়েছিল) একটা বেশ ছিমছাম ছোট স্টেশন দেখে পছন্দ করে সেখানেই নেমে পড়েছিলুম। অনেকটা 'অরণ্যের দিনরাত্রি' নামের উপন্যাসের চরিত্রগুলির মতন। অবশ্য আমরা মোটেই ওই উপন্যাসের অনুকরণ করিনি, ওই উপন্যাসটিই বরং আমাদের জীবনের ঘটনা টুকেছে। স্টেশনটির নাম ধলভূমগড়, তখন সেখানে মনুষ্যবসতি বেশ বিরল ছিল, এবং কাছেই ছিল একটি পেঙ্গুইন এডিশান সাইজের জঙ্গল। সেই জঙ্গলে কোনও হিংস্র জানোয়ার নেই, কিন্তু এমনই আমাদের কেরামতি যে সেই জঙ্গলে রাত কাটাতে গিয়েও আমরা আমাদের জীবন বিপন্ন করেছিলুম। আবার এর বিপরীত

ঘটনাও আছে। সুন্দরবনের গহিন জঙ্গল আর বিপজ্জনক নদীতে রাত দুটোর সময় যখন বাঘের পেটে না হলেও ডাকাতের হাতে প্রাণ যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা, তখনও সেখানে আমরা নির্বোধ দেবশিশুর মতন ঘুরে বেরিয়েছি, গায়ে সামান্য একটা আঁচড়ও লাগেনি। সম্ভবত সুন্দরবনের ডাকাতরা দূর থেকে লক্ষ করে আমাদের আরও বড় কোনও ডাকাতের দল ধরে নিয়েছে এবং ভয়ে পালিয়েছে।

একটা বয়েসে যখন-তখন প্রাণের ঝুঁকি নেওয়ার একটা দারুণ নেশা থাকে। রাজনীতি বা আদর্শবাদের জন্য যে-কারণে কিশোর-তরুণরা অবহেলে প্রাণ দেয়। আমি অল্প বয়েসে কিছুদিন বাম ছাত্র-রাজনীতি ও দু-একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলুম, কিন্তু বেশিদিন লেগে থাকতে পারিনি। মিছিল আমার সহ্য হয় না। আর দশজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে একই কথা বলতে আমি কিছুতেই পারি না, বাধো-বাধো লাগে। এটা আমার দোষ হোক বা যা-ই হোক। তবে, যে-বয়েসে নকশালপন্থী ছেলেরা আদর্শের জন্য মৃত্যু হাতে নিয়ে খেলেছে, সেই বয়েসে আমরা কয়েক বন্ধুও পাহাড়ে-কন্দরে-জঙ্গলে অনেকবার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার তোয়াক্কাই করিনি। অতি তুচ্ছ কারণে আমি ও আর কেউ-কেউ দু-তিনবার অন্তত নির্ঘাত মরে যেতে পারতুম, বেঁচে গেছি অলৌকিকভাবেই বলা যায়। এই ব্যাপারটাতে রোমান্টিক ভাববিলাস মনে হতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে যে একটা গূঢ় কিছু খোঁজারও ব্যাপার আছে, তা অনেকেই বুঝবে না, কেউ-কেউ হয়তো বুঝবে।

জীবনের নানা স্তরে বন্ধু-বান্ধবদেরও পালা বদল ঘটে। আমার জীবনে এক সময় দুই চট্টোপাধ্যায় শক্তি ও সন্দীপন, আর সমীর রায়চৌধুরী-পর্ব কেটেছে। সমীরই আমাদের মধ্যে প্রথম চাকরি পায় ও বিবাহ করে। তা হলেও সে ঠিক সংসারী হয়নি, একটা বাউণ্ডুলেপনা তার রক্তে মেশা ছিল এবং বন্ধুদের জন্য তার ছিল সব সময়ের উদাত্ত আহ্বান। চাইবাসা, ডাল্টনগঞ্জ ও সিংভূম সাঁওতাল পরগনার অন্যান্য জায়গায় সে যখনই বদলি হয়ে গেছে, প্রত্যেকবারই আমরা কয়েকজন সেখানে আচম্বিতে উপস্থিত হয়েছি। বিহারের এই সব ছোট শহরের কাছাকাছিই চমৎকার সব জঙ্গলে অধিষ্ঠিত ডাকবাংলো আছে। বড় মোহময় সেই সব অঞ্চল। কোনওরকম পরিকল্পনা নেই। টাকাপয়সার সে-রকম জুত নেই, তবু আনন্দ ছিল স্বতোৎসার। নিরিবিলি জঙ্গলে বসে থাকা বা গড়ানো কিংবা আদিবাসীদের হাটে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশে যাওয়া, এরই আকর্ষণ ছিল সাংঘাতিক। একবার একটা শুকনো নদীর খাতে অসংখ্য ফড়িং দেখেছিলুম। অত ফড়িং কেন ছিল সেখানে? একদা সেই নদীটির জলস্রোতের শব্দ শুনেছে সেখানকার জঙ্গল, সেই শব্দ আর নেই, সেই শূন্যতা ভরিয়ে দেওয়ার জন্যই কি সেই ফড়িংয়ের ঝাঁক সেখানে ডানার গুঞ্জরণ তুলত?

সন্দীপনের ছিল নিত্য-নতুন উদ্ভাবনী প্রতিভা। আপাতত যা অসম্ভব বলে মনে হয়, সেদিকেও এগিয়ে যেতে সে অপরাঙ্মুখ। তবে সন্দীপন পুরোটা যায় না, খানিকটা এগিয়ে, খানিকটা গণ্ডগোল পাকিয়ে তারপর সে অন্যদের সামনে ঠেলে দেয়। সন্দীপনের পরিকল্পনায় আমরা অনেকবার অচেনা রাজ্য আবিষ্কারে গেছি। শক্তি প্রকৃত অর্থেই বেপরোয়া। শক্তি কোনও পরিকল্পনার ধার ধারে না, কোনও একটা জায়গায় গিয়ে পড়তে পারলেই হল, তারপর আর ফেরার নামটি নেই। শক্তি পেছনে ফিরতে চায় না, এই বাংলোর পর আর এক বাংলো আছে, এই জঙ্গলের পর অন্য জঙ্গল। শারীরিক দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়ারও এক অদ্ভুত প্রতিভা আছে শক্তির। কতবার যে ওর মাথা ফেটেছে, হাত-পা ভেঙেছে তার ঠিক নেই। এমনও বেশ কয়েকবার হয়েছে, কোনও অভিযানের মধ্যপথে হাত-ভাঙা বা পা-ভাঙা শক্তিকে নিয়ে আমরা ফিরে এসেছি কলকাতার হাসপাতালে।

আমাদের দলে সেই সময় আর এক বন্ধু থাকত, তার নাম ভাস্কর দত্ত, যে এখন বিলেতে প্রবাসী। এই ভাস্করের দুঃসাহস ছিল তুলনাহীন, আর যে -কোনও অচেনা লোকের কাঁধে হাত দিয়ে নিমেষের মধ্যে তাকে সে অন্তরঙ্গ করে নিতে পারত।

বলাই বাহুল্য, এই দলে আমিই ছিলুম সবচেয়ে সাদামাটা।

ওই সব জায়গায় ঘোরার পর আমাদের জঙ্গলের নেশা ধরে যায়। তারপর ভারতের বহু

জঙ্গল আমরা কখনও দল বেঁধে, কখনও আলাদাভাবে ফুঁড়ে ফেলেছি।

বন্ধুদের সঙ্গে দল বেঁধে ভ্রমণ যেমন মহা আনন্দের, আবার একলা-একলা ঘুরে বেড়ানোরও অন্যরকম মজা আছে। ইদানীং একলা বেড়াতেই আমি বেশি পছন্দ করি। বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেন যাত্রায় কামরার অন্য কোনও লোকের দিকে নজরই পড়ে না, অথচ যখন একা যাই, তখন কামরার সব দৃশ্য ঠিক সিনেমার মতন মনে হয়, স্মৃতিতে জমা হয় অনেকগুলো চরিত্র।

পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে দূরে কোথাও নির্জন জায়গায় থাকলে নিজের সঙ্গে দেখা হয়। মাঝে-মাঝে নিজের সাহচর্যও তো দরকার। মনে পড়ে, মধ্যনিশীথে শ্বাপদসংকুল মানস অরণ্যে, মানস নদীর পাশে একা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা। ওপরে পরিষ্কার তারা ভরা আকাশ, মাঝে-মাঝে শোনা যাচ্ছে হরিণের ডাক। সেইরকম সময়ে মনে হয় সারা পৃথিবীতে আর কোনও মানুষ নেই। কিছুক্ষণ পরে আমি ফিসফিস করে জিগ্যেস করেছিলুম, কেমন আছ, সুনীল? আমায় চিনতে পার? সে রাত্রে সংলাপ বেশ জমেছিল।

একবার হঠাৎ খেয়াল হল আন্দামান যেতে হবে। কিনে ফেললুম একখানা জাহাজের টিকিট। বন্ধুবান্ধবরা জিগ্যেস করল, ওখানে যাচ্ছ কেন? কেউ নেমন্তন্ন করেছে? ওখানে কেউ চেনা আছে? না এবং না। তবে কেন যাচ্ছ? এর উত্তরে আমি এভারেস্ট সম্পর্কে এক বিখ্যাত অভিযাত্রীর মন্তব্যের কায়দায় বলেছিলুম, বিকজ ইট ইজ দেয়ার!

সেই প্রথম আমার সমুদ্রযাত্রা। এর আগে আকাশপথে সমুদ্র ডিঙিয়েছি বেশ কয়েকবার, কিন্তু জাহাজে ভাসিনি। দু-দিন যাওয়ার পর বঙ্গোপসাগরে ঝড় উঠল। প্রবল ঝড়ে জাহাজ থেমে রইল প্রায় গোটা দিন। আমার যে কী তীব্র আনন্দ হয়েছিল। এটা যেন উপরি পাওনা! টিকিটের দামের সঙ্গে তো একখানা এইরকম ঝড় উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল না। শরৎচন্দ্রের লেখায় সেই যে আছে, 'কর্তা, কাপ্তেন কইছে সাইক্লোন হতি পারে'—সেই সাইক্লোন যে আমি কোনওদিন নিজের চক্ষে দেখব, তা কল্পনাও করিনি! সেই দুর্দান্ত ঝড়ের মধ্যে আমার নাচতে ইচ্ছে করছিল। ভয় পাইনি একটুও, কারণ আজকাল জাহাজডুবির সম্ভাবনা খুবই কম। বঙ্গোপসাগরে যে এত হাঙর আছে আর উড়ুক্কু মাছ, তাও জানতুম না আগে। প্রথম উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক দেখে যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, মানুষখেকো মাছ পিরানহা কিংবা ইলেকট্রিক মাছ কিংবা উড়ুক্কু মাছ এই ধরনের সব অদ্ভুত জিনিস শুধু দক্ষিণ আমেরিকাতেই আছে। আমাদের কলকাতার এত কাছে উড়ুক্কু মাছ? উড়ুক্কু মাছ শুধু জল থেকে একবার লাফিয়ে উঠেই ডুব মারে না। মুনিয়া পাখির মতন এক ঝাঁক উড়ুক্কু মাছ ফরফর করে যে অনেকক্ষণ উড়ে বেড়াতে পারে, তাও আমার জানা ছিল না। পরে অবশ্য পোর্ট ব্লেয়ারে উড়ুক্কু মাছ ভাজা খেয়েছি। অনেকটা পার্শে মাছের মতন।

আন্দামান পশ্চিমবাংলার প্রতিবেশী। অথচ আন্দামান সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই অস্পষ্ট। পোর্ট ব্লেয়ার এমনই এক আধুনিক শহর, যেখানে বাড়িতে বসে টেলিফোনে ট্যাক্সি ডেকে পাঠানো যায়, এ খবর কজন জানে? আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের সৌন্দর্য ইটালির ক্যাপ্রি ইত্যাদিকেও হার মানাতে পারে।

একটা দ্বীপে হাঁটতে-হাঁটতে সমুদ্রের ধারে উপনীত হয়ে দেখেছিলুম এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা বিশাল শিংওয়ালা হরিণকে হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে জলের ধারে। হরিণটার আধখানা দেহ ডুবে গেছে জলে, কিন্তু সে বেঁচে আছে। সমুদ্রে তখন জোয়ার আসছে, ঢেউগুলো যেন লোভী জিভের মতন ছলাৎ-ছলাৎ করে ধাক্কা মারছে তার গায়ে। তীব্র অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে হরিণটা আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও হরিণটাকে বাঁচাতে পারিনি। ওর কাছাকাছি এগুলেই ও শিং দিয়ে ঝাপটা মারার চেষ্টা করছিল। অবিলম্বেই জোয়ারের জল তাকে টেনে নিয়ে গেল।

পরে জেনেছিলুম, ওই দ্বীপে হরিণের সংখ্যা সাংঘাতিক বেড়ে গেছে, হরিণের অত্যাচারে ফসল রক্ষা করা যায় না। হরিণের মাংস খেতে-খেতে অরুচি জন্মে গেছে বলে লোকে ফাঁদ পেতে

হরিণ ধরে-ধরে জলে ফেলে দেয়। সেই সময় পোর্ট ব্লেয়ারে হরিণের মাংসের কেজি চার টাকা, কোনও কোনও দ্বীপে এক টাকা দু টাকাতেও পাওয়া যেত।

পোর্ট ব্লেয়ার থেকে রঙ্গত দ্বীপে যাচ্ছিলুম সার্ভিস লঞ্চে। সপ্তাহে একদিন সেই লঞ্চ যার ফলে সাংঘাতিক ভিড়। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় আমি সকালে টিকিট কাটার লাইন দিতে পারিনি, শেষ মুহূর্তে গিয়ে লঞ্চে উঠেছিলুম, স্থান পেয়েছিলুম ছাদের ওপর খোলা জায়গায়। সারাদিনের যাত্রা। আন্দামানে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়। আমি একবার বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে যাচ্ছি, আবার রোদ্দুরে গায়ে সব শুকোচ্ছে, এইরকমভাবে দশ-বারো বার। একটু বসবারও জায়গা পাইনি, আগাগোড়া ঠায় দাঁড়িয়ে। সারাদিনেও খাওয়াও জোটেনি। দুপুরে এক জায়গায় লঞ্চ থেমে ছিল, সেখানে নেমেই ছুটতে শুরু করেছিল সব যাত্রীরা। একটি মাত্র হোটেল, তাতে আগে যারা পৌঁছবে, তারাই খাবার পাবে। অন্যদের খাওয়া জুটবে না, কারণ ততক্ষণে লঞ্চ ছেড়ে দেবে। আমি অনভিজ্ঞ তাই আগে পৌঁছতে পারিনি। অভুক্ত অবস্থায় সারাদিন ধরে বৃষ্টি ভেজা ও রোদে পোড়া, এক সময় মনে হয়েছিল, দূর ছাই, এভাবে আর যেখানে সেখানে ছুটব না। ঢের পৃথিবী দেখা হয়েছে, এবারে ক্ষ্যামা দাও।

তবু, আন্দামানের কথা এখন মনে পড়লেই ইচ্ছে করে আবার সেখানে যাই। আবার সেই ঘন নীল সমুদ্রের বুকে লঞ্চের ছাদে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজি।

আর একরকম বেড়ানোতে ইদানীং আমার বেশ নেশা ধরে গেছে। সেরকম বেড়ানো নিয়ে কোনও ভ্রমণ কাহিনি লেখা যায় না। কেষ্টপুর, স্বরূপনগর, বাণপুর ইত্যাদি সাধারণ নামের যে হাজার-হাজার গ্রাম রয়েছে, সেরকম কোনও-কোনও গ্রামে গিয়ে মাঝে-মাঝে চুপচাপ কয়েকটি দিন কাটিয়ে আসা। আমি গ্রাম সম্পর্কে তদন্ত করতে যাই না, কারণ লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করার ক্ষমতা আমার নেই। আমি শুধু দেখি। এইভাবে কয়েকটা গ্রাম এবং সুন্দরবনের সঙ্গেও আমার খানিকটা চেনাশুনো হয়েছে।

আমি বিদেশেও বেশ কিছু ঘোরাঘুরি করেছি। কলকাতার কোনও জায়গায় একটা লোহা পুঁতলে সেটা পৃথিবী ফুঁড়ে উলটোদিকে যেখানে বেরুবে, সেখানেও গেছি, অর্থাৎ অর্ধেক পৃথিবী দেখেছি এমন দাবি করতে পারি। তাতে লাভ হয়েছে এই যে, এই রূপসি বসুন্ধরা যে মানুষের বসবাসের পক্ষে চমৎকার জায়গা সেই উপলব্ধি হয়েছে। কেস্টপুরে যেমন, রিভিয়েরাতেও তেমন মানুষ সমান সুখে বেঁচে থাকতে পারে। এই পৃথিবীকে যারা ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করছে, তারা জননীর কুপুত্র।

পাহাড় যেখানে ডাকে

কাঠমাডু থেকে চিনের সীমান্তের দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে, আমরা এগিয়ে চলেছি সেই রাস্তা ধরে। এই পথে ট্রলি বাস চলে। এই রাস্তাটা তৈরি করেছে চিনেরা, আর ট্রলি বাস জাপানিদের গড়া। আমাদের দেশে ট্রলি বাস নেই, কিন্তু এদেশে এসেও এবার ট্রলি বাসে চাপার সুযোগ হল না, জায়গা পেয়ে গেলুম ইয়েতি ট্রাভল্‌স-এর আরামদায়ক কোচে।

এই পথেই পড়ে ভক্তপুর, নেপালের প্রাচীন এক নগরী। কিন্তু আপাতত আমরা ভক্তপুরে

থামছি না, আমাদের গন্তব্য আরও দূরে।

কাঠমাণ্ডু উপত্যকা পা হওয়ার পরই শুরু হল পাহাড়ি পথ। এখানে একটা উঁচু জায়গায় পেছনে ফিরে দূরের কাঠমাণ্ডুকে দেখায় যেন এক মডেল নগরী। বড় অপূর্ব সেই দৃশ্য।

ছোট-ছোট পাহাড়ের গা দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বাস যায়। ক্রমে পাহাড়গুলি বড় হয়ে উঠেছে। হাত বাড়ালেও ছোঁয়া যায় যে এইসব পাহাড়, এরাও সবাই হিমালয়ের এক একটি ঢেউ। হিমালয় নাম শুনলেই আমার রোমাঞ্চ হয়। এই যে পাহাড়ের শ্রেণি, একটার আড়ালে দেখা যায় আর একটির মাথা, এই রকম কিছু পাহাড়ের দূরত্বেই রয়েছেন নগাধিরাজ এভারেস্ট!

পিচ-বাঁধানো আধুনিক যে পথ দিয়ে এখন আমরা চলেছি, এক কালে এরই কাছাকাছি পার্বত্যপথ দিয়ে এখানকার মানুষ বাণিজ্য-পশরা নিয়ে যেত তিব্বত সীমান্তে। তিব্বতীয়রাও নেমে আসত সেই পথ দিয়ে। এখন সেই অবাধ বাণিজ্যের দিন আর নেই। এখন সব দেশের সীমান্তই সৈন্যরা পাহারা দেয়।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে সাধারণ নেপালি চাষিদের বাড়ি। পাহাড়ের ঢালু গায়ে থাক-থাক কাটা চাযের খেত। দূর থেকে মনে হয়, ওই সব খেত যেন মানুষের তৈরি নয়। প্রাকৃতিক, ঠিক ছবির মতন। আসলে বহু বছরের বহু পরিশ্রমে মানুষই ওইভাবে পাহাড় কেটে ফসল ফলাচ্ছে।

চাষিদের বাড়িগুলোও আমাদের দেশের চাষিদের মতন নয় অধিকাংশ বাড়িই লালচে রঙের ইটের এবং দোতলা। খুব বড় নয়, কিন্তু পরিষ্কার, ছিমছাম। আমাদের দেশের গ্রামের দিকে যে খোলার ঘর বা ঝুপড়ি দেখা যায়, সেরকম একটাও চোখে পড়ল না। তাহলে ভারতীয় চাষিদের চেয়ে নেপালি চাষিদের অবস্থা কি ভালো? বোধহয় তাই।

দু-পাশের সবুজের মধ্য দিয়ে চলেছে কোচটা, এক সময় দেখতে পেলুম একটা টিলার ওপরে এক ঝাঁক ঘরবাড়ি। যত্ন করে তৈরি করা বাগান। আমাদের কোচ একটু বাদে থামল সেখানেই। রাস্তা থেকে বেশ কয়েক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে এলেই ধূলিখেল মাউন্টেন রিসর্ট। এর চত্বরের ওপরে দাঁড়ালে প্রথমটা বুক ধক করে ওঠে। যেন আমি পাহাড় দেখছি না, চারদিকের পাহাড়ই আমাদের দেখছে।

এখানে রয়েছে একটা বেশ বড়ে ডাইনিং রুম এবং কয়েকটি কটেজ। প্রত্যেকটি কটেজই স্বয়ংসম্পূর্ণ, দুটি করে শয্যা। এই শৈলাবাসটি দেখলে ইটালি কিংবা মেক্সিকোর কোনও হোটেল বলে মনে হয়। নাইট অফ দা ইগুয়ানা ফিলমে অ্যাভা গার্ডনার যে হোটেলটির মালিকানি ছিলেন, সেই হোটেলটির কথাও মনে পড়ে যেতে পারে। সব কিছুই সাহেবি কায়দায় সাজানো ও অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। এখানে অবশ্য কাছাকাছি সমুদ্র নেই, রয়েছে জঙ্গলময় উপত্যকা।

এই রকম একটা জায়গা খুঁজে বার করাই বড় কথা। সেই কৃতিত্ব এই মাউন্টেন রিসর্টের পরিচালক শ্রীযুক্ত বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ'র প্রাপ্য। তিনি ইয়েতি ট্রাভেলসের একজন অফিসার, সাহেব মেমদের নিয়ে নেপালের সব জায়গায় ঘুরতে হয়েছে তাঁকে। তা ছাড়া এক সময় তাঁর শিকারের শখ ছিল, তাই নিরালা জঙ্গল অঞ্চলগুলি চেনেন। ঘুরতে-ঘুরতে একদিন এই টিলার ওপর দাঁড়িয়েই, উঁচু পাহাড়ঘেরা গোল দিগন্তের দিকে চেয়ে-চেয়ে তিনি সেই জায়গাটিকে ভালোবেসে ফেললেন। তিনি এখানে কিনে ফেললেন অনেকটা জমি, অর্থাৎ পুরো একটি পাহাড়ের চূড়া। তারপর প্রতিষ্ঠিত হল ধূলিখেল মাউন্টেন রিসর্ট। এসব মাত্র কয়েক বছর আগেকার কথা।

শীতকালে, রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে এখান থেকেই দেখতে পাওয়া যায় বিশ্ববিখ্যাত কয়েকটি শৃঙ্গ। মা কালু, ধওলাগিরি, গৌরীশঙ্কর ইত্যাদি। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে এভারেস্টেরও দর্শন মিলতে পারে, তার জন্য আর একটা উঁচু টিলায় ওঠার দরকার। এমনকি ঘরে শুয়ে শুয়েও এই সব বরফ ঢাকা পাহাড় দেখা যায়, ঘরগুলো সেই-ভাবে তৈরি।

এখন বর্ষাকাল, দূরের পাহাড় সব জমাট মেঘে ঢাকা, কাছের পাহাড়গুলোতে চলেছে মেঘ

ও রোদের খেলা। এই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, এই ঝিকমিকে রোদ।

আমরা বেশ একটা বড় দল মিলে এসেছি। কথা ছিল, দুপুরে এখানে লাঞ্চ খেয়ে তারপর কিছুক্ষণ প্রকৃতির শোভা উপভোগ করে বিকেলে ফিরে যাওয়া। কিন্তু দু-এক ঘণ্টার মধ্যে আমি প্রকৃতির শোভা ঠিক হজম করতে পারি না, বিশেষত এত বড় বড় পাহাড়-মাখা প্রকৃতি। ফেরার আগে আমি হঠাৎ ঠিক করলুম, আমি আজ রাতটা এখানে থেকে যাব।

আমাদের দলটির ব্যবস্থাপনার ভার নিয়েছিলেন হানি হলিডে সংস্থার শ্রীস্বপন পোদ্দার। তাঁকে কানে-কানে কথাটি জানাতেই তিনি বললেন, নো প্রবলেম! ধুলিখেল মাউন্টেন রিসর্টের পরিচালক বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ-ও প্রস্তাবটিতে রাজি হয়ে গেলেন সঙ্গে-সঙ্গে। বিকেল হওয়ার আগেই কোচটি ফিরে গেল কাঠমাণ্ডু। টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে আমি ওঁদের বিদায় জানালুম। তারপরই জায়গাটা অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এই রকম নিস্তব্ধতার মধ্যেই টের পাওয়া যায় যে মানুষের কণ্ঠস্বর, একটা দুটো পাখির ডাক কিংবা বাতাসে গাছের পাতার শব্দ কত মধুর। প্রত্যেকটি আলাদা করে চেনা যায় এবং সূক্ষ্মতম ঝংকারও কানে আসে। পাহাড়ের গায়ে মেঘের ছায়া পড়ে অনবরত রূপ বদল হচ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, তার কাছ দিয়েই নেমে গেছে গভীর উপত্যকা। তা এতই গভীর যে অনেক নীচে আমি দেখতে পাচ্ছি উড়ন্ত বকের ঝাঁক ও ভাসমান মেঘ। ওই উপত্যকার কোনও মানুষ হয়তো ভাবছে যে ওই বকের পাঁতি উড়ছে। আকাশের গা দিয়ে, আর আমি দেখছি ওরা মাটির কত কাছে!

এই জায়গাটিতে বড়-বড় ছাতা রাখা আছে, যাতে বৃষ্টি পড়লে আশ্রয় নেওয়া যায়। এক একটা গোল গাছও ছাতার মতন। এখানে চেয়ার টেনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়।

এক ফাঁকে আমি আমার ঘরটি দেখে এলুম। ডাইনিং হল থেকে টিলার ওপরের দিকে উঠে যেতে হয় খানিকটা। সেখানে লাল ইটের কটেজ। জানলায় অতি সূক্ষ্ম তারের জাল ও কাচ। পাশাপাশি দুটি খাটের বিছানা এত ধবধবে সাদা যে দুগ্ধফেননিভ বলতে ইচ্ছে করে। বাথরুম ঝকঝকে। চমৎকার ব্যবস্থা। বিছানায় শুয়ে পড়ে দেখলুম, বালিশে মাথা রেখেও পাহাড় দেখা যায়!

আবার বেরিয়ে এসে বসলুম উপত্যকার সীমান্তে। অনেক নীচে দেখা যাচ্ছে একটি দোতলা বাড়ি। তিনটি বাচ্চা মেয়ে খেলছে উঠোনে। এত উঁচু থেকে ওদের দেখাচ্ছে পুতুলের মতন।

একটু বাদে দুজন নেপালি যুবক এসে বসল আমার কাছাকাছি, তাদের হাতে বন্দুক, বিনা আলাপেই কথা বলতে শুরু করলুম ওদের সঙ্গে। যুবক দুটি বেশ উচ্চশিক্ষিত মনে হল। দুজনেই ব্যবসায় জড়িত, শিকারের শখ আছে। কাঠমাণ্ডু থেকে মাঝে-মাঝে চলে আসে এই দিকে শিকারের খোঁজে।

আমি জিগ্যেস করলুম, এ দিকে কী শিকার পাওয়া যায়?

হরিণ আছে নানা জাতের, লেপার্ড আছে যথেষ্ট, তা ছাড়া বুনো শুয়োর ও খরগোশ।

একজন লোক আঙুল দিয়ে নীচের উপত্যকার একটা জঙ্গলের দিক দেখিয়ে বলল, ওই তো ওইখানে কয়েকদিন আগেই একটা লেপার্ড মেরেছি।

শিকারের গল্প শুনতে সব সময়েই ভালো লাগে। পাহাড়ের গায়ে-গায়ে ভেড়ার লোমের মতন জঙ্গল। সেদিকে এবারে নতুনভাবে তাকালুম।

আমি রাত্তিরে এখানেই থাকব শুনে যুবক দুটি বেশ অবাক। বারবার জিগ্যেস করতে লাগল, এখানে রাত্রে থেকে কী করবেন? রাত্তিরে তো কিছুই করার নেই।

আমি বললুম, এত সুন্দর কটেজ বানিয়ে রেখেছে, তা কি রাত্তিরে থাকার জন্য নয়?

ওরা বলল, হ্যাঁ থাকে, সাহেবরা থাকতে আসে। তারা নির্জনতা আর পাহাড়ের নিঃশব্দ মহিমা উপভোগ করে।

আমি হেসে বললুম, সে কী! সাদা চামড়া না হলে কি নির্জনতা আর পাহাড়ের মহিমা উপভোগ

করতে কোনও বাধা আছে?

ওরা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না, না, তা অবশ্য নয়। কিছু কিছু ভারতীয়ও আসে দেখেছি। তবে তারা তো আসে নারী-পুরুষ জোড়ায়-জোড়ায়। আপনি একেবারে একা।

আমি আপশোশের সুরে বললুম, যার যেমন ভাগ্য।

যুবক দুটি চলে গেল একটু পরে। ওদের সঙ্গে গাড়ি আছে, রাত্তিরের মধ্যেই ফিরে যাবে শহরে। আস্তে-আস্তে বিকেলের আলো নরম হয়ে আসছে।

বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ-ও এখানে থাকেন না রাত্রে। তিনি প্রত্যেকদিন আসেন না, তাঁর অন্য কাজ থাকে। শনিবার রবিবার এখানে থাকেন। সারা সপ্তাহ এখানে হোটেল চালায় তাঁর মেয়ে। মেয়েটির বয়েস একুশ-বাইশের বেশি নয়, একেবারে মেম-সাহেবের মতন ফুটফুটে চেহারা।

এখানে ইলেকট্রিসিটি নেই। আমার কাছে সেটাই আর একটি উপরি আকর্ষণ মনে হল। চতুর্দিকের পাহাড়ের সারি হাজার-হাজার বছর ধরে একই রকম রয়েছে, এর মধ্যে হঠাৎ এক জায়গায় কৃত্রিম আলো যেন খুবই বেমানান হত। সাড়ে সাতটার পর সব কিছু ডুবে গেল নিঝুম অন্ধকারে, পাহাড় ও আকাশ মিশে গেল একাকার হয়ে। শুধু মাঝে-মাঝে দেখা যায় গাড়ির হেড লাইট, চিনা সড়ক দিয়ে ট্রাক চলেছে। পাহাড়ের বাঁকে-বাঁকে তাদের শব্দ একবার বাড়ছে, একবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম তো দূরের কথা ঘুমের ইচ্ছেও মাথায় এল না। আলো নেই, কথা বলার একটি মানুষ নেই, এইরকম সময়ে যেন নিজেকে খুব কাছাকাছি পাওয়া যায়। দিনের পর দিন তো কাটে হইচই-এর মধ্যে, কত রকম ব্যস্ততা, কত ভুল বোঝাবুঝি, এত সব কিছুর মধ্যে নিজের সঙ্গেই শুধু কথাবার্তা হয় না। তা ছাড়া আমরা প্রতিনিয়ত সময় কাটাই ছোট-বড়-মাঝারির সাহচর্যে। সত্যিকারের বৃহতের সংস্পর্শ লাভ আর কটা দিন ভাগ্যে ঘটে! এখন এই অন্ধকারের মধ্যে, যদিও চোখে দেখতে পাচ্ছি না, তবু টের পাচ্ছি হিমালয়ের মহান গাম্ভীর্য। এখানকার বাতাসে যেন রয়েছে দৈব স্পর্শ। নিজের নিশ্বাসই যেন বেশ পবিত্র লাগে। একা-একা বেশ কিছুক্ষণ বসে থাকার পর মনে হয়, হৃদয়ের ভেতরটা যেন ধোয়া-মোছা হয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে।

তারপর এক সময় মনে হল, সমবেত পাহাড় থেকে একটি ধ্বনি ভেসে আসছে। যেন ডাক উঠেছে। ভুলে যেও না, ভুলে যেও না, গাছপালা, পশুপাখির মতন মানুষও এই প্রকৃতিরও সন্তান!

পরিব্রাজক, তুমি কোথায়?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাসে একজন বুড়ো মানুষের চরিত্র ছিল, যে-লোকটি নদিয়া আর যশোহর জেলার সীমান্তে একটি গাছের নীচে এসে অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন। দুটো আলাদা জেলা ওখানে মিশেছে, সেই বিশেষ রেখার ওপর দাঁড়াবার উপলব্ধি ওই বৃদ্ধকে আত্মহারা করে। বৃদ্ধ জীবনে অমন আনন্দ খুব কম পেয়েছেন।

অথচ কিছুই তো না, দুটো জেলার আলাদা সীমারেখা তো নেহাত খাতাপত্রে অথবা চালের কর্ডনিং-এর সময় পুলিশের পাহারায়, এ ছাড়া আর কী এমন আলাদা? তবু ওই বৃদ্ধ, প্রগাঢ় প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে, সংসারের সব দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে মিটিয়ে পদব্রজে ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। এ গ্রাম ও গ্রাম, এক জেলা থেকে আরেক জেলা—এতেই তিনি পেয়েছিলেন অপরিসীম আনন্দ, বৈচিত্র্যের

পরমাকাঙিক্ষত সুস্বাদ। বিভূতিভূষণের সেই বৃদ্ধাটিকে আমি ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসি।

নাম মনে নেই, একটি মার্কিন উপন্যাসে পড়েছিলুম, ট্রিলিং নামের একজন বিপত্নীক চাষির সংসারে সবচেয়ে প্রিয় ছিল তার কালো-ধূসর ঘোড়াটি। বিয়ের পর তার বউয়ের বাবা ওই ঘোড়াটি তাকে দিয়েছিল। বিয়ের ছ'মাস বাদেই ট্রিলিংয়ের বউ মরে যায়, তখন থেকে ওই ঘোড়াটিই ছিল তার একমাত্র সচিবসখা। সকালবেলা ঘোড়াটা এসে ট্রিলিংয়ের মুখের ওপর গরম নিশ্বাস ফেলে তার ঘুম ভাঙাত। বিকেলবেলা সেই ঘোড়ার পিঠে চেপে সূর্যাস্তের শোভা দেখত ট্রিলিং। রাত্রিবেলা চাঁদের আলোয় হেলান দিয়ে স্যাক্সোফোন বাজিয়ে যখন গান করত সে, তখনও একমাত্র শ্রোতা সেই ঘোড়া। এইরকমভাবে আট বছর কাটার পর একদিন ট্রিলিং-এর খুব জ্বর হয়েছে, ঘোড়াটা বিশ্বস্ত নার্সের মতন মাথার কাছে বসে থেকে বড়-বড় নিশ্বাস ফেলে ট্রিলিংকে বাতাস দিয়েছে, তারপর বিকেলের দিকে একটু বেরিয়েছে নিজের ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে। একটু পরেই একটা বন্দুকের শব্দ, আশঙ্কায় টলতে-টলতে বেরিয়ে এসে ট্রিলিং দেখল—তার বাড়ি থেকে অদূরেই মাঠের মধ্যে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে আছে ঘোড়াটা। ট্রিলিং যখন তার কাছে পৌঁছল তখনও সে মরেনি, বিশাল দুটি চোখ মেলে ট্রিলিং-এর দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে সে মরে গেল।

ট্রিলিং কখনও জানতে পারেনি কে বা কেন তার ঘোড়াটাকে মারল। হয়তো কোনও প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চার কিংবা কোনও আইটল, নেহাত কৌতুকের বশেই তাক পরীক্ষার জন্য গুলি ছুড়েছে। কিংবা অন্য কিছু, ট্রিলিং ভাবতেও পারে না। ট্রিলিং লোকটা ছিল নিরীহ ধরনের, প্রতিশোধ বা আততায়ীকে খোঁজার চেষ্টা ছেড়ে পরদিন সে তার বাড়ি জমি বিক্রি করে দিয়ে ক্যানসাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এই প্রথম সে তার জন্মস্থান ছেড়ে বাইরে যায়। ট্রিলিংয়ের উদ্দেশ্য ছিল, যে-দিকে দু-চোখ যায়, সেদিকেই হাঁটতে থাকবে, কোথাও থামবে না, যতদিন না সে লিটল রকির মতন ঠিক ওই রকম আর একটি কালো ধূসর ঘোড়া খুঁজে পায়।

হাঁটতে-হাঁটতে বহু মাস বছর কেটে যায়, ট্রিলিংয়ের টাকা পয়সা ফুরিয়েছে ইতিমধ্যে, এখন সে স্যাক্সোফোন বাজিয়ে গান গেয়ে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করে, ঘোড়া খোঁজার কথা আর ট্রিলিংয়ের মনে নেই, এক একটা প্রদেশ সে পায়ে হেঁটে পেরুচ্ছে, দেখছে প্রকৃতির বৈচিত্র্যের সমারোহ, নানা ধরনের মানুষ, নানা ধরনের সুখ-দুঃখ। সে নিজে ছিল চাষা, সল্ট লেকে এসে দেখল সেখানে নুনের মরুভূমি। নেভাডা যাওয়ার পথে, যতদূরে চোখ যায় ধূ-ধূ করছে জমি, কিন্তু সেখানে মাটিও নয়, বালিও নয়, গুঁড়ো-গুঁড়ো নুন। ট্রিলিং অভিভূত হয়ে ভাবল, পৃথিবীতে এমনও আছে বাড়ি থেকে না বেরুলে তো জানতে পারতুম না। গ্র্যান্ড কেনিয়নের প্রপাতের সামনে সে মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বহুক্ষণ, তারপর টুপি খুলে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বলেছিল, ঈশ্বর, তুমি আমায় মনুষ্যজন্ম দিয়ে ধন্য করেছ। এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে ট্রিলিং একদিন এসে পৌঁছল টেকসাসে, সেটা তো ঘোড়ারই রাজ্য। দেখল, সেখানে তার লিটল রকির মতন হুবহু কালো-ধূসর রঙের ঘোড়া অনেকগুলো। লিটল রকির জন্য তার বুক মুচড়ে উঠল পুরোনো কালের মতন। ট্রিলিং-এর টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার বুকের ক্রুশ চিহ্নটা ছিল সোনার, সেটাকে বিক্রি করে দিয়ে সে কালো-ধূসর একটা ঘোড়া কিনল। সেই ঘোড়াটার আকৃতি, হাব-ভাব সবই লিটল রকির মতন, অল্প ক্ষণেই ট্রিলিং-এর সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়ে গেল, কিন্তু ট্রিলিং দেখল, ঘোড়ার পিঠে চড়ে তার আর ভালো লাগছে না, হেঁটে হেঁটে ভ্রমণ করাই তার অভ্যেস হয়ে গেছে। ঘোড়া বড় তাড়াতাড়িই যায়। তখন ট্রিলিং ঘোড়াটাকে পাশে নিয়ে হেঁটে হেঁটেই ভ্রমণ শুরু করল, ঘোড়াটা যেন তার বাহন নয়, বন্ধু। ঘুরতে-ঘুরতে ট্রিলিং এসে পৌঁছল প্রশান্ত মহাসাগরের পারে। এর আগে সে সমুদ্র দেখেনি। বন্দরের একদল মানুষের মুখে শুনল, তারা ব্রাজিল যাচ্ছে, ব্রাজিল এক অদ্ভুত, অন্যরকম দেশ। শুনেই, ব্রাজিলে ভ্রমণ করার ইচ্ছে তীব্র হয়ে উঠল ট্রিলিং-এর মধ্যে। কিন্তু কী করে যাবে? ঘোড়াটা তার আগের লিটল রকির মতই এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু ঘোড়াটা আগের মতন, ট্রিলিং যে এখন অন্যরকম।

শেষ পর্যন্ত অত আদরের ঘোড়াটিকেও ট্রিলিং বিক্রি করে দিল, ব্রাজিলে যাওয়ার টিকিট কাটার জন্য।

বইটির লেখকের কথা আমার মনে নেই, কিন্তু ট্রিলিং-এর চরিত্র আমার দীর্ঘকাল ধরে মনে আছে।

সুদূর আফ্রিকা থেকে ইবন বতুতা এসেছিলেন বাংলা দেশে। সাতগাঁয়ের পথ দিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে তিনি অবাক। এ কোন্ দেশ, এর যেখানে সেখানে নদী, নদী ভরা নৌকো, নৌকোগুলি পরস্পরকে অতিক্রম করার সময় ডংকা বাজায়, গানের মতন সুরেলা ভাষায় কথা বলে এর জনপদের মানুষ। কী গাঢ় সবুজ এখানকার গাছপালা, লেবুর গন্ধ ভরা এখানকার বাতাস। এরকম দেশও পৃথিবীতে আছে, যেখানে জীবন যাপনের জন্য প্রায় পয়সা খরচ করতে হয় না বললেই চলে? ইবন বতুতা লিখেছেন—তখন মোট তিনজনের পুরো এক বছরের খাবার খরচ লাগত সর্বসমেত সাত টাকা। এখানে এক মণ ঘিয়ের দাম এক টাকা সাত আনা, এক মণ চালের দাম সাত পয়সা। একটি দুগ্ধবতী গরুর দাম তিন টাকা, একটি নারীর দাম দশ টাকা। ইবন বতুতা নিজের জন্য দশ টাকা দিয়ে আসুরা নামের একটি পরমা রূপসি মেয়েকে কিনলেন, ওঁর সঙ্গী কিনলেন লুলু নামের একটি ক্রীতদাস, কুড়ি টাকায়। এত দেশ ঘুরে ইবন বতুতার ভ্রমণ সার্থক। সময়, চতুর্দশ শতাব্দী, তখনকার সস্তা বাজারের জন্য আমার কৌতূহল নয়, ভাবতে অবাক লেগেছিল সেই আফ্রিকা থেকে একজন পর্যটক এসেছিলেন এতদূরের বাংলা দেশে। অধিকাংশ পথ পায়ে হেঁটে।

শ্রীহট্টের একজন ফকিরকে দেখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল ইবন বতুতার। ফকিরের নাম শেখ জালালুদ্দিন, শ্রীহট্টের কাছে এক পাহাড়ে তার বাস। ফকিরের দীর্ঘ শীর্ণ দেহ, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থেকে তপস্যা, করেন, কিচ্ছু না খেয়ে, এই রকম দশ দিন, তারপর একাদশ দিনের দিন সামান্য দুধ খেয়ে উপবাস ভঙ্গ। ফকির অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন, তিনি হাওয়ায় উড়তে পারেন, তিনি প্রত্যেকদিন ভোরবেলা অদৃশ্য হয়ে হাওয়ায় উড়ে গিয়ে শ্রীহট্ট থেকে চলে যেতেন মক্কায়, সেখানে নমাজ সেরে আবার সূর্যোদয়ের সময় ফিরে আসতেন। ইবন বতুতা নিজে শ্রীহট্টে পৌঁছে ফকিরের গুহায় আশ্রয় নিলেন এবং ওই অলৌকিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলেন।

'অনেকক্ষণ অনাবৃত পদে পাষাণময় বন্ধুর পথে বিচরণ করিতে করিতে পা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল। এখন শুষ্কপ্রায় কর্দমের উপর দিয়া চলিতে বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল।' পথ কোথাও রুক্ষ কঠিন, কোথাও নরম মসৃণ, তাতেই যা কখনও কষ্ট, কখনও আরাম। নিজে আরামের ব্যবস্থা করার কোনও চেষ্টাই নেই, কেন না, বিশেষ লক্ষণীয়, লেখকের খালি পা। শরৎচন্দ্র শাস্ত্রীর 'দক্ষিণাপথ ভ্রমণ' পড়েছিলাম। কাশীর টোল ছেড়ে শাস্ত্রী মশাই পরিভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, শুধু খালি পা নয়, মস্তকে ক্ষুদ্র টিকি আর অঙ্গে উত্তরীয়। কিন্তু বাঙালি তো, একটি মাত্র আরামের ব্যাপারে খুব সজাগ, উজ্জয়িনীতে শেঠের বাড়িতে হাজির হয়েই বলেছিলেন, 'আমরা রুটি খাই না, অন্ন আহার করিয়া থাকি।' কিন্তু রান্না তো নিজেকেই করতে হবে, উনুনটা সদ্য তৈরি করা, তাই ভিজে, কিছুতেই ধরতে চায় না। ভলকে-ভলকে শুধু ধোঁয়া বেরুচ্ছে, চোখের জলে নাকের জলে এক তবু শাস্ত্রীমশাই অসীম অধ্যবসায়ে উনুনে হাওয়া করতে লাগলেন, তাতে আরও বেশি ধোঁয়া, এসব উনুন ধরানো মেয়েদের কাজ কিন্তু শেঠ গিন্নিকে কিছু বলতে সাহস হয় না। কারণ শেঠের বয়েস পঞ্চাশের বেশি কিন্তু তার গৃহিনীর বয়েস পঁচিশ-ছাব্বিশ। শেঠের পরনে ময়লা কাপড়, সে নিজেই সব কাজকর্ম করে, আর শেঠ গৃহিণী 'কেবল সর্বদা দুই চারিখানি স্বর্ণালঙ্কার ও রঙিন সূক্ষ্ম বসন ও আঙরাখার দেহ আবৃত করিয়া বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়ায়।' একে উনুন ধরাতে বলা যায় না, তা ছাড়া শেঠ গৃহিণী একটি হাসির ফোয়ারা, উনুনের ধোঁয়ার মতোই তার মুখে সবসময় গলগল করে হাসি বেরুচ্ছে। তারপর কী হল, শেঠ গৃহিণীর হঠাৎ উনুন ধরিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে হল, তিনি গজেন্দ্রগমনে উনুন পর্যন্ত এসে পৌঁছবার আগেই দপ করে উনুনের আগুন জ্বলে উঠল। তখন হাসিতে সারা শরীর

দুলিয়ে শেঠ গৃহিণী বলল, দেখলে তো মহারাজ, তোমার এক ডাকাডাকিতেও আগুন এল না, শুধু ধোঁয়া পাঠাচ্ছিল। আর আমাকে দেখা মাত্রই আগুন জ্বলে উঠল। এর উত্তরে আর শাস্ত্রীমশাই কী বলবেন? তিনি যুক্তি দেখিয়েছেন, 'চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যেও অনেক রসিক আছেন, দুর্ভাগ্যক্রমে আমি ওই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।' সুতরাং শেঠনীর হাসি অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রীমশাই 'আলু, মুগের ডাল সিদ্ধ, আতপান্ন পাক করিয়া গব্যঘৃত, লেবুর চাটনি ও দুগ্ধের দ্বারা ভোজন শেষে করিলেন।' উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরের সামনে প্রণত সেই পর্যটক ব্রাহ্মণের মূর্তি আমি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই।

অনেক কাজ আমরা নিজেরা করি না, করতে পারি না, কিন্তু অন্য কেউ করছে জানলে বড় ভালো লাগে। ছেলেবেলা থেকে কত ভ্রমণকাহিনি পড়েছি, সবচেয়ে ভালো লাগে আমার পায়ে হেঁটে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। ছেলেবেলায় বোধ হয় সবাই মনে-মনে একবার অন্তত ভাবে, কোনওদিন সে তেপান্তরে মাঠ পাড়ি দেবে। পথিক শুনলেই মনে হয় একজন নিঃসঙ্গ মানুষ, কোথায় কোনও অজানা রাস্তায় আসন্ন গোধূলিতে অন্যমনে হেঁটে চলেছে। পরিব্রাজক কথাটা শুনলেই মনে হয়, তার কোনও গন্তব্য নেই, যে-কোনও জায়গায় সে যেতে পারে। একসময় কি যে-কোনও বালকই ভাবেনি, সেও একদিন নিরুদ্দেশের রাস্তায় বেরিয়ে পড়বে! বাল্য বয়সে সে রামমোহন রায়ের জীবনী পড়েছে, পায়ে হেঁটে রামমোহন রায় তিব্বতে চলে গিয়েছিলেন—সেও কি রামমোহন রায়ের সঙ্গে-সঙ্গে তিব্বত যায়নি? তারপর সেইসব বালকেরা ক্রমশ বড় হয়ে উঠেছে, শিক্ষা সমাপ্ত করে ক্রমশ ভদ্র, সভ্য ও যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছে, পোশাক পরিচ্ছদ নিখুঁত না হলে চলে না, কথাবার্তা যথোপযুক্ত, বিনা উদ্দেশ্যে কোনও কাজ করার আর তখন প্রশ্নই ওঠে না, সুতরাং তখন উদ্দেশ্যহীন পথে পরিব্রাজক হয়ে কে আর বেরুতে পারে? তখন সেলসম্যান হয়ে বা অফিসের কাজে যেত হয় নাগপুর বা কানপুর, কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে ছুটি কাটাতে শিলং পাহাড়, কিম্বা বয়স্ক হয়ে ওঠার প্রধান লক্ষণই হল জমি কেনা কিংবা বাড়ি কেনার চেষ্টা, অর্থাৎ স্থায়ী হওয়া, স্থাবরের অধীশ্বর হওয়া। শুধুই পথকে ভালোবেসে কে আর পথে বেরিয়ে পড়তে পারে?

অনেকেই পারে না, যেমন আমি পারি না, তবু কি মনে-মনে কল্পনা করতে ইচ্ছে হয় না, পৃথিবীর পথে-পথে এখনও পরিব্রাজকরা ঘুরছে? না কি, সবাই ভদ্র, সভ্য এবং যুক্তিবাদী হয়ে গেল, আর কেউ অনাসক্ত পরিব্রাজক নেই? ভাবতে আমার ভয় হয়। কালচারাল ডেলিগেশন, বাণিজ্যিক মিশন, ছুটি কাটানো বা স্বাস্থ্যোদ্ধারে ভ্রমণ, ভ্রমণকাহিনি লেখা বা উপন্যাসের উপকরণ খোঁজার জন্য ঘুরে বেড়ানো—এগুলি অবশ্যই বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু শুধু পথের প্রেমিক কোনও পরিব্রাজককে যেন চোখ বুঝলে আর দেখতে পাই না। মনে পড়ে পৃথিবী যত বেশি স্বাধীন হচ্ছে ততই ছোট হয়ে যাচ্ছে পৃথিবী, এখন পথের বাঁকে-বাঁকে ভিসা, পাসপোর্ট আর রিজার্ভ ব্যাংক ডিক্লারেশন, দুই সহোদরা দেশেরও একদিক থেকে অন্যদিকে যাওয়া যাবে না। ভাবতে ভয় হয় যে, পরিব্রাজক হয়তো এসে দাঁড়িয়েছেন কোনও এক অজানা দেশের সীমান্তে। অমনি সীমান্ত প্রহরীবৃন্দ এসে বলবেন, কী চাই হে তোমার? পরিব্রাজক উদাসভাবে উত্তর দিলেন, আমি কিছুই চাই না, শুধু পথ অতিক্রম করে যেতে চাই!

কিছুই চাই না? এই কথাটাই যে এই বস্তুবাদী পৃথিবীতে সন্দেহজনক। এক প্রহরী তখন নিশ্চিত চোখ মটকে অপর প্রহরীকে বলবে, এ ব্যাটা তাহলে নিশ্চয়ই স্পাই! কী রকম নিখুঁত ছদ্মবেশ!—তখন পরিব্রাজকের কাঁধে এসে পড়বে—তাদের নোংরা হাত, ভাবতে আমি শিউরে উঠি।

না, একজন না একজন পরিব্রাজক আমাদের সব সময় চাই। আমরা যারা ধরাবাঁধা জীবনে আছি, প্রতিদিন প্রায় একই পথ হেঁটে বেঁচে আছি, বাসস্থান, কর্মস্থান আর বান্ধবগৃহ একই ছক-বাঁধা পথে, আমরা মাঝে-মাঝে স্বপ্নে অন্তত দেখতে চাই—কোথাও কোনও অজ্ঞাত জনপদে, রুক্ষ পাহাড়ি পথে, রহস্যময় অরণ্যের মধ্য দিয়ে একজন ছন্নছাড়া পরিব্রাজক আমন মনে হেঁটে চলেছে।
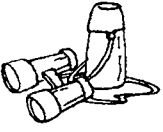
শৈল শিখরে শীতের সন্ধ্যা-সকাল

মাথার মাংকিটুপিতে মুখের প্রায় অর্ধেকটা ঢাকা, দুহাতে নকল চামড়ার গ্লাভস, গলাবন্ধ ঝোলা কোট, পায়ে পেল্লায় ভারী জুতো, সব মিলিয়ে আমায় দেখতে কী রকম লাগছিল কে জানে! এই পোশাকে আমি অবশ্য এভারেস্টের চুড়োয় কিংবা দক্ষিণ মেরু অভিযানে যাইনি, ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম দার্জিলিং-এর ম্যালে। সময়টা অবশ্য মধ্য ডিসেম্বর।

আমার শীতকালে যেতে ইচ্ছে করে শীতের দেশে, বর্ষার সময় সমুদ্র কিনারে আর ঘোর অমাবস্যার রাতে মিশমিশে অন্ধকার জঙ্গলে। নিজের বাড়ির বিছানাটা সারা বছরই ভালো কিন্তু বাইরে বেড়াতে গেলে প্রকৃতির বাড়াবাড়িপনাই বেশি উপভোগ্য।

আমরা গরম দেশের মানুষ, আমাদের এখানে শীতকালটা যেন ভুল করে পরের বাড়ি ঢুকে লজ্জায় জিভ কেটে চলে যাওয়ার মতন। তাই যতটা পারা যায়, শরীরে শীত পুইয়ে নিতে ইচ্ছে করে। কাশ্মীর বা সিমলা পাহাড় তো অনেক দূরের এবং খরচের ব্যাপার, হাতের কাছেই আছে দার্জিলিং, তাই প্রতি শীতেই দার্জিলিং আমায় হাতছানি দেয়। শীতে দার্জিলিং-এর হোটেল শস্তা, জায়গা পাওয়ার জন্য মাথা ঘামাতে হয় না। বরং ওরা হাতে ধরে টানাটানি করে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সময় দার্জিলিং-এ চেনা-আধচেনা, পছন্দের-অপছন্দের মানুষদের সঙ্গে দুবেলা গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে হয় না।

এই ডিসেম্বরে যখন দার্জিলিং যাই তখন অনেকে ভয় দেখিয়ে বলেছিলেন, এবারে বেশি শীত পড়েছে, ফ্রস্ট বাইট হবে, নিউমোনিয়া লেগে যাবে, এমন সর্দি ধরবে যে বারো বছরের আগে ছাড়বে না ইত্যাদি। তাই আমি পোশাকের ব্যাপারে বড্ড বেশি-বেশি করে ফেলেছিলুম। ম্যালে খানিকক্ষণ ঘোরার পর বাঁদুরে টুপির জন্য আমার কান গরম হয়ে গেল, পিঠে কুলকুল করছে ঘাম, দুহাতে গ্লাভস পরে থাকাও ঝকমারির ব্যাপার, তাতে সিগারেট টানা যায় না।

ক্রমে খুলে ফেললুম মাথার টুপি ও হাতের গ্লাভস, কোটের দুটো বোতাম। খোলার পরও শীত ঝাঁপিয়ে এসে আক্রমণ করল না বরং আরামের প্রলেপ বুলিয়ে দিল। এখন বেশ সাবলীলভাবে হাঁটা যায়।

ম্যাল যতটা ফাঁকা হবে মনে করেছিলুম, ততটা ধু-ধু ফাঁকা নয়। ভেবেছিলুম, শুধু সাহেব-মেমদেরই দেখব, কিন্তু বাঙালিও তো কিছু রয়েছে দেখছি। কেউ-কেউ এসেছে অন্য রাজ্য থেকে। শীতকালেই যে পাহাড় দেখতে হয়, তা বুঝেছে আমাদের দেশের মানুষ। অন্য সময় তো যখন তখন মেঘ, বৃষ্টি কিংবা কুয়াশা। অন্য সময় দার্জিলিং-এ এসে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার সৌভাগ্য হয় ক'জনের। আর এখন তো সকাল থেকেই অঢেল কাঞ্চনজঙ্ঘা, যত খুশি দেখো, এমনকি এক এক সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা দারুণ সেজেগুজে ছবি তোলানোর জন্য পোজ দিয়ে থাকে, কিন্তু সেদিকে তাকাবার কথা মনেই পড়ে না। রোদ্দুর যে কত ঝকঝকে হতে পারে তা দেখতে হলেও শীতে পাহাড় চূড়ায় আসতে হয়।

পর্যটন দফতরের ডেপুটি ডিরেক্টর আমেদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি সব সময় ফিটফাট সাহেব সেজে থাকেন। প্রত্যেক শীতে তিনি তাঁর পরিবারের লোকজনদের সমতলে পাঠিয়ে

দিয়ে নিজে থেকে যান এখানে। তাঁকে কথায়-কথায় বললুম, কী শীতের ভয় দেখাচ্ছিল সবাই? আপনাদের দার্জিলিং-এ শীত কোথায়? আমার তো একটা উলের গেঞ্জি আর একটা কোটেই বেশ চলে যাচ্ছে।

আমেদ সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, আর শীত চান? তাহলে টাইগার হিল চলে যান। সেটা তো আরও অনেক উঁচুতে, সেখানে বরফ পেয়ে যেতে পারেন।

আমি পরজন্ম মানি না কিন্তু পূর্বজন্ম মানি। পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে সব জায়গাতেই আমি বন্ধু পেয়ে যাই কেন? অচেনা মানুষও আমার দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমেদ সাহেব সরকারি কাজে সেই বিকেলেই টাইগার হিল পরিদর্শনে যাবেন, আমাকেও তুলে দিলেন তাঁর জিপে। টাইগার হিলে আমি অনেকদিন আগে একবার গিয়েছিলুম, পায়ে হেঁটে। বড় দলের সঙ্গে। সেটা ছিল শরৎকাল। বৌদ্ধদের কী একটা পরবের মিছিল দেখেছিলুম মনে আছে। এবারেও ঘুম ছাড়াবার পর নিরিবিলি রোমাঞ্চকর রাস্তায় এক জায়গায় দেখি বৌদ্ধদের মিছিল। এই শীতের মধ্যেও তাদের মুখগুলি নিরভিমান, পোশাকে বর্ণবাহার আছে, কিন্তু আতিশয্য নেই। এখন গ্লাভস না পরে আর পারছি না আমি, আঙুলগুলো বেঁকে যাবে মনে হয়, কিন্তু এই পাহাড়িদের সবারই হাত নগ্ন।

টাইগার হিলের আদি বাংলোটি ইংরেজ পছন্দ। পাশে নতুন ডানা গজাচ্ছে। বাংলোর বাইরের বারান্দায় বেশ কয়েকজন জাপানি পর্যটক বসে আছে, প্রত্যেকের চেয়ারের নীচে একটি করে লাল গনগনে হিটার। হ্যাঁ, এখানকার ঠান্ডাটি হাড়ে-হাড়ে টের পাওয়ার মতন বটে।

দুজন চেনা বাঙালির সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল। একজন হলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আর একজনকে আমি গল্প লেখক আদিনাথ ভট্টাচার্য বলেই চিনি, কিন্তু এখানে বোঝা গেল সেই রোগা পাতলা মানুষটি বেশ একজন হোমরাচোমরা, কর্মসূত্রে পর্যটক করপোরেশনের পরিচালক। জমে গেল আড্ডা, চায়ের সঙ্গে গরম-গরম পেঁয়াজি।

খানিক বাদে আদিনাথ ভট্টাচার্য প্রস্তাব দিলেন, চলুন, আর একটু ওপরে ওয়াচ টাওয়ার থেকে সূর্যাস্ত দেখে আসা যাক।

একটু ওপরে মানে অবশ্য বেশ ওপরে। হাঁটতে-হাঁটতে হাঁপিয়ে যেতে হয়। শীতের মধ্যে ভালো ব্যায়াম। একটি সুদৃশ্য গেট পেরিয়ে সিঁড়ি। একেবারে টঙে ওয়াচ টাওয়ার। তার একতলাটা এজমালি, দোতলায় উঠতে গেলে টিকিট কাটতে হয়, কেন না সেখানে বসবার জায়গা আছে। টিকিট কেটে ওপরে এসে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলুম। না, সূর্যাস্ত নয়। সূর্যবিহীন এক রঙের খেলা। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। আকাশের এখানে-ওখানে সাদা মেঘ, তার এক এক প্রান্তে ম্যাজিকের মতন লাল রং জ্বলে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। যেন এক অদৃশ্য মশালধারীর দৌড়।

বাংলোয় ফিরে এসে আহারাদি হল বেশ প্রলম্বিত। আড্ডা চলল আরও লম্বাভাবে। এখানকার ম্যানেজার তামাং সাহেব প্রাক্তন ফৌজি মানুষ, ভূত-প্রেত, ঠাকুর দেবতা, সাপখোপের প্রচুর গল্প তাঁর স্টকে। বলার ভঙ্গিটি যেমন মজাদার, তেমনি রোমহর্ষক।

রাত সাড়ে বারোটার সময় তিনি গল্প সমাপ্ত করে বললেন, এবারে শুয়ে পড়ুন। ঠিক ভোর সোয়া চারটেয় সময় ডেকে দেব। চা খেয়ে সানরাইজ দেখতে যাবেন।

রাত সাড়ে বারোটায় শুয়ে ভোর সোওয়া চারটেয় ওঠা, পাগল নাকি? এখানে সানরাইজ দেখতেই সবাই আসে। উনি ধরেই নিয়েছেন আমরাও তার জন্য ব্যস্ত। আমার ধারণা হল, তামাং সাহেবের নিজেরই ঘুম ভাঙবে না।

শীতটা ঠিক কতটা তা বোঝাবার জন্য একবার বারান্দায় আসতেই হু-হু হাওয়া আমার দু'গালে যেন থাপ্পড় কষাল। ভয়ে পালিয়ে এলাম ঘরের মধ্যে।

তারপর আর ঘুম আসে না। ঘরের মধ্যে দুটো হিটার জ্বলছে, বিছানায় দুখানি করে লেপ,

তার নীচে গরম জলের বোতল, একটু পরেই আমার ঘাম বেরুতে থাকে। আবার লেপ সরালেই শীতে জমে যাওয়ার উপক্রম। তা ছাড়া, পায়ের কাছে বেশি গরম, মাথার কাছে বেশি ঠান্ডা। এ তো মহাজ্বালা!

হঠাৎ বাইরে হইচই শুনে ভাবলুম ডাকাত পড়ল নাকি? তা নয়। এরই মধ্যে সোওয়া চারটে বেজে গেছে। তামাং সাহেব আশ্রমিকদের জাগাবার জন্য ডাকাডাকি করছেন। ভেবেছিলুম আমাদের দলের কেউ যাবেন না। কিন্তু দেখি যে আদিনাথবাবু, আমেদ সাহেব, এমনকি শীতকাতুরে সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত পর্যন্ত একে-একে তৈরি। পুণ্যলোভ না প্রকৃতিপ্রেম? আপাতত ও দুটোই মাথায় থাকুক। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত আমায় অনেক ডাকাডাকি করলেন, আমি ঘাপটি মেরে পড়ে রইলুম।

ওরা চলে যাওয়ার বেশ খানিকটা পরে আমার সামান্য অপরাধ বোধ হল। ভোরের সূর্যকে এতটা হেলাতুচ্ছ করা ঠিক নয়। বিছানার লেপটাই গায়ে জড়িয়ে চলে এলাম বাইরের বারান্দায়। কিন্তু কিছুই তো দেখা যাচ্ছে না, সামনে দিগন্ত জুড়ে শুধু নীল-নীল কুয়াশা। এমন ঠান্ডা যে মনে হল আমার নাকটা নেই। আঙুল দিয়ে দেখে নিতে হল, সত্যি সেটা খসে পড়েছে কি না। যাক আর কোনও দায়িত্ব নেই, ফিরে এসে সটান আবার বিছানায়, এবং বেলা আটটা পর্যন্ত টানা ঘুম।

জেগে উঠে শুনলুম, ওপর থেকে ভালোই সূর্যোদয় দেখা গেছে। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত এমনই অভিভূত হয়েছেন যে তিনি নিবিড় মনোযোগ দিয়ে কবিতা রচনা করছেন। সেটি শেষ হওয়ার পর অনুরোধ করলুম, পড়ে শোনাবেন আমাদের?

চমৎকার কবিতা, গভীর উপলব্ধি ও শব্দঝংকার বিশেষ ব্যঞ্জনাময়। সেই কবিতা শুনেই আমার অনেক পরিব্যাপ্ত সূর্যোদয় দর্শনের অনুভূতি হল।
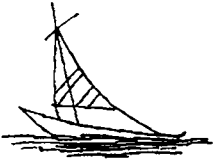
অনেক দিন পর

ঘুম ভাঙল বিউগলের শব্দে। চমকে ধড়মড় করে উঠে এলাম বিছানা থেকে। ঘড়িতে সকাল ছ'টা। জানলার কাচে প্রচুর আলো, পাহাড়-চূড়ায় তাড়াতাড়ি ভোর হয়। বিউগলের শব্দ শুনে প্রথমেই আমার মনে হল, তাহলে কি একটা মিছিল বেরিয়েছে? কাল বিকেল থেকেই বিরাট ধরনের কোনও জয়োল্লাস কিংবা গোলমালের প্রতীক্ষা কিংবা আশঙ্কা করছিলাম যেন। কিন্তু সে-সব কিছুই না। পাশেই একটা ইস্কুল, সেখানকার ছেলেরা এই সাত-সকালে বিউগল বাজানো শিখছে, অন্যদিকে পাকদন্ডি বেয়ে উঠে আসছে ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা। রাস্তায় শুরু হয়ে গিয়েছে লোক-চলাচল। সামনের জলাপাহাড়ে চলছে ঐরাবতের মতন মেঘেদের বপ্রক্রীড়া, আকাশে ঠান্ডা আলো, একটা শান্ত, স্নিগ্ধ সকাল। কিছুই অস্বাভাবিক নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে আছে মানুষ, এই প্রভাতের প্রসন্নতার সঙ্গে শিক্ষার্থী শিশুদের বিউগলের ফুঁ-ও একটুও বেমানান লাগে না। আজকাল সুসংবাদ বড় দুর্লভ। বরং বিপরীতটাই বেশি। প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে মনে হয় বাড়ির সবাই ঠিকঠাক আছে তো? কিছু গন্ডগোল ঘটেনি? প্রবাসে গেলেও গলায় কাঁটা ফোটার মতো উৎকণ্ঠা থেকে যায় দেশের জন্য। আমি সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশে গিয়েছিলাম, অনেকদিন খবরের কাগজ পড়িনি, ফিরে আসার পরই কয়েকজনের মুখে শুনলাম, দার্জিলিং-সমস্যা মিটে গিয়েছে! প্রথমে বিশ্বাস করতেই চাইনি। কোনও সমস্যাই কি মেটে? ছোট্ট কিংবা নিরীহ ধরনের কোনও সমস্যার বীজ

রাষ্ট্রনায়কদের অবহেলায় দু-চার বছরে মহীরুহ হয়ে ওঠে, চতুর্দিকে তার ডালপালা ছড়াতেই থাকে, এই রকমই তো এখন চলছে ভারতবর্ষ জুড়ে। গত দু'বছরে আমাদের অনেকেরই মনে গভীর নৈরাশ্য দানা বাঁধছিল, মনে হচ্ছিল, আবার বুঝি বঙ্গভঙ্গ আসন্ন, দার্জিলিং কালিম্পংয়ের মতন সুন্দর শৈলশহর অনধিগম্য হয়ে যাবে। হঠাৎ এরই মধ্যে পাহাড়ি গোর্খাদের নেতা সুবাস ঘিসিং গোঁ ছেড়েছেন, তিনি পার্বত্য পরিষদ মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন। তাহলে তো বোমা-বন্দুক, বিধ্বংসী আগুন আর কুকরির ঝলসানি থেমে যাওয়ার কথা। যারা দাবি আদায়ের জন্য প্রাণ দিচ্ছিল কিংবা অন্যের প্রাণ নিচ্ছিল, তারা কি খুশি হয়েছে? সেইসব দেখার কৌতূহলেই দার্জিলিং ছুটে আসা।

শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে পাহাড়ে উঠতে-উঠতে প্রথমে খটকা লেগেছিল। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া নেই বললেই চলে, দু-চারটি মাত্র সরকারি কিংবা সিপাহিদের গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসছে, পথচারীও বিশেষ চোখে পড়ে না। অথচ আগে যতবার এসেছি, এই রাস্তায় প্রচুর যানবাহন ও মানুষজন দেখেছি। ফাঁকা রাস্তা গাড়ি চালাবার পক্ষে সুবিধেজনক, কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকেই যায়। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিতে ঝলমল করছে গাছপালা, দু পাশে ফুটে আছে অজস্র বুনোফুল, কিন্তু সে সৌন্দর্যের দিকেও বেশিক্ষণ আকৃষ্ট হতে পারি না। মানুষ মানুষকেই ভয় পায়, আবার মানুষ মানুষকেই চায়।

কার্শিয়াংয়ের কাছাকাছি এসে দৃশ্য বদলে গেল। বেশ কিছু গাড়ি যাওয়া-আসা করছে, বাস ভরতি মানুষ জিপ কিংবা ট্রেকারে ভরতি যুবকদের দল, দোকান-পাট সব খোলা। মনে হল যেন, সমতলের সঙ্গে যোগাযোগ এখনও ততটা স্বাভাবিক না-হলেও পাহাড়ি এলাকার মধ্যে জীবনযাপনের ব্যস্ততা ঠিকই চলছে। ছোট রেল প্রায় এক বছরের বেশি বন্ধ, তাই ট্যাক্সি-ট্রাকে গাদাগাদি করে অনেককে যেতে হচ্ছে এক স্টেশন থেকে অন্য স্টেশনে।

চা খাওয়ার জন্য থামা হল কার্শিয়াঙ টুরিস্ট লজে। চমৎকার কাঠের বাড়িটি, টেবিলের পাশেই অনেকখানি চোখ জুড়োনো নিসর্গ। বছর তিনেক আগে পর্যটন দফতরের কর্তাদের সঙ্গে আমরা কয়েকজন এসেছিলাম এখানে। উপরতলায় রেস্তোরাঁ। নীচের তলায় রাত্রিবাসের জন্য কক্ষ। এই নবনির্মিত লজটি নিয়ে পর্যটন দফতরের বেশ গর্ব ছিল। শোনা গেল, আন্দোলনের তীব্রতার সময় এই বাড়িটিকে পুড়িয়ে দেওয়ার অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একেবারে রাজপথের উপরেই বলে সেটা সম্ভব হয়নি। এখনও বালির বস্তার আড়ালে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে এক রাইফেলধারী সৈনিক। দিনকাল এমনই পড়েছে যে, কোথাও চা খেতে গেলেও রাইফেল-বন্দুক দেখতে হয়! তাতে চায়ের স্বাদ একটু কমে যায় না?

রেস্তোরাঁটি পরিচ্ছন্ন কিন্তু ফাঁকা। আর একটিমাত্র টেবিলে যে ব্যক্তিটি বসে আছেন, তিনি স্থানীয় এস ডি ও, আমার সঙ্গে তাঁর পূর্ব-পরিচয় নেই, কিন্তু আমার সহযাত্রী তাপস মুখার্জিকে দেখে তিনি উঠে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তরুণ বয়স্ক অবাঙালি এই রাজপুরুষটির চেহারায় এখনও কলেজীয় যুবকের আদল। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চেয়েও তিনি কাছাকাছি এক জায়গার বিরাট ধসের ব্যাপারেই বেশি উদ্বিগ্ন। তবু সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কথা এসেই যায়। তাপসবাবুর সঙ্গে তাঁর কথাবার্তার মধ্যে আমি জিগ্যেস করলাম, একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না, জঙ্গি জি এন এল এফ নেতা ঘিসিং যুদ্ধং দেহি মনোভাব ছেড়ে হঠাৎ পার্বত্য পরিষদ গঠনের প্রস্তাবে রাজি হলেন কেন? রাজপুরুষটি হেসে বললেন, দ্যাট ইজ আ মিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন!

আমার যাত্রা শুরু। কার্শিয়াংয়ের আগে ও পরে বেশ কিছু জায়গায় রাস্তা বেশ খারাপ, কয়েকদিন আগেও ধসের জন্য এই রাস্তা বন্ধ ছিল, এখনও মেরামতির কাজ চলছে, দু-এক জায়গায় গাড়ি চলে বেশ সন্ত্রস্তভাবে। এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে বেশ বড় একটা গর্ত, তাপসবাবুর দিকে তাকাতেই তিনি মৃদু গলায় বললেন, মাইন পোঁতা ছিল। কয়েক জায়গায় এ রকম মাইন বিস্ফোরণ হয়েছে।

তাপস মুখার্জি একজন শান্ত ধরনের সাহসী মানুষ। তাঁর জন্ম দার্জিলিংয়ে। তিন পুরুষ ধরে

এই শহরে বাস, নেপালি বলতে পারেন মাতৃভাষার মতন, তবু এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁকে একবার প্রায় মৃত্যুমুখে পড়তে হয়েছিল, এক শীতের রাত্রে একদল উগ্রপন্থী গোর্খা তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে চোখে বেঁধে নিয়ে যায়, তারপর শেষ পর্যন্ত তিনি কীভাবে রক্ষা পেলেন, সে এক রোমহর্ষক কাহিনী, কিন্তু তাপসবাবু সে ঘটনা নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে চান না, এখনও পাহাড়ের যত্রতত্র তাঁর অবাধ গতি। দার্জিলিংয়ের কাছাকাছি এসে আবার মনে পড়ল, এই শহরে আমি শেষবার এসেছিলাম উনশশো পঁচাশি সালে, দার্জিলিং শহর স্থাপনের দেড়শো বছর পূর্তি উৎসবে যোগ দিতে। সে বার লেখক ও সঙ্গীত-শিল্পীদের একটি বড় দল এসেছিল, উৎসবে গোর্খা লেখক ও শিল্পীরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। সে বারে আমরা ঘিসিংকে দেখিনি, সেরকম কোনও আন্দোলনেরও চিহ্ন ছিল না, তবে কী রকম যেন একটা আলগা-আলগা ভাব ছিল, গোর্খা লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আমাদের আড্ডা হল না, বন্ধুত্ব হল না। আমাদের দিক থেকেই কোনও ত্রুটি হয়েছিল? আমরা দার্জিলিংয়ে অতিথি, সেখানকার অধিবাসীরাই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, এটাই রীতিসম্মত নয় কি? পরে শুনেছিলাম, সেই উৎসবে সমতলের লোকদের যোগ দেওয়াটাই নাকি গোর্খারা অনেকে পছন্দ করেননি! এটি একটা অদ্ভুত কথা!

সেই সময়েই সমরেশ বসু অসুস্থ হয়ে পড়লেন হঠাৎ। অসম্ভব মনের জোরে তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠে নিজের পায়ে হেঁটেই দু-দিন বাদে বেরিয়ে এলেন হাসপাতাল থেকে। মাত্র এই তো সেদিনের কথা। এখন আর তিনি নেই, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। সে বারে দার্জিলিংয়ে প্রচণ্ড ভিড় দেখেছিলাম। ভ্রমণপ্রিয় বাঙালির কাছে দার্জিলিং-কালিম্পং বরাবরই অবশ্য দ্রষ্টব্য, গ্রীষ্মকালে ও পুজোর ছুটিতে শুরু হত দার্জিলিং-অভিযান। ইদানীং শীতে-বর্ষাতেও আনাগোনা শুরু হয়েছিল। আমি একবার জানুয়ারি মাসেও এসে যথেষ্ট পর্যটক দেখেছি, শুধু সাহেব-মেমরাই নয়, বাঙালিরাও ঠান্ডা বাতাস ভালোবাসতে শিখেছে। বর্ষাকালেও পাহাড়-বনরাজি বড় নয়নাভিরাম। এক একবার দার্জিলিংয়ে এসে এত চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছে যে মনে হত, তা হলে আর দার্জিলিংয়ে এলাম কেন, গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিলেই হত! ম্যালের শৌখিন পোশাক পরা জনতাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

এ বার সেই ম্যাল পুরোপুরি ফাঁকা। বসবার বেঞ্চিগুলো সব ক'টাই উধাও। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিসের সামনে অনেকবার বোমাবাজি হওয়ার খবর শুনেছি, এখন সেখানে দু'জন জলপাই-রঙের পোশাক পরা প্রহরী নিথরভাবে দণ্ডায়মান। খানিকটা দূরে একটা গাছতলায় প্রায় গাছেরই সঙ্গে মিশে আছে চার-পাঁচজন বি এস এফ-এর জওয়ান। দু-জন মাত্র ঘোড়াওয়ালার মধ্যে একজন নিজেই নিজের ঘোড়া চালিয়ে এল এক পাক। খদ্দের না পেলেও ঘোড়াদেরও তো ব্যায়াম দরকার। দোকানগুলি খোলা, কিন্তু অন্য বারের মতন কেউ ডাকাডাকি করছে না আমাদের, কেউ চোখে চোখ ফেলছে না, কথা বলছে না একটাও। কী ব্যাপার, এরা কি এখনও আমাদের শত্রুপক্ষ মনে করছে নাকি? ম্যাল থেকে ঘড়ি-গম্বুজ পর্যন্ত হেঁটে এলাম একবার। রাস্তার পাশে সোয়েটার, শাল, টুপি খেলনাপাতি সাজিয়ে পসারী-পসারিণীরা বসে আছে ঠিকই, কিন্তু কেউ আমাদের সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে গ্রাহ্যই করল না।

স্থানীয় অধিবাসীরা কেউ-কেউ যাতায়াত করছে ম্যালের ওপর দিয়ে, নিঃশব্দে। যেন কথা বলা নিষিদ্ধ। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ডের বদলে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ পেয়ে এরা অখুশি? তার কোনও প্রকাশ্য চিহ্ন এখনও দেখিনি। মধুর অভাবে গুড় পেয়েও সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে? দাঙ্গা-হাঙ্গামা, খুনোখুনি কতদিন লোকে সহ্য করতে পারে! কিন্তু সাধারণ মানুষ মুখ খুলতে রাজি নয় মনে হচ্ছে।

কফি-তেষ্টা মেটাতে স্টেপ অ্যাসাইডের দিকের একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়লাম। বাইরের চত্বরে কয়েকজন বৃদ্ধ ও অন্যান্য নারী পুরুষ নিজেদের মধ্যে কী যেন কথা বলছিলেন, হঠাৎ থেমে

গেলেন আমাদের দেখে। চেয়ে রইলেন আমাদের মুখের দিকে। কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও মন্তব্যও নয়। এতে খানিকটা অস্বস্তি লাগে, আমরা কি এখানে অবাঞ্ছিত? দোকান খুলে রেখেছে, যে-কেউ তো সেখানে আসতে পারে। কিন্তু খদ্দের দোকানে ঢুকলে সামান্য অভ্যর্থনাও করবে না? একজনের চোখে চোখ রেখে সরাসরি প্রশ্ন করলুম, কফি মিলেগা? তিনি নিস্পৃহভাবে বললেন, হাঁ, মিলেগা!

দোকানের ভিতরে আর কেউ নেই। আমরা জানলার ধারে টেবিলে বসার পর কাউন্টার থেকে একটি কিশোর উঠে এল। ভাবলেশহীন মুখ। যেন সে কিছুতেই হাসবে না প্রতিজ্ঞা করেছে। তাকে কফি এবং কোল্ড ড্রিংকসের অর্ডার বুঝিয়ে দেওয়ার পর সে যেন হঠাৎই অসাবধানে বলে ফেলল, ঠিক আছে। ঠিক হ্যায় বলেনি, ঠিক আছে! তার মুখে এই সামান্য বাংলা শুনেই যেন গলে গেলাম একেবারে! সে অবশ্য বিল মেটাবার সময় টিপ্‌সের পয়সাটা গ্রাহ্যও করল না, টেবিলের ওপরেই পড়ে রইল প্লেটে।

সারাদিন দার্জিলিং শহরে ঘোরাঘুরি করার পর মনে হল, এখানকার অবস্থা স্বাভাবিকই তো হয়ে গিয়েছে। সর্বত্র যাওয়া-আসার কোনও অসুবিধা তো নেই। একটা যে থমথমে ভাব দেখেছি, সেটা অনেকটাই হয়তো আমার কল্পনা। পার্বত্য পরিষদ নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে কেউ কোনও উচ্ছ্বাস দেখাচ্ছে না বটে, তা তো হতেই পারে, এর ফলাফল কী হবে, তা বুঝে নেওয়ার সময় নিচ্ছে।

সন্ধেবেলাতেই খবর পাওয়া গেল, চকবাজারে দুটি দোকান লুট হয়েছে।

॥ ২ ॥

ঘুম পর্যন্ত এসে আমরা ওপরের রাস্তা ধরলাম টাইগার হিলের দিকে। ছেলেবেলায় ঘুম নামটি শুনলেই একটা অদ্ভুত আবেশ বোধ হত। ছোট ট্রেনে আসতে-আসতে আমরা স্টেশনের নামগুলি মুখস্থ রাখতাম এইভাবে ছড়া বানিয়ে। কার্শিয়াং-টুং, সোনাদা-ঘুম! সেই ট্রেনের লাইনে এখন মরচে পড়ে গেছে, ঘুম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে গুচ্ছের সি আর পি। এক ঝাঁক পায়রার মতন হঠাৎ বৃষ্টি এসেই আবার উড়ে চলে গেল।

টাইগার হিলের রাস্তা বিষম খাড়াই, গাড়ি উঠছে গোঁ-গোঁ শব্দ করে। জোড়বাংলোর পর জনবসতি আর নেই বললেই চলে। দু-একটি বাড়ির সামনে কর্মরত নারী পুরুষরা মুখ ফিরিয়ে সবিস্ময়ে তাকাচ্ছে। রাস্তার পাশে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে কাঠকুড়ানি কামিনরা, যেন অনেকদিন তারা কোনও গাড়ি দেখেনি। আমাদের দার্জিলিং শহরের বাইরে কিছুটা ঘোরাঘুরির প্রস্তাবে তাপস মুখার্জি প্রথমে একটু খুঁতখুঁত করছিলেন, চিন্তিত ছিলেন আমাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে, শেষ পর্যন্ত নিজেই মত বদল করে জোগাড় করে আনলেন গাড়ি। এখানে বৃষ্টিতে সদ্য স্নান করা দু-পাশের সবুজ বনানীর মধ্যে এমন একটা স্নিগ্ধতা রয়েছে, এমন একটা শান্তির ভাব যে, কোনও বিপদের কথা মনেই আসে না।

একদিন আগেই সন্ধেবেলা দুটি দোকান লুঠ এবং কয়েকজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে গুম করার কথা শোনা গেলেও পরদিন সকালবেলা আবার দোকান-বাজার ঠিকই খুলেছে, সব কিছুই আপাত স্বাভাবিক। কপালে সবুজ ফেট্টি বাঁধা জি এন এল এফ-এর যুবা কর্মীদের যেমন অনেক জায়গায় ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা যায়, সেইরকমই তারা নাকি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দাম কেউ বেশি বাড়ালে সেইসব দোকানদারদের শাসায়, ধরে নিয়ে গিয়ে চড়-চাপাটি দেয়, কিছু কিছু লুটপাটও হয়। সেইসময় রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নেই এমন কিছু কিছু চরিত্র অরাজকাতর সুযোগ নিয়ে পেশি ও কুকরি প্রদর্শন করতে পারে, লোকজন ভয়ে দৌড়োদৌড়ি করে। তবু, এইসব ছোটখাটো বিপদের পটভূমিকাতেও জীবনের স্রোত থেমে থাকে না।

অবশ্য এরকম দু-একটি ঘটনার কথা আমি শুনেছি মাত্র, চোখে দেখিনি।

টাইগার হিলে আমি কখনও বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখতে যাইনি। তবে একটা রাত্রি কাটিয়েছিলাম ওখানকার চমৎকার টুরিস্ট বাংলোতে। বছর তিনেক আগের কথা। সেবার সঙ্গে ছিলেন কবি সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং পর্যটন কর্পোরেশনের ডিরেকটর আদিনাথ ভট্টাচার্য। জানুয়ারি মাস, আকাশ ঝকঝকে নীল, পাহাড়গুলি যেন নিজেদের দৈর্ঘ্যের চেয়ে দীর্ঘ হয়ে উঠেছিল। এখানকার টুরিস্ট লজে ম্যানেজারের নাম তামাং, তিনি একজন প্রাক্তন সৈনিক, রাত্তিরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর ঘরের মধ্যে ফায়ার প্লেসে হাত সেঁকতে-সেঁকতে তিনি আমাদের অনেক ভূতের গল্প শোনালেন। ওরকম শীতের রাতে ভূতের গল্পই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। ভোর হবার আগেই প্রকৃতিপ্রেমিক সমরেন্দ্র ছুটলেন খানিকদূরের প্যাভিলিয়নে চড়ে আকাশের লাল বলটি লাফিয়ে ওঠার দৃশ্য দেখার জন্য, ফিরে এসে ধ্যানমগ্ন হয়ে তিনি একটি গম্ভীর-সুন্দর কবিতাও লিখে ফেললেন, আমি অবশ্য তখনও বিছানা ছেড়ে উঠিনি। সেবারে ওই টুরিস্ট লজে বেশ কিছু নেপালি ছেলেমেয়ে দেখেছিলাম। ওরা সূর্যোদয়ের দেশের মানুষ, তাই বুঝি অন্য দেশে এসেও ওরা সূর্য দেখার সুযোগ ছাড়ে না।

আমাদের গাড়ি যখন টুরিস্ট বাংলোর দিকে বাঁক নিচ্ছে, তখন দেখি টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ। সে সম্ভবত আমাদের গাড়িটাকে পুলিশের গাড়ি ভেবেছিল। টুরিস্ট বাংলোটি দেখেই আমি একবার চোখ বুজলাম। ঘটনাটি আগেই শোনা ছিল, তবু স্বচক্ষে দেখার অভিঘাত অনেক তীব্র হতে বাধ্য। সেই টুরিস্ট লজটি এখন ভূতপূর্ব টুরিস্ট লজ। কিছুদিন আগে সেটিকে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, এখন সেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার কঙ্কাল। এখানে দমকল আসার প্রশ্নই ওঠে না বোধ হয়, তাই আগুন তার ইচ্ছে মতন বাড়িটাকে খেয়েছে, শুধু পাথরের দেয়ালগুলি হজম করতে পারেনি। ঠিক যেন বিশ্বাস হয় না, এখানে যে বাড়িটিতে আমি থেকে গেছি, কত গল্প, কত হাস্য-পরিহাস হয়েছে, এখনও তার পরিপার্শ্ব একই রকম হয়েছে। শুধু বাড়িটি নেই। সামনের বারান্দাটা ছিল পুরো কাচে ঢাকা, তার ওপর নানারকম প্রজাপতি ও পতঙ্গ এসে বসত, এখন চতুর্দিকে ছড়ানো কাচের টুকরো। পাথরের খাঁচাটার একটা অংশে আঙুল দেখিয়ে আমি বলি, ওই যে, ওই ঘরটায় আমরা শুয়েছিলাম। সেটাকে ঘর বলে চেনার কোনও উপায় নেই। রাশি রাশি কাপ-প্লেট অর্ধেক ভাঙা হয়ে পড়ে আছে। যারা আগুন দিয়েছে, তারা লুট করতে আসেনি, ধ্বংস করতেই এসেছিল।

স্বাতী দুঃখিতভাবে প্রশ্ন করল, এমন সুন্দর বাড়িটি ওরা পোড়াল কেন? গোর্খাল্যান্ড হলেও তো বাড়িটা ওদেরই কাজে লাগত। আবার ওদেরই তো এখানে নতুন বাড়ি তৈরি করতে হবে।

আমি ও তাপস চুপ করে রইলাম। এইসব প্রশ্নের উত্তর হয় না। কলকাতায় একসময় যখন তখন ট্রাম-বাস পোড়ানো হত কেন, পঞ্জাবের উগ্রপন্থীরা কেন নিরীহ বাসযাত্রী বা পূজা প্যান্ডেলের লোকজনদের হত্যা করছে? আমাদের দেশে প্রতিবাদের ভাষাই হল হিংসা এবং ধ্বংস।

কাছেই ফুটে আছে অজস্র ঘাসফুল। দু-তিনটি অতি শিশু ছাগল ছানা তিড়িংবিড়িং লাফাচ্ছে। অদূরের ঝাউবনে শোনা যাচ্ছে বাতাসের শব্দ, কী অপূর্ব উজ্জ্বল আজকের সকালটি। দগ্ধ বাংলোটির দিকে পেছন ফিরে আমরা চিরকালীন সুন্দরকে দেখি।

দার্জিলিং শহরের মধ্যেই সার্কিট হাউস এবং একটি পি ডব্লু ডি-র বাংলো ঝলসানো অবস্থায় রয়েছে। ঘুরতে ফিরতে সার্কিট হাউসটিকে কয়েকবার দেখেছি। আর দার্জিলিং জেলায় মধ্যে দূরে-দূরে অনেকগুলি বাংলো, যেখানে পুলিশ সহজে পৌঁছতে পারে না। সেগুলি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেরকম আর একটি বাংলোও দেখতে গেলাম।

দার্জিলিং শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে, মিরিকের পথে একটি জায়গায় নাম লেপচা জগত (আসল নাম নাকি লাপচে জগত), সেখানকার বাংলোটি ব্রিটিশ আমলের। দুর্গম পাহাড়ে একটি চিত্তহারী স্থান খুঁজে বার করার কৃতিত্ব ছিল সাহেবদের। একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এই বাংলোটি

এমনই এক জায়গায়, যার সামনে উপত্যকা, বিপরীত দিকে দেখা যায় পুরো দার্জিলিং শহর, আরও দূরে কালিম্পং ও সিকিম। এখানেও আমি আগে এসেছি একাধিকবার। এই বাংলোটি সম্পর্কে একটা কাহিনি আছে। একবার এক ইংরেজ এই বাংলোতে কয়েকটি দিন কাটিয়ে যান, সর্বক্ষণই বৃষ্টি পড়ছিল, এমন একটানা বৃষ্টি তিনি আগে কখনও দেখেননি। বাংলোর ভিজিটার্স বুকে তিনি সেই বৃষ্টির বর্ণনা লিখে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পর তাঁর ছেলে এসেছিলেন এখানে। পুরোনো খাতা উলটেপালটে তিনি তাঁর বাবার লেখাটা দেখতে পান। সেই লেখার নীচে পুত্র তাঁর মন্তব্য লিখলেন, ফাদার ইট ইজ স্টিল রেইনিং হিয়ার।

ফায়ার প্লেসের চিমনি দুটি ছাড়া এই বাংলোর আর কিছুই প্রায় অবশিষ্ট নেই। ধ্বংসকারীরা চৌকিদারদের ঘরগুলো পর্যন্ত পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। শুধু এক কোণে রান্নাঘরটি কোনওক্রমে অবশিষ্ট আছে। সামনের চত্বরে একজন প্রৌঢ় টাঙ্গির মতন একটি অস্ত্রে ধার দিচ্ছিল। তার পাশে কয়েকটি বাচ্চা কাচ্চা আর একটি লোমশ কুকুর। আমাদের দেখে সে টাঙ্গিটা হাতে নিয়ে এগিয়ে আসে। সে আসলে একজন নিরীহ লোক, এই প্রাক্তন বাংলোটির চৌকিদার। বাংলোটি আর না থাকলেও তার চাকরিটি তো আছে, তাকে এখানে ডিউটি দিতেই হবে। কিন্তু বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে তার এখানে থাকার খুবই কষ্ট, কোনক্রমে রান্নাঘরটিতে মাথা গুঁজে আছে। সে কথা বলার লোক পায় না, আমাদের কাছেই তার অভিযোগ জানিয়ে কিছু প্রতিকার চাইল। হায়, আমরা শুধু দর্শকমাত্র!

গাড়িটাকে দূরে রেখে আমরা বনপথ দিয়ে অনেকটা হেঁটে এসেছিলাম, ফেরার পথে একবার মনে হল, হঠাৎ যদি অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে গোটা চার পাঁচেক মানুষ আমাদের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাহলে কী হবে? জায়গাটা অসম্ভব নির্জন বলেই এরকম গা ছমছমে কল্পনা মাথায় আসে। কিন্তু সেরকম কোনও ঘটনা ঘটল না। তবু আমি বলব, রাজনৈতিকভাবে হামলা বন্ধ হলেও এখনই চট করে কারুর ওই লেপচা জগত বনবাংলোর দিকে যাওয়াটা ঠিক হবে না, গুন্ডা-বদমাসের উপদ্রব তো হতেই পারে।

এ কথা ঠিক, অনেকের মুখেই শুনেছি, আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখনও নেতাদের নির্দেশ ছিল সাধারণ মানুষ, বাঙালি অবাঙালিই কারুকেই মারধোর, খুন জখম করা চলবে না। লড়াই হয়েছে জি এন এল এফের সঙ্গে পুলিশ ও সি আর পির। এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দল সি পি এমের সঙ্গে। পাহাড় অঞ্চলে কংগ্রেস প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা যেতে পারে। সি পি এম কর্মীদের অদম্য সাহস ও আদর্শের জোরের প্রশংসা শুনেছি সর্বত্র। প্রায় সব গোর্খাই যখন সুবাস ঘিসিং-এর দলের সমর্থক, তখনও যেসব গোর্খা সি পি এম দল ছাড়েনি, তারা সামাজিকভাবে ধিক্কৃত হয়েছে, বাঙালির পা-চাটা কুকুর বলে অনেকে তাদের গায়ে থুতু দিয়েছে। কেউ-কেউ খুনও হয়েছে, তবু তারা অনমনীয় থাকতে পেরেছে।

দার্জিলিঙে গত বছর দু'এক ধরে কোনও টুরিস্ট আসে না। বন্ধের জন্য, ধসের জন্য পর্যটকেরা নানা রকম অসুবিধেয় পড়েছে বটে, কিন্তু তাদের ওপর কোনও আক্রমণ হয়নি কখনও। সুবাস ঘিসিং-এর জনপ্রিয়তার একটা প্রধান সূত্রই হল বাঙালি বিরোধিতা। বাঙালিদের নামে ছড়ানো হয়েছে প্রচুর ঘৃণা, কিন্তু তাঁর দলে যে শৃঙ্খলা আছে তা মানতেই হবে। দার্জিলিঙের স্থানীয় বাঙালি কিংবা কর্মক্ষেত্রে আসা বাঙালি ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর কোনও শারীরিক অত্যাচার করা হয়নি, কোনও বাঙালিকেই দার্জিলিং ছেড়ে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়নি।

শুধু, কিছুদিন আগে স্থানীয় এক বাঙালি যুবককে কয়েকটি নেপালি ছেলে এসে কুপিয়ে মারে, তার বৃদ্ধ বাবা বাধা দিতে এলে তাকেও খুন করা হয়। এই নৃশংস কাণ্ডটি ঠিক কী কারণে ঘটেছিল, তার সঠিক ব্যাখ্যা আমি অনেকের কাছে জিগ্যেস করেও পাইনি।

॥ ৩ ॥

ম্যালে কয়েকজন ছাত্রর সঙ্গে দেখা। দার্জিলিং সরকারি কলেজের বাঙালি ছাত্র, বছর তিনেক ধরে এখানে আছে, আন্দোলনের পুরো চেহারাটাই তারা দেখেছে। আমি ধরেই নিয়েছিলাম তারা কাছাকাছি জলপাইগুড়ি-শিলিগুড়ি থেকে এসেছে, কিন্তু সেরকম উল্লেখ করতেই তারা জানাল না, না, আপনাদের সাউথ বেঙ্গল থেকেও অনেকে আসে, কলকাতা, সোদপুর, চুঁচড়ো...। আমি যে সাউথ বেঙ্গলের লোক বা কলকাতা নগরীটি সাউথ বেঙ্গলে, তা এতদিন খেয়াল করিনি। আমরা কথায়-কথায় উত্তরাঞ্চলকে বলি নর্থ বেঙ্গল, সুতরাং সাউথ বেঙ্গলও তো থাকবেই। আমরা যেমন বলি বম্বে মেল, তেমনি বম্বের লোকেরাও একটা ট্রেনকে বলে ক্যালকাটা মেল, এটা প্রথমবার শুনে খুব অবাক লেগেছিল। ছাত্ররা সাহিত্যে বিষয়ে উচ্ছ্বাস দেখাতে চাইলেও আমি তাদের প্রথমেই প্রশ্ন করি, এই গন্ডগোলের মধ্যে তোমাদের কোনও অসুবিধে হয়নি তো? তারা সকলেই একবাক্যে জানাল যে তাদের কোনও বিপদে বা ঝামেলায় পড়তে হয়নি। তবে লম্বা-লম্বা বন্ধের সময় কলেজ বন্ধ থেকেছে পড়াশুনোর কিছু ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে কখনও কোনও আশঙ্কা ঘটেনি। অবশ্য সন্ধে ছ'টার পরে তারা পারতপক্ষে কেউ রাস্তায় বেরোয় না। একজন হাসতে-হাসতে বলল, আমরা নিজেরাই নিজেদের ওপর এমন কড়া ডিসিপ্লিন চাপিয়েছি যে আমাদের বাবা-মায়েরাও এতটা আশা করতে পারবেন না, সন্ধের পর আর কিছুই করার থাকে না বলে আমরা শুধুই পড়াশুনো করি।

ক্লাস ধরবার তাড়া ছিল বলে ওরা চলে গেল। ওদের কাছ থেকে খবর পেয়ে আরও একদল ছাত্র বিকেলবেলা দেখা করতে এল হোটেলে। তাদের দাবি, তাদের মেসে একবার যেতে হবে। আমারও আড্ডায় অনুৎসাহ নেই। হস্টেলে থাকার বদলি বাঙালি ছাত্ররা ছোট ছোট দল করে বিভিন্ন জায়গায় মেস বানিয়ে আছে। ঘর ভাড়া-এখন সুলভ। অধিকাংশ হোটেল বন্ধ হয়ে আছে, সেই সব হোটেলের মালিকরা সাগ্রহেই ছাত্রদের মাসিক হিসেবে ঘর ভাড়া দিতে রাজি, ছাত্ররা নিজেরাই রান্নার ব্যবস্থা করে নেয়।

পরের দিন সেই মেসবাড়ির আড্ডায় গিয়ে দেখি কয়েকটি ছাত্রীও এসেছে। তারা অবশ্য হস্টেলেই থাকে। ছাত্রীরা নিজের উদ্যোগে আলাদা মেস করে থাকার মানসিকতা সারা দেশেই কোথাও এখনও আসেনি বোধহয়। এই ছেলেমেয়েদের পরিচ্ছন্ন, খোলামেলা ব্যবহারে কিছুক্ষণ বেশ সুন্দর সময় কাটল, যদিও আড্ডা-গল্প-কবিতা পাঠের মাঝে-মাঝে সমসাময়িক সংকটের কথা এসেই পড়ে। একটি ছেলে বেশ জোরাল গলায় গোর্খা আন্দোলনের সমর্থনে একটি কবিতা শোনাল। এই আন্দোলনকে সে বিপ্লব আখ্যা দিয়েছে। তার টগবগে যৌবনদীপ্ত চেতনা কাছাকাছি আর কোনও বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখতে না পেয়ে সম্ভবত এটাকেই আঁকড়ে ধরতে চায়।

কলকাতায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যেও কেউ-কেউ পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি সমর্থন করেছেন, দু-এক জায়গায় দেওয়ালে বাংলা-ইংরেজিতে উগ্র ঘোষণাও দেখেছি। সুবাস ঘিসিং কি সে কথা জানেন না? না হলে তিনি কলকাতায় আসতে ভয় পান কেন? ভয় কিংবা লজ্জা কিংবা অবজ্ঞা, যাই হোক, শ্রীযুক্ত ঘিসিং কলকাতাকে এড়িয়ে চলেন, ঘুরিয়ে নাক দেখাবার মতন তিনি দিল্লি যাবার জন্য আর পাঁচ জায়গা ছুঁয়ে যান কিন্তু কলকাতায় পা দেন না। কলকাতা শহরে তিনি জীবনে কখনও এসেছেন কি না সে সম্পর্কেও কেউ নিশ্চিত নয়। গত সপ্তাহে মনে হয়েছিল, সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে, ঘিসিং কলকাতায় এসে হিল কাউন্সিলের চুক্তিতে সই করে দেবেন। তিনি দিল্লি থেকে চলে এলেন কিন্তু কোথায় গেলেন তা জানা যায়নি প্রথম দিন। তারপর শোনা গেল তিনি কলকাতায় না পৌঁছে পাটনায় বসে আছেন। পাটনাতেই যখন এলেন, তখন দার্জিলিং ফিরলেন না কেন? এই নিয়ে কত জল্পনা-কল্পনা। সাধারণ মানুষ যেন আর ধৈর্য ধরে রাখতে পারছে না, কবে সই হবে?

কবে সই হবে?

সমতলের একটা ভুল ধারণা দার্জিলিংয়ে এসে ভাঙল। কলকাতায় অনেকেই বলাবলি করে যে দু-বছর ধরে দার্জিলিঙে কোনও টুরিস্ট যাচ্ছে না। এরপর আর কত দিন আন্দোলন চালাবে? না খেয়ে মরবে যে! অথচ দার্জিলিঙে দেখছি, একটা-দুটো টুরিস্ট পেলেও তাদের সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের কোনও আগ্রহ নেই। পর্যটক না আসায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে হোটেল-ওয়ালা আর দোকানদারেরা, তারা কেউ স্থানীয় নেপালি নয়। ধনী ব্যবসায়ীদের নানাদিকে ডালপালা ছড়ানো থাকে, দু-তিন বছরে তারা কুপোকাত হয় না। ঘোড়াওয়ালা ও কুলিশ্রেণির লোকরা এক জায়গায় কাজ না পেলে অন্য জায়গায় চলে যাবে সর্বত্রই দিনমজুরদের যা নিয়তি। তা ছাড়া রাজনৈতিক দল ও আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয় মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তারা কোনও ক্রমেই পর্যটকদের ওপর নির্ভরশীল নয়। বরং টুরিস্টরা এসে হঠাৎ নবাবি ভাব দেখিয়ে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে দেয় বলে তাদের ওপর শহরের স্থায়ী বাসিন্দাদের খানিকটা বিরক্তির ভাব থাকারই কথা। কলকাতার বাঙালিবাবুরা পাহাড়ে গিয়ে সমস্ত গোর্খা-নেপালিদেরই দারোয়ান শ্রেণি মনে করে বহুকাল ধরে অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার করেছে, সে কথাও তো ভুললে চলবে না।

এখন ওখানকার কোনও কলেজের এক তরুণ গোর্খা লেকচারার যদি উগ্রভাবে পৃথক গোর্খাল্যান্ড দাবি করেন, তা হলে তিনি টুরিজমের ব্যাপারে তোয়াক্কা করবেন না, কারণ এতে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। বরং গোর্খাল্যান্ড স্থাপিত হলে যখন চাকরি-বাকরিতে গোর্খাদেরই প্রাধান্য দেওয়া হবে, কলেজের উঁচু পদ থেকে বাঙালিরা সরে যাবে, তখন তিনিই হয়ে যেতে পারেন হেড অফ দা ডিপার্টমেন্ট কিংবা প্রিন্সিপাল! এর সঙ্গে জাতীয়তাবাদের মাদক তো আছেই!

দুপুরবেলা খেতে বসে পাশের টেবিলে এক বাঙালি দম্পতিকে দেখতে পাই, তাদের সঙ্গে একটি বারো-তেরো বছরের কিশোর। কিশোরটির প্যান্ট-শার্টের সঙ্গে টাই, পরিপাটি চুল আঁচড়ানো, তার বাবা-মা তাকে বেশি-বেশি খাবার দিচ্ছেন। একটি বাৎসল্যের ছবি, বোর্ডিং স্কুলে পড়া সন্তানকে দেখতে এসেছেন জনক-জননী। স্কুলগুলি আবার খুলেছে বলে তাঁরা খুশি। অন্য একটি টেবিলে এক যুবতী তার শিশুকে জোর করে খাওয়াচ্ছে ফ্রুট স্যালাড, দুরন্ত শিশু বারবার টেবিল ছেড়ে পালিয়ে যেতে চায়। যুবতীটির স্বামী সমতলের একজন ব্যাংক অফিসার, বিশেষ করে তাঁকে আসতে হয়েছে দার্জিলিং, স্বামীকে তাঁর পত্নী একলা ছাড়তে চাননি। দার্জিলিংয়ে বহিরাগত বলতে প্রধানত এই ধরনের মানুষই। বিদেশি পর্যটকও চোখে পড়ে না বিশেষ। আমি তো ঘুরে ফিরে একটা শ্বেতাঙ্গ দম্পতিকেই দেখতে পাচ্ছি। এরই মধ্যে এক ফাঁকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম ঘুম-এর তিব্বতি মন্দিরটি। সেখানকার ভিজিটারস বুকটা দেখলাম কৌতূহলবশত, গত চার দিনে পাঁচ জন মাত্র দর্শনার্থীর নাম, তার মধ্যে একটা বিদেশির এবং বাকিদের মধ্যে কেউ বাঙালি নয়। এই বিখ্যাত মনাস্টারির এমন দশা। আমি অল্প বয়েসে বয়েজ স্কাউট হিসেবে এসেছিলাম এখানে, তারপর অনেকবার দার্জিলিং ঘুরে গেলেও ঘুমে আসা হয়নি। ছেলেবেলায় এই মনাস্টারিটিকে যেন আরও বিরাট, আরও অনেক রহস্যময় মনে হয়েছিল। কেন যে ছেলেবেলার সেই চোখটা হারিয়ে যায়।

এক সন্ধেবেলা একটি নেমন্তন্নের আসরে ডাক পেয়ে গেলাম দৈবাৎ। বেশ কিছু সরকারি অফিসার সাংবাদিক ও ব্যবসায়ী সেখানে উপস্থিত এবং তাঁদের অনেকের স্ত্রী। রীতিমতন একটা পার্টি, কিন্তু সেখানে একজনও নেপালি-গোর্খা নেই। দেখে খটকা লাগে। নেপালি-গোর্খাদের সঙ্গে অন্যদের সামাজিক মেলামেশা কি একেবারেই বন্ধ? বিচ্ছেদ কি একেবারে সম্পূর্ণ হয়ে গেছে? ফাটল আর কোনও দিন জোড়া লাগবে না? চরম গন্ডগোলের মধ্যেও বড় বড় ব্যবসায়ীরা এখানে নির্বিঘ্নে রয়ে গেছেন, তাঁদের কারুর কারুর অভিমত এই যে গোর্খা হিল কাউন্সিল হচ্ছে এই আন্দোলনের জয়ের প্রথম ধাপ। এরপর ওরা আলাদা রাজ্য না নিয়ে ছাড়বে না। এবং সেই সম্ভাবনায় এদের যে কিছু

অসুবিধে ঘটবে, তাও মনে হল না।

এই আসরেই দেখা হয়ে গেল ডি আই জি রমেশ হান্ডার সঙ্গে। এর নাম ও বীরত্বের কাহিনিগুলি শুনলে মনে মনে ছবি তৈরি হয় এক জবরদস্ত পুলিশ সাহেবের, দশাশই চেহারা, বেড়ালের ল্যাজের মতন গোঁফ, চোখে কটমটে দৃষ্টি, গলায় বজ্রের আওয়াজ। আদতে ইনি একজন নম্র, লাজুক ধরনের মানুষ চাপা গলায় কথা বলেন। গোঁপ-টোঁপ কিছু নেই, মুখ-চোখে কোনও টেনশানের ছাপও নেই। বলাই বাহুল্য, ইনি একজন অসমসাহসী পুরুষ। সংকটের সময় ইনি নিজেই বহু অভিযান পরিচালনা করেন, একবার সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েও একটু নিরুদ্যম হননি, তাঁর চলাফেরাও নিয়ন্ত্রিত হয়নি। হান্ডার সঙ্গে আমার কিঞ্চিৎ পূর্ব পরিচয় ছিল, আমরা পাশাপাশি বসে গল্প করলাম বেশ খানিকক্ষণ, দার্জিলিং নিয়ে কোনও প্রশ্ন তুললাম না, সর্বক্ষণ সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে ওঁর নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। আমারও তেমন মাথাব্যথা নেই। আমরা অন্যান্য গল্প, চেনা লোকদের ঘটনা নিয়ে হাস্য-পরিহাস করলাম প্রাণ খুলে।

এক সময় পার্টি ছেড়ে আমি চলে এলাম বাইরে। কাচের জানলার ওপাশে রাতের দার্জিলিং ঈষৎ ঝাপসাভাবে দেখা যায়। নিঃশব্দে সরু সরু বৃষ্টিপাত হচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে মিটিমিটি আলো। কোথাও কোনও শব্দ। এই শহরে আরও অনেকবার আসব নিশ্চয়ই। গোর্খারা নিজস্ব হিল কাউন্সিল গঠন করে এই অঞ্চলের উন্নতি করুক, স্থানীয় লোকদের প্রাধান্য স্থাপিত হোক, সে তো খুব ভালো কথা, কিন্তু বাঙালি মানস থেকে কাঞ্চনজঙঘা কিছুতেই মুছে ফেলা যাবে না। এবার মেঘ-বৃষ্টির জন্য কাঞ্চনজঙঘার সঙ্গে দেখা হল না, পরের বার দেখা হবে।

বাংলাদেশে আমার বন্ধুরা

কলেজ জীবনে মনে হত, সমাজে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি, কোনও মন্ত্রীটন্ত্রি কিংবা জননেতা নন, বরং কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর। চ্যান্সেলরও নন, কারণ তিনি আসেন পদাধিকার বলে। যেমন কোনও রাজ্যপাল কিংবা রাষ্ট্রপতি। রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীর চ্যান্সেলর বা আচার্য হন ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হন পশ্চিম বাংলার রাজ্যপাল। এঁরা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, তেমন বিদ্বান না হতেও পারেন। কিন্তু ভাইস চ্যান্সেলর বা উপাচার্য হিসেবে প্রকৃত কোনও উচ্চস্তরের বিদ্বান ব্যাক্তিকেই মনোনীত করা হয়। পরে অবশ্য জেনেছি, এটা সব সময় সত্যি নয়, এই মনোনয়নের মধ্যেও কিছু কিছু রাজনৈতিক কারসাজি থাকে। অল্প বয়সে তা জানতাম না, ভাইস চ্যান্সেলরদেরই মনে হত সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁরা অনেক দূরের মানুষ, তাঁদের দিকে আড়াল থেকে ভক্তিভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। কোনও উপাচার্যের সঙ্গে এক টেবিলে মুখোমুখি বসে কথা বলার সুযোগ পাওয়াটা সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা।

কলেজ জীবনে সে সৌভাগ্য আমার হয়নি।

উপাচার্যদের শুধু দূর থেকে সমীহই করেছি, তাঁদের ব্যাক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছুই জানতে পারিনি।

পরিণত জীবনে অনেক ধারণাই ওলট-পালট হয়ে যায়। এখন তো দেখি, অনেক উপাচার্য বিদ্বান হলেও আমাদের মতোই সাধারণ মানুষ। আমি শিক্ষা জগতে যাইনি, ছাত্র হিসেবে তেমন

প্রতিভাবানও ছিলাম না। সুতরাং আমার পক্ষে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না কখনও। কিন্তু আমার কোনও কোনও বন্ধু উপাচার্য হয়েছে। সারা ভারতে অন্তত সাত-আটজন উপাচার্যকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। তাদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেয়েছি। এমনকী অন্যান্য পানীয়েরও সদ্ব্যবহার করেছি। অল্পবয়সের সেই অসাধ্য কল্প সাধ এ বয়সে মিটেছে।

সমাজ জীবনে সবচেয়ে অপছন্দের মানুষ কে?

বাছাবাছি করতে গেলে কত যে নাম বাদ দিতে হয় তার ঠিক নেই। আমার কাছে এ তালিকায় এক নম্বরে আছে ফিল্ম স্টুডিও-র মালিক। এটা নিতান্তই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার, সাধারণভাবে এরকম বিচার করা যায় না। স্টুডিও-র মালিকদের মধ্যে কেউ কেউ নিশ্চয়ই সজ্জন। কিন্তু আমার জীবনে প্রথম যে চলচ্চিত্র প্রযোজক এবং স্টুডিও-র অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, তাঁকে আমি ঘোরতর অপছন্দ করেছিলাম। শুধু অপছন্দ না, মনের মধ্যে অত্যন্ত বিরাগ ও ঘৃণা জন্মেছিল।

তখনও আমি গদ্যলেখক হিসেবে তেমন পরিচিত নই, দু-চারখানা উপন্যাস লিখেছি, আর্থিক অসাচ্ছল্য পিছু ছাড়েনি। এমন সময় খবর এল, এক প্রযোজক আমার একটি বেশ দুর্বল উপন্যাস দিয়ে ফিল্ম বানাতে আগ্রহী। বাইরে তেমন প্রকাশ না পেলেও মনে-মনে দারুণ উৎফুল্ল হয়েছিলাম। টাকার যে দরকার খুবই। নুন আনতে আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। পরিচালকের প্রস্তাব অনুযায়ী ফিল্মটি হবে বাংলা ও হিন্দিতে। বাংলায় সামান্য টাকা পাওয়া যায়, হিন্দিতে অনেক বেশি। কত টাকা হতে পারে? এর আগে আমার বন্ধু অরবিন্দ গুহর 'আপনজন' নামে একটি ছোটগল্পের ওরকম ডাবল ভার্সান হয়েছিল, তখন শুনেছি, উনি পেয়েছেন কুড়ি হাজার টাকা। সে আমলে, সত্তর দশকে, কুড়ি হাজার টাকার মূল্য অনেক, আমার কাছে স্বপ্নেরও অতীত। তখন আনন্দ পুরস্কার ছিল এক হাজার টাকা। এখন পাঁচ লাখ।

পরিচালক আমাকে বললেন, টাকা-পয়সার ব্যাপারে তাঁর কোনও হাত নেই। সেটা ঠিক করবেন প্রযোজক। তিনি একটি স্টুডিও'র মালিক, ডিস্ট্রিবিউশন চেইন আছে, বিশাল ধনী। পরিচালকই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন স্টুডিওতে। সেখানে মালিকের বিলাসবহুল কক্ষ, তেমন কক্ষে আমার আগে প্রবেশ করার বিশেষ সুযোগ ঘটেনি। মালিক মহাশয়ের মস্তবড় চেহারা, দৈর্ঘ্যে ততটা নয়, প্রস্থেই বেশি। তিনি বসে আছেন একটি সোফায়, তাঁর খুব কাছাকাছি একটি চেয়ারে একজন সাধারণ চেহারার রমণী, বোঝাই যায় তাঁর স্ত্রী নন, উচ্চপদস্থ কর্মচারীও নন, মহিলার পরনের শাড়িটি সস্তা ধরনের। অন্য দুজন পুরুষ কর্মচারী উপস্থিত। আমাকে ও পরিচালককে বসতে দেওয়া হল উলটোদিকের চেয়ারে। পরিচালকের খুব একটা ব্যক্তিত্ব নেই, মুখে একটা কৃতার্থ ভাব।

সেই ঘরে আমি ছিলাম চল্লিশ মিনিট। তার মধ্যে ওই মালিক ভদ্রলোক আমার রয়ালটি কুড়ি হাজার থেকে বারো হাজারে নিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে তাঁর অসাধারণ প্রতিভা। তাঁর টাকা কমাবার পদ্ধতিটি এইরকম; কুড়ি তারিখে তাঁর জন্মদিন, সেই জন্য কুড়ি সংখ্যাটি টাকা-পয়সা সংক্রান্ত ব্যাপারে কখনও ব্যবহার করেন না। বেজোড় সংখ্যা তাঁর পক্ষে অপয়া। সুতরাং উনিশও চলবে না। তার মেয়ের বয়স আঠারো। সতেরো বাদ তো হবে। ষোলো সংখ্যায় আগের ছবিটি বক্স অফিসে মার খেয়েছে ইত্যাদি। আমি কোনও কথাই বলতে পারছি না। উনি এই দরাদরির সময় মাঝে-মাঝেই বলছেন, ক্যাশ টাকা তাঁর রেডি আছে, একবার টাকার অঙ্কটা ঠিক হয়ে গেলেই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে পেমেন্ট করে দেবেন পুরোটা, ধার-বাকির কারবার তিনি পছন্দ করেন না।

বারো হাজার নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, তখন আমার বুক ধড়ফড় করতে শুরু করেছে। আরও কমবে? এর পরেই তো দশ। মনে-মনে কুড়ি হাজার নিয়ে কত কী করার পরিকল্পনা নিয়ে এসেছিলাম। যাই হোক, দয়াপরবশ হয়ে তিনি বারোতেই থামলেন, বারো নাকি তাঁর লাকি নাম্বার। ততক্ষণে আমার অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি। আমার গা ঘিন ঘিন করছে!

মালিকের পাশের মহিলাটির সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়নি। আগাগোড়া সে

নিঃশব্দ। কথা বলার মাঝেমাঝে মালিকটি সেই মহিলার উরুতে চাপড় মারছে। প্রথম প্রথম আমি অবাক হয়েছি। পরে আর ওদিকে তাকাইনি। মালিকটি এক-দেড় মিনিট অন্তর অন্তর মহিলার উরুতে চাপড় মেরেই চলেছে। এটা কী ব্যাপার!

পরে শুনেছি, কোনও মেয়ের উরুতে চাপড় মারা নাকি ওই মালিকটির মুদ্রাদোষ। সেই জন্য সব সময় তাঁর পাশে একটি মেয়েকে বসাতে হয়। প্রত্যেকদিন এক মেয়ে না হলেও চলে। কর্মচারীরা মোটামুটি স্বাস্থ্যবতী কোনও মেয়েকে জোগার করে আনে, এ জন্য মেয়েটি তিরিশ টাকা পায়। অর্থাৎ প্রতিদিন তার উরুর ভাড়া তিরিশ টাকা।

মালিকটি ওই রমণীর সঙ্গে আর কোনও যৌন কদাচারে লিপ্ত হয় কি না, তা আমি জানি না। ওইসব ব্যক্তিদের অন্তরাল-জীবন নিয়ে আমাদের মাথা ঘামানোরও কথা নয়, কিন্তু প্রকাশ্যে এরকম অভ্যতা অমার্জনীয়। ধনী ব্যক্তিদের নানারকম মুদ্রাদোষ থাকে, কিন্তু অন্যদের সামনে এক মহিলার উরু চাপড়ানো, শুধু সেই মহিলার পক্ষেই অপমানজনক নয়, উপস্থিত অন্যদের প্রতিও চরম তাচ্ছিল্যের নিদর্শন।

সেদিন হাত পেতে সেই বারো হাজার টাকা নিয়েছিলাম বটে, কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, জীবনে আর কোনওদিন কোনও প্রযোজক বা স্টুডিও মালিকের কাছে যাব না, তাতে আমার আর কোনও গল্পের সিনেমা না হয় না হোক! দরকার হলে তারা আমার কাছে আসবে। সত্যি আর কখনও যাইনি একমাত্র ব্যতিক্রম সত্যজিত রায়, তিনি অবশ্য প্রযোজক নন, পরিচালক। এবং শুধু পরিচালকই নন, জ্ঞানে-গুণে-ব্যক্তিত্বে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। সুকুমার রায়ের পুত্র, নিজেও লেখক, আমাদের সাহিত্য জগতেরই মানুষ। সত্যজিৎ রায়ের অসাধারণ ভদ্রতার কথাও এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত। 'অরণ্যের দিনরাত্রি' কাহিনি নিয়ে তিনি যখন একটি চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভাবেন, তখন আমি নিতান্তই এক তরুণ লেখক, আর তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তবু তিনি প্রথম দিন আমাকে টেলিফোন করার পর বলেছিলেন, এই গল্পটা নিয়ে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করা দরকার, কোথায় দেখা হবে? আমি কি আপনার বাড়িতে যাব, না আপনি আমার বাড়িতে আসতে পারবেন? আমি তখন দমদমের দিকে একটি ছোট দু-কামরার ফ্ল্যাটে থাকি, সেখানে অতবড় একজন মানুষকে (আক্ষরিক অর্থেও) বসাবার জায়গা ছিল না। আমিই গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ সময়ের আলোচনা আজও মনে গেঁথে আছে।

বহু বছর পরে, একবিংশ শতাব্দীতে পা দিয়ে আমি আর একবার একটি স্টুডিও-তে, ঠিক স্টুডিও নয়, ফিল্ম ভিলেজ বলা যায়, উপস্থিত হই। ঠিক গ্রামের মতোই সাজানো বিস্তৃত অঞ্চল, যেখানে কুঁড়েঘর, ঢেঁকিশাল, পুকুর যেমন আছে, তেমনি আছে পাকা বাড়ি, আধুনিক সুইমিং পুল ইত্যাদি। এবং রাজপ্রাসাদ কিংবা দুর্গের সেট মতো ফাঁকা জায়গা। অর্থাৎ যে-কোনও কাহিনিরই শুটিং হতে পারে এখানে। এই স্টুডিও তথা ফিল্ম ভিলেজটির মালিক আমাকে এবং আমার স্ত্রীকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইনি নিজেও একজন লেখক, আমার চেয়ে অনেক বেশি খ্যাতিমান ও জনপ্রিয় লেখক। হ্যাঁ, হুমায়ন আহমেদ! এই ফিল্ম ভিলেজটির নাম নুহাশ পল্লি, ঢাকা শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে। হুমায়ূন এখন নিজেই নিজের কাহিনির চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। সেইসব চলচ্চিত্রে সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। হুমায়ুন আহমেদ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে। প্রথম জীবনে ফিল্ম প্রডিউসার তথা স্টুডিও-র মালিকদের সম্পর্কে আমার যে বিরাগ ছিল, হুমায়ুনের তা জানার কথা নয়। কিন্তু পরিণত জীবনে যাতে সেই গ্লানি সম্পূর্ণ ঘুচে যায়, নিয়তি নির্বন্ধে হুমায়ূন যেন সেই কাজটিই করলেন।

দুবারই নুহাশ পল্লিতে গিয়ে আমি অপার, বিশুদ্ধ আনন্দ পেয়েছি।

প্রথমবার গিয়েছিলাম, হুমায়ূনের মেয়ের বিয়েতে। খুবই বর্ণাঢ্য বিবাহ-উৎসব হয়েছিল ঢাকাতে, তারপর একটি দাওয়াত নুহাশ পল্লিতে। হুমায়ুন আমন্ত্রণ করার সময় জানিয়েছিল তার

মেয়ে নাকি বলেছে, তার দু'চারখানি গয়নার বদলে সে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নামের এক লেখককে বিয়ের উৎসবে অতিথি হিসেবে পেতে চায়। সম্ভবত কথাটি সত্যি নয়। হুমায়ূন রসিকতার ছলে এমন অনেক গল্প বানায়, আমি জানি। কিন্তু সত্যি না হলেও এরকম গল্প শুনলে যে-কোনও লেখকের বক্ষ উত্তাল হয়।

এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে আমরা ঢুকেছিলাম নুহাশ পল্লিতে। কয়েকশো মানুষ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল দুপাশে। হুমায়ূনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু করিম একজন আর্কিটেক্ট, সে আমাকে বলেছিল, আমার আর স্বাতীর জন্যই ওখানকার অতিথিশালায় সদ্য আধুনিক বাথরুম বানানো হয়েছে। তার দেয়ালের রং তখনও কাঁচা। হয়তো, এটাও কথার কথা, তবু এরকম মধুর মনোরঞ্জনের কথাই-বা কে বলে।

দ্বিতীয়বার গেলাম আরও এক আশ্চর্য কারণে।

হুমায়ূনের একটা ফিল্মের শুটিং-এর শেষ দিন, সব ফিল্ম ইউনিটেই এই দিনটিতে একটা উৎসবের মতো হয়। ক্যাম্প ফায়ার, নাচ-গান-হই-হুল্লা, উদ্দামতা হয়। এটা শুধুই ইউনিটের নিজস্ব ব্যাপার। আমি সম্পূর্ণ বাইরের লোক, সে ফিল্মটি সম্পর্কেও কিছু জানি না। তবু সেই উৎসব-উদযাপনের দিনে সস্ত্রীক আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কলকাতা থেকে।

এই নুহাশ পল্লিতে আমি প্রতিবারই দেখেছি মাজহারুল ইসলামকে, অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক। মাজহার এই ডাকনামেই সে পরিচিত। গায়ের রং কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সুদর্শন এই যুবকটির স্বভাব যেমন প্রীতিময়, তেমনই সে খুবই পরিশ্রমীও উদ্যমী। মাজহারের অন্য তিন বন্ধু মাসুম, কমল ও নাসেরও তার মতোই উদ্যমী। পারস্পরিক বোঝাপড়া ও আত্মিক সম্পর্ক অত্যন্ত গাঢ়। এমনটা সচরাচর চোখে পড়ে না। এই চার বন্ধু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অন্যদিন পতিকাটিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, আর তাদের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানও প্রচুর বই প্রকাশ করছে। এই পত্রিকা ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান লেখক হুমায়ূন আহমেদ।

হুমায়ূনের চলচ্চিত্র প্রযোজনার ব্যাপারে মাজহারের কোনও আর্থিক সংযোগ আছে কি না, তা জানি না। তবে তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাই বেশি চোখে পড়ে। ওডহাউসের একটি উপন্যাসে আছে যে, একজন প্রকাশক একজন লেখিকাকে চুমু খাচ্ছে। ওডহাউস তাতে মন্তব্য করেছিলেন, কোনও প্রকাশক কর্তৃক কোনও লেখিকাকে চুম্বন অবশ্যই বিশ্ব রেকর্ড কারণ লেখক-প্রকাশকের এরকম হৃদ্যতার কোনও উদাহরণ নেই। সব লেখকই প্রকাশকদের সন্দেহের চোখে দেখে। সাহেবদের দেশেই যদি এই অবস্থা হয়, আমাদের দেশে তা আরও বাস্তব সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে হুমায়ূনের সঙ্গে অন্যপ্রকাশের যে পরস্পরিক নির্ভরতার সম্পর্ক, তা খুবই ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হতে পারে।

অন্যদিন সম্পাদক মাজহার আর লেখক হুমায়ূন আহমেদ থাকে ধানমন্ডির একই বাড়িতে, দুটি পাশাপাশি ফ্ল্যাটে প্রতিবেশী। দু'তরফেই পারিবারিক সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ। এ ফ্ল্যাটের রান্না ও ফ্ল্যাটে যায়। অবাধ মেলামেশা।

ঢাকা শহরে আমার পরিচিতের সংখ্যা নেহাত কম নয়। একাত্তর সালের পর থেকে যাতায়াত করছি নিয়মিত, আড্ডা জমেছে অনেক বাড়িতে। বীথি ও গাজী শাহাবুদ্দীনের বাড়ি প্রায় আমাদের নিজের বাড়ির মতো। বেলাল চৌধুরী আমার সহোদরের মতো এবং নিত্য সহচর। ইদানীং কয়েক বছর ধরে ঢাকায় গেলেই একদিন না একদিন হুমায়ূন-মাজহারের ব্যবস্থাপনার আসরে যেতেই হয়। সে আসর হতে পারে ঢাকা ক্লাবে কিংবা অন্যত্র, কিন্তু বাড়ির মধ্যে অন্তরঙ্গ আড্ডাই আমার বেশি পছন্দ। কয়েক বছর ধরে ওদের যৌথ ফ্ল্যাটে আড্ডাই বেশি জমে।

মাজাহারকে চিনি বেশ কিছুদিন। তার আগ্রহ আতিশয্যে প্রতি বছর অন্যদিন ঈদসংখ্যাতে একটা উপন্যাস লিখে থাকি। বাংলাদেশের অন্য প্রকাশকরা আমাকে পরিত্যাগ করেছে, তাদের কারুরই আর মুখ দেখি না, শুধু মাজহারই আমাকে আকর্ষণ করে আছে। কয়েক বছর আগেও সে নিয়মিত

কলকাতা আসত সদলবলে। এখানেও বেশ আড্ডা জমত, তার বাবার চিকিৎসার জন্যও মাজহারকে আসতে হত। তারপর একটা দুঃখজনক ঘটনার পর সে আর তেমন আসে না। একবার নিউ ইয়র্ক শহরে হুমায়ূন, করিম, মিলন, কমল ও মাজহার একসঙ্গে এসেছিল, খুব আড্ডা জমেছিল মনে আছে।

এখন ঢাকাতে হুমায়ূন কিংবা মাজহারের আমন্ত্রণ পেলে আমি খুবই উৎফুল্ল বোধ করি। মাজহারের ব্যবস্থাপনা নিঃশব্দ। সে নিজেকে একটু আড়ালে রাখতে ভালোবাসে। আমার স্ত্রী স্বাতীর সঙ্গে মাজহারের স্ত্রী ও অন্যদের সম্পর্ক আত্মীয়তার মতো।

হুমায়ূনের সঙ্গে আড্ডার প্রধান অঙ্গ গান-বাজনা। হুমায়ূন খুবই সঙ্গীতপ্রিয়। তার ফিল্মগুলোতে সে নিজেই গান লেখে। তবে গায়ক সে নয়। তার নাটক ফিল্ম ইউনিটের অনেকেই উপস্থিত থাকে আড্ডায়, গায়ক-গায়িকার অভাব নেই। হুমায়ূনের স্ত্রী শাওনও একজন ভালো গায়িকা। আমি ও স্বাতী ওর গানের ভক্ত। সুতরাং গানের সুর সব ছোটখাটো কথাবার্তা ছাপিয়ে যায়।

হুমায়ূন গান ভালোবাসে, গানের সমঝদার এবং মাঝেমাঝে সে যেসব টুকটাক গল্প ছাড়ে, তা অনবদ্য। রসিকতায় সে প্রায় সৈয়দ মুজতবা আলির সমতুল্য। হুমায়ুনের এইসব রঙ্গরসিকতা কেউ লিখে রাখলে তা অনায়াসে হুমায়ূন কথামৃত হিসেবে স্থায়ী মূল্য পেতে পারে।

বিমান ভাড়া দিয়ে, সম্পূর্ণ বিনা স্বার্থে হুমায়ূন আমাকে ও স্বাতীকে কেন ঢাকায় নিয়ে যায় মাঝেমাঝে, তা আজও জানি না। সাধারণভাবে বলতে পারি, পশ্চিম বাংলার তুলনায় বাংলাদেশের মানুষ বেশি অতিথিবৎসল। বাংলাদেশের কোনও পরিচিত মানুষ কলকাতায় আমাদের বাড়িতে এলে আমরা বড়জোর চা-বিস্কুট কিংবা দুটো-একটা মিষ্টিদ্রব্য সামনে রাখতে চাই। অনেকটাই ফর্মাল ধরনের খানিকটা পশ্চিমি সফিসটিকেশনের অনুকরণে। আর বাংলাদেশের বন্ধুরা ঢাকায় গেলে বিরিয়ানি খাওয়াতে চায়। দুপুরে চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের জন্য জোরাজুরি করে। ব্রেকফাস্টেই কাবাব-কোর্মা খাওয়ানোর চল বাংলাদেশ ছাড়া গোটা ভারতীয় উপমহাদেশে আর কোথাও নেই।

নুহাশ পল্লিতে দ্বিতীয়বার যখন যাই, সেই সময়ের ঘটনা আমার জীবনে অবিস্মরণীয়।

ঢাকা বিমানবন্দরে নেমেছি, ঢাকা শহরে প্রবেশ করাই হল না, মাজহার ও তার 'অন্যদিন'-পরিবারের বন্ধুরা আমাকে ও স্বাতীকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে এল সোজা বেশ কিছু দূরের নুহাশ পল্লিতে। নিজের পত্রিকায় ঈদসংখ্যার লেখা দেওয়ার জন্য মাজহার মাঝেমাঝে বেশ অভিমানের সঙ্গে তাড়া দেয়, কিন্তু যখন আমন্ত্রণ জানায়, তখন কোনও দাবিই থাকে না তার।

নুহাশ পল্লিতে যেমন আছে গ্রাম্য পুকুর, তেমনি আছে অত্যাধুনিক সুইমিং পুল। সেই সুইমিং পুলে সারা শরীর পানিতে ডুবিয়ে, হুমায়ূনসমেত আরও দশ বারোজন আমরা আড্ডা দিয়েছিলাম প্রায় চার ঘণ্টা। সেরকম জলজ আড্ডা আমার জীবনে অবিস্মরণীয়। সে আড্ডার কারও কারও নাম এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। আড্ডায় ছিলেন 'প্রথম আলো' সম্পাদক মতিউর রহমান, উপসম্পাদক সাজ্জাদ শরীফ, কবিবন্ধু বেলাল চৌধুরি, জাদুশিল্পী জুয়েল আইচ, স্থপতি ফজলুল করিম, টিভি অভিনেতা জাহিদ হাসান ও স্বাধীন, চলচ্চিত্র নায়ক ফেরদৌস, আলোক চিত্রী নাসির আলি মামুন, অন্যদিন-এর প্রধান সম্পাদক মিজানুর রহমান মাসুম ও ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সিরাজুল কবীর চৌধুরী।

সন্ধের পর শুরু হল ক্যাম্পফায়ার। বেশ বড় করে আগুন জ্বালা হয়েছিল, তাই ঘিরে বসা। তারপর শুরু গান-বাজনা, কবিতা পাঠ, ফাঁকে, ফাঁকে আড্ডা। আমি বাচ্চা বয়সে বয়েজস্কাউট ছিলাম, তখন বাইরের কোনও শহরে আউটিং-এ গিয়ে ক্যাম্পফায়ার হত, সবাইকেই দেখাতে হত কিছু না কিছু কেরামতি। ফিল্মের শেষ দিনে ক্যাম্পফায়ারে আমি একলাই গেছি, দিঘা সমুদ্র সৈকতে, শমিত ভঞ্জের কোনও একটি ফিল্মের শেষ সন্ধ্যায়। সেই ফিল্মে আমি কিছু সংলাপ লিখে দিয়ে সাহায্য করেছিলাম, সেইটুকুই যোগাযোগ, সেই কারণেই যোগাযোগ। ভালো লেগেছিল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়, এরই মধ্যে প্রযোজক, শমিত ভঞ্জের সঙ্গে গোলযোগ শুরু হয়েছিল, তারপর তিক্ততা, আমি বিনা

বাক্যব্যয়ে সে জায়গা ছেড়ে চলে গিয়ে সমুদ্রের ঢেউ-এ চাঁদের দোলা দেখছিলাম।

এখানে এই ফিল্মের সঙ্গে আমার কোনও সংশ্রবই নেই, এই ক্যাম্পফায়ারে আমার ভূমিকা শুধু শ্রোতার। তবু, অনেক গায়ক-গায়িকাই আমাকে উদ্দেশ করে নিবেদন করেছিল কিছু-কিছু। বড় ভালো লাগছিল, বড় ভালো লাগছিল, বড় ভালো লাগছিল।

আমাদের বাড়ি ছিল মাদারিপুর জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সেখানকার বাড়ি-ঘর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক কারণে। তার জন্য বুকে এখনও একটু-একটু চিনে ব্যথা হয়, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

তবু, এ কথাও ঠিক, ঢাকায়, পূর্ব পাকিস্তান পরবর্তী বাংলাদেশে এসে অনেকের কাছে যেমন আন্তরিক, আত্মীয়ের মতো নিবিড় ব্যবহার পেয়েছি, সেই তুলনায় যা হারিয়েছি, সেইসব বাড়ি-ঘর অতি তুচ্ছ। ভালোবাসা ছাড়া আর কোনওকিছুরই কোনও মূল্য নেই।

স্বদেশি মেলা থেকে বিশ্বমেলা

মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়ানো জীবনে খুব কম হল না। আসলে খুব ছেলেবেলা থেকেই বাইরের প্রতি আমার ছিল অদম্য টান। একদিকে যেমন ছিলাম বইয়ের নিঃশব্দ পোকা, অন্যদিকে বিস্তৃত মাঠ-ময়দান, নদী-পাহাড়, জল-জঙ্গল, সর্বোপরি বিচিত্র বহুবর্ণ মানুষ আমায় দিত নিশির ডাক বারবার।

স্কুলের শেষদিক থেকেই সে-টানে উধাও হয়ে গিয়েছি এখানে-ওখানে। পড়তাম শ্যামবাজারের টাউন স্কুলে। বাবা ছিলেন ওই স্কুলেরই শিক্ষক। তিনি স্কাউট-দল পরিচালনা করতেন। তাঁর দলের সঙ্গেও বাইরে যাওয়ার সুযোগ ঘটেছে। হয়তো সেখান থেকেই পেয়েছিলাম বাইরের অমোঘ টান।

প্রথম কোথায় অভিভাবকদের বাদ দিয়ে ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম? যতদূর মনে পড়ে মুর্শিদাবাদ। তখন কিন্তু মুর্শিদাবাদই আমাদের কাছে বেশ দূর ভ্রমণ। মনে আছে, সিরাজদৌলার কী একটা জীবনী পড়ে, একজন বন্ধুর সঙ্গে মাত্র দশ টাকা (তখন থেকেই আমি নিয়মিত টিউশন করি) পকেটে নিয়ে দিয়েছিলাম ভোঁ-দৌড়। বাড়িতে বলেছিলাম বারাসতে এক বন্ধুর মামাবাড়ি যাচ্ছি। সেই প্রথম নিজে ট্রেনে টিকিট কাটা। তখনও ভালো করে গোঁফ ওঠেনি, তবু গম্ভীরভাবে হোটেলের ঘরভাড়া করেছিলাম বহরমপুরে। মনে আছে, ভাড়া ছিল চারটাকা প্রতিদিন। বহরমপুর থেকে বাসে চেপে মুর্শিদাবাদ, আর নৌকোয় চেপে গঙ্গার ওপারে খোসবাগ। সেখানে রয়েছে, নবাবদের সমাধি। আলিবর্দি খাঁর কবরটা ফাটা, কেউ একজন বলেছিল, সিরাজ যখন পলাশির যুদ্ধের সময় মিরজাফরকে বিশ্বাস করে ভুল করেন, সেই সময় আলিবর্দি কবর থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিলেন! সে এক রোমাঞ্চকর ভ্রমণ।

এভাবেই শুরু। প্রথম মেলা দেখি শ্যামবাজার-বাগবাজার অঞ্চলে—রথের মেলা। নাগরদোলা, পাঁপড়ভাজা, তালপাতার বাঁশি আর অজস্র মানুষ। পুরো দিন দশেকের মেলা। আমরা বন্ধুরা মিলে যেতাম সেখানে। ধনী বাড়ির ছেলেরা আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে লাঠিলজেন্স চুষত, পাঁপড় খেত, ভেঁপু বাজাত। আমরা শূন্য পকেটেই ঘুরে বেড়াতাম।

সম্ভবত ১৯৪৮-৪৯ সালে কলকাতার ইডেন-গার্ডেন-এ দেখেছিলাম একটি একেবারে অন্য

ধরনের মেলা। নাম তার 'স্বদেশি মেলা।' ভারতীয় ইতিহাসের নানা চিহ্ন দেখানো হয়েছিল সেখানে। রাণা প্রতাপের বর্ম আর শিরস্ত্রাণ দেখে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, বেশ মনে আছে। দেখেছিলাম বিদ্যাসাগরের খড়ম। এরকম আরও অনেক কিছু। সে-মেলার একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে হেঁটে যেতেই অনেকক্ষণ লাগে। অতবড় মেলা কলকাতায় আর হয়েছে কি? ছোটবেলার স্মৃতিতে সব কিছুই বড় বড় মনে হয়। কলকাতা ময়দানে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হত, তাও কম বড় নয়। এখনকার বইমেলা তো প্রকাণ্ড।

আমার জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায়। তা হলেও স্থায়ীভাবে থাকিনি সেখানে। বাবা কলকাতায় চাকরি করতেন। কলকাতাতেই তাই আমাদের সব শেকড়-বাকড়। দুর্ভিক্ষের বছরে বাবা আমাদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দেশের বাড়িতে। যা হোক দুমুঠো খেতে পাব— এই ভরসায়। কিন্তু পাইনি। তাই বলা বাহুল্য, বাংলাদেশে ছেলেবেলায় কোনও মেলা-টেলা দেখার সুযোগ আদপেই আসেনি।

এখনও মনে পড়ে, ভারী সুন্দর একটা মেলা দেখেছিলাম দেওঘরে। পাহাড়তলিতে সে এক অনুপম আদিবাসী মেলা। পাহাড়-অরণ্যের দূর পথ ধরে দল বেঁধে হেঁটে আসছে অসংখ্য আদিবাসী— পুরুষ-রমণী, কচি-কাঁচা, বুড়ো-বুড়ি আদিবাসীদের কোনও দেবতার পুজো উপলক্ষেই বসেছিল সেই মেলা। আমরা কয়েকজন হঠাৎই পৌঁছে গিয়েছিলেম সেখানে। মুগ্ধ চোখে দেখেছিলাম মানুষের, প্রকৃতির আদিম সৌন্দর্য। শাল-পিয়ালের বন, সুঠাম স্বাস্থ্যের স্ত্রী-পুরুষ, মাদলের বোল, সাঁওতালি নাচ-গান, একেবারে আক্ষরিক অর্থে মুগ্ধ করেছিল। নাচেও যোগ দিয়েছি তাদের সঙ্গে। কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় হাঁড়িয়া পান সেই মেলার প্রধান আকর্ষণ। এরকম আদিবাসীদের মেলায় আরও গিয়েছি কয়েকবার। বিহারে, উড়িষ্যায় মধ্যপ্রদেশে। মধ্যপ্রদেশের বাস্তার জেলার দুর্গম অঞ্চলে দেখেছিলাম এক মেলা, যেখানে অনেক নারীপুরুষই প্রায় উলঙ্গ। অধিকাংশই খুব গরিব, সেইজন্যই জিনিসপত্রও অবিশ্বাস্য রকমের শস্তা, বেগুনের সের (তখনও কিলো হয়নি) মাত্র দশ পয়সা। হিসেব করে দেখলাম, একটি মেয়ে তার সব বেগুন বিক্রি করে মোট এক টাকা উপার্জন করবে। সেই একটা টাকাও সে মুরগি-লড়াইয়ের জুয়ায় বাজি খেলে হেরে গেল। তারপরেও তার মুখে সে কী খিলখিল হাসি। সর্বস্ব খুইয়েও যে মানুষ অমনভাবে হাসতে পারে, তা আর কোথাও দেখিনি।

কলেজজীবনে পৌষমেলায় গিয়েছি শান্তিনিকেতনে। তখনকার পৌষমেলা কিন্তু এখনকার মতো এত শহুরে,সাজানো গোছানো হয়ে ওঠেনি। তখন সেখানে বীরভূমের লোকসংস্কৃতির স্পর্শ বেশ অনুভব করা যেত। আশ্রমিক সঙেঘর ব্রাহ্মসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত যেমন হত, তেমনই তার সঙ্গে সাঁওতালদের নাচ-গান, আউল-বাউলদের অনুষ্ঠানও ছিল জনপ্রিয়। পৌষমেলায় পরেও গিয়েছি অনেকবার। কিন্তু প্রথমবারের কথাই বেশি মনে পড়ে। ৯ পৌষ, মেলার শেষদিন, আধিবাসীদের জন্য বরাদ্দ, রাত্তিরবেলা মশালের আলোয় নাচ হত।

পৌষমেলায় দেখেছিলাম পূর্ণ দাস বাউলের পিতা নবনী দাস বাউলকে। একটা লম্বা আলখাল্লা পরে সারা মেলা প্রাঙ্গণে দাপটে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। পরিচিত-অপরিচিত যাঁর সঙ্গেই দেখা হচ্ছে, তাকেই তিনি ডেকে ডেকে দেখাচ্ছেন সে আলখাল্লা, 'ওরে দ্যাখ-দ্যাখ, গুরুদেব দিয়ে গেছেন।' খুব মজা লেগেছিল। এখন মনে হয়, সত্যি সেটা ছিল কত বড় পুরস্কার। তাঁর কণ্ঠে গান শুনেছিলাম 'মন তুই পড় গা ইস্কুলে।' মনে পড়ে, খুব মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তো বাউলদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বাউল গানের তিনি ছিলেন পরম অনুরাগী। নবনী দাসের কাছে শোনা নানা গানের স্পষ্ট প্রভাব আছে তাঁর বাউলাঙ্গের গানে। লালন ফকিরের গানের খাতা রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করে নিজের সঙ্গে রেখেছিলেন, এমন একটা কথাও প্রচলিত আছে।

কলাভবনের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠানও আমার সামনে সেই প্রথম রবীন্দ্রসংগীতের দরজাটি

হাট করে খুলে দিয়েছিল। মধ্যরাতে কোপাই নদীর পাড়ে, বা রনরনে রোদ্দুরে খোয়াইয়ের সামনে বসে আমরাও হেঁড়ে গলায় গাইতাম, 'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে।' পৌষমেলাতেই শুরু হত অনেকের প্রথম প্রেমপর্ব। আলাপ হত অনেক নতুন মানুষের সঙ্গে। একবার নাগরদোলায় একটি অচেনা যুবতী বসেছিল আমার পাশে। সেটা যখন খুব জোরে ঘুরছিল, সে ভয় পেয়ে চেপে ধরেছিল আমার হাত। আমরা পরস্পরের নামও জানি না, অথচ হাত ধরাধরি করেছি। এরপরেই তার সঙ্গে ভাব হয়ে গেল খুব। মেয়েটির গায়ের রং কালো, তার মুখ ও শরীরের গড়ন অপূর্ব, যেন কষ্টিপাথরের ভাস্কর্য। নামও কৃষ্ণা। কলকাতায় ফিরে যোগাযোগ করার জন্য সে তার ঠিকানা ও ফোন নাম্বার লিখে দিয়েছিল এক টুকরো কাগজে। আমার ফোন ছিল না, তাই কিছু দিইনি। সেই কাগজটি খুঁজে পাইনি। কী কষ্ট হয়েছিল সেজন্য। অনেক ছোটগল্প এরকম হয়। কিন্তু আমার গল্পটি অন্যরকম। প্রায় পাঁচবছর পর সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা আমি খুঁজে পাই একটা বইয়ের ভাঁজে। তখন হাসি পেয়েছিল। এতদিন পর ফোন করার কোনও মানেই হয় না।

বীরভূমের কেঁদুলি-মেলায় গিয়েছি বারবার। ভারতীয় সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবের বাসস্থান কেন্দুবিল্ব বা কেঁদুলি। এখন যার ডাকনাম, ভালোনাম জয়দেব কেঁদুলি। কিংবদন্তী যে, পৌষ-সংক্রান্তিতে গঙ্গা স্নান করলে পুণ্য হয়। কবি জয়দেব প্রতিদিন ভোরবেলায় বহুদূর পথ পায়ে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। সেবার পৌষ-সংক্রান্তির আগে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। খুব মনোকষ্ট তাঁর। এবার আর মকরস্নান করা হবে না। তখন রাতে স্বয়ং গঙ্গা তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, 'এবার আমিই যাব তোর কাছে, অজয় নদের কদম্বখণ্ডীর ঘাটে। সেখানে স্নান করলেই গঙ্গা-স্নানের পুণ্যি পাবি তুই।'

জয়দেব ভক্তকবি। তিনি সেবার অজয়েই মকরস্নান সারলেন। সেই থেকে অজয় পেয়ে গেল ধর্মীয় মহিমা। শুরু হল প্রতি বছর পৌষ-সংক্রান্তির দিন অজয় স্নানযাত্রা। বসল মেলা। গানের আসর।

কবির মৃত্যুর পর থেকে তাঁর বাসস্থান কেঁদুলি গ্রামে বসছে বিরাট মেলা। পৌষ সংক্রান্তির দিন থেকে শুরু করে তিন দিনের এই মেলা সাধারণভাবে 'জয়দেব-মেলা' নামেই খ্যাত। বাংলাদেশের প্রাচীনতম মেলাগুলির মধ্যে অন্যতম। অবশ্য জয়দেবের জন্ম হয়েছিল ওড়িশায়, এমন একটি দাবিও আছে। জয়দেব শুধু সংস্কৃতই লিখেছেন, সুতরাং তিনি বাঙালি না ওড়িয়া, এ তর্ক অবান্তর।

পৌষ মাস বাঙালির কাছে বিশেষত গ্রামের বাঙালির কাছে এক বিরাট আনন্দের সময়। পৌষে কৃষকের ঘর ভরে যায় ফসলের হিল্লোলে। শ্রমের পর শ্রমের সাফল্য উপভোগের সময় এই পৌষ মাস। এ-সময়েই বাংলাদেশের গাঁয়ে গঞ্জে শুরু হয় নানা মেলা ও উৎসব। ধর্মীয় অনুষঙ্গ থাকলেও এসবের মূল আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য এটাই। মানুষের হাতে থাকে অল্পবিস্তর পয়সাকড়ি। কেনা-বেচারও বড় সুসময় এই পৌষ মাস।

বীরভূমের কেঁদুলি মেলাও বস্তুত তারই উজ্জ্বল প্রকাশ। কেঁদুলির মানুষের কাছে তো বটেই, সারা বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, ২৪ পরগণা, হাওড়া হুগলি, এমনকী কলকাতার মানুষের কাছেও জয়দেব মেলা এক অমূল্য আকর্ষণের ব্যাপার। ধর্ম এবং আনন্দ এখানে ওতপ্রোত হয়ে যায়। তাই নানা জেলা থেকে, ভিনপ্রদেশ থেকেও আসেন অসংখ্য ভক্ত বৈষ্ণবের দল, আউল বাউল, সুফি-সহজিয়া, চাষি-মজুর, বাবু-বিবি বা অসংখ্য সাধু-সন্ন্যাসীর দল। নতুন শাড়ি জামা পরে কাঁধে বাচ্চা নিয়ে আসে মঙলির মা, লাঙলের ফলা বা জালের সুতো কাঠি কিনতে পরান মাঝি, নাগরদোলা বা ভানুমতির খেল দেখতে ঝলমলে ঝিমলি, সুবল বা বাবুলাল। আগে সার্কাস কোম্পানি, মিঠাই-মণ্ডা; চুলের ফিতে, কাচের চুড়ি, পুঁতির মালা, লোহার ড্রাম, কড়ি-বরগা, জানালা-কপাট, বাসনকোসন, হাঁড়িকুড়ি, ধামা কুলো-হাঁসমুরগি, নামাবলি, তাসের আসর, বহুরূপী কলার কাঁদি।

এইসব সাত সতেরো জিনিসপত্র নিয়ে মাইলখানেক জায়গায় এই মেলার বিস্তার। দূর মাঠের

আলপথ দিয়ে সকাল থেকেই লোক আসছে অবিরাম। বাসগুলো ধুলো উড়িয়ে ছুটে আসছে একেবারে মেলার বুকের ওপর। শীতে শুকিয়ে কঙ্কাল হয়ে গেছে ভাঙন-ধরা অজয় নদ। শীর্ণ নদী গরুর গাড়িতে পার হয়ে ওপার থেকে আসছে বর্ধমানের যাত্রীরা। আসছে খড় বোঝাই গরুর গাড়িও। মেলায় খড়ের চাহিদা। খড়ের বিছানাতেই তো রাত কাটাতে হয় মেলাযাত্রীদের। কাকভোর থেকে পুণ্যার্থীরা ঝুপঝাপ ডুব মারছে অজয়ের হাঁটু জলে। উত্তুরে বাতাসে কনকনে ঠান্ডা, তবুও। তাল, তমাল আর শালবনের নীচে লুকিয়ে আছে লাল ধুলোর মেঠো পথ, অ্যাসফল্ট -এর কালো রাস্তা। দুপাশে বীরভূমের রুক্ষ বিষণ্ণ ফসলহীন মাঠ বিছিয়ে রয়েছে। আমরা কখনও বোলপুর, কখনও দুবরাজপুর, কখনও বর্ধমান হয়ে গিয়েছি জয়দেব মেলায়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় একসময় যেতেন ফি বছর।

মেলায় বাউলদের আকর্ষণটাই ছিল আমাদের কাছে মুখ্য ব্যাপার। বাউলরা আখড়া বানাতেন। এক-একটা আখড়ায় এক-এক বাউল এবং তাঁর সম্প্রদায়। প্রাণের গান গাইতেন তাঁরা গলা ছেড়ে। আমরা ঘুরে-ফিরে সব আখড়াতেই যেতাম, গান শুনতাম, খেতাম, শুতাম। আমাদের সঙ্গে দারুণ ভাব জমে গিয়েছিল তাঁদের। তখন মাইকের উৎপাত ছিল না। শহুরে মানুষরাও খুব কম যেতেন। তাই পরিবেশটা ছিল একেবারেই অন্যরকম—আদিম, গ্রামীণ। সেই পরিবেশে তিন দিনের জন্য আমরা একেবারে হারিয়ে যেতাম, ডুবে যেতাম। ভুলে থাকতাম আমাদের নাগরিক প্রেক্ষাপট। নদীতে স্নান করতাম, কোনও আখড়ায় ভাত খেতাম (এখনকার মতো ভাতের এত হোটেল তখনও হয়নি), রাতে ওই আখড়াতেই ঘুমোতাম, কিংবা জেগে থাকতাম। যেন তিনদিন আমরাও বাউলের সঙ্গে মিলে বাউলই হয়ে যেতাম। ওঁরাও কী করে যেন জেনে গিয়েছিল আমাদের কবি পরিচয়। আমাদের 'বাউলবাবু' বলতেন। কনকনে ঠান্ডায়, রাতভর আসরে-আসরে ঘুরে গান শোনা, গানের সঙ্গে গলা মেলানো বা উদ্দাম নাচ এখনও স্মৃতিতে হানা দেয়। এই কেঁদুলির মেলাতেই আমাদের গাঁজা টানার দীক্ষা হয়। তখনও সাহেব-মেমরা বাউলদের নিয়ে মাতামাতি শুরু করেনি, আমাদের মতন কলকাতার ছেলে-ছোকরারাও বাউলদের সঙ্গে তেমন অন্তরঙ্গভাবে মিশত না। আমরা কৃত্তিবাস পত্রিকার দলবল, আমরা বাউলদের জীবন দর্শনে আকৃষ্ট হয়েছিলাম ওদের সঙ্গে একাত্ম হতে গেলে ওদের পাশে বসে পোড়া রুটি খেতে হবে, কেউ গাঁজার কলকে বাড়িয়ে দিলে প্রত্যাখ্যান করা চলবে না। তা গাঁজা টেনে বেশ মজাই পেয়েছি। এখন দেখি অনেকে ড্রাগের পাল্লায় পড়ে জীবন নষ্ট করে ফেলে। আমরা কয়েকজন অনেকরকম নেশার দ্রব্য পরীক্ষা করে দেখেছি, কিন্তু কখনও পাকাপাকি ধরা পড়িনি।

একবার ধলভূমগড় থেকে ট্রাকে চেপে জঙ্গলের গভীরে ৪-৫ ঘণ্টা যাওয়ার পর হঠাৎ দেখি পাহাড়ের কোলে বসেছে আদিবাসীদের এক রঙিন মেলা। তৎক্ষণাৎ নেমে পড়ি সেখানেই। ট্রাকের ড্রাইভার আমাদের সেখানে নামতে বারণ করেছিল। কেন না, মাত্র কয়েকদিন আগেই নামি সেখানে হানা দিয়েছিল বুনো হাতির পাল। তারা তছনছ করে দিয়ে গেছে সারা গ্রাম। নেকড়েরা নাকি জঙ্গল থেকে ইচ্ছে হলেই যখন তখন বেড়াতে চলে আসে এদিকে। আমরা শুনিনি। নেমে পড়েছিলাম। গাছে-গাছে মহুয়ার ফুল। গন্ধে ম-ম করছে পৃথিবী। পাহাড় থেকে নেমে আসছে একটি ছোট্ট ঝরনা। পাহাড়ের পায়ের কাছে আদিবাসীদের কোনও পুজোপার্বণ উপলক্ষেই বসেছিল সে-মেলা। অল্প কিছু দোকানপাট। গুড়, চিঁড়ে-বাতাসা, মেয়েদের রূপটান, চুলের ফিতে আর তাগড়াই চেহারার মোরগ মুরগি—এইসব। একটা জিনিস খুব অবাক করেছিল। সেখানে কোনও জিনিসের দরদাম করা চলবে না। আমরা অবিশ্বাস্য কম দামে ক'টা মুরগি কিনেছিলাম।

দেখেছিলাম দূরের পাহাড়ি পথ ধরে দল বেঁধে মেলায় আসছে আদিবাসীরা। মেয়েরা খুব রঙচঙে পোশাকে,আর পুরুষরা কাঁধে তিরধনুক ঝুলিয়ে। প্রতি দলের সঙ্গে আছে নেকড়ের মতো বড় বড় শিকারি কুকুর। কুকুরগুলিও খোশমেজাজে মেলায় ঘুরছে-ফিরছে, জুলজুল চোখে দেখছে সবকিছু। একবার আমার দিকেও তাকিয়েছিল সন্দেহের চোখে একটা কুকুর। বুক শুকিয়ে গিয়েছিল। সেখানেই অনেক জায়গায় চলছিল মুরগির লড়াই। দুটো বড়০বড় মোরগের পায়ে ছোট ছুরি বেঁধে

দিয়ে দুটোকে লড়িয়ে দিয়ে মজা দেখত কয়েকশো মানুষ। যার মোরগ জিতবে সে পাবে অন্য মোরগটি। ওই পাহাড়ি মেলায় এটাই ছিল একমাত্র আকর্ষণ।

সেখানে আমরাই ছিলাম একমাত্র প্যান্ট-শার্ট পরা শহুরে মানুষ, মূর্তিমান বেমানান। কিন্তু ওরা আমাদের দেখে যেমন আহ্লাদিত হয়নি, তেমনি বিরূপও হয়নি কিছু। অদ্ভুত শান্ত, স্থির চরিত্র তাদের। মেয়েদের মাথায় লাল ফুল, পুরুষদের পিঠে তীরধনুক। মাথার ওপর টকটকে নীল আকাশ। সবুজ পাহাড়, সাদা ঝরনা। সেখান দিয়ে কোনও বাস চলে না। যানবাহন কিছু নেই। এসেছিলাম একটা ট্রাকে চেপে, ফিরব কী করে? ঝুপ ঝুপ করে নেমে এল রাত। মেলা ফেরত একট দলের পিছু পিছু গিয়ে পৌঁছলাম একটা গ্রামে। সেটা সাঁওতাল বা ওঁরাওদের গ্রাম। এক বাড়িতে মহুয়া ও হাঁড়িয়া বিক্রি হচ্ছিল, বসে গেলাম সেখানে। রাত্তিরে শোওয়ার জন্য সে-বাড়ির লোকেরা উঠোনে খাটিয়া পেতে দিল। মুরগির ঝোল আর রুটি খাওয়াল। তার জন্য কিছুতেই পয়সা নেবে না। এমন আতিথেয়তা ক'জন পায়? কোনও বাড়াবাড়ি নেই, উচ্ছ্বাস নেই, যেন এটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।

বারো বছর আগে এলাহবাদে দেখেছিলাম কুম্ভমেলা। প্রতি চারবছর অন্তর কোন আদিকাল থেকে এই মেলা হয়ে আসছে। সারা ভারতবর্ষের মানুষ প্রয়াগের তীর্থ-সঙ্গমে স্নান করে পুণ্যার্জন করতে আসেন। বলা যায়, প্রয়াগে তখন সারা ভারতবর্ষের উজ্জ্বল উপস্থিতি। নাগা সন্ন্যাসীরাই এ মেলার মুখ্য আকর্ষণ। সারা গায়ে ছাই মেখে হাতে একটি লোহার চিমটে নিয়ে রক্তচোখে দাপটে ঘুরে বেড়ায় তারা। আমি যে বছর যাই, তার আগের বার কুম্ভে নাগা-সন্ন্যাসীরা কোনও কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে অঘটন ঘটিয়েছিল মেলায়। পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিল বহু মানুষ। সেবারও নাগাদের ক্ষিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত তেমন কিছু হয়নি। আমার একটা ব্যাপার খুব মজার লেগেছিল। নাগা-সন্ন্যাসীরাও শীতে কাঁপছে হি হি করে। আসল ব্যাপারটা হচ্ছে, নাগা সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক্রমশ কমে আসছে। কিন্তু কুম্ভমেলায় নাগাদের প্রধান দাপট, তাদের মিছিল দেখার জন্যই বড় বড় ক্যামরা নিয়ে আসে বিদেশিরা। তাই, স্থানীয় কিছু লোকজন ভাড়া করে নাগা সন্ন্যাসী সাজানো হয়। রিক্সাওয়ালা, মুটে কিংবা ভিখিরিরা পয়সার লোভে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে মিছিলে যোগ দেয়। খাঁটি নাগা সন্ন্যাসীদের শীত সহ্য করা অভ্যাস আছে, ভাড়া করা নাগারা তা পারবে কেন? সেইজন্য কিছু কিছু নাগা অত শীতেও গায়ে ছাই মেখে সটান হেঁটে যাচ্ছে, আর কিছু নাগা এমন লাফাচ্ছে, যেন তাদের গায়ে বিছুটি লেগেছে। না, অত অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে স্নান করছে দেখে প্রয়াগে আমার স্নানের ইচ্ছে হয়নি। আমার পুণ্যের লোভও নেই।

প্রথম সেই মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণের পর থেকে ঘুরলাম তো কম না। পৃথিবীর প্রায় সব বড়লোক দেশেও গিয়েছি। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মেলা 'বিশ্বমেলা', যা চার বছর অন্তর ঘুরেফিরে নানা দেশে হয়, অনেকটা অলিম্পিকের মতো, দেখেছি তাও একবার, নিউইয়র্ক-এ। সে এক বিশাল, অবর্ণনীয় রাজকীয় মেলা। প্রতি দেশের বিরাট-বিরাট মণ্ডপ—দেশজ সংস্কৃতির কোনও-না কোনও প্রতিরূপ। নিউইয়র্কের সেই বিশ্বমেলায় ঘুরছিলাম কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের সঙ্গে। শিল্প প্রদর্শনীর সঙ্গে রয়েছে খাবারের দোকান। পৃথিবীর সব দেশের খাবার সেখানে চেখে দেখা যায়। সেখানে খেয়েছিলাম কেনিয়ার জেব্রার মাংসের আচার, জাপানের কাঁচা মাছ, ক্যানাডার কুমিরের পেটের মাংস, ভাজা, যা অনেকটা ফিস ফিঙ্গারের মতন স্বাদ। পাকিস্তানি প্যাভেলিয়নে ঢুকে গিয়ে একজন লোকের মুখে বাংলা কথা শুনে চমকে উঠেছিলাম। তখনও বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হয়নি। ভারতীয় প্যাভেলিয়নে একজনও বাঙালি ছিল না।

সেই বিশ্বমেলার মার্কিন প্যাভিলিয়নে বিজ্ঞান প্রদর্শনী কক্ষে, মানুষকে রকেটে চাপিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে পৌঁছে দেওয়ার একটা খেলা ছিল। সেই রকেটে চেপে অ্যালেন জিগ্যেস করেছিল, সুনীল আমরা কি সত্যি সত্যি পরের শতাব্দী দেখে যেতে পারব? অ্যালেন পারেনি, সে চলে গেছে তিন বছর আগে। আমি তো পেরে গেলাম দেখছি।

বিশ্ব-বইমেলা দেখেছি ফ্রাঙ্কফুর্ট-এ। ফ্রাঙ্কফুট-এ আছে স্থায়ী মেলা ভবন ও মেলা প্রাঙ্গণ। ভবন মানে অনেকগুলি বহুতল বাড়ি আর প্রাঙ্গণ মানে বিশাল ব্যাপার, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যেতে হয় গাড়িতে চেপে। নিয়মিত গাড়ি চালায় মেলা কর্তৃপক্ষ, ভাড়া লাগে না। নিজেরা করেছি 'মুক্তমেলা'। পার্ক স্ট্রিট-এর কাছে মনোহর দাস তড়াগের গায়ে প্রতি শনিবার বসত শিল্পসাহিত্যের সে এক অনুপম মেলা। যে যার কবিতা-গল্প পড়ছে, নাটক করছে, গান গাইছে, ছবি দেখাচ্ছে। দর্শকের, শ্রোতার সম্পূর্ণ অধিকার দেখার, শোনার বা প্রত্যাখানের। প্রয়াত কবি তুষার রায় তাঁর সব প্রাণশক্তি ঢেলে দিয়ে কবিতা পড়তেন সেখানে। বিকেলের ওই খেয়ালখুশির মেলায় সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় হয়েছিলেন তিনি। তুষার কবিতা পড়লে আমাদের কারও আর শ্রোতা জুটত না। কলকাতা বইমেলায় তো প্রতি বছরই যাই। বইমেলা তো এখন জড়িয়ে গেছে বাঙালির রক্তে। সারা বছর সবাই অপেক্ষায় থাকি এই বই পার্বণের জন্যে। ফ্রাঙ্কফুর্ট বা দিল্লির বইমেলা কলকাতার প্রাণপ্রাচুর্যের কাছে কিছুটা বিবর্ণ মনে হয় আমার।

ঘুরছি অনেক। অনেকেই বলেন, আমার নাকি পায়ের তলায় সরষে। পৃথিবীটাকে আমার কখনও কখনও খুব ছোট্ট মনে হয়। কিন্তু সেই যে ধলভূমগড়ের কাছে নাম-না-জানা পাহাড়ি মেলা, সেখানকার মহুয়া ফুল, মাদল, মানুষজন, সেসব আজও আমায় নির্জনে ডাক দিয়ে যায়। বুক মুচড়ে ওঠে। যদি যাওয়া যেত আর-একবার।

খুব কাছে, খুব দূরে

কলকাতা থেকে পাখিওড়া দূরত্বে একশো মাইলও হবে না বোধ হয়। মোটর গাড়ির দূরত্বে দুশো কুড়ি-পঁচিশ মাইল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। অথচ মনে হয় যেন কত দূরে। ভারতীয় সংবাদপত্রে, বেতারে, দূরদর্শনে বাংলাদেশের সংবাদ থাকে ক্বচিৎ-কদাচিৎ, সেই খবরও ঝড়ে লঞ্চ ডুবির বা রাজনৈতিক ওলটপালটের। বাংলাদেশের প্রচার মাধ্যমগুলিতেও ওই একই রকম ভারতীয় সংবাদ অতি নগণ্য, যা থাকে, তাও দাঙ্গা বা রাজনৈতিক কেলেঙ্কারির। এর নাম ঐতিহাসিক নিয়তি।

কিন্তু মানুষ যেমন শুধু খাদ্য খেয়ে বাঁচে না, সেই রকম কোনও দেশই শুধু রাজনীতি নিয়ে বেঁচে থাকে না। রাজনীতি-নিরপেক্ষ এক জীবন প্রবলভাবে প্রবাহিত হয়ে চলে ঠিকই।

সম্প্রতি বাংলাদেশে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্যোগে, উভয় দেশের কোনও রকম সরকারি সংস্পর্শে না গিয়ে। যারা বেড়াতে ভালোবাসে, তারা পৃথিবীর যে কোনও দেশেই কিছু না কিছু দর্শনীয় বস্তু পেতে পারে, কিন্তু একটা মুশকিল হয় এই যে অন্য দেশে গিয়ে অনবরত বিমাতৃভাষা বলতে-বলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। সেই হিসেবে আমাদের পক্ষে ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশে প্রতি প্রকৃষ্ট স্থান, সেখানে প্রকৃতি অতি ঐশ্বর্যময়ী এবং সাংস্কৃতিক আবহাওয়া আমাদের কাছে সাবলীল লাগে। বাংলাদেশের নাবিকরাও বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে একবার অন্তত কলকাতায় ঘুরে যেতে চান, সম্ভবত ওই একই কারণে। আমি বাংলাদেশে বারবার যাই, এবার সাগরময় ঘোষও গিয়েছিলেন সস্ত্রীক।

সংবাদের অভাব অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। নকশালপন্থী আন্দোলনের সময় দিল্লি ও বোম্বাইয়ের সংবাদপত্রে শুধু কলকাতার খুনের খবর ছাপা হত। তাতে ওইসব জায়গার লোকেরা

মনে করত, কলকাতার মানুষ বুঝি ভয়ে বাড়ি থেকে বেরোয় না। সন্ধ্যের পর রাস্তাঘাট সব শুনশান। আসলে, এত বড় নগরীতে যে চার-পাঁচটি রাজনৈতিক খুনের কোনও প্রভাবই জনজীবনে পড়ে না, তা দূর থেকে বোঝা যায় না। তারই মধ্যে সভা-সমিতি, সিনেমা-থিয়েটার, অফিস-আদালত, হাট-বাজার, মধ্যরাত পর্যন্ত পথের জনস্রোত এবং পাড়ায় পাড়ায় আড্ডা ঠিক একইভাবে চলে। সেই রকমই, বাংলাদেশের শুধু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সংবাদই এখানে ছাপা হয় বলে, অনেকের ধারণা, ওখানে বুঝি শুধু ডামাডোলই চলছে। স্বাভাবিক জনজীবন নেই। প্রতিবেশীদের সম্পর্কে আমরা এ রকম পারস্পরিক ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি। কে যেন বলেছিল আধুনিক বিজ্ঞান পৃথিবীটাকে অনেক ছোট করে দিয়েছে। সেইসঙ্গে মানুষে মানুষে দূরত্বও যে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে সে কথা বলেনি কেন?

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা একটি অতি জীবন্ত ও স্পন্দমান শহর। কলকাতার ছড়ানো বিশালত্ব সহসা চোখে পড়ে না। সেই তুলনায় ঢাকা শহর আয়তনে ছোট হলেও এর নতুন সৌন্দর্য প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাস্তাগুলি চওড়া-চওড়া এবং পরিষ্কার, খানাখন্দ নেই, এবং সন্ধ্যের পর ঢাকা শহর যতখানি আলোয় ঝলমল, ততখানি আলো এখন নেই কলকাতায়। পশ্চিমবাংলার অনেকেরই ঢাকা শহর মুখস্থ, অনেকেরই বাল্য-কৈশোর কেটেছে ঢাকা কিংবা আশেপাশের এলাকায়। তাঁরা কিন্তু এতদিন পর ঢাকা শহর দেখলে সহসা চিনতেই পারবেন না। বুদ্ধদেব বসুর রচনায় বর্ণিত ঢাকা শহরও এখন খুঁজে পাওয়া খুব শক্ত। সম্পূর্ণভাবে রূপ পালটেছে এই শহর, পুরোনো ঢাকার গুলিঘুঁজি এখনও কিছু-কিছু টিঁকে থাকলেও খাল ও জলাভূমি ভরাট করে বিস্তৃত হচ্ছে নতুন শহর। শুনেছি যে জংলা জায়গাটির নাম ছিল মতিঝিল এখন সেখানেই গড়ে উঠেছে ঢাকার কনট সার্কাস কিংবা চৌরঙ্গি। বাড়িগুলিতে আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন, ঢাকার নতুন রেল স্টেশন এমনই চমকপ্রদ চোখ-ধাঁধানো যে তার তুলনায় হাওড়া-শিয়ালদা অত্যন্ত ম্যাড়মেড়ে। কলকাতার অনেক কিছুই গড়ে উঠছে বটে, কিন্তু স্থাপত্যকলা নিয়ে কারুর মাথাব্যথা নেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার আগে আমি কখনও ঢাকা শহরে যাইনি। সুতরাং এই শহর আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। সাগরময় ঘোষেরও জন্ম চাঁদপুরে। কিন্তু কখনও তিনি ঢাকা শহর দেখেননি। শুধু তাই নয়, গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি পূর্ব বাংলায় যাননি, তিনিও নতুন শহর হিসেবেই ঢাকাকে দেখেছেন। এবং প্রথম নজরে ঢাকা দেখে সত্যিই মুগ্ধ হওয়ার মতন।

পশ্চিমবাংলার অধিবাসী আমাদের অনেকেরই জন্ম ওদিকে। কারুর ফরিদপুরে, কারুর কুমিল্লা, কারুর টাঙ্গাইলে। কথায়-কথায় সেইসব প্রসঙ্গ ওঠে। তখন জানতে পারা যায় যে ঢাকানিবাসী অনেকেও জন্মেছিলেন এদিকে। কেউ কলকাতায় পার্ক সার্কাসে, কেউ বারাসতে, কেউ বর্ধমানে। অমনি যেন আত্মীয়তা স্থাপিত হয়ে যায়। আমাদের সঙ্গে দেখাশুনো হয়েছে অধিকাংশই লেখক শিল্পীদের সঙ্গে এবং বারবার মনে হয়েছে, সাংস্কৃতিক সম্পর্কে দুই বাংলা এখনও নিবিড়ভাবে আপন। দুই বাংলা কথাটা উচ্চারণ করতে এখন কিছুটা খটকা লাগে। বাংলাদেশ নিশ্চয়ই বাংলা। কিন্তু পশ্চিমবাংলায় আমরা নিজেদের বাঙালি বললেও কার্যত আমরা ভারতীয় নাগরিক। বাংলাদেশের মুদ্রার নাম টাকা, আমরাও টাকা কথাটা ব্যবহার করি, কিন্তু ভারতীয় মুদ্রার নাম রূপিয়া। ঢাকায় যে ভারতীয় হাইকমিশন আছে, তারা অবশ্যই দেখবে ভারতীয় স্বার্থ, আলাদা করে পশ্চিমবাংলার জন্য তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। অথচ বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার যে একটি বিশেষ ধরনের সম্পর্ক থাকতে বাধ্য, তা নিয়ে ভারত সরকার কিংবা পশ্চিমবাংলার রাজ্য সরকার কখনও চিন্তা করেছেন কি না জানি না।

বাংলাদেশে শিল্প-সাহিত্যের আসর জমজমাট। সাহিত্যের মাধ্যমে মানসিক মুক্তির যেন একটা জোয়ার এসেছে। সবচেয়ে যেটা প্রথমেই নজরে আসে এবং যেটা বাংলাদেশের অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর দিক, সেটা হল শিল্প-সাহিত্যের বিকাশের মাধ্যমগুলিতে তরুণদের প্রবল উপস্থিতি। রেডিও টেলিভিশনের অনেক শাখা পরিচালনা করে বেশ তরুণ বয়স্করা। সংবাদপত্রে কাজ করছে অনেক

সদ্য যুবক। থিয়েটার ও চলচ্চিত্র-আন্দোলনের অগ্রণী হয়েছে তারাই।

কলকাতার তুলনায় ঢাকায় সংবাদপত্রের সংখ্যা অনেক বেশি। কলকাতা ছাড়া পশ্চিমবাংলার আর কোনও জায়গা থেকে খবরের কাগজ বিশেষ বেরোয় না। কিন্তু বাংলাদেশে ঢাকা ছাড়াও চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বড় শহর থেকেও দৈনিক কাগজ বেরোয়। আমাদের দৈনিক সংবাদপত্রে সাহিত্যের জন্য আলাদা পৃষ্ঠা যেমন প্রায় লোপ পেতে বসেছে, সেই তুলনায় ওঁদের সংবাদপত্রে সাহিত্যের জন্য সিংহভাগ বরাদ্দ থাকে। ওঁদের কোনও-কোনও লেখকের সাক্ষাৎকার ফলাওভাবে ছাপা হয়। কারণ, একজন লেখক ওদের কাছে দেশের একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, আমাদের দেশে তা নয়। কবি শামসুর রহমানের পঞ্চাশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ঢাকায় তাঁকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিটি সংবাদপত্র যোগ্য মর্যাদার সঙ্গে সেই সংবাদ প্রকাশ করেছে।

ঢাকায় প্রধান সাপ্তাহিক পত্রিকা তিনটি। সরকারি সংবাদপত্র দৈনিক বাংলার সঙ্গে যুক্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক দুটিরই সম্পাদক শামসুর রহমান। বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক ইত্তেফাক, তাঁদের সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম 'রোববার'। এর সম্পাদক আবদুল হাফিজ, এবং রাহাত খান ও রফিক আজাদের মতন লেখকরা এর সঙ্গে যুক্ত। সংবাদপত্র-নিরপেক্ষ আর একটি সাপ্তাহিকের নাম সচিত্র সন্ধানী। এর সম্পাদক গাজি সাহাবুদ্দিন এবং বেলাল চৌধুরী, শফিক রেহমান এবং অন্যান্য লেখকরা এই পত্রিকা পরিচালনায় সাহায্য করেন। মূলত সাহিত্যধর্মী, সেই সঙ্গে সামাজিক সমস্যার আলোচনা এবং চলচ্চিত্রের কথাও থাকে এই সব পত্রিকায়। এ ছাড়া কয়েকটি ট্যাবলয়েড সিনেমা পত্রিকাও আছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্বাণী। এবং আমার কাছে আরও উল্লেখযোগ্য মনে হয়েছে 'কিশোর বাংলা' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা, এমন রঙিন ছবি দিয়ে সাজানো সর্বাঙ্গীন কিশোরদের পত্রিকা পশ্চিমবাংলায় নেই।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, ছোটদের জন্য সরকারি উদ্যোগও অনেক কিছু করা হচ্ছে বাংলাদেশে। ঢাকায় আছে শিশুদের জন্য আলাদা উদ্যান, সেখানকার বিশাল মেরি গো রাউন্ডটি বহু দূর থেকে চোখে পড়ে। সেটি দেখলে বড়দেরও চাপবার লোভ হবে। এ ছাড়া আছে 'শিশু একাডেমি', সেখান থেকে ছোটদের জন্য চমৎকার চমৎকার রঙিন বই প্রকাশিত হচ্ছে কম দামে। আমাদের দিল্লিতেও আছে চিলড্রেন্স বুক ট্রাস্ট, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, কিন্তু তার ছিটেফোঁটা কতটা পশ্চিমবাংলায় এসে পৌঁছয়, কে জানে। ঢাকায় শিশু একাডেমির সঙ্গে যুক্ত আছেন একজন লেখক, বিপ্রদাস বড়ুয়া।

আরও দুটি প্রধান একাডেমি আছে ঢাকায়। তার মধ্যে শিল্পকলা একাডেমির কথা সম্ভবত পশ্চিমবাংলার অনেকের কাছে অজানা। বিশালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই একাডেমি, বাংলাদেশের শিল্পসামগ্রী সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছেন এঁরা। একটি বিশাল প্রেক্ষাগৃহ সেখানে নির্মিত হচ্ছে দেখে এলাম। এই একাডেমি নাটক, সঙ্গীত ও নৃত্যেরও পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এঁদের আছে আলাদা পত্রিকা। আমাদের পরিচিত কবি আল মাহমুদ এই শিল্পকলা একাডেমির সঙ্গে যুক্ত। বিখ্যাত শিল্পী জয়নাল আবেদিনের একটি চমৎকার অ্যালবাম এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকায় আছে আর্ট কলেজ, প্রখ্যাত শিল্পী কামরুল হাসান এবং কাইয়ুম চৌধুরী এর সঙ্গে যুক্ত।

বাংলা একাডেমির নামের সঙ্গে আমরা অনেকেই আগে থেকে পরিচিত। সরকারি উদ্যোগে সাহিত্য-সৃষ্টি হয় না ঠিকই, সৃজনমূলক সাহিত্য সরকার থেকে যত দূর সরে থাকে ততই ভালো। কিন্তু সাহিত্য নিয়ে গবেষণার কাজ এবং সার্থক সাহিত্য সুলভে প্রচারের ভার সরকারের নেওয়া উচিত। সুবৃহৎ আঞ্চলিক ভাষায় অভিধান ছাড়াও আরও প্রায় তিনশো সাড়ে তিনশো গবেষণাধর্মী গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন এই বাংলা একাডেমি এবং আরও বিপুলভাবে কাজ চলছে। শুনলাম, এই উদ্যোগের জন্য সরকারি অনুদান এ বছর এগারো কোটি টাকা। শুনলে আমাদের শিস্ দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয় না? দিল্লির সরকার বাংলা সাহিত্যের জন্য কতটা কী করেছে বা করবে? পশ্চিমবাংলার সরকার অতিকষ্টে রবীন্দ্র রচনাবলি দ্বিতীয়বার মুদ্রণের পরিকল্পনা নিয়েছে। কিন্তু এখনও বেশি দামে

শরৎচন্দ্র, নজরুল বা বিভূতিভূষণের রচনাবলি কেনবার জন্য প্রকাশকদের দোকানের সামনে দীর্ঘ লাইন পড়ে। ঢাকার বাংলা একাডেমি অল্প দামে ক্লাসিক বইগুলি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেয়। উত্তরাধিকার নামে একটি সুসম্পাদিত পত্রিকাও প্রকাশিত হয় এখান থেকে। বুদ্ধদেব বসুর মৃত্যুর পর তাঁর উদ্দেশ্যে এই পত্রিকার একটি সম্পূর্ণ সংখ্যা নিবেদিত হয়েছিল। সৈয়দ মুজতবা আলির মৃত্যুর পর এই পত্রিকা কেন এখনও সেই দায়িত্ব পালন করেনি, সে সম্পর্কে আমার খটকা রয়ে গেল।

বাংলা একাডেমির মহা পরিচালক আশরফ সিদ্দিকী স্বয়ং একজন কবি। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, ঢাকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদেই রয়েছেন একজন কবি বা লেখক। ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গির নগর বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানকার-উপাচার্য জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, প্রখ্যাত কবি, সম্প্রতি তিনি শেকসপিয়রের সনেটগুলি অনুবাদে নিমগ্ন। টাকা ভাঙাতে গিয়েছিলাম মতিঝিলের এক বিরাট ব্যাংকে। সেখানকার হোমরা-চোমরা একজনের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনিও একজন কবি, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ। রসীজুদ্দিন আহমেদ নামে এক ভদ্রলোক জাহাজের ব্যাবসা করেন, তিনিও ছোট গল্প লেখেন। ওখানকার পেট্রোল কোম্পানির একজন চাঁই হলেন প্রধান ঔপন্যাসিক রশিদ করীম। এ রকম আর কতজনের নাম করব। তা হলে তো গোটা লেখাটাই নামাবলি হয়ে যাবে। বাংলা একাডেমির গুরুত্বপূর্ণ পদে আরও কয়েকজন কবি ও গদ্য লেখককে দেখলাম। অর্থাৎ অনেক লেককের জীবিকার সংস্থানও করেছেন বাংলা একাডেমি।

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র বেশ দুর্বল। এ কথা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরাও স্বীকার করেন। অনেক দামি-দামি আধুনিকতম সরঞ্জাম আছে ঢাকায়। সেই তুলনায় ছবির মান তেমন কিছু না। তবু এরই মধ্যে আমজাদ হোসেনের 'গোলাপি এখন ট্রেনে' ছবিটির বিশেষ প্রদর্শনী দেখলাম। একটু সংক্ষিপ্ত করলে ছবিটি বেশ ভালো বলা যায়। ট্রেনে যেসব মেয়েরা চোরাচালান করে তাদের নিয়ে গল্প। বেশ একটি সুস্থ বক্তব্য আছে। অন্য চালু ছবিগুলি দেখতে অনেকেই নিষেধ করেছিল। কিন্তু আমি চমৎকৃত হলাম বাংলাদেশে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের খানিকটা পরিচয় পেয়ে। ঢাকার একটি টিনচালের ঘরে মুহম্মদ খসরু নামে এক অতি উৎসাহী যুবক তার বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে শুরু করেছিল এই আন্দোলন। বিদেশের শ্রেষ্ঠ দেখা বা না-দেখা চলচ্চিত্রগুলির সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই এদের উদ্দেশ্য ছিল। এখন চলচ্চিত্র আন্দোলনের অনেকগুলি সংস্থা হয়েছে এবং জেলায়-জেলায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই ফিল্ম সোসাইটির ছেলেরাই নতুন ছবি বানাবার স্বপ্ন দেখে। একদিন এদের কারুর হাত থেকেই বেরিয়ে আসবে বাংলাদেশের সার্থক চলচ্চিত্র। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ থেকে ধ্রুপদী নামে একটি পত্রিকাও বেরোয়, যার সম্পাদক ওই মুহম্মদ খসরু। পত্রিকাটির রুচি, অঙ্গ-সজ্জা ও রচনাগুলির মান যথেষ্ট উঁচু।

নাটক অভিনয়ের ব্যাপারেও এখন মেতে উঠেছে ঢাকা শহর। অভিনয়ের উপযোগী হলের অভাব, যে হলটি আছে, সেটার মধ্যেও দারুণ গরম। তবু সেখানেও নিয়মিত দর্শকরা এসে অটুট ধৈর্য নিয়ে নাটক উপভোগ করছেন। ঢাকায় এখন অনেকগুলি নাটকের দল। তার মধ্যে তিনটিই প্রধান, এমন শুনেছি। এই দল তিনটির নাম থিয়েটার, নাগরিক এবং ঢাকা থিয়েটার। থিয়েটার দল এখন অভিনয় করছেন, রামেন্দু মজুমদারের পরিচালনায় আবদুল্লা আল মামুন রচিত সেনাপতি, একটি ব্যঙ্গধর্মী নাটক। সংলাপ বেশ তীক্ষ্ণ এবং অভিনয়ের মান বেশ উন্নত। এঁরা রবীন্দ্রনাথের দুই বোনও অভিনয় করেন মাঝে-মাঝে।

ঢাকা থিয়েটার করছেন এখন শকুন্তলা। সেলিম আল দিন নামে এক তরুণ কালিদাসের তোয়াক্কা না করে শুধু শকুন্তলা উপাখ্যানটি নিয়ে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লিখেছেন এই নাটক। খুবই নতুন ধরনের প্রচেষ্টা। নাটকটির পরিচালক নাসিরুদ্দিন ইউসুফ। বিশেষভাবে মনে থাকে এই নাটকের সেট, যেটি তৈরি করেছেন আফজাল হোসেন নামে এক তরুণ শিল্পী, যিনি একজন ভালো

অভিনেতাও বটেন। এই দলের সবাই তরুণ এবং বুক ভরতি টগবগে উৎসাহ।

নাগরিক দল এখন ডি এল. রায়ের সাজাহান নাটকটি খানিকটা বদলে অভিনয় করছেন। সেটি দেখার সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠেনি। তবে এই দলের কর্ণধার আলি যাকের-এর বাড়িতে আমরা কাটিয়ে এলাম এক সন্ধ্যা। আলি যাকের ওখানে বাদল সরকারের 'বাকি ইতিহাস'-এর নির্দেশক এবং সাজাহানের প্রধান অভিনেতা। সেই দলের আতাউর রহমান, আসাদুজ্জামান নূর এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে নাটক বিষয়ে অনেক কথা হল। ঢাকায় নাট্যকর্মীরা কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার আন্দোলন সম্পর্কে অনেক খবরাখবর রাখেন। সেই তুলনায় কলকাতার দর্শকরা ঢাকার নাটক বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঢাকার কোনও-কোনও নাটক দলকে কলকাতায় নিমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের অভিনয় এখানে দেখাবার ব্যবস্থা করা যায় না? কারা যেন এ সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করতে পারে।

ঢাকার প্রধানা অভিনেত্রী ফিরদৌসী মজুমদারকে দেখলে কেন যেন বারবার তৃপ্তি মিত্রের কথা মনে পড়ে। শুধু অভিনয়ের গুণের জন্যই নয়, ব্যক্তিত্বেও যেন কোথায় দুজনের মিল আছে। 'থিয়েটার' দল 'থিয়েটার' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেন। তাতে অন্যান্য অনেক কিছুর সঙ্গে থাকে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার নাট্য আন্দোলনের খবর। এর সম্পাদক এবং নির্বাহী সম্পাদক রামেন্দু মজুমদার এবং মুহম্মদ জাহাঙ্গির।

শুধু ঢাকাতেই বাংলাদেশের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইচ্ছে ছিল চট্টগ্রাম বা আরও অন্যান্য কয়েকটি জায়গায় ঘোরাঘুরি করব। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়ে উঠল না। ঢাকাতেই আড্ডা, হইহল্লা আর নেমন্তন্ন খেতে-খেতে দিন ফুরিয়ে গেল। মাঝখানে একদিন শুধু গিয়েছিলাম টাঙ্গাইল। সেখানে কবি তারাপদ রায় তখন ছিলেন তাঁর পৈতৃক বাড়িতে। তারাপদ রায়ের বাড়ির বারান্দাতেও অবিরাম চলেছিল টাঙ্গাইলের কবিদের আড্ডা। আমরা আর যেখানেই বেড়াতে যাই, যত কিছুই দেখি না কেন, বাঙালিতে-বাঙালিতে যেমন আড্ডা হয়, সেটা কি আর কোথাও সম্ভব? ঢাকার লেখক শিল্পীরা বাঙালি আড্ডার ঐতিহ্যটি সার্থকভাবে বহন করে চলেছে। এক একদিন চলত এক এক জায়গায় আড্ডা। আড্ডাধারীদের মধ্যে ছিলেন রশীদ করীম, লায়লা সামাদ, মাহমদুল হকের মতন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিকরা, শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, ফজল সাহাবুদ্দিন, রফিক আজাদের মতন প্রসিদ্ধ কবিরা এবং অগণিত তরুণ-তরুণী লেখক-লেখিকা। কত রকম প্রসঙ্গ। ওখানকার অনেকেই এদিককার সাহিত্য সংস্কৃতি সম্পর্কে অনেক কিছু জানে। ইফতেখারুল ইসলাম নামে এক নবীন লেখকের কথাবার্তা শুনে আমি চমকে-চমকে উঠছিলাম। সে সমগ্র বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে এত বেশি জানে যে ওই বয়েসি ক্বচিৎ দু-একজনের মধ্যেই এ রকম জানার পরিধি সম্ভব।

ঢাকার মানুষদের আতিথেয়তারও কোনও তুলনা নেই। প্রতি সন্ধেবেলাতেই দাওয়াত এবং নেমন্তন্ন এবং নেমন্তন্ন মানেই বিশাল আয়োজন, অন্তত দশ রকম পদ। শুধু চাখতে-চাখতে উদরপূর্তি হয়ে যায়, এবং কয়েকদিন পর খাদ্য সম্পর্কে ভীতি জন্মে যায়। ঢাকার লোকের কলকাতা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা আছে। তারা ভাবে, কলকাতায় বুঝি মাছ একেবারেই পাওয়া যায় না। আসলে কলকাতায়ও অত্যন্ত ভালো-ভালো মাছ পাওয়া যায়। দাম বেশি বলে আমরা কম খাই। তা বলে ঢাকায় দিন দশেকের জন্য বেড়াতে গিয়ে তো আর দশ বছরের উপযোগ্য মাছ খেয়ে আসা সম্ভব নয়।

ঢাকায় আমরা কোনও হোটেল ঠিক করে যাইনি। প্রথমে উঠেছিলাম এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে, ভেবেছিলাম, পরে কোনও হোটেল বেছে নিয়ে চলে যাব। কিন্তু সে বাড়ির সকলের আন্তরিক ব্যবহারে এবং আপ্যায়নে আমরা বাঁধা পড়ে গেলুম। তাঁরাই জোর করে যেতে দেননি কিংবা আমরাই আর যাওয়ার গরজ দেখাইনি—এর মধ্যে কোনটা বেশি সঠিক তা বলা শক্ত। বোধহয় দ্বিতীয়টিই বেশি সত্যি। সে বাড়ির গৃহিণী বীথি সাহাবুদ্দিন যেমন রূপসি তেমনি মধুর স্বভাবের, এবং রন্ধন শিল্পে রীতিমতন প্রতিভাময়ী। পশ্চিমবাংলায় এমন মহিলা দুর্লভ।

ঢাকায় কি শিল্প-সংস্কৃতির দিক ছাড়া আর কিছুই নেই? খারাপ কিছু বা সমালোচনা করার মতন কিছুই নেই? আছে নিশ্চয়ই, কারণ ঢাকা শহর তো স্বর্গ নয়, কিংবা স্বর্গে গেলেও নিশ্চয়ই অনেক দোষ ধরা যাবে। কিন্তু আমি সেসব লিখতে চাই না। অথবা, এমনও হতে পারে, সব সময় ভালো লোকজনদের সংসর্গে আমরা ছিলুম বলে মন্দ কিছু আমাদের চোখে পড়েনি। স্বেচ্ছায় মন্দ কিছু আমি দেখতেও চাই না।

খুব কাছে, অনেক দূরে

একটা সময় ছিল, যখন মাইলগুলো ছিল দারুণ লম্বা লম্বা। এখনকার কিলোমিটারের অন্তত পাঁচ-ছ'গুণ তো হবেই। কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরত্ব তো বিরাট ধু-ধু করা ব্যাপার। এই তো কলকাতা থেকে যশোর এখনকার হিসেবে মাত্র একশো মাইল, যে-কোনো গাড়িতেই বড় জোর চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগবে। আর এক সময় কলকাতা থেকে সকালে বেরিয়ে যশোরে পৌঁছতুম মাঝ রাত্তিরে। সেখান থেকে স্টিমারে ফরিদপুরে আমাদের গ্রামে পৌঁছতে আরও একদিন প্রায়। আমাদের বাড়ি থেকে মামাদের বাড়ি ছিল পঞ্চাশ-ষাট মাইল দূরে। বছরে দু-বারের বেশি সেখানে যাওয়া যেত না, ওই পঞ্চাশ-ষাট মাইল পার হতে লাগত পাক্কা দেড় দিন। সেটা অবশ্য নৌকো-পথে।

আর মুঙ্গের-ভাগলপুর এসব তো ছিল বহু দূরের দেশ, সেই পশ্চিমে, মিরাট-দেরাদুনের সঙ্গে বিশেষ তফাত নেই। সেখানে যারা যায়, তারা নির্বাসনেই যায়। ক্বচিৎ তারা ফিরেও আসে।

সেই রকমই একবার শুনলুম, আমাদের ভাগলপুরের মাসীমা এবার পুজোতে আসছেন। আমার এই মাসিমার মুখও আমার ভালো মনে নেই, অনেক ছেলেবেলায় এঁকে দেখেছি, অবশ্য অন্যান্য মামা-মাসি ও মায়ের কাছে এঁর গল্প শুনি প্রায়ই। ভাগলপুরে আমার দুজন মাসতুতো ভাইও জন্মে গেছে এর মধ্যে। তাদের একেবারেই চিনি না। শুধু নাম জানি।

আমাদের মামাবাড়ির পুজোয় লোক আসত অনেক। দাদুশ্রেণি এবং মামাশ্রেণির অনেকেই চাকরি করতেন প্রবাসে, কেউ রেলে, কেউ কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে, কেউ সাহেব কোম্পানিতে। পুজোর সময় সবার দেশের বাড়িতে আসা চাই। কিন্তু বিবাহিতা মাসিমা যাঁরা দূরে চলে গেছেন, তাঁদের আর দেখতে পেতুম না বিশেষ। তার মধ্যে সেই সুদূর ভাগলপুর থেকে আমার নতুন দুটি ভাই সমেত এক মাসী আসছেন শুনেই বেশ একটা চনমনে আনন্দ হতে লাগল। সেই একটা বয়েসে যখন বিস্মিত হবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে থাকে।

বাস-ট্রেন-স্টিমার ও নৌকো চেপে আসতে হবে ওঁদের, তিন-চার দিন তো লাগবেই। গরু আর শরৎচন্দ্র এই দুটি ব্যাপারেই শুধু ভাগলপুর আমাদের কাছে পরিচিত। আমাদের ধারণা, বেলুনের মতন বাঁটওয়ালা প্রচুর গরু সেখান ঘুরে বেড়ায়, রাস্তার পাশের নর্দমাতে প্রচুর দুধ গড়িয়ে যায়। আর শরৎচন্দ্র ওরফে শ্রীকান্তের বন্ধু ইন্দ্রনাথ নামে দুর্দান্ত একজন মানুষ ওখানে থাকে। মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হত, আমাদের এখানে আকাশ যেমন নীল, ভাগলপুরের আকাশও কি সেরকম? সবাই যে বলে পশ্চিমের দেশগুলো খুব শুকনো খটখটে।

প্রবল বর্ষায় নদী-নালা-পুকুর-বিল সব অতিরিক্ত উচ্ছল। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে নৌকো উলটে যাবার খবর আসে। বর্ষাকাল শেষ হয়ে গেলেও প্রায়ই চোরা ঝড়বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। নৌকো-

দুর্ঘটনার কথা শুনে বাড়ির সবাই ভয়ে কাঁটা। ভাগলপুরের মাসিরা আসবার পথে যদি দৈবাৎ এরকম কিছু হয়? অন্য কারুর সম্পর্কে এ ভয় নেই, নৌকো উলটোলে কিছু জিনিসপত্র নষ্ট হবে বড় জোর, প্রাণের কোনও ভয় নেই। আমরা তো ইচ্ছে করেই কতবার ডিঙি নৌকো উলটেছি। ভরা বর্ষার সময় বন্ধুর বাড়িতে যেতে হলে নৌকোর জন্যে বসে থাকিনি, প্যান্টুল আর গেঞ্জি খুলে বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে ডান হাতে সাঁতরে চলে গেছি।

কিন্তু ভাগলপুরের মাসতুতো ভাইরা তো সাঁতার জানে না! ভাগলপুরের মেসো সারাজীবনই কাটিয়েছেন ওই দেশে, তিনি নাকি জলকে খুব ভয় পান।

সেইজন্য একখানার বদলে তিনখানা নৌকো পাঠানো হলো ওঁদের আনবার জন্য। মাইল সাতেক দূরে স্টিমার ঘাটা। তবে সাত মাইল তো যে-সে সাত মাইল নয়, তার মধ্যে অনেক হ্যাপা।

নৌকো একেবারে আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় আনবার ব্যবস্থা আছে। যদিও বাড়ির পাশে নদী নেই। সামনের দিকের বারোয়ারি দিঘিটি বিরাট, তার একটা দিক খুলে দিলে (স্থানীয় ভাষায় বান কাটা) একটা মাঝারি খালের সঙ্গে সংযোগ হয়। অর্থাৎ নদী থেকে নৌকো আসবে সেই খালে, তারপর খাল থেকে পুকুরে। বাড়ি পর্যন্ত মটোরেবল রোডের মতন নৌকো-পথ।

সারা বাড়ির তিরিশ-চল্লিশজন লোক পুকুরধারে দাঁড়িয়ে আছে অধীর প্রতীক্ষায়। এক সময় খাল দিয়ে তিনটি নৌকো ঢুকলো দিঘিতে। সবাই নিরাপদেই পৌঁছেছে। সামনের নৌকোটিতেই দাঁড়িয়ে আছেন ভাগলপুরের মেসো। ফর্সা, ছিপছিপে চেহারা, মাথায় কোঁকড়া চুল, হিটলারি গোঁফ, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, গায়ে গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবি আর কোঁচানো ধুতি, কাঁধের ওপর পাট করা শাল। কেন জানি না, শরৎচন্দ্রেরই লেখা নতুনদা চরিত্রটা মনে পড়ল সেই মেসোকে দেখে।

প্রায় সেই রকমই একটা কাণ্ড করলেন তিনি। ঘাটে নৌকো লাগবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অতি উৎসাহে দিলেন একটি ছোট লাফ। লাফ দিলেই যে পায়ের তলা থেকে নৌকো সরে যায় সেটা তিনি জানতেন না, সুতরাং তাল সামলাতে না পেরে ঝপাং করে পড়লেন জলে। একেবারে তীরে এসে তরী ডোবার মতন ব্যাপার। তিরিশ-চল্লিশজন মানুষ একসঙ্গে 'হুঁ' শব্দ করল।

ভাগলপুরের মেসো অবশ্য বেশ স্মার্টভাবেই জল থেকে উঠে এসে বললেন, 'আরে, কিছু হয়নি! তোমাদের একটু চমকে দিলাম আর কি!'

আমাদের ওপর আগে থেকেই নির্দেশ ছিল যে অনেকদিন পরে মাসী-মেসো আসছেন, কথা বলার আগেই পায়ের ধুলো নিতে হবে। এখন যদিও ধুলো নেই, তবু ভাগলপুরের মেসোর ভিজে পায়ের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়লুম। তিনি সস্নেহে আমার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে তারপর নিজের হাতটায় চুমু খেয়ে বললেন, কেমন আচিস রে, বেটা?

এর আগে আমি কখনো কারুকে এরকম নিজের হাতে চুমু খেতে দেখিনি। তার চেয়েও আশ্চর্য হলুম বেটা কথাটা শুনে। আমাদের এখানে বেটা তো গালাগালের সময় বলে। তাও তো ছোটদেল বলে না কেউ। অবশ্য ভাইপোকে অনেকে ভাইয়ের ব্যাটা বলে বটে। কিন্তু সেটা ভালো না খারাপ অর্থে, সে ব্যাপারে কখনও নিশ্চিত হতে পারিনি।

আমার মাসিকে প্রণাম করায় তিনি বললেন, ও মা, সুকুমার, তুই এত বড় হয়ে গেছিস? অ্যাঁ?

তখন পাশ থেকে আমার অন্য এক মামাতো ভাই বললো, আমার নাম সুকুমার!

তখন মাসি বললেন, ও, ভুল হয়েছে তো, তুই বুঝি তবে চণ্ডীচরণ? কী সুন্দর চেহারা ছিল তোর ছোটবেলায়।

চণ্ডীচরণ নামে অবশ্য কারুকে খুঁজে পাওয়া গেল না। তারপর প্রত্যেকদিন দেখেছি, আমার ভাগলপুরের মাসির নাম ভুলে যাওয়ার এক দুরন্ত প্রতিভা আছে। বাড়ির কোনও লোককেই উনি ঠিক নামে ডাকেন না। তবে চমৎকার মধুর স্বভাব তাঁর। কী করে সবাইকে খুশি রাখবেন এই নিয়ে

তিনি নিরন্তর ব্যস্ত।

আমার মাসতুতো ভাই দুটির সঙ্গে কিন্তু ভাব জমল না প্রথম দিন। দুই ভাই সব সময় পাশাপাশি থাকে, খুব গম্ভীর, আমাদের দিকে আড়চোখে তাকায়। কিন্তু জিগ্যেস করলেও সহজে উত্তর দেয় না। তবে কি ওরা আমাদের গাঁইয়া ভাবছে? আমরা জানি কলকাতার ছেলেরা খুব কাইডিস মার্কা হয়। কিন্তু ওরা তো ভাগলপুরের ছেলে, ওদের কি অত যোগ্যতা আছে? অবশ্য, আমি লক্ষ করেছি, ওরা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই চুল আঁচড়ায়। আমাদের তো চিরুনির সঙ্গে সম্পর্ক দিনে একবারই, দুপুরে স্নানের পর। তাও এক-একদিন বাদ যায়।

একদিন বাদে বুঝতে পারলুম ওদের আসল অসুবিধেটা। ওরা ভালো বাংলাই বলতে পারে না। আমরা বলি, উনি আমার মামা। ওরা বলে, উনি আমার মামা হচ্ছেন! তাই শুনে সুকুমাররা ফাজলামি করতে লাগল, 'ও, উনি এখনো পুরোপুরি মামা হননি তাহলে, তৈরি হচ্ছেন?'

তা ছাড়া আমরা বাঙালরা সূর্যবংশীয় কিনা, তাই কথায় কথায় চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি না। এরা আবার ঘোর চন্দ্রবংশীয়, এত যে চন্দ্রবিন্দু ছিল তা আমরা জানতুম না। আমরা দাঁতকে বলি দাত। হাঁসকে বসি হাস। আর এরা দাঁ-আঁ-আঁ-তঁ! হাঁ-আঁ-আঁ-স। এমনকি ভাতকেও বলে ভাঁ-ত, আর ঘি-কে বলে ঘিঁ! আমরা ভাতের সঙ্গে ঘি খাই আর ওরা ভাঁতের সঙ্গে ঘিঁ খেতেই চায় না। এ দেশের ঘিঁ-তে নাকি ওদের গঁন্ধ লাগে!

দু'দিনের মধ্যেই অবশ্য এসব দূরত্ব ঘুচে যায়। পায়েসের মধ্যে কিসমিসের মতন ওরা বাড়ির একদঙ্গল ছেলেমেয়ের মধ্যে একটু আলাদা হয়ে থাকলেও মানিয়ে যায় চমৎকারভাবে। আমরা ওদের নিয়ে মজা করি, ওরাও আমাদের নিয়ে মজা করে। ভাগলপুরের ছেলেদের আর একটা চমৎকার গুণ আমাদের চোখে পড়ে। ওরা কক্ষনো কোনো ব্যাপারেই মা-বাবার কাছে নালিশ করতে যায় না। ওরা আমাদের চেয়েও বেশি হাসতে পারে।

ভাগলপুরের মাসি সম্পর্কে সবাই বলতে লাগল, ও একদম বদলায়নি, বিয়ের আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমন, আর ভাগলপুরের মেসোকেও দেখা গেল দারুণ রগুড়ে লোক, উনি 'নুচি' আর 'নেবু' মার্কা কথা বলেন আর দিনে সাত-আট কাপ চা খান বটে, কিন্তু ওর কাছে অফুরন্ত গল্পের স্টক।

হুস করে কখন দিনগুলো কেটে যায় খেয়ালও থাকে না। এই পুজো পুজো বলে এতদিনের প্রতীক্ষা, হঠাৎ একদিন শুনতে পাই ঢাকে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। কী যেন আছে এই বাজনার মধ্যে, বুকটা ধড়াস ধড়াস করে, একটু একটু জ্বালা করে চোখের কোণাগুলো। এ তো শুধু বিসর্জন নয়, এ যে আত্মীয় বিচ্ছেদের সময়। বাইরের কোনও পৃথিবী সকলের জন্য অপেক্ষা করে বসে আছে, সবাইকে এবারে যে-যার জায়গায় ফিরে যেতেই হবে।

তেরো মিনিটের বেশি সময় তাঁর নষ্ট করিনি

উনিশ শো চৌষট্টি সালের আগস্ট মাস, এক বাঙালি বেকার ছোকরা আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছে। হ্যাঁ বেকার তো বটেই, আমি চাকরি-বাকরিতে জলাঞ্জলি দিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলুম। তখনও বিয়েটিয়ে করিনি, ঝাড়া হাত-পা, ভেবেছিলুম যত দিন খুশি ওই দেশে থেকে যাব। এখনকার

আমেরিকার সঙ্গে তখনকার আমেরিকার অনেক তফাত, এখন আমেরিকা অনেকটা চুপসে গেছে, অর্থনীতিতে মার খাচ্ছে, জাপানের কাছে, বেকারের সংখ্যা অনেক, আর সেই যাটের দশকের গোড়ার দিকে আমেরিকা ঐশ্বর্যে গর্বে মটমট করত, চাকরি-বাকরি অঢেল, ভিসার কড়াকড়ি ছিল না, আমি অন্তত বছর পাঁচেক থেকে যেতে পারতুম অনায়াসে। কিন্তু ওই যে কথায় আছে, অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চচ্চড় করে, আমার আমেরিকা সহ্য হল না, বছর খানেক কাটতে না কাটতেই মন ছটফটিয়ে উঠল। অকস্মাৎ তল্পিতল্পা গুটিয়ে, যা থাকে কপালে বলে দিলুম দেশের দিকে লাফ।

ফেরার পথে লন্ডন। সেখানকার কোনও বাঙালিকে তখন চিনি না, পকেটে পয়সাকড়ি বিশেষ নেই, কিন্তু আছে একটি রাজকীয় নেমন্তন্ন। কমনওয়েলথ-এর কালচারাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এ দেশের কিছু কিছু সাংবাদিক-সাহিত্যিককে বিলেত ঘুরিয়ে আনার ব্যবস্থা ছিল তখন। সেই সুবাদে আমি বিলেতফেরত, যদিও আমার বেলায় ব্রিটিশ সরকারের কিছু অর্থ সাশ্রয় হল, আমার জন্য যাতায়াতের ভাড়া দিতে হল না, কিন্তু একজন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ল।

হোটেলে পৌঁছবার পর সরকারি প্রতিনিধি আমাকে দশ দিনের সফরসূচি দেখালেন। সকাল-বিকেল ঠাসা প্রোগাম। উইন্ডসর দুর্গ, লন্ডন গম্বুজ, মহাশয়া তুসোর মোম সংগ্রহশালা, সন্ত পলের ক্যাথিড্রাল, হাউস অব কমনসে একবেলা, স্ট্রাটফোর্ড-অন-আভন, একটি শেক্সপিয়ার ও একটি আধুনিক নাটক, এই সবই বেশ চমৎকার। সখের ভ্রমণকারীরা যা দেখে, আমি বিনা পয়সায় সেগুলি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছি, কিন্তু এর মধ্যে দুটি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা দেখে আমি আঁতকে উঠলুম, স্টিফেন স্পেন্ডার এবং টি এস এলিয়ট। ইংরিজি কাব্যের এই দুই মহারথীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার বিন্দুমাত্র বাসনা আমার ছিল না। আমি বিখ্যাত ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে কদাচ যেতে চাই না। তার কারণ, একই সঙ্গে আমার লাজুকতা এবং গোপন অহংকার। সরকারি প্রতিনিধিকে আমি অনুরোধ করলুম, ওই দুটি সাক্ষাৎকার বাদ দিতে, তিনি ভুরু কপালে তুলে বললেন, অনেক আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা আছে, এখন বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তা ছাড়া, ওঁরা সহজে সময় দিতে চান না, যখন রাজি হয়েছেন, সে সুযোগ গ্রহণ করতে আপনি অরাজি কেন? আমি বললুম, আমি ওদের সময় নষ্ট করতে চাই না, তা ছাড়া আমি ব্যক্তিপূজক নই, খ্যাতনামা ব্যাক্তিদের কাছে যাওয়া কিংবা তাঁদের সঙ্গে কথা বলার কোনও আগ্রহ আমার হয় না, ওঁদের দুজনকে আমি লেখার মধ্য দিয়ে যতখানি চিনি, তাই-ই যথেষ্ট। সরকারি আমলাটি তবু সফরসূচি বদলালেন না।

টি এস এলিয়টের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার কথা ফেবার অ্যান্ড ফেবার অফিসে, স্টিফেন স্পেন্ডারের সঙ্গে লাঞ্চ খেতে হবে অক্সফোর্ড স্ট্রিটে একটি নাম-করা রেস্তোরাঁয়। দ্বিতীয় দিন প্রচুর ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে আমার হোটেলে ফিরেছি, রাত এগারোটার একটু পরে কাউন্টারের কর্মচারীটি বেশ সচকিতভাবে বললেন, আপনার জন্য মিঃ স্পেন্ডার অপেক্ষা করছেন। অত রাতে লাউঞ্জ ফাঁকা, একটি সোফায় একজন মাত্র ব্যক্তিই বসে আছেন, এক শুভ্রকেশ প্রৌঢ়, স্টিফেন স্পেন্ডার! আমি হতবাক।

নিউ ইয়র্কে একটি ভোজসভায় স্টিফেন স্পেন্ডারের সঙ্গে আগেই দেখা হয়েছিল বলে মুখ চেনা ছিল, আমি তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে করমর্দন করে অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে বললেন, আমি তোমার কাছে মার্জনা চাইতে এসেছি, আগামীকালের লাঞ্চ অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে পারছি না, বিশেষ কাজে প্যারিস যেতে হচ্ছে, আশা করি তুমি কিছু মনে করবে না।

এই সামান্য ব্যাপারটা তিনি লোক মারফত কিংবা টেলিফোনে জানাতে পারতেন, এমনকী হোটেলের কাউন্টারে একটা নোট রেখে যেতে পারতেন, সেসব না করে তিনি নিজের মুখে কথাটা আমাকে জানাবার জন্য অত রাত্রে হোটেলে এসে বসে আছেন! আমার অদ্ভুত অনুভূতি হল। কবিদের সম্পর্কে লোকের ধারণা, তারা মদ্যপ, বোহেমিয়ান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়, কিন্তু একজন প্রতিষ্ঠিত

কবি যে এমন ভদ্রও হতে পারেন তা যেন প্রথম জানলুম।

এই অ্যাপয়েন্টমেন্টটি বাতিল হওয়ায় আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল। সাহেবি লাঞ্চ খেতে অন্তত পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগে, অতক্ষণ ধরে আমি স্পেন্ডার সাহেবের সঙ্গে কী কথা বলতুম? এখন এলিয়ট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারটিও কোনওরকমে এড়ানো যায় না? এলিয়ট সাহেব বিদেশে বেশি যান না জানি, কিন্তু ওঁর তো অন্তত জ্বরও হতে পারে।

নির্দিষ্ট দিনে কাঁটায়-কাঁটায় সকাল সাড়ে দশটায় আমার সফরসঙ্গী এসে হাজির, টি এস এলিয়টের অফিসে পৌঁছতে হবে এগারোটায়। তিনি তখন ফেবার অ্যান্ড ফেবার নামে প্রকাশক সংস্থার অন্যতম পরিচালক। কিছুদিন আগেই সেই সংস্থা থেকে পাঁচজন তরুণ কবির কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন তিনি। এটা একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কারণ, বড় বড় প্রকাশনালয়গুলি তরুণদের কবিতার বই ছাপতে চায় না। সেই পাঁচটি বই ছাপা হয়েছিল পরীক্ষামূলকভাবে অর্থাৎ সেগুলি মোটামুটি বিক্রি হলে অন্যান্যদের বইও ছাপা শুরু হবে।

যতদূর মনে পড়ে, সেই পরীক্ষা সফল হয়নি, সেই পাঁচজনের মধ্যে টম গান ছাড়া অন্যরা পরে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি।

ঘরখানি সরু লম্বাটে। টেবিলটি বেশ ছোট, কাগজপত্রের ভিড় নেই, একপাশে কিছু বই ও না-খোলা চিঠিপত্র। পাতলা চেহারার এলিয়ট সাহেব মগ্ন হয়ে কিছু পড়ছিলেন, উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে অত্যন্ত নীচু গলায় বললেন, হাউ ডু ইয়ু ডু?

আমার সরকারি সফরসঙ্গী গড়গড় করে মুখস্থ বলার মতন উচ্চারণ করতে লাগলেন আমার পরিচিত। জানাবার মতন কিছুই নেই, শুধু এলেবেলে কথা। তারই মধ্যে আমি 'কৃত্তিবাস' নামে একটি কবিতার পত্রিকা সম্পাদনা করি শুনে তিনি সামান্য কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলেন, কবিতার কাগজ? শুধু বাংলা কবিতা? আমি বিনীতভাবে বললুম, খুবই ছোট কাগজ, অনিয়মিত, মাত্র সাড়ে সাত শো ছাপা হয়। উনি স্বগত চিন্তার ভঙ্গিতে বললেন, সাড়ে সাত শো, সাড়ে সাত শো, নট ব্যাড....।

এর পর চলল টুকিটাকি কথাবার্তা। নিছক মামুলি, শুধুই বলার জন্য বলা, এই ধরনের স্মল টক একেবারে অর্থহীন, অকারণে একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সময় নষ্ট। আমি মনে মনে খুবই অস্বস্তি বোধ করছি। কলকাতায় সেই আমলে টি এস এলিয়ট অনেকেরই আরাধ্য দেবতা, যে কোনও সাহিত্যঘটিত প্রসঙ্গে এলিয়টের দু-চার লাইন কোটেশন অবধারিত, কফি হাউসের বুদ্ধিজীবীরা যখন তখন দু-এক পঙক্তি এলিয়ট আওড়ায়, এ হেন কবির সামনে বসে থেকেও আমার আহামরি ভাব হল না, খালি মনে হচ্ছে কখন উঠব।

একজন মহিলা, কিংবা একইরকম পোশাকের একাধিক মহিলা এরই মধ্যে দু-তিনবার টকটক করে হাইহিলের শব্দ তুলে ঘরের মধ্যে এসে নিম্নগলায় কবিকে কী যেন বলে চলে যাচ্ছে। 'ইন দা রুম দা উইমেন কাম অ্যান্ড গো টকিং অফ মিকেলাঞ্জেলো'!

একটি সুদর্শন যুবক এসে চা দিয়ে গেল আমাদের। আমি মনে মনে ভাবলুম, চা শেষ করেই উঠে পড়া যাবে। আমি সরাসরি এলিয়টের চোখের দিকে চাইছি না, তিনিও তাঁর দৃষ্টির মধ্যে মন দিচ্ছেন না।

'দা আইজ আর নট হিয়ার / দেয়ার আর নো আইজ হিয়ার'....।

একটা সময়ে আমরা দুজনেই চুপ। খুবই অস্বস্তিকর নীরবতা। আমার দিক থেকে একটা কিছু বলা উচিত, তাই আমি হঠাৎ মনে-পড়া ভঙ্গিতে বললুম, বাংলায় আপনার কবিতার অনুবাদের বই বেরিয়েছে, আমাদের বিখ্যাত কবি বিষ্ণু দে অনুবাদ করেছেন, আপনি জানেন? এলিয়ট মৃদু হেসে বললেন, জানি। ভিষ্ণু ডে। ভিষ্ণু। ব্রাহামা-ভিষ্ণু-শিভা....এই ট্রিনিটি। আচ্ছা, তুমি বলতে পারো,

ভিষ্ণু আর শিভার অনেক ভক্ত আছে, তাদের মন্দির আছে, প্রতিদিন এই দুই দেবতার পুজো হয়, কিন্তু ব্রাহমা-ও এদের সমান হলেও মন্দিরে কেন তাঁর পুজো হয় না?

আমি একটু চমকে উঠলুম। এ যে অতি কঠিন প্রশ্ন। ভারতের কোথাও হয়তো দু-একটা ব্রহ্মার মন্দির থাকতেও পারে, কিন্তু আমি দেখিনি। ত্রয়ীর মধ্যে ব্রহ্মার ভক্তসংখ্যা কেন এত কম, আর ঘরে ঘরে কেন তাঁর পুজো হয় না, সে কারণটাও তো আমি জানি না।

অকপটে স্বীকার করলুম আমার অজ্ঞতা! চা পান হয়ে গেছে, এবার উঠলেই হয়, আমি উশখুশ করছি, এই সময় তিনি টেবিল থেকে একটা বই তুলে জিগ্যেস করলেন, দেখো তো, এটা কী ভাষার বই?

বইটি দেখে আমি চমৎকৃত হলুম। বেশ খারাপভাবে ছাপা একটি বাংলা কবিতার বই। নামটা যতদূর মনে পড়ে 'বিষের ধোঁওয়া' কিংবা 'বিষের বাঁশী', বাঁকুড়ার একজন স্কুল-শিক্ষকের রচনা। তিনি বইটি টি এস এলিয়টকে উৎসর্গ করেছেন, ভেতরে প্রায় আধ পাতা জোড়া এই ধরনের ইংরিজিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন ঃ ইউ আর মাই গুরু অ্যান্ড আই অ্যাম লাইক একলব্য, ইয়োর মোস্ট ডিভোটেড ডিসাইপল্‌...।

উনি সামান্য হেসে বললেন, আমি তো এই বই পড়তে পারব না।

তারপর অতিশয় ভদ্রতার সঙ্গে বললেন, তোমার কোনও কবিতার ইংরিজি অনুবাদ আনোনি? থাকলে আমি দেখতে পারতাম, এখন সঙ্গে না থাকলেও যদি পরে পাঠিয়ে দাও।

আমিও সমান ভদ্রতার সঙ্গে বললুম, আজ্ঞে না, সেরকম কিছু নেই। সেগুলো আপনাকে দেখাবার মতনও কিছু নয়। আমি উঠে দাঁড়াতেই তিনিও উঠে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর দক্ষিণ করতল বেশ নরম আর ঠান্ডা মনে হল। তাঁর চোখের নীচে খানিকটা ক্লান্তির ছাপ। হয়তো তাঁর শরীর খুব সুস্থ নয়। আমি বারো-তেরো মিনিটের বেশি তাঁর সময় নষ্ট করিনি।

বিটুইন দা কনসেপশান / অ্যান্ড দা ক্রিয়েশান / বিটুইন দা ইমোশান / অ্যান্ড দা রেসপন্স/ ফল্‌স দা শ্যাডো...।

কফি বানিয়ে দিচ্ছিলেন দালি নিজে

শরৎকালের এক সকালে অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ ও গ্রেগরি করসো, এই দুই কবির সঙ্গে আমি হাঁটছিলুম, নিউ ইয়র্কের রাস্তায়। আমাদের গন্তব্য লি রয় জোনস নামে একজন কৃষ্ণকায় কবি ও নাট্যকারের বাসস্থান; এই লি রয় জোনস পরবর্তীকালে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলনের এক উগ্রপন্থী নেতা হয়েছিলেন, সঙ্গে রিভলভার রাখতেন, কিন্তু সে সময়ে তাঁর মস্তিষ্ক সবে উষ্ণ হতে শুরু করেছে, আগের রাত্রে এক পানশালায় গ্রেগরি করসোর সঙ্গে তাঁর জোর কথা কাটাকাটি হয়েছে। কবি-লেখকদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটি সব দেশেই হয়ে থাকে। অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের মাথা ঠান্ডা, তাকে সবাই মানে, তাই সে চলেছে, দুজনের মিটমাট করে দিতে। আমি তখন দিন পনেরো ধরে অ্যালেনদের অ্যাপার্টমেন্টে অতিথি, পালা করে রান্না করি, ঘর ঝাঁট দিই, বাজারে যাই এবং কখনও সবাই মিলে একসঙ্গে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গান গাই। সেই সকালে আমার কিছু করণীয় ছিল না, তাই আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিল অ্যালেন।

লোয়ার ইস্ট সাইডের তিন নম্বর রাস্তা, এটা গরিবদের পাড়া। বাপ-মা খেদানো শ্বেতাঙ্গ ছেলে-মেয়ে, কৃষ্ণাঙ্গ বেকার কিংবা মজুর, মারকুটে, পোরতোরিক্যান, বেশ কিছু নানা জাতের নেশাখোরদের সঙ্গে কিছু কিছু শিল্পী-কবিরাও তখন এ পাড়ায় থাকত। বাড়িগুলো উঁচুর দিকে লম্বা লম্বা বস্তির মতন, লিফট নেই, লঝঝড়ে সিঁড়ি, দেওয়ালে নানারকম অসভ্য কথা লেখা। পরে আরেকবার গিয়ে দেখেছি, সেইসব অনেক বাড়িই ভেঙে ফেলা হয়েছে। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি' নামে একটি বিখ্যাত ফিলমে সেই পাড়াটির তৎকালীন ছবি বিধৃত হয়ে আছে।

সেই সকালটি ছিল মনোরম, রৌদ্রকরোজ্জ্বল, পথে অনেক ঝলমলে মানুষ। এসব রোদকে সাহেবরা বলে গ্লোরিয়াস সানশাইন। হঠাৎ থেমে গিয়ে অ্যালেন রাস্তার বিপরীত দিকের একজন মানুষের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করল, ওই লোকটিকে চেনো?

সেই লোকটির দিকে অনেকেই ফিরে ফিরে দেখছে। বেশ মোটা-সোটা দীর্ঘকায়, গায়ে একটা সোনালি রঙের জ্যাকেট, সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে তার গোঁফটি, মোম দিয়ে পাকানো, দু-দিকে একেবারে খাড়া। সব মিলিয়ে অনেকটা যেন হরতনের গোলামের মতন। আমি দু'দিকে মাথা নাড়তেই অ্যালেন বলল, সালভাদর দালি। চলো, আলাপ করবে?

গ্রেগরি করসোর তাতে আপত্তি। সে বলল, না, না, ছাড়ো ওর সঙ্গে দেখা হলেই ও অনেকক্ষণ বকবক করবে!

কিন্তু ইতিমধ্যেই দালি আমাদের দলটিকে দেখতে পেয়েছেন। অ্যালেনের দিকে হাত তুলে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে তিনি সমস্ত ট্র্যাফিক অগ্রাহ্য করে লম্বা লম্বা পা ফেলে পেরিয়ে এলেন রাস্তা। চেহারা ও পোশাকেও দালি এমনই বিশেষ দ্রষ্টব্য যে তাঁর জন্য সব গাড়ি থেমে যায়।

আমি সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চিত এবং নির্বাক। আমার তখন হিরো ওয়ারশিপের বয়েস, আমি দালির এমনই ভক্ত যে মনে হল চোখের সামনে এক দেবতাকে দেখছি। দালির একটি ছবির অনুপ্রেরণায় আমি 'জ্বলন্ত জিরাফ' নামে একটি কবিতা লিখেছি মাত্র কয়েক মাস আগে। সেই মহান শিল্পী আমার চোখের সামনে? আমরা দেশে থাকতে ইমপ্রেশানিস্ট, পোস্ট ইমপ্রেশানিস্ট, কিউবিস্ট, সুররিয়ালিস্ট শিল্পীদের নিয়ে মাতামাতি করি, কিন্তু মূল ছবিগুলি দেখার সৌভাগ্য আমাদের হয় না। দুধের বদলে পিটুলিগোলার মতন ছবির বইতে ছোট-ছোট প্রিন্টই আমাদের সম্বল। আমরা ছবিগুলির কাহিনি অনেক জানি কিন্তু ছবিগুলির প্রকৃত শিল্প-উপভোগের সুযোগ পাই না। সেইজন্যই নিউ ইয়র্কে এসে আমি ক্ষুধার্তের মতন মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম, গুগেনহাইম মিউজিয়াম ও অন্যান্য আর্ট গ্যালারিগুলো ঘুরে এইসব মাস্টারের ছবি যতগুলো পেয়েছি দেখে নিয়েছি। পিকাসোর চেয়েও দালির ছবি আমার বেশি প্রিয়, তার কারণটা ব্যাখ্যা করতে পারব না, তবে দালির ছবি আমার কল্পনাকে বেশি উদ্দীপ্ত করে।

রাস্তার এদিকে এসে দালি প্রায় ধমক দিয়ে অ্যালেনকে বললেন, তুমি আসবে বলেছিলে, তুমি আমার শর্ট ফিল্ম দেখতে এলে না। অ্যালেন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। আমি ভারতীয় শুনে দালি ভুরু তুলে, অদ্ভুত একখানা মুখ করে বেশ কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন নিঃশব্দে, তারপর অ্যালেনকে বললেন, চলো, চলো, তোমরা সবাই আমার ওখানে চলো!

গ্রেগরি ক্ষীণ আপত্তি জানালেও দালি তা শুনলেন না, তিনি গ্রেগরির হাত দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে জোর করে টেনে নিয়ে চললেন।

দালিকে ওই গরিবপাড়ায় দেখতে পাওয়া একটা আশ্চর্য ঘটনা। সেই ষাটের দশকেই দালি বিশাল ধনী ব্যক্তি। মাতিস, ব্রাক ও কানদিনস্কির পর পিকাসো এবং দালিই পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতিমান শিল্পী এবং দুজনেই টাকা পয়সার ব্যাপারে ছিলেন শাহেন শা, ঝানু ব্যাবসাদার যাকে বলে। পিকাসো তো কেউ তাঁর ছবি কিনতে এলে তাঁর সঙ্গিনী ফ্রাসোয়াজ জিলো-র আঁকা ছবিও গছিয়ে দিতেন,

আর দালি ফুলদানি কিংবা পেয়ালা-পিরিচে নতুন ডিজাইন করার নামে দুটি চারটি আঁকিবুকি কেটে আদায় করতেন প্রচুর টাকা। তবু দালি সেই সময়টায় শখ করে গ্রিনিচ ভিলেজে একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে সদলবলে থাকতেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার দিনটায় তিনি রোদ্দুরে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন, যদিও তখন সকাল সাড়ে দশটা।

দালির, সঙ্গে আমার আলাদা করে কিছু কথা হয়নি, ভারত সম্পর্কে তিনি বিশেষ কোনও আগ্রহও দেখাননি। এক সময়ে ফরাসি দেশে জমায়েত শিল্পীরা খানিকটা ঝুঁকেছিলেন জাপানি শিল্পকলার দিকে, কিন্তু ভারতীয় শিল্প রীতি পশ্চিমে কখনও তেমনভাবে আদৃত হয়নি। আমি মুগ্ধভাবে দালিকে শুধু দেখছিলাম ও তাঁর কথা শুনছিলাম। দালি খুব উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন শর্ট ফিল্ম নিয়ে। অন্য কয়েকজনের সহযোগিতায় তিনি একটি শর্ট ফিলম বানানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন সেসময়।

এ কথা সবাই জানে যে, এক সময় বিখ্যাত পরিচালক লুই বুনুয়েলের সঙ্গে দালি যুক্ত ছিলেন শিল্প নির্দেশক হিসেবে। দুজনের মিলিত প্রয়াসে তৈরি হয়েছিল লস অলভিদাদস-এর মতন এক অসাধারণ চলচ্চিত্র, আমার মতে যা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি ফিল্মের অন্যতম। পরে বুনুয়েলের সঙ্গে দালির ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, না টাকাপয়সা নিয়ে বিবাদ, এই দুই প্রতিভার বিচ্ছেদে চলচ্চিত্রশিল্পে নিশ্চিত অনেকটা ক্ষতি হয়ে গেছে। কথাবার্তার ফাঁকে আমি একবার দালিকে জিগ্যেস করলাম বুনুয়েলের সঙ্গে আপনি আর ছবি করলেন না কেন? উত্তরটা এড়িয়ে গিয়ে দালি আবার অদ্ভুত মুখ করে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, সে এক লম্বা গল্প!

যে শর্ট ফিল্মের কথা দালি বলছিলেন, সেগুলি দশ-বারো মিনিটের ছবি, নিজেদের প্রমোদের জন্যই খেলাচ্ছলে করা। তার একটি দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল পরে, সেটি কৌতুকও আদিরসের এক বিচিত্র সংমিশ্রণ।

গ্রেগরি করসোর ছটফটানির জন্য সেদিন আমাদের বেশিক্ষণ বসা হয়নি, পর পর তিন কাপ কফি খেয়ে বিদায় নিয়েছিলাম। কফি বানিয়ে দিচ্ছিলেন দালি নিজে, তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে সেদিন কোনও নারীকে দেখিনি। সেইসময় দালি নিউ ইয়র্কে একটি মজার ঘটনা ঘটিয়েছিলেন, সেটি বলে শেষ করি। ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি অঞ্চলটি নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড়লোকি পাড়া, সেখানে বড় একটা দোকানে লক্ষ-কোটি টাকার সওদা হয়। সেই রাস্তায় একটি নতুন দোকান খোলা হবে তার অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জা করে দেবেন সালভাদর দালি, খবরের কাগজে এর বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল। দোকানটির উদ্বোধন দিন আসন্ন, দালি অনেক টাকা পয়সা নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু কিছুই করছেন না, মালিকের তো মাথায় হাত! দালিকে কিন্তু জিগ্যেস করতে তিনি বলেন—হবে, হবে, ব্যস্ত হওয়ার কী আছে। অবশেষে এসে পড়ল উদ্বোধনের দিনটি, তখনও কিছু হয়নি। সকালবেলা দালি সেই দোকানের বিশাল কাচের শো উইন্ডোর পাশে পাতলেন একটি বাথ টাব, তার মধ্যে নিজে নগ্ন হয়ে শুয়ে পড়লেন। তাই দেখার জন্য এমন ভিড় জমে গেল যে তা সামলাতে পুলিশের হিমসিম অবস্থা। প্রায় সারা শহরের লোক ছুটে এল সেদিকে। দালির জন্য সেই দোকানের প্রচার হয়ে গেল কোটি কোটি টাকার।

সেই দৃশ্যটি অবশ্য আমি দেখতে যাইনি। আজও আমার মনে আছে দালিকে রাস্তার মাঝখানে প্রথম দেখার স্মৃতি। আমি ভারতীয় শুনে তিনি অদ্ভুত মুখ করে প্রায় ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে বেশ কয়েক পলক তাকিয়েছিলেন, কেন তা আমি আজও বুঝতে পারিনি।
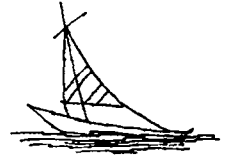
সাগর থেকে পাহাড় ১

মে মাসে মালদায় প্রধান দ্রষ্টব্য আম। ফরাক্কা সেতু ছাড়বার খানিক পরেই চোখ টানে দুপাশের সব আমবাগান। এত আম! এ বছর বোধহয় এদিকে তেমন ঝড় বা শিলাবৃষ্টি হয়নি, গাছগুলি একেবারে ফলে ভরতি। সারা পশ্চিমবাংলায় এত আম আর কোথাও হয় না। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর-মজিলপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত অঞ্চলটার নানরকম ফলের খ্যাতি আছে। এবারে দেখেও এসেছি। কিন্তু তা মালদার তুলনায় কিছু না। মুর্শিদাবাদের আমবাগানও অনেক হার মেনে যায়। মালদার আমবাগানগুলি ঝকঝকে তকতকে, কোনও কোনও গাছের আম ভরতি ডাল এত নীচু যে রাস্তা থেকেও হাত বাড়িয়ে ছিঁড়ে নেওয়া যায়। কেউই নিচ্ছে না অবশ্য। এই আমবাগানগুলি নিশ্চয়ই ব্যাবসায়ীদের কাছে জমা দেওয়া। কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে তাদের পাহারাদার। এই সময়টায় আম এখানকার অর্থনীতিতে একটা বড় ভূমিকা নেয়। মাঝেমাঝে লিচু বাগানও রয়েছে।

বিদেশে গিয়ে আমরা রাস্তার ধারেধারে আপেল-আঙুর ফলে থাকতে দেখে বিস্মিত হই, এখানকার হাজার হাজার গাছে আম আর লিচুর দৃশ্যও কম সুন্দর নয়। আপেল সম্পর্কে নানান ভুল খ্যাতি এতদিন প্রচলিত ছিল, কিন্তু স্বাদে ও খাদ্যগুণে আম আপেলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট। আমি অবশ্য আম বা আপেল কোনওটারই ভক্ত নই, তবু একসঙ্গে এত ফলবান গাছ দেখলে মুগ্ধ হতেই হয়।

মালদার অন্য দ্রষ্টব্য হল গৌড় ও পাণ্ডুয়া। বাংলার প্রাচীন ইতিহাসের চিহ্ন প্রায় বিশেষ কিছুই নেই, যা আছে, তার মধ্যে গৌড়, ও পাণ্ডুয়ার পুরাকীর্তি এবং ধ্বংসাবশেষ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অথচ পর্যটন দপ্তর এগুলি সম্পর্কে এত উদাসীন কেন? হাইওয়ে দিয়ে যাওয়ার সময় কোথা দিয়ে ঢুকতে হবে, তার কোনও পথ নির্দেশ নেই, মসজিদ-মিনারগুলির কোনও রক্ষক নেই, ঐতিহাসিক পরিচিতিগুলি এক কালে যা লেখা ছিল, তা অনেক জায়গায় মুছে গেছে। এই অবহেলা দেখে মর্মপীড়া হয়। মনে হয়, এখানে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মধ্যে গা ঠেলাঠেলির ব্যাপার আছে। লুকোচুরি দরওয়াজা, চাকনা মসজিদ, লিটন মসজিদ দেখতে-দেখতে আমরা পৌঁছে গেলাম সীমান্তে। গৌড়ের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশেও পড়েছে, কিন্তু তা তার দেখবার উপায় নেই। ছোট একটা রাস্তার ওপর আড়াআড়ি একটা ডান্ডা বাসিয়ে লেখা আছে, প্রবেশ নিষেধ। বসে আছে একজন মাত্র তেলতেলে চেহরার রক্ষী, সে একজন কালো চশমা পরা লোকের সঙ্গে কী নিয়ে গল্প করছে কে জানে। কাছাকাছি মাঠ-ঘাট দিয়ে যে-কেউ এপারে-ওপারে আসা যাওয়া করতে পারে, সেরকম, ভাবে আসছে যাচ্ছে নিশ্চয়ই অনেকে, শুধু আমরা যারা আইন মেনে চলি, তাদের জন্যই প্রবেশ নিষেধ-এর কাঠোর নির্দেশ।

গৌড়ের সবচেয়ে বিখ্যাত বারো দুয়ারী বা বড় সোনা মসজিদ-এর রাস্তাটাই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। রাস্তায় একজন প্রৌঢ় মুসলমান চাষীকে জিগ্যেস করতে সে খুব সুন্দরভাবে রামকেলী গ্রামের রাস্তা বুঝিয়ে দিয়ে, একটু থেমে, জোর দিয়ে বললেন, ওখানকার মন্দিরটাও দেখে আসবেন। প্রৌঢ়টির এই কথা খুব স্বাভাবিক বলেই গণ্য করা উচিত, কিন্তু পরে পাণ্ডুয়াতে গিয়ে অতি বিখ্যাত আদিনা মসজিদ দেখতে গিয়ে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে খানিকটা অস্বস্তি ও দুশ্চিন্তা লক্ষ করেছি। আদিনা

মসজিদে বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্যের ছাপ স্পষ্ট। বুদ্ধমূর্তি এবং হিন্দু দেবদেবীদের মূর্তি ঘষে-ঘষে মুছে ফেলার চেষ্টা হলেও এখনও অনেক চিহ্ন বেশ ভালোভাবেই রয়ে গেছে। এমনকী মেহরাবের পাশে রয়েছে হিন্দু ধর্মীয় মোটিফ। রাজা গনেশের ছেলে যদি এক মুসলমান নবাব নন্দিনীর প্রেমে পড়ার পর ধর্মান্তারিত হয়ে জালালুদ্দিন হন, এরকম এক আধা ইতিহাস মিশ্রিত কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে এই মসজিদের সঙ্গে। এটা মিশ্র সংস্কৃতির একটা চমৎকার নিদর্শন। হিন্দু মন্দির ভেঙে মুসলমানের মসজিদ তৈরি হয়েছে শুনলেই অনেক হিন্দুর ইদানিং রক্ত গরম হয়, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে আগে বৌদ্ধ মন্দির বা স্তূপও ভেঙে এক সময় জবর দখল করেছে হিন্দুরা। ভাঙা-গড়া নিয়েই তো ইতিহাস। কিন্তু আদিনা মসজিদ গিয়ে কয়েকবার ঘোঁট পাকিয়েছে কোনও এক গোঁড়া হিন্দু সংস্থা। স্থানীয় মুসলমানরা এই জন্যই খানিকটা চিন্তিত। যদি এর পরে এখানে রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদের মতন কোনও বিবাদ লেগে যায়? এ বিষয়ে কি আগে থেকেই সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই? আমাদের জাতীয় দোষ এই, আমরা কোনও সমস্যারই আগে থেকে প্রতিকারের চেষ্টা করি না, আগুন জ্বলে উঠলে গেল গেল রব তুলি এবং অন্য কারুর ওপর দোষারোপের চেষ্টা করি।

গৌড় থেকে ফেরার পথে একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা হল। আমবাগানগুলো নানা লোকের সম্পত্তি কিন্তু রাস্তার ধারের গাছগুলো সরকারি অর্থাৎ কারুর নয় যে কেউ এইসব গাছের ফল পাড়তে পারে। জায়গাটা আমের পক্ষে এমনই উর্বর যে রাস্তার ধারেই গাছেও প্রচুর ফল। নানা জায়গায় বিভিন্ন বয়েসি নারী পুরুষ মহা উৎসাহে এইসব গাছের ফল পাড়ছে, কেউ কেউ ঝুড়ি-বস্তা ভরতি করে ফেলেছে। এগুলো উঁচু জাতের আম, সুস্বাদু আম, এক জায়গায় গাড়ি থামিয়ে আমি একজনকে বললাম, ভাই দুটো আম দেবে নাকি? সে সঙ্গে সঙ্গে দুটোর বদলে চারটে দিয়ে দিল। আমি কিন্তু দাম দেওয়ার জন্য পকেটে হাতে দিচ্ছিলাম, আর কয়েকজন এসে বলল, নিন না, আমারা নিচ্ছি, আপনারাও নিন! প্রত্যেকেই দুটো তিনটে করে দিতে লাগল। একজন অন্যদের বলল, দিচ্ছিস যখন, ভালো দেখে দে! আমি যত বলি, আর চাই না, তারা শোনে না, মহাউৎসাহে সবাই দুটো তিনটে করে আম-দান করতে লাগল। পয়সার কোনও প্রশ্ন নেই। পঞ্চাশ বছর আগে এরকম ঘটনা হয়তো স্বাভাবিক ছিল কিন্তু এখনও বিনা পয়সায় মানুষ মানুষকে কিছু দিতে চায়, এটা যেন অবিশ্বাস্য মনে হয়। ভবিষ্যৎ কালের জন্য আমি এই ঘটনাটা উল্লেখ করলাম।

এই ভালো লাগার অনুভূতি অবশ্য মালদা শহরে ঢুকলে মিলিয়ে যায়। নির্বাচনী দেওয়াল লেখা ও পোস্টারে এই শহর একেবারে ছয়লাপ। এত প্রচার উপকরণ পশ্চিম বাংলার আর কোনও শহরে আছে কি না সন্দেহ। লাল, তেরঙা, ও দু-রঙা ঝান্ডা যেন সারা শহরটাকে মুড়ে রেখেছে। যেন যুদ্ধের আয়োজন, ভোটে জেতা যেন এক জীবন-মরণ সমস্যা, শহর ছেড়ে ইংলিশবাজার ও মানিকচকের দিকে যেতে গিয়ে দেখি, অল্প ব্যবধানে জমেছে কংগ্রেস প্রচারকদের সাইকেল বাহিনী, পদ্মফুল মার্কাদের মিছিল, আর বামপন্থীদের মিটিং। পথের মাঝখানে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে এক পুলিশের গাড়ি, থমথমে অপেক্ষায়। আমাদের সৌভাগ্য এই যে কোনও সংঘর্ষ দেখিনি।

টুরিস্ট লজের কাছাকাছি এক রাজনৈতিক নেতার প্রায় মুখোমুখি পড়ে গেলাম। তিনি আমাকে বোধহয় চিনতে পেরেছিলেন, কিন্তু আমি না দেখার ভান করে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। এখানকার পরিচিত দু'চারজন জিগ্যেস করল আপনি নিশ্চিয়ই এখানে কারুর কারুর সঙ্গে কথা বলবেন? আমি কোনও রাজনৈতিক নেতার সঙ্গেই দেখা করতে চাই না শুনে তারা বিস্মিত। কেন আমি দেখা করব? প্রেমে ও রণে মিথ্যে কথা বলা মেনে নেওয়া যায়। কিন্তু ইদানীং সবচেয়ে বেশি মিথ্যে কথা বলা হয় নির্বাচনের সময়। আমি নির্বাচনকে যুদ্ধ বলেও মানতে রাজি নই।

অনেক কংগ্রেসি আমাকে মনে করে বাম-ঘেঁষা। আবার বামপন্থীরা আমাকে মনে করে, আমি পুরোপুরি বিরুদ্ধ পক্ষে। আমি এই অবস্থাটা বেশ উপভোগ করি। কট্টর হিন্দু এবং কট্টর মুসলমান, এই দুই দলই নাস্তিকদের ঘৃণা করে। সব রাজনৈতিকদলের কট্টর সমর্থকরাই নিরপেক্ষতা সহ্য করে

না। সবাই মনে করে নিরপেক্ষরা আসলে বিপক্ষে, কেউ-কেউ মনে করে, নিরপেক্ষ মানেই শত্রু। এই মনোভাব বদলের সময় এসেছে। দলীয় আনুগত্য এক ধরনের অন্ধত্ব এনে দেয়, যুক্তি তুচ্ছ হয়ে যায়। দলকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক মিথ্যেকেও সত্য বলে জোর গলায় প্রচার করা হয়। কোনও রাজনৈতিক দল বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে যে কিছু-কিছু মিথ্যের কাছে তাদের আদর্শ বিসর্জন দিতে হয় না? দেশের সমস্ত মানুষকে কোনও না কোনও দলীয় রাজনীতির দিকে ঠেলে দিলে সামাজিক পরিবেশে যে অনেক রোগ দেখা দেয়, তা প্রমাণিত হয়ে গেছে। সেই জন্যই সমাজের কিছু লোকের নিরপেক্ষ থাকা দরকার। যারা কোনও দলের কাছ থেকেই কোনও সুযোগ বা কৃপা গ্রহণ করবে না। শাসক দলের যে কোনও সুকৃতিকে সমর্থন জানাবে, ভুল নীতি বা স্পর্ধার সমালোচনা করবে। মুক্ত সমালোচনার সুযোগ না থাকলেই সমাজে হিটলার, স্টালিন, এমাজেন্সি আমলের ইন্দিরা গান্ধি, চাউসেস্কু এরশাদের মতন স্বৈরাচারীরা আধিপত্য করার সুযোগ পায়।

প্রতিবেশী বাংলাদেশে স্বৈরাচারী এরশাদের পতন হয়েছে সর্বদলীয় ছাত্র সমাজের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদে। সেখানকার সাম্প্রতিক নির্বাচনের মতন মুক্ত ও স্বাধীন নির্বাচন যে এই উপ মহাদেশে আগে কখনও হয়নি, তা সমস্ত আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরাই স্বীকার করেছেন, বাংলাদেশের নিরপেক্ষরা জোরালো কণ্ঠে দাবি তুলে ছিল, নিজের ভোট নিজে দেব। যাকে ইচ্ছে ভোট দেব।

আমাদের এই নির্বাচনে জোর জবরদস্তি আর টাকার খেলায় ভোট কেনার সম্ভাবনা যে যথেষ্ট রয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহই নেই। একে গণতন্ত্র বলে না। গণতন্ত্রের প্রকৃত চরিত্রকে বাঁচাতে হলে এখানকার নিরপেক্ষদেরও এই ধ্বনি তোলা দরকার।

নিজের ভোট নিজে দেব
যাকে ইচ্ছে ভোট দেব!

সাগর থেকে পাহাড় ২

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্পের চরিত্র দুটি জেলার সীমান্তে দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। নিজের জেলা পেরিয়ে সে যাচ্ছে, পরের জেলাটি যেন এক অচেনা মহাদেশ। এই বিস্ময়বোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। যান-বাহনের সংখ্যা ও প্রকার অনেক বেড়েছে। মিডিয়ার বিস্ফোরণ ঘটে গেছে, কোনও মানুষই এখন আর এত ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ নয়। জেলাগুলির মধ্যে কোনও সীমারেখাও নেই। আমি একটার পর একটা জেলা পেরিয়ে যাচ্ছি। চট করে কোনও প্রাকৃতিক আলাদা চেহারাও নজরে আসে না। তবে বর্ধমান ছাড়াতে না ছাড়াতেই চোখে পড়ে লাল ধুলো। বীরভূমে গ্রাম-ছাড়া রাঙা মাটির পথ প্রত্যাশিত, কিন্তু ওইদিক দিয়ে মুর্শিদাবাদে ঢুকলে মাটির রং আরও বেশি লাল মনে হয়। মুর্শিদাবাদের রাঙা মাটি নিয়ে কেউ গান লেখেননি। মালদহ থেকে পশ্চিম দিনাজপুরের দিকে এগুলে দু'দিকের রাস্তা একেবারে হলুদে-হলুদ, এর সঙ্গে এত অমলতাস গাছ আর কোথাও দেখিনি। অমলতাসের আর একটা নাম বাঁদরলাঠি। এমন চমৎকার গাছটির এই বিচ্ছিরি নামান্তর হল কী করে? আমরা যাকে বলি ঢ্যাড়শ, ইংরেজরা কত সুন্দর করে তারই নাম রেখেছে লেডিজ ফিংগার।

শিলিগুড়ির দিকে গেছে যে জাতীয় সড়ক, তা একবার হঠাৎ বিহারে ঢুকে আবার

পশ্চিমবাংলায় ফিরে আসে। বিহারে ওই অংশটিকে অন্যান্যবারের চেয়ে এবার বিশেষ আগ্রহ নিয়ে দেখতে-দেখতে এলাম। কারণ এখানে আমাদের বন্ধু এম কে আকবর নির্বাচন প্রার্থী। সাইকেল রিক্সার পেছনে তার ছবি। কিছুদিন আগেও সে ছিল সুদর্শন তরুণ যুবা। রাজনীতিতে যোগ দিয়ে মুখের ভাবভঙ্গি ভারিক্কি হয়েছে। তার অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রচারের তেজ কম নয়। এবারের নির্বাচনে আকবর জিতলে ভারতীয় রাজনীতির কতটা লাভ হবে জানি না, কিন্তু আমরা একজন প্রতিভাবান সাংবাদিককে হারাব।

উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করার পরই বিরহ বেদনার মতন বুকটা খালি-খালি লাগে। দু'পাশে মাঠ। যেখানে মাঠ থাকার কথা ছিল না। কৈশোরে দেখা রূপ এখনো স্মৃতিতে লেগে আছে, কী নিবিড় সবুজ ছিল এইসব জায়গা, কত বিশাল বিশাল গাছ, তাদের বনস্পতি নামটাই মানাত। কোথায় অদৃশ হয়ে গেল সেইসব গাছ? চতুর্দিকে মানুষের কুঠারের চিহ্ন। শিলিগুড়ি ছাড়িয়ে সেবক রোড ধরে করোনেশান ব্রিজের দিকে যেতে পড়ে বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্ট, একটা নাম করা গভীর অরণ্য কিন্তু এখন রাস্তার ধারে কিছু বড়-বড় গাছ রেখে দিয়ে ভেতরটা প্রায় সাফ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই চোখে পড়ে ঝুপড়ি কলোনি। আবার জবর দখল, এরা অবশ্য যত দোষ নন্দ ঘোষ পাকিস্তান-বাংলাদেশের উদ্বাস্তু নয়, এরা আসে নেপাল থেকে। বছরের পর বছর ধরে এরা আসছে। সরকারি জমি দখল করে বসে যাচ্ছে। এদের নিয়ে তেমন হইচই শোনা যায় না। অবশ্য এরাও অতি গরিব মানুষ, নিশ্চয়ই বাধ্য হয়েই আসে।

গরিব মানুষরা গাছ কাটে, কিন্তু বড় বড় গাছ কেটে অরণ্য নির্মূল করে না, সে সাধ্য তাদের নেই। এই বৃক্ষকূল ধ্বংস করার পেছনে আছে ব্যবসায়ীরা। শিলিগুড়ি শহরে এরকম অনেক হঠাৎ বড়লোক গজিয়ে উঠেছে, যারা ধ্বংস করছে প্রকৃতি ও পরিবেশ। এদের কেউ নিবারণ করে না, বরং আমলা এম এল এ মন্ত্রীরাও এদের মদত দেয়, এসব শোনা যায়।

চতুর্দিকের গাছপালা কাটতে কাটতে দিন দিন লম্বায় ধ্যাড়েঙ্গা হচ্ছে শিলিগুড়ি শহর। আমরা শহর বিরোধী নই। কিন্তু শিলিগুড়িকে দেখলেই বলতে ইচ্ছে করে, দাও ফিরে সে অরণ্য, লও হে নগর। দেখতে-দেখতে কত বড় হয়ে গেল দৈত্যের ছানার মতন, কোনও পরিকল্পনা নেই, কোনওরকম সৌন্দর্য রক্ষার চেষ্টা নেই। যেখানে সেখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে, আর দোকানপাট। গাড়ি-রিকশার সংখ্যা ধাঁ-ধাঁ করে বাড়ছে। হিল কার্ট রোডে প্রতিদিন প্রায় সর্বক্ষণ ট্রাফিক জ্যাম। দোকানের ঠাসা জিনিসপত্র ও কিছু-কিছু মানুষের ভাবভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায়, টাকা উড়ছে চতুর্দিকে। কলকাতার পরেই পশ্চিম বাংলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর শিলিগুড়িতেও বাঙালিদের প্রাধান্য নেই। পঁয়ষট্টি সালের চিন-ভারত যুদ্ধের পর এই শহরের প্রাধান্য বেড়েছে, সেই সঙ্গে হয়ে দাঁড়িয়েছে স্মাগলারদের একটা বড় কেন্দ্র। তাদের কেউ ঘাঁটায় না। পুলিশ এবং সবক'টি রাজনৈতিক দলই তাদের অনুগ্রহপুষ্ট। আমাকে একজন বললেন যে তিনি এখানকার দু-একটি বেকার ছেলের চাকরি ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন, তারা নেয়নি। নামে বেকার হলেও অন্যভাবে তাদের উপার্জন যথেষ্ট।

অদূরেই জলপাইগুড়ি শহরের চরিত্র আলাদা। জলপাইগুড়ি পুরোনো শহর। বাঙালি সংস্কৃতির ছাপ এই শহরে ঢুকলেই টের পাওয়া যায়। এককালে এখানকার অনেক পরিবারেরই কোনও না কোনও চা বাগানে কিছুটা শেয়ার ছিল, সেই জন্য সচ্ছলতাও ছিল, এখন চা বাগান সব অবাঙালিরা কুক্ষিগত করেছে, জলপাইগুড়ির বাঙালি পাড়াগুলি বেশ মলিন।

দুই শহরে টের পাওয়া যায় নির্বাচনী জ্বর। প্রচারের পালা শেষ হয়ে আসছে। মেঘলা আকাশ। গরম নেই, তাই দিন দুপুরেও সাইকেল মিছিল। গাড়িতে-গাড়িতে চিৎকার চলছে। দেয়াল লিখনগুলিতে ছবি, পালটা দাবি, প্রতিশ্রুতি, অপরের প্রতি ব্যঙ্গোক্তি পড়তে পড়তে আমি ভাবছিলাম, উত্তর বাংলায় এত বৃক্ষ নিধনের ফলে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হতে চলেছে, এটা একটা বিরাট সমস্যা, অথচ যে বিষয়ে তো কোনও দল একটাও কথা বলেনি, গাছ কাটা বন্ধ করা কিংবা পরিবেশ

সুস্থ-সুন্দর করে তোলাটা কি রাজনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে পড়ে না? আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলি এখন আর কোনওরকম সামাজিক ভূমিকা নেয় না। ক্ষমতা দখলই যেন শুধু ধ্যানজ্ঞান। যারা ক্ষমতায় যায় না, তারাও কী যেতে পারে না মানুষের কাছে? কুসংস্কার, অপরিচ্ছন্নতা, সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষা বিধি, এইসব বিষয়ে তারা কখনও একটা কথাও বলে? সেইজন্য সবাই যেন ধরে নিয়েছে, সরকারি প্রশাসন যা করার করবে। অন্যদের কিছু করণীয় নেই।

এর ব্যতিক্রম দেখলাম, জলপাইগুড়ি শহরে। জলপাইগুড়ি ওয়েল ফেয়ার অর্গানাইজেশান একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। একদল তেজি যুবক-যুবতী এর সংগঠন কর্মী। এই প্রতিষ্ঠানটির উল্লেখ করছি, তার কারণ সারা দেশের কাছেই এই ধরনের প্রতিষ্ঠান আদর্শ স্বরূপ হতে পারে। সরকার যেসব ক্ষেত্রে ব্যর্থ বা উদাসীন, হাসপাতালগুলির ব্যবস্থা যেখানে যথেষ্টর চেয়েও অনেক কম, সেইসব জায়গায় এরা এগিয়ে এসেছে সাধারণ মানুষদের নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবার জন্য। এঁরা নানা ধরনের পঙ্গু অসহায় রোগী এমনকী, ক্যানসারের রোগীদেরও চিকিৎসা ও স্বনির্ভরতায় ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করেছেন তো বটেই, এদের কাজ কিন্তু যে-কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অনেক বেশি গুরত্বপূর্ণ। এরা একটা প্রেসার গ্রুপ। এরা সরকারি গাফিলতির খবর পেলেই দল বেঁধে গিয়ে চাপ দেয়। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার কিংবা থানার দারোগা কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করলে এরা গিয়ে ঘিরে ধরে, প্রতিকার এবং ক্ষমা চাইতে বাধ্য করে, এদের স্বার্থহীনতা এমনই বলিষ্ঠ যে এখন যে-কোনও রাজনৈতিকদলই এদের বাধা দিতে ভয় পায়।

নির্বাচনী প্রচার শুনতে শুনতে আর একটা কথা মনে হচ্ছিল, সারাদেশে প্রচারযন্ত্র এমন জোরালো ও সরব তো আর কখনও হয় না। প্রতিটি শহরে গ্রামেগঞ্জে এখন সমস্ত পার্টির প্রচার চলেছে। এত বড় প্রচার যজ্ঞের আয়োজন করার সাধ্য কোনও সরকারের নেই। বিপুল ব্যয়বহুল এই প্রচার ব্যবস্থাকে শুধু ভোটের আবেদন, ও পরস্পরের প্রতি গালাগালি ছাড়াও অন্য কোনও কাজে লাগানো যায় না? প্রতিটি বক্তৃতার শেষে মাত্র দু-মিনিট প্রতিটি বক্তা যদি বলেন, আচ্ছা, এতক্ষণ তো ভোটের কথা হল, এবার অন্য একটা কথা শুনুন। গাছ আমাদের বন্ধু। আমরা যদি এলোপাথারি সব গাছ কাটতে থাকি। তা হলে কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেব। তখন কোথায় থাকবে সরকার, আর কোথায় থাকবে ভোট।

এ যেন পাহাড় নয়, প্রকৃতির ভাস্কর্য

আগে থেকেই ঠিক ছিল, দেখা হবে ভ্যাঙ্কুভারে। ছ'জন বন্ধু। কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে দেখা হওয়ার মতনই স্বাভাবিক ব্যাপার যেন, যদিও এই বন্ধুরা উড়ে আসছে তিনটি মহাদেশ থেকে। উদ্দেশ্য? স্রেফ আড্ডা আর ভ্রমণ।

এই ছ'টি চরিত্রের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। একটা প্রায় অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্যি তথ্য হল যে, আড্ডাপ্রিয় আর অ্যাডভেঞ্চার-উৎসুক এই দলটির ছ'জনের মধ্যে চারজনেরই বয়স সত্তরের গণ্ডি পেরিয়েছে। কিন্তু সবারই শরীর ফিটফাট, কেউ কোনও অসুখের কথা উচ্চারণ করে না, আর খাদ্যপানীয়ের ব্যাপারে কিছুমাত্র বাছ-বিচার বা শুচিবাই নেই, বরং কিছু-কিছু অনিয়ম করার দিকেই ঝোঁক। পাঁচজনই সিগারেট ফোঁকে, চা-কফি ও আরও কড়া জাতীয় পানীয় চলে সকাল

থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত।

সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ জন পঁচাত্তরে পা দিয়েছেন, তিনিই সবচেয়ে উৎসাহী ও প্রাণবন্ত। এই মানুষটি প্রকৃতির এক আশ্চর্য সৃষ্টি। বয়সের কোনও ছাপ পড়েনি শরীরে, আড্ডায় অক্লান্ত, তাঁর নাম কান্তি হোর। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, যাদবপুর, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে পাড়ি দিয়েছিলেন ইউরোপে, জার্মানিতে থেকেছেন অনেক বছর, তারপর আবার সমুদ্র ডিঙিয়ে কানাডায়। এখন নামমাত্র বসতি টরন্টো শহরে, আজও কাজের জীবনে সক্রিয়, কাজের জন্য সারা বছরই পশ্চিম গোলার্ধের নানা দেশে ছুটে বেড়াচ্ছেন। এসবের মধ্যে তেমন বিস্ময়ের কিছু নেই, আসল বিস্ময় হল, প্রায় পঞ্চান্ন বছর ধরে দেশের বাইরে থেকেও কান্তি বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণ আপন করে রেখে দিয়েছেন। কত লোককে তো দেখলাম, দশ-পনেরো বছর বিলেতে বা বিদেশে থেকে সাহেব হয়ে যায়, বাংলা বলতেই চায় না। আর কান্তি অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি বিদেশে, তাঁর চেহারাটা বিদেশিদের মতনই হয়ে গেছে, অনায়াসেই স্প্যানিশ মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর অন্তরটা খাঁটি বাংলা।

বয়সের হিসেবে এর পরেই আমি। এই দলের মধ্যে আমিই কিছুটা কমজোরি হয়ে পড়েছিলাম সেই সময়, আমার হাঁটুতে বেশ ব্যথা ছিল, কিন্তু ইচ্ছাশক্তিতে তো পঙ্গুও গিরি লঙঘন করতে পারে।

তৃতীয়জন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আমার চেয়ে কয়েক মাসের ছোট। 'অপুর সংসার'-এর এই নায়ককে আমি সিনেমার নায়ক হওয়ার আগে থেকেই চিনি। সৌমিত্র তুখোড় আড্ডাবাজ, আড্ডার টানে অনেক জরুরি কাজ ফেলেও চলে আসতে পারে।

এর পর ফরাসি দেশ নিবাসী অসীম রায়। কান্তি হোরের মতন অসীম রায়ও বহুকাল প্রবাসী, প্রথমে লন্ডন, তারপর প্যারিস। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার। ছোটবেলায় দেওয়াল পত্রিকায় লেখার হাতেখড়ি, বিদেশে গিয়ে আর লেখালেখি করেনি, কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে ছাড়েনি, তার বাড়িতে পুরো রবীন্দ্ররচনাবলি থেকে শুরু করে কয়েকজন আধুনিক কবির কবিতার বই পর্যন্ত আছে। মাত্র কয়েক বছর আগে, হঠাৎ কী খেয়ালে সে একটা ছোট গল্প লিখে ফেলেছিল, সে গল্প এমনই মান-উত্তীর্ণ যে অনায়াসে ছাপা হয়ে গেল 'দেশ' পত্রিকায়। কিন্তু আর লেখেনি। এখন কলমের চেয়ে ক্যামেরা তার বেশি প্রিয়।

পঞ্চমজন রবীন চ্যাটার্জি, ইনিও যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার, দীর্ঘকায়, অতি ভদ্র মানুষ, মৃদুভাষী, ইনি অল্প বয়সে কখনও গল্প-কবিতা লিখেছেন কিনা আমি জানি না। বহু কাল কানাডাবাসী, ওঁর স্ত্রী বিদেশিনী, কিন্তু ওঁর বাংলা ভাষাপ্রীতি খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রায় প্রতি বছরই কলকাতায় এসে বইমেলা থেকে কিনে নিয়ে যান একগাদা বাংলা বই। রবীন স্বেচ্ছায় আমাদের গাড়ি চালাবার ভার নিয়েছেন।

এই দলের ষষ্ঠ এবং একমাত্র মহিলা সদস্যদের নাম স্বাতী, ইনি এখনও সত্তর বছরে পৌঁছবার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি। অনেক দেরি। এতজন পুরুষের সঙ্গে একজন মহিলা কি মানিয়ে নিতে পারবেন? এ মহিলাটির এমনই ভ্রমণের নেশা যে, কোনও বাধাই মানবেন না, কোনও অসুবিধেই ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না, শুধু বাথরুমটা ভালো হওয়া চাই। আমাদের দেশে অনেক জায়গায় বাথরুমের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে নানা সমস্যা হয়, কিন্তু সাহেবদের দেশে সে প্রশ্নই নেই। পরিচ্ছন্নতাবোধে সাহেবরা আমাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে, তা স্বীকার করতেই হবে।

সৌমিত্র, আমার ও স্বাতীর ভ্যাঙ্কুভারে আসার একটা উপলক্ষ আছে। আমরা এসেছি বঙ্গ সম্মেলনের আমন্ত্রণে। এখন প্রতি বছরেই উত্তর আমেরিকার (যার মধ্যে কানাডাও আছে) কোনও না কোনও শহরে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন হয়। বাড়তে-বাড়তে তা বিরাট আকার ধারণ করেছে, অংশগ্রহণকারী ও প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছ'-সাত হাজার ছাড়িয়ে যায়। সারা ভারতে কোথাও বাঙালিদের

এমন সম্মেলন হয় না, যেখানে এত বেশি সংখ্যক মানুষ যোগ দেয়। আমেরিকার মতন এত বেশি ধুতি-পাঞ্জাবি আর শাড়ি পরা বাঙালিও একসঙ্গে কোথাও দেখা যায় না ভারতে।

মূল বার্ষিক সম্মেলন ছাড়াও কয়েক বছর ধরে কয়েকটি ছোট-ছোট বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে কোনও কোনও শহরে। যেমন শিকাগোয়, কলম্বাস-ওহায়োতে, এই ভ্যাঙ্কুভারে। ছোট বলেই (তাও উপস্থিতি দেড়-দু-হাজার তো হবেই) আন্তরিকতা ও ব্যক্তিগত স্পর্শ পাওয়া যায় অনেকটা।

তিনদিনের সম্মেলন তো শেষ হল ভালোভাবেই, ততদিন বাকি তিনজন এক হোটেলে ঘাপটি মেরে বসেছিল, আমাদের কর্তব্য শেস হলেই শুরু হবে আড্ডা ও ভ্রমণ। সেই টানেই তো এসেছে ওরা।

পৃথিবীতে যে ক'টি অতি সুদৃশ্য শহর আছে, তার মধ্যে ভ্যাঙ্কুভার অন্যতম। প্রকৃতি এখানে যেমন অকৃপণ, তেমনই তা বিশুদ্ধ সুন্দর করে রেখেছে এখানকার মানুষ। আর ভ্যাঙ্কুভার থেকে বেরোলেই যে শত-শত মাইল পর্বতমালা ও হিমবাহ, তা বিশ্বের বিস্ময়। এর রূপ সমস্ত কল্পনাকেই হার মানায়।

ভ্যাঙ্কুভার আসলে একটা দ্বীপ। এক সময় ছিল বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর লীলাভূমি। তথাকথিত সভ্যতার সংস্পর্শে না এসে তারা নিজস্ব সুখে-শান্তিতেই ছিল। তারপর এল ইউরোপীয় ভাগ্যান্বেষী ও রাজশক্তি। জর্জ ভ্যাঙ্কুভার নামে ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর এক অফিসার প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূল টুঁড়তে-টুঁড়তে এখানে এসে পৌঁছল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি 'গোল্ড রাশ' নামে যে পাগলামি শুরু হয় তার একটা কেন্দ্র ছিল এই দ্বীপ। ততদিনে অবশ্য আদিবাসীদের জীবনযাত্রা তছনছ হয়ে গেছে।

যাই হোক, আমরা তো চানাচুর, বিস্কুট, চিজ, আরও সব নানা রকম প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করে বেরিয়ে পড়লাম শহর ছেড়ে। একটা বড় গাড়ি ভড়া করা হয়েছে, যাতে ছ'জনে মিলে বেশ হাত-পা ছড়িয়ে বসা যায়। ছয় সংখ্যাটা একটু গণ্ডগোলের, ছয় রিপুর কথা মনে পড়ে। এখানে কিন্তু আমাদের ছ'জনের মধ্যে একটুও মনের গরমিল নেই। দীর্ঘযাত্রায় সাধারণত একজনকে বেছে নিয়ে নানারকম লেগ পুল ('পদাকর্ষণ', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর ভাষায়) আর নির্দোষ মজা করতে করতে যাওয়া হয়। এবারে অবশ্য আমাদের মধ্যে তেমন বিশেষ একজন কেউ নেই, সুতরাং এক-এক সময় এক-এক জন। তবে অসীমই নিজগুণে বেশি সুযোগ করে দিচ্ছিল।

এর আগেও প্রতি বছরই আমরা দল বেঁধে কোথাও না কোথাও অভিযানে বেরিয়েছি, কখনও ভারতে কখনও বিদেশে। দলের সদস্যদের মধ্যে দু-একজন আদল বদল হয়েছে, কখনও গাড়ির স্টিয়ারিং ধরছে টরন্টোর দীপেন্দু চক্রবর্তী, নানারকম খাবার দাবার জোগাড় করার অদ্ভুত ক্ষমতা তার। এবার সে আসতে পারেনি। অথবা লন্ডনের ভাস্কর দত্ত স্বাভাবিকভাবেই সে দলের নেতা, অসীমের সঙ্গে তার খুনসুটি ছিল বিশেষ উপভোগ্য। ভাস্কর দত্ত আর কোনওদিন আসবেন না। বাদল বসুও থেকেছে কয়েকবার।

এবারে আমরা যে-পথে বেরোলাম, সে-পথের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত। কানাডিয়ান রকি মাউন্টেনস। টানা চার-পাঁচদিন ধরে পাহাড়ের মধ্যে ঘোরাফেরা। সে পাহাড়ের বৈশিষ্ট্যের কথা ক্রমশ প্রকাশ্য। পাহাড় ছাড়াও আরও কিছু।

তবে, এ কথাও ঠিক, প্রকৃতি যতই মনোহর হোক, সব সময় তো আর সেদিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা যায় না! দল বেঁধে গেলে মাঝেমাঝেই আড্ডাটা প্রধান হয়ে ওঠে। প্রত্যেক দলে একজন থাকে প্রধান আড্ডাধারী, এই দলে সৌমিত্র। অফুরন্ত তার গল্পের স্টক আর কথায় কথায় সে গান গেয়ে উঠতেও পারে। আর মাঝেমাঝেই বুদ্ধির ঝিলিকে ছোট্ট মন্তব্য করে কান্তি, অসীম প্রায়ই সম্পূর্ণ

উলটো কিছু বলে ফেলে।

এই অভিযাত্রীদের গড় বয়স সত্তর হলেও একমাত্র মহিলা সদস্যটি ছাড়া আর সবাই ধূমপায়ী। কিন্তু অসীমের কঠোর নির্দেশ, চলন্ত গাড়িতে সিগারেট ধরানো নিষেধ। একবার ফ্রান্সে তার গাড়িতে এই ব্যাপারে একটা দুর্ঘটনার উপক্রম হয়েছিল। তা ছাড়া, এখানকার চলন্ত গাড়িতে যেহেতু জানলা খোলা যায় না, (দুরন্ত গতির জন্য এমন জোর হু-হু শব্দ হয় যে কথাই বলা যায় না) তাই বন্ধ গাড়িতে ধূমপান দ্বিগুণ অস্বাস্থ্যকর। সুতরাং ঘণ্টাখানেক পরপর কোনও ছুতোয় রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে সিগারেট ব্রেক দিতে হয়।

যদিও দুপাশে পাহাড়, কিন্তু রাস্তা মোটেই পাহাড়ি নয়, অতি মসৃণ যথেষ্ট প্রশস্ত। এসব দেশের রাস্তা দেখলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। কিছুদিন আগেও এইসব দেশের রাস্তা দেখে নিজের দেশের রাস্তার জন্য ভারী হীনম্মন্যতা বোধ হত, কিন্তু এখন 'সোনালি চতুর্ভজ'-এর সুবাদে এমন সব চমৎকার হাইওয়ে তৈরি হয়েছে, যা সাহেবদের দেশের সঙ্গে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে, কোনও কোনও রাস্তা আমাদের দেশেই বেশি ভালো। কলকাতা থেকে আগে গাড়িতে শান্তিনিকেতন যেতে সময় লাগত সাড়ে ছ'ঘণ্টা, এখন তিন ঘণ্টা বড়জোর!

এই প্রসঙ্গে আর একটা রাস্তার কথা মনে পড়ল।

উত্তর আমেরিকার কলোরাডো রাজ্যেও এরকম পাহাড়ের ট্রেল রয়েছে। বোলডার শহর থেকে আমার এক বাল্যবন্ধু শুভেন্দু দত্ত (এখন ওদেশে বিখ্যাত অধ্যাপক) আমাকে ওই রাস্তায় নিয়ে গিয়েছিল কিছু দূর। সেবারে আমার এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল। জুন মাস, সোয়েটার-কোট পরার প্রশ্নই নেই, গায়ে শুধু একটা হাওয়াই শার্ট। এক জায়গায় এসে দেখি, রাস্তার দুধারে দু'তিন ফুট বরফ জমে আছে। অথচ একটুও শীত নেই। প্রথমটা আমি হতবাক। গাড়ি থেকে নেমে বরফের পাশে দাঁড়ালেও একটুও শীতের কাঁপুনি লাগছে না, বাচ্চা ছেলেমেয়েরা টি-শার্ট পরে বরফ নিয়ে খেলা করছে, এটা কী করে সম্ভব? কয়েকজন ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়েছিল, সেটাও আমার ঠিক বোধগম্য হয়নি। কিন্তু বরফ তো জমে আছে! উত্তাপ শূন্যের নীচে না গেলে বরফ জমে কী করে? বরফ তো গলছেও না। কেউ বলল, হাওয়া নেই বলে শীত লাগে না! যাই হোক, সেটা আমার জীবনে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার হয়ে আছে।

আর্নেস্ট হেমিংওয়েব একটি উপন্যাসের নাম 'স্নোজ অফ কিলিমাঞ্জারো।' আফ্রিকার কেনিয়ায় গিয়ে আমি কিলিমাঞ্জারো পাহাড় দেখেছি। কত পাহাড়ের চূড়াতেই তো বরফ জমে, তা হলে এই নামকরণের তাৎপর্য কী? এখান থেকে গেছে বিষুব রেখা। সুতরাং গরম হওয়ার কথা, তবু কিলিমাঞ্জারোর চূড়ায় (এমন কিছু উঁচু পাহাড়ও নয়) বরফ জমে আছে, সেটাই আশ্চর্য ব্যাপার!

আমার এই অভিজ্ঞতার কথা শুনে একজন বলেছিল, কলোরাডোতে পাহাড়ের ওপর দিয়ে হাইওয়ে গেছে। আমেরিকানদের যদি মাউন্ট এভারেস্টটা দিয়ে দেওয়া যেত, তা হলে অনেক দিন আগেই ওরা চূড়া পর্যন্ত হাইওয়ে বানিয়ে ফেলতে পারত। তেনজিং আর হিলারি শিখর জয় করত গাড়ি চেপে!

এই কানাডিয়ান রকিজ-এর অনেক পাহাড়েই বরফ নেই, গাছপালাও নেই, শুধুই উলঙ্গ পাথর। সেটাই এই পর্বতমালার বৈশিষ্ট্য। গাছপালা থাকলে সব পাহাড়কেই দূর থেকে একরকম দেখায়। এখানকার প্রতিটি পাহাড়কে মনে হয় যেন আলাদা-আলাদা ভাস্কর্য। নানা রকমের আকার, তা দেখে কত কিছু কল্পনা করে নেওয়া যায়, কত রকমের মূর্তি কিংবা প্রাসাদ। প্রকৃতিই এইসব ভাস্কর্যের স্রষ্টা। কিংবা যারা ঈশ্বরের সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাসী, তারা অবশ্যই ধরে নিতে পারে, এইসব রূপ অপ্রাকৃত।

আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, রাত্তিরে গাড়ি চালানো হবে না। প্রতি রাত্রির জন্যই এক

এক স্থানে মোটেলে তিনটি করে ঘর বুক করা আছে। এখানে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলের মধ্যেও হোটেল-মোটেল থাকে অনেক, পর্যটক আসে অজস্র। ইন্টারনেট দেখে কান্তি হোর সব ব্যবস্থা করে রেখেছে। প্রথম দিনের গন্তব্য কামলুপস দূরত্ব ৩৬৬ কিলোমিটার। এদেশে এতটা পথ দিব্যি ধীরেসুস্থে সন্ধের আগেই পৌঁছনো যায়।

পাহাড়ের পর পাহাড় এবং কয়েকটি নদীনালা পেরিয়ে এক উপত্যকায় কামলুপস একটা ছোটখাটো শহরের মতন। টমসন নদীর দুটি ধারার মাঝখানে। এককালে ছিল 'লাল ভারতীয়'-দের গ্রাম, স্বর্ণসন্ধানীরা হুড়মুড় করে এসে পড়ে এখানে। তারপর আগে পশমলোভী ইউরোপীয়রা। পশম তখন খুবই দামি জিনিস। এইসব অঞ্চলে এক প্রকারের রামছাগল প্রচুর, যাদের বলে 'মাউন্টেন গোট', তাদের গায়ে বড় বড় লোম। সেই লোমে তৈরি হয় উত্তম পশম। হরিণের শরীরের মাংসই যেমন তার শত্রু, সেইরকম এই লোমের জন্যই হাজার-হাজার রামছাগল নিহত হয়েছে। তা ছাড়া আছে বৃহৎ আকারের ভাল্লুক, তাদের গায়ের লোমও মহার্ঘ, সেই 'গ্রিজলি বেয়ার' এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। আমরা অবশ্য সেই ভাল্লুক দেখিনি, তবে 'মাউন্টেন গোট' চোখে পড়েছে প্রায়ই।

কামলুপস নামটা আদিবাসীদের নিজস্ব নামের বিকৃতি, যার অর্থ অনেক জলের মাঝখানে। অন্য মতে, ফরাসিরা এসে এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন 'কাম্প দে লুপস,' যার অর্থ নেকড়েদের আস্তানা!

মোটেলগুলোতে খাওয়ার ব্যবস্থা নেই, তার জন্য রেস্তোরাঁ খুঁজতে হয়। মালপত্র রেখে কিছুক্ষণ আমরা উষ্ণ পানীয় নিয়ে গা-গরম করে নিই। তারপর বেরিয়ে পড়ি খাদ্যের সন্ধানে। এ ব্যাপারে মূল দায়িত্ব অসীমের। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার হলেও অসীম বেশ কয়েক বছর প্যারিস শহরে একটি রেস্তোরাঁর মালিক ছিল। খাবারের গুণাগুণ ও দাম সে-ই ভালো বুঝবে। এরকম ছোট জায়গাতেও চাইনিজ, মেক্সিকান ও নানা রকম রেস্তোরাঁ আছে, ভারতীয়ও থাকতে পারে, কিন্তু আমরা ভুলেও ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুঁজি না। সারা জীবন দিশি খাবার খাচ্ছি, বিদেশে এসে বিদেশি খাবার খাব না কেন?

অসীম বেশি-বেশি জানে বলেই তাকে নিয়ে বেশি মুশকিল হয়। সে একটার পর একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে মেনু আর দাম দেখবে, তার পছন্দ হবে না, এদিকে খিদেতে আমাদের পেট চুঁইচুঁই করছে! এমনও হয়, আট-দশটা জায়গা দেখার পর প্রথম যেটা দেখা হয়েছিল অসীম সেটাতেই ফিরে আসে। আমি তা নিয়ে কখনও একটু ক্ষোভ প্রকাশ করতে গেলেও অতি ভদ্র কান্তি হোর তা চাপা দিয়ে বলে, না, না, সব ভালো যার শেষ ভালো। অসীম যখন বলছে, এটাই সবচেয়ে ভালো...।

খাবারের অর্ডার দিতেও অনেক সময় যায়। ছ'জনের পাঁচ রকম পছন্দ! দলের কনিষ্ঠা সদস্যাটিই তার মতামত জানাবার সুযোগ পায় না। অসীম হঠাৎ একটা ডিশ বেছে নিয়ে বলে, স্বাতী, এটা তুমি আর আমি ভাগ করে খাব, অনেকটা দেবে। স্বাতী বেচারির হয়তো পুরো প্লেটটি খাওয়ার ইচ্ছে, কিংবা অন্য কোনও রান্না বেশি পছন্দ, তা আর বলা হয় না। অসীম পাঁউরুটি খুব ভালোবাসে, যে-কোনও রান্নার সঙ্গে পাঁউরুটি খাবে অনেকটা। কয়েকদিন পরে অবশ্য স্বাতী ক্ষীণ প্রতিবাদ করে নিজের পছন্দ জানাতে শুরু করেছিল।

আমাদের পরের দিনের গন্তব্য ব্যানফ (Banff) নামে এক বিখ্যাত উদ্যান অঞ্চল, দূরত্ব ৪৯২ কিলোমিটার।

প্রস্তুত হয়ে বেরতে বেরতে ন'টা বেজে যায়। গাড়ি চালাচ্ছে রবীন, সে সবচেয়ে আগে তৈরি। রবীন অতিমাত্রায় বাঙালি, কিন্তু ব্যবহারে পাশ্চাত্য দেশীয়দের মতন। একেবারে সাহেবদের মতন চেহারার কান্তি হোরের মুখের ভাষা নিখুঁত বাংলা হলেও ব্যবহারে কোনও বাঙালিসুলভ

ঢিলেঢালা ব্যাপার নেই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্য যত দোষই থাকুক, অনেকে স্বীকার করে যে, সে হাতঘড়ি পরে না, কিন্তু আকাশের দিকে তাকিয়ে সব জায়গায় সময়ের ঠিক রাখে।

সমস্যা দুজনকে নিয়ে। মেয়েদের তৈরি হতে বেশি সময় লাগতেই পারে, ঠিকমতন সাজগোজ না করে তারা বেরতে পারে না। সবাই তাড়া দেওয়ার পর স্বাতী বেরিয়ে এলেও আবার একবার নিজের ঘরে যাবেই। কী যেন সে ফেলে এসেছে। প্রায় প্রত্যেকবারই দেখা যায়, সে টুথব্রাশটা আনতে ভুলে গেছে। আর অসীম অনেক আগেই তৈরি হয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে, ছবি তোলা তার নেশা, তাই গাড়িতে ওঠার আগে তাকে দেখতে পাওয়া যায় না। ডাকাডাকি করে তাকে তো ফিরিয়ে আনা গেল, তখন সে বলবে, আমাকে আর দু'মিনিট সময় দাও। তাকে একবার টয়লেটে যেতে হবেই হবে! অন্তত দশবারো বছর ধরে আমি দেখছি, অসীমের এই লাস্ট মিনিট টয়লেটে যাওয়ার দুর্বলতা। আমি জিগ্যেস করেছি, অসীম, সত্যিই কি তোমাকে সকালে দ্বিতীয়বার টয়লেট যেতে হয়? অসীম আমতা আমতা করে বলে, না, তা নয়, তবে যদি মাঝ রাস্তায় হঠাৎ যদি....।

দ্বিতীয় দিনে পার্বত্য শোভা সত্যিই শ্বাসরুদ্ধকর। রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা খুবই কম, চতুর্দিক শান্ত ও নিস্তব্ধ, পাহাড়ের চূড়া যেন দেখছে আমাদের। কখনও মনে হচ্ছে দুর্গ, কখনও মন্দির, গির্জা কিংবা মসজিদ, কখনও কোনও মোষের মাথা, কখনও যেন ভবিষ্যৎ কালের স্থাপত্য। এই দলটির সকলেই অনেক দেশে অনেক পাহাড় দেখেছে, কিন্তু এই পর্বতমালার সৌন্দর্য যে সম্পূর্ণ অন্য রকম, তা মানতেই হয়।

কয়েক ঘণ্টা পর পথের পাশে সাময়িক বিরতি। পাশাপাশি দুটি পর্বতশৃঙ্গের ধারালো চূড়া, যেন আকাশের দিকে উদ্যত অস্ত্র। এ দৃশ্য কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হৃদয়ঙ্গম করতে হয়। ফ্লাস্কে আছে কফি, তাছাড়া বিস্কিট, চিজ, এবং সিগারেট। গাড়ি চালাতে রবীনের ক্লান্তি নেই, সে সৌমিত্রকে বলল, আপনার অভিজ্ঞতার কিছু গল্প বলুন।

কলকাতার সিটি কলেজে সৌমিত্র আর আমি একসঙ্গে পড়েছি। কলেজের বার্ষিক উৎসবে একবার একটা নাটকে সৌমিত্র আর আমি দুজনেই অভিনয় করেছিলাম। একটা বিদেশি নাটকের (খুব সম্ভবত গলসওয়ার্দির) 'অ্যান ইনসপেক্টর কলস'-এর বাংলা অনুবাদ। সে নাটকে সৌমিত্র আর আমার ভূমিকা ছিল সমান সমান কিন্তু যা হয়, পরবর্তীকালে অভিনেতা হিসেবে আমার কোনও স্থানই হল না। আর সৌমিত্র উঠে গেল কত ওপরে। তখন কে জানত যে সিটি কলেজের এই ছেলেটিকে সত্যজিৎ রায় পছন্দ করে ডেকে নেবেন 'অপুর সংসার' ফিলমের জন্য, পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের অনেক ফিলমে তো বটেই, গোটা বাংলা সিনেমাতেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠবে অন্যতম প্রাধন নায়ক!

অন্যতম বললাম এই জন্য যে, বেশ কিছু বছর উত্তমকুমার আর সৌমিত্র ছিল দুই প্রধান নায়ক। অনেক দর্শকই ছিল উত্তমকুমারের বেশি ভক্ত, আবার অনেক দর্শক সৌমিত্রর। যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আর ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের গানের। যেমন, সুচিত্রা মিত্র ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতের। এরকম মনে হতেই পারে যে পাশাপাশি দু'জন সমান মাপের শিল্পীর মধ্যে খানিকটা রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকতেই পারে। অন্যদের কথা জানি না, সৌমিত্রের মধ্যে সেরকম মনোভাব আমি কখনও দেখিনি। উত্তমকুমারকে সে মনে করেছে বড় ভাইয়ের মতন, আর উত্তমকুমারও কনিষ্ঠের মতন স্নেহ করতেন সৌমিত্রকে। এটা ভারী চমৎকার ব্যাপার।

গাড়ি চলতে শুরু করার পর সৌমিত্র শুরু করল নানারকম টুকিটাকি গল্প। তার মধ্যে একটি তরুণকুমার সম্পর্কে। উত্তমকুমারের এই ভাইটিরও বেশ অভিনয়প্রতিভা ছিল, ছায়াছবিতে প্রথম

আবির্ভাবের পর তার চেহারাও ছিল ছিপছিপে, সুশ্রী, কিন্তু সে কোনওদিনই নায়কের পর্যায়ে উন্নীত হল না, কারণ দিন দিন সে মোটা হতে লাগল। সৌমিত্র একদিন উত্তমকুমাকে বলল, উত্তমদা, আপনি তরুণকুমারকে (ডাকনাম বুড়ো) বলতে পারেন না, একটু ব্যায়াম করতে, শরীরটা ঠিক রাখতে?

যারা পারফরমিং আর্টিস্ট, তাদের শরীর ঠিক রাখতেই হয়। বাংলায় একটা কথা আছে, কেশো রুগি চোর আর মুখচোরা বেশ্যার কখনও উন্নতি হয় না। সেই রকমই গলা ভাঙা গায়ক, বানান ভুল করা লেখক, চোখের দোষ থাকা ক্রিকেটার, বেশি অহংকারী রাজনীতিবিদ, এদের কোনও উন্নতির আশা নেই।

উত্তমকুমার একদিন সৌমিত্রের বাড়িতে এলেন ভোরবেলা। সৌমিত্র আর উত্তমকুমার দুজনই নিয়মিত ব্যায়াম করেন, ভোরবেলা জগিং করতে যান, দুজনকেই প্রচুর খাটতে হয়। উত্তমকুমার সৌমিত্রকে বললেন, পুলু (ডাকনাম) তুমি তো বলেছিলে বুড়োর ব্যায়াম-ট্যায়ামের কথা! এসো, আমার সঙ্গে দেখবে এসো। আমি ওকে জোর করে ডেকে জগিং করাতে এনেছি, তার ফল কী হয়েছে।

সৌমিত্র গিয়ে দেখল, লেকে একটা গাড়ির মধ্যে বসে তরুণকুমার ভোঁস-ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে!

এই রকম গল্পের মাঝখানে অসীম রায় হঠাৎ বলে উঠল, সিনেমার সব লোকগুলো বড় দু'নম্বরি হয়!

আমরা স্তম্ভিত। বলে কী অসীম! পাশে বসে আছে বাংলা চলচ্চিত্রের এখনকার প্রধান পুরুষ, তার সামনে এইসব কথা?

রবীন ব্যাপারটা সামলাবার জন্য মুখ ফিরিয়ে বলল, অসীম রায় বোধহয় ওয়েস্টার্ন সিনেমার কথা বলছেন....

কান্তি বললেন, হ্যাঁ, আমরা শুনেছি, ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে সিনেমার কিছু কিছু ব্যাপারে, অনেক রকম...

অসীম সে ইঙ্গিত না নিয়ে আবার বলল, না, না, ওসব বাংলা ইংরেজি একই ব্যাপার। লোকগুলো নানা রকম....

আমি চুপ। আমি তো জানি, অসীম একটু ট্যালা ধরনের, স্থান-কাল পরিস্থিতি খেয়াল রাখে না, হঠাৎ একটা কিছু বলে বসে।

এই ব্যাপারে সবচেয়ে যার আহত হওয়ার কথা, সেই সৌমিত্র হা-হা করে হেসে উঠে বলল, অসীম ঠিকই বলেছে, সিনেমার লোকগুলো এমন ভণ্ড আর পাজি হয়...

তখন অসীমের খেয়াল হল। সে থতোমতো খেয়ে বলল, ইয়ে, মানে, প্রেজেন্ট কোম্পানি একজেমটেড...আমি সৌমিত্রকে কিছু বলছি না।

সৌমিত্র আবার হেসে উঠে বলল, না, না, শালা, সিনেমার লোকগুলো....

আমি পুরো ব্যাপারটা থেকে দৃষ্টি ফেরাবার জন্য বললাম, ওই দ্যাখো, দ্যাখো, সামনে কী হচ্ছে।

রাস্তার ধারে, আমাদের সামনে একটা গাড়ি থেমে আছে। জানলা দিয়ে বায়নোকুলার বার করে কী যেন দেখছে একজন। ওখানে নিশ্চয়ই দ্রষ্টব্য কিছু আছে।

আমরাও নিঃশব্দে গাড়ি থামালাম সেখানে। আমাদের সঙ্গে বায়নোকুলার নেই, খালি চোখেই দেখতে পেলাম, গাছপালার আড়ালে দুটো মুস। অর্থাৎ প্রায় গরুর আকারের প্রাণী, মাথায় মোটা মোটা শিং ধীর গতিতে ঘাস খাচ্ছে। এরাও শিকারিদের প্রিয় প্রাণী।

অসীম নেমে গেল ছবি তোলার জন্য।

॥ দুই ॥

অসীম খুব ভালো ফটোগ্রাফার। কয়েকটি সারা দেশীয় প্রদর্শনীতে তার ছবি স্থান পেয়েছে। কিন্তু ভাস্কর বলত, অসীম শুধু শূন্যে ঝোলা মাকড়সা, পুকুরে ব্যাঙের লাফ কিংবা কুকুরের হাই তোলার ছবি তোলে, মানুষের দিকে কক্ষনো ক্যামেরার মুখ ঘোরায় না। আমি একটু সংশোধন করে বলেছি, অসীম পুরুষ মানুষের ছবি তোলে না, কিন্তু ওর বাড়িতে আমি অনেক সুন্দরী মেয়ের ছবি দেখেছি।

সুতরাং একসঙ্গে বেড়াতে বেরলেও অসীমের কাছ থেকে আমরা নিজেদের ছবি কখনও পাই না। কখনও খুব কাকুতিমিনতি করলে অসীম ব্যাজার মুখে বলে, ঠিক আছে, সবাই একসঙ্গে দাঁড়াও দেখা যাক কী করা যায়।

ছবি তোলার ব্যাপারে অসীম খুব পরিশ্রমী। পছন্দমতন বিষয়বস্তু পেলে সে জল-কাদা, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়েও চলে যায়। তার এই অধ্যবসায় দেখে আমাদের যাত্রার বিরতি দিতেই হয় মাঝেমাঝে।

জুলাই মাসের ১১ তারিখ থেকে টানা ছ'দিন আমাদের এই ভ্রমণ। শুধু পাহাড় আর পাহাড়, একসঙ্গে এত পাহাড়ের অভ্যন্তরে এতদিন ধরে ঘোরাফেরা করিনি আগে। সব পাহাড়ের বর্ণনা দেওয়ার কোনও অর্থ হয় না। এর মধ্যে অনেক হ্রদ, অনেক উদ্যান, অনেক গিরিনদীর মধ্যে দুটি জায়গার কথা না বললেই নয়। যদিও লেক লুইসের অভিজ্ঞতাও অবিস্মরণীয়, ব্যানফ, জ্যাসপারের মতন বিখ্যাত স্থানগুলিও বাদ দিতে হচ্ছে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য দুটি জায়গার মধ্যে একটি হিমবাহ, অন্যটি উষ্ণ জলের প্রস্রবণ। প্রকৃতির কী বিচিত্র লীলা, এক জায়গায় অনাদিকাল থেকে সঞ্চিত তুষার আর অদূরেই মাটি ফুঁড়ে টগবগ করে উঠছে গরম জল।

যেখানেই পর্যটকদের বিশেষ আকর্ষণ, সেখনেই ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি। এ তো আর বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণ নয় যে যার ইচ্ছে সেই এসে নেমে পড়ছে! এখানে উষ্ণ জলের ধারাকে এক জায়গায় সুইমিং পুলের মতন বেঁধে রাখা হয়েছে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকলে তোয়ালে আর পোশাক বদলাবার ব্যবস্থা সব নিখুঁত। দুটি সুইমিং পুলের মধ্যে একটি বেশি গরম, অন্যটি ততটা নয়, যার যেটি পছন্দ। কিংবা ইচ্ছে করলে একবার এখানে, আর একবার ওখানেও নামা যায়।

আগে থেকেই পরিকল্পনা করা ছিল বলে, আমরা সবাই সুইমিং স্যুট সঙ্গে করে এনেছি। নারী-পুরুষের সহস্নান এদেশে বেশ চালু। কেন জানি না, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের সংখ্যাই বেশি মনে হয়। মেয়েদের পোশাকের কত রকম বাহার। কিংবা সঠিক বলতে গেলে, পোশাক না থাকার কত রকম বাহার। একেবারে নিরাবরণ কেউ নয়, তবে অনেকেরই পোশাক খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সুইমিং স্যুটের ক্ষুদ্র সংস্করণের নাম বারমুডা, আর তার থেকেও ছোট হলে? সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষায়, আমার গলার টাই দিয়ে তিনটি মেয়ের জাঙ্গিয়া হয়ে যায়।

একবার টিকিট কেটে ঢুকলে যার যতক্ষণ ইচ্ছে থাকতে পারে। আরামদায়ক গরম জল আর চতুর্দিকে স্বল্পবসনা সুন্দরীরা, অর্থাৎ সিনেমার মতন বেদিং বিউটির ছড়াছড়ি, এই অবস্থায় উঠে যেতে কার ইচ্ছে করে! কিন্তু আমাদের তো অনেক দূরে যেতে হবে! কে কাকে তাড়া দেবে? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, প্রত্যেকেই বলছি, এবার ওঠা উচিত, তবু ওঠার নাম নেই। মাঝেমাঝে সৌমিত্র চলে যাচ্ছে গভীর জলে, কখনও হারিয়ে যাচ্ছে অসীম।

শেষ পর্যন্ত উঠতেই হল খিদের তাড়নায়। এর পর আবার অসীমের রেস্তোরাঁ খোঁজার পালা। হঠাৎ এক জায়গায় নির্দেশ চোখে পড়ল যে মাইলখানেক দূরে গেলেই এই উষ্ণ প্রস্রবণের উৎসটা দেখা যাবে। স্বাতী সেটা দেখতে যাবেই। অন্যরাও রাজি। একমাত্র আমিই অপারগ। সেই

সময় আমার হাঁটুতে খুব ব্যথা, পাহাড়ি রাস্তায় দু'মাইল আসা-যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু স্বার্থপরের মতন আমি তো আর অন্যদের নিষেধ করতে পারি না! তাই ঠিক হল, আমি রাস্তার ধারে বসে থেকে অপেক্ষা করব, ওরা ঘুরে আসবে। কান্তি হোর অবশ্য বলল, সে থেকে গিয়ে আমাকে সঙ্গ দিতে পারে, যদি আমার কোনও অসুবিধে হয়! আমি তাকে ধমক দিয়ে বললুম, আমি কি বাচ্চা ছেলে নাকি যে অসুবিধে হবে? তুমিও ঘুরে এসো।

আমি বসলাম একটা উঁচু পাথরে, অন্য পাঁচজন হাঁটতে-হাঁটতে মিলিয়ে গেল ঢালু রাস্তায়। এবার আমার প্রতীক্ষা, ওরা কতক্ষণে ফিরবে। এইরকম সময়ে প্রতি মিনিটকেই অনেক গুণ বেশি লম্বা মনে হয়, যেন অনন্তকাল কেটে যাচ্ছে। চতুর্দিকে পাহাড় ও জঙ্গল, আকাশ একবারে মেঘমুক্ত নীল, ঝকঝক করছে রোদ, আর কোনও জনমনুষ্যের সাড়াশব্দ নেই, ঝিমঝিম করছে স্তব্ধতা, তার মধ্যে আমি বসে আছি একা। কান্তিকে বলেছিলাম, আমি বাচ্চাছেলে নই, কিন্তু একসময় একটা পরিত্যক্ত শিশুর মতনই আমার বুক অভিমানে ভরে গেল, যেন আমাকে ইচ্ছে করে পথে ফেলে রেখে চলে গেছে আমার ঘনিষ্ঠ সঙ্গীসাথীরা! এর পর কি আমি কেঁদে ফেলব নাকি?

কতক্ষণ পর কে জানে, সেই ঢেউখেলানো রাস্তায় প্রথম দেখতে পেলাম একজন স্প্যানিশ সাহেবকে, অর্থাৎ আমাদের কান্তি হোর। উৎসস্থলটি নাকি খুবই রমণীয়, আসতে ইচ্ছে করছিল না, কান্তিই সবাইকে তাড়া দিয়ে এনেছে।

যতই সৌন্দর্য উপভোগ করা যাক, এখন সকলেরই খিদেয় পেট জ্বলছে। আজ আর অসীমকে বেশি সুযোগ দেওয়া যায় না, কাছাকাছি প্রথম রেস্তোরাঁতেই ঢুকে পড়া গেল। অসীমেরও তেমন আপত্তি নেই। বেশিক্ষণ স্নান করলে বেশি খিদে লাগে। মূল খাবার আসার আগেই বুভুক্ষুর মতন আমরা টেবিলের ওপর রাখা পাঁউরুটি আর মাখনই খেতে শুরু করলাম। শুধু কান্তিরই খিদেবোধ কম। এরই মধ্যে উঠে গিয়ে সে কাউন্টার থেকে কিনে আনল ছ'খানা রঙিন ছবির পোস্ট কার্ড। অন্যদের বলল, যার যেখানে মন চায়, চিঠি লেখো। আমি পোস্ট করে দেব।

চিঠি লেখা এখন তো প্রায় উঠেই গেছে। একমাত্র অর্ধশতাব্দীরও বেশি প্রবাসী কান্তি এখনও চিঠি লেখার অভ্যেস ধরে রেখেছে। পৃথিবীর বিভিন্নপ্রান্ত থেকে মাঝেমাঝেই তার মুক্তোর মতন হস্তাক্ষরে বাংলা চিঠি আসে। এই যাত্রাতেও সে কয়েকবার আমাদের দিয়ে চিঠি লিখিয়েছে।

আথাবাস্কা গ্লেসিয়ার বিশ্ববিখ্যাত। গোটা উত্তর আমেরিকার মধ্যে এই গ্লেসিয়ার দেখতেই সবচেয়ে বেশি মানুষ আসে। অনেকে বলে, এই হিমবাহের ওপর দাঁড়ালে ঠিক যেন চাঁদের বুকে হাঁটার অভিজ্ঞতা হয়।

ভূগোল বইতেই হিমবাহের কথা পড়েছি। তা যে কখনও দেখব, আর সত্যি সত্যি সেখানে দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা হবে, তা কি কখনও কল্পনাতেও ভেবেছি? অবশ্য সেখানে পদার্পণ করাও কম বিপজ্জনক নয়। মৃত্যুভয় আছে। গুপ্ত ক্রিভাস বা তুষারফাঁদ আছে। হুট করে সেখানে হাঁটতে গেলে অতলে তলিয়ে যেতে হয়, বেশ কয়েকজন এভাবে মারাও গেছে।

কত কোটি বছর আগে এই হিমবাহ শুরু হয়েছে, তা কেউ জানে না। একটু-একটু করে নীচে নামছে, প্রতিদিন কয়েক সেন্টিমিটার করে নামে, বছরে দু-তিন মিটার। এখানেও ব্যবসায়ীরা বেশ কিছু অর্থের বিনিময়ে পর্যটকদের অবতরণের ব্যবস্থা করেছে। মূল রাস্তা থেকে একটা বাসে চাপিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হিমবাহের অনেকটা কাছে। তারপর খাড়া নামতে হয়, তার জন্য আছে অন্য গাড়ি। সে এক অত্যাশ্চর্য স্নো কোচ, তার এক-একটি চাকা একজন মানুষের সমান। সারা পৃথিবীতেই এরকম গাড়ি কয়েকটি মাত্র আছে।

আমার বন্ধুরা আমার প্রতি সদিচ্ছাবশতই উপদেশ দিল, সুনীল, তুমি যেও না, এক জায়গায়

বসে থাকো, গাড়িটাই বিপজ্জনক, তা ছাড়া নীচে নামলে টালমাটাল পায়ে হাঁটতে হবে, আছাড় খেয়ে পড়লে তোমার হাঁটুতে চোট লাগবে। অসীম আমার কাঁধ ছুঁয়ে বলল, নেমো না। রবীন বলল, না নামাই উচিত হবে। সৌমিত্র বলল, কেন শুধু শুধু রিস্ক নেবে! স্বাতীর দু'চোখে উদ্বেগ, একমাত্র কান্তি নীরব।

আমি হেসে বললাম, তোমরা ভেবেছ কী? বাচ্চা ছেলের মতন আমাকে বারবার রাস্তার ধারে বসিয়ে রাখবে? আমি এবার যাবই, যা হয় হোক!

সেই অতিকায় চাকাওয়ালা কোচে তো চাপা হল। একেবারে খাড়া পাহাড়ের ধার দিয়ে নামতে হবে অনেকটা নীচে। সেদিকে তাকালে অতি বড় সাহসীরও একবার বুক কাঁপবে। কোচটা চালাচ্ছে একটি লাল চুলের যুবতী। একজন গাঁট্টাগোট্টা জোয়ানের হাতে এই গাড়ির স্টিয়ারিং থাকলেই যেন ঠিক মানাত। কিন্তু আজকাল তো মেয়েরা সব পারে।

গাড়িটা সবে মাত্র নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে, তখন সেই যুবতীটি বলে উঠল, তোমরা কিছু মনে কোরো না। এই গাড়িটা অন্যদিন আমার এক সহকর্মী চালায়, কিন্তু আজ সে অনুপস্থিত, তাই আমি, মানে... এ গাড়ি চালাবার কোনও অভিজ্ঞতা আমার নেই, আজই প্রথম! অনেকেই শিউরে উঠল। বলে কী মেয়েটা, এমন সাংঘাতিক পথে সে এই পেল্লায় গাড়িটা চালাচ্ছে, অভিজ্ঞতা নেই....। পরমুহূর্তেই কয়েকজন হেসে উঠল। বোঝাই যাচ্ছে, এটা মিছে কথা। এতগুলি মানুষের প্রাণের ঝুঁকি রয়েছে, ব্যবসায়ী কোম্পানিটি কি একটি অনভিজ্ঞ মেয়েকে সেই গাড়ি চালাবার ভার দিতে পারে? এ দেশে ওসব হয় না। ওটা মেয়েটির রসিকতা। এরা যখন-তখন এরকম রসিকতা করে। সে বেশ মসৃণভাবে, অতি ধীর গতিতে গাড়িটি নীচে নামিয়ে আনল।

ছয় স্কোয়ার কিলোমিটার প্রশস্ত এই হিমবাহে খুব সাবধানে পা ফেলতে হয়। কোথায় কোথায় যাওয়া যাবে না, তারও নির্দেশ আছে। এর রূপ ধপধপে শুভ্র নয়, মানুষের জুতোর দাগে চতুর্দিকে কালো গর্ত হয়ে আছে। ছবিতে দেখা চাঁদের পৃষ্ঠদেশেরই মতন।

বন্ধুরা ছাড়াও আশেপাশে আরও অনেকে, তবু হঠাৎ খুব একা মনে হয়। নিজেকে বলতে ইচ্ছে হয়, কী রে সুনীল, পৃথিবীর অন্য পিঠে একটা হিমবাহের ওপর। এ কি স্বপ্ন না সত্যি না মায়া না যাবজ্জীবনের পুণ্যফল।
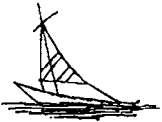
আমাদের ছোট নদী ঃ অজয়

এমন একটা সময় ছিল, যখন প্রতিবছর শীতকালে নেশার ঝোঁক কিংবা চুম্বকের টানের মতো চলে যেতাম কেঁদুলির মেলায়। শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার চেয়েও এই মেলার আকর্ষণ ছিল অনেক বেশি।

তখন তো আমাদের এমন কিছু পরিচিত হয়নি, আমাদের কেউ খাতিরও করত না। থাকার জায়গা-টায়গার নানান অসুবিধে ছিল। কেন্দুলির মেলা সারা রাতের, বীরভুমের হাড় কাঁপানো শীতের মধ্যে। এই মেলায় অনেক ছোট-বড় তাঁবু, একেকটা তাঁবুতে একেকজন বাউল শিরোমণির আখড়া। সারারাত শুধু গান। শীত কাটাবার জন্য বাউলদের সঙ্গে সঙ্গে আমি, শক্তি, ভাস্কর, দুয়েকবার

শরৎকুমার ও গণেশদা গাঁজা টানতাম। তাতে সত্যিই শীত বোধ খানিকটা কমে যায়। লুকিয়ে-চুরিয়ে দুয়েকটা দিশি মদের ঠেকও থাকত, সে মদ্যপানে শীতের তেমন কিছু সুরাহা হয় না, তবে গান শোনার উৎসাহ বাড়ে।

আমরা এক তাঁবু থেকে অন্য তাঁবুতে ঘুরতাম নতুন-নতুন গানের সন্ধানে। শেষ রাতে ঘুমে চোখ টেনে এলে মাঠের মধ্যেই খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকতাম একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে। তখন বয়েস কম, শরীরও বেশ টনকো, অসুখ-বিসুখ গ্রাহ্য করতাম না।

কেঁদুলির বাউল মেলায় সে সময় ইলেক্ট্রিসিটি ছিল না, সুতরাং মাইকও ছিল না। এক আখড়ার সঙ্গে অন্য আখড়ার গানের সংঘর্ষও হত না, সব গানই শোনা যেত আলাদাভাবে।

অজয় নদীর ধারে এই গ্রামে নাকি কবি জয়দেবের জন্ম। নাকি বলছি এই জন্য যে ওড়িশাতেও অনেকে দাবি করে, জয়দেব সে রাজ্যেই জন্মেছিলেন। জয়দেব বাঙালি কবি নয়, ওড়িয়া ভাষারও কবি নন, তিনি লিখেছেন সংস্কৃত ভাষায়। সুতরাং কোথায় তিনি জন্মেছিলেন, সঠিকভাবে তা নির্ণয় করা শক্ত।

জয়দেবের জন্মস্থানকে ঘিরেই কেন বাউলদের এত বড় মেলা উৎসব হয়, তাও ঠিক বোঝা যায় না। সংস্কৃত ভাষার এক কবি কী করে বাংলার বাউলদের গুরু হলেন? বাউলদের উদ্ভব জয়দেবের জন্মের অনেক পরে এবং কেঁদুলি থেকে অনেক দূরে অবিভক্ত বাংলার কুষ্টিয়া জেলাকে ঘিরে। এখনও সেখানে বাউলের সংখ্যা অনেক। বাউল-সম্রাট লালন ফকিরও কুষ্টিয়ারই মানুষ। কোন কারণে যে একেকটা মেলা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, তা বলা অসম্ভব। পশ্চিম বাংলায় এখন কেঁদুলির মেলা বাউলদের জন্যই বিখ্যাত মেলা।

আমাদের ছেলেবেলায় বাংলার বাইরে বাউলদের তেমন পরিচিতি ছিল না। তাদের গান ছিল বাংলার একটা নিজস্ব ধারা। রবীন্দ্রনাথ বাউল গানে মুগ্ধ ছিলেন, তাদের থেকে কিছু গ্রহণও করেছেন, তাতেই শিক্ষিত সমাজে বাউলদের সম্পর্কে আগ্রহ জন্মায়। ক্রমে সাহেবদের নজর পড়ে বাউলদের দিকে। বাউলদের গান ও জীবনধারা তাঁদের আকৃষ্ট করে। কবি অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ এদেশে থাকার সময় অনেক বাউলদের সঙ্গে মেশেন। আমাদের সঙ্গেও অ্যালেন গেছেন কেঁদুলির মেলায়, সারারাত জেগেছেন।

অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গ দেশে ফিরে গিয়ে বাউলদের কথা প্রচার করেন। আমেরিকার অতি বিখ্যাত গায়ক বব ডিলান একবার উডস্টক নামে একটা জায়গায় নানা ধরনের গায়কদের বিরাট এক সমাবেশের আয়োজন করেন। উডস্টক নামটিই এখন মার্কিনি গানের জগতে ইতিহাস হয়ে আছে। সেই সময় অ্যালেন গিন্‌স্‌বার্গের পরামর্শে বব ডিলান নিজস্ব বিমান পাঠিয়ে কলকাতা থেকে পূর্ণদাস বাউলকে উডস্টকে যোগ দেওয়ার জন্য নিয়ে যান। সেখানে পূর্ণদাসের একইসঙ্গে উদাত্ত গলার গান, গুপিযন্ত্র বাজনা ও নাচ দেখে অনেকেই মুগ্ধ হয়েছিলেন।

সেই থেকে অনেক বাউলই প্রায়ই নানা দেশ থেকে আমন্ত্রণ পান। চেনাশুনো অনেক বাউলই বিলেত-আমেরিকা-ফেরত। শান্তিনিকেতনের ট্রেনে গান গায় যে কার্তিক বাউল, সে একাধিকবার আমেরিকা-ইউরোপ ঘুরে এসেছে। পবন বাউল এখন থাকে প্যারিসে।

যাই হোক, সাহেব-মেমদের নজর পড়ার ফলে কেঁদুলির মেলার চরিত্রও অনেকটা বদলে যায়। ইতিমধ্যে ইলেক্ট্রিসিটি এসে গেছে, শুরু হয়েছে মাইকের উৎপাত। তাঁবুগুলি বেশি সাজানো, বাউলদের পোশাকও অনেক জমকালো। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সব বড় বড় আখড়াতেই মাইক লাগাবার ফলে কোনও গানই আলাদাভাবে মন দিয়ে শোনা যায় না। মনে হয় যেন একসঙ্গে অনেক শব্দের দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলেছে।

আমরাও তখন থেকে ওই মেলা সম্পর্কে আগ্রহ হারিয়ে ফেলি।

শেষবার ওই মেলায় যাই, যখন আমাদের বন্ধু আয়ান রশিদ খান ছিল বীরভূম জেলার এস পি। সে নিজে কবি এবং গান-পাগল। পদাধিকার বলে সে মেলার ওই তিনদিন উপস্থিত থেকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করত। একটা মস্ত বড় রঙিন তাঁবু, যার নাম সুইস কটেজ, সেখানেই তার অবস্থান। আমাকে আর শক্তিকে সে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল।

শক্তি বলেছিল, রশিদ, তুমি হুকুম দিয়ে এতগুলো মাইক একসঙ্গে চালানো বন্ধ করে দিতে পারো না? শুধু একটা মাইক থাকবে, সকলেই পালা করে এসে সেটা ব্যবহার করবে।

রশিদ বলেছিল, বাঙালিদের কোনও ব্যাপারেই কি একমত করানো সম্ভব? আমি এ ব্যাপারে মাথা গলিয়ে বিপদে পড়তে চাই না।

রশিদ তার তাঁবুতে একটি অল্পবয়েসি বাউল ও তার সঙ্গিনীকে ডাকিয়ে এনে আমাদের গান শুনিয়েছিল। ওদের বয়েস বড়জোর উনিশ-কুড়ি। কী সুন্দর সারল্য মাখা মুখ। ওদের গান শুনে তো ভালো লেগেছিল বটেই, তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছিলাম ওদের কথাবার্তা শুনে। এই বয়েসেই একটা চমৎকার দার্শনিক জীবন বোধ আছে। বাউলরা সব কমার্শিয়াল হয়ে গেছে, এই অভিযোগ আর মানতে ইচ্ছে করে না। এরকম ছেলেমেয়ে তো এখনও আসে।

ওদের নিয়ে আমি একটা গল্প লিখে ফেলেছিলাম।

এবারে নদীর কথা।

অজয় নদীর ধারে এই কেঁদুলি। মেলা চলার সময় সে নদীর ধারে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একসঙ্গে অত মানুষের সমাবেশ, তারা বাথরুমে যাবে কোথায়? সবই ওই নদীর ধারে। এখন কোনও সুবন্দোবস্ত হয়েছে কি না জানি না। সে সময় ওদিকটায় দুর্গন্ধের চোটে ঘা ঘিনঘিন করত। ওরই মধ্যে অনেকে স্নান করত অজয় নদীর জলে।

এই অজয় নদীকে আমি আরও অনেক জায়গায় দেখেছি। বীরভূম আর বর্ধমান জেলার সীমান্ত ভাগ করেছে এই নদী। মেলা ছাড়া অন্য সময়েও আমি কেঁদুলির পাশ দিয়ে গেছি। তখন এ নদীর চেহারা বেশ পরিষ্কার আর সুন্দর।

বীরভূমের অনেক নদীরই উৎপত্তি বর্তমান ঝাড়খন্ডের পাহাড়-টিলায়। অজয়ও সেখানেই জন্ম নিয়ে কালিপাথর নামে একটা জায়গার পাশ দিয়ে প্রবেশ করছে বীরভূমে। আমরা যখন ট্রেনে চেপে শান্তিনিকেতনে যাই, অজয় নদীর ওপর ঝমঝম শব্দে ট্রেনটা পার হলেই বুঝি, এবার ব্যাগট্যাগ গুছিয়ে নিতে হবে, আর দশ মিনিটের মধ্যেই বোলপুর এসে যাবে। এখানেই অজয় বীরভূম আর বর্ধমানের স্পষ্ট সীমানা।

ট্রেন থেকে কেমন দেখি আমরা এই নদীর রূপ? প্রায় সারা বছরই যেন এই বিশাল নদীটি মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। জল থাকেই না বলতে গেলে, চারদিকে শুধু বালি, এক জায়গায় শুধু তিরতির করে বয়ে যাচ্ছে, সেটাই তার বেঁচে থাকার লক্ষণ। লোকজন হেঁটেই পার হয়, গরুর গাড়িও চলে।

বর্ষার সময় দুয়েকটা মাস দেখা যায় তার আসল রূপ।

শান্তিনিকেতনে গাড়ি করে যেতে গেলে ইলামবাজারের কাছে জঙ্গলে একটা সেতু পার হতে হয়। উনিশশো আটাত্তর সালে প্রবল বন্যায় সে সেতুর কী দশা হয়েছিল, তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। বন্যা শেষের কয়েকদিন পরেই আমি ওদিকে গিয়েছিলাম। জলের এত তেজ? অতবড় একটা সেতু একেবারে দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে-চুরে গেছে। না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

একবার বর্ষার সময় শান্তিনিকেতনে থাকতে থাকতে শুনতে পেলাম যে অজয় নদীতে নাকি ইলিশ মাছ উঠেছে। প্রথমে মনে হয়, বাজে কথা, গুজব! ইলিশ তো সমুদ্রের মাছ, পদ্মা-গঙ্গায় কিংবা

সুবর্ণরেখাতেও কিছুটা ঢুকে আসে। এতদূর আসবে কী করে? পরে মনে হয়, হয়তো একেবারে গুজব নয়, এই অজয় গিয়ে পড়েছে, গঙ্গার যেখানে নাম ভাগীরথী, সেইখানে। সেদিক থেকে কিছু ইলিশ এদিকে চলে আসতে পারে। সে ইলিশ অবশ্য আমার খাওয়া হয়নি।

একবার কবি সমরেশ মণ্ডলের মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে পাণ্ডবেশ্বর নামে এক গ্রামে গিয়েছিলাম, রাত্রিবাস করেছিলাম তার বন্ধু ও কবি সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অতিথি ভবনে। গ্রাম বলছি বটে, কিন্তু পাণ্ডবেশ্বর বেশ প্রাচীন জায়গা, এখনও বেশ বর্ধিষ্ণু। শহরের সব চিহ্ন বর্তমান। এখানেও অজয় নদ।

এখানে পাণ্ডুরাজার ঢিবি খুঁড়ে অনেক ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। অর্থাৎ এককালে এখানে কোনও রাজ্যের রাজধানী ছিল। খুব সমৃদ্ধ ও বেগমান নদী না হলে তার তীরে কোনও বসতি গড়ে ওঠার কথা নয়। যদিও প্রায় ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ, তবু অজয়ের সেই গৌরবের দিন আর নেই। বাংলার অনেক নদ-নদীর মতো অজয়েরও এখন করুণ দশা।

পাণ্ডবেশ্বরে বিখ্যাত মন্দিরটিও দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানেও নদীর প্রস্থ দেখে সম্ভ্রম জাগে, বোঝা যায় এককালে কত চওড়া নদী ছিল! কিন্তু নদী বলতে তো তার দৈর্ঘ্য প্রস্থ কিংবা দু-ধারের দৃশ্য বোঝায় না, নদী হচ্ছে এক খাতের মধ্যে প্রবাহিত জলধারা। সেই জলই আর নেই। সারা পৃথিবী থেকে নাকি জল কমে যাচ্ছে, আর উষ্ণতা বাড়ছে। এর পরের মহাযুদ্ধ হবে নাকি দেশে-দেশে জলের অধিকার নিয়ে।

আমাদের বাংলায় নদ-নদীর নাম অনুযায়ী পুরুষ কিংবা স্ত্রী বলে নির্ণয় করা হয়। গঙ্গা যেমন নদী, ব্রহ্মপুত্র সেই রকম নদ। অজয়ও সেই কারণে নদ। কিন্তু লেখার সময় বারবার নদ লিখতে কেমন যেন ভুল হয়ে যায়, সবই নদী বলে মনে হয়।

অজয়কেও আমি কয়েকবার নদী বলে ফেলেছি। কিন্তু শুধু আমি নয়। অজয়ের তীরবর্তী এক বিখ্যাত কবিও অজয়কে নদীই বলেছেন।

অজয়ের তীরে আরেকটি বিখ্যাত গ্রামের নাম কোগ্রাম। এই গ্রামের খ্যাতির প্রধান কারণ এখানে কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক জন্মেছিলেন, এখানেই তিনি বসবাস করতেন। অনেক বিখ্যাত লেখক তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য যেতেন কোগ্রামে।

সে গ্রামে আমিও গেছি দুয়েকবার, তখন অবশ্য কবি জীবিত নন। এখানে নদী কেমন যেন পাক ঘুরে গেছে। তাই নিয়ে কুমুরঞ্জন লিখেছেন:

বাড়ি আমার ভাঙন ধরা অজয় নদীর বাঁকে
জল যেখানে সোহাগ ভরে স্থলকে ঘিরে রাখে।

আমাদের ছোট নদী

॥ ১ ॥

ফরাসি দেশে লোয়ার নামে একটি নদী আছে। খুব একটা বড় নদী নয়, আমাদের দেশের বিখ্যাত নদ-নদীগুলির তুলনায় ছেলেমানুষ। এই লোয়ার নদীর খ্যাতি অন্য কারণে, এ নদীর দুই তীরে রয়েছে অনেকগুলি সাতো বা দুর্গ সমন্বিত প্রাসাদ। যেগুলির স্থাপত্য শিল্প নৈপুণ্য অতুলনীয়। সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ-লক্ষ নারী-পুরুষ ওই লোয়ার উপত্যকার সাতোগুলি দর্শন করতে যায়। প্রত্যেকটি সাতোর অন্দরে রয়েছে ইতিহাসের বহু রোমাঞ্চকর কাহিনি, অনেক ছবি ও ভাস্কর্য, একটি বিশেষ সাতোর সঙ্গে অমর ইতালিয়ান শিল্পী লিয়োনার্দো দা ভিঞ্চির নাম যুক্ত হয়ে আছে।

আমি আপাতত এই লোয়ার নদী সম্পর্কে লিখছি না। কিছুদিন আগে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছিল। বন্ধু অসীম রায়, ভাস্কর দত্ত ও প্রীতি সান্যালের সঙ্গে গাড়িতে ফরাসি দেশের নানা অঞ্চলে ঘোরাঘুরি করছিলাম, মাঝে মাঝেই লোয়ার নদীটি পারাপার করতে হচ্ছিল, এই নদীটি আমি গত পনেরো বছরে বেশ কয়েকবার দেখেছি, কিন্তু এ নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমার দুটি কবিতার লাইন মনে পড়েছিল :

সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে...

মনে কখন কী আসে, তার কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে না। বর্ষাকালেও বসন্তের গান গুঞ্জরিত হতে পারে মনের মধ্যে। এক নদী দেখে আরেক নদীর কথা মনে পড়া তো খুব স্বাভাবিক। মাইকেল তাঁর জন্মস্থানের পার্শ্ববর্তী নদীটিকে নিয়ে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটা আমার মাথার মধ্যে এমনই গেঁথে গেল যে আমি অনবরত এ লাইন দুটি বিড়বিড় করতে লাগলাম। ওই কবিতার এই দু-লাইন ব্যতীত আর লাইনগুলি আমার স্মরণে নেই।

এই ঘটনার মজার দিকটা হল, পরে আমি মাইকেল মধুসূদনের জীবনীগ্রন্থ ঘেঁটে দেখলাম, মাইকেল তাঁর প্রিয় কপোতাক্ষ নদী সম্পর্কে ওই কবিতাটা লেখেন ফরাসি দেশে বসে। এই লোয়ার নদী দেখেই তাঁর কপোতাক্ষর কথা মনে পড়েছিল নাকি? আমার যদি আত্মা কিংবা ভূতে বিশ্বাস থাকত, তা হলে অনায়াসেই বলা যেত যে মাইকেলের ভূত আমার মাথার মধ্যে ওই সময় ওই কবিতার লাইন দুটি ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

লোয়ার নদীর সঙ্গে কপোতাক্ষ নদীর কোনওই মিল নেই। দুই তীরের শিল্প ভাস্কর্যের সামান্যতম গৌরবও নেই কপোতাক্ষ নদীর। এ নিতান্তই গ্রাম্যনদী, অলঙ্কারহীন, কিন্তু সরল, মায়াময়। অমন কবিত্বময় নাম তাকে কে দিয়েছিল কে জানে। তবু অমন নাম সত্ত্বেও নদীটি অকিঞ্চিৎকর হয়েই থাকত, যদি না তার তীরের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে মধু নামে একটি ছেলে জন্মাত। সেই ছেলেটির জন্যই কপোতাক্ষ বাংলা সাহিত্যে অমর হয়ে আছে।

কপোতাক্ষ নদী নয়, নদ। কেন সে নদী নয়, তা আমি জানি না। কিন্তু লেখার সময় বারবার নদ লিখতে ভুল...

কপোতাক্ষর সঙ্গে আমার সন্দর্শন হয়েছিল বেশ কিছু বছর আগে, বাংলাদেশের জন্মের ঠিক পরে-পরেই। কবির জন্মস্থানে, কবির জন্মদিনে এখন প্রতি বছর মধুমেলার আয়োজন হয়। সেটা বোধহয় প্রথম বছর। উদ্যোক্তারা কয়েকজন সাহিত্যিককে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমাদের দলনেতা ছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। তিনি তখন লেখক হিসাবে যত বিখ্যাত, তার চেয়েও বেশি খ্যাত আনন্দবাজার পত্রিকা সংস্থার কর্ণধার হিসেবে। এরকম পড়ুয়া, এরকম অসাধারণ স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন এবং এরকম ছটফটে মানুষ আমি আর দ্বিতীয় দেখিনি।

আমাদের ঘাঁটি হয়েছিল যশোর শহরে। সেখান থেকে সাগরদাঁড়ি গ্রামের দূরত্ব আঠাশ মাইল। যাতায়াতের জন্য অনেক গাড়ি রয়েছে। এককালে এসব অঞ্চলে রাস্তাঘাট বিশেষ ছিল না, বর্ষাকালে গরুর গাড়ি চালানোও দুঃসাধ্য হত, নদীপথই ছিল একমাত্র ভরসা। মাইকেলের বাপ-দাদারা নৌকোতেই কলকাতায় যাওয়া আসা করতেন। এখন বাংলাদেশে অনেক নতুন-নতুন পথ তৈরি হয়েছে, কিছু-কিছু পথ কংক্রিটে বাঁধানো, গাড়িগুলি সব বিদেশি। গমনাগমন অতি মসৃণ।

উদ্যোক্তারা যশোর থেকে আমাদের সাগরদাঁড়িতে মাইকেলের পৈতৃক বাড়িতে বসিয়ে রেখেছেন। মেলা ভালো করে শুরু হয়নি। সাহিত্যিকরা যখন এসেছেন, একটা সভা তো হবেই, বক্তৃতাও করতে হবে। কিন্তু এখনও মঞ্চ বাঁধা চলছে, সভার দেরি আছে, সন্তোষকুমার যথারীতি ছটফট করছেন। এক জায়গায় বেশিক্ষণ চুপ করে বসে থাকা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। উদ্যোক্তারা আমাদের খাতির করার জন্য এবং শান্ত করার জন্য বারবার ডাব খাওয়াচ্ছেন। কিন্তু পরপর ক'টা ডাব খাওয়া যায়? সন্তোষকুমার এক সময় কোনও গুপ্ত স্থান থেকে ফস করে একটা জিনের পাঁইট বার করলেন এবং কিছুটা জিন মিশিয়ে দিলেন ডাবের জলে। এ অতি উত্তম পানীয়। আমরাও প্রসাদ পেলাম, বলাই বাহুল্য।

বোতলটি অচিরেই শেষ হয়ে গেল, তবু সভা আরম্ভ হওয়ার নাম নেই, এর পরেও কী করে অপেক্ষা করা যায়? সন্তোষকুমার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, কপোতাক্ষ নদী দেখে আসি।

উদ্যোক্তারা হা-হা করে উঠলেন। সে নদী এখন আর দেখবার মতো নেই, যদি যেতেই হয়, বিকেলবেলা তারাই ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কে শোনে কার কথা। অপরের ইচ্ছে দ্বারা পরিচালিত হওয়ার মতো বান্দা নন সন্তোষকুমার। তিনি আমার হাত ধরে টেনে, জুতো মশমশিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মাইকেলের পৈতৃক বসতবাড়িটি প্রায় ধ্বংসস্তূপ বলা যায়। একটি গাছের তলায় বাঁধানো বেদিটি টিকে আছে, ওখানে বসে মাইকেল কবিতা লিখতেন, এরকম একটি গুজব অনেকে বিশ্বাস করে। বর্তমানের প্রতিবেশীরা সবাই মুসলমান। একটু আগে আমি এই সাগরদাঁড়ি গ্রামের মাইকেল সম্পর্কে অত্যুৎসাহী সেলিম নামে একটি যুবককে একটি গল্প শুনিয়েছিলাম। মাইকেলের ঠাকুরদার এক ভাইয়ের নাম ছিল মানিকরাম দত্ত। মাইকেলের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এই মানিকরামেরই কিছুটা কবিত্ব শক্তি ছিল। তিনি এক সম্ভ্রান্ত ধনী মুসলমানের অধীনে চাকরি করতেন এবং প্রভুর মনোরঞ্জনের জন্য তিনি তাঁকে প্রতিদিন একটি করে স্বরচিত কবিতা শোনাতেন। ওই প্রভুর একটি অতি রূপসী ও যোড়শী কন্যা ছিল, সেও পরদার আড়াল থেকে কবিতা শুনত। শুনতে-শুনতে মানিকরামের প্রতি তার প্রেম হয়ে গেল। আড়ালে মন দেওয়া-নেওয়া হতেও দেরি হল না, যুবতীটি জেদ ধরে বসল, সে মানিকরামকেই বিয়ে করবে। সে খবর জেনে ওই মুসলমান ভদ্রলোক মানিকরামের গর্দান নিতে চাননি, বরং উদারভাবে বলেছিলেন, বেশ তো, তুমি মুসলমান হয়ে যাও, তারপর আমার মেয়েকে বিয়ে করো। তাতে আবার মানিকরাম ও তার পরিবারের সকলের ঘোর আপত্তি। বিয়ের জন্য ধর্মত্যাগ করা চলবে না। তারপর এই নিয়ে বিস্তর কথা কাটাকাটি ও মন কষাকষি। মানিকরাম যখন বুঝলেন, এ বিয়ে কিছুতেই হবে না, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, আর বিয়েই করবেন না সারা জীবন, সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন।

মাইকেল ধর্মত্যাগ করে খ্রিস্টান হয়েছিলেন, তাঁর ওই পূর্বপুরুষ মানিকরাম যদি ইসলামে

দীক্ষিত হতেন, তা হলে মুসলমানদের সঙ্গে দত্ত পরিবারের একটি সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারত।

গল্পটা শুনে সেলিম আমার দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। সে ভেবেছিল, গল্পটা আমি তক্ষুনি বানিয়েছি। সন্তোষকুমার পাশে বসে কান খাড়া করে শুনছিলেন, তিনি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, যোগীন্দ্রনাথ বসুর মাইকেলের জীবনীতে এ কাহিনি আছে।

একেই তো সন্তোষকুমার ঘোষের অগাধ পড়াশুনো, তা ছাড়া তিনি কোনও সভায় বক্তৃতা করার আগে হোম ওয়ার্ক করে যেতেন। বাইরে বেরিয়ে বললেন, মাইকেল যতই সাহেব সাজুন এই গ্রামটাকে বড় ভালোবাসতেন। একবার বলেছিলেন, এ সাগরদাঁড়ি গ্রামের সব কাঁচা রাস্তাগুলো তিনি নিজের খরচে বাঁধিয়ে দেবেন। 'মাইকেলোদ্যান' নামে একটা বড় বাগান তৈরি করার ইচ্ছে ছিল, সেইসঙ্গে একটা স্কুল, রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের মতো। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যা পেরেছেন, মাইকেল তা পারেননি।

আমি মনে-মনে বললাম, মাইকেল খুব সম্ভবত আপনারই মতো চঞ্চলমতি ছিলেন।

নদীর ধারে এসে একজন নৌকোর মাঝিকে ডাকাডাকি করে থামানো হল। নদী অতি হ্রস্ব, তবু সাগরদাঁড়ি গ্রামটার তিনদিক ঘিরে আছে। আমরা এ নদীর আগেকার দিনের রূপ বর্ণনা পড়েছি, এখন তা বিশ্বাস করাই শক্ত। এক সময় এই নদী দিয়ে বজরা চলত, মাইকেল নিজেই শেষবার স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে বজরায় চেপে গ্রামে এসেছিলেন।

এখন বজরার কথা কল্পনাই করা যায় না। ছোট-ছোট নৌকো চলে। আমাদের নৌকোটিতে চার-পাঁচজন বসায় টলটলায়মান। মাঝি লগি মারছে, তাতে বোঝা যায়, বড়জোর এক মানুষ জল।

মাইকেলের জন্মদিন ২৫ জানুয়ারি, অর্থাৎ শীতকাল। বেশ ঠান্ডা হাওয়া। সন্তোষকুমার পরে আছেন পুরো দস্তুর গরম সুট, টাই সমেত, আমি পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়িয়েছি। এইটুকু ছোট একটা নদীতে নৌকোভ্রমণ এমন কিছু আহামরি নয়। দু-দিকেরই তীর বড় কাছে, তবু মাইকেল মধুসূদন এই নদী দিয়ে যাতায়াত করতেন, এটা ভেবেই রোমাঞ্চ হয়।

সন্তোষকুমার মাইকেলের জীবন থেকে নানান ঘটনা শোনাতে-শোনাতে এক সময় জিগ্যেস করলেন, এই নদী নিয়ে কবিতাটা কার পুরো মনে আছে? আর কারুরই নেই, আমিও দুলাইনের বেশি মনে রাখতে পারি না, সন্তোষকুমার নিজেই শুনিয়ে দিলেন ঃ

সতত হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া মন্ত্র ধ্বনি) তব কলস্বনে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে।
বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষা মিটে কার জলে?
দুগ্ধস্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি-স্তনে...

আমাদের দলের একজন একবার ভুল করে নদীটিকে 'কপোতাক্ষী' বলতেই সন্তোষকুমার ধমকে দিলেন।

অনেকে মনে করে, কপোত প্লাস অক্ষি, কপোতাক্ষীই হওয়া উচিত। যেমন মীনাক্ষী। কিন্তু তাতে ব্যাকরণ ভুল হয়। তারা খেয়াল করে না, মীন প্লাস অক্ষি কিন্তু মীনাক্ষি নয়, দীর্ঘ ঈ-কার দিয়ে মীনাক্ষী। তার কারণ, মুল কথাটা মীনাক্ষ, তার স্ত্রী লিঙ্গে মীনাক্ষী। পুরুষ নদ বলেই কপোতাক্ষ, নদী হলে কপোতাক্ষী হত।

কিছুক্ষণ নৌকোভ্রমণের পর সন্তোষকুমার অন্য পারের একটি স্থানের দিকে আঙুল তুলে বললেন, মাইকেল যখন সপরিবারে আসছিলেন, তখন তাঁর একটি সন্তান খিদেতে কান্নাকাটি করতে

শুরু করেছিল। তখন মাইকেল বজরা থেকে নেমে গিয়ে দুধ জোগাড় করার জন্য গ্রামের দিকে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভবত এই জায়গায়। এদিকের গ্রামটা একবার দেখে এলে হয় না? মাঝি, নৌকোটা ওখানে লাগাও তো।

আমরা তাকিয়ে দেখি, সেখানে থকথক করছে কাদা। নামলে কোমর পর্যন্ত ডুবে যাবে।

মাঝিই বলল, না, ওখানে লাগানো যাবে না।

সন্তোষকুমার বললেন, লাগাও বলছি। কাদা থাকে থাক, সে আমরা বুঝব।

মাঝিটি গম্ভীরভাবে বলল, পারের কাছে গেলে নৌকো ঠেকে যাবে। এখানে লাগাতে পারব না।

মাঝিটি বেশ গোঁয়ার ধরনের, সে কিছুতেই কথা শুনবে না।

আমি বললাম, সন্তোষদা, মাঝিটি তো আনন্দবাজারের কর্মচারী নয়, তাই আপনার হুকুম মানতে চাইছে না।

সন্তোষকুমার অসম্ভব রেগে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, লাগাবে না মানে? আমার অর্ডার! যত টাকা লাগে লাগুক...।

কথা শেষ হল না। সন্তোষকুমার উঠে দাঁড়াতেই ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল, নৌকোটা জোরে দুলে উঠল, সন্তোষকুমার টপাস করে জলে পড়ে গেলেন।

আমি আঁতকে উঠেছি, কারণ আমি জানতাম, উনি সাঁতার জানেন না। তা ছাড়া, ধরাচুড়ো পরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আরও একটি আশ্চর্য কাণ্ড হল। সেই প্রৌঢ় বয়েসেও তিনি দারুণ তৎপরতা দেখিয়ে, নৌকোর গলুই ধরে সামারসল্ট খেয়ে ওপরে উঠে এলেন।

কেউ হাসবার আগেই বলে উঠলেন, দেখলে, দেখলে, আমার এজিলিটি দেখলে?

সত্যিই তাঁর সপ্রতিভতা দেখার মতোই বটে।

এদিকে সভা শুরু হয়ে গেছে, ডাকাডাকি করছে উদ্যোক্তারা। সন্তোষকুমারের পোশাক পালটাবার উপায় নেই। আমাদের পোঁটলা-পুঁটলি রয়ে গেছে যশোরে। সেই অবস্থাতেই মঞ্চে উঠে সভাপতির চেয়ারে বসলেন সন্তোষকুমার ঘোষ, তাঁর মাথা থেকে, কোট প্যান্ট থেকে জল ঝরছে।

তাতেও তাঁর ভাষণে কোনও তারতম্য হল না।

॥ ২ ॥

সে নদীর উৎস কোনখানে, আর কোথায় বা গিয়ে শেষ হয়েছে, তা কিছুই জানা ছিল না। আমরা শুধু জানতাম, আমাদের গ্রামের নদীর নাম আড়িয়াল খাঁ। ঠিক গ্রামের পাশেই নদী নয়, ছ-সাত মাইল দূরে। শীতকালে হেঁটে যেতে হয়, আর বর্ষাকালে নৌকোয়।

আমাদের গ্রামের সীমানা তা বলে শুকনো নয়। ইস্কুল যাওয়ার সময় একটা বেশ চওড়া খাল পেরিয়ে যেতে হত, সেটাকেই আমরা নদী বলেই মনে করতাম ছোটবেলায়। তখন নদী আর খালের তফাত জানা ছিল না ঠিক। বর্ষকালে জল, জল, চতুর্দিকেই জল, মাঝে-মাঝে দ্বীপের মতো গ্রাম। কোনটা ধানের খেত ছিল আর কোনটা খেলার মাঠ, কিছুই বোঝা যেত না। বন্যা নয়, প্রতি বছরই এরকম।

আমাদের গ্রামের নাম মাইজ পাড়া। সব নামেরই একটা অর্থ থাকে। মাইজ পাড়া, অর্থাৎ মাঝের পাড়া। বাঙাল ভাষায় মেজো ভাইকে বলে মাইজা ভাই, মেজো ছেলে—মাইজা পোলা। শুধু মাইজ পাড়া নয়, আমাদের গ্রামের সঠিক নাম পূর্ব মাইজ পাড়া। মাঝখানের আবার পূর্বদিক কী করে হয়? বাচ্চা বয়সে এসব চিন্তা করিনি। পশ্চিম মাইজ পাড়া নামেও আর একটা গ্রাম ছিল।

নদীর নামটা শুনে সবসময় গা ছমছম করত। আড়িয়াল খাঁ! কোনও ডাকাতের নাম নাকি? কিন্তু কোনও ডাকাতের যতই নামডাক হোক, তার নামে কেউ নদীর নাম রাখে না। পরে জেনেছিলাম, আড়িয়াল খাঁ ছিল কোনও এক ফকিরের নাম। কিন্তু এযাবৎ আর কোনও মুসলমানের নাম আড়িয়াল হয় বলে শুনিনি। ডাকাতের নামে নদীর নাম হয় না বটে, তবে কুমিল্লা জেলায় একটা নদীর নাম ডাকাতিয়া!

আড়িয়াল খাঁ নদীটাকে আমরা দেখতে যেতাম মাদারিপুর শহরের কাছে। যদিও পায়ে হাঁটার রাস্তা ছিল এবং খালপথে নৌকোয় যাওয়া যেত। কিন্তু আমরা যেতাম অন্যভাবে। শীতকালে জল সরে গিয়ে জেগে উঠত ভূমি, তখন ধানখেত, পাটখেত দেখা যেত স্পষ্ট, আমরা বাঁধা পথ ছেড়ে হাঁটা দিতাম মাঠের মাঝখান দিয়ে। হাঁটা দিতাম বা হাঁটা দেওয়াও বাঙাল কথা, এখন লিখতে গেলে লিখি, হাঁটতে শুরু করতাম। বা, করতুম! যেতে হত ধুয়াসার নামে একটি গ্রামের পাশ দিয়ে। এই গ্রামটি আমাদের গ্রামের চেয়েও বর্ধিষ্ণু। ছবির মতো সুসজ্জিত। একটি বাড়ির সামনের দিঘিতে চওড়া লাল রঙের সিঁড়িওয়ালা বাঁধানো ঘাট, দুপাশে বসবার ব্যবস্থা। দেখলেই মনে হয় দুপুরের রোদ পড়ে গেলে ওখানে কারা যেন বসে খুব গল্পগুজব করে। সেই ঘাটে নেমে আমরা স্বচ্ছ জলে পা ডুবিয়ে একটু আরাম করে নিতাম।

একদিন ওই বাড়ির এক মহিলাকে দেখে বলেছিলাম, এক গ্লাস জল দেবেন। যত অসুবিধাই থাকুক, জল চাইলে কেউ প্রত্যাখ্যান করে না। সেই মহিলাটি, যাকে দেখলেই ছোট মাসি বলে ডাকতে ইচ্ছে করে, তিনি দোরগোড়ায় নিয়ে গিয়ে শুধু জল নয়, একটা কাঁসার রেকাবিতে চারটি তক্তি এনে দিলেন। 'তক্তি' শব্দটা পূর্ববঙ্গে বলে, মূল বাংলাভাষায় চালু নেই। কী করে বোঝাব? ক্ষীর আর নারকোল দিয়ে তৈরি চারকোনা পাতলা-পাতলা মিষ্টি। নাড়ু তো গোল হয়। চারকোনা মিষ্টির কী নাম হয়? বাঙাল ভাষার কিছু-কিছু শব্দ মূল বাংলা সাহিত্যের ভাষায় স্থান পাওয়া উচিত। যেমন খালি গা-কে ওদিকে বলে উদলা, বেশ মিষ্টি শোনায় না?

অপ্রত্যাশিতভাবে জলের সঙ্গে সেই মিষ্টি খেতে পেয়েছিলাম বলে মনে-মনে আমরা সেই বাড়িটার নাম দিয়েছিলাম 'তক্তিবাড়ি'। অন্য যে কোনও বাড়িতেই পথিকরা জল চাইলে কেউ শুধু জল দিত না, অন্তত দুটো বাতাসা এনে দিত। একটু মিষ্টি মুখ না করে জল খেতে নেই, এই ছিল প্রথা। আমাদের বাড়িতে সারা বছর বাতাসা থাকত। আমাদের নিত্য জলখাবার ছিল বাতাসা আর মুড়ি। কোনও কোনও দিন চিঁড়ের মোয়া!

বর্ষার দিনেও আমরা খালপথে না গিয়ে নৌকো চালিয়ে দিতাম ধানখেতের ওপর দিয়ে। সব ধানখেতেই এক বুকের বেশি জল, শুধু ধানের ডগাগুলো উঠে থাকে। জল যত বাড়ে ধানগাছ তত লম্বা হয়। প্রকৃতির একটা নিজস্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে। ধানের খেত একেবারে জলে ডুবে গেলে, যতক্ষণ ডগাগুলো ওপরে উঠে থাকে, ততক্ষণ ধানগাছ মরে না। ধানও পচে না। পশ্চিমবাংলায় খেতগুলো এমনভাবে জলে ডুবে যায় না, তাই ধান কিংবা পাটগাছগুলো তত লম্বাও হয় না। পাটগাছ লম্বা হলেই বেশি লাভ, বেশি পাট পাওয়া যায়, পাটকাঠি বা প্যাঁকাটিও বেশি লম্বা হয়, সেগুলি জ্বালানি হিসেবে কাজে লাগে। আর ধানগাছ বেশি লম্বা হলে খড় পাওয়া যায় বেশি।

সেই জলে ডোবা ধানখেতের ওপর দিয়ে দিব্যি নৌকো চলে। খালের ওপর দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই নৌকোযাত্রার রোমাঞ্চ অনেক বেশি। দেখা যায় অনেক ছোট-ছোট মাছ। ইচ্ছে করলে ধানের ডগা থেকে খপ খপ করে ধরা যায় সবুজ ঘাসফড়িং (ওদিকে এই সবুজ ঘাসফড়িং-এর নাম কয়া), মাঝে-মাঝে ফুটে থাকে শালুক ফুল (ওদিকে শালুকের নাম শাপলা)। মামাবাড়ির মাঝি নাদের আলি শেষ পর্যন্ত কথা রাখেনি, সে আমায় নিয়ে যায়নি তিন প্রহরের বিলে। তার বর্ণিত পদ্মফুলের মাথায় সাপ আর ভ্রমরের খেলা দেখা হয়নি আমার। কিন্তু ধানখেতের ওপর দিয়ে নৌকোয় যেতে যেতে আমি কয়েকবার দেখেছি। শালুক ফুল জড়িয়ে আছে হলদে-কালো ঢোঁড়া সাপ আর

ওপরে ফরফর করছে একরাশ ফড়িং।

ধানখেতের ওপর দিয়ে কোনাকুনি গেলে পথ অনেক সংক্ষিপ্ত হয়। তারপর মাদারিপুর শহর। সে শহর দেখে এমন কিছু মোহিত হওয়ার মতো নয়। মফস্সল শহর যেমন হয়। বাল্য বয়সেই আমি কলকাতা দেখেছি অনেকবার। গ্রামের অন্যান্য ছেলেদের তুলনায় আমি ছিলাম ক্যালকেশিয়ান। আমি চাঁদকে চাদ না বলে চাঁদই বলতে পারতাম। ওরা বলত হাসি, আমার উচ্চারণ হাঁসি। ওদিকে চন্দ্রবিন্দু একেবারে বরবাদ, কলকাতায় বেশি-বেশি।

আমাদের প্রধান দ্রষ্টব্য ছিল আড়িয়াল খাঁ নদী। কেউ বলত আড়িয়েল, কেউ বলত আড়িয়াল। এপার থেকে ওপার দেখা যেতে না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য? তবে শীত আর বর্ষায় তফাত ছিল অনেকখানি। বর্ষাকালেই ফুটে উঠত তার প্রকৃত রুদ্র রূপ। প্রচণ্ড জলের প্রবাহের মধ্যে যেন শোনা যেত একটা গর্জন! মাঝে-মাঝে ঝপাস-ঝপাস করে ভেঙে পড়ত পারের মাটি। একটু-আধটু মাটি নয়, অনেকখানি। একটু আগে দেখলাম, নদীর ধারে একটা আমগাছ, হঠাৎ লাফিয়ে-লাফিয়ে উঠতে লাগল ঢেউ। ওই আমগাছটার ওপর নদীর খুব লোভ হয়েছে। এরপর ওই আমগাছটাকে বাঁচাবার সাধ্য কারওর নেই। ঠিক যেন অতিকায় এক জলজ প্রাণীর মতো ঢেউ সেই গাছটাকে টেনে নিয়ে গেল, নদীতে ওলটপালট খেতে-খেতে সেই গাছটা চলে গেল কোথায়? সঙ্গে চলে গেল কয়েকটা পাখির বাসা। পাখিরা করুণভাবে ডেকে-ডেকে ঘুরতে লাগল জলের ওপর। হয়তো সেই গাছের বাসায় তাদের ছানা-পোনারা রয়ে গিয়েছিল।

সেই নদী সম্পর্কে আমার মনে ভয় ও সমীহ ছিল দুটি কারণে।

আমি বাচ্চা বয়স থেকেই সাঁতার জানি, জলকে ভয় পাই না, জল আমায় টানে। কোনও নদী দেখে ভালো লাগলেই নেমে পড়ি। পৃথিবীর বহু দেশের নদীর জলে মিশে আছে আমার শরীরের উত্তাপ। নদীর সঙ্গে প্রকৃত ভালোবাসা হয় অবগাহনে।

কিন্তু আমাদের আড়িয়াল খাঁ নদীতে সাঁতার কাটতে আমার ভয় লাগত। কোনওদিন সাঁতার দেওয়ার চেষ্টাও করিনি, কিন্তু একবার আমাদের নৌকো উলটে গেল। নৌকো চালাচ্ছিল আমার ছোট কাকা। আমার চেয়ে বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড়, অর্থাৎ তখনও বেশ কিশোরই। যত না ভালো নৌকো চালাত, তার থেকে কেরদানি দেখাত বেশি। তাই একবার নৌকোটা উলটেই গেল। আমি ভয়ে আঁকুপাঁকু করতে লাগলাম, যদিও পার থেকে বেশি দূরে নয়। অনায়াসে সাঁতরে পৌঁছনো যায়, তবু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, জলের তলা থেকে কোনও রহস্যময় প্রাণী আমার পা ধরে টেনে পাতালে নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত যে বেঁচে গিয়েছিলাম, তা বলাই বাহুল্য, অন্যদের সাহায্য ছাড়াই। কিন্তু আমার ভেতরের ভয়টা কেউ দেখতে পায়নি।

আর একবার আমরা তিন বন্ধু নদীর পাড়ে বসে গল্প করছি। বেশ উঁচু পাড়। আমরা চিনেবাদামের খোসা ছুড়ে-ছুড়ে ফেলছি জলে। হয়তো সেইটাই অন্যায় হয়েছিল। ফকিরের নামে নদী, তার গায়ে আজেবাজে জিনিস ছুড়ে ফেলা মোটেই উচিত নয়, নদীর রাগ হতেই পারে।

গল্পে-গল্পে আমরা তন্ময় হয়ে গেছি, হঠাৎ খেয়াল হল পেছনে কারা যেন খুব চেঁচামেচি করছে। ভয়ের স্বর। আমরা কারণটা বুঝতে পারলাম না। আমরা বসেই আছি। চিৎকারটা বাড়ছে, হঠাৎ আমার সেই ছোট কাকা দৌড়ে এসে আমার কাঁধটা খামচে ধরল, তারপর আমাকে প্রায় শূন্যে উড়িয়ে নিয়ে চলে এল বাজারের দিকে। বন্ধুরাও সঙ্গে-সঙ্গে ছুটছে। আসতে-আসতে দেখি আমরা যেখানে বসেছিলাম তার খানিকটা পেছনে মাটি এক জায়গায় কেটে হাঁ হয়ে গেছে, প্রায় একহাত ফাঁক, ভূমিকম্পে যেরকম ফাটল ধরে, অর্থাৎ একটা সাঙঘাতিক ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছিল। আর একটুক্ষণ বসে থাকলে অনেকখানি জমি আমাদের সঙ্গে নিয়ে নদীতে তলিয়ে যেত। ওই অবস্থায় প্রাণ বাঁচানো খুব কঠিন। আমরা দেখলামও, আমাদের চোখের সামনে সেই জায়গাটা প্রবল শব্দে ধসে গেল। নদীর পাড় থেকে অতখানি দূরে যে ফাটল ধরে তা আমরা জানতামই না। আমাদের ধারণা ছিল,

নদীর ধারের মাটি ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে। নদী একটু-একটু এগোয়। সাধারণ নদীতে সেরকম হয়, কিন্তু আমাদের আড়িয়াল খাঁ-এর তেজ যেন অসাধারণ।

এতক্ষণ এই নদীর শোভার কথা কিছু বলিনি। সুন্দর, কবিত্বময় কোনও দৃশ্যের কথা মনেও নেই। যে বিশেষ দৃশ্যটির স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে, সেটিও সুন্দর বটে, কিন্তু হৃদয়ের চেয়ে উদরের সম্পর্কই তার সঙ্গে বেশি।

আড়িয়াল খাঁ-র ইলিশ বিখ্যাত ছিল। পদ্মার ইলিশের মতোই। পূর্ববাংলা তথা বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীরই পদ্মা কিংবা মেঘনার সঙ্গে লতায়-পাতায় সম্পর্ক আছে। আড়িয়াল খাঁ পদ্মার দিকে। পাড়ে দাঁড়ালেই দেখা যায় অনেকগুলি জেলেনৌকোয় ইলিশ মাছ ধরা চলছে। একেকবার জাল উঠছে, তাতে ঝকঝক করছে ইলিশ।

আমরা দু-একবার আমাদের নৌকো নিয়ে মাঝনদীতে ইলিশ মাছ ধরা দেখতে গেছি। ইলিশ মাছ কখনও পাড়ের কাছে আসে না। মাঝনদী দিয়ে ঝাঁক বেঁধে যায়। একেকবার টানা জালে চার-পাঁচটা ওঠে। দুপুরের রোদ্দুরে মনে হয় যেন একেবারে রুপোর শরীর। দু-একবার লাফিয়েই নিথর হয়ে যায় ইলিশ। অর্থাৎ জ্যান্ত ইলিশ আমি দেখেছি বলে দাবি করতে পারি। রোদ্দুরের স্পর্শে ইলিশ বাঁচে না, তবে রাত্তিরবেলা জ্যোৎস্নার আলোয় ইলিশ মাছ ধরা পড়লে আরও বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে কি না আমি জানি না।

আমাদের সেই গ্রামের বাড়িও আর নেই। সেই নদীও আমাদের নেই, শুধু মনের মধ্যে ছবি আছে।

পাকিস্তানি আমলে একবারও আর ওদিকে যাইনি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকায় গেছি বহুবার। মাদারিপুরে অবশ্য যাওয়া হয়ে ওঠেনি। ঢাকার বন্ধুদের কাছে যখন আমার বাল্যকালের গল্প করি, তখন বুঝতে পারি, ওরা অনেকেই আড়িয়াল খাঁ নদীর নাম শোনেনি। দু-একজন নাম শুনলেও চোখে দেখেনি। বাংলাদেশে কত বড়-বড় নদী আছে, সেই তুলনায় এই নদীটা কিছুই না। আমাদের কলকাতাতে কজন কেলেঘাই নদীর নাম শুনেছে বা দেখেছে? আড়িয়াল খাঁ অনেকটা কেলেঘাইয়েরই মতো।

ঢাকায় একবার শুধু একজন বলেছিল, তুমি আড়িয়াল খাঁ নদীর কথা এত বলো। সে নদী আমি গত বছর দেখেছি। ওরকম, দুর্দান্ত কিছুই না। বেশি চওড়াও নয়। মাঝখানে চরা পড়ে গেছে, কেমন যেন মরা-মরা ভাব। তুমি এখন দেখলে চিনতেই পারবে না।

আমি আর দেখতেও চাই না। বাল্যকালের দেখা ছবিটাই থেকে যাক মনের মধ্যে।

॥ ৩ ॥

এ নদীর নাম বিদ্যা। সরস্বতী নামের এক পৌরাণিক নদীর অস্তিত্ব নিয়ে কত মাথা ফাটাফাটি তর্ক-বিতর্ক চলেছে, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামে সেই পুণ্যবাহিনী নদীর এখনও খোঁজ মেলেনি। এই সাদাসিধে বিদ্যা নামের নদীটির সঙ্গে লেখাপড়ার কোনও সম্পর্ক নেই, এর দু-তীরের বহু মানুষ নিরক্ষর, স্কুল-কলেজের সংখ্যা ভয়াবহ রকমের কম।

তবু এ নদীর নাম বিদ্যা কেন? শহর, গঞ্জ, গ্রামের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে তবু কিছু লেখালেখি হয়েছে, নদীগুলির নামকরণের কোনও ইতিহাস আমার চোখে পড়েনি। এমনকী পশ্চিম বাংলার সমস্ত নদীগুলির পরিচয় সমন্বিত কোনও বইও নেই, বাংলাদেশে কিন্তু আছে, সে বইয়ের নাম 'বাংলা দেশের নদনদী', এক ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক অনেক খেটেখুটে লিখেছেন।

কলকাতার অনেক মানুষই সুন্দরবন চেনে না। বাঙালিরা অনেকেই পালামৌ, হাজারিবাগ

যায় জঙ্গল দেখতে, এমনকী কান্‌হা কিংবা মানস কিংবা গির অরণ্যেও যায়। অথচ বাড়ির কাছে সুন্দরবন অনেকে সারাজীবনেও চোখে দেখেনি। অনেকে এখনও সুন্দরবনের নাম শুনলেই ভয় পায়, যেন সেখানে সব সময় গজরে-গজরে ঘুরছে বাঘ আর ফোঁস-ফোঁস করছে সাপ। অবশ্য কিছুকাল আগেও সুন্দরবনে ট্যুরিস্ট লজ কিংবা ভালো কোনও থাকার জায়গা ছিল না। এখন হয়েছে, লঞ্চে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়ার নিয়মিত ব্যবস্থাও আছে।

আমি যখন প্রথম যাই, বহু বছর আগে, তখন সুন্দরবন ছিল অনেকটাই গা ছমছমে দুর্গম, যদিও কলকাতা থেকে দূরত্ব তেমন কিছুই না।

ইস্কুলে পড়ার সময় থেকেই আমার ঘুরে বেড়ানোর নেশা। দু-তিন বন্ধুকে সঙ্গী করে চলে যেতাম এদিক-ওদিক। সুন্দরবনের দিকে আমাদের প্রথম অভিযান ক্যানিং পর্যন্ত, তখন কত বয়স হবে, পনেরো-ষোলো! সুন্দরবনে যাওয়ার কথা ভাবিনি, তখনও সংঘবদ্ধভাবে, বন্দুক-টন্দুক না নিয়ে বেড়াবার প্রশ্নই ছিল না সেখানে। আমাদের ক্যানিং বেছে নেওয়ার কারণটি বেশ মজার। কেউ একজন বলেছিল, ক্যানিং এমনই একটি বিচিত্র শহর, যেখানে দিনেরবেলা সবাই ঘুমোয় আর সারারাত জেগে থাকে। আমাদের সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত হৃদয়ে তখনও লেগেছিল রূপকথার রেশ। এরকম শহরের কথা তো রূপকথাতেই থাকে। ট্রেনের টিকিট কেটে মাত্র তিন ঘণ্টায় সেখানে পৌঁছনো যায়? এমন রহস্যময় জায়গায় যেতেই হবে।

ক্যানিং এখন বেশ উন্নত, আধুনিক হয়েছে, তখন ছিল নিতান্তই টিমটিমে মফস্‌সল। তখনও অবশ্য ক্যানিংকে বলা হত সুন্দরবনের সদর দরজা।

আমরা চারবন্ধু পৌঁছলাম সন্ধের পর। তখনও ইলেকট্রিক ট্রেন চালু হয়নি। কয়লার ইঞ্জিনে, টিকিস-টিকিস করে যেতে সময় লেগেছিল তিন ঘণ্টারও বেশি।

বলাই বাহুল্য, আমাদের সেই অভিযানের পরিণতি হয়েছিল খুবই হাস্যকর ও করুণ। খামোকা ক্যানিংয়ের লোক সারারাত জাগতে যাবে কেন? সেই লোকটি আমাদের ডাহা ধাপ্পা দিয়েছিল।

আসলে ক্যানিংয়ে একটি বেশ বড় মাছের বাজার আছে। সেই বাজারটাতেই সারারাত হ্যারিকেন আর হ্যাজাক বাতি জ্বলে। সন্ধের পর থেকে সেখানে মাছ ধরা নৌকোগুলো জড়ো হয় বিভিন্ন নদী ও সমুদ্র থেকে। মাছের আড়তদাররা সেই মাছ কিনে ভোর-ভোর চালান দেয় কলকাতায়। অর্থাৎ বাজারটিতেই শুধু জেলে, মাছওয়ালা, পাইকার ও ফড়েদের ভিড়। চতুর্দিকে আঁশটে গন্ধ। মিনিট পনেরোর বেশি সেখানে ঘোরা যায় না। ফেরার আর ট্রেন নেই, সারারাত আমাদের শুয়ে থাকতে হয়েছিল প্ল্যাটফর্মে, তেলেভাজা-মুড়ি খেয়ে। উপরন্তু খাদ্য ছিল মশার কামড়।

একটি দর্শনীয় ব্যাপার ছিল বটে। গঞ্জ এলাকায় অনেক খরিদ্দার, বিক্রেতা আর পাইকারদের ভিড় হয়, তাদের সঙ্গে থাকে কাঁচা টাকা, তাই প্রত্যেক গঞ্জেই থাকে বেশ্যাপল্লি। এর আগে আমরা ওরকম পল্লি দেখিনি। একটা বড় পুকুরের ধারে, একটা পিচ্ছিল কাঁচা রাস্তার ধারে সারি-সারি ঘর, প্রত্যেক দরজার সামনে হাতে লম্ফ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মুখে খড়ি মাখা স্ত্রীলোকেরা, খানিকটা দূর থেকে সেই দৃশ্য যেন কেমন অলৌকিক মনে হয়েছিল। ছবিটা মনে গেঁথে আছে।

সেইটুকুই যা রহস্য রোমাঞ্চ!

তার কয়েক বছর পরই সরাসরি সুন্দরবনে।

এবার অন্য একজন বন্ধুর সঙ্গে, যাদের একটা পারিবারিক খামারবাড়ি ছিল সুন্দরবন লাট এলাকায়। সেইজন্য ওই অঞ্চলটি তার চেনা।

এবারেও প্রথমে ট্রেনে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে চেপে গোসাবা। এই গোসাবাই সুন্দরবনের প্রাণকেন্দ্র, যদিও মোটেও শহর বলা যায় না। একটি সুদৃশ্য কাঠের বাড়ি শুধু দেখবার মতো। ওখানে নাকি একবার রবীন্দ্রনাথ এসে থেকেছিলেন কিছুদিন। কিন্তু তাঁর লেখায় সুন্দরবনের বিশেষ উল্লেখ নেই।

গোসাবার পাশেই বিদ্যা নদী। সেই নদীতে আর একটি ছোট লঞ্চে চেপে বন্ধুটির গ্রামে, সে গ্রামটির নাম মনে পড়ছে না। সেখানে খাতির-যত্ন পাওয়া গিয়েছিল ভালোই, টাটকা মাছ-মুরগি, কিন্তু সব মিলিয়ে হতাশই হয়েছিলাম। কোথায় সুন্দরবন? বাঘের ডাক শোনা তো দূরের কথা, কাছাকাছি কোনও জঙ্গলই নেই। এমনই একটা সাধারণ গ্রাম, চাষ-বাসের খেত, নদী-নালা। হিংস্র প্রাণী দেখেছিলাম একটি মাত্র, সে দেখাটি সত্যি রোমহর্ষক। অতীব হাস্যকরও বটে।

আমার জন্ম যদিও পূর্ববঙ্গের গ্রামে, কিন্তু একেবারে শিশু বয়েস থেকেই গ্রাম-বিচ্যুত এবং পুরোপুরি শহুরে হয়ে গেছি।

বন্ধুটির গ্রামে গিয়ে বহুকাল পরে পুকুরের জল খেতে হবে শুনে প্রথমে শিউরে উঠেছিলাম। এখন আমাদের সকলেরই স্বাস্থ্যজ্ঞান টনটনে। কলেরা-ভীতি, টাইফয়েড-ভীতি কার না আছে? গ্রামের পুকুরে বাসন মাজা, কাপড় কাচা সবই চলে, মানুষের সঙ্গে সঙ্গে গরু-মোষও চান করে, ভ্যান-গাড়িও ধোওয়া হয়। তবে শুনলাম, একটি বিশেষ পুকুরে স্নান, গরু-মোষ নামানো নিষিদ্ধ, তাকে বলে মিষ্টি পুকুর, তার জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গ্রামের সব লোক সেই জল খায়, আমার বন্ধুটিও, সুতরাং আমি আর আপত্তি না জানিয়ে ভাবলাম, দেখাই যাক না।

কিন্তু একটা ব্যবস্থা কিছুতেই আমার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হল না! মাঠে গিয়ে বড় বাথরুম (এটাই এখনকার ভব্য বাংলা)। গোটা গ্রামেই একটাও বাথরুম নেই। সবাই মগ হাতে নিয়ে মাঠেঘাটে যায়। মেয়েরা পর্যন্ত!

পশ্চিম বাংলার আরও অনেক গ্রামে আমি এরকম বাথরুমহীনতা দেখেছি। ওই ব্যাপারটি যেন একেবারেই অবান্তর। কোনও একটি গ্রামে সন্ধের সময় ঘণ্টাখানেক পুরুষ মানুষদের নদীর ধারে যাওয়া নিষেধ ছিল, সেই সময়টায় স্ত্রীলোকেরা ওই কাজ সারতে লাইন বেঁধে বসে পড়ত। কোনও মহিলার কি দিনেরবেলা বেগ আসতে পারে না, তারা কী করে?

আসলে প্রাইভেসি ব্যাপারটা সভ্যতার উচ্চস্তরের অঙ্গ। আমরা গ্রামে-গঞ্জে এখনও সেই উচ্চস্তরে উঠিনি। এমনকী প্রাইভেসি শব্দটির সঠিক বাংলা প্রতিশব্দও নেই।

তুলনামূলকভাবে পূর্ব বাংলায় এ ব্যাপারে সচেতনতা ছিল। সেখানকার গ্রামে স্নানের জন্য কোনও আব্রু থাকত না বটে, তা সেরে নেওয়া হত নদী বা পুকুরঘাটে, কিন্তু অতি দরিদ্রের বাড়িতেও বড় বাথরুমের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান থাকত।

প্রকাশ্যে মাঠে-ঘাটে মগ নিয়ে যাওয়ায় আমার ঘোরতর আপত্তি দেখে বন্ধুটি আমার জন্য চটপট একটি বাথরুম তৈরি করে দিল। অর্থাৎ বাড়ির পিছন দিকে একটা গর্ত খুঁড়ে পেতে দেওয়া হল কয়েকটা ইট, আর তালগাছের কয়েকটি পাতা কেটে গর্তটার চারপাশে পুঁতে দিতেই হয়ে গেল আব্রু। সেখানে গিয়ে সবেমাত্র বসেছি, অমনি তালপাতায় খড়মড় শব্দ হল এবং আমার চক্ষু চড়কগাছ। চিড়িক-চিড়িক করে জিভ বার করতে-করতে সেখান দিয়ে ঢুকছে একটা মস্ত মোটা সাপ! এর থেকে ভীতিজনক ও অস্বস্তিকর অবস্থায় আর কোনও মানুষ পড়েছে কি? আমার তখন পালাবারও উপায় নেই। শুনেছিলাম, একেবারে নড়াচড়া না করলে সাপ নিজে থেকে দংশন করে না, আমি নিশ্বাস বন্ধ করে কাঠের মূর্তি হয়ে রইলাম। সাপটা একটা মালগাড়ির মতো লম্বা, আসছে তো আসছেই, এবং মালগাড়ির থেকেও ধীর গতি এবং আঁকাবাঁকা, সর্পিল গতি যাকে বলে।

বলাই বাহুল্য, শেষ পর্যন্ত আমি সর্প দংশিত হইনি। সেটা নির্বিষ দাঁড়াস এবং বাস্তু সাপ শুনেও মোটেই সান্ত্বনা পাইনি, আর একদিনও থাকতে চাইনি সেখানে।

কিন্তু সেবারেই সুন্দরবন দেখা হয় সবিস্তারে।

গোসাবায় ফিরে এসে আরও দুটি গ্রামে গেলাম। রাঙাবেলিয়া ও সাতজেলিয়া। রাঙাবেলিয়া গ্রামটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এককালের বিপ্লবী ও পরবর্তীকালে গান্ধিবাদী সমাজসেবী পান্নালাল দাশগুপ্তের সংস্থা টেগোর সোসাইটি এখানকার স্থানীয় মানুষদের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

রাঙাবেলিয়ায় কিছু স্যানিটারি বড় বাথরুম পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছে। মাছ ধরা যাদের জীবিকা এবং সুন্দরবনের গহনে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যারা মধু সংগ্রহ করতে যায়, দারিদ্র্য ছিল তাদের চিরসঙ্গী, এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে অনেকটা। এর কাছাকাছি একটা গ্রামের নামই হয়ে গিয়েছিল বিধবা গ্রাম, সেখানে বিধবার সংখ্যা খুব বেশি, কারণ তাদের স্বামীরা জঙ্গলে মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে অকালে বাঘের মুখে প্রাণ দিয়েছে। এখন আর সচরাচর সেরকম ঘটে না।

রাঙাবেলিয়ায় তখন একজন আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, তাঁর নাম তুষার কাঞ্জিলাল। সেই সময়ে ইনি ছিলেন ওখানকার একটি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, এ ছাড়াও তিনি গ্রামের সঙ্গে বিশাল কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন। তার বিস্তৃত পরিচয় এখানে দেওয়া যাবে না। তুষারবাবুর আমন্ত্রণে আমি পরে বেশ কয়েকবার রাঙাবেলিয়ায় গিয়ে থেকেছি এবং ঘুরে দেখেছি।

তুষার কাঞ্জিলাল একজন চমৎকার লেখক। গ্রামের মানুষদের সুখ-দুঃখের কথা, একেকটি মুখ সামান্য কয়েকটি আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলার মতো ভাষার দক্ষতা ইদানীং আমি অন্য কোনও লেখকের মধ্যে দেখিনি। অনেক বঞ্চনা ও দীর্ঘসূত্রতার কথা তিনি লেখেন, কিন্তু তার মধ্যে তিক্ততা বা ক্রোধ প্রকাশ পায় না, থাকে শ্লেষ ও কৌতুক! এমন লেখার ক্ষমতা যদি আমার থাকত!

এই রাঙাবেলিয়াতেই বহুকাল ধরে রয়েছে কবি বিনোদ বেরা। সে একজন চাষি, নিজের হাতে সামান্য জমি চাষ করে কোনওক্রমে সংসার চালায়। 'দেশ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যাতেও ছাপা হয় তাঁর কবিতা। বিনোদ বেরা একজন আধুনিক কবি হিসেবে গণ্য, অথচ জমি চাষ করাই তাঁর জীবিকা, এমন দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত আর নেই।

রাঙাবেলিয়া থেকে সাতজেলিয়া গ্রামে যেতে হয়েছিল পায়ে হেঁটে, মাঝখানে খেয়া নৌকোয় নদী পেরিয়ে।

সাতজেলিয়া গ্রামটি বেশ বড়, সেটাই বলতে গেলে শেষ জনবসতি, তারপর বাঘের এলাকা। সাতজেলিয়াতে যার বাড়িতে আতিথ্য নিয়েছিলাম, সেও একজন আলাদা ধরনের মানুষ। সে দক্ষিণ কলকাতার একটি সম্পন্ন পরিবারের সন্তান, লেখাপড়া অনেকখানি শিখে ভালো চাকরি করছিল। অর্থাৎ সহজভাবে নিরুদ্বেগ, সফল জীবনযাপনে তার কোনও বাধা ছিল না। কিন্তু হঠাৎ চাকরি-বাকরি ছেড়ে সে সাতজেলিয়ায় চলে এসে চাষবাস শুরু করে। এখানে তাদের কিছু পৈতৃক জমি ছিল এবং বাথরুম সমেত একটি ছোট পাকা বাড়ি, সে আধুনিক প্রথায় চাষ শুরু করে, যাতে গ্রামের অনেক মানুষের উপকার হয়, নিজেরও জীবিকার সংস্থান হয়।

সুন্দরবনের চাষ মানে অনিশ্চয়তার সঙ্গে সর্বক্ষণ লড়াই। প্রকৃতি এখানে বিমুখ, প্রবল ঝড়বৃষ্টি তো আছেই, নোনা জল জমিতে ঢুকে পড়লে দু-এক বছর সে জমি নিষ্ফলা হয়ে যায়। আমার সেই বন্ধুটি দাঁতে দাঁত কামড়ে সেই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী এই সন্ধের পর অন্ধকারে ডুবে থাকা (বিদ্যুৎ নেই) গ্রামে এসে থাকতে রাজি হয়নি, তা ছাড়া ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে লেখাপড়া করাবার জন্য কলকাতাতেই রয়ে গিয়েছিল। কলকাতায় বন্ধুটিকে আগে শৌখিন প্যান্টশার্ট পরতে দেখেছি, গ্রামে সে লুঙ্গি এবং গেঞ্জি পরে নদীর ঘাটে বসে স্থানীয় ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিত অনায়াসে। সিগারেটের বদলে বিড়ি ধরেছিল।

এবার নদীর কথা।

ক্যানিং থেকে আমরা লঞ্চে যে নদীবক্ষে যাই, সে নদীর নাম মাতলা। সেটি বেশ বড় নদী। মাতলার তুলনায় বিদ্যা নদীর দৈর্ঘ্য বেশি নয়। কিন্তু তেজ আছে।

এই বিদ্যা নদীতে নৌকোয় করে ঘুরেছি অনেকবার। ভোরবেলা যাত্রা করে সারাদিনের জন্য বেরিয়ে পড়া। সন্ধের আগেই ফিরে আসা উচিত, তাও দুয়েকবার হয়নি।

সঙ্গে চাল, ডাল ও অন্যান্য খাদ্য পানীয়, নৌকোতেই রান্না-বান্না। এই নদী ধরে একদিকে গেলে সমুদ্রের মুখে পড়া যায়, অন্যদিক দিয়ে চলে যাওয়া যায় বৃহৎ ও দুর্দান্ত রায়মঙ্গল নদীতে, তার পাশেই বাংলাদেশের সীমান্ত। বাংলাদেশের যমুনা নামে একটি নদী এসে মিশেছে রায়মঙ্গলে। জলের ওপর সীমারেখা টানা যায় না, তাই এখানকার নৌকোগুলোতে কোনওটায় ওড়ে ভারতের পতাকা, কোনওটায় বাংলাদেশের।

বিদ্যা নদী দিয়ে যেতে-যেতে একসময় কোনও জনবসতি চোখে পড়ে না, শুধু জঙ্গল। সুন্দরবনে বড় গাছ বা মহিরূহ প্রায় নেই-ই বলতে গেলে, সব গাছই বেঁটে-বেঁটে, সুঁদরি বা সুন্দরী নামের গাছের জন্যই এ জঙ্গলের এমন নামকরণ, কিন্তু আক্ষরিক অর্থে কোনও মিল নেই, এ জঙ্গল সুদৃশ্য নয়। মানুষখেকো বাঘের নিবাস বলেই এ জঙ্গলের দিকে তাকালে দিনেরবেলাও গা ছমছম করে। এবং সেটাই এ জঙ্গলের আকর্ষণ।

এখানকার বাঘের দিন বা রাত্রি নেই। এ বাঘ নিয়ে একেবারেই ছেলেখেলা চলে না। কৌতুকের ছলে কোনও শহুরে পর্যটক এখানে এসে নৌকো থেকে একবার জঙ্গলের ধারে নেমেছে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে বাঘ এসে তাকে ঘাড় কামড়ে ধরে নিয়ে গেছে, এরকম ঘটনা গল্প হলেও সত্যি। নদীর ধারে-ধারে দুরকম গাছ দেখা যায়, ম্যানগ্রোভ আর হেঁতাল। চাঁদ সদাগরের হেঁতালের লাঠির সঙ্গে এই হেঁতালের কোনও মিল নেই, ঝোপ ধরনের, পাতাগুলিতে সবুজের মধ্যে কিছুটা হলদের আভাস, বাঘের পক্ষে এর মধ্যে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা আদর্শ, কামুফ্লাজ যাকে বলে। শোনা যায়, নদী বা খাঁড়ির মধ্যে নৌকো চলার সময় বাঘ আড়াল থেকে একেকটা নৌকো অনুসরণ করে আসে মাইলের পর মাইল। মানুষের সামান্য দুর্বলতার জন্য অপেক্ষা করে।

দিনেরবেলা চলন্ত নৌকোর ওপরে যে বাঘ লাফিয়ে পড়ে না, তার কারণ, বাঘের স্বভাবই এই, সে মুখোমুখি মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হতে চায় না। সুন্দরবনের সব বাঘই মানুষকে আক্রমণ করে অতর্কিতে পিছন দিক থেকে। ঘাড়টা প্রথমে কামড়ে ধরে মট করে ভেঙে দেয়। এই জন্য অনেক কাঠুরে ও মধুসংগ্রহকারী জঙ্গলে ঢোকার সময় মাথার পিছনে একটা মানুষের মুখ আঁকা মুখোশ বেঁধে নেয়, যাতে বাঘ মনে করে মানুষটা তার দিকেই তাকিয়ে আছে। এতে আক্রমণের সংখ্যা অনেক কমে গেছে।

রাত্তিরে মাঝনদীতে নৌকো বেঁধে রাখাও খুবই বিপজ্জনক। মিশমিশে অন্ধকারে বাঘ প্রায় নিঃশব্দে নদী সাঁতরে এসে নৌকা থেকে মানুষ তুলে নিয়ে গেছে, এরকম দৃষ্টান্ত আছে। এমনও হয়েছে, নৌকো থেকে একজন লোককে বাঘে নিয়ে গেল, অন্যরা তা টেরও পেল না।

আমরাও একবার প্রায় সেরকম বিপদের মুখে পড়েছিলাম।

বিদ্যা নদী ধরে যেতে-যেতে একসময় মনে হয়, পৃথিবীতে জঙ্গল ছাড়া কিছু নেই। মাঝে-মাঝে ছোট ছোট দ্বীপ আর অজস্র খাঁড়ি। আমি দেশে বা বিদেশের জঙ্গলে একাধিকবার বাঘ দেখলেও সুন্দরবনে কখনও স্বচক্ষে বাঘ দেখিনি। এখানকার লোকে বলে, যে বাঘের দেখা পায়, সে আর সেই বাঘের রূপ বর্ণনা করার জন্য বেঁচে থাকে না। তবে সুধন্যখালিতে বাঘের টাটকা পায়ের ছাপ কিংবা সজনেখালিতে সদ্য বাঘের কামড়ে অর্ধমৃত একজন মানুষকে দেখেছি। আর দেখেছি কুমির। খুব ছোটবেলায় স্টিমারে যেতে যেতে পদ্মার চরে কুমিরদের রোদ পোহাতে দেখেছিলাম। অনেককাল পরে সেরকম দেখেছি সুন্দরবনে।

প্রথমবার বিদ্যা নদীতে ভ্রমণে কোনও ঘটনা ঘটেনি। শুধু দৃশ্য অবলোকন ও নিজেদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ হয়েছিল। তাই দ্বিতীয়বার ভয় ভেঙে গিয়েছিল অনেকখানি।

এবারে গোসাবা থেকে যাচ্ছিলাম মাধবকোটির দিকে। তাড়াহুড়ো নেই, মাঝি দুজন নৌকো চালাচ্ছিল ধীরে-ধীরে। জোয়ার-ভাটার হিসেব করে একবার থামতেও হয়েছিল লোকালয় দেখে। নৌকোতেই রান্না হয়েছিল খিচুড়ি, জেলেদের নৌকো থেকে কেনা হয়েছিল চিংড়ি ও তোপসে মাছ।

এমন টাটকা মাছের স্বাদই আলাদা, খিচুড়ি একটু-একটু করে নিতে-নিতে ঠিক কতটা খাচ্ছি বোঝা যায় না, সুতরাং গুরুভোজন হয়ে গিয়েছিল।

শীতকাল, রোদ্দুর যেমন আরামের, তার সঙ্গে হাওয়া দিলে ঘুমও এসে যায়। খানিকটা দিবানিদ্রার পর জেগে উঠে দেখি, আকাশ অন্ধকার হয়ে গেছে। এত তাড়াতাড়ি সন্ধে হওয়ার কথা নয়, শীতের আকাশ হঠাৎ ছেয়ে গেছে মেঘে।

তার ওপরে, মাঝিদের মুখে একটা কথা শুনে পিলে চমকে গেল।

মাঝিরা পথ হারিয়ে ফেলেছে।

এখানে নদীর গায়ে-গায়ে অন্য নদী, প্রচুর উপনদী, শাখানদী, মাঝিরা কী করে নিশানা ঠিক রাখে কে জানে। হয়তো আকাশের সূর্য দেখে। এখন সূর্য অদৃশ্য। পূর্ব-পশ্চিমও বোঝার উপায় নেই।

ঝড়-বৃষ্টির আশঙ্কা তো আছেই, আমরা ফিরব কোন দিক দিয়ে? মাঝি দুজন রীতিমতো ঘাবড়ে গেছে।

রাত্তিরবেলা সব নদীই রহস্যময়ী হয়ে যায়। দুদিকের কিছুই দেখা যায় না বলে মনে হয় বিদ্যা নদী যেন অনেক চওড়া হয়ে গেছে। আলো দেখলে গ্রামের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়, আলো না থাকলেই জঙ্গল। কোথাও এক বিন্দু আলো নেই বলে কোনও পাড়ের দিকে যেতে মাঝিরা ভরসা পাচ্ছে না।

প্রথম সমস্যা দেখা দিল পানীয় জলের। আমরা হিসেব করে জল এনেছিলাম, খিচুড়ি খাওয়ার পর তেষ্টা বেড়ে যায়, সব জল ফুরিয়ে গেছে। আমরা নদীর বুকে ভাসছি, তবু যেন মরুভূমি। বিদ্যা নদীর জল এক আঁজলা মুখে দিয়ে দেখেছি, অসহ্য রকমের নোনতা, বমি এসে যায়।

বাঘের ভয়ে অন্ধকার তীরে তরী ভেড়ানো যাবে না। মাঝনদীতেও কিন্তু রাত্তিরবেলা স্বস্তি নেই। এইসব সীমান্ত অঞ্চলে ডাকাতের উৎপাত লেগেই আছে। ডাকাতরা কোনও সীমারেখা মানে না। এখানকার ডাকাতরা পালিয়ে যায় বাংলাদেশে, ওখানকার ডাকাতরা লুকোয় এসে পশ্চিম বাংলায়। এখানকার ডাকাতরা এমনই ছ্যাঁচড়া যে জামা-প্যান্ট কেড়ে নেওয়ার জন্যও মানুষ খুন করে। এসব ঘটনা কোনওদিন কাগজে ছাপা হয় না। সেইজন্যই অন্য কোনও নৌকো দেখলে সাহায্য চাইতেও ভয় হয়। অন্য কোনও নৌকো অবশ্য একটাও দেখা যায়নি। আকাশে মেঘ জমলে সুন্দরবনের নদীতে বেরুতে ডাকাতরাও ভয় পায়। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নৌকোটা চলছে তো চলছেই। আমরা সবাই চুপচাপ, যেন নিরুদ্দেশের যাত্রী। কোথাও থামার উপায় নেই, অথচ কোনদিকে যাচ্ছি তাও জানি না।

এই রকম সময়ে বিপদ যেন ভারসাম্যে দোলে। ঝড় উঠলে নৌকো উলটে কুমিরকামটে ভরা নদীতে পড়ব। নৌকো পাড়ে লাগলে সেখানে কটা হিংস্র বাঘ অপেক্ষা করে আছে কে জানে। জলে কুমির, ডাঙায় বাঘের একেবারে প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঝড় না উঠলে ডাকাতরা বেরিয়ে পড়তে পারে, তা হলে তো সোনায় সোহাগা!

আবার একটুর জন্য বেঁচে যাওয়াও যায়।

সবেমাত্র বাতাসের বেগ প্রবল হচ্ছে, এমন সময় দূরে একটা আলোর বিন্দু দেখে আমরা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। আলোর বিন্দুটি সঞ্চরণশীল নয়, অর্থাৎ ওখানে বসতি আছে। জোরে-জোরে নৌকো চালানো হল সেদিকে।

আলোর বিন্দু একটিই মাত্র, কাছাকাছি গিয়েও অন্য আলো দেখা গেল না, তার মানে ওখানে গ্রাম নেই। আরও কাছে যেতে কেউ একজন, সেই আলোর দিক থেকে একটা হুঙ্কার ভেসে এল, কে আসে? তোমরা কারা, পরিচয় দাও!

সেটা একটা ফরেস্ট চেকপোস্ট। জায়গাটার নাম দত্তের বাগান। রাতে নৌকো চালানোর মতো ছেলেমানুষি হঠকারিতার জন্য সেখানকার বন্দুকধারী রক্ষীরা আমাদের প্রচুর ধমক দিল।

তবে, রাতটার মতো আমাদের আশ্রয় ও আতিথ্যও দিয়েছিল, তাদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

॥ ৪ ॥

প্রথমে একটা ছোট্ট স্বপ্নের কথা বলি। প্রতিদিনই আমরা অনেক স্বপ্ন দেখি, অধিকাংশ স্বপ্নই পরে আর মনে থাকে না, ধূপের গন্ধের মতো মিলিয়ে যায়। কোনও-কোনওটি সকালে জেগে ওঠার পরেও কিছুক্ষণ মনে থাকে, দুয়েকটা বেশ স্থায়ী দাগ রেগে যায় স্মৃতিতে। এই স্বপ্নটা বেশ মনে আছে।

আমি একটি নদীতে নামছি একটু-একটু করে। প্রথমে হাঁটু জল, তারপর কোমর পর্যন্ত, তারপর বুক, আমি কিছুই পরে নেই, একেবারে নগ্ন। দিনেরবেলা নয়, রাত্তিরবেলা, আকাশে চাঁদ জ্যোৎস্না ছড়াচ্ছে। তারপর দেখলাম দূরে বড়-বড় পাহাড়, রাত্তিরবেলাও জ্যোৎস্নায় চকচক করছে শিখরের তুষার। সাঁতার কাটার বদলে আমি আস্তে-আস্তে ডুবে গেলাম সেই নদীর গভীরে, তারপরই দূরে কামানের গোলার মতো কীসের যেন প্রচণ্ড শব্দ হল।

ব্যাস, এখানেই স্বপ্নের শেষ।

স্বপ্নের অনেকে-অনেকরকম ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। অধিকাংশই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। এককেটা স্বপ্ন নিজের কাছেই একটা বাঁধা হয়ে থাকে। কলকাতা শহরে, বিছানায় শুয়ে হঠাৎ আমি একটা নদীতে ডুব দেওয়ার স্বপ্ন দেখলাম কেন? দিনেরবেলা নানান কাজে ব্যস্ত থেকে আমি তো কোনও নদীর কথা একেবারে চিন্তা করিনি। তা হলে কি এটা কোনও প্রতীক? এ আমার মৃত্যু-বাসনা? কিন্তু কোনও নদীতে ডুবে মরা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পূর্ববঙ্গে জন্ম, আমি বেশ ভালোই সাঁতার জানি।

তা হলে কি অতৃপ্ত বাসনা? তাই-ই বা কী করে হবে, আমি জীবনে বহুবার বহু নদীতে ডুব দিয়েছি, এমনকী বিশ্ববিখ্যাত নদী ড্যানিয়ুবেও সাঁতার কেটেছি।

সে যাই হোক, স্বপ্নের ব্যাখ্যা থাক। স্বপ্নে আমি কোন নদীটাকে দেখলাম? রাত্তিরবেলা কোনও পাহাড় ঘেরা নদীতে কখনও স্নান করিনি, সুতরাং এটা আমার পূর্বস্মৃতি হতে পারে না।

স্বপ্নে অবশ্য আমরা অনেক অদৃষ্টপূর্ব জায়গা দেখি। মনে-মনে অনেক নতুন দৃশ্য তৈরি করি। তবু অনেক ভেবে-ভেবে একদিন মনে হল, আমার স্বপ্নে দেখা নদীটি একেবারে কল্পিত নয়, অনেকটা পহেলগাঁও-এর লিদার নদীর মতো।

লিদার বা লিদ্দার বা লিডার নদীটি অনেকের কাছেই পরিচিত। কাশ্মীরের ভ্রমণকারীরা পহেলগাঁও যান। আর অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের বারবার এই নদীকে প্রত্যক্ষ করতে হয়। কাশ্মীর বাঙালিদের খুবই প্রিয় জায়গা, এখন অনেক বছর ধরে অবশ্য সেখানে যাওয়া বিপজ্জনক, কখন উগ্রপন্থীদের গুলিতে প্রাণটি যাবে তার ঠিক নেই। আবার কবে ওই স্বর্গসম উপত্যকায় সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করা যাব কে জানে! তাই লিদার নদীর তীরের একটি অভিজ্ঞতার কথা লিখতে ইচ্ছে হল। এর সঙ্গে আমার ওই স্বপ্নের অবশ্য কোনও যোগ নেই। লিদার নদীর জলে যেমন তীব্র স্রোত, তেমনই ঠান্ডার কামড়, ওখানে স্নান করতে কখনও ইচ্ছে হয়নি।

পহেলগাঁওতে আমি গেছি দুবার।

প্রথমবার গিয়েছিলাম বয়েজ স্কাউটদের সঙ্গে, সব মিলিয়ে বোধহয় পঞ্চাশজন, সকলেরই পরনে খাকি হাফপ্যান্ট ও সাদা শার্ট। দলবেঁধে ঘোরার মজা আছে ঠিকই, অনেক হইচই ও আমোদ হয়, কিন্তু নিসর্গ উপভোগ করা যায় না। সেবারে রিজার্ভ বাসে করে ঘোরা, চেঁচিয়ে গান গাওয়া, লুকিয়ে চুরিয়ে ব্র্যান্ডি পান, এই সবই মনে আছে, নদীর সঙ্গে কোনও সম্পর্ক স্থাপনের স্মৃতি নেই।

দ্বিতীয়বার গিয়েছিলাম স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে, তিনজনের ছোট্ট দল, কোনও কারণে সেবার পহেলগাঁওতে তখন ভিড়ও ছিল না। ঠিক করেছিলাম, ওখানে নিরিবিলিতে কয়েকটা দিন কাটাব।

পহেলগাঁওতে প্রচুর হোটেল আছে, আমাদের সাধ হল তাঁবুতে থাকার। হোটেলের ঘর অনেক আরামদায়ক, কিন্তু স্বাতী অতি রোমান্টিক, তাঁবুতে রাত্তিরযাপনই তার বেশি পছন্দ। আমাদের ছেলে পুপলুর তখন ছ-সাত বছর বয়স। তার কাছেও তাঁবুতে থাকা বেশ একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো।

অনেক তাঁবু ভাড়া পাওয়া যায়। দোকানের লোকরাই তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে যায়, একখানা শোওয়ার ঘর, থালা-গ্লাস, চায়ের কাপ-ডিশ, সব কিছুর জন্যই আলাদা-আলাদা ভাড়া। আমরা অবশ্য রান্নাবান্নার ঝামেলার মধ্যে যাইনি। দু-বেলা খেয়ে আসতাম শহরের দোকান থেকে। রাত্তিরবেলা খেয়েদেয়ে তাঁবুতে ফেরাটাই ছিল সবচেয়ে কষ্টের। পহেলগাঁও দিনেরবেলা চমৎকার, সন্ধের পর থেকেই খুব শীত পড়তে শুরু করে, রাত আটটা-নটার সময়ই বাইরে থাকলে ঠান্ডা বাতাস হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। হু হু হু হু করতে করতে স্বামী, স্ত্রী ও সন্তান একসঙ্গে দৌড় লাগাতাম তাঁবুর দিকে।

তাঁবুতে ফেরার পরেও কনকনে বিছানায় শোওয়াও যেন এক শাস্তি। বিছানা গরম করার জন্য তার ওপর আমরা লাফালাফি করতাম কিছুক্ষণ।

একটা ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হত। পহেলগাঁও আসবার আগে শ্রীনগরের অদূরে নাগিন হ্রদের এক বজরাতেও আমরা কাটিয়েছি কয়েকটি দিন। সেখানে একদিন পুপলুকে প্রায় অবধারিত মৃত্যুর কাছ থেকে ছিনিয়ে আনা হয়েছে কোনওক্রমে। আশপাশের কয়েকটি বজরায় থাকত কিছু সাহেব-মেম। তাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পুপলুর ভাব হয়ে গিয়েছিল, তাদের সঙ্গে খেলা করত। এক বজরা থেকে আরেক বজরায় লাফিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে পুপলু হঠাৎ জলে পড়ে যায়। একে তো জল দারুণ ঠান্ডা, তা ছাড়া তলাটা ঝাঁঝিতে ভরা। ওই ঝাঁঝিতে পা জড়িয়ে গেলে আর কিছুই করার থাকে না। আমি আর স্বাতী তখন বজরার ছাদে বসে এক ফেরিওয়ালার কাছে রংবেরঙের পাথর যাচাই করছি। চেঁচামেচি শুনে উঁকি মেরে দেখি পুপলু জলের মধ্যে খাবি খাচ্ছে। দুয়েক মিনিটের মধ্যে কিছু করতে না পারলে তার বাঁচার আশা নেই। আমি উঠে দাঁড়িয়ে লাফাবার জন্য গায়ের কোট খুলে ফেললাম। যদিও এক ঝলকের জন্য মনে হল, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়লে আমি নিজেই ঝাঁঝির মধ্যে গেঁথে যাব, পুপলুকে তো ধরতে পারবই না, নিজেকে বাঁচানোই তখন কঠিন হবে। তবু, নিজের সন্তানকে উদ্ধার করার জন্য কিছু একটা তো করতেই হবে, সে সময় যুক্তিবোধ কাজ করে না। আমি লাফ মারার জন্য উদ্যত হয়েছি, ঠিক সেই মুহূর্তে কোথা থেকে এক শিকারাওয়ালা এসে ঝুঁকে পুপলুর চুলের মুঠি ধরে তুলে এনে আমাদের চিরকৃতজ্ঞপাশে আবদ্ধ করেছিল।

পহেলগাঁওতে এসে সেইজন্যই সে দুরন্ত বালককে সব সময় চোখে চোখে রাখতে হয়। কোনওক্রমে লিদার নদীর জলে পড়লে তাকে কেউ উদ্ধার করতে পারবে না। নদীর মধ্যে বড় বড় পাথর, তীব্র স্রোত, স্রোতের টানে কোনও পাথরে গিয়ে পড়লেই মাথাটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে।

তবু, রাত্তিরবেলা তাঁবুতে শুয়ে নিস্তব্ধতার মধ্যে নদীর অবিরাম কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাওয়াও এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

লিদার নদীটি তেমন কিছু বড় নয়, যদিও দুটি নদী মিলে এখানে একটি নদী হয়েছে। কোলহাই হিমবাহ আর শেষনাগ থেকে বয়ে এসেছে দুটি ধারা, পাহাড় থেকে নেমে এসে মিলিত হয়েছে এই উপত্যকায়। অনেকে বলে লিদারের আদি নাম নীলগঙ্গা। পহেলগাঁও থেকে অনন্তনাগ পর্যন্ত বয়ে গিয়ে এই নদী মিশে গেছে ঝিলম নদীতে।

আমরা দিন চারেক চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম পহেলগাঁওতে। অধিকাংশ সময় বসে থাকতাম নদীর ধারে। তাঁবুতে কিছু রান্না না করলেও চা তৈরির ব্যবস্থা ছিল, ফ্লাস্কে ভরা থাকত চা। পুপলু আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে পাথর নিয়ে খেলা করত। অবিরাম ঘোরাঘুরি কিংবা দর্শনীয় স্থানে যাওয়াব

ব্যাকুলতার বদলে কোনও একটা জায়গায় স্থির হয়ে কয়েকদিন বসে থাকলেই সেই জায়গাটির সৌন্দর্য সঠিক উপলব্ধি করা যায়।

আরও কয়েকদিন হয়তো থাকতাম, কিন্তু অমরনাথের তীর্থযাত্রীদের ভিড় শুরু হয়ে গেল। সুন্দরের লীলাভূমিতে বেশি মানুষের ভিড় আমার পছন্দ হয় না, তীর্থ দর্শনেরও কোনও লোভ নেই। অনেকেই হয়তো শুনলে বিশ্বাস করবে না একবার পূর্ণকুম্ভের স্নানের সময় আমি এলাহাবাদের সঙ্গমের কাছে এক তাঁবুতে টানা চোদ্দো দিন ছিলাম, কিন্তু একবারও নদীত নেমে স্নান করিনি। ওই ধরনের পুণ্য অর্জনে আমি বিশ্বাস করি না। যে কোনও নদীতে ডুব দিলেই পুণ্য হতে পারে, শুধু-শুধু এক লক্ষ মানুষের সঙ্গে গাদাগাদি করে ওই সঙ্গমে গিয়ে ডুব দিতে হবে কেন?

অমরনাথের পথে, চন্দনবাড়ি পর্যন্ত আমরা ঘোড়ায় চেপে ঘুরে এসেছি একদিন। পুপলুর রোমাঞ্চটাই আমরা উপভোগ করেছি বেশি। ওই বয়েসের ছেলেরা ঘোড়ায় চাপলেই নিজেকে রাজপুত্র বা সেনাপতি-পুত্র বলে ভাবে। হাতে থাকে কাল্পনিক তলোয়ার। পুপলু তখন রবীন্দ্রনাথের 'বীরপুরুষ' কবিতাটা মুখস্থ বলতে পারত।

চন্দনবাড়ির কাছে দেখেছি, লিদার নদীর জল প্রায় দুধের মতো সাদা। নদীর সঙ্গে আমরা নারীর তুলনা দিতেই পছন্দ করি। কিন্তু লিদার নদীকে দেখে আমার দুর্দান্ত প্রাণশক্তি সম্পন্ন এক কিশোর বলে মনে হয়েছে।

একদিন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল। দুপুরবেলা নদীর ধারে একটা পাথরে হেলান দিয়ে শুয়ে আছি আমি। রোদ্দুর একেবারে নরম মখমলের মতো। এক সময় শনশন করে হাওয়া বইতে লাগল। শীত সবসময় বাতাসের সওয়ার হয়ে আসে। বরফ পড়লেও তেমন শীত করে না, বাতাস বইলেই কাঁপুনি শুরু হয়।

বেশি গরম জামা আনিনি, সব রয়েছে তাঁবুর মধ্যে। সেখান থেকে সোয়েটার-শাল নিয়ে আমার জন্য স্বাতী উঠে দাঁড়িয়েই, এই এই বলে চিৎকার করে উঠল।

স্বাতীর গলায় জড়ানো ছিল একটা চিত্র-বিচিত্র সিল্কের স্কার্ফ, সেটা হাওয়ায় উড়ে গেছে।

পাছে পুপলু সেটা ধরতে যায়, তাই এক হাতে তাকে নিষেধ করে আমি ছুটে গেলাম। স্কার্ফটা সুতো কাটা ঘুড়ির মতো দুলতে-দুলতে উড়ছে। স্কুল বয়সে আমার খুব ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা ছিল, রাস্তায় অনেকবার ভো-কাট্টা ঘুড়ি ধরার জন্য ছুটেছি। তখন দিকবিদিক জ্ঞান থাকে না, অনেক ছেলে এই অবস্থায় গাড়ি চাপা পড়ে, আমারও দুয়েকবার সেরকম সম্ভাবনা হয়েছিল।

এবারেও সেরকম হল। স্কার্ফটা যে নদীর দিকে উড়ে যাচ্ছে আমি তা খেয়াল করলাম না। আমার চোখ ওপর দিকে। পিছন থেকে স্বাতী এবং আরও কয়েকজন লোক চিৎকার করছে, আমি শুনতে পাচ্ছি না। একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে আমি পড়লাম জলে।

না, ততটা জলে নয়, যাতে স্রোতে আমাকে টেনে নিয়ে যেতে পারে। কেউ এসে ধরবার আগেই আমি উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলাম। তবে, অন্ধের মতো ওইভাবে ছুটলে, পাথরে ধাক্কা না খেলে, আমার কপালে ঘোর বিপদ ছিল। স্কার্ফটা জলে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

পাথরটাই আমাকে বাঁচাল? কিংবা নদী। আমি জানি, কোনও নদীই কোনওদিন আমাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাবে না।

॥ ৫ ॥

'সুরভি' নামে কেরলের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম কোচিনে। বেশ বড় রকমের সাহিত্য সমাবেশ, সারা ভারতের প্রত্যেক ভাষা থেকে নির্বাচিত লেখক প্রতিনিধিদের সংখ্যা প্রায়

দেড়শো হবে। এরকম গ্যাঞ্জামে সাহিত্যের কোনও সুসার হয় না, পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হয়, অচেনা লেখকদের সঙ্গে মেলামেশা হয়, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হয়। আমার কাছে অতিরিক্ত আকর্ষণ অদেখার দর্শন।

সকাল-দুপুর-সন্ধেতে অবিরাম কবিতাপাঠ, সাহিত্য আলোচনা ও ভাষণ, এত সব কে শোনে? বেশিক্ষণ বসে থাকলে মাথা ধরে যায়। একসঙ্গে এত লেখক-লেখিকাকে সামলাতে উদ্যোক্তারা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন, সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের মেজাজ-মর্জিও কম বিচিত্র নয়। চারদিন থাকার কথা, তার মধ্যে প্রথম দুদিন কেটে যাওয়ার পর বোঝা গেল, কর্মকর্তারা আমাদের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়ে দেখাবার বিশেষ ব্যবস্থা করতে পারেননি। তা হলে কি কাঠের চেয়ারে বসে চারদিন ধরে বাইশটা ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয় করেই ফিরে যেতে হবে? আমার মন ছটফট করছিল।

সম্মেলন স্থান থেকে চুপিচুপি সরে পড়ে কাছাকাছি দু-একটি জায়গা ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু গাড়ির বড় অনটন। গাড়ি ছাড়া যাওয়া যাবে না। উদ্যোক্তাদের কাছে ফাঁকি দিয়ে ভ্রমণের জন্য গাড়িও চাওয়া যায় না। সেই সময় আবার এর্নাকুলমে কী একটা রাজনৈতিক সমাবেশ চলছিল, সেই রাজনৈতিক দল সেখানকার অধিকাংশ ভাড়ার গাড়ি দখল করে নিয়েছিল।

আমাদের থাকার ব্যবস্থা বেশ একটি মনোরম স্থানে। একটি বিশাল হ্রদের মতো জলাভূমি, চারদিকে গাছপালা, তারমধ্যে একটি বিশাল হর্ম্য। সেটি কোনও এক কারখানার গেস্ট হাউস। সত্যিই বিশাল, ঘরের সংখ্যা শতাধিক, প্রত্যেকটি আরামপ্রদ ঠান্ডা ব্যবস্থা সমেত, বিদেশি অতিথিরা এসে এখানে থাকেন। অতি সুন্দর জায়গা হলেও যাতায়াতের খুব অসুবিধা। ইচ্ছেমতো বেড়িয়ে আসা যায় না, হেঁটে কাছাকাছি জনপদে যেতেও ঘণ্টাখানেক লাগে। সকালে-বিকালে উদ্যোক্তারা বাস পাঠিয়ে আমাদের নিয়ে যান, ফিরিয়ে দেন। আমরা স্কুলের বাচ্চার মতো অধীরভাবে সেই বাসের অপেক্ষা করি, একটা বাস এলে অনেক বয়স্ক, গম্ভীর চেহারার লেখক-লেখিকাও সত্যিই ছেলেমানুষের মতো দুদ্দাড় করে দৌড়ে তাতে উঠে জায়গা দখল করে নেন। বাকিরা হতাশভাবে অপেক্ষা করেন পরবর্তী বাস বা গাড়ির জন্য।

তৃতীয় দিনে একটি উপায় পাওয়া গেল। ইংরিজিতে কবিতা লেখেন কেকী দারুওয়ালা, আমার পূর্ব পরিচিত, তিনি শুধু কবি নন, খুবই উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার, দিল্লিতে সি বি আই-এর ডিরেক্টর না কী যেন। খুবই সদালাপী, নিরহঙ্কার, সুদর্শন মানুষ। এই কেকী দারুওয়ালা ভারতের যে-কোনও শহরে গেলেই পুলিশ বিভাগ থেকে তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য একটি গাড়ি পাবেন। এখানেও যথারীতি তিনি আলাদা গাড়িতে ঘুরছেন। কেকী দারুওয়ালাকে আমি চুপিচুপি জিগ্যেস করলাম, তোমার গাড়িতে আমরা কয়েকজন পালিয়ে যেতে পারি না? কেকী বলল, আমরা সেরকমই একটা প্ল্যান করছি, তুমি হলে চতুর্থ জন, আর কারওকে যেন বোলো না। অন্যরাও অনেকে যেতে চাইলে কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখব?

চারজনে বেরিয়ে পড়া গেল, আমরা দুজন পুরুষ ছাড়া অন্য দুজন মহিলা—নবনীতা দেবসেন এবং হিন্দি ভাষার তরুণী কবি গগন গিল। আদি পরিকল্পনা নবনীতার, এই নারীটি বিশ্ব-বেড়ানি, একা-একা চিন সীমান্ত এবং দক্ষিণ-মেরু, যে-কোনও জায়গায় অকুতোভয়।

অনেক কিছু দেখা হল, তবু শেষ পর্যন্ত আমার মনে দাগ কেটে রইল একটা ছোট নদী। এখানকার পেরিয়ার নদী সুবিখ্যাত, সে নদীর কথা বলছি না, এই অঞ্চলে ঘোরাফেরা করলেই পেরিয়ার নদী বারবার চোখে পড়বে, অনেক সেতুও পেরোতে হয়। আমাদের সমাবেশের ব্যবস্থাও হয়েছিল দুই নদীর সঙ্গমস্থলে, ভারী সুন্দর জায়গা। কিন্তু ভালো লাগার নদীটি দেখেছি সব শেষে।

ইতিহাস আমার প্রিয় এবং ইতিহাসের দিক থেকে কেরল রাজ্য একটি অতি সমৃদ্ধ খনি। ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমানদের প্রথম মসজিদ স্থাপিত হয়েছে কেরলে, প্রথম রোমান ক্যাথলিক গির্জাও এখানে, ইহুদিরা এখানে বসতি স্থাপন করেছিল, আবার এখানেই জন্মেছেন শঙ্করাচার্য, যিনি মাত্র

বত্রিশ বছর জীবিত থেকে ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ধর্মের ধ্বজা তুলেছিলেন।

কোচিন দুর্গ চত্বরেই রয়েছে গির্জাটি, পোর্তুগিজরা এটি বানিয়েছিল প্রায় পাঁচশো বছর আগে। সেন্ট ফ্রান্সিসের নামের এই গির্জাটি সাদামাটা, বিরাটও নয়, তেমন কিছু শ্রীমণ্ডিতও নয়। সামনের অংশটি অবিকল রেখে ভেতরে যে অনেকবার পুনর্নির্মাণ হয়েছে তা বোঝা যায়। কিন্তু এই চার্চের প্রধান আকর্ষণ, এখানেই ভাস্কো-দা-গামাকে সমাধি দেওয়া হয়েছিল। পাশ্চাত্য বণিক ও লুণ্ঠনকারীদের ভারতে প্রথম টেনে এনেছিলেন এই ভাস্কো-দা-গামা, ভারতের অধঃপতনের ইতিহাসে এই লোকটির ভূমিকা অনেকখানি।

১৫২৪ সালে ভাস্কো-দা-গামা এখানে দেহ রেখেছিলেন। এই সেন্ট ফ্রান্সিস চার্চে তাঁকে কবর দেওয়ার চোদ্দো বছর পর অবশ্য তাঁর দেহাবশিষ্ট নিয়ে যাওয়া হল লিসবনে। কিন্তু এই গির্জার মধ্যে তাঁর সেই কফিন ও সমাধি ফলক রয়ে গেছে। পাঁচশো বছর পর মানুষের হাড়গোড়ের কী অবস্থা হয় তা আমি জানি না, সেগুলো এখানে থাকুক বা না থাকুক, তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু মৃত অবস্থায় তিনি এখানে শায়িত ছিলেন, ভাবতেই রোমাঞ্চ হয়।

আমি নবনীতাকে বললাম, ভাস্কো-দা-গামা নিশ্চয়ই মদ খেয়ে মাতলামি করতে-করতে মারা যান। কেকী দারুওয়ালা খুব কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসে বলল, তাই নাকি, তাই নাকি। এ তথ্য তো ইতিহাসে পাইনি! আমি হাসতে-হাসতে জানালাম, এটা অবশ্য আমার অনুমান। স্মৃতিফলকে লেখা আছে, ভাস্কো-দা-গামার মৃত্যু হয়েছিল ক্রিসমাসের দিন সকালে। আগের রাত্রে, অর্থাৎ ক্রিসমাস ইভে সাহেবদের পার্টিতে মদের স্রোত বইতে থাকে, সার্থকতার আনন্দে তিনি হয়তো প্রচুর পান করে ফেলেছিলেন এবং কারওর সঙ্গে মারামারি বাঁধানোও অস্বাভাবিক ছিল না।

একটা নিদারুণ বিষণ্ণতার আবহাওয়া পাওয়া যায় মাত্তান নামে একটি জায়গায়। এমন কোনও পল্লির অবস্থা কি কল্পনাও করা যায়, যেখানে মানুষ আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে একটিও যুবক বা যুবতী নেই? মাত্তানের জু-টাউন ঠিক তাই। এককালে এখানে ছিল সমৃদ্ধ নগর, ইজরায়েল থেকে পালিয়ে এসে দলে দলে ইহুদিন এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। এখনও বাড়িগুলি ইওরোপীয় ধরনের। রাস্তাঘাট সুন্দর, কিন্তু অধিবাসী সবাই বুড়োবুড়ি। অল্প বয়েসি ছেলেমেয়েরা সবাই পাড়ি দিয়েছে উন্নত ও শক্তিশালী দেশ ইজরায়েলে, সেখানে ইহুদিদের কাজ জোটাবার কোনও অসুবিধা নেই। বুড়ো-বুড়িরা যায়নি, শেষ জীবনে নতুন পরিবেশে গিয়ে কী -ই বা হবে। এখন দেখা যায়, এককেটা বড় বড় বাড়িতে রয়েছে একটি মাত্র বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তাদের ফ্যাকাশে ধরনের মুখ। এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাই এখানকার প্রসিদ্ধ সিনাগগটি কোনওরকমে চালু রেখেছে।

এই জায়গাটিতে এসে কেকী দারুওয়ালা খুব অভিভূত হয়ে পড়ল। সে পারশি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ভারতের পারশিদের সংখ্যাও খুবই ক্ষীয়মাণ, আত্মীয়স্বজনের বাইরে বিয়ের পাত্র-পাত্রী পাওয়াও দুর্লভ।

এবারে আমার সেই নদীর কথা।

শেষ দিনটিতে যাওয়া হল কালাডিতে। প্রায় কুড়ি-বাইশ কিমি দূরে। শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান হিসেবেই জায়গাটি প্রায় একটি তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে, সেখানে রয়েছে তাঁর স্মৃতিমন্দির বা আটতলা কীর্তিস্তম্ভ সৌধ। ওই সৌধ আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করল না। সেখানে নাকি রয়েছে শঙ্করাচার্যের রুপোর চটিজুতো আর দেওয়ালের গায়ে তাঁর জীবনকাহিনির নানান ছবি। ছবিগুলি জ্যাবজেবে রঙে আঁকা, ছবি হিসেবে একেবারেই উৎকৃষ্ট নয়। আর চটিজুতোর ঘরে এত ভিড় সে ভিড় ঠেলে একজোড়া পাদুকা দেখার সাধ আমার হল না।

অনেকদিন আগে শঙ্করাচার্যের একটা রচনা পড়ে বেশ ভালো লেগেছিল। দারুণ তেজি বক্তব্য। 'শ্লোকার্ধেব প্রবক্ষ্যামি যদুক্তঃ গ্রন্থ কোটিভিঃ...' অর্থাৎ কোটি-কোটি গ্রন্থে যা লেখা হয়েছে, তা আমি মাত্র আধখানা শ্লোকে বলে দিতে পারি। সেই আধখানা শ্লোক কী? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা! অতি

সরল কথা, আসলে বেশ জটিল। এক এবং অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মই সত্য, আর এই জগৎ মিথ্যা। এই জগৎ কেন মিথ্যা হবে, তা অবশ্য আমি বুঝি না। শঙ্করাচার্য সে সম্পর্কেও বলেছেন, প্রত্যেক জীবই স্বরূপত ব্রহ্ম, কিন্তু অজ্ঞানবশত জীব তার স্বরূপ বুঝতে পারে না বা ভুলে যায়।

আমার মনে হয়, আমি ভুলে গিয়েই বেশ আছি, ব্রহ্ম-টহ্ম হতে চাই না। সে যাই হোক, অত অল্প বয়েসের মধ্যে এই তেজি ব্রাহ্মণটি সারা ভারত জয় করেছিলেন বলে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধার ভাব আছে।

শঙ্করাচার্যের জীবনকাহিনিতে একটি নদীর গল্প আছে, সেই নদীটি কোথায়? তাঁর জন্ম এ পল্লিতেই। এর কাছাকাছি একটি নদী থাকা উচিত।

লোকজনকে জিগ্যেস করে আমি বড় রাস্তা ছেড়ে ডানদিকে একটা সরু রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। সাধারণ গ্রামের রাস্তার মতো, দুপাশে আগাছার ঝোপ। একটু বাদেই চোখে পড়ল সেই নদী, কী সুন্দর সেই নদী। দেখামাত্র চোখ জুড়িয়ে গেল।

এ কিন্তু পেরিয়ার নয়, তারই একটি শাখা, এই নদীর নাম পূর্ণা। আমাদের গঙ্গা, পদ্মা, মেঘনার মতো অত চওড়া নয়, রূপনারায়ণের মতোও নয়, আবার কেলেঘাই বা কপোতাক্ষর মতো ছোটও নয়। অন্য পাড় স্পষ্ট দেখা যায়, গাছপালার ফাঁকে-ফাঁকে ছোট-ছোট কুটির, মাঝনদীতে নৌকো চলেছে পাল তুলে। কেরলের প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের বাংলার বেশ মিল আছে, এই নদীতীরে এসে হঠাৎ মনে হল যেন আমাদের কৈশোরের পূর্ব বাংলায় এসে পড়েছি।

গ্রীষ্মকালে আমাদের এদিককার নদীগুলির বড়ই শীর্ণদশা হয়। পূর্ণায় বেশ জল আছে। এবং স্রোত আছে। স্রোত না থাকলে নদীকে মানায় না। কুলুকুলু ধ্বনিটিও যেন শুনতে পাওয়া যায়। নদীর সঙ্গে নারীর উপমা আসেই, পূর্ণা যেন সদ্য ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরেছে, গায়ের রং বেশ ফরসা, কেন না জলের রং স্বচ্ছ।

একটা পাথরের বাঁধানো ঘাট রয়েছে। কিছুটা ভাঙা ভাঙা। শঙ্করাচার্য জন্মেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে। নিশ্চয়ই ততদিনের পুরোনো ঘাট নয়, তবু একটা প্রাচীনত্বের ছাপ আছে। কিংবা আবহমানকালের। এরকম নদী দেখলেই সাধ হয় এর কিনারায় একটা বাসা বেঁধে থেকে যাই।

এককালে এই নদীতে কুমির ছিল। শঙ্করাচার্যের জীবনীতে এই গল্প আছে যে, একদিন এই নদীতে স্নানের সময় তাঁ পা একটি কুমিরে কামড়ে ধরেছিল। তা দেখে, তীরে দাঁড়িয়ে আর্তস্বরে কেঁদে উঠেছিলেন তাঁর মা। শঙ্করাচার্যের তখন কৈশোরের বয়স, সেই বয়সেই তিনি সংসার ত্যাগ করে ব্রহ্মচর্য নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চান, মা কিছুতেই রাজি হননি। কুমির যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছে, তখন শঙ্করাচার্য বলে উঠলেন, মা, তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দাও, তা হলে আমি বাঁচবার চেষ্টা করতে পারি। মা তখন ব্যাকুলভাবে অনুমতি দিয়ে বলেছিলেন, তুই সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী যা হতে চাস তাই হবি, এখন তুই শুধু বেঁচে ফিরে আয়!

অমনি কুমির ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, শঙ্করাচার্য ঘাটে ফিরে এলেন। সেটা সত্যিই কুমির ছিল, না মায়া-কুমির, তা কে জানে! বারোশো বছর আগে ঘটনাটা ঘটেছিল এখানে।

এখন এই নদীতে কুমির থাকার প্রশ্নই ওঠে না। মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। মানুষ কুমির মেরে-মেরে প্রায় শেষ করে দিচ্ছিল, তারপর হঠাৎ একদিন খেয়াল হল, আরে পৃথিবী থেকে ডোডো পাখির মতো, কুমিরও যে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। এদের বাঁচানো দরকার। এখন কুমিরের ডিম খুঁজে-খুঁজে কুমিরের চাষ হয়, বাচ্চা কুমিরদের খাইয়ে-দাইয়ে বড় করে ছেড়ে দেওয়া হয় নদীতে। এখন কুমির টিকে আছে মানুষের দয়ায়।

পূর্ণা নদীটির রূপ এমনই স্নিগ্ধ যে-কোনও হিংস্রতার কথা এখানে মনেই আসে না। বরং দেখলেই অবগাহনের ইচ্ছে জাগে। একটা তোয়ালে আনিনি বলে বড় আপসোস হতে লাগল।

জুতোটুতো খুলে আমি ঘাটের পৈঠায় বসলাম জলে পা ডুবিয়ে। খানিক পরে একটা চমকপ্রদ

ব্যাপার হল। কয়েকটা ছোট ছোট মাছ ঠোকরাতে লাগল আমার পায়ে। পরিষ্কার জলে দেখা যাচ্ছে মাছগুলোকে, অনেকটা আমাদের চ্যালা মাছের মতো, আর একটু লম্বা, ঝিলিক দিচ্ছে তাদের গায়ের রুপোলি রং। তারপর দেখি ঝাঁকে-ঝাঁকে ওই মাছ এসে আমার পা দুটোকে ঘিরে ধরেছে। আমার কিন্তু ব্যথা লাগছে না একটুও, বরং সুড়সুড়ি বোধ হচ্ছে। ওরা কি আমার পা-কে কোনও খাদ্য বা খেলার বস্তু ভেবেছে?

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগে কখনও হয়নি। এই নদীতে এত মাছ?

অন্যরা মন্দির, সৌধ দেখায় ব্যস্ত, আমি সেখানে জলে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ ধরে দেখতে লাগলাম মাছেদের খেলা।

॥ ৬ ॥

জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে আগেই খবর দেওয়া ছিল, সেখানে আমরা সেরে নিলাম মধ্যাহ্নভোজ। জলপাইগুড়ি পুরোনো শহর, আগে এসেছি কয়েকবার। একবার প্ল্যান্টার্স ক্লাবে ছিলাম, সেবারের কথাই মনে পড়ে বেশি। সেবারে সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে এসেছিলাম। এক দুপুরে সাহিত্যের সামান্য কোনও বিষয় নিয়ে তর্ক শুরু হল, তার থেকে প্রবল ঝগড়া, তারপর কথা বন্ধের প্রতিজ্ঞা। বিকেল থেকে সত্যি আমরা আর পরস্পরের সঙ্গে কথা বলিনি। পাশাপাশি ঘর, প্রত্যেকটি বিরাট, পুরোনো বাড়ি, অনেক দেওয়ালের প্লাস্টার খসে-খসে পড়ছে। রাত এগারোটায় শুতে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পরেই দরজায় ঠকঠক শব্দ। প্রথমে সন্তোষদার তর্জন-গর্জন, তারপর কাকুতি-মিনতি। সন্তোষদার খুব ভূতের ভয়, এরকম পুরোনো বাড়িতে উনি রাত্তিরে একা ঘরে ঘুমোতে পারবেন না। অত বুদ্ধিমান, বিদ্বান, যুক্তিবাদী মানুষটির ভূতের ভয়। তারপর রাত দুটো পর্যন্ত জেগে গল্প করেছিলাম।

সে অনেকদিন আগেকার কথা। এবারে আর জলপাইগুড়ি শহরে থামা হবে না। যাওয়ার পথে কিছু চানাচুর, বিস্কুট, আলুভাজা ও বোতলের জল কিনে নেওয়া হল। এই বোতলের জল ব্যাপারটা কয়েক বছর ধরে চালু হয়েছে মাত্র। তার আগে আমরা কত জায়গায় গেছি, কত আঘাটা-কুঘাটার জল খেয়েছি, কিছু তো হয়নি!

গাড়ির চালকের নাম জগদীশ। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, সে খুব কম কথা বলে। কিন্তু প্রশ্ন করলে একটি দুটি শব্দে উত্তর দেয়। তবু একজন মানুষ আমাদের সঙ্গে তিন-চারদিন থাকবে, তার পরিচয় জানব না? এইটুকু জানা গেল, তারা দেশ-ভাগের শিকার, বাবা-মা এসেছে পূর্ব বাংলার এক গ্রাম থেকে, জগদীশ অবশ্য কোনওদিন বাংলাদেশ দেখেনি। জিগ্যেস করলাম, বাবা-মায়ের কাছে নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটির গল্প শুনেছে। সেখানে একবার যেতে ইচ্ছে করে না? জগদীশ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, নাঃ।

যাত্রী মাত্র তিনজন। বিলেত-প্রবাসী আমার বন্ধু ভাস্কর দত্ত, আমার স্ত্রী স্বাতী আর আমি। বিদেশে কয়েকবারই গাড়ি নিয়ে বেড়ানো হয়েছে। তখন সামনের সিটটা আমার বাঁধা, কারণ আমি ম্যাপ দেখি, যে চালায় তাকে নির্দেশ দিই। এখানে ম্যাপ দেখার প্রশ্ন নেই, জগদীশ রাস্তা চেনে।

এই হাইওয়ে চলে গেছে অসমের দিকে। মাঝে-মাঝে আর্মি ট্রাকের কনভয়, এ ছাড়া অন্য যানবাহন কম। উত্তরবঙ্গে যতবারই আসি, মনে হয় যেন গাছ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সরল, উন্নত বৃক্ষগুলি সব কোথায় গেল?

ফালাকাটা, হাসিমারা এইসব চেনা চেনা নাম চোখে পড়ে। একটা নদী পেরিয়ে যাই, তার নাম ডায়না। ইংল্যান্ডের রাজকুমারের প্রাক্তন স্ত্রী ডায়নাকে নিয়ে সম্প্রতি কত কাণ্ডই হয়ে গেল।

সেই রকমই এক মেমসাহেবের নামে উত্তর বাংলার এই নদী।

আলিপুরদুয়ারের কাছাকাছি এসে আমাদের গাড়ি মূল সড়ক ছেড়ে দিল। দুপাশের চা-বাগানের মধ্য দিয়ে রাস্তা। ভাস্কর অল্প বয়সেই বিলেত চলে যায়, উত্তরবঙ্গ দেখেনি। মাত্র গত বছরই আমার সঙ্গে শিলচর গিয়ে ও প্রথম চা-বাগান দেখেছে। যতবার দেখি, ততবারই চা-বাগানের দৃশ্য আমার চোখ জুড়িয়ে দেয়।

একেকটা চা-বাগানের নামও বেশ মজার। যেমন, এখানে একটির নাম তুরতুরি। কোনও বাচ্চা মেয়ের নাম হিসেবে বেশ মানিয়ে যায়। স্বাতী ঠিক করে ফেলল, এরপর চেনাশোনা কারও কন্যাসন্তান জন্মালে সে ওই নাম রাখতে বলবে।

চা-বাগানের পর জঙ্গল। মার্চ মাসের শেষ, অধিকাংশ গাছেরই পাতা ঝরে গেছে, তাই জঙ্গল তেমন ঘন মনে হয় না এবং এই জঙ্গলের মধ্যে মধ্যেও বসতি আছে। শোনা যায় গোরুর গলার ঘণ্টা।

এক জায়গায় রাস্তাটা দু-দিকে বেঁকে গেছে। একদিকে জয়ন্তী, অন্যদিকে ভুটানঘাট। জয়ন্তী আমার চেনা, বেশ কয়েক বছর আগে সেখানকার ডাকবাংলোয় স্বাতী আর আমি চমৎকার দুটি দিন কাটিয়ে গেছি। এবারে আমাদের গন্তব্য ভুটানঘাট।

যতটা কাছে মনে হয়েছিল, তা নয়, এর পরেও অনেকটা পথ। ভুটানঘাট বনবাংলোয় পৌঁছতে আমাদের সন্ধে হয়ে গেল।

আগে থেকে খবর না দেওয়া থাকলে খাবার-দাবার কিছুই পাওয়া যায় না। রিজার্ভেশন না থাকলে ফরেস্ট বাংলোতে কেউ হুট করে এসে জায়গাও পাবে না। আমাদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য কয়েকজন তৈরিই ছিল। চা পাওয়া গেল পৌঁছবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

আগাগোড়া কাঠ দিয়ে তৈরি দোতলা বাড়ি। ওপরের দুটি ঘরই বেশ প্রশস্ত। এই বাংলোটির প্রধান সৌন্দর্য এর স্থান নির্বাচন ও পরিপার্শ্ব। নিবিড় জঙ্গল, পাশেই নদী, ওপারে ভুটানের পাহাড়। অস্পষ্ট অন্ধকারে নদীটি অবশ্য দেখা যাচ্ছে না, একটা ঝরনার মতো শব্দ শোনা যাচ্ছে। খানিক বাদে পাহাড়ের মাথায় চাঁদ উঠল।

বাংলোটি বেশ যত্ন করে এবং কার্পণ্য না করে বানানো হয়েছে। দোতলায় দুটি ঘরের সামনেই বেশ চওড়া বারান্দা, আরও একটা বসবার জায়গা, ইচ্ছে হলে পঁচিশ-ত্রিশজন মানুষও বসতে পারে। আপাতত আমরা তিনটিমাত্র প্রাণী। ইলেকট্রিসিটির জন্য তার এবং বাল্‌ব লাগানো আছে, কানেকশন নেই। কিন্তু জেনারেটরে আলো জ্বালানো যায়, সদলবলে কোনও মন্ত্রীটন্ত্রি এলে নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থা হয়, কিন্তু এখন ডিজেল ফুরিয়ে গেছে বলে জেনারেটর চালানো যাচ্ছে না, সেজন্য চৌকিদার এসে দুঃখ প্রকাশ করল। তাতে বরং খুশিই হলাম আমরা, জঙ্গলের মধ্যে ইলেকট্রিকের আলো বড় কর্কশ লাগে।

আফ্রিকার সেরিংগেটি অরণ্যের একেবারে মাঝখানে আমি একটা হোটেলে ছিলাম একবার। হোটেল বটে, কিন্তু সেখানে ঘর নেই, সবই তাঁবু। জঙ্গলের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে একেকটা তাঁবু, পাশাপাশি নয়। একটা থেকে অন্যটা দেখাই যায় না। একটি সুইস কোম্পানি সেই হোটেলটা চালাচ্ছে, আধুনিক সব ব্যবস্থাই আছে, বড় তাঁবু সংলগ্ন একটা ছোট তাঁবুতে বাথরুম, সেখানে ঝকঝকে পরিষ্কার কমোড আছে, শাওয়ারে গরম জল-ঠান্ডা জল দুরকমই পাওয়া যায়। কিন্তু ইলেকট্রিক আলো রাখেনি। হ্যারিকেন। রাত্রিবেলা মনে হয়, গভীর জঙ্গলে একা এক তাঁবুতে শুয়ে আছি, সন্ধেবেলা সেখানে নানারকম জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে একটা জলহস্তীকেও ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলাম। রাত্রিবেলা কাছাকাছি বিভিন্ন ধরনের ফোঁসফোঁসানি শুনে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে পারিনি।

উত্তরবঙ্গের জঙ্গল অবশ্য তেমন ভয়াবহ কিছু নয়। হাতির উপদ্রব আছে, হাতির সংখ্যা যথেষ্ট বেড়েছে। বাঘও কিছু আছে, কিন্তু আমাদের সুন্দরবনের বাঘের তুলনায় সেগুলি প্রায় গান্ধীবাদী।

বরং লেপার্ডগুলো দুষ্ট প্রকৃতির। (বাংলায় আমরা লেপার্ডকে ভুল করে চিতাবাঘ বলি, কিন্তু এই দুটি প্রাণীতে অনেক তফাত। আসল চিতাবাঘ পৃথিবীর দ্রুততম প্রাণী হয়েও অনেক দেশ থেকেই লোপ পেয়ে গেছে। আমাদের দেশেও নেই)। উত্তরবঙ্গের লেপার্ডগুলো মাঝে-মাঝে চা-বাগানেও ঢুকে পড়ে, মানুষকে আক্রমণও করে। তবে একসঙ্গে দু-তিনটি মানুষ দেখলে তারা পালায়।

আমাদের অবশ্য রাত্রিবেলা বাংলোর বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। তবু খাওয়া-দাওয়ার পর ভাস্কর বলল, চল না নদীর ধারটা ঘুরে আসি, কী আর হবে? স্বাতীরও ভয়-ডর বলে কিছু নেই। না, কথাটা ঠিক হল না। স্বাতীর একটু-একটু ভূতের ভয় আছে, চোর-ডাকাতের ভয় আছে, কিন্তু রাত্রিবেলা জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবার ব্যাপারে প্রবল উৎসাহ। নীচে নেমে এসে দেখি, বাইরে বেরোবার সব দরজায় তালা বন্ধ।

সকালবেলা ঘুম ভাঙল ময়ূরের ডাকে। আবহাওয়া চমৎকার। গরম একেবারেই নেই, একটু-একটু ঠান্ডা শিরশিরে ভাব, তা বেশ মনোরম। বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে দিনের আলোয় পরিপার্শ্বটি ভালো করে দেখা গেল। সামনে তাকালে জঙ্গলে, কিছু কিছু গাছের পাতা আছে, অনেক গাছই পাতা-ঝরা। ডান পাশের নদীটাই চোখকে বেশি টানে। অনেকখানি চওড়া নদী, কিন্তু জল দেখা যায় না, বড় বড় পাথরের চাঁই শুধু। ওপারের দুটো পাহাড়ের মাঝখানে খানিকটা ফাঁক, সেই জায়গাটা বেশি আলোকিত মনে হয়। যেন পাহাড়ের আড়াল থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে আলো। সব মিলিয়ে একটা আকর্ষণীয় ছবি। প্রকৃতির ছবি যাঁরা আঁকেন, তেমন কোনও শিল্পী এই বিশেষ জায়গাটি দেখলে নিশ্চিত পছন্দ করতেন।

বাংলোর সামনে দিয়ে গেলে নদীটিতে জল চোখে পড়ে না। অথচ জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে ঠিকই। বাংলোর পিছন দিক দিয়ে আরেকটা পথ আছে, মিনিট পাঁচ-সাত হাঁটতে হয়, তারপর হঠাৎ নদীটি চোখে পড়ে। হ্যাঁ, মাঝখান দিয়ে খানিকটা জলের প্রবাহ আছে ঠিকই, স্রোত আছে বেশ, একটা জায়গায় ছোটখাটো একটা প্রপাতের মতো হয়ে আছে, সেই শব্দই বাংলো থেকে শোনা যায়।

সমতল বাংলায় আমরা যে ধরনের নদী দেখি, তার চেয়ে উত্তরবাংলার পাহাড়ি নদীগুলির চরিত্র একেবারে আলাদা। এইসব নদীর খাত বেশ বড়, কিন্তু সারা বছরের খুব কম সময়ই জল থাকে। বর্ষার সময় হঠাৎ ভরে যায়, আবার জল সরে যেতেও দেরি লাগে না। এমনও দেখেছি, এরকম একটা নদী, প্রায় শুকনো, দুয়েকদিন প্রবল বৃষ্টিতে একেবারে ভরে গেল, জল টগবগ করে ফুটছে, স্রোতে ভেসে যাচ্ছে গাছের ডালপালা। পাঁচ-ছ'দিন পরেই আবার আগের অবস্থা। এসব পাহাড়ে বরফ নেই, তাই নদীগুলি প্রায় বৃষ্টির বাহন। খাত বেশ চওড়া হলেও জলের ধারা একেক সময় একেক দিক থেকে বয়ে যায়। তাই দেখতে বড় হলেও আসলে এরা ছোট নদী।

নদীটার নাম কী? চৌকিদার, পাচক, দারোয়ান, কেউ কিছু বলতে পারে না। এ ওর মুখের দিকে তাকায়। এদের জীবনের গণ্ডি ছোট। সারাদেশে কত নদ-নদী আছে তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। বাড়ির পাশে একটা নদীকেই ভালো করে জানে, চেনে সারা জীবন। সে নদী নদীই, তার আবার নামের কী দরকার।

একটু বেলায় আমরা গাড়ি নিয়ে বেরোলাম আরও জঙ্গলের দিকে।

জগদীশ একটা ব্যাপারে চিন্তিত। হঠাৎ হাতির পাল এসে পড়লে কী করা হবে? সরু রাস্তা, চট করে সব জায়গায় গাড়ি ঘোরানোও যায় না। হাতির পাল যদি গাড়িটাকে খেলনা ভেবে লোফালুফি শুরু করে দেয়? একটু আগেই আমাদের গভীর জঙ্গলের একটা জলাশয় ও সল্ট লিক দেখানো হয়েছে, যেখানে হাতি ও অন্যান্য জন্তু-জানোয়াররা আসে। সুতরাং হঠাৎ রাস্তা জুড়ে গাদাখানেক হাতি দেখতে পাওয়া অসম্ভব কিছু নয়।

আমি জগদীশকে ভরসা দিয়ে বললাম, তখন তুমি খুব জোরে-জোরে হর্ন বাজাবে। হাতিরা আওয়াজ পছন্দ করে না। নিজেরাই সরে যাবে।

ছোট-ছোট পাহাড় পেরিয়ে যাওয়া। পাশ দিয়ে নদীটা চলছে। কখনও চোখে পড়ে, কখনও হারিয়ে যায়। জঙ্গল মাঝে-মাঝে ফুরিয়ে গিয়ে অনেকখানি দিগন্ত। সেখানকার রুক্ষ পাহাড়ের ঢাল আর পাথুরে নদী দেখে মনে হয়, অনেক ওয়েস্টার্ন ছবিতে ঠিক এইরকম দৃশ্য দেখেছি। ওরা অনায়াসে এখানে এসে শ্যুটিং করতে পারে।

এক সময় রাস্তাটা একদিকে বেঁকে শেষ হয়ে গেল নদীর ধারে। সেখানে কয়েকটা বাড়িঘর, ফরসা-ফরসা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করছে। নদীটার ওপারে একটা ঝুলন্ত সেতু, সেটা দোলে। এই সেতু পেরিয়ে ভুটানের মানুষজন যাওয়া আসা করে। এখানে নদীতে বেশ জল, বেশ স্রোত।

আমরা সেতু পেরিয়ে ওদিকে গেলাম। কিন্তু নদী তো শুধু ওপর থেকে দেখলেই হয় না, কাছে গিয়ে জল ছুঁতে হয়। এখানে সেরকম ঠিক সুবিধে নেই। আগেই ঠিক করেছি ফিরে গিয়ে বাংলোর পিছনদিক দিয়ে নদীর ঘাটে চা কিংবা আরও কড়া গোছের কিছু পানীয় নিয়ে বসতে হবে। যে-কোনও নদীর জলে খানিকক্ষণ পা ডুবিয়ে বসে থাকা স্বাতীর প্রিয় ব্যসন।

সেতুর ওপারে বিশেষ কিছু নেই, বরং এপারেই কয়েকটা দোকানপাট আছে। অতি সাধারণ দোকান, অন্য বিশেষ কিছুই নেই, শুধু কিছু মদের বোতল সাজানো আছে।

একটা দোকানে দোকানদার নিজেই বসে-বসে ছাং খাচ্ছে। পেট মোটা বাঁশের কোঁড়ার মধ্যে সর্ষের দানার মতো কীসের যেন বীজ ঢেলে দেয়, তারপর তাতে গরম জল ঢালতে হয়। পাইপ দিয়ে টানলে অনেকটা হালকা বিয়ারের মতো লাগে। মাঝে-মাঝে আরও গরম-গরম জল ঢালতে হয়।

ভাস্কর এসব কখনও দেখেনি। জিগ্যেস করল, ওগুলো কী রে? ব্যাপারটা শুনে বলল, আমি টেস্ট করে দেখব।

তিনজনেই বসে গেলাম দোকানের বারান্দায়। দোকানদারটি অতি সুপুরুষ। মেদবর্জিত, দীর্ঘ শরীর। সে ভাঙা-ভাঙা হিন্দি জানে, তার সঙ্গে গল্প হতে লাগল। সে এরকম একটা অখ্যাত স্থানে অতি সামান্য দোকান চালায় বটে, কিন্তু, তার এক ছেলে জাপানে চাকরি করতে গেছে, সেজন্য তার বেশ গর্ব। ছেলের ছবি দেখাল। কথায়-কথায় সে আরও জানাল, সকাল থেকেই সে এই ছাং পান করে। সন্ধের সময় থামে। তার পরেই বিছানা।

একজন বয়স্কা মহিলা দোকানের মধ্যে টুকটাক কাজ করে যাচ্ছে আপনমনে। খানিক পরে একজন বেশ ফুটফুটে যুবতী সেখানে দাঁড়াল, আর আমাদের দিকে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসতে লাগল, স্বাতী সম্পর্কেই তার কৌতূহল বেশি। যেন সে জানতে চায়, দুজন পুরুষের সঙ্গে একজন মাত্র নারী কেন?

দোকানদারটিকে ভাস্কর জিগ্যেস করল, এ মেয়েটি কে?

সে বলল, আমার বউ।

ভাস্কর ঠিক বুঝতে না পেরে বলল, ভেতরে ওই যে একজন, সে তা হলে কে?

দোকানদারটি বলল, দুজনেই আমার বউ।

দোকানদারটি বলল, আরও বেশি করা যায়। আমাদের রাজার চারটে বউ। রাজার চেয়ে বেশি বউ কেউ রাখতে পারবে না। চারটে পর্যন্ত ঠিক আছে।

ভাস্কর জিগ্যেস করল, আমি যদি এখানে একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে চাই, পারব?

দোকানদারটি উৎসাহের সঙ্গে বলল, হ্যাঁ, পারবেন না কেন? ইন্ডিয়ানরা থাকতে পারে।

ভাস্কর আবার জিগ্যেস করল, বিয়ে করতে চাইলে বউ পাব?

লোকটি একগাল হেসে বলল, তাও পাবেন। আমি জোগাড় করে দেব। থাকুন না।

ভাস্কর বলল, আমি তা হলে এখানেই থাকব ঠিক করলাম। আমার চারটে বউ চাই।

আমি স্বাতীর দিকে তাকালাম। নিজের স্ত্রী সামনে থাকলে এই ধরনের রসিকতা করার সাহসও আমার নেই।

॥ ৭ ॥

বিয়াস খুব বড় নদী। হিমাচল প্রদেশের রোটাং পাস থেকে এর উৎপত্তি। ইচ্ছে করলে সে পর্যন্ত গিয়েও দেখে আসা যায়। পাহাড়ি খাত ধরে ঝরনার মতো নেমে এসেছে অনেকখানি। মানালি, কুলু, মাণ্ডি শহরগুলোর ধারে-ধারে ঝরনার বদলে নদী-নদী ভাব, তাও শীতকালে জলের বদলে পাথরই দেখা যায় বেশি।

বিয়াস নামটির তাৎপর্য এখন অনেকটা বদলে গেছে। এখন অনেকের ধারণা, মহাভারতের স্রষ্টা ব্যাসদেবের নাম থেকেই এই নদীর নাম। পৌরাণিক কাহিনিটি অবশ্য অন্য। সেকালের মুনি-ঋষিদের নানারকমের তেজ এবং নারীঘটিত কীর্তির কথা আছে, কিন্তু তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে শান্ত, গভীর এবং নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বশিষ্ঠ। সেই নিরীহ ঋষিরও একশোটি পুত্রকে হত্যা করে কল্মাষপাদ রাক্ষস। নিদারুণ শোকে বশিষ্ঠ ঋষি প্রাণ বিসর্জনের সংকল্প নিয়েছিলেন। হঠাৎ লাফ দিলেন উঁচু পাহাড় থেকে, কিন্তু তাতেও তাঁর পুণ্য শরীর অক্ষত রয়ে গেল। তবু সংকল্প থেকে বিরত হলেন না বশিষ্ঠ, শক্ত দড়িতে নিজের হাত-পা বেঁধে ঝাঁপ দিলেন তাঁর আশ্রমের সামনের নদীতে। কিন্তু স্বয়ং প্রকৃতি এই মহাত্মার মৃত্যু চান না, তাই নদীর স্রোতে আপনাআপনি তাঁর বন্ধন খুলে গেল। বশিষ্ঠ আবার উদ্বুদ্ধ হলেন বেঁচে থাকার মন্ত্রে। এই নদী তাঁকে শাপমুক্ত করেছে বলে, তিনি এর নাম দিলেন বিপাশা। সেই বিপাশা এখন বিয়াস। অবশ্য ব্যাসদেবের সঙ্গেও এই নদীর সংস্রব আছে, এর তীরেই নাকি ছিল ব্যাসদেবের আশ্রম। রোটাং পাসে যেখানে এই নদীর উৎস, সেই জায়গাটির নাম বিয়াসকুণ্ড।

কুলু-মানালির সৌন্দর্য বিখ্যাত এবং সেই খ্যাতির টানেও সারা বছরই বড় ভিড়। এমনকী শীতকালেও পর্যটকদের স্রোত অব্যাহত। যারা কুড়ি বছর আগে মানালি গেছে, তারা এখন ওই জায়গায় গেলে চিনতেই পারবে না। যেমন স্বাতী পারেনি। আগেরবার এসে কোথায় ছিল, সে জায়গাটা খুঁজেই পায় না, আমাদের কাছে যা বর্ণনা দিয়েছিল, তা মেলে না কিছুই। ফাঁকা জায়গা একটুও নেই, হোটেলে-হোটেলে ধূল পরিমাণ। কীসব বড়-বড় হোটেল, দেখলে তাক লেগে যায়। কাশ্মীর উপত্যকায় অশান্তি এবং নিরাপত্তার অভাবের জন্য এখন ভ্রমণকারীরা দল বেঁধে আসে কুলু-মানালিতে। মধুর অভাবে গুড় যেমন। তা মধুর চেয়েও নতুন ওঠা ঝোলা গুড় কম সুস্বাদু নয়। কাশ্মীরের মতো বড়-বড় হ্রদ এখানে নেই, অত উচ্চ গিরিচূড়াও নেই, কিন্তু কুলু-মানালিতে যেন হিমালয়ের বুকের ওপর বসে থাকার মতো অনুভূতি হয়। কাশ্মীরের সঙ্গে এ জায়গায় তুলনা টানা ঠিক নয়, দুটি জায়গা দুরকম, নিজস্বভাবে আকর্ষণীয়।

আমরা ঠিক করেছিলাম নিরিবিলিতে একটা ছোট্ট জায়গায় থাকব। যে জায়গার নাম ট্যুরিস্ট ম্যাপে নেই, যেখানে কন্ডাক্টেড ট্যুর যায় না, যেটা তীর্থস্থান নয়। মাণ্ডির ডিভিশনাল কমিশনার সুদৃপ্ত রায় আমার বন্ধু ভাস্করের ভাগনে, সে-ই সুপারিশ করল, আপনারা কসোল-এ যান।

প্রথমে বুঝতে পারিনি। কসৌলি তো বিখ্যাত জায়গা। ধরমপুর থেকে যেতে হয়। সেখানে পাবলিক স্কুল আছে, হাসপাতাল আছে, হিমালয় প্রেমিকদের অবশ্য দ্রষ্টব্য একটি স্থান। সেখানে তো ভিড় লেগে থাকবেই। তা ছাড়া, কসৌলি এখান থেকে অনেক দূরে।

সুদৃপ্ত হেসে বুঝিয়ে দিল, কসৌলি নয়, কসোল, এর নাম বিশেষ কেউ জানে না, আমাদের রুচি বুঝেই সে বলেছে, সেখানে একটিমাত্র হোটেল ও কিছু গেস্টহাউস আছে। কোনওরকম উত্তেজনা

নেই, আওয়াজ নেই। সুদৃপ্তর ব্যবস্থাপনায় পরদিন সকালেই আমরা রওনা দিলাম সেদিকে।

মাণ্ডি থেকে কুলু-মানালির দিকে একটিই মাত্র পথ। বিপাশা নদীর পাশে পাশে। কখনও নদীর এপারে, কখনও ওপারে। মাঝে-মাঝে যেমন ছোট ছোট উপনদী-শাখানদী আছে, সেইরকম ছোট-ছোট রাস্তাও বেরিয়ে গেছে এদিকে-ওদিকে। কুলু পৌঁছনোর আগেই আমরা সেরকম একটা পথে বেঁকে গেলাম ডানদিকে।

মাঝে-মাঝে রাস্তাটি বেশ সরু, রোমাঞ্চকর বলা যেতে পারে, হঠাৎ দুদিক থেকে দুটি গাড়ি এসে পড়লে বুক দুরু-দুরু করে। এইসব রাস্তায় বাস উলটে পড়ার দৃশ্য একবার না একবার চোখে পড়বেই।

এই রাস্তার পাশে পাশেও একটি নদী। নাম জানা গেল, পার্বতী। বেশ সরল, সুন্দর নাম। চওড়া বেশি নয়, তাই জলের তোড় টের পাওয়া যায়।

কসোল-এ পৌঁছবার আগে রাস্তায় যেসব মানুষজন দেখা গেল, তাদের মধ্যে বিদেশিই বেশি। পরে শুনেছিলাম, যে-কোনও কারণেই হোক, ইতালিয়ানদের কাছে এই ক্ষুদ্রস্থানটি বেশ জনপ্রিয়।

হোটেলটিতে পৌঁছে আমরা আশ্বস্ত হলাম।

পুরো হোটেলটিতে আমরা ছাড়া আর লোকই নেই বলতে গেলে। এটা হোটেলের মালিকের পক্ষে দুঃখের বিষয় হলেও আমাদের বেশ ভালো লাগল। একটু পরেই জানা গেল, এত যে সাহেব-মেম আসে, তারা সাধারণত হোটেলে ওঠে না, তারা দু-তিন মাসের জন্য গ্রামের মধ্যে বাড়ি ভাড়া নেয়, নিজেরা রান্না করে খায়। সেই জন্যই অনেক সুন্দর-সুন্দর কটেজ তৈরি হয়েছে এ অঞ্চলে।

আমরা মোট চারজন, কিন্তু আমাদের তিনটি ঘর লাগে। স্বামী-স্ত্রীর একটি, পয়সা বাঁচানো গেলেও ভাস্কর ও অসীম কিছুতেই এক ঘর শুতে রাজি নয়। অসীমের ধারণা, ভাস্করের খুব জোরে নাক ডাকে, তাই এক ঘরে থাকলে সে রাতে ঘুমোতে পারবে না। ভাস্করের জোরে নাক ডাকে ঠিকই, যেমন আমারও রীতিমতো নাসিকা গর্জন হয়, সেটা স্বাতীর সহ্য হয়ে গেছে, কিন্তু অসীমের নিজেরও যে নাক ডাকে, তা সে জানে না। বিয়ে তো করল না, না-হলে তার স্ত্রীই জানিয়ে দিত।

পাশাপাশি তিনটি ঘর পাওয়া গেল সহজেই। ডাকলেই বেয়ারারা ছুটে আসে, অন্য কোনও কাজ নেই তো। হোটেলটার চারদিকে যেন ঘিরে আছে পাহাড়, কয়েকটি চূড়া বরফমণ্ডিত। পাহাড়গুলির গায়ে নিবিড় জঙ্গল। আর হোটেলের পিছন দিকে, অদূরে পার্বতী নদী।

নদীর ধারে-ধারে আপেল বাগান। এই অঞ্চলের আপেল বিখ্যাত। আপেল আর পর্যটন, এই দুটি কারণে এখানকার মানুষদের দারিদ্র্য বেশ কম।

সন্ধেবেলা আড্ডা হয় ভাস্করের ঘরে। ফেব্রুয়ারি মাস, দিনের বেলাতেই বেশ শীত, সূর্যাস্তের পর বাইরে বেরোতেই ভয় করে। ভাস্কর আর অসীম তিন যুগ ধরে আছে, লন্ডন ও প্যারিসে, কিন্তু ঘরের মধ্যে বসেও ভাস্করের বেশি শীত করে। গায়ে জড়িয়েছে চাদর, পায়ের কাছে জ্বলন্ত হিটার। সেই তুলনায় অসীমের শীতবোধ কম।

যখন আমরা একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে যাই, ভাস্কর অনেক কিছু গুছিয়ে নিয়ে আসে। প্রচুর কাজুবাদাম, নানারকম বিস্কুট, চানাচুর, এমনকী জোয়ান-এলাচ মেশানো মশলা পর্যন্ত। নানাবিধ উত্তম পানীয় তো থাকবেই, এবং অবশ্যই অ্যান্টাসিড ট্যাবলেট ডজন-ডজন। জীবনের আর সবক্ষেত্রে ভাস্করের স্বভাব এলোমেলো ও ভুলোমনা, শুধু ভ্রমণের ব্যাপারেই তার পরিকল্পনা নিখুঁত।

প্রথমে চা দিয়ে শুরু হয়, তারপর কড়া পানীয়, আড্ডার ঝোঁকে রাত গভীর হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে একমাত্র স্বাতীই আগে দুবার কুলু-মানালি ঘুরে গেছে, অনেকদিন আগে অবশ্য, সেই জন্য এবারে এদিকে আসার ব্যাপারে তার প্রাথমিক আপত্তি ছিল। কিন্তু কসোল তার পছন্দ হয়ে গেল। এখানকার নিস্তব্ধতা, আবার পাহাড়ের গভীর উপস্থিতি। দুটি মিলিয়ে বিচিত্র অনুভূতি হয়।

ভাস্কর ঘুম-কাতুরে, জাগে অনেক দেরিতে। স্বাতী উঠে পড়লেও তার বাইরে বেরোবার জন্য

প্রস্তুত হতে সময় লাগে। অসীমের স্বভাবে কৌতূহলবৃত্তি প্রবল, যে-কোনও নতুন জায়গায় গিয়ে সে চতুর্দিকে ঘুরে দেখে নিতে চায়। তা ছাড়া তার ফটোগ্রাফির ঝোঁক, ক্যামেরার ব্যাগ তার কাঁধে ঝোলানো থাকে সব সময়, তাতে তিন-চার রকম ক্যামেরা, পাঁচ-ছ'রকম লেন্স। সকাল সকাল অসীম বেরিয়ে পড়তেই আমি হলাম তার সঙ্গী।

আপেল বাগানের একেকজন মালিকের সীমানা কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা, তাই প্রথমে নদীর পারে পৌঁছবার রাস্তাটা খুঁজে পাই না। হোটেলের সামনের রাস্তাটা চলে গেছে মণিকরণের দিকে। সেটা ধরে খানিকটা এগোতেই একটা সরু পথ চোখে পড়ল নদীর দিকে। পথ মানে বড়-বড় পাথর ফেলা, যেতে হয় ডিঙিয়ে। আমাদের বাংলা-বিহারে যে-কোনও লোকালয়ের নদীর ধারে সকালবেলা না যাওয়াই ভালো, গেলে অনেক পুরুষের বসে থাকা উন্মুক্ত পশ্চাৎ-দৃশ্য দেখতে হয়। এখানে কেউ নদীকে সেভাবে ব্যবহার করে না। তা ছাড়া এই শীতে বরফ-গলা নদীর জল ছোঁবে কে?

উঁচুর দিক থেকে নেমে আসছে পার্বতী নদী, ধাপে ধাপে, তাই তার স্রোতে মৃদু কুলুকুলু ধ্বনি আছে। মাঝে-মাঝে ভেসে আসছে ভাঙা ডালপালা। নামের জন্যই নদীটিকে মনে হয় সুন্দরী রমণী, সে যেন আপনমনে গান গাইতে-গাইতে চলেছে।

জলের মধ্যে একটি আধো-ডোবা পাথরে একটি ফড়িং একেকবার বসছে আর উড়ে যাচ্ছে। ঠিক মুহূর্তে ফড়িংটিকে ধরবার জন্য ক্যামেরা তাক করে আছে অসীম, মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। ভালো ছবি তুলতে ধৈর্য লাগে। আন্তর্জাতিক দুয়েকটি প্রতিযোগিতাতেও অসীম তার ছবি পাঠায়। ফড়িং-মাকড়সা-গুবরে পোকা, এইসবের ছবিই নাকি বেশি পুরস্কারযোগ্য। আমার অত ধৈর্য নেই। আমি ফড়িংকে ছেড়ে দেখতে থাকি নদীর ওপারের বনরাজি। মনে হয়, হঠাৎ যেন ওর মধ্য থেকে হরিণ বেরিয়ে আসবে। আমি সুন্দরবনে গিয়ে কখনও বাঘ দেখিনি, কিন্তু ভোরবেলা লঞ্চের ছাদ থেকে দেখেছি জঙ্গলের প্রান্তে এক পাল হরিণ।

জঙ্গলের ওপাশে পাহাড়ের চূড়া, প্রথম সূর্যের আলোয় ঝকঝক করছে বরফ। স্বর্ণকিরীট একেই বলা যায়। অসীমকে বললাম, এই পাহাড়ের ছবি তুলবে না? দ্যাখো, দ্যাখো—

মনঃসংযোগ নষ্ট হওয়ায় বিরক্তভাবে ভুরু কুঁচকে বলল, ওতে নতুনত্ব কী আছে?

পাহাড়ের তুলনায় একটি ফড়িং-এর ওড়াউড়িতে কী এমন নতুনত্ব থাকতে পারে, তা আমার পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। বুঝলে তো আমিও ফটোগ্রাফার হতাম।

একটু পরে অসীম বললে, চলো, নদীটার ধার দিয়ে দিয়ে খানিকটা এগোই।

বেশি দূর যাওয়া গেল না অবশ্য। নদীর কিনারে কোনও রাস্তাই নেই, অনবরত পাথর ডিঙোতে হয়, কোথাও ডিঙোনোও যায় না। পার্বতী নিরিবিলিতে থাকতে চায়।

দুপুরবেলা আমরা এগোলাম পাকা রাস্তা ধরে, গাড়ি নিয়ে। কিছু দূরেই মণিকরণ, একটি তীর্থক্ষেত্র। হিন্দু এবং শিখ, দুই ধর্মেরই তীর্থ বলে সারা বছরই এখানে জনসমাগম লেগে থাকে।

মণিকরণের কাছাকাছি এসে পার্বতী নদীর এমন একটা রূপ চোখে পড়ে, যায় তুলনা পাওয়া ভার। নদীর জল থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে।

এদিককার কোনও পাহাড়ের হিমবাহ থেকেই এই নদীর উৎপত্তি। বরফ-গলা জল নিশ্চিত ঠান্ডা হওয়ার কথা। কিন্তু এই অঞ্চলে যত্রতত্র উষ্ণপ্রস্রবণ। নদীর ধার ঘেঁষেও কোথাও-কোথাও মাটি ফুঁড়ে উষ্ণপ্রস্রবণ বেরিয়ে আসছে, সে জল এমনই গরম যে নদীকেও তপ্ত করে তুলেছে।

একদিকে গাড়ি রেখে, একটা কাঠের সেতু পেরিয়ে মণিকরণে যেতে হয়। সেতুর নীচে দেখি, এক জায়গায় পার্বতী নদী টগবগ করে ফুটছে। এরকম দৃশ্য আমি আগে কখনও দেখিনি।

গুরু নানক নাকি মণিকরণে এসেছিলেন, তাই শিখদের কাছে এই স্থানটি খুব পবিত্র। একটা প্রকাণ্ড ধর্মশালা রয়েছে। আর সব উষ্ণপ্রস্রবণকেই হিন্দুরা তীর্থস্থান মনে করে। একটি বড় রামমন্দির আছে, আরও অনেক মন্দির। কয়েক জায়গায় প্রকৃতির গরম জলে স্নান করার ব্যবস্থা।

অনেক শ্বেতাঙ্গ সেখানে দিব্যি কালো মানুষদের সঙ্গে স্নান করছে। কয়েকটি হোটেলেও ওইরকম স্নানের ব্যবস্থা আছে, হোটেলের বাথরুমে উষ্ণপ্রস্রবণের জল।

তীর্থস্থান মানেই প্রচুর টুকিটাকি জিনিসপত্রের দোকান, আর রেস্টুরেন্ট। এক জায়গায় দেখি, বাংলায় লেখা, 'বউদির দোকান'। সেখানে নিশ্চিত ভাত-মাছের ঝোল পাওয়া যায়। আমি প্রবাসে গিয়ে বাঙালি খাওয়া একেবারে পছন্দ করি না। নিত্যি তিরিশ দিন বাড়িতে যা খাচ্ছি, প্রবাসে বেড়াতে গিয়ে তা খাব কেন? প্যারিসে আমাদের এক বাঙালি বন্ধুর স্ত্রী ফরাসিনী। তাঁদের বাড়িতে গেলেই বন্ধুর স্ত্রী আমাদের ভাত-ডাল-তরকারি খাওয়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁর অপটু হাতের রান্না ডাল-তরকারির চেয়ে ফরাসি খাদ্যদ্রব্য পেলে যে আমরা অনেক বেশি প্রীত হতাম, তা তাঁকে বোঝানো যায় না।

মণিকরণ একটি উপত্যকার মধ্যে। চতুর্দিকের দৃশ্য ভারী মনোরম। ভাস্কর বলল, আগে এই জায়গাটা নিশ্চয়ই খুব সুন্দর ছিল, এখন এত বাড়ি-ঘর উঠে ঘিঞ্জি হয়ে গেছে। আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, আমি এখানে এত বাড়ি বানানো নিষিদ্ধ করে দিতাম।

অসীম বলল, ওটাই তো এ দেশের দোষ। কেউ কিছু চিন্তা করে না, সুন্দর জায়গাকে সুন্দর রাখতে জানে না।

অসীম ও ভাস্কর দুজনেই বিদেশে থাকে, ওদের পাসপোর্টও ভারতীয় নয়, কিন্তু অসীম এ দেশের নিন্দে শুরু করলেই ভাস্কর তার বিপক্ষে চলে যায়। স্বাতীও তখন ভাস্করের সঙ্গে যোগ দিয়ে অসীমকে বকাবকি শুরু করে। আমি অধিকাংশ সময়েই নিরপেক্ষ শ্রোতা।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর স্বাতী বলল, এখানে একদিন থেকে গেলে হয় না?

তৎক্ষণাৎ আমরা তিনজন পুরুষ একমত হয়ে জানালাম যে, না, তা হতেই পারে না। ভিড়ের জায়গায় থাকব না ঠিক করেই এসেছি, এর চেয়ে কসোল অনেক ভালো।

আমি মন্দির-মসজিদ-গির্জা বাইরে থেকেই দেখা পছন্দ করি। স্বাতী ভেতরেও যেতে চায়। এখানকার মন্দিরগুলিতে ভাস্কর্য-স্থাপত্যের কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তাই কাছে গিয়েও দেখার মতো কিছু নয়। কিন্তু স্বাতী দুয়েকটি মন্দিরের ভেতরে যাবেই ঠিক করেছে। ভাস্কর শিভাল্‌রি দেখিয়ে সঙ্গ দেয় স্বাতীকে।

অসীম ছবি তোলার জন্য বিষয় খুঁজতে চলে যায়, এদিক ওদিক। আমি বসে ওদের জন্য অপেক্ষা করি একটি চায়ের দোকানের বেঞ্চে।

চা অত্যন্ত বিস্বাদ, দুধে ফোটানো, বেশি চিনি। কম চিনির ব্যাপারটা এরা বোঝেই না। আজকাল ট্রেনের চা-ওলারাও আগে থেকে মিষ্টি মিশিয়ে রাখে, তাতে বাইরে চা খাওয়ার আনন্দটাই চলে গেছে। মাটির ভাঁড়ও নেই, সেই সোঁদা গন্ধ মেশানো চায়ের জন্য মন কেমন করে।

সিগারেট টানতে-টানতে উলটোদিকের বাড়ির দেওয়ালে একটা বড় পোস্টার চোখে পড়ল। মাঝখানে একটি যুবকের ছবি, তার তলায় লেখা, দশ হাজার ডলার পুরস্কার।

উঠে গিয়ে ইংরিজিতে লেখা পোস্টারটি ভালো করে পড়লাম।

খুব মর্মস্পর্শী ব্যাপার। কানাডার এক মহিলা সেই পোস্টারটি লাগিয়ে গেছেন। ছবিটি তাঁর একমাত্র ছেলের, সে নিরুদ্দেশ। দু-মাস আগে সেই ছেলেটি এই মণিকরণ থেকে তার মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছিল, তারপর থেকে আর তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ভদ্রমহিলা নিজে এখানে এসেছিলেন খোঁজ করার জন্য। এই পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে পোস্টার লাগিয়ে গেছেন অনেক জায়গায়।

ফিরে এসে দোকানদারটিকে জিগ্যেস করলাম, ওই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেটির বিষয়ে কিছু জানেন নাকি?

দোকানদারটি বললেন, ওই বিদেশি যুবকটিকে তিনি চিনতেন। মণিকরণে থেকেছে অনেকদিন।

এই দোকানে চা খেতেও আসত। একদিন সে পার্বতী নদীর উৎস সন্ধান করতে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একা চলে গিয়েছিল পাহাড়ে। আর ফিরে আসেনি। পাহাড়ের পর পাহাড়, কোথায় সে হারিয়ে গেছে, কী করে আর জানা যাবে!

আমি পার্বতী নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

যুবকটি কি শেষ পর্যন্ত পার্বতীর উৎসমুখে পৌঁছতে পেরেছিল? কত দূর থেকে এসেছিল সে, একা-একা কেন গেল ওই দুর্গম পাহাড়ে।

সে বোধহয় এই নদীর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল। নদী তাকে বুকে টেনে নিয়েছে?

॥ ৮ ॥

প্রথমবার গিয়েছিলাম ট্রেনে। দ্বিতীয়বার গাড়িতে। বলাই বাহুল্য, প্রথমবারের রোমাঞ্চ অনেক বেশি ছিল।

বিচিত্র নামের জায়গা রাজা-ভাত-খাওয়া। সেখান থেকে ট্রেন। রাজাদের স্মৃতি-বিজড়িত হলেও জায়গাটি অকিঞ্চিকর, কিছুই নেই বলতে গেলে। জায়গাটি আমার বিশেষ কারণে মনে আছে। ওখানেই আমি তক্ষক নামে প্রাণীটি প্রথম দেখি। ছোটবেলা থেকে তক্ষকের ডাক অনেকবার শুনেছি। কিন্তু সচরাচর প্রাণীটিকে চোখে দেখা যায় না। অনেক পুরোনো বাড়িতে তক্ষক লুকিয়ে থাকে। ওদের ডাকও নির্দিষ্ট থাকে। কোনওটি প্রত্যেকবার পাঁচবার ডাকে, কোনওটা সাতবার। বেশ জোরে, 'তক্কো', তক্কো' করে ডাকে, সেই থেকেই নামটি এসেছে। লোকের ধারণা, তক্ষক একটা সাপ। মহাভারতে অতি বিষধর তক্ষক রাজা পরীক্ষিৎকে দংশন করেছিল। রাজা-ভাত-খাওয়া স্টেশনের বাইরে খুব কাছেই সেই ডাক শুনে দৌড়ে গিয়ে দেখি, একটা শালগাছের গায়ে উলটোদিকে মুখ করে আছে। সাপ মোটেই না, একটা গিরগিটির মতন প্রাণী। আরও একটু লম্বাটে, ধূসর। আমরা কাছে যেতেই সড়াৎ করে ডালপাতার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। তক্ষক কারুকে কামড়েছে বা তক্ষকের কামড়ে কেউ মারা গেছে, এমন কখনও শুনিনি। মনে হল, টিকটিকির মতনই নিরীহ প্রাণী।

রাজা-ভাত-খাওয়া থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ট্রেন, প্রধানত মাল বহনের জন্য। কাঠ ও ডলোমাইট নিয়ে যায়। যাত্রীর সংখ্যা সামান্য। বৃষ্টি পড়েছিল বলে যাত্রাটা আরও উপভোগ্য হয়েছিল। জঙ্গলে বৃষ্টি, আঃ, তার চেয়ে মাদকতাময় আর কী হতে পারে। মাত্র ষোলো কিলোমিটার পথ, কু-ঝিক-ঝিক করে ট্রেনটি চলছিল। ঠিক ছেলেবেলার মতন। এখন ট্রেনের শব্দ বদলে গেছে। সেই ট্রেন এখনও চলে কিনা, জানি না। দ্বিতীয়বার যখন যাই, তখন সেই ট্রেন বন্ধ ছিল সাময়িকভাবে। যেতে হয়েছিল গাড়িতে। গাড়িটা পাওয়া গিয়েছিল পর্যটন দপ্তরের সৌজন্যে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গাড়ির পথও মনোরম। কিন্তু বৃষ্টি পড়েনি। গাড়িতে শুধু স্বাতী আর আমি। যেহেতু আমার দ্বিতীয়বার, তাই আমি প্রথমবারের সঙ্গে তুলনা করছিলাম। কিন্তু স্বাতীর প্রথম দর্শনের জন্য মুগ্ধতা বেশি।

জয়ন্তীতে পৌঁছলাম দুপুরের আগেই। পি ডব্লু ডি বাংলোটি আগে থেকেই আমাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। পুরোনো আমলের বাড়ি, দোতলার দুটি ঘর, সামনে বারান্দা। এবং সেখান থেকেই দৃশ্যটি প্রথাসিদ্ধ সুন্দর। সামনেই নদী, ওপারে নিবিড় জঙ্গল, পটভূমিকায় পাহাড়। এরকম দৃশ্য কখনও পুরোনো হয় না।

নদীর নামও জয়ন্তী। জঙ্গলের ওপাশেই ভুটান, সেখানকার কোনও পাহাড় থেকে নেমে এসেছে। কিছুদূর বয়ে মিশে গেছে রাইডাক নদীতে। জয়ন্তীর মতন ছোট নদী সারাদেশে কত যে ছড়িয়ে আছে। ছোট হলেও নগণ্য নয়। লিটল ম্যাগাজিনের মতন, তেজ আছে। আগেরবার বর্ষার সময় এসে দেখেছি, বেশ লাফিয়ে-লাফিয়ে ছুটছিল। নৃত্যপরায়ণও বলা যায়। মনে হয়েছিল, এখন-

তখন গতি পালটে ফেলতে পারে। এখন অবশ্য শরৎকাল, জল অনেক কম। মাঝে মাঝে পাথর জেগে আছে, তবে ধারাটি ঠিক প্রবাহিত।

জয়ন্তীতে এসে একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। কেমন যেন নিঃশব্দ, জনশূন্য ভাব। আগেরবার ডিনামাইটের কোয়ারির জন্য অনেক লোকজন দেখেছি। মাঝে-মাঝে ডিনামাইটের বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যেত। এখন এত শুনশান কেন? চৌকিদারের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, পরিবেশ দূষণ সংক্রান্ত কী একটা মামলায় ডলোমাইট খোঁড়া সাময়িকভাবে বন্ধ আছে। ট্রেনও চলছে না। লোকজন আসবে কোথা থেকে?

নির্জনতাই তো বেশি পছন্দ হওয়ার কথা। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। আজকাল তো প্রসিদ্ধ সুন্দর জায়গাগুলিতে একেবারেই যেতে ইচ্ছে করে না। সেখানে লোকজন গিসগিস করে, আর বাঙালিদের এমনই সংগীত-প্রীতি যে জঙ্গলে গিয়েও ট্রানজিস্টার বাজাতে হয়। তবে, জায়গাটা এত ফাঁকা-ফাঁকা দেখে স্বাতীর মুখে-চোখে যেন খানিকটা অস্বস্তির ভাব। তার কারণ, আলিপুরদুয়ারে একজন স্বাতীর কানে-কানে বলে দিয়েছে, জয়ন্তীর পুরোনো বাংলোটায় ভূত আছে।

দুপুরটা আর বেরুনো হল না। বিকেলবেলা চা-পানের পর আমরা ভ্রমণের জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। সঙ্গে গাড়ি থাকলে একটা মুশকিল এই যে, পায়ে হেঁটে ঘোরাঘুরির সুখ পাওয়া যায় না, গাড়ির ড্রাইভার সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে আসে। আমরা গাড়ি নিতে না চাইলে সে মনে করে, তার ডিউটিতে বুঝি কিছু গাফিলতি হচ্ছে।

জয়ন্তী নদী হেঁটেই পার হওয়া যায়, গাড়ি চলার জন্যও একটা ফেয়ার ওয়েদার ব্রিজ মতন করা আছে, ওপারের জঙ্গলের মধ্যেও প্রশস্ত রাস্তা। আগেরবার লরি চলাচল করতে দেখেছি। এখন সব বন্ধ।

কিছুদূর গিয়ে ঢুকলে মহাকালের মন্দির দেখা যেতে পারে। মন্দির মানে কয়েকটি গুহা। সেখানে স্ট্যালাগটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের কিছু কিছু আকৃতি আছে, সেগুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, ভক্তরা মনে করে ঠাকুর-দেবতা। কাশ্মীরে অমরনাথের বরফের পিণ্ডটাকে যেমন অনেকে মনে করে শিবলিঙ্গ।

আমাদের সে পর্যন্ত যাওয়া হল না। হঠাৎ অন্ধকার হয়ে এল, এখনই সন্ধে হওয়ার কথা নয়, কিন্তু আকাশে ঘনিয়ে এসেছে মেষের গায়ের রঙের মেঘ। হেডলাইট জ্বালাতে হল গাড়িতে। ড্রাইভারটা গম্ভীর ধরনের। কিছু জিগ্যেস করলে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তর দেয়। একসময় সে বলে উঠল, স্যার, হঠাৎ হাতির পাল এসে পড়লে মুশকিল হবে। আগে একবার এরকম হয়েছিল, তখন গাড়ি ঘোরাতে এমন অসুবিধে হয়...

এখানে হাতির সংখ্যা প্রচুর। ছুটকো-ছাটকা দু-একটা বাঘও থাকতে পারে। উত্তরবঙ্গের বাঘদের ভয় পাওয়ার বিশেষ কারণই নেই। সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতন তারা অত চতুরও নয়, হিংস্রও নয়। চা বাগানের আশেপাশে যেসব লেপার্ডগুলো ঘুরে বেড়ায়, তারাও গাড়ি দেখলে ভয়ে পালিয়ে যায়। আসল সমস্যা হাতির পাল নিয়ে। তারাও যে তেড়ে এসে আক্রমণ করে, তা নয়, কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় তারা কোনও বিঘ্ন পছন্দ করে না। কাছাকাছি গাড়ি দেখলে খেলাচ্ছলে উলটে দিতেও পারে। আগেরবার আমি হাতির পালের গতি ফেরাতে জঙ্গল-কর্মীদের পটকা ফাটাতে দেখেছি।

ঝুঁকি না নিয়ে আমরা ফেরার পথ ধরলাম। সবে সন্ধে হয়েছে। এখনই ঘরের মধ্যে ঢুকে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। অত মেঘ, কিন্তু বৃষ্টি এল না। কিছুক্ষণ বসে রইলাম নদীর ধারে। দূরের পাহাড়ের রেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে আকাশে। অন্ধকার হলে সব জঙ্গলকেই গম্ভীর আর রহস্যময় মনে হয়।

যে-কোনও নদীর কাছে গেলে স্বাতী তার জল ছোঁবেই। বালিকার মতন লঘু পায়ে পাথরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে সে জলধারার কাছে গিয়ে আঁজলা করে জল মাথায় ছোঁয়াল। আমি

উঠে পড়লাম। কাছাকাছি সর-সর শব্দ হচ্ছে মাঝে-মাঝে। এখানে সাপ থাকা বিচিত্র কিছু নয়।

এইসব বাংলোয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতেই হয়। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দিতে পারলেই চৌকিদারের ছুটি। ভাত, ডাল, ট্যাঁড়শের তরকারি আর মুরগির ঝোল। এ ছাড়া অন্য কিছু আশা করাই যায় না।

খেতে-খেতে স্বাতী ফস করে চৌকিদারকে জিগ্যেস করল, এই বাংলোয় ভূত আছে?

চৌকিদার উত্তর না দিয়ে আমাদের দিকে চেয়ে রইল। তার এই নৈঃশব্দই রহস্যময়।

আরও একবার জিগ্যেস করায় সে বলল, কী জানি। আমি তো কখনও ওপরের ঘরে থাকিনি। তবে দু-একজন বাবু বলেছে—

চৌকিদারকে আরও জেরা করে জানা গেল, ইংরেজ আমলে নাকি এখানে এক মেমসাহেব খুন হয়েছিল। সে অনেককাল আগের কথা। সেই মেমসাহেবকে নাকি এখনও কেউ কেউ দেখে। এরকম গল্প থাকলে স্থানটি আরও রোমাঞ্চকর হয়। ভূত নয়, পেত্নী, মেমপেত্নী।

স্বাতী যে ভূতে ঠিক বিশ্বাস করে, তা নয়, কিন্তু ভূতের ভয় পেতে খুব ভালোবাসে। গা ছমছমানিটাই উপভোগ করে মনে হয়।

ভূতের কাহিনি যেখানে জড়িয়ে আছে, সেখানে ও রাত্তিরে বাথরুমে যেতেও ভয় পায় রীতিমতন। সত্যি সত্যি কোনও ভূতের সামনে পড়লে ও মূর্ছা যাবে নিশ্চিত, আবার কোনও একদিন একটা ভূত দেখে ফেলার ইচ্ছেও আছে পুরোপুরি। আমি অবশ্য ভূত বা ভগবানের দেখা কখনওই পাব না, তা জেনে গেছি অনেক কমবয়েসেই।

রাত্তিরবেলা দূরের শব্দও খুব কাছের মন হয়। হঠাৎ একটা জানলা যেন দড়াম করে অকারণেই বন্ধ হয়ে যায়। এইসব নিয়ে খানিকটা রোমহর্ষকভাবে কেটে গেল অনেকটা সময়, কিন্তু কোনও মেমসাহেবের ছায়া বা কায়া উঁকিঝুঁকি মারল না।

স্বাতী ঘুমিয়ে পড়ার পরও আমার ঘুম এল না। আমি বারান্দায় এসে একটা সিগারেট ধরালাম। এর মধ্যে সব মেঘ অদৃশ্য হয়ে গেছে, পুটুস করে একটা চাঁদও উঠেছে। বেশ ঝলমলে জ্যোৎস্না।

নদীটার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। এখানে-সেখানে জ্যোৎস্নায় চিকচিক করছে জল। পাথরগুলো দেখা যায় না। জয়ন্তী নদীর এ রূপ দিনেরবেলার চেয়ে একেবারে অন্যরকম। যেন এ এক মায়ানদী। দিনেরবেলা শব্দ শুনিনি। এখন শুনতে পাচ্ছি কলকল ধ্বনি। জলের মধ্যে যেন চাপা আলো জ্বলছে। এক-একবার এক জায়গার জল সরে যাচ্ছে অন্যখানে। হঠাৎ মনে হল, এই নদীতে বোধহয় রাত-দুপুরে পরি নামে। আমি ভূত বিশ্বাস করি না বটে, তবে পরি বা অপ্সসিদের সম্পর্কে বেশ বিশ্বাস আছে। কোনও না কোনওদিন অকস্মাৎ তাদের দেখা পেয়ে যাব—এরকম আশা করে আছি।

॥ ৯ ॥

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে আমার জন্ম। কিন্তু বাল্যকালে ফরিদপুর থেকে কলকাতা অনেকবার এসেছি বটে, কিন্তু এদিকে, আরও পুবে কখনও যাওয়া হয়নি, এমনকী ঢাকা শহরও দেখিনি। আমার প্রথম ঢাকা-দর্শন পাকিস্তান আমল শেষ হওয়ার পর, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসে।

তারপর বাংলাদেশে যাওয়া আসা করেছি অনেকবার, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই আটকে গেছি ঢাকায়। বার দু-এক চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ভ্রমণ করেছি যদিও কিন্তু অন্য জেলাগুলি দেখার সুযোগ

ঘটেনি। ঢাকার বন্ধুরা অন্য অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু আড্ডার নেশায় মেতে প্রতিবারই ঘনিয়ে এসেছে ফেরার দিন।

একবার অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল।

১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্রের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় কি না তা পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বহুদেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্ক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারত থেকে দশজন, সেই ভারতীয় দলটির মধ্যে কী করে যেন দৈবাৎ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হল। এই দলে আরও দুজন বাঙালি ছিলেন বটে, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী, দুজনেই দিল্লি প্রবাসী। পশ্চিমবাংলা থেকে আমিই একমাত্র।

নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, তাই সরকারিভাবে দারুণ খাতির-যত্নের ব্যবস্থা। বিমান থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গে কূটনৈতিক বিভাগীয় ব্যক্তিরা ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন, তারপর তুললেন ঢাকার সর্বোত্তম হোটেলে। সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। খাওয়া-দাওয়ার বাহুল্যের কথা আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। কে বলবে যে এক দরিদ্র দেশে এসেছে আর এক দরিদ্র দেশের মানুষ!

ইউরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকেও পর্যবেক্ষকেরা এসেছেন, সকলকে শুধু ঢাকায় বসিয়ে রাখার কোনও মানে হয় না। তাই প্রস্তাব নেওয়া হল যে পর্যবেক্ষকদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলায়। আমাদের আপ্যায়নের ভার যাঁরা নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেই সব কর্তাব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে চেনাশুনো, তাঁরা আমাকে জিগ্যেস করলেন, কোনও বিশেষ জেলা আমার পছন্দ কি না, তা হলে তাঁরা সেখানেই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রায় কিছু না ভেবেই আমি বললাম, বরিশাল!

তাঁরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকেই জানতেন যে আমার জন্মস্থান ফরিদপুর, তথা মাদারিপুর, আগে মহকুমা ছিল, এখন মাদারিপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা। আমি তো ইচ্ছে করলেই মাদারিপুর বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ পেতাম। কিন্তু সেখানে আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

আরও যে কত জেলা ছিল, তবু বরিশাল আমি বেছে নিলাম কেন? বরিশালে আমার তেমন চেনাশুনো কেউ নেই, আলাদা কোনও আকর্ষণ নেই। তবে কিছুদিন আগে তপনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা স্মৃতি-রম্যকাহিনিতে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিলাম, সেই জন্যই কি বরিশাল নামটা প্রথমে মনে এসেছিল?

আর একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটল। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর একজন যে পর্যবেক্ষককে আমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হল, সে আমার পূর্বপরিচিত তো বটেই, আমার প্রিয় ও বিশেষ স্নেহভাজন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার, অল্প বয়েস থেকেই সে দারুণ জনপ্রিয়, তা ছাড়াও তার মতন পড়ুয়া আমি খুব কম দেখেছি। বাংলাসাহিত্যের যাবতীয় রচনা তার পড়া, তার স্মৃতিশক্তিও ভালো, মিলনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র দফতরের এক তরুণ অফিসারকেও সঙ্গে দেওয়া হল, তার নাম আনোয়ার। বয়েস বেশ কম, প্রথম প্রথম তার ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট মনে হয়েছিল, সে আমাকে মিস্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করছিল। কোনও বাঙালির মুখে এরকম সম্বোধন শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে, কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট হতে চায়, সাহিত্যের ধার ধারে না, আমি যে কিছু লিখি-টিখি তা সে জানেও না। একদিন পরেই ভুল ভেঙেছিল, আনোয়ার আসলে বেশ লাজুক, রোমান্টিক, সাহিত্যপ্রেমিক, নিজেও কিছু-কিছু লেখে। আমি তার তুলনায় অনেক বয়স্ক লেখক বলেই সে প্রথমে

স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক সময় মৃদু গলায় জিগ্যেস করেছিল, আমি কি আপনাকে সুনীলদা বলে ডাকতে পারি!

নির্বাচনের দুদিন আগে আমরা গাড়িতে যাত্রা করলাম বরিশালের দিকে। গাড়িতে বরিশাল? পুরোনো আমলের মানুষেরা এ কথা শুনলে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবেন। বরিশাল অনেক নদী ও জলাভূমি ঘেরা জেলা, ট্রেনলাইন নেই, স্থলপথে যাওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না বহুকাল। নৌকো বা স্টিমারই ভরসা। পরাধীন আমলে সাহেবরা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রীবাহী স্টিমার চালাতেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশি স্টিমার সার্ভিস চালু করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পথঘাটের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না। সর্বত্রই মসৃণ রাস্তা। এত নদী, সব জায়গায় এখনও ব্রিজ তৈরি হয়নি, কিন্তু গাড়ি কিংবা বড় বড় যাত্রীবাহী বাস ফেরিতে পার করে দেওয়ার সুন্দর ব্যবস্থা। ফেরিঘাটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোট ন' বার ফেরিতে নদী পার হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে সময় লেগেছে পৌনে দু'ঘণ্টা।

ঢাকা থেকে এদিকে আসতে গেলে দুটি ঘাট দিয়ে ঢাকা পার হতে হয়। আরিচা ও মাওয়া। আমরা এসেছিলাম বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মাওয়া ঘাটে। এই বিক্রমপুরে ইমদাদুল হক মিলনের পৈতৃক বাড়ি। সে হাত তুলে কিছুদূরে তার বাড়িটা দেখাল। আমি এভাবে আমার নিজের বাড়ি দেখাতে পারব না। আমাদের মতন যাদের বাড়ির অস্তিত্ব এখনও ওই অঞ্চলে আছে, সেগুলি নাকি 'শত্রু-সম্পত্তি'। আমি কী করে আর একজন বাঙালির শত্রু হয়ে গেলাম, তা জানি না।

মাওয়া ঘাট থেকে যে স্টিমারে ওঠা হল, সেটি মস্ত বড়, প্রায় জাহাজের মতন, দিগন্ত বিস্তৃত পদ্মা। এখানকার ক্যান্টিনে খাওয়া হল ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত। খুব যে আহামরি লাগল, তা নয়। সাধারণ রান্না। আজকাল পূর্ব বাংলার রাঁধুনিরাও ঝাল দিতে ভুলে গেছে। পদ্মার ইলিশের চেয়ে এদিককার কোলাঘাটের গঙ্গার ইলিশের স্বাদ যে অনেক বেশি ভালো, তা শুনলে ওদিকে অনেকে চটে যায়। পদ্মায় অনেক বেশি ইলিশ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাদে এদিককার গঙ্গার ইলিশ জিতে যায়।

পদ্মা পার হওয়ার একটু পরেই আবার একটি নদী পার হতে হল। আড়িয়াল খাঁ, আমার ছেলেবেলাকার নদী! 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো!' আমার চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কী এক দুর্দান্ত, গর্জমান, অনবরত পাড়-ভাঙা নদীর ছবি আছে স্মৃতিতে, তার বদলে এখন চুপচাপ চলেছে নিরীহ, সাধারণ এক নদী। হয়তো আগেও এরকমই ছিল, বাল্যকালে সবই বড় বড় লাগে। ইস্কুলের মাঠটাকে মনে হয় প্রকাণ্ড, বাড়ির পাশের দিঘিটার ওপারও যেন ছিল রহস্যময় জঙ্গলে ঢাকা। এক-একটা রাস্তাকে মনে হত অনন্তের পথ। তা ছাড়া আড়িয়াল খাঁ-কে আমি হয়তো স্মৃতিতে ধরে ফেলেছি ভরা বর্ষার সময়কার রূপে। এখন প্রবল গ্রীষ্ম, সব নদীই শীর্ণ। এবং আছে ফরাক্কা বাঁধের সমস্যা, যে-জন্য বাংলাদেশে নদীগুলিতে জল কমে আসে। বাঁধ বেঁধে-বেঁধে পৃথিবীর সব দেশের নদীগুলিই যৌবন হারিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার মাঝখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হেঁটে বেড়ায়, বেলুড়ের কাছে আমি নিজে দেখেছি।

রাস্তার ধারে-ধারে গ্রাম ও শহরগুলির নাম লেখা। ফরিদপুর-মাদারিপুর পেরিয়ে গেলাম। একটা জায়গার নাম দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল একবার। ট্যাকের হাট! এর খুব কাছেই মা'র মামাবাড়ি আমগ্রাম। ওই মামাবাড়িতেই আমার প্রথম যৌন-উন্মেষ হয়েছিল। ওইখানে সাঁতার শিখি। যখন তখন ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে ন্যাংটো হয়ে এক হাতে উঁচু করে ধরে, আর এক হাতে সাঁতার কেটে খাল পার হয়ে গেছি। ওইখানেই প্রথম সামনাসামনি দেখি মৃত্যু, আমার দাদামশাইয়ের। ওখানেই প্রথম হাতেখড়ি। ওখানেই প্রথম দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠাবলি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে

আমি ছাদের এককোণে বসে কেঁদেছিলাম।

গাড়িটা একটু ঘোরালেই আমার সেই মামার বাড়ি—আমবাগান-আটচালা-পুকুর এখন কী অবস্থায় আছে দেখে আসতে পারি। না, যাব না, কিছুতেই যাব না।

বিকেলের মধ্যেই পৌঁছে গেলাম বরিশাল।

॥ ১০ ॥

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরিশাল শহর আমাদের আগমনবার্তা রটে গেল, যদিও কারুকেই আগে থেকে খবর দেওয়া হয়নি। আত্মগোপন করে থাকা মুশকিল। মিলন অত্যন্ত জনপ্রিয় সেখানে, তা ছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়, সে নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় সশরীরে, সুতরাং পাঠকদের কাছে তার মুখ বিশেষ পরিচিত। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকেও কেউ কেউ দেখে চিনতে পেরে যায়।

পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। নিয়মমাফিক আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের এস পি, পোলিং অফিসার কয়েকজনের কাছে খোঁজখবর নিতে গেছি। এই সব আমলারাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, আমি নিজে অবশ্য আপনার লেখা কিছু পড়িনি, কিন্তু আমার বউ আপনার ভক্ত, বাড়িতে আপনার বই আছে। আবার কেউ কেউ আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার কবিতার দু-চার লাইন মুখস্থ বলে দেয়, কিংবা মিলনের কোনও উপন্যাসের কাহিনি।

সাংবাদিকদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে পরদিন যেতে হল স্থানীয় প্রেস ক্লাবে। অনেকেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তাতে কিছুতেই রাজি হই না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আরও অনেক বাড়িতে যেতে হবে, তাদের বত্রিশ ব্যঞ্জন খেতে-খেতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। বাংলাদেশের মানুষদের মতন এত অতিথিপরায়ণ মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

বরিশাল শহরে হিন্দুদের সংখ্যা এখনও নগণ্য নয়। অশ্বিণী দত্ত এককালে ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা, এখানকার টাউন হলটি এখনও তাঁর নামে। বরিশালের আর একজন স্বনামধন্য পুরুষ ফজলুল হক। ভারতীয় কংগ্রেস যদি এক সময় তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা না করত, তা হলে বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হত।

এককালের সুখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ বা বি এম কলেজ এখনও সগৌরবে চলছে। সম্প্রতি এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে।

সন্ধেবেলা হোটেলের ঘরে বসে আড্ডা দিতে দিতে মিলন বলল, সুনীলদা, এই শহরে জীবনানন্দ দাশ কোন বাড়িতে থাকতেন, তা খুঁজে বার করলে হয় না?

মিলন কবিতা লেখে না, শুধু গদ্যকার, কিন্তু অন্যান্য অনেক গদ্যকারের সঙ্গে তার তফাত এই যে সে খুব কবিতা ভালোবাসে। অনেক সময় তার সঙ্গে আমার গল্প-উপন্যাসের বদলে কবিতা নিয়েই কথা হয়।

বরিশালে এলে জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়বেই, তাঁর বাড়িটি দেখার ইচ্ছে আমারও মনে উঁকি দিয়েছিল।

আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিক নিয়েছে নিঙড়ায়ে
নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস; এ সবুজ ঘাসের ভিতর
সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাচের মতন সাদা ঘাসের গায়ে
ভেরেণ্ডা ফুলের নীল ভোমরারা ঝুলিতেছে—সাদা স্তন ঝরে

করবীর; কোন এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে; নরম ব্যাকুল।

জিগ্যেস করলাম, সে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কি এতদিন পর? ওদের কেউ তো এখানে নেই শুনেছি।

মিলন বলল, লোকাল কারুর সাহায্য নিতে হবে। শহরটা আমিও ভালো চিনি না।

পরদিন একজন সাংবাদিককে পাকড়াও করা হল। সুবিধের মধ্যে এই যে, আমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি থাকে, পেট্রলের চিন্তা নেই, এবং ড্রাইভার ভদ্রলোকটি গোমড়ামুখো নন।

বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে, তার নাম বগুড়া রোড। সেই রাস্তার এক বাঁকের মুখে খুঁজে পাওয়া গেল সেই বাড়ি। আশেপাশে বড় বড় হর্ম্য উঠে গেছে, কিন্তু এ বাড়িটি ছিমছাম একতলা। গেট পেরিয়ে ছোট্ট একটি উঠোন, অনেকটা বাগানের মতন, এদিকে ওদিকে কয়েকটি ঘর, পাকা দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। বাড়িটিতে এখনও বেশ একটা শান্তশ্রী আছে। বর্তমানে এক মুসলমান পরিবার এখানে থাকেন, তাঁরা যত্ন করে আমাদের দেখালেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, এ বাড়ি একইরকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুটা অদলবদল ও সংস্কার হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু একেবারে খোল-নলচে বদলে যায়নি। একদিকের একটি ঘর দেখিয়ে একজন জানালেন যে সেটি প্রায় আগের মতনই আছে। কল্পনা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ ওই ঘরে বসে লিখতেন।

কতদিন তুমি আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে; সন্ধ্যায় ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে...

সে বাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ থাকিনি। একটা বাড়ি অত দেখবার কী আছে! এক ঝলক দেখলে বেশি মনে থাকে।

গেটের পাশে সে বাড়ির নাম লেখা আছে, 'ধানসিড়ি'। জীবনানন্দের আমলের নয়, বর্তমান মালিকেরা এই নাম দিয়েছেন। তাঁরা ওই কবির অনুরাগী।

তখন মনে হল, তা হলে ধানসিড়ি নদীটাও খুঁজে দেখলে হয়। ওই নামে সত্যি কোনও নদী আছে?

বরিশালের চেনা কয়েকজন তরুর লেখক ও সাংবাদিক জানাল যে, ওই নামে একটি নদী অবশ্যই আছে, তারা সবাই শুনেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, তারা কেউ জানে না নদীটা ঠিক কোথায়, কেউ দেখেনি। দেখার আগ্রহও হয়নি?

ধানসিরি নামে একটি নদী আছ অসমে। ওখানে সুবনসিরি, ধানসিরি এইরকম নদীর নাম হয়, কিন্তু বানান আলাদা। জীবনানন্দ লিখেছেন ধানসিড়ি, চন্দ্রবিন্দু দেননি।

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে
যেইখানে এলোচুলে রাজপ্রাসাদের সেই শ্যামা আজো আসে...

জীবনানন্দ নিশ্চিত আসামের নদীটির কথা লেখেননি, তাঁর নদীটি একান্তই বাংলার গ্রাম্য নদী। এক নামে একাধিক নদী থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইছামতী ও যমুনা নামে বহু জায়গায় আলাদা-আলাদা নদী আছে। বৈতরণী নামে নদীও একাধিক।

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে 'কীর্তনখোলা' নদী। বেশ নামটি। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কোনও কবিতায় 'কীর্তনখোলা' নামটি ব্যবহার করেননি, অথচ দূরবর্তী ধলেশ্বরীর কথা এসেছে বারবার।

'কীর্তনখোলা' নদীটির রূপ উপভোগ করা যায় না। এককালে বরিশাল শহরটি নাকি সুন্দর ছিল, নদীর ধার দিয়ে বেড়াবার রাস্তা ছিল, এখন তা বোঝার উপায় নেই। নদীর ধারে কল-কারখানা ও বড় বড় গুদামঘর নদীকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, নদী দেখাই যায় না প্রায়। জনসংখ্যার চাপে শহরটি শ্রীহীন।

নির্বাচনের দিনটিতে আমাদের কাজ বিভিন্ন পোলিং বুথ ঘুরে ঘুরে দেখা, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। কোথাও কোনও কারচুপি ও জোর জবরদস্তি চললে, বা সেরকম কোনও অভিযোগ শুনলে লিখে নিতে হবে। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ভোট চলল, অনেক পোলিং বুথের সামনে লম্বা লাইন, সুতরাং আমাদের করণীয় তেমন কিছু নেই। আমি ও মিলন ঘোরাঘুরির ফাঁকে-ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম ধানসিড়ি নদীটি।

আগেকার বরিশাল এখন অনেক ভাগ হয়ে গেছে, মহাকুমাগুলি এখন ছোট ছোট জেলা। যেমন ঝালকাঠি (উচ্চারণ ঝালোকাটি), পটুয়াখালি এগুলোও এখন জেলা। সব মিলিয়ে এখানে বলা হয় বৃহত্তর বরিশাল। এই বৃহত্তর বরিশালই আমাদের পরিদর্শন এলাকা। আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছি অনবরত। শহরের ছেলেরা কেউ ধানসিড়ি নদীর সন্ধান দিতে পারেনি, আমরা যে-কোনও নদীতে খেয়া পার হওয়ার সময় স্থানীয় লোকদের কাছে ধানসিড়ির খোঁজখবর নিই। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না।

ঝালকাঠির দিকে যাওয়ার জন্য প্রায়ই আমাদের একটি নদী পার হতে হয়। এদিকের অনেক নদীর নামই বেশ সুন্দর, যেমন, একটি নদীর নাম সন্ধ্যা! কিন্তু এই নদীটির নাম মোটেই সুন্দর নয়, বরং অদ্ভুত, মানে বোঝা যায় না। ডাবখান! কেউ কেউ বলল, এটা নদী নয়, কাটা খাল, যদি তাও বা, তা হলেই বা একটা খালের নাম ডাবখান হবে কেন? সমুদ্রের কাছাকাছি এই নদীমাতৃক দেশে ডাব পাওয়া যায় সর্বত্র, এখানকার ডাবের আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এখানকার সোনালি মর্তমান কলার স্বাদ অপূর্ব! কলা নয়, যেন ক্ষীর।

যাই হোক, এই ডাবখান পারাপারের সময় একজন মাঝি জোর দিয়ে বলল, হ্যাঁ, ধানসিড়ি নদী আছে, ওই তো ওদিকে। ওদিক পানে অনেকগুলো নদী মিশেছে।

ডাবখান নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো সড়ক নেই, মাঝিটি যেদিকটায় হাত তুলে দেখাল, সেদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খেয়ার লঞ্চ ছাড়া শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়ার নৌকোও আছে, সে নৌকো ভাড়া নেওয়া যাবে না। অন্য কোনও নৌকো নেই, বহু নৌকোই নির্বাচনের ডিউটি দিচ্ছে। কোনওক্রমেই কি ওই অনেক নদীর সঙ্গম স্থানটিতে যাওয়া যাবে না? খেয়ার ঘাটে অন্যান্য লোকদের জিগ্যেস করলে সকলেই মাথা নেড়ে বলে, মুশকিল, এখান থেকে যাওয়া খুব মুশকিল। কেউ কেউ বিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অকিঞ্চিৎকর নদী দেখার জন্য আমাদের এই ব্যাকুলতার কারণ বুঝতে পারে না। কী আছে সেখানে?

তা হলে, ধানসিড়ি নদীটি জীবনানন্দের স্বকপোলকল্পিত নয়, একটা ওই নামের বাস্তব নদী কাছেপিঠে আছে ঠিকই, সচরাচর যাতায়াতের পথে পড়ে না। ডাবখানের তীরে আমরা বেশি সময় কাটালে আমাদের সঙ্গী আনোয়ার বিনীতভাবে আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখনও অনেক পোলিং বুথ দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু যদি মারামারি না হয়, বুথ দখল বা বোমা ছোড়ার ঘটনা না ঘটে, তা হলে আর দেখার কী আছে? ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমরা অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিই। যেমন ফজলুল হকের বসতবাড়িটি দেখা হয়ে গেল। বেশ বড়, অনেকখানি ছড়ানো বাড়ি, এখনও বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা বোঝা যায়, সে বাড়ির একটি অংশ ফজলুল হকের ব্যবহৃত জিনিসপত্র নিয়ে একটি সংগ্রহশালা করে রাখা হয়েছে। আমি ফজলুল হককে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের মতন চেহারাটিও

যে বিশাল ছিল, তা তাঁর ব্যবহৃত চটি জুতো ও জল খাওয়ার গেলাসের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

ফজলুল হকের এক ছেলেও একজন রাজনৈতিক নেতা, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। জীবনানন্দ দাশের ছেলে ও মেয়ে দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বংশে আর কেউ নেই। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ যখন নিহত হন, তখন কবি হিসেবে কজনই বা চিনত তাঁকে। তাঁর বাড়িটি সংরক্ষণের কথা কেউ চিন্তা করেনি, এমনকী কলকাতাতেও কত হেঁজিপেঁজি লোকের নামে রাস্তা আছে, জীবনানন্দ দাশের নামে কোনও রাস্তার নাম রাখা হয়নি। অন্তত ট্রাম কোম্পানি তো তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনও ব্যবস্থা করতে পারত।

যেন চুম্বকের টানে আমরা ডাবখানের তীরে ফিরে যাই বারবার। ঝালকাঠির দিকে কী যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, এই উড়োকথা শুনে আমরা নদী পেরিয়ে সেদিকে গেলাম তৃতীয়বার।

ধানসিড়ি নামে নদী আছে, এটা জেনেই আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু মিলন নিরুদ্যম হতে রাজি নয়। তার বয়েস কম, জেদি স্বভাব, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সে ধানসিড়ি আবিষ্কার করবেই। এক জায়গায় একটা ছোট দোকানে সিগারেট কেনার জন্য থেমেছি, মিলন সেখানেও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। হঠাৎ একজন লোক বলল, ধানসিড়ি যাবেন? এই পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে যান না! মাইল দেড়েক যেতে হবে।

সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে অনেকখানি। এরকম একটা রাস্তা রয়েছে, তা আগে কেউ আমাদের বলেনি কেন? এ লোকটি কি সত্যি কথা বলছে? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে আমরা এগোলাম সেই প্রথম কাঁচা রাস্তা ধরে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা এসে থামল এক নদীর কিনারে। একটা খাটিয়ার ওপর কয়েকজন লোক বসেছিল, তাদের জিজ্ঞাসা করা হল, এটা কী নদী? তারা বলল, ধানসিড়ি।

এমন কিছু আহামরি রূপ নয় সে নদীর, তবু কেন নাম শোনামাত্র রোমাঞ্চ হল?

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায়;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধ ভরা জলে ভেসে ভেসে...

এককালে এই ধানসিড়ির তীরেও খেয়াঘাট ছিল, এখন ডাবখানের বুকে ফেরি লঞ্চ চলে। ওদিকে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তাই এপাশে বিশেষ কেউ আসে না। এক সময় এ নদীও যেন চওড়া ছিল, এখন মজে গেছে, একদিকে চড়া পড়ে যাওয়ায় সেদিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া। তবু এখনও এই নদী নাব্য, কিছু নৌকো চলাচল করে।

নদীর ঘাটে দাঁড়ালেই কি নদীকে চেনা যায়? নদীর সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক হওয়া দরকার। সাহেবরা সেইরকম মনে করে। একবার জামশেদপুরের দিক থেকে সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে এসেছে নদীর ওপর, পশ্চিম আকাশের সূর্য থেকে সত্যিই অনেকগুলি সুবর্ণরেখা নেমে এসেছে জলে, আমরা প্রথাগতভাবে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছি, আমাদের সঙ্গী ছিলেন কবি অ্যালেন গিনস্‌বার্গ, তিনি প্যান্ট-শার্ট খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নেমে গেলেন জলে। আর একবার একজন বেলজিয়ান কবি ভ্যারনার ল্যামবারসিকে নিয়ে কাকদ্বীপের দিকে বেড়াতে গিয়ে হারউড পয়েন্ট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় ভ্রমণ করছিলাম, মাঝগঙ্গায় ভ্যারনার হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। আমিও একবার, সেটা খুব সংগোপনে, মানসের জঙ্গলে মধ্যরাত্রিতে মানস নদী দেখে এমনই উতলা হয়েছিলাম, শরীর কাঁপছিল যৌন আবেগে, আর কেউ কোথ্থাও নেই,

রুপোলি জ্যোৎস্নায় নদীটিকে মনে হয়েছিল নারী, সম্পূর্ণ পোশাক খুলে সাঁতার কাটার ছলে সঙ্গম করেছিলাম সেই নদীর সঙ্গে।

এখানে তা সম্ভব নয়। একটা নৌকো এসে থামতেই সেটি ভাড়া করা হল। মাঝির নাম ফারুক, তার খালি গা, লোহা-পেটা শরীর, সঙ্গে একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি ওর নিজের নয়, অনাথ। আমরা কোথায় যাব? কোথাও যাব না, শুধু এই নদীতে কিছুক্ষণ ঘুরব শুনে ফারুক চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইল।

এ নদীর প্রস্থ, বড়জোর বাগবাজারের খালের দেড়গুণ, কোনও দিকেই ধানখেত নেই। একদিকে গ্রাম, কিছু কিছু বাড়ি ও গাছপালা, 'কাঁঠাল-ছায়া' আছে কি না বোঝা গেল না। অন্যদিকে বাঁধের ওপর বাবলা গাছের ঝাড় লাগানো হয়েছে। ওই বাবলা গাছগুলি ফারুক মাঝির ঘোর অপছন্দ, তার ধারণা, ওর জন্য হাওয়া গরম হয়, বারবার বলতে লাগল, হাওয়া গরম, দেখেন না ঘাম হচ্ছে, এ বাতাস ভালো নয়। অনাথ ছেলেটির জন্য ফারুকের খুব মায়া, নিজের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে তাকে ঘাম মুছে নিতে বলে।

আমরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ফারুককে জিগ্যেস করি, তুমি ভোট দিতে যাবে না?

সে বলল, আলবাত যাব। ভোট নষ্ট করব কেন? ভিড় কমুক, বিকেলে যাব। সকালে গিয়ে লাইন দিলে রোজগার করব কখন?

আবার জিগ্যেস করা হল, কাকে ভোট দেবে, ফারুক মিঞা?

সে চোখ ঘুরিয়ে বলল, তা আপনাদের বলব কেন? আমার প্যাটের কথা কেউ জানতে পারবে না?

তার নৌকোর ছইতে এক নেত্রীর ছবি সাঁটা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করতে সে হি হি করে হেসে বলল, ছবি থাকলে চক্ষে ধুলো দেওয়া যায়। প্যাটের কথা তবু প্যাটেই থাকেই।

বলাই বাহুল্য, ফারুকের মুখের ভাষা একেবারে অন্য রকম। সে-ভাষা আমি বুঝলেও অবিকল লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। এই নিরক্ষর মাঝিটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন।

কথা বন্ধ করে আমি সতৃষ্ণ নয়নে নদীর দু-দিকে চেয়ে থাকি। এককালে হয়তো এর ধারে-ধারে ধানখেত ছিল। জীবনানন্দ কি কোনওদিন সত্যিই এই নদীর বুকে নৌকোয় ঘুরেছেন? কিংবা শহরের অন্য লোকেদের মুখে শুধু নামটাই শুনেছেন।

নদীগুলো খুব বদলে যায়। ধানসিড়ি এখন একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ছোট নদী। আমি কপোতাক্ষ নদীতেও নৌকো চেপেছি, তার জল এখন কোনও মৃত পাখির চোখের মতন বিবর্ণ।

ক্রমশ ধানসিড়ি চওড়া হয়, সামনের দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি। ফারুক জানাল যে ওইখানে সাতখানা নদী এসে মিশেছে, ওখানে গেলে ঘূর্ণিতে পড়তে হবে। সুতরাং আমরা আবার নৌকো ঘোরাতে বললাম।

এই নদীর নামটি জীবনানন্দের এমনই ভালো লেগে গিয়েছিল যে তিনি বেশ কয়েকটি কবিতায় এই ধানসিড়ির উল্লেখ করেছেন।

এ সব কবিতা আমি যখন লিখেছি বসে নিজ মনে একা;
চালতার পাতা থেকে টুপটুপ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির;
কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর...

ফারুক মাঝির কথাবার্তা এমনই চিত্তাকর্ষক যে এরপর আমরা নদীটিকে ভুলে গিয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। সে কবিতা কাকে বলে জানেই না, তবু সে বলে যে যখন বাতাস থাকে না, তখনই বাবলা গাছগুলোর ভেতর থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে, এই নদীর জল

বড় গম্ভীর, ভোটের ঝগড়াঝাঁটি শেষ না হলে বৃষ্টিধারা নামবে না, ভোটের রেজাল্ট শোনার জন্য মেঘ চুপ করে বসে আছে...

এই ফারুককে নিয়ে কবিতা লেখা কত শক্ত!

॥ ১১ ॥

যে বাড়িতে বসে আমি চা খাচ্ছি, গত বছর সে বাড়ির অর্ধেক বন্যায় ডুবে ছিল। বাড়ির মালিক মোসলেম আলি, সচ্ছল, মধ্যবিত্ত, শিক্ষকতাও করেন। বাড়ির একটি অংশ পাকা, ঢালাই করা ছাদ, অন্য অংশে টিনের চাল। এ বাড়ির একটি কিশোর আমাকে শোনাচ্ছিল গতবারের অভিজ্ঞতার কথা। উনিশ-কুড়ি দিন বাড়ির সবাই মিলে ছাদের ওপর বাস করেছিল। আমি জিগ্যেস করলাম, সারা দিন-রাত ছাদে? বৃষ্টির সময় কী করতে?

ছেলেটি বলল, পাশের টিনের চালের তলায় মাচা বাঁধা হয়েছিল, সেখানে ঢুকে যেতাম। আর খাবার জল পেতে কোথায়? মাঝে-মাঝে একজন কেউ নেমে গিয়ে দূরের কোনও জেগে-থাকা টিউবওয়েল থেকে নিয়ে আসত। ছেলেটি পানি বলে না, আমার সামনে জলই বলতে লাগল বারবার। তার গলায় দুঃখের সুর নেই, এই বয়েসে কিছুদিনের জন্য সবাই মিলে ছাদের ওপরে থাকা, সেখানেই রান্না-খাওয়া অভিনব অভিজ্ঞতার মতন। সে বলল, আমাদের চেয়েও, যাদের মাটির বাড়ি তাদের কষ্ট হয়েছে বেশি।

যাদের মাটির বাড়ি বন্যায় গলে যায়, তারা অনেকে গাছের ওপর উঠে বসে থাকে। মানুষ কী করে দিনের পর দিন গাছের ওপর বাস করে, ঘুমোবার সময় পড়ে যায় কি না, এ ব্যাপারে আমার মনে একট খটকা ছিল! সাত লক্ষ বছর আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা গাছেই বাস করত, সেই স্মৃতি কি জিন-বাহিত হয়ে এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে? না, তা নয়। মাটির বাড়ির লোকেরা জল ধেয়ে আসার আগেই গাছের ওপর মাচা বেঁধে নেয়। মাঝে-মাঝে টুপটাপ করে দু-একটি শিশু জলে পড়েও যায়।

গ্রামের নাম পঞ্চানন্দপুর, মালদা শহর থেকে চব্বিশ-পঁচিশ কিলোমিটার দূরে। এ গ্রামের কাছেই গঙ্গা। আটানব্বই সালে এই অঞ্চলের বহু গ্রাম বানের জলে ডুবে গিয়েছিল। কয়েকটি গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এ বছর বর্ষা শুরু হবে আর সাত দিনের মধ্যেই। সকলের চোখে-মুখে আবার বন্যার আশঙ্কা।

বন্যা আমি কম দেখিনি। ছেলেবেলায় পূর্ববঙ্গে তো প্রতি বছর বন্যা হত। আমাদের বসতবাড়ি অবশ্য কখনও ডুবে যায়নি। তবে বন্ধুদের বাড়িতে খেলা করতে যেতে হলে সাঁতরে যেতে হত। ভিজে পোশাক গায়ে নিয়ে তো আর খেলা যায় না, তাই একটা ঝোঁপের আড়ালে গিয়ে ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে এক হাত উঁচু করে আর এক হাতে সাঁতরে যেতাম, ওপারের ডাঙায় উঠে আবার পরে নিতাম সেগুলো।

উনিশশো আটাত্তর সালের ভয়াবহ বন্যায় যখন কলকাতা ছিল জলবন্দি, হাওড়া-হুগলি-মুর্শিদাবাদের গ্রাম ছিল জলের তলায়, বম্বে রোডের মতো হাইওয়ে দিয়েও নৌকো চলেছিল, সেবারে নৌকোয় চেপে গিয়েছিলাম হাওড়ার গ্রাম দেখতে, মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম আর্মির হেলিকপ্টারে। তবে বন্যায় কোনও বাড়িতে বসে আমি আগে চা খাইনি।

শুধু চা নয়, সঙ্গে মুখরোচক নাস্তা ও মালদার বিখ্যাত আম খেয়ে আমরা একটি দল বেরিয়ে পড়লাম গঙ্গার উদ্দেশে। নৌকোয় চেপে ভাঙন ও ধ্বংসচিহ্ন দেখতে যাওয়া হবে।

এই দলে আমি যোগ দিলাম কী করে? আমাকে খবরের কাগজ থেকে রিপোর্ট করতে পাঠানো

হয়নি, এ ধরনের রিপোর্টিংয়ের বয়স আমি পেরিয়ে গেছি, পরবর্তী অগণন তরুণেরা এসেছে সুন্দর-ক্রুদ্ধ মুখে, এসব এখন তাদেরই কাজ। আমার এখানে আগমন অনেকটাই আকস্মিক।

কয়েকদিন আগে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিকাল মিউজিয়ামের অবসরপ্রাপ্ত পরিচালক শ্রী সমর বাগচী টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি অরুন্ধতী রায়ের লেখাটা পড়েছেন?

সমরবাবুর সঙ্গে আগে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না, টেলিফোনে সেই প্রথম আলাপ। মাত্র দুদিন আগে একটি ইংরেজি সাপ্তাহিকে অরুন্ধতী রায়ের নর্মদা-আন্দোলন, সেই প্রসঙ্গে ভারতের সমস্ত নদী-বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সংক্রান্ত অমানবিক কর্মকাণ্ড, ব্যর্থতা, সরকারি ও আন্তর্জাতিক জুয়াচুরি নিয়ে লেখাটি পড়ে আমি অভিভূত হয়ে আছি। প্রচুর পরিশ্রম, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও গবেষণার সমন্বয়ে লেখা এই রচনাটি মর্মস্পর্শী কিন্তু আবেগের বাহুল্য নেই, তথ্যবহুল অথচ সুখপাঠ্য। এই আধা-বাঙালি তরুণীটি একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন, 'গড অব স্মল থিংস', সেটি পড়ে আমার ভালোই লেগেছিল, যদিও আহামরি কিছু নয়, কিন্তু পরিবেশ সংক্রান্ত এই সুদীর্ঘ প্রতিবেদনটি যেন অনেক বেশি সার্থক।

সমরবাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে একটু আলোচনার পরেই তিনি বললেন, আমাদের পশ্চিম বাংলাতেও তো ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে অনেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, মালদহে এবারেও গত বছরের মতন বন্যা হতে পারে, মালদহে ও মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরে গঙ্গার ভাঙনে এই নদীর সম্পূর্ণ গতি পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা, এইসব নিয়ে কি বাঙালি লেখকরা কিছু লিখতে পারেন না?

আমি খানিকটা চুপসে গেলাম। এক-একজনের লেখার ধরন এক এক রকম। বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে, কোথাও গিয়ে, দেখেশুনে, লোকজনের সঙ্গে কথা বলে কিছু লেখার অভ্যেস আমার নেই, অচেনা লোকদের সঙ্গে আমি সহজ ভাবে মিশতে পারি না, কথা বলতেও পারি না। আমার ঝোঁক ইতিহাসের দিকে। সমরবাবুর প্রশ্নের উত্তরে আমি লজ্জা পেয়ে মিনমিন করে বললাম, ওই সব ব্যাপারে আমার তো কোনও অভিজ্ঞতা নেই, বিশেষ কিছু জানি না...। সমরবাবু বললেন, চার তারিখে আমরা একটা দল মালদা যাচ্ছি সবকিছু দেখতে, যাবেন আমাদের সঙ্গে? এমনিতে আমার হাতে এখন অনেক কাজ, অনেক কমিটমেন্ট, তা ছাড়া শারদীয়া সংখ্যায় লেখার প্রস্তুতিও তো নিতে হবে, তবু সেসব চিন্তা না করে হঠাৎ বলে ফেললাম, ঠিক আছে, যাব! কোন দল, কাদের দলের সঙ্গে, তা কিছুই জিগ্যেস করিনি।

মোসলেম আলির বাড়ির কাছেই গঙ্গা, কাছেই মানে প্রায় এক কিলোমিটার হাঁটা পথ। ৫ জুনের অসহ্য গরম একটা দিন, স্লেট রঙের আকাশ, ঠা-ঠা রোদ, একটা গাছের পাতাও নড়ছে না। আমার কোনওদিনই ছাতা ব্যবহারের অভ্যেস নেই, এখানে একজন জোর করে আমায় একটা ছাতা দিয়েছেন, টের পেলাম সেটার অশেষ উপকারিতা। মালদার গরমের সঙ্গে কলকাতার গরমের তুলনাই চলে না। ছাতার বাইরে যেটুকু অঙ্গে রোদ পড়ে, সেটুকু যেন পুড়িয়ে দেয়।

দলটি নারী-পুরুষ মিশ্রিত পনেরো-ষোলো জনের। সমরবাবু ছাড়া কয়েকটি চেনা মুখও পেয়েছি। 'হন্যমান'-এর লেখিকা ও কবি জয়া মিত্র পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে খুব উৎসাহী, হিল্লি-দিল্লি-রাজস্থান ঘুরে বেড়ান, তিনি আছেন এই দলে। সোনালি চা-বাগান-আন্দোলনখ্যাত চিন্ময় ঘোষকেও অনেকদিন চিনি, মাথার চুল ধপধপে সাদা, রোগা চেহারা, হাঁপানি অসুখ আছে, তবু অদম্য উৎসাহে তিনি সারাবাংলা ঘুরে বেড়ান, কোথায় যেন পড়লাম, তাঁকে আখ্যা দেওয়া হয়েছে 'বাউল কমিউনিস্ট', এই অঞ্চলে তিনি অনেকবার এসেছেন, প্রধানত তাঁর উৎসাহে এখানে গড়ে উঠেছে 'গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন নাগরিক কমিটি'। আরও কয়েকজন অল্প-চেনা, নতুন করে পরিচয় হল ড. কল্যাণ রুদ্রের সঙ্গে, উনি ভূগোলের অধ্যাপক, নদী-বিশেষজ্ঞ, গঙ্গা নিয়ে বিশেষ গবেষণা করেছেন। জ্ঞানী অথচ বিনীত মানুষ।

নৌকোটি বেশ বড়, যদিও নৌকো বললে ভুল হবে, এখন সবাই বলে ভটভটি। মোটর লাগানোর ফলে আধুনিকতার স্পর্শ পেয়েছে, দাঁড় বা লগি ঠেলতে হয় না, কিন্তু নৌকোর চেহারা ও মাঝিমাল্লাদের মলিন পোশাকের কোনও পরিবর্তন হয়নি, হয়তো তাদের আর্থিক অবস্থারও। একটি নিতান্তই বালক জল সেঁচছে, যার ইস্কুলে যাওয়ার কথা। একটু বাতাস থাকলে এই নৌকো-যাত্রা আরামদায়ক হতে পারত, কিন্তু প্রকৃতি একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প, রোদের ঝাঁঝ জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে একবারে।

গঙ্গার রূপ এখানে দেখতে একটুও ভালো লাগে না, বেঢপ, বেখাপ্পা! সমুদ্র অনেক দূরে, তবু নদী এমন ফুলে ফেঁপে চওড়া হবে কেন? মাঝখানে সুদীর্ঘ চড়া। এরকম রূপ হারাবার একটিই কারণ, ফরাক্কায় গঙ্গার গতি রুদ্ধ করা হয়েছে, লক্ষ্মী মেয়ের মতন গঙ্গা মেনে নেবে কেন, তাই তো সে দুধারে আয়তন বিস্তার করছে, বর্ষার সময় বিপুল জলরাশি নিয়ে ধাক্কা মারছে পাড়ে, আরও বিস্তৃত হওয়ার জন্য গ্রাস করছে গ্রামের পর গ্রাম।

এমনিতে অনাদিকাল থেকেই নদীতে বান হয়। কূল ছাপিয়ে বানের জল এসে দুপারের অনেক জমি ডোবায়, আবার নেমে যায় বানের জল, প্রচুর পলি পড়ে জমি হয় উর্বর। বন্যার সময় সাময়িক বিপদ ও বহু মানুষের গৃহচ্যুতি হলেও ফসলের উন্নতি হয় অনেক। কিন্তু নদীগুলিকে বাঁধবার ফলে এই স্বাভাবিক অবস্থা বদলে গেছে। নদীকে মাঝে-মাঝে জীবন্ত মনে হবেই। ফারাক্কার বিশাল বাঁধের বিরুদ্ধে চরম আঘাত দেওয়ার জন্য গঙ্গা যেন এখন ফুঁসছে, ফরাক্কাকে সে ভাঙতে পারবে না, কিন্তু ফরাক্কাকে এড়িয়ে সম্পূর্ণ অন্য পথে তো যেতে পারে!

গঙ্গার বুকে ফারাক্কার মতন একটা বাঁধের পরিকল্পনা হয়েছিল সেই ইংরেজ আমল থেকেই। গত শতাব্দীতেই সাহেবদের প্রধান চিন্তা ছিল কী করে কলকাতার বন্দরটাকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। কারণ ভারত-শোষণের যাবতীয় বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হত প্রধানত কলকাতা বন্দর দিয়ে। বিহারের রাজমহলের পাহাড়ি অঞ্চল ছেড়ে গঙ্গা বাংলার সমতল ভূমিতে এসে কিছুদূর প্রবাহিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ জেলার কাছে দুটি ধারায় ভাগ হয়েছে, সেখান থেকে একটির নাম পদ্মা, অন্যটির নাম ভাগীরথী। এই ভাগীরথীকে ইংরেজরা বলত হুগলি নদী, কিন্তু আপামর জনসাধারণ গঙ্গাই বলে। বরাবরই গঙ্গার প্রধান ধারা ওই পদ্মা, তুলনায় ভাগীরথী দুর্বল। মাঝে মাঝেই ভাগীরথী প্রায় শুকিয়ে গিয়ে কলকাতা বন্দর অকেজো হওয়ার উপক্রম হয়েছে, ইংরেজরা খোঁড়াখুঁড়ি করে কোনওরকমে ভাগীরথীকে চালু রেখেছে। ১৯৩০ সালে ২৬ ফুট ড্রাফটের জাহাজ কালকাতা বন্দরে আসা-যাওয়া করতে পারত বছরে প্রায় তিনশো দিন, স্বাধীনতার দেড় দশক পরেই সেরকম জাহাজের চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই বাধ্য হয়েই বর্ষায় গঙ্গার অতিরিক্ত জল ধরে রেখে, গ্রীষ্মে সেই জল ছেড়ে নদীকে সচল রাখার জন্য গৃহীত হয় ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনা। দুজন আন্তর্জাতিক নদী-বিশেষজ্ঞ —জে জে ড্রনকার্স এবং ডব্লু হেনসেন-এর পরামর্শ নিয়ে কাজ শুরু হয় ১৯৬২ সালে, শেষ হয় ১৯৭৫ সালে। আন্তর্জাতিক নদী-বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিশ্চিত খুব প্রয়োজনীয়, কিন্তু এই নদী ঘিরে কত মানুষের আবেগ-উন্মদনা, জীবিকা ও জীবদর্শন, লোককথা ও গান আছে, তা কি তাঁদের পক্ষে বোঝা সম্ভব? তাঁরা কি ভাবতে পেরেছিলেন, এই ফারাক্কাকে উপলক্ষ করে পাকিস্তান, পরে বাংলাদেশের সঙ্গে জলবন্টন নিয়ে আমাদের মন কষাকষি শুরু হয়ে যাবে? এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর কথাও নয় তাঁদের।

ফরাক্কার ফিডার ক্যানাল, জল ছাড়া না-ছাড়া, জলের পরিমাণ ভাগাভাগির চুক্তি, চুক্তি নিয়ে আন্দোলন, এইসব নিয়েই নানান খবর তৈরি হয়ে আসছে। কিন্তু ফারাক্কা বাঁধের উপরিভাগের যে-অংশ, সেখানকার মানুষের ভবিষ্যৎ নিয়ে আমাদের দিশি বিশেষজ্ঞ বা সরকার কোনও চিন্তা করেননি, কিংবা চিন্তা করলেও প্রকাশ করেননি। প্রকাশ না করারও যথেষ্ট কারণ আছে।

ছেলেবেলায় সিরাজউদ্দৌল্লা নামে একটি নাটকের রেকর্ড খুব বিখ্যাত ছিল। টিভি তো দূরে

থাক, অডি ক্যাসেটও তখন অকল্পনীয়, একমাত্র ভরসা রেডিয়ো, সেখানে প্রায়ই শোনানো হত নাটকটি, নির্মলেন্দু লাহিড়ির কাঁপা কাঁপা গলায় ট্র্যাজিক নায়ক সিরাজের সংলাপ বুক কাঁপিয়ে দিত। সেই নাটকে নিয়তির গানের মতন এক মাঝির মুখের গান ছিল এই রকম ঃ নদীর এ কূল ভাঙে, ও কূল গড়ে, এই তো নদীর খেলা—সকালমেলা আমির রে ভাই, ফকির সন্ধ্যাবেলা, এই তো নদীর খেলা...। নদী এবং মানুষের জীবন সম্পর্কে অতি সরল সত্য কথা। একসময় মাদারিপুর শহরের পাশে বর্ষায় প্রমত্ত নদ আড়িয়াল খাঁর পাড় ভাঙা দেখে আমার ওই গানটি মনে পড়ত; এখনও নৌকোয় যেতে যেতে গঙ্গার পাড় ভাঙার দৃশ্য দেখতে দেখতে মনের মধ্যে গানটি গুনগুনিয়ে ওঠে।

পুরোনো ম্যাপে দেখা যায়, রাজমহল থেকে ফরাক্কা পর্যন্ত গঙ্গার প্রবাহ প্রায় সরলরেখার মতন। কিন্তু নদী কক্ষনও চিরকাল সরল থাকে না, নদী তো আর খাল নয়, এখন স্যাটেলাইটের ছবিতে স্পষ্ট বোঝা যায়, গঙ্গা এই অংশে বেঁকে গেছে কাস্তের মতন, এবং সেই বাঁকটি মালদা জেলার দিকে। অর্থাৎ প্রত্যেক বর্ষায় ক্রুদ্ধ জলের তোড় ধাক্কা মেরে খেয়ে নিচ্ছে মালদার গ্রামের পর গ্রাম, অপর পারে বিহার, সেখানে জেগে উঠেছে চর, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের দিক সংকুচিত হয়ে বিহারের জমি বাড়ছে। আবার ফরাক্কা পেরিয়ে গঙ্গা ধাক্কা মারছে ডানদিকে, অর্থাৎ মুর্শিদাবাদের ভূমিক্ষয় হচ্ছে নতুন চর উঠছে বাংলাদেশে। নদী কখন ডানদিকে, কখন বাঁ-দিকে ধাক্কা মারবে, সেটা তার খেয়াল বলা যেতে পারে। মনে হয় যেন, ফারাক্কার প্রতি আক্রোশে গঙ্গা পশ্চিমবাংলার ওপরেই প্রতিশোধ নিতে চাইছে।

ভূমিক্ষয়ের চেয়েও আরও অনেক বিপদের খাঁড়া মালদা জেলা ও শহরের ওপর দোদুল্যমান।

এখানে গঙ্গার ধারার খুব কাছাকাছি আছে আরও কয়েকটি ছোট নদী। পাগলা, ভাগীরথী (অন্য এক অকিঞ্চিৎকর ভাগীরথী), কালিন্দী, ফুলহার এবং মালদা শহরের পাশে মহানন্দা। পাগলা নদীর সঙ্গে এখন গঙ্গার দূরত্ব আধ কিলোমিটারেরও কম। প্রচুর পলি জমে জমে গঙ্গার খাত এখন অনেক উঁচু হয়ে গেছে। বর্ষার সময় গঙ্গায় জল হয় তিরিশ-বত্রিশ লক্ষ কিউসেক, কোনও কোনও বছর হঠাৎ এর চেয়ে আরও বেশিও হতে পারে, সেই বিপুল জলরাশি ফরাক্কায় গিয়ে ধাক্কা মারে, (সেখানকার ১০৮টি স্লুইস গেটের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই এখন আর খোলা যায় না, চর উঠে, পলি জমে অবরুদ্ধ হয়ে গেছে) আবার ফিরে আসে, মানিকচক ও কালিয়াচকের মধ্যবর্তী গ্রামগুলি গ্রাস করতে থাকে। যদি একবার গঙ্গা এসে পাগলা নদীকে ছুঁয়ে দেয়, তখন আরও নদীগুলি মিলিয়ে সে দিকেই হয়ে যাবে গঙ্গার মূল প্রবাহ, সেই নতুন গঙ্গা ফরাক্কাকে পাশ কাটিয়ে, কাঁচকলা দেখিয়ে সোজা গিয়ে মিশবে বাংলাদেশের পদ্মায়। এই পঞ্চানন্দপুরের মতন অসংখ্য গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, মালদা শহরও পরিণত হবে জলাভূমিতে। এটা শুধু সম্ভাবনা নয়, রীতিমতন বাস্তব আশঙ্কা।

বাংলাদেশে তখন পানি ভাগাভাগি নিয়ে অভিযোগের অবকাশই থাকবে না, ফরাক্কা বাঁধের বাধা না থাকায় পুরোটাই চলে যাবে পদ্মায়। কিংবা উলটো ব্যাপারও হতে পারে, অচিন্তনীয়ভাবে এত বেশি পানি পেয়ে পদ্মা শুরু করতে পারে তাণ্ডবলীলা, যেমন হয়েছে অতীতে, পদ্মা যে কত প্রাসাদ, অট্টালিকা সমেত জনপদ খেয়ে ফেলেছে, তার কি ইয়ত্তা আছে? সেই জন্যই তো পদ্মার আর এক নাম ছিল কীর্তিনাশা। তখন হয়তো বাংলাদেশ আবার দাবি করবে, এত বেশি পানি চাই না, ফিরিয়ে নাও, ফিরিয়ে নাও। সেখানকার মৌলবাদীরা বলবে, গঙ্গাকে বাঁধনমুক্ত করা ভারতের এক ষড়যন্ত্র।

গঙ্গার গতি পরিবর্তন রোধ ও মালদাকে বাঁচানোর জন্য কর্তৃপক্ষ কী ব্যবস্থা নিয়েছেন? ১৯৭৮ সালে গড়া হয়েছিল প্রীতম সিংহ কমিটি, তার রিপোর্ট পেশ করা হয় দুবছর বাদে। বন্যায় বহু চাষের জমি নষ্ট হয়, কিন্তু তা রোধ করার জন্য নদীর পাড় বাঁধানোর যে বিপুল খরচ, সেই তুলনায় কৃষি-ক্ষতি অনেক কম। তবে ধুলিয়ান, ঔরঙ্গাবাদ, গিরিয়া, কুতুবপুর, শেখ আলিপুর, সাঁকো পাড়া ইত্যাদি জনবহুল অঞ্চলে পাথর দিয়ে পাড় বাঁধাবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। অনেক জায়গায়

এরকম বাঁধ দিতে বহু কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এখন আরও একটি অন্য উপায় অবলম্বিত হচ্ছে। তার নাম স্পার (SPUR), বাঁধ থাকে নদীর সমান্তরাল, স্পার নদীর গর্ভে নেমে আসে, যাতে স্রোতের ধাক্কা প্রতিহত হতে পারে। এসবই যেন কোনও দৈত্যের হাতে বাচ্চা ছেলের খেলনা দিয়ে ভোলাবার চেষ্টা। ১৯৯০ সালে আখেরিগঞ্জে ছ'কোটি টাকা খরচ করে যে-বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, মাত্র পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে নদী তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়।

বাঁধের প্রসঙ্গ উঠলেই এখানকার সাধারণ মানুষ হাসাহাসি করে। দশ কোটি টাকা বাজেট শুনলেই বলে বড়জোর অর্ধেক। অর্থাৎ অর্ধেক টাকা চুরি হবেই। চুরি শব্দটা ব্যবহার করা বোধহয় ঠিক হল না, প্রমাণ করতে হয়। এসব কখনও প্রমাণ হয় না। তবে কি তছরূপ? তারও প্রমাণ লাগে। অনায়াসে বলা যায় বে-হাত। অর্ধেক টাকা যে অনেকগুলি অদৃশ্য হাতে হাতে চলে যাবে, তা সবাই দিন ও রাতের মতন স্বাভাবিক ঘটনা বলেই ধরে নিয়েছে। বাকি অর্ধেক টাকাও আক্ষরিক অর্থেই জলে যায়। কোনও বাঁধ বা স্পারই দু-তিন বছরের বেশি টেকে না।

নৌকোয় যেতে যেতে আমরা এরকম অনেক ভাঙাবাঁধ ও গ্রামের ধ্বংসচিহ্ন দেখতে লাগলাম। কলকাতা থেকে আগত দলটির সঙ্গে স্থানীয় লোকজনও রয়েছে অনেক। কেউ গান গাইছে, না, হাস্য পরিহাস করছে না, সকালর মুখেই শুধু বন্যা ও ভাঙনের কথা। এঁরা ভুক্তভোগী, কেউ-কেউ দু-তিনবার বাড়ি-জমি হারিয়েছেন এবারের আসন্ন বর্ষায় আরও কতখানি বিপদ আসবে সেই চিন্তায় আকুল। সাপে যাকে কামড়ায়নি, সে যেমন সাপের বিষে যাতনা কতখানি তা বুঝবে না, তেমনই যাঁরা জন্মভিটে, বাড়ি-ঘর, নিজের হাতে লাগানো গাছ, নিজের প্রতিপালিত গরু-মোষ, হাঁস-মুরগি, হারায়নি, তাদের পক্ষে কী এদের মর্মবেদনা বোঝা সম্ভব? যেমন পূর্ববঙ্গ থেকে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছে, তাদের আর্থিক ও বৈষয়িক ক্ষতির চেয়েও মনঃকষ্ট যে বেশি, তা কি পশ্চিমবাংলার মানুষ ঠিকঠাক বুঝেছে কখনও?

এত ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও এরা কিন্তু এখনও নদীকে ভালোবাসে। নদীকে কে না ভালোবাসে? কিন্তু যেমন বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে, সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে, তেমনই নদীকেও নদীর খাতেই সবচেয়ে ভালো মানায়। নদী বিনা আমন্ত্রণে হুড়মুড় করে বাড়ির উঠোনে এসে হাজির হলেই সর্বনাশ। 'নদী, তুমি নদীতেই থাকো, বাড়িতে এসো না', এই পঙ্‌ক্তিটি আমার মনে এসেছিল আড়িয়াল খাঁ নদীর বাড়ি-ঘর ভাঙার রুদ্ররূপ দেখার স্মৃতিতে।

এক জায়গায় একটি নতুন স্পার তৈরি হচ্ছে দেখে সবাই মিলে নৌকো থেকে নেমে পড়া হল। বড়-বড় গয়নার নৌকো থেকে নামানো হচ্ছে রাশি রাশি বোল্ডার। লৌহসদৃশ এই গ্রানাইট খণ্ডগুলি আনা হচ্ছে বিহার থেকে। নদীগর্ভে পলিথিনের শিট বিছিয়ে পাথর মুড়ে, বিদেশি টেকনোলজিতে নতুন ধরনের মজবুত স্পার গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এখানে। কাজ শুরু হয়েছে সবেমাত্র। একজন তরুণ ইঞ্জিনিয়ার কাজ তদারক করছেন, অনেকে মিলে প্রশ্ন করতে লাগল তাঁকে, আমার কাজ পাশে দাঁড়িয়ে শোনা। একজন জিগ্যেস করল, বরষা তো এসে গেল প্রায়, কাজ এত দেরিতে হচ্ছে কেন? তিনি উত্তর দিলেন, সরকার থেকে ওয়ার্ক অর্ডার এসেছে মাত্র সাত দিন আগে। (কেন ওয়ার্ক অর্ডার এত দেরিতে এসেছে, এর উত্তর তাঁর পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা তো সবাই জানি, রাস্তা সারাবার কাজ শুরু হয় বর্ষার ঠিক আগে, যাতে অর্ধেক ধুয়েমুছে যায়, পরের বছর আবার কাজ শুরু করতে হয়।) স্পারটি ঠিক এখানেই কেন গড়া হচ্ছে, স্রোত এখানে ধাক্কা খেয়ে কি অন্য জায়গায় পাড় ভাঙবে না? এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে, অদূরে ভাঙন শুরু হয়ে গেছে। তরুণ ইঞ্জিনিয়ারাটি বললেন, স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব তো তাঁর নয়। সেসব ওপর মহলের ব্যাপার। তাঁকে যেখানে কাজ করতে বলা হয়েছে, তিনি সেখানেই করবেন। ঠিকই কথা। জনসাধারণের সামনে এদেরই পড়তে হয়, অথচ যারা নীতি নির্ধারণ করেন, তাঁরা থাকেন অদৃশ্য।

দেখলেই বোঝা যায়, বর্ষার আর বড়জোর সাত দিন দেরি, তার মধ্যে এই কাজ শেষ হওয়া

সম্ভব নয়। সবেমাত্র বোল্ডারগুলি মজুরদের মাথায়-মাথায় নামছে। বারো কোটি সত্তর লক্ষ টাকার প্রকল্প। এর অর্ধেক টাকা কি ঘুষ খাওয়ানো হচ্ছে নদীকে? টাকাপয়সা কি নদীর কাছে সুখাদ্য? আমার খটকা লাগল। বালি ব্রিজ পার হওয়র সময় অনেককে গঙ্গায় পয়সা ছুড়ে দিতে দেখেছি। কেন দেয় লোকে? হিন্দুদের মধ্যে ঠাকুর-দেবতাদের টাকাপয়সা, সোনাদানা ঘুষ দেওয়ার প্রথা তো আছেই।

আবার নৌকোয়, এবং খানিক দূর যাওয়ার পর আবার একটি গ্রামের কাছে নামার উদ্যোগ নেওয়া হল। সবাই নামলেন, আমি ছাড়া। এই ৫ জুন যেন আমার অভিজ্ঞতায় উষ্ণতম দিন। এক একজনের শরীর এক-একরকম তাপ সহ্য করতে পারে। শীতে আমার কষ্ট হয় না, শূন্যের নীচে পঁচিশ ডিগ্রি ঠান্ডাতেও আমি সাবলীলভাবে ঘোরাফেরা করেছি। কিন্তু বেশি গরমে আমার মাথা ঝিমঝিম করে, অন্যদের তুলনায় আমার ঘাম হয় বেশি। পাঞ্জাবিটা ঘামে ভিজে সপসপে, তাতে শরীর অবসন্ন লাগে, তা ছাড়া হাঁটুতে একটা ব্যথা আছে বলে এবড়ো-খেবড়ো জমিতে হাঁটতেও অসুবিধে হয়। হঠাৎ অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে পড়লে অন্যরা বিব্রত হবেন বলে আমি আর নামলাম না। তাতে একটা সুবিধে হল, এখানকার কিছু লোকের সঙ্গে নিরিবিলিতে কথা বলা গেল।

নানা বয়সের কিছু লোক স্নান করছে এখানে। তারা নৌকোর কাছে এসে জিগ্যেস করতে লাগল, আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেন এসেছি, সরকারি লোক কি না ইত্যাদি। এদের মুখপাত্রটি নিজের নাম ঠিক কী বললেন, বোঝা গেল না, তবে বাংলা ফিল্মে এই ধরনের মানুষের নাম সৃষ্টিধর মণ্ডল বা গোবিন্দ সামন্ত হয়। সৃষ্টিধরই ধরে নেওয়া গেল, চেহারাটি বেশ আকর্ষণীয়, লম্বা-চওড়া, কপাট-বক্ষ, মহিষ-বর্ণ, কণ্ঠস্বর সুগম্ভীর। নিজের পরিচয় দিয়ে তিনি ঈষৎ গর্বের সঙ্গে জানালেন যে তিনি ক্লাস টেন পর্যন্ত পড়েছেন এবং অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারি করেন। (পরে একটি মুসলমান যুবকও বলেছিল, তার দাদারা বিএসসি, এমএসসি পাশ করেও চাকরি পায় না দেখে সে মাধ্যমিকের পর লেখাপড়া ছেড়ে দিয়েছে। এখন কোয়াক ডাক্তারি করে, ভালোই পসার, সেই জন্য একটি অবস্থাপন্ন পরিবারের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। কোয়াক শব্দটি তার নিজেরই ব্যবহার করা।) সৃষ্টিধরের বাপ-ঠাকুরদার আমলের বাড়ি আছে এই গ্রামে, সঙ্গে বাগান ও জমি, কয়েকবার বন্যা এসে ধাক্কা দিয়েও ভাঙতে পারেনি, তাঁর ধারণা, এবারে বন্যা হলে সবকিছু তলিয়ে যাবে।

তিনি অভিযোগের সুরে বললেন, নতুন স্পার তৈরি হচ্ছে পঞ্চানন্দপুর গ্রামটাকে বাঁচাতে, কারণ ওরা আন্দোলন-টান্দোলন করছে, তা হলে এ দিকের গ্রামগুলোর কী হবে? পঞ্চানন্দপুর মুসলমান-প্রধান গ্রাম, তাদের খুশি করার জন্য এরকম সরকারি সিদ্ধান্ত, এই তাঁর বক্তব্য। এবং আমাদের যদি কিছু করার ক্ষমতা না থাকে, তা হলে আমরা শুধু-শুধু রোদে পুড়ে শখ করে এসব দেখতে এসেছি কেন? ঠোঁটে হাসি এঁকে নিরুত্তাপ থাকা ছাড়া আর আমার উপায় কী?

বিকেলবেলা সভা শুরু হল গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধ অ্যাকশন কমিটির উদ্যোগে। পাগলা নদীর পাশ দিয়ে দিয়ে রাস্তা। আপাতত নিস্তেজ, ছোট নদী, কচুরিপানা ও দামে ভরা। এর নাম কেন পাগলা? অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই কিছু পাগলামি করেছে, এবং ভবিষ্যতে আরও অনেক খ্যাপামি করার অপেক্ষায় আছে? গঙ্গা নদী নিয়ে যেমন হিন্দুদের বহু পৌরাণিক কাহিনি ও লোককথা আছে, তেমনই মুসলমানদেরও আছে নিশ্চয়ই, তারাও তো বহু শতাব্দী ধরে বাস করছে এই নদীর দু-ধারে। আমাদের সঙ্গী একটি যুবক বলল, সে তার দাদির কাছে একটা গল্প শুনেছে। গঙ্গা আর এখানকার অন্য সব নদীগুলো মিলে সাত বোন, আর তাদের একমাত্র ভাই এই পাগলা। গঙ্গা তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য খুব ব্যাকুল। একদিন না একদিন আসবেই। এটা কি গল্প, নাকি প্রৌঢ়ার ভবিষ্যদ্বাণী?

সভা হবে একটা স্কুলবাড়িতে। সুকিয়া মহাজনী নামে এক মহিলার অনেক সম্পত্তি ছিল। তিনি সবকিছু দান করেন স্কুল তৈরি করার জন্য। তাঁর নামেই পঞ্চানন্দ সুকিয়া হাইস্কুল। বেশ মজবুত দোতলা পাকা বাড়ি, সামনে বিস্তৃত মাঠ, এখানে-ওখানে আমবাগান, এখন সব গাছ আমে ভরতি। সুন্দর পরিবেশ। শুনলাম, দুবার স্কুলটির স্থান পরিবর্তন করতে হয়েছে, এবারে বোধহয় এ বাড়িটিও

ছাড়তে হবে, কারণ সেই গঙ্গা।

পঞ্চানন্দপুরে পঁচাত্তর ভাগ মুসলমান, পঁচিশ ভাগ হিন্দু। আপাতত মনে হয় চমৎকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রয়েছে, বাস্তবে ঠিক ততটা নয়, কয়েকজন হিন্দু গুজগুজ করে আমাকে কিছু কিছু ক্ষোভের কথা জানিয়েছে। হিন্দুরা এখানে সংখ্যালঘু, সব জায়গাতেই সংখ্যালঘু মনস্তত্ত্ব একই রকম। এই প্রতিরোধ কমিটির সভাপতি হিন্দু, সম্পাদক মুসলমান, বক্তা ও শ্রোতারা অনেক দূর দূর গ্রাম, এমনকী মালদা শহর থেকেও এসেছেন, হিন্দু-মুসলমান মিশ্রিত। এখানে সবাই মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করার সংকল্প নিয়েছেন, দেখে ভালো লাগে।

বক্তারা কেউ অবান্তর কথা বলছেন না। নদীকেন্দ্রিক জীবন, বহু অভিজ্ঞতায় পোড়-খাওয়া একজন মানুষ যখন নিজেদের কথা বলে, তার ভাষার অভাব হয় না, তার বক্তব্য হয় নিখাদ। আর কোনও সভায় এত আগ্রহী শ্রোতা দেখেছি বলেও মনে হয় না। বিষয় শুধু নদী আর বাঁধ।

সমর বাগচী মশাইকে যত দেখেছি, ততই অবাক হচ্ছি। ছেষট্টি বছর বয়েস, শরীরে দু-একবার অপারেশন হয়ে গেছে, কিন্তু সারাদিন ঘোরাঘুরিতে একটুও ক্লান্তি নেই। আমি গরমে কাতর, তিনি নির্বিকার। চাকরি থেকে অবসর নিলেও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিজ্ঞান-চেতনা জাগাবার কাজ করে যাচ্ছেন, পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে ঘুরছেন গ্রামে গ্রামে। মনীষা নামে একটি তরুণীও কলকাতা থেকে এসেছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। তাঁকে দেখিয়ে জয়া মিত্র বললেন, সারা ভারতেই এখন পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে অনেক মহিলাই অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছেন। শ্রীমতী মেধা পটেকর তাঁদের প্রেরণাদাত্রী?

দ্বিতীয়ার্ধে ড. কল্যাণ রুদ্র অনেকগুলি মানচিত্র সহযোগে খুব সুবোধ্য ভাষায় গঙ্গা নদীর চরিত্র, গতি-প্রকৃতি, ফারাক্কা বাঁধের ভালো-মন্দ দিক এবং মালদা জেলাকে বাঁচাবার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করলেন। আমি কিছুক্ষণ বসে শুনলাম মনোযোগী ছাত্রের মতন, তারপর একসময় মনে হল, যথেষ্টরও বেশি হয়ে গেছে। একদিনে কি এত নদী সহ্য হয়? এখন ঘামে ভেজা জামাটা বদলানোই বেশি দরকার।

রাত ন'টা বেজে গেছে, অন্যরা কিন্তু তখনও আলোচনা চালিয়ে যেতে চান।

রাত্রে ওই স্কুলবাড়িতেই অন্যদের সঙ্গে আমার শোয়ার কথা, কিন্তু স্থানীয় উদ্যোক্তারা বেশি খাতির দেখিয়ে, আমার আপত্তি সত্ত্বেও প্রায় জোর করেই নিয়ে গেলেন কাছাকাছি এক গৃহস্থের বাড়িতে। সেখানে ইনভার্টারে একটি টেবিল-পাখা চলতে পারে সারারাত।

নতুন জায়গায় শুয়ে অনেকক্ষণ আমার ঘুম আসে না। বারবার মনে হতে লাগল, আমি এখানে কেন এসেছি? একদিন-দুদিন ঘুরে দেখায় কী আর এমন অভিজ্ঞতা হতে পারে? আসল দ্রষ্টব্য তো নদী নয়, মানুষ। সে জন্য একটানা অনেকদিন এখানে থেকে যাওয়া উচিত, তা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অরুন্ধতী রায় যা পেরেছেন, সেরকম আমি পারব কী করে? অরুন্ধতী একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছেন, আর লিখবেন না বলেছেন, এখন তিনি পুরোপুরি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, নর্মদা বিষয়ক নিবন্ধটি রচনার জন্য তিনি নিশ্চিত ছ'মাস বা এক বছর সময় নিয়েছেন। তাঁর ভাষা ইংরেজি, তিনি সারা দেশের, এমনকী বিদেশেরও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবেন। আমি গল্প উপন্যাস রচনাতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, ভালো হোক বা না হোক, সেটা আমার 'কর্ম'। কবিতা রচনা আমার প্রাণের শখ, সেসব ছেড়েছুড়ে এখন কি আর আমার পক্ষে সমাজকর্মী হওয়া সম্ভব? দুর্গত মানুষের পাশে গিয়ে এক-এক সময় দাঁড়াতে ইচ্ছে করে, অথচ পারি না, এক দারুণ বৈপরীত্য। এক দিকে আমি ব্যক্তিগত জীবনে ভ্রমণপিপাসু, আবার অন্যদিকে ঘরকুনো লেখক। আমি নিজে জানি, আমি অপরিশোধ্যভাবে জন্ম-রোমান্টিক। সেই জন্যই মানুষকে একটু দূর থেকে দেখি, জনসাধারণের মধ্যে মিশে গিয়ে সহজভাবে কথা বলতে পারি না। এটা আমার অযোগ্যতা হতে পারে, কিন্তু আমি এই ধাতুতে গড়া। দূর থেকে যেটুকু দেখি, তা লিখলে কি কারও কোনও কাজে লাগতে পারে?

আর একটা কথা মনে আসতেই শিহরণ হয়। ফরাক্কা বাঁধের আংশিক ব্যর্থতা সত্ত্বেও সরকার

সেটাকে টিকিয়ে রাখতে নিশ্চিত বদ্ধপরিকর। কারণ, তার সঙ্গে এখনও কলকাতা বন্দরের ভবিষ্যৎ, বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক ইত্যাদি বড়-বড় ব্যাপার জড়িত। তার জন্য মানিকচক, পঞ্চানন্দপুর, কালিয়াচক ইত্যাদি অঞ্চলগুলি যদি ভেসেও যায়, সেই ক্ষতি সারা দেশের তুলনায় কতখানি? সেই জন্য কি সরকার এবং সংশ্লিষ্ট সব কর্তৃপক্ষ এই অঞ্চলটাকে কনডেমড বলে ধরেই নিয়েছেন? বাড়ি-জমি সমেত এই কয়েক লক্ষ মানুষকে বাঁচাবার সত্যিই কি কোনও উপায় আছে?

নদীর গতি-প্রকৃতি অনেকটা পেন্ডুলামের মতন, একবার এ পার ভাঙে, ও পার গড়ে, আবার অন্যদিকে ফেরে। নদীর খাত যে-অঞ্চলসীমার মধ্যে বারবার পরিবর্তিত হয়, তাকে বলে মিয়েন্ডার বেল্ট, আজই কল্যাণবাবুর কাছ থেকে তা জেনেছি। মালদা-মুর্শিদাবাদে এই মিয়েন্ডার বেল্ট দশ কিলোমিটার ব্যাপী। দু-পারের এই ভূমি থেকে সমস্ত বসতি একেবারে সরিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু যাদের বাড়ি-ঘর ভাঙা হবে, তাদের পুনর্বাসন হবে কোথায়, কীভাবে? এই ব্যাপক উদ্যোগ কি সরকারের পক্ষে সম্ভব? সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে? ক্ষতিপূরণ বা রিলিফের টাকা কীভাবে, কত দিনে এবং শেষপর্যন্ত কতটুকু প্রকৃত প্রাপকের হাতে পৌঁছয়, তা কি আমরা জানি না?

মনে পড়ে, নদীর ঘাটে সেই সৃষ্টিধর নামের লোকটির শেষ উক্তি। প্রায় ধমকের সুরে তিনি আমায় বলেছিলেন, নদী তার ইচ্ছেমতন কাজ করবে। মানুষ তাকে বাধা দিতে পারবে? নদী যদি আমার বাড়িখানা খেয়ে ফেলতে চায়, খাক না। তখন আমি বিবাগী হয়ে যে-দিকে ইচ্ছে চলে যাব। তাতে আপনাদের কী আসে যায়? আপনারা দেখতে এসেছেন কেন?

ওই মানুষটির মনস্তত্ত্ব কি আমি কোনওদিন বুঝতে পারব?

বিজনে নিজের সঙ্গে

এই প্রথম এয়ারপোর্টে আমাকে কেউ পৌঁছে দিতে আসেনি। যদিও এবারেই আমি যাচ্ছি সবচেয়ে বেশি দূরে।

প্রথমবার যখন বিদেশে যাই, তখন সমস্ত এয়ারপোর্ট প্রায় ছেয়ে গিয়েছিল আমার বন্ধুবান্ধবে। সে কতকাল আগেকার কথা। তখন বিদেশ যাত্রা এখনকার মতন এমন জল-ভাত ছিল না। আর বাংলা কবিতা লিখে বিদেশে আমন্ত্রণ পাওয়া শুধু অভাবনীয় নয়, অবিশ্বাস্য মনে হত।

সেই প্রথমবার মনে হয়েছিল, আকস্মিকভাবে এই যে সুযোগ পেয়েছি, এই তো যথেষ্ট, আর কখনও যাওয়া হবে না, এবারেই প্রথম ও শেষ। আমার সেই যাওয়ার মূলেও ছিল প্রবল ইচ্ছাশক্তি। গরিবের ছেলে হলেও দৃঢ় সংকল্প ছিল, যে-কোনও উপায়ে বিশ্ব ভ্রমণে যাবই যাব। কোনও যোগ্যতা না থাকলেও জাহাজের খালাসির চাকরি নেব, রান্নাঘরের পাচকের তৃতীয় সহকারী হয়ে আলুর খোসা ছাড়াব, তবু তো দেখা যাবে অকূল সমুদ্রের রূপ, জাহাজ থামবে অচেনা বন্দরে-বন্দরে। কত ভ্রমণকাহিনিতে এরকম বিবরণ পড়ে উদ্দীপিত হয়েছি। বাঙালিদের মধ্যে বিশ্ব পর্যটক হিসেবে এক সময় খুব খ্যাতিমান হয়েছিলেন রামনাথ বিশ্বাস, তিনি ছিলেন আমার ছোটবেলার হিরো, ইস্কুল-বয়েসে সেই জলজ্যান্ত মানুষটিকে একবার দেখতে গিয়েছিলাম।

আমার সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় জাহাজে চাকরি নিয়ে অনেক বন্দর ছুঁয়ে এসেছেন। খুব সম্ভবত খানিকটা অগ্রজ শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরও এরকম অভিজ্ঞতা হয়েছিল। পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত পড়াশুনো করার জন্যে যারা বিলেত-আমেরিকায় যেত, তারা সবাই গেছে জাহাজে, আমার চোখের সামনে দিয়েই প্রায় গেছেন নবনীতা দেবসেন (তখন শুধু দেব) আর প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত।

আমি জাহাজ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয়েছি একটুর জন্য। ষাটের দশক থেকেই জাহাজগুলি যাত্রী বহন করা বন্ধ করে দিয়েছিল। বিমান যাত্রাই তখন সুলভ। আমেরিকার আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছিল বিশ্ব-পরিক্রমার বিমানের টিকিট। এর পরে আন্দামানের স্বল্প দূরত্ব ছাড়া আমি আর কখনও জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দিইনি।

নানান কার্যকারণবশত আমার বিদেশ ভ্রমণ প্রথমবারেই শেষ হয়ে যায়নি। আরও আমন্ত্রণ পেয়েছি বহুবার। কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দরে আমাকে বিদায় জানাবার জন্য আত্মীয়-বন্ধু-শুভার্থীর সংখ্যাও কমে যাচ্ছিল ক্রমশ। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই সংখ্যাটা কমতে-কমতে একেবারে শূন্য হয়ে যাবে?

প্রত্যেকবারই আর কেউ না হোক, স্বাতী অন্তত যায়। খুব ভোরে কিংবা মাঝরাত্তিরে ফ্লাইট হলে আমি নিষেধ করি, তবু সে শোনে না। আমার মা থাকেন বাগুইআটিতে, আমাকে দমদমে পৌঁছে দিয়ে স্বাতী আমার মায়ের সঙ্গেও দেখা করে আসতে পারে।

এবারেও আমার যাত্রা কাক-না-ডাকা ভোরে। অ্যালার্ম দিয়ে জাগতে হয়েছে রাত চারটের সময়। স্বাতী আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিল, কিন্তু আগের রাতে তার জ্বর এসে গেল খুব। শেষ রাতে উঠে আমার জন্য চা তৈরি করে দিল ঠিকই, কিন্তু মুখ চোখের অবস্থা বেশ

কাহিল, কাঁচুমাচু ভাবে বলল, শরীরটা বেশ দুর্বল লাগছে, আমি যদি তোমার সঙ্গে না যাই...। আমি তাকে আশ্বস্ত করে বললাম, না, না, শুধু-শুধু যাওয়ার দরকার নেই, আজকাল তো এয়ারপোর্টের ভেতরে যাত্রী ছাড়া অন্যদের ঢুকতেই দেয় না, আমাকে নামিয়েই চলে আসতে হবে, আর এত ভোরে মা-কে জাগাবারও কোনও মানে হয় না—।

এসব বললাম বটে, কিন্তু কুয়াশামাখা প্রায়ান্ধকার রাস্তায় গাড়িতে একা যেতে-যেতে আমি স্মৃতি-কাতরতা বোধ করছিলাম খানিকটা। কত দূর চলে যাচ্ছি, যদি আর ফেরা না হয়? যদিও এরকম চিন্তা অবান্তর, তবু মনে তো আসতেই পারে।

অন্যান্যবার কয়েকজন সঙ্গে আসে, বিশেষ ব্যবস্থা করে তাদের ভেতরে ঢোকানোও যায়, সুতরাং চেক-ইন করার পরও ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যায় গল্প-গুজব, হাসি-ঠাট্টার জন্য। এয়ারপোর্টে খবর দিয়ে রাখলে সিকিউরিটি কিংবা কাস্টমসের কোনও অফিসার এসে আমার দায়িত্ব নিয়ে নেন, আমাকে লাইনে দাঁড়াতে হয় না। আমার পাসপোর্ট ও টিকিট তাঁরা নিয়ে ব্যবস্থা করে দেন সব কিছুর। খবর না দিলেও কেউ না কেউ চিনতে পারেন, এগিয়ে আসেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। অন্য যাত্রীদের তুলনায় আমি সুযোগ-সুবিধে একটু বেশি পাই। এবারে খবর দেওয়া হয়নি, এবং কেউ আমাকে চিনতেও পারল না। অর্থাৎ যাত্রা শুরুর আগে থেকেই একাকিত্ব।

বিশেষ খাতির যত্ন পাওয়ার যেমন তৃপ্তি আছে, তেমনি কিছু না পাওয়ারও কৌতুক বোধ থাকে। আমি লাইনে দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, কাস্টমস-সিকিউরিটি বা এয়ার লাইনসের কোনও বাঙালি অফিসার এসে বলবেন, এ কী, আপনি লাইনে দাঁড়িয়ে! আমাদের খবর দেননি কেন? এর ঠিক আগের বারই তো কাস্টমসের কয়েকজন তরুণ অফিসার আমাকে খাতির করে ভেতরে নিজেদের ঘরে বসিয়ে চা ও খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আপ্যায়ন করেছিলেন।

এবারে শেষ পর্যন্তও কেউ এল না। বরং কাউন্টারের তরুণীটি আমাকে বিপাকে ফেলে দিল। মেয়েটি বাঙালি নয়। আমার আজকাল একটা গোঁয়ার্তুমি হয়েছে, কলকাতায় থাকলে সব সময় বাংলা বলি, তা সে তাজ বেঙ্গল হোটেলেই হোক বা বিমানবন্দরে। জানি, এসব জায়গায় অনেক অবাঙালি কাজ করে। তা বেশ তো, সকল ভাষাভাষীই স্বাগত, তা বলে কলকাতা শহরে চাকরি করতে হলে বাংলা ভাষাটা শিখে নিতে হবে না? প্লেনে ওঠার পর থেকে তো বাকি দিনগুলি ইংরিজিতে কাজ চালাতেই হবে, তার আগেকার কয়েক ঘণ্টাও বাংলা ছাড়তে হবে কেন? আমার বাংলা কথা শুনে এ তরুণীটি প্রথমেই আমাকে অপছন্দ করে বসল।

তরুণীটি আমার টিকিট উলটেপালটে দেখে বলল, এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দিতে হবে।

আজকাল এয়ারপোর্ট ট্যাক্স টিকিটের সঙ্গেই জোড়া থাকে। এর আগে অনেকবার বিদেশ যাত্রায় আমাকে আলাদা করে এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দিতে হয়নি। এবারে আমার আমন্ত্রণকারী আমাকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের টিকিট দিয়েছে। সে টিকিট সংগ্রহ করার জন্য আমাকে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের শহরের কার্যালয়ে যেতে হয়েছিল দুবার। সেখানে একটি তরুণী কর্মী বলেছিল, তাদের কাছে টিকিট সম্পর্কে যে নির্দেশ এসেছে, তাতে পৃথিবীর বিভিন্ন এয়ারপোর্টের ট্যাক্স ধরা নেই। অনেকগুলি এয়ারপোর্ট আমাকে পার হতে হবে। তার জন্য আমাকে দিতে হবে সাড়ে চার হাজার টাকা। তা শুনে আমার চক্ষু কপালে ওঠার উপক্রম। আহ্বায়করা বারবার জানিয়েছেন, আমাকে বিনা পয়সায় টিকিট পাঠাচ্ছেন, আমার কোনও খরচ লাগবে না, তা হলে কলকাতায় বিমান-অফিস এতগুলো টাকা চাইছে কেন? তরুণীটি তার কোনও সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারল না, মোট কথা ওই সাড়ে চার হাজার টাকা না দিলে তার পক্ষে টিকিট দেওয়া সম্ভব নয়। অত টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে যাইনি, পরদিন ভোরেই যাত্রা, সুতরাং ওখান থেকে বেরিয়ে সাড়ে চার হাজার ক্যাশ টাকা কোনওরকমে জোগাড় করে ফিরে আসতে হয়েছিল হুড়োহুড়ি করে।

মেয়েটি আমাকে টিকিট ও টাকার রসিদ দিয়েছিল, আমি বারবার তাকে জিগ্যেস করেছিলাম,

আর কোথাও আমাকে কোনও ট্যাক্স দিতে হবে না তো? সে আশ্বস্ত করেছিল, না, সব দেওয়া হয়ে গেল। সে ঠিক কথা বলেনি। তার কথা প্রথম মিথ্যে প্রমাণিত হল দমদমে। পরে আরও হয়রান হতে হয়েছে।

দমদমের কাউন্টারের তরুণীটিকে আমি রসিদটি দেখিয়ে বললাম, এই তো সব এয়ারপোর্ট ট্যাক্স দেওয়া হয়ে গেছে।

মেয়েটি বাংলা বোঝে, কিন্তু বলবে না। সে অসহিষ্ণুভাবে খানিকটা রুক্ষ ইংরিজিতে বলল, তুমি টাকাটা দাও, না হলে পরের যাত্রীর জন্য জায়গা ছেড়ে দাও!

এসব ক্ষেত্রে তর্কাতর্কি করতে গেলে পেছনের যাত্রীদের কাছ থেকে কোনওরকম সহানুভূতি পাওয়া যায় না। কালহরণ তাদের অস্থির করে তোলে। কিন্তু একই বিমান কোম্পানির এক কর্মী আমাকে বলেছে, পৃথিবীর আর কোথাও আমাকে পয়সা খরচ করতে হবে না। আবার অন্য এক কর্মী বলছে, দেশের মাটিতেই আমাকে অতিরিক্ত কর দিতে হবে। এই গরমিলের কোনও মীমাংসা হবে না?

জানি, তর্কে কোনও সুরাহা হবে না। জীবনে অনেক অযৌক্তিক ব্যাপারই তো আমাদের মেনে নিতে হয় মুখ বুজে।

কিন্তু উপরন্তু মুশকিল এই, আমার কাছে তো একটাও ভারতীয় টাকা নেই। আনিনি। কোনও প্রয়োজনই বোধ করিনি। আমাকে যদি দু-একজন পৌঁছে দিতে আসত, তা হলে তাদের কাছ থেকে তিন-চার শো টাকা পাওয়া যেত নিশ্চিত। এই একটা একা-আসার অপকারিতা টের পাওয়া গেল।

অগত্যা বাক্স-প্যাটরা সেখানেই রেখে আমাকে গিয়ে লাইন দিতে হল ফরেন এক্সচেঞ্জ কাউন্টারে। নিজের দেশে ডলার ভাঙিয়ে টাকা হাতে নেওয়ার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। দুর্লভ ডলার।

এক বিপত্তিকে অনুসরণ করে আসে আরও।

ফিরে আসার পর চেক-ইন কাউন্টারের তরুণীটি একটা দারুণ দুঃসংবাদ দিল।

দিনের বেলায় বিমান যাত্রায় আমি সব সময় জানলার ধারের আসন পছন্দ করি। কলকাতা থেকে সোজা লন্ডন দীর্ঘ সাড়ে দশ ঘণ্টার যাত্রা। ট্রেনে এই সময়টাকেও খুব বেশি মনে হয় না। মাটির সঙ্গে যোগ আগে বলেই হয়তো, তা ছাড়া মাঝখানের দু-একটা স্টেশনে থামে, নেমে হাত-পা ছড়িয়ে নেওয়া যায়। বিমানে এই সময়টাই বেশি বেশি লম্বা হয়ে যায়, যেন কাটতেই চায় না। এতক্ষণ টানা বই পড়াও যায় না। মাঝে-মাঝে বাইরের আকাশের দিকে তাকালে চোখ জুড়োয়। আমি মেঘবিলাসী, মেঘের খেলা কখনও পুরোনো হয় না। পঁয়ত্রিশ হাজার ফিট, এভারেস্ট শিখরের চেয়েও অনেক বেশি উচ্চতায় মেঘের কত বৈচিত্র্য, পাহাড়-মেঘ, দুর্গ-মেঘ, অরণ্য-মেঘ, দুধসাগর-মেঘ, কতবার কত মেঘ দেখার স্মৃতি অমলিন হয়ে আছে। পরিষ্কার ঝকঝকে দিনে অত উঁচু থেকে পৃথিবীর ভূমিও দেখা যায়, সমুদ্র কিংবা হ্রদ, তুষারমণ্ডিত পাহাড়। একবার করাচি থেকে বেইজিং যাচ্ছিলাম, পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল হিমালয়ের একটা অংশ পার হয়ে যাচ্ছি, তারপরই হঠাৎ মরুভূমি, টাকলা মাকান, দুদিকের প্রকৃতির এমনই কনট্রাস্ট যে রোমাঞ্চ হয়।

যারা হরদম বিমানে যাতায়াত করে, তারা অনেকেই জানলা পছন্দ করে না। তারা চায় ধারের সিট, যাতে ইচ্ছে মতন যখন তখন উঠে যাওয়া যায়। জানলার ধার থেকে কখনও টয়লেটে যাওয়ার জন্য বেরুতে গেলে পাশের যাত্রীদের খানিকটা অসুবিধে হয়ই। পাশের যাত্রীটি যদি চোখ বুজে থাকে, ঘুম ভাঙিয়ে তাকে পেরুতে লজ্জা করে। কয়েকজন আমাকে বলেছে, জানলার ধারে বসে দেখার কী আছে? খালি তো একঘেয়ে আকাশ কিংবা মেঘ! যাদের আকাশ এবং মেঘ একঘেয়ে লাগে, তারা ভিন্ন প্রজাতির মানুষ, তাদের সঙ্গে আমার বাক্য বিনিময় করতেও ইচ্ছে করে না, কিংবা, তাদের ভাষা আমি বুঝি না।

চেক-ইন কাউন্টারের মেয়েটি আমাকে বলল, জানলার ধারের সিট পাওয়া যাবে না। সব ভরতি হয়ে গেছে। আমি আকাশ থেকে পড়ার ভঙ্গিতে বললাম, আমি যে একটু আগে জানলার ধারের আসন চেয়ে গেছি। সে ফরাসি পুরুষদের কায়দায় কাঁধ ঝাঁকাল। শুধু তাই নয়, আমাকে একেবারে ধারের আসন বা আইল সিটও সে দিতে পারবে না। আমাকে বসতে হবে অন্য দুজনের মাঝখানে! অর্থাৎ লম্বা বিমান যাত্রায় সমচেয়ে কম আরামপ্রদ এবং অস্বস্তিকর জায়গা।

আমি বাংলায় কথা বলেছি বলেই কি মেয়েটি আমাকে এমন হেলা-তুচ্ছ করল? আমি বাংলায় তাকে একটা ধমক দিতেও পারতাম, কিন্তু অনেকেই জানে, আমি প্রকাশ্যে ঝগড়া খুব কমই করে থাকি। তবে নানা সময়েই মানুষের অসমীচীন ব্যবহারে ভেতরে-ভেতরে গজরাই। এমনকী যে-সমস্ত গালাগালি জীবনে কখনও উচ্চারণও করি না, অব্যক্ত ভাষায় তাও অনেকের প্রতি বর্ষণ করেছি!

আমার সঙ্গে কেউ আসেনি, তাই আমাকে ডলার ভাঙিয়ে ভারতীয় টাকা নিতে হল এবং সেই দেরির জন্য আমাকে বঞ্চিত হতে হল আকাশ দেখার সুখ থেকে। এয়ারপোর্টে আগে থেকে জানিয়ে রাখলেও সবকিছু অন্যরকম হত। খাতির পেতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি বলেই কি এইসব আমার বেশি-বেশি গায়ে লাগছে? সাধারণ যাত্রীদের তো এরকমই হয়, মাঝখানের সিটে কেউ না কেউ তো বসবেই!

এমনও হয়েছে, এয়ারলাইন্সের কোনও অফিসার আমাকে চিনতে পেরে এবং অতিরিক্ত খাতির দেখিয়ে, আমার ইকোনমি ক্লাসের টিকিট থাকা সত্ত্বেও বসিয়ে দিয়েছেন ক্লাব ক্লাসে কিংবা ফার্স্ট ক্লাসে। ফার্স্ট ক্লাসে তো রাজা-মহারাজাদের মতন আপ্যায়ন! সবচেয়ে স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েছিল জাপানে।

বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। নিপ্পন-বাংলা বন্ধুত্ব সমিতির আমন্ত্রণে গিয়েছিলাম টোকিও শহরে। সেবারে আমার সঙ্গে ছিল বাংলাদেশের কবি রফিক আজাদ আর কলকাতার আশিস সান্যাল। ফেরার দিনে এক দারুণ সঙ্কট। টোকিও শহরটি বিরাট লম্বা, আমরা যেখানে উঠেছিলাম, সেখান থেকে নরিতা এয়ারপোর্ট পৌঁছতে লাগে আড়াই ঘণ্টা। যে-বাংলাদেশি যুবকটি আমাদের পৌঁছে দেবে তার গাড়িতে, সে এল একটু দেরি করে, পথে যানজটে আটকে গিয়েছিল, আমাদের যাত্রা শুরুর পর বৃষ্টি নামল প্রবল তোড়ে এবং মাঝে-মাঝেই কঠিন কঠিন যানজট। এই বৃষ্টি ও যানজট গন্তব্যে পৌঁছবার সময়ের মধ্যে গণ্য করা হয়নি, সুতরাং বিমানবন্দরে পৌঁছতে খুবই দেরি হয়ে গেল, সকাল এগারোটায় ফ্লাইট, আর মাত্র ন'মিনিট বাকি! কাউন্টার বন্ধ হয়ে গেছে।

আমাদের টিকিট বাংলাদেশ বিমানের। কাউন্টার সামলাচ্ছে দুটি জাপানি মেয়ে। তারা জানাল যে আর কোনও উপায় নেই, মালপত্র সব তুলে দেওয়া হয়েছে, বিমান থেকে সিঁড়ি পর্যন্ত সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখন আর যাত্রী তোলার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

রফিক ও আশিসের সেই প্রথম বিদেশ যাত্রা। ওদের তুলনায় আমি যেহেতু অনেকবার আন্তর্জাতিক বিমানে যাওয়া আসা করেছি, তাই আমি জানি, এ অবস্থায় অনুরোধও করা যায় না। আমাদের জন্য তো ফ্লাইট বিলম্বিত হতে পারে না। বৃষ্টি এবং যানজটের কারণে যে আমাদের পৌঁছতে দেরি হয়েছে, তার জন্য তো এয়ারলাইন্স দায়ী নয়।

কিন্তু আমাদের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি। বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট সপ্তাহে মাত্র একবার, অর্থাৎ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে আরও সাতদিন। রফিক আজাদের ভিসার সেদিনই শেষ দিন, জাপানে ভিসার ব্যাপারে খুবই কড়াকড়ি। তা ছাড়া, এই সাতদিন আমরা থাকব কোথায়? জাপান পৃথিবীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল দেশ।

রফিক আজাদের গোঁফ বিখ্যাত, তার মুখমণ্ডলে সেটাই সবচেয়ে দর্শনীয়। কিন্তু জাপানের রাস্তাঘাটে একজনও গোঁফওয়ালা মানুষ দেখা যায় না। ওদেশের সম্রাট ছাড়া কেউ গোঁফ রাখে না, তাই রফিক লজ্জায় ও ঝোঁকের মাথায় তার গোঁফ কামিয়ে ফেলেছিল। একেই তো গোঁফের

অভাবে সে ম্রিয়মাণ, তার ওপর ভিসা ফুরিয়ে যাওয়া—এই সংকটে সে একেবারে চুপ। আমিও ধরেই নিয়েছি আজ আর যাওয়া হবে না এই সাতদিনের জন্য অন্য ব্যবস্থা চিন্তা করতে হবে। শুধু আশিস সান্যাল উত্তেজিতভাবে বারবার বলতে লাগল, আমাদের যেতেই হবে, যে-কোনও উপায়ে, আমরা থাকব কোথায়, ভিসাও ফুরিয়ে গেছে, আমাদের কাছে আর টাকাও নেই...। তার এই সরল স্বীকারোক্তি ও দাবিতে জাপানি মেয়ে দুটি একটুও বিচলিত হয় না, তারা যন্ত্রের মতন নিয়ম মেনে চলে। আশিসের প্রতি তারা একটিই বাক্য ব্যবহার করে, পৃথিবীর বহু এয়ারলাইন্সের কর্মী নানা অবস্থায় এই বাক্যটি যখন তখন বলে, লন্ডনেও আমাকে আর একবার শুনতে হয়েছিল, (সে কাহিনি পরে বলা যাবে) সে বাক্যটি হল, দ্যাটস ইয়োর প্রবলেম! অর্থাৎ এয়ারলাইন্সের যদি কোনও গাফিলতি না থাকে, তা হলে তুমি যে বিপদে পড়েছ, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতে যাব কেন? তোমার থাকায় জায়গা, ভিসা, টাকাপয়সা আছে কিনা, তা নিয়ে তুমি মাথা ঘামাও!

আশিস তাতেও নিরুদ্যম হল না। আশঙ্কায় তার চোখ-মুখ লাল হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আশিসেরই জয় হল প্রকারান্তরে। সে বারবার একই কথা বলায়, একটি মেয়ে খানিকটা বিরক্ত হয়ে টেলিফোন তুলে বলল, টক টু দ্য ম্যানেজার। অর্থাৎ বাংলাদেশ বিমানের ম্যানেজার সেই এয়ারপোর্টেরই কোথাও বসে আছেন। বাংলায় কথা বলার সুযোগ পেয়ে আশিস নবোদ্যমে সব বলতে লাগল আবার, ম্যানেজার মশাই তাকে থামাবার চেষ্টা করে জানাতে লাগলেন, আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে এভাবে দেরি করা যায় না। কথার তোড়ের মধ্যে আশিস একবার আমার নাম উচ্চারণ করে বলল, আমাদের সঙ্গে ইনি রয়েছেন, কলকাতায় তাঁর আগামীকালই খুব জরুরি কাজ আছে। ম্যানেজার জিগ্যেস করলেন, কী নাম বললেন? আশিস আবার আমার নাম বলায় ম্যানেজার বললেন, দাঁড়ান, আমি আসছি।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে দীর্ঘকায় সুদর্শন ম্যানেজারবাবু হন্তদন্ত হয়ে এসে তিনজনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, আপনাদের মধ্যে উনি কোন জন?

রফিক ও আশিস আমাকে দেখিয়ে দিল।

তিনি তো খুবই অপ্রত্যাশিতভাবে জিগ্যেস করলেন, 'পূর্ব পশ্চিম' আপনিই লিখেছেন?

কী করে প্রমাণ করব যে উক্ত উপন্যাসটি লেখার মতন অপকর্ম আমিই করে ফেলেছি? কিংবা এই ব্যক্তিটি যদি ওই বইটি পড়ে খুবই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে থাকেন (হতেই পারেন) তা হলে এখন, এই অবস্থায় পূর্ব পশ্চিমের পিতৃত্ব স্বীকার করা কিংবা অস্বীকার করা, কোনটা সঙ্গত হবে? এমন বলাই যায়, না, না। আমি নই, একই নামের অন্য ব্যক্তি।

আমাকে মুখে কিছু বলতে হল না। আশিসই অত্যুৎসাহে জানাল, হ্যাঁ। হ্যাঁ, উনিই।

এবারে ভদ্রলোক সবিস্ময়ে কয়েক পলক আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী আশ্চর্য কোয়েনসিডেন্স, আমি সেই বইটাই একটু আগে পড়ছিলাম, ফার্স্ট পার্টের দুশো সাঁইত্রিশ পৃষ্ঠায়, আর আপনি এখানে—

তৎক্ষণাৎ তিনি ফোনে প্লেনটি থামাবার নির্দেশ দিলেন। আমাদের মালপত্র চেক-ইন হল না। কনভেয়ার বেল্টে চাপাবার সময় নেই, সেগুলি হাতে নিয়েই আমাদের দৌড়তে হল, ম্যানেজার মহোদয় নিজেও আমাদের একটি সুটকেস বইতে লাগলেন, প্লেনে আবার সিঁড়ি জোড়া হল। বড় বড় সুটকেস সঙ্গে নিয়ে এয়ারক্রাফটের মধ্যে যাওয়া যে সম্ভব, তাই-ই আমি আগে জানতাম না। শুধু তাই নয়, আমাদের বসিয়ে দেওয়া হল ফার্স্ট ক্লাসে, এবং ম্যানেজারের নির্দেশ মতন সমস্ত যাত্রা-সময়টিতে বিমান কর্মীরা আমাদের তোয়াজ করতে লাগলেন অনবরত। সেই দিনই প্রথম মনে হয়েছিল, ভাগ্যিস দু-চারখানা বই লিখে ফেলেছিলাম, তাই তো আজ উদ্ধার পাওয়া গেল সমূহ দুর্বিপাক থেকে।

বাংলার গ্রন্থ রচনার জন্য অপ্রত্যাশিত খাতির পেয়েছিলাম জাপানে, বাংলাদেশ বিমানের

কাছ থেকে, আর বাংলায় কথা বলার জন্য আমারই নিজের জায়গা কলকাতার বিমান বন্দরে আমাকে পেতে হল এমন তাচ্ছিল্য? হয়তো তা নয়, আমি বেশি-বেশি স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছি, মেয়েটি সূক্ষ্মভাবে তার কর্তব্য করে যাচ্ছে মাত্র। তবু, জানলা দিতে না পারার জন্য সে একটু সামান্য দুঃখ প্রকাশ করলেও তো পারত।

এই দমদমেই আর একবার একটি মজার কাণ্ড হয়েছিল।

সেবারে যাচ্ছিলাম মস্কো, তখন সোভিয়েত ইউনিয়ানের আমল, সেখানকার সরকারের আমন্ত্রণ বলে টিকিট দেওয়া হয়েছিল এরোফ্লোট বিমানের। সে সময়ে এরোফ্লোটের কোনও সিট নাম্বার থাকত না। যাত্রীরা সবাই সমান, আগে থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে যে যেখানে দৌড়ে গিয়ে বসতে পারে। সেবারে আমাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আমাদের বিশেষ পারিবারিক বন্ধু রণজিৎ গুহ, রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে জেলখানা, সব জায়গার কর্তাব্যক্তিদের চিনতেন তিনি। এরোফ্লোটের কাজকর্ম দেখাশুনো করতেন এয়ার ইন্ডিয়ার অফিসাররা, সেখানে রয়েছে আমার ছোট শ্যালিকার স্বামী পার্থ মুখোপাধ্যায়। সুতরাং আমাকে বিশেষ খাতির দেখাবার জন্য অনেকেই ব্যস্ত। অন্য যাত্রীরা একজনও ওঠার আগে আমাকে নিয়ে আসা হল ফাঁকা এয়ারক্রাফ্টে। একেবারে সামনের দিকে পা-ছড়াবার মতন আরামদায়ক জায়গায় জানলার ধারে বসিয়ে দেওয়া হল, তারপর উঠল অন্য যাত্রীরা। একটু বাদে সিঁড়ি পড়ে গেল, দরজা বন্ধ হল, তবু বিমানটা ছাড়ে না, নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলেও। জানলা দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি, তখনও রণজিৎদা, স্বাতী ও আরও অনেকে দাঁড়িয়ে আছে টারম্যাকের এক প্রান্তে। হাওয়া-সেবিকারা ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছে, তাদের চোখে মুখে উদ্বেগের ছাপ। ক্রমে জানা গেল যে, সবাই বসার পর যাত্রী-যাত্রিণীদের মাথা গুনে নেওয়ার একটা প্রথা আছে, বিমান কর্মীরা অনেকে মিলে যতবার গুনছেন, কিছুতেই হিসেব মিলছে না, বেশি হয়ে যাচ্ছে একটি মাথা। শেষ পর্যন্ত সবার বোর্ডিং কার্ড পরীক্ষা করে দেখা হতে লাগল। আমার বোর্ডিং কার্ডটা বার করার পরই বোঝা গেল, সেটির তলার অংশ ছেঁড়া হয়নি। দু-তিনজন হাওয়া-সেবিকা তাদের সুন্দর মুখে এমন ক্রোধ-চঞ্চল নয়নে তাকাল, যেন আমাকে একেবারে ভস্ম করে দেবে! আমার জন্যই দেরি। আমার জন্যই বিমানটি মাটি ছেড়ে উড়তে পারছিল না। আমি অপরাধী মুখে বারবার ক্ষমা চেয়েছিলাম, যদিও প্রত্যক্ষভাবে আমি দায়ী নই।

অনেকবারই অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে, তবে এবারের মতন এমন মুখ চুন করে কখনও দেশ ছাড়িনি। অন্যবার দু-চারজন যাত্রী-যাত্রিণী অন্তত চেনা বেরিয়ে যায়। এবারে একজনও সেরকম কেউ ডেকে কথা বলল না, ইমিগ্রেশান-কাস্টমস-সিকিউরিটিতে কোনও ব্যক্তিই পাসপোর্টে আমার নাম দেখেও উচ্চবাচ্য করল না। যেন নিজের দেশ নয়, আমি অন্য কোনও অচেনা দেশের বিমানবন্দরে বসে আছি।

এবারের বিদেশ যাত্রা সম্পর্কে আমার বেশ বেশিই আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল, এখন সব যেন চুপসে গেছে, যেন মনে হচ্ছে, আমাকে পাঠানো হচ্ছে নির্বাসনে। আর কোনও দিনও ফেরা হবে না।

॥ ২ ॥

বিমানটিকে চাইল্ড স্পেশাল বলা যায়। একসঙ্গে এত বাচ্চা আমি আর কোনও ফ্লাইটে দেখিনি।

সামনে, পেছনে, চতুর্দিকেই অনেক যাত্রীর কোলেই একটি করে শিশু, তারা একসঙ্গে কান্না জুড়েছে।

বাচ্চাদের প্রতি যত স্নেহই থাক, তাদের কান্না বেশিক্ষণ সহ্য করা যায় না। বাচ্চারা তো

কাঁদেই বড়দের তিতিবিরক্ত করার জন্য, যাতে বড়রা অন্য সব কাজ ফেলে শুধু তাদের প্রতি মন দেয়। বিমান যাত্রার শুরুতে অধিকাংশ বাচ্চাই কাঁদে, তার অন্য একটা কারণও আছে। বিমানের উত্থান ও অবতরণের সময় কানে বাতাসের চাপ লাগে, বড়রা তা সহ্য করতে পারলেও বাচ্চাদের নিশ্চিত খুব কষ্ট হয়, তাই তারা চিল চিৎকার করে প্রতিবাদ জানায়।

হঠাৎ উপলব্ধি হল, পৃথিবীর সব শিশুদের কান্না একইরকম। মানুষের মধ্যে কতরকম জাতি, কত ভাষা, কত সংস্কার, কতরকম বিভেদ, সবই কৃত্রিমভাবে তৈরি করা, সব মানুষই একইরকমভাবে জন্মায়, জন্মের পর অন্তত দু-তিন বছর মানবশিশুর হাসি ও কান্নায় কোনও প্রভেদ নেই। রকেফেলার পরিবারের কোনও বাচ্চা আর কলকাতার বস্তির কোনও গরিব মায়ের সন্তান ঠিক একই সুরে কাঁদে।

কলকাতায় ইদানীং শ্বেতাঙ্গ বিদেশিরা বিশেষ আসে না। এই ফ্লাইটে কিন্তু প্রচুর সাহেব মেম আর তাদের কোলেই একটি করে কালো কালো বাচ্চা। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, এরা এসেছিল শিশু পুত্র-কন্যা দত্তক নিতে। নীল পাড় সাদা শাড়ি পরা একজন দিশি মহিলাকেও দেখা গেল। তিনি নিশ্চিত মাদার টেরিজার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি। অন্তত কুড়ি-পঁচিশটি বাচ্চা কলকাতা ছেড়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে চিরকালের মতন।

আমার সুইডেনের একটি দৃশ্য মনে পড়ল।

স্টকহল্‌ম শহরের মেট্রো ট্রেনগুলি অনেক গভীর। ওসব দেশে অনেক ভূগর্ভ ট্রেন লাইন দোতলা-তিনতলা হয়। সে রকমই একটা স্টেশনে এসকেলেটর দিয়ে নামার সময় মনে হয়, প্ল্যাটফর্ম কত নীচে, তলার মানুষগুলোকে ছোট ছোট দেখায়।

পাশ দিয়ে সিঁড়িও আছে। কিন্তু কোনও কারণে এসকেলেটর বন্ধ হলে অতটা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে কারুর-কারুর হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে।

ছোট ছেলেমেয়েদের কথা অবশ্য আলাদা। তারা অনেক সময় খেলাচ্ছলে এসকেলেটরের বদলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে-দৌড়ে ওঠা-নামা করে। একদিন আমি একটা এসকেলেটর দিয়ে নামছি, পাশের সিঁড়ি দিয়ে তিনটি কিশোরী সিঁড়ি দিয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় মেতেছে।

তাদের মধ্যে দুজনের গায়ের রং তুষার শুভ্র, অন্য জনের শ্যামলা। সেইজন্যই তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি যায়।

আমার সঙ্গী এক বাংলাদেশি যুবক বলল, ওই যে মেয়েটিকে দেখছেন, ও কিন্তু ইন্ডিয়ান। আমি চিনি ওকে। ওর এক বছর দু-মাস বয়েসে ওকে কলকাতা থেকে অ্যাডপ্‌ট করে আনা হয়েছিল। বাঙালিও হতে পারে। ওর অবশ্য কিছুই মনে নেই।

একটুপরে সেই মেয়ে তিনটি নেমে এল নীচের প্ল্যাটফর্মে। হাসির দমকে-দমকে হিলহিল করছে তাদের সারা শরীর। খুব সম্ভবত শ্যামল রঙের মেয়েটিই জিতেছে। তার চেহারায় স্বাস্থ্যের চমৎকার দীপ্তি, মুখখানায় সারল্যের পবিত্রতা মাখানো! যেন সে মন্দ কিছু চেনেই না।

এক বছর দু-মাস বয়েসে কলকাতা থেকে তাকে নিয়ে আসা হয়েছে। হতেও পারে সে কলকাতার কোনও বস্তিবাসিনীর মেয়ে, কিংবা অবাঞ্ছিত সন্তান হিসেবে তাকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল আঁস্তাকুঁড়ে। এরকম তো কতই হয়। যদি মেয়েটি বর্ধিত হত কোনও বস্তিতে, তা হলে এই তেরো-চোদ্দো বয়েসে সে নিশ্চিত ঝি-গিরি করত কয়েকটি বাড়িতে, এর মধ্যে যৌন-অভিজ্ঞতা হয়ে যেত অবশ্যই। কিংবা হাত-ফেরতা হয়ে চলে যেত হয়তো কোনও বেশ্যাপল্লীতে, তার মুখের এরকম সারল্য মুছে যেত কবে! দৈবাৎ শব্দটার মধ্যে দৈব মিশে আছে, ভাগ্য বললেও ঠিক বোঝায় না, যাই হোক, যে-কোনও উপায়ে সে এসে পড়েছে সুইডেনের মতন প্রাচুর্যের দেশে, কোনও ধনী পরিবারের সন্তান হিসেবে শুধু যে খাদ্য-বস্ত্র পেয়েছে তাই-ই নয়, পেয়েছে শিক্ষা, পেয়েছে সমবয়েসিদের সঙ্গে মেলামেশার সমান অধিকার। একটা অভাবনীয়, নতুন জীবন সে লাভ করেছে।

মেয়েটির সঙ্গে আমার একটু কথা বলার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ওসব দেশে অচেনা মেয়েদের

সঙ্গে কথা বলার কোনও সামাজিক জড়তা নেই। আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, তোমার নাম কী?

সে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল ইনগ্রিড। তারপরই সঙ্গিনীদের সঙ্গে দৌড়ে উঠে গিয়েছিল ট্রেনের একটা কামরায়। আর কিছু বলার সুযোগ পাইনি। কিন্তু আমাদের কলকাতার একটি অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত মেয়ে এদেশে এসে একটা পরিচ্ছন্ন, সুন্দর জীবন পেয়েছে দেখে আমার এতই ভালো লেগেছিল যে কান্না এসে গিয়েছিল হঠাৎ।

অনেকদিন আগে কলকাতার ফুটপাথবাসীদের সম্পর্কে একটি মর্মন্তুদ তথ্যচিত্র দেখে পল এঙ্গেলের প্রথমা পত্নী মেরি এমনই ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে, আমার সামনে তর্জনী তুলে তিনি বারবার প্রশ্ন করেছিলেন, তোমরা কলকাতার যারা ভদ্রলোক, তারা সব পরিবারে অন্তত একটি করে পথশিশুকে দত্তক নিতে পারো না! তা হলে অন্তত পঞ্চাশ-ষাট হাজার বাচ্চা তো বেঁচে যেতে পারে। নাও না কেন, কেন, কেন?

আমি উত্তর দিতে পারিনি।

আমাদের দেশে রক্তের সম্পর্ক বিষয়ে কুসংস্কার আছে। সেইজন্যই বেশিরভাগ মানুষ অজ্ঞাতকুলশীল শিশুদের পালিত সন্তান হিসেবে গ্রহণ করতে চায় না। আগেকার দিনে নিজেরই বংশের শাখা-প্রশাখার কোনও বাচ্চাকে দত্তক হিসেবে গ্রহণ করা হত। রক্তের সম্পর্ক ব্যাপারটা গুজব মাত্র, বহু পরিবারের রক্তেই ভেজাল আছে। এখন জিন-তত্ত্ব প্রাধান্য পাচ্ছে। মানব শরীরে জিনের মানচিত্রও তৈরি হয়ে গেছে। বাবা-মায়ের ক্রোমোজোম মিলনে শিশুরা জন্মায় বটে, কিন্তু দশ পুরুষ আগেকার জিনের স্বরূপও কোনও শিশুর মধ্যে বিকশিত হতে পারে। সুতরাং একটা ভিখিরির ছেলের দশ প্রজন্ম আগেকার পূর্বপুরুষ হয়তো ছিল কোনও বীর যোদ্ধা কিংবা দার্শনিক। এই জিন প্রভাবেই কোনও মুচির ছেলে এক শক্তিশালী দেশের রাষ্ট্রপতি হতে পারে, হয়েছেনও, যেমন জোসেফ স্তালিন। অবশ্য এর সঙ্গে পুরুষকারও যুক্ত করতে হবে। মহাভারতের কর্ণের উক্তি একেবারে অমোঘ, দৈবায়ত্ত কুলে জন্ম, কিন্তু পৌরুষ আমার নিজের করায়ত্ত। মেয়েদের ক্ষেত্রে পুরুষকারের কোনও সঠিক প্রতিশব্দ নেই, কিন্তু এই মানসিক শক্তির জোরেই ঘুঁটেকুড়ুনির মেয়ে হতে পারে রাজরানি।

পুরুষকারের এক বাস্তব, জীবন্ত, ঐতিহাসিক নিদর্শন হচ্ছেন চেঙ্গিজ খান। কৈশোরেই ক্রীতদাস, শুধু তাই নয়, তাঁর গলায় শিকল বেঁধে রাখা হত পশুদের মতন, সেই অবস্থা থেকে তিনি পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন। অনেকের মতে, এই চেঙ্গিজ খানই দ্বিতীয় সহস্রাব্দে কোনও মানুষের একক প্রচেষ্টায় উচ্চতম কীর্তি স্থাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক।

নিঃসন্তান দম্পতিরাই যে শুধু দত্তক গ্রহণ করবে, তারও কোনও মানে নেই। উন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়, এক পরিবারে নিজস্ব সন্তানের সঙ্গে প্রতিপালিত হচ্ছে একাধিক দত্তক। আমি নিজেই দেখেছি, আমেরিকায় একটি পরিবারে ঠিক সমবয়েসি চারটি ছেলেমেয়ে, তাদের মধ্যে একজন মাত্র গৃহকর্তার আত্মজ। সে যে কে তা চেনবার উপায় নেই, বাইরের লোকদের কাছে আলাদা করে তার পরিচয়ও দেওয়া হয় না। এঁদের যেহেতু অর্থ সামর্থ্য আছে, তাই আর তিনটি অনাথ শিশুকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ দিয়েছেন। আমাদের দেশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও গীতা মুখোপাধ্যায় আপন কন্যা করে নিয়েছেন বেশ কয়েকটি বাইরের মেয়েকে।

নিঃসন্তান দম্পতি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর একটি দত্তক নিলে তারপর কোনও কোনও পরিবারে একটি অতি মধুর সুখকর ঘটনা ঘটে। আমি নিজেই অন্তত দুটি ক্ষেত্রে এরকম দেখেছি। যে বধূটি কখনও গর্ভবতী হবে না বলে ধরেই নেওয়া হয়েছিল, চিকিৎসকরাও সে রকম বলেছিলেন, কিন্তু দত্তক নেওয়া সন্তানটির প্রতি সেই বধূটির অবরুদ্ধ স্নেহ যেমন মুক্তি পায়, সেই সঙ্গে-সঙ্গে হরমোনের নিঃসরণও শুরু হয়। খুলে যায় রুদ্ধদ্বার, হঠাৎ সে সন্তানসম্ভবা হয়ে ওঠে।

আমাদের দেশের অনাথ শিশুদের বিদেশিরা দত্তক নিয়ে যায়, তাতে আবার অনেকে ক্রুদ্ধ

হয়, চাগিয়ে ওঠে দেশপ্রেম। সংবাদপত্রে দেখি, তাদের বক্তব্য, এ-ও এক ধরনের শিশু পাচার। এ দেশের ছেলেমেয়েদের বিদেশিরা পাইকারি হারে নিয়ে গেলে তাতে দেশের বদনাম হবে না? এই ধরনের দেশপ্রেম দেখালে আমার গা জ্বলে যায়। দেশ আবার কী? মহাবিশ্ব সম্পর্কে যেটুকু আমাদের জ্ঞান হয়েছে, তাতে আমরা বুঝতে পারি, কী দুর্লভ ও মূল্যবান এই মনুষ্য জন্ম। পরিচিত অন্য কোনও গ্রহ-উপগ্রহে তা নেই। এবং মাত্র একবারই এই সুযোগ পাওয়া যায়। এই মনুষ্য জন্মটাকে সার্থক করতে না পারাটাই সভ্যতার নিদারুণ ব্যর্থতা। অনেক দেশ তার সব মানুষদের এখনও সে সুযোগ দিতে পারে না। বেঁচে থাকাটাই বড় কথা, তা দেশগুলির কৃত্রিম সীমানা পেরিয়ে মানুষ যেখানে বাঁচতে পারবে, যেখানে অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষার সুযোগ পাবে, সেখানেই যাবে।

এইসব প্রতিবাদী দেশপ্রেমিক বীরপুরুষরা পথশিশুদের দিকে ফিরেও তাকায় না। অবহেলায়, অপুষ্টিতে কত বাচ্চা মরে যাচ্ছে তা গ্রাহ্যও করে না। শুধু বিদেশিরা বাচ্চাদের নিয়ে গেলে তাদের মানে ঘা লাগে। এরা ঠিক গো হত্যা নিবারণের প্রচারকদের মতন। তাদের গো-মাতারা যে কতরকম অত্যাচার সহ্য করে, কী নিদারুণ কষ্টের মধ্যে থাকে, তা নিবারণ করার কোনও উদ্যোগ নেই। কিন্তু কেউ গো-মাংস ভক্ষণ করলেই তারা গেল-গেল রব তোলে।

সুইডেনে যে শ্যামলা রঙের মেয়েটিকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি যদি কখনও অলিম্পিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক বিজয়িনী হয় কিংবা কোনও বিষয়ে নোবেল পুরস্কার পেয়ে যায়, তখনই আমরা হ্যাংলার মতন তাকে ভারতীয় বলে দাবি করব! যাদের আমরা খেতে দিতে পারি না, যাদের শিক্ষার সুযোগ নেই, কিংবা এ দেশে যাদের জীবিকার সংস্থান হয় না, তারা যদি অন্য দেশে গিয়ে কোনও ব্যাপারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখায়, অমনি তাদের কৃতিত্বের ভাগ নেওয়ার জন্য আমাদের নোলা শক শক করে।

আমার এ ফ্লাইটে যে-সব বাচ্চারা কাঁদছে, তাদের কোলে নিয়ে ঘুরে-ঘুরে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে পুরুষরাই। একজন দীর্ঘকায় পুরুষ আমার কাছ দিয়েই যাতায়াত করছে, বাচ্চাটার পিঠ চাপড়াতে-চাপড়াতে মৃদু স্বরে একটা ছড়া বলছে, তার ভাষা ইংরিজি নয়। সম্ভবত স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কোনও ভাষা। কলকাতার একটি দুধের শিশুকে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ছড়া শোনানোও অবান্তর নয়। শিশুটির মুখে এখনও ভাষা ফোটেনি, অর্থাৎ তার নিজস্ব কোনও ভাষা নেই, ভবিষ্যতে সে তার পালক পিতার ভাষাতেই বর্ধিত হবে, এখন যে-কোনও স্নেহের শব্দ শোনাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

মা ও বাবার মধ্যে সাধারণত বাবারা বাচ্চাদের কান্না-টান্না ঠিক সামলাতে পারে না। অনেক পিতাই শিশু সন্তানের কান্নাকাটিতে কিছুক্ষণ পরে বিরক্ত বা ধৈর্যহীন হয়ে ওঠে, স্ত্রীকে ডাকাডাকি করে। কোনও বাবা অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চার কান্না থামাতে পারছে না, রান্নাঘর থেকে মা ছুটে এসে বাচ্চাটাকে ছোঁ মেরে কোলে তুলে নিয়ে কয়েকবার চাপড় দিতেই ম্যাজিকের মতন তার কান্না থেমে যায়। এর একটা জৈবিক কারণও আছে। সব জননীই তার শিশু সন্তানদের কোলে তুলে নিয়ে বুকের বাঁ-দিকে মুখটা চেপে ধরে। পৃথিবীর কোনও জননীই সন্তানদের বুকের ডান দিকে চেপে ধরে না। তার কারণ বাঁ-দিকেই জননীর হৃৎপিণ্ড। ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন শিশুরা এই অপরিচিত পৃথিবীতে নানারকম শব্দ শুনে অসহায় বোধ করে, ভয় পায়। একমাত্র মায়ের হৃৎপিণ্ডের লাবডুব শব্দটাই তার চেনা, মাতৃগর্ভে থাকার সময় সে ওই শব্দটাই শুনেছে। সেই জন্যই মা তাকে বুকের বাঁ-দিকে চেপে ধরলে সে আবার ওই পরিচিত শব্দটা শুনে স্বস্তি পায়।

এক মায়ের সন্তানকে অন্য মা যদি বুকের বাঁ-দিকে চেপে ধরে তা হলেও কি শিশুটি একই রকম স্বস্তি বোধ করবে? কৃষ্ণাঙ্গ ও শ্বেতাঙ্গ, ককেশিয়ান ও নিগ্রোবটু, ধনী ও দরিদ্র, সব মায়েদেরই কি হৃৎস্পন্দনের শব্দ একরকম? এ বিষয়ে আমার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

অনেকক্ষণ ধরে বাচ্চাদের চ্যাঁ ভ্যাঁ শোনা ও বাচ্চাদের পায়চারি দেখার একঘেয়ে দৃশ্য থেকে চক্ষু ফিরিয়ে যে আকাশ দেখব, তারও উপায় নেই। আমার পাশে, জানলার ধারে যে ভাগ্যবান

ব্যক্তিটি বসে আছেন, তাঁর চেহারা আমার থেকেও বিপুল, তিনি পুরো জানলাটাই ঢেকে রেখেছেন। আমি লোভীর মতন তবু দু-একবার উঁকিঝুঁকি মেরেছি, যদি তাঁর বপুর ফাঁকফোকর থেকে একটুখানি আকাশ দেখা যায়! আমার জানলা-প্রিয়তার প্রধান কারণ এই, অনেকক্ষণ ধরে প্লেনের যাত্রীদের মুখ দেখার চেয়ে আকাশ দেখা অনেক ভালো। কারণ, আকাশ কখনও পুরোনো হয় না।

আমার অন্যপাশে আইল সিটে যিনি বসে আছেন, তিনি রোগা ও ছিমছাম, তবে প্রথম থেকেই তিনি একটা খাতা খুলে, না, কবিতা রচনা নয়, কীসব বড়-বড় টাকার অঙ্ক যোগ-বিয়োগ শুরু করেছেন। আমি প্রথম থেকেই ঠিক করে ফেলেছি, এই দুই সহযাত্রীর সঙ্গে একটি ব্যাক্যব্যয়ও করব না। সচরাচর বিমান যাত্রায় কথোপকথন নিতান্তই আমড়াগাছির মতন। অকারণ সময় নষ্ট হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে। তার চেয়ে বরং একেবারে চুপ করে থাকলে অনেক মৌলিক চিন্তা মাথায় আসতে পারে।

মহাত্মা গান্ধী যে সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত পালন করতেন, তার উপকারিতা আমি অনুভব করতে পারি। কী করে? আমি তো ওই ব্রত নিইনি, সারাদিন বাক্যহীন থাকার সুযোগও আমার ঘটে না। একবার, একদিন মাত্র ঘটেছিল। ইস্তানবুলে।

তুরস্ক দেশ থেকে আমি কখনও আমন্ত্রণ পাইনি, ইস্তানবুল গিয়েছিলাম স্বেচ্ছায়। নিজের উদ্যোগে।

পুরো টিকিট কেটে যেতে হলে হয়তো সম্ভব হত না।

সেবারে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ছ'জন লেখক-লেখিকার একটি দল পাঠানো হয়েছিল চেকোশ্লোভাকিয়ায় (তখন এই দেশটি দু-ভাগ হয়নি, তার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল) এবং বুলগেরিয়ায়। সেই দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার খবর পেয়েই আমি ঠিক করেছিলাম, তা হলে ইস্তানবুলে যেতেই হবে। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ বা প্রাহা শহরে আমাদের সরকারি সফর শেষ হবে, সেখান থেকে ইস্তানবুল বেশি দূর নয়। বিমানের টিকিট সামান্য বদলে স্টপ ওভার পাওয়া যায়। তাতে দামের বিশেষ হেরফের হয় না। ইস্তানবুলের পূর্ব নাম ছিল কনস্টান্টিনোপোল, শহরটি একেবারে ইতিহাসের খনি। রোমান সভ্যতা, বাইজান্টাইন সভ্যতা এবং ইদানীংকালের আরব সভ্যতা স্তরে-স্তরে বিধৃত হয়েছে এই একটি মাত্র শহরে। এখানেই রাস্তায় বসে গান গাইতেন মহাকবি হোমার, এককালের প্রখ্যাত ট্রয় নগরের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গেছে এর কাছাকাছি।

আমার সঙ্গে যে অন্য পাঁচজন লেখক-লেখিকা ছিলেন, আমি তাঁদের জনে-জনে অনুরোধ করেছিলাম আমার সঙ্গী হওয়ার জন্য, কেউ রাজি হননি। আমি লক্ষ করেছি, সাহিত্যিকরা, বিশেষত ভারতীয় সাহিত্যিকরা অনেকেই ভ্রমণে উৎসাহী নন। সরকার থেকে যখন প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়, তখন সরকার থেকে যেটুকু ব্যবস্থাপনা থাকে, শুধু সেইটুকুই সেরে নিয়ে তারা দেশে ফিরে আসতে চান অতি দ্রুত, এ আমি দেখেছি বহুবার। আর আমি প্রত্যেকবারই নিজের উদ্যোগে টুকটাক ঘুরে আসি কাছাকাছি অন্য দু-একটা দেশ। জীবনে প্রথমবার আমেরিকা এসে, ফেরার পথে, আর কখনও এমন ভ্রমণের সুযোগ পাওয়া যাবে না এই ভেবে, আমি রোম ও ইজিপ্ট গিয়েছিলাম অতি সামান্য অর্থ সম্বল করে। এবং সেসব শহরে কেউ পরিচিত ছিল না, কারুর সঙ্গে আমার যোগাযোগও করিয়ে দেওয়া হয়নি।

আমার সমসাময়িক এক বাঙালি লেখক একবার লন্ডনে গিয়েছিলেন একটি আমন্ত্রণ পেয়ে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, ফ্রান্সে যাবেন না? লন্ডন থেকে প্যারিসের দূরত্ব মাত্র এক ঘণ্টা, সেখানে আমার বন্ধুবান্ধব আছে, থাকার জায়গার ব্যবস্থা করে দেব, খরচ প্রায় কিছুই লাগবে না, ফ্রান্সের আর্ট গ্যালারিগুলো দেখার এই সুযোগ ছাড়বেন কেন? তিনি নিমরাজি হয়েও শেষ পর্যন্ত গেলেন না, লন্ডন থেকেই ফিরে এলেন সরাসরি। আর কখনও প্যারিসে যাননি।

আমি যে নানান দেশে ঘোরাঘুরি করি, তা আমার লেখক সত্তার জন্য নয়। কৈশোর থেকেই একটা বাউণ্ডুলেপনা ছিল, আর অচেনা জায়গা দেখার দুরন্ত নেশা। অল্প বয়েসে যে-টানে আমি

গিয়েছি সাঁওতাল পরগনার ছোট-ছোট পাহাড় অঞ্চলে কিংবা আসামের মার্গারিটায় কিম্বা বিনা টিকিটে বিশাখাপত্তনমে, সেই টানেই গেছি, আফ্রিকার কেনিয়ায়, সেরিংগেটি ফরেস্টে থেকেছি তাঁবুতে, প্রবল গ্রীষ্মে উটের পিঠে চেপে ইজিপ্টের মরুভূমিতে পিরামিড দেখতে। সেই টানেই ইস্তানবুলে। আমি এমন অনেক দেশে গেছি, যেসব দেশ সম্পর্কে এক লাইনও ভ্রমণকাহিনি লিখিনি।

আমার অবশ্য একটা সুবিধে আছে, যে-কোনও জায়গায় থাকতে পারি এবং খাদ্য সম্পর্কে কোনও বাছবিচার নেই। যে-কোনও খাদ্য আমি চেখে দেখতে রাজি আছি, জিহ্বার স্বাদে ভালো লাগলে খেয়ে নিই, ভালো না লাগলে ফেলে দিই, কোনওরূপ পূর্ব সংস্কার মানি না। এই জন্যই হাঙর-কুমির-অক্টোপাস দিব্যি খেয়ে নিয়েছি। সাপ-ব্যাঙ-জেব্রা-ক্যাঙারুর মাংস অপছন্দ হয়নি, এমনকী নর্মান্ডি উপকূলে জীবন্ত ঝিনুক এবং জাপানের কাঁচা মাছও উপভোগ করেছি।

ইস্তানবুলে আমার পরিচিত কেউ ছিল না।

বিমানবন্দরে নেমে দেখলাম, পর্যটকদের সহায়তা করার জন্য একটা কাউন্টার রয়েছে। সেখানে গিয়ে বললাম, আমার দু-তিন দিনের জন্য একটা জায়গা চাই। একটা সস্তার হোটেলের সন্ধান দিতে পারো? সে আমাকে একটা ছাপানো চার্ট দিল, তাতে অসংখ্য হোটেলের নাম ঠিকানা, কোনওটির দৈনিক ঘরভাড়া সাতশো সাড়ে সাতশো ডলার, আবার কোনওটির দশ ডলার। আমি দশ ডলারের হোটেলের নামে আঙুল রাখতেই সে বলল, তুমি অত সস্তার হোটেলে থাকতে পারবে না, পাড়াগুলো খারাপ, তোমার মালপত্র ছিনতাই হয়ে যেতে পারে। তুমি দৈনিক অন্তত পঞ্চাশ ডলার খরচ করতে পারবে? সেটা আমার পক্ষে বেশি, বললাম, আর একটু নীচে নামো। সে বলল, তা হলে অন্তত পঁচিশ থেকে তিরিশ ডলারের মধ্যে? বাইরে খেয়ে নেবে, তাতে সস্তা হবে। আমি সম্মতি জানাতে সে আমাকে সে রকম পাঁচটি হোটেলের নামে দাগ দিয়ে বলল, এগুলোতে চেষ্টা করে দেখো, যদি খালি পাও, তবে ঘর আগে যাচাই করে নিও। কিছু কিছু হোটেলে খুব বাজে ঘর গছিয়ে দেয়।

হোটেলগুলি যে জনবহুল এলাকায়, তা বিমানবন্দর থেকে অনেকটা দূরে। ট্যাক্সি নিতেই হবে। কাউন্টারের যুবকটিই আমাকে সাবধান করে দিল, ট্যাক্সিওয়ালা তোমাকে ঘুর পথে নিয়ে গিয়ে ঠকাতে চাইবে। ন্যায্য ভাড়া হওয়া উচিত আট থেকে সাড়ে আট হাজার দিনার। (তুরস্কের মুদ্রা এখন দিনার, যা শুনলেই আরব্য উপন্যাসের কথা মনে কড়ে। তবে একালের দিনারের মূল্যবান খুবই কমজোরি। ভারতীয় মুদ্রার থেকেও বেশ কম।)

ট্যাক্সি চালকটির ইংরিজি জ্ঞান কহতব্য নয়, বাংলা বললেও একই রকম বুঝবে, তবে বেশ হাসিখুশি। দিলখোলা। সে আমাকে দু-তিনটি হোটেল ঘুরিয়ে দেখাল নিজেই গরজ করে। তৃতীয়টিতে পছন্দ হল ঘর, ভাড়াও আমার সঙ্গতির মধ্যে, শুনতে পনেরো-কুড়ি হাজার দিনার, আসলে আঠাশ ডলারের সমতুল্য। আমি ট্যাক্সি চালকের সঙ্গে দরাদরি করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম, কিন্তু আমাকে অবাক করে সে চাইলই মাত্র পৌনে আট হাজার দিনার। সে আমাকে ভারতীয় বলে জেনেছিল, এবং এই পরিচয়ের জন্য হোটেলের ম্যানেজার, কর্মচারী, রাস্তার দোকানদাররাও সহৃদয় ব্যবহার করেছে। ইজিপ্টেও রাষ্ট্রপতি নাসেরের আমল পর্যন্ত ভারতীয়দের বেশ খাতির ছিল, এখন কী অবস্থা তা জানি না।

ইস্তানবুলে শতকরা সাড়ে নিরানব্বই জনই ভালো ব্যবহার করলেও ব্যতিক্রম মাত্র একজনই ছিলেন এবং তিনি একজন বাঙালি। আমার এক শুভার্থী তাঁর টেলিফোন নাম্বারটি দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, তুমি তার বাড়িতে উঠবে না, অন্য কিছু সাহায্য না চাও চেয়ো না। শুধু টেলিফোনে একটু যোগাযোগ করে রেখো। কারণ, যদি অসুস্থ হয়ে পড়ো, তাহলে একজন অন্তত নিজের দেশের মানুষকে জানাতে পারবে। শেষের যুক্তিটা আমার মনে ধরেছিল। হঠাৎ অসুস্থ হওয়া কিংবা দুর্ঘটনা তো ঘটতেই পারে। যদিও আগে কখনও এ নিয়ে মাথা ঘামাইনি।

হোটেলে থিতু হয়ে বসার পর সন্ধেবেলা সেই ভদ্রলোককে ফোন করলাম। একটি পুরুষ

কণ্ঠ অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় সিকিভাগ বাংলা ও বাকিটা ইংরেজিতে আমাকে বললেন, হ্যাঁ, কী ব্যাপার বলুন? আমি আপনার জন্য কী করতে পারি? আমি কে, কেন এসেছি, কী বৃত্তান্ত, সে ব্যাপারে কোনও আগ্রহই প্রকাশ করলেন না। আমি বললাম, আমার নাম এই, আজই এখানে এসে পৌঁছেছি, হোটেলে উঠেছি, অমুকদা আপনার ফোন নাম্বার দিয়ে বলেছিলেন খবর নিতে—। আমাকে থামিয়ে দিয়ে তিনি আবার বললেন, হ্যাঁ, বুঝলাম, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন?

তখনই আমার ফোন রেখে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ভদ্রতা বড় দায়। আমি বিনীতভাবে নিতান্ত কথার কথা হিসেবে বললাম, তা সেরকম কিছু নয়, আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না। আমি নিছক বেড়াতে এসেছি, এখানে প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান কী আছে বলতে পারেন? তিনি বললেন, টুরিস্ট গাইড ধরনের বই অনেক দোকানেই পাওয়া যায়, তার একটি কিনে নিন, তাতেই দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা জানতে পারবেন।

টুরিস্ট গাইড ধরনের বই পড়ে যে-কোনও জায়গার দ্রষ্টব্য স্থানগুলির কথা জানা যায়। এই মহামূল্যবান উপদেশটি এ পর্যন্ত ভূ-ভারতে আর কেউ আমাকে দেয়নি। আশ্চর্য, আমি এতদিন এটা জানতাম না? এই মহা উপকার করার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন রেখে দিলাম।

আমি ধরেই নিলাম, আজ কোনও কারণে ভদ্রলোকের মেজাজ খারাপ আছে, হয়তো স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। এরকম তো হয়ই। কিংবা তিনি বাংলা এবং বাঙালিদের সঙ্গে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করতে চান। সেরকমও দৃষ্টান্ত আছে। কিংবা, উনি ভেবেছিলেন, আমি ওঁর কাছে আশ্রয় চেয়ে বিব্রত করব। সে যাই হোক, লোকে যেমন বলে, দ্যাটস হিজ প্রবলেম, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে যাব কেন? তাঁর সম্পর্কে আমার সব সম্পর্কের ইতি।

হয়তো, কয়েক ঘণ্টা পরে ভদ্রলোকের ভাবান্তর হয়েছিল, তখন আমি বাথরুমে, তিনি হোটেলে একটা বার্তা রেখেছিলেন, আমি চাইলে তিনি তাঁর বাড়িতে আমাকে একদিন চা-পানে আপ্যায়ন করতে চান, আমি জানালেই তিনি গাড়ি পাঠাবেন।

আমার অত চায়ের নেশা নেই। কারুর গাড়িতে চেপে অনেক দূরের কোনও বাড়িতে গিয়ে চা-পানের বদলে রাস্তার ধারের কোনও দোকানের সস্তার ভাঁড়ের চা খেয়ে আমি বেশি তৃপ্তি পাই। ভদ্রলোককে আর ফোন করিনি।

এই বঙ্গ পুঙ্গবের কথা এতখানি বলতে হল এই কারণে যে তাতে পরবর্তী দিনটির কথা বোঝা যাবে। পৃথিবীর নানান দেশের প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে এত অন্তরিক ও চমৎকার ব্যবহার পেয়েছি, যে এই একমাত্র ব্যতিক্রমটি মনে দাগ কেটে যাবেই। আমিও গোঁয়ার কম নই। এবং অন্যভাবে বিচার করতে গেলে এই ভদ্রলোক আমার বেশ উপকারই করেছিলেন। রাত্রে শোওয়ার সময়ই ঠিক করে নিয়েছিলাম, পরদিন সকালে ভদ্রলোকটি যদি আবার ফোন করেন, তাহলে আমি কোনওভাবেই তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ করব না। আমি তাঁর নাম মন থেকে মুছে ফেলেছি।

সেইজন্যই পরদিন, ভোরবেলা ভালো করে আলো ফুটবার আগেই বাথরুম-টাথরুম সেরে নিতে হল, ফোন বাজবার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। (এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও ইস্তানবুলের হোটেলের টয়লেট সম্পর্কে একটা অভিনব তথ্য দিতে প্রলুব্ধ হচ্ছি। সব মুসলমান দেশেই টয়লেটে মগের বদলে একটা গাড়ু থাকে। বাংলাদেশেও এরকম দেখেছি। পশ্চাদ্দেশ শোধন করার জন্য মগ ও গাড়ুর মধ্যে কী ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা থাকে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ইস্তানবুলের হোটেলের টয়লেটে গাড়ু ছিল না, মগও ছিল না। শুধু টয়লেট পেপার থাকলে সেটাকে পাশ্চাত্যদেশীয় কায়দা মনে করা যেত। হঠাৎ দেখি, কমোডের মধ্যে একটা লোহার নল, তার মুখটা গাড়ুর মতন। সেই গোপন গাড়ু-মুখো নল এসে জলের তোড়ে পশ্চাদ্দেশ পরিষ্কার করে দেয়।)

আগে জানতাম না। টার্কিতে জনসংখ্যার আটানব্বই শতাংশ এখন মুসলমান হলেও সেটি সংবিধানগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সেখানে অসংখ্য মসজিদ, গির্জা ও পেগান আমলের ধর্মস্থানের

সহাবস্থান। আরও একটি ব্যাপারে ইস্তানবুল শহরটি অনন্য। পৃথিবীর অনেক আধুনিক শহরই এখন অনেকটা দৃশ্যত একই রকম, আমেরিকায় বহু শহরের ডাউন-টাউন যেন কার্বন কপি, সেদিক থেকে ইস্তানবুল একেবারে পৃথক এবং সুন্দর তো বটেই। তা ছাড়াও ইস্তানবুলই পৃথিবীর একমাত্র শহর যা দুটি মহাদেশে বিস্তৃত। সত্যিই তাই, ইস্তানবুল শহরের কিছু অংশ এশিয়ায়, কিছুটা ইওরোপে। ব্রিজ পেরিয়ে যখন তখন এশিয়া থেকে ইওরোপে যাওয়া যায়। কোনও ভিসা-টিসার প্রয়োজন হয় না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ছোট গল্পে একজন গ্রামের মানুষ হাঁটতে-হাঁটতে একটা গাছতলায় এসে জেনেছিল, সেখান থেকে অন্য একটি জেলার শুরু। জেলাগুলির মধ্যে সীমানা ভাগ করার কোনও চিহ্ন থাকে না। এক জেলা থেকে অন্য জেলায় হরদম বহু লোক যাতায়াত করে, কিছু খেয়ালই করে না। শুধু সেই মানুষটি, এক জেলা অতিক্রম করছে জেনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছিল। এখানেও ব্রিজ পেরিয়ে পায়ে হেঁটে এশিয়া থেকে ইওরোপ মহাদেশে যাওয়ার সময় আমার অবস্থাও হয়েছিল ওই গ্রামের মানুষটির মতন।

সেই বাঙালি ভদ্রলোকটির সঙ্গে আর কথা বলব না ঠিক করার পর রাস্তার বেরিয়ে কিছুক্ষণ বাদে ভাবলাম, আজ সারাদিন কারুর সঙ্গেই একটাও কথা না বললে কীরকম হয়? দেখাই যাক না!

দোকান-টোকানে ইংরিজি বোঝাতে গেলে এত ধস্তাধস্তি করতে হয় যে তার বদলে আকারে ইঙ্গিতে কাজ চালানো অনেক সহজ। পায়ে হেঁটেই একটা শহর সবচেয়ে ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যায়। প্রশস্ত রাস্তার দুপাশে বড়-বড় গাছগুলি দেখে হকচকিয়ে গেলাম। চিনতে অসুবিধে হয় না, ম্যাগনোলিয়া গ্রান্ডিফ্লোরা! এত বড় গাছ! আর প্রত্যেক গাছে প্রচুর ফুল ফুটে আছে। আমাদের দেশের ম্যাগনোলিয়া এত বড় হয় না আর ফুল খুবই দুর্লভ। শহরের মাঝখান দিয়ে গোল্ডেন হর্ন নামে একটি প্রণালী আর বিখ্যাত বসফরাস। এই বসফরাসে কত রণতরী ভেসেছে, কত রক্তাক্ত ইতিহাস আছে। এখন অবশ্য এর ওপর ব্রিজ বানিয়ে দিয়েছে জাপানিরা।

ইস্তানবুলের বেশ কাছেই তুরস্কের চির শত্রু গ্রিস, আর একদিকে বুলগেরিয়া, সে দেশ তো তুর্কিরা বহুকাল দখল করে রেখেছিল ছেলেবেলার ইতিহাস-ভূগোলে পড়া নামগুলি চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হতেই রোমাঞ্চ বোধহয়। স্টিমার সারভিস নিয়ে যখন তখন ঘুরে আসা যায় কৃষ্ণ সাগর (ব্ল্যাক সি) কিংবা মর্মর সাগর (সি অফ মারমারা)।

সন্ধেবেলা হঠাৎ খেয়াল হল, ভোর থেকে আমি কারুর সঙ্গে কথা বলিনি তো বটেই, মুখ দিয়ে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি। এটা কোথাও নির্জনে বসে মৌনীবাবা সেজে থাকা নয়, সকাল থেকে ঘুরছি জনারণ্যে, দুবার দু-জায়গায় টিকিট কেটেছি, সব কাজ সারা হচ্ছে নিঃশব্দে, অথচ কেউ বোবা বলে মনেও করছে না, একবারের বেশি দুবার তাকাচ্ছে না। দুপুরে খাবার খেয়েছি। সঙ্গে এক বোতল বিয়ার। সমুদ্র থেকে মাছ ধরে এনে সেই নৌকো থেকেই মাছ ভেজে বিক্রি করা হয়। এত টাটকা মাছের স্বাদই আলাদা, কী মাছ জানি না। এক একটি প্রায় পাঁচশো গ্রাম ওজন, ভেতরে একটি মাত্র সরল কাঁটা, সঙ্গে হাতে-গড়া হৃষ্টপুষ্ট ফুলকো রুটি ও স্যালাড। এ একেবারে অমৃতবৎ এবং সস্তা। এসব কেনার জন্যও আমাকে একটি কথা খরচ করতে হয়নি, খানিকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছি, অন্য খদ্দেররা কত পয়সা দিচ্ছে। তারপর ঠিকঠাক সেই পয়সা বার করে বিক্রেতার সামনে গিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ।

সন্ধেবেলা কৃষ্ণ সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে চেয়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হল। এশিয়ার দিকটায় আগে অন্ধকার নামে, ইওরোপের দিকটায় তখনও কিছু আলো থাকে। আলো নয়, পশ্চিমের আকাশ যেন জ্বলছে দাউ-দাউ করে। প্রাচ্য দেশ অন্ধকার, পাশ্চাত্যে আগুন!

সারাদিন একটিও শব্দ উচ্চারণ না করলে শরীরটা অনেক হালকা লাগে, সকল মানুষের

মধ্যে থেকেও এক মনোরম একাকিত্বের সুখ অনুভব করা যায়। অন্যের সঙ্গে কথা না বললে বেশি করে কথা বলা যায় নিজের সঙ্গে। সভ্যতার এই তো অভিশাপ, নিজের সঙ্গে কথা বলার সময়ই পায় না অধিকাংশ মানুষ। তা হলে আর আত্মানং বিদ্ধি হবে কী করে?

আমি এখানে তুরস্ক ভ্রমণের কথা লিখতে বসিনি। লিখতে চাইছি এক নিঃসঙ্গতার অভিযানের কথা।

তবু, ইস্তানবুলের একটি সৌধের কথা না বললেই নয়।

রোমান সম্রাটরা এই কনস্তান্তিনোপোলে একটি গির্জা বানিয়েছিল, সেটা যেমন সুদৃশ্য তেমনই সুবিশাল। এর নাম সোফিয়া, বা হাজিয়া সোফিয়া। হাজিয়া শব্দটির অর্থ পবিত্র, আর সোফিয়ার একটি অর্থ মূর্তিমতী দিব্যজ্ঞান। খ্রিস্টানদের জগতে রোমের ভ্যাটিকানের পরই এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মস্থান। প্রায় পাঁচশো বছর এই গির্জাটি খ্রিস্ট ধমাবলম্বীদের প্রার্থনাভবন ছিল। তারপর রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর মুসলমানরা এটি দখল করে। বাইরে চারপাশে চারটি গম্বুজ বানিয়ে এটি রূপান্তরিত হয় মসজিদে। প্রায় এক হাজার বছর ধরে এই মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়েছে।

তারপর তুরস্কে আধুনিকতার প্রবর্তক কামাল আতার্তুক এসে ঘোষণা করে দেন, এই হাজিয়া সোফিয়া আর শুধু মসজিদ থাকবে না, গির্জাও হবে না। এটি একটি ঐতিহাসিক পুরাকীর্তি। এর সংরক্ষণ করবে সরকার এবং যে-কোনও ধর্মের মানুষদের এখানে প্রবেশ ও প্রার্থনা করার অধিকার থাকবে।

যখন গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল, তখন এর দেওয়ালে-দেওয়ালে ছিল অসংখ্য রঙিন রেখাচিত্র, বড়-বড় শিল্পীদের কাজ। মানুষের ছবি বা মূর্তি ইসলামে নিষিদ্ধ। সুতরাং মসজিদ হওয়ার পর তাতে ওইসব ছবি রাখা যায় না। কিন্তু তৎকালীন মুসলমান শাসকদের এটুকু অন্তত সুবুদ্ধি ও শিল্পবোধ ছিল, তারা ওই মহামূল্যবান ফ্রেসকোগুলি ধ্বংস করেননি। ঘষে ঘষে মুছেও ফেলেননি, পুরু চুনকাম দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন।

এখন আবার খুব যত্নে সেই চুনকাম তুলে তুলে ছবিগুলি পুনরুদ্ধার করা হচ্ছে। এই ছবিগুলি অমূল্য ইতিহাসের উপাদান। এক জায়গায় এক রাজা-রানির ছবিতে রাজার মুখখানা যেন তাঁর শরীরের সঙ্গে ঠিক মানানসই নয়। ঐতিহাসিকরা খুঁজে বার করেছেন তার কারণটি। রাজার মৃত্যুর পর রানি তাঁর প্রথম স্বামীর ধড়ের ওপর দ্বিতীয় স্বামীর মুণ্ডুটা জুড়ে দিয়েছিলেন।

এই সোফিয়াতে টুরিস্টদের ভিড়ের মধ্যেও আমি মুসলমান ও খ্রিস্টানদের কাছাকাছি বসে প্রার্থনায় মগ্ন থাকতে দেখেছি। অযোধ্যার রামমন্দির ও বাবরি মসজিদের কথা মনে পড়ে না? আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ই বড় বেশি উগ্র ও যুক্তিহীন। মুসলমানরা রামমন্দির সম্পর্কে হিন্দুদের সেন্টিমেন্ট মানসিকতার মূল্য না দিয়ে বাবরি মসজিদ বজায় রাখার জন্য জেদ ধরেছিল, আর হিন্দু মৌলবাদীরা বাবরি মসজিদ ভাঙার মতন অন্যায় অসভ্যতায় মেতে উঠতে দ্বিধা করেনি। ওই বিতর্কিত স্থানটিকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত প্রার্থনাস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা যেত না? অবশ্য তার জন্য একজন কামাল আতাতুর্কের দরকার, সেরকম মেরুদণ্ড দিল্লির কোনও নেতারই আছে কি?

বিমান যাত্রায় সহযাত্রীদের সঙ্গে খেজুরে আলাপে সময় নষ্ট না করলে বই পড়ারও অনেকটা সময় পাওয়া যায়। আমি বড় আকারের বই এনেছি, বহুদূর যেতে হবে। এ বছর যে চিনা লোকটি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, সেই গাও জিংজিয়ান-এর (উচ্চারণ অন্যরকম হতে পারে, Gao Xingjian) উপন্যাস, সোল মাউন্টেন (আত্মা পর্বত।)

কলকাতা থেকে একটানা লন্ডন, উড়ান সময় প্রায় সাড়ে দশ ঘণ্টা। এর মধ্যে একবার ব্রেকফাস্ট ও পরে লাঞ্চ খেতে দেবে। সব বিমানের খাবারই এখন চরিত্রহীন হয়ে গেছে। জলের জাহাজ থেকে যখন প্রথম-প্রথম উড়োজাহাজে যাত্রী বাড়তে শুরু করে, তখন উড়োজাহাজের খাদ্য

পরিবেশনে নানান বৈচিত্র্য ও বিশেষ যত্ন ছিল, এখন নিতান্তই দায়সারা। এখন তেমন খেতে ইচ্ছেও করে না।

তবু, একঘেয়ে যাত্রার মধ্যে খাবার পরিবেশনের সময়টায় মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। এয়ার হোস্টেসদের ব্যস্তভাবে ঘোরা ফেরা, ট্রলির আওয়াজ, নানা ধরনের কথা।

প্রত্যেক মানুষের পিঠে এমন একটা জায়গা আছে, যেখানে ডান হাত কিম্বা বাঁ-হাত, কোনওটাই পৌঁছোয় না। সেই জায়গাটায় চুলকোতে গেল অন্যের সাহায্য নিতে হয়। আমাদের প্রিয় ডাক্তার কালী চট্টোপাধ্যায় বলতেন মানুষ বিয়ে করে কেন জানিস তো? রাত্তিরবেলা ওই জায়গাটায় কুটকুট করলে বউ চুলকে দেবে! (একটি নাটকে আমি এই সংলাপটি ব্যবহার করেছি আগে।)

প্রত্যেক বিমানেই এরকম একটি প্রায় নো-ম্যানস ল্যান্ড আছে। অর্থাৎ সামনের দিক থেকে একটা খাদ্যের ট্রলি আসছে, পেছন দিক থেকেও একটা ট্রলি আসছে, তারা ওই জায়গাটায় পৌঁছোয় একেবারে শেষে। আমি বসেছি সেরকম একটা সিটে। মনে হয় যেন অনন্তকাল ধরে সুন্দরীরা আসছে তো আসছেই, প্রতীক্ষার আর শেষ নেই।

শেষ পর্যন্ত যে এসে পৌঁছোল, সে সুন্দরী নয়, একজন পুরুষ!

এদের গলায় আওয়াজে একটা খুব যান্ত্রিক ভদ্রতা থাকে, যা নিশ্চয়ই বেশ কষ্ট করে শিখতে হয়।

যেহেতু ভারতীয় যাত্রীরা অনেকেই নিরামিষ খায়, তাই প্রত্যেককে এরা জিগ্যেস করে, আমিষ, না নিরামিষ?

আমাকে সেই যন্ত্র-পুরুষটি বলল, আমিষ খাবার ফুরিয়ে গেছে, আপনি কি নিরামিষ খাবেন?

নিরামিষ খাবারের বিরুদ্ধে আমার কোনও বক্তব্যই নেই, আমি বেশ পছন্দই করি। আমিষ ভক্ষকদের তো এই এক সুবিধে, তারা গাছেরও খায়, তলারও কুড়োয়। শুক্তো, লাউঘণ্ট দিব্যি লাগে, আবার মাছ ভাজা, কষা মাংসও চাই। সকালবেলা আমি অবশ্য মাছ-মাংস কখনও খাই না, প্রাতরাশের সময়, তবে মাঝে-মাঝে একটা ডিমসেদ্ধ ভদ্রলোক মাত্রই খায়। বিমানের প্রাতরাশে একটা ওমলেট ও দু-এক টুকরো সসেজ থাকে। তার বদলে পুরি-তরকারি খেলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু আমাকে নিরামিষ খেতে বাধ্য করা হবে কেন? এতেই বিরক্ত লাগে।

এবারে যাত্রাটাই যে অশুভ হয়েছে, তার প্রমাণ, দুপুরে ঠিক একই ব্যাপার ঘটল। আবার খাবারের ট্রলি আমাদের সারিতে এসে পৌঁছোল সবচেয়ে শেষে। এবং যন্ত্র-মানবটি আবার বলল একই কথা, আমিষ ফুরিয়ে গেছে। নিরামিষ খাবেন?

কেন আমিষ ফুরিয়ে যায়? এয়ারলাইনস্ পয়সা বাঁচাচ্ছে?

আমি রাগারাগি না করে মৃদু গলায় জানালাম, না, আমি নিরামিষ খাই না। আপনারা আমাকে যদি না খাইয়ে রাখতে চান, রাখুন।

লোকটি আমাকে কিছু না দিয়েই চলে গেল।

ব্রিটিশ এয়ারওয়েজে এই সেকটারের ফ্লাইটে বাংলায় অনেক ঘোষণা হয়, তাতে কিছুটা পুলকিত বোধ করছিলাম। এয়ার ইন্ডিয়া বাংলার ধার ধারে না, কলকাতা থেকে ফ্লাইটই বন্ধ করে দিয়েছে।

এখন উপলব্ধি হল, শুধু বাংলায় পেট ভরে না।

॥ ৩ ॥

লন্ডন বিমানবন্দরে অপেক্ষা করতে হবে প্রায় ঘণ্টা তিনেক।

ইচ্ছে করলে আমি লন্ডন শহরে দু-একদিন থেকেও যেতে পারতাম, আমার অনেক বছরের

ভিসা আছে। কিন্তু লন্ডনে আর আমার যেতে ইচ্ছে করে না। ভবিষ্যতে আর কোনওদিনই যাব না বোধহয়।

এই প্রথম আমি এই বিমানবন্দরে একা।

এর আগে যতবারই এসেছি, চোখ বুজেই দেখতে পেতাম ভাস্করকে।

শ্যামবাজারের টাউন স্কুলে ভাস্কর আমি পড়েছি ক্লাস টু থেকে। এত অল্প বয়েসের বন্ধুর সঙ্গে সারা জীবন সম্পর্ক রাখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

স্কুল ছেড়ে কলেজে আসার পর আমাদের বিষয় ছিল আলাদা আলাদা, তবু দেখা হত প্রায় প্রত্যেকদিন। এক লাইনও কবিতা না লিখে ভাস্কর কৃত্তিবাস কবিগোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত ছিল।

ভাস্কর পড়েছিল কমার্স ও চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি, কলকাতায় কিছুদিন চাকরি করার পর ভাস্কর বলল, একবার লন্ডনটা ঘুরে আসি। ওখানে একটা আমার নামে রাস্তা বানিয়ে ফিরে আসব।

কিন্তু ফেরা অত সহজ নয়, ভাস্কর ইংল্যান্ডে থেকে গেল ঠিক পঁয়ত্রিশ বছর। লন্ডনে ওর নামে রাস্তা হয়নি বটে, কিন্তু হ্যারোতে বাঙালি তথা ভারতীয়দের মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা নিয়েছিল এবং বর্ণবৈষম্যের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ওর ছিল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। ওকে স্যার উপাধি দেওয়ার কথাও উঠেছিল শোনা যায়, যদিও স্যারের বদলে লর্ড হলেই যেন ওকে বেশি মানায়। বন্ধুরা অনেক সময়ই ওকে লর্ড ভাস্কর বলে ডাকত। চেহারাটাও ছিল তেমনি সুন্দর। অবশ্য টাক পড়ার আগে।

বনেদি বাড়ির ছেলে ভাস্কর। বেশিদিন চাকরি করা ওর পোষায়নি, ওর ছোট ভাই বরুণের সঙ্গে মিলে, লন্ডন থেকে বেশ খানিকটা দূরে করবি নামের শিল্পাঞ্চলে স্থাপন করেছিল একটা হাই-টেক রাবারের কারখানা।

একবার ভাস্কর আমাকে সেই কারখানাটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। গেট দিয়ে ঢোকার সময় এবং অভ্যর্থনা কক্ষে সাহেব-মেম কর্মচারীরা মালিককে দেখে সমম্ভ্রমে বলছিল, গুড মর্নিং স্যার, গুড মর্নিং মিস্টার ডাটা! ভাস্কর আমার দিকে চোখ টিপে একটা ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ, দেখলি দেখলি, সাহেব-মেমরা, আমাকে কীরকম সেলাম ঠুকছে!

লন্ডনের কোনও হোটেলে থাকার উপায় আমার ছিল না। প্রত্যেকবার এয়ারপোর্ট থেকেই ভাস্কর বগলদাবা করে নিয়ে যেত ওর বাড়িতে। কখন কোনও প্রতিনিধি দলের সঙ্গে গিয়ে আমার হোটেলে ওঠার কথা থাকলেও ভাস্কর সেখানে আমায় শুধু খাতায় নামটা মাত্র লিখতে দিয়েছে, তারপরই আমার সুটকেসটা নিজে তুলে নিয়ে বলত, চল-চল, আমার বাড়িতে ভিকটোরিয়া রান্না করে রেখেছে! শুধু আমি নয়, আমাদের বন্ধুবান্ধব যে-ই লন্ডনে গেছে, কিম্বা লন্ডন ছুঁয়ে অন্য কোথাও যেতে হয়েছে, ভাস্করের হ্যারোর বাড়ি ছিল সকলের অবশ্য গন্তব্য।

ভাস্করের স্ত্রী ভিকটোরিয়া, মেমসাহেবের মতন ফরসা বাঙালি মেয়ে, যেমন মধুর স্বভাবের, তেমনই কাজের মেয়ে এবং রান্নায় অদ্বিতীয়া। সে আবার দু-তিন জনের জন্য রান্না করতে পারে না, যে পদই রাঁধে তা অন্তত বারো-চোদ্দোজনের যোগ্য। ভাস্কর বলত, মাঝে-মাঝে আমায় কী করতে হয়, জানিস না তো? রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে আমাকে লোক ডাকতে হয়, ওগো, আমার বাড়িতে খাবে এসো, খাবে এসো! কে কে খাবে, চলে এসো, চলে এসো।

সুদীর্ঘ প্রবাসেও ভাস্কর কয়েকটি জিনিস একেবারে ছাড়েনি। যেমন খাঁটি উত্তর কলকাতার ভাষা, আড্ডা রীতি এবং বন্ধুদের প্রতি টান। আড্ডার কৃতিত্বে ভাস্কর ছিল আমার চেনাশুনো সকলের মধ্যে অদ্বিতীয়। প্রথম-প্রথম যখন লন্ডনে গেছি, সকালবেলা এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে নিয়ে, ভাস্কর তখন চাকরি করত, তবু বলে উঠত, আজ আর অফিসে যাব না! শুধু সেদিনই নয়, পরপর দু-তিনদিন। বিলেত-আমেরিকায় এরকমভাবে ছুটি নেওয়া যে কত কঠিন, তা নিশ্চয়ই বলে দিতে

হবে না।

একবার বেলজিয়ামে লিয়েজ নামে একটা ছোট্ট শহরের কাব্য সম্মেলনে আমন্ত্রণ পেয়ে আগে লন্ডনে পৌঁছেছি। ভাস্করকে খবর দিয়েছিলাম শেষ মুহূর্তে। পরের দিন নেহাত কথার কথা হিসেবে ভাস্করকে বলেছিলাম, কী রে আমার সঙ্গে বেলজিয়াম যাবি নাকি? ভাস্কর যাকে বলে এক পায়ে খাড়া, সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চল।

অফিস কামাই করে সেখানে আমার সঙ্গে রয়ে গেল পাঁচদিন, তারপর আবার প্যারিসে। আর একবার বার্লিনে একটা ইন্ডো-জার্মান লেখক সমাবেশে যোগ দিতে গেছি, হঠাৎ দেখি সেখানে ভাস্কর উপস্থিত। আলোচনা সভায় ভাস্কর আমাদের সঙ্গে বসত এক টেবিলে, অন্য লেখকদের সঙ্গে তার ভাব জমাতে বেশিক্ষণ লাগত না, সান্ধ্যআসরে সে-ই হয়ে উঠত সবচেয়ে জনপ্রিয়। অন্য লেখকরা জিগ্যেস করেছিল, আপনি কি লন্ডন থেকে প্রতিনিধি হয়ে এসেছেন? ভাস্করের উত্তর, না আমি লেখক-টেখক কিছু নই, আমি এসেছি স্রেফ আড্ডা দিতে।

এরকম আরও অনেক দেশে। নিজের পয়সা খরচ করে, কাজ ফেলে রেখে অন্য দেশে গিয়ে আড্ডা দেওয়ার এমন দুঃসাহসিক নেশা আর ক'জনের থাকে?

আড্ডার আর একটি কেন্দ্র প্যারিস, অসীম রায়ের বাড়ি। প্যারিসে অসীম ছাড়াও প্রীতি ও বিকাশ সান্যাল, ভূপেশ দাশ ও আরও কয়েকজনের একটি ঘনিষ্ঠ গোষ্ঠী আছে। এ ছাড়া কেউ গেলে ভাস্কর লন্ডন থেকে চলে আসবেই। কোনওবার এর ব্যতিক্রম হয়নি।

একবার অসীম রায়ের বাড়িতে আরও অনেকের সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীও ছিলেন। তিন-চারদিন অবিশ্রান্ত আড্ডার পর বিশেষ কাজ আছে বলে ভাস্করকে আগে লন্ডন ফিরে যেতেই হবে। সেইজন্য সে খুবই দুঃখিত। তার খুব ভোরবেলা ফ্লাইট, আগের রাতে প্রায় শেষ প্রহর পর্যন্ত আড্ডা হয়েছে, অ্যালার্ম দিয়ে জেগে উঠে ভাস্কর আমাদের কারুকে না ডেকে একা ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল। সকালবেলা উঠে নীরেনদা হতভম্ব। ভাস্কর নিজেরটার বদলে নীরেনদার প্যান্ট পরে ও নীরেনদার চশমা নিয়ে ততক্ষণে পৌঁছে গেছে লন্ডনে। এটা সাধারণ বদলাবদলি নয়, নীরেনদা ভাস্করের থেকে অন্তত পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং তাঁর চশমার ক্ষমতার সঙ্গে ভাস্করেরটির দূরত্ব বিস্তর। ওরকম প্যান্ট পরে এবং প্রায় অন্ধ হওয়ার মতন চশমা চোখে দিয়ে ভাস্কর কী করে বিমানে চেপে যথাস্থানে পৌঁছেও গেল, সেটাই এক রহস্য।

পরিণত বয়েসেও ভাস্কর যেন এক দুরন্ত শিশু।

গত আট-দশ বছর ভাস্কর খুব বেশি করে জড়িয়ে পড়ে দেশের সঙ্গে। তার দেশ কোনটা? সে ততদিনে ব্রিটিশ নাগরিক কিন্তু মনেপ্রাণে রয়ে গেছে উত্তর কলকাতার দত্ত বাড়ির ছেলে আর বাংলাভাষা প্রেমিক।

সে ঠিক করেছিল, বছরের তিন-চারমাস অর্থাৎ শীতের সময়টা কলকাতাতেই কাটাবে। এখানকার তরুণ কবিদের সঙ্গে সে মিশে গিয়েছিল সমবয়েসি বন্ধুদের মতন, তরুণ কবিদের জন্য দুটি পুরস্কারের প্রবর্তন করে সে। বনগাঁ-র পথের পাঁচালি সেবা সমিতির সঙ্গেও জড়িত হয়ে পড়ে ভাস্কর গ্রামের দরিদ্র মানুষদের জন্য অনেক কিছু করার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এ ছাড়া আড্ডা ও ভ্রমণ তো আছেই।

ভাস্কর, অসীম, স্বাতী ও আমি এই চারজনের একটা টিম বহু জায়গায় বেড়াতে গেছি, বিদেশে এবং এদেশে। বছর দু-এক আগে, শীতকালে স্বাতী ও অসীমের ইচ্ছে কোনও জঙ্গলে গিয়ে কয়েকটি দিন কাটানোর, কিন্তু ভাস্কর ঠিক করল যাওয়া হোক কুলু-মানালি অঞ্চলে। তার এক ভাগনে খুব উচ্চ পদে রয়েছে, সুতরাং ব্যবস্থাপনার অনেক সুবিধে পাওয়া যাবে। ভাস্কর আর অসীম ঠান্ডার দেশেই থাকে, তবু পাহাড়ি উচ্চতায় শীতের মধ্যে যে আমাদের যাওয়া ঠিক নয়, তা তখন বুঝিনি।

মানালিতে গিয়ে ভাস্কর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেখানকার হোটেল থেকে আমরা প্রস্তুত হয়ে

বেরুচ্ছি, সেদিনই ফিরে আসব। লম্বা বারান্দা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ভাস্করের পা দুটি দুর্বল হয়ে গেল, আমি আর অসীম তাকে ধরলাম দুদিক থেকে। আর কয়েক পা গেলেই বাইরে গাড়ি অপেক্ষমাণ, ভাস্কর হঠাৎ থমকে গিয়ে বলল, এটা কী হচ্ছে? এটা কী হচ্ছে?

খুব বিস্ময়ের সঙ্গে সে কী যেন বলতে চেয়েছিল, সেটা আর জানা হল না। সেটাই ভাস্করের শেষ কথা।

এমন স্বার্থপরের মতন আমাদের ছেড়ে হঠাৎ চলে যাওয়ার মতন কাজ ভাস্কর সারা জীবনে কখনও করেনি। পঁয়তিরিশ বছর বিলেতে থেকেও সে তার শরীরটা মিশিয়ে দিল হিমালয়ের ক্রোড়ে বিপাশা নদীর ধারে।

ভাস্কর চলে যাওয়ার পর একবারই গত বছরে আমাকে লন্ডনে আসতে হয়েছিল। সেবারে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে গেল এক সরকারি প্রতিনিধি, উঠতে হল হোটেলে। যদিও দু-একদিন পরই ভাস্কর ও আমার বন্ধু এখন লন্ডনের টেগোর সোসাইটির সভাপতি অমলেন্দু বিশ্বাস আতিথ্য দিল তার বাড়িতে, তার স্ত্রী অরুন্ধতী খুবই যত্ন করেছেন, ভাস্করের স্ত্রী ভিকটোরিয়ার কাছে গিয়ে থাকারও অসুবিধে ছিল না। লন্ডন থেকে অনেকটা দূরে একটা ছোট জায়গায় আন্তরিক আতিথ্য দিয়েছিল রাখী ও নবকুমার বসু নামে ডাক্তার দম্পতি। সমরেশ বসুর ছেলে নবকুমারকে চিনি ওর ছোটবেলা থেকে, সে নিজেও লেখক, ওদের সঙ্গে উপভোগ্য আড্ডা হয়। তবু মনটা পালাই-পালাই করছিল। ভাস্কর-বিহীন লন্ডন আমার সহ্য হচ্ছিল না।

এবারে লন্ডন এয়ারপোর্টে আমি সম্পূর্ণ একা। কাটাতে হবে তিন ঘণ্টা সময়। একটা রেস্তোরাঁয় কফি আর হট ডগ নিয়ে বসে রইলাম। লন্ডনে আমার বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে, রয়েছে অনেক বাংলাদেশি সুহৃদ, তাদের দু-একজনকে ফোন করলে আমায় নিয়ে যেতে পারত, একটা দিন এখানে বিশ্রাম নিয়ে যাওয়াই ছিল সুবিধেজনক, কিন্তু ইচ্ছে হল না। এয়ারপোর্টে হরেক রকমর সহস্র মানুষ, পৃথিবীতে যে কত জাতের, কত চেহারার, কত রকম পোশাকের মানুষ আছে, তার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় হিথরো বিমানবন্দরে। এবং সবাই ব্যস্ত। এসবের মাঝখানে একেবারে চুপচাপ বসে থাকারও এক ধরনের উপভোগ্যতা আছে। বইও পড়ছি না। শুধু চেয়ে আছি। এই যে কতরকম রঙিন মানুষের শশব্যস্ত চলাচল, এর মধ্যেও যেন একটা ছন্দ অনুভব করা যায়। কখনও মনে হয় চার্লি চ্যাপলিনের ফিল্ম।

অনেকক্ষণ পরে খেয়াল হল, আরে, আমার তো টার্মিনাল বদল করতে হবে!

হিথরো বিমানবন্দরটি প্রায় একটি শহরের মতন। এক টার্মিনাল থেকে অন্য টার্মিনাল যেতে হয় বাসে চেপে। আর দেরি করলে আমাকে ফ্লাইট মিস করতে হত।

আমাকে যেতে হবে অনেক দূরে, দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বিয়া রাজ্যে। সেখানে একটি আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনের আমন্ত্রণ। কলম্বিয়ায় কবি সম্মেলন? সেখানকার নাম শুনলেই তো মনে পড়ে ড্রাগ ও খুনোখুনির কথা। আবার মার্কেজের মতন লেখক কলম্বিয়াতেই জন্মেছেন।

গত বছরেও এই আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম, গ্রহণ করতে পারিনি অন্য অপরিহার্য কাজের জন্য। যদিও যাওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিল, কারণ দক্ষিণ আমেরিকার কোনও দেশ আমি কখনও দেখিনি। এ বছরেও আমন্ত্রণ পাওয়াটা আশাতীত।

তবে, আমন্ত্রণ ও সত্যি সত্যি যাওয়ার ব্যবস্থাপনার মধ্যে অনেকগুলি ফাঁক থাকে।

কলম্বিয়া গরিব দেশ। তারা মোট আশিটি দেশের কবিদের প্রতি ডাক পাঠিয়েছে, এদের ভাড়া জোগানোর মতন সংস্থান কি তাদের আছে? এই বিশাল সম্মেলনের উদ্যোক্তা একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান, সরকার নয়।

আমার চিঠির সঙ্গে তাঁরা জানিয়েছিলেন, কোনও কবিকে তাঁরা যাতায়াতের ভাড়া দিতে পারবেন না। সব কবিদেরই নিজের নিজের সরকারের কাছ থেকে বিমান ভাড়া সংগ্রহ করতে হবে,

সে জন্য উদ্যোক্তারাও দূতাবাসগুলির কাছে অনুরোধ জানাবেন।

পরের চিঠিটিই তাঁরা জানালেন যে তোমাদের দেশের সরকার তোমার বিমান ভাড়া দিতে রাজি হয়নি।

এতে আমি বিশেষ বিস্মিত হইনি। কোনও কারণে বর্তমান ভারত সরকার আমার প্রতি সদয় নন, বাংলাদেশের সঙ্গে সরকারি বাস যাত্রার উদ্বোধন অনুষ্ঠানেই আমি তা কিছুটা টের পেয়েছিলাম। তা হলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল। আমার নিজের পক্ষে তো অত ভাড়া দিয়ে যাওয়া সম্ভবই নয়।

পরের চিঠিতে সত্যিই চমকপ্রদ। আমি যেতে পারব না জানিয়ে দেওয়ার পরেও কবি সম্মেলন কমিটির সভাপতি আমাকে জানালেন যে, ভারত থেকে এ বছর আমিই একমাত্র আমন্ত্রিত, এত বড় সম্মেলনে ভারতের কোনও প্রতিনিধি থাকবে না, এটা তাঁদের মনঃপূত নয়, সেই জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে আমার বিমান ভাড়া তাঁরাই দিয়ে দেবেন।

এরকম আনন্দ-সংবাদ আমি বহুদিন পাইনি।

এ বছরই আর একটি আমন্ত্রণ পেয়েছি অস্ট্রেলিয়ার কয়েকজন বাঙালির কাছ থেকে। সেখানেও আমি আগে কখনও যাইনি। তা হলে দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ঘুরে এলেই সবক'টি মহাদেশ আমার ছুঁয়ে আসা হবে। কৈশোরে জাহাজের নাবিকের চাকরি নিয়ে বিশ্ব-ভ্রমণের কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতাম। সেটা যে এভাবে সম্ভব হবে, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

অবশ্য আন্টার্কটিকা নামের তুষারময় মহাদেশটি বাদ রইল। সেটা বাদই থেকে যাবে। আন্টার্কটিকায় আর আমার ইহজীবনে পদার্পণ সম্ভব হবে না। যেমন, আর কিছুকালের মধ্যেই মহাশূন্যে সশরীরে পর্যটন শুরু হতে যাচ্ছে, কিন্তু আমাদের কাছে তা মানসভ্রমণ হয়েই রইল।

আন্টার্কটিকা বাদ দিয়ে অন্য সবক'টি মহাদেশ সফরের এই যে আমার গোপন আনন্দ, এটা এক ধরনের ছেলেমানুষিও বটে। আমার যেমন খুবই ভ্রমণের উদ্দীপনা আছে, আবার মাঝে-মাঝে এও মনে হয়, না দেখলেই বা কী এমন ক্ষতি হত। অনেকে তো নিজের ঘরে শুয়েই বিশ্বদর্শন করে। মহাদেশগুলির বিভাজনও যে কত অলীক, তার প্রমাণ তো ইস্তানবুল শহরেই পেয়ে গেছি।

অনেক দৌড়ঝাঁপ, শারীরিক কষ্ট সহ্য করেও পৌঁছেছি কোনও দূর-দুর্গম দেশে। আবার এ কথাও মনে হয়, মনসা মথুরা ব্রজই সম্ভবত সর্বোৎকৃষ্ট ভ্রমণ।

এবারে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ ছেড়ে আমাকে যেতে হবে আমেরিকার এয়ারলাইন্সে নিউ ইয়র্ক। কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় পৌঁছোবার জন্য নিউ ইয়র্ক যাওয়ার কোনও প্রয়োজনই নেই, এ যেন ঘুরিয়ে নাক দেখানো!

কিন্তু এই একই সময়ে নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলিসে বাংলাদেশিদের উদ্যোগে দুটি বই মেলায় সাংস্কৃতিক উৎসব হচ্ছে, আমার দক্ষিণ আমেরিকা যাওয়ার খবর শুনে (আজকাল ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনও জাদুবলে যেন সবাই সবকিছু জেনে যায়) সেখানকার উদ্যোক্তারা আমাকে এই দুটি শহর ঘুরে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করছিলেন। আমি রাজি হয়েছিলাম এই জন্য যে, কলকাতা থেকে কলম্বিয়া পর্যন্ত সুদীর্ঘ একটানা যাত্রার ধকল খানিকটা কমবে মাঝপথে থেমে গেলে, আর নিউ ইয়র্কের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও দেখা হবে এক ঝলক। নিউ ইয়র্ক থেকে বাসে বা ট্রেনে চেপে বস্টনেও ঘুরে আসা যেতে পারে পুপলু আর চান্দ্রেয়ীর কাছে, হাতে সেই জন্য কয়েকটা দিন সময় রেখেছি।

টার্মিনাল বদল করে একেবারে শেষ মুহূর্তে পৌঁছবার জন্যই এবারেও জানলার ধারে আসন পাওয়া গেল না। এবারের আকাশ যাত্রায় আমাকে আকাশ বঞ্চিত হয়েই থাকতে হবে মনে হচ্ছে।

তিনটির বদলে দুটি সিট, জানলা দখল করেছে একটি অল্পবয়েসি শ্বেতাঙ্গিনী মেয়ে। তার চেহারাটা ছোট নয়, অনেকটা বেলুনের মতন, তবে মুখটা দেখলে বয়েস বেশি মনে হয় না। ত্যারছাভাবে তার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে মনে হল, মেয়েটির নিশ্চয়ই কিছু মাথার রোগ আছে, প্রায় সাড়ে সাত ঘণ্টা ধরে যাত্রাকালে সে অনবরত কিছু না কিছু খেয়েই চলল, তার পায়ের কাছে

একটা মস্ত ব্যাগ, সেটা খাবারে ভরতি। সে কিন্তু বিমানের খাবার প্রত্যাখ্যান করল। তার হাতের খোলা বইটি হ্যারি পটারের কাহিনি, সবাই বলে এই গাঁজাখুরি কাহিনি একেবারে রুদ্ধশ্বাস পাঠ্য। সে কিন্তু একটা পাতাও ওলটাল না। তাকে দেখে আমার একটু ভয় ভয়ই করছিল, তাই সে, যখন রোদ্দুর আড়াল করার জন্য জানলাটা বন্ধই করে দিল, আমি মুখের ভাবেও আপত্তি প্রকাশ করিনি।

বিমান যাত্রায় সাধারণত কোনও নাটকীয় ঘটনা ঘটে না। আমাদের এদিকে অনেক যাত্রী অন্য যাত্রীর সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলে বটে, ওদিকে সেটা ঠিক শোভন নয়। কেউ অন্যের কথা শুনতে পায় না।

এ যাত্রায় সামান্য একটা ঘটনা ঘটল। আমার ঠিক সামনের সারিতে একটি পুরুষ ও নারী কণ্ঠের উত্তেজিত কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে। ভাষা আমি বুঝিনি, খুব সম্ভবত স্প্যানিশ।

ঘণ্টাখানেক পরে মহিলাটি উঠে দাঁড়ালেন।

বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য সেই রমণী। প্রথমত তাঁর উচ্চতা অধিকাংশ মেয়েদের চেয়ে বেশ বেশি, একেবারেই স্থূলকায়া নয় অথচ বড়সড়ো শরীর, মুখের ভঙ্গিতে এমন একটা আভিজাত্য আছে যে মনে হয়, ইংরেজি সিনেমায় এরকম কোনও রানিকে দেখেছি। বাংলাদেশের লেখিকা দিলারা হাসেনের সঙ্গে যেন খানিকটা সাদৃশ্য আছে তাঁর মুখের রেখায়। তরুণী নয়। এঁর বয়েস অন্তত পঁয়তাল্লিশের কাছাকাছি।

মহিলাটি একজন এয়ার হোস্টেসকে ডেকে যা বললেন, তাতে বোঝা গেল, ইনি জায়গা বদল করতে চান।

পাশের পুরুষটি কিছু বলার চেষ্টা করল, তার জড়িত কণ্ঠস্বরই প্রমাণ করে দেয় যে সে নেশাগ্রস্ত এবং রসস্থ।

তার কথায় কান না দিয়ে নিজের হ্যান্ডব্যাগটি নিয়ে জানলার ধার ছেড়ে বেরিয়ে এলেন মহিলাটি, এয়ার হোস্টেসের সমভিব্যাহারে চলে এলেন অন্যদিকে।

এ হচ্ছে, সেই ধরনের রূপ, যা একবার দেখলেই মনের মধ্যে একটা চিরস্থায়ী ছবি হয়ে যায়।

মহিলাটিকে মনে রাখবার আরও কারণ আছে। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে তিনি আমার অশেষ উপকার করেছিলেন।

শেষের দিকে আমি ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম অনেকখানি।

বিমানটি আমেরিকার ভূমি স্পর্শ করার পর সেই ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভাঙল। এ রকম আচমকা ঘুম ভাঙলে প্রথম কয়েক মুহূর্ত বোঝাই যায় না আমি কোথায় আছি। এটা বিকেল না সকাল?

॥ ৪ ॥

প্রবল স্রোতের বিরুদ্ধে তবু সাঁতার কাটার চেষ্টা করা যায়। কিন্তু বিমান বন্দরে মানুষের স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটার চেষ্টা করা তার চেয়ে অনেক কঠিন।

গন্তব্যে পৌঁছবার পর বিমান থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নামার জন্য সব যাত্রীই অস্থির হয়ে ওঠে। নেমেই সবাই প্রায় ছুটতে থাকে। কারণ দেরি হলেই ইমিগ্রেশানের লাইন লম্বা হয়ে যায়। বাইরে অপেক্ষামান কোনও বন্ধু বা প্রিয়জনের সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যও অধীরতা থাকে।

সবার সঙ্গে পা মিলিয়ে আমিও যখন আধা ছুটন্ত, হঠাৎ আমার কেন যেন অস্বস্তি বোধ হল। শরীরটা একটু হালকা-হালকা লাগছে না? কী যেন নেই! হাত দিয়ে দেখলাম, চশমা আছে,

বুক পকেটে পাসপোর্ট আছে, কাঁধে ঝোলা ব্যাগও আছে। তবে? তবু যেন শরীরটা একটু হালকা।

প্যান্টের পকেট থাবড়ে দেখলাম, মানিব্যাগটা নেই।

বুকটা ধস করে উঠল। আবার?

কবি বা লেখকরা নাকি অধিকাংশই ভুলো-মনা এবং ন্যালাখ্যাপা ধনের হয়। আমি ততটা বড় কবি বা লেখক নই বলেই এই গুণগুলি অর্জন করতে পারিনি। এত ঘোরাঘুরি করি, তবু আমার পাসপোর্ট বা জিনিসপত্র কখনও হারায় না। এক যাত্রায় একাধিকবার বিমান পালটাতে হলেও সময়ের গোলমাল করে ফেলিনি কখনও।

শুধু দুবার মানিব্যাগ পকেটমার হয়েছে।

একবার ঢাকায়, একবার ইতালির ফ্লোরেন্স নগরীতে।

ঢাকার ঘটনাটিতে প্রায় সম্পূর্ণ দোষ ছিল আমারই। আসলে মানিব্যাগ ব্যবহার করার অভ্যেসই আমার নেই, সেই জন্য পকেটে মানিব্যাগ রাখলে যে ধরনের সতর্কতা থাকা দরকার সেটাই আমি খেয়াল করি না। কলকাতায় কিম্বা দেশের মধ্যে যেখানেই যাই, ঘড়ি আর মানিব্যাগ, কোনওটাই আমার লাগে না। বিদেশে পকেট থেকে টাকা বার করা দৃষ্টিকটু, তাই ব্যাগ রাখতে হয়।

ঢাকায় কয়েক বছর আগে জাতীয় কবিতা উৎসবে এক সকালে প্রথমে গিয়েছিলাম দল বেঁধে শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য দিতে, তারপর মঞ্চে কবিতা পাঠ। ঢাকায় কবিতা নিয়ে যেমন উন্মদনা, সেরকম আর কোথাও দেখিনি এ পর্যন্ত। হাজার হাজার নারী-পুরুষ কবিতা শুনতে আসে।

কবিতা পাঠের পর মঞ্চ থেকে যেই নেমে এসেছি, যথারীতি বহু অল্পবয়েসি ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরেছে অটোগ্রাফের জন্য। (কলকাতায় একরমই ছোটখাটো একটা দৃশ্য দেখে একজন বেলজিয়াম ফরাসি কবি আপশোশ করে বলেছিলেন, আমাদের দেশে এখন আর কেউ কবিদের কাছ থেকে অটোগ্রাফ চায় না!) ঢাকায় সাধারণত আমি পাজামা-পাঞ্জাবি পরেই কাটাই। সেই সকালে আমার মানিব্যাগটা হোটেলে রেখে না এসে কেন যে ঢোলা পাঞ্জাবির পকেটে নিয়ে আসার দুর্মতি হয়েছিল কে জানে! সেটার কথা আমার মনেও ছিল না।

ছেলেমেয়েরা অটোগ্রাফের জন্য চিলুবিলু করছে, আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সই মেরে যাচ্ছি, শেষই হচ্ছে না, হঠাৎ স্পষ্ট বুঝতে পারলাম কেউ আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়েছে। আমি এই, এই, কী হচ্ছে বলে চেঁচিয়ে উঠে ভিড় সরাতে সরাতেই তার মধ্যে গোপন হাতটি মানিব্যাগ নিয়ে অদৃশ্য।

স্বাক্ষর সংগ্রহকারীদের মধ্যে কেউ আমার পকেট মেরেছে, এ তো হতেই পারে না, বরং ওরকম বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখে কোনও পকেটমার ওদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। ঢোলা পাঞ্জাবির পকেটে ওরকম অরক্ষিতভাবে মানিব্যাগ রাখার উচিত শিক্ষাই আমি পেয়েছি।

ফ্লোরেন্সের ঘটনাটি একটি নিখুঁত চক্রান্ত।

ফ্লোরেন্সে (এখনকার নাম ফিরিঞ্জিয়া) শহরের কেন্দ্রে অনেকটা অঞ্চলে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ। সেখানে বহু মূল্যবান শিল্প ও পুরাকীর্তি আছে, গাড়ির ধোঁয়ায় সেগুলির ক্ষতি হতে পারে। (ইদানীং তাজমহলের এক-দেড় মাইলের মধ্যেও পেট্রোল-ডিজেলের গাড়ি চলতে দেওয়া হয় না, ব্যাটারিচালিত বাস যাতায়াত করে।) সুতরাং আমরা হেঁটে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম। কয়েকদিন আগেও বেশ শীত ছিল, সেদিনই হঠাৎ উৎকট গরম পড়েছে, তাই কোট খুলে রেখে এসে গায়ে ছিল শুধু টি-শার্ট, যার বুকপকেট নেই। যদি গাড়িতে ঘুরতাম কিংবা আমার গায়ে কোট থাকত, তা হলে আর আমাকে ওভাবে গালে চড় খেতে হত না।

ভাস্কর, অসীম, স্বাতী ও আমি ঘুরছি ফ্লোরেন্সের রাস্তায়, এক সময় ওরা খানিকটা এগিয়ে গেছে: আমি সিগারেট ধরাবার জন্য থেমেছি, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে এসে চারটি মেয়ে আমাকে ঘিরে ধরল।

বাঘ যেমন শিকার ধরার আগে কিছুক্ষণ লক্ষ ও অনুসরণ করে, এরাও নিশ্চিত লক্ষ করছিল আমাদের। ভারতীয় বলে চিনতে পেরে ধরে নিয়েছিল, আমার পকেটে ক্রেডিট কার্ডের বদলে ক্যাশ টাকা থাকতে পারে। আমি যে-ই দল ছাড়া হয়েছি, অমনি ওরা সেই সুযোগ নিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছে একেবারে আমার সামনে, মুখোমুখি। তার পেটটা অনেকটা উঁচু, অর্থাৎ গর্ভবতী, সেখানে হাত রেখে সে যা বলতে চাইল, তার মানে না বুঝলেও বোঝা যায় সেটা ভিক্ষে চাইবার ভাষা। মেয়েটি আমার পথ জুড়ে এমনভাবে আমার গাঁ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, যেন আমার বুকের ওপর এসে পড়বে। আরে করছ কী, করছ কী, এই ভঙ্গিতে আমি হাত দুটো তুলতেই, দুদিক থেকে অন্য দুটি মেয়ে আমার হাত চেপে ধরে পৃথিবীর সব ভিখারিনীর মতনই কিছু বলতে লাগল আনুনাসিক সুরে।

আমি বুঝতে পারছি, এরা নিছক ভিখিরি নয়। কিন্তু একটি গর্ভবতী মেয়েকে কি কোনও পুরুষ ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পারে? অন্য দুটি মেয়ে এত শক্তভাবে আমার হাত চেপে ধরেছে যে ছাড়াতে পারছি না।

পুরুষ হলে যত জোরে ঝটকা মারতে পারতাম, মেয়ে বলেই তা সম্ভব নয়। এই সুযোগে, চতুর্থ মেয়েটি আমার প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল।

সবই আমি দেখতে ও বুঝতে পারছি, চেঁচিয়েও উঠেছি, কিন্তু পুরো ঘটনাটি ঘটল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে। এমনই ওদের চমৎকার ট্রেনিং।

আমার পকেটের মানিব্যাগে ছিল সামান্য কিছু টাকা ও খুচরো পয়সা। আর একটি খামে ভ্রমণের যাবতীয় টাকা। মেয়েটি দুটিই তুলে নিয়েছে, কিন্তু এক সঙ্গে হাতের মুঠোয় রাখতে পারল না। মানিব্যাগটাই ধরে রাখতে পারল না, শুধু খামটি নিয়ে দৌড় লাগাল। ওদের ভাগ্য কত ভালো, মানিব্যাগের বদলে খামটি খসে পড়লে আমার বিশেষ কিছুই ক্ষতি হত না।

এই সব কাণ্ডকারখানা দেখে ও আমার চিৎকার শুনে রাস্তার অনেক লোক থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সাহায্যের জন্য হাত বাড়াবার প্রথা অবশ্য ওসব দেশে নেই। কয়েকজন ইচ্ছে করলেই মেয়েগুলিকে, অন্তত একজনকেও ধরে ফেলতে পারত, কিন্তু ওরা প্রায় চোখের নিমেষে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পালাল। মানিব্যাগটি পড়ে আছে দেখে পথচারীরা কেউ-কেউ মন্তব্য করল, যাক, লোকটা খুব জোর বেঁচে গেছে।

আমার বদলে ওই মেয়ে পকেটমাররা যদি ভাস্কর বা অসীমের পকেটে হামলা করত, তাতে ওদের প্রায় কিছুই লাভ হত না। ওরা লন্ডন-প্যারিসে থাকে, ওদের পকেটে ক্রেডিট কার্ড।

ওই মেয়েগুলি সম্ভবত রুমানিয়ান জিপসি, চুরি-ছিনতাই, পকেটমারিতে খুব দক্ষ। আমরা পুলিশের কাছে রিপোর্ট করতে গিয়েছিলাম, তারা গ্রাহ্যই করেনি। সব টাকাপয়সা হারিয়েও স্বাতীকে ও আমাকে যে দারুণ বিপদে পড়তে হয়নি, তার কারণ, সঙ্গে ছিল দুই বন্ধু।

কিন্তু এবারে বিমানের মধ্যে কে আমার পকেট মারবে?

হিথরো এয়ারপোর্টে আমি ওই মানিব্যাগ থেকে টাকা ভাঙিয়ে রেস্তোরাঁর বিল মিটিয়েছি, বিমানের মধ্যেও মানিব্যাগটা আমার কাছে ছিল, হ্যাঁ মনে আছে।

হুড়-হুড় করে বিমান থেকে বেরিয়ে আসছে শয়ে-শয়ে মানুষ, সবাই একমুখী, এই সময় আমাকে উদ্‌ভ্রান্তের মতন উলটো দিকে যেতে দেখে প্রত্যেকেই বিরক্ত হয়, ধাক্কাধাক্কি লাগে, তবু আমাকে তো খোঁজ করতে যেতেই হবে।

ক্ষুধার্ত মানুষ নাকি আকাশের চাঁদের দিকে তাকায় না।

আমার মতন এমন বিপদাপন্ন অবস্থার মধ্যেও কি কোনও মানুষের নারীর রূপসুধা পানের দিকে মন থাকে? যাত্রীদের মধ্যে সেই দীর্ঘদীপিতদেহা রমণীকে দেখতে পেয়ে আমি ভুলে গেলাম আমার উদ্বেগ কয়েক মুহূর্তের জন্য। অন্যদের মতন তিনি দৌড়োচ্ছে না, হাঁটছেন ব্যক্তিত্বময়ীর মতন

ধীর পদক্ষেপে। এরকম রমণীর জন্য পৃথিবীতে বহু যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে গেছে।

কী আশ্চর্য, আমাকে দেখতে পেয়ে সে মহিলাও থমকে দাঁড়ালেন।

আমি উলটো স্রোতের সাঁতারু বলে সবাই একবার করে দেখছে আমাকে। কেউ কোনও মন্তব্য করছে না। এ মহিলা এগিয়ে এলেন আমার দিকে। বিমানের মধ্যে এঁর সঙ্গে আমার একটাও কথা হয়নি। চোখাচোখিও হয়নি, আমাকে চেনার কোনও প্রশ্নই নেই।

কাছে এসে তিনি স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বললেন আমাকে।

আমি অসহায় ভাবে জানালাম, স্প্যানিশ ভাষা আমার বোধগম্য নয়।

তখন তিনি ইংরেজিতে জিগ্যেস করলেন, আপনার কিছু হারিয়েছে?

সঙ্গে-সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, মানিব্যাগ।

তিনি বললেন, আমি একটা সিটের পাশে মানিব্যাগ পড়ে থাকতে দেখেছি, পার্সারের কাছে জমা দিয়ে এসেছি। তার কাছে খোঁজ করুন।

তিনি আর দাঁড়ালেন না, আমিও ছুটলাম।

যাত্রীরা সবাই শেষ হয়ে যাওয়ার পর বিমানকর্মীরাও নামছে, আমি কিছু জিগ্যেস করার আগেই তাদের একজন 'পথিক তুমি কি পথ হারাইয়াছ?'-র ভঙ্গিতে প্রশ্ন করল, কিছু হারিয়েছে?

আমার মানিব্যাগ।

লোকটি বলল পার্স, না বিলফোল্ড?

পাতলা ধরনের মানিব্যাগ, যার মধ্যে খুচরো রাখা যায় না, শুধু নোট রেখে ভাঁজ করা যায়, আমেরিকানরা তাকেই বলে বিলফোল্ড। আমার ব্যাগটা পাতলা ধরনের, তার মধ্যে অল্প কিছু টাকাই ধরে, (আমেরিকানদের কাছে অল্প শ'তিনেক ডলার, আমাদের দেশের টাকার হিসেবে অনেকটাই) তাই বললাম, বিলফোল্ড।

লোকটি জিগ্যেস করল, ভেতরে তোমার কিছু প্রমাণ আছে? কার্ড কিংবা ঠিকানা? কিংবা কোনও ছবি?

না, সেরকম কিছুই নেই। ঠিক ঠিক টাকার অঙ্কটা গোনা নেই।

লোকটি বলল, তুমি যে বললে, কিছুই প্রমাণ নেই, সেটাই প্রমাণ। ভেতরে কোনও কাগজ বা ছবি নেই, আমি এটা জমা দিতে যাচ্ছিলাম। এই নাও।

অনেকেরই কোনও না কোনও সময় টাকাপয়সা হারায়, কিন্তু হারানো টাকা অবিকল ফেরত পাওয়া অতি দুর্লভ ঘটনা নয়?

আমাদের দেশে এরকম অবস্থায় কত ফর্ম ভরতি করা আর কতক্ষণ যে অপেক্ষা করতে হত, তার ঠিক নেই।

এখানেও যদি ইমিগ্রেশান কাউন্টার পেরিয়ে যেতাম, তা হলে আর বিমানের দিকে ফিরে আসা অসম্ভব ছিল। যাত্রীরা নেমে গেলেই ঝাড়ুদাররা ওঠে, তারা কেউ ব্যাগটা পেলে হজম করে ফেলত না?

বাংলাদেশের মুক্তধারা নামে বইয়ের অন্যতম প্রকাশক বিশ্বজিৎ সাহা নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে একটি ছোট্ট বাংলা বই ও ক্যাসেটের দোকান খুলেছিল, এখন সে দোকানটি অনেক বড় হয়েছে, নিউ ইয়র্কে বাংলা বইমেলার সেই প্রধান উদ্যোক্তা। সেই বিশ্বজিৎ আর অভিজিৎ নামে আর একটি যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করছিল বাইরে।

এই বইমেলা ও সাহিত্যসভা উপলক্ষ্যে ঢাকা থেকে এসেছে হুমায়ুন আহমেদ ও ইমদাদুল হক মিলন আর কলকাতা থেকে সমরেশ মজুমদার। তারা পৌঁছে গেছে আমার আগেই, যে হোটেলে রয়েছে, সেখানকার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গাড়ি থেকে নামবার সময় আমার চশমাটা খুলে পড়ে গেল ফুটপাথে।

লেন্‌স দুটি অক্ষত থাকলেও ফ্রেমটাই ভেঙে গেছে, সেটা আর ব্যবহার করা যাবে না!

একবার মানিব্যাগ হারাচ্ছি, একবার চশমা ভাঙছে, এ ধরনের ট্যালামি আমায় পেয়ে বসল কী করে? সত্যি-সত্যি বুড়ো হয়ে গেলাম?

নিজের ওপর এমনই রাগ হল যে তখনই অস্ফুট স্বরে শপথ নিয়ে নিলাম, যদি এর পর এরকম আর একটা ভুল হয়, তাহলে এ-ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে দেখে ফিরে যাব!

অনেক দিনের জন্য বাইরে বেরুলে দ্বিতীয় একটা চশমা সঙ্গে রাখতেই হয়। আমার দ্বিতীয় চশমাটি অনেক দিনের পুরোনো, লেন্‌সের পাওয়ার কম, তাতে একটু ঝাপসা-ঝাপসা দেখি, কোনও রকমে কাজ চলে। তা হলে কি বাকি দিনগুলি আমাকে ঝাপসা দৃষ্টিতে কাটাতে হবে?

বিশ্বজিতের স্ত্রী রুমা অবশ্য বিশেষ যত্ন নিয়ে নিউ ইয়র্ক ছাড়ার আগেই আমাকে ফ্রেমটা বদল করে নতুন চশমা করিয়ে এনে দিয়েছিল।

নিউ ইয়র্কে বাংলা বইয়ের মেলা? তাতেই বোঝা যাবে, কত বাঙালি গিয়ে থিতু হয়েছে সেখানে। বলাই বাহুল্য, তাদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যাই পশ্চিমবঙ্গীয়দের তুলনায় অনেকগুণ বেশি। শুধু তাই-ই নয়, বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি রক্ষা ও মর্যাদা বাড়াবার কাজে বাংলাদেশিদেরই উদ্যম বিদেশের বহু শহরে চোখে পড়ে।

নিউ ইয়র্ক থেকেই বাংলা পত্রিকা বেরোয় অন্তত ন'খানা, সব কটাই বাংলাদেশিদের, পশ্চিমবঙ্গীয়দের একটাও না। এবং সেসব পত্রিকা নিছক শখের বা লিটল ম্যাগাজিন নয়, সংবাদপত্রও আছে। সেরকম দু-তিনটি সংবাদপত্র কার্যালয় দেখতে গিয়েছিলাম, রীতিমতন কম্পিউটার ও ফটোগ্রাফি বিভাগ সমেত আধুনিক অফিস, সেখানে যে কয়েকজন কর্মী কাজ করেন, সেটাই তাঁদের জীবিকা।

প্রতি বছর উত্তর আমেরিকার কোনও না কোনও বড় শহরে বিশাল আকারে একটি বঙ্গ সম্মেলন হয়, তার উদ্যোক্তা পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালিরা। এ সম্মেলনের প্রায় শুরু থেকে আমি অনেকবারই দেখেছি, লক্ষ করেছি, ক্রমশই সেই বঙ্গ-যজ্ঞে থিয়েটার-নাচ-গান-বাজনার প্রাধান্য বাড়ছে, সাহিত্য হয়ে যাচ্ছে গৌণ। বাংলাদেশিরাও আলাদাভাবে এরকম বড়-বড় সম্মেলনের আয়োজন করে। সেখানে গায়ক-গায়িকাদের তুলনায় লেখক-লেখিকাদের ভূমিকা ও সম্মান কিছুমাত্র কম নয়।

মনে পড়ে, অনেককাল আগে শিকাগোর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে একটা বইয়ের দোকানের কাচের জানলায় একটি বইয়ের মলাটের বাংলা অক্ষর দেখে রোমাঞ্চে আমার শরীরে শিহরণ হয়েছিল। সেটি এডোয়ার্ড ডিমক অনূদিত ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, 'থিফ অফ লাভ', মলাটে ব্যবহৃত হয়েছিল কয়েকটি বাংলা অক্ষর। আমেরিকায় বসে বাংলা বই, পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ করার একমাত্র উপায় ছিল অনেক বেশি ব্যয়ে দেশ থেকে আনানো। এখন কত বটল ঘটে গেছে। বাংলা বই ও ক্যাসেট তো অনেক জায়গায় পাওয়া যায়ই, জ্যাকসন হাইটের কয়েকটি রাস্তায় বাংলাদেশিরা তাদের দোকানের সাইনবোর্ডেও ব্যবহার করে বাংলা ভাষা। টিউব ট্রেনে যেতে-যেতে দেখা যায়, কেউ-কেউ স্থানীয় বাংলা কাগজ পড়ছে। লন্ডনের মতন নিউ ইয়র্কেও অনেক স্কুলে বাংলা পড়াবার ব্যবস্থা আছে।

সবচেয়ে বেশি চমক লেগেছিল টেলিফোনে। ভুল নাম্বার ডায়াল করলে কিংবা কোড নাম্বার ভুল করলে রেকর্ড বা সংশোধনীবাণী শোনাবার ব্যবস্থা প্রায় সব দেশেই আছে। নিউ ইয়র্কে সেরকম একটা ভুল টেলিফোন করে শুনতে পেলাম বাংলায় নির্দেশ। ইংরিজিও আছে অবশ্যই, ইংরিজি ও বাংলা পরপর বলে যাচ্ছে।

আমার এবারের স্বল্পস্থায়ী নিউ ইয়র্ক অবস্থানে সব বন্ধুদের বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। শুধু এক বিকেলে গিয়েছিলাম যামিনীদা ও সুমিত্রা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আর এক সন্ধেবেলা বড় আকারের জমায়েত হয়েছিল মীনাক্ষী ও জ্যোতির্ময় দত্তের বাড়িতে। এসেছিলেন করবী ও মণি নাগ, নূপুর লাহিড়ি ও অ্যান্ডঅর, প্রীতি সেনগুপ্ত, স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়, তনুশ্রী ভট্টাচার্য, আরও অনেকে, অনেক গান ও হাসিঠাট্টার অট্টরোল হল, কেন জানি না, আমি ঠিক মন বসাতে পারছিলাম না,

ভেতরে-ভেতরে একটা অস্থিরতা কাজ করছিল, তাও কীসের জন্য, বোঝার উপায় নেই।

যেন আমার জীবনে একটা পরিবর্তন অবধারিতভাবে আসন্ন। নিউ ইয়র্কে গিয়ে একবার অন্তত গ্রিনিচ ভিলেজে না যাওয়ার কোনও মনে হয় না। গৌতম দত্ত, মহুয়া চৌধুরী ও সৌবীর আমাকে ও সমরেশকে নিয়ে গেল শেষ রাত্রিটিতে। সাত-আট মাস আগেও আমি একবার এসেছিলাম এখানে। যত বারই আসি, খুব বেশি করে অ্যালেন গিনস্‌বার্গের কথা মনে পড়ে। অ্যালেনই একমাত্র আন্তর্জাতিক খ্যাতিমান কবি, যার সঙ্গে কলকাতার সম্পর্ক ছিল তার জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত।

দেখতে-দেখতে অ্যালেনের মৃত্যুর পর চার বছর কেটে গেল। এই ভিলেজের রাস্তায়-রাস্তায় অ্যালেনের সঙ্গে কতবার হেঁটেছি। আমার চিঠি লেখার অভ্যেস খুব কম, তবু অ্যালেন হঠাৎ-হঠাৎ চিঠি পাঠালে তার উত্তর দিতাম, ১৯৯৭ সালে ওকে লিখেছিলাম, আমি শিগগিরই আবার আসছি, তুমি সেই সময় নিউ ইয়র্কে থাকবে তো? অ্যালেন অনেক সময় কলোরাডোর বোল্ডার শহরের কাছে নারোপা বৌদ্ধ মহাবিদ্যালয়ে অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও ধ্যান করতে যেত। আমার চিঠির উত্তরে সে লিখল, হ্যাঁ, আপাতত নিউ ইয়র্কে আছি, তুমি সরাসরি এসে আমার অ্যাপার্টমেন্টে উঠবে। আমার আসতে একটু দেরি হয়েছিল, তার আগেই শেষ নিশ্বাস ফেলে চলে গেল সে। মৃত্যুর এক সপ্তাহ আগে অ্যালেন তার শেষতম কবিতাটি লেখে, তার নাম Things I'll not do (Nostalgias)। জীবনে আর কী-কী করতে পারবে না সেই তালিকা দিতে-দিতে অ্যালেন এক জায়গায় লিখেছে, "Or return to have Chat older Sunil & te young Coffee shop Poets." মনে পড়েছিল কলকাতা ও তার বন্ধুদের কথা?

অ্যালেন, পিটার অরলভস্কি আর গ্রেগরি করসোর সঙ্গে যেবার প্রথম এসেছিলাম এই গ্রিনিচ ভিলেজে, তখন এ জায়গাটা ছিল কত ফাঁকা-ফাঁকা, দোকানপাট অনেক কম, গরিব পাড়া বলে যত রাজ্যের বাউণ্ডুলে কবি-শিল্পীরা এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল। মাঝে-মাঝে সারারাত ধরেও চলত শিল্পের পাগলামি। তারপর তাদের দেখার জন্য আস্তে-আস্তে পর্যটকদের ভিড় জমতে থাকে। এখন শুধু পর্যটকদেরই গিজগিজে ভিড়। অজস্র রেস্তোরাঁ, কবি-শিল্পীরা অদৃশ্য হয়ে গেছে।

লস অ্যাঞ্জেলিসে যাওয়ার সময় আবার একটি কাণ্ড হল।

হুমায়ুন আমেদ আর সমরেশ মজুমদারেরও যাওয়ার কথা থাকলেও ওদের দেশে ফিরে যেতে হল বিশেষ কারণে। তবে ইমদাদুল হক মিলন আর বিশ্বজিৎ এবং মঝহারুল ইসলাম সমেত প্রকাশকদের একটি দলের সঙ্গী হব আমি। মিলন খুব ভালো ভ্রমণসঙ্গী, দুজনে আগেও গেছি নানান জায়গায়। এবারে দলবল মিলে এয়ারপোর্টে আসা হল, মালপত্র চেক-ইন আর বোর্ডিং কার্ডও প্রত্যেকের হাতে, বিমানের গেট পর্যন্ত পৌঁছতে হল অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে, কারণ জে এফ কে বিমানবন্দরটির অনেক অংশ ভেঙেচুরে আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া চলছে।

একেবারে শেষ গেটের সামনে, বিমানে ওঠার মুখে বিমানকর্মীরা আটকে দিল আমাদের। মিলন-বিশ্বজিৎদের টিকিটগুলি কনফার্মেশন নাকি ঠিক নেই, একমাত্র আমারটি ও.কে.। সুতরাং আমি ভেতরে যেতে পারি, ওদের অপেক্ষা করতে হবে।

চেক-ইনের সময় কিছু বলল না, মালপত্র ওজন, এক্স-রে, বোর্ডিং পাস দেওয়ার পরেও এরকম আপত্তি? সাহেবদের দেশে এমন অব্যবস্থা আগে দেখিনি।

আমি ভেতরে গিয়ে নির্দিষ্ট আসনে বসলাম, মনে হল, ওদের নিশ্চিত একটুপরেই ছেড়ে দেবে, ওদের মালপত্রও তো তোলা হয়ে গেছে।

ক্রমে বিমানটি অন্য যাত্রীতে ভরে গেল, ওরা কেউ আসতে পারল না।

আবার আমি একা।

বিমানটি আকাশে ওড়ার পর হঠাৎ খেয়াল হল, আমি কোথায় যাচ্ছি? লস অ্যাঞ্জেলিসের বইমেলার উদ্যোক্তাদের কারুকে আমি চিনি না, কারুর নামও জানি না, সব যোগাযোগ হয়েছে

বিশ্বজিতের মারফত। কোথায় উঠব, সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই।

যদি আমাকে কেউ ওখানকার এয়ারপোর্টে নিতে না আসে?

এবারে জানলার ধারে একটা আসন পেয়েছি বটে, কিন্তু রাত হয়ে গেছে, আকাশ দেখা যাবে না। বিমানের মধ্যে আলো জ্বলে বলে বাইরের অন্ধকারও দেখার উপায় নেই, ভেতরের প্রতিচ্ছায়ই থাকে বাইরে।

তবু তো জানলা। বিমানটির অবতরণের সময়ে তো অন্তত দেখা যাবে আলোকোজ্জ্বল মহানগরী। বিন্দু বিন্দু জোনাকির মতন আলো ক্রমশ হয়ে ওঠে দীপাবলি। যতবার দেখি, পুরোনো হয় না।

তা হলেও বারবার অমার ওই একই কথা মনে হতে লাগল। যদি কেউ আমায় নিতে না আসে? লস অ্যাঞ্জেলিস একটা বিতিকিচ্ছিরি রকমের লম্বা শহর, আগে কয়েকবার এলেও রাস্তাঘাট চিনি না। বিমানটি পৌঁছবে অনেক রাতে, তখন আমি কোথায় যাব? বিশ্বজিৎ অবশ্যই ওখানকার কারুকে টেলিফোনে জানাবে। যদি ভুলে যায়? টেলিফোনে যদি না পায়? লস অ্যাঞ্জেলিস শহরে আমার নিজস্ব কোনও বন্ধুও নেই।

বই পড়ায় মন বসছে না, অন্য কোনও কথাও ভাবছি না, শুধু ওই এক দুশ্চিন্তা। এক সময় নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হল।

কেউ বিমানবন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে না এলেও কী আসে যায়! আমি কি সাঁতার না-জানা বাচ্চা ছেলে যে জলে পড়ব?

একা একা অনেক অচেনা বিদেশি শহরে যাইনি এর আগে? যেমন ইস্তানবুলে, যেমন কায়রোতে, যেমন রোমে, যেমন ব্যাংককে। ওসব জায়গায় এয়ারপোর্টে কেউ নিতেও আসেনি, পরেও কারুর সঙ্গে পরিচয় হয়নি।

এই লস অ্যাঞ্জেলিসেই জীবনে প্রথমবার আসার সময় পরিচিত কেউ ছিল না, শুধু শহরটা দেখব বলেই চলে এসেছিলাম আইওয়া থেকে। তখন ট্যাক্সি নেওয়ার মতন বিলাসিতা করারও সামর্থ্য ছিল না, এয়ারপোর্ট থেকে বাসে চেপে গিয়েছি সিটি সেন্টারে, তারপর একটা সস্তার হোটেল খুঁজে নিয়েছি। রোমহর্ষক সেই হোটেল-অভিজ্ঞতা।

সস্তার হোটেল, তাতেও আরও সস্তার ঘর পাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে কাউন্টারের লোকটি বলেছিল, যে-দুটি মাত্র ঘর খালি আছে, সে দুটিই সুইট, সেইজন্য ভাড়া দ্বিগুণ, তোমাকে একটা ঘর দিতে পারি, তার ভাড়া অর্ধেকেরও কম।

কেন আমার প্রতি এই বিশেষ উদারতা? একটা ঘর কোনও একজন ব্যক্তি তিন মাসের জন্য টাকা দিয়ে ভাড়া নিয়ে রেখেছে, মাঝে-মাঝেই সে থাকে না। কিন্তু ঘরটাও ছাড়ে না। তবে সেই ক'টা দিনের জন্য হোটেলের মালিক যদি ঘরখানা অন্য কাউকে ভাড়া দেয়, তাতে তার আপত্তি নেই। আমার ভাড়া অনেক কম লাগবে বলে আমি তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিলাম।

ঘরে ঢুকেই চক্ষুস্থির। মূল ভাড়াটের বহু জিনিসপত্র সারা ঘরে ছড়ানো। তার আন্ডার প্যান্ট থেকে আধা ভরতি মদের বোতল পর্যন্ত। (মদের বোতল কখনও অর্ধেকটা খালি বলতে নেই) লোকটির স্বভাব খুবই এলোমেলো নিশ্চিত, জামা-প্যান্ট ইত্যাদি যেন ছুড়ে-ছুড়ে যেখানে সেখানে ফেলা রয়েছে। শুধু বিছানাটা ব্যবহারযোগ্য।

প্রথম মধ্যরাতেই দরজায় করাঘাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বেল নয়, দুম দুম করাঘাত। দরজা খুলেই দেখি এক বিশালকায় ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে, সত্যজিৎ রায়ের চেয়েও লম্বা, চওড়াতেও তাঁর চেয়ে ঢের বেশি। মুখ ভরতি দাড়ি, তার কাঁধে ঝোলানো গিটারের মতন কিছু একটা বাদ্যযন্ত্র। সে ক্রিয়াপদবর্জিত ইংরিজি বলতে লাগল, যেমন, হু ইউ? মাই রুম দিস! এবং তার প্রতিটি বাক্যে প্রচুর হুইস্কির গন্ধ মেশানো।

ভয়ে আমার বুক তো কেঁপে উঠতেই পারে। প্রথমেই মনে হল, লোকটি যদি বলে, তাব

কোনও জিনিস আমি চুরি করেছি? তার মদের বোতল থেকে চুমুক দিয়েছি? (দিইনি, তার কোনও জিনিসই ছুঁইনি।) দোষ আমার নয়, হোটেল মালিকের, কিন্তু বেশি রাতে কাউন্টারে কেউ থাকে না, তা ছাড়া এই মাতাল কি আমার কোনও কথা বুঝবে? এ আমাকে তুলে আছাড় মারলেও বাধা দেওয়ার উপায় নেই।

পরিণতিটি সেরকম ভয়াবহ হয়নি শেষ পর্যন্ত। মিন-মিন করে তাকে জানিয়ে দিলাম যে সে সাত দিনের আগে ফিরবে না বলে হোটেলের ম্যানেজার আমাকে এই ঘরে থাকতে দিয়েছে। তোমার আপত্তি থাকলে আমি এক্ষুনি বেরিয়ে গিয়ে অন্য হোটেল খুঁজে নিতে পারি। তোমার জিনিসপত্র সব বুঝে নাও।

লোকটি আমার দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থাকে, দুলতে-দুলতে বলল, অ্যানাদার হোটেল? অ্যাট দিস আওয়ার? নট সেইফ ম্যান।

তারপর জিগ্যেস করল, তুমি কোন দেশের লোক?

লোকটি একজন উঠতি গায়ক। সেই সময়টায় আমেরিকান গায়ক-শিল্পী-কবিরা ভারতীয়দের সম্পর্কে কিছুটা দুর্বলতা পোষণ করত। তখন ভারতের দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার দিকে এরা আকৃষ্ট হচ্ছে অনেকেই।

রাত্তিরের লস অ্যাঞ্জেলিসের রাস্তা রীতিমতন বিপদসঙ্কুল, তাই লোকটি আমাকে তো বেরুতে দিল না বটেই, সে রাতটা তার ঘরে থেকে যেতে বলল। কাঁধের ঝোলা থেকে বার করল স্যান্ডুইচ, আর তার মদের বোতলেও ভাগ নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল বারবার।

প্রায়ই এই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার আরও বেশ কয়েকবার হয়েছে। তবে, এবারে আমি ভয় পাচ্ছি কেন? বয়েস বেড়েছে বলে গেরেমভারি হয়েছি? খাতির-যত্ন পাওয়ার অভ্যেস হয়ে গেছে? এরকম অভ্যেস হওয়া মানেই পর্যটকের মৃত্যু। তা হলে একা-একা ঘোরাঘুরি এবার থামাতে হবে।

নিজেকে বকুনি দিয়ে বোঝালাম, এত চিন্তার কী আছে?

এখন বাসের বদলে ট্যাক্সি করতে পারি, খুব সস্তার বদলে ভদ্রগোছের মাঝারি হোটেলে এক রাত থাকার মতন টাকাও আছে, কাল সকালে ফোন-টোনে যোগাযোগ হবেই।

লস অ্যাঞ্জেলিসে নেমে বিমানবন্দরে ফুলের তোড়া হাতে অপেক্ষমাণ কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার নাম লেখা বোর্ড হাতে নিয়েও দাঁড়িয়ে নেউ কেউই।

আগের থেকে মনস্থির করে ফেলেছি বলে হতাশা জাগল না।

নিজের সুটকেসটা সংগ্রহ করার জন্য এগিয়ে চলেছি নির্দিষ্ট স্থানটির দিকে, কখন যেন অলক্ষে একটি যুবক পাশে এসে পড়ে বলল, সুনীলদা তো? আপনার হ্যান্ডব্যাগটা আমাকে দ্যান!

সে আমাকে চিনল কী করে, সে প্রশ্ন অবান্তর। এই ফ্লাইটে আমিই ছিলাম একমাত্র অশ্বেতাঙ্গ যাত্রী।

যুবকটির নাম শাহিন। তার বাড়িতেই আমার থাকার ব্যবস্থা।

গাড়িতে উঠে শাহিন বলল, আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দেব। এটা শুনুন।

সে চালিয়ে দিল একটা ক্যাসেট। তাতে শোনা গেল স্পষ্ট, সুমিষ্ট গলায় একটি কবিতার আবৃত্তি। কেউ কথা রাখেনি।

॥ ৫ ॥

লস অ্যাঞ্জেলিসে বাংলাদেশিদের বইমেলা ও বড় আকারের সাংস্কৃতিক উৎসব এই প্রথম, তাই অভিজ্ঞতার অভাবে সময়-রক্ষা ও অনুষ্ঠানসূচিতে এলোমেলো ভাব রয়ে গেছে কিছুটা। অবশ্য

উদ্যোক্তাদের আন্তরিকত ও নিষ্ঠার অভাব নেই। এখানে পেশা বা ব্যাবসায় যাই হোক, সবসময় ব্যস্ত থাকতে হয়, তবু এইসব অনুষ্ঠানের জন্য যাঁরা স্বেচ্ছায় সময় দান ও খাটাখাটনি করতে আসেন, তাঁরা আসলে জন্মভূমির টান ভুলতে পারেননি। পশ্চিমবঙ্গীয়দের তুলনায় বাংলাদেশিরা অনেক ঘন ঘন স্বদেশে যায়।

একটা জিনিস লক্ষ করলাম, এখানকার বাংলাদেশি মানুষগুলি সবাই ভালো ছেলে, কেউ সিগারেট খায় না, সন্ধে আটটার পরেও কেউ গেলাস ধরার জন্য উসখুস করে না। ঢাকা শহরের মানুষদের মধ্যে অনেক বেশি উদ্দামতা দেখেছি।

আমেরিকায় এখন সিগারেট বিরোধী আন্দোলন একেবারে তুঙ্গে। বিধিনিষেধ আরোপ হতে-হতে এখন শুধু খোলা মাঠ ও রাস্তাগুলি বাকি আছে। খুব শিগগিরি সম্ভবত সিঙ্গাপুরের মতন আমেরিকাতেও রাস্তায় ধূমপান নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। আমেরিকান পুরুষরা সবাই প্রায় ধূমপান ছেড়েছে, শুধু এখনও স্বাস্থ্য-সতর্কতা উপেক্ষা করে যাচ্ছে মেয়েরা, অনেক শহরে দেখেছি, দোকানের কাউন্টার সামলানো রমণীরা মাঝে-মাঝে দোকান ছেড়ে রাস্তায় গিয়ে, তুষারপাত কিংবা বৃষ্টির মধ্যেও দাঁড়িয়ে ফুক ফুক করে একটা সিগারেট টেনে আসছে।

বাঙালি নারী-পুরুষদের মধ্যে ধূমপায়ী আর দেখাই যায় না। আমার লজ্জা করে। অনেক সময়েই দেখি চতুর্দিকে ধূমপান বিরোধী হংসদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বসে আছি আমি এক বেয়াদপ বক! আমার মস্তিষ্ক থেকে তাম্রকূটের টানটা কিছুতে যাচ্ছে না। সন্ধের পর একটু-আধটু সুরা পানেও এরা অনাগ্রহী। আমি আর নিজেকে শোধরাতে পারলাম না।

সন্ধের পরেও বইমেলার একটা দোকানে বসে থাকতে থাকতে মনে হয়, আমি এখানে কেন এসেছি? কেন একাকিত্ব বোধটা কাটছে না? এখানকার সব কিছুর মধ্যেই যেন আমি বেমানান।

কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা, কিন্তু আমার গন্তব্য সেখানেও নয়। এই আন্তর্জাতিক কবিতা উৎসব হচ্ছে অন্য একটি শহরে, তার নাম Madellin, উচ্চারণ অবশ্য ম্যাডেলিন নয়, ফরাসি ভাষার মতন স্প্যানিশেও পাশাপাশি দুটো এল থাকলে উহ্য হয়ে যায়, কিংবা বদলে যায়। আমি সে চেষ্টা করব না, ইংরিজি মতে ম্যাডেলিনই বলব।

এখান থেকে আমাকে যেতে হবে মায়ামি, সেখান থেকে বিমান বদল করে বোগোটা, আবার ছোট বিমানে ম্যাডেলিনে পৌঁছে একটানা যাত্রার সমাপ্তি।

মায়ামির ফ্লাইট ধরতে হল অতি ভোরে উঠে, কষ্ট করে শাহিন আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল। বৃষ্টিহীন রোদ-ঝলমলে দিন, তবু এবারেও জানলা পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই।

ফ্লোরিডার মায়ামি একটি জগৎবিখ্যাত প্রমোদ-নগরী, প্রকৃতিও এখানে বড়ই রূপসী। আমার হাতে পরবর্তী উড়ানের আগে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময়। ছোট হোক বা বড় হোক, পৃথিবীর সমস্ত বিমানবন্দরই প্রায় একই রকম বৈচিত্র্যহীন, সুতরাং বিমানবন্দরে অযথা বসে না থেকে শহরটা ঘুরে দেখা যেত অনায়াসে, তা আর হয়ে উঠল না। মায়ামি বিমানবন্দর আমেরিকা যাওয়া-আসার একটি প্রধান দ্বার বলে এখানে নিরাপত্তা ব্যবস্থার খুবই কড়াকড়ি। তা ছাড়া নিকটবর্তী কিউবা সম্পর্কেও আমেরিকার সরকারের শুচিবাই আছে। নানাবিধ অস্ত্রধারী শান্ত্রীরা মাঝে মাঝেই এক একটা হিংস্র কুকুর নিয়ে এসে সবকিছু শোঁকাচ্ছে।

বিমানে ওঠার আগে আবার একটি ঝঞ্ঝাট হল। যাত্রা বাতিল হওয়ার উপক্রম। পাসপোর্ট-ভিসা পরীক্ষা করা হচ্ছে বারবার। একেবারে শেষ মুহূর্তে আমাকে আটকে দিয়ে বলা হল, আমার নাকি ভিসায় গণ্ডগোল আছে।

আমি দিল্লি থেকে কলম্বিয়ার ভিসা করিয়ে এনেছি, তার জন্য দণ্ড দিতে হয়েছে অনেক। আমি এ পর্যন্ত যত দেশে গেছি, তার মধ্যে কলম্বিয়ার মতন একটি ছোট, অকিঞ্চিৎকর দেশের ভিসা-খরচ সবচেয়ে বেশি। তার আবার কীসের গণ্ডগোল?

মিলিটারির মতন পোশাক ও চেহারার সেই লোকটি বলল, এ ভিসা তুমি কোথা থেকে পেয়েছ?

বললাম, কলম্বিয়ার দিল্লি দূতাবাসের ছাপই তো রয়েছে, তা দেখেই বোঝা যাবে।

লোকটি পাসপোর্টের সেই পাতাটি আমার চোখের সামনে ধরে বলল, এতে কোনও তারিখ নেই।

সত্যিই তো তাই। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। আমাকে এক মাসের জন্য ভিসা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন তারিখ থেকে কত তারিখ পর্যন্ত তার উল্লেখ নেই, সইয়ের তলাতেও কোনও তারিখ নেই। এরকম ভুল কোনও দূতাবাস করতে পারে? তারিখবিহীন যে কোনও দলিলই তো মূল্যহীন!

লোকটি আমাকে একপাশে সরে আসতে বলে কমপিউটার নিয়ে বসল।

কম্পিউটার যে কত অসাধ্য সাধন করতে পারে, সে বিষয়ে আমার সম্যক জ্ঞান নেই। মায়ামিতে বসে কম্পিউটার মারফত দিল্লির দূতাবাস থেকে দেওয়া ভিসার তারিখ কী করে বার করা হবে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য।

ভিসা শব্দটি লিখছি বটে, কিন্তু এর উচ্চারণ ভিজা ও ভিঝার মাঝামাঝি। সে উচ্চারণ বাংলায় বানান করা যায় না।

অন্য সব যাত্রী-যাত্রিণীরা চলে যাচ্ছে ভেতরে, আমি দাঁড়িয়ে আছি একপাশে, সেই মিলিটারি-প্রতিম লোকটি কম্পিউটার খটখটিয়েই চলেছে।

যেন আমি কোনও অপরাধ করে ধরা পড়েছি। কিংবা কৃপাপ্রার্থী।

মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা নামে অধিকারটা আজকাল সব বিমানবন্দরে এসে ধূলিসাৎ হয়ে যায়। কোনও প্রশ্ন করার উপায় নেই। নিরাপত্তার নামে যখন তখন সারাগায়ে চাপড় মারবে, একই জায়গায় দু-তিনবার বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে বলবে, ঘাঁটাঘাঁটি করবে, দাড়ি কামাবার পাউচটা তুলে জিগ্যেস করবে, এটা কী? পাসপোর্টটা এ হাত থেকে ও হাত ঘুরবে, তা নিয়ে চলবে গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর। প্রশ্ন করলেই যাত্রা বাতিল করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে বিমানকর্মীদের। যদিও হাইজ্যাকাররা বোমাপিস্তল নিয়ে ঠিকই উঠে পড়ে।

আমার এ যাত্রার ঠিক সাড়ে তিন মাস পরেই আমেরিকায় একসঙ্গে চারখানি বিমান হাইজ্যাকিং হয় একই দিনে, প্রায় একসঙ্গে। দুটি বিমানের ধাক্কায় ধ্বংস হয়ে যায় জগৎবিখ্যাত দুটি বিশালাকায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, একটি আঘাত হানে পেন্টাগনে।

প্রায় মিনি পনেরো দাঁড়িয়ে থাকার পর আর ধৈর্য রাখা গেল না। জিগ্যেস করলাম, কত দেরি হবে?

লোকটি কঠোর কণ্ঠস্বরে বললেন, দেরি হবে, হ্যাঁ, কত দেরি হবে তা কী করে বলব!

মনে মনে বললাম, ধুত্তোরি ছাই! কলম্বিয়ায় যেতেই হবে, এমন মাথায় দিব্যি কে দিয়েছে? এত বিঘ্নের মধ্য দিয়ে কবিতা পড়ার শখ আমার নেই।

নিউ ইয়র্ক, লস অ্যাঞ্জেলিসে পরিচিতরা সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করেছে, কেন আমি যাচ্ছি ওদেশে? বিশেষত এই সময়ে? সেখানে সন্ত্রাস ও খুনোখুনি লেগেই আছে।

একটা প্যারা-মিলিটারি বাহিনী, একটা চূড়ান্ত দক্ষিণপন্থী দল ও একটি মার্কসবাদী বিপ্লবী সংগঠন, এই তিন রকম দল অরাজকতা চালিয়ে যাচ্ছে সে দেশে। অতি শক্তিশালী মাদক চোরাচালান চক্র তো আছেই।

এখানে থাকতে থাকতেই কাগজে পড়লাম বোগোটা শহরে দিনদুপুরে বোমা বিস্ফোরণে অনেক লোক হতাহত হল একদিন। প্রথমে একটি গাড়ি-বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজন মরল, তারপর পুলিশ ও উদ্ধারকারীরা যখন সেখানে পৌঁছেছে, তখন ফাটল কাছাকাছি আর একটি গাড়ি-বোমা, তাতে কয়েকজন পুলিশসমেত ঘায়েল হল কিছু সাংবাদিক ও টিভির লোকজন।

এখানকার উগ্রপন্থীদের বিশেষ শখ পুলিশ খুন করা। তিনশোর বেশি পুলিশ ওদের হাতে বন্দি আছে। চোরাচালানকারীদের অস্ত্রে পর পর কয়েকজন বিচারক হত্যার কাহিনিও সবাই জানে। নিজের দেশের একজন ফুটবল খেলোয়াড় হঠাৎ একটা সেমসাইড গোল করে ফেলেছিল, সেই ভুলের জন্যও বেচারিকে গুলি খেয়ে মরতে হয়েছে।

ম্যাডেলিনও খুব সশস্ত্র হিংসার শহর। এক সপ্তাহ আগেই সেখানে চলন্ত বাসে গুলি চালিয়ে খতম করে দেওয়া হয়েছে বারোজন নিরীহ, সাধারণ যাত্রীকে। সেখানে অপহরণও নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা।

এরকম জায়গায় কেউ সাধ করে যায়?

শুধু দুজন, ফ্রান্সের প্রীতি সান্যাল ও কানাডার কান্তি হোর আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, কলম্বিয়া অবশ্যই দেখার মতন জায়গা, মানুষজন যেমন সুন্দর, তেমনই সুদৃশ্য প্রকৃতি।

প্রীতি সান্যাল নিজে গিয়েছেন কলম্বিয়ায়, তাঁর স্বামী বিকাশ সান্যালের ইউনেস্কোর কাজের সূত্রে। ওঁদেরও বিপদের ভয় সম্পর্কে সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু ওখানকার মানুষদের কাব্য ও গানবাজনার প্রতি ভালোবাসা দেখে মুগ্ধ হয়েছেন।

আর কান্তি হোরকে কাজের সূত্রে কলম্বিয়া তথা দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশে প্রায়ই যেতে হয়। তাঁর একটা সুবিধে, তিনি স্প্যানিশ ভাষা মাতৃভাষার মতন ভালো জানেন। না, একটু ভুল হল, অনেকেই নিজের মাতৃভাষাটা ভালো জানে না। কান্তি হোর এক আশ্চর্য, বিরল ব্যতিক্রম। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশ ছাড়া, কিন্তু বাংলাভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রয়ে গেছে প্রগাঢ় ভালোবাসা। তিনি যখন মুক্তোর মতন অক্ষরে বাংলার চিঠি লেখেন নিজের হাতে, তাতে একটাও ইংরিজি শব্দ থাকে না, থাকে না কোনও বানান ভুল।

কান্তিবাবু কলম্বিয়ার ভায়োলেন্সের ব্যাপারটা পাত্তাই দিতে চান না। তাঁর মতে, সেখানকার মানুষদের আন্তরিক ও শিষ্ট ব্যবহার অতুলনীয়। আমি যতদিন থাকব, তার মধ্যেও তিনিও একটা কাজের ছুতো নিয়ে চলে আসবেন, খুব আড্ডা হবে।

হিংস্রতা ও খুনোখুনি কোন দেশে নেই? বোমা, বাসযাত্রীদের গুলি করে মারা, অপহরণ কি আমাদের দেশে নেই? নকশাল আমলের কলকাতা, এখনকার ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, মণিপুরে এসব অহরহ ঘটছে, তবু কি সাধারণ জীবনযাত্রার স্রোত থেমে থাকে? কাশ্মীরের কথা বাদই দিলাম।

শুধু কবিতা পাঠের বাড়াবাড়ি রকমের আগ্রহে আমি অত দূরের দেশে যাচ্ছি না। অত কবিতা পড়ার নেশা আমার নেই, প্রকাশ্য জনসভায় কবিতা পাঠের চেয়ে ঘরোয়া অন্তরঙ্গ পরিবেশে কবিতা পড়া ও শোনাই আমার কাছে বেশি উপভোগ্য। তবু অনেক জায়গায় যেতেই হয়। ওখানে যাচ্ছি, দেশভ্রমণের নেশায়। আর ওই যে আগেই বলেছি, আর একটা মহাদেশ ছুঁয়ে আসার ছেলেমানুষি!

কিন্তু এ যাত্রায় গোড়া থেকেই এমন বিড়ম্বনা শুরু হয়েছে বলে সব উৎসাহে ছাই চাপা পড়ে যাচ্ছে।

এবারে আমিও খানিকটা কড়া গলায় বললাম, আমার আমেরিকান ভিসা তো ঠিক আছে? পাসপোর্টটা ফেরত দিন, আমি আর যাব না। এখান থেকেই ফিরব।

এতে ম্যাজিকের মতন কাজ হল।

লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে কম্পিউটার থেকে হাত তুলে, আমার পাসপোর্টটা বন্ধ করে এগিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে, আপনি প্লেনে উঠে পড়ুন!

তারিখবিহীন ভিসাতেই যদি কাজ চলে, তাহলে লোকটি এতক্ষণ দেরি করল কেন? অদ্ভুত সব ব্যাপার। ও কি আশা করেছিল, আমি ওর কাছে কাকুতি মিনতি করব? অন্যের আত্মসম্মান

নষ্ট করিয়ে অনেকে আনন্দ পায়।

বিমানে উঠে উচ্চশ্রেণির অংশটা পেরিয়ে সাধারণ শ্রেণিতে ঢোকার পরই দেখলাম, একেবারে সামনের সারিতে বসে আছেন সেই মহিলা। যাঁকে লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক আসার বিমানে দেখেছি, যিনি আমার মানিব্যাগটা উদ্ধার করে দিয়েছিলেন।

কাকতালীয়? তা ছাড়া আর কী।

আমার সিটটা বেশ খানিকটা দূরে। যেতে যেতে মনে হল, মানিব্যাগটার জন্য ভদ্রমহিলাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত ছিল। এই তো সুযোগ।

কিন্তু মহিলার সঙ্গে এবারে একটি বেশ বড় দল আছে, তিনি তাদের সঙ্গে কথাবার্তায় মগ্ন। থাক পরে দেখা যাবে।

বিমানটি কিন্তু ঠিক সময়ে ছাড়ল না।

প্রথমে ক্যাপ্টেন ঘোষণা করলেন যে সামান্য কোনও কারণে মিনিট পনেরো দেরি হবে, সে জন্য তিনি ক্ষমাপ্রার্থী।

পরবর্তী ঘোষণায় সেই সময়সীমা বেড়ে গেল।

তৃতীয়বার জানা গেল, রানওয়ে খালি নেই বলে বিমানটি উড়তে পারছে না।

এই কালহরণ অত্যন্ত বিরক্তিকর।

উড়ন্ত বিমানেই সময় যেন কাটতেই চায় না, মাটিতে থেমে থাকা বিমান একেবারেই চরিত্রহীন। টিভি-র নীরেস ছবি দেখার চেয়ে বইয়ের পাতায় চোখ ডুবিয়ে অন্যমনস্ক হওয়া বরং ভালো।

নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত 'সোল মাউন্টেন' নামে যে উপন্যাসটি আমি পড়ছি, সেটাও অনেকটা ভ্রমণকাহিনির মতন। একটি উপকথার পাহাড় খুঁজতে-খুঁজতে চিনের দুর্গম অঞ্চলে ঘুরছেন লেখক। তাঁর আঙ্গিকটি অনেকটা সতীনাথ ভাদুড়ির 'সত্যি ভ্রমণকাহিনি'র মতন। এক পরিচ্ছেদের বর্ণনা প্রত্যক্ষভাবে লেখকের উত্তম পুরুষে, পরবর্তী পরিচ্ছেদ তৃতীয় পুরুষে।

এই ভ্রমণকাহিনি যাতে একঘেয়ে না লাগে, তাই মাঝে-মাঝে লেখক মশাই বেশ রসালো মালমশলা মিশিয়ে দিয়েছেন। এর সময়কাল লেখকের তরুণ বয়েসের, ঘুরতে-ঘুরতে লেখকের সঙ্গে প্রায়ই একটি সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে দেখা ও আলাপ হয়ে যাচ্ছে, তারপর দুজনেই কিছুক্ষণ পর এক শয্যায়। একই নায়িকা নয়, বিভিন্ন পরিচ্ছেদে অন্য অন্য যুবতী, কোথাও-কোথাও আদিরসেরও অভাব নেই। সাম্যবাদী চিনের প্রত্যন্ত মফস্‌সলে যে এরকম বিছানা-উদার স্বাধীন রমণীদের দেখা পাওয়া যায়, তা আমার জানা ছিল না।

অবশ্য এই লেখক সাম্যবাদ-বিরোধী। হয়তো তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সেটাই প্রধান কারণ।

সে যাই হোক, আমার এই রচনাটির সঙ্গে ওই উপন্যাসটির প্রধান অমিল এই যে, আমারটির মধ্যে কোনও প্রেম কাহিনি নেই। কাহিনিই প্রায় নেই বলতে গেলে, প্রেম থাকবে কী করে?

সতীনাথ ভাদুড়ির 'সত্যি ভ্রমণকাহিনি'তে তবু একটা প্রেম না হলেও মধুর সম্পর্কের কথা আছে, আমার এ যাত্রায় সব মাধুর্য নিরুদ্দেশ।

তবে, আমার ব্যাগ উদ্ধারকারিণী, দ্বিতীয়বার দেখা এই কলম্বিয়া যাত্রিণী মহিলাটিকে নায়িকা বলা যেতে পারে, নায়িকা হওয়ার মতন সবরকম গুণই তাঁর আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আর একটিও বাক্য বিনিময় হয়নি আমার। আগবাড়িয়ে অচেনা মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার যোগ্যতাই আমার নেই। মেয়েরা যদি দয়া করে, সে আলাদা কথা।

টয়লেটে যাওয়ার ছুতোয় আমি সেই মহিলার পাশ দিয়ে ঘুরে এলাম একবার। আমাকে তাঁর চেনার কোনও প্রশ্নই নেই, দেখেও দেখলেন না। তিনি তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে গল্পে মগ্ন হয়ে

আছেন, এখন আমি ধন্যবাদ জানাতে গেলে যদি আলাপের ছুতো ভেবে বিরক্ত হন? তাই কিছুই বলা হল না।

তবে, মহিলাটির নাম জানা গেল, ইলিয়ানা। অন্যরা এই নামে ডাকছে। কথা না বললেও ওঁর মুখের দিকে তাকালে দৃষ্টি ধন্য হয়।

নিউ ইয়র্ক যাওয়ার সময় ইলিয়ানা এক সহযাত্রীর ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়েছিলেন, এখানে তিনি মনের মতন সঙ্গীদের পেয়েছেন, বেশ খুশিতে আছেন।

বিমানটি শেষ পর্যন্ত উড়ল দেড় ঘণ্টা বাদে।

এবারে জানলা পাওয়া গেছে, অনেক সিটই খালি, সুতরাং এটা কোনও সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। যদিও একটুপরেই সন্ধে হয়ে যাবে, তবু এখনও নীচের দিকে অনেক কিছুই চোখে পড়ে।

ম্যাপে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ-জায়গায় অনেক বিন্দু-বিন্দু দ্বীপ দেখেছি। মায়ামি থেকে কিউবা ডিঙিয়ে যেতেই হবে, তারপর ক্যারিবিয়ান সাগর, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ, জামাইকা, কোস্টারিকা, পানামা, কোনটা যে কী তা বোঝার উপায় নেই। সমুদ্রের বুকে যে একটা গম্ভীর পাহাড় চোখে পড়ল, সেটাই কি সান অ্যান্ড্রস?

এক সময় একজন পারসার আমার কাঁধে টোকা দিয়ে জিগ্যেস করল, তোমার কি পাসপোর্টটা হারিয়েছে?

আমি আঁতকে উঠলাম। মানিব্যাগ হারিয়েছি। চশমা ভেঙেছি, এরপর পাসপোর্ট? সেই কম্পিউটার খটখটানো মিলিটারি মেজাজের লোকটি কি শেষ পর্যন্ত আমার পাসপোর্ট ফেরত দেয়নি?

পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম। না তো, পাসপোর্ট ঠিকই আছে। বার করে মিলিয়েও নিলাম।

লোকটি বলল, টয়লেটের কাছে একটা পাসপোর্ট পাওয়া গেছে, ছবিটা অনেকটা তোমারই মতন—

পৃথিবীতে আমার মতন চেহারার অনেক মানুষ আছে, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, তবে আমার পাসপোর্ট আমার কাছেই অটুট আছে। এ ব্যাপারে তাকে নিশ্চিন্ত হতে বললাম।

এতবার এতরকম ঘোরাঘুরিতেও আমি কখনও পাসপোর্ট হারাইনি। এ ব্যাপারে ভাস্কর ছিল আমার ঠিক বিপরীত, যেখানে সেখানে পাসপোর্ট ফেলে যেত। ওর ব্রিটিশ পাসপোর্ট, খুবই মূল্যবান, একটু সুযোগ পেলেই চোরেরা লুফে নেবে, তাতেও ভ্রূক্ষেপ ছিল না ওর। নিজের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ইনসুলিনের বাক্সটাও যে হারিয়েছে কতবার!

একেবারে শেষ যাত্রার সকালবেলা ভাস্কর জামা-প্যান্ট পরে হোটেল থেকে বেরুবার জন্য তৈরি হয়েছে, ঘরে কিছু ফেলে যাচ্ছে কি না আমি আর অসীম খুঁজে দেখে একটা রুমাল ও একজোড়া মোজা পেয়েছিলাম, ভাস্কর পকেট থাবড়ে বলে দিল সব ঠিক আছে। তখন তো আমরা বুঝিনি যে এটাই ওর শেষ যাত্রা, মৃত্যু এর মধ্যেই এসে ওর বুকের মধ্যে থাবা গেড়েছে। ভাস্কর কথা বলছে বটে, আসলে ওর বাহ্যজ্ঞান নেই।

কয়েক মিনিট পরেই খুব কাছের হাসপাতালে ডাক্তাররা যখন ওর বুকে চাপ দিয়ে দিয়েও আর নিশ্বাস ফেরাতে পারলেন না, তখন সেখানে একটা ভিড় জমে গিয়েছিল। ভাস্কর যেখানেই একদিন-দুদিন থাকে, সেখানেই ও সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে যায়। হোটেলের ম্যানেজারদের সঙ্গে সে অনেকবার দরাদরি করেছে। কিন্তু বেয়ারা-খানসামাদের অবিশ্বাস্য রকমের বেশি বকশিশ দিয়ে হতভম্ব করে দিত।

দশ মিনিট আগেও ভাস্কর কথা বলেছে। এখন থেকে আর কখনও তার কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না, এই উপলব্ধিটা তখনও আমরা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য করতে পারছি না, থুম মেরে বসে আছি

হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে একটা গাছের নীচে, ভিড় ঠেলে একটি অল্পবয়েসি ছেলে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এই ছেলেটি হোটেলে ভাস্করের ঘরে ফাই ফরমাস খাটত। ওর হাতে ভাস্করের মানিব্যাগ আর পাসপোর্ট, ও দুটো ছিল মাথার বালিশের নীচে। আমরা সারাঘর খুঁজেছি, বালিশের তলাটা দেখার কথা মনে পড়েনি। ভাস্করের আর কখনও পাসপোর্টের প্রয়োজন হবে না, মানিব্যাগটাও কাজে লাগবে না, তাই বোধহয় ওগুলো নিয়ে ভার বাড়াতে চায়নি। ব্যাগটায় একগাদা টাকা।

ছেলেটি এসেছিল ছুটতে-ছুটতে, সে এসেছিল জীবন্ত ভাস্করের ওগুলো ফেরত দিতে। যে হাসিখুশি, মজাদার বাবুটিকে সে কতবার চা, ওমলেট, সোডা এনে দিয়েছে, সেই বাবুর অসুখ করেছে, আবার নিশ্চয়ই সেরে উঠবেন, ধরে নিয়েছিল। সে ওগুলো পেয়ে লুকিয়ে রাখলে আমরা টেরও পেতাম না। আর একটু পরেই মানালি থেকে আমাদের পাহাড়ের নীচে নেমে যাওয়ার কথা। হোটেলের ওই বাচ্চা চাকরটার অতগুলো টাকা অনেক কাজে লাগত, তবু যে সে ফেরত দেওয়ার জন্য ছুটে এসেছে, তাতেই সে একা বিশ্বের সব চোর -ডাকাতদের বিবেকহীনতার প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে রইল।

আমার কখনও পাসপোর্ট না হারালেও পাসপোর্টের জন্য একবার আমাকে এক দারুণ শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়তে হয়েছিল।

এটা সেই ইস্তানবুলে যাওয়ার ঠিক আগেকার ঘটনা।

ভারতীয় লেখক-প্রতিনিধি দলটির বাকি সবাই ফিরে যাবে ভারতে, আমি একাকী যাব তুরস্কে। ভারতের বিমান দুপুরবেলা, আমার বিমান খুব ভোরে, তাই অন্যদের না জাগিয়ে আমি তৈরি-টৈরি হয়ে নেমে এসেছিলাম হোটেলের কাউন্টারে।

এটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার ঠিক বছর খানেক আগের কথা। সে সময় চেকোশ্লোভাকিয়া অধিকাংশ মানুষকেই বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ মনে হয়েছিল, আমাদের এই সরকারি কর্মচারীদের আতিথ্য ছিল নিতান্তই দায়সারা, আসলে তারা সকলেই তখন সরকারের প্রতি ক্রোধে ফুঁসছে। হোটেলগুলিও সব সরকারি, সেখানকার কর্মীদের ব্যবহারও খুবই শুষ্ক।

সব সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই ভিসা ব্যবস্থা ছিল অন্যরকম। গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে পাসপোর্টের মধ্যে একটা পাতায় ভিসার ছাপ দেওয়া থাকে, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে আলাদা একটি কাগজে দেওয়া হত ভিসা। সে কাগজটায় ছবিও থাকত। সেসব দেশ ছেড়ে আসবার সময় ভিসার কাগজটা এয়ারপোর্টে রেখে দিত। অর্থাৎ, ধরা যাক মস্কো, সেখান থেকে বিমানে ওঠার পর আর কোনও প্রমাণই থাকত না যে আমি মস্কো গিয়েছিলাম।

তা ছাড়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানিতে যেমন একবার বিমানবন্দর থেকে দেশটার মধ্যে ঢুকে পড়লে তারপর আমি কোথায় যাব কিংবা কোথায় থাকব, তা নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু রাশিয়া, পোলান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া কয়েকটি মাত্র শহরের নাম নির্দিষ্ট থাকত, তার বাইরে কোথাও যাওয়ার উপায় ছিল না। শুধু তাই নয়, যে-কোনও শহরের হোটেলে পৌঁছলেই পাসপোর্টটি জমা নিয়ে নিত, সেটি সঙ্গে রাখতে দিত না।

আমার পাসপোর্টও এখানে জমা করা আছে, সেটা ফেরত চাইতেই ঘুম-ঘুম চোখে হোটেল কর্মীটি একগাদা পাসপোর্টের ভেতর থেকে আমারটা বার করে দিল। সে পাসপোর্টের ভেতর থেকে আমার ছবি-সাঁটা ভিসার কাগজটা বেরিয়ে আছে।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে একা চলে গেলাম এয়ারপোর্ট। সফরের চোদ্দোদিন সবসময় একজন না একজন ইন্টারপ্রেটার সঙ্গে থাকত। প্রাহা শহরের এয়ারপোর্টটি তখন বেশ ছোটই ছিল, কর্মীদেরও ঢিলেঢালা ভাব। সুটকেস বইবার ট্রলি পাওয়া যায় না। নির্দিষ্ট কাউন্টারে গিয়ে মালপত্র জমা দিয়ে বোর্ডিং কার্ড নিয়ে নিলাম। সুভেনির হিসেবে এক জোড়া কাচের পুতুলও কিনে ফেললাম দোকান থেকে।

তারপর ইমিগ্রেশানে এসে এক মহিলা অফিসারকে পাসপোর্ট দিতেই শুরু হল নাটক।

তিনি পাসপোর্টটা দেখছেন আর আমার মুখটা দেখছেন পর্যায়ক্রমে বারবার। তারপর ছবির পাতাটা আমার চোখের সামনে এনে জিগ্যেস করলেন, ইজ দিস ইয়োর পাসপোর্ট?

জীবনে এত অবাক কখনও হইনি। বিস্ময়ের সঙ্গে ভয়, কেউ যদি পাহাড়ের একটা খাদে ঠেলে ফেলে দেওয়ার মতো পিঠে হাত রাখে, সেইরকম অবস্থার মতন।

বোমা ফাটানোর মতন চিৎকার করে বললাম, 'নো!'

পাসপোর্টের ছবিটা আমার নয়, ভিসার কাগজটা আমার। অর্থাৎ অলস, ফাঁকিবাজ হোটেল কর্মী অন্য একজনের পাসপোর্টের মধ্যে আমার ছবিটা ঢুকিয়ে রেখেছে।

মহিলাটি চেয়ারে হেলান দিয়ে মিষ্টি হেসে বললেন, অন্যের পাসপোর্ট নিয়ে ঘোরা কতখানি বে-আইনি, তুমি জানো নিশ্চয়ই? সিকিউরিটির লোককে ডেকে এখুনি তোমাকে জেলে দেওয়া উচিত। আর আমি যদি নিয়ম ভেঙে তোমাকে ছেড়েও দিই, তাতেও তোমার কোনও লাভ হবে না। নকল পাসপোর্ট নিয়ে তুমি অন্য যে-দেশে যাবে, সেখানেই বাধা পাবে, এমনকী নিজের দেশেও ঢুকতে পারবে না।

ভদ্রমহিলা যা বললেন, তার প্রতিটি বর্ণ মর্মে-মর্মে সত্যি।

আমি দ্রুততম চলচ্চিত্রের বেগে ভেবে যেতে লাগলাম ঘটনা পরম্পরা।

ইস্তানবুলের এই ফ্লাইট ধরতে না পারলে আবার কবে রিজার্ভেশন পাব তার ঠিক নেই। এখান থেকে ভারতের রিজার্ভেশান পাওয়া খুবই দুষ্কর, আগেই শুনেছি। মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। এখানেই বা থাকব কী করে, আমার কাছে খুব বেশি টাকা নেই। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এই সব দেশে সরকারি আতিথ্যের নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেলে তারপর আর কেউ ফিরেও তাকায় না। আমার ভিসাও আর একদিন আছে মাত্র।

তবে কি বিদেশ-বিভুঁইয়ে জেল খাটাই আমার নিয়তি?

মরিয়া হয়ে বললাম, মালপত্র চেক-ইন করার সময় কেন আমাকে কিছু বলা হয়নি? কাউন্টারে পাসপোর্টটা রেখেছিলাম, ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি সেটা উলটেও দেখেনি। তখন জানালে তবু একটা ব্যবস্থা করা যেত।

মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, উচিত ছিল, এটা ওই ব্যক্তিটির গাফিলতি। কিন্তু তাতেও তোমার কাছে অন্যের পাসপোর্ট রাখার অপরাধ খণ্ডন হয় না। তোমার ভিসার কাগজ দেখে বুঝতে পারছি, তুমি ইচ্ছে করে এটা করোনি। তোমাকে আমি এইটুকু মাত্র সুযোগ দিতে পারি, তোমার বিমান ছাড়ার পঞ্চাশ মিনিট দেরি আছে, তোমাকে চল্লিশ মিনিট সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে যদি এটা বদল করে নিজের পাসপোর্ট নিয়ে আসতে পারো, তা হলে তোমার কোনও শাস্তি হবে না।

তাতেও কোনও সুরাহা হল না।

ভোরবেলা হোটেল থেকে ট্যাক্সিতে এয়ারপোর্টে আসতে পাক্কা পঁচিশ মিনিট সময় লেগেছিল। এখন যানবাহন বেড়েছে, আর একটু বেশি সময় লাগতে পারে। সুতরাং হোটেলে যাওয়া-আসার সময় হবে না।

আমাদের দলের অন্য কোনও লেখককে যে অনুরোধ জানাব, তাতেও বিশেষ সুবিধে হবে না। তারা সবাই ঘুমোচ্ছে দেখে এসেছি। ডেকে তুলতে হবে। তৈরি হতে কিছুটা অন্তত সময় তো লাগবেই। তা ছাড়া, অন্যের হাতে আমার পাসপোর্ট কি দেবে হোটেল কর্তৃপক্ষ?

তবু হোটেলে একটা ফোন করলাম।

এর মধ্যে হোটেল কাউন্টারের আগের কর্মীটি বদলে গেছে, অন্য যে এসেছে, সে এতই কম ইংরিজি জানে যে ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারে না। ভিসার কাগজ আমার, পাসপোর্টটা অন্যের, এটা শুনে সে বারবার বলতে লাগল, হোয়াট! হোয়াট! দ্যাট ক্যান্ট বি! তারপর লাইন

কেটে দিল।

বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ হচ্ছে, ডুবন্ত মানুষের মতন আঁকুপাঁকু করতে-করতে হঠাৎ দেখতে পেলাম এক মহিলাকে। ইনি প্রথম কয়েকটি দিন আমাদের দলটির ইন্টারপ্রেটার ছিলেন। ভদ্রমহিলার চেহারা এতই রোগা, এতই শুকনো যেন শরীরের সব রসকষ শুষে নেওয়া হয়েছে, মুখে কখনও হাসি নেই, বরং সবসময় বিরক্তি ও রাগ-রাগ ভাব। আমাদের দলের পুরুষরা আড়ালে তাঁকে বলত পেত্নি। একজন হিন্দি লেখক বলেছিল, সব ভ্রমণ কাহিনিতে কত সুন্দরী, রসিক ইন্টারপ্রেটার বা গাইড থাকে, আর আমাদের ভাগ্যে এই!

এখন সেই মহিলাকেই আমার মনে হল দেবদূতী।

এয়ারপোর্টের জনারণ্যে তিনিই একমাত্র, যিনি আমাকে চিনবেন এবং ইংরিজিতে আমার সমস্যা বুঝতে পারবেন।

আমি ভদ্রতা-সভ্যতা ভুলে গিয়ে ওঁর হাত চেপে ধরে বললাম, মিস, আমাকে বাঁচান!

তিনি সব শুনে বললেন, আমি একটি চিনা প্রতিনিধি দলকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছি, আর দশ মিনিটের মধ্যে তাদের বিমান নামবে। আমি তোমাকে বেশি সময় দিতে পারব না। তবে শেষ চেষ্টা করছি। তোমারও দোষ আছে, পাসপোর্ট সবসময় ভালো করে দেখে নেওয়া উচিত, শুধু ভিসার কাগজ দেখে তোমার নিশ্চিত হওয়া উচিত হয়নি। আর হোটেলেরও দোষ আছে, অন্যের পার্সপোর্টে তোমার ভিসার কাগজ ছাপা মারাত্মক অপরাধ। এই পাসপোর্টটা যার, সেও তো বিপদে পড়বে! যাই হোক, আমি হোটেলের ঘাড়েই সব দোষ চাপাচ্ছি।

একটা টেলিফোন বুথে ঢুকে তিনি কয়েক মিনিট কথা বললেন, মনে হল যেন কারুকে খুব ধমকাচ্ছেন। ভয় দেখাচ্ছেন।

বেরিয়ে এসে বললেন, ওদের কোনও লোক এখন আসতে পারবে না, তবে একজন ট্যাক্সি ড্রাইভারের হাতে দিয়ে এক্ষুনি তোমার পাসপোর্টটা পাঠাচ্ছে, তার হাতেই অন্য পাসপোর্টটা দিয়ে দিও। বাইরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে অপেক্ষা করো।

তিনি আর দাঁড়ালেন না। চলে গেলেন অ্যারাইভালো গেটের দিকে। আমি কৃতজ্ঞতায় তাঁর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম, তাঁর পদচুম্বনেও রাজি ছিলাম। আর দু-চার মিনিট এদিক-ওদিক হলে ওঁর সঙ্গে আমার দেখাই হত না।

প্রতিটি মিনিট এখন মূল্যবান। হোটেল থেকে ট্যাক্সিটি আসতে অন্তত আরও আধঘণ্টা তো লাগবেই। এই আধঘণ্টা মানে আসলে কত ঘণ্টা?

থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি খুব সহজ করে বোঝাবার জন্য আইনস্টাইন নাকি কারুকে বলেছিলেন, মনে করো, কোনও লোকের একটা পা ফায়ার প্লেসের আগুনে ঠুসে ধরা হয়েছে, তা হলে সেই লোকটির কাছে পাঁচ মিনিটই মনে হবে এক ঘণ্টা। আর কেউ যদি তার প্রেমিকার পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে থাকে, তা হলে তার এক ঘণ্টাকেই মনে হবে পাঁচ মিনিট।

আমার পা নয়, যেন মাথাটাই ঠুসে ধরা হয়েছে ফায়ার প্লেসে। এই আধঘণ্টার মধ্যেই নির্ভর করছে আমার জীবন-মরণ না হলেও তুরস্ক ভ্রমণ কিংবা কারাদণ্ড।

অনবরত ঘড়ি দেখতে-দেখতে আর ঘন-ঘন সিগারেট টানতে-টানতে এ কথাও মনে হচ্ছে যে, সেই ট্যাক্সিওয়ালা আমায় চিনবে কী করে? এখানে এসে ট্যাক্সি পার্ক করে নেমে এসে আমার নাম ঘোষণার ব্যবস্থা করবে?

পার্কিং করতেই তো অনেক সময় লেগে যায়। আমি তো আর একটা মিনিটও অতিরিক্ত ব্যয় করতে পারব না। পরপর ট্যাক্সি আসছে। নির্দিষ্ট লেন দিয়ে ঢুকছে ট্যাক্সিগুলো, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে আমার চোখে ব্যথা হয়ে গেল। হঠাৎ দেখি, এক ট্যাক্সিচালক জানলা দিয়ে একটা হাত বাইরে তুলে আছে, সেই হাতে ধরা একটা পাসপোর্ট!

কত ভাড়া হবে সেটা জানাই আছে। তার সঙ্গে কিছু বকশিশ জুড়ে সেই টাকা নিয়ে ছুটে গেলাম। পাসপোর্ট বদলাবদলি করেই আবার দৌড় দিলাম প্রস্থানদ্বারের দিকে।

তখন আমার নামে শেষ ডাক ঘোষিত হচ্ছে।

॥ ৬ ॥

আমেরিকান এয়ার লাইন্সের বিমান বোগোটায় পৌঁছল দেড় ঘণ্টা দেরিতে। অবশেষে আসা হল দক্ষিণ আমেরিকায়। এর পরেও দেখা দিতে লাগল নতুন-নতুন সমস্যা।

বোগোটা থেকে আজ রাতেই দিশি বিমানে পৌঁছবার কথা ম্যাডেলিন শহরে। কবিতা উৎসবের উদ্যোক্তারা লিখে জানিয়েছিল যে বোগোটা বিমানবন্দরেই কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পৌঁছে দেবে অন্য ছোট বিমানের দরজায়। সুটকেস সংগ্রহ করার স্থানটিতে গিয়ে দেখতে পেলাম ইলিয়ানাকে। চার-পাঁচজনের একটি দলের মধ্যে দাঁড়িয়ে। মায়ামিতে বেশ গরম ছিল। এখানে নরম-নরম শীত, ইলিয়ানার গলায় একটা কমলা রঙের স্কার্ফ জড়ানো। ওই দলের মধ্যে একটি পনেরো-ষোলো বছরের খুকিও আছে, সে ইলিয়ানার সন্তান কি না জানার উপায় নেই। যদি হয়ও, মায়ের মতন রূপ সে পায়নি।

চলন্ত বেল্টে নানারকম সুটকেস ও পোঁটলাপুঁটলি ঘুরছে। এ সময় সবাই শ্যেন চক্ষুতে নিজের বস্তুটি খোঁজে। আমি লক্ষ করছি, ইলিয়ানার জিনিসপত্র আগে আসে কি না। আমার আগে পেলে সে আগেই বেরিয়ে যাবে, তাকে আর বেশিক্ষণ দেখা যাবে না। আমি চলে যাব অন্য শহরে।

ইলিয়ানা খুবই রূপবতী হলেও তার সেই রূপের মধ্যে উগ্রতা বা প্রগলভতা নেই একটুও। পোশাকেও নেই রুচিহীনতা কিংবা দেখানেপনা, শুধু একটা মেরুন রঙের স্কার্ট পরা, গলায় স্কার্ফটি তাঁকে আরও গরিমা দিয়েছে।

শুধু আমি নই, আরও অনেকে আড়ে-আড়ে দেখছে ইলিয়ানাকে।

ইলিয়ানার সুটকেস বা ব্যাগটা কী রঙের হতে পারে? এ কৌতূহলের কোনও মানে হয়? আমার সুটকেস এসে গেছে, তবু আমি তুলছি না, সেটাকে ঘুরতে দিচ্ছি, দেখছি ইলিয়ানার হাত। দেখব না? তিনিই যে এই রচনার নিঃশব্দ নায়িকা।

ইলিয়ানার মাঝারি আকারের সুটকেসটির রং খয়েরি। দামি কিছু নয়। সেটা তিনি তুলে নেওয়ার পর তাঁর এক সঙ্গী সেটা তাঁর হাত থেকে নিতে চাইল, তিনি দিলেন না। হাঁটার সময় তাঁর মাথাটা উঁচু করা থাকে। অনেক শিক্ষাদীক্ষায় , কিংবা আভিজাত্যে এরকম হাঁটা রপ্ত করতে হয়।

আমি বাইরে এসে দেখলাম, একজোড়া যুবক-যুবতী আমার নাম লেখা প্লাকার্ড নিয়ে অপেক্ষমাণ। স্বাগতম জানাবার আগেই তারা একটি দুঃসংবাদ দিল।

আমি এত দেরি করে পৌঁছেছি বলে ম্যাডেলিনগামী নির্দিষ্ট দিশি বিমানটি এর মধ্যেই ছেড়ে চলে গেছে। এর পরে আর একটিই মাত্র ফ্লাইট আছে, সেটাতে সিট পাওয়া যাবে কি না ঠিক নেই, সুতরাং এক্ষুনি আমাদের এয়ারপোর্টের অন্য প্রান্তে দৌড়ে যেতে হবে।

আমার আন্তর্জাতিক টিকিটগুলির সঙ্গে এখানকার স্বল্প যাত্রার টিকিটটি যুক্ত ছিল না, সুতরাং তার সময়সূচিও জানতাম না।

মেয়েটি গেল টিকিটের ব্যবস্থা করতে, যুবকটি দাঁড়িয়ে রইল আমার পাশে। কিন্তু সে আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি।

আমি দু-একটি বাক্য বলার চেষ্টা করে বুঝলাম, তার গাম্ভীর্য কিংবা লাজুকতার কারণ, সে

ইংরিজি জানে না।

আবার একটা অনিশ্চয়তার উদ্বেগ আমাকে পেয়ে বসেছে।

ম্যাডেলিন-এ এয়ারপোর্টে যে আমাকে নিতে আসবে, সে নির্দিষ্ট ফ্লাইটে আমাকে দেখতে না পেয়ে যদি ফিরে যায়? তখন আমি কী করব? কোন হোটেলে আমার থাকার কথা, তাও তো জানা নেই।

লস অ্যাঞ্জেলিসে নামার আগে উদ্বেগ অনেকটা ভিত্তিহীন ছিল, কারণ সেখানে আমি নিজেই কিছু ব্যবস্থা করে নিতে পারতাম। কিন্তু এটা আমার অচেনা দেশ, গণ্ডগোল লেগেই আছে, এখানে বিপদের আশঙ্কা তুচ্ছ করার মতন নয়। সেখানে পৌঁছব রাত সাড়ে এগারোটায়।

যুবতীটি ফিরে এসে জানাল, একটাও সিট ছিল না, অনেক ধরাধরির পর এক নম্বর ওয়েটিংলিস্টের প্যাসেঞ্জারকে বঞ্চিত করে আমার জায়গা হয়েছে।

আমি আমার উদ্বেগের কথা জানাতে সে মেয়েটিও চিন্তিত মুখে বলল, হ্যাঁ তারা চলে যেতেই পারে, পরের ফ্লাইটে যে তুমি যাচ্ছ, তাও তো তারা জানবে না। আমি তাদের ফোনে ধরবার চেষ্টা করছি ফিরে গিয়ে।

যদি ফোনে ধরতে না পারো?

মেয়েটি বলল, ফেস্টিভালো অফিসে এখন কেউ থাকবে না, অন্য একজনের বাড়িতে...যাই হোক, তোমাকে হোটেলের নাম আর টেলিফোন নাম্বার লিখে দিচ্ছি, যদি এয়ারপোর্টে কেউ না থাকে, একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যেতে হবে।

এয়ারপোর্ট থেকে শহর কত দূরে?

অন্তত এক ঘণ্টা তো লাগবেই।

রাত সাড়ে এগারোটায় এক অচেনা বিপদসঙ্কুল শহরে একা একা ট্যাক্সিতে যাওয়ার প্রস্তাবটা মোটেই সুখকর বলা যায় না। এইসব সময়ে মনে হয়, কেন এলাম?

বোগোটা থেকে ম্যাডেলিনের উড়ান-সময় মাত্র পঞ্চাশ মিনিট। ছোট বিমান।

তাতে উঠেই আমি যাত্রীদের প্রত্যেককে একবার দেখে নিলাম। কাকে খুঁজছি? অবশ্যই ইলিয়ানাকে। সেও তো এই বিমানে থাকতেও পারে।

ততটা কাকতালীয় আর হল না। ইলিয়ানা নেই।

সুটকেস নেওয়ার সময় ইলিয়ানাকে দেখে তো অনায়াসেই দুটো-একটা কথা বলা যেত। তাকে মনে করিয়ে দিতে পারতাম আমার মানিব্যাগ খুঁজে দেওয়ার কথা। কারুকে ধন্যবাদ জানানোটা কোনওক্রমেই অভদ্রতা বলে গণ্য হতে পারে না।

তবু কথা বলিনি। অনেক সময় এরকম হয় মানুষের। যে-কাজটা করা উচিত কিংবা যেটা করলে ভালো লাগবে, সেটাও করি না। মনে মনেই ভেবে যাই!

এই পঞ্চাশ মিনিট আমি অনবরত নিজের সঙ্গে একটা বাজি ধরার খেলা খেলতে লাগলাম। এয়ারপোর্টে কেউ থাকবে কি থাকবে না? বোগোটার মেয়েটি ওদের কারুকে টেলিফোনে পাবে কি পাবে না?

শেষপর্যন্ত এই বাজিতে আমি জিতলাম না হারলাম? নিজের সঙ্গে বাজি ধরার মুশকিল এটাই, ফলাফলটা ঠিক বোঝা যায় না।

দুটি লোক পোয়েট্রি ফেস্টিভালের বোর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কাছে গিয়ে আমার নাম বলতেই তারা মাথা নাড়ল।

এখানে আমার সুটকেসটা এল সবার শেষে। ততক্ষণে এয়ারপোর্ট ফাঁকা হয়ে গেছে।

বাইরে এসে ওদের গাড়িতে ওঠার আগে দেখে নিলাম, একটাও ট্যাক্সি নেই। অর্থাৎ এরা অপেক্ষা না করলে আমার দুর্ভোগের অন্ত থাকত না।

ওদের একজনকে আমি বললাম, মায়ামি থেকে আসার ফ্লাইট অনেক লেট করেছে, সে জন্য আগের প্লেনটা ধরতে পারিনি। তোমাদের এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হল, সে জন্য আমি দুঃখিত। এবং অনেক ধন্যবাদ।

সে লোকটি তার পাশের লোকটিকে খোঁচা মারল।

অর্থাৎ সে ইংরিজি বোঝে না।

অন্য লোকটিও ইংরিজি ভাঙা-ভাঙা, সে বলল যে, বোগোটা থেকে একটি মেয়ে মোবাইল ফোনে তাদের জানিয়ে দিয়েছে।

মনে-মনে সেই নাম না জানা মেয়েটিকে ধন্যবাদ দিলাম।

গাড়িটা পুরোনো আর লঝঝরে, ক্যাঁচকোঁচ শব্দ হচ্ছে। গতিও খুব কম।

কিছুক্ষণ সমতলে যাওয়ার পর গাড়িটা উঠতে লাগল পাহাড়ে। তারপর উঠছি তো উঠছিই, পথ আর ফুরোচ্ছে না।

অন্ধকারে যেটুকু দেখা যাচ্ছে, তাতে মনে হয় পাহাড়টা সুদৃশ্য নয়। বৃক্ষ বিরল, মাঝে-মাঝে দু-একটা বন্ধ দোকান। দার্জিলিঙে যাওয়ার পথে কাঠের তৈরি ছোটখাটো বাড়ির মতন বাড়ি, গরিব-গরিব ভাব।

রাস্তায় একজনও মানুষ নেই তো বটেই, আর কোনও গাড়িও নেই। পেছনেও নয়, সামনেও নয়। প্লেনের অন্য যাত্রীরা গেল কোন দিকে? আমার সুটকেস সবচেয়ে শেষে পেয়েছি বলে সব গাড়ি ও ট্যাক্সি আগেই বেরিয়ে গেছে? উলটো দিক থেকেও কোনও গাড়ি আসছে না, তার কারণ, এত রাতে শহর ছেড়ে কেউ বাইরে যায় না?

প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট কেটে গেছে, গাড়ি এখনও পাহাড়ে। এমনকী হতে পারে, বিমানবন্দর থেকে শহরে যেতে হলে এত পাহাড় ডিঙোনো ছাড়া আর কোনও রাস্তা নেই?

মাঝে-মাঝে দূরে কোনও একটা আলো-জ্বলা বাড়ি দেখলে মনে হচ্ছে, এটাই বোধহয় একটা হোটেল, এবার পৌঁছে যাব। না, পেরিয়ে যাচ্ছি সেইসব বাড়ি।

এই লোকদুটি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে।

এরা উৎসব কমিটির প্রতিনিধি, এদের সন্দেহ করার কোনও কারণই নেই। কিন্তু মধ্যরাত্রি পেরিয়ে যাওয়া এই নির্জন পাহাড়ি রাস্তায় যদি কোনও ঝোপের আড়াল থেকে উগ্রপন্থীরা গুলি-টুলি চালায়!

আমি বেশি-বেশি ভয় পাচ্ছি, বয়েস বেড়েছে বলে? অন্য কেউ হলে কী ভাবত। মাঝে-মাঝে এরকম মনে হয়। এই মুহূর্তে আমার জায়গায় শক্তি থাকলে কী করত? শঙ্খ ঘোষ থাকলে কী চিন্তা করতেন?

হঠাৎ সব কিছুই মনে হল, পরাবাস্তবতা। এক অচিন দেশে, দুজন নির্বাক মানুষের সঙ্গে, মধ্যরাত্রির অন্ধকারে আমি ঘুরছি একটা পাহাড়ে। এটা সত্য নয়, অলীক।

সুতরাং উৎকণ্ঠা সম্পূর্ণ মুছে ফেলে, শরীরের সব স্নায়ু শিথিল করে, এই সময়টা উপভোগ করাই ভালো।

এখন আমি আর এই পৃথিবীতেই নেই, চাঁদের দিকে যাচ্ছি ভাবলেও ক্ষতি কী? কিংবা পৃথিবীতে আর হিংসা নেই। সমস্ত উগ্রপন্থীদের অস্ত্রসম্ভার মরচে ধরে অকেজো হয়ে গেছে।

হঠাৎ গাড়িটা এক জায়গায় থেমে গেল। ভাঙা ইংরিজির লোকটি বলল, কাম!

পাহাড়ের খুব উঁচুতে, কাছাকাছি কোনও বাড়ি নেই, আলো নেই, এখানে নামতে বলছে কেন?

এটাও অলীকের মধ্যে ধরে নিলে অনায়াসে নামা যেতে পারে।

ভাঙা ইংরিজির লোকটি একটি সিগারেট ধরাল। লোকটি বুঝি গাড়ির মধ্যে ধূমপান করে

না! উচিত কি উচিত নয় ঠিক জানতে না পেরে আমিও এতক্ষণ সিগারেট ধরাইনি। আমার বন্ধু অসীম রায় নিজে ধূমপায়ী হলেও তার গাড়ির মধ্যে বসে সিগারেট ধরানোর কঠোর নিষেধ আছে।

অন্য লোকটি এগিয়ে গেল পাহাড়ের খাদের দিকে। ও বুঝি হিসি করবে? তা নয়, সেও আমার দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, কাম, কাম।

কাছে গিয়ে বোঝা গেল কারণটা।

পাহাড়ের একপাশটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে অনেক নীচে। সেখানকার উপত্যকায় দেখা যাচ্ছে অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আলো।

অর্থাৎ ওরা আমাকে একটা দৃশ্য দেখাচ্ছে।

অন্য লোকটি বলল, ওই যে ম্যাডেলিন শহর।

যারা রাত্তিরবেলা দূর থেকে দার্জিলিং বা শিলং দেখেছে, তাদের কাছে এ দৃশ্য এমন কিছু আহামরি মনে হবে না। প্লেন থেকে অনেক সমতল শহরও এরকমই দেখায়।

তবু, তুলনা না করেও সব সুন্দরী তো সুন্দর। আলো-ঝলমল একটি উপত্যকার একটা বিশেষ রূপ তো আছেই।

কিন্তু আমি আজ উঠেছি মুরগি না-জাগা ভোরে, তারপর সারাদিন ধরে এতরকম অনিশ্চয়তা ও উৎকণ্ঠার ধকল গেছে যে শরীরের চেয়েও মনটাই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেশি। এখন আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার চোখ নেই।

তবু ভদ্রতা করে বললাম, বাঃ, ভারী সুন্দর তোমাদের শহর।

লোকটি আমার কথা ঠিক বুঝতে না পেরে নিজেই বলল, বিউটিফুল, বিউটিফুল, এরকম আগে দেখেছ?

এরকম সময়, আমাদের দার্জিলিং-কালিম্পং-শিলং আছে এমন বলাটা অসভ্যতা।

সুতরাং বললাম, না, আগে দেখিনি। সত্যি খুব সুন্দর!

এরপর গাড়ি নামতে লাগল নীচের দিকে।

মিনিট পনেরো পর দেখা গেল লোকালয়। শুধু আলয় বলাই উচিত, শহরের রাস্তাতেও একটিও লোক নেই। এত রাতে কেউ বাইরে থাকে না। মনে আছে, চিনের সাংহাই শহরে রাত একটা-দুটোর সময় রাস্তায় দেখেছি প্রচুর মানুষজন। অবশ্য, সাংহাইতে তো উগ্রপন্থী দল থাকা সম্ভব নয়।

হোটেলের কাউন্টারে উৎসব কমিটির একজন এখনও বসে আছেন। তিনি আমাকে স্বাগত জানিয়ে হাতে তুলে দিলেন একটি ফাইল। রেজিস্টারে নাম সই করার পর পাওয়া গেল ঘরের চাবি।

আমার ঘর আটতলায়। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার পরি খুলে ফেললাম একটা ব্র্যান্ডির বোতল। এটা আমার অস্ত্রের মতন, সব সময় সঙ্গে থাকে। ক্লান্তিতে শরীর আর বইছিল না।

দু-চুমুক দেওয়ার পর খানিকটা চাঙ্গা হয়ে খুলে ফেললাম ফাইল।

অন্যান্য কাগজপত্রের মধ্যে একটি চিঠিতে অনেক ভালো ভালো কথার পর লেখা আছে দশ দিনের অনুষ্ঠান সূচি। তারপর শেষের দিকে কয়েকটি সতর্কবাণী।

তাতে বোঝা গেল, আমার আশঙ্কা কিংবা ভয়-ভয় ভাব একেবারেই অমূলক নয়।

সতর্কবাণীগুলি এরকম ঃ

** সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের জিগ্যেস না করে কিংবা অনুমতি ছাড়া কোনও অচেনা ব্যক্তির আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন না।*

** শহরের মধ্যে কোথাও একা-একা যাবেন না।*

** যে-কোনওদিন অনুষ্ঠানের পর কোনও অচেনা ব্যক্তি আপনাকে তার গাড়িতে পৌঁছে দিতে চাইলে রাজি হবেন না।*

** প্রকাশ্য স্থানেও কোনও অচেনা ব্যক্তি আপনাকে খাদ্য বা পানীয় দিয়ে আপ্যায়ন করতে চাইলেও তা নেবেন না।*

** রাস্তায় সাবধানে হাঁটবেন, আপনাকে যেন বিদেশি বলে চেনা না যায়।*

** কোনও দামি জিনিস, গয়নাগাটি, টাকাপয়সা নিজের কাছে না রেখে হোটেলের সিকিউরিটি বাক্সে জমা রাখবেন ইত্যাদি।*

॥ ৭ ॥

ম্যাডেলিনের কবিতা উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতন এমন বিশাল ও জমকালো অনুষ্ঠান আমি জীবনে আর কোথাও দেখিনি, ভবিষ্যতেও দেখব বলে মনেও হয় না।

এর সঙ্গে কিছুটা তুলনীয় এক কবি সম্মেলন দেখেছিলাম যুগোশ্লাভিয়ার ওখরিদ নামে ছোট্ট একটি শহরে।

তারপর যুগোশ্লাভিয়া টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, এখন সেই অঞ্চলটি মাকেদোনিয়া বা ম্যাসিডোনিয়া।

সেখানে কবি সম্মেলনটি হয়েছিল একটি নদীর বুকের ওপর, আক্ষরিক অর্থেই। একটি তন্বী, ছিমছাম, তরঙ্গবতী নদী, চওড়ায় বড়জোর চৌরঙ্গির মতন একটা রাস্তার সঙ্গে তুলনীয়, সেই নদীর ওপরে একটি সেতুকেই মঞ্চ বানানো হয়েছে। আর নদীর দুপাশে ঘাসের ওপর বসে আছে শ্রোতারা। আমরা কবিতা পাঠ করেছি সামনের দিকে তাকিয়ে, যেন নদীকেই উদ্দেশ্য করে।

সেবারে ওই কবি সম্মেলনের কয়েকটি দিনে অ্যালেন গিলসবার্গ আর প্রখ্যাত রুশ কবি ভজনেসেনস্কির সঙ্গে তুমুল আড্ডা হয়েছিল।

ম্যাডেলিনের অনুষ্ঠানটি আরও বেশি বর্ণাঢ্য ও অভিনব।

বাসে করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পাহাড়ের গায়ে একটি জায়গায়।

ম্যাডেলিন শহরটি একটি জামবাটির মতন। উপত্যকার সব দিকেই গোল করে ঘেরা পাহাড়। শহর বিস্তৃত হতে-হতে পাহাড়ের গায়ে-গায়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে।

সেরকমই, উঁচুতে একটি স্থানে পাহাড় কেটে-কেটে বানানো হয়েছে গ্যালারি। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি ধাপ। অনেক নীচে তৈরি হয়েছে বড় মঞ্চ। গ্যালারিটি স্টেডিয়ামের মতন বেঁকে গেছে ডান দিকে ও বাঁ-দিকে। সেখানে বসে আছে পাঁচ-সাত হাজার নারী পুরুষ, কত রঙের পোশাক, অনেকের পোশাক প্রায় নেইও বলা যায়, পুরুষ ও নারীর সংখ্যা সমান সমান তো হবেই, হয়তো নারীর সংখ্যাই কিছু বেশি। তাদের দিকেই তো আগে চোখ পড়ে। নারীরা নানা বয়েসি, কিশোরী থেকে বৃদ্ধা।

মঞ্চে বিদ্যুৎ বাতি ও মাইক্রোফোন আছে, শ্রোতাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে রয়েছে লাউড স্পিকার। কিন্তু বিদ্যুতের আলো নেই, দাউ-দাউ করে জ্বলছে অনেকগুলি মশাল। একেবারে ওপরে ফুচকা, আলুকাবলি, চপ-কাটলেটের দোকান। (ওগুলো নয় অবশ্য, তার বদলে সসেজ, বেগেল, হ্যামবার্গার ও মাটন রোলের মতন কিছু একটা।)

এই অনুষ্ঠানে কোনও মন্ত্রী কিংবা রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপাল নেই, কোনও সভাপতি নেই, কোনও ভাষণও নেই। শুধু শুরুতে একজন একটা ইস্তাহার বা ঘোষণাপত্র পড়ে গেল মিনিট দশেক ধরে, সেটা স্প্যানিশ ভাষায় হলেও আর একজন সঙ্গে-সঙ্গে ইংরিজি অনুবাদ করে দিচ্ছিল বলে বোঝা

গেল, তাতে শুধু বিশ্বের সব কবিদের জয়গান। মূল বক্তব্য, যেন কবিরাই অবসান ঘটাতে পারো সব যুদ্ধের, ঘুচিয়ে দিতে পারে মানুষের হিংসা প্রবৃত্তি।

খুবই লম্বা দাবি। তবে শুনতে ভালোই লাগে।

এরপর কবিতা পাঠ। মোট দশজন কবি প্রথম দিনের জন্য নির্বাচিত, তাঁদের মধ্যে আমি নেই। আমি সেরকম আশাও করিনি। শোনা গেল, আশিটি দেশের কবিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে (শেষপর্যন্ত এসে পৌঁছেছেন বাহাত্তর জন), এ ছাড়া রয়েছেন বেশ কয়েকজন স্থানীয় কবি, এঁদের মধ্য থেকে দশজন বেছে নেওয়া খুবই শক্ত। তাই প্রতি বছর ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে এক-এক দেশের কবিদের এই সুযোগ দেওয়া হয়। গত বছরই এক ভারতীয় হিন্দি কবি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কবিতা পড়ে গেছেন। তবে, সব আমন্ত্রিত কবিদেরই বসানো হয়েছে মঞ্চে।

কবিরা পড়েছেন নিজেদের মাতৃভাষায়, সঙ্গে আর একজন পড়ে দিচ্ছেন স্প্যানিশ অনুবাদ। সুতরাং দশজনের মধ্যে ন'জন কবিরই শুধু কণ্ঠস্বর উপভোগ করা গেল, বোঝা গেল না একটি পংক্তিও। একমাত্র অস্ট্রেলিয়ান মহিলা পড়লেন ইংরিজিতে। তাঁর প্রথম কবিতার শিরোনাম, আমার বাবা-মা কীভাবে বিছানায় প্রেম করতেন।

শ্রোতারা উৎসাহে যেন টগবগ করছে। তারা তো স্প্যানিশ অনুবাদে বুঝতে পারছে সব কটিই। এক একটি পাঠের শেষে কী বিপুল হাততালি। শুনলেই মনে পড়ে, ইদানীং আমলের দেশের দর্শক বা শ্রোতাদের অধিকাংশেরই যেন হাতে বাত হয়েছে কিংবা প্রাণ খুলে হাততালি দিতে ভুলে গেছে।

এখানে কয়েক হাজার সমবেত হাততালির শব্দে কর্ণপটহ বিদীর্ণ হওয়ার জোগাড়। কোনও-কোনও কবিতা বেশ ভালো লাগলে শ্রোতারা ই-ই-ই করে একরকম শব্দ করছে, মনে হয় যেন এই প্রথাটা ইওরোপীয় নয়, স্থানীয় আদিবাসীদের কাছ থেকে শেখা।

আমাদের দেশের হাততালির রক্তাল্পতা কিংবা মিনমিনে সাধু-সাধু রবের থেকে এখানকার শ্রোতাদের এই উদ্দামতা দেখতে অনেক ভালো লাগে।

আমি যতদূর সম্ভব মহিলা শ্রোতাদের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে কিছুক্ষণ খুঁজলাম ইলিয়ানাকে। যদি সে এর মধ্যে কোথাও বসে থাকে। এ এক অসম্ভব যুক্তিহীন কৌতূহল। ইলিয়ানা তো ম্যাডেলিন শহরেই আসেনি, সে এই কবি সম্মেলনে উপস্থিত হবে কী করে? কাকতালীয়র ওপর আমার এত বিশ্বাস বা ভক্তি হল কবে থেকে।

ইলিয়ানার বয়েসি অনেক মহিলাই এখানে রয়েছে। তাদের কাব্যপ্রীতি ফুটে উঠেছে চোখে মুখে।

মঞ্চে আমার পাশে যে কবিটি বসে আছে, সে এক সময় আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ।

আমার দেশের নাম শুনে সে বলল, আমিও ইন্ডিয়ান। তবে মেক্সিকোর, আমি মায়া।

রহস্যময় ও অল্প-জ্ঞাত মায়া সভ্যতার এক প্রতিনিধি আমার পাশে বসে আছে, শুনলেই রোমাঞ্চ জাগে।

সে আবার জিগ্যেস করল, 'তুমি কি হিন্দু ভাষায় লেখো?

বললাম, হিন্দু ভাষা বলে কোনও ভাষা নেই। ভারতের অনেক ভাষা, তরে মধ্যে একটি হিন্দি, আর একটি বাংলা, আমি সেই ভাষায় লিখি। তুমি বাংলা ভাষার নাম শুনেছ?

সে দু-দিকে মাথা নেড়ে, ঠোঁট উলটে জানাল, শোনেনি।

হায়, 'মোদের গরব মোদের আশা'! বিশ্বের পঞ্চম ভাষা, তবু বিশ্বের শতকরা পাঁচজন লোকও বাংলা ভাষার অস্তিত্বের কথাই জানে না।

আমার অন্য পাশের কবিটি এসেছে তাহিতি থেকে। সেই তাহিতি, যেখানকার মেয়েদের

ছবি এঁকেছেন পল গগ্যাঁ। তাঁর মৃত্যুও সেই দ্বীপে।

বিন্তু তাহিতির কবিটির সঙ্গে যে আলাপ করব, তার উপায় নেই। সে করুণভাবে মাথা নেড়ে-নেড়ে বলতে লাগল, নো ইংলিশ, নো ইংলিশ।

এই ভাষার বাধা পরবর্তী দিনগুলিতে আমায় জ্বালিয়ে মেরেছে।

তারিখ পয়লা জুন, কলকাতায় অসহনীয় রকমের গরম, ম্যাডেলিনে নরম-নরম শীত, পনেরো-ষোলো ডিগ্রি, সন্ধের পর এরকম খোলা জায়গায় কোট গায়ে দিলেও আরাম লাগে। এখানকার অনেকের গায়েই অবশ্য সাধারণ রঙিন জামা, মেয়েদের অর্ধেক বুক খোলা। অনেক জায়গাতেই দেখেছি, মেয়েদের শীতবোধ কম।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি, কবিতা পাঠ সমেত ঠিক দু-ঘণ্টা। তারপর দলে-দলে বাসে চেপে হোটেলে প্রত্যাবর্তন।

হোটেলটির নাম নুটিবারা। খুব উচ্চাঙ্গের কিছু নয়, সম্ভবত তিন তারা, কিছুটা মলিন হলেও মোটামুটি পরিচ্ছন্ন। আটতলার ওপর আমার ঘরটি বেশ বড়, টিভি, টেলিফোন ও ফ্রিজ আছে, দুটি আলাদা বিছানা, তাতে দিনে ও রাতে বদলাবদলি করে শোওয়া যায়।

এই ঘরটি আমার এগারো দিনের আস্তানা। একটানা এগারো দিন একই হোটেলে থাকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে কখনও হয়নি।

ঘরটির প্রধান বৈশিষ্ট্য, এর একদিকে পুরোটা কাচ, পরদা সরিয়ে দিলে দেখা যায় পাহাড়, খুব বেশি দূরেও নয়, রাত্তিরবেলা সেই পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলিতে আলো জ্বলে, মনে হয় যেন স্থায়ী দেওয়ালি। আর সন্ধের পর থেকে যত রাত বাড়ে, ততই এই আলোর প্যাটার্ন বদলায়। কিছু আলো নিভে যায়, কিছু নতুন করে জ্বলে ওঠে, বেশিরভাগ আলোই সারারাত জ্বলে।

খুব কাছাকাছি বাড়িগুলির জানলায় হঠাৎ-হঠাৎ দেখা যায় চলন্ত মনুষ্য মূর্তির ছায়া। নারী না পুরুষ? এ কৌতূহল চিরন্তন।

ঘরটির আর একটি চমৎকার ব্যাপার আছে। প্রথমবার দেখে চমকে উঠেছিলাম। দরজার পেছনটা জুড়ে একটা মস্ত বড় আয়না। দরজা বন্ধ করে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে অমনি দেখা যায় উলটোদিকের জানলার ওপাশে সেই আলোকোজ্জ্বল পাহাড়ের পটভূমিকা। অর্থাৎ ঘরটার দুদিকেই যেন পাহাড়, দুদিকেই আলোর খেলা।

সন্ধের পর একলা এ ঘরে থাকতে খারাপ লাগার কথা নয়। কারণ ঘরের বাইরে অনেকখানি দৃশ্যমান প্রকৃতি।

আহারাদির ব্যবস্থা হোটেলের দোতলায় প্রশস্ত ভোজন কক্ষে। প্রাতরাশ, মধ্যাহ্ন ভোজ ও রাত্রির খাবার, কোনও কুপন-টুপনের দরকার নেই। ঘরের চাবিটা দেখালেই হয়। সব খাদ্যদ্রব্য পর পর সাজানো থাকে, প্লেটে ইচ্ছেমতন তুলে নেওয়া যায়। বুফে সিস্টেম যাকে বলে। এই বুফে কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ হয় না। সুতরাং এই ফরাসি শব্দটিকে বাংলা ভাষায় ঢুকিয়ে নেওয়াই উচিত। গোটা তিরিশেক টেবিল আছে, তার যে-কোনও একটিতে অন্য কবিদের সঙ্গে বসে পড়লেই হয়। তাতে অন্যান্য দেশের কবিদের সঙ্গে আলাপচারি করা যায়। এটাই তো খুব ভালো ব্যবস্থা। এই সব আন্তর্জাতিক কবি-লেখকদের সমাবেশে প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের চেয়েও আড্ডায়, পারস্পরিক মত বিনিময়ে অনেক সুফল পাওয়া যায়।

এখানে সেই সুফল থেকে আমি বঞ্চিত হলাম।

কোনও একটা টেবিলে হয়তো চার-পাঁচজন কবি খাবারের প্লেট সামনে নিয়ে প্রবল আড্ডা ও হাসাহাসিতে মেতে আছে, আমি একটা চেয়ার টেনে বসামাত্র তারা থেমে যায়। আড়ষ্টভাবে তাকায় আমার দিকে। যেন আমি এক অবাঞ্ছিত আগন্তুক।

আমাকে অপদস্থ করার বিশেষ কোনও কারণ নেই, আমার চেহারা তেমন একটা বীভৎস

কিছু নয়, আমার গায়ের রংটাও কারণ নয়, কেন না, এখানকার আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে কালো রঙের নারী-পুরুষদেরই প্রাধান্য।

তা হলে?

ভাষার ব্যবধান! প্রায় সকলেই স্প্যানিশভাষী, সেই কারণেই তাদের অস্বস্তি।

কেউ-কেউ অল্প ইংরিজি জানে, তা নিয়ে নিছক মামুলি কথাবার্তা চালানো যায়, কিন্তু যাঁরা কবি এবং ভাষাশিল্পী, তাঁরা যদি নিজেদের মনের ভাব ঠিক মতন প্রকাশ করতে না পারেন, তা হলে একটু পরে নিজের ওপরেই বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

তার থেকে কথা না বলাই ভালো।

সিগমুন্ড ফ্রয়েড মোটামুটি ভালোই ফরাসি ভাষা শিখে প্রথমবার এলেন প্যারিস শহরে। কিন্তু সে শহরের রাস্তার লোকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখলেন, পারস্পরিক উচ্চারণ বুঝতে খুবই অসুবিধে হচ্ছে, ফ্রয়েডকে এক কথা বলতে হচ্ছে বারবার। অন্যের কথাও ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না। তিনি নিজের ওপর রেগে গিয়ে বললেন, কী! আমি অশিক্ষিতের মতন অন্যের ভাষা শুনে বারবার অ্যাঁ অ্যাঁ বলব? শিশুরোগ বিষয়ে একটা সেমিনারে তাঁর যোগ দেওয়ার কথা ছিল। যোগ দিলেন না। ফিরে গেলেন নিজের দেশে!

ইংরিজি সাহিত্যে আইরিশ লেখকরা এক সময় আধিপত্য করেছেন। আমাদের অল্প বয়েসে বার্নাড শ' ছিলেন ইংরেজি ভাষার প্রধান নাট্যকার এবং এক প্রবল ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর মাতৃভাষা ইংরিজি ছিল না। আয়ার্ল্যান্ড থেকে তিনি চোস্ত ইংরিজি শিখে এসে প্রথমবার লন্ডন শহরে পা দিয়ে ঘোড়াগাড়িওয়ালাদের কক্‌নি একটা অক্ষরও বুঝতে না পেরে বুঝেছিলেন, তাঁর ইংরিজি ভাষা শিক্ষা সব অসম্পূর্ণ।

আমি যাঁদের টেবিলে বসছি, তাঁরা নিজের-নিজের দেশে বিশিষ্ট কবি, তাঁদের ভাষায় উচ্চ শিক্ষিত, আমি ভারতীয় জেনে তাঁরা আগ্রহান্বিত, কিন্তু নিজেদের ঠিক মতন প্রকাশ করতে পারছেন না বলে তাঁদের মুখে ফুটে উঠছে অপ্রস্তুত-রেখা। তাঁদের আড্ডা নষ্ট করে দিচ্ছি বলে আমারও নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

এখানে এসেই বোঝা গেল, ইংরিজি ভাষার আধিপত্য অনেক দেশেই অকিঞ্চিৎকর। গোটা দক্ষিণ আমেরিকায়, একমাত্র ব্রাজিলে চলে পোর্তুগিজ, বাকি প্রায় সবগুলি দেশে স্প্যানিশ। আরব দেশ ও পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের কবিরা ফরাসি ভাষায় স্বচ্ছন্দ, ইংরেজি শেখার দরকারই মনে করেন না।

এই ডাইনিং হলে আমি দুদিন পর থেকেই রাত্রে আসা বন্ধ করেছিলাম। তা শুধু ভাষাগত এই সমস্যার জন্য মোটেই না। সকালে ও দুপুরে আসতে হয় নেহাত ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য। বাইরে খেতে গেলে অনেক পয়সার খরচ হয়, তা ছাড়া রাত্রে অতি স্বল্পাহার কিংবা খাদ্যবস্তু একেবারেই বাদ দেওয়া আমি অনেকদিন অভ্যাস করে ফেলেছি। সন্ধের পর শক্ত খাদ্য কিছুই না খেলেও আমি দিব্যি থাকি।

কলম্বিয়া রাজ্যটির খাদ্যবৈশিষ্ট্য কিংবা রন্ধনস্বাদ সম্পর্কে শুধু একটি হোটেলের খাদ্য তালিকার ওপর নির্ভর করে মন্তব্য করা হয়তো উচিত নয়। বাইরের কোনও হোটেল ও রেস্তোরাঁয় গিয়ে আমার খাদ্যের স্বাদ নেওয়া হয়ে ওঠেনি, কারণ ওই যে, একা একা রাস্তায় বেরিয়ে কোথাও খাওয়া সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা।

পৃথিবীর যত হোটেলেই গেছি, ডাইনিং হলের টেবিলের ওপর লরেল ও হার্ডির মতন পাশাপাশি নুন ও গোলমরিচের দুটি শিশি দেখা যায়। এই হোটেলে শিশি মাত্র একটি, শুধু নুনের। গোলমরিচ বলে কোনও বস্তু নেই। বোধহয় সেটা এখানে খুব দামি। সব রান্নাতেই মশলার কোনও চিহ্ন নেই।

সম্ভবত কোনও মশলাই এ দেশে তৈরি হয় না এবং খুব দুর্লভ। কাঁচালঙ্কাও দেখিনি একদিনও। মশলাহীন, ঝালহীন সব রান্না। তা বলে খুব যে স্বাস্থ্যকর খাদ্য, তাও বলা যায় না। মুরগিগুলো অতিশয় বুড়ো, তারা ঠাকুরদা মুরগি, সেইসব মুরগির মাংস ও রুটি দাঁতের বদলে পা দিয়ে ছিঁড়লে সুবিধে হয়। মাঝে মাঝে যে সুপ দেয়, তা অতি বিস্বাদ, ব্ল্যান্ড যাকে বলে, কোনওরকম সস নেই। একদিন মাশরুম সুপ এই নাম দেখে খুব উৎসাহ করে এক বাটি নিয়ে দেখি, তার মধ্যে মাইক্রোস্কোপ দিয়ে খুঁজলেও মাশরুম দেখা যাবে না। পুরোটাই বার্লি। মাঝে-মাঝে যে মাছভাজা পাওয়া যায়, তা অতিরিক্ত নোনতা।

পাউরুটির সঙ্গে মাখনও দেওয়া হয় না। চিনেও অনেক হোটেলে টোস্টের সঙ্গে মাখন পাইনি, সেটা অবশ্য অপ্রাপ্যতার জন্য নয়। চিনে দুগ্ধজাত সামগ্রীর এখন বিশেষ চল নেই, দই জিনিসটা ওদেশে অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ চিন ভ্রমণে গিয়ে ঘরে পাতা দই খেয়েছিলেন বলে, এক চিনা পণ্ডিত নাকি তা দেখে দৌড়ে বাইরে গিয়ে বমি করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কবি পচা দুধ কী করে খাচ্ছেন!

খাবারের স্বাদ যদি একেবারেই জিভ বিরোধী হয়, আর চেহারা দেখে মুখে নিলেও নিরাশা কিংবা বিবমিষার কারণ হয়, তা হলে তো সব না খাওয়াই ভালো। হোটেলের ঠিক সামনেই, একটা দোকানে আলুভাজা, বাদাম ভাজা ও নানারকম বিস্কিটের প্যাকেট পাওয়া যায়, সেগুলি অনেক রকম জমিয়ে সন্ধের পর থেকে আমি নিজের ঘরে একা।

হোটেলের ঘরের দরজা বন্ধ করলেই বাইরের পৃথিবী থেকে একেবারে বিযুক্ত।

তখন নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয়।

সে বড় জটিল মনোবিজ্ঞান। অধিকাংশ মানুষই নিজের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেইজন্য একটু ফাঁকা পেলেই ডিটেকটিভ বই পড়ে, কিংবা টিভি দেখে, বউয়ের সঙ্গে প্রেম ঝালিয়ে নিতে গিয়ে আবার ঝগড়া শুরু করে দেয়—

বাধ্য হয়ে একা থাকা আর স্বেচ্ছা-একাকিত্ব এক নয়।

জেলখানায় অনেক বন্দি থাকে নিঃশব্দ কুঠুরিতে, তাদের হাজর জনের মধ্যে এক জনেরও আত্ম-উপলব্ধি হয় না।

আমি ইচ্ছে করলেই হোটেল লবিতে নেমে যেতে পারি। দু-চারজন ইংরিজি-জানা তো আছেই। এমনকী বাংলাতেও কথা বলা যায়।

বাংলাদেশ থেকে এসেছে হায়াৎ সইফ, এটা তার আসল নাম নয়, এই নামে সে কবিতা লেখে, আসল নামে সে মস্ত বড় সরকারি অফিসার। হায়াৎকে অনেকদিন থেকেই চিনি। জিয়াউল করিম নামে একটি অল্পবয়েসি, সুশ্রী সাংবাদিকও এসেছে তার সঙ্গে। অর্থাৎ তিনজন বাংলাভাষী। ব্রেকফাস্টের সময় আমরা এক টেবিলেই বসি, তাতে কেউ একজন ঈষৎ বিদ্রুপের সুরে বলেছিল, তোমরা বাঙালিরা বুঝি সবসময় একসঙ্গে থাকো?

আমি বাকসংযম করে একলা ঘরের মধ্যে নিজেকে খোঁজার চেষ্টা করি।

সে কাজটাও কিন্তু মোটেই সহজ নয়।

মনটা যেন একটা পানা পুকুরের মতন। পানা সরিয়ে-সরিয়ে যেমন পরিষ্কার জল বার করতে হয়, সেই রকমই অনেক অবান্তর চিন্তা ঢেকে রেখে দেয় স্বচ্ছতা। আয়নার দিকে তাকিয়ে আছি, নিজের মুখের বদলে দেখতে পাচ্ছি একটা টেলিফোন। সেটাকে মুছে দিতেই সেখানে এসে জুড়ে বসল এক ঝুড়ি আভোমাড়ো। এই ফলটা এখানে খুব পাওয়া যায়।

আবার পানা সরিয়ে সরিয়ে নিজের প্রতিবিম্বটা খোঁজা। তাকে প্রশ্ন করতে হবে, জীবনে কী কী ভুল করেছ?

দ্বিতীয় দিন গভীর রাতে কিছু একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল।

দরজায় কেউ দুমদুম করে ধাক্কা দিচ্ছে।

টেবল ল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখলাম। পৌনে তিনটে। এত রাতে কে আমাকে এই নতুন দেশে ডাকাডাকি করবে? টরেন্টোর একটা হোটেলে একবার এরকম মাঝরাতে দরজায় ধাক্কা দিয়ে কেউ জানিয়েছিল, আগুন লেগে গেছে, শিগগিরি নীচে চলে যাও!

সেটা ঠাট্টা ছিল না, সত্যিই আগুন লেগেছিল হোটেলের একতলায়। এরকম সময় কোনও জিনিসপত্রের জন্য এক মুহূর্তও দেরি করতে নেই, হাতে কোনও কিছু না নিয়ে লিফটের বদলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে হয়। সেবার আমাদের সঙ্গে সেই হোটেলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিল। মনে আছে, সৌমিত্র, স্বাতী ও আমি চোদ্দোতলা সিঁড়ি ভেঙে, একবস্ত্রে রাস্তায় এসে শীতের মধ্যে কেঁপেছিলাম। সে আগুন অবশ্য মারাত্মক হয়নি। নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল অচিরেই।

এখানেও সেরকম কিছু ব্যাপার নাকি?

দরজার কাছে এসে জিগ্যেস করলাম, কে?

একটি নারীকণ্ঠ স্প্যানিশ ভাষায় কিছু বলল। বুঝতে না পেরে আমি জানালাম, ইংরেজিতে বলো, কী ব্যাপার।

নারীকণ্ঠ এবার ইংরিজিতেই বলল, ওপন দ্য ডোর!

কেন? কী হয়েছে?

আবার সেই একই কথা, ওপন দ্য ডোর।

এই কণ্ঠস্বরে কোনও মিনতি নেই, লাস্য নেই, প্রলোভন নেই। যেন অতি ব্যস্ততা।

কারণ না জানলে এত রাতে দরজা খুলব কেন?

এবার সে বলল, দরজাটা আগে খোলো। তুমি আমাকে চেনো।

এ পর্যন্ত কয়েকটি মেয়ের সঙ্গে আমার টুকরো-টুকরো কথাবার্তা হয়েছে বটে, কিন্তু এমন পরিচয় কারুর সঙ্গেই হয়নি, যে এই ঘোর নিশীথে আমার ঘরে আসতে চাইবে।

হোটেলের ঘরে অচেনা মেয়েদের আনাগোনা পৃথিবীর অনেক দেশেই আছে।

আমার এরকম প্রথম অভিজ্ঞতা হয়েছিল ব্যাংককে। ভিয়েতনাম যুদ্ধের আমল থেকে ব্যাংককে তৈরি হয়েছিল একটা বিরাট নারী মাংসের বাজার।

আমি সেবারে সুইডেন, ডেনমার্ক, জার্মানি ঘুরতে ঘুরতে বিমান কোম্পানির সৌজন্যে দুদিন ব্যাংককে বিনা খরচে থাকার কুপন পেয়েছিলাম। এখন ব্যাংককে বিশাল ও অত্যাধুনিক বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে, তখন বিমানবন্দরটি ছিল ম্যাড়মেড়ে আর ছোট আকারের। আমাদের দেশে যেমন অনেক তীর্থস্থানেই রেল স্টেশনে পাণ্ডারা ছেঁকে ধরত এক সময়ে, ব্যাংককেও বিমানবন্দরের বাইরে একদল লোক চিলুবিলু করছিল, তারা গাইড হতে চায়। কেউ-কেউ হাত চেপে ধরেছিল আমার। খুবই ক্লান্ত ছিলাম, ঠেলাঠেলি করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত একজন মোটাসোটা লোককে বলেছিলাম, ঠিক আছে, চলো আমার সঙ্গে।

ওরে বাবা, সে কী গাইড! তার নিজস্ব গাড়ি আছে, সে গাড়িতে তুলে সে আমায় তার একটি সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাল।

সে একজন পুলিশ। ছুটির দিনে অতিরিক্ত রোজগারের জন্য সে গাইডের কাজ করে। সারাদিন সে আমার কাজে নিযুক্ত থাকবে, আমাকে ট্যাক্সি ভাড়ার অতিরিক্ত খরচ করতে হবে না।

সে আমাকে নিয়ে তুলল একটি মাঝারি হোটেলে। সে হোটেলের ম্যানেজার থেকে পরিচারিকা পর্যন্ত সবাই মেয়ে, একজনও পুরুষ নেই। কিন্তু তাদের ব্যবহার খুবই ভদ্র ও নম্র। খাবার-দাবারও বেশ সুস্বাদু ও স্বাভাবিক দামের। সুতরাং নালিশ করার কিছু নেই। বরং নারীদের এই স্বাধীন উদ্যোগ ও কর্মক্ষমতা দেখলে ভালোই লাগে।

কিন্তু আমাকে জ্বালিয়ে খেয়েছে পুলিশ-গাইডটি। সারারাত বিমানে কাটিয়ে পৌঁছেছি সকালে।

এখন কিছুক্ষণ চা-টা খেয়ে বিছানায় গড়াগড়ি না দিলে গায়ের ব্যথা মরবে না। কিন্তু ঘরে পৌঁছবার পাঁচ মিনিট পরেই শ্রীমান এসে উপস্থিত। দন্ত্যবর্ণ বহুল ইংরিজিতে সে বলল, চলো, বেড়াতে যাবে না? আমি বললাম, এখন কী! আগে স্নান করব, বিশ্রাম নেব, ঘুম-ঘুম পাচ্ছে, তুমি দুপুরে এসো।

তা সে শুনবেই না। সে সারাদিন আমার কাজ করার জন্য তৈরি। সারাদিনের জন্য এক রেট, তা হলে শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছি কেন? তাতে আমার কিছু আসে যায় না, তবু সে নাছোড়বান্দা, এমনই কর্তব্যপরায়ণ। তার পীড়াপীড়িতে আমাকে বেরুতেই হল।

লোকটি পুলিশ কর্মী বলে আমি ধরে নিয়েছিলাম, সে চোর জোচ্চোর হবে না এবং অন্য চোর-জোচ্চোরদের কাছ থেকে আমাকে আড়াল করে রাখবে।

সে আমাকে তিরিশ হাজর জীবন্ত কুমির, বুদ্ধ মন্দির-টন্দির দেখাবার পর নিয়ে এল একটা বাড়ির সামনে। আমি সোনার গয়না ও জামা-কাপড় কিনব কিনা জানতে চাইলে তাকে জানালাম, আমার ওসব কিছু দরকার নেই। এবার হোটেলে ফিরে চলো, একদিনের পক্ষে যথেষ্ট দেখা হয়েছে, এখন আমার শরীর বিশ্রাম চাইছে।

এইসব দোকান থেকে কেনাকাটি করলে গাইডরা কমিশন পায়, জানি, তাই সে একটু নিরাশ হয়ে বলল, আর একটা জায়গায় শুধু চলো—

সে বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলাম দোতলায়। একটা লম্বা টানা বারান্দা, রেস্তোরাঁর মতন পরপর অনেকগুলি টেবিল ও চেয়ার, কিন্তু আলো প্রায় নেই, অন্ধকারই বলা যায়।

আমরা টেবিলে বসা মাত্রই একজন লোক দু-প্লেট সসেজ ও দু-বোতল বিয়ার দিয়ে গেল। এ কী ব্যাপার! কিছু না চাইতেই এসব দেবে কেন? গাইডটি মুচকি হেসে বলল, ফ্রি-ফ্রি।

কিন্তু বিনা পয়সার খাদ্য-পানীয়তে আমার বিন্দুমাত্র রুচি নেই। তা নিয়ে আপত্তি জানাতে জানাতেই হঠাৎ একসঙ্গে জ্বলে উঠল অনেক আলো। দেখা গেল একটা অদ্ভুত দৃশ্য। বারান্দার পাশে একটা হলঘর, সেখানে একটা গ্যালারি, তাতে থাকে-থাকে দাঁড়িয়ে আছে তিরিশ-বত্রিশটা মেয়ে। তাদের পোশাক বলতে কিছুই নেই, প্রত্যেকের গলায় সুতোয় বেঁধে ঝোলানো কার্ডে এক-একটি নম্বর। অন্য টেবিল থেকে একজন চেঁচিয়ে একটা নম্বর বলতেই সেই নম্বরের মেয়েটি গ্যালারি থেকে নেমে এসে দেখাতে লাগল তার অঙ্গ সৌষ্ঠব।

হঠাৎ আমার অস্বাভাবিক রাগ হয়ে গেল। ব্যাবসার জন্য এরা মেয়েদের এত নীচে নামিয়ে এনেছে। এ যেন গরু-ছাগলের হাট। শরীর-স্বাস্থ্য দেখিয়ে এক-একটি মেয়েকে বিক্রি করা হবে এক-দুঘণ্টার জন্য। পুরুষরা চালাচ্ছে এই ব্যাবসা, পুরুষরাই খদ্দের। আমি নিজে একজন পুরুষ বলে লজ্জায় ঘেন্নায় প্রায় চোখে জল এসে যাচ্ছিল।

আমি গাইডকে জিগ্যেস করলাম, তুমি কেন আমায় এখানে এনেছ?

সে আবার হেসে বলল, 'ফ্রি, ফ্রি।'

অর্থাৎ সে বলতে চাইল, আমি কোনও মেয়েকে সাময়িকভাবে কিনতে না চাইলেও শুধু দেখতে কোনও খরচ নেই। অথবা সে নিজেও দেখতে চায়।

ধুত্তোর বলে আমি দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, সামনেই একটা ট্যাক্সি পেয়ে চলে এলাম হোটেলে।

লোকটি খানিক বাদে হোটেলে এসে উপস্থিত হল, সে আমার রাগের কারণই বুঝতে পারল না। অধিকাংশ ভারতীয়ই নাকি এই সব জায়গায় যেতে চায়। অনেকে ওরকম চার-পাঁচ জায়গায় ঘোরে। সন্ধের পর সে আমাকে আরও আকর্ষণীয় জায়গায় নিয়ে যাবে।

আমি বললাম, তোমাকে আর আমার দরকার নেই, তুমি বিদায় হও।'

সে পাঁচশো ডলার হেঁকে বলল।

একবেলা মাত্র কয়েকটি জায়গায় নিয়ে গেছে, তার জন্য পাঁচশো ডলার? এ কি মামদোবাজি! তার গাড়ির ভাড়া ও তার মজুরি হিসেব করে আমি পঞ্চাশ ডলার বার করে বললাম, এটা নিতে

চাও, নাও। নইলে আমি পুলিশ ডাকব।

পুলিশ ডেকে আর একজন পুলিশকে ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমি সুফল পেতাম, না আরও বেশি বিপদে পড়তাম, তা জানি না। কিন্তু তখন আমার মেজাজ এমনটা চড়ে ছিল যে ওই মুখটাই দেখতে ইচ্ছে করছিল না, ও আর বেশি কথা বললে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য হয়ে হয়তো ওকে মেরেই বসতাম।

আমার ওই উগ্রমূর্তি দেখে ও আর দরাদরি না করে বিদায় নিয়েছিল।

সেই হোটেলেও মাঝরাত্তিরে ঠুকঠুক শব্দ হয়েছিল দরজায়। খুবই মৃদু এবং কোনও কণ্ঠস্বর ছিল না। কয়েকবার শোনার পর দরজা খুলে দিয়েছিলাম। একটি রমণী খুবই লাজুকভাবে জিগ্যেস করেছিল, আপনার কি মালিশ করাবার দরকার আছে।

আমার দরকার নেই শুনেও সে আমাকে একটি কাগজ দেখিয়েছিল। তার যে-কোনও অসুখ নেই, সেই মর্মে একটি ডাক্তারি সার্টিফিকেট। আমার পুনশ্চ প্রত্যাখানের পর সে খুবই কুণ্ঠিতভাবে সরি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার বলে বিদায় নিয়েছিল, একটুও জ্বালাতন করেনি।

সাংহাই-এর হোটেলের লিফটে এক উগ্র সাজে সজ্জিতা রমণী ওই একই প্রশ্ন করেছিল, তোমার মালিশের প্রয়োজন আছে? তোমার রুম নাম্বার কত? তাকে আমি বলেছিলাম, আমি একজন গরিব লোক, মালিশ করাবার মতন বিলাসিতা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

সেন্ট পিটার্সবার্গে প্রবল শীতের মধ্যে এক হোটেলের বাইরে দশ বারোটি পাতলা পোশাক পরা রমণীর দাঁড়িয়ে থাকার করুণ দৃশ্যটি এখনও আমার চোখে ভাসে। ওখানে তখন সব জিনিসের অগ্নিমূল্য, নিজের বা পরিবারের সকলের খিদের জ্বালায় ওই মেয়েরা নিজেদের বিক্রি করতে এসেছিল, হোটেলের দারোয়ান মাঝে-মাঝে তাদের তাড়া করে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে, কোনও পুরুষ সঙ্গী না থাকলে তাদের ভেতরে ঢোকার অনুমতি নেই।

আমি মেয়েদের কাছ থেকে মাধুর্য চাই, দয়াও চাইতে পারি। মেয়েদের ওপর জোর জবরদস্তি করা কিংবা তাদের অসহায় অবস্থার সুযোগ নেওয়া নিকৃষ্টতম অন্যায়, তবু পৃথিবীতে এই অন্যায়টাই চলছে সবচেয়ে বেশি।

এখানে এই কলম্বিয়ার হোটেলে কী ঘটছে? একটি মেয়ে জোর জবরদস্তি করে ঢুকতে চাইছে আমার ঘরে? একবার দরজা খুললে সে ভেতরে এসে আমার নামে যে-কোনও মিথ্যে অভিযোগ দিতে পারে।

আমি দরজা খুলব না বলায় সে একই রকম ধাক্কা দিতে-দিতে একই কথা বলতে লাগল, খোলো, খোলো, তুমি আমায় চেনো!

আমি বললাম, এবার আমি পুলিশ ডাকব।

তবু সে নিরস্ত হচ্ছে না দেখে আমি টেলিফোনে অপারেটরকে ডেকে বললাম, দ্যাখো, একজন কেউ আমার ঘরে এসে হামলা করছে, তোমরা লোক পাঠাও। একটা কিছু ব্যবস্থা করো।

হা হতোস্মি! অপারেটর এক বর্ণ ইংরিজি জানে না। এর আগেও দেখেছি। এই হোটেলের অপারেটর ইংরিজি ওয়ান—টু-ও বোঝে না, এখানে ঘর থেকে আন্তর্জাতিক কল করার ব্যবস্থা নেই, আমি তাকে যতবার নম্বর বলেছি, সে বুঝতে পারেনি, শেষ পর্যন্ত একটা কাগজে সংখ্যাটা লিখে দিতে হয়েছিল।

সুতরাং এখন আমি যা বলতাম, তা সে কিছুই বোঝেনি, এবং সে স্প্যানিশে কী যে বলে যেতে লাগল, তাও আমার বোধগম্য হল না।

আমার ঘরের দরজায় এত জোর শব্দ হচ্ছে, অন্য কোনও ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসছে না? ছিটকিনি বন্ধ আছে, দরজা যদি ভেঙে ঢুকতে চায় তো ঢুকুক। চুপ করে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় কী?

খানিক পরে সব শব্দ থেমে গেল।

এরপর কি আর সহজে ঘুম আসে?

আমার স্বভাব এই, এমন কোনও একটা ঘটনা যদি ঘটে যায়, যার আমি ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না। ব্যাখ্যা খুঁজতে-খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে গেলে এক সময় মনে হয়, সত্যিই কি এরকম কিছু ঘটেছিল? কিংবা সবটাই অলীক?

একটা মাত্র ক্ষীণ ব্যাখ্যা মনে আসে। রমণীটি কি অন্য কোনও চেনা লোকের ঘরের বদলে ভুল করে ধাক্কা মারছিল আমার ঘরে? বারবার বলছিল, তুমি আমাকে চেনো। তুমি আমাকে চেনো!

এটাও ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না।

কয়েক রাত পরে আবার একটা কিছুটা অন্য রকমের ব্যাপার ঘটল।

॥ ৮ ॥

ম্যাডেলিনে কবিতা উৎসব চলবে একটানা দশদিন।

এত দীর্ঘদিন ধরে, এতগুলি আন্তর্জাতিক কবিদের আমন্ত্রণ করে এনে কবিতা নিয়ে উৎসব, পৃথিবীর আর কোনও দেশে হয় কি না আমার জানা নেই। তাও কলম্বিয়া নামের ছোট দেশে, ম্যাডেলিন নামে একটি অকিঞ্চিৎকর শহরে। যে শহরটিকে হিংস্রতা ও মাদক চোরাচালানের কেন্দ্র হিসেবেই লোকে চেনে।

একটি দশতলা হোটেলের প্রায় পুরোটাই কবিতা উৎসবের দখলে, তাও শুধু খাওয়া-থাকার জন, কবিতা পাঠ এখানে হয় না, তা শহর ও শহর ছাড়িয়ে নানা জায়গায়। এই বিপুল খরচের জোগান কোথা থেকে আসছে, সে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে।

সরকারি সাহায্য আছে বলে মনে হয় না।

সরকারের উপস্থিতি কোথাও নেই, সে মর্মে কোনও ফেস্টুন বা পোস্টারও চোখে পড়েনি।

অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন স্পনসরের নাম থাকে, এখানে কোনও মঞ্চেই 'কবিতা উৎসব' ছাড়া আর কিছু লেখা থাকে না। উদ্যোক্তরা প্রমেটিও নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা।

তাহলে কি মাদক চোরাচালানকারী বিপুল বিত্তের মালিকরাই পৃষ্ঠপোষক? তারা নাম জাহির করতে চায় না? এ বিষয়ে জিগ্যেস করা যায় না, কিছু জানাও যায় না। কিন্তু মনে প্রশ্ন থাকেই, যারা বে-আইনি মাদকের ব্যাবসা করে, যারা এমনই দুর্দান্ত ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির যে যখন তখন জজ-ম্যাজিস্ট্রেটদেরও খুন করতে দ্বিধা করে না, তারা কবিতার জন্য এত টাকা খরচ করতে যাবে কেন? খুনিরা ভালোবাসে কবিতা?

আমাদের দেশে মদ, সিগারেট কোম্পানি, ঠান্ডা পানীয় প্রস্তুতকারীরা বড় বড় খেলা কিংবা হুলুস্থুল নাচ-গান-বাজনার উৎসবের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও কবিতা নিয়ে তো কখনও মাথা ঘামায় না।

এই দশ দিনের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় কবিদের ভাগ ভাগ করে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে। আমার বরাদ্দ চারদিন। এক-একটি অনুষ্ঠানে পাঁচ বা ছ'জন বিভিন্ন দেশের কবি, সমসংখ্যক অনুবাদক-অনুবাদিকা, দু-ঘণ্টার বেশি সময় লাগে না। প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেই দেখেছি, হলঘর সম্পূর্ণ ভরতি, অনেককে দাঁড়িয়ে বা সিঁড়িতে বসেও শুনতে হয়, কোনওরকম গণ্ডগোলহীন মনোযোগ, বিপুল করতালি। অনুষ্ঠানের শেষে দলে দলে ছেলেমেয়ে এমনকী বয়স্ক-বয়স্করাও আসে বিদেশি কবিদের কাছ থেকে অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য। উদ্যোক্তারা প্রকাশ করেছেন চারশো সত্তর পৃষ্ঠার একটি সুমুদ্রিত গ্রন্থ, যাতে রয়েছে আমন্ত্রিত কবিদের এক গুচ্ছ করে কবিতার স্প্যানিশ অনুবাদ। আমার কবিতাগুলির

অনুবাদ করেছেন দিল্লির জহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়। এ ছাড়াও রাউল হেইসে নামে স্থানীয় এক কবি আমার আরও কয়েকটি কবিতার অনুবাদ করে রেখেছেন, তিনি কোথা থেকে সেগুলো পেয়েছেন কে জানে।

ওই অনুবাদ কাব্য-সংগ্রহটি অনেক শ্রোতারই হাতে হাতে, তারা কিনেছে, অনুষ্ঠানের শেষে এক এক কবির নামের নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় নিয়ে নিচ্ছে স্বাক্ষর।

কবিতা পাঠের সময় আমি নিজের সঙ্গে একটা মজা করেছি।

অনুবাদক পাঠ করছেন আমার কবিতার স্প্যানিশ ভাষ্য, শ্রোতারা সেগুলিই উপভোগ করছে, ভালো লাগছে কিংবা মন্দ লাগছে, কিন্তু আমার বাংলা পাঠ কেউ বুঝছে না একটি শব্দও। আমার বাংলা কবিতা আমি নিজেই পড়ছি, নিজেই শুনছি। তা যদি হয়, তা হলে প্রত্যেকবার অনুবাদের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে আমার মূল কবিতা পড়ার দরকার কী? অন্য কবিতা পড়লেও তো কেউ ধরতে পারবে না। তাহলে শুধু নিজের কবিতা কেন, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের কবিতা মুখস্থ বলে গেলেও দিব্যি চলে যাবে।

একবার অনুবাদক 'আমার নীরা বিষয়ক একটি কবিতা পাঠ করার পর আমি মূল হিসেবে পড়ে গেলাম, 'যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থরে। সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া...!' অনুষ্ঠান শেষে একজন মাত্র লোক এসে আমাকে প্রশ্ন করলেন, আপনার কবিতার স্প্যানিশ অনুবাদে প্রি-র‍্যাফেলাইট শব্দটি ছিল, বাংলায় তো সে শব্দটি শুনলাম না?

আমি প্রায় স্তম্ভিত! এমন মনোযোগী শ্রোতাও থাকে?

সবচেয়ে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল একটি মেডিক্যাল কলেজে।

ডাক্তারির ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অধ্যাপকদের কবিতা সম্পর্কে এত আগ্রহ? হল তো পরিপূর্ণ ছিলই, তা ছাড়া যাকে বলে ভাইব্রেশান, তাতে বোঝা যাচ্ছিল কবি ও শ্রোতাদের মধ্যে একটা নিবিড় যোগাযোগ ঘটে যাচ্ছে। অটোগ্রাফ সংগ্রহের জন্যও তাদের উৎসাহ প্রচুর। শুধু তাই নয়, পরদিন ওখানকার একটি ছাত্রী মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষের লেখা ধন্যবাদ পত্র, একটি কলম ও গালে একটি চুম্বন উপহার দিতে এসেছিল।

প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানেই আমি মঞ্চে বসে শ্রোতাদের মুখগুলির মধ্যে ইলিয়ানাকে খুঁজি। অকারণ, অর্থহীন, অযৌক্তিক এই খোঁজা, তবু এটা যেন আমার বাতিক হয়ে গেছে। নিজের মানিব্যাগ থেকে টাকা বার করে কিছু কিনতে গেলেই প্রত্যেকবার মনে পড়ে ইলিয়ানার কথা। কেন তাঁকে আমি ধন্যবাদ জানাইনি? তিনি কি আমাকে সেই সুযোগ আর একবার দেবেন না?

একদিন হোটেল থেকে রাস্তায় বেরিয়েই দেখি, উলটো দিকে এক মহিলা ট্যাক্সি ডেকে উঠে পড়লেন। আমার বুকটা ধক করে উঠেছিল। ইলিয়ানা না? ঠিক যেন সেইরকম চেহারা! আসলে তেমন মিল নেই, আমার কল্পনারই প্রতিফলন।

মাঝে মাঝেই ভাবি, ওই মধ্যবয়েসি মহিলাটি কি নিছক গৃহবধূ? কিংবা অধ্যাপিকা? চিত্রাভিনেত্রী? পলিটিশিয়ান? একা একা ইংল্যান্ডে গিয়েছিলেন, নেহাত সাধারণ হতে পারেন না। যৌবনকালে ওঁর জন্য কজন পুরুষ ডুয়েল লড়েছে? এখনও ওঁর যা শরীরের বাঁধুনি, তাতে যৌবন পড়ন্ত মনে হয় না।

ইংল্যান্ড, আমেরিকা তো বাদই দিলাম, চিন, জাপান, কেনিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্কেরও যে-কোনও শহরে অন্তত একগুচ্ছ বাঙালি দেখা যায়। ম্যাডেলিন শহরে একজনও বাঙালি নেই তো বটেই, ভারতীয়ও আছে কি না সন্দেহ। একজনকেও দেখিনি। বিভিন্ন দেশের রেস্তোরাঁ আছে, চিনে রেস্তোরাঁ তো থাকবেই, এখন জাপানিরাও সর্বত্র, কিন্তু ভারতীয় বা পাকিস্তানি বা বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ একটাও নেই। আশ্চর্য, সর্দারজিরাও ওখানে পৌঁছতে পারেনি।

আমাদের সঙ্গে যে কয়েকজন বিভিন্ন আরব দেশের কবি আছেন, তাঁরা নুটিবারা হোটেলের

বিস্বাদ খাদ্য খেতে-খেতে তিতিবিরক্তি হয়ে একদিন আমাকে বলেছিলেন, এখানে ভারতীয় হোটেল নেই কেন? তা হলে অন্তত রুটি-মাংস খেয়ে বাঁচতাম। ভারতীয় খাবার আমাদের খুব পছন্দ।

একটি কাব্যপাঠের আসরে শ্রোতাদের মধ্যে দুজন শাড়িপরা মহিলাকে দেখে মনে হয়েছিল, এই তো, বাঙালি না হলেও ভারতীয় নারী তো হবেই! তাদের গায়ের রংও মেম সাহেবদের মতন নয়।

অনুষ্ঠান শেষে মহিলা দুটি নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করার জন্য।

ও হরি, এরা তো ভারতীয় নয়, এখানকারই মিশ্র জাতি। স্প্যানিশ ও স্থানীয় অধিবাসীদের মিশ্রণের ফলে এখানকার অনেক নারী পুরুষদেরই গায়ের রং আমাদের মতন তামাটে।

মহিলা দুটি শাড়ি পরেছে, কারণ এরা ইস্কনের সদস্য, বৈষ্ণব। এখানেও ইস্কন পৌঁছে গেছে। রামকৃষ্ণ মিশনের চেয়েও ইস্কন অনেক সুদূরপ্রসারী। এই ইস্কনের দৌলতে মহাপ্রভু, শ্রীচৈতন্য, কৃষ্ণ, মায়া, কর্ম এইরকম কয়েকটি শব্দ এখানকার বুদ্ধিজীবীরা জানে।

ইস্কন পরিচালিত এখানে একটি নিরামিষ ভোজনালয় আছে, আমি যেহেতু এদের মহাগুরু প্রভুপাদের দেশের লোক, বাংলা শব্দ উচ্চারণ করেছি, সেই সুবাদে এরা ইস্কন ভোজনালয়ে আমাকে নেমন্তন্ন করলেন। আমি সঙ্গে-সঙ্গে রাজি, কিন্তু উদ্যোক্তাদের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তিটি আমাদের সঙ্গে ছিল, সে মৃদু ও দৃঢ় স্বরে জানাল এই মহিলাদের আমরা চিনি না। সুতরাং এদের কাছে তোমাকে আমরা ছেড়ে দিতে চাই না। এরা সন্দেহভাজন হোক বা না হোক, এরা তোমার নিরাপত্তা দিতে পারবে কি না তা বুঝবে কী করে? তোমার না যাওয়াই ভালো। সুতরাং ওদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করা গেল না। ইস্কনের নিরামিষ রান্না খুব সুস্বাদু হয়। তা থেকে বঞ্চিত হলাম।

মুখের ওপর তো প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তাই আমাকে বলতেই হল, এখন কয়েকটা দিন ব্যস্ত আছি, পরে খোঁজ করবেন!

আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে শাড়ি পরা মেয়ে একটিই আছে। সে এসেছে শ্রীলঙ্কা থেকে। শ্যামলা রঙের ছোটখাটো চেহারার তরুণীটিকে হুবহু বাঙালি বলে মনে হয়। তাকে আমি বলেছিলাম, তুমি কলকাতার রাস্তা দিয়ে হাঁটলে সবাই তোমাকে বাঙালি মেয়ে বলে ভুল করবে। মেয়েটির নাম রামিয়া জিরাসিংঘে। সে হেসে বলেছিল, আমাদের সঙ্গে বাংলার মানুষদের কিছু-কিছু মিল আছে।

কিন্তু আমি শ্রীলঙ্কায় গিয়ে দেখেছি, সেখানকার মানুষরা 'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ হেলায় লঙ্কা করিল জয়' এ তথ্য মানতে চায় না। (বিজয় সিংহ বাঙালিও নয়, খুব সম্ভবত গুজরাতি)। রামায়ণের কাহিনিও সেখানে অনেকে জানে না কিংবা জানলেও আলোচনা করতে চায় না। ওখানকার স্কুল-কলেজে পড়ানো হয় না রামায়ণ। কারণ রামায়ণ অনুযায়ী তো শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের পূর্বপুরুষ সবাই ছিল রাক্ষস!

পাকিস্তানে এখন শাড়িপরা নিষিদ্ধ। পাকিস্তান থেকেও একজন মহিলা এসেছেন, তিনি সালোয়ার-কামিজ পরা, মধ্যবয়েসি, খুবই সপ্রতিভ এবং তুখোড়। আমি তাঁকে প্রথম দিন দেখতে পাইনি, তিনিই এক সকালে ডাইনিং রুমে আমায় খুঁজে বার করলেন এবং আমাকে অবাক করে দিয়ে বললেন, তিনি আমার নাম জানেন এবং নবনীতা দেবসেনের সঙ্গে ভালো পরিচয় আছে। কিশোয়ার নাইদ নামে এই কবি পেশায় সরকারি অফিসার, এক সময় পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন, তাই কিছু-কিছু বাংলা জানেন। কিশোয়ার নাইদ সেই ধরনের মহিলা যার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই মনে হয় অনেকদিনের চেনা।

একটি অধিবেশনে কিশোয়ার আর আমি পাশাপাশি বসেছিলাম, কবিতা পাঠও পরপর, কিশোয়ার ফিসফিস করে নানারকম মজার-মজার গল্প বলছিল। কিশোয়ারের উর্দু কবিতার আংশিক রস গ্রহণে আমার অসুবিধে হল না, উর্দু গজল তো আমরা হরদমই শুনি। আমার বাংলা কবিতাও কিশোয়ার খানিকটা বুঝেছে বলে দাবি করল।

একজন সুইডিশ মহিলা ঘুরে-ঘুরে বিভিন্ন দেশের কবিদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন তাঁর পত্রিকার জন্য। আমাকে তিনি এতবার ডাকলেন, বসা হল হোটেল সংলগ্ন এক রেস্তোরাঁয়, সেখান থেকে রাস্তার দৃশ্য দেখা যায়, সন্ধে হয়ে এসেছে। মহিলাটির সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি চমৎকৃত। বাংলা সাহিত্য বিষয়ে তাঁর দারুণ জ্ঞান, তিনি জানেন জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কতখানি প্রভেদ, নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের গুরুত্ব, এমনকী উত্তরবঙ্গে যে নকশালবাড়ি নামে একটি গ্রাম আছে, যেখান থেকে সামরিক বিপ্লবের উদ্ভব, তাও তাঁর জানা।

কিছুক্ষণ পরে কিশোয়ার সেখানে এসে উপস্থিত হল। সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে শুরু হল আড্ডা। আমরা বিয়ার নিয়েছিলাম, কিশোয়ার কী খাবে জিগ্যেস করতেই সেও বিয়ার চাইল। পাকিস্তানে মদ্যপানের ব্যাপারে নাকি কঠোর নিষেধ আছে, কিশোয়ারের ব্যবহার দেখে মনে হল, সে সুরাপানে বেশ অভ্যস্ত।

ঘণ্টা দু-এক পরে আড্ডা ভাঙার সময় আমি রমণী দুটিকে বললাম, তোমরা ব্যাগে হাত দেবে না। বিয়ার-টিয়ারের বিল সই করব আমি। ওরা আপত্তি করার চেষ্টা করতেই আমি বাধা দিয়ে বললাম, শোনো, আমি মেল শোভেনিস্ট, মেয়েদের টাকাপয়সা নিয়ে নাড়াচাড়া করা দেখতে আমার ভালো লাগে না!

সুইডিশ মহিলাটি মেনে নিলেও কিশোয়ার হইহই করে উঠল, সে তার ভাগের অংশ দেবেই দেবে। আমি বললাম, কিছুতেই না। তুমি আমাদের টেবিলে এসে বসলে কেন?

কিশোয়ার আমার হাত চেপে ধরল, আমি তা ছাড়াবার জন্য টানাটানি করছি, সুইডিশ মহিলাটি বললেন, এবার কি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হবে নাকি?

আমি বললাম, আজকাল কোনও যুদ্ধেই কেউ জেতে নাকি? কেউ জেতেও না। কেউ হারেও না। আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়। মাঝখান থেকে শুধু বহু প্রাণ ও বহু অস্ত্র নষ্ট হয়। তবে আপাতত এখানে এই যুদ্ধটায় আমি জিতব!

কিশোয়ার জিগ্যেস করল, কত টাকা পর্যন্ত হলে তুমি মেয়েদের খরচ দিয়ে দাও?

মোক্ষম প্রশ্ন! অতি বুদ্ধিমতী মহিলা তো।

হাসতে-হাসতে বললাম, তোমরা দু-তিন হাজার টাকা খেয়ে ফেললে আমি মোটেই দিতাম না। একশো-দেড়শো হলে ভাগাভাগি করাটা ভালো দেখায় না।

কবিদের মধ্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের সংখ্যা দশ শতাংশ, অর্থাৎ খুবই পুরুষ প্রাধান্য। অথচ, আমাদের দেশে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের পড়ুয়াদের মধ্যে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীরেদ সংখ্যা বহুগুণ বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা এম এ ক্লাসে মেয়েদের উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্যে ছেলেদের প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না।

বেশ কয়েকজন কবি লাজুক এবং একচোরা, আর কিছু কবি হইচই প্রবণ। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের কালো রঙের কবিরা সব সবল ও দীর্ঘকায়, জোরে জোরে কথা বলে। এঁদের বেশ কয়েকজনের মাথায় আমাদের দেশের পাহাড়ি সাধু-সন্ন্যাসীদের মতন দীর্ঘ জটা। এটাই নাকি এখনকার ফ্যাশান ওই সব অঞ্চলে। পিঠ পর্যন্ত ঝুলন্ত, শক্ত জটা নিয়ে এঁরা ঘুমোন কী করে? এটা যেন আমারই সমস্যা!

কয়েক দিনের মধ্যেই সবচেয়ে অমিশুক হিসেবে আমার পরিচিতি রটে গেল। কেউ-কেউ এসে অভিযোগও করেছে, তুমি অন্যদের সঙ্গে মেশো না কেন? কথা বলতে চাও না?

আর সবচেয়ে মিশুক আর ঠিক জনপ্রিয় না হলেও সবচেয়ে বির্তকিত হলেন আমেরিকার কবি আমিরি বরাকা। ইনি কৃষ্ণাঙ্গ হলেও লম্বা-চওড়া নন, ছোটখাটো, প্রায় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি, ভাবভঙ্গিতে অ্যালেন গিনসবার্গের অনুকরণ।

ইনি ডেকে ডেকে সবার সঙ্গে আলাপ করেন। এবং বিলি করেন নিজের সম্পাদিত পত্রিকা।

সে পত্রিকায় আগুন ঝরছে। সব লেখাতেই আমেরিকার শাসক সম্প্রদায় এবং প্রেসিডেন্টকে তীব্র আক্রমণ। এঁর মতে আমেরিকা দেশটায় চলছে অগণতান্ত্রিক গণতন্ত্র আর প্রেসিডেন্ট বুশ বর্ণবিদ্বেষী ও জাল-জোচ্চুরি করে জিতেছেন।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতির বাবা-মা তুলে গালাগাল করলেও পার পাওয়া যায়, কোনও শাস্তি হয় না। প্রেডিডেন্ট কেনেডি খুন হওয়ার পর তাঁর উত্তরাধিকারী জনসনকে খুনি সাজিয়ে নাটক লেখা হয়েছিল।

আমিরি বরাকার কবিতা পাঠের সময়ও গালাগালিগুলি খুব প্রকট আর উচ্চকণ্ঠ।

কোনও-কোনও কবির মুখের ভাবে একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান লেগে থাকে সব সময়। যেন তিনি বলতে চান, আমি যে নিজের দেশের কত খ্যাতিমান কবি, তা তোমরা বুঝতেই পারছ না।

শুনেছিলাম এই সম্মেলনে মার্কেজ আসবেন, আসেননি। তিনি অসুস্থ, ক্যানসার রোগে আক্রান্ত।

সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সময় কয়েকদিনের মধ্যে একটা ঘটমান নাটক লক্ষ করলাম।

একজন কৃষ্ণকায় বৃদ্ধ কবির সঙ্গে সবসময় থাকে তাঁর প্রায় হাঁটুর বয়েসি এক তরুণী। এঁরা কোন দেশের জানি না। কাছাকাছি টেবিলে দেখতে পাই, কবিটির সঙ্গে থাকে একগাদা কাগজ ও বইপত্র, তিনি অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। শুধু মেয়েটির সঙ্গে ফিসফিস করেন। এবং ঘনঘন হিসি করতে যান।

তিনি উঠে গেলেই অন্য টেবিলের কোনও না কোনও অত্যুৎসাহী কবি উঠে আসে মেয়েটির সঙ্গে ভাব জমাবার জন্য। মেয়েটির বয়স বড় জোর বাইশ-তেইশ, পুরোপুরি কালো নয় গায়ের রং, মুলাটো ধরনের মুখখানায় অপূর্ব লাবণ্য মাখা আর লজ্জা-লজ্জা ভাব। আজকাল লাজুকতা পশ্চিমি দেশে আর দেখাই যায় না।

যুবকেরা মেয়েটিকে অন্য টেবিলে ডাকলে সে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে আপত্তি জানায়। আর বৃদ্ধ কবিটি ফিরে এসে অন্য যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে অমনি মেয়েটিকে বকাবকি শুরু করেন।

কবিটি কি তাঁর মেয়েকে সঙ্গে এনেছেন, তাকে সর্বক্ষণ পাহারা দিয়ে রাখতে চান? এসব দেশে এটা মোটেই স্বাভাবিক নয়। পরে জানা গেল, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী! বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যার প্রতি বেশি-বেশি দুর্বলতা ও সবসময় হারানোর ভয় সব দেশে একই রকম।

একদিন আমি একটা টেবিলে একা বসে আছি, অন্য টেবিলে জায়গা না পেয়ে ওই দুজন খাবারের প্লেট নিয়ে বাধ্য হয়ে বসলেন আমার পাশে।

আলাপ করতে না চাইলেও, ভদ্রতা সূচক সুপ্রভাত বলতেই হয়। সেইটুকু বলেই আমি হাতের বইতে মনোনিবেশ করি। এখানকার কোনও খাবারই আমার রোচে না, এমনকী পাউরুটিও এমন খড়মড়ে যে মনে হয় গাল কেটে যাবে, একদিন মাত্র ডিমের ঝুরঝুরি বা স্ক্রামব্‌লড এগ দেখা গিয়েছিল। আমি শুধু দেখেছি, নিজে পাইনি। লাইনে দাঁড়িয়ে সেই ভাণ্ডটা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতেই নিঃশেষ। খরা-পীড়িত মানুষের মতন আগের লোকেরা যে যতটা পারে তুলে নিয়েছে। তাই আমি শুধু কাপের পর কাপ কফি খাই।

আমি নিজে থেকে কোনও কথা বলছি না কিংবা মেয়েটির প্রতি চোরা দৃষ্টিপাত করছি না দেখে বোধহয় বৃদ্ধ কবিটি নিশ্চিন্ত হলেন। হঠাৎ জিগ্যেস করলেন, তুমি কি ভারতীয়?

আমি মাথা নেড়ে বোঝালাম যে তাঁর অনুমান সঠিক।

তিনি আবার বললেন, আমি ভারত সম্পর্কে আগ্রহী। কিছু-কিছু ভারতীয় দর্শন পড়েছি।

এবারে মাথা নাড়লাম দুবার।

সকালবেলা অনর্থক বাক্যব্যয় করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো নয় বলে আমি দুবার মাথা নেড়ে

বুঝিয়ে দিলাম, ওঁর ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে আগ্রহ থাকতে পারে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন আলোচনার আগ্রহ আমার নেই।

তিনি আবার বললেন, উপনিষদে চমৎকার কবিত্ব আছে।

আবার দুবার শিরশ্চালন। মেয়েটি খানিকটা বিস্ময়ের সঙ্গে তাকিয়ে আছে এদিকে।

এই কবি অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলতে চান না, আমি শুধু ভারতীয় বলেই যেন দয়া করছেন। আমি কেন এই দয়া নিতে যাব?

এরপরেও তিনি বললেন, আমার নাম হোজে ডি'কস্টা, আমি হেইটি থেকে এসেছি।

এবারে আমাকে মুখ খুলে নিজের নাম জানিয়ে বলতেই হল, আপনার সঙ্গে আলাপ করে সুখী হলাম।

তারপরই উঠে গেলাম কফি আনতে।

ফিরে এসে দেখি কবিটি নেই, বসে আছে মেয়েটি। কবি তা হলে গেছেন হিসিখানায়।

মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ইংরিজিতে বলল, তুমি ভারতীয়? আমার খুব ভারতে যেতে ইচ্ছে করে।

একজন ঈর্ষাকাতর বৃদ্ধকে উপেক্ষা করলেও একটি তরুণীকে অবহেলা করব কেন?

হেসে বললাম, এসো একবার ভারতে বেড়াতে।

সে বলল, ভারত যে অনেক দূর।

হ্যাঁ, অনেক দূর। তুমি কি কবিতা লেখো?

মেয়েটি প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলল, না, না, আমি কবিতা লিখতে পারি না। কবিতা লেখা সহজ নাকি? আমি একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়াই। আমার খুব ইচ্ছে সাংবাদিক হওয়ার।

সেটা খুব শক্ত নয়, চেষ্টা করলেই পারো।

অসুবিধে আছে। সাংবাদিকতা করতে হলে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে হয়। সেটা উনি পছন্দ করেন না।

তোমার নাম কি?

আমার নাম ফ্রাঁসোয়াজ।

ফরাসি নাম?

হ্যাঁ। তুমি ফরাসি ভাষা জানো?

জানি না-ই বলা যায়। তবে ফরাসিতে ছেলেদের নাম হয় ফ্রাঁসোয়া, আর মেয়েদের ফ্রাঁসোয়াজ, এটা অন্তত বুঝি। তোমাদের ভাষা বুঝি ফরাসি?

আমাদের ইংরিজি, ফরাসি আর হেইশিয়ান, তিনটে ভাষাই শিখতে হয়। আমার স্বামী আরও অনেক ভাষা জানেন।

মেয়েটির গলার আওয়াজটি বেশ মিষ্টি। লাজুকভাবেই আস্তে-আস্তে কথা বলে।

একটি অ-ফরসা মেয়ের ফরাসি নাম কেমন যেন অসঙ্গত মনে হয়। শ্যামলী কিংবা কৃষ্ণা নামেই ওকে বেশি মানাত।

আমাদের দেশেও কোনও কোনও মেয়ের নাম শেলি কিংবা বিউটি হয়, সে নাম শুনলেই অন্যদিকে তাকাতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি তিনটি ভাষা জানে, স্কুলে পড়ায়। তার মানে নিজস্ব জীবিকা আছে। কিন্তু তার সাংবাদিকতা করার সাধ মেটাতে দেবে না তার হিংসুক স্বামী।

ওর রূপ আর গুণ দুই-ই আছে, তবু ও বাপের বয়েসি একজন বৃদ্ধকে বিয়ে করতে গেল কেন? নামকরা কবি, সেই খ্যাতির মোহ?

কিন্তু এ কথা তো জিগ্যেস করা যায় না।

ভারতের নাম শুনেই বৃদ্ধ কবিটির উপনিষদের কথা মনে পড়েছিল। দর্শন ও কবিত্ব। কিন্তু বর্তমান ভারত তো উপনিষদের দেশ নয়, বর্ণ-বৈষম্য, জাত-পাতের অবিচার, ধর্ম-ভেদের লড়াই, কত রকম নীচতা, ক্ষুদ্রতা প্রতিদিন চোখে পড়ে। গৌতম বুদ্ধ ও মহাত্মা গান্ধির দেশ হওয়া সত্ত্বেও হিংস্রতা ও হানাহানি চলছে সারাদেশ জুড়ে। প্রাচ্যদেশে ভারতই প্রথম পারমানবিক অস্ত্র বানাবার অপরাধে অপরাধী।

বাংলা ও ভূগোল বইতে যার নাম হাইতি, এখানে সকলে বলে হেইটি, সে দেশটা সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি? হেইটি নাম শুনলেই মনে পড়ে অরাজকতা ও স্বৈরাচার, অশান্তি ও খুনোখুনি। একসময় সেখানকার এক কুখ্যাত স্বৈরাচারী শাসক পরিচিত ছিল পাপা ডক নামে, তার এক গুপ্ত বাহিনীর নাম ছিল টনটন। হিটলারের গেস্টাপোদের মতন, তাদের হাতিয়ার ছিল পাতলা লিকলিকে ছুরি, সামান্য সন্দেহে তারা হাজার লোককে পেটের মধ্যে ওঁই ছুরি চালিয়ে হত্যা করেছে। গ্রাহাম গ্রিন এই সময়টা নিয়ে 'দ্য কমেডিয়ানস' নামে একটা বাস্তব উপন্যাস লিখেছিলেন। সেটা হলিউডের নাম করা ফিল্মও হয়েছিল। এলিজাবেথ টেলর ও রিচার্ড বার্টন ছিল প্রধান ভূমিকায়। এখনও হেইটিতে মানুষের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নেই।

এক একটা দেশ সম্পর্কে এরকমই এক ধরনের একপেশে পরিচিতি ছড়িয়ে আছে বহির্বিশ্বে। আজ সকালের আগে আমিও তো জানতাম না হেইটিতে রয়েছে এই বৃদ্ধ হোজে ডি'কস্টার মতন বহু ভাষাবিদ কবি, যিনি উপনিষদের পর্যন্ত খবর রাখেন। আর এই ফ্রাঁসোয়াজ-এর মতন সুন্দরী, মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে, নিশ্চয়ই আরও আছে এর মতন।

কোনও একটা দেশের নামে সে দেশের মানুষের পরিচয় হতে পারে না। এই জন্যই আমার মাঝে-মাঝে মনে হয়, দেশ জিনিসটাই একটা গাঁজখুরি ব্যাপার।

চোখ ও মুখের সৌন্দর্য ছাপিয়েও ফ্রাঁসোয়াজ-এর নম্র ও লাজুক ভঙ্গিটিই আমার বেশি ভালো লাগছিল।

কিছুক্ষণ নীরবভাবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, ফ্রাঁসোয়াজ, তোমার মুখটা দেখলেই মনে হয়, তোমার মধ্যে একটা সুন্দর সারল্য আছে।

এই উক্তিটিতে পুরুষ সুলভ স্তুতির চেয়ে স্নেহের ভাবটাই বেশি।

ফ্রাঁসোয়াজ আরও লজ্জা পেয়ে মাথাটাকে নীচু করে প্রায় টেবিলের সঙ্গে ছুঁইয়ে ফেলল।

আর কোনও কথা হল না। ফিরে এলেন তার স্বামী। আরও দুজন এসে যোগ দিল আমাদের টেবিলে।

এর পর আর কোনও সকালেই আমাদের এক টেবিলে বসা হয়নি। সবাই তো আর এক সময়ে আসে না। সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে ন'টা, এর মধ্যে যার যখন খুশি।

দূর থেকে দেখেছি কয়েকবার। চোখাচোখি হলে ফ্রাঁসোয়াজ এক ঝিলিক হাসি উপহার দিয়েছে।

জীবনে আর কখনও দেখা হবে না, ঠিকানা বদলাবদলিও করিনি, তবু যেন ওর সঙ্গে একটা চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব হয়ে গেল। হেইটি নামের দেহটার ভাবমূর্তি বদলে দিল এই এক দম্পতি।

কয়েকদিন পর দেখি, বৃদ্ধ কবিটি একা বসে আছেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। এর আগে সব সময় ওদের দেখেছি একসঙ্গে। মেয়েটির অসুখ করল নাকি?

ওঁর কাছে খোঁজ খবর করতে গেলে উনি হয়তে উলটো ভাববেন। মনের মধ্যে রয়ে গেল অদম্য কৌতূহল।

পরের দিনও তাই। অন্য এক টেবিলে একা-একা বসে কাপের পর কাপ খেয়ে যাচ্ছেন বৃদ্ধ কবি। সামনে যথারীতি একগাদা বই, তিনি পড়ছেন না, শূন্য উদাস দৃষ্টি। ফ্রাঁসোয়াজ-এর অনুপস্থিতিতে সকালবেলায় এ ঘরের ছবিটি অসম্পূর্ণ মনে হয়।

ফ্রাঁসোয়াজ অসুস্থ কিনা, তা জানার একটা বুদ্ধি মাথায় এসে গেল।

কবিরা কে কোন ঘরে থাকে, তার একটা তালিকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি চট করে উঠে গিয়ে হোটেলের লবি থেকে ফোন করলাম হোজে ডি'কস্টার ঘরে। কেউ ধরল না। ফোন বেজেই গেল।

তাহলে তো ফ্রাঁসোয়াজ ঘরেও নেই। বেশি অসুস্থ, হাসপাতালে গেছে? তরুণী, স্বাস্থ্যবতী, তার হঠাৎ এমনকী গুরুতর অসুখ হতে পারে?

পরদিনও ফ্রাঁসোয়াজকে দেখা গেল না, অসুস্থ হয়ে পড়লেন তার স্বামী।

বৃদ্ধ কবি একা একাই বসেছিলেন ব্রেকফাস্ট টেবিলে, হঠাৎ তিনি এলিয়ে পড়ে গেলেন মাটিতে, চেয়ারও পড়ে গিয়ে জোর শব্দ হল।

আরও কয়েকজনের সঙ্গে আমি দৌড়ে গেলাম তাঁর কাছে। ধরাধরি করে তোলা হল। তিনি অজ্ঞান হয়ে যাননি। বারবার বলতে লাগলেন এমনি মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।

তিনি অন্য কোনও রকম সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে চুমুক দিতে লাগলেন কফিতে। তাঁর কথার মধ্যে রয়েছে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব।

আমার টেবিলে আরও চার-পাঁচজন বসেছিল, আমি ফিরে আসার পর তাদের নীচু গলায় আলোচনা শুনে, যদিও ফরাসি ভাষায়, খানিকটা খানিকটা বোঝা গেল যে ফ্রাঁসোয়াজ নামের মেয়েটি দুদিন ধরে উধাও হয়ে গেছে। না, আতঙ্কবাদীরা তাকে ধরে নিয়ে যায়নি, তার জামাকাপড়ের হ্যান্ডব্যাগটিও নেই, সে চলে গেছে একজন কলম্বিয়ান কবি ও সাংবাদিকের সঙ্গে, তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না।

প্রথমেই একটু অভিমান হল আমার। ফ্রাঁসোয়াজ চলে গেল, আমাকে একবারও বলেও গেল না?

তারপরই হাসি পেয়ে গেল। আমাকে সে বলবে কেন, অমি তার কে? আমার সঙ্গে চলে যাওয়ায় তার স্বামী থানা-পুলিশ বা হইচই করেনি। কারুর কাছে মুখই খোলেনি। সাঙঘাতিক আঘাত পেয়েছেন নিশ্চয়ই, তা তিনি সহ্য করছেন একা-একা। ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন, তরুণী বউকে সব সময় চোখে-চোখে রাখতেন, সেগুলোও তো প্রবল ভালোবাসারই লক্ষণ। বুড়ো হয়ে গেছেন, তা আর তিনি কী করবেন। ফ্রাঁসোয়াজ তো জেনেশুনেই তাঁকে বিয়ে করেছিল। হয়তো জানতেনই, ও মেয়ে চলে যাবে একদিন।

এরকম আঘাত পেয়েও যে তিনি আত্মসম্মান হারাননি, এ জন্য বৃদ্ধ কবিটির ওপর আমার শ্রদ্ধা হল।

যে তরুণ কবি-সাংবাদিকটি ফ্রাঁসোয়াজকে ইলোপ করে নিয়ে গেছে, সে নাকি এই ডাইনিং হলে সকাল-দুপুরে নিত্য হাজিরা দিত। খুবই সুপুরুষ ও আলাপি। কিন্তু আমি তার চেহারাটা মনে করতে পারলাম না।

মনে-মনে সেই যুবকটির উদ্দেশে বললাম, দেখিস হারামজাদা, ওই সরল, সুন্দর মেয়েটিকে কষ্ট দিস না।

॥ ৯ ॥

টানা দশ দিনের উৎসবে আমার অংশগ্রহণ মোট আট ঘণ্টার জন্য। হোটেল বুকিং বারো দিনের।

তা হলে বাকি সময়টা আমি কী করব?

ঘুরে-ঘুরে দেশটা দেখার উদ্দেশ্য নিয়েই তো এসেছিলাম। কিন্তু নানারকম বিধিনিষেধ ও

সতর্কবাণী শুনে প্রথম থেকেই বুঝেছিলাম সেটা সম্ভব হবে না।

একা-একা ঘুরে বেড়ানো বিপজ্জনক, অচেনা লোকেদের সঙ্গে আমার দল বেঁধে ঘুরতে ভালো লাগে না। কোথাও একা গেলে আমি অনেক কিছু দেখতে পাই, দল বেঁধে গেলে বিস্তর অবান্তর কথা শুনতে হয়। একজন মাত্র কেউ সঙ্গে থাকলে সুবিধে হতে পারে। কিন্তু সেরকম উপযুক্ত সঙ্গী বা সঙ্গিনী আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

আমার কবিতার স্প্যানিশ অনুবাদ পড়ে দেওয়ার জন্য একজনকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, তার নাম কার্লোস। সে-ই আমায় সব জায়গায় নিয়ে যাবে, ফিরিয়ে আনবে, এক হিসেবে সে আমার গাইডও বটে। তার ওপরেই আমার দেখাশুনোর ভার। কার্লোস নামটি স্প্যানিশদের মধ্যে অনেকেরই হয়, এখানেই তিন-চারজন কার্লোস আছে। কয়েক দশেক আগে কার্লোস নামে একজন আন্তর্জাতিক দুর্ধর্ষ ভাড়াটে খুনি ছিল, সে বহুরূপী, এবং বহু নাম ব্যবহার করত, ইউরোপ-মধ্যপ্রাচ্যে অনেক রাষ্ট্রপতি বা বিখ্যাত ব্যক্তির গুপ্ত হত্যার জন্য দায়ী করা হত এই কার্লোসকে। ফরাসি দেশের রাষ্ট্রনায়ক দ্য গলকে হত্যা করার নিখুঁত পরিকল্পনাও করেছিল সে, কিন্তু সেবারে সে সার্থক হয়নি। 'দ্য ডে অফ দ্য জ্যাকল' এই কার্লোসকে নিয়েই লেখা।

আমার গাইড এই কার্লোস নিরীহ প্রকৃতির মানুষ।

উচ্চতায় বা স্বাস্থ্যে সে একজন দস্যু সর্দার হিসেবে বেমানান হত না, কিন্তু তার চেহারায় খানিকটা বেখাপ্পা ভাব আছে। শরীরের দৈর্ঘ্যটা যেন সে ঠিক সামলাত পারে না। ল্যাক প্যাক করে। অথচ সে খুব রোগাও নয়। তার পোশাকগুলো ঢলঢলে। ফরসা রং, ককেশিয়ানদের মতন নাক, প্রশস্ত কপাল, তবু তার মুখে কোনও ব্যক্তিত্বের ছাপ নেই। বছর পঁয়তাল্লিশেক বয়েস হবে।

কার্লোসের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হতে পারত, কিন্তু হল না। তার অনেকগুলি বাধার মধ্যে একটি হল ভাষা।

আমার গাইড হিসেবে তার ইংরিজি জানবার কথা। কিন্তু কোনও বাক্যই সে শেষ করতে পারে না। দুটি-তিনটি শব্দ বলেই সে থেমে গিয়ে অবিকল তোতলাদের মতন বাকি শব্দ খুঁজতে থাকে।

যেমন আমি তাকে জিগ্যেস করেছিলাম, আমরা যে এই নুটিবারা নামের হোটেলটায় আছি, এই নুটিবারা মানে কী? সে বলল, ইয়েস, নুটিবারা, মিনিং ইট ইজ...।

ব্যাস, তারপর আর কিছু নেই। কিছু বোঝা গেল? এইভাবে কতক্ষণ কথাবার্তা চালানো যায়?

আমার একটা তত্ত্ব বা ধারণা আছে, যারা পারিবারিক জীবনে অসুখী কিংবা যাদের বাবা-মায়ের জীবনে প্রেম ছিল না, অর্থাৎ প্রেমহীনতার সন্তান, তারাই অর্ধসমাপ্ত বাক্য বলে।

কার্লোসকে জিগ্যেস করলাম, তুমি বিয়ে করেছ? তোমার ছেলেমেয়ে আছে?

ভাঙা-ভাঙা বাক্যে ও যা জানাল, তাতে বুঝলাম, ও বিবাহিত, সন্তান নেই। স্ত্রীও এখন নেই, বিচ্ছেদ হয়ে গেছে।

তোমার এখন কোনও বান্ধবী নেই?

হ্যাঁ, আছে। দেখা হয়। রোজ না, মাঝে-মাঝে।

তুমি কি কবিতা লেখো?

না, মানে, অনুবাদ করি, মানে, নিজেও কয়েকটা লেখার চেষ্টা করেছি। বন্ধুরা ভালো বলে না...

তোমার জীবিকা কী? তুমি কোনও চাকরি করো?

সে জানাল যে আগে সে একটা সরকারি কাজ করত, সেটা ছেড়ে দিয়েছে।

তা হলে এখন কী করো?

এখন, কিছু না, মানে এই, এই যে, তোমার সঙ্গে রয়েছি।

অর্থাৎ, সে যে আমার গাইডের কাজ করছে, সে জন্য কিছু অর্থ পাবে। কতই বা পাবে। তাও তো মাত্র দশ দিনের জন্য। তার মানে সে বেকার। সরকারি চাকরি সে নিজেই ছেড়ে দিয়েছে, না ছাঁটাই হয়েছে, তা জিগ্যেস করা যায় না।

সরকারি হিসেব অনুযায়ী এ দেশে শতকরা কুড়িজন বেকার। সরকারি পরিসংখ্যান কোনও দেশেই যথার্থ হয় না, সুতরাং আরও বেশি হতে পারে।

একদিন কার্লোসকে নিয়ে নগর দর্শনে বেরিয়েছিলাম।

কিন্তু দেখব কী? দু-পা যেতে না যেতেই সে একটা পাব-এর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলল, এখানকার বিয়ার খুব ভালো। তুমি কলম্বিয়ান বিয়ার চেখে দেখেছ!

সেখানে গিয়ে এক বোতল করে বিয়ার পান করতে হল। কলম্বিয়ার বিয়ার এমন কিছু আহামরি নয়।

আবার মিনিট দশেক পরে সে জিগ্যেস করল, তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়োনি? এই পাবেই একটা রেস্তোরাঁ আছে, এটা খুব বিখ্যাত, ওখানে একটু বসে যেতে পারি।

দশ মিনিট হেঁটে ক্লান্ত হব কেন, গরম তো নেই। এখানকার আবহাওয়া সারা বছরই নীতিশীতোষ্ণ, তাই এরা বলে চিরবসন্তের দেশ। আর একটাও মজার কথা পড়েছি একটা বইতে।

ম্যাডেলিন শহরটি সমুদ্র সমতল থেকে পাঁচ হাজার ফিট উঁচুতে। কলম্বিয়ানরা বলে, স্বর্গের চেয়ে মাত্র কয়েক ইঞ্চি নীচে।

মৃদু-মৃদু ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যে হাঁটতে ভালোই লাগছিল কিন্তু কার্লোসের আগ্রহ-আতিশয্যে আবার একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকতেই হল। সিগারেটের ধোঁয়া ও বহু নারী পুরুষের গুঞ্জন ছাড়া আর কোনও বিশেষত্ব নেই। যে মেয়েরা পরিবেশন করছে, তাদের সুগোল বক্ষঃস্থল প্রায় সবটাই পরিদৃশ্যমান।

এ দৃশ্যও এখানে মোটেই দুর্লভ নয়। কলম্বিয়ার রমণীদের সৌন্দর্য বিশ্ববিখ্যাত। ইউরোপ-আমেরিকার অধিকাংশ বিজ্ঞাপনের মডেল হয় নাকি এখানকার মেয়েরা। রাস্তাঘাটে যেসব তরুণীদের দেখা যায়, তাদের পোশাক অত্যন্ত আঁট, স্কিনটাইট যাকে বলে। শরীরের গড়ন বেঢপ হলে পোশাকে খুব কুৎসিত দেখাত, পোশাকের জন্যই বোধহয় এরা খুব শরীরের চর্চা করে। সেইজন্যই এখানকার তরুণীদের উরু, নিতম্ব ও বক্ষদ্বয় একেবারে বিসদৃশ নয়। এবং তা প্রদর্শন করতেও এদের লজ্জা নেই।

শুধু মেয়েরা কেন, মাঝে-মাঝে খুব রূপবান পুরুষও দেখা যায়।

শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের রূপ বর্ণনায় সব সময় গ্রিক দেবতাদের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মিশ্র রক্তের জন্য কলম্বিয়ার অনেক পুরুষও প্রকৃত সুপুরুষ।

এক বোতল বিয়ার শেষ করার পর কার্লোস জিগ্যেস করল, তুমি হুইস্কি পছন্দ করো না? সিভাস রিগ্যাল, ব্ল্যাক লেবেল, কুইন অফ কুইনস, সবই এখন পাওয়া যায়।

অর্থাৎ তার হুইস্কি পানের ইচ্ছে হয়েছে। এই সব নামগুলোর ইংরেজি উচ্চারণও ঠিকঠাক জানে।

দিলাম হুইস্কির অর্ডার।

নানারকম চতুরালি করে ও যে আমার পয়সায় মদ্যপান করতে চায়, তাও ঠিক নয়। কেন-না, আমি যখন বিল মেটাচ্ছি, তখন ও খুবই কুণ্ঠিতভাবে বলল, আমারই খাওয়ানো উচিত ছিল তোমাকে, কিন্তু আমি আজ বেশি পয়সা আনিনি, অন্য একদিন অবশ্যই—

ওর এই কুণ্ঠাটা আন্তরিক।

তৃষ্ণার্তকে যেমন জল প্রত্যাখ্যান করা যায় না, তেমনই এক বিদেশি, বেকার, স্ত্রী-পরিত্যক্ত,

বান্ধবীহীন, ব্যর্থ কবি যদি বিয়ার হুইস্কি পান করতে চায়, তা হলে মানবতার খাতিরেই তাকে নিরাশ করা উচিত নয়।

তার জন্য পয়সা খরচ করতে আমি রাজি হলাম। কিন্তু অতক্ষণ ধরে কী গল্প করব তার সঙ্গে?

একে তো তার ভাঙা-ভাঙা ভাষা, তা ছাড়া তার কৌতূহল প্রবৃত্তিটাই কম।

সে আমার কবিতার অনুবাদ পাঠ করছে, কিন্তু আমি আর কী লিখি, কিংবা মূল বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তার কোনও আগ্রহ নেই। আমি কোথায় থাকি কিংবা আমার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ও কিছু জানতে চায় না।

আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না, কিন্তু অনুবাদে স্প্যানিশ সাহিত্য আমরা সবাই বেশ কিছু পড়েছি। এক সময় ইংরেজির মাধ্যমে অনুবাদও করেছিলাম কিছু স্প্যানিশ কবিতা। পাবলো নেরুদা, গার্সিয়া লোরকা, আনতোজিও মাচাদো, হুয়াও রাসেল হিমনেথ এঁদের রচনার উল্লেখ করলেও তেমন কিছু তাপ-উত্তাপ নেই কার্লোসের।

হিমেনেথের একটি কবিতা আমার খুব প্রিয়।

'ওখানে কেউ না। জল
কেউ না?
জল কি কেউ নয়?
ওখানে কেউ না। ফুল।
ওখানে কেউ না?
তবু ফুল কি কেউ না?
ওখানে কেউ না। হাওয়া
কেউ না? হাওয়া কি কেউ না?
কেউ না? মায়া
ওখানে কেউ না?
আর মায়া কি কেউ না?'

কার্লোসকে জিগ্যেস করলাম, তোমার এটা কেমন লাগে? এর মূল স্প্যানিশ তোমার মুখস্থ আছে?

কার্লোস জানাল যে কবিতাটা ভালোই, কিন্তু মূল তার মুখস্থ নেই।

শুনেছিলাম, মূল স্পেন ভূখণ্ড থেকে এতদূরে হলেও কলম্বিয়ায় খাঁটি ক্যাসটিলিয়ান স্প্যানিশ ভাযা প্রায় অবিকৃত রাখার চেষ্টা হয়েছে। কানাডার একাংশ যেমন ফরাসিভাষী হলেও সে ভাষা অনেকখানি বদলে গেছে মূল ফরাসিদেশের ভাষা থেকে, এরা সেটা হতে দেয়নি। কিন্তু স্পেনের বড় বড় কবি-লেখকদের নিয়ে এরা আদিখ্যেতাও করে না।

আমাদের দেশে কিংবা বাংলাদেশের কবিতা উৎসবে যেমন মৃত কবিদের নামে মঞ্চ হয় কিংবা বড় বড় পোস্টারে উদ্ধৃত থাকে তাঁদের রচনা, এখানে সেসবের কোনও নিদর্শন চোখে পড়েনি। যাকে বলে 'হিরো ওয়ারশিপ' সেটা নেই এদের সাহিত্য-জগতে।

এমনকী গার্সিয়া মার্কেজ সম্পর্কে দু-একজনের সঙ্গে কথা বলে যা উত্তর পেয়েছি, তাতে অবাক হতে হয়। কলম্বিয়ার সন্তান বিশ্ববিখ্যাত মার্কেজকে নিয়ে এদের গর্ব করারই তো কথা। কিন্তু এরা বলল, 'হ্যাঁ, কারুর কারুর মতে, মার্কেজ বেশ বড় লেখক, আবার কারুর কারুর মতে, অনেকটাই চমক সৃষ্টির চেষ্টা। এমন কিছু না।

বাংলার একটা প্রবাদ আছে, এ গাঁয়ের মেধো, ভিন গাঁয়ে মধুসূদন। মার্কেজেরও দেখছি সেই অবস্থা।

স্প্যানিশ ভাষায় সমসাময়িক অপর এক মহান লেখক বর্হেজ এক সময় মার্কেজের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত উপন্যাস 'ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্স অফ সলিচুড' সম্পর্কে তির্যকভাবে বলেছেন, ও বইটা ভালো, কিন্তু আর একটু ছোট করা উচিত ছিল আর নাম দেওয়া উচিত ছিল, 'ফিফটি ইয়ার্স অফ সলিচুড'। পঞ্চাশ বছরেই তো মার্কেজ নোবেল প্রাইজ পেয়ে গেছেন, তারপর আর নির্জনতা কোথায়?

ওই একদিনই কার্লোসের সঙ্গে বেরিয়েছিলাম, আর না। এরপর থেকে ওকে আমি একটু এড়িয়েই চলতাম।

আর একদিন বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লাম একাই, কর্তৃপক্ষের নিষেধ অমান্য করে। খানিকটা হেঁটে যাওয়ার পর ভয়-ভয় করছে লাগল। আগের দিনই নিউজিল্যান্ড থেকে আগত কবিটিকে কোথায় যেন মারধোর করা হয়েছে, কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার ক্যামেরা ও টাকাপয়সা, এরকম শুনেছি। মারধোরের চেয়ে বেশি আশঙ্কা অপহরণের। এখনই নাকি তিনশোর বেশি বিদেশিকে আটকে রাখা হয়েছে দুর্গম পাহাড় অঞ্চলে।

অল্প বয়েস হলেও না হয় কিছুদিন জঙ্গিদের আস্তানায় কাটিয়ে আসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা যেতে পারত, এখন সেটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। তা ছাড়া মাঝে মাঝেই ওরা নাকি একজন-দুজনকে খুন করে বাইরে ছুড়ে দেয়। যে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণাই নেই, সেখানে খামোখা প্রাণটা দিতে যাব কেন?

একটা ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। কিন্তু যাব কোথায়? কার্লোসকে জিগ্যেস করেছিলাম, এ শহরে দ্রষ্টব্য স্থান কী-কী আছে। সে অনেক ভেবেচিন্তে বলেছিল, সেরকম তো কিছু নেই, তবে কিছু দূরে একটা সুন্দর সাজানো গ্রাম আছে, সেখানে আছে অনেক রকমের রেস্তোরাঁ। এত দূর দেশে এসে শুধু রেস্তোরাঁ দেখতে যাব?

আর ট্যাক্সিতে নগর পরিক্রমা অত্যন্ত নির্বোধের মতন ব্যাপার। তার চেয়ে হোটেলের সামনের বড় রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকলে অনেক কিছু দেখা যায়।

শহরটি নেহাত ছোট নয়।

জনসংখ্যা কুড়ি লক্ষের বেশি। দরিদ্র দেশ বলে বিদিত হলেও শহরের রাস্তাঘাটে তা প্রকট নয়। ভিখিরি নেই। আমাদের দেশের মতন প্রচুর ফেরিওয়ালা আছে, তারা চেঁচিয়ে জিনিস বিক্রি করে। ট্যাক্সিওয়ালা লব্‌ঝরে নয়, অন্য যানবাহনও উন্নত, উঁচু দিয়ে চলা স্কাই ট্রেন আছে।

রাস্তাগুলি ঝকঝকে ও প্রশস্ত। সম্প্রতি নাকি এ শহরের সব রাস্তা নতুনভাবে গড়া ও মেরামতের পর মেয়রমশাই ঘোষণা করেছেন, কেউ যদি কোনও রাস্তায় একটাও খানা-খন্দ খুঁজে বার করতে পারে, তাকে পুরস্কৃত করা হবে!

এই দৃষ্টান্ত অনুসারে কলকাতার মেয়র মহোদয় উলটো একটা ঘোষণা করতে পারেন। কেউ যদি এই শহরে এমন একটাও রাস্তা খুঁজে বার করতে পারে, যেখানে খানা-খন্দ নেই, তা হলে পুরস্কার পাবে সে।

দরিদ্র হলেও এখানকার অধিকাংশ মানুষই বেশ ফূর্তিবাজ। এরা নাচ-গান ভালোবাসে। শুক্রবার বিকেলের পর থেকেই অনেক তরুণ-তরুণী রাস্তার মোড়ে মোড়েই নাচতে শুরু করে। ট্যাংগো নাচের উৎপত্তি নাকি এখানেই।

এরা কবিতা এত ভালোবাসে, নাচ-গান ভালোবাসে, অথচ এখানেই এত হিংস্রতা, এত হানাহানি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে জীবনযাত্রার স্রোত দেখলে সেই বিপজ্জনক দিকটির কথা টেরই পাওয়া যায় না। সবই যেন স্বাভাবিক।

কান্তি হোর ঠিকই বলেছিলেন, এখানকার সমস্ত মানুষজনেরই ব্যবহার খুব চমৎকার। ট্যাক্সি চালক, হোটেলের বেয়ারা, বিমানবন্দরের পোর্টার, সকলেরই আচার-আচরণের মধ্যে একটা স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ আছে। কেউ বেশি পয়সা চায় না, কেউ ঠকাবার চেষ্টা করেনি।

শুধু কিছু-কিছু বুদ্ধিজীবী শ্রেণির মধ্যে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে। কারুকে কোনও কাজের কথা বললে সে অন্য একজনকে দেখিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। উৎসবের উদ্যোক্তাদের মধ্যে দু-একজনকে আমার কোনও প্রয়োজনের কথা বলে দেখেছি, তারা জোর দিয়ে জানিয়েছে, তুমি কোনও চিন্তা কোরো না, আমি নিজে কাগজটা বিকেলে তোমার কাছে পৌঁছে দিয়ে যাব। তারপর কোথায় কী, বিকেল গড়িয়ে রাত্রি, পরের দিনও তার পাত্তা নেই। এই ব্যাপারে আমাদের দেশের সঙ্গে খুব মিল।

দুটি ব্যাপারে আমার মনের মধ্যে অস্বস্তি বা চাঞ্চল্য রয়েই গেল।

আমার ফেরার টিকিটের নির্ঘণ্ট আগে থেকেই পাকা হয়ে আছে। আবার এখান থেকেই বোগোটা, মায়ামি, নিউ ইয়র্ক, লন্ডন হয়ে সরাসরি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। শুধু লস অ্যাঞ্জেলিসে আর যেতে হবে না।

কিন্তু মায়ামি থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছব রাত আটটা পনেরোয়, এরপর লন্ডনের ফ্লাইট ন'টা পনেরোয়। মাঝখানে মাত্র এক ঘণ্টা সময়। এর মধ্যে এক টার্মিনাল থেকে আমাকে যেতে হবে অন্য টার্মিনালে, রাস্তা চিনতে দেরি হলেই ফসকে যাবে পরের ফ্লাইটটা। তা ছাড়া নিউ ইয়র্কে যদি পৌঁছতে দেরি করে?

নিউ ইয়র্কেই আসার পথে আমার এই নির্ঘণ্ট বদলের কথা বলেছিলাম বিমান কোম্পানিকে। তারা বলল, সেদিন তার আগে অন্য ফ্লাইট নেই। বদল করা যাবে না। তা ছাড়া চিন্তার কী আছে? এক ঘণ্টা যথেষ্ট সময়। টার্মিনাল বদল করতে বড়জোর পনেরো-কুড়ি মিনিট লাগবে!

যদি নিউ ইয়র্কের ফ্লাইটই দেরি করে পৌঁছয়?

আমেরিকান এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট কখনও লেট করে না।

এরকম কথা শুনলেই আমার গা জ্বলে যায়।

পৃথিবীর বহু জাতের বিমানে ঘোরাঘুরি করে দেখেছি, যত বিখ্যাতই হোক, সব এয়ারলাইন্সই কখনও না কখনও দেরি করে ছাড়ে কিংবা দেরি করে পৌঁছয়।

একবার প্যারিসের শার্ল দ্যগল বিমানবন্দরে লন্ডনে যাওয়ার জন্য সকাল ছ'টা থেকে বসে থাকতে হয়েছিল বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। যদিও লন্ডন মাত্র এক ঘণ্টার পথ। তাও যদি কর্তৃপক্ষ বলে দিত যে সেদিন নির্দিষ্ট ফ্লাইট ছাড়তে অত দেরি হবে, তা হলে অসীমের বাড়িতে ফিরে গিয়ে খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে বিকেলে আসতে পারতাম। তার বদলে এই ছাড়বে, এক্ষুনি ছাড়বে ঘোষণা করে করে আমাদের তিনবার বিমানে উঠিয়েও নামিয়ে আনা হয়েছিল। অব্যবস্থার চূড়ান্ত। সেদিন এয়ার ফ্রান্সের কর্মীরা ঝটিতি ধর্মঘট করে বসেছিল, তাদের সঙ্গে মালিকপক্ষের আলোচনা চলছিল সারাদিন ধরে।

এয়ার ফ্রান্সই যদি এগারো ঘণ্টা লেট করতে পারে, তাহলে যত দোষ নন্দ ঘোষ আমাদের ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স-এর?

এবারেও তো মায়ামি থেকে বোগোটা আসবার সময় দেড় ঘণ্টা লেট করেছে আমেরিকান এয়ারলাইন্স!

ম্যাডেলিনে পৌঁছবার পরদিন থেকেই আমি টিকিট বদল করার চেষ্টা করে আসছি।

হোটেলের দোতলায় বেশ কয়েকখানা ঘর জুড়ে কবিতা উৎসব কমিটির দফতর। গাব্রিয়েল ফ্রাঙ্কো নামে একজনের ওপর বিমানের টিকিট সংক্রান্ত সমস্যার ভার। তাকে আমার ওই এক ঘণ্টার সংকটের ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম, আমাকে নির্দিষ্ট তারিখের আগের দিন ফিরতেই হবে।

সে একগাল হেসে বলল, না, না, আগের দিন যাবে কেন? উৎসবের শেষ দিনটায় দারুণ জমকালো আসর হয়, সেই জন্যই তোমার টিকিট তার পরের দিন করা হয়েছে। যাতে তুমি শেষ উৎসবটা দেখে যেতে পারো।

তাকে জানালাম যে উৎসবের শেষ অনুষ্ঠান দেখতে পারলে খুব ভালো লাগত, কিন্তু আমার উপায় নেই। নিউ ইয়র্ক থেকে ফ্লাইট মিস করার ঝুঁকি আমি কিছুতেই নিতে পারি না।

সে কোনওক্রমেই বুঝতে চায় না, শেষ পর্যন্ত বলল, ঠিক আছে, দেখি, এখন তারিখ বদল করা সম্ভব কি না, ট্রাভেল এজেন্সির কাছে পাঠাব, তোমার টিকিটগুলো রেখে যাও।

পরদিন দুপুরেই খোঁজ নিতে গেলে গাব্রিয়েল বলল, না, কাল পাঠানো হয়নি, আজ বিকেলে ট্রাভেল এজেন্সির লোক এখানেই আসবে, তাকে দিয়ে দেব।

আবার পরদিন গেলাম, গাব্রিয়েল যেন আমাকে চিনতেই না পেরে বলল, কী ব্যাপার?

আবার আদ্যোপান্ত বলতে হল।

সে বলল, ও হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমার টিকিটটা, টিকিটটা...

অন্য টেবিলের দুজনের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের টিকিটটা তো ট্রাভেল এজেন্সির কাছে পাঠানো হয়েছে, তাই না।

একজন বলল, হ্যাঁ।

আর একজন একটা ড্রয়ার খুলে আমার টিকিটটা উঁচু করে দেখাল।

গাব্রিয়েল বলল, 'ওঃ হো, ভুল হয়ে গেছে। কাল অবশ্যই পাঠাব।

অন্যজন বলল, কাল শনিবার।

এবং পরের দিন রবিবার। আগামী দুদিন ট্রাভেল এজেন্সি বন্ধ।

সোমবার যদিও বা টিকিটটা পাঠানো গেল, তার পরেও ট্রাভেল এজেন্সির কাছ থেকে কোনও উত্তর নেই।

আমি বারবার খোঁজ নিতে গেলে গাব্রিয়েল বেশ বিরক্ত হয়।

এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। এরা আমার সমস্যাটা বুঝতেই পারছে না।

যদি নিউ ইয়র্কে দেরি করে পৌঁছই, তার একটা চেইন রি-অ্যাকশন হবে। তা হলে নিউ ইয়র্ক থেকে লন্ডনের ফ্লাইট ধরা যাবে না। লন্ডনে দেরি করে পৌছলে সেখান থেকে কলকাতার ফ্লাইট চলে যাবে। সেটাই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কারণ, লন্ডন-কলকাতা সরাসরি বিমান যায় সপ্তাহে মাত্র দুদিন, সেখান থেকে রিজার্ভেশান পাওয়া খুব শক্ত। আগের বছরই এই কারণে আমাকে লন্ডনে আটদিন আটকে থাকতে হয়েছিল।

এবারেও নিউ ইয়র্কে বা লন্ডনে আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল ধরে অপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই।

এখান থেকে ফিরেই কয়েকদিন পর অস্ট্রেলিয়া সফরের সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে আছে। সে টিকিটও তৈরি। এখানে স্বাতীকে নিয়ে আসতে পারিনি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বাঙালিরা স্বাতীকেও আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ভ্রমণপিয়াসী স্বাতী উন্মুখ হয়ে আছে, অস্ট্রেলিয়ার বাঙালিরাও খুব নিরাশ হবেন আমরা যথা সময়ে পৌঁছতে না পারলে। সিডনি, মেলবোর্ন, ক্যানবেরার কিছু বাঙালি নির্দিষ্ট কয়েকদিনে অনুষ্ঠানের জন্য 'হল' ঠিক করে রেখেছেন। সে তারিখগুলি বাতিল হয়ে গেলে কাছাকাছি সময়ের মধ্যে আবার 'হল' পাওয়া শক্ত, অনেক টাকার ক্ষতিও হয়ে যাবে।

সুতরাং নিউ ইয়র্ক-লন্ডন আর লন্ডন-কলকাতার কনফার্মড ফ্লাইটগুলি আমাকে অবিকল রাখতেই হবে, শুধু এখান থেকে নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে হবে একদিন আগে, সেটা এমন কিছু শক্ত হওয়ার কথা নয়।

কিন্তু দিনের পর দিন ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রাখার জন্য আমার উদ্বেগ রয়েই গেল।

দ্বিতীয় উদ্বেগের কারণটা ঠিক বলার মতন নয়, আবার গোপন করবই বা কেন?

একদিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে হায়াৎ আর জিয়াউল হাতখরচ বিষয়ে কী যেন বলাবলি করছিল। আমি কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করেছিলাম, হাতখরচ ব্যাপারটা কী?

ওদের একজন বলল, আপনি এখান থেকে হাতখরচ পাননি? আপনার আমন্ত্রণের চিঠিতে সেরকম কিছু লেখা ছিল না? সবাইকেই তো দেবে।

ঘরে এসে সেই চিঠিটা, খুঁজে বার করলাম। সত্যিই তো, তাতে লেখা আছে আমার হোটেল খরচ, খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত ব্যবস্থা ছাড়াও কিছু হাতখরচ দেওয়ার কথা। আগে সেটা আমি খেয়াল করিনি।

পাঁচদিন কেটে গেল, সে টাকা এখনও দিল না কেন? আমাকে গিয়ে চাইতে হবে নাকি? ওদেরই তো প্রথম দিনই আমাকে দেওয়া উচিত ছিল।

তিন লক্ষ দশ হাজার টাকা দেওয়ার কথা। শুনে যত চমকপ্রদ মনে হয়, তা নয় অবশ্য।

টাকা তো নয়, এখানকার মুদ্রা পেসো। তার মূল্যমান অতি সামান্য। এক ডলারে দু-হাজার দুশো, অর্থাৎ আমাদের ভারতীয় এক টাকা চারশো পেসো-রও বেশি। এর মধ্যে আমকে কিছু ডলার ভাঙাতেও হয়েছে, তাই মূল্যমান জানি। অনেকটা ইতালির লিরার মতন, সিগারেট কিনতেও পাঁচ হাজার, দশ হাজার লাগে।

তিন লক্ষ দশ হাজার পেসো প্রায় দেড়শো ডলার, আমাদের প্রায় সাত হাজার টাকার মতন। এই টাকার অঙ্কটা এমন কিছু বেশি নয়, আবার উপেক্ষা করবার মতনও নয়।

টাকাটা যখন প্রত্যেক আমন্ত্রিত কবিকে দেবেই বলা হয়েছে, তখন পৌঁছনোর পরেই তো পাওয়ার কথা। চাইতে হবে কেন?

এত দূর থেকে ডেকে এনে হোটেলে রেখে খাতির-যত্ন করছে, তার পরেও আবার টাকা চাইতে যাব? এটা আমার কাছে সম্মানজনক মনে হয় না।

গ্যাব্রিয়েলের ঘরে টিকিটের খবর নিতে বারবার যাই, সেখানে অনেকেই আমাকে চিনে ফেলেছে। সেখানে কারুর মনে পড়ে না যে আমাকে টাকাটা দেওয়া হয়নি? সেখানে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হয়ে থাকি, এই বুঝি কেউ বলবে, ওঃ হো, আপনি হাতখরচ নেননি কেন? এই যে—

কেউ সে কথা বলে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মনে-মনে বলি, নাঃ, চাইব না, কিছুতেই চাইব না! ভারী তো সাত হাজার টাকা!

মন কিন্তু নিজের কাছেও সত্যি কথা বলে না।

মনের একটা অংশ খিকখিক করে হাসে। হাসতে-হাসতে বলে, তুমি এমন কিছু বাবু হওনি যে সাত হাজার টাকা এমনি-এমনি ছেড়ে দেবে। তোমার ন্যায্য প্রাপ্য টাকা। সাত হাজার টাকা এমন কিছু ফ্যালনাও নয়। ওই টাকা লিখে রোজগার করতে হলে তোমাকে কতটা পরিশ্রম করতে হয় বলো তো? একবার না হয় চোখ-কান বুজে, মান খুইয়ে চেয়েই ফ্যালো। এখানে তোমার মানহানির কথা আর কেউ তো জানতে পারছে না। দেশের সাত হাজার টাকার চেয়েও বিদেশে দেড়শো ডলারের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি।

তবু আমি মুখ ফুটে চাই না বটে, কিন্তু সর্বক্ষণ যে টাকাটার কথা ভাবছি, সেটাই তো একটা পরাজয়।

একদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে হঠাৎ মনে হল, টিকিট বদলানোর ব্যাপারটা ক্রমশই খুব বিরক্তিকর হয়ে উঠছে। আর কতবার বলব! আমার যতখানি চেষ্টা করার তো করেইছি, এর পর যা হওয়ার তা হবে। আজ বিকেল থেকেই এ সমস্যাটা একেবারে মুছে ফেলতে হবে মন থেকে।

আর হাতখরচের টাকাটা আমি চাইব না, চাইব না, চাইব না, এটাই শেষ কথা। অতিথির পক্ষে অর্থ ভিক্ষা অতি অশোভন।

এবার থেকে যেমন একবেলা কিছুই খাব না, তেমনি দুপুরের পর থেকে আর এক পাও বাইরে বেরুব না। নিজের সঙ্গে ছাড়া আর একটাও কথা বলব না কারুর সঙ্গে।

চাবি দিয়ে ঘরটা খুলতে-খুলতে মনে হল, আমি যেন সদ্য সন্ন্যাস ব্রত নিয়েছি আর হোটেলের এই ঘরখানা যেন হিমালয় পাহাড়ের কোনও দুর্গম গুহা।

॥ ১০ ॥

সেই দ্বিতীয় রাত্রে যে দরজায় দুম দুম ধাক্কা ও নারীকণ্ঠের আবেদন শোনা গিয়েছিল, সে রকম কিছু আর ঘটেনি। তার পরের কয়েকটি দিনে, যেসব মেয়েদের দেখলেই তাদের পেশা বোঝা যায়, তাদের দেখিনি হোটেলের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে।

এ হোটেলের পেছনের রাস্তাতেই লালবাতি এলাকা, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে ফুলো ফুলো বুকের রমণীরা, সিগারেট ফুকতে-ফুঁকতে তারা আড়ে-আড়ে পথিকদের দিকে চায়, আর কোনও প্রকাশ্য ইঙ্গিত করে না। তারা হোটেলের মধ্যেও ঢোকে না, সেদিক দিয়ে হোটেলটি পরিচ্ছন্ন।

তা হলে সেই দ্বিতীয় রাতের রমণীর ব্যাপারটা কী? অত জোরে-জোরে দরজায় ধাক্কা দেওয়া স্বাভাবিক নয়। হয়তো সে কোনও চেনা লোককেই খুঁজতে এসেছিল, ঘরের নম্বরটা ভুল করেছে। আমার কণ্ঠস্বর শুনে বুঝতে পারেনি? হয়তো ততটা ইংরিজি জানে না কিংবা ছিল নেশাগ্রস্ত।

যাই হোক, বেনিফিট অফ ডাউট দেওয়া গেল।

টেলিফোনটা প্রায় নিস্তব্ধই থাকে, বেজে ওঠে কদাচিৎ।

পৌঁছবার পরদিনই কানাডা থেকে ফোন করেছিলেন কান্তি হোর। আমি তাঁকে হোটেলের নাম জানিয়ে আসতে পারিনি। তিনি ওয়েবসাইটে কবিতা উৎসবের সংবাদ থেকে উদ্যোক্তাদের ফোন নাম্বার খুঁজে বার করেছেন।

এত দূর দেশে এসে এরকম একটি সহৃদয় বাংলা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে ভারী ভালো লাগে। ওঁর সঙ্গে ঠিক হয়ে রইল, উনি কয়েকদিন পরে চলে আসবেন বোগোটায়, পৌঁছেই ফোনে জানাবেন কোথায় উঠেছেন। আমিও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব, এক রাত অন্তত আড্ডা হবে।

আমি নিজে থেকে স্বাতীকে ফোন করেছি একবারই, ঠিকঠাক এক খণ্ড অবস্থায় যে পৌঁছেছি, সে খবর জানাবার জন্য। হোটেলের ঘর থেকে টেলিফোন করার খরচ খুব বেশি, তা ছাড়া অপারেটরকে সংখ্যা বোঝাতে গলদঘর্ম হতে হয়। শেষ পর্যন্তও বুঝতে না পেরে অপারেটর আমার ঘরে এসে কাগজ-পেনসিল দেখিয়ে ইঙ্গিতে বলেছিল সংখ্যাটা লিখে দিতে। এটাও খুব সৌজন্যের ব্যাপার, টেলিফোন অপারেটর নিজের কাজ ছেড়ে, খুপরি ছেড়ে আটতলায় উঠে আসবে, এরকম আশাই করা যায় না। কিন্তু বারবার কি তাকে আমার ঘরে টেনে আনা উচিত? অপারেটনেরর সাহায্য ছাড়াই হোটেলের ঘর থেকে সারাবিশ্বে সরাসরি ফোন করার ব্যবস্থা এমনকী আমাদের দেশেও চালু হয়ে গেছে, এখানে নেই।

আমি স্প্যানিশ এক থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যা কার্লোসকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে মুখস্থ করে ফেলেছি। কিন্তু উচ্চারণ আয়ত্ত করা তো সহজ নয়, তাই বললেও কেউ বুঝতে পারে না। শুধু হোটেলের লিফ্‌টে উঠে যখন বলি, ওচো, চালিকা মহিলাটি আমায় ঠিক নিয়ে যান আট তলায়। ওচো মানে আট। এরপর ধন্যবাদের বদলে গ্রাসিয়াস।

স্বাতীকে বলেছিলাম, পুপ্‌লু-চান্দ্রেয়ীকে আমার হোটেলের টেলিফোন নাম্বার জানিয়ে দিতে, তাই ওরা নিজেরাই ফোন করেছিল পরের দিন। পুপ্‌লু কিছুটা স্প্যানিশ শিখেছিল, তাই অপারেটরকে আমার নামধাম বোঝাতে অসুবিধে হয়নি। পুপ্‌লুর কাছ থেকে জেনে গিয়েছিল গৌতম দত্ত, সেও আমার খোঁজখবর নিয়েছে। টরেন্টোর দীপ্তেন্দু চক্রবর্তীকে জানানো হয়ে ওঠেনি, ভুল হয়ে গেছে। দীপ্তেন্দু কানাডা থেকে কলকাতায় আমাকে প্রায়ই ফোন করে শুধু এইটুকু জানবার জন্য, আমি রোজ

একটা করে অ্যাসপিরিন খেতে ভুলে যাচ্ছি কি না। ওর মতে অ্যাসপিরিনই এখন সর্ব রোগের বিশল্যকরণী।

এক একজন মানুষের টেলিফোনের নেশা থাকে। সারাবিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আমার চেনা-জানা মানুষদের মধ্যে এই নেশায় এক নম্বর চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে কামাল। সে বিড়ি-সিগারেট, মদ, পান-জর্দা কিছুই খায় না, জামা-প্যান্টের শখ নেই, অন্য কোনও নেশা নেই, সব নেশা পুঞ্জীভূত হয়েছে টেলিফোনে। টেলিফোন দেখলেই তার হাত নিশপিশ করে। পৃথিবীর বহু দেশে আমি আচম্বিতে তার টেলিফোনের ডাক পেয়েছি। কামালকে নম্বর জানাবার দরকার হয় না। একবার সানফ্রান্সিসকোতে এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় হঠাৎ দেখা, সে খুব খুশি হয়ে বলল, চলো, আমার বাড়ি চলো। বন্ধুটির বাড়ি বার্কলেতে, সেখানে অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা ও পানাহার চলছে, এক সময় টেলিফোন বাজল, বন্ধুটি সেটা তুলে বলল, সুনীল, তোমাকে ডাকছে!

এটা ভৌতিক ব্যাপার মনে হয় না? আমি যে সন্ধেবেলা এ বাড়িতে থাকব, তা দুপুরেও ঠিক ছিল না, অন্য কারুর জানবার কথাও নয়। টেলিফোনটা তোলবার আগেই বুঝে যাই, কামাল ছাড়া আর কেউ নয়।

প্রথমেই তাকে জিগ্যেস করি, কামাল, তুমি কোথায়? সানফ্রান্সিসকোতে এসেছ নাকি?

না, আমি এখন মালয়েশিয়ায়।

আমার এখানকার নম্বর তুমি কী করে পেলে? কী করে জানলে—

কামাল এমনভাবে উত্তর দিল, যেন পদ্ধতিটা খুবই সহজ। প্রথমে সে ফোন করেছে কলকাতায়, তারপর আমেরিকার অমুক, অমুক আর অমুকের কাছে। অর্থাৎ সাত জায়গায় ফোন করে সে তারপরেও আন্দাজে এখানে চেষ্টা করেছে।

এতগুলি আন্তর্জাতিক ফোনের টাকা খরচ করে সে আমাকে খুঁজে বার করল কেন? বিশেষ জরুরি কোনও কারণ আছে? কিচ্ছু না, এমনই, অনেকদিন কথা হয়নি। এরকমই তার ভালোবাসা।

এবারে কামাল এখনও পর্যন্ত ফোন করেনি। সে অসুস্থতায় খানিকটা কাবু হয়ে আছে। তবু, ফোন বাজলে প্রথমেই মনে পড়ে কামালের কথা।

টেলিভিশানে কয়েকটি চ্যানেলের মধ্যে দুটি ইংরিজি, সি এন এন আছে, তাতে মাঝে-মাঝে খবর দেখে নিই, বহির্বিশ্বের সঙ্গে এইটুকুই সংযোগ, খবরের কাগজ তো পড়বার উপায় নেই। কলম্বিয়ার খবরও থাকে, একটি জঙ্গি দলের সঙ্গে বন্দি-বিনিময় নিয়ে আলোচনা চলছে সরকারের, আর একটি জঙ্গি দল আবার গোলাগুলি চালিয়েছে। কলম্বিয়ায় গৃহযুদ্ধের মতন অবস্থা চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

অন্য ইংরিজি চ্যানেলটিতে একটু রাত হলেই খোলাখুলি পর্নোগ্রাফি দেখাতে শুরু করে। এমন বুদ্ধিভাষ্যহীন নগ্ন চিত্র কোনও ভদ্দরলোকের পক্ষে পাঁচ মিনিটের বেশি সহ্য করা সম্ভব নয়। সুতরাং টিভি-টা বন্ধই রাখি।

ঘরে একটা খালি ফ্রিজ আছে। আমার বরফ লাগে না, তাই এটাও অকেজো। কিন্তু কাজে লাগাবার একটা বুদ্ধি বেরিয়ে গেল। প্রয়োজনই তো উদ্ভাবনার জননী।

আজকাল পানীয় জল সম্পর্কে সকলেরই শুচিবাই হয়ে গেছে। অল্প বয়েসে গ্রামগঞ্জে, অচেনা দেশে যখন যে রকম জল পেয়েছি, তাতেই চুমুক দিয়েছি, কিছু হয়নি তো। এর মধ্যে কি সারা পৃথিবীর জল দূষিত হয়ে গেল? অনেকেরই হাতে-হাতে পয়সা দিয়ে কেনা বোতলের জল। কলকাতাতেও বোতলের জল এখন দ্রুত প্রসারমান ব্যাবসা। সব বোতলের জল কতটা জীবাণুমুক্ত আর নির্ভরযোগ্য তার ঠিক নেই, তবু বাড়ির জলের ওপর আর ভরসা নেই। নেমন্তন্ন বাড়িতেও এখন দেওয়া হয় বোতলের জল।

ফ্রান্সে কিংবা উত্তর আমেরিকায় কলের জল সম্পূর্ণ নির্ভয়ে পানের উপযুক্ত বলে ঘোষণা

করা হলেও সেখানেও দেখি অনেকে বোতলের জল কেনে। কলম্বিয়ায় কলের জল সম্পর্কে সেরকম কোনও ঘোষণা নেই। সুতরাং বিশ্বাস করা যায় না।

প্রথম রাতে এসেই দু-বোতল জল কিনেছিলাম হোটেল থেকে। বেশ চড়া দাম। এগারো-বারো দিন থাকতে হবে, প্রতিদিন দু-বোতল জল অন্তত লাগবেই, অনেক টাকা বেরিয়ে যাবে। আমাকে হাতখরচও দেয়নি।

বাথরুমের কলে গরম জল-ঠান্ডা জল পাওয়া যায়। গরম জলটা সকালের দিকে খুবই গরম থাকে, বেলা হলে তার তেজ কমে যায়। সকালবেলা গরম জলের কলটা খুলে রাখলে একটু পরে ধোঁয়া বেরুতে শুরু করে। এত গরম জলে কোনও বীজাণু থাকতে পারে না। একটা কাচের বোতলে সেই জল ভরে নিলাম। ফুটন্ত জলে কাচের বোতল ফেটে যেতে পারে, তাই কায়দা করতে হল, ঠান্ডা জলের কলটাও খুলে রেখে তার তলায় রইল আমার বোতলের পেছন দিকটা।

গরম জলে বোতলটা ভরে গেলে সেটা এমনই গরম হয়ে যায়, যে সেটা হাতে ধরা রাখা যায় না। তা হলে বোতলটা আগে থেকেই তোয়ালে দিয়ে মুড়ে নিতে হবে। সেই অবস্থায় বাথরুম থেকে বেরিয়ে বোতলটা ভরে দিতে হবে ডিপ ফ্রিজে। সেখানেও কাচের বোতল বেশিক্ষণ থাকলে ফেটে যাওয়ার সম্ভাবনা, তাই আধঘণ্টা পরে বার করে রাখতে হয় অন্য তাকে।

এইভাবে দু-তিন বোতল পানীয় জল তৈরি করা আমার প্রতিদিন সকালের প্রথম কাজ।

এ যেন গ্রামের মেয়েদের পুকুরঘাটে জল আনতে যাওয়ার মতন। আমিও বোতল ভরতে-ভরতে গান ধরি : তরী আমার হঠাৎ ভেসে যায়...। কিংবা, ঘাটে বসে আছি আনমনা, যেতেছে বহিয়া সুসময়...কিংবা, ক্ষণে ক্ষণে, মোর মনে-মনে, শুনি অতলজলের আহ্বান। মন রয়না, রয়না ঘরে, মন রয়না—

সন্ধের পর একটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে তার সঙ্গে ঠান্ডা জল মিশিয়ে, গেলাসটা হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম জানলার ধারে। সামনেই আলোয় সাজানো পাহাড়। ঠান্ডা করা ঘরে সব দরজা-জানলা বন্ধ, তাই বাইরের কোনও আওয়াজ শোনা যায় না। শব্দহীন নৈশ দৃশ্য।

কল্পনায় যেন দেখা যায়, সাড়ে চারশো বছর আগে একদিন ওই পাহাড়ের ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল দুই অশ্বারোহী। স্পেন থেকে অভিযানে বেরিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল তছনছ করতে-করতে তারা এসে পৌঁছেছিল এখানে। একটা ছবির মতো উপত্যকা, মাঝখান দিয়ে চলে গেছে একটা স্ফটিকস্বচ্ছ জল প্রবাহিত নদী, চারদিকের পাহাড়ে নিবিড় অরণ্য, উপত্যকায় স্থানীয় হলুদ ফসলের খেত, তাদের শান্তিপূর্ণ, নির্বিরোধী জীবন। সভ্যতায় তারা উন্নত, অস্ত্র ধরতেও জানে। কিন্তু তারা ঘোড়সওয়ার দেখেনি, জানে না আগ্নেয়াস্ত্রের কথা। সেই দুই অশ্বারোহী ফিরে গিয়ে ডেকে এনেছিল তাদের সৈন্যবাহিনী, এই মনোরম উপত্যকাটি জয় করার জন্য তারা দ্রুতগতির বাহন আর বারুদভরা অস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছে আদিবাসীদের শান্ত সভ্যতা।

আমাদের দেশে যখন মোগল শাসন চলছে, তখন ইওরোপের স্পেন, পোর্তুগাল, ব্রিটেনের মতো ছোট-ছোট দেশের দুঃসাহসী মানুষেরা সমুদ্র পেরিয়ে এদিকে এসে অস্ত্রের জোরে দখল করছে বিশাল-বিশাল ভূমি, চালিয়ে যাচ্ছে হত্যালীলা, সেসব আমরা খবরও রাখিনি।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ মনে হল, ঘরটা দুলছে।

মেঝেটাও দুলছে, ছাদও দুলছে। ভূমিকম্প শুরু হল নাকি?

দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। তা হলে তো ছোটাছুটি শুরু হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু অন্য কোনও ঘরের তো দরজা খুলল না। আমি একলা দৌড়ব নাকি? আমি ছাড়া আর কেউ টের পায়নি, তা কি হয়?

একটু যেন কমেছে মনে হল, ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সঙ্গে সঙ্গে খাটসুদ্ধু আমি যেন বোঁ করে ঘুরে গেলাম, ঘরের ছাদটাও একবার নীচে নেমে

আবার উঠে গেল ওপরে।

এখনও বাইরে কোনও গোলমাল নেই। আবার উঠে এসে দরজাটা খুললাম, লম্বা টানা প্যাসেজটা একেবারে শুনশান।

তা হলে ভূমিকম্প নয়, আমারই মাথা ঘুরছে।

এর আগে দু-একদিন স্নানের সময়ও মনে হয়েছিল একটু একটু দুলছে বাথরুমটা, জাহাজের মতন। তখন ভেবেছি, মনের ভুল।

এখন আর মনের ভুল নয়, সত্যিই খাট-বিছানা, দেওয়াল, আয়না, ছাদ সবই দুলে উঠছে মাঝে-মাঝে।

শুয়ে পড়ে ভাবলাম, এটা কি কোনও অসুখ? তা হলে তো অসুখটা বেশ ভালো। ঘরের সবকিছু যদি দোলে, তা হলে একঘেয়েমি কেটে যায়। সবকিছু কেন স্থায়ীভাবে এক জায়গায় থাকবে?

এরকম দুলুনি বেশ উপভোগ্য। চলুক না আরও অনেকক্ষণ।

এই কৌতুক অবশ্য বেশি চালানো যায় না। এটা গুরুতর অসুখ হয় যদি। ব্লাড প্রেশার খুব বেড়ে গেছে? হার্ট অ্যাটাকের আগে এরকম হয়?

এত দূর দেখে এসে একলা একলা মরে-ফরে যাব নাকি?

মৃত্যুচিন্তাটা মোটেই সুখকর লাগল না।

ডাক্তার ডাকব? আমার মেডিকাল ইনসিওরেন্স আছে। এত রাতে কি ডাক্তার পাওয়া যাবে?

হোটেলের লোকদের উত্যক্ত করে একজন ডাক্তার সংগ্রহ করা যেতে পারে। কিন্তু অত ঝামেলার পর ডাক্তার এসে যদি বলেন, আপনার কিছুই হয়নি? হার্ট ঠিক আছে, ব্লাড প্রেশার ঠিক আছে, ওরকম একটু-আধটু মাথা ঘোরা সকলেরই হতে পারে! আপনি শুধু-শুধু ভয় পেয়েছেন।

সেটা একটা লজ্জায় ব্যাপার হবে। আমি কি কখনও অকারণে মৃত্যুভয় পেয়েছি? বরং মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে কি অনেক খেলা খেলিনি? এখন আমার মনের জোর কমে যাচ্ছে?

দরজাটা বন্ধ রাখা কি ঠিক হল?

এরপর যদি উঠতেই না পারি? ডাক্তার ঢুকবে কী করে? দরজা ভেঙে! ও না, হোটেলের লোকদের কাছে আর একটা চাবি থাকে।

একটু-একটু বাথরুম পাচ্ছে। যাওয়া উচিত নয়। সত্যিকারের হার্ট অ্যাটাক হলে, এক পাও হাঁটা উচিত নয়। বুদ্ধদেব বসু বাথরুমের মধ্যে শেষ নিশ্বাস ফেলেছিলেন। অনেকেই তখন বলেছিল, উনি যদি ওখানে না গিয়ে তখুনি চিত হয়ে শুয়ে পড়তেন, তা হলে হয়ত বেঁচে যেতে পারতেন তখনকার মতন, চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া যেত।

সত্যিকারের হার্ট অ্যাটাক হয়েছে কি না তা বুঝব কী করে? আগে তো হয়নি, তাই জানি না কী তার উপসর্গ।

কোনও মানুষই দুবার মরে না, তাই কারুকেই জানিয়ে যেতে পারে না তার চরম মুহূর্তটির অনুভূতি। ভাস্কর বলেছিল, এটা কী হচ্ছে, এটা কী হচ্ছে।

ভাস্করের পাশে ছিল তার দুই বন্ধু, এখানে আমার পাশে কেউ নেই।

এখনও বেশ মাথা ঘুরছে। কোনওরকমে উঠে সর্বরোগহর দুটি অ্যাসপিরিন ট্যাবলেট খেলাম, তাতেও বিশেষ সুবিধে হল না।

যদি কালকেও এটা চলতে থাকে, আমি চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলি, তাহলে পুপ্‌লু চান্দ্রেয়ীকে খবর দিতে হবে। কাজ ফেলে ছুটে আসতে হবে ওদের। গৌতম বা আরও দু-একজন বন্ধুও আসতে পারে, ওদের কত ঝঞ্ঝাটে পড়তে হবে, সেটাও খুবই লজ্জার ব্যাপার।

তার চেয়ে একেবারে টেঁসে যাওয়াই ভালো।

তাতেও আমার ডেডবডি নিয়ে ওদের বিড়ম্বনা হবে খুবই, কিন্তু তখন আর আমার লজ্জা

পাওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।

ডেডবডি! এখন এই যে পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যে শরীর, তার নাম সুনীল। যে মুহূর্তে আমার শেষ নিশ্বাস পড়বে, তখন থেকেই এ নামের অবসান। তখন তার এই শরীরটাকে কেউ সুনীল বলবে না তখন এটা সুনীলের ডেডবডি। রবীন্দ্রনাথকে নিমতলা শ্মশাটঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়নি, নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর প্রাণহীন দেহ।

তা হলে প্রাণটাই মানুষের অস্তিত্ব, শরীর নয়।

কেউ কেউ প্রাণের বদলে বলে আত্মা। যা নাকি অজয়, অক্ষয়। আত্মার বিনাশ হয় না, সে এক শরীর ছেড়ে গিয়ে আবার নতুন দেহ ধারণ করে। শুধু যারা মহাযোগী ও মহাপুণ্যবান, তাঁদের আর পুনর্জন্ম হয় না, তাঁদের আত্মা মিশে যায় পরমাত্মায়।

এই চমৎকার রূপকথাটি বহু যুগ ধরে চলে আসছে বটে কিন্তু কিছু মানুষ এখনও তা সত্যি বলে বিশ্বাস করে কী করে?

পুনর্জন্মে বিশ্বাসও এক ধরনের মায়া, কিছুতেই ছেড়ে যেতে হচ্ছে করে না এ পৃথিবী। জরা ও মৃত্যু এসে একদিন শরীরটা ধ্বংস করে দেবেই, তখনও মনে হয় বিশ্বাস থাকে, আবার নতুন শরীর নিয়ে জন্ম হবে। বিপ্লবী এই বিশ্বাস নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে উঠেছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা যুগ্মভাবে আত্মহত্যা করায় সময় ভাবে, পরজন্মে আবার দেখা হবে।

আমি জানি, আমার মৃত্যুতেই সবকিছু শেষ। শরীর বাদ দিয়ে প্রাণ বা আত্মা বলে কিছু থাকে না। শেষ নিশ্বাসটা নিছকই শেষ নিশ্বাস, তার সঙ্গে ফুরুৎ করে অন্যকিছু বেরিয়ে যায় না।

কী করলাম এতদিন এই জীবনটা নিয়ে?

শুধু খেলাই তো খেলে গেলাম। এই লেখা-লেখা, সবই তো খেলা। প্রেম-ভালোবাসাও খেলা। এই খেলায় জয়ী হতে চাইনি তো সবসময়। কখনও-কখনও হেরে গিয়েও মজা লেগেছে। কিছু কিছু পরাজয় মনের তেজ বাড়িয়ে দেয়।

কাকে বলে জীবনের সার্থকতা?

অকালে ঝরে না যাওয়াই তো ফুল ও ফলের সার্থকতা। অসময়ে শুকিয়ে না যাওয়া নদীর সার্থকতা।

মাঝপথে থেমে না যাওয়াই যেমন একটা গানের সার্থকতা, সব খেলারও তো তাই-ই। তবু তো যখন-তখন খেলা ভেঙে যায়। আজ রাত্রির নির্জনতার সঙ্গে খেলাটা যদি হঠাৎ এখুনি শেষ হয় তো হোক, মন্দ কাটল না তো এই পৃথিবীতে।

হঠাৎ একটা গান মনে পড়ে গেল! কে বলে যাও, যাও তোমার যাওয়া তো নয় যাওয়া...কী তাল এটা, দাদরা নাকি?

দাদরা ছমাত্রা, কাহারবা আটমাত্রা।

পাশ ফিরে ছোট টেবিলটায় তাল দিতে লাগলাম, ধা ধিন না, তা ধিন না।

গানটার পরের কথাগুলো কী? মনে পড়ছে না।

কিন্তু ভুলে যাওয়া সব গানই, এক সময় ফিরে আসে। পথিক আমি পথেই বাসা, আমার যেমন যাওয়া তেমনি আসা—

হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া—

এটাও দাদরা না! এক সময় তবলা শিখেছিলাম। কতকাল টেবিলের ওপর তাল দিইনি।

মাথাটা একটু এপাশ থেকে ওপাশে নাড়াতেই আবার সবকিছু ঘুরতে থাকে। ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া। এই গানটা ভালো, কিন্তু কোন অমরার বিরহিনীরে...এ জায়গাটা দুর্বল, একটু ন্যাকা-ন্যাকা।

ধা ধিন না, তা ধিন না।

বুকেও একটু-একটু ব্যথা করছে নাকি? কিংবা মনের ভুল? ভুল হোক ঠিক হোক আর কিছু করার নেই। এখন কারুকে ডাকা সম্ভব নয়। ধা ধিন না, তা ধিন না, হে ক্ষণিকের অতিথি—

এ কী, হয়তো আমি একটু পরেই মরে যাব। এখন টেবিলে তবলার তাল ঠুকছি? অন্য কেউ দেখলে হাসবে না?

অন্য কেউ দেখার নেই। তা ছাড়া হাসির কী আছে? শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাল ঠিক রাখতে হবে। সুর ঠিক রাখতে হবে।

পাছে সুর ভুলি, সে-ই ভয় হয়, পাছে শূন্যতারই জয় হয়...

এ গানটায় সুর ঠিক আছে? 'ভয়' এই জায়গাটায় হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠতে হবে।

কে?

দরজায় কি কোনও শব্দ হচ্ছে? না-তো।

জানলায় কেউ টক টক করল?

আটতলার ওপর বাইরের দিকে জানলায় কে টক টক আওয়াজ করবে? তবে, হাওয়ার শব্দ?

ওখানে কে? কেউ না। হাওয়া। হাওয়া কি কেউ না?

সব আলো নিভে গেল হঠাৎ? লোডশেডিং? এ দেশেও হয়? লোডশেডিং নয়, পাওয়ার কাট। ধ্যাৎ কী হচ্ছে আমার। আলো তো ঠিকই আছে। মানুষ বেশিক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকতে পারে না। মাঝে-মাঝে চোখের পাতা তো পড়েই। সেই মুহূর্তের ভগ্নাংশেও তো সব অন্ধকার, কিন্তু অন্য সময় সেটা আমরা খেয়ালই করি না।

ঘুমও তো অন্ধকার।

কিন্তু আমার ঘুমও আসছে না।

চুপ করে চেয়ে আছে আলো। এ কথাটার কোনও মানে হয়? আলো কি চেয়ে থাকে, মা আমরা তাকাই আলোর দিকে।

তবু, এখন যেন মনে হচ্ছে, টেবিল ল্যাম্পটা ঠিক যেন তাকিয়ে আছে আমার দিকে। কিছু একটা বলতে চায়।

চওড়া রাইটিং টেবিলটার ওপর দু-তিনখানা বই, আমার কবিতা লেখার খাতা, এক গেলাস জল—এই জলের গেলাসটাও চেয়ে আছে, দেওয়ালে একটি মাত্র ছবি, সমুদ্রের দৃশ্য, সমুদ্র চেয়ে আছে, ফ্রিজটাও কিছু বলতে চায়, ওয়ার্ডরোবের দরজাটার একটা পাল্লা খোলা, তার ভেতরে কেউ, না কেউ না, খোলা পাল্লাটাই যেন তাকিয়ে থাকার মতন—

এ কী হচ্ছে আমার? এই কদিনে হোটেল ঘরটা চেনা হয়ে গেছে, কোন জিনিসটা কোথায় একেবারে মুখস্থ, এখন আমার মাথা ঘুরলেও, কোনও জিনিসই জায়গা বদলায়নি, এদিকে ছবিওয়ালা দেওয়ালের ঠিক উলটো দিকে ফ্রিজ, তবু, এরা সবাই যেন আজ জীবন্ত, টেবিল বাতির বালবটা, জলের গেলাস, ছবি, ফ্রিজ, এরা যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে আছে আমার দিকে, কিছু একটা বলতে চায়।

কিছু একটা বলতে চায়।

কিছু একটা বলতে।

কিছু একটা।

তারপরেই কীসের একটা শব্দে আমি কেঁপে উঠলাম। খুব জোর শব্দ। সেই শব্দটাও কাঁপছে কিংবা দুলছে।

প্রথমে চিনতেই পারলাম না শব্দটা।

তারপর বুঝতে পারলাম। টেলিফোন।

আমার ঘোর কেটে গেল। মনে হল, সবকিছুই তো স্বাভাবিক, ঠিকঠাক আছে।

টেলিফোনটা হঠাৎ যেন বেশি জোর ঝনঝন শব্দ করে বেজে উঠল

মাথার বালিশ থেকে সেটা খুব দূরে নয়, হাত বাড়িয়ে ধরা যায়। রিসিভারটা তোলার আগে মনে হল, এবার নিশ্চয়ই কামাল। নইলে, এত রাত্রে কে আর আমাকে মনে করবে?

কামাল নয়, অন্য একটা অচেনা কণ্ঠস্বর জিগ্যেস করল, আর ইউ সুনীল?

হ্যাঁ।

তোমার ঘরে কি ইলিয়ানা আছে?

মাথার মধ্যে যেন চড়াৎ করে একটা শব্দ হল। ইলিয়ানা? আমার ঘরে? সেই গাম্ভীর্য মাখা মধ্যবয়েসিনী সৌন্দর্য প্রতিমাকে আমি দেখেছি মাত্র কয়েকবার, প্রায় কোনও কথাই হয়নি, তিনি আসবেন আমার ঘরে? এত রাতে? ম্যাডেলিন শহরে তিনি এসেছেন কি না তাও তো জানি না। তাঁর নামটা ছাড়া কিছুই জানি না তাঁর সম্পর্কে।

কে জিগ্যেস করছে এরকম উদ্ভট প্রশ্ন?

ইলিয়ানা আমার ঘরে থাকবেন কেন?

সেই লোকটি আবার জিগ্যেস করল, তোমার সঙ্গে ইলিয়ানার আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না?

মোটেই না। সে প্রশ্নই ওঠে না।

তুমি ইলিয়ানাকে চেনো না? একটি কলেজের ছাত্রী, কবিতা লেখে?

আবার মাথাটা ঘুরে গেল। এ অন্য মেয়ের কথা বলছে। কলেজের ছাত্রী, তার মানে অনেক কম বয়েস।

এবার, দৃঢ় স্বরে বললাম, না, আমার সঙ্গে কোনও মেয়ের আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না।

তুমি শিওর। ইলিয়ানা তোমার ঘরে যায়নি?

অফ কোর্স আই অ্যাম শিওর!

লোকটি ফোন রেখে দিল।

কয়েকটা মুহূর্ত আমার বিমূঢ় অবস্থায় কাটল। একজন অচেনা লোক কেন জানতে চাইল এসব কথা?

আজ কেন, এর মধ্যে কোনওদিন, কোনও মেয়ের সঙ্গে আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয়নি। কোনও পুরুষেরও না। এ যাত্রায় এমনই এক ধরনের নিস্পৃহতা আমাকে পেয়ে বসেছিল যে কোনও পুরুষ বা নারীর সঙ্গেই হৃদ্যতা হল না।

আমার ঘরে একবারই শুধু একজোড়া তরুণ-তরুণী এসেছিল, তারা একটা লিট্‌ল ম্যাগাজিন চালায়, তারা আমার সাক্ষাৎকার নিতে চেয়েছিল। তারা দুজনেই পড়তে গিয়েছিল টেক্সাসে, ভালো ইংরিজি জানে, ঘোর আমেরিকা-বিদ্বেষী হয়ে ফিরে এসেছে। তাদের মতে, কলম্বিয়ার সব অশান্তির মূলে আমেরিকার সরকার।

আর তো কেউ আসেনি।

এই লোকটার টেলিফোনের মর্ম কী? সে ভুল নাম্বারে ফোন করেনি, আমার নাম ধরে ডেকেছে, ইংরিজিও বলতে পারে।

এটা মেয়ের দালালি হতে পারে কি? ভাষাটা তো সেরকম নয়, কথা বলছিল খানিকটা ধমকের সুরে। ইলিয়ানা নামটা বলে প্রথমে আমাকে খুব ঘাবড়ে দিয়েছিল।

কিংবা, এমন হতে পারে, এই লোকটি ইলিয়ানা নামের এক যুবতীর প্রেমিক। সেই ইলিয়ানা ওকে ফাঁকি দিয়ে সময় কাটাচ্ছে কোনও বিদেশি কবির সঙ্গে। তাই ও খোঁজ করছে প্রত্যেক ঘরে-ঘরে।

কিন্তু কারুর ঘরে যদি ইলিয়ানা গোপনে এসে থাকে, তা হলে সে কী তা স্বীকার করবে।

এই লোকটিও টেলিফোনে আমার অস্বীকার শুনে বিশ্বাস করবে কি? না দেখতে আসবে।

এক্ষুনি সে যদি এসে বলে, দরজা খোলো, ইলিয়ানা তোমার ঘরের ভেতরে আছে কিনা দেখব!

কল্পনায় দেখতে পেলাম সেই ল্যাটিন প্রেমিককে। এরা এমনিতে বেশ মজাখোর গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকে, কিন্তু প্রেমে ধাক্কা খেলে হিংস্র হয়ে ওঠে। হয়তো তার সঙ্গে আছে রিভলভার কিংবা লম্বা ছুরি।

সে যদি উত্তেজিত হয়ে ছুটে আসে তাহলে কি আমার দরজা খোলা উচিত?

এই আকস্মিক টুকরো ব্যাপারটার জন্য আমার অসুখটার কথা ভুলেই গেলাম। উঠে গিয়ে বসলাম চেয়ারে।

আসুক সে, আমি খুলে দেব দরজা।

একটু আগে মৃত্যুর জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। এটাও যদি একটা খেলা হয়, এ খেলায় দরজা বন্ধ রাখতে নেই।

প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, একটি উগ্রমূর্তি এসে দরজায় আঘাত করবে। তার জন্য অপেক্ষা।

কিছু কি বাকি রয়ে গেল? মনে পড়ে গেল, তারাশঙ্করের কবি উপন্যাসের একটা গান ঃ জীবন এত ছোট কেনে, ভালোবেসে মিটিল না সাধ...।

এবং আশ্চর্য! কত প্রতিশ্রুতিই তো রক্ষা করতে পারিনি, তবু মনে পড়ল একটি যুবকের কথা, তাকে চিঠি লিখব কথা দিয়েছিলাম, বোধহয় সে চিঠি আর লেখা হবে না। লস অ্যাঞ্জেলিসে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। তার নাম বাবুল, ভালো নাম রেজুল আহমেদ, সে পাগলের মতন ভালোবাসে আমাকে, সে-ই সর্বশেষ, তাই তার কথাই বেশি করে মনে পড়ছে।

কখন এসে দরজায় ধাক্কা দেবে এক ব্যর্থ প্রেমিক, কিংবা মৃত্যু?

॥ ১১ ॥

চোখ মেলার পর মনে হল, মহানিদ্রা নয়তো। এই তো আবার দিব্যি জেগে উঠেছি। জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভোরের আকাশ, পাহাড়ের বাড়িগুলির বাতি নিভে গেছে বলে বাড়িগুলিও দেখা যায় না, শুধুই মেঘ-প্রতিম পাহাড়।

মনট বেশ খুশি-খুশিই লাগল।

বিছানায় যাওয়া হয়নি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম চেয়ারে বসেই। রাত্তিরে তা হলে আর কেউ আসেনি!

শরীরটা একটু দুর্বল লাগছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতেই মাথাটা টনটন করে উঠল। তা হোক, এ নিশ্চয়ই হার্ট অ্যাটাক নয়। স্পন্ডেলাইটিস না স্পন্ডিলোসিস কী যেন বলে, তা হতে পারে, ঘাড়ে বেশ ব্যথা। ব্লাড প্রেশার খুব বাড়লেও নাকি এরকম ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। আমার তো এসব ঝামেলা ছিল না আগে! ফিরে গিয়েই ভূমেন গুহ-র কাছে পরামর্শ নিতে হবে। জানাতে হবে ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আগে তো পৌঁছই।

দেওয়াল ধরে-ধরে গেলাম বাথরুমে।

কাল রাতে আমি মরে যাইনি বটে, কিন্তু মৃত্যুভয় পেয়েছিলাম ঠিকই।

সেই ভয়ের কাছে কি নতজানু হয়েছি?

ইলিয়ানার নাম করে একটা লোক ওরকম অদ্ভুত টেলিফোন করল কেন? অন্য ইলিয়ানা।

কাল রাত্রে কিছুই খাইনি, মদ্যপানও যৎসামান্য, বেশ খিদে টের পাচ্ছি। খিদেই তো ভালো স্বাস্থ্যের লক্ষণ, গুরুতর অসুখ হলে খিদে চলে যায়।

পোশাক-টোশাক পরে চুল আঁচড়ে বেরিয়ে পড়লাম ঘর থেকে। মাথাটা একটু একটু ঘুরছে এখন। মনে-মনে বারবার বলতে লাগলাম, অজ্ঞান হলে চলবে না, অজ্ঞান হলে চলবে না। যত অখাদ্যই থাক, তবু কিছু খেতে হবে পেট ভরে, তা হলেই দুর্বলতা চলে যাবে।

বড় ডাইনিং হলটিতে ব্রেকফাস্ট খেতে এখনও অনেকে আসেনি। আমিও অন্যদিন দেরি করে আসি। বৃদ্ধ কবি হোজে 'ডি'কস্টা একা বসে আছেন একটা টেবিলে। সামনে বই খোলা। অন্য কয়েকটা টেবিলেও তো বসে আছেন একজন-একজন করে, কিন্তু ওই টেবিলটা যেন বড় বেশি ফাঁকা।

আমি সে টেবিলে বসলাম না। ফ্রাঁসোয়াজ-এর আর কোনও খবর নেই। সে ঠিকই করেছে, তার উচ্চাকাঙক্ষা আছে, সাংবাদিক হতে চায়, শুধু-শুধু এক ঈর্ষাকাতর বৃদ্ধের এঁকে দেওয়া ঘেড়াটোপের মধ্যে বন্দিনী থেকে সে কেন নষ্ট করবে তার জীবন? এসব দেশে বিবাহিত সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের একসঙ্গে থাকা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তবু বারবার মনে হচ্ছে, বেচারি সরল মেয়েটি যেন কোনও কঠিন আঘাত না পায়।

আজকে কর্নফ্লেক্স ও দুধ পাওয়া গেল। এ যেন চাঁদ পাওয়া। হোটেলের সামনের দোকান থেকে কয়েক প্যাকেটে বিস্কুট কিনে এনে রেখেছি। এই কদিন শুধু তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করছিলাম সকালে।

অন্য এক টেবিলের একজন আমার নাম ধরে ডাকল। অনেকের সঙ্গে পরিবৃত হয়ে সেখানে বসে আছে গ্যাব্রিয়েল। গত কয়েকদিন সে আমাকে দেখেই অন্যদিকে মুখ ফেরাচ্ছিল।

কাছে যেতেই গ্যাব্রিয়েল বলল, তোমার টিকিটের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে আজই সন্ধেবেলা চলে যেতে হবে, এ ছাড়া আর কোনও ফ্লাইটে বুকিং পাওয়া যায়নি। কাল সকালে তুমি বোগোটা থেকে ফ্লাইট নিয়ে পৌঁছে যাবে নিউ ইয়র্ক। তুমি সাড়ে ন'টার পর অফিস থেকে টিকিটটা নিয়ে যেও।

আজ সন্ধেবেলা ম্যাডেলিন ছেড়ে চলে যাব, আর কাল সকালে বোগোটো থেকে নিউ ইয়র্কের ফ্লাইট। তাহলে আমি রাত্তিরটা থাকব কোথায়?

গ্যাব্রিয়েল দু-কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, সে ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে। উৎসবের শেষ অনুষ্ঠানের জন্য আমরা সবাই এখন খুব ব্যস্ত থাকব।

যথাসময়ে টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রচুর ধন্যবাদ জানালাম গ্যাব্রিয়েলকে। সে ধন্যবাদে কিন্তু আন্তরিকতা ছিল না। মনে-মনে বলছিলাম, হাতখরচের টাকাটা দিলে না। সে টাকাটার কথা এখনও মনে পড়ল না।

মুখ ফুটে টাকা চাইতে পারি না বটে, কিন্তু গরিব বংশের ছেলে, টাকার কথা ভুলতেও পারি না।

টিকিট বদলের সুসংবাদের সঙ্গে জুড়ে রইল আর একটা উদ্বেগ।

ভেবেছিলাম, ম্যাডেলিন থেকে বোগোটা পৌঁছে দু-এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে ধরতে পারব পরের ফ্লাইট। এরা সে ব্যবস্থা করতে পারেনি। এক রাত কাটাতে হবে বোগোটায়। সেখানে কারুকে চিনি না। রাত্তিরবেলা খুঁজতে হবে কোনও হোটেল, সে শহরে যখন তখন অশান্তির কথা সবাই জানে।

আগের সকালেই কান্তি হোর একটা দুঃসংবাদ দিয়েছেন। অনেক দিন ধরে ঠিক হয়ে আছে।

তিনি এসে পড়বেন বোগোটায় কিংবা ম্যাডেলিনে, তাঁর সঙ্গে দেখা হবেই। কান্তি হোর দুঃখিতভাবে জানিয়েছেন, তিনি বোগোটায় হোটেল পর্যন্ত বুক করে রেখেছিলেন, কিন্তু হঠাৎ ঠিক হয়েছে, কলম্বিয়ার যে কোম্পানির সঙ্গে তাঁর কাজের সম্পর্ক, সেখানকার লোকেরাই সদলবলে যাচ্ছে কানাড়ায়, আলোচনার জন্য। অর্থাৎ, এখন ইচ্ছে থাকলেও শুধু বেড়াবার জন্যও তিনি এখানে আসতে পারছেন না।

কাজের ব্যাপার, সুতরাং বলার কিছু নেই।

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ইস, কেন কান্তিবাবুর কাছ থেকে তাঁর হোটেলের নামটা জেনে রাখিনি? তাঁর বুকিংটা আমি কাজে লাগাতে পারতাম। তিনি মন্ট্রিয়েল চলে যাবেন, এখন আর তাঁকে ফোনে পাওয়া যাবে না।

পুপ্লুকে ফোন করা যেতে পারে।

আগে দেখেছি, ওরা কম্পিউটারের ইন্টানেটের মাধ্যমে হোটেল বুক করে খুব সহজেই। বোগোটার মতন যে-কোনও শহরে কত হোটেল আছে সবই জানা যায় ইন্টারনেটে। কোনটায় কত রেট, কোনটায় ঘর খালি আছে। তারপর ক্রেডিট কার্ড দিয়েই সংরক্ষণ করা যায় পছন্দমতো ঘর। চিঠি লিখতে হল না, অগ্রিম টাকা পাঠাতে হল না, কম্পিউটার নামের আশ্চর্য প্রদীপের আলাদিন ঠিক করে দিতে পারে সবকিছু।

পুপ্লুকে ফোন করার কথা ভাবতেই মনে পড়ে গেল, এই রে, পুপ্লু আর চান্দ্রেয়ী যে বলেছিল, এ সপ্তাহান্তে ওরা কোথায় যেন তাঁবুতে থাকতে পারে। এখন তো ওদের পাওয়া যাবে না।

পুপ্লুর বাবা এর আগে একা একা অনেক দেশে গেছে, নিজেই হোটেল ঠিক করে নিয়েছে। এবার যে মাথা টলটল করছে বলে তার বাবা বেশ ভয় পেয়ে গেছে, তা সে জানবে কী করে!

যদি হৃদ্‌রোগ বা ব্লাড প্রেশার বৃদ্ধি হয়েই থাকে, তাহলে একেবারেই দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়। টেনশানে এসব রোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

মন, শান্ত হও, ফিরে এসো একটা স্থির বিন্দুতে।

সব বড় শহরেই অশান্তি, গণ্ডগোল, মারামারি হয়। তবুও তো হাজার-হাজার মানুষ নিত্য যাতায়াত করে, বাস-ট্রেন চলে, বিমানবন্দর সচল থাকে। আমি এ পর্যন্ত কখনও কোথাও ভয়ঙ্কর কোনও হিংস্রতার ব্যাপার দেখিনি। তা আগের দিন বা পরের দিন ঘটেছে। বোগোটাতেও কিছু হবে না।

এ হোটেলের কাউন্টারে টেলিফোন ও কয়েকদিন বিছানা-চায়ের বিল মেটাতে এসে জিগ্যেস করলাম, আপনাদের এই হোটেলের কি কোনও শাখা আছে বোগোটায়? এরকম তো থাকে।

ম্যানেজার ব্যক্তিটি বললেন, না, আমাদের সেরকম কোনও শাখা নেই।

তাহলে বোগোটার কয়েকটি মাঝারি হোটেলের নাম বলে দিতে পারেন?

তিনি কয়েকটি হোটেলের নাম লিখে দিলেন। এবং জানালেন বোগোটায় বিমানবন্দর থেকে শহরের মূল কেন্দ্রের দূরত্ব অন্তত সাত-আট মাইল, ট্যাক্সি ভাড়া নেবে অন্তত দশ ডলার।

ঘরে এসে সুটকেস্ গুছিয়ে নিলাম।

মনের মধ্যে একটা কথা এখনও খচখচ করছে, বোগোটায় গিয়ে ট্যাক্সি ভাড়া আর হোটেলের খরচ আমাকে দিতে হবে। এরা হাতখরচের টাকাটা শেষ পর্যন্ত দিল না, অন্য সবাই পেয়েছে।

মধ্যবিত্ত মানসিকতা আর কাকে বলে!

রাগ কমাবার জন্য ঠিক করলাম, দুপুরে এখানে আর খেতে যাব না। নিউ ইয়র্কে পৌঁছে কিংবা বোগোটা থেকে গৌতম দত্তকে খবর দিলে সে কতরকম খাওয়াবে!

এবং মনটাকে অন্যদিকে ফেরাবার জন্য খুঁজতে লাগলাম গান।

গানের একটা মজা এই, তা সমসাময়িকতা গ্রাহ্য করে না।

এরকম সময়ে যে-গান মনে পড়ল, তার সঙ্গে সমসাময়িক বাস্তবতার কোনও সম্পর্ক নেই।

প্রথমেই মনে পড়ল, পূর্ণ দাসের একটা গান, মাঝিগিরি জানি ভালো, ও-ও ভয় পেও না, ব্রজাঙ্গনা...।

গুনগুন করে গাইতে গাইতে তাল দিতে লাগলাম টেবিলে। এটা দাদরা, তাই না?

পরের গান, প্রেম জানে না রসিক কাঁলাচাঁদ...।

এটাও তো দাদরা তাল। ধা ধিন না, তা ধিন না।

আমার যেমন বেণী, তেমনি রবে চুল ভিজাব না। এটাও দাদরা নয়?

তা হলে কি যত বাউল গান ও পল্লীগীতি সবই দাদরা?

হে ক্ষণিকের অতিথি, এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া...। এ-ও তো ধা ধিন না, তা ধিন না।

গগনে গগনে ডাকে দেয়া, ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। এটাও দাদরা হতে বাধ্য।

তাহলে শুধু বাউল গান নয়, রবীন্দ্রসংগীত সমেত অধিকাংশ বাংলা গানই দাদরা তালে।

এটা কি আমার এই মুহূর্তের আবিষ্কার? আগে আর কেউ ভাবেনি?

ছেলেবেলায় এরকম মনে হত। মাঝে মাঝেই দারুণ পুলকিত বোধ করতাম, নিজেকে একজন আবিষ্কারক ভেবে। সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে যে আবিষ্কারক হওয়া যায় না, এ বোধ তখন জাগেনি।

কাহারবা নয় দাদরা বাজাও, উলটোপালটা মারছো চাঁটি। শশীকান্ত, তুমিই দেখছি। আসরটাকে করবে মাটি...।

এই আধুনিক গানটাতেই ঠিক ধরেছিল, বাংলা গানের ঝোঁক দাদরার দিকে।

ধ্যাৎ! আমাকে দাদরায় পেয়ে বসল নাকি? কতকাল আগে তবলা শিখেছিলাম, এখন কিছুই মনে নেই। চর্চা না থাকলে কি সহজে তাল বোঝা যায়? কাল রাত্তির থেকেই আমার এই দাদরা বাতিক হয়েছে। হয়তো সব কটাই ভুল ভাবছি।

তালের নাম না জানলেও তাল ঠিক রাখা যায়। যারা কবিতা আবৃত্তি করে, তারা কি সব ছন্দের নাম জানে?

ভালো কইরা বাজাও গো দোতারা, সুন্দরী কমলা নাচে। এর কী তাল জানি না।

গান করতে-করতেই স্নান সেরে নিলাম। বাথরুমটা এবারেও জাহাজের মতন দুলে উঠল বটে। এমন কিছু না। কাল রাত্তিরে সত্যিই বড্ড বাড়াবাড়ি হচ্ছিল।

শরীরটা এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

বিস্কুটের প্যাকেটগুলো শেষ করতে হবে। তাহলে আর দুপুরে ডাইনিং রুমে যাওয়ার দরকার নেই। কারুর কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে না।

বোগোটায় কি বিপদ হবে? নাঃ, এখন বিপদ-টিপদ বাদ থাক, ফিরে গিয়েই স্বাতীকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্রস্তুতি। সবক'টা মহাদেশ না ছুঁয়ে একেবারে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

আপাতত বোগোটার কথাও চিন্তা করে লাভ নেই। হে ক্ষণিকের অতিথি—

হে নিরুপমা, হে নিরুপমা...

বিদায় ম্যাডেলিন!

গানের গুনগুনোনি অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয়।

এক সময় হঠাৎ খেয়াল হয়ে গেল, সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আমাকে তো এখনি

বিমানবন্দরে যাওয়ার জন্য ট্যাক্সি ধরতে হবে।

সুটকেস-ফুটকেস নিয়ে তড়িঘড়ি নেমে গেলাম নীচে। লিফট চালিকা মহিলাটিকে বারবার বললাম, গ্রাসিয়াস, গ্রাসিয়াস। সঞ্জীবচন্দ্রের ভাষায় এঁর ওষ্ঠ ভারী প্রসন্নতাব্যঞ্জক। একদিন ইনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইছিলেন। ভাষার অসুবিধের জন্য কিছু বোঝাতে পারিনি। এঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

নীচের কাউন্টারের কাছে উৎসব কর্তৃপক্ষের একজন প্রতিনিধি দাঁড়িয়ে বারবার ঘড়ি দেখছে। সে বলল, তোমার হাতে বেশি সময় নেই। এয়ারপোর্ট যেতে এক ঘণ্টার বেশি লাগবে। যে-কোনও ট্যাক্সি নেওয়া তোমার পক্ষে নিরাপদ নয়, তাই আমরা তোমার জন্য বিশেষ ট্যাক্সি ঠিক করে রেখেছি।

আমার জন্য যে এটুকু চিন্তা করেছে, সে জন্য সত্যিই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। শুধু তাই নয়, বিমানবন্দরে পৌঁছে ট্যাক্সি চালক আমার কাছ থেকে ভাড়া নিতে চাইল না, সে সারা দিনের জন্য উৎসব-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে চুক্তিপদ্ধ। এ কথাটা না জানিয়ে সে অনায়াসেই ভাড়া নিয়ে নিতে পারত আমার কাছ থেকে। এমনকী কিছু বকশিশ দিতে গেলেও সে বলল, না, না, দরকার নেই।

আসবার পথেও পুরো পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে। তা হলে সত্যিই বিমানবন্দর থেকে শহরে যাওয়া-আসার এই একটিই রাস্তা। ড্রাইভারটি ভাঙা ইংরিজিতে বারবার বলছিল, তুমি চিন্তা কোরো না, তোমাকে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেব।

এরকম ভদ্র ট্যাক্সি ড্রাইভার কখনও দেখিনি।

বোগোটার ড্রাইভারটিও একইরকম ভদ্র। একে আরও বেশি নম্বর দেওয়া উচিত, কারণ, এ তো কর্তৃপক্ষের নিয়োজিত নয়, আর দশজনের একজন।

মালপত্র নিয়ে বাইরে এসে প্রথম এই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে পেয়ে, কয়েকটি হোটেলের নাম লেখা কাজটি দেখিয়ে বললাম, এর মধ্যে কোনও একটি ভদ্রগোছের হোটেলে নিয়ে যেতে পারো?

সে একটি হোটেলের নামের পাশে আঙুল রাখল।

এর ভাড়া কত?

সত্তর ডলার।

ঠিকই আছে। এই টাকাটাও গচ্চা বলে ধরে না নেওয়া যেতে পারে।

লন্ডন থেকে নিউ ইয়র্কে আসার ফ্লাইটে আমার মানিব্যাগ হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা উদ্ধার করে দিয়েছে কলম্বিয়ারই এক রমণী ইলিয়ানা। সুতরাং তার কিছু টাকা এখানে খরচ করলে সেটাই হবে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো। এ দেশকে পরিশোধ।

ড্রাইভারকে জিগ্যেস করলাম, কত ট্যাক্সি ভাড়া পড়বে?

সে বলল, নয় থেকে দশ ডলার।

অর্থাৎ এ-ও আমাকে ঠকাবার মতলবে নেই। এরকমই তো ভাড়া হওয়ার কথা।

এখন রাত সাড়ে ন'টা।

শনিবার বলেই হয়তো, রাস্তা বেশ ফাঁকা। চওড়া রাস্তা, আপাতত বেশ সুদৃশ্য শহর। দূরে ছোট্ট পাহাড়ের রেখা। পথে লোক বিশেষ নেই, কিন্তু গাড়ি আছে।

আমার মনটা যে শুধু হালকা হয়ে আছে তাই-ই নয়, মাথা ঘোরাটাও কম। মাঝে-মাঝে শুধু যেন চিড়িক-চিড়িক করছে। মাথাটা পেছনে ঘোরাতে গেলে ঘুরে যাচ্ছে সমস্ত প্রকৃতি।

তা-ও মনে হচ্ছে, এ যাত্রা বেঁচেই গেলাম। একবার নিউ ইয়র্ক পৌঁছতে পারলে আর কোনও চিন্তা নেই।

বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ট্যাক্সিটা যখন বড় রাস্তা ছেড়ে উলটোদিকের একটা ছোট রাস্তায় বেঁকতে যাবে, সেই সময় শুরু হয়ে গেল আকস্মিক গণ্ডগোল। উলটোদিক থেকে ছুটে আসছে প্রবল

বেগে একটা গাড়ি, তার পেছনে-পেছনে একটা পুলিশের গাড়ির শেয়াল ডাকের মতন আওয়াজ।

এই সময় রাস্তা পার হওয়া বিপজ্জনক। সব গাড়িকে থেমে থাকতে হয়।

প্রথমে আমাদের সামনে দিয়ে ছুটে গেল একটা ভ্যান। তার পেছন দিকে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারজন নারী-পুরুষ, তাদের হাতে অটোমেটিক রাইফেলের মতন বিদ্‌ঘুটে অস্ত্র। ওদের মধ্যে একজন,...ওদের মধ্যে...অস্ত্র হাতে একজন রমণী কি ইলিয়ানা? সেরকমই দাঁড়াবার ভঙ্গি, সেই রূপ। সত্যি, না আমার চোখের ভুল?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পেরিয়ে গেলে গাড়িটা, তারপরই পেছনের পুলিশের গাড়ি থেকে শুরু হল গুলি চালনা।

ড্রাইভারটি আমাকে বলল, শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।

পুলিশ ও অন্য পক্ষের গোলাগুলি চলতে লাগল খানিকটা দূরে। তা বুঝতে পেরেই ড্রাইভারটি খুব জোরে ট্যাক্সি চালিয়ে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট হোটেলের দরজায়।

হোটেলটির সদর বন্ধ করে দেওয়া ছিল, আমাদের ডাকাডাকি শুনে খুলে দিল।

হোটেলের সমস্ত কর্মচারী লবিতে দাঁড়িয়ে আছে উদ্বেগ ঠোঁটে নিয়ে, কেউ কোনও কথা বলছে না। আমার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকি পাড় দিচ্ছে, এত কাছ থেকে গুলিগোলার ব্যাপার আর কখনও দেখিনি।

ম্যাডেলিনেও দেখেছি, এখানকার সরকার ও জঙ্গিদের সম্পর্ক নিয়ে কথা উঠলেই উদ্যোক্তারা বা স্থানীয় কবিরা সবাই চুপ করে যায়। কে যে কোন জঙ্গি দলের সমর্থক তা প্রকাশ্যে জানাতে চায় না। সরকারবিরোধী কথা বললেও হয়তো বিপদ আছে।

খানিক বাদে সব শব্দ থেমে গেলে আমার ঘরের বন্দোবস্ত হল। এ হোটেলে এখন বোধহয় আর খুব কমই লোক আছে। বিশেষ সাড়া-শব্দ নেই। একজন পোর্টার আমার মালপত্র পৌঁছে দিয়ে গেল তিনতলার একটি প্রশস্ত ঘরে। ঘর না বলে সেটাকে সুইট বলা উচিত, তা হোক, আমার সাধ্যমতন ভাড়া আগেই নিয়ে নিয়েছে।

পোর্টার যুবকটিকে বললাম, আমার কিছু খাদ্য চাই। দুপুরে কিছু খাইনি, খিদে পেয়েছে।

সে আমাকে হাত তুলে বরাভয় দেখাল। অর্থাৎ সে ইংরিজি জানে না। ডেকে আনছে আর একজনকে।

এই হোটেলে একজনই ইংরিজি জানে, সে মেয়েটি চলে এল অবিলম্বে।

আমি তাকে আমার খাদ্য-পানীয়ের প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে দিয়ে বললাম, আমাকে কাল সকালেই চলে যেতে হবে, সাড়ে সাতটার মধ্যে চা কিংবা কফি এনে আমাকে জাগিয়ে দিতে পারবে তো!

মেয়েটি বলল, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। ঠিক সাড়ে সাতটায় চা পাবে।

সে চলে যাওয়ার জন্য উদ্যত হলে জিগ্যেস করলাম, কিছু যদি মনে না করো, তা হলে বলো তো, একটু আগে লড়াই হল পুলিশের সঙ্গে কাদের?

মেয়েটি বলল, একটা ব্যাঙ্ক লুটের কথা শুনেছি। তারপর একটি বিপ্লবী দলের সঙ্গে এইমাত্র সংঘর্ষ হয়েছে পুলিশের। মেশিন গান ফিট করা পুলিশের এই সব গাড়িগুলো উপহার হিসেবে এসেছে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে। সাংঘাতিক সব গাড়ি। বিপ্লবীদের মধ্যে একজন মহিলা আর একটি কিশোর মারা গেছে শুনলাম।

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর আমি পাথরের মূর্তির মতন বসে রইলাম একটুক্ষণ।

একজন মহিলা মারা গেছেন, তিনি কি ইলিয়ানা? যাঃ, হতেই পারে না। আমি ভুল দেখেছি। ওই বয়েসের কোনও নারী কি বিপ্লবে যোগ দেয়? দিলেও হয়তো তাত্ত্বিক হতে পারে। অন্য বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে পারে, কিন্তু অস্ত্র নিজের হাতে নেবে কি!

নিশ্চয়ই আমি ভুল দেখেছি। চলন্ত গাড়িতে, কয়েক মুহূর্ত, ভুল তো হতেই পারে। ইলিয়ানা নয়, অন্য কেউ।

অবশ্য, এখানকার বিপ্লব কিংবা নাশকতা কিংবা সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আমার জ্ঞান কতটুকু? মধ্যবয়স্কা মহিলা কিংবা সেই বয়েসের পুরুষরা অস্ত্র ধরে কি না, সে সম্পর্কেও আমার ধারণা নেই।

তবু, ইলিয়ানা আমার সামনেই এসে প্রাণ দেবে, অথচ তার সঙ্গে একটাও কথা বলার সুযোগ হবে না, এটা যেন বড় বেশি বাড়াবাড়ি।

এতসব যুক্তির তৌল করার পরেও মনটা ভারী হয়ে আসে।

চোখ বুজে আমি ধ্যান করতে বসি। কোনও আরাধ্য দেবতা নেই, ধর্ম নেই। ঈশ্বর নেই। তবু ধ্যান, তীব্র একাগ্রতা।

নিঃশব্দে বলতে থাকি, ইলিয়ানা, তুমি আজ এখানে ছিলে না, তুমি মরতে পারো না, আমার তীব্র ইচ্ছেশক্তি দিয়ে তোমাকে বাঁচিয়ে রাখবই। তুমি বেঁচে থাকো, তুমি সহসা চলে গেলে পৃথিবী অসুন্দর হয়ে যাবে। তোমাকে বাঁচতেই হবে। আমার আয়ুর কিছুটা দিয়ে দিচ্ছি তোমাকে, তুমি আমার যা উপকার করেছিলে, তার তুলনায় এই প্রতিদান তো সামান্য। তুমি বেঁচে থাকো, ইলিয়ানা, আমি একজন রূপের পূজারি, কোনওদিন হয়তো তোমাকে আর দেখব না। তবু তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে চাই!

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে বেঁচে আছে।
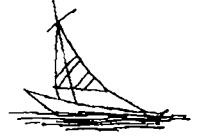
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী পারের বঙ্গ সংস্কৃতি

প্রথমবার উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবের সময় আমি এদেশেই ছিলাম। আয়ওয়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে। উদ্যোক্তাদের কেউ একজন খবর পেয়ে আমাকে ও স্বাতীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কলকাতা থেকে আর কোনও লেখককে আনানো হয়নি, শিল্পীদের মধ্যেও ক'জন এসেছিলেন মনে নেই, পরিচিতদের মধ্যে পূর্ণদাস বাউলকে দেখেছিলাম।

সেবারে অনষ্ঠান হয়েছিল নিউইয়র্কের এক গির্জা সংলগ্ন হলে। দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা হাজার খানেকের বেশি নয়, কাচ্চাবাচ্চা সমেত। বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খলা ও হইহল্লা ছিল, প্রথমে মনে হয়েছিল ভাগলপুরে কিংবা হায়দরাবাদে প্রবাসী বঙ্গ সম্মেলন যেমন হয় অনেকটা সেই রকম। তবে সুদূর সাগর পারে, এই যা। অবশ্য সুদূর সাগর পারে বলেই বাংলা গান ও বাংলা আলোচনা শুনলে কিছুটা রোমাঞ্চ হয়ই।

পরবর্তী পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন শহরে আমন্ত্রিত হয়েছি। দু-একবার আমন্ত্রণ পেয়েও আসতে পারিনি অন্য কাজের ব্যস্ততায়। ক্রমশ এই সম্মেলন এত বৃহৎ আকার ধারণ করেছে যে আমি পূর্ব অভিমত পালটাতে বাধ্য হয়েছি। প্রতিবারই অন্তত পাঁচ-ছ'হাজার বাঙালি নারী-পুরুষ তো সমবেত হনই। কোনও এক বছরে নাকি আট-দশ হাজারে পৌঁছেছিল। ভারতে কিংবা বাংলাদেশেও একসঙ্গে এত বাঙালি কোনও অনুষ্ঠানে আসে না, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে এত মানুষকে এক জায়গায় টেনে আনা সম্ভবই নয়। আমেরিকার বাঙালিরা তা পেরেছেন। আমেরিকার সব কিছুই বড়-বড়, সেই দৃষ্টান্তে বাঙালিরাও তাঁদের সম্মেলন এত বড় করে ফেলেছেন। এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডের সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনা করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়।

একবারের উৎসবের কথা বিশেষভাবে মনে আছে। ১৯৯২ সালে টরেন্টো শহরে। যথারীতি মস্ত বড় হোটেলে অবস্থান, অনুষ্ঠান শুরুর আগের মাঝরাত পেরিয়ে হঠাৎ বেজে উঠল তীব্র ঘণ্টাধ্বনি। ফায়ার অ্যালার্ম। এ দেশের নিয়ম এই আগুনের সঙ্কেত পেলেই হাতে কিছু না নিয়ে, এক বস্ত্রে, লিফটের বদলে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নেমে যেতে হবে। সেবারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সস্ত্রীক আমি ছিলাম পাশাপাশি ঘরে। অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে পরে শুতে গেছি। সতেরো না আঠেরো তলা, গেঞ্জি পরা অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে দুদ্দাড় করে নামতে শুরু করেছি।

হাতে কিছু নেওয়ার কথা নয়, কিন্তু মেয়েরা বোধহয় গয়নার বাক্সের মায়া ছাড়তে পারে না, আর ছেলেরা সিগারেট-দেশলাই। বাইরে টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল, তাতে ভিজতে-ভিজতে সৌমিত্র আর আমি সিগারেট টানতে লাগলাম। সৌভাগ্যবশত এক জায়গায় শর্ট সার্কিট হয়ে কিছু আগুনের ফুলকি দেখা দিলেও শেষ পর্যন্ত বড় রকমের কোনও অগ্নিকাণ্ড হয়নি। এবং পরবর্তী তিনদিন শ্রী কান্তি হোর-এর সুযোগ্য ও সুভদ্র পরিচালনায় খুব সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠানগুলি স্মরণীয় হয়েছিল।

দেশ থেকে অনেকে বইপত্র, শাড়ি, গহনা ও অন্যান্য পসরা এনে সাজিয়ে বসেন, ভালোই বিক্রি হয় শুনেছি। একবার আমার চেনা এক মহিলা এনেছিলেন অসাধারণ সব একসক্লুসিভ শাড়ি, প্রত্যেকটাই আ[illegible] দিনেই [illegible] তাঁরা স্টলটির

সামনে দাঁড়িয়ে থেকে অনুযোগ জানাতে লাগলেন, এত কম এনেছেন কেন? আমার চেনা মহিলাটি বিব্রতভাবে বলতে লাগলেন, আগামী বছর আরও বেশি আনব, এবারে ঠিক বুঝতে পারিনি। সেই মহিলা নিজেও পড়ে আছেন নীল রঙের এক স্বর্গীয় শাড়ি। হতাশ ক্রেতাদের মধ্যে এক নারী ফস করে বললেন, আপনি যেটা পড়ে আছেন, ওটাই দিন না। দেশে গিয়ে আবার কিনে নেবেন। সে মহিলা অবাক হয়ে বললেন, আমি এটা পরে আছি। এটা দেব কী করে? দু-তিনজন নারী এগোতে এগোতে বসলেন। হ্যাঁ, দিন না, দিন না...। তারপর কয়েকজন নারী কর্তৃক এক মহিলার বস্ত্রহরণ হয়েছিল কি না। তা আমি ঠিক জানি না।

নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও এইসব উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ আড্ডা। এক একজনের সঙ্গে হঠাৎ দেখা। পুরোনো বন্ধু, হালকা ধরনের পূর্ব প্রেমিক। মাথার চুল সম্পূর্ণ লাল, এক অচেনা যুবতী আমাকে একবার বলেছিল, সে অনেক দূর থেকে এসেছে শুধু আমাকে তার জীবনের একটি গোপন কথা শোনাবে বলে। অন্যান্য বন্ধুদের কৌতূহলী উঁকিঝুঁকিতে সে গোপন কথা আর আমার শোনা হয়নি। এই রকমই এক উৎসবে নীললোহিতের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল তার সুনীলদার। সেই বাউণ্ডুলে ছেলেটি এখন কোথায় আছে জানি না।

প্রথম প্রথম বেশ কয়েক বছর দেখেছি, বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসবে সাহিত্যের ওপর ঝোঁক ছিল বেশি। মূল মঞ্চে বসতেন লেখক লেখিকারা, শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর জমে উঠত। এখন যেন সাহিত্যকে ক্রমশই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে পেছনের সারিতে, গান-বাজনা, নাটক ইত্যাদির ওপর ঝোঁক বেশি। বাংলা সাহিত্য বাঙালির গর্ব। সেই সাহিত্যকে অবহেলা করে অন্য যা কিছু হয়, তাই-ই কি সংস্কৃতি? বাংলাদেশিরা আলাদাভাবে যেসব উৎসব করে, তাতে কিন্তু সাহিত্যই প্রাধান্য পায়। এখনও।

আমার ভ্রমণ মর্ত্যধামে

॥ এক ॥

রোমের রাস্তায় একটি বাঙালির ছেলে ঘুরছে। হয়তো তার খুব একা-একা লাগছে। কারুর সঙ্গে বসে দু-দণ্ড প্রাণের কথা বললে প্রাণটা খোলামেলা লাগত। বিখ্যাত রোমের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে হাঁটছে দুজন ভারতীয়। বাঙালির ছেলেটি ওদের দেখে উৎসাহিত হল। কিন্তু তখুনি ছুটে গিয়ে কথা বলতে পারল না। আগে দেখা যাক, ওরা কোথাকার লোক। বাঙালি ছেলেটি তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ওদের কাছাকাছি গিয়ে পিছন-পিছন হাঁটতে লাগল। মুখের ভাব এমন, যেন সে দুজনকে দেখতেই পায়নি। আসলে ছেলেটি কান খাড়া করে শুনছে, ওরা কী ভাষায় কথা বলছে। যদি বাংলায় হয়, তা হলেই একমাত্র সান্ত্বনা। তৎক্ষণাৎ তবে ডেকে বলা যায়, কী দাদা আপনারা কবে এলেন? এখন কোথায় চললেন? চলুন না একসঙ্গে যাওয়া যাক।

কিন্তু, ছেলেটি অনেক দূর অনসুরণ করার পর তবে বুঝতে পারল—ওরা কী যেন এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। হিন্দিও নয়, মারাঠি বা গুজরাতি, ছেলেটি যার এক বর্ণও জানে না। নিরাশ হয়ে গেল ছেলেটি। তা হলে আর ডেকে লাভ কী, একটাও তো প্রাণের কথা বলা যাবে না। সেই কথা বলতে হবে মুখে ফেনা-ওঠা ইংরেজিতে। ছেলেটি এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল—যাতে ওদের সঙ্গে চোখাচোখি না হয়। ওরা দুজনেও বোধ হয় ছেলেটিকে দেখেছিল, দেখে চিনেছিল বোধ হয় বাঙালি বলে, বাঙালিদের নাকি দেখলেই চেনা যায়, এরাও ডেকে কথা বলেনি। একই দেশের তিনজন মানুষ, দূর বিদেশে এসে কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলল না।

গ্লাসগোতে থাকে শীলা ভট্টাচার্যি। প্রত্যেকদিন সকালে চিঠির বাক্সের কাছে দৌড়ে যায়, যদি চিঠি বা 'দেশ' আসে তবু যা হোক খানিকক্ষণ বাংলা ভাষার জগতে থাকা যাবে নইলে যে শুধু নিজের সঙ্গেই কথা বলতে হয়। ইংরেজি আর ইংরেজি আর ইংরেজি, আর পারা যায় না। ল্যান্ডলেডি খুব ভালো, পাড়া প্রতিবেশী খুব ভালো, কলেজে চমৎকার পরিবেশ। কোথাও কোনও অসুবিধে নেই, একমাত্র শুধু প্রাণ খুলে কথা বলতে না পারার কষ্ট। একদিন ল্যান্ডলেডির মেয়ে লিনডা এসে বলল, শীলা, আজ সন্ধেবেলা আমার সঙ্গে একটা পার্টিতে যাবে।

—না ভাই, আজ আমার সন্ধেবেলা অনেক কাজ।

—আহা, চলো না, প্রত্যেক দিনই তো ঘরে বসে-বসে পড়াশোনা করছ। তা বলে শুক্কুরবারটা নষ্ট করবে?

—না ভাই, আজ বাদ দাও। গত সপ্তাহে আমার সর্দি হয়ে তিনদিন নষ্ট হল। আজ একটু মেকআপ করে নিতে হবে।

আসলে শীলার যে ইচ্ছা নেই, তা তো নয়। কিন্তু একে সারা সপ্তাহ একটাও চিঠি আসেনি বলে মন খারাপ, তার ওপর পার্টিতে গেলে শুধু যে ইংরেজি কথাবার্তা তা তো নয়। বিলিতি কায়দায় হাস[illegible] লিনডা তবু জোর

করে বলল, চলো-চলো, আজ বনির ওখানে একটি নতুন ইন্ডিয়ান ছাত্রও আসবে। ইউ ওনট ফিল লোনলি।

নতুন ভারতীয় ছেলে? যদি বাঙালি হয়। শীলা ভট্টাচার্য তখনি রাজি হয়ে গেল। শীতকালে যদি বৃষ্টি হয়, তখুনি রাজ্যের মন খারাপ হয়। তখন ভালো লাগে না বিদেশে একা থাকতে। যে-কোনও কথা, আজবাজে কথা, কিন্তু বাংলায় বলার জন্য একজন সঙ্গী পেতে ইচ্ছে করে।

কলেজের ছেলেমেয়েদের পার্টি, খুব হইহল্লা চলছে। তিনটে ঘর জুড়ে হুল্লোড়। নাচ শুরু হয়ে গিয়েছে, সেই সঙ্গে পানীয়। প্রথম ঘরে কোনও ভারতীয় নেই। দ্বিতীয় ঘরের কোণের দিকে একজন ভারতীয় পানীয় নিয়ে চুপ করে বসে আসে। ছেলেটিও যে শীলাকে দেখে উৎসাহে দপ করে উঠল। কাছে এগিয়ে এসে আলাপ হল। শীলা তুমি একে চেনো? লেট মি ইনট্রোডুশ মিস্ ভট্...ভট্টাচারিয়া, মিঃ আয়েংগ্যার। আয়েংগ্যার? ভট্টাচার্যি? সঙ্গে-সঙ্গে দুজনের উৎসাহ নিভে গেল। ভারতীয় হয়েও ওরা রইল বিদেশি। শুকনো নমস্কার সেরে দুজনে দুদিকে চলে গেল। যদি ইংরেজিতেই কথা বলতে হতে হয়, তবে খাঁটি ইংরেজিতে বলা ভালো।

সানফ্রান্সিস্কোর ভারতীয় দূতাবাসে এসেছে একটি ভারতীয় ছেলে। ওর পাসপোর্টে মেক্সিকো যাওয়ার এনডোর্সমেন্ট করিয়ে নিতে। ধরা যাক ছেলেটির নাম অমুক মুখোপাধ্যায়। অফিস প্রায় খালি, ভারপ্রাপ্ত ভারতীয় কর্মচারীটি আমেরিকান মেয়ে টাইপিস্টদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন। আমাদের অমুক মুখোপাধ্যায় সানফ্রান্সিস্কোতে নতুন এসেছে কারুকে চেনে না। ভেবেছিল নিজের দূতাবাসে এসে চেনা পরিবেশ পাবে, নিজের কাজ ছাড়াও কিছুক্ষণ গল্পগুজব করতে পারবে। কর্মচারীটি মুখে কেজো গম্ভীর ভঙ্গি ফুটিয়ে জিগ্যেস করল, ইয়েস, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর য়ু?

ছেলেটি বিনীতভাবে নিজের দরকারের কথা নিবেদন করল।

—দেখি পাসপোর্ট? বলার স্বর এমন যেন ছেলেটি ওঁর ভৃত্য কিংবা চাকরির জন্য ইনটারভিউ দিতে এসেছে।

পাসপোর্ট হাতে নিয়ে উলটে-পালটে দেখতে-দেখতে লোকটি বললেন ইংরেজিতেই, পাশের মেয়েটিকে শুনিয়ে, কী নাম? মু-খো-পা-ড্যি-য়া-য়? জি! প্রিটি লং নেম।

আমাদের চেনা ছেলেটি এবার রেগে গেল। বক্র হেসে বলল, আর তোমার নামটা কী শুনি? নিজলিঙ্গাপ্পা না ভেঙ্গটেশ্বরম? বাঁদর কোথাকার!

আমেরিকান মেয়েটি অবাক! বিদেশে দেখা দুজন ভারতীয়ের এই প্রথম সম্ভাষণ!

বিদেশেও ভারতীয় মাত্রই ভারতীয়ের স্বদেশবাসী নয়। দুজন ভারতীয়ও পরস্পর নিজেদের কাছে বিদেশি। ভারতীয় হলেই চলবে না। তোমার আর আমার কি এক প্রদেশ? ভাষা কি এক? নইলে যাও, কোনও বন্ধুত্ব নেই। পাশাপাশি হয়তো থাকে এক বাঙালি আর এক মারাঠি। দুজনেই বেশ ভদ্র ও মার্জিত। তবু পুরো বন্ধুত্ব হয় না, প্রাণ খুলে কথা হয় না। দুজনের সমস্যা হয়তো দুধরনের। বাঙালি ছেলেটি ভাবছে ইস্, কতদিন টাট্‌কা মাছ খাইনি! এ এন্ড পি-তে টাটকা মাছ এসেছে কি না একবার খোঁজ করতে গেলে হয় না? মারাঠি ছেলেটির মাছের নামেই বমি আসে। তার দুঃখ, কতদিন তেঁতুলের আচার খায়নি! নিউ ইয়র্ক থেকে কয়েকখানা পাঁপড় এবার লিখে আনতেই হবে।

প্যারিসে কোনও বাঙালি শিল্পীর বাড়িতে হয়তো চার-পাঁচজন বাঙালি বসে রবিবার সকালবেলা আড্ডা দিচ্ছে। ওরা প্ল্যান করছে আগামী রবিবার ওরা ভার্সাইয়ে গিয়ে সারাদিন থাকবে। এমন সময় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার যোগীন্দার সিং এসে হাজির হতেই ওরা চুপ করে গেল। এখন আর ও আলোচনা থাক, অন্য কথা হোক। কে কতটা ফরাসি শিখেছে তাই নিয়ে হাসিঠাট্টা চলুক বরং। কারণ, এখন ওর সামনে রবিবারের পিকনিকের প্ল্যান করলে, ওকেও যেতে বলতে হয়। আর, যোগীন্দার গেলে কি প্রাণ খুলে বাংলা বলা যাবে! ওর সঙ্গে কথা বলতে হবেই ইংরেজিতে, ও

যে একটা বর্ণ বাংলা বোঝে না। তা ছাড়া শুনতে হবে ওর হিন্দি!

আবার এক প্রদেশের বলেই যে সব সময় বন্ধু হবে তার কোনও মানে নেই। বার্লিনে রঞ্জনা বোসের সঙ্গে দেখা হল শান্তা রায়চৌধুরীর। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন শান্তা! রঞ্জনাকে বললেন, আপনি কোন পাড়ায় থাকেন বলুন! আমিও সেখানে উঠে যাব। উঃ, বাংলা কথা না বলে হাঁপ ধরে যাচ্ছে! খানিকটা অপ্রস্তুত হয়ে রঞ্জনা বললেন ইংরেজিতে, আমি বাঙালি হলেও বেশিরভাগ থেকেছি বাংলাদেশের বাইরে, পড়েছি সাহেবি স্কুলে, বাবা-মা আমাকে বাংলা শেখায়নি। কী লজ্জা যে হয় সেজন্য! রঞ্জনা বসুর সঙ্গে শান্তা রায়চৌধুরীর বন্ধুত্ব হল না। শান্তা বাড়িতে চিঠি লিখলেন—এখানে একটি বাঙালি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হল। কী দেমাকি মেয়ে বাবা! দেখলে গা জ্বলে যায়!

ল্যান্ডলেডি সদাশিব রাওকে বললেন, তোমাকে ঘর দিচ্ছি বটে, কিন্তু সাবধানে থাকতে হবে বলে দিচ্ছি! আমি জানি, তোমরা ইন্ডিয়ানরা বড্ড নোংরা হও।

—কী করে জানলে?

—আগে যে আমার বাড়িতে একজন ইন্ডিয়ান ছিল। নোংরার হদ্দ!

—কী নাম তার?

—পড্‌মা...পল্...ওঃ এই লেখা আছে, পদ্মনাভ বড়ুয়া।

—ওঃ, অসমীয়া কিংবা বাঙালি! তা ওর জন্য তুমি আগে থেকেই আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন?

—কেন? ও কি ইন্ডিয়ান নয়? তোমার দেশের লোক নয়?

থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেলেন সদাশিব। না, অস্বীকার করার উপায় নেই যে, আসাম কিংবা বাংলা ভারতবর্ষেই, ওই লোকটি পদ্মনাভ বড়ুয়া তারই স্বজাতি। কিন্তু সদাশিব রাও কোনওদিন আসাম যাননি, জানেন না সেখানকার ভাষা, জানেন না আসামের লোকের খাদ্য কী, আচার ব্যবহার কী। আসাম কিংবা কাশ্মীর কিংবা উড়িষ্যার কোনও ছেলেকে দেখলে তাকে বিদেশির মতোই প্রায় ব্যবহার করতে হবে। আর কলকাতার ছেলেগুলো তো অতি পাজি হয়! ইংরেজিতে বাক্যালাপ, মামুলি সম্ভাষণ। কিন্তু ল্যান্ডলেডির কাছে অস্বীকার করবেন কী করে যে, হ্যাঁ, লোকটি আমারই স্বজাতি ভারতীয়, বিদেশে ওর সুনাম ও দুর্নামের আমিও সমান অংশীদার।

॥ দুই ॥

একজন ভারতীয় তরুণ আমেরিকায় প্রবাসজীবন সেরে দেশে ফিরছে। ফেরার পথে ইউরোপ দেখা তার অতিরিক্ত লাভ। কারণ ইউরোপ ঘোরার জন্য তার আলাদা প্লেনের টিকিট কাটতে হবে না। যে ইউরোপ অনেক ভারতীয় যুবার কাছেই স্বপ্নের জগৎ, আজ এই বিশেষ তরুণটির পক্ষে ইউরোপের যে-কোনও শহরের অজানা পথে পথে ঘুরে বেড়ানো কত সহজ। যেখানে ইচ্ছে যাও, যে হোটেলে ইচ্ছে বসে বিশ্রাম নাও, যে-কোনও স্মৃতিস্তম্ভের সামনের মাঠের ঘাসে শুয়ে থাকো ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কোনও কাজ নেই, কোনও তাড়া নেই,—এমনকী বিস্ময়ও কোথাও বিপুল নয়। এক একটি জগৎবিখ্যাত দর্শনীয় স্থানের সামনে এসে সে বলতে পারে, জানতুম, এরকমই হবে। যতখানি কল্পনা করেছিলুম, তার চেয়ে বেশি কিছু দেখাতে পারেনি কেউ। তাই বুঝি সব ভ্রমণের সার মনসা মথুরা ভ্রমণ।

ছেলেটি একটি কাজ করেছে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে। বিদেশে গিয়ে খুঁজে-খুঁজে অপর ভারতীয়দের সঙ্গে দেখা করে সময় নষ্ট করেনি। যে-দেশে গেছে, সেখানে মিশেছে শুধু সেই দেশের

লোকের সঙ্গে। আমেরিকানদের সঙ্গে কথা বলে সে চিনেছে আমেরিকা, ইংরেজদের সঙ্গে আলাপ করে ইংল্যান্ড, তেমনি ফরাসি দেশ ও জার্মানিতে এসে সে শুধু গ্রহণ করেছে ফরাসি ও জার্মান বন্ধু। ওসব দেশের কয়েকজনের সঙ্গে আগে থেকেই পরিচয়ের সূত্র ছিল, কোথাও চিঠিপত্রে, কোথাও বন্ধুর বন্ধু হিসেবে।

একমাত্র রোমেই তার পরিচিত কোনও ইতালীয় ছিল না। অথচ রোম দেখার আগ্রহ ছেলেটির অসীম, রোমের দু-হাজার বছরের পুরোনো স্টেডিয়ামের প্রাচীর এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। যে প্রাচীর সম্বন্ধে বলা হয়, যেদিন ওই প্রাচীর একেবারে ভেঙে পড়বে, সেদিন রোম শহরেরও পতন হবে। আর রোমের পতন হলে পৃথিবীরও পতন। সেই রোম দেখবে না? কিন্তু সেই রোম কি সে দেখবে পেশাদার টুরিস্টদের মতো কনডাক্টেড টুরে? শুধু রোম কেন, সে দেখতে চায় ভেনিস, সম্পূর্ণ ইটালি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ইটালিতে কোনও নির্ভরযোগ্য ইতালীয় বন্ধুর সন্ধান পাওয়া গেল না।

বরং ইংল্যান্ডে, ফ্রান্সে, জার্মানিতে যেখানেই রোম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়, ওইসব দেশের লোকেরা সকলেই একবাক্যে বলত, রোমে যাচ্ছ? সাবধান!

রোমের সম্পর্কে ইওরোপের অন্যান্য দেশের অনেকের অভিযোগ এই যে রোমের মতো এমন শিল্প-সুষমামণ্ডিত প্রাচীন শহরে ভ্রমণ করতে যেতে সকলেরই লোভ হয়, কিন্তু রোম বা ইটালির যে-কোনও শহরই প্রায় জুয়াচোর-প্রতারকে ভরা। ইটালিতে জিনিসপত্র দরাদরি করে কিনতে হয়। রোমের হোটেলওয়ালাদের ব্যবহার সাংঘাতিক, অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি ছাড়া তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা সম্ভব নয়। যেমন প্রথমে হোটেলে যাওয়া মাত্রই তারা অসম্ভব হাসিখুশি ব্যবহারের সঙ্গে আশাতিরিক্ত সস্তা দাম চাইবে। প্রসন্ন পর্যটক সঙ্গে-সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে মালপত্র রেখে চাবি হাতে বেরিয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর ভ্রমণপর্ব সমাপ্ত করে হোটেল পরিত্যাগ করার সময়, যখন কাউন্টারে দাম চুকিয়ে দেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন, তখন হাতে পেলেন তাঁর নিজস্ব হিসেবের দু-গুণ বা তিনগুণ একটি বিল। কী ব্যাপার? ঘর ভাড়া তো অনেক কম বলা হয়েছিল? আহা, সে তো শুধু ছিল ঘরভাড়া, তার সঙ্গে যোগ হবে ইলেকট্রিকের চার্জ, চাকরদের সার্ভিস, জলের খরচ, আর আপনাকে বলা হয়েছিল ছোট এক-বিছানা ঘরের খরচ, কিন্তু তার বদলে সে আপনাকে সুন্দর, প্রশস্ত, দু-বিছানার ঘর দেওয়া হয়েছিল!

এ ছাড়া, রোমের কুলিরা নাকি মালপত্র নিয়ে দরাদরি করে খুব। ট্যাক্সিওয়ালা এক নম্বরের ফেরেব্‌বাজ। অনেক ট্যাক্সির মিটার থাকে না বা মাঝপথে সুযোগ বুঝে মিটার খারাপ হয়ে যায়, তারপর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যা-তা ভাড়া হেঁকে বসে। ইটালির রেস্টুরেন্টগুলোও জোচ্চুরির জায়গা, একই খাবার একজন ইতালীয় খেয়ে গেল যে দাম দিয়ে, আরেকজন বিদেশিকে সেজন্য দিতে হল ডবল্। অনেক সময় ইটালির আর ইংরেজি দু-ভাষায় আলাদা মূল্য তালিকা ছাপা থাকে, কিন্তু ভাষা অনুযায়ী দামের অনেক হেরফের। আর সবচেয়ে মারাত্মক হচ্ছে দাম নিয়ে বা টাকাপয়সা নিয়ে কোনও বিদেশি যখন তর্ক করতে চায়, তখন হঠাৎ সুযোগ মতো ইতালীয়রা একবর্ণও ইংরেজি বা কোনও বিদেশি ভাষা না বোঝার ভান করে উলটে, দুর্বোধ্য ইটালিয়ানে কী যেন বকবক করে যায়।

এইসব অভিযোগ ভারতীয়টি শুনল ইওরোপের অনেকগুলো দেশে। প্রমাণ হিসাবে, সদ্য ইটালি ফেরত একজন ফরাসি তাকে খবরের কাগজের একটি অংশে আঙুল দিয়ে দেখাল। খবর বেরিয়েছে, ভেনিসের কয়েকটি হোটেলে পুলিশ অকস্মাৎ হানা দিয়ে শাসিয়েছে যে বিদেশিদের কাছ থেকে যদি আবার বেশি দাম নেওয়া হয় তবে ওইসব হোটেলের লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হবে। সুতরাং আশা করা যায় রোমের বিশাল বিমানবন্দরে আত্মীয়হীন নির্বান্ধব দেশে ছেলেটি যখন প্লেন থেকে নামল, তখন সে হয়তো মনে-মনে দুর্গা নাম জপ করেছিল একবার। আগে থেকেই

সে ঠিক করে নিয়েছিল রোমে ট্যাক্সি চাপবে না, কুলির হাতে মালপত্র সঁপে দেবে না, হোটেলের ঘর নেবে খুব সাবধানে।

এয়ার টার্মিনালের একটু দূরেই কয়েকটি হোটেলের নাম জ্বলছে আলোতে। দুটি ভারী সুটকেস দু-হাতে বয়ে নিয়ে ছেলেটি চলেছে হোটেলের নাম পড়তে-পড়তে। ক্লান্ত চেহারায় ওরকম সুটকেস বওয়া, রাস্তার লোক দেখছে ফিরে-ফিরে। ছেলেটি হাঁটতে-হাঁটতেই মনে-মনে ইটালির মুদ্রা লিরার সঙ্গে টাকা কিংবা ডলারের হিসেব ঝালিয়ে নিচ্ছে—যাতে ওদিক দিয়ে অন্তত কেউ ঠকাতে না পারে। সামনে একটি হোটেল দেখেই ঢুকে পড়লে। একটিই ঘর খালি আছে। কত ভাড়া? বেশ সস্তা। সেয়ানা ছেলেটি প্রশ্ন করল, পরে আর কী-কী চার্জ দিতে হবে? ভদ্র ম্যানেজার স্পষ্টভাবে বললেন, আর কিছু না, সার্ভিস চার্জ পর্যন্ত না, এবং ওই টাকার মধ্যেই সকালের জল খাবার, এক বেলা খাবার ধরা আছে। আশ্চর্য, এ হোটেলটিকে দেখা যাচ্ছে দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

পরদিন একটা ডলারের ট্রাভেলার্স চেক ভাঙানো দরকার। ম্যানেজারকে বলল। ম্যানেজার বললেন এখন তো পুরো টাকাটা নেই আপনি চেকটা রেখে অর্ধেক টাকা নিয়ে যান, বিকেলে বাকি টাকাটা নেবেন। কী সর্বনাশ। কোন ভরসায় রেখে যাবে, যদি বিকেলে বাকি টাকাটা দিতে অস্বীকার করে! অনেক টাকা অথচ ম্যানেজার চেকটির জন্য হাত বাড়িয়ে আছে। একটা মুশকিল এই, আমাদের পরিচিত ভারতীয় ছেলেটি একটু লাজুক ধরনের। মুখের ওপর কোনও লোককে অবিশ্বাস করতে পারে না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চেকটি রেখেই এল, সারাদিন কাটল বিরস মনে। বিকেলবেলা স্নান সেরে জামা-কাপড় বদলাচ্ছে, দরজায় টোকা দিয়ে ম্যানেজার এসে বাকি টাকাটা দিয়ে গেল।

সন্ধেবেলা ডিনার খেতে ঢুকল একটা রেস্টুরেন্টে। যে-কোনও রেস্টুরেন্ট, আগে থেকে নাম না জানা। তার টেবিলের উলটোদিকে একজন ইটালিয়ান। সবরকম খাবার-দাবারের নাম জানে না বলে ইটালিয়ান ভদ্রলোক যে-যে খাবারের নাম বললেন ইতালীয় ভাষায়, ছেলেটিও ঠিক সেইগুলোই পুনরুক্তি করে গেল। তারপর খেতে লাগল ঠুকঠাক করে, ধীরেসুস্থে। বেশ সুখাদ্য। অন্য লোকটি চেনা খাবার চটপট খেয়ে দাম দিয়ে উঠে গেলেন। ছেলেটি আড়চোখে দেখে নিয়েছিল, তিনি কত দাম দিচ্ছেন। এবার দেখা যাক, একই খাবারের জন্য তার কাছে কত দাম চায়। অবাক কাণ্ড, তাকে বিল দেওয়া হল একটু কম টাকার। উচ্চারণের দোষে বুঝতে না পেরে, তাকে নাকি সুপ দেওয়া হয়েছে একটা অন্য কম দামের।

সত্যি আশ্চর্য কথা, রোমে তার সাতদিনের অবস্থানে একটি লোকও তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেনি। কেউ তাকে ঠকাবার চেষ্টা করেনি। একেবারেই প্রতারিত না হতে পেরে বিরক্ত বোধ করে, সে শেষ চেষ্টা হিসেবে একবার ট্যাক্সিও চেপে বসল। গন্তব্যে পৌঁছুবার পর দেখা গেল, তার কাছে একটা বড় নোট, ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে পুরো খুচরো নেই। ড্রাইভারটি তখন পঞ্চাশ লিরা কম নিয়েই বলল, ঠিক আছে, আর দিতে হবে না! ছেলেটি বলল, না, না, তা-কি হয়, আমি টাকাটা ভাঙিয়ে নিচ্ছি কোথাও। ড্রাইভারটি চমৎকার হেসে বলল, গ্রাৎসি সেনর! ব্যস্ত হওয়ার কী আছে। আপনি না হয়, পরে অন্য কোনও ড্রাইভারকে বকশিশ দিয়ে দেবেন।

ভ্যাটিকান দেখে ফেরবার পথে বিকেলে বাসে যাওয়ার সময় ছেলেটির পাশে এক সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলা বসেছেন, বারবার তাকাচ্ছেন ছেলেটির দিকে। তারপর জিগ্যেস করলেন, তুমি কোন্ দেশের? ছেলেটি জানাল। ভদ্রমহিলা বললেন, আমি তোমাদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে খুব কম জানি। কিন্তু কি সুন্দর তোমার গায়ের রং। পাকা জলপাইয়ের মতো। এমন রং আমি পেলে ধন্য হয়ে যেতাম!—এরকম কথা সারা পশ্চিম জগতে অন্য কোনও অপরিচিত মেয়ে বলেনি। ছেলেটির মন পূর্ণ হয়ে গেল।

রোম, এ কী রহস্য তোমার। অর্ধেক পৃথিবীর কাছে শুনে এসেছি তোমার অধিবাসীদের বদনাম। অথচ ছেলেটি ভাবল, আমার অভিজ্ঞতা অপরূপ সুন্দর, নিখুঁত, সারা পশ্চিম জগতের মধ্যে সবচেয়ে

সু-ব্যবহার পেলাম। উপরন্তু একটি সুন্দরী মহিলার মুখে আমার গাত্রবর্ণের স্তুতি। ভাবতে ইচ্ছে হয়, রোম যেন এই ভারতীয় ছেলেটিকে বিশেষ রকম আন্তরিকতা দেখিয়েছে।

॥ তিন ॥

কোনও কোনও নতুন শহরে এসে পৌঁছবার সময় মনে হয় কেউ আমার জন্য এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকবে। ঈষৎ ক্লান্ত রুক্ষ মুখে একটু এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পাব কেউ আমার জন্য হাতছানি দিচ্ছে। মুহূর্তে কাস্টমসের সামনে দাঁড়ানো বিরক্তি অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

অসম্ভব এই আশা। জুরিখে আমি কারুক্কে চিনি না। এখানে কোথাও আমার কোনও হোমিওপ্যাথিক সম্পর্কের আত্মীয়-বান্ধব আছে বলেও শুনিনি। তা ছাড়া সেদিন জুরিখে আমার পৌঁছবার কথা আমি নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। তবু যুক্তিহীনভাবে আকাঙক্ষা করছিলুম, কেউ আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে এয়ারপোর্টে।

এয়ারপোর্ট পেরিয়ে যখন আসছি, দেখি দূরে দাঁড়িয়ে এক বাঙালি ভদ্রমহিলা হলুদ রঙের শাড়ি-পরা, পাশে একটি দেবকান্তি শিশু এবং হ্যানডলুমের শার্ট পরা এক ভদ্রলোক—আগত যাত্রীদের দিকে দেখছেন। হয়তো ওঁরা আমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছেন, হয়তো আমার কোনও মাসিমা কিংবা বৌদির ননদ হঠাৎ এখানে এসেছেন আমি জানতুম না, কী করে ওঁরা আমার আসার খবর পেলেন ইত্যাদি এসব ভেবে লাভ নেই, নিশ্চয়ই ওঁরা আমারই জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। সারাক্ষণ ধরে বুক চাপা মন খারাপ, কোনও কারণ নেই তবু মন খারাপ, এক একটা নতুন শহর দেখবার আগেই একটা চমৎকার উত্তেজনা থাকে বুকের মধ্যে, আবার কোনও কোনও নতুন শহরে আসবার আগে মনে হয়—এই সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় আমার সম্পূর্ণ একাকিত্ব হয়তো এক এক সময় অসহ্য হয়ে উঠবে। মানুষের সঙ্গে পরিচয়ের একটা অদ্ভুত ব্যাপার আছে—অনেক সময় একা একা রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও নিজেকে একা মনে হয় না, কিন্তু ক্রমাগত নতুন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হতে থাকলে, নিজের একাকিত্ব হঠাৎ বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে, তখন ইচ্ছে হয়, হঠাৎ কেউ পিছন থেকে আমার কাঁধে চাপড় দিয়ে বলুক, আরেঃ তুই এখানে!

আমি সেই ভদ্রমহিলা, শিশু ও পুরুষটির ছোট্ট দলের দিকেই এগুতে লাগলুম। ওদের দেখলেই মনে হয় ওঁরা কারুর জন্য অপেক্ষা করছেন, এই প্লেনেরই কোনও যাত্রীর জন্য। কিন্তু আমার এ প্লেনে আর তো কোনও বাঙালি যাত্রী দেখিনি। ওঁরা কি আমারই জন্য! আমার খুব দরকার একটি চেনা মুখ, আমি এই শহরে অচেনা আগন্তুক হয়ে থাকতে চাই না। আমি জানি, তবে জুরিখ আমার ভালো লাগবে না! জেনিভা আর জুরিখের মধ্যে রেষারেষি আছে, ফরাসি আর জার্মান ভাষার মন কষাকষি। তা থাক, আমি আগে জেনিভা গেছি বলেই জুরিখের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। কিন্তু এই অকারণ মন খারাপের তো কোনও যুক্তি নেই। এরকম মন খারাপ থাকলে মনে হয়, কিছুই ভালো লাগবে না। অনবরত ভাঙা ইংরেজি বলতে-বলতে মনে বোবা হয়ে গেছি।

আশ্চর্য, সেই ভদ্রমহিলা ও শিশুটি আমার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াতে লাগলেন। ওরা নিশ্চয়ই ভুল করেছেন, আমাকে অন্য কেউ ভেবেছেন—আমার তো কেউ চেনা নেই এখানে, আমি যে জুরিখে আজ আসব, তা তো আমি নিজেই জানতুম না গতকাল পর্যন্ত। কিন্তু ওদের ভুল হোক, ক্ষতি নেই—আমিও ওদের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়লুম। আমিও তো ওঁদের চেনা লোক বলে ভুল করতে পারি!

ওঁরা হাত নাড়া বন্ধ করলেন না। আর খুব বেশি দূরে নেই মহিলার লাবণ্যময় বাঙালি

মুখ, শিশুটির বাংলা হাসি, পুরুষটির বাঙালি ধরনের সিগারেট টানা। কিন্তু, এ কথা নিশ্চিন্ত, এঁদের আমি আগে কখনও দেখিনি, আমার কোনও আত্মীয় হওয়া এঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু আমি নিবৃত্ত হলুম না। ওঁদের তো এখনও ভুল ভাঙেনি। আমি তখনও হাত নেড়ে হাসিহাসি মুখে এগিয়ে যেতে লাগলুম। আমার মন খারাপ অনেকটা কেটে যাচ্ছিল। ওঁদের কাছে তখুনি কৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলুম। এবার একেবারে মুখোমুখি।

বিদেশে যা হয়, দেশের লোক দেখলেই মুখ ঘুরিয়ে নেওয়া! আমি তখনও হাসিমুখে আশা করছিলুম ওঁরাই প্রথম কথা বলবেন। ওদের মুখে হাসি—পুরুষ ও মহিলাটি সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, হ্যালো মিঃ ব্যাবকক্। আমি মুহূর্তে পিছনে তাকিয়ে দেখলুম, আমার পিছনেই একজন বুলডগ মুখো জারমান বিশাল থাবা বাড়িয়েছে ওঁদের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করার জন্য। ওঁরা আমার দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না।

এই তো স্বাভাবিক, ওঁদের চেনা কোনও লোককে নিতে এসেছেন। আমি কেউ নই, অন্য লোক, অচেনা—আমার সঙ্গে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কিন্তু ওই সামান্য ঘটনার জন্যই জুরিখ শহর একেবারে ভালো লাগল না।

॥ চার ॥

প্যারিসে দেখা হল পরিতোষের সঙ্গে, বিলেতে বিমান, আর ভবশংকর আর নন্দিতা, জার্মানিতে হৃষীকেশ, আমেরিকায় অসিত আর কৃষ্ণেন্দু আর আরতি মুখার্জি—ওরা আর ফিরে আসবে না! ওদের কারুকে আগে চিনতাম, অনেকের সঙ্গে প্রবাসে আলাপ হল, আরও তো বাঙালি বা ভারতীয়ের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয় বিদেশে—অনেকেরই মুখ ভুলে যাই কয়েকদিন পর। কিন্তু দেখা হওয়ার পর কয়েকটি কথার শেষেই যারা বলেছে, আমরা আর দেশে ফিরে যাব না, এখানেই আছি, তাদের মুখ কিছুতেই ভুলতে পারি না, ইচ্ছে হয় একটা অ্যালবামে ওদের খুশির মুখোশ পরা চাপা বিষণ্ণ মুখগুলি জমিয়ে রাখি।

ভবশংকরদাকে চিনতাম খুব ছেলেবেলায়, ফুটবলের মাঠ থেকে রোজ সন্ধেবেলা জলকাদা মেখে ফিরতেন, সেই মূর্তিটাই মনে আছে। আমাদের বাড়ির রকে বসে আমার মাকে বলতেন, ছোট মাসিমা, চা-তো তৈরি করেছেন জানিই, একটু আদা দিয়ে তৈরি করবেন? সেই ভবশংকর হঠাৎ কী করে যেন বিলেতে চলে যান, তেমন লেখাপড়া শেখেননি, অথচ কী করে যে বিলেতে গিয়ে পৌঁছলেন, কোনওদিন আমরা জানতে পারিনি। সোহো-র একটা হোটেলে খাওয়ার পর বিল দিতে গেছি হঠাৎ বেয়ারাটি বলল, পয়সা দিতে হবে না। অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকালুম, একটু চেনা চেনা লাগল, বেয়ারাটি বলল, কোথায় উঠেছিস? সন্ধের পর দেখা করতে পারবি? ভবশংকরদা!

একটা বাড়ির পাশাপাশি দুটো ঘরে ভবশংকরদা আর হাসান সাহেব থাকেন। দুজনেই এসেছেন পূর্ববঙ্গের একই গ্রাম থেকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে। দুজনের গভীর বন্ধুত্ব। কেউই আর ফিরে যাবেন না। ভবশংকরদা আমাকে হাজার প্রশ্ন করলেন, অন্তত পঞ্চাশ জনের খবর নিলেন। কারুর কথা ভোলেননি, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটির প্রতি মমতা, আমাদের বাড়িতে বছর দশেক আগে একটা কুকুর ছিল, সেটার কথা আমাদেরই মনে নেই—অথচ সেটার মারা যাওয়ার খবর শুনে ভবশংকরদা যেন মুষড়ে পড়লেন।

জিগ্যেস করলাম, ভবশংকরদা, এই চোদ্দো-পনেরো বছরে তো আপনার এখানে মন বসেনি বুঝতে পারছি। ফিরে যাবেন না?

—না রে!

—কেন?

কী করব ফিরে গিয়ে? মুখ্য-সুখ্য মানুষ। বামুনের ছেলে হয়ে সাহেবের দেশে তবু বেয়ারার চাকরি করা যায়, কিন্তু নিজের দেশে পারব না। বেশ আছি এখানে।

আরতি মুখার্জি ছিল আমেরিকার একটি ছোট শহরে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যমণি। প্রায় সত্তর-আশি জন ভারতীয়দের মধ্যে ওই একজনই ছিল কুমারী মেয়ে এবং সুন্দরী। কে একটু ওর সঙ্গে কথা বলবে, বেড়াতে বা সিনেমায় যাবে, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা চলত। হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলা টেলিফোন পেলাম। শুনুন, কেমন আছেন, আমি আরতি, আমি, মানে...আমি কাল, ইয়ে...ইস...দেখুন কীরকম লজ্জা পাচ্ছি, আমি না পরশুদিন বিয়ে করেছি।.

—বিয়ে করা হয়ে গেছে?

হ্যাঁ। করে ফেললাম আর কি, আপনি তো দুদিন ছিলেন না এখানে, তাই খবর শোনেননি অন্য ছেলেরা এমন সব বিচ্ছিরি আলোচনা করছে।

—সৌভাগ্যবানটি কে?

—হ্যারল্ড। হ্যারল্ড ক্লার্ক!

—বাঃ! ও তো খুব ভালো ছেলে। শুনে খুব খুশি হলাম।

—কাল আমার বাড়িতে একটা ছোট্ট পার্টির আয়োজন করেছি। বেশি লোককে বলিনি, খুব ঘরোয়া, আপনি আসবেন কিন্তু।

—হায়, হায়, এ খবরে কত ছেলের যে বুক ভেঙে যাবে!

—আপনার যে যাবে না, সেটা ঠিক জানি। আপনি তো আমাকে গ্রাহ্যই করলেন না কখনও।

—আহা-হা! তুমি এরকম ভাব, এ কথা যদি আগে জানতাম!

এরপর দুজনের হাসি। টেলিফোন রেখে দিলাম।

আরতি মেয়েটি ছোটখাটো ফুরফুরে, ইংরেজিতে ছাড়া কথা বলে না। কিন্তু আমি ওকে খুকি বলে ডাকতাম। যার সঙ্গে বিয়ে হল সেই হ্যারল্ড ক্লার্ক চমৎকার সপ্রতিভ ছেলে, সুন্দর স্বাস্থ্য ওর। বাবা আমেরিকান, মা ক্যানেডিয়ান। ওর সঙ্গে আরতিকে খুব সুন্দর মানিয়েছে। পার্টিতে কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর আরতিকে একা জিজ্ঞেস করলাম বাংলায়—হঠাৎ এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করলে? আর একটু ভাবা উচিত ছিল না?

—কিন্তু আমার যে ভিসা ফুরিয়ে এসেছে। তিন বছরের জায়গায় সাড়ে চার বছর টেনেটুনে করেছি। এবার তাড়িয়ে দিত। কিন্তু আমি যেতে চাই না। আমি ফিরতে চাই না। আমি এদেশেই থাকতে চাই। এখন আমাকে ভিসা না দিয়ে দেখুক তো!

—কিন্তু ফিরতে চাও না কেন?

—উপদেশ টুপদেশ দেবনে না বলছি! চাই না তো চাই না। দেখুন আমি দেশে থাকতে বরাবর ইংরেজি ইস্কুলে পড়েছি। বাড়িতে ছিল বিষম সাহেবি আদবকায়দা। বাবা-মা চাইতেন যে, আমরা সাহেব মেমের মতো থাকি। বাড়িতে যখন এরকম শিক্ষাই পেয়েছি তখন সত্যিকারে সাহেবদের দেশেই যে আমার ভালো লাগবে তাতে আর আশ্চর্য কী! মিথ্যেমিথ্যি এখন আর ভারতীয়ত্ব দেখিয়ে লাভ কী? তা ছাড়া, আমি হ্যারল্ড ক্লার্ককে ভালোবাসি।

আহা, ভালোবাসা-টালবাসার কথা থাক। বললে ওটাই প্রথমে বলা উচিত ছিল। কিন্তু তুমি বড়লোকের মেয়ে। দেশে থাকলে তোমার নির্ঘাৎ কোনও ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হত, এখানে শেষ পর্যন্ত বিয়ে হল ক্লার্কের সঙ্গে!

কৃষ্ণেন্দু আমার ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। সাত বছর ধরে আমেরিকায়, ফেরার নামটি নেই! বিষম লাজুক, গোবেচারা ধরনের ছেলে ছিল, ধুতি ছাড়া প্যান্টালুন পরত না

কোনদিন, এতদিন বিদেশে কী করছে কে জানে। ওর ছোট বোন আমাকে চিঠি লিখে জানাল দাদার একটু খোঁজ করুন। মাসে মাসে শুধু টাকা পাঠায় বাবার নামে, কিন্তু চিঠি লেখে না। ওকে আপনি একটু বুঝিয়ে বলুন।

আমেরিকায় তিন বছর থাকার পর দু-বছর গিয়ে কানাডায় ছিল, তারপর আমেরিকায় আবার ফিরে নাগরিকত্ব পাওয়ার চেষ্টা করছে কৃষ্ণেন্দু, শুনলাম। কিন্তু ও থাকে আমার চেয়ে দেড় হাজার মাইল দূরে, দেখা করা সহজ নয়, সুতরাং আমি একটা চিঠি লিখলাম ওর নামে।

হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে টেলিফোন। লং ডিসটেন্স কল। কৃষ্ণেন্দুর গলা। 'এই শূয়ার, তিনবার টেলিফোন করে তোকে পাইনি! চার মাস হল এখানে এসেছিস আর এখনও আমার সঙ্গে দেখা করলি না? তুই আসবি, না আমি যাব? কালই চলে আয়!'

কী স্মার্ট, তীক্ষ্ণ গলার আওয়াজ হয়ে গেছে কৃষ্ণেন্দুর। যে ছিল মার্কামারা ক্লাসে-ফার্স্ট হওয়া লাজুক ভালো ছেলে। কত বদলে গেছে। বললুম, দাঁড়া, দাঁড়া অতদূরে চট করে যাওয়া সহজ! পয়সা কোথায়? ক্রিসমাসের সময় নিউ ইয়র্কে যাব, ওখান থেকে তোর বাড়িতে।

—তাহলে কখন বাড়ি থাকিস বল? প্রায়ই তোকে টেলিফোন করব।

—সে কী রে! ঘন-ঘন লং ডিসটেন্স কল? তোর পয়সা খুব বেশি হয়ে গেছে বুঝি? বরং চিঠি লিখিস।

—গুলি মারো পয়সা! ডলারের নিয়মই হচ্ছে, যেমন পাবে তেমনি ওড়াবে! ওসব চিঠিফিটি লেখা আমার দ্বারা হয় না। তাওতো তোকে আবার লিখতে হবে বাংলায়! ঝঞ্ঝাট!

এখনও গোপনে বিয়ে করেনি, একাই থাকে, তবু কৃষ্ণেন্দু তিনখানা ঘরের বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নিয়ে আছে। রেকর্ড প্লেয়ার, টেপ-রেকর্ডার, রেডিওগ্রাম, গোটাতিনেক ক্যামেরা, সিনেমা প্রোজেকটার—ইত্যাদি। বিচ্ছিরি জিনিসে ঘর ভরতি। দরজার সামনে ঝকঝকে মোটর গাড়ি। ওয়ার্ডরোবে আধশো শৌখিন পোশাক। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের ছাত্র ছিল, কী যেন একটা গবেষণা ধরনের কাজ করে প্রচুর টাকা পায় শুনলাম। আমাকে দেখে কৃষ্ণেন্দু হইহই করে উঠল। প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের পর বলল, দ্যাখ, তুই এসেছিস এখন তিন চারদিন খুব হুল্লোড় করব, খাব-দাব ফুর্তি করব, আমার গাড়িতে তোকে নায়েগ্রা ফলস দেখিয়ে আনছি চল—কানাডার ওপাশ দিয়ে, কিন্তু খরবদার বলে দিচ্ছি আমার দেশে ফিরে যাওয়ার কথা তুলে প্যান প্যান করবি না!

বললুম, যা যা বয়ে গেছে আমার। ভারতবর্ষের ওই জনসংখ্যা, তোর মতো কিছু কিছু কমে গেলেই তো বাঁচি!

কিন্তু ফিরে যাওয়ার প্রসঙ্গ কৃষ্ণেন্দু নিজেই তুললে। জানিস, গাড়ি চালানো আমার এমন নেশা হয়ে গেছে! যখন কোনও কাজ থাকে না, গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শ'খানেক মাইল এমনিই ঘুরে আসি। এটা আমার সাত নম্বর গাড়ি। গরিবের ছেলে, কোনওদিন গাড়িতে চড়ার স্বপ্নই দেখিনি, এখন ইচ্ছেমতো গাড়ি কিনছি। গত ফলে (শরৎকালে) গাড়ি চালিয়ে আরিজোনা গিয়েছিলাম। আড়াই হাজার মাইল, ভেবে দ্যাখ! কী চমৎকার ছিল সেই গাড়িটা, সাদা রং ঝকঝকে নতুনের মতো, ঠিক যেন রাজহাঁস। কিন্তু কী হল জানিস গাড়িটার সব ভালো, কিন্তু মাঝে-মাঝে কোথায় যেন ক্রিক-ক্রিক করে শব্দ হতে লাগল। কোথা থেকে শব্দটা বেরুচ্ছে কিছুতেই বুঝতে পারি না, সব খুলে দেখলাম—কোনও ত্রুটি নেই, অথচ আমি শুনতে পাই। গাড়ি চলবে বেড়ালের মতো, কোনও শব্দ হবে না—আশি মাইল স্পিডে চললেও। কিন্তু আমার গাড়িটা—অন্য লোক চড়ে কিছু শুনতে পায়নি, অনেককে জিগ্যেস করেছি, কিন্তু আমি একা ঠিক শুনতে পেতাম ক্রিক, ক্রিক, ক্রিক। শেষে কী করলাম জানিস? জলের দামে অমন সুন্দর গাড়িটা বেচে দিলাম। এ গাড়িটা দেখবি—নিজের মুখে কী বলব—

আমি চুপ করে শুনছিলাম। কৃষ্ণেন্দু আপন মনেই বলল, ফেরার সময় অবশ্য একটা গাড়ি

নিয়ে যাওয়া যায়। কিন্তু কেনই বা ফিরব?

—সত্যিই তো, কেনই বা ফিরবি?

—বেশ করব ফিরব না। কী আছে তোদের দেশে? গাড়ি নিয়েও কি মেনটেন করা সহজ। যা-তা সব রাস্তা! আর গেলেও তো খেতে পাব না। যাদবপুর ইউনিভারসিটিতে পড়াতুম, চারশো কুড়ি টাকা মাইনে পেতুম, ফোর টুয়েন্টি! হাঃ হা, ওই জন্য আবার ফিরে যাওয়া! নাকে খত দিচ্ছি!

—কে তোকে ফেরার জন্য মাথার দিব্যি দিচ্ছে রে!

—জানি কেউ দিচ্ছে না! কেনই বা দেবে! আগে দেশে থাকতে সংসারে দিতুম তিনশো টাকা, এখন দু-হাজার টাকা প্রত্যেক মাসে পাঠাই। আরও বেশি পাঠাতে পারি—কিন্তু লোভ বেড়ে যাবে বলে, চেপে রেখেছি খানিকটা। বাড়িতে এখন আর আমার ফেরার কথা ভুলেও লেখে না! কেন লিখবে, জানে তো—ফিরে গেলে বড়জোর সাত-আটশো টাকার মাইনের চাকরি হবে আমার—সংসারে এখন যত বাবুয়ানি চলেছে—সব ঘুচে যাবে? কেউ লেখে না। খালি লেখে আমার শরীর ভালো আছে কি না। অর্থাৎ আমি অসুখে পড়লে টাকা পাঠানো বন্ধ হয়ে যাবে যে!

—ওরকম বাজে কথা বলিস না। তোর মায়ের কাছে নিশ্চয়ই টাকার চেয়ে তোর দাম বেশি।

-আমি মাকে ভুলিনি। কিন্তু মায়ের আরও ছেলেমেয়ে আছে। মা তাদের মানুষ করে সুখে থাকুন। আর সত্যিই বল, টাকার কথা ছেড়েই দিলাম। দেশে ফিরলে আমাদের লাইনে রিসার্চ করার সুযোগ আছে? না আছে যন্ত্রপাতি, না আছে কোনও আধুনিক ধারণা—

—বাজে কথা বলছিস এবার! তোর আবার রিসার্চ কী রে? তোকে জানি—তুই মুখস্থ করা ভালো ছেলে, মেধাবী; কিন্তু বিজ্ঞান পড়েছিস বলেই কি তুই বৈজ্ঞানিক? তুই নেহাত একটা টেকনিসিয়ান। তোর কি সত্যিই নতুন কিছু আবিষ্কার করার ইচ্ছে আছে? না সে জিনিসই তোদের মধ্যে নেই আমি জানি, ওসব রিসার্চের নামে বড়-বড় কথা বলিস না। টাকা পাচ্ছিস, টাকার নেশা ধরেছে, থেকে যা।

—আচ্ছা, টাকাও কি কম কথা। আমি মহাপুরুষ নই যে টাকার আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারব। প্রতি মাসে ডলার পাঠাচ্ছি, ভারত সরকারের ফরেন এক্সচেঞ্জ লাভ হচ্ছে। টাকার জন্য এই সুখস্বাচ্ছন্দ্য, মজা উল্লাস পাচ্ছি—আমি এই নিয়েই থাকব। যখন যেখানে খুশি বেড়াতে যাব। এখানেই একটা মেয়েকে বিয়ে করে সংসার পাতব, ইচ্ছে হলে। এইতেই আমার সুখ।

—সুখ? কৃষ্ণেন্দু তুই এখানে থেকে যাতে চিরকাল সুখে থাকতে পারিস—আমি মনেপ্রাণে তাই কামনা করব।

এরপর শর্ত করেই আর আমরা দেশে ফেরার কথা আলোচনা করব না ঠিক করলাম। আমারও ইচ্ছে নেই। নিজের জীবনের গতি ঠিক করার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই স্বাধীনতা আছে। কয়েকটা দিন আমরা প্রচুর খাওয়াদাওয়া, ফিল্ম দেখা, গাড়িতে চড়ে পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করলাম। একদিন রাত্রে খাওয়া শেষ করে আমরা দুজনে তাস খেতে বসেছি। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। বরফ পড়ার সময় দূরের কোনও শব্দ শোনা যায় না, চারদিক অস্বাভাবিক নিঃশব্দ। আমরাও দুজনে অনেকক্ষণ কোনও কথা বলিনি। হঠাৎ কৃষ্ণেন্দু জিগ্যেস করল, হ্যাঁ রে, ঠনঠনেতে এখনও বৃষ্টির দিনে জল জমে? আমি গম্ভীরভাবে এক শব্দে উত্তর দিলাম, জমে।

—ভাস্করদের বাড়িতে এখনও তোদের নিয়মিত আড্ডা হয়?

—হয়।

—জানিস, আর দু-একদিন পরে সরস্বতী পজো। কলকাতায় এই সময় সব মেয়েরা বাসন্তী রঙের শাড়ি পরে ঘুরবে না?

—হুঁ।

—যাঃ, আর তাস খেলতে ইচ্ছে করছে না।

কৃষ্ণেন্দু হাতের তাসগুলো ফেলে দিয়ে উঠে গিয়ে জানলার কাছে দাঁড়াল। তারপর বরফ পড়া দেখতে লাগল একদৃষ্টে। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হল এখন আর আমার এ ঘরে থাকা ঠিক নয়। ওকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দেওয়াই বুঝি উচিত। আমি কৃষ্ণেন্দুকে কিছু না বলে নিঃশব্দে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

॥ পাঁচ ॥

কিছুই মেলে না, না রে? পায়ের নীচে এই তো সত্যি-সত্যি প্যারিস। সামনে স্যেন নদী, ওই যে নতরদাম গিরজা—এসব সত্যি, যেমন তুই আমার সামনে বসে আছিস, আমি এই যে পা দোলাচ্ছি—এসব সত্যি। অথচ যা ভেবেছিলুম, তা কি মিলেছে? সত্যি করে বল।

আমি বললুম, রেণু, তুই বোধহয় এবার কেঁদে ফেলবি? অমন গলা ভারী করে বলছিস কেন?

রেণু স্থির চোখে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। পুব হাওয়ায় ফুরফুরিয়ে উড়ছে ওর চূর্ণ চুল, সবুজ রঙা শাড়ির সঙ্গে মেলানো পান্নার দুল দুটো চিকিচিকিয়ে উঠছে মাঝে-মাঝে, ডান হাতের তর্জনী চিবুকে ছোঁয়ানো, রেণু উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ রেণু ভঙ্গি বদলাল, মুখখানা ভেংচে বলল, তাই আয় না, দু'জনে মিলে ছেলেবেলার মতন ভেউ ভেউ করে কান্না শুরু করে দিই। তুই তো জন্ম ছিঁচকাঁদুনে, একবার বললেই হল, চোখ দিয়ে গঙ্গা বইবে।

—বাজে কথা বলিস না।

—বাজে কথা? মনে নেই, ছোট কাকার পকেট থেকে সিকি চুরি করেছিলি, ধরা পড়ে মার খাওয়ার আগেই কেঁদে ভাসালি?

—পয়সা চুরি করেছিলুম? কী মিথ্যাবাদী তুই রেণু?

—আহা-হা, এখন কোট-টাই পরে সাহেব সেজেছিস—তাই স্বীকার করতে লজ্জা! পয়সা কি তুই মোটে একবার চুরি করেছিলি? আমার পুতুলের বাক্সে ছ'আনা জমিয়েছিলাম—তা কে চুরি করেছিল? আমার সব মনে আছে!

—ভারী তো ছ'আনা পয়সা। নে, তোকে পাঁচ ফ্র্যাংক দিয়ে দিচ্ছি এখন। সুদে-আসলে সব শোধ হয়ে যাবে।

রেণু খিলখিল করে হেসে উঠল। দুষ্টুমি-ভরা উদ্ভাসিত মুখে বলল, ভারী টাকা দেখানো হচ্ছে এখন। ছেলেবেলায় ছ'আনা বড় হলে এক হাজার টাকা দিলেও শোধ হয় না। তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারিনি, সে দুঃখ আমার এখন ঘুচবে?

—তখন কাচপুঁতির মালা কিনতে পারিসনি বলেই তো সে-কথা তোর এখনও মনে আছে!

—আমার সব মনে আছে।

—সব? সেই তোর জ্যাঠামশাইয়ের পিকচার পোস্টকার্ড...

রেণু আর আমি প্যারিসের নদীপাড়ে হেমন্তসন্ধ্যায় বসে বসে শৈশব স্মৃতি মেলাতে লাগলুম। কলকাতার ভবানীপুর থেকে প্যারিস কত দূর, তার চেয়েও অনেক দূরে রেণুকে আমি ফেলে এসেছিলাম।

গত দশ বছরে বোধহয় রেণুর কথা আমার একবারও মনে পড়েনি। তারও আগে রেণু নামে অন্য মেয়ের সঙ্গেও আমার ভাব হয়েছিল। হাজারিবাগে গিয়ে সুজিতের বোন রেণুর সঙ্গে

আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, বিকেলবেলা ব্যাডমিন্টন খেলায় সে হত আমার জুটি, তারপর একদিন ক্যানারি হিল্‌স-এ বেড়াতে গিয়ে আমরা ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়েছিলাম, কালকাসুন্দি ঝোপের আড়ালে গিয়ে আমি তাকে চুমু খেয়েছিলাম। জীবনে সেই প্রথম। স্ফুরিত ওষ্ঠাধরে সুজিতের বোন রেণু আমার দিকে বিস্ময় বিহ্বল চোখে তাকিয়েছিল। আমি অতীব লজ্জা পেয়ে কিছুটা কথা বলার জন্যই বোকার মতন বলেছিলাম, জানো, আমি রেণু নামে আর একটা মেয়েকে চিনতাম। সে তখন ঈষৎ আলোছায়ায় সরে গিয়ে বলেছিল, সে বুঝি দেখতে খুব সুন্দর ছিল। তাকে বুঝি তুমি...? আমি তাড়াতাড়ি উত্তব দিয়েছিলাম, না, না, সে একটা কেলটি রোগা মেয়ে, কানভরতি পুঁজ...শুধু নামের মিল...

এক মেয়ের সামনে যে অন্য মেয়ের প্রশংসা করতে নেই, সেটা সেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ বয়সেই আপনা-আপনি জেনে গিয়েছিলাম। কিন্তু খুব বেশি মিথ্যে কথাও তো বলতে হয়নি। আজ আমার সামনে যে বসে আছে, এই আঁটো শরীরের যুবতী, নারকোল পাতার মতন ঝকঝকে কালচে-নীল রং, চোখেমুখে বিচ্ছুরিত আলো—এই সেই ভবানীপুরের রেণু!

মহিম হালদার স্ট্রিটের এক পুরোনো বাড়িতে আমরা পাশাপাশি ভাড়াটে থাকতাম। রেণুর বাবা পোস্ট অফিসে কাজ করতেন, ওরা সাত ভাই-বোন ছিল, জিরজিরে নড়বড়ে সংসার। এতদিনে আর একটা পোস্ট অফিসের কেরানি কিংবা কোর্টের মুহুরির সঙ্গে বিয়ে হয়ে রেণুরও চার-পাঁচ সন্তান বিইয়ে চেতলা কিংবা উলটোডাঙ্গায় সংসার পেতে বসার কথা ছিল। তার বদলে, রেণু অনর্গল ইংরেজি আর ফরাসি বলছে, ছুটি কাটাতে যায় সুইজারল্যান্ডে, নামের আগে ডক্টরেটের শোভা বা বোমা। জীবনে কিছুই মেলে না।

রেণু কিন্তু কিছুই মেলে না বলছে অন্য মানে ভেবে। এক হিসেবে ওর সবই ঠিকঠাক মিলে গেছে। রেণু আর আমি ছিলাম একেবারে সমান বয়সি। সাত বছর বয়েস থেকে বারো বছর পর্যন্ত আমরা একবাড়িতে পাশাপাশি ছিলাম। রেণু আর আমি এক ক্লাসে পড়তুম। রেণুর স্বভাব ছিল অনেকটা ছেলেদের মতন, কালো-রোগা চেহারা, প্রায়ই কানে পুঁজ হত, দশ-এগারো বছর বয়সে রেণুর মাথায় উকুন হয়েছিল বলে ওর মা ওকে ন্যাড়া করে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট চুল, রেণু তখন অবিকল ছেলেদের মতন, তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে ছোটাছুটি করত, আমি যখন ঘুড়ি ওড়াতুম, তখন লাটাই ধরত রেণু। সুতো মাঞ্জা দেওয়ার সময় ওকে দিয়ে হামানদিস্তেয় কাচ গুঁড়ো করাতুম। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে আমি কাঞ্চনজঙঘা সিরিজের বই এনে ওকেও পড়তে দিতুম বলে রেণু আমাকে ওর মায়ের কুলের আচার চুরি করে এনে খাওয়াত। রেণুর সঙ্গে ওরকম বন্ধুত্ব ছিল বলেই মেয়েদের সম্পর্কে কোনও আলাদা কৌতূহল তখনও জাগেনি। আমি আর একটা মেয়ে যে কীসে আলাদা—তা বুঝিনি। হাফ প্যান্ট কিংবা ফ্রকের রহস্যের কথা মনে আসেনি। ছাতের ঘরে রেণু আর আমি—বারো বছরের দুই কিশোর-কিশোরী যখন পাশাপাশি শুয়ে বই পড়তুম—তখন কখনও আমার ইচ্ছে হয়নি রেণুর জামার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিই। চুমু খাওয়ার ব্যাপার তো জানতুমই না।

কিন্তু, সেই ভবানীপুরের এঁদো বাড়ির গুমোট সংসারে মাঝেমাঝে বিলেতের হাওয়া আসত। রেণুর এক জ্যাঠামশাই বহুকাল ধরে ইংল্যান্ডে প্রবাসী। কবে যেন ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন, আর ফেরেননি, কোনওদিন ফিরবেনও না। তিনি মাঝেমাঝে ওদের উপহার পাঠাতেন। কী সুন্দর সব প্যাকেট আসত, রেণুদের ভাইবোনদের জন্য চমৎকার রঙিন সোয়েটার আর জামা। রেণুদের সেইরকম প্যাকেট এলে হিংসেয় আমার বুক জ্বলে যেত। আর আসত ছবির পোস্টকার্ড। রেণুর জ্যাঠামশাই ফ্রান্স, ডেনমারক, হল্যান্ড বেড়াতে গেলে সেইসব জায়গা থেকে ছবির পোস্টকার্ডে ওদের চিঠি পাঠাতেন।

আমাদের পরিবারে কেউ কখনও বিলেত যাওয়া তো দূরের কথা, বাংলাদেশের বাইরেও আমাদের কোনও আত্মীয়-স্বজন ছিল না। আমরা কখনও ওরকম চিঠি পাইনি। রেণু এই এক ব্যাপারে আমায় টেক্কা দিত। আলতোভাবে পিকচার পোস্টকার্ডগুলো ধরে আমাকে দেখাত, আমি হাত দিতে

গেলে বলত, এই, এই, ওরকম ভাবে ধরে না, বাবা বলেছেন, ছবির মাঝখানে আঙুল লাগলে ছবি খারাপ হয়ে যায়। আমি তখন রেগে বলতুম যা যা, দেখতে চাই না, ভারী তো ছবি!

রেণু বলত, জানিস, আমিও একদিন বিলেতে যাব! ইজেরের দড়ি ছিঁড়ে গেছে বলে বাঁ-হাত দিয়ে ইজেরটা চেপে ধরা ঢলঢলে ফ্রকটা কাঁধ থেকে বারবার নেমে যাচ্ছে, কদম ছাঁটা চুল, নাক দিয়ে ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে শিকনি টানছে একটা কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে—সে বিলেতে যাবে! আমি হি-হি, ইল্লি আর টকের আলু, অত খায় না।

রেণু বলত, হ্যাঁ, দ্যাখ না, জেঠু লিখেছেন, আমি ভালো করে লেখাপড়া করলে আমাকেও বিলেত নিয়ে যাবেন। বাবা তো লিখেছিলেন, আমি এবার ফার্স্ট হয়েছি।

আমি বলতুম, ভ্যাট, মেয়েরা আবার বিলেতে যায় নাকি? দেখিস, আমিই বরং একদিন বিলেত যাব।

—তুই বিলেত যাবি? হি-হি, তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস এবার।

—তাতে কী হয়! আমি জাহাজে চাকরি নেব, আমি নাবিক হয়ে সারা পৃথিবী ঘুরব।

—তোর যা প্যাংলা চেহারা, তোকে জাহাজে চাকরি দেবে না ছাই!

আমি তখন ঠাঁই করে রেণুর মাথায় একটি চাঁটি মেরে বলতুম, আমি প্যাংলা? আর তুই কী রে কেলটি?

তখন ঝটাপটি মারামারি শুরু হত।

আবার যখন দুজনে খুব ভাব থাকত, রেণু আর আমি পাশাপাশি গায়ে গা ঠেকিয়ে বসে সেই ছবির পোস্টকার্ড দেখতুম। জ্যাঠামশাই-এর চিঠি পড়ে পড়ে রেণু আমার তুলনায় বেশি জানত, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলত, এই যে এটা দেখছিস, এটার নাম নতরদাম গিরজা, সেই যে বইটা পড়লুম হাঞ্চব্যাক অব নতরদাম—সেই একই, একদিন আমি এটার পাশ দিয়ে হাঁটব, ভেতরে ঢুকব,...এটার নাম টাওয়ার অব লন্ডন, এটা আসলে একটা দুর্গ—ইতিহাসে পড়িসনি, এটার মধ্যে ওয়াল্টার র‍্যালেকে বন্দি করে রেখেছিল—কত দেখার জিনিস আছে এর মধ্যে, জেঠু লিখেছেন আমাদের কোহিনূর হীরেও ওখানে আছে,...এই জায়গাটার নাম ভেনিস...এখানে জলের রাস্তা...আমি একদিন এখানে বেড়াব, উঃ সেদিন যা লাগবে না আমার!

আমি নেহাত গায়ের জোরে বলার চেষ্টা করতুম, দেখিস, আমিও ঠিক যাব। হঠাৎ একদিন বিলেতের রাস্তায় দেখা হয়ে যাবে। ভারী তোর জ্যাঠামশাই আছে, আমি একাই...

পরের বছর রেণুর বাবা পাটনায় বদলি হয়ে যেতে ওরা সবাই পাটনা চলে যায়। আমরাও ভবানীপুরের বাড়ি ছেড়ে পাইকপাড়ায় উঠে গেলাম। তারপর, সেখানকার ইস্কুলে বিমল বলে গোঁফকামানো বখা ছেলের সঙ্গে ভাব হল, সে আমায় ছাদের ট্যাংকের পাশে বসে সিগারেট খাওয়া ও আরও সব অসভ্যতা শেখাতে লাগল, তার সঙ্গে আমি দুপুরে টিফিন পালিয়ে সিনেমায় যাওয়া শুরু করলুম। অর্থাৎ বড়দের নিষিদ্ধ জগতে প্রবেশের উত্তেজনায় তখন আমি ব্যাকুল, তখন কোথায় রেণু হারিয়ে গেল। রেণুর আর খোঁজ রাখিনি।

কিন্তু রেণুর সব মিলে গেছে। রেণু পড়াশুনোয় ভালো ছিল। জ্যাঠামশাই-এর বিশেষ সাহায্য নিতে হয়নি, রেণু এম. এস. সি-তে বটানিতে ফার্স্টক্লাস পেয়েছিল, সুতরাং স্কলারশিপ পেতে তেমন অসুবিধে হল না। ছেলেবেলায় জ্যাঠামশাই-এর সেইসব পিকচার পোস্টকার্ড দেখে ওর যে বিলেত যাওয়ার তীব্র ইচ্ছে জেগেছিল—সেই ইচ্ছের জোরেই ও পড়াশুনোয় অত ভালো করেছে। ওদের পরিবারে তেমন শিক্ষার আবহাওয়া ছিল না, ওর ভাই বোনরা কেউ বেশিদূর এগোতে পারেনি। রেণু আমাকে বলত, তুই বিলেত যাবি কী করে? তুই তো অঙ্কে গাড্ডু পেয়েছিস! অঙ্ক না জানলে আর লেখা পড়া হয়? সেই রোগা কালো মেয়েটা কিন্তু অঙ্কে তখন একশো পেত। পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুলে গর্বের সঙ্গে রেণু বলত, দেখিস, আমি ঠিক বিলেত যাব, জেঠুর কাছে

থাকব, কত দেশ বেড়াব, ইস, তখন যা মজা হবে—আমার চেহারাও ভালো হয়ে যাবে...ফরসা হব...

রেণুর সব মিলে গেছে। ফরসা হয়নি বটে, কিন্তু শরীরে একটা সুস্বাস্থ্যের উজ্জ্বল আভা এসেছে, রং মেলানো রুচিময় পোশাক, পাঁচ বছর বিলেতে থেকে ও এখন ঝানু প্রবাসী। ছুটিতে সত্যিই সেই ছেলেবেলার স্বপ্নের মতো সুইডেন কিংবা ইটালি বেড়াতে যায়।

আর, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মতন আমিও দৈবাৎ বিদেশে চলে এলাম, এবং রেণুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। মাঝখানে কত বছর দেখা হয়নি, শৈশবের চেনা ডাক এক মুহূর্তে মনে পড়ল। ভারতীয় দূতাবাসের পার্টিতে ভিড় ঠেলে রেণু আমার সামনে এসে বলল, কী রে নীলু, তুই? সত্যিই তুই...। দুর্ঘটনার মতন এই ছেলেবেলার কথা মিলে যাওয়া। কিছুতেই যেন বিশ্বাস হয় না।

রেণু নদীতে একটা ঢিল ছুড়ে আবার বলল, কিছুই মেলে না, না রে?

আমি বললুম, কোথায় মেলেনি? তোর ছেলেবেলার সব কথাই তো মিলে গেল।

রেণু উদাসীনভাবে ঠোঁট উলটে বলল, দূর! কিছু না!

—তুই ওই মাদ্রাজিটাকে বিয়ে করলি কেন?

রেণু মুখ ফিরিয়ে খানিকটা রাগি গলায় বলল, কী অসভ্য! 'মাদ্রাজিটা' কী? নাম নেই?

—রাগ করছিস কেন? আমি অবহেলা দেখাবার জন্যে বলিনি। খটমটো নাম তো, কী নাম যেন? কানাড় চেনাস্বামী। হঠাৎ ওর সঙ্গে তোর কী করে বিয়ে হল?

—হঠাৎ আবার কী! ভালো লেগেছে, তাই! তুই কি ভেবেছিলি আমি তোকে বিয়ে করার জন্যে বসে থাকব? তোর মতন একটা হুঁৎকো কালো-ভাল্লুক!

—আহা, তুই পায়ে ধরে সাধলেও যেন আমি তোকে বিয়ে করতুম!

তোর পায়ে ধরে সাধব? কী ভাবিস রে তুই নিজেকে?

—রেণু, তোর কথাবার্তা এখনও কীরকম ছেলে-ছেলে! চেহারাখানা তো বেশ সুন্দর করেছিস, স্বভাবটা একটু মেয়েলি করতে পারলি না।

—মেয়েলি স্বভাব হলে আর এ দেশে টিকতে হত না।

—বাজে কথা বলিস না। আমি কত মেমকে দেখেছি, কী নরম আর ঠান্ডা স্বভাব।

—ইস, খুব মেম দেখা হয়েছে! তোকে কেউ পাত্তা দিয়েছে!

—তোর স্বামীর সঙ্গে তুই কি ভাষায় কথা বলিস? সবসময় ইংরেজিতে?

—ও কী সুন্দর বাংলা জানে, তুই অবাক হয়ে যাবি। শান্তিনিকেতনে পড়ত।

সন্ধে গাঢ় হয়ে এসেছিল, ইফেল টাওয়ারের সব আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। ল্যাটিন কোয়ার্টার্সের দিকে একটা গোলমাল শোনা গেল, কিছু লোক ছুটোছুটি করছে, বোধহয় কোনও আলজিরিয়ান চোর ধরা পড়েছে। আমরা উঠে পড়লুম। রেণুর স্বামী খুব সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ, লাইব্রেরিতে পড়াশুনো করতে গেছেন, আমাদের সঙ্গে ন'টার সময় মঁমার্তে-র একটা সিনেমা হলের সামনে দেখা করবেন। নতরদাম গির্জার বাগানে কী সব খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, আজ ভেতরে ঢোকা যাবে না। আমরা দুজনে গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে চাইলুম। কতবার সিনেমায় দেখেছি এসব, গির্জার দড়ি ধরে ঝুলে কোয়াসিমোদা বিদ্যুৎবেগে এসেছিল এসমারেল্ডার কাছে...হঠাৎ আমার মনে পড়ল, রেণুর জ্যাঠামশাই-এর ছবির পোস্টকার্ডের কথা! আমি রেণু, তোর মনে আছে? সেই ছবি, তুই বলেছিলি, একদিন এর সামনে দাঁড়াব...এই তো আমরা দাঁড়িয়ে...সব মিলে গেল।

—কিছুই মেলে না!

—তার মানে?

—তুই বুঝবি না! ভালো লাগছে না! চল এখান থেকে চলে যাই...

—ভালো লাগছে না? কেন?

রেণু উত্তর দিল না। নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল। রেণুর চেহারায় ব্যক্তিত্ব এসেছে, পাশ দিয়ে কত হালকা ফুরফুরে ফরাসি সুন্দরীরা হেঁটে যাচ্ছে—তার মাঝখানেও আজ রেণুকে রূপসি মনে হয়। ছেলেবেলার বান্ধবীর হাতে-হাতে ধরে বেড়াবার অপূর্ব মাদকতা ভোগ করছিলুম আমি, রেণুর হাতে সামান্য চাপ দিলুম! রেণু বলল, কী?

আমি বললুম, তোর ভালো লাগছে না কেন রে রেণু? আমার তো বিষম ভালো লাগছে।

রেণু ভ্রূভঙ্গি করে বলল, তুই আছিস বলেই ভালো লাগছে না। কেন যে মরতে তোর সঙ্গে দেখা হল এখানে?

আমি অপমানিত বা আহত হব কি না ঠিক করতে পারলুম না, রেণুর গলার সুরটা ঠাট্টার কিনা বোঝা যায় না। জিগ্যেস করলুম, আমি আছি বলে? তোর স্বামীর জন্য মন কেমন করছে নাকি? বাবা রে বাবা, একটু পরেই তো দেখা হবে।

রেণু আমার দিকে রহস্যময়ভাবে তাকাল। কিছু একটা বলতে গিয়েও থেমে গেল। তারপর বলল, চল, কোনও কাফেতে গিয়ে বসি। সাঁজেলিঝেতে যাবি? না থাক, মঁমার্তেই গিয়ে বসা যাক্, ওখানে তো যেতেই হবে!

আমরা টুপ করে মাটির নীচে নেমে গেলুম। মেট্রোতে চেপে মঁমার্তে এসে ফের মাটির ওপরে উঠলুম। খানিকটা ঢালু রাস্তা ধরে নেমে এসে একটা মজার ধরনের কাফে রেণুই খুঁজে বার করল—চত্বরের মধ্যে অনেকগুলো রঙিন ছাতার নীচে টেবিল পাতা, মৃদু আলো স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। রেণু ফরাসি বলে অনর্গল—হ্যাম স্যান্ডউইচ আর কফির অর্ডার দিয়ে আমার জন্যে এক বোতল ওয়াইনও নিল। একজন দাড়িওয়ালা আর্টিস্ট এসে বলল, মস্যিও-মাদাম, আপনাদের ছবি এঁকে দেব? এক্ষুনি? মাত্র দশ ফ্রাঁ লাগবে—

আমি রেণুকে বললুম, ছবি আঁকাবি?

রেণু বলল, ভ্যাট! তুই শুধু নিজেরটা আঁকা!

—না দুজনের একসঙ্গে।

—না! তুই আঁকা! আমি পরে এসে আমার স্বামীর সঙ্গে একসঙ্গে আঁকাব।

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, বিলেতে এলে কি হয়, আসলে একেবারে ভেতো বাঙালি। সংস্কারের ডিপো। কেন, আমার সঙ্গে একসঙ্গে ছবি আঁকালে কী হত? সতীত্বে কলঙ্ক হত!

রেণু হাত নেড়ে আর্টিস্টকে বারণ করে দিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, নীলু, তোকে একটা সত্যি কথা বলব? কিছু মনে করবি না?

—এত ভণিতা কেন? বল না!

—তোর সঙ্গে দেখা হয়ে আমার ভালো লাগছে না! কেন যে সেদিন পার্টিতে আমি সেধে তোর সঙ্গে কথা বলতে গেলুম!

—আমাকে ভালো লাগছে না?

—না!

আমি থতোমতো খেয়ে গেলুম। উনিত্রিশ বছরের জীবনে কম দুঃখ পাইনি, কিন্তু কোনও মেয়ে এ পর্যন্ত মুখের ওপর বলেনি, আমাকে ভালো লাগছে না। আর রেণু? আমার শৈশবের বান্ধবী, যাকে দেখে আমি উল্লসিত হয়ে উঠেছিলুম, আকস্মিক বিস্ময়ের ঘোর এখনও কাটেনি, সেই রেণু!

আমি দীর্ঘ চুমুকে গেলাসের পানীয় শেষ করলুম। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেট-দেশলাই

গুছিয়ে নিয়ে বললুম, আমার রাস্তা চিনতে কোনও অসুবিধে হবে না। আমি আমার হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।

বিল মেটাবার জন্য আমি ফ্র্যাঙ্কের নোটগুলো বার করছিলুম পকেট থেকে, রেণু বলল, তোকে টাকা দিতে হবে না। আমি এখানে আর একটু বসব। ও তো নটার সময় আসবে—

—আচ্ছা রেণু, আমি চলি।

—তোর একা থাকতে খারাপ লাগবে? কী করব বল, তুই একটা অপয়া, তোর সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার ক্রমশ বেশি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে, তুই বরং—

—ঠিক আছে, আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না, আমি একা থাকব না, উইশ ইউ ভেরি গুড টাইম...

রেণু আর কথা না বলে চেয়ে রইল, আমি চেয়ারের ওপর থেকে রেনকোটটা তুলে নিয়ে উঠে পড়লাম। আর পিছনে না চেয়ে বেরিয়ে পড়লাম রেস্তোরাঁ থেকে। সবেমাত্র রাস্তায় পা দিয়েছি, অমনি রেণু চেঁচিয়ে উঠল, এই সুনীল, একটা কথা—

দৃশ্যটা এমনিতেই বিসদৃশ। পুরুষ ও মহিলা একসঙ্গে এসে ঢুকল, তারপর মহিলাকে একা রেখে পুরুষের চলে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু, তারপর রেণুর ওই রকম বাংলা ভাষায় চিৎকার—অনেকেই ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। আমি বাধ্য হয়েই ফিরলাম। রেণু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে, মুখে অকপট বিস্ময়, বলল, একটা কথা, তুই রাগ করছিস না তো? বুঝতে পেরেছিস তো, আমি কী বলতে চাই?

আমি নিজেকে সামলাতে পারছিলুম না, অসম্ভব অভিমান আমার বুকে বাষ্প হয়ে জমছিল, তবু অতিকষ্টে স্বাভাবিক গলায় বললুম, না রে, রাগ করব কেন? সবার তো আর ভালোলাগা একরকম নয়।

—ও মা, তুই সত্যি ভীষণ রেগে গেছিস। একটু বোস প্লিজ, একটুখানি—রাগ করিস না।

রেণুর কণ্ঠস্বর ব্যাকুল। হাত বাড়িয়ে আমার কোটের প্রান্ত ধরে আমাকে জোর করে চেয়ারে বসাতে চাইল। আমি অগত্যা বসে রুক্ষ গলায় বললুম, কী ছেলেমানুষি করছিস, রেণু? সবাই দেখছে—ভাবছে আমি ঝগড়া করছি তোর সঙ্গে। আমাকে তোর ভালো লাগছে না—আমি চলে যাচ্ছি, সোজা কথা, এর মধ্যে রাগের কী আছে?

—তোকে আমার ভালো লাগছে না? কে বলল?

—তুই-ই তো বললি।

—আমি বললুম? কখন?

—কী ন্যাকামি হচ্ছে, রেণু? প্যারিসের রেস্তোরাঁ না হলে কান ধরে এক চাঁটি মারতুম। তুই চাসনি, আমি এখান থেকে চলে যাই?

টেবিলের ওপর মাথা ঝুঁকিয়ে আচ্ছন্নের মতন বসে আছে রেণু। আঙুল দিয়ে টেবিলের ওপর দাগ কাটতে-কাটতে বলল, আমার মনে হচ্ছে, তোর চলে যাওয়াই ভালো—তোর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমার কিছুই তেমন ভালো লাগছে না, কিন্তু তোকে আমার ভালো লাগবে না কেন?

—থাক, আর বলার দরকার নেই। রেণু, তুই নিশ্চয়ই জানিস, তোর সম্বন্ধে আমার কোনওই দুর্বলতা নেই। পনেরো-ষোলো বছর তোকে দেখিইনি, তোর কথাও মনে ছিল না। হঠাৎ দেখা হল, চিনতে পারলুম, স্বাভাবিকভাবেই সবার ভালো লাগে বিদেশে এরকম হঠাৎ দেখা হলে—এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। এর মধ্যে বিশেষ ভালোলাগা মন্দলাগা কিছু নেই। তুই যদি অন্যকিছু ভেবে থাকিস—

রেণু যেন আমার কথা শুনলই না। বলল, তুই এখনও রেগে আছিস। তোকে ভালো লাগছে না, কখন বললাম? তোকে ভালো না লাগার মানে তো নিজের ছেলেবেলাকেই ভালো না লাগা।

মুশকিল হয়েছে কী জানিস, ছেলেবেলাটাকেই এখন বেশি ভালো লাগছে। সেই জন্যই তো তোকে চলে যেতে বললাম।

—ধাঁধা শুরু করেছিস এবার। রেণু তুই অনেক বদলেছিস, চালিয়াতও হয়েছিস খুব। আমার অত চালিয়াতি পোষায় না। আমার ভালোলাগা মন্দলাগা দুটোই খুব সরল।

—তুই এখনও বুঝতে পারলি না? শোন, প্যারিসে এসেছি বেড়াতে, ঘুরব, আনন্দ করব, তাই করছিলুমও, হঠাৎ তোর সঙ্গে দেখা হল। তুই তো আর কিছু না, তুই আমার ছেলেবেলা। ছেলেবেলার কথা মনে পড়তেই সব গোলমাল হয়ে গেল এখন আর এখানে কিছু ভালো লাগছে না। তোর ভালো লাগছে?

—ছেলেবেলাটা কী এমন মধুর ছিল!

—ছেলেবেলায় সেইসব স্বপ্ন? ছেলেবেলায় ভাবতুম, এখানে এলে কী অসম্ভব ভালো লাগবে। কই, সেরকম ভালো লাগছে? সত্যি করে বল!

—আমার তো ভালোই লাগছে।

—তুই কিছু বুঝিস না! কিংবা তোর ছেলেবলোর কথা মনেই পড়েনি। আমি যখনই ভাবছি ছেলেবেলার কথা, তখন কত বেশি ভালো লাগার কথা কল্পনা করতুম—সেই তুলনায় কি এমন...কিছুই মেলে না, এই তো প্যারিস, এই তো মঁমার্ত, এই তো শা নোয়া রেস্তোরাঁ—কিন্তু কী এমন মনে হচ্ছে, এমন কিছুই না। তুই সব মাটি করে দিলি!

—আমি?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই। এর আগে, আমার স্বামীর সঙ্গে বেড়াতুম, তুই বোধহয় ভুল ভাবছিস—আমাদের দুজনের মধ্যে কোনও ফাটল নেই, আমরা দুজনে দুজকে খুব ভালোবাসি, ও এমন চমৎকার লোক যে ভালো না বেসে পারা যায় না—ওর সঙ্গে যখন বেড়াই তখন আর সবার যেমন ভালো লাগে—আমারও সেই রকম, এখানকার যে আমি—তার ভালো লাগা! কিন্তু তুই এলি আমার ছেলেবেলাটাকে নিয়ে, সেই চোখ দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখছি কিছুই মিলছে না! কোথায় সেই অপূর্ব ভালোলাগার দেশ—ছেলেবেলায় যার কথা ভাবতুম। এই যে প্যারিস—জগৎবিখ্যাত—এও হেরে গেল।

—রেণু, ছেলেবেলার মতন কি আর বয়স্কদের সত্যিই এত বেশি ভালো লাগে? আমাদের তিরিশের কাছাকাছি বয়েস—এখন আর কিছু দেখে আচ্ছন্ন হওয়ার মতন—

—সেই কথাই বলছি! তোর সঙ্গে দেখা না হলে—আমার স্বামীর সঙ্গে বয়স্কদের মতন ভালো লাগত—কিন্তু তুই কেন ছেলেবেলাটাকে...আঃ, কেন যে পনেরো বছর বাদে ভূতের মতন এসে উদয় হলি—তাই তো মনে হল, তুই চলে গেলেই আবার এখানকার বয়সে ফিরে আসব, এখানকার চোখে সবকিছু—

—রেণু, আমি বুঝতে পেরেছি। আমি চলেই যাচ্ছি। কিন্তু, একবার মনে পড়লে আর কি ভুলতে পারবি?

॥ ছয় ॥

গ্রিস থেকে যখন কেউ কায়রো আসবেন বিমানে, সকালে আসবেন না। দুপুরেও না। রাত্রে আসার তো কোনওই মানে হয় না। বিকেলে আসবেন, যখনও ঠিক সন্ধে হয়নি, অথচ রোদ্দুরের তেজ মরে গেছে। আলো তখনও আছে, কিন্তু তাপ নেই।

আথেনসের বিমান বন্দরটা ছোট। এপাশে সমুদ্র, ওপাশে পাহাড়ের সারি, মাঝখানের সমতল

উপত্যকায় ছোট্ট বাড়ি। আকাশে মেঘ নেই, গ্রিসের আকাশে কদাচিৎ মেঘ থাকে।

প্রতীক্ষাগৃহ থেকে হয়তো কিছুটা হেঁটে গিয়ে আপনাকে প্লেনে উঠতে হবে। অথবা প্লেন আসতে যদি দেরি হয়, কিছুটা হয়তো অপেক্ষা করতে হবে এয়ারপোর্টে। আপনার ভালোই লাগবে, নাকে আসবে সমুদ্রের লবণ হাওয়া, আপনার বুকের মধ্যে একটু-একটু ড্রিমড্রিম শব্দ হবে।

না, আমি এয়ারপোর্টের বর্ণনা লিখতে বসিনি। একটি আলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করতে চলেছি।

গ্রিস ভ্রমণের চেয়ে, গ্রিস ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্তটিও কম আকর্ষণীয় নয়। প্লেন আসার পর আপনি গিয়ে প্লেনে উঠলেন। সিট বেল্ট বাঁধলেন কোমরে, কানে তালা লাগানো শব্দ, হাওয়ার জাহাজ হাওয়ায় উঠল।

তখনও আপনার বিশেষ কিছু মনে হবে না। প্লেনে চড়ার অভিজ্ঞতা আপনার তো নতুন নয়, বরং বিরক্ত হয়ে উঠেছেন, এখন যে-কোনওদিন প্লেনে উঠেই কত তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছনো যায়, সেই জন্যই আপনার ব্যস্ততা থাকে। এবার প্লেন যখন শূন্যে উঠে সমান হয়েছে, উড়ে চলেছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে, আপনি কোমর থেকে সিট বেল্ট খুলে সিগারেট ধরিয়েছেন, ছেড়ে আসা গ্রিসের জন্য সামান্য বুক টনটন করছে। সেই স্বপ্নের গ্রিস, দেখা হয়ে গেল, এখন বিদায়। হয়তো আপনার ইচ্ছে হবে—যদি ভাগ্যবশত জানালার ধারের সিট পান—জানলা দিয়ে একবার শেষবার গ্রিসের দিকে তাকাতে। শেষবার অ্যাক্রোপলিসের দিকে দেখে নিতে। আপনি পিছন ফিরে তাকাবেন, আর সঙ্গে-সঙ্গে চমকে উঠবেন বিষমভাবে।

ও কী! পিছনের আকাশটা দাউ দাউ করে জ্বলছে শেষ গোধূলিতে। যেন ভয়ংকর আগুন লেগে গেছে গ্রিসে—আপনি আসার ঠিক পরেই কি একরকম অগ্নিকাণ্ড হল? বিষম বিস্ময়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর একটু একটু করে আপনার মনে পড়বে—ওই আগুন ইউরোপের আগুন। পিছন দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে অপনি সামনের দিকে তাকাবেন। সামনের আকাশ নিকষ কালো। বিষম অন্ধকার ওই মিশরের দিকে। মিশর নয়, সমস্ত প্রাচ্যে অন্ধকার। সূর্য প্রাচ্যদেশে আগে ওঠে, আগেই অস্ত যায়। তাই সামনের দিকে দেখবেন সন্ধ্যা নেমে গেছে, পিছনের দিকে তবুও শেষ সূর্যের আগুন।

তৎক্ষণাৎ আপনার মনে পড়বে আপনি পাশ্চাত্য দেশ ছেড়ে এসেছেন, এই মাত্র, আপনি প্রাচ্যে প্রবেশ করছেন। আমি ধরেই নিয়েছি, আপনি প্রাচ্যদেশের লোক, ভারতবর্ষের হয়তো কোনও বাঙালি যুবা। আপনি নিজের দেশে ফিরছেন। আপনি এখন ভূমধ্যসাগরের ওপরে আছেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সন্ধিস্থলে, আপনার গা ছমছম করবে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের একটি চরিত্র নদীয়া আর যশোর জেলার সীমান্তে একটি গাছতলায় দাঁড়িয়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিল! এখানে দুটো জেলা এসে মিলেছে, দুই চরিত্র! আর আপনি এখন আছেন দুই পৃথিবীর মাঝখানে—প্রাচী ও প্রতীচীর মধ্যে আপনি ত্রিশঙ্কু। সামনে অন্ধকার পিছনে আগুন। একদিন সভ্যতা জেগে উঠেছিল প্রাচ্যে, এখন অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে। আর পিছনে, পাশ্চাত্যে সভ্যতা এখন জ্বলছে দাউ-দাউ করে, হয়তো শিগগিরই পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

এই উপলব্ধি মাত্রই এক ধরনের অলৌকিক অনুভব হবে আপনার। হঠাৎ আপনার গলা থেকে টাই খুলে ফেলতে ইচ্ছে হবে। মুখ ও নাক দিয়ে যুগপৎ একটা বড় নিশ্বাস ফেলা মাত্র আপনার মুখের চেহারা বদলে যাবে। ইউরোপ বা আমেরিকা—পশ্চিমের যে-কোনও দেশে থাকার সময় আপনার মুখটা অন্যরকম হয়ে যায়—হাসি অন্যরকম, গলার স্বর অন্যরকম, হাঁটা অন্যরকম, চাহনি অন্যরকম। চেষ্টা করে ভুরু টান করে রাখতে হয়—নচেৎ অনিচ্ছায় বারবার ভুরু কুঁচকে আসে। জুতোর ডগায় ধুলো লাগলে অস্বস্তি হয়, প্যান্টের ক্রিজ ঠিক না থাকলে বিরক্তি আসে, বারবার নিজের গলার কাছে হাত চলে যায়—টাইয়ের গিঁট ঠিক আছে কি না দেখার জন্য। হাঁচি পেলে হাঁচা যায় না, সর্দি লুকোতে হয় রুমালে, খাওয়ার পর ঢেকুর তোলা তো রীতিমতো পাপ। চা খাওয়ার

সময় ভয় হয়—পাছে সপসপ শব্দ না হয়ে যায়। আর তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই—আসলে আপনি পুবের লোক—পশ্চিমে গিয়ে অন্যরকম। পশ্চিমে সাহেব-সুবোর পাশে দাঁড়ানো আপনার ছবি দেখে আপনার বাড়িতে সকলে বলেছে, ওম, কত বদলে গেছে! আসলে আপনি বদলাননি, যা বদলেছে তা আপনার অভিব্যক্তি, সাময়িকভাবে বদলেছে মুখের রেখা।

যেই মাত্র আপনি অনুভব করলেন, আপনি পশ্চিম ছেড়ে এসেছেন, অমনি—(না, আপনার কাঁধ থেকে ভূত নেমে গেল—এ কথা বলব না, অনেকের শেষ পর্যন্ত নামে না—) আপনার সেই কৃত্রিম মুখের রেখা মিলিয়ে যাবে, আপনার উদ্ভাসিত মুখ সেই আপনার পুরোনো নিজস্ব মুখ। আপনার বোধ হবে আপনি নিজভূমিতে ফিরে এলেন—মিশর আপনার দেশ নয়, কিন্তু সেই একই মাটি—যে মাটির সঙ্গে আপনার দেশ যুক্ত। একা একা বসেও আপনার মুখের নিঃশব্দ হাসিটি মনে হবে বাংলা ভাষায় হাসি। আপনার মনে হবে হঠাৎ আপনার শরীর খুব হালকা হয়ে গেছে।

আমার মনে হয়েছিল।

॥ সাত ॥

কমনওয়েলথ রিলেশানস অফিসের তত্ত্বধানে ব্রিটিশ সরকারের অতিথি হয়ে ছিলাম লন্ডনে। একজন অমায়িক প্রদর্শক এবং সরকারি মোটরগাড়ি করে খুব ঘোরাঘুরি করছি। ব্রিটিশের অধীনে কলকাতা শহরে যখন ছিলাম, তখন কম ভাড়ার জন্য ট্রামের সেকেন্ড ক্লাসে চড়েছি, কখনও পুরো ভাড়া বাঁচাবার জন্য হাওড়ার বাসে উঠে গেঁয়ো সেজে জিগ্যেস করেছি, এ বাস কি কালীঘাট যাবে? আর এখানে, ভূতপূর্ব রাজার গাড়িতে চেপে চলেছি তাঁরই দেশের ওপর দিয়ে। কিন্তু অভিভূত হয়ে যাইনি, গাড়ি আসতে পাঁচ মিনিট দেরি হলে ভুরু কুঁচকেছি, হোটেলের খাবার যথেষ্ট ভালো না হলে খুঁত-খুঁত করেছি। কিন্তু আমার প্রদর্শক-সঙ্গী যখন খুশি মুখে বললেন, কাল আমরা ফেবার কোম্পানিতে যাব—তোমার সঙ্গে টি. এস. এলিয়টের দেখা হবে—তখন আমি আঁতকে উঠেছি! ত্রাস মিশ্রিত গলায় বলেছি, সে কী?

সঙ্গী বললেন, হ্যাঁ সত্যি, কাল এলিয়টের কাছে যাওয়া হবে!

—কেন?

—বাঃ, আমাদের প্রোগ্রাম সেইভাবে ঠিক করা। অতিথিদের যাঁর যেদিকে ঝোঁক, তাঁর সঙ্গে সেই ধরনের বিখ্যাত লোকদের দেখা করিয়া দেওয়া হয়। তুমি এলিয়ট, স্পেনডার, টি এল, এস-এর সম্পাদক আরথার কুক—এদের সঙ্গে দেখা করবে!

—এ তো মহা মুশকিল দেখছি!

সঙ্গী এবার বিস্মিত হয়ে বললেন, কেন, এলিয়টের সঙ্গে দেখা করতে তোমার ইচ্ছে হয় না? এ এক কত বড় সুযোগ! তুমি নিশ্চয়ই এলিয়টের—

—হ্যাঁ পড়েছি। তুমি যদি চাও, আমি গড়গড় করে পাতার পর পাতা আবৃত্তি করে যেতে পারি। কিন্তু, তার সঙ্গে দেখা করার কী সম্পর্ক? আমি কি ওঁর সামনে গিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকব, না বলব, আপনি সত্যিই খুব ভালো লেখেন! ওঁর সামনে আমি সামান্য মানুষ—শুধু শুধু সময় নষ্ট করব কেন?

আমার সঙ্গী পিঠ চাপড়াবার ভঙ্গিতে বললেন, নিজেকে অত ছোট ভাবতে নেই। যতবড় প্রতিভাবানই হোন, উনিও একজন মানুষ। মানুষের সঙ্গে মানুষ দেখা করতে যাবে—এ তো স্বাভাবিক। খুব বেশি বিনয় আবার হীনতাবোধ এনে দেয়।

আমি এবার একটু দুষ্টুমির হাসি ছাড়লুম। তারপর বললুম, শুধু তোমাকেই গোপনে বলছি,

বিনয় মানুষকে অহংকারীও করে। আমি যে যেতে চাইছি না—সেটা আমার অহংকার থেকেই। আমি বীরপূজক নই। আমি ওঁর কাছে যেতে চাই না—কারণ, আমি ওঁর জীবনী, লেখা, আদর্শ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানি। কিন্তু উনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। এরকম একতরফা কথাবার্তা আমার ক্লান্তিকর লাগে যাঁর সম্পর্কে আমি পরম শ্রদ্ধাশীল, তাঁর সঙ্গও একটু বাদে আমার বিরক্তিকর লাগে।

সেটা ১৯৬৪-র আগস্ট মাস। ঈষদুষ্ণ সকাল দশটায় ফেবার অ্যান্ড ফেবার কোম্পানির সামনে নামলুম। আমার অনিচ্ছুক মুখে ভদ্রতার হাসি ফোটাবার চেষ্টা করছি। দোতলায় নিরিবিলি অফিস, পুরোনো ধরনের বাড়ি—মনটিথ নামে একজন দীর্ঘদেহী প্রৌঢ়, যিনি ওই কোম্পানির অপর অংশীদার, আমাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, প্রথমেই একটা দুঃখের কথা বলি, মিঃ এলিয়ট আজ আসতে পারবেন না বলে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। ওঁর শরীরটা একটু খারাপ!

ওরা কেউ লক্ষ করল না—আমার বুক থেকে একটা বিরাট স্বস্তির নিশ্বাস বেরিয়ে এল। যাক, বাঁচা গেল।

কিছুক্ষণ মামুলি ধরাবাঁধা কথা হল। ইংলন্ডের তরুণ কবিদের কবিতা কী-রকম বিক্রি হয়। ফেবার অ্যান্ড ফেবার থেকে কয়েকজন তরুণের বই লেখা প্রকাশ করা হয়েছে তাদের জনপ্রিয়তা—বাংলাদেশের কবিরা প্রকাশক পায় কি না—ইত্যাদি। কথায়-কথায় তিনি জিগ্যেস করলেন, বাংলাদেশে এলিয়টের লেখা কেউ পড়ে কি না।

আমি বললুম, বিক্রি দেখে বুঝতে পারেন না? কলকাতায় কত বই বিক্রি হয়, নিশ্চয়ই জানেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার ধারণা, কলকাতায় কিছু ইংরেজি-ভাষী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান আছে, তারাই...

—হা ভগবান! যাক, এ বিষয়ে আর কিছু না বলাই ভালো। তবে একবার সিনেমা হলে আমি একটি সুবেশ, ইংরেজি-ভাষী অ্যাংলো ইন্ডিয়ান দম্পতি দেখেছিলাম, যাঁরা হ্যামলেটের গল্পও জানেন না!

মিঃ মনটিথ এবার বললেন, চলুন, এলিয়ট যে-ঘরে বসে কাজ করেন, সেই ঘরটা আপনাকে দেখিয়ে আনি।

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, না দেখলেও চলে অবশ্য।

—না, না কোনও অসুবিধে নেই।

একজন বিখ্যাত পুরুষ কোন চেয়ারে বসেন, কোন কলমে লেখেন, কোথায় থুতু ফেলেন, এসব দেখায় আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ হয় না কখনও। কিন্তু ওঁরা ভাবছেন, আমি বুঝি দেখলে ধন্য হয়ে যাব।

—ঘরের এই যে দরজাটা দেখছেন, এটা ওঁর ঠাকুরদার বাড়ি থেকে এনে বসিয়েছেন। উনি একটু ঝুঁকে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন, তাই দিনের বেলাতেও আলো। ওই আরাম কেদারায় মাঝেমাঝে বসে বিশ্রাম করেন। ওঁর আজকের ডাকের চিঠিপত্র—উনি নিজের হাতে খাম খুলতে ভালোবাসেন।

এখানে আমি একটা মজার জিনিস দেখতে পেলাম। সেদিনের ডাকের ওপরেই একটা বাংলা বই। একটি চটি কবিতার বই। আমি সেটা খুলে নিয়ে উলটে দেখলাম! উদাসী বাঁশি—প্রাণকৃষ্ণ সাঁতরা। এই ধরনেরই লেখকের নাম ও বইয়ের নাম। আমি আগে কখনও শুনিনি সেই নাম। বাঁকুড়ার এক গ্রাম থেকে একজন শিক্ষক কিছু সরল পদ্য লিখে ছাপিয়েছেন—প্রথম পাতায় ভিক্টোরিয়ান ইংরেজিতে আধপাতা হাতে লেখা এলিয়টের প্রতি উৎসর্গ। সেই উৎসর্গবাণীর মর্মার্থ, আপনি এলিয়ট, আমার গুরু। আমি দূর থেকে একলব্যের মতো আপনার শিষ্য। আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় লিখি,

আপনার কাজ থেকে ভাবের উৎস পাই। ইত্যাদি।

আমি মিঃ মনটিথকে বইটার ব্যাপারে বুঝিয়ে দিয়ে বললুম, আপনি বলেছিলেন বাংলাদেশে এলিয়ট পড়ে কি না? এই দেখুনি, এক গণ্ডগ্রাম থেকে এসেছে।—তারপরই আবার যোগ করলুম, আচ্ছা, এলিয়ট এ বইটা নিয়ে কী করবেন? নিরুপায় হয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতেই ফেলবেন আশা করি।

পরদিন হোটেলে সকালবেলা টেলিফোন। উৎফুল্ল গলায় মিঃ মনটিথ বলছেন, আপনার জন্য সুখবর আছে। এলিয়ট আজ অফিসে এসেছেন। আপনার কথা বলে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে রেখেছি। আজ তিনটের সময় আসুন!

টেলিফোনের এপাশে আমার মুখ বিকৃত হয়ে গেল! এ আবার কী নতুন ঝঞ্ঝাট। কাল ভেবেছিলুম, খুব বেঁচে গেছি। আজ আবার—।

কিন্তু প্রত্যাখ্যান করা হবে চরম রূঢ়তা। ঢোক গিলে রাজি হতেই হল।

আমি ওঁর হাত ছুঁয়ে টেবিলের এপাশে বসেছি। ভিতরে-ভিতরে দুর্বল লাগছে। সাধারণ চেহারার শান্ত মানুষটি, কিন্তু ওঁর পিছনের যে বিশাল জ্যোতির কথা আমি জানি—সেজন্যই দুর্বল হয়ে পড়েছি। ঠান্ডা লেগেছে বলে একটু শুকনো মুখ ও ধরা গলা। গম্ভীর মুখ নয়, কথা বলার সময় ঈষৎ হাসি-মাখা থাকে, নম্র কণ্ঠস্বর। এক সময় ব্যাংকের কেরানি ছিলেন, বন্ধুবান্ধবরা ওঁর কবিতার বই ছাপাবার জন্য চাঁদা তুলেছিল—এই সব মনে করে ওঁকে আমারই মতো সাধারণ মানুষ ভাবার চেষ্টা করে নিজের দুর্বলতা কাটাবার চেষ্টা করছিলাম। ওঁকে আমার একটি মাত্র প্রশ্নই করার ছিল, ওঁর নতুনতম কাব্য সংগ্রহে কিছু ফরাসি কবিতা ঢুকিয়েছেন কেন? ফরাসিদের মুখে শুনেছি, ওগুলো তেমন ভালো হয়নি। কিন্তু জিগ্যেস করতে পারিনি (ভয়েই হয়তো)। উনিই যা-কিছু প্রশ্ন করলেন। প্রথমটায় আমি কবে এসেছি, কবে যাব ইত্যাদি। তারপর মৃদু হেসে, কলকাতার তরুণরা এখনও আমার লেখা পড়ে, না আমি পুরোনো হয়ে গেছি?

এ প্রশ্নের ঠিক প্রত্যক্ষ উত্তর আমি খুঁজে পেলুম না। বললুম, এখনও আপনার কবিতার নিয়মিত অনুবাদ হয় বাংলায়। কয়েক বছর আগে একটা পুরো অনুবাদ-বই বেরিয়েছে, আপনি জানেন বোধ হয়।

বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে। কি যেন অনুবাদকের নাম? আমি বিষ্ণু দে-র কথা বললুম। উনি বললেন, আচ্ছা, ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব—এদের নামে এখনও কি অনেকের নাম রাখা হয়?

—শিবের নানান নাম খুব জনপ্রিয়। আমাদের বাবা-কাকাদের আমল পর্যন্ত শিব-বিষ্ণু-র নামে অনেকের নাম রাখা হত। এখন কমে গেছে। আর ব্রহ্মা ঠিক গৃহদেবতা হিসেবে পূজিত হন না বলেই বোধহয়, তাঁর নামে নাম রাখা হয় না। আমি অন্তত বাংলাদেশে ব্রহ্মা নামের কোনও লোক দেখিনি।

তারপর তিনি অনুবাদ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করলেন। এখনকার বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে দু-একটা কথা জানতে চাইলেন। ঘরে বেশ রোদ এসেছে, মাঝে মাঝে ওঁর চশমায় লেগে ঝলসাচ্ছে সেই রোদ। আমার অস্বস্তিবোধ যায়নি। যদিও কথা বলে যাচ্ছেন—কিন্তু আমার ঠিক কখন উঠে পড়া উচিত বুঝতে পারছি না। হাজার হোক, ইংরেজ—কখনও বুঝতে দেবে না আমার ওঠার সময়। ওই রকমই হয়তো কথা বলে যাবেন। অথচ, হঠাৎ কথার মাঝখানে উঠে পড়াও যায় না।

জানলার দিকে তাকিয়ে উনি বললেন, পৃথিবীর কত দেশে কত নতুন রকমে হয়তো লেখা হচ্ছে। ইংরেজি-ফরাসির মধ্য দিয়ে না এলে আমরা জানতে পারি না। ভারতীয় সাহিত্য বলতে আমরা এখনও সংস্কৃত বা রবীন্দ্রনাথের কথাই জানি। কিন্তু আধুনিক বাংলায় হয়তো এমন লেখা হচ্ছে—যা আমাদের সচকিত করে দিতে পারে। কিন্তু, অনুবাদ না হলে—। সুইডেনের সাহিত্য সম্পর্কেও আমাদের জ্ঞান কম, কিন্তু দাগ হ্যামার-সোলডের লেখা পড়ে আমি অভিভূত হয়ে গেছি! অডেনকে

বলেছি অনুবাদ করতে—শিগগিরই বোধহয় ছাপা হবে।

আমি এই সময় দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, আচ্ছা, এবার আমি যাই।—আপনার অনেকটা সময় নষ্ট করলুম, এ কথাও বলব ভেবেছিলাম, কিন্তু মনে মনেই রয়ে গেল। মনে হচ্ছিল, আমার গলার আওয়াজ ওঁর সামনে বড় কর্কশ শোনাচ্ছে। উনি আমাকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন।

সেদিন কল্পনাও করতে পারিনি, আর মাত্র পাঁচ মাস বাদেই এলিয়টের মৃত্যু হবে।

॥ আট ॥

কান্তিময় ব্যানার্জি আমেরিকায় চার বছর আছেন, এখনও তিনি বুধবার রাত্রে দাড়ি কামান। অর্থাৎ, কাজে যাওয়ার জন্য প্রত্যেকদিন তাকে দাড়ি কামিয়ে যেতে হয়, কিন্তু লক্ষ্মীবার বৃহস্পতিবার তো ব্রাহ্মণের ছেলের চুল-দাড়ি-নোখ কিছুই কাটতে নেই, তাই বৃহস্পতিবারের জন্য তিনি বুধবারই বেশি রাত্রে দাড়ি কামিয়ে রাখতেন। অতদিন ধরে বিদেশে আছেন, কিন্তু একদিনও কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খাননি, কারণ, কোথায় কে গরু শুয়োরের মাংস মিশিয়ে দেয়, ঠিক কি? আমি অবশ্য বলেছিলাম, সাহেব-সুবোরা ভারতীয়দের নেমন্তন্ন করলে আগে জিগ্যেস করেই নেয়, নিরামিষাশী কি না! আপনি তো নিরামিষ খান বললেই পারেন!

উঁহু। ওরা অনেক সময় রান্না করে চর্বির তেল দিয়ে, সেটা কীসের চর্বি তা কে জানে? এসব ম্লেচ্ছদের ব্যাপারে বিশ্বাস আছে?

অনেক সময় অফিসের কাজে ওঁকে নানা জায়গায় যেতে হয়—তখন সেই ক'টা দিন তিনি শুধু ফল খেয়ে থাকেন। সঙ্গে রাখেন নিজের গ্লাস, অপরের মুখে দেওয়া গ্লাসে খাবার বদলে উনি বরং আত্মহত্যা করবেন। একবার একটি আমেরিকান ছেলে ওর ঘরে আড্ডা দিতে আসে, তখন আমিও ছিলাম। আমেরিকান ছেলে-ছোকরারা খুব বেশি ভদ্রতা মানে না, কথায়-কথায় হঠাৎ বলে ফেলল, কুড আই হ্যাভ আ কাপ অব টি? ইওর ইন্ডিয়ান টি?

কান্তিবাবুর ঘরে রান্নার এলাহি বন্দোবস্ত, কারণ রান্নাই তাঁর একমাত্র ধ্যান জ্ঞান, অবসর সময়ে একমাত্র বিলাসিতা। কোন দোকানে টাটকা মাছ পাওয়া যাচ্ছে খুঁজে-খুঁজে বেড়ান প্রত্যেক সন্ধেবেলা, এবং দৈবাৎ টাটকা কাতলা মাছ পাওয়া গেলে সে খবর আবার দিয়েও আসতেন অন্য বাঙালি বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে।

কান্তিবাবু তৎক্ষণাৎ তিন কাপ চা বানিয়ে ফেললেন। খুব ভালো চা। কোনো পুরুষের হাতে তৈরি এত ভালো চা আমি আগে কখনও খাইনি।

আড্ডা শেষে আমেরিকান ছেলেটি উঠে যাওয়ার পর কান্তিবাবু ওর খাওয়া কাপটা অবলীলাক্রমে ময়লা-ফেলা ঝুড়িতে ফেলে দিলেন। আমি হাহা করে উঠে বললুম, ও কী, ও কী?

কান্তিবাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, দ্যুৎ! এঁটো কাপে আর কে খাবে? আমার খাওয়া কাপটাও পরে উনি ফেলে দিয়েছিলেন কি না জানি না, কিংবা আমি ওঁর স্বজাত বলে দয়া করেছিলেন কে জানে। আমি আর ভয়ে জিগ্যেস করতে সাহস পাইনি। তবে, ওর বাড়িতে গিয়ে চা খাওয়া আমি এড়িয়ে গেছি এরপর।

কেমিস্ট্রিতে ডক্টরেট পাওয়ার পর আমেরিকায় রিসার্চ করতে গেছেন, তাঁর এই অবস্থা। প্রতিদিন সন্ধেবেলা ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে গলা থেকে টাইটা খুলতেন এমনভাবে, যেন একটা মরা সাপ ছুঁচ্ছেন। সেই সঙ্গে সাহেবদের পোশাক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার জন্য গালাগাল। তারপর বাথরুমে ঢুকে আধঘণ্টা ধরে স্নান করে সাবান দিয়ে পৈতে মেজে, সন্ধ্যা আহ্নিক করতে বসতেন।

আমি ওঁকে জিগ্যেস করেছিলুম, এত যখন শুচিবায়ু তখন আপনি এলেন কেন এদেশে?

টাকা! শুধু টাকা! দুলক্ষ টাকা জমুক আমার এদেশে—সঙ্গে-সঙ্গে ফিরে যাব!

আমি কান্তিবাবুর এসব স্বভাব মনেপ্রাণে অপছন্দ করতুম। কিন্তু ওঁর সঙ্গে তর্ক করতে গিয়ে দেখেছি সুবিধে হয়নি। উনি বলতেন, আপনি যা বলছেন সবই আমি জানি। ঠিক, আপনার কথাই ঠিক। কিন্তু আমার সংস্কার আমি ছাড়তে পারি না।

তখন আমি ওঁকে সবিস্তারে আমার অখাদ্য কুখাদ্য খাবার গল্প করতুম! এসব সত্ত্বেও যে আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল তার কারণ পাশের বাড়িতে একজনের সঙ্গে বাংলায় কথা বলার সুযোগ। ঝগড়া করলেও তা বাংলায় করতুম। এবং কান্তিবাবুর একটি বিশেষ গুণ ছিল। উনি খুব ভালো বাংলা পল্লিগীতি জানতেন। অন্ধকার ঘরে বসে উনি যখন নীচু গলায় পদ্মাপারের ভাটিয়ালি গাইতেন, তখন আমেরিকার এক ক্ষুদ্র শহরে বসে, বাইরে বরফ পড়ছে, বাংলা দেশের জন্য আমার বুকটা হু-হু করে উঠত।

শুচিবায়ু ছাড়াও কান্তিবাবুর আর একটি প্রধান দোষ ছিল, প্রতি কথায় আমেরিকানদের নিন্দে করা। আমেরিকানদের চরিত্রে নিন্দে করার অনেক জিনিস আছে, কিন্তু কান্তিবাবু যেগুলি বলতেন, আমি তার একটিও মানতে পারিনি। যেমন আমেরিকানরা ভদ্রতা জানে না। এ রকম অভদ্র জাত, দেখলেন দুম করে কীরকম চা খেতে চাইল? ছেলেমেয়েগুলো তো অসভ্যের একশেষ। আপনি তো কলেজে যান না, গেলে দেখতেন, ছোঁড়াগুলো ক্লাসের মধ্যে বসেই মাস্টারের সমানে সিগারেট টানছে। বেঞ্চির ওপর পা তুলে দিয়ে বসে আছে। একটু শ্রদ্ধা-ভক্তি নেই। ভদ্রতা শিখতে হয় ভারতবর্ষের কাছে! এই আমেরিকানদের আমরা কান ধরে ভদ্রতা সহবত শেখাতে পারি!

এসব কথা বলছেন যে কান্তিবাবু, তিনি বাড়িতে কোনও বিদেশি ডাকতে এলে দরজা খুলে দরজার সামনে দাঁড়িয়েই কথা বলেন, ভেতরে আসতে বলেন না পর্যন্ত। পাছে চা খাওয়াতে হয়।

আমি একদিন ওঁকে আমার দুটি অভিজ্ঞতার কথা বলছিলাম। বলে, জিগ্যেস করেছিলাম, এবার আপনি বলুন, এদের কাছ থেকে আমরা, না আমাদের কাছ থেকে এরা—কে কতখানি ভদ্রতা শিখবে।

প্রথম ঘটনাটি খুব সামান্য। পোস্ট অফিসে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম একটা প্যাকেট পাঠাব বলে। তখন ক্রিসমাসের সময় বিষম ভিড়। নারী-পুরুষ সবাই নিঃশব্দে লাইন দিয়ে আছে। লাইন আস্তে আস্তে এগুচ্ছে, কোথাও কোনও গোলমাল নেই।

কান্তিবাবু আমায় বাধা দিয়ে বললেন, এ আর এমন কী! আমাদের দেশের লোকেরাও আজকাল লাইন দিতে শিখেছে। না হয়, লাইনে দাঁড়িয়ে লোকেরা একটু গোলমাল করে। কিন্তু কী আর তফাত। আপনার সবতাতেই আদিখ্যেতা।

আমি হেসে বললুম, বাকিটা শুনুন। লাইন আস্তে আস্তে এগুচ্ছে। তখনও জনাপঞ্চাশ মেয়ে-পুরুষ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ একটা লোক ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঢুকল। এবং লাইনে না দাঁড়িয়ে সোজা কাউন্টারে চলে গেল। দু-মিনিটের মধ্যে একটা প্যাকেট রেজিস্ট্রি করে, তৎক্ষণাৎ আবার চলে গেল। লাইন তখনও নিঃশব্দ। আবার এগুতো লাগল। এ ঘটনাকে আপনি কী বলবেন। একটা লোকও চেঁচিয়ে উঠল না, ও দাদা, লাইনে দাঁড়ান! আমরা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি কি মুখ দেখতে। কে হে তুমি খাঞ্জাখাঁ? ইত্যাদি ইত্যাদি। কেউ কিছু বলেনি। সবাই নিঃশব্দ। এমন কী কাউন্টারে লোকটিও আপত্তি করেনি। কেন? কারণ সবাই ধরে নিয়েছে, লোকটির নিশ্চয়ই বিষম দরকার, লাইনে দাঁড়াবার সময় নেই। অথবা তা যদি নাও হয়; লোকটি অভদ্র হয়, তবুও অন্যেরা অভদ্র হয়ে গেল না। তারা চুপ করে রইল। ভদ্রতা একেই বলে। আর ভদ্রতার পরাকাষ্ঠার দেশ ভারতবর্ষে এ ব্যাপার হলে, লাইনের সবক'টা লোক হা-রে-রে-রে করে চেঁচিয়ে উঠত না?

আর একটি ঘটনা কলেজের। ঠিকই আমি কলেজে যাই না। কিন্তু এদেশের কলেজে পড়ানোর

পদ্ধতিটা কী রকম তা দেখার জন্য আমি দু-একটা ক্লাসে গিয়েছিলাম। একদিন একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়েছিল।

খুব বড় ক্লাস, ছেলেমেয়েতে ভরতি। সত্যিই অনেক ছেলেমেয়ে বিড়ি-সিগারেট খাচ্ছে। অনেকের পা বেঞ্চির ওপর তোলা। কেউ কেউ যখন ইচ্ছে আসছে, যখন ইচ্ছে বেরিয়ে যাচ্ছে। জামাকাপড় অনেকের অদ্ভুত। এ সবই আমাদের চোখে দৃষ্টিকটু লাগে। কারণ আমাদের অন্যরকম দেখা অভ্যেস। কিন্তু এগুলো সবই হল চালচলন। এগুলিকে ভদ্রতা-অভদ্রতার সঙ্গে মিলিয়ে ফেলা যায় না। 'ভদ্রতা' শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ অন্যরকম।

অধ্যাপক পড়াচ্ছেন। ক্লাস সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। ছেলেমেয়েগুলো যতই দুর্দান্ত আর বদমাশ হোক, ক্লাসে কিন্তু এরা গণ্ডগোল করে না। মাঝে মাঝে দু-একজন প্রশ্ন করছে, যা শুনলেই বোঝা যায়, মনোযোগ দিয়ে পড়ানো না শুনলে এরকম প্রশ্ন করা যায় না।

বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে, শূন্য ডিগ্রির অনেক নীচে শীত। ঝড়ের হাওয়া দিচ্ছে! এমন সময় আরেকজন ছাত্রী ঢুকল। সঙ্গে একটা কুকুর। আমি তো হতভম্ব হয়ে গেছি—কুকুর নিয়েও ক্লাসে আসা যায় নাকি? সত্যি আমেরিকা দেখছি আজব দেশ। অধ্যাপক একবার চোখ তুলে তাকালেন কুকুর সমেত নবাগত ছাত্রীটির দিকে। তারপর আবার পড়াতে লাগলেন। ছাত্রছাত্রীরা কেউ একটি কথা বলল না।

কিন্তু অমন বন্ধ ঘরে অতগুলো মানুষের মধ্যে এসে কুকুরটা চুপ করে বসে থাকবে কেন? একটু বাদেই কুঁইকুঁই শব্দ আরম্ভ করে দিল। তারপর বেশ জোরে ডাক, সেই সঙ্গে শিকলের ঝন্‌ঝন্‌। অধ্যাপক পড়ানো বন্ধ করলেন। ছাত্রছাত্রীরা চুপ। সেই ছাত্রীটি মুখ দিয়ে চুঃ-চুঃ শব্দ করে কুকুটাকে শান্ত করতে লাগল। আবার পড়ানো শুরু হল। একটু পরেই আবার ঘেউ করে কুকুরের ডাক। অধ্যাপক আবার পড়ানো বন্ধ করে হাতের আঙুল দেখতে লাগলেন। কুকুরটা একটু চুপ করতে অধ্যাপক আবার আরম্ভ করলেন। এরপর হঠাৎ কুকুরটা মেয়েটির হাত ছাড়িয়ে ছুটে বেড়াতে লাগল ঘরময়, মেয়েটি উঠে পেছন-পেছন ছুটতে লাগল। তারপর শিকলটা ধরে ফেলে—আবার টেনে এনে বসল, কুকুরটা অবিশ্রান্তভাবে ঘেউঘেউ করে ডাকতে লাগল।

এই প্রথম অধ্যাপক তাঁর দুরূহ বিনয় ছেড়ে ছাত্রীটির দিকে তাকিয়ে অন্য কথা বললেন। একটু হেসে বললেন, ক্যাথরিন, তোমার কুকুরের বোধ হয় আমার পড়ানো পছন্দ হচ্ছে না। ও বোধহয় বাইরে যেতে চায়!

—কিন্তু বরফ পড়লে কুকুরটা যে তখন আমাকে ছাড়া একদম থাকতে চায় না!

—কিন্তু, তোমার কুকুরকে চুপ করাতে পারি, এমন বিদ্যে যে আমার নেই, ক্যাথরিন! তুমি না হয় ক্লাসটা আজ নাই করলে। তুমি যদি কুকুরটাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য—

—বাঃ, এমন দামি ক্লাশটা আমি মিস করব নাকি?

—ওঃ, আচ্ছা! তাহলে, আজ বরফ পড়ার সময়, তোমার কুকুরের মেজাজ খারাপ বলে সেই সম্মানে আমাদের ক্লাস আজ এখানেই শেষ। ধন্যবাদ ক্যাথরিন।

ক্লাস শেষ হয়ে গেল। ছাত্র-ছাত্রীরা কিন্তু সারাক্ষণ চুপ করেছিল—একটি কথাও বলেনি। অথচ ক্লাসটা ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। এ অবস্থায়, কান্তিবাবু আমাদের দেশের যে-কোনও কলেজের কথা ভেবে দেখুন। ক্লাশ শুদ্ধু সবাই কি ওই সময়টা কুকুর ডাকত না? ওই ছাত্রীটি হয় অত্যন্ত অভদ্র অথবা কুকুর-প্রীতিতে পাগল। কিন্তু ওর অভদ্রতা দেখেও আপনার ওই সিগারেট-খাওয়া, টেবিলে-পা-তোলা ছাত্রের দল একটুও অভদ্রতা করেনি। এমন কি অধ্যাপকও তাঁর ক্ষমতা দেখাবার জন্য চোখ-মুখ লাল করেননি। শেষ পর্যন্ত ভদ্রতা করেছেন। একেই বলে খাঁটি ভদ্রতা, যখন অপরের অভদ্রতা দেখলেও একজন নিজের ভদ্রতা হারায় না। এর তুলনায় আমাদের ভারতীয়, বা প্রাচ্য ভদ্রতা এখন প্রবাদ মাত্র। তার আর কোনও অস্তিত্ব নেই!

॥ নয় ॥

বাড়িতে চিঠি লিখেছিলাম, 'এই এতবড় একটা চিংড়ি খেলাম সেদিন!' উত্তরে মা লিখলেন, 'এত বড়' মানে বুঝব কী করে কত বড়?' সত্যিই তো। আমি লজ্জায় পড়ে গেলুম। আসলে চিঠিটা লেখার সময় আমি টেবিলের ওপর কলমটা রেখে দুটো হাত ফাঁক করে মনে-মনে বলেছিলাম, অ্যা-তো-ব-ড়। আয়তনটা লিখে জানাতে ভুলে গিয়েছিলাম। এখনও লিখতে গিয়ে আমার দু-হাত ফাঁক হয়ে যায়, আমি বলি, হুঁ, অ্যা-তো-ব-ড়-ই হবে!। আমি যে টেবিলটায় বসে আছি, তার অর্ধেক হবে। অন্তত ঠ্যাংগুলো ছাড়াই আমার হাতের দেড় হাত লম্বা সেই বিরাট চিংড়ি।

মারশাল টাউন নামের একটা ছোট্ট শহরে নিয়ে গেছে আমার বন্ধু। শহরটা ছবির মতো সাজানো সুন্দর এবং সেই শহরের রাজার বাড়িতে আমাদের নেমন্তন্ন। না, আমেরিকায় রাজা নেই। কিন্তু সেই লোকটিকে রাজাই বলা যায়, তিনি সেখানকার একটি বিরাট ইস্পাত কারখানার মালিক, তিনটি সিনেমা হল ওঁরই, সবচেয়ে বড় দোকানটাও ওঁর ছেলের নামে, শহরের কতগুলো বাড়ি যে ওঁর, তার আর সীমা সংখ্যা নেই, শহরের একমাত্র মিউজিয়ামটিও ওঁরই টাকায় তৈরি। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের পক্ষে, ওই শহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলটিরও তিনিই মালিক। সেখানে আমাদের নেমন্তন্ন, সেই সন্ধেবেলা।

নিরহঙ্কার, সাধারণ চেহারার মানুষটি। তবে খুব বেশি লম্বা, এবং এমনই রোগা যে ওই লিকলিকে চেহারা দেখলে ভয় বা সম্ভ্রম জাগার বদলে হাসি পায়। আমেরিকার ধনীদের তুলনায় তিনি যদিও একটি কুচো চিংড়ি, কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা আমাদের এত বিরাট একটা গলদা চিংড়ি খাইয়েছিলেন, যেরকম বড় চিংড়ি মাছ আমি আর কখনও দেখিনি।

স্বয়ং হোটেলের মালিক তাঁর অতিথিদের খাওয়াচ্ছেন—সুতরাং সারা হোটেলে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। সার বেঁধে ওয়েটার ওয়েট্রেসরা পিছনে দাঁড়িয়ে। আমাদের প্রতিটি অনুরোধ বা হুকুমের উত্তরে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে বলছে, ইয়েস স্যার।

অন্য আর কিছু খাওয়ার পদ নেই। সুপের পরই ওই বিরাট চিংড়ি। চিংড়িটা রান্না হয়েছে আস্ত অবস্থাতেই। আস্ত চিংড়িটা প্রথমে গরম জলের ভাপে অনেকক্ষণ সেদ্ধ করা, তারপর বেশ কিছুক্ষণ হালকা মদে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু জলে সেদ্ধ করে খেলে নাকি একটা বুনো বা জলো গন্ধ থেকে যায়।

সুপ খাওয়ার পরই আমাদের প্রত্যেককে অ্যাপ্রন পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। টেবিলে রাখা হয়েছে একগাদা রুপোর ছুরি-কাঁটা, সাঁড়াশি-হাতুড়ি ইত্যাদি একগাদা যন্ত্রপাতি। তারপর আলাদা রুপোর ট্রেতে করে প্রত্যেকের সামনে একটি করে ওই বিশাল মাছ রেখে গেল, তখন আমি ভয়ংকর চমকে গেছি! লবস্টার! লবস্টার!—বলে টেবিলে একটা কলরব পড়ে গেল। আমার পাশে এক ভদ্রমহিলা বসেছিলেন, তাঁকে জিগ্যেস করলুম, এই এতবড় মাছ কেউ একা খেতে পারে নাকি!

—কী বলছ? এরকম বড় মাছ কদাচিৎ পাওয়া যায়। মারশাল টাউনের জরজ ছাড়া এরকম মাছ কেউ খাওয়াতে পারবে না।

—কিন্তু কখন হাতুড়ি-সাঁড়াশি ব্যবহার করতে হবে, তার কোনও নিয়ম আছে?

ভদ্রমহিলা খিলখিল করে হেসে বললেন, আমাকে দেখে দেখে করে যাও।—এ কথাতেও আমি খুব নিশ্চিন্ত হলুম না। কারণ কিছুকাল আগের এক ফরমাল পার্টিতে আমি এক মহিলাকে দেখে দেখে ছুরি-কাঁটা ব্যবহার করছিলুম, কিন্তু টেবিলের সব লোক আমাকে দেখে ফিক-ফিক করে হাসছিল। পরে জেনেছিলুম সেই ভদ্রমহিলা ল্যাটা। মেয়েরা যে এত ল্যাটা হয়, আমেরিকায় না এলে জানতে পারতুম না!

যাই হোক, কলকাতার বাজারে মাছ নেই, থাকলেও আকাশ ছোঁয়া দাম, ভালো গলদা চিংড়ি

তো আর বঙ্গোপসাগরেই আসে না বোধহয়, সুতরাং এত বিরাট একটা সুস্বাদু চিংড়ি মাছ খাওয়ার বেশি বর্ণনা দিলে পাঠকদের প্রতি নিষ্ঠুরতা করা হবে। তা ছাড়া, সেই ভোজপর্ব আমার পক্ষেও খুব সুখের হয়নি। দুটি মাত্র হাতে অত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা সহজ নয়। সাঁড়াশি চেপে খোলা ভেঙে হয়তো চিমটে দিয়ে ভেতরের মাছ তুলতে গেছি অমনি ধাক্কা লেগে ছুরিটা পড়ে গেল কার্পেটে। আমি ওই ছুরিটাই তুলে কাজ চালাতে পারি, বড়জোর প্যান্টালুনে একবার ঘষে নেব, কিন্তু সড়াত করে একজন ওয়েটার ছুটে এসে—সেটা তুলে নিয়ে, নিয়ে এল আর একটা। ইতিমধ্যে আমি আবার চামচেটা ফেলে দিয়েছি। সেটা আনতে না আনতে সাঁড়াশিটা। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড!

বরং আমি প্রথম দিনের ব্যাঙ খাওয়ার ঘটনাটা বলি। শামুক-ঝিনুক প্রজাপতি হাঙর ইত্যাদিও আমি খেয়েছি, কিন্তু সে গল্প বলার দরকার নেই, কিন্তু ব্যাঙ খাওয়ার ব্যাপারটা না বললে চলে না। সুপার মার্কেটের মাছ-মাংস বিভাগে রোজই দেখি, ব্যাঙের ঠ্যাং বিক্রি হচ্ছে। ব্যাঙের সারা শরীরটা খায় না, শুধু পা-দুটিই খাদ্য। ছাত্রবয়সে বায়োলজি পড়ার সময় অনেক ব্যাঙ কেটেছি, সুতরাং ভেককুলের প্রতি আমার কোনও ঘৃণা ছিল না। আর ছাল ছাড়ানো ব্যাঙের পা—অবিকল সুন্দরী রমণীয় পদদ্বয়ের মতোই দেখায়, দেখে ক্রমশ আমার খাওয়ার ইচ্ছে হল! অথচ রাঁধতে জানি না। একটি ফরাসি মেয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাকে বললুম, মার্গারিট, একদিন ব্যাঙ রেঁধে খাওয়াও না।

সে হেসে বলল, আমি তো রাঁধতে জানি না! আমি কী করে খাওয়াব!

—সে কী! তুমি মিথ্যে কথা বলছ। তুমি নিজে কোনওদিন খাওনি?

—কোনওদিন না।

—যাঃ! আমরা কতকাল থেকে শুনছি ফরাসিরা ব্যাঙ খেকো! চালাকি!

—আমি তো খাইনি বটেই, আমাদের বাড়ির কেউ কোনওদিন ব্যাঙ খেয়েছে বলেও শুনিনি। প্যারিসেও কয়েকটা বড় বড় হোটেলেই শুধু পাওয়া যায়—খুব দামি, শৌখিন খাবার!

—কিন্তু, এখানে তো খুব বেশি দাম নয়?

—তাহলে এসো একদিন দুজনেই একসঙ্গে খাই।

কিনে আনলুম। কিন্তু কী করে রাঁধব সে এক সমস্যা। একে তো স্বাদ কীরকম জানি না—তারপরে যদি রান্নার দোষে গা গুলিয়ে ওঠে কিংবা বমি আসে তাহলে? হয়তো, ব্যাঙের মাংসে কোনও বিটকেল গন্ধ আছে—যা কোনও বিশেষ মশলা দিয়ে দূর করা যায়। অনেক ভেবে-চিন্তে একটা উপায় বের করলুম। ঘরে অনেক মাখন ছিল। আর মাখন দিয়ে ভাজলে দুনিয়ার সব জিনিসই সুখাদ্য হতে বাধ্য—এই ভেবে বেশ কড়া করে ভাজলুম মাখনে। তারপর টেবিল সাজিয়ে দুজনে দুদিকে বসেছি। দজুনেরই সামনের প্লেটে ভাজা ব্যাঙের ঠ্যাং, হাতে ছুরি-কাঁটা, কিন্তু চুপ করে বসে আছি। কে আগে শুরু করবে? যে প্রথমে মুখে দেবে—তারই যদি বমি আসে—তবে, অন্যজন ফেলে দিতে পারে। কিন্তু কে আগে?

আমরা দুজনেই দুজনের দিকে চোখাচোখি করে হো-হো করে হেসে উঠলুম।

তখন আমরা ঠিক করলুম, দুজনেই এক-দুই তিন গুনে একসঙ্গে মুখে পুরব। ছুরি দিয়ে এক স্লাইস কেটে কাঁটায় গেঁথে নিলাম। রেডি? এক! দুই! তিন! মুখে!

তারপর? মুক্তকণ্ঠে বলতে পারি, এরকম সুখাদ্য আমি জীবনে খুব কমই খেয়েছি। ওইটুকু দুটো ব্যাঙের ঠ্যাঙের বাকিটা খেতে আমাদের আর এক মিনিটও লাগল না।

তখন, মনে হল, আমাদের দেশ থেকে ব্যাঙগুলোকে কেন যে আমরা শুধু-শুধু সাপের মুখে ঠেলে দিচ্ছি! কিংবা না দিয়েই বা উপায় কী? আমাদের দেশের কোটি-কোটি সাপই বা তাহলে খাবে কী? আমরা ব্যাঙ খাব, আর সাপেরা আমাদের খাবে, তা তো আর হতে পারে না।

॥ দশ ॥

—কী করছ এখন?

—কিছু না।

—যে অবস্থায় আছো, সোজা আমার ঘরে চলে এসো।

—কেন, কেন?

—এসোই না। মজা দেখতে পাবে, এসো—

রজার আমারই বাড়ির তিনতলায় থাকে। হঠাৎ টেলিফোন। কৌতূহলী হয়ে ছুটে গেলাম। বাইরে থেকেই শুনতে পেলাম, ঘর গমগম করছে। বহু লোক। দরজা ঠুকঠুক করেছি, রজার হাস্যমুখে উঁকি দিয়ে বলল, এসো, পার্টি হচ্ছে। টেড আর জুলির জন্য পার্টি।

টেড আর জুলি? শুনে আমার মূর্তি হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। অতি কষ্টে ঘরে ঢুকে দেখি সারাঘর জুড়ে নাচ চলছে, টেড আর জুলিও উপস্থিত। টেড আর জুলি ছিল সমস্ত অলস মুহূর্তের মুখরোচক উপাদান। কোথাও টেড বসে থাকলে, জুলি দূর থেকে আসতে-আসতে ওকে দেখলেই মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। আর কোথাও জুলিকে দেখলেই টেড চলে যাওয়ার আগে যা বিড়বিড় করবে, সেটা নিশ্চিত কোনও গালাগালি। কোনও বন্ধুর বাড়িতে টেড আসবার আগে টেলিফোন করে জেনে নেবে, সেখানে জুলি আছে কি না। আর একবার সিনেমা হলের মধ্যে কোণে টেডকে দেখে জুলি পুরো বই না দেখেই উঠে বেরিয়ে গিয়েছিল। দুজনের মুখ দুজনের কাছে আগুন লাগা, ওদের নাম পরস্পরের কানের বিষ। টেড আর জুলি স্বামী-স্ত্রী।

ওরকম স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া তো কতই দেখেছি। কিন্তু বাইরে বাইরে সুখ দেখানোই তো পশ্চিমি সভ্যতা। পরস্পর বাহুবন্ধনে প্রকাশ্যে হাঁটা, মোটর গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে 'এসো ডার্লিং' বলা, এবং লোক দেখিয়ে অকারণে টেলিফোন করে স্বামী বা স্ত্রীর স্বাস্থ্য বা মুড সম্পর্কে উদ্বিগ্নতা দেখানো—এইসব তো স্বামী-স্ত্রীর সাজানো ধরন, কেউ জানবে না ওদের মনের মধ্যে আছে সুধা না গরল। কিন্তু টেড আর জুলি নিয়ম-না-মানা প্রকাশ্যে সাপ আর নেউল। ওরা বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য আবেদন করেছে—তার আগে দুজনে আলাদা থাকবে চুপচাপ, পরস্পর দেখা হলে ভদ্রতার হাসি হাসবে—এই তো নিয়ম। কিন্তু ওদের দুজনের কী কী দোষ—আমরা ওদের মুখ থেকেই জেনে গেছি। টেডের বিষম নাক ডাকে ঘুমের মধ্যে, জুলির হাতে নাকি রোজ আট-দশটা গেলাস-কাপ ভাঙে, টেড রাত দুপুরে উঠে কফি খেতে চায় এমন পাজি, আর জুলি তার পোষা বেড়ালটাকে সঙ্গে নিয়ে শোবেই, টেড একবেলাও রান্না করতে চায় না আর জুলিটা এমন বিশ্রী যে, উদয়াস্ত টেলিভিশনের সামনে না বসলে চলবে না। এই সমস্ত মহৎ দোষ যখন ওদের আছে, তখন দীর্ঘকাল স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকা নিশ্চয়ই অসম্ভব।

আড়াই বছর আগে টেড আর জুলি কেউ কারুকে চিনত না। দুজনে দুদিক থেকে গাড়ি চালিয়ে আসছিল ৭৮নং হাইওয়ে দিয়ে। মুখোমুখি ধাক্কা। পুলিশ ইনসিওরেন্সের লোক, মোটর সারাবার কোম্পানি ইত্যাদি ঝামেলা চুকলে দেখা গেল, টেড-এর গাড়িটার কিছুই হয়নি, কিন্তু ওর ডান কবজিটা মচকে গেছে, আর জুলির গাড়িটা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে, কিন্তু শরীরে আচড়টি পড়েনি। তখন টেড জুলিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইল নিজের গাড়িতে—ওর হাত ভাঙা বলে গাড়িটা অবশ্য জুলিই চালাল। সেই প্রথম দেখা। আড়াই দিনের মধ্যে গভীর প্রেম। এক মাসের মধ্যে বিয়ে। শুনেছিলুম, টেড আর জুলির মতো দুরন্ত, উচ্ছল, খুশি দম্পতি বহুদিন কেউ এ শহরে দেখেনি। এক বছর পরেই ঝগড়া, এমন প্রকাশ্যে ঝগড়াও বহুদিন দেখা যায়নি এখানে। আমি আসার পর ঝগড়ার পালাই দেখছি। শুনেছি, ওদের বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা উঠেছে। কেন এই খামখেয়ালি মিলন, যার ফলে এমন কটু বিচ্ছেদ?

সপ্তাহ খানেকের জন্য শিকাগো গিয়েছিলাম, মাত্র সেদিনই ফিরেছি, তারপরেই রজারের ডাক। সেদিনের পার্টি রজারই ডেকেছে, উপলক্ষ টেড আর জুলির সেদিনই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। দুজনেরই সমান বন্ধু হিসেবে রজার আজ উৎসব করতে চায়।

এই প্রথম আমি এক আসরে টেড আর জুলি দুজনকেই দেখতে পেলাম। কিন্তু এ কোন টেড আর জুলি? দুজনের মুখে সামান্য গ্লানির চিহ্ন পর্যন্ত নেই। হো-হো করে হাসছে, হাত ধরাধরি করে। টেডের মুখ থেকে জ্বলন্ত সিগারেট কেড়ে নিয়ে টানতে আরম্ভ করেছে জুলি। নাচের বাজনা থেমে যেতেই টেড চেঁচিয়ে বলল, এই জুলি, রেকর্ডটা বদলে এবার একটা রে চার্লসের দাও। রে চার্লসের কোনটা বলো তো? যেটা আমার সবচেয়ে প্রিয়—বাধা দিয়ে হাসতে জুলি বলল, জানি, জানি।

—না, দেখি মনে আছে কি না। বলো তো কোনটা?

—বলব না।

হাসতে-হাসতে জুলি রেডিওগ্রামের কাছে গিয়ে রে চার্লসের একটা রেকর্ড দিতেই টেডের মুখে ঈপ্সিত হাসি আর ঘরময় অট্টহাস্য। টেড বলল, জুলি, এটাও আমি তোমার সঙ্গে নাচব! জুলি ঘাড় বেঁকিয়ে সহাস্য মুখে বলল, ইস, মোটেই না। লজ্জা করে না—। টেড ছুটে এসে জুলির হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগল, আর কৃত্রিম বাধা দেওয়ার চেষ্টায় জুলির মুখে হাসি মেশানো রাগ।

আমি ঘরের এক কোণে চেয়ার নিয়ে বসেছিলুম। নাচতে জানি না কিন্তু দেখতে ভালো লাগে। কী সরব উল্লাসময় আজ এই ঘরের হাওয়া। বর্তমান আইন অনুযায়ী টেড আর জুলি স্বামী-স্ত্রী ছিল, একটি দিনের জন্যও একসঙ্গে হলে ওদের দুজনের হাসি দেখিনি। আজ ওরা আর স্বামী-স্ত্রী নয় বলেই ওদের ব্যবহার সত্যিকারের সুখী দম্পতির মতো। কোথাও কোনও গ্লানি নেই। টেড কিরকম অম্লান বদনে জুলির হাত ব্যাগ খুলে সিগারেট প্যাকেট বার করে দিচ্ছে! নিজের বউয়ের হাত-ব্যাগ খুলতেও স্বামীদের এদেশে অনুমতি নিতে হয়, আর আজ ওদের এতই ঘনিষ্ঠতা সে এসব নিয়মও গ্রাহ্য করছে না।

অনেকক্ষণ লক্ষ করার পর বুঝতে পারলুম, টেডের পাশে আর একটা মেয়ে সব সময় ঘনিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করছে, তার নাম সেরা। জুলির মতো এক রকমই সুন্দরী। আর জুলির পাশেও আর একটা ছেলে বেশি ঘনিষ্ঠ, ওর নাম পিটার। পিটারকে আমি চিনি, বেশ সরল বেপরোয়া ধরনের ছেলে, গ্রিকদের মতো মুখ। টেড আর জুলির মধ্যে যে ঝগড়া—তার জন্য কোনও তৃতীয় নারী বা পুরুষ দায়ী ছিল না—আমরা বেশ ভালোভাবেই জানতুম। বিচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে ওদের দুজনের আলাদা বন্ধু জুটে গেছে। টেড একবার পিটারের কাঁধ চাপড়ে বলল ব্রেভ বয়! গো আহেড! মাইরি বলছি, জুলির মতো এরকম ভালো মেয়ে আর নেই। জুলিও এক ফাঁকে সেরাকে বলল, এই মুখপুড়ি, তুই টেডকে বিয়ে করবি নাকি?

সেরা বলল, ধ্যেৎ!

আহা লজ্জা কীসের। শোন তোকে কয়েকটা ব্যাপার শিখিয়ে দি ওর সম্বন্ধে!—জুলি সেরার কানে কানে কী যেন বলতে লাগল।

আমি ভাবতে লাগলুম, টেডের সঙ্গে সেরার কিংবা জুলির সঙ্গে পিটারের আলাপ কতদিনের? আবার আড়াই দিন নাকি? আমি সেরাকে ডেকে একবার বললুম, জুলি, তোমার দেশলাইটা একটু দাও তো! সে হি-হি করে হেসে বলল, কী ভুল তোমার! এখনও নাম মনে রাখতে পারো না? আমি জুলি নই, আমি সেরা।

আমি বললুম, ও হ্যাঁ-হ্যাঁ তাই তো!

খানিকটা বাদে একে একে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় পিটারকে বললুম,

চলি টেড। আবার দেখা হবে।

পিটার বলল, এই, তুমি বুঝি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ? আমার নাম টেড নয়, তুমি ভালো করেই জানো আমি পিটার।

আমি হেসে বললুম ওই একই হল। নামে কি এসে যায়?

॥ এগারো ॥

আমেরিকায় এসে একজন ভারতীয় প্রথমেই কী দেখে অবাক হবে? একশো তলা বাড়ি নয়, মাটির নীচ দিয়ে বা মাথার ওপর দিয়ে ট্রেন নয়, ম্যাজিক দরজা—যার সামনে দাঁড়ালে আপনিই দরজা খুলে যায়, তা দেখেও নয়। ওসব তো সে আগেই শুনে গিয়েছিল, বরং যতখানি দেখবে বলে কল্পনা করেছিল, তার চেয়ে অনেক কম দেখবে—বাড়িকে মনে হবে না আকাশ ছোঁয়া, বিদ্যুতের ভৃত্যপনাকে মনে হবে না অস্বাভাবিক। কিছুতেই তার চমক লাগবে না, জাগবে না সত্যিকারের বিস্ময়। অত কথা শুনে এসেছে আমেরিকা সম্পর্কে, ভেবেছিল স্বর্গের সমান কোনও একটা দেশ দেখবে, কিন্তু, প্রথম দিন, প্রথম দৃষ্টিপাতে সে হয়তো একটু নিরাশই হবে। নিউ ইয়র্ক শহরের হাডসন নদীর পারে দাঁড়িয়ে সে হয়তো মনে মনে গুনগুন করে বলবে ঃ ইজ দিস ইয়ারো? দিস দা স্ট্রিম অব হুইচ মাই ফ্যানসি চেরিস্‌ড? প্রতিমুহূর্তে সে হয়তো অভাবনীয় কিছু দেখার প্রত্যাশা করবে।

প্রথম যেখানে গিয়ে তার ভারতীয় রক্ত ছলকে উঠবে—সে জায়গাটি যে-কোনও ব্যাঙ্ক। যে-কোনও মার্কিন বন্ধুকে না নিয়ে একাই এসেছে তার প্রথম চেকটি ভাঙাতে। বিশাল ভবনের মধ্যে ঝলমল করছে আলো, গোল করে ঘেরা কাউন্টারের অধিকাংশ জানালায় বসে আছে সুন্দরী মেয়েরা। কোনও জানালাতেই ভিড় নেই। খানিকটা অস্বস্তিতে ভারতীয়টির বুকের ভিতরে একটু একটু ঘর্মক্ষরণ হবে। তার আইডেনটিটি চাওয়া হলে—অর্থাৎ চেকের ওপর লেখা নামটি যে তারই পিতামাতা-প্রদত্ত, বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার স্বীকৃত-এ কথা সে ঠিক কীভাবে প্রমাণ করবে—মনে মনে তারই একটা মহড়া দিয়ে নেবে। পকেটে হাত বুলিয়ে একবার দেখে নেবে পাসপোর্টটি ঠিক মনে করে এনেছে কি না। তারপর ভরসা করে সে হয়তো সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির জানালায় গিয়ে দাঁড়াবে চেকটি হাতে নিয়ে।

তারপরই সে পাবে প্রথম বিস্ময়। মেয়েটি চোখ নাচিয়ে এক ঝলক হেসে শুধু দেখে নেবে টাকার অঙ্ক, তারপরই ফর্‌ফর্‌ করে গুনে ছেলেটার হাতে তুলে দেবে এক গোছা নীল রঙের নোট। যন্ত্রের মতো ছেলেটির মুখ থেকে বেরিয়ে আসা 'ধন্যবাদে'র উত্তরে মেয়েটি আবার হেসে বলবে, 'তুমি স্বাগতম!' কোনও প্রশ্ন নেই, সন্দেহ নেই, সই মেলানো নেই, অ্যাকেউন্টে টাকা আছে কি না দেখার নেই, চেকটা হাতে তুলে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টাকা। যেন ছেলেটি ব্যাঙ্কের খাস বড়বাবুর বড় ছেলে, তাকে কোনও প্রশ্ন করবে, এমন সাহস কার—চেক দিতেই মিষ্টি হাসি ও টাকার গোছার বিনিময় হল। আমাদের ভারতীয়টি হয়তো প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে উঠে গোপন আত্মশ্লাঘায় জামার কলার ও টাইয়ের গিঁট নেড়েচেড়ে ঠিক করবে। ভাববে, তার নিজের মুখে সততা ও মহত্ত্ব মাখানো, তা দেখেই অমন বিনা দ্বিধায় তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হল।

পরে ক্রমশ তার ভুল ভাঙবে। সুন্দর বা কুৎসিত মুখ যাই হোক—সকলেই বিনা সন্দেহে টাকা তুলতে পারবে ব্যাঙ্ক থেকে—একটা নির্দিষ্ট অঙ্ক পর্যন্ত। আমেরিকাতে ওই রকমই রীতি। চেক কেটে টাকা তোলা অত সহজ বলে আমেরিকাতে চেক-জালিয়াতির সংখ্যা অত্যন্ত কম। নরহত্যা, গুন্ডামি এবং ডাকাতি ওদেশে লেগেই আছে। কিন্তু ছিচকে চুরি নেই! দু-পাঁচ হাজার টাকার চেক জাল করার মতো নোংরা কাজও ওরা করে না। যদি এমন দুর্মতি দৈবাৎ কারুর হয়ও, এক লক্ষে

একজন, তার জন্য বাকি নিরানব্বই হাজার ন'শো নিরাব্বইজন সৎমানুষকে বিব্রত করা, সন্দেহ করা, দেরি করিয়ে দেওয়া ওরা অন্যায় মনে করে। একমাত্র কিছুটা সন্দেহ করে তেরো-চোদ্দো বছরের ছেলেমেয়েদের, নির্বোধের মতো জাল-জোচ্চুরি করার ইচ্ছে ওদেরই হতে পারে, তা ছাড়া আমেরিকার টিন-এজার-রা এমনিতেই কিছুটা ভয়ের বস্তু। জালিয়াতি নিরাপত্তার জন্য অনেক ব্যাঙ্ক ইনসিওর করা থাকে কোনও কোনও গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে। জাল চেক ধরা পড়লে সেই গোয়েন্দাদের দায়িত্ব অপরাধীকে খুঁজে বার করা, এবং খুব কম ক্ষেত্রেই জালিয়াত জেলের বাইরে থাকে।

ব্যাঙ্কের কার্যাবলির পরিসীমা দেখে ভারতীয়টির বিস্ময় ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। যে-দিন সে নিজের নামে অ্যাকাউন্ট খুলতে গেল সেদিনও আর এক অভিজ্ঞতা। ফর্মে নাম-ঠিকানা টেলিফোন নাম্বার লিখে টাকাগুলো দিল কাউন্টারের জানালার যে-কোনও একটি- মেয়ের হাতে। এখানেও আধ-মিনিটে কাজ শেষ। পাশেরই একটা মেশিনে ঝকাং ঝক শব্দ করে রসিদ ছাপিয়ে ছেলেটির হাতে তুলে দিয়ে মিষ্টি হেসে মেয়েটি বলল, পরশু এসে তোমার চেকবই নিয়ে যেও, কেমন?

পরশুদিন আবার যেতেই দেখল, কোনও গণ্ডগোল নেই, ওকে দেওয়া হল একটি লাল রঙের (যে-কেউ যে কোনও রং বেছে নিতে পারে) রেক্সিনে বাঁধানো অতি সুদৃশ্য মানিব্যাগের মতো, তার মধ্যে কয়েকখানা চেক বই, প্রত্যেকটি চেকের পাতায় ওর নাম ঠিকানা ছাপানো। হ্যাঁ, ছাপানো! দুশো ডলারের বেশি টাকার অ্যাকাউন্ট খুললে প্রত্যেকের চেকে আলাদা করে নাম ঠিকানা ছাপিয়ে দেবে ব্যাঙ্ক। আর কোনও পাশ বই, অ্যাকাউন্ট নাম্বার কিচ্ছুর দরকার নেই। মেয়েটির দিকে তাকিয়ে সত্যিই অবাক হয়ে গেল ছেলেটি—চুল এলো করা, মুখে সব সময় মিচকি হাসি, চুইংগাম চিবুচ্ছে সব সময়, মনে হয় যে কাজে মন নেই—ফাঁকি দিয়ে কখন বাড়ি পালাবে—সেইজন্য ব্যস্ত। অথচ প্রতিটি কাজ নির্ভুল এবং ঠিক।

ক্রমশ ছেলেটি আমেরিকার ব্যাঙ্কের কাজকর্মের ধরনধারণ দেখে মুগ্ধ হয়েছে। চেক বই পকেটে নিয়ে ঘোরার দরকার নেই, ব্যাঙ্কের কাউন্টারে রাখা আছে চেক বই—তাতে সই করেও টাকা তোলা যায়। এ ছাড়া প্রত্যেক বড় দোকানে রাখা আছে যে-কোনও বাঙ্কের চেক বই। দোকানে কোনও জিনিস পছন্দ হল, অথচ পকেটে টাকা বা চেক বই নেই, কিন্তু তা বলে জিনিস কেনা আটকায় না। দোকানের চেক বইতে সই করে দিলেই হল শুধু সইটা যদি হিজিবিজি হয়—তবে পুরো নামটা একটু গোটা অক্ষরে ওপরে লিখে দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে চেকবই একেবারে না হলেও চলে—সাদা কাগজে ব্যাঙ্কের নাম লিখে সই করে দিলেও চেক হিসাবে চলে যাবে, শুধু সঙ্গে একটা দু-সেন্টের স্ট্যাম্প লাগাতে হবে। এক ব্যাঙ্কের টেবিলে একটা ভাঙা মদের খালি বোতল রোজ রাখা থাকে—লোককে দেখাবার জন্য, একজন লোক চেক বই পায়নি, সাদা কাগজও পায়নি, ওই বোতলটার গায়ে নাম সই করে স্ট্যাম্প আটকে ব্যাঙ্কে পাঠিয়েছিল সেও টাকা পেয়েছে।

ধরা যাক, আমাদের ভারতীয় ছেলেটি এক শনিবার বান্ধবীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাবে। এদিকে পকেটে পয়সা নেই। কাছে খুচরো টাকাও নেই। আর সিনেমার টিকিটের দাম এত কম যে, ওখানে কেউ চেক কাটে না, কেমন যেন দেখায়। মহামুশকিল, তখন ড্রাইভ-ইন-ব্যাঙ্কও বন্ধ (ড্রাইভ-ইন-ব্যাঙ্ক অতিব্যস্ত লোকদের জন্য। সরু সরু গলির মাথায় একটা করে ঘর। লোকেরা মোটর গাড়ি চেপে এসেই সেই ঘরের সামনে দাঁড়ায়, গাড়ি থেকে নামতেও হয় না, জানলা দিয়ে চেক নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিলেই একজন সঙ্গে সঙ্গে টাকা দিয়ে দেয়)! তখন ছেলেটির মাথায় এক বুদ্ধি এল। বান্ধবীকে বলল, তুমি একটু অপেক্ষা করবে? আমি চট করে সংসারের বাজারটা করে আনি। গেল বাজার-দোকান অর্থাৎ সুপার মার্কেটে। বারো ডলারের জিনিস কিনল, আর লিখে দিল একটা কুড়ি ডলারের চেক। বিনা প্রশ্নে ফিরে পেয়ে গেল আট ডলার।

সহজে কাগজে সই করে টাকা লেনদেন হয় বলেই বোধহয় অধিকাংশ আমেরিকানদের কাছে টাকা পয়সা এমন খোলামকুচি।

ভারতীয় ছেলেটি আমেরিকার ব্যাঙ্কের প্রশংসা করছিল একজন আমেরিকান বন্ধুর কাছে।

—কেন, তোমাদের দেশে কী নিয়ম? তোমার নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা তুলতে অসুবিধা হয়?

—আমার দেশে আমার কোনও ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট নেই।

—কেন?

—প্রথমত আমার টাকা নেই। দ্বিতীয়ত, আমি ব্যাঙ্ক পছন্দ করি না।

—কেন, অসুবিধে কী?

—আমাদের ব্যাঙ্কে ঢুকলেই নিজেকে আসামি মনে হয়। যেন প্রতিটি লোক আমাকে সন্দেহ করছে। তারপর এক জায়গায় টাকা জমা দিয়ে একটা গোল চাক্তি হাতে নিয়ে বসে থাকতে হয়। সেটাও এক পরম অস্বস্তি। সব সময় মনে হয় চাকতিটি বুঝি হারিয়ে গেল। এদিকে বসে থাকতে-থাকতে তোমার সবকটা কড়িকাঠ মুখস্থ হয়ে যাবে, কোন পাখাটা মিনিটে ক'বার ক্রিক ক্রিক শব্দ করছে জানা হয়ে যাবে, ব্যাঙ্কের দেয়ালে ঝোলানো যাবতীয় নিয়ম-কানুন, ক্যালেন্ডারের ছবি মনে গেঁথে যাবে—তখন হয়তো আদালতের পেয়াদার মতো তোমার নামে ডাক পড়তেও পারে। তারপর—

—তারপর?

—তারপর হয়তো শুনবে, সই মেলেনি। কিংবা অ্যাকাউন্ট নাম্বার ভুল। তখন দুটো বেজে গেছে, সেদিন আর হবে না। আমি এক ভদ্রলোককে জানি যিনি নিজের অ্যাকাউন্টের টাকা তুলতে গিয়েছিলেন। সই মেলেনি, বারবার সই করেছেন—তবু মেলেনি। তবুও তিনি টাকা তোলার জন্য জোর করায় তাকে পুলিশে দেওয়া হয়!

—তোমাদের দেশে এত লোক, সেই তুলনায় ব্যাঙ্ক নিশ্চয়ই অনেক কম। সুতরাং অনেক সাবধান হতেই হয়!

—তা ঠিক। সেইজন্যই হয়তো, আমাদের ব্যাঙ্কের কর্মচারীরা লোকদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন নিজের সিন্দুক থেকে টাকা ওদের দান করে ধন্য করছেন। লোকে ধন্যও হয়।

—তোমাদের সব লোকে ব্যাঙ্কে টাকা রাখে?

—না! অনেকে রাখে মাটিতে পুঁতে। অনেক সোনার বাট করে বিছানার নীচে রেখে শোয়।

—চোর ডাকাতের ভয় নেই?

—প্রচুর। সেই সঙ্গে অনিদ্রারোগ। টাকা থাকলেই আমাদের দেশে লোকের থাকবে অনিদ্রার অসুখ!—

॥ বারো ॥

'হ্যাঁরে, বিদেশে ভিখিরি ছিল?' মা জিগ্যেস করেছিলেন।

'—কেন, আমিই তো ছিলাম! তবে আমি একা নয়। আরও ছিল। শিকাগোর রাস্তায় যে লম্বা মতন লোকটা কানের কাছে ফিসফিস করত, ও. কে.?'

যে-কোনও নতুন লোকেরই শিকাগো শহরে প্রথমে কয়েকটা দিন ভয়-ভয় করবে। এমন সব রোমাঞ্চকর গল্প শিকাগো শহরের সম্পর্কে আগে শুনেছি, বিখ্যাত গুন্ডা আল-কাপনের জায়গা, যেখানে দিনে-দুপুরে ডাকাতি হত। এখন অতটা হয় না ঠিকই, কিন্তু একেবারেই নিরুপদ্রব পৃথিবীর কোনও বড় শহরই নয়, প্রায়ই মারাত্মক দুঃসাহসী হত্যাকাণ্ডের খবর শিকাগো থেকে আসে। সুতরাং বাকসর্বস্ব এই বঙ্গ-সন্তান প্রথম কয়েকদিন ভয়ে সরু হয়ে পথ হাঁটতুম।

প্রায়ই একটা দশাসই নিগ্রো বিনয়ে নীচু হয়ে কানের কাছে গুনগুন করে কী বলত। সে পাশে পাশে আসত সাউথ ওয়াবাস এভিনিউর মোড় পর্যন্ত, তারপর আর দুজন তার জায়গা নিত। সেই একই রকম পাশে পাশে গুনগুন। একটি অক্ষরও বুঝতে পারতুম না, নমস্কারের ভঙ্গিতে বারবার 'থ্যাঙ্ক য়ু', 'থ্যাঙ্ক য়ু', বলে সুট্‌ করে পাশের গলিতে ঢুকে পড়তুম।

কী চায় ওরা বুঝতে না পেরেই অমন অস্বস্তিতে ছিলুম। বিলেত দেশটা মাটির হলেও আমেরিকা দেশটা তো সোনার। তবে, আমার মতো কাদামাটির দেশের মানুষের কাছে কী গূঢ় দাবি থাকতে পারে ওদের। গলির মোড়ে মোড়ে বা কফিখানায় একদল সুসজ্জিত ছোকরাকে দুপুরে জটলা করতে দেখতুম, দেখে মনে হয় বেকার। একদিন প্রকাশ্য দিবালোকে আমার পঞ্চাশ গজের মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিটে বিয়ারের বোতল ছোঁড়াছুড়ি করে দুই দলে রোমহর্ষক মারামারি হয়ে গেল।

একা রাস্তায় ঘুরলেই সেই ফিসফিসানিদের পাল্লায় পড়তাম। ক্ষীণ সন্দেহ হত, পৃথিবীর সব শহরেই বিদেশিদের নিষিদ্ধ প্রমোদ ভবনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ধরনের লোক থাকে, ওরাও কি তাই? কিন্তু, বলা বাহুল্য, ওসব জায়গায় যাওয়ার ঝুঁকি নিতে আমার মোটেই শখ ছিল না। যাই হোক ক্রমে সব রকম উচ্চারণ যখন কানে সড়গড় হয়ে গেল, তখন আমি একটু ভরসা করে দাঁড়িয়ে সেই লম্বা লোকটার কথা শুনলুম, অত্যন্ত বিনীত সুরে সে বলছে ঃ আ ডাইম প্লিজ!

ওঃ, মোটে একটা ডাইম! (অর্থাৎ ওখানকার দশ নয়া পয়সা, আমাদের বারো আনা) ভিক্ষে চাই। তা হলে তো তুমি আমার চেনা লোক। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললুম। পকেট থেকে একটা ডাইম খসিয়ে ওরকম আনন্দ কখনও পাইনি।

সানফ্রান্সিস্কোর মতন অমন রূপসি নগরী দুনিয়ায় ক'টা আছে জানি না। অল্প শীতের দুপুরবেলা উপসাগরের দিকে হেঁটে যাচ্ছিলুম। পথে একটি দর্শনীয় চেহারার মানুষ চোখে পড়ল। অতিশয় লম্বা, বৃষস্কন্ধ শালভূজ। বয়েস সত্তরের কম না, কিন্তু কী সবল শরীর। আর প্রায়-সব সাদা ঝোপ দাড়ি, লম্বা চুল, পোশাক দেখলে মনে হয় সে পোশাক পরেই লোকটা রাত্তিরে ঘুমোয়। অনেকটা মবি ডিক উপন্যাসের ক্যাপ্টেন এহাবের মতন চেহারা। কিন্তু এহাবের মতো অহঙ্কারী সে মোটেই নয়, বরং কোলরিজের সেই বুড়ো নাবিকের মতোই সে হঠাৎ আমাকে দেখে ঘুরে দাঁড়াল, তারপর কাঁধে হাত দিয়ে জিগ্যেস করল, তুমি ভারতীয়?

ততদিনে আমি আমেরিকার কথাবার্তার ধরন ঢের জেনে গেছি।

বললুম, হ্যাঁ, কিন্তু তোমাদের 'ভারতীয়' নয়, খাঁটি ভারতবর্ষের ভারতীয়।

লোকটি বলল, আমি ভাতরবর্ষে গিয়েছিলাম। চমৎকার দেশ। গান্ধি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ। তুমি কোথায় যাবে, চলো, আমিও একটু তোমার সঙ্গে হাঁটি।

হাঁটতে-হাঁটতে লোকটা বলল, গান্ধির মতন লোক হয় না, সত্যি। আমি ওর অনেক লেখা পড়েছি। গ্রেট ম্যান—তারপরই লোকটি আমার কানের কাছে মুখ এনে নীচু গলায় বলল, তোমার কাছে একটা সিকি (কোয়ার্টার) হবে?

আমি স্তম্ভিত ও মন্ত্রমুগ্ধের মতো লোকটির হাতে একটি সিকি তুলে দিলুম। লোকটি দরাজ গলায় আমাকে বলল, গড ব্লেস ইউ, মাই সান, তার পরই অন্তর্হিত হয়ে গেল।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল, লন্ডনে ভারতীয়দের মধ্যে একটা রসিকতা চালু আছে যে, রাস্তায় কোনও অপরিচিত লোক যদি হঠাৎ এসে বলে যে, 'নেহরু খুব ভালো লোক' বা 'গান্ধি একজন সত্যিকারের মহাত্মা', তা হলে তৎক্ষণাৎ তাকে এড়িয়ে চলা উচিত। লোকটা নিশ্চিত কোনও মতলববাজ, ভিখিরি।

ওই সানফ্রান্সিস্কোতেই আর একজন মজার ভিখারির সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম। কলম্বাস এভিনিউতে লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে এক দোকানে বসে এসপ্রেসো কফি খাচ্ছিলুম, পাশে আর একটি খোঁচা দাড়ি বুড়ো বসে খুব বকবক করছিল, সাহিত্য, জীবন, ভগবান ইত্যাদি সম্বন্ধে; হঠাৎ

এক সময় লোকটা হাই তুলে বলল, চারটে বাজল। বাবা!—তার পরই আমার দিকে ফিরে ঃ তোমার কাছে খুচরো আছে?

ভাবলুম লোকটা টাকা ভাঙাতে চায়। কোটের পকেটে হাত দিয়ে বললুম, না পুরো হবে না, আমার কাছেও ডলারের নোট।

লোকটা উদার হেসে বলল, না, না, আমি আস্ত এক ডলার কারুর কাছ থেকে নিই না। ও খুচরো যা আছে, তাই দাও।

ফের্লিংগেটি বললো, ও কি হচ্ছে ডন, ছি ছি, ও এসেছে গরিব ভারতীয়, তাও কবি, ওর কাছ থেকে তোমার নেশার পয়সা না নিলে চলে না।

লোকটা বলল, তুমি ভারতীয়? আচ্ছা, তোমার পয়সা আমি শোধ দিয়ে দেব। ঠিক দেব, কোনও না কোনও দিন। আমি কথা দিয়ে কথা রাখি।

ওকে বলা হয়নি, আমি সেদিনই ওখান থেকে চলে যাচ্ছি।

মেয়ে ভিখারির দেখা পেলাম নিউ ইয়র্কে। গ্রিনিচ ভিলেজ থেকে ইস্ট সাইডে যেতে প্রায়ই একটি মাঝ বয়েসি মেয়ে নিঃশব্দে হাত পেতে থাকত। পরপর তিন দিন তাকে আমি একটি করে নিকেল (পাঁচ পয়সা) দিলাম। তাই দেখে অ্যালেন গিনসবার্গ হেসে বলল, কী, খুব মজা লাগছে বুঝি ভিক্ষে দিতে। একটা প্রতিশোধ। এত বড় লোকের দেশেও ভিখিরি।

আমি বললুম, না, এরা তো আমার চেনা লোক। একেবারে ভিখিরি না থাকলেই বরং দেশটা একেবারে কাঠকাঠ লাগত।

—এরা কিন্তু বেশিরভাগই নেশাখোর। না খেতে পাওয়া ভিখিরি প্র্যাকটিক্যালি এ দেশে নেই।

—সে যাই হোক, ভিক্ষে কেন করছে এটা বড় কথা নয়। ভিক্ষে চাইছে এইটাই আনন্দের খবর। সবাই পরিশ্রম করবে, তার কী মানে আছে। যে হিসেবে সাধু-সন্ন্যাসীরা ভিখিরি, আমি তাদের শ্রদ্ধা করি। অবশ্য, আমাদের দেশে বেশিরভাগই বাধ্য হওয়া, খেতে না পাওয়া ভিখিরি।

—ঠিকই এদেশে আরও বেশি ভিখিরি থাকা উচিত ছিল। বেঁচে থাকা এখানে এত সহজ।

লন্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে প্রত্যেক দিন সন্ধেবেলা বক্তৃতা হয়। নানান জটলায় যে-ইচ্ছে বক্তৃতা দেয়, পৃথিবীর হেন বিষয় নেই যা নিয়ে ফাটাফাটি হয় না রোজ। একজন লোক ছিল ভারী মজার, সারা হাতে মুখে উল্কি, ফ্যাস-ফেসে গলা—চুরি করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম, এই বিষয়ের ভিত্তিতে সে তার জীবনের নানা চৌর্যকর্মের বর্ণনা দিয়ে বক্তৃতা দেয়। একদিন মাঝপথে বক্তৃতা থামিয়ে হঠাৎ দুঃখিত গলায় বলল, আজকাল চুরির বাজার বড় মন্দা, যাই হোক আশেপাশে পুলিশ নেই—আপনারা ঝটপট দু'চার পেনি করে ভিক্ষে দিন তো।

একটা জিনিস লক্ষ করেছি, আমাদের দেশে খুব দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি পেলেও, ভিক্ষের রেট খুব বাড়েনি। এখনও বুলি সেই পুরোনো, 'মা, দুটো পয়সা ভিক্ষে দিন।' বড়জোর আধুনিক ছেলে-ছোকরা ভিখিরিরা পাঁচ পয়সা, দশ পয়সা চায়। বিদেশের ভিখিরিরা কিন্তু চার-আনা আট-আনার কম কথাই বলে না। এক সময় শ্যামবাজারে একটি সত্যিকারের স্টাইলিস্ট ভিখারি দেখতাম। একটি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের ছোকরা, প্যান্ট ও গেঞ্জি পরা, বোধহয় আধপাগলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে সে লোক নির্বাচন করে নিয়ে—সেই লোকের কাঁধে টোকা দিয়ে বলত, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে। হতচকিত কোনও লোক যদি থেমে যেত তাকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে সে বলত, আপনার কাছে একটা স্পেয়ারেবল সিকি হবে? আমার শর্ট পড়ে গেছে।

কি জানি ছোকরাটা বিলেত ফেরত কি না। কারণ, বিলেতে অনেক ভিক্ষার্থীর মুখে 'স্পেয়ারেবল' শব্দটা শুনেছি।

প্যারিসেও দেখেছি মাটির তলায় ট্রেনের রাস্তায় হাত পেতে নিঃশব্দে বসে আছে। কেউ

অথর্ব, কেউ হাত-পা কাটা। কেউ ব্যাঞ্জো বাজায়, কেউ চোখে চোখ ফেলে করুণ মিনতি করে! আর যেখানেই রিফিউজি, সেখানেই ভিখারি। প্যারিসে কিছু আছে আলজিরিয়ার রিফিউজি। একদিন দেখি, একটা ছোট্ট পার্কে ওয়াইনের বোতল সঙ্গে নিয়ে একজন কেক খাচ্ছে—আশেপাশে দু-তিনটে রিফিউজি ছোকরা ছুকরি ঘুরঘুর করতে লাগল। একজন শেষে বলেই ফেলল, তার নাকি ওয়াইন সর্ট পড়ে গেছে, কেক খেয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, সুতরাং সে যদি একটু—।

রোমে একটা লোক এসে বলল, তুমি বোতাম কিনবে?

না, ধন্যবাদ।

ক্যালেন্ডার কিনবে?

না, ধন্যবাদ।

দেন, প্লিজ হেল্প মি টেন লিরা!

প্রত্যেক জায়গাতেই আমি এ সব শুনে খুশি হয়েছি। কারণ, ওসব দেশে, এত অসংখ্য লোক আমাকে অকারণে সাহায্য করেছে।

দেশে ফেরার পরের দিন গলির মোড়ে পুরোনো বৈরাগীকে দেখতে পেলাম, খঞ্জনি বাজিয়ে আগমনী গান গাইছিল ঃ 'যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী, উমা কত মা-মা বলে কেঁদেছে।' আমাকে দেখে একগাল হেসে বলল, খোকাবাবু, ভাল আছ, কদ্দিন দেখিনি। দাও, গরিবকে দুটো পয়সা দাও।

পকেটে হাত দিলাম। হা-কপাল। একটাও পয়সা নেই। সত্যিই নেই।

৷৷ তেরো ৷৷

রাত্রি ন'টা আন্দাজ টেলিফোন বেজে উঠল।

—তুমি খুব ব্যস্ত। একবার আসতে পারবে?

পরিচিত অধ্যাপকের স্ত্রীর গলা।

আবহাওয়া ভালো নয়, প্রায়ই বৃষ্টি হচ্ছে। সারাদিন সন্ধের পর ঝড়ের হাওয়া উঠেছে। অধ্যাপকের বাড়িতে পৌঁছলাম। সদর দরজা খোলাই ছিল, আমি না ডেকেই ভেতরে ঢুকে গেছি বহুবার! ওঁদের কুকুরটাও আমাকে চেনে।

বসবার ঘরে আলো জ্বলছে, কিন্তু শূন্য ঘর, বাইরের ঝড়ের শব্দ উঠছে শোঁশোঁ করে। কীরকম যেন অস্বাভাবিক লাগল—সারা বাড়িতে কোনও জনপ্রাণীর শব্দ নেই—মেরি আমাকে টেলিফোন করে হঠাৎ এ সময় ডাকলই বা কেন? কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো? কিন্তু বিপদ-আপদ হলে আমাকেই বা ডাকতে যাবে কেন? আমি কী করব, আমার আর কী করার ক্ষমতা আছে? আমি চেঁচিয়ে ডাকলুম, মেরি। মেরি!—শূন্য বাড়িতে আমার ডাক প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। কুকুরটা ছুটে এসে শুধু কুঁ-কুঁ করতে লাগলে পায়ের কাছে।

একটু পরে পায়ের শব্দ পেলাম। বেসমেন্ট অর্থাৎ মাটির তলা থেকে উঠে এল মেরি! পরনে একটা ঢিলে গাউন, শুকনো মুখ, একমাথা সাদা চুল এলোমেলো! ঈষৎ অপ্রস্তুতভাবে হেসে বলল, ইস্, তুমি অনেকক্ষণ এসেছ বুঝি! তোমাকে কতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। ছি, ছি! আমি বেসমেন্ট গিয়ে বসেছিলাম, জানো, আমি ঝড়ের শব্দ মোটে সহ্য করতে পারি না।

অধ্যাপকের নাম করে জিগ্যেস করলুম, আলবার্ট কোথায়? পিতার বয়সি সেই অধ্যাপক এবং মায়ের বয়সি অধ্যাপকের পত্নী, কিন্তু এ দেশের নিয়ম নাম ধরে ডাকা। কথার ভঙ্গি এমন যেন তুমি করে কথা বলছি। এমন কোনও ঠাট্টা ইয়ার্কি নেই যা এঁদের সামনে করা যায় না। যদিও

আমি ওঁর ছাত্র নই, অন্য সূত্রে পরিচয়, কিন্তু অন্তরঙ্গ ছাত্ররাও অধ্যাপকের সঙ্গে এই সুরেই কথা বলে।

মেরি বলল, আলবার্ট গেছে নিউ ইয়র্ক, তুমি জানো না? সাতদিন আগে!

—সে কী, এই সাতদিন তুমি একা আছ?

মেরি বিষণ্ণ হেসে বলল, হ্যাঁ, আর কে থাকবে বলো! জানো, আজ অ্যালবার্টের প্লেনে চড়ে বোস্টন যাওয়ার কথা, এই ঝড়ের রাত আমার এমন ভয় করে!

—আমাকে হঠাৎ ডেকেছ? তোমার কোনও জিনিসের দরকার আছে? আমি এনে দেব?

—না, না। তোমাকে ডেকেছি একটু গল্প করার জন্য। তোমার যদি কোনও কাজ থাকে, তাহলে অবশ্য...না, না, ডোনট বি পোলাইট! তুমি সত্যি করে বলো, আমার জন্য শুধু...

আমি বিষম ব্যস্ত হয়ে বললুম, মোটেই না, আমার কোনওই কাজ ছিল না। আমি টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে বসে-বসে নভেল পড়ছিলুম। তার বদলে তোমার সঙ্গে গল্প করতে আমার অনেক ভালো লাগবে!

—মোটেই না, আমি জানি! বুড়ির সঙ্গে গল্প করতে কার ভালো লাগে। কারুর না! তোমার বয়সি ছেলেদের তো নয়ই, এমনকী বুড়োদেরও নয়! কিন্তু আজ বড় মন খারাপ, খুব একা-একা লাগছে, কিছুতেই চুপ করে বসে থাকতে পারছিলুম না। এসো না হয়, আমরা দুজনে বসে একসঙ্গে টেলিভিশন দেখি!

—না, থাক! টেলিভিশন আমার অসহ্য লাগে। বরং গল্প করি এসো!

মেরি খানিকটা হাসল। তারপর বলল, আমিও যে টেলিভিশন খুব ভালোবাসি তা নয়, কিন্তু বুঝলে, একা থাকলে অনেকটা সঙ্গ দেয়। আচ্ছা, তুমি কী ড্রিংকস নেবে বলো? আমি নিয়ে আসি, তারপর গল্প করা যাবে।

আমি নাম বললুম।

মেরি রান্নাঘরে গিয়ে ফ্রিজ থেকে বরফ বার করে পানীয় তৈরি করতে গেল। আমি একটা সিগারেট ধরিয়ে দূর থেকে ওঁর দিকে চেয়ে রইলুম। বার্ধক্যে ওঁর শরীর একেবারে ভেঙে না দিয়ে বরং অন্য ধরনের সৌন্দর্য এনে দিয়েছে। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত পরিবারের বৃদ্ধাদের মতো, ওদের পোশাক পরিচ্ছেদে অবহেলা নেই। স্বামী বিখ্যাত অধ্যাপক, প্রায়ই নানান কাজে এখানে ওখানে যেতে হয়। প্রায়ই খবরের কাগজে স্বামী সম্পর্কে প্রশস্তি বেরোয়। সুতরাং ওকে দেখলে মনে হয় সুখী মহিলা। কোনও অতৃপ্তি থাকার কথা নয়।

কিন্তু এই ঝড়ের রাত্রে দেখে বুঝতে পারলুম কত অসহায়। নিজের মুখে প্রায় ভিখারিনীর মতো স্বীকার করলেন, একা থাকতে ওঁর খারাপ লাগছে। এ কথা সাহেব-মেমরা কেউ মুখে বলে না। কত পরিবারকে দেখেছি, এ দেশের সর্বত্র, ইওরোপেও, সন্ধেবেলা কী দারুণ বিষণ্ণ। কিছু করার নেই। খবরের কাগজ মুখে নিয়ে বসে থাকা, অথবা টেলিভিশনের সামনে ঝিমোনো। বিশেষ করে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কিছু করার নেই। ছেলেরা বিয়ে করে আলাদা বাড়িতে থাকে। মেয়েরা চলে যায় পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে পার্টিতে। অথবা এক বাড়িতেও থাকলে ছেলে-মেয়ে বাপ-মার সঙ্গে বসে সন্ধেবেলা গল্প করতে আসে না। রবিবার গির্জাতে গিয়ে যা একটু গল্প-গুজবের সুযোগ, আর নানা ধরনের ক্লাবের মিটিং-এ কিছুটা পরনিন্দা পরচর্চা। এ-ছাড়া আর সঙ্গ নেই। বুড়ো-বুড়িদের পার্টিতেও ডাক পড়ে খুব কম। বাড়িতে পুজো করারও প্রথা নেই যে, আমাদের দেশের ঠাকুমা-দিদিমার মতো দিনরাত ঠাকুরঘরে পড়ে থাকবে।

মেরির দুই মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, ফিলাডেলফিয়ায় থাকে। ছেলে থাকে জাপানে। আরেক মেয়ের বিয়ে হয়নি, কিন্তু তার বিষম ঘোড়া পোষার শখ। শহর থেকে

চল্লিশ মাইল দূরে একটা ফার্মে ওদের দশটা ঘোড়া আছে, মেয়ে সেখানেই থাকে একা। সপ্তাহে একবার হয়তো বাপ-মার সঙ্গে দেখা করে যায়। এদের কারুর কোনও ভয় ডর নেই, মেয়ে থাকে একা সেই নির্জন ফার্মে, দুটো ভয়ংকর কুকুর তাকে পাহারা দেয়। আর মা আছে একা। এই নির্জন বাড়িতে ঝড়ের রাত্রে সম্পূর্ণ একা।

মেরি যে আমাকে ডেকেছে, সে যে শুধু আমাকে স্নেহ করে সেই জন্যই নয়, আমি বিদেশি বলে প্রত্যাখ্যানও করব না। কিন্তু আমার বয়সি এ দেশের কোনও ছেলে-মেয়েকে ডাকলে মোটেই আসত না, হয়তো মুখের ওপরই ঠাট্টায় প্রত্যাখ্যান করে উঠত। দরকার ছাড়া কেউ কারুকে ডাকে নাকি? শুধু এক বুড়ির সঙ্গে গল্প করার জন্য? অসম্ভব! অন্য কোনও বুড়ো-বুড়িকেও ডাকা যায় না। সেও নির্জন, সেও একাকিত্বে অসুখী, কিন্তু কেউ কারুর কাছে স্বীকার করবে না সে কথা। সে যে বিষম লজ্জার। এমনকী আমাকেও যদি মেরি প্রায়ই ডাকে, আমারও হয়তো আসতে ভালো লাগবে না, আমিও হয়তো মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে এড়াবার চেষ্টা করব। আগেও তো করেছি আমার বুড়ো বাড়িওলা যখন আমার ঘরে এসে অনাবশ্যক গল্প করে দেরি করেছে, আমি ব্যস্ততার ভাব করে সরে পড়েছি।

অথচ মেরির সঙ্গে কথা বলতে আমার ভালোই লাগে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং রসিকতা জ্ঞান আছে। কোনওরকম কুসংস্কার নেই। বহু জিনিস সম্পর্কে ভালো পড়াশুনো আছে। কিন্তু যখনই নির্জনতার প্রসঙ্গ আসে, তখনই আমার অস্বস্তি হয়। মনে হয়, কোনও মানুষেরই নির্জনতা আমি স্পর্শ করতে পারব না। আমার সাধ্য নেই, কারুর একাকিত্ব ঘোচাবার। আমি সে-মন্ত্র জানি না। আমি বসে বসে কথা বলতে পারি, কিন্তু যখনই মনে হবে, এ-সব কথাই আসলে মূল্যহীন, আসলে একজন মানুষকে কিছুক্ষণ সঙ্গ দেওয়া, তার একাকিত্ব ভুলিয়ে রাখা, তখনই আমার অস্বস্তি লাগে, আমার মনে হয়, আমিও খুব দূরে সরে যাচ্ছি, দূরে সরে গিয়ে কোথায় আমিও বিষম একা হয়ে পড়লাম।

মেরি পানীয় এনে বসল আমার সামনে। কী যেন দু-একটা কথা বলে সামান্য হাসাহাসি করলুম। একটু বাদেই সবিস্ময়ে লক্ষ করলুম, অনেকক্ষণ আমরা কথা না বলে চুপচুপ বসে আছি। আমাদের কথা ফুরিয়ে গেছে। তখন মেরি বলল, তুমি শুনবে, আমি পিয়ানো বাজাব? তোমার খারাপ লাগবে না তো?

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

উঠে গিয়ে মেরি পিয়ানোর সামনের টুলে বসল। একা একা বুঝি পিয়ানোও বাজানো যায় না। তার জন্যও একজন সঙ্গীর দরকার হয়।

বাইরে তখন ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পিয়ানোর টুং টাং শব্দ শুনতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলাম। আমার মনে হল, মেরি তো এমনিতে কাঁদতে পারবে না মন খুলে। তবু, এই পিয়ানোর শব্দের মধ্যে কিছুক্ষণ কেঁদে নিক!

॥ চোদ্দো ॥

তাহিতির সমুদ্র পাড় দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক ভদ্রমহিলা যেন হঠাৎ ভূত দেখে চমকে উঠলেন। নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারলেন না। আধ-ময়লা, ছেঁড়া পোশাকপরা একজন বুড়ো মতন লোক বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে, তাকে অবিকল দেখতে পল গগ্যাঁর মতন। কিন্তু তাতে কোনও রকমেই সম্ভব হতে পারে না, কারণ পল গগ্যাঁ মারা গেছেন অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে, ওই তাহিতি

দ্বীপেই, অনাহারে-অপমানে, রোগে ভুগে, লোকচক্ষুর আড়ালে। মাসে ১৬ হাজার টাকার চাকরি ছেড়ে প্যারিস থেকে চলে গিয়েছিলেন পল গগ্যাঁ। পানামায় এসে মাটিকাটা কুলিগিরি করেছেন দীর্ঘকাল, তারপর তাহিতি দ্বীপে এসে নির্জন প্রবাস। সভ্যতার সঙ্গে সমস্ত সংস্রব ছিন্ন করতে চেয়েছিলেন। তাহিতি দ্বীপে তাঁর শেষ জীবনে আঁকা বিশাল ছবি "আমরা কে? আমরা কোথা থেকে এসেছি? আমরা কেন এখানে? আমরা কোথায় চলেছি?" সমস্ত পৃথিবীর চিত্রশিল্পে একটি মহামূল্যবান সম্পদ।

নিজের স্ত্রী আর পাঁচটি ছেলেমেয়েকে জন্মের মতো ত্যাগ করে এসেছিলেন। ছেলেদের দেখার জন্য মাঝেমাঝে ইচ্ছে হত, কিন্তু বউ বিষম বদমেজাজি, রোজগারহীন স্বামীকে অপদার্থ ছাড়া আর কিছু মনে করতেন না। শেষ পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, গগ্যাঁ ওই তাহিতি দ্বীপেরই একটি আদিবাসী মেয়েকে—নাম, পাহুরা—স্ত্রী হিসেবে অবৈধভাবে গ্রহণ করে একসঙ্গে বসবাস করেন। কিন্তু সে যা হোক, আজ এতদিন পর আবার গগ্যাঁর দেখা পাওয়া অসম্ভব। গগ্যাঁর মৃত্যু খুবই নিশ্চিত, একবার অসার্থক আত্মহত্যার চেষ্টার অল্প কিছুদিন পরই হার্ট ফেল করে মারা যান, একা ঘরে, একটা পা খাটের বাইরে বেরিয়েছিল—যেন শেষ মুহূর্তে আর একবার দাঁড়াতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলা সেই বুড়ো মতন লোকটির কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলেন, 'আপনার নাম কী?' বিশাল কর্কশ গলায় উত্তর এল, 'গগ্যাঁ'! ভদ্রমহিলা আরও হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন।

আদিবাসী মেয়েটি গগ্যাঁকে একটি ছেলে দিয়েছিল। নাম রেখেছিল, এমিল গঁগ্যা। মৃত্যুর আগে গগ্যাঁ তার ওই পুত্রের ভবিষ্যত সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে এক বন্ধুকে চিঠি লিখেছিলেন। এমিল কি প্যারিস গিয়ে লেখাপড়া শিখবে? না, গগ্যাঁ নিজেই ঠিক করলেন, 'সভ্যতা' নামক দূষিত হাওয়ার সংস্পর্শে তাঁর প্রাকৃতিক সন্তানের যাওয়ার দরকার নেই। সে খোলা আকাশের নীচে আপন স্বভাবে গড়ে উঠুক। সুতরাং, গঁগ্যার মৃত্যুর পর, অন্যান্য আদিবাসী অনাথ বালকদের যা হয়, এমিলেরও তাই হল। সে লেখাপড়া শিখল না, কাজকর্ম কিছুই শিখল না, ছেলেবেলায় রইল টুরিস্টদের ফুটফরমাজ খাটা চাকর, তারপর ক্রমে ক্রমে অশ্লীল ফটোগ্রাফ বিক্রি করা, নিষিদ্ধ প্রমোদের মধ্যম পুরুষ। তারপর এমিলের বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে যখন, তখন তাকে আবিষ্কার করলেন ওই শিল্পরসিকা ফরাসি মহিলা। মহিলার নাম, মাদাম যোসেৎ জিরো।

এমিলকে দেখতে যে হুবহু তার বাবার মতো, তা ঠিক নয়। তবে, তার মুখ দেখলেই গগ্যাঁর কথা মনে পড়ে। পিতার চেহারার সঙ্গে যেমন অমন মিল, তেমন পিতার প্রতিভার কিছু কি ও পেয়েছে?—এই ভেবে ভদ্রমহিলা এমিলকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নিজের সঙ্গে আমেরিকায় নিয়ে এলেন। তারপর তার সামনে রাখলেন রং-তুলি ক্যানভাস। জীবনে কোনওদিন ওসব ছোঁয়নি এমিল। তিন বছরের মধ্যে এমিল গগ্যাঁ হয়ে উঠলেন একজন প্রসিদ্ধ শিল্পী।

এমিলের বাবা পল গগ্যাঁরও শিল্পী-জীবনের শুরু ওইরকম আকস্মিকভাবে। পল গগ্যাঁও কোনওদিন ভাবেননি তিনি শিল্পী হবেন, শেয়ার মার্কেটের অফিসে বড় চাকরি করতেন, তাঁর স্ত্রীও স্বপ্নেও কোনওদিন স্বামী ওই দুর্মতির কথা কল্পনা করেননি। সব ছেড়েছুড়ে শুধু শিল্পী হওয়ার জন্যই আত্মনিয়োগ করেছিলেন যে টানে, হয়তো তারই নাম 'প্রেরণা'। শিল্পী হিসেবে গগ্যাঁ সমস্ত বিশ্বে তুলনারহিত। তাঁর ছেলে এমিলও কত বড় শিল্পী হবেন তা এখনও বলা যায় না—কারণ এমিল শুরু করেছে বড় দেরিতে, ৬২ বছর বয়সে, ওর বাবার মৃত্যুই হয়েছিল ৫৫ বছরে। কিন্তু এই বয়সে এমিলের চিত্তের সুপ্ত সুকুমারবৃত্তির উন্মেষ সত্যিই বিস্ময়কর। এমিল গগ্যাঁর ছবির একাধিক প্রদর্শনী হয়ে গেছে লন্ডনে, শিকাগোতে, ক্যালিফোর্নিয়ায়।

* * * *

শিকাগোতে এক প্রদর্শনীতে, আমার সঙ্গে এমিল গর্গ্যার দেখা হয়েছিল। হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি, হো-হো করে হাসে, তিন বছরে একটুও ইংরেজি শেখেনি। ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে কথা বলে। শুনলাম, ছবি আঁকা সম্বন্ধে খুবই মনোযোগী হয়ে উঠেছে সে, অত্যন্ত যত্ন করে ড্রয়িং শিখছে, সেই সঙ্গে ভাস্কর্য। কিন্তু রং-এর ব্যবহার তার নিজস্ব, রীতিবিরুদ্ধ এবং টাটকা শিল্প সম্ভাবনাময়। অতিরিক্ত মদ্যপানের স্বভাব ছিল তার, সেটা আস্তে-আস্তে কমিয়ে ফেলেছে। ওর বাবা ছিলেন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, এমিল কিন্তু গোঁড়া ক্যাথলিক। নিয়মিত গির্জায় যায়। আমেরিকার দুটো জিনিস খুব পছন্দ ঃ হট ডগ (এক ধরনের সস্তা খাবার) এবং মেয়েরা। কথায়-কথায় সে বলে, 'হট ডগ এবং মেয়েরা দীর্ঘজীবী হোক!' ওর সঙ্গে একটা আধটা কথা বলতে আমার খুব ইচ্ছে করছিল। কিন্তু ভাষায় কুলোচ্ছিল না। অতিকষ্টে আমার যাবতীয় ফরাসিজ্ঞান আহরণ করে ওকে জিগ্যেস করলুম, 'আপনার বাবার কথা আপনার একটুও মনে আছে?' আমার এবং ওর উচ্চারণের এত তফাত যে, ও বোধহয় কিছুই বুঝতে পারল না। এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আমার কাঁধে ওর বিশাল থাবায় দুই চাপড় দিয়ে বলল, 'চমৎকার। চমৎকার!'

।। পনেরো ।।

উঠেছিলুম শহরের ঠিক হৃৎপিণ্ডের কাছে, প্লাজা হোটেলে। নিউ ইয়র্কের সেরা হোটেলগুলির একটা। আমাদের হিসেবে প্রায় আড়াই শো টাকা শুধু ঘর ভাড়া—বলা বাহুল্য, আমি একজনের অতিথি। চৌরঙ্গির সামনের ময়দানের মতো, বিশাল সেন্ট্রাল পার্কের গায়ে এই হোটেল, এলাহি কাণ্ড, প্রাণপণে পুরোনো বনেদিভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা, ঝাড়লণ্ঠনে, এমনকি সামনে কয়েকটা ঘোড়ার গাড়ি পর্যন্ত দাঁড়িয়ে। আমি ছাড়া আর দ্বিতীয় কালো বা তামাটে রঙের লোক নেই বলে একটু অস্বস্তি লাগল—সেই জন্যই লিফটম্যান বা ম্যানেজারের 'গুডমর্নিং স্যার' শুনে গম্ভীরভাবে কাঁধ ঝাঁকাতুম।

প্রথম দিন দেখি একটি চটপটে চেহারার ছেলে, আমি যখন ঢুকতে যাচ্ছি, দ্রুত বেরুচ্ছে, চোখে কালো রোদ-চশমা, ছুটে গিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল, দারোয়ান বেহারারা দরজা খুলে তটস্থ। ছেলেটিকে কেমন যেন চেনা চেনা লাগল, বিশেষত ওর দৌড়োবার ভঙ্গি। পরে মনে পড়ল, ওর নাম পল নিউম্যান, অনেক ছবিতে দেখেছি, হলিউডের উত্তমকুমার। আর একদিন ওই হোটেলের লবিতেই দেখি একজন কাঁচাপাকা চুলের ভদ্রলোক সপারিষদ দাঁড়িয়ে, চিনতে দেরি হয়নি, স্যার অ্যালেক গিনেস। তার আগের দিনই তাঁকে দেখেছি ব্রডওয়ের স্টেজে 'ডিলান' নাটকে ক্ষুব্ধ, মদ্যপ, তরুণ, আত্মহন্তারক ডিলান টমাসের ভূমিকায়।

কয়েকদিন পর আরেক কাণ্ড। বিকেলের দিকে বেরুতে যাচ্ছি, গেটের সামনে কী ভিড়, চেঁচামেচি, পুলিশ—ভয় পেয়ে আমি ভেতরে ফিরে এলুম, আমার পনেরো তলার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মারলুম নীচে। হাজার হাজার রিনরিনে গলার টিনএজার মেয়ে রং-বেরঙের স্কার্ট দুলিয়ে রইরই করছে। ভিড় সামলাতে পুলিশ হিমসিম। একটু পরে এক লিমুসিন গাড়ি থেকে চারটে রুক্ষু চুলওয়ালা ছোঁড়া নামল, আর অমনি পুলিশের কর্ডন ভেঙে ছুটে এল মেয়েরা। ছোকরা চারটের বয়েস কুড়ি বাইশের মধ্যে, হুড়ো কুড়ো মাথা, চুল পড়েছে কপাল পর্যন্ত, নিরীহ, বদমাশের মতো তাকাচ্ছে হেসে-হেসে। বুঝলুম, এরা বিটলস, সাম্প্রতিক সামাজিক গুজব, ক্রেজ, এলভিস প্রিসলির চতুর্গুণ অবতার, উত্তেজনা। গ্রেট ব্রিটেন থেকে আমদানি, স্টেজের ওপর নেচে-কুঁদে, গান গেয়ে লক্ষ লক্ষ ডলার উপায় করছে! কাগজে-কাগজে এদের ছবি এখন।

আমি কবি পল এঙ্গেলের সঙ্গে নিউ ইয়র্কে বেড়াতে এসেছি। আয়ওয়া-র লিটারারি ওয়ার্কশপের পরিচালক কবি পল এঙ্গেল আমাকে এ শহরের বহু প্রখ্যাত লোকের সঙ্গে পরিচয়

করিয়ে দিচ্ছেন। বিস্ময়, আনন্দ, উপভোগ—এই কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে ডুবে আছি। মাঝেমাঝে মনে হচ্ছে আমি একটা অন্য লোক হয়ে গেছি, অন্য জগতে, এক এক সময় আবার পুরোনো অবস্থায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পল এঙ্গেলের ব্যবহার চির সুহৃদের মতন আন্তরিক, তবু কয়েকদিন পর অকৃতজ্ঞের মতন আমি এঙ্গেলকে বললুম, দ্যাখো এখানে এ হইহুল্লার মধ্যে আমার থাকা হবে না। আমার অসুবিধে হচ্ছে।

অসুবিধে হচ্ছে? ও আমার কথা ঠিক বুঝতে পারল না।

আমি বললুম, আমার ঠাকুরদা ছিলেন পাঠশালার পণ্ডিত, বাবা ছিলেন ইস্কুল মাস্টার, আমি বেকার—আমার কি এসব আরাম বেশিদিন সহ্য হয়? আমার রাত্রে ঘুম হচ্ছে না।

এটা কোনও যুক্তি হল না। ঘুম হচ্ছে না কেন?

যে বিছানায় দিনে দুবার চাদর পালটানো হয়, সে বিছানায় শুয়ে সত্যি আমার ঘুম হয় না।

এদিকে এসো জানলার কাছে। দ্যাখো। ও আমাকে বলল। জানলা দিয়ে দেখলুম, যতদূর চোখ যায় হর্ম্যের সারি, আদিগন্ত জুঁইফুলের মতো হালকা বরফ পড়ছে, নীচে, সেন্ট্রাল পার্কে রঙিন প্রজাপতির মতো ছেলে-মেয়েরা স্কেটিং করছে অবিরাম, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, কিন্তু এমন দৃশ্য বহুবার বহু ছবিতে দেখেছি।

এরকম দৃশ্য তুমি আর কোথায় পাবে?

আমি মনে-মনে ভাবলুম, কিন্তু এখানে থাকলে আমার শুধু দৃশ্যই দেখা হবে, নিউ ইয়র্ক দেখা হবে না!

ওঃ, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, সে কথা এখনও বলা হয়নি। প্রথম দিন এসেই সন্ধেবেলা ও কাজ সেরে রেখেছিলুম। কী হতাশ হয়েছিলুম প্রথমটায়। লজ্জার কথা কী বলি, গোড়াতে খুঁজেই পাইনি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। লোককে জিগ্যেস করতেও পারিনি, অত বড় বাড়ি যা নাকি তিনশো মাইল দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়, সেটা হারিয়ে গেছে বললে সবাই নিশ্চিত হাসবে। অন্তত গোটা দশেক বাড়িকে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং বলে ভুল করেছিলুম, শেষে অতিকষ্টে ম্যাপ দেখে খুঁজে পেলুম। না, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং-এর উচ্চতা একেবারে গুজব না, একশো দুই তলা ঠিকই, আমি নিজে চড়ে দেখেছি। কিন্তু আশেপাশে আরও অনেক সত্তর-আশি তলা বাড়ি থাকলে, ওরা মহিমা ঠিক বোঝা যায় না। ও বাড়িটা যে সত্যি-সত্যি উঁচু তা বুঝতে পারা যায় বহু দূর থেকে কিংবা খুব কাছ থেকে।

তেমনি নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজ। প্রথম দিন-দশেক এঙ্গেল সাহেবের সঙ্গে আমি হোমরা-চোমরাদের বাড়িতে খুব ডিনার খেলুম, রকেফেলার পরিবার, অ্যাডলাই স্টিভেনসানের সহধর্মিণী, 'লাইফ' পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটর, ওমুক তেল কোম্পানির মালিক ইত্যাদি—খাস খানদানি ব্যবস্থার ত্রুটি নেই, সাত-আট কোর্স ডিনার, নানা রকম ওয়াইন, ইংরেজ বাটলার—আমি অকুতোভয় ছিলুম, বাঁধা ধরা ব্যবহার, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গড়ে পাঁচ রকমের বেশি প্রশ্ন হবে না জানতুম, মেয়েরা কেউ মুখে সিগারেট তুললে আগবাড়িয়ে ফটাস করে দেশলাই কাঠি জ্বালতে ভুল হয়নি। মাঝে-মাঝে মুখ লুকিয়ে হাসতুম একা-একা। দিনের বেলা আমি কোথায় খাই যদি জানতে পারত এরা! দিনের বেলায় খাওয়া আমার নিজের খরচে, তখন খুঁজে-খুঁজে যত রাজ্যের সস্তা জায়গায় যেখানে টিপস দিতে হয় না, কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ঘোঁত-ঘোঁত করে স্যান্ডউইচ কিংবা হ্যামবার্গার গেলা যায়।

তবে সব পার্টির সেরা অ্যাস্টর হোটেলের পার্টি। কবিতার ওপর ধনী আমেরিকানদের আজকাল বড় দরদ। সব জায়গাতেই খাওয়ার পর এ নিয়ে কিছু না কিছু আলাপ করা দস্তুর। 'পোয়েট্রি সোসাইটি অব অ্যামেরিকা' নামের প্রতিষ্ঠান দেখে কে বলবে পৃথিবীতে কবিতার দুর্দিন। প্রচুর ধনী বুড়োবুড়ি, কলেজের মাস্টার, রিটায়ার্ড কবি আছেন এ প্রতিষ্ঠানে। এদের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে

অ্যাস্টর হোটেলে ডিনার, এবারের উৎসব বেশি জমজমাট, বেশি খুশি—কারণ, সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান এক মিলিয়ান ডলার চাঁদা পেয়েছে। বিশাল হলঘরে সবাই খেতে বসেছে, টেবিলে সবাইকার নাম লেখা কার্ড আছে আগে থেকে, নিজের নাম খুঁজে নিয়ে আমিও বসলুম, প্রায় হাজারখানেক নারী পুরুষ। সমিতির সভ্যদের জন্যও এ উৎসবে আলাদা পঁচাত্তর টাকা টিকিট, কিন্তু এঙ্গেল সাহেব আমার জন্য নেমন্তন্ন জোগাড় করে দিয়েছিলেন বলে, আমার ফ্রি। প্রধান অতিথি স্টিফেন স্পেন্ডার—আমার নামও সভাপতি মশাই ভারতবর্ষের কবিতা পত্রিকার সম্পাদক বলে বিশেষ অতিথি হিসেবে ঘোষণা করে দিলেন! সেই ঘোষণা শুনে আমার আশেপাশের দু-চারজন চোখ গোল-গোল করে আমার দিকে তাকাতেই আমি ফিসফিস করে বললুম, ওটা অনেকটা ফাঁকা আওয়াজ, বুঝলেন! কবিতার পত্রিকা মানে শ'পাঁচেক কপি ছাপা হয়, যত লোক কেনে তার বেশি বিলি হয়। ভারতবর্ষ তো দূরে থাক কলকাতাতেও আমাকে খুব কম লোক চেনে, মহাশয় মহাশয়াগণ!—এখানে আজ একরাত্রে কবিতার নামে যত টাকা খরচ হচ্ছে, তা দিয়ে কলকাতার তাবৎ কবিদের সংবৎসরের খোরাক জুটে যায়!' শুনলুম কোথাকার এক ডাচেস, নিঃসন্তান, মরার সময় সেই সোসাইটিকে এক মিলিয়ান ডলার চাঁদা দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁর সমস্ত টাকার কিছুটা তাঁর পোষা বেড়ালের নামে, কিছুটা কবিদের জন্য। এক মিলিয়ন ডলার, অর্থাৎ পঁচাত্তর লাখ টাকা। বুঝলুম, নোবেল প্রাইজে আজকাল এদেশে বিশেষ কোনও খবর হয় না কেন! নোবেল প্রাইজ, কি আর, লাখ পাঁচেক টাকা মাত্র! আমাদের রবীন্দ্রনাথের নাম তো অনেকে শোনেইনি, অনেকে নোবেল প্রাইজেরই নাম শুনেছে কি না সন্দেহ।

মাথায় সমস্ত চুল সাদা, স্টিফেন স্পেন্ডার ভিড় ঠেলে আমার কাছে এসে হ্যান্ডশেক করে বললেন, 'আপনাকে আমি চিনতে পেরেছি, কলকাতায় আলাপ হয়েছিল।'—একেবারে ডাহা গুল, স্পেন্ডার সাহেব বার-দুয়েক কলকাতায় এসেছিলেন বটে, কিন্তু আমি নগন্য ব্যক্তি আমার সঙ্গে কখনও দেখা হয়নি। যাই হোক, ওটা হজম করে আমিও এক প্রস্থ দিলুম, বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনার সেই অসুখটা এমন কেমন আছে?'

থতোমতো খেয়ে স্পেন্ডার সাহেব বললেন, 'ভালো, ভালো খুব ভালো, একেবারে সেরে গেছে, থ্যাঙ্ক ইউ, যামিনী রায়ের কী খবর?

আমি এমনভাবে যামিনী রায়ের বৃত্তান্ত শোনালুম যেন কলকাতায় থাকতে ওঁর সঙ্গে আমার দু-বেলা দেখা হত। সলোমন নামে এক পুরোনো কবি বললেন, আমি বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুব ভালো জানি, টেগোর আর তরু দত্তর সব লেখা পড়েছি।' বললুম, 'ক্ষমা করবেন, টেগোরের সব লেখা আপনার পক্ষে পড়া অসম্ভব, আমার পক্ষেও প্রায় অসম্ভব। আর তরু দত্ত বাঙালি সাহিত্যিক নয়—ওই মেয়েটি বাংলাদেশে জন্মে ইংরেজি ও ফরাসিতে কিছু লেখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তা বাংলা সাহিত্য নয়। আপনি জীবনানন্দ দাশ পড়ার চেষ্টা করুন। না, না, জীবনান্তো নয়, জীবনানন্দ। অবশ্য, ওঁর বেশি লেখা অনুবাদ হয়নি।

আর একজন কবি, নাম ভুলে গেছি, বললেন, বাংলা সাহিত্য মানে কী? তোমাদের রাষ্ট্রভাষা তো হিন্দি, বাংলা তো একটা ডায়ালেক্ট।

আমি বললুম, আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিন্তু পরে আপনার সঙ্গে আলাদা দেখা করে এ সম্বন্ধে বলতে পারি। এখানে এতবড় জায়গায় ঠিক সুবিধে হবে না, আমি বক্তৃতা করতে পারি না বিশেষত বেশিক্ষণ ইংরেজিতে বড়-বড় বাক্য আমি একেবারেই ম্যানেজ করতে পারি না, খানিকটা ইংরেজি বলার পরই আমার জল তেষ্টা পায়, কান কটকট করে, বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস আওয়াজ হয়!' (কান কটকটের ইংরেজি জানি না বলে ওটা আমি ভঙ্গি দিয়ে বুঝিয়েছিলুম!)

ওই পোয়েট্রি সোসাইটি পার্টিতে যাই হোক, নানারকম উত্তম উত্তম খাবার ছিল, পানীয়,

বক্তৃতা, গান ও আবৃত্তি হল, অনেক কবি অনেক উপহার পেল, কিন্তু কবিতার কোনও ব্যাপার ছিল না। ওই পার্টিতে আমি এক কাণ্ড করেছিলুম। খাবার টেবিলে সাধারণত আমি আদবকায়দার ধার ধারি না, যা স্বাভাবিক মনে হয়, তাই করি। কিন্তু সেদিন ওরকম কেতাদুরস্ত আবহাওয়ায় আমি কীরকম ট্যালা হয়ে গেলুম, ভাবলুম সব ঠিক ঠিক করতে হবে। আমার পাশের চেয়ারে বসেছিলেন এক রূপসি ভদ্রমহিলা, সবুজ সান্ধ্য পোশাক পরা, নামও মিসেস গ্রিন, আমার সঙ্গে হেসে-হেসে দার্জিলিং-এর আবহাওয়া বিষয়ে আলোচনা করছিলেন, আমি আদব-কায়দায় ওকে হুবহু নকল করতে লাগলুম। কখন ন্যাপকিন কোলে রাখতে হবে, কোন হাতে ছুরি কাঁটা, বিনা শব্দে সুপে চুমুক, আইসক্রিমের চামচ ও কফির চামচে পার্থক্য, কোন হাত দিয়ে স্যালাড খেতে হবে—আমি আড়চোখে দেখে-দেখে কপি করে যাচ্ছিলুম। হঠাৎ দেখি, টেবিলের বাকি সবাই আমার দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারি না, আমি আড়ষ্ট হয়ে কলার ঠিক করি, বো সোজা করি, জামা প্যান্টের বোতাম ঠিক আছে কি না দেখি, তবু ফিকফিক হাসি থামে না। শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করলুম, আমার পাশের ভদ্রমহিলা ন্যাটা, ওঁর দেখাদেখি এতক্ষণ আমিও বাঁ-হতে ছুরি ধরেছিলুম।

এমনিভাবে হাওয়ায় শিমুল ফুলের মতো আমি ভাসতে লাগলুম নিউ ইয়র্কের উঁচু সমাজে। কিছুই ছুঁতে পারিনি। পার্টি থেকে পার্টি, ট্রাম লাইনের মতো বাঁধা কথাবার্তা, আকাশছোঁয়া হোটেল। মাঝেমাঝে দিনের বেলা একা পথে পথে ঘুরতুম। কোনওদিন পথ ভুল করে হারিয়ে যাইনি। হঠাৎ কোথাও পথের মধ্যে থেমে তাকিয়ে থাকতুম ওই বিশাল শহরটার দিকে। সত্যিই বিশাল। ভারতবর্ষে একমাত্র কলকাতার সঙ্গে মিল আছে। সাবর্ণ রায়চৌধুরীরা ইংরেজদের কাছে কলকাতা সমেত তিনটি গ্রাম বেচে দিয়েছিল মাত্র তেরোশো টাকায়, এই ম্যানহাটান দ্বীপও রেড ইন্ডিয়ানরা ইওরোপীয়দের কাছে বিক্রি করেছিল মাত্র ছাব্বিশ ডলারে। আজ এই শহর শুধু বাণিজ্য নয়, শিল্প ও সাহিত্যের কেন্দ্র। পৃথিবীর নানান দেশের লেখক শিল্পী জমা হচ্ছে এখানে। অসংখ্য আর্ট গ্যালারিতে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের ছবি। পৃথিবীর সব দেশেই বাছাই করা সিনেমা দেখা যাবে এখানে, থিয়েটার, যে-কোনও বই। যে-কোনও খাবার, যে-কোনও পোশাক, যে-কোনও জাতের মানুষ। কলকাতার মতোই জীবন্ত এই শহর—মাটির তলায় ট্রেন ও আকাশ ঝাঁড় দেওয়া বাড়ির সারি সত্ত্বেও। তবু, আমার মনে হচ্ছিল, আমি যেন ঠিক এ শহরের প্রাণ ছুঁতে পারছি না।

একদিন হোটেলে ফিরে এঙ্গেল সাহেবকে বললুম, আমি চললুম এখান থেকে, গ্রিনইচ ভিলেজে সস্তা থাকার জায়গা পেয়েছি।

তারপর আর বাক্যব্যয় না করে বিদায়।

নাম ভিলেজ, আসলে গ্রিনইচ ভিলেজ নিউ ইয়র্কের একটি পাড়া, আমাদের কলেজ স্ট্রিট পাড়ার মতো। নিউ ইয়র্ক কলেজ ও আশেপাশে বই-এর দোকান, ছোট-ছোট বাড়ি ও রেস্তোরাঁ, যত রাজ্যের লেখক শিল্পী অভিনেতা গাইয়েদের আড্ডা। একটা ছোট্ট হোটেলের এক চিলতে ঘরে উঠলুম, নিজের ইচ্ছে মতো পাঞ্জাবির দোকানে কষা-মাংস কিংবা চিনে হোটেলে ভাত মাছের ঝোল খাই। মাঝেমাঝে টেলিফোন করে এক অ্যামেরিকান কবি বন্ধুকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করি। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কলকাতায়, সে এখানে বিষম বিখ্যাত, যে-কোনও পার্টিতে তার নাম করেছি সবাই চিনেছে ও কিছুটা আঁতকে উঠেছে। কিন্তু যেখানেই ফোন করি, শুনি, সে কাল এখানে ছিল, আজ কোথায় জানি না। দু-তিনদিন ঘুরলুম একা ওয়াল স্ট্রিট পেরিয়ে, স্ট্যাচু অব লিবার্টির চক্ষু-সীমায়।

আমার হোটেলের ঠিক উলটো দিকে একটা বড় বই-এর দোকান, সেখানে ঘুরঘুর করি, একদিন সাহস করে কাউন্টারে জিগ্যেস করলুম, অ্যালেন গিনসবার্গ কোথায় থাকে বলতে পারেন? লোকটা আমার দিকে মুখ তুলে বলল, আপনার নাম সুনীল সামথিং? ইন্ডিয়া থেকে? এই যে একটা

চিঠি আপনার নামে। দোকানের ভেতর দিয়ে সোজা চলে যান, ডানদিকে সিঁড়ি, দোতলায় অ্যালেন গিনসবার্গকে পাবেন।

বুক পর্যন্ত দাড়ি, অবিন্যস্ত চুল, ঠিক কলকাতায় যেমন দেখেছিলাম। তখন দুপুর একটা, সদ্য ঘুম থেকে উঠেছে অ্যালেন। বলল, 'আমিও তোমাকে খুঁজছিলাম, আমার থাকার জায়গার ঠিক নেই, এক একদিন এক এক জায়গায় থাকি। এই বই-এর দোকানের মালিক এখানে কয়েকদিন থাকতে দিয়েছে। চলো ওপরে যাই রান্নাঘরে। বিলায়েত খান আর ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের রেকর্ড আছে, শুনবে?'

এতদিন পর ভারতীয় রাগসঙ্গীত শুনতে পেয়ে, যাকে বলে বুক জুড়িয়ে গেল। রাগসঙ্গীত যে আমি এত ভালোবাসি আগে কখনও বুঝতে পারিনি। অনেক কনফারেন্সে শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছি, এখানে রেকর্ডগুলো বারবার শুনতে লাগলুম। অ্যালেন ভাত আর মুরগির মাংস রেঁধেছিল আগের দিন, সেইগুলো গরম করে দুজনে খেলুম। সেই সঙ্গে চমৎকার জমানো দই। অ্যালেনের গায়ে পুরোনো রং-জ্বলা খাঁকি কর্ডের কোট ও প্যান্ট, জিগ্যেস করলুম, 'ওগুলো কোথায় পেলে, কলকাতায় তো ছিল না?' শুনলুম, ওর এক বন্ধু শিগগির মারা গেছে, তার বিধবা পুরোনো জামা-কাপড়গুলো দিয়ে দিয়েছে অ্যালেনকে। আমি কোথায় উঠেছি, আমাকে জিগ্যেস করল। প্লাজা হোটেল শুনে আঁতকে উঠল, বলল, 'আমি জন্মেছি এখানে, তিরিশ বছরের বেশি আছি নিউ ইয়র্কে, আজ পর্যন্ত ওসব জায়গায় ঢোকার সুযোগ পাইনি। আর তুমি! নিউ ইয়র্কে আর কী-কী দেখলে বলো।'

আমি আরম্ভ করলুম, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, মেট্রোপলিটান মিউজিয়ম, ইনস্টিটিউট অব মডার্ন আর্ট, ওয়াল স্ট্রিটের স্টক এক্সচেঞ্জ নামক চিড়িয়াখানা, নদীর তলায় লিঙ্কন টানেল, নিগ্রোপাড়া হার্লেম, ইউ এন বিল্ডিং। স্টাচু অব লিবার্টি? হ্যাঁ। রকেফেলার সেন্টার? হ্যাঁ। কোন-কোন লোকের সঙ্গে দেখা হল? লিস্টি দিলাম। যেসব লোকের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছি, তাদের নাম শুনে ওর চোখ গোল হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ছেলেমানুষের মতো বলল, 'ওখানে কী সব কথাবার্তা হয় বলো তো শুনি, কখনও জানতে পারি না, কিন্তু খুব জানতে ইচ্ছে হয়।' নানারকম গল্পের পর অ্যালেন বলল, 'ট্যুরিস্টরা যা দেখে তুমি সবই দেখেছ, এমনকী তার চেয়ে অনেক বেশি, ও সব জায়গায় সবাই ঢোকার সুযোগ সুযোগ পায় না। তুমি দেখেছ উঁচু সমাজের নিউ ইয়র্ক। চলো, তোমাকে আর একরকম নিউ ইয়র্ক দেখাই। কলকাতায় আমি টুরিস্টের মতো ঘুরিনি, আমি দেখেছি চিৎপুর, চিনেবাজার, পোস্তা ওই সবও। চলো, তোমাকে নিউ ইয়র্কের ওসব জায়গা দেখাই!'

খানিকটা বাদে ওর বন্ধু পিটার এল। তিনজনে রাস্তায় বেরুলুম। সারাদিন ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে। গ্রিনইচ ভিলেজের রাস্তায় নানারকম লোক, এখানকার পোশাক তেমন ধোপদুরস্ত নয়, অনেক মেয়েদের মাথায় লম্বা চুল—অবেণীবদ্ধ, ছেলেদের পোশাক রং-বেরং, গলায় টাই নেই—এরা শিল্পী, তাই বেশবাসে এদের ভিন্ন হওয়ার দাবি আছে। বরফে ঢাকা নির্জন ওয়াশিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে আসছিলুম। অ্যালেন বলল, 'এই পার্ক দেখে কার কবিতা মনে পড়ে বলো তো?' বললুম, 'পল ভের্লেনের কলোক্ সাঁন্তিমঁতাল।' 'শীতের নির্জন পার্ক চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার। দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র পার হল।—' আমার দিকে হতচকিত হয়ে তাকাতেই আমি বললুম, 'না-না, ভয় পাওয়ার দরকার নেই, ভের্লেনের এই একটি মাত্র কবিতাই আমি জানি।'

পিটার সারা আমেরিকায় একমাত্র লোক যে বরফের ওপর দিয়ে মোজা ছাড়া শুধু হাওয়াই চটি (কলকাতায় কেনা) পরে হাঁটতে পারে। লোকে বলে, ওটা একটা বেড়াল, শীত গ্রীষ্ম বোধ নেই। আমি জিগ্যেস করলুম, 'সত্যি তোমার শীত করে না পিটার?' ও বলল, 'সুনীল, তোমার মনে আছে, কলকাতায় যখন তোমাকে জিগ্যেস করেছিলুম, জুন মাসের গরমে পিচের রাস্তায় রিকশাওয়ালারা খালি পায়ে হাঁটে কি করে? তুমি বলেছিলে, অভ্যেস হয়ে গেছে।'

অমন বিচিত্র পোশাক গ্রিনইচ ভিলেজের, তবু ওদের দুজনের অতবড় দাড়ি ও এলোমেলো বেমানান জামা-কাপড় দেখে এখানেও লোকে হাসে, যেমন কলকাতায় হাসত। পাড়ার মোড়ে মোড়ে বসা ছেলেরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওরে পাগলারা, ভোর হয়ে গেছে, এখনও দাড়ি কামাবার কথা মনে নেই তোদের?' অথবা 'ওরে, তোদের গালে ও কীসের জঙ্গল রে?' অ্যালেন কোনও উত্তর দেয় না, কিন্তু পিটার মাঝেমাঝে হেসে জবাব দেয়, 'পয়সা নেই ভাই, তাই কামাতে পারিনি।' অথবা 'আমি ইন্ডিয়ান সাধু!' এরপর যে কটা বাংলা-হিন্দি শব্দ জানে এক নিশ্বাসে বলে দেয়, 'নমস্কার, সব ঠিক হ্যায়, দাম কিতনা, আচ্ছা, আমি ভালো আছি, সারেগামা পাধানিসা!'

যত হাঁটতে লাগলুম ততই জাঁকজমক বিরল হয়ে এল। অথচ সেটাও নিউইয়র্ক। ম্যানহাটান দ্বীপ। ও দিকটাকে বলে লোয়ার ইস্ট সাইড। রাস্তাগুলো ভাঙাচোরা, এখানে সেখানে জল-কাদা জমেছে। ছেঁড়া জামাপরা লোক, পোর্টুরিকান, নিগ্রো, ইহুদি অঞ্চল। এই প্রথম দেখলুম দোকানে কাটা মাংস ঝুলছে। মোড়ে মোড়ে জটলা করছে বেকার ছেলের দল। এবং অবিশ্বাস্য হলেও, মাঝে-মাঝে সাদা চামড়ার ভিখিরি, মেয়ে ও পুরুষ। যতবার ভিখিরিদের পয়সা দিচ্ছি, অ্যালেন ও পিটার হাসছে। বলছে, 'তুমি ইন্ডিয়ান হয়েও আমেরিকানদের ভিক্ষে দিয়ে একটা নিষ্ঠুর আনন্দ পাচ্ছ, না?' ঠেলাগাড়িতে সস্তা মালপত্র সাজিয়ে ফিরিওয়ালা হাকছে লে-লে বাবু ছ'আনা। কোথায় গেল সব সুপার মার্কেট।

আমরা যাচ্ছিলুম অ্যালেন ও পিটারের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। ভাড়া নিয়ে নিজেরাই ঘর রং করছে, দরজা জানলা সারাচ্ছে। একটা অন্ধকার গলি দিয়ে ঢুকলুম, ছ'তলা বাড়ি কিন্তু লিফট নেই, নড়বড়ে রেলিং, নোংরা সিঁড়ি, দেওয়ালে অসভ্য কথা লেখা, আমাদের উত্তর কলকাতার যাচ্ছেতাই ভাড়া-বাড়িগুলোর তুলনায় কোনও অংশে ভালো নয়। শেষ পর্যন্ত ওদের ঘর দেখে আমি হতাশ হয়ে প্রায় মাটিতে বসে পড়লুম। অ্যালেন বলল, 'তুমি ছমাস আমেরিকায় থেকে সত্যি আমেরিকান হয়ে গেছ! কলকাতায় অনেকের বাড়ি কি আমি দেখিনি? এর চেয়ে ভালো নয়!'

'যদিও এ কথা ঠিক', অ্যালেন বলল, 'আমেরিকায় ঠিক না খেয়ে লোকে মরে না। বেকার ভাতা ইত্যাদি আছে। অপর্যাপ্ত সম্পদের দেশে একটু চেষ্টা করলেই যথেষ্ট টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু গরিব আর বড়লোকদের মাঝখানের তফাত ভয়ংকর বেশি। তা ছাড়া স্লামে থাকা যাদের স্বভাব, তারা চিরকাল স্লামেই থাকবে—স্লাম বা অট্টালিকা কোথায় বেশি সুখ, কে জানে? আমার মতো যারা, তারা চাকরিবাকরি করে সময় নষ্ট করতে চায় না, সমস্ত জীবনটাই শিল্পের জন্য ব্যয় করতে চায়, তাই তাদের দারিদ্র্য। কিন্তু শুধু কবিতা লিখে বেঁচে থাকাই তোমাদের অসম্ভব! এখানে সেটা অসম্ভব না। লেখা থেকে যদি আমার বেশি টাকা আয় হয়, আমিও ভালো বাড়িতে উঠে যাব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাড়িতে থাকতে আমারও ইচ্ছে হয়!'

সন্ধে হয়ে আসার পর আমরা বেরুলুম। তুমি সাবওয়ে চেপেছ একবারও? আমি জিজ্ঞাসিত হলুম। (সাবওয়ে অর্থাৎ মাটির তলায় ট্রেন, প্যারিসে যার নাম মেট্রো, লন্ডনে টিউব), সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলুম পাতালে—দুপাশের প্লাটফর্ম ঝকঝক করছে নিওন আলোয়, কোথাও হাওয়ার কষ্ট নেই, আশ্চর্য 'কলকাতায় এমন ট্রেন নেই কেন?' অ্যালেন জিগ্যেস করল, তৎক্ষণাৎ পিটার জুড়ে দিল, 'তা হলে কী চমৎকার শোওয়ার জায়গা হত ভিখিরি কিংবা রিফিউজিদের।'

ট্রেনের অনেক লোক অবাক হয়ে দেখছিল ওই বিচিত্র যুগল মূর্তিকে, অনেকে হাসাহাসি করছিল। অ্যালেন গুনগুন করে ভৈরবীর সুর ভাঁজছিল, পিটারের মাথায় কাশ্মীর লাল টুপি। একজন বুড়ো ভদ্রলোক অনেকক্ষণ তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললেন, 'আহা, দেখে মনে হয় যেন বাইবেলের যুগ থেকে উঠে এসেছে।' অ্যালেন বলল, 'সকলেই সেখান থেকে।' আমি মজা করার জন্য জিগ্যেস করলুম, 'আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে, আমি কোথা থেকে এসেছি?' আমাকে অবাক করে ভদ্রলোক বললেন, 'মহাভারতের যুগ থেকে!' আলাপ হল, শুনলুম, গাড়ির এককোণে পুরোনো

ওভারকোট পরে বসে থাকা ওই বৃদ্ধটি যুদ্ধের আগে জাপানে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত ছিলেন কিছুদিনের জন্য।

পাতাল ফুঁড়ে আবার উঠলুম মর্ত্যে! বরফপড়া তখনও থামেনি। রাত্রের গ্রিনইচ ভিলেজ সত্যিকারের জাগ্রত! এখানে ওখানে জ্যাজ ও নানারকম বিদেশি (এদের ভাষায় এক্সটিক) গান বাজনার আওয়াজ। আমরা গুনগুন করে 'হরে কৃষ্ণ হরে রাম' গাইছিলুম, খানিকটা পরে অ্যালেন বেশ গলা ছেড়ে গাইতে লাগল, নির্ভুল সুর, উচ্চারণ খানিকটা হিন্দি ঘেঁষা।

গ্রিনইচ ভিলেজ এখন টুরিস্টদের ভিড়ে ভরে গেছে। নিউইয়র্কের অবশ্যদ্রষ্টব্য জায়গার গাইডবুকে এখন গ্রিনইচ ভিলেজেরও নাম। দেশ বিদেশের লোক এখানে আসে কবি-শিল্পীদের পাগলামি দেখতে। তাই বহু নকল শিল্পীতে এখানকার কাফে রেস্তোরাঁ ভরে গেছে। আসল লোকেরা ক্রমশ এখান থেকে সরে যাচ্ছে। ওই বারে ডিলান টমাস তার আত্মহত্যার শেষ মদ্যপান করেছিল, এই পন শপে এফ স্কট ফিটজেরাল্ড তার জামাকাপড় বাঁধা দিয়েছিল। কামিংস থাকত ওই বাড়িতে, এইখানে হেমিংওয়ে আড্ডা দিত—এসব দেখতে-দেখতে যাচ্ছি—হঠাৎ এক বিশ্ব-বিখ্যাত লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পথে, অ্যালেনকে দেখে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলেন আমাদের সঙ্গে, আলাপ হল, স্যালভাডোর ডালি। প্রৌঢ়ত্ব পেরিয়ে গেছে, লাল রঙের কোট গায়ে, মোম দিয়ে পাকানো গোঁফ, পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে দ্বিতীয় প্রিয় শিল্পকে চাক্ষুষ দেখে খানিকটা হতাশ হলুম, না দেখলেই ভালো হত। পৃথিবীতে যারা টাকা তৈরি করে —স্যালভাডোর ডালি এখন তাদের কাছে কিছুটা আত্মসমর্পণ করেছেন।

'বিনে পয়সার কফি খাবে সুনীল?' পিটার জিগ্যেস করল। এখানে গোপনে অবাধ গাঁজা মেরুয়ানা, মেস্কালিন, হাসিস ইত্যাদি মাদক নেশার অবাধ প্রচলন। শিল্পীদের সেসব অভ্যেস ছাড়ানোর জন্য স্যালভেশান আর্মি ফ্রি কফি এবং বক্তৃতার ব্যবস্থা করেছে! পিটার বলল, 'চলো, আগে আমরা ফ্রি কফি খেয়ে আসি, তারপর গাঁজা খাব।'

কাফে রেস্তোরাঁগুলো ভিড়ে ভরা। জায়গা পাওয়া যায় না। খুঁজে-খুঁজে গেলুম আসল জায়গাগুলোতে, ছোট-ছোট দোকান, নড়বড়ে কাঠের চেয়ার, ছেলেমেয়েরা এক কাপ কফি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাচ্ছে, মাঝে-মাঝে কেউ কেউ চেঁচিয়ে কবিতা পড়ছে, ছোটোখাটো সাহিত্য পত্রিকা বিলি হচ্ছে—হাতবদল হচ্ছে, এ ওর মুখ থেকে কাড়াকাড়ি করছে সিগারেট—অবিকল আমাদের কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের আবহাওয়া। খালি তফাত, এদের মধ্যে অনেক সুন্দরী বালিকা আছে। আমাদের কলকাতার সুন্দরী মেয়েদের আর কবিতায় কোনও উৎসাহ নেই, আমি ফিসফিস করে একজনকে বললুম।

যেখানেই যাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজস্র প্রশ্ন, কৌতূহল, আন্তরিক জিজ্ঞাসা এখানে—উঁচু সমাজের মতো ধরাবাঁধা নয়। 'আমি আগামী বছর যাচ্ছি ভারতবর্ষে, তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে', কেউ বলল 'জীবনে যখনই পারি, অন্তত হেঁটেও যাব ভারতবর্ষে', আরেকজন।

কলকাতায় আমরা বিটনিকদের সম্বন্ধে যা শুনেছিলুম, তাঁর অধিকাংশই ভুল। যারা বিটনিক হিসেবে সেজে আছে তাদের অধিকাংশই বাজে লেখক, শৌখিন, অভিনেতা, প্রচার-কার্তিকেয়। আসল লেখক ও শিল্পীরা লুকিয়ে আছে প্রায় চারদিকে, দারিদ্র্যে ও পীড়নে, প্রাণপণে লড়ছে সামাজিক অসমীচীনতার বিরুদ্ধে, সেন্সরের অপবিচারের বিরুদ্ধে। গ্রেগরি করসো—শান্তির জন্য উন্মুখ। নিগ্রো কবি লি রয় জোন্স, সাদা কালোর নির্বোধ লড়াই নিয়ে হাসছে। গেলুম আধুনিক শিল্পীদের কাছে, ছোট্ট অন্ধকারে ঘরে তিন চারজনে ঠাসাঠাসি করে থাকে, দেয়াল ভরতি বিশাল-বিশাল ক্যানভাস, কবে খ্যাতি আসবে, এমনকি কোনওদিন কোনও একজিবিশানের সুযোগ পাবে কি না পরোয়া নেই, দুঃসাহসী রং নিয়ে খেলছে, খাদ্য শুধু ভাত, নুন আর সেদ্ধ মাংস।

হলিউডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে একদল। 'আমেরিকার ছবিতে সেক্স আর কস্টিউম ছাড়া

আমাদের কিছু নেই; ছি ছি।' নিজেরা কো-অপারেটিভ করে ফিল্ম তুলছে তারা। নানা রাস্তা, গলি ও সিঁড়ি পেরিয়ে হঠাৎ কোনও ঘরে ঢুকে, প্রোজেক্টার মেশিন, ছড়ানো ফিল্ম, ফ্ল্যাশ লাইট, বাজনা—মনে হয় কোনও অন্য রাজ্যে এলুম। ওই একই ঘর—স্টুডিও, অফিস, শোওয়ার জায়গা। 'আমরা সাহিত্য, শিল্প এবং ফিল্মকে এক পর্যায়ে আনতে চেষ্টা করছি, কবিরা এখানে কাহিনি শিখছে, শিল্পীরা শিখছে ক্যামেরা, আমরা সবাই চোখ ব্যবহার করছি।'

তুমি যোগ জানো?—না। তুমি প্রাণায়াম জানো?—না। তুমি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গেয়ে শোনাবে?—জানি না। তুমি আমাদের কিছুটা বেদান্ত বোঝাবে?—না, আমি নিজেই ভালো করে বুঝিনি। অন্য অনেক জায়গায় কিছুটা জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কিন্তু তোমরা খাঁটি লোক, তোমাদের সঙ্গে চালাকি করব না। আমিও খাঁটি লোক।

কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেইসব জ্বলন্ত ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে গেলুম। বাজে, ভ্যাজাল ও চালিয়াতদের চিনে নিতে দেরি হল না। 'তুমি কেন হোটেলে আছ, আমাদের সঙ্গে এসে থাকো।' একজন তরুণ কবি বলল আমাকে, তৎক্ষণাৎ হোটেল থেকে সুটকেস নিয়ে গেলুম তার বাড়িতে। ছাদের চিলেকোঠা দুটি, ভাঙা, অন্ধকার, মাথার ওপর অ্যাসবেশটাসের ছাউনি। একটা ঘর একটা পত্রিকার অফিস, সে ঘরে দুটি ছেলেমেয়ে শোয়। বাকি ঘরের খাটে দুজনে শুলো, আমি ও অ্যালেন ও পিটার মাটিতে কম্বল বিছিয়ে। মাঝেমাঝে একটা ভাঙা জানালা দিয়ে হু-হু করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে—তাড়াতাড়ি উঠে সেটায় সোয়েটার কিংবা কম্ফর্টার দিয়ে গর্ত বোজানো হতে লাগল। 'কী সুনীল, অসুবিধে হবে না তো?' অ্যালেন জিগ্যেস করল।

আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে আমি বললুম, 'কলকাতায় আমার নিজের থাকার বাড়িটাও অবিকল এইরকম।'

॥ ষোলো ॥

ঠিক ন'টার সময় হাজির হলুম কাফে মেট্রোতে। ওখানে অনেকে কবিতা পড়বে। কাফে মেট্রো অনেকটা আমাদের কলকাতার সুতৃপ্তি বা বসন্ত কেবিনেরই মতো, আয়তনে একটু বড়। নড়বড়ে চেয়ার টেবিল, মিটমিটে আলো, কফি ছাড়া অন্য কোনও পানীয় পাওয়া যায় না। রাস্তার থেকে সিঁড়ি নেমে নীচু ঘর, যে-দিন কবিতা পড়া থাকে সেদিন আগে থেকেই তরুণ কবি বা ভাবী কবির দল টেবিল দখল করে থাকে। দু-একজন নিরীহ পথচারী—শুধু কফি খাওয়ার জন্যই যে ওখানে ঢুকে পড়ে না তা নয়, কিন্তু ওসব কবিতা শোনার পর একজনকে আমি দাম না দিয়ে ছুটে পালিয়ে যেতে দেখেছি। কাফের মালিক নিশ্চিত খুবই কবিতা অনুরাগী—যেহেতু এসব সহ্য করেন, এবং আর্থিক লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই। একটি অল্প বয়সি মেয়ে কফি সার্ভ করে, নিঃশব্দে টেবিলে ঘুরে যায় সে, মুখে কোনও বিকার নেই। একটি কবিতা ওই মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করেই পড়া হল বুঝতে পারলুম—কিন্তু মেয়েটির তবু কোনও হৃদয় দৌর্বল্য ঘটল মনে হল না। একজন চেঁচিয়ে বলল, 'আইরিন, কবিতাটি তোমাকে নিয়েই লেখা হয়েছে, বুঝতে পারছ?' মেয়েটি কাপে কফি ঢালতে-ঢালতে চোখ না তুলে বললে, 'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কবিতাটা ভালো হয়নি।'

আমেরিকায় কাফে রেস্টুরেন্টে কবিতা পড়ার রেওয়াজ উল্লেখযোগ্যভাবে শুরু হয় সানফ্রান্সিসকো শহরে। তারপর অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এখন নিউইয়র্কই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। গ্রিনইচ ভিলেজ—যেটা নিউইয়র্কের কবি-শিল্পীদের পাড়া, অর্থাৎ প্যারিসের যেটা এক কালের মঁমার্ত, লন্ডনের কিছুটা সোহো স্কোয়ার, কলকাতার কলেজ স্ট্রিট—সেখানে অনেক কাফে বা বারে কবিতা পড়া হয় নিয়মিত, জ্যাজ বা মেয়েদের নাচের মতোই—শুধু কবিতা শোনার জন্যই অনেক ভ্রমণার্থী টিকিট

কেটে ঢোকে। তবে সেসব জায়গায় কবিতা পড়া হয় অনেকটা ফ্যাশানের সঙ্গে কিছুটা প্রতিষ্ঠিত বা কিছুটা অতি বাজে কবিরা পড়েন। টাকা পান সে জন্য। একমাত্র কাফে মেট্রোতেই টিকিট কেটে ঢুকতে হয় না, এককাপ কফি নিয়ে চেয়ার দখল করে বসতে পারলেই হল—ওখানেই সত্যিকারের উৎসাহী তরুণ কবিরা কবিতা পড়েন। একজন মোটামুটি পরিচালনা করে, কোন কবি পড়বেন—তার নাম ঘোষণা করে, দু-চার লাইনে কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে দেয়। একজনের পড়া শেষ হলে—কিছুটা গুঞ্জন, কথাবার্তা,—তারপরই, কাফের মধ্যে একটা পুরোনো পিয়ানো আছে, তার সবগুলো রিডে চাপ দিলে ঘং করে একটা গম্ভীর শব্দ হয়, সব চুপ, আবার একজনের নাম ঘোষণা হল। ছেলেদের সঙ্গে-সঙ্গে মেয়ে-কবিদের সংখ্যাও প্রায় সমান সমান। অনাহুত, রবাহুত হয়েও কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বলে, আমি একটা কবিতা পড়ব। সেও সুযোগ পায়। আমাকেও একদিন কবিতা পড়ার জন্য খুব পেড়াপেড়ি করা হয়েছিল। অগত্যা আমি জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা পড়েছিলাম। প্রথমে খাঁটি বাংলায়।

কবিতা পড়ার বর্ণনা দিয়ে অবশ্য লাভ নেই। কবিদের ব্যবহার সবদেশেই সমান। কেউ অহংকারী গলায় পড়তে-পড়তে 'রাজ্যজয় করছি'—এই ভঙ্গিতে ঘন-ঘন তাকায় মেয়েদের দিকে। কেউ লাজুক গলায় মিনমিনে সুরে পড়ে। কেউ ভাবগম্ভীর, উদাত্ত ভঙ্গিতে পড়ে একটা অতি ওঁচা পদ্য। কেউ বা একটা পড়ার নাম করে পাঁচ-ছ'টা না পড়ে ছাড়ে না। কেউ-কেউ 'আমায় কেন আগে পড়তে দেওয়া হল না'—এই বলে খোনা গলায় খুঁত-খুঁত করে। অবিকল বাংলাদেশের মতো। দু-একটা ভালো কবিতা, বাকি অনেক ভ্যাজাল ও ভঙ্গি। কিন্তু এক সন্ধ্যেবেলা—অন্তত একটি ভালো কবিতা শুনতে পাওয়াও কম নয়। এর মধ্যে নিগ্রো কবিরাও আছে। একজন নিগ্রো কবির একটি লাইন মনে আছে ঃ আমেরিকা, মাই সুইট মাদারল্যান্ড অব শ্লেভারি।

আসর ভাঙে রাত বারোটা একটায়। গলা ভেজাবার জন্য এক এক দল যায় তখন এক এক বারে, সেখানে হই-হুল্লোড়, তর্কাতর্কি, আড্ডা, অশ্লীল গল্পের কমপিটিশন—ইত্যাদির পর বাড়ি ফিরতে রাত তিনটে-চারটে। আমার বরাবরই একটা কথা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল। এইসব ছেলে-মেয়েগুলো বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরছে দিনরাত এদের চলে কী করে, এরা টাকা পায় কোথায়। ওসব পদ্য-টদ্য লেখার জন্য তো এক পয়সাও পায় না, জানি। আমার পাশে একটি মেয়ে বসেছিল, সেদিন সেই মদের দোকানে, মেয়েটি সে সন্ধেবেলা কবিতা পড়েছিল। ভারী সুন্দর দেখতে মেয়েটি, বয়েস কুড়ি-চব্বিশ, গায়ের রং কর্কশ লালচে নয়...বরং যেন গৌর, সোনালি চুল। নাম লিন্ডা। লিন্ডাকে জিগ্যেস করলুম, তুমি কোথায় থাকো? আঙুল দিয়ে ওপাশের একটি ছেলেকে দেখিয়ে বলল, আমি পলের সঙ্গে একসঙ্গে থাকি।

—বিয়ে করেছ?

—না।

এসব প্রশ্ন-ইওরোপ-আমেরিকায় করা খুবই অভদ্রতা হয়তো, কিন্তু এসব ছেলেমেয়েরা কোনও রীতিনীতি মানে না। এদের জিগ্যেস করা যায়, জানি। এদের মধ্যে একজন আমাকে একবার দুম করে প্রশ্ন করেছিল, আমি কখনও সুইসাইড করার চেষ্টা করেছি কি না। ছেলেটিকে নিরাশ করে আমি উত্তর দিয়েছিলুম, না।

যাই হোক, আমি লিন্ডাকে জিগ্যেস করলুম, পল কি কোনও চাকরি-টাকরি করে?

—না, না, ও কবিতা লেখে। চাকরি করলে ওর অসুবিধে হয়।

—ও, আচ্ছা, তাই নাকি। ঢোঁক গিলে আমাকে বলতে হল। তবুও ওখানে না থেমে মেয়েটিকে আবার জিগ্যেস করলুম, কবিতা লেখা সত্ত্বেও, তোমাদের দু'বেলা কিছু খাবার খেতে হয়, আশা করি। কোথা থেকে পাও। তুমি চাকরি-টাকরি করো?

লিন্ডা খিল্‌খিল করে হেসে উঠল। তারপর বললে, না। তবে মাঝেমাঝে কিছু উপার্জন হয়।

—কী করে? আশা করি তুমি কিছু মনে করছ না।

—না, না। খুব শক্ত। আমি মাঝেমাঝে মডেলের কাজ করি। তাতে যা পাই, চলে যায়। আগে আর্টিস্টদের মডেল হতাম, কিন্তু ওটা বড় কষ্টকর, একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকতে খুব বিরক্ত লাগে। তা ছাড়া ওরা পয়সা কম দেয়। এখন ফটোগ্রাফারদের সঙ্গে কাজ করি। খুব কম সময়ে হয়ে যায়, পয়সাও ভালো।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কী সরল মুখ ওর। আর একটা প্রশ্ন বুকের মধ্যে আকুলি-বিকুলি করছে। কিন্তু আর জিগ্যেস করতে ভরসা হচ্ছে না। অথচ এদের ব্যবহারে কোনও আড়ষ্টতা বা লজ্জা নেই। শেষকালে বললুম, তোমার ওসব ফটোগ্রাফ কি কাগজে ছাপা হয়?

—হ্যাঁ, হয়। তবে ফ্যাশান ম্যাগাজিনের ছবি নয়। নতুন পোশাকের ডিজাইন নিয়ে মডেলের ছবি—তা নয় কিন্তু, আমার কোমরটা, এই দ্যাখো, তেমন সরু নয়, সেইজন্য ফ্যাশান ম্যাগাজিনে আমার ছবি তোলে জামা কাপড় সব খুলে—

—তোমার একটুও লজ্জা করে না।

—না! তবে, আমার মা-বাবা যদি দেখতে পান—তবে ওঁদের লজ্জা হবে—তাই আমি মুখের ওপর চুলগুলো ফেলে মুখটা ঢেকে দিই প্রায়। অনেক সময় ওই অবস্থায় আমি কবিতার লাইন ভাবি। কাল একটা লিখেছি...

কবিতার জন্য এ কী জীবন-মরণ পণ এদের। কিন্তু তবু বড় দুঃখ হয় ভেবে, কবিতার জন্য জীবন-মরণ পণ করাও কিছু নয়। আত্মদান করলেও অনেকের কবিতা হয় না। অন্তত ওই পল বলে ছোকরার যে জীবনে এক লাইনও কবিতা হবে না, এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত।

আর একটি ছেলের কাছে জানলুম—সে একটা হোটেলে ঘরভাড়া নিয়ে থাকে। দিনের বেলা সেই হোটেলেই চাকরের কাজ করে। কেউ-কেউ মিউজিয়াম বা লাইব্রেরিগুলোয় ক্যাটালগ তৈরির কাজ করে মাঝে-মাঝে। দু-একটা আছে বোকা অহংকারী। অশ্লীল নামে একটি পত্রিকা বার করে একটি ছেলে—সেও কোনও কাজকম্ম করে না। জিগ্যেস করলুম, কাগজ চালাবার পয়সা পায় কোথা থেকে। ভুরু উলটে উত্তর দিল, জুটে যায়। সত্যিই জুটে যায় এদিক-সেদিক থেকে। অল্প আয়াসে। তাই কবিতা লেখা বা ছবি আঁকার নাম করে বাউণ্ডুলে সেজে থাকে কত ছেলেমেয়ে—তাদের মধ্যে ক'জন সত্যিকারের শিল্পী বাছতে গেলে গ্রিনউচ গ্রাম উজাড় হয়ে যাবে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম রাত তিনটেয় আকাশের নীচে। তখনও দোকানগুলি আলোয় ঝলমল। ভেসে আসছে ছেলেমেয়েদের মিশ্রিত দুর্বোধ্য শব্দ। শোঁ-শোঁ করে দু-একবার আসে সমুদ্রের বাতাস। পাথরের মূর্তির মতো এখানে-ওখানে পুলিশ। মনের মধ্যে সামান্য একটা গ্লানির সুতো যেন টের পাচ্ছি। আজ সন্ধেবেলায় অমন উত্তেজিত কবিতার আসরের পর—এদের সবার সঙ্গে আমি টাকা পয়সার আলোচনা করতে গেলুম কেন!

একজন কবির সঙ্গে আরেকজন কবি কী নিয়ে কথা বলে? ক্রিয়েটিভ প্রসেস নিয়ে কোনও আলোচনা হয় না, করা যায় না, অসম্ভব। তাও দুজনের ভাষা যদি আলাদা হয়। ভাষা ছাড়া কবিতার আর কী আছে? আর কিছু নেই, নইলে বাংলা ভাষা এমন দাসত্বের শিকল কেন পরিয়েছে আমার গলায়। তা ছাড়া ওদের কাছ থেকে শেখার কিছুই নেই। আমারও কিছু নেই ওদের শেখাবার। শুধু কথা আসে জীবন সম্বন্ধে, জীবনকে টেনে বাঁচিয়ে রাখা শুধু। তোমাদের অনেকেরই কবিতা অতি অখাদ্য, একেবারেই ভালো লাগেনি আমার—তবু কফির দোকানে ওই কবিতা পাঠ উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা, গৌরব ও লাজুকতা, সারা সন্ধে ও রাত্রি কবিতার কথায় ভরে রইল, 'শিল্পের জন্য ইহজীবনে কিছু আত্মত্যাগ' করেছ তোমরা, সেজন্য তোমাদের মনে হল এক পরিবারের লোক।

॥ সতেরো ॥

মিসেস টেলারের বয়স শুনলুম সাতান্ন, কিন্তু দেখলে মনে হয় অনেক অনেক কম। শান্ত, শীতলশ্রী, মুখের মধ্যে যেন জননীর ছায়া আছে। কথা বলেন খুব আস্তে আস্তে। বিশাল ধনী ব্যবসায়ীর স্ত্রী, কিন্তু এক সময় তিনি কবিতা লিখতেন। বললেন, হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথকে আমার মনে আছে। এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই তাঁর সেই অসাধারণ রূপবান মূর্তি।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার তখন বয়স নিশ্চয়ই খুব কম ছিল!

—হ্যাঁ, আমি তখন কচি খুকি প্রায়। নিউ ইয়র্কের একটা হোটেলে দাসীর কাজ করি—

আমার ভুরু দুটি তখন জিজ্ঞাসায় দ্বিতীয় ব্রাকেট হয়েছে দেখে হেসে বললেন, হ্যাঁ, আমি তখন একটা হোটেলে বাসন ধোয়ার কাজ করতুম, সপ্তাহে দশ ডলার মাইনে। তখনও ডনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি।

মিসেস টেলারের শিল্পপতি স্বামী পাশে বসেছিলেন, মৃদু হাসলেন, বললেন, জুডি, তখন তোমার চুলের রং কালো কুচকুচে ছিল!

মিসেস টেলার হাসতে-হাসতে বললেন, এখন সোনালি। কিন্তু তুমি তো সোনালি রং-ই পছন্দ করো। হ্যাঁ, তারপর একদিন বিকেল বেলা আমার বন্ধু গটফ্রিড (সে ছিল সত্যিকারের ভালো কবি, আহা বেচারা অল্প বয়সে অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়) হঠাৎ বিকেলবেলা টেলিফোন করে জিগ্যেস করল, আমি একজন ইন্ডিয়ান কবির বক্তৃতা শুনতে যাব কি না! আমি প্রথমটা খুব অবাক হয়েছিলুম, কারণ জানো তো, ইন্ডিয়ান শুনলে প্রথমেই আমাদের মনে পড়ে, এখানকার আদি অদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের কথা! রেড ইন্ডিয়ানরা আবার কবিতা লেখে, তাও আমি শুনতে পাব নিউইয়র্কে বসে। গটফ্রিডের যত পাগলামি! একটু পরে সব বুঝতে পারলুম। গটফ্রিড যোগ ব্যায়াম করত, হিন্দু বৌদ্ধ শাস্ত্র সম্পর্কে কৌতূহল ছিল, ও অনেক খবর রাখত! ওর মুখে আমি প্রথম টেগোরের নাম শুনলুম তিনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং শুধু কবি নয়, মানুষ হিসেবেও তিনি মহাপুরুষ।

আমার তখন একটিই ভদ্রগোছের গাউন ছিল, সেদিন একটু আগে কেচে দিয়েছি। এখানকার খুকিদের মতো তখন আমরা ট্রাউজারস পরে পথে বেরুতে পারতুম না। তাড়াতাড়ি ইস্ত্রি ঘষে সেই ভিজে পোশাকটাই কোনওরকমে শুকিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম গটফ্রিডের সঙ্গে। ব্রডওয়ে অঞ্চলের একটা থিয়েটার, আমার নাম ঠিক মনে নেই। অসংখ্য লোক এসেছিল। তার আগে আমি কোনও ভারতীয়কে দেখিনি। পথেঘাটে দেখেছি কিন্তু আলাদাভাবে চিনতুম না, সমস্ত এশিয়াবাসীদের আমার মনে হত এক রকম। দেখলুম মঞ্চের ওপর কবি একটি চেয়ারে বসে আছেন। অমন রূপবান মানুষ আমি আগে আর দেখিনি—ওরকম জ্যোতির্ময় পুরুষ, পুরুষ মানুষ যে এত সুন্দর হয় (স্বামীর দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি) আমি কল্পনাই করিনি। সাদা চুল, বুক পর্যন্ত সাদা দাড়ি, একটা লম্বা স্লিপিং গাউনের মতো পোশাক পরে ছিলেন, সেরকম একজন মানুষকে দেখা এক জীবনের অভিজ্ঞতা। উনি প্রথমে একটি বক্তৃতা দিলেন, তারপর অনেকগুলি কবিতা পড়লেন, দীর্ঘ সুরেলা গলা, যেন গির্জায় একক সঙ্গীতের মতো। কথাগুলি আমার মনে নেই, কিন্তু সেই উদাসীন মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর আমার কানে আজও ভাসছে। সত্যি, বড় দুঃখের কথা, উনি কী কবিতা পড়েছিলেন আমার একেবারেই মনে নেই—কিন্তু একটি বিশেষ ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো শেষ পর্যন্ত বসে ছিলুম। শেষ হওয়ার পর বেরিয়ে এলুম কী যেন এক অনির্বচনীয় দুঃখ বুকে নিয়ে।

উনি যখন থিয়েটার থেকে বেরুচ্ছেন—হঠাৎ একদল মানুষকে দেখলুম ওঁর দিকে ছুটে যেতে। আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম—হঠাৎ কি কোনও কারণে লোক ওঁকে আক্রমণ করতে চাইছে? তখুনি জানতে পারলুম, আসলে তা নয়, উপস্থিত ভারতীয়রা ছুটে যাচ্ছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। কী

বিচিত্র প্রথা; সবাই তার সামনে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। আমি গটফ্রিডকে জিগ্যেস করলুম। গটফ্রিড বলল, ভারতীয়রা কারুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁর পায়ের ধুলো নেয়। এরকম কথা আমি জীবনে কখনও শুনিনি, কিন্তু সেই মুহূর্তে মনে হল, ওরকম মানুষকে শ্রদ্ধা জানাবার এইটাই তো শ্রেষ্ঠ উপায়।

মিসেস টেলার আমার দিকে তাকিয়ে লাজুকভাবে হেসে বললেন, তখন আমিও ওঁর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় ঠেকালুম।

॥ আঠারো ॥

'কাল সকালে মরুভূমি দেখতে যাবে?' ভাবছিলুম কার সঙ্গে যাব। আরিজোনায় এসে ক্যাকটাসের মরুভূমি না দেখার কোনও মানে হয় না। অথচ গাড়ি ছাড়া যাওয়ার উপায় নেই। এমন সময়ে কানের কাছে দৈববাণীর মতো ড্রুমন্ডের প্রশ্ন।

ড্রুমন্ড হাডলি একজন তরুণ কবি, আমার চেয়ে বছর দু'একের ছোট হবে হয়তো (আমি এই জুলাই-এ উনত্রিশ)। পাঁচ বছর আগে বিয়ের পর ড্রুমন্ড হানিমুন করতে গিয়েছিল কম্বোডিয়া ও ভারতবর্ষে। রথের মেলার সময় পুরীতে গিয়েছিল আসল সমুদ্র নয়, জনসমুদ্র দেখতে। 'তবে এমন ম্যালেরিয়ায় ভুগেছিলুম যে, ভ্রমণের অর্ধেক আনন্দই মাটি হয়ে গিয়েছিল'—ও বলল। বললুম, দ্যাখো, আমাদের সরকারি হিসেবে ম্যালেরিয়া ভারতবর্ষ থেকে উচ্ছেদ হয়ে গেছে, ওটা বোধহয়—

—কম্বোডিয়া থেকে হয়েছিল, আমারও তাই মনে হয়।

—ভাগ্যিস তুমি বললে, তোমরা বললে দোষ নেই। আমি বললেই অন্য দেশের নিন্দে হয়ে যেত। একেই তো প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের বন্ধুত্ব নেই বললেই চলে।

বাড়িতে বাঘ পুষেছে ড্রুমন্ড। সত্যিকারের বাঘের বাচ্চা, মরুভূমি থেকে ধরা। ওর স্ত্রী, ভারী লক্ষ্মী শ্রীমতী মেয়েটি, পরীক্ষার জন্য খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছিল, আমি যেতেই শিষ্টভাবে উঠে দাঁড়াল, পাশ থেকে ঘর্-র্‌র্-র্ করে উঠল বাঘের বাচ্চা। 'ভয় পেয়ো না, আমাদের বেড়ালটা কারুকে কিছু বলে না।' চারটে কাবুলি বেড়াল সাইজের ওই আট মাসের বাঘের বাচ্চাটা—দেখেই আমার হাড় হিম। একটা বড় ঘরে আলাদা করে রেখেছে ওটাকে—ওরা দুজনে বেড়ালের মতোই ওটার সঙ্গে খেলা করে। ব্যাপারটা গোপন, পুলিশে জানতে পারলে ধরে নিয়ে যাবে। আমি এক কোণে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে সেই গল্পটা বললুম, সেই যে কোন এক ভদ্রলোক বাঘ পুষেছিলেন, তারপর বাঘ সেই লোকটার হাঁটু চাটতে-চাটতে হঠাৎ রক্তের স্বাদ পেয়ে ঘাঁক করে কামড়ে দেয়। ওরা দু'জন হেসে বলল, 'একজন লোক ফেল করেছে বলে আমরা পারব না, তার কী মানে আছে। মানুষ অ্যাটমকে পোষ মানাচ্ছে—বাঘ তো দূরের কথা। তুমি কাছে এসে ওর গায়ে হাত দিয়ে দেখো, কিছু বলবে না।'

আমি বললুম, না ভাই থাক, দূর থেকেই দেখেছি। এমনিতেই আমার শরীরে আঠেরো ঘা আছে।'

সকাল নটা আন্দাজ ড্রুমন্ডের ভ্যান নিয়ে আমরা বেড়িয়ে পড়লুম। অ্যারিজোনার টুসন শহরের একেবারে গা থেকেই মরুভূমি আরম্ভ। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট পাহাড়—তার ওপাশে মেক্সিকোর সীমানা।

—মরুভূমি সম্বন্ধে যা ভাবছো তা নয়, ড্রুমণ্ড বলল, অন্যরকম, দেখো, তোমার ভালো লাগবে। কিন্তু একটা কথা, মরুভূমি দেখে কবিত্ব করা চলবে না। বিশেষত এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ড আবৃত্তি

করা একেবারেই নিষেধ। আমি অনেক শুনেছি।

—সুন্দর দৃশ্য দেখলে আমার মনে মোটেই কবিত্ব জাগে না। আমার খিদে পায়।

—ক্কি?

—মাইরি বলছি, আমার খিদে পায়। অর্থাৎ আমার হৃদয় কাজ করে না, তার একটু নীচে, পেটে প্রতিক্রিয়া হয় আমার।

ও হেসে বলল, ভয় নেই, আমার বউ কয়েকটা হ্যামবার্গার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছে!

বিষম জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল। আমি দুপাশের দৃশ্য দেখার বদলে ড্রুমন্ডকে দেখছিলুম। একটা ব্লু জিন আর গেঞ্জি পরেছে, মাথার চুল এলোমেলো। সুঠাম স্বাস্থ্য ও সাহস, বাড়িতে পরমাসুন্দরী স্ত্রী ও বাগান, বাঘ পুষেছে—এই একজন আমেরিকার তরুণ কবি। ভারী চমৎকার খোলামেলা ছেলে ড্রুমন্ড, কিন্তু একটা দোষ ঃ যখন খুব উৎসাহে কথা বলে, তখন খাঁটি ওয়েস্টার্ন আকসেন্ট বেরিয়ে পড়ে—আমার পক্ষে বোঝা দুষ্কর হয়। ও বলল, 'এখানে খুব জলের অভাব'। তারপরই গড়গড় করে কি শুরু করল—আমি কিস্যু বুঝতে পারলুম না তবুও সেনটেন্সের মধ্যে কমা, ফুলস্টপ বসাবার মতো মাঝেমাঝে হুঁ হ্যাঁ, 'ত তাই নাকি' করে যেতে লাগলুম। হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'তোমাদের দেশে এ সম্বন্ধে কী করে?'

আমি একেবারে গভীর জলে পড়লুম। যদিও বুঝতে পারলুম, ব্যাপারটা জল সম্বন্ধেই। টস্টিমেশন, ড্রিলিং এই শব্দ শুনেছি বটে। আমতা-আমতা করে বললুম, 'আমি ঠিক—

—ঠিক কোন জায়গা খুঁড়লে জল পাওয়া যাবে কি করে বুঝতে পারো?

বললুম, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি ঠিক ও বিষয়ে জানি না। আমি জন্মেছি পূর্ববঙ্গে, সেখানে জল থাকাটাই একটা সমস্যা, না-থাকা নয়। রাজস্থানের দিকে ও সমস্যা আছে বটে—কিন্তু ওরা কী করে আমি জানি না'। একটু থেমে আবার বললুম, 'একটা কথা বলব? তোমাদের দেশের অনেক কবির সঙ্গে কথা বলে দেখেছি—তাঁরা কবিতা ছাড়াও আরও অনেক বিষয় জানে। স্পেসশিপের কোথায় কোথায় শূন্য স্টেশন হওয়া দরকার, হায়ারোগ্লিফিকসের পাঠান্তর, নদীর তলায় সুড়ঙ্গ বানাবার কি কী সমস্যা, বাঁদরের মস্তিষ্ক টেস্ট টিউবে আলাদা বাঁচিয়ে রাখার পর সেই অশরীরী মস্তিষ্কের দুঃখ ও আনন্দ বোধ থাকে কি না, ইন্দোনেশিয়ার প্রতি বর্গমাইলে জনসংখ্যা—এইসব। আমাদের দেশের কবিরা একটু ন্যালা খ্যাপা টাইপ, জেনারেল নলেজে শূন্য, ধুতি পাঞ্জাবিতে জেবড়ে থাকে, এক চেয়ারে বসলে ঘণ্টা পাঁচেকের কমে উঠতে চায় না, কবিতা ছাড়া আর কোনও বিষয়েই কিছু জানে না—হয়তো সেই জন্যই তোমাদের চেয়ে ভালো কবিতা লেখে।'

আমার শেষ কথা শুনে ও চমকে আমার দিকে তাকাল। তারপরই ঝকঝক করে হেসে উঠল। বলল, 'কী জানি, হয়তো সত্যি। আমি বেশি পড়িনি—বিশেষ করে তোমাদের ওই হরিবল্ ট্রানস্লেশনে টেগোরের লেখাও আমার মোটেই ভালো লাগেনি। কিন্তু তোমাদের একটা অসুবিধে আছে—যেটা আমাদের নেই। তোমাদের কাঁধের ওপর চেপে আছে তোমাদের ঐতিহ্য, তোমাদের ধর্ম। তোমরা নির্জন হতে পারো না। কিন্তু আমাদের ওসব ঝামেলা নেই—আমরা সবাই গভীর অন্ধকারে মধ্যে হাঁটছি, সুতরাং আমাদের প্রতি পদক্ষেপে নিজেকে খুঁজতে হচ্ছে—আমরা নির্জন আধুনিক মানুষ—সকলেই।'

—কিন্তু ঐতিহ্যের প্রতি তোমাদেরও লোভ কম নয়। তোমরা—

—দ্যাখো, দ্যাখো, ওইদিকে দ্যাখো।

আকাশে একটা বড় সাইজের পাখি দেখতে পেলুম। জিগ্যেস করলুম, ওটা কি?

—গোল্ডেন ইগল!

বিশাল ডানাওয়ালা সোনালি ইগল এই অঞ্চলে এখন দেখতে পাওয়া যায় শুনেছিলুম, আগে কখনও দেখিনি। কিন্তু 'গোল্ডেন ইগল' এ নামটা খুব চেনা, কলকাতায় বহু গ্রীষ্মের দুপুরবেলা ও

নামে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটেছে।

তাড়াতাড়ি একটা জোরালো দূরবিন বার করে ড্রুমন্ড ছুটল ওই পাখিটার পিছনে গাড়ি নিয়ে। এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি রাস্তায় কী দুঃসাহসিক গাড়ি চালানো—এক হাতে স্টিয়ারিং, এক হাতে দূরবিন নিয়ে বাইরে ঝুঁকে—চোখ রাস্তায় নয়, আকাশে। কিন্তু অমন দুঃসাহসীর পাশে বসেছিলাম বলে আমারও ভয় করল না। কী ভয়ংকর গতি ওই ইগলের—ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় মহাশূন্যে বিন্দুর মতো হয়ে গেল হঠাৎ আবার ঝুপ করে নেমে এল খুব নীচে—শোঁ-শোঁ করে আবার পেরিয়ে গেল পাহাড়ের পর পাহাড়, মিলিয়ে গেল দিগন্তে কয়েক মিনিটে। আমরা গাড়ি নিয়েও ওর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলুম না।'

ড্রমন্ড বলল, ওই ইগল আমেরিকার প্রতীক চিহ্ন।

গাড়ি উঠে এসেছিল একটা ছোট পাহাড়ের মাথায়। ডানদিকে তাকিয়ে বিশাল মরুভূমি চোখে পড়ল। সত্যিই, আমাদের কল্পনায় যে মরুভূমির ছবি আছে—অর্থাৎ মাইলের পর মাইল হলুদ বালি, গনগনে হাওয়া—এ মরুভূমি সেরকম নয়। এ মরুভূমি জীবন্ত। হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভূমি জুড়ে অসংখ্য সৈনিক দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলো ক্যাকটাস, পশ্চিম অঞ্চলের বিখ্যাত ক্যাকটাস, সরল, দীর্ঘ প্রত্যেকটা অন্তত দেড়শো-দুশো বছরের পুরোনো। প্রথম শাখা বেরোয় পঁচাত্তর বছরে—ওই শাখা বা ডানা গুনে বয়েস বোঝা যায়। ওগুলোকে বলে সাউয়ারো (স্প্যানিশ নাম ঃ Saguaro জি উচ্চারণ হয় না)—গ্রীষ্মকালে ফুল ফুটতে থাকে—বীভৎসতার বদলে এ মরুভূমিকে মনোরমই দেখায়। মরুভূমি নয় পুরোটাই যেন এক মরুদ্যান। এ ছাড়া আছে অন্য নানা জাতের ক্যাকটাস, প্রিক্‌লি পিয়ার—বুনো শেয়াল, কাঁকড়া বিছে, ছোট বাঘ, র‍্যাটেল স্নেক (ল্যাজে যে-গুলোর খট্‌খট্‌ আওয়াজ হয়), হরিণ। জল নেই, ফসল হয় না—কিন্তু মরুভূমির বদলে পোড়ো জমি কথাটাই মনে আসে। কিন্তু ড্রুমন্ড আগেই এলিয়টের ওয়েস্টল্যান্ডের উল্লেখ করতে বারণ করেছে।

এই মরুভূমির দৃশ্য আমাদের অদেখা নয়। আমেরিকার যাবতীয় ওয়েস্টার্ন ছবিতে দেখেছি, ঘোড়া ছুটোচ্ছে কাউবয়রা, কথায়-কথায় গোলাগুলি খুনোখুনি—এখানকার রেড ইন্ডিয়ানদের প্রায় সবাইকে মেরে ফেলে এখন মিউজিয়মে পুরেছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে। এখানে রেড ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে তারপর স্প্যানিশদের সঙ্গে, তারপর সিভিল ওয়ারে। মরুভূমি মাত্রই রক্তলোভী, আরবের মরুভূমিও কম রক্ত শোষেনি।

ড্রুমন্ড জিগ্যেস করল, কেমন লাগছে?

বললুম, ভাই ড্রুমন্ড, যদি সত্যি কথা বলতে হয়—এসব-দৃশ্যই আমি আগে ছবিতে দেখেছি। এ দেখার চেয়ে, ছবিতে বেশি সুন্দর লেগেছিল।

—যাঃ, তা হয় নাকি?

—তোমাকে ঠিক যুক্তি দেখাতে পারব না। এ জায়গাটা বড় বেশি বিশাল আমার পক্ষে, আমি ছোট করে, ফ্রেমের মধ্যে না দেখতে পেলে ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারি না।

—দুঃখের বিষয়, আমি ক্যামেরা আনিনি। আরেকদিন পাহাড়ের ওদিকে গুহা দেখতে যাব, তখন। (পরে একদিন সেখানে অসিত রায় ও সুবোধ সেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম)।

ছেলেমানুষের মতো ড্রুমন্ড বলল, জানো এখানে হরিণ আছে? হয়তো এই মুহূর্তে দশটা হরিণ দশদিক থেকে আমাদের দেখছে? আমরা দেখতে পাচ্ছি না।

আমাদের মোটামুটি গন্তব্য ছিল ডেজার্ট মিউজিয়ম—মরুভূমির ঠিক মধ্যে আসল পরিবেশে মরুভূমিতে যা কিছু পাওয়া যায়—তার প্রদর্শনী। ড্রুমন্ড জিগ্যেস করল, তুমি কিছু মনে করবে, যদি আমরা একটু ঘুরে যাই? ওই ডানদিকের টিলাটা আমার দেখা হয়নি।

আমি বললুম, না-না আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে ওটা দেখা হয়নি মানে? তুমি কি মরুভূমির সব জায়গা জানো নাকি?

—প্রায়, আমি প্রত্যেক সপ্তাহে এখানে আসি, এবং নানান জায়গা দেখি।

—কেন?

প্রথমে ও কারণটা বলতে চাইল না। লাজুক হেসে আমতা-আমতা করতে লাগল। মুগ্ধ হওয়ার জন্য মরুভূমিতে প্রতি সপ্তাহে আসার মতো এরকম খেলো কবিত্ব ও করবে বলে আমার বিশ্বাস হল না। পরে কারণটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

ড্রুমন্ড মরুভূমিতে সোনা খুঁজতে আসে।

এই খোঁজা নতুন নয়। সোনার লোভেই সাদা চামড়ার লোকেরা আসে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত, তারপর একদিন দেখতে পায় প্রশান্ত মহাসাগর। সোনার লোভে কত হত্যাকাণ্ড করেছে নিজেদের মধ্যে। ভুলে গেছে মানুষের জীবন সোনার চেয়েও দামি। এতকাল সোনার লোভে এক পাল লোক মরেছে—সাদা হাড় ও কঙ্কালের স্তূপের মধ্যে ঝিকঝিক করেছে দু-একটা সোনার দাঁত। কিন্তু এখনও সোনার লোভে কেউ আসে জানতুম না, শেষে কি একটা পাগলের পাল্লায় পড়লুম! কিন্তু ড্রুমন্ডের অমন সরল সুন্দর মুখে কোনও স্বর্ণলোভ দেখলুম না। সোনা নয়, সোনা খুঁজছে—এইটাই যেন বড় ব্যাপার। র‍্যাঁবোর কবিতার মতো ঃ যখন আমি ফিরব, আমি সোনা নিয়ে আসব।

—তোমার সত্যিই ধারণা এখানে সোনা পাওয়া যায়?

—নিশ্চয়ই! কত লোক ছুটির দিনে আসে সোনা তৈরি করতে। কিন্তু তারা সারাদিনে যতটুকু সোনা পায় বালি ছেঁকে—তাতে দিনের মজুরি পোষায় না। আমি খুঁজছি এমন একটা জায়গা—যেখানে অফুরন্ত সোনা। নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

পাকা রাস্তা ছেড়ে গাড়ি চলল পাহাড়ি পথে। ড্রুমন্ডের গাড়িটাও ওরই মতো ডাকাবুকো। কড়কড়, মড়মড় শব্দ হতে লাগল, ডানদিকে বাঁ-দিকে বিষম হেলে পড়তে লাগল, তবু চলল ঠিকই। শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় থামল। আর রাস্তা নেই। আমরা হাঁটতে লাগলুম। 'সাবধানে হেঁটো সুনীল, র‍্যাটেল স্নেক আছে খুব! অবশ্য ভয় নেই—কামড়ালে মানুষ চট করে মরে না!' খুব একটা ভরসা পেলাম না যদিও ও কথা শুনে।

একটা ছোট টিলা পেরতেই দূরে একটা বাড়ি চোখে পড়ল।

—এখানে এই বিশ্রী মরুভূমিতে কে বাড়ি করেছে?

—জানি না, আমি আগে দেখিনি। তবে ভেব না কোনও সাধু সন্ন্যাসী, তোমাদের ইন্ডিয়ার মতো—নিশ্চয়ই কেউ সোনার লোভে এসেছে।

বাড়ির সীমানায় বহুদূর থেকে কাঁটা-তারের বেড়া। কোথাও কারুর কোনও সাড়াশব্দ নেই। আমরা দরজা ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। হলিউডের সিনেমায় দেখা দৃশ্যের মতো—আমি প্রতি মুহূর্তে বন্দুকের গুলি আশা করছিলুম। কাছে এসে অবাক হয়ে গেলুম। বাড়িটা নতুন, কিন্তু সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। যেন কোনও অতিকায় দানব এসে মহা ক্রোধে ওটাকে ধ্বংস করেছে। কোনও ঘরের ছাদ নেই, দেওয়ালে বড়-বড় ফুটো (বন্দুকের কি না কে জানে।)—আসবাবপত্র ভেঙেচুরে তছনছ করা। প্রচণ্ড রাগের সঙ্গে কেউ ভেঙেছে। নতুন রেফ্রিজারেটার—কিন্তু হাতুড়ি মেরে ভাঙা হয়েছে বোঝা যায়, গ্যাসস্টোভের শুধু পাইপগুলো ভেঙে বিকল করা হয়েছে—নতুন কাঠের চেয়ার অথচ ভাঙা, সোফা কুশন ছুরি দিয়ে ফাঁসানো।

আমি ড্রুমন্ডের মুখের দিকে তাকালুম। ও বলল, কি জানি, হয়তো ঝড়ে ভেঙেছে—মাঝেমাঝে এখানে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে। এখানে বাড়ি বানানোই বোনামি।

আমি বললুম, না, ঝড় অসম্ভব। মানুষের কাজ।

—হতে পারে, একদল গ্যাংস্টার এসে লুটপাট করেছে। কেউ হয়তো এখানে ছুটি কাটবার জন্য বাড়ি বানিয়েছিল। হয়তো কেউ থাকত না এখানে।

ডায়নামো বসিয়ে ইলেকট্রিক কানেকশন পর্যন্ত ছিল, তারগুলো দেওয়াল থেকে ছেঁড়া,

মেশিনটা তোবড়ানো। দেয়ালে কুৎসিত ছবি—তাই দেখে প্রাক্তন বাসিন্দাদের রুচির খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। সবই ন্যাংটো মেয়েমানুষ, কয়েকটা খড়ি দিয়ে আঁকা, একটি স্ত্রীলোকরে শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্ল্যাং ভাষায় নাম লেখা, যেন কারুকে শেখানো হয়েছে।

—গুন্ডারা এসব জিনিসপত্র ভেঙেছে কেন—নিয়ে যেতে তো পারত?

—মরুভূমিতে এসব জিনিসের লোভে কে আসে, সবাই আসে সোনার লোভে। ড্রুমন্ড বিষম উৎসাহ পেয়ে গেল ব্যাপারটাতে—শখের গোয়েন্দার মতো খুঁটিনাটি দেখতে লাগল। এক একটা জিনিস পায়—আর আমাকে ডেকে-ডেকে দেখায়—আধপোড়া পিয়ানো, একবাক্স ছেঁড়া জামা কাপড় এইসব। মরুভূমি দেখতে এসে কী এক রহস্যময় বাড়িতে এসে হাজির হলুম। হঠাৎ খানিকটা দূর থেকে ড্রুমন্ড আমাকে ডাকল। কাছে গিয়ে দেখলুম, ড্রুমন্ড মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসেছে। ওর সামনে একটা ছোট্ট কবর। একটা কাঠের ক্রুশে ছোট্ট একটা পতাকা—তাতে লেখা, 'এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি আমাদের সাধের খোকনকে খুন করেছে। শ্রীমান ফ্রেডেরিক, (বয়স আট) ঈশ্বর তোমাকে আশ্রয় দেবেন।' তারিখ খুব টাটকা, মাত্র একুশ দিন আগের।

ড্রুমন্ড গম্ভীরভাবে বলল, 'চলো, আমরা এখান থেকে কেটে পড়ি। এখানে কোনও রহস্য আছে—শেষে আমরা পুলিশ কেসে জড়িয়ে পড়ব।'

ওই রহস্যময় বাড়ি পেরিয়ে পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আমরা অন্যদিকে নেমে গেলুম! বিশাল ক্যাক্টাসগুলো একটু আগেও যেন নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করছিল, আমাদের দেখে থেমে গেল। বিষম গরমে কান ঝাঁঝা করছে। একটা নদী খাতের মতো জায়গা দেখলুম, মাঝে-মাঝে বাঁধানো ঘাটের মতো, এক বিন্দু জল নেই। প্রাগৈতিহাসিক কালে হয়তো সেখানে নদী ছিল।

আমিই প্রথম সোনা আবিষ্কার করলুম। আমি আস্তে আস্তে হাঁটছিলুম, মাঝেমাঝে বসছিলুম ক্যাকটাসের ছায়ায়, কাঁটা বাঁচিয়ে—ড্রুমন্ড ছটপুজোয় মানতকরা মেয়েমানুষদের মতো মাঝে মাঝেই শুয়ে পড়ছিল মাটিতে—কোথাও গন্ধ শুকছে, কোথাও মাটিতে কান পেতে কী শুনছে এবং মাঝেমাঝে ওর সেই ইমোশনাল ইংরেজিতে (দুর্বোধ্য) কী সব বলছে। এমন সময় আমি বেশ একটা গোল, নধর, পাউডার পাফ (ফরাসিরা বলে শাশুড়ির মাথা) ক্যাকটাসের তলায় দিব্যি একতাল সোনা দেখতে পেলুম। রোদের আলো পড়ে ঝলসে দিচ্ছে! সঙ্গে-সঙ্গে আমার মনে হল—ড্রুমন্ড নিশ্চই আমাকে অর্ধেক শেয়ার দেবে, তা হলে, ওটার দাম কত কে জানে—দেশে ফিরে অন্তত বছর পাঁচেক কোনো চাকরি করতে হবে না! আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমন্ড ওই দেখো!'

বিষম চমকে ও মুখ ফেরালে তারপর আমার আঙুল সোজা লক্ষ করে সোনার তালটা দেখতে পেয়ে ও তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল, ওঃ তাই বলো! তুমি এমনভাবে চেঁচিয়ে উঠলে—আমি ভাবলুম সাপ না বাঘ! আমি আমার বন্দুকটা আনিনি!

—ও কী তবে?

—সোনা।

কাছে গিয়ে ড্রুমন্ড ওই জিনিসটাকে এক লাথি মেরে বলল, বাস্টার্ড! এই জিনিসগুলো কম ঝামেলে করে? এর নাম কী জানো—বোকার সোনা, ফুল্'স গোল্ড। যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়। বছর দশেক আগেও এ জিনিস আবিষ্কার করে কত লোক নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেছে।

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে আবার সেই সরল হাসি হেসে বলল, ভাগ্যিস তুমি ওটা দেখতে পাওয়ার পরই পেছন থেকে আমাকে ছুরি মারোনি!

বস্তুত, ব্যাপারটা এমন মেলোড্রামটিক হল যে তারপর থেকে আমার বিষম বিশ্রী লাগতে লাগল। মরুভূমি দেখার সম্পূর্ণ ইচ্ছে চলে গেল আর আমার। ওটা দেখতে পাওয়ার পর মুহূর্তে আমার বুকের মধ্যে যে ছমছম শব্দ হওয়া শুরু করেছিল—তা আর থামল না। বিষম ক্লান্ত হয়ে

পড়লুম। ড্রুমন্ডকে স্বর্ণলোভী ভেবে মনে মনে একটু ক্ষীণ অবজ্ঞা করতে শুরু করেছিলুম—কিন্তু তখন, তারপর থেকে কোথা থেকে এক গভীর নিরাশা আমার বুকে ভরে দিলে! যেন কেউ সেই মুহূর্তে কেড়ে নিল আমার পাঁচ বছর চাকরি না করার ছুটি, যেন পাঁচ বছর চাকরি করার পরিশ্রম একসঙ্গে সেই মুহূর্তে আমার কাঁধে চেপে বসল।

আমরা ফিরে এলাম গাড়ির কাছে। ড্রুমন্ডের বউ-এর বানিয়ে দেওয়া হ্যামবার্গার আর স্যান্ডউইচ খেলাম। গাড়ির পিছনদিকটা খুলে ড্রুমন্ড কী যেন খেতে লাগল চোঁ-চোঁ শব্দে—মনে হল যেন পেট্রল খাচ্ছে। কাছে গিয়ে দেখলুম ওখানে আলাদা একটা জলের ট্যাঙ্ক আছে। ঘন ঘন মরুভূমিতে আসার জন্য পাকা ব্যবস্থা।

ডানদিকেও ওই অঞ্চলটা একটু দেখেই আমরা যাব মিউজিয়ামে। তুমি আসবে আমার সঙ্গে?

—না, আমি এখানে বসছি। তুমি ঘুরে এসো।

—আমার ঘণ্টাখানেক লাগবে।

একটু দূরে যাওয়ার পর আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'ড্রুমন্ড, সাবধানে ঘুরো। হারিয়ে যেও না—কিংবা মরে যেও না। কারণ, আমি পথও চিনি না, গাড়িও চালাতে জানি না।'

একটু পরেই ড্রুমন্ড মিলিয়ে গেল দূরে। আমি একা গাড়ির ছায়ায় বসলুম। চারিদিক এমন নিশ্বাস যে ভয় করতে লাগল! হঠাৎ হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে, একটা শুকনো পাতারও শব্দ নেই। দূরে সেই পোড়ো বাড়িটা! আমি ওটার থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে বসলুম। দু-মানুষ-তিনমানুষ লম্বা ক্যাকটাসের সারি চলে গেছে মাইলের পর মাইল—সান্টা ক্যাটালিনা পাহাড় পর্যন্ত। নিস্তব্ধতা যেন জীবন্ত হয়ে ঘুরছে সেই মরুভূমিতে। আমার হাতঘড়ি নেই, সময় জানি না। একমাত্র শব্দ শুনছি নিজের হৃৎপিণ্ডের—তখনও প্রবলভাবে দুমদুম করছে। ক্রমশ দুর্বলতা বোধ এনে দিচ্ছে। মরুভূমিতে এতকাল যে অসংখ্য মানুষ মরেছে—তাদের সবার জন্য অসম্ভব দুঃখ বোধ করতে লাগলুম। ওপরের দিকে তাকানো যায় না, আকাশ এত গরম। অপেক্ষার প্রতিটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল অসম্ভব লম্বা। এর থেকে ঘুমিয়ে পড়া ভালো আমার মনে হল। গাড়ির মধ্যে ঢুকে লম্বা সিটে শুয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। ঘুমিয়ে আমি একটা জলে ডোবা মানুষের স্বপ্ন দেখেছিলাম সেদিন।

॥ উনিশ ॥

নিউ ইয়র্কের হার্লেম পাড়ায় এক বাড়ির রকে বসে তিনটি নিগ্রো ছোকরা আড্ডা দিচ্ছিল। বাড়ির মালিক একজন সাদা লোক। সে বলল ছোঁড়া তিনটেকে উঠে যেতে ঝাঁটফাঁট দেবে, ফুলগাছে জল দেবে—এই অজুহাতে। কিন্তু রকবাজ ছেলেরা কবে আর সুবোধ বালকের মতো উঠে যেতে শিখেছে! সুতরাং তারা ঠাট্টা মশকরা করতে লাগল বাড়িওলার সঙ্গে। রেগেমেগে বাড়িওলা স্টিরাপ পাম্পে জল ছিটিয়ে দিলে ওদের গায়ে। ছেলেরাও ছাড়বে কেন—উলটেপালটে ইট পাটকেল ছুড়তে লাগল। পাশের এক রেডিয়োর দোকান থেকে বেরিয়ে এল এক পুলিশ সার্জেন্ট, সাদা। সার্জেন্ট সাহেবের তখন অফডিউটি, তবু উৎপাত দেখে কর্তব্যপরায়ণতা জেগে উঠল, কোমর থেকে রিভলবার খুলে পরপর তিনটে গুলিতে পাওয়েল নামের একটি ছোকরাকে খুন করে ফেলল। শুরু হয়ে গেল নিউ ইয়র্কের দাঙ্গা।

পুলিশ পক্ষ বলছে, ছেলেটা ছুরি নিয়ে সার্জেন্টকে তেড়ে এসেছিল, প্রাণ বাঁচাবার জন্য সার্জেন্ট গুলি করেছে। নিগ্রোরা বলছে, মিথ্যে কথা, ছেলেটির হাতে ছুরি ছিল না, উপরন্তু, পুলিশটি নাকি গুলি করার পরও ছেলেটার গায়ে লাথি মেরে বলেছে ডার্টি নিগার। সাদা পুলিশ মাত্রই বন্দুক-

খুশি, সুযোগ পেলেই নিগ্রোদের ওপর হাতের সুখ করে নেয়।—কোন্‌টা সত্যি কে জানে, তবে এ কথা বোঝা যাচ্ছে না—চোদ্দ বছরের একটা ছেলে ছুরি নিয়ে তেড়ে এলেও—তার হাতে বা পায়ে গুলি করেও তো তাকে থামনো যেত—তিন তিনটে গুলি খরচ করা ওই সামান্য কারণে।

আমি সেদিন ওয়ার্ল্ড ফেয়ার দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে বসে এর কিছুই টের পাইনি। সেখানে রং ও রূপের সমভিব্যাহার, যেন মায়াপুরী, ঝলমল রং-এর পোশাক পরে ছেলেমেয়ে, বিশেষত মেয়েরা ঘুরছে। মনে হয় পৃথিবীতে কোথাও কোনও দাঙ্গা নেই, যুদ্ধ নেই, বিভেদ নেই! বিরাট প্রান্তর জুড়ে সারা বিশ্বের মেলা বসেছে। ভারী চমৎকার জায়গা—স্বর্গ ফর্গ বোধহয় এই ধরনেরই অনেকটা! এক একটা প্যাভেলিয়ন-এ যাচ্ছি, যেন সেই দেশ ঘুরে আসছি। পাকিস্তানের প্যাভেলিয়নে মোরগ মোশল্লাম খেয়েই চলে গেলুম মেক্সিকোর নাচ দেখতে, সেখান থেকে সুইডেনের ছবি, যুগোশ্লাভিয়ার গান, জাপানের রহস্য, ভারতের ঘরে এসে বাঁকুড়ার পোড়া মাটির ঘোড়া মূর্তিকে বললুম, কেমন আছ? জেনারেল মোর্টসের বিশাল এলাকা, তার সামনে তার চেয়ে বড় লাইন পড়েছে। ওরা নাকি সবাইকে নিয়ে যাবে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে! আমি অ্যালেনকে জিগ্যেস করলুম, যাবে নাকি?

দুজনে আধঘণ্টাটাক লাইনে দাঁড়ালুম! তারপর বসতে পেলুম ইলেকট্রিকের বেঞ্চিতে—সেটা আপন মনে চলতে লাগল—এক অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে, খানিক বাদে আমরা ঘুরতে লাগলুম, সমুদ্রের তলায় আগামী শতাব্দীর শহরে—যেখান দিয়ে ট্রেন ও মোটর গাড়ি চলছে, গেলুম চাঁদের গ্র্যান্ড হোটেলে, মঙ্গল গ্রহের চৌরঙ্গিতে, মরু প্রদেশের মধুপুর-দেওঘরে। অ্যালেনের রং ফরসা, আমার রং খয়েরি, আমার পাশে একজন নিগ্রো মেয়ে বসে—আমরা তিনজনেই একসঙ্গে ঘুরছিলাম ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে।

ওখান থেকে বেরলুম অনেক রাত্রে। মাটির তলার ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরলুম—সুতরাং শহর চোখে দেখিনি। ফিরে রেডিওতে শুনি, ভীষণ দাঙ্গা চলছে তখন হার্লেমে। আর রেডিয়োওয়ালারা কী বিষম ওস্তাদ ওদেশে, গোপনে ওখানে কোথায় একটা পাওয়ারফুল মাইক্রোফোন রেখে দিয়েছে, আর আমরা রেডিওতে শুনছি দাঙ্গার সমস্ত হই হল্লা, গুলির শব্দ, পুলিশের সাইরেন, বিয়ারের বোতল ভাঙা।

দিন চারেক চলল বেশ ঘোরতরভাবে সেই দাঙ্গা। দিনের বেলা চুপচাপ—সন্ধে হলেই শুরু হয়, হার্লেমপাড়াটা মোটামুটি নিগ্রোদের—কিছু সাদা লোকও আছে। কিন্তু সাদা লোকেরা ভয়ে দরজা বন্ধ করে পালাল, হার্লেম হয়ে উঠল নিগ্রোদের দুর্গ। ও পাড়া দিয়ে আর একটাও গাড়ি চলে না ভয়ে, বাস যায় না। চলন্ত গাড়ি আটকেও সাদা লোক দেখলেই মারধোর চালাল, রাত্তির বেলা পুলিশের গাড়ির উদ্দেশ্যে ইট, বোতল, গরম জল ছোড়া—তার উত্তরে পুলিশের কাঁদুনে গ্যাস ও গুলি। সেই সঙ্গে লুটপাট। নিগ্রোদের দোকানও লুঠ করতে লাগল নিগ্রোরাই। সমস্ত ঘটনাটাই চলে গেল চোর-বদমাশ আর লুঠেরাদের হাতে। এমনকী নিগ্রো নেতাদের (যারা গান্ধিবাদী ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন বিশ্বাসী) আবেদনও কেউ গ্রাহ্য করল না। তাদের মিটিংয়েও চলল ইট-পাটকেল।

খুব একটা অস্বাভাবিক বা ধারণাতীত ছিল যে এই দাঙ্গা, তা নয়। যে-কোনও একটা কারণের অপেক্ষায় ছিল। নিগ্রোদের রাগি সর্দার ম্যালকম এক্স বহুদিন থেকেই ঘোষণা করেছিল—এই গ্রীষ্ম হবে দীর্ঘ রক্তাক্ত গ্রীষ্ম—লং ব্লাডি সামার। খুনের বদলে খুন। দক্ষিণ অঞ্চলে যে অমানুষিক অত্যাচার চলছে এখনও, যেরকম হাসি ঠাট্টাচ্ছলে নিগ্রো খুন করছে—তার জন্য আর দয়া ভিক্ষা নয়, অনুরোধ-উপরোধ নয়, এবার শুরু করতে হবে শ্বেতকায় খুন। এক হিসেবে একটা পাগলের প্রলাপ—কারণ দু-কোটি নিগ্রো কী করে দাঁড়াবে সতেরো কোটি শ্বেত আমেরিকানের বিরুদ্ধে—তা ছাড়া শাসনযন্ত্র শ্বেতকায়দের হাতে। সেইজন্যই বোধহয় ম্যালকম এক্স—আফ্রিকায় চলে এসেছিল—আফ্রিকার নিগ্রোদের সাহায্য পাওয়ার আশায়। এও এক ছেলেমানুষি অ্যাডভেঞ্চারের নেশা—আফ্রিকার নিগ্রোরা আমেরিকায় এসে ওখানকার নিগ্রোদের সাহায্য করবে—এ এক রূপকথা। যখন আফ্রিকানরা খোদ

আফ্রিকাতেই এখনও ভেরউডকে সরাতে পারেনি। অবশ্য, এ কথাও ঠিক, ম্যালকম এক্স বা জঙ্গি ব্ল্যাক মুসলিমদের দল—খুব বেশি সমর্থন পায়নি নিগ্রোদের মধ্যেও—মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ অনেক বেশি বিশ্বাস এবং জোর এনে দিয়েছে—সে সঙ্গে বহু সংখ্যক সাদা লোকেরও এই আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা।

সেই দাঙ্গার সময় আমার কী অবস্থা? আমার রং ফরসাও নয়, কালোও নয়। খয়েরি বলা যাক্। নিগ্রো-সাদার লড়াইতে আমাদের কোনও প্রত্যক্ষ অংশ থাকার কথা নয়! আমরা ভারতীয়রা, বা এশিয়ার লোকরা একটা আলাদা জাত—জাপানি-চিনেরা কালো না হলেও হোয়াইট ম্যান নয়, যেমন নয় আরব-তুর্কিরা। ইংরেজরা আমাদেরও তো গালাগালের সময় 'নিগার' বলত ইংল্যান্ডেও যে এখন কালো-সাদার সমস্যা উঠেছে—সেখানে নিগ্রো-ভারতীয়—সবাইকেই কালার্ড লোক বলে ধরা হচ্ছে। আমেরিকাতেও যে ভারতীয় বা এশীয় হলেই নিগ্রোদের চেয়ে বেশি খাতির হবে তা নয়—অনেক জায়গায় সমান। জাপানিদের বিরুদ্ধেও আমেরিকায় এক সময় দাঙ্গা হয়েছিল। ভারতীয় ছাত্ররা সব পাড়ায় বাড়ি ভাড়া পায় না। আমেরিকার দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে যেখানে নিগ্রোদের প্রতি অহরহ মারধোর চলছে—সেখানেও ভারতীয় বললে রেয়াৎ করে না। অনেক মিশ্রিত নিগ্রোর গায়ের রং আমাদের মতোই— শুধু চুল কোঁচকানো। ওদিকে নিগ্রোরাও আমাদের যে পরম আত্মীয় মনে করে তা না। তারা সমর্থন খুঁজছে আফ্রিকার কাছে—এশিয়ার কাছে নয়। আফ্রিকায় স্পষ্টতই ভারতীয় বিদ্বেষ খুব ঘোরালো হয়ে উঠছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আর নিগ্রোরা নৃশংসভাবে মারামারি করছে। সুতরাং আমরা একটা তৃতীয় জাত-এখনও পর্যন্ত।

সোজা কথা দাঙ্গার সময় আমি হার্লেম পাড়ার তল্লাটও মাড়ালুম না। যেমন আমেরিকার নানা জায়গায় বেড়াবার সুযোগ পেয়েও আমি কখনও দক্ষিণে যাইনি। কী দরকার বাবা, ওসব ঝঞ্ঝাটে জড়াবার। কারণ ও সমস্যাটা আমার সমস্যা নয়। ওটা আমেরিকার ঘরোয়া ব্যাপার। 'আমেরিকার উচিত অবিলম্বে নিগ্রোদের সবরকম সমান অধিকার দেওয়া—' এ কথাটা আমরা প্রায়ই বলে থাকি বটে, কিন্তু এটা অতিরিক্ত মানবতার দাবি। আমাদের দেশে তো বটেই সব দেশেই দেখি এ ধরনের কিছু না কিছু সমস্যা রয়েছে!

সিভিল রাইটস বিল হয়েছে।—কিন্তু কতদিন লাগবে সেটা কার্যকরী হতে কে বলবে। জঙ্গি নিগ্রোরা ভাবছে—সাদারা যেন দয়া করে আমাদের অধিকার দিচ্ছে—তা কেন, আমরা জোর করে নেব। দক্ষিণের সাদারা ভাবছে—আইনকে গায়ের জোরে আটকাব, ভোট দিতে দেব না নিগ্রোদের। সেই দাঙ্গার আগেই তো তিনজন সিভিল রাইটস কর্মী নিখোঁজ হয়ে গেল—পুলিশ, শেষ পর্যন্ত সরকারি ফৌজ এসে তন্নতন্ন করে খোঁজার পর চল্লিশ দিন বাদে তাদের বুলেট-ফোঁড়া, পচাগলা দেহ পাওয়া গেল এক নতুন বাঁধের মাটির নীচে। সেই সময়কার একটা ছবি বেরিয়ে ছিল কাগজে...সৈন্যেরা এক নদীর পারে খোঁজাখুঁজি করছে—আর একদল বখা সাদা ছেলে হাসতে-হাসতে বলছে, 'ওতো মাছের খাদ্য হিসেবে দু-চারটে নিগ্রোকে মাঝে-মাঝেই আমরা নদীতে ছুড়ে দিই!' কিন্তু ওই তিনজন শহীদের মধ্যে দুজনই সাদা, অসংখ্য সিভিল রাইটস কর্মীদের মধ্যে সাদার সংখ্যাই বেশি। চার-পাঁচটা প্রদেশ বাদে, বাকি তরুণ আমেরিকা বর্ণ-বিভেদ মুছে ফেলতে চায়।

চার-পাঁচটা প্রদেশের নামে দোষ দিচ্ছি বারবার। সত্যিই ওরা আমেরিকার কলঙ্ক, কিন্তু বাকি অংশ কি নিষ্কলুষ? বিভেদ সব জায়গাতেই আছে। কত অসংখ্য উদার মনের মানুষ দেখলুম, যাঁরা বিষম লজ্জিত আমেরিকার এই সমস্যায়। তাঁরা কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, অধ্যাপক। কিন্তু তার বাইরেও বহু লোক থেকে যায়। মুখে চায় নিগ্রো-শ্বেত মিলন, কিন্তু মন থেকে সম্পূর্ণ গ্লানি বা ভয় ঘোচেনি। নিগ্রোরা (দু-এক জায়গায় ভারতীয়ও) তাদের কাছে বাড়ি ভাড়া চাইতে এলে—দিতে অস্বীকার করবে না, বা দক্ষিণের মতো বন্দুক উঁচিয়েও ধরবে না, কিন্তু মিষ্টি করে মিথ্যে কথা বলবে, 'দুঃখিত, আমার ঘর আগেই ভাড়া হয়েছে।' কিছু কিছু সৎ সাদা লোকদের মনে নিগ্রোদের সম্বন্ধে নতুন

ভয় ঢুকেছে। তার জন্য ওই জঙ্গি ব্ল্যাক মুসলিমরা দায়ী। নিগ্রোরা ভোটের অধিকার পেয়েছে। ওদের বংশবৃদ্ধির রেট অসম্ভব বেশি। একদিন যদি ওরা রাজনৈতিক ক্ষমতা পায় তবে এখন যেমন প্রতিহিংসার কথা বলছে এখনও যদি সাদাদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা নিতে শুরু করে! এ ভয় খুব অমূলক নয়। পুরোনো দাবি যা প্রতিশোধ ইতিহাসকে বহুবার বিষাক্ত করেছে।

আমি নিউইয়র্কের দাঙ্গা এড়িয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। দাঙ্গা অবশ্য হার্লেম থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল অন্যান্য জায়গায়। সন্ধের আগেই সুট করে বাড়ি ঢুকে পড়তুম। একদিন দুপুরে নাপিতের দোকানে চুল ছাঁটতে ঢুকেছি। সামনের আয়নার পিছন দিকের একটি সুন্দরী মেয়েকে দেখা যাচ্ছিল। ঘাড়ের ভঙ্গি ও শরীরের ঔদ্ধত্যে এমন বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম যে, নাপিত কী করছে খেয়ালই করিনি! হঠাৎ দেখি যে আমার মাথার এক পাশের ঘাড়-জুলপি ছেঁটে তালুর কাছ পর্যন্ত ফরসা করে দিয়েছে। হা-হা করে উঠলুম, কিন্তু তখন আর উপায় নেই, 'নাবিক ছাঁট' না কী বলে—মাথার একদিকের চুল আধ ইঞ্চি করে দিয়েছে। বাকি দিকটাও তা না করে উপায় নেই। নইলে ন্যাড়া হতে হয়। হায়, হায়—আমার অমন সুন্দর কালো ঘন-ঢেউ খেলানো চুল মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে—হাওয়ায় উড়ে চলে গেল ওপাশের সেই সুন্দরীর পদপ্রান্তে—ভক্তের নিবেদনের মতো। মাথা চাপড়াতে-চাপড়াতে বেরিয়ে এসে ঢুকলুম এক হোটেলে কিছু খাবার খেয়ে রাগ ঠান্ডা করতে। একটা হ্যামবার্গার নিয়ে বসেছি। টেবিলের উলটো দিকে একজন মজুর শ্রেণির শ্বেত লোক। খুব ক্লান্ত ও বুড়ো লোকটা। সে হঠাৎ আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি হার্লেমে থাকো, না ব্রুকলিনে?

কীরকম খটকা লাগল। এরকম তো কেউ প্রশ্ন করে না। বড়জোর জিগ্যেস করতে পারত, তুমি কোথায় থাকো? কিন্তু আমি যে ওই দু-জায়গার এক জায়গাতেই থাকব তার কী মানে আছে।

জিগ্যেস করলুম, তুমি কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

আবার প্রশ্ন ঃ তুমি হার্লেমে থাকো না ব্রুকলিনে?

হঠাৎ মাথায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। শিউরে উঠল সারা শরীর। ওই দুটো পাড়াতেই সাধারণত বহু নিগ্রো থাকে। লোকটা আমাকে ধরে নিয়েছে মিশ্রিত নিগ্রো—মাথার আমার চুল নেই, প্রমাণ নেই।

জিগ্যেস করলুম, কেন? কেন জানতে চাইছ?

—তাহলে আলোচনা করতুম, তোমরা দাঙ্গা করছ কেন? দাঙ্গা করে তোমাদের কী লাভ?

প্রথমটায় ভয় পেয়েছিলাম। তারপর নিজেকে নিগ্রো বলে অস্বীকার করতেও ইচ্ছে হল না। স্পষ্ট গলায় বললুম, না দাঙ্গা করে কোনও লাভ নেই। দাঙ্গা করে কোথাও কোনও লাভ হয় না। এই কথাটা বলার সময় প্রথম আমার ঢাকার দাঙ্গার কথা ও কলকাতার দাঙ্গার কথা মনে পড়েছিল। তারপর মনে পড়ে নিউইয়র্ক-শিকাগোয় নিগ্রোদের দাঙ্গা, মিসিসিপি-অ্যালেবামায় সাদাদের দাঙ্গা, ওয়েস্ট ইন্ডিজের ভারতীয় আফ্রিকানদের দাঙ্গা, সাইপ্রাসে গ্রিক-তুর্কিদের দাঙ্গা। আমি আবার বললুম, না, কোনও লাভ হয় না।

॥ কুড়ি ॥

দিল্লি পৌঁছে শুনলাম, সফরসূচি বদলে গেছে। আগে ঠিক ছিল যে মে মাসের তিন তারিখ রওনা হওয়া হবে সদলবলে। বিকেলের দিকে ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া দফতরে টেলিফোন করে জানা গেল যে তিন তারিখের বদলে চার তারিখে যাত্রা ঠিক হয়েছে। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে আমাকে তা জানানো হয়নি। সবাই মিলে একসঙ্গে যাওয়া হবে বলেই আমার দিল্লিতে আসা। দলের সদস্য

সংখ্যা ছয় অমৃতা প্রীতম (পাঞ্জাবি ভাষার কবি) গোপালকৃষ্ণ আদিগা (কন্নড় ভাষা), কেদারনাথ সিং (হিন্দি), শামসুর রহমান ফারুকি (উর্দু), অরুণ কোলাটকর (মারাঠি) এবং আমি। এবং দলটির তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে যাবেন ভূপালের ভারত ভবনের পরিচালক অশোক বাজপেয়ী।

আমার পক্ষে তখন টিকিট বদল করার অনেক ঝামেলা। সুতরাং একাই যেতে হবে। একলা ভ্রমণ আমার ভালো লাগে, অভ্যেসও আছে। কিন্তু পুরো দলটিকে নিউ ইয়র্কে ভারতীয় উপ-দূতাবাসের কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনা করার কথা। আমার একার জন্য নিশ্চয়ই কেউ আসবে না, হোটেল ইত্যাদি কে ঠিক করবে তাই-বা কে জানে। যাই হোক, একটা কিছু হবেই। দিল্লিতে সারাসন্ধে আড্ডা দেওয়ার পর রাত দুপুরে আমাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে গেল মিহির রায়চৌধুরী, সমরেশ দাশগুপ্ত ও ভারতী। আজকাল এমনই সিকিউরিটির কড়াকড়ি যে সঙ্গী-সাথীদের গেটের বাইরে থেকেই বিদায় জানাতে হয়। বিমানে ওঠার আগে পেছন ফিরে প্রিয়জনদের আন্দোলিত করতল আর দেখার উপায় নেই!

ইন্দিরা গান্ধির নামে নতুন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি খুলেছে মাত্র দুদিন আগে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। নতুন বলেই মনে-মনে সব কিছু ক্ষমা করা যায়, হয়রানি সত্ত্বেও মনকে সেইভাবে শান্ত রাখি। রাত্তিরে ঘুমের কোনও আশা নেই। কারণ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানটি বোম্বাই ছুঁয়ে যাবে, সেখানে ঘণ্টা দুয়েকের অপেক্ষা, তারই মধ্যে আবার নতুন করে সিকিউরিটি চেক, নিজের সুটকেসটি খুঁজে অঙ্গুলি নির্দেশের দায়িত্ব। কতিপয় উগ্রপন্থী শিখ যাত্রী ভরতি বিমান আকাশপথে ধ্বংস করার বায়না ধরেছেন, তারই জন্য এত সব ঝকমারি, তবু সকৌতুকে লক্ষ করলুম, যাত্রীসংখ্যা একটুও কমেনি, বিমানটি প্রায় টইটম্বুর।

পশ্চিম গোলার্ধে যাত্রায় মজা এই যে তাতে অতিরিক্ত সময় অর্জন করা যায়। এই আকাশ পথে দীর্ঘ যাত্রায় সন্ধে এবং রাত্রির পরে ভোর হয় না, আবার বিকেল ফিরে আসে। আমার ইওরোপে থামার কোনও পরিকল্পনা নেই, সুতরাং আটলান্টিকের অন্তরীক্ষে মিশমিশে কালোরাত দেখার পর নিউ ইয়র্কে যখন পৌঁছলুম, তখন ফটফটে বিকেল।

কেনেডি এয়ারপোর্টের অবস্থা যাচ্ছেতাই। মুহুর্মুহু প্লেন ওঠা-নামা করছে, গিসগিস করছে যাত্রী-যাত্রিণী, ইমিগ্রেশন আর কাস্টমসের সামনে লম্বা লাইন। আমি যখন প্রথমবার এদেশে আসি তখন এই বিমানবন্দরটির নাম ছিল আইডেলওয়াইল্ড, তখন প্লেন থেকে বাইরে বেরুতে দশ মিনিটের বেশি সময় লাগত না, এখন নাকি দু-আড়াই ঘণ্টা লেগে যায়। কোন পুণ্যবলে জানি না, আমাকে তেমন ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হল না। আমি কবিতা পাঠ করতে এসেছি শুনে দুটি জায়গাতেই ঈষৎ হাস্য পরিহাস করে আমাকে ছেড়ে দিল। সুটকেস ঠেলতে-ঠেলতে আমি চিন্তা করছি কোথায় যাব, কোন হোটেলে উঠব, কোন বন্ধুকে টেলিফোন করব, এমন সময় দেখি অনেকগুলি উজ্জ্বল পরিচিত মুখ। বিদেশের এয়ারপোর্টে যদি কোনও চেনা মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়, তাও আবার যদি অচিন্ত্যপূর্ব হয়, তাহলে তার তুলনা দেওয়া যায় অল্প পড়াশুনো করে পরীক্ষায় ফার্স্ট হওয়ার সঙ্গে। আমি ভেবেছিলুম, আমার জন্য কেউই থাকবে না, দেখলুম অপেক্ষা করছেন মোট সাতজন। আমাদের বুধসন্ধ্যার ধ্রুব কুণ্ডু, নিউ ইয়র্কের অনেককালের অধিবাসী যামিনী মুখার্জি এবং তাঁর স্ত্রী সুমিত্রা মুখার্জি, হোয়াইট প্লেইনসের চন্দন সেনগুপ্ত এবং তার গুজরাটি পত্নী প্রীতি, এবং কমিটি ফর ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রির দুজন প্রতিনিধি মার্ক নেসডর এবং স্যাম শার্প। এঁরা সবাই এসেছেন আলাদা-আলাদা ভাবে এবং আমাদের দূতাবাসের পক্ষ থেকে কেউই আসেননি। মার্কিন যুবক দুটি জানাল যে আমার জন্য হোটেল ঠিক করা আছে।

যে-কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি এসেছি, তা ভারত উৎসবেরই অন্তর্গত। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের পর, দেড় বছর ধরে খণ্ড খণ্ড ভাবে এই অনুষ্ঠান চলবে। উৎসবের উদ্যোক্তা ভারত সরকার বটে কিন্তু আমেরিকার বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠানগুলির আয়োজন করেছে কমিটি অফ

ইন্টারন্যাশনাল পোয়েট্রি। নিউ ইয়র্কের একদল কবি এই কমিটি গড়েছেন, সেই কবিদের প্রধান হচ্ছেন অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। এই কমিটি বিভিন্ন দেশের কবিদের আমন্ত্রণ জানান এদেশে কবিতা পাঠের জন্য। এবারে ভারত সরকারের সঙ্গে সহযোগিতায় তাঁরা ভারতীয় কবিদের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করেছেন। এদের সঙ্গে আমেরিকান সরকারের কোনও সম্পর্ক নেই।

হোটেলটির নাম লেক্সিংটন, এটি ম্যানহাটানের লেক্সিংটন অ্যাভিনিউ ও ৪৮নং রাস্তার মোড়ে। এককালে নামকরা হোটেল ছিল নিশ্চয়ই, শুনলুম সম্প্রতি কোনও ভারতীয় এটি কিনেছেন। সামনের দিকে মেরামতের কাজ চলছে, অব্যবস্থার একেবারে চূড়ান্ত। রুম সার্ভিস বলে কিছু নেই, ঘরে বসে এককাপ চা কিংবা কফিও পাওয়া যায় না। ভারতীয় মালিকানায় গেছে বলেই এই অবস্থা, এরকম মন্তব্য অনেকেই করেছেন বারবার। যদিও হোটেলটির কর্মচারীরা ভারতীয় নয়।

হোটেলে পৌঁছে একটি চিরকুট পেলুম, তাতে লেখা আছে গিন্‌সবার্গ এক রেস্তোরাঁয় উইলিয়াম বারোজ-এর সঙ্গে ডিনার খাবেন, সেখানে তিনি আমাকেও নেমন্তন্ন করেছেন। কিন্তু সুদীর্ঘ বিমানযাত্রা এবং ঘুমহীনতায় আমি অবসাদ বোধ করছিলাম, আবার বাইরে বেরুতে বা কিছু খেতে ইচ্ছে করল না একেবারেই। নিজের ঘরে বসে বন্ধুদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দেওয়ার পর আমি টিভি চালিয়ে দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলুম। আমেরিকান টিভি খুব ভালো ঘুমের ওষুধ।

পরদিন সন্ধ্যায় পুরো দলটি এসে পৌঁছবার পর জানা গেল, শ্রীমতী অমৃতা প্রীতম আসতে পারেননি। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় প্রায় শেষ মুহূর্তে যাত্রা বাতিল করেছেন। যাই হোক, ভারতীয় কবির দলটির সংখ্যা-হানি অবশ্য হল না, কারণ সেইদিনই এসে পৌঁছেছেন নবনীতা দেবসেন। আর একটি ভ্রাম্যমাণ ভারতীয় লেখকদের দল আমেরিকার বিভিন্ন শহরে বক্তৃতা ও আলোচনাচক্রে যোগ দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্য থেকে দুজন নবনীতা দেবসেন এবং বোম্বাইয়ের ইংরিজি ভাষার কবি-সম্পাদক নিসিম ইজিকিয়েল নিউ ইয়র্কের কাব্য পাঠের আসরে যোগদান করবেন, এরকম আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে। এ ছাড়া, শিকাগোতে অধ্যাপনা করেন দক্ষিণ ভারতীয় কবি এ কে রামানুজন, ডেকে আনা হয়েছে তাঁকেও।

নিউ ইয়র্কের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছে দু-জায়গায়। প্রথম তিনদিন অনুষ্ঠান হবে মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টস-এ, সংক্ষেপে যার নাম মোমা। মিউজিয়াম কথাটি শুনলেই আমাদের প্রাচীন হাড়-পাথরের কথা মনে পড়ে, কিন্তু পশ্চিমের মিউজিয়ামগুলি সব সময়েই সমসাময়িক সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক রাখে। ছবির প্রদর্শনী তো থাকেই তা ছাড়া দেশ-বিদেশের শিল্পোত্তীর্ণ চলচ্চিত্র, সঙ্গীত, সাহিত্যেরও স্বাদ পাওয়া যায় এখানে এসে। মোমা-তে প্রায়ই তো কবিতা পাঠের ব্যবস্থা থাকে।

মে মাসের পাঁচ তারিখ থেকে তিনদিন ধরে যে কবিতা পাঠের আসর, তাতে আমেরিকান ও ভারতীয় দু-দল কবিই পড়বেন। এই সম্মিলিত কাব্য পাঠের ব্যবস্থাটি অভিনবই বলতে হবে।

দ্বিতীয় দিন সকালেই হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। তার সঙ্গে আমার পনেরো বছর বাদে আবার দেখা। পাঁচ বছর আগে আমি যখন এদেশে এসেছিলাম, তখন অ্যালেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে মুক্তি যুদ্ধের সময় হঠাৎ একদিন কলকাতায় আমার বাড়িতে উপস্থিত হয়েছিল অ্যালেন। সেসময়ে আমাদের বাড়ির বয়স্ক রাঁধুনি গোপালের মা ছাড়া আর কেউ উপস্থিত ছিল না, অ্যালেন গোপালের মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করায় সে হেসে-কেঁদে অস্থির!

সেবার অ্যালেন এসেছিল বাংলাদেশ যুদ্ধের শরণার্থীদের অবস্থা নিজের চোখে দেখতে। তার সঙ্গে জন জিয়োনো নামে আর একজন তরুণ কবি ও ফটোগ্রাফার। আমরা তিনজন যশোর রোড ধরে গিয়েছিলাম বনগাঁর সীমান্তের দিকে। দু'পাশের উদ্বাস্তু শিবিরগুলিতে ঢুকে-ঢুকে লক্ষ-লক্ষ শিশু বৃদ্ধ-নারীর মানবেতর জীবনযাপন নিজের চোখে দেখে অ্যালেন চোখের জল ফেলেছিল। সেটা ছিল

সেপ্টেম্বর মাস, কয়েকদিন আগেই প্রবল বর্ষায় এইসব অঞ্চলে বন্যা হয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত আমরা গাড়িতে যেতে পারিনি, একটা নৌকো ভাড়া করে এগিয়ে যেতে যেতে দেখেছিলুম অনেক ভাসমান সংসার। সেই অভিজ্ঞতা থেকে অ্যালেন লিখেছেন তার বিখ্যাত দীর্ঘ কবিতা, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'। কিছুদিন পরে পপ সঙ্গীতের সম্রাট বব ডিলান যখন বাংলাদেশের দুর্গতদের সাহায্য করা জন্য এক বিরাট সঙ্গীতানুষ্টানে টাকা তোলেন, সেখানে ওই কবিতাটি সুর করে গাওয়া হয়েছিল।

অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এরও অনেকদিন আগে, বাষট্টি সালে। সেবারে অ্যালেন ও তার সহচর পিটার অরলভস্কি এসেছিল মধ্যপ্রাচ্যের মধ্য দিয়ে হিচ হায়কিং করে। তখনও হিপি আন্দোলন শুরুই হয়নি, ছেঁড়া জামা, ধুলো-কাদা মাখা সাহেব দেখা এদেশের মানুষের অভ্যেস হয়নি। কেরুয়াক-করসো-গিনসবার্গ প্রমুখ কবি সাহিত্যিকরা নিজেদের বলত বিট জেনারেশান, ওদের নীতি ছিল যতদূর সম্ভব কম খরচে জীবন যাপন করা, যাতে কোনওক্রমেই প্রতিষ্ঠানের কাছে হাত পাততে না হয়, শিল্পী-সাহিত্যিকরা চব্বিশ ঘণ্টার জন্যই স্বনিযুক্ত, কোনও রকম চাকরি-বাকরি করায় ওঁরা বিশ্বাসী নন।

কবি হিসেবে অ্যালেন গিন্‌সবার্গকে আমি আগে থেকেই চিনতাম। বুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে তার আমেরিকায় আলাপ হয়েছিল, সেই সূত্রে কলকাতায় এসে সে কৃত্তিবাসের আড্ডায় জুটে পড়ে। তারপর দিনের পর দিন এক সঙ্গে কাটানো, কখনও শ্মশানঘাটে, কখনও মাহেশে রথের মেলায়, কখনও ডায়মন্ডহারবারে, কখনও আমরা বা উৎপলকুমার বসু বা তারাপদ রায়ের বাড়িতে, আড্ডা তুমুল আড্ডা। তারপর জামসেদপুর, চাইবাসা, কাশীতে ভ্রমণ। শক্তি অ্যালেনদের সঙ্গে চলে গিয়েছিল তারাপীঠ, সেখানে তান্ত্রিকদের সঙ্গে কাটিয়ে এসেছে কয়েকটা দিন। অ্যালেনের ঝোঁক তখন অতীন্দ্রিয় সাধনার দিকে, ভারতে সে প্রধানত এসেছিল গুরু খুঁজতে। আমাদের ধর্মের দিকে বা যোগসাধনার দিকে কোনও ঝোঁক ছিল না। আমরা তখন নিমজ্জিত হয়ে আছি কবিতায়, শুধু কবিতায়। অ্যালেন গিনসবার্গের মতন একজন জোরালো কবির সান্নিধ্যে আমরা অনুপ্রাণিত বোধ করতাম। মানুষ হিসেবেও সে চমৎকার, নরম, ভদ্র, অন্যের কথা মন দিয়ে শোনে, নিজের মতামত জোর করে খাটাবার চেষ্টা করে না। তার কবিতা বর্ণনামূলক হলেও শব্দ ব্যবহারের জাদু আছে, এই পৃথিবীর প্রতি তার নিজস্ব কিছু কথা বলার আছে, এই কবিতা আমাদের নতুন স্বাদ দেয়।

সেই অ্যালেন গিনসবার্গের সঙ্গে কতকাল পরে আবার দেখা। আমার বর্তমান চেহারা সে চিনতে পারবে কি না এ ব্যাপারে কিছু সন্দেহ ছিল, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র সে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গ ন করার পর ফটাফট চুমো খেল দুই গালে। দুবার বলল, লং টাইম, আফটার আ লং টাইম। তারপর সে জিগ্যেস করল, কত বছর বাদে? পনেরো; কুড়ি; পঁচিশ? সে বহুদেশ ঘুরে বেড়ায়, তার সঠিক মনে থাকার কথা নয়, আমি তাকে সঠিক তারিখগুলি স্মরণ করিয়ে দিলাম।

এতগুলি বছরে, পোশাকে ছাড়া তার শরীরের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। তার বয়েস ষাট, কিন্তু বার্ধক্যের চাপ পড়েনি, মাথার চুল ঈষৎ পাতলা, দাড়িতে পাক ধরেছে। সে পরে আছে কোট ও টাই, তেমন কিছু ফ্যাশানদুরস্ত বা দামি নয়, তবে ভদ্রস্থ। এর আগে আমি কিছু পত্র-পত্রিকায় পড়েছি যে এককালের সেই বিদ্রোহী কবি অ্যালেন গিনসবার্গ এখন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আঁতাত করেছে, সে এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, সে এখন অনেক টাকা রোজগার করে। এমনকী এখন তার প্রাইভেট সেক্রেটারি আছে। অবশ্য কবি হিসেবে তার খ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে, এখন আমেরিকার সে প্রধান কবি বললে অত্যুক্তি হয় না।

আমি দেখলুম, এত খ্যাতি সত্ত্বেও অ্যালেন আগের মতনই নিরভিমান, বন্ধুত্বের ব্যাপারে উষ্ণ। আমার কাছে সে কলকাতার অনেক খবরাখবর নিল। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় দত্ত, তারাপদ রায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের কথা তার স্পষ্ট মনে আছে, বারবার জিগ্যেস করল তাদের কথা।

পরদিন দুপুরে অ্যালেনের বাড়িতে আমাদের সবার নেমন্তন্ন। সে এখন থাকে ম্যানহাটনের

১২ নম্বর রাস্তায়, ঠিকানা জানাবার সময় সে আমার দিকে চোখ টিপে সকৌতুকে বলল, আমি আপ টাউনে উঠে এসেছি! এ শহরে রাস্তার নম্বর শুনলেই অনেকটা বোঝা যায় যে কেমন অবস্থাপন্ন পাড়ায় থাকে। অ্যালেনরা আগে থাকত গ্রিনইচ ভিলেজের একটেরেতে লোয়ার ইস্ট সাইডে, প্রায় বস্তির মতন এক লম্বাটে বাড়িতে, গ্রিনইচ ভিলেজ এখন অনেকটাই ভেঙেচুরে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, বাকিটা টুরিস্টদের ভিড়ে ভরা।

অ্যালেনের বর্তমান অ্যাপার্টমেন্টটিও তেমন কিছু সচ্ছল এলাকায় নয়, রাস্তায় ছেলে মেয়েরা চ্যাঁচামেচি করছে, বাড়িটি পুরোনো, লিফট নেই, সিঁড়ি ভেঙে উঠতে হল চারতলায়। পিটার ওরলভস্কি এখন তার সঙ্গে থাকে না, সে অসুস্থ অবস্থায় আছে কোনও বৌদ্ধ আশ্রমে। এখানে রয়েছে অ্যালেনের প্রাইভেট সেক্রেটারি বব্ রোসেনথাল, আর একটি মেয়ে অ্যালেনের বই-এর সংগ্রহ ও পাণ্ডুলিপি গোছগাছ করার কাজ করে। এসব সত্ত্বেও বাসস্থানটি দেখলে মনে হয় কোনও গৃহী সন্ন্যাসীর। একটি ঘরের কোণে আমাদের দেশের মা-ঠাকুমাদের ঠাকুর ঘরের মতন কয়েকটি ঠাকুর-দেবতার ছবি ও মূর্তি সাজানো, সামনে আসন পাতা, সেখানে অ্যালেন প্রতিদিন ধ্যানে বসে। নবনীতা মহা উৎসাহে ছবি তুলতে লাগল এইসব কিছুর।

অ্যালেন আমাকে তার সমগ্র কাব্য সংগ্রহ উপহার দেওয়ার সময় ছেলে-মানুষের মতন নানারকম ছবি এঁকে আঁকিবুকি কেটে আমার নাম লিখে দিল। এ ছাড়া সেদিন তার কবিতার গানের লং প্লেয়িং রেকর্ড, তার নিজের গলায় গাওয়া 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড' কবিতার ক্যাসেট। আমাদের বাংলা বই তাকে দিয়ে কোনও লাভ নেই, আমি একটি ছোট্ট প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে বললুম, আমার স্ত্রী তোমার জন্য একটা পাঞ্জাবি পাঠিয়েছে। অ্যালেন ক্ষুণ্নভাবে বলল, কেন তুমি পাঞ্জাবি এনেছ? কলকাতায় আমি একটা লাল পাঞ্জাবি গায়ে দিতুম তোমার মনে আছে? সেটা আমি সঙ্গে এনেছি, তুলে রেখে দিয়েছি, ওসব আমি আর পরি না। এখন আমি পাঞ্জাবি পরে রাস্তায় বেরুলে লোকে আমাকে হিপি বলবে। ওসব আমি এখন চাই না। দ্যাখো, এক সময় আমি অনেক অনিয়ম-অনাচার করেছি, ঢের হয়েছে, এখন বয়েস তো হল, এখন আমি চুপচুপ শান্তভাবে কবিতা লিখতে চাই।

আমি বললুম, ঠিক আছে, এটা পরে তোমায় রাস্তায় বেরুতে হবে না। ঘুমোবার সময় এটাকে নাইট শার্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারো।

অ্যালেন প্যাকেটটি না খুলে রেখে দিল একপাশে।

অ্যালেনের সেক্রেটারি বব রোজনথাল বললো, অ্যালেন আজ নিজে রান্না করেছে। চলো, খাবার ঠান্ডা করা ঠিক হবে না।

আমরা সবাই চলে এলুম রান্নাঘরে। মোটামুটি সাত্ত্বিক আহার, তরমুজ-কলা-আম-স্ট্রবেরি ইত্যাদি নানারকম ফল, রুটি-মাখন, চিজ কয়েকপ্রকার, গরম সাদা ভাত, পেঁপের তরকারি, ডাল ইত্যাদি। আমাদের মধ্যে কয়েকজন নিরামিষাশী, তাদের পছন্দ হল খুব। অবশ্য একটি প্লেটে হ্যাম ও স্যালামির টুকরোও রাখা আছে, তবে সেদিন অশোক বাজপেয়ি, নবনীতা ও আমি ছাড়া কেউ বোধহয় হাত বাড়ায়নি।

সন্ধেবেলা মোমাতে কবিতা পাঠের আসরে দেখি অ্যালেন সেই পাঞ্জাবিটা পরে এসেছে। বব্ আমাকে বলল, দেখেছ, অ্যালেন আজ কীরকম সেজেছে! অনেকদিন আমি ওকে এরকম এক্সটিক পোশাকে দেখিনি। আমি অ্যালেনকে জিগ্যেস করলুম, তুমি শেষ পর্যন্ত হিপি সাজলে যে? অ্যালেন হেসে বলল, তখন খুলে দেখিনি, এই ডিজাইনটা খুব সুন্দর, আর আজকের আবহাওয়ায় এই মেটেরিয়ালটিই লাস্ট রাইট!

ভারতীয় কবিদের মধ্যে কেদারনাথ সিং, অশোক বাজপেয়ী ও আমি প্রতি আসরেই পাজামা-পাঞ্জাবি পরে গেছি, অন্যদের অবশ্য প্যান্টকোটই বেশি পছন্দ। আর বর্ণময় শাড়িতে ও ঝলমলে

ব্যবহারে নবনীতা সব সময়েই দৃষ্টি আকর্ষণীয়া।

প্রতি সন্ধ্যায় তিনজন ভারতীয় কবি ও তিনজন আমেরিকান কবি কবিতা পড়বেন, এই রকম ঠিক ছিল। ভারতীয় কবিরা কবিতাপাঠ করবেন মাতৃভাষায়। সেই কবিতাগুলিরই ইংরেজি কবিতা পড়ে দেবেন কোনও আমেরিকান কবি। এই ব্যবস্থাটি আমার খুব পছন্দ। কোনও রুশ কবি বা কোনও ফরাসি কবি যখন মার্কিন দেশ সফরে আসেন, তখন তাঁরা মাতৃভাষাতেই কবিতা পড়েন। ইংরেজিতে নয়। তাঁদের কবিতা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অন্যের। তাহলে আমরা ভারতীয়রাই বা আমাদের নিজস্ব উচ্চারণে ইংরিজি পড়তে যাব কেন? এর ব্যতিক্রম ঘটল শুধু নিসিম ইজিকিয়েল আর নবনীতা দেবসেন-এর ক্ষেত্রে। নিসিম ইজিকিয়েল ইংরিজিতেই লেখেন, তিনি নিজের কবিতা নিজেই পড়লেন। আর নবনীতা বিলেত-আমেরিকায় দশ কুড়িবার ঘুরে গেছে, এইসব দেশে সে দীর্ঘদিন থেকেছে, পড়াশুনো করেছে, তার ইংরিজি উচ্চারণ অনেক আমেরিকানের চেয়েও ভালো, সে কোনও অনুবাদ-পাঠকের সাহায্য নেয়নি, নিজের কবিতা আগে বাংলায় পাঠ করে সে সেই কবিতার অনুষঙ্গ তার নিজস্ব ভাষায় বুঝিয়ে তারপর অনুবাদ পড়ে একেবার জমিয়ে দিল। নবনীতার কবিতা পাঠের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যেন এক অনবদ্য একক অনুষ্ঠান, তা অত্যন্ত সমাদৃত হয়েছে।

কবিতা পাঠের আসরটি বসেছিল মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্টসের গার্ডেন হলের কাছাকাছি ঢাকা বারান্দায়। শ্রোতারা সব বসেছেন চতুর্দিকে ছড়ানো আলাদা আলাদা টেবিলে। অনুষ্ঠান শুরুর আগে ও বিরতির সময় বিনামূল্যে লাল ও সাদা সুরা ও কোমল পানীয় বিতরিত হচ্ছিল, অনেকটা যেন রেস্তোরাঁয় আড্ডার মেজাজ, কিন্তু কবিতা পাঠের সময় পিন-পতন নৈঃশব্দ্য। শ্রোতার সংখ্যা দুশো-আড়াই শো'র বেশি নয়, অল্প কিছু সংখ্যক ভারতীয়, তাদের মধ্যেও বাঙালিই বেশি!

আমেরিকান কবিদের মধ্যে যাঁরা নিজস্ব কবিতা পড়লেন, তাঁদের মধ্যে খ্যাতিমান ও তরুণ মেলানো মেশানো। খ্যাতিমানদের মধ্যে অবশ্যই অ্যালেন গিনসবার্গ শীর্ষে, তা ছাড়া ছিলেন জেমস্ লকলিন, বিল জাভাটস্কি ও ডেভিড র‍্যাটরে। জেইন করটেজ নামে একজন কালো রঙের মহিলা কবি পড়লেন দারুণ রাগি, চ্যাঁচামেচির কবিতা, এদেশের বহু পাঠকের কাছেই যা কবিতা বলে মনে হবে না। একজন বর্ষীয়ান কবি পড়লেন ভারতবর্ষ বিষয়ক কবিতা। টম উইগেল নামে এক তরুণ কবি নানারকম কায়দা কানুন করতে লাগলেন, মাঝে-মাঝে ঘাড় বেঁকানো, তাচ্ছিল্যের প্রকাশ, উলটোপালটা মন্তব্য, হাত থেকে কাগজ পড়ে যাওয়া, হঠাৎ পড়া থামিয়ে সিগারেট ধরানো। এসবই আমার চেনা, আমাদের দেশেও এমন অনেকবার দেখেছি। এ আর কিছুই না, অ্যালেন গিনসবার্গের মতন একজন প্রখ্যাত কবি সামনে বসে আছে বলে তার বিরুদ্ধে খানিকটা বিদ্রোহের প্রকাশ। আমি তাকিয়ে দেখি, অ্যালেন মুচকি-মুচকি হাসছে। ছেলেটি অবশ্য তেমন ভালো লেখে না, ভালো লিখলে এসব মানিয়ে যেত।

দর্শকদের মধ্যে প্রধান দ্রষ্টব্য হচ্ছে গ্রেগরি করসো। এই প্রখ্যাত কবিটি প্রতি সন্ধেবেলাতেই হাজির, কিন্তু তাকে কবিতা পড়ার আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গ্রেগরি ঠিক আগের মতনই রয়ে গেছে, সব সময় মাতাল কিংবা গাঁজার ধোঁয়ায় টইটম্বুর, টলমলে পায়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রেগরিকে কবিতা পড়তে দেওয়া হয়নি বলে আমি বেশ ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলুম। আমেরিকায় প্রকাশ্যে মাতালামি কেউ সহ্য করে না।

এতবড় একজন কবি বিনা আমন্ত্রণে প্রতিদিন আসছে, এটাও খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। কিন্তু গ্রেগরি নাকি অ্যালেনের সঙ্গ ছাড়তে চায় না, ছায়ার মতন ঘোরে। অ্যালেন বলল, গ্রেগরি একটি আট বছরের শিশু, আমি দেখাশুনো না করলে ও নিজেকে সামলাতে পারে না।

গ্রেগরির ভাবভঙ্গি ঠিক একটি দুষ্টু ছেলের মতনই। বারবার টেবিল বদলে সে এর ওর মদের গেলাস কেড়ে নিচ্ছে, জ্বলন্ত সিগারেট তুলে নিচ্ছে অন্যের আঙুল থেকে, ওখানে বসেই গাঁজা টানছে। একটি মেয়ের কবিতা পাঠের সময় সে চেঁচিয়ে উঠল, হানি, তুমি আমার লেখা থেকে চারলাইন

চুরি করেছ।

চৌষট্টি সালে নিউ ইয়র্কে অ্যালেনের অ্যাপার্টমেন্টে যখন আমি দিন কতক কাটিয়ে গিয়েছিলাম, তখন গ্রেগরিকে এইরকমই দেখেছি। তখন তার কোনও রোজগার ছিল না, সে ছিল অ্যালেনের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। অ্যালেন অবশ্য খাওয়া-দাওয়া থাকার বিনিময়ে তাকে দিয়ে ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজার কাজ করাত। গ্রেগরি একদিন আমার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে পালিয়েছিল। এবারে তার সঙ্গে অ্যালেন যখন নতুন করে পরিচয় করিয়ে দিল তখন দেখা গেল তার সেই ঘটনাটা ঠিক মনে আছে। সে বলল, ও তুমিই সেই ভারতীয় ছোকরা কবি যার কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিয়েছিলাম? তারপর সে আমার কাঁধ চাপড়ে বলল, দেব, দেব, একদিন না একদিন তোমার ধার আমি ঠিক শোধ দেব! আমি বললুম, না, গ্রেগরি আমি তোমাকে সারা জীবন ঋণী রাখতে চাই!

ভারতীয় কবিদের মধ্যে এ কে রামানুজন-এর অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইনি ইংরিজি ভাষাতে লেখেন। কিন্তু যেহেতু এখানে তামিল কবিতার কোনও প্রতিনিধিত্ব নেই, তাই তিনি নিজের কবিতা পাঠ করার আগে আগে প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত তামিল কবিতার ধারার নির্বাচিত কিছু কিছু অংশ পাঠ করে তার ইংরিজি অনুবাদ শোনালেন। আমি মনে মনে ভাবলুম, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে যারা সব ইংরিজিওয়ালা, যারা শুধু ইংরিজিতে লেখে, তাদের কারুর এরকম মাতৃভাষা প্রীতি তো দেখি না! অবশ্য, আমার এই ধারণাটি মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে, ক'দিন পরেই আমি এরকম বাঙালি দেখেছি! সব কিছুরই ব্যতিক্রম আছে।

আমার কবিতার অনুবাদগুলি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ নিজে পাঠ করছে শুনে প্রথমে আমি বেশ বিব্রত বোধ করেছিলাম। সে এখন এত খ্যাতিমান কবি, সে কেন অন্যের কবিতা পড়তে যাবে? এ যেন বন্ধুত্বের খাতিরে অতিরিক্ত দাবি। আমি তাকে বললুম, অ্যালেন, তোমার পড়বার দরকার নেই, অন্য যে-কেউ পড়ে দিক না। কিন্তু অ্যালেন তা শুনল না। সে তার ভরাট, সুন্দর কণ্ঠস্বরে আমার দুর্বল কবিতাগুলি সুখশ্রাব্য করে দিল।

অ্যালেন নিজের কবিতা পড়বার আগে হারমোনিয়াম বাজিয়ে জুড়ে দিল গান। এই ছোট হারমোনিয়ামটি সে ভারত থেকে নিয়ে গেছে। ইদানীং গানের দিকে খুব-ঝোঁক গেছে তার, অবশ্য গায়কদের মতন তার গলা যে সুরেলা তা নয়, কিন্তু তালজ্ঞান আছে। বৈদিক মন্ত্র যেমন গাওয়া হয়, সে তার কোনও-কোনও কবিতা সেইভাবে উচ্চারণ করতে চায়। প্রথম একটি গানের পর বাকি কবিতাগুলি সে পড়ল স্বাভাবিক কবিতা পাঠের ভঙ্গিতে। সে তার আশু প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি থেকে নতুন কবিতা পাঠ করে শোনাল, কবিতাগুলির মধ্যে তার মায়ের কথা ঘুরে-ঘুরে এসেছে। অনেক আগে সে তার কাব্যগ্রন্থ 'কাদিস' মূলত তার মা নাওমি-কে নিয়েই লিখেছিল। এখন তার কবিতার ভাষা অনেক সংহত, আগে সে মাঝে-মাঝেই চমকে দেওয়ার জন্য দু-একটি কাঁচা গালাগালির শব্দ ব্যবহার করত, এখন তা একেবারেই নেই। এখন তার লাইনগুলিতে ফুটে ওঠে ছোট ছোট ছবি এবং সেই সব ছবি ছাপিয়েও যা ফুটে ওঠে, তা হল একটি বিশ্ব-নাগরিক মন। তার কবিতা একেবারেই দুর্বোধ্য নয়। নিছক শব্দ নিয়ে খেলা, কিংবা বিনি সুতোর মালার মতন কবিতা ওদেশে অচল হয়ে গেছে। অ্যালেনের কবিতায় স্পষ্ট বোঝা যায় এক কবির ক্ষোভ ও বিষাদ চার পাশের বাস্তব জীবন সম্পর্কে কবির অভিমত এবং মাঝে মাঝেই বাস্তবতা থেকে উত্তরণ।

কবিতা পাঠের পর প্রতিদিনই আমরা অনেক রাত পর্যন্ত কোথাও না কোথাও আড্ডা দিতাম। কোনওদিন কোনও ভারতীয় রেস্তোরাঁয়, কোনওদিন চিনা খাবারের দোকানে, কোনওদিন আমার হোটেলের ঘরে। আমার কাছে একটি উপহার-পাওয়া শ্যাম্পেনের বোতল ছিল। প্রথম দিনই সেটা খুলে ফেলা হল। অ্যালেন মদ ছোঁয় না আর গ্রেগরির বোতল ফুরিয়ে ফেলার জন্য খুবই ব্যস্ততা।

ভারতীয় কবির দলের মধ্যে দু'তিনজন কট্টর নিরামিষাশী, কিন্তু মদ্যপানে তাঁদের কারুর অনীহা নেই। কয়েকজন শিল্পীও এসে জুটে গিয়েছিলেন দলে, ছোট ঘরে সকলের বসার জায়গা হয় না, যে-সেখানে পারে একটু স্থান করে নেয়, আড্ডা রাত দুটো-আড়াইটে পর্যন্ত গড়িয়ে যায়।

একদিন আমরা খবর পেলাম যে হিন্দি ভাষায় বিশিষ্ট কবি শ্রীকান্ত ভার্মা গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় রয়েছেন নিউ ইয়র্কেরই হাসপাতালে। কবিতা পাঠের পর তাড়াতাড়ি এক পার্টি সেরে আমরা কয়েকজন দেখতে গেলাম তাঁকে। অ্যালেনের সঙ্গে শ্রীকান্তের পরিচয় নেই, তবু সে-ও যেতে চাইল। ছিপ ছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, তারই মধ্যে আমরা হাঁটতে-হাঁটতে গেলুম সাত আট ব্লক; শ্রীকান্ত তখন অচৈতন্য, আমরা দেখা করে এলুম তাঁর স্ত্রী ও আত্মীয়দের সঙ্গে। আমরা যখন কথা বলছিলুম তখন অ্যালেন চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল একপাশে। শ্রীকান্ত জানতেও পারল না যে আমেরিকার প্রধান কবি এসেছিল তাকে শুভেচ্ছা জানাতে।

মিউজিয়াম অফ মর্ডান আর্টসে তিনরাত্রি কবিতা পাঠের আসরের পর তিনদিন বাদ দিয়ে আবার কবিতা পাঠের ব্যবস্থা শনিবার দুপুরে সেন্ট্রাল পার্কে। দৈত্যাকার নিউ ইয়র্ক শহরের ফুসফুস এই সেন্ট্রাল পার্ক। আমাদের কলকাতার ময়দানের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, তবে অনেকগুণ বড় এবং ভেতরে নানারকম উদ্যান ও জলাশয় রয়েছে। মুক্তাঙ্গনে কবিতাপাঠ এদেশে অভিনব, এই আইডিয়াটিও অ্যালেনের।

শনিবারের দুপুরটি চমৎকার। ঝলমল করছে রোদ, শীত কমে গেছে। এ দেশে সবাই এমন দিনের জন্য মুখিয়ে থাকে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আজকের কবিতাপাঠ পুরোপুরি ভারতীয় কবিদের। এমন দিনটিতে কিন্তু শ্রোতার সংখ্যা আশানুরূপ নয়। এসব উপভোগ্য দিনে কার আর কবিতা শোনার দায় পড়েছে। আজ শ্রোতাদের মধ্যে বিদেশিদের সংখ্যাই বেশি, বিদেশি বলতে অবশ্যই ভারতীয়, তাদের মধেও বেশ কিছু সুন্দরী বঙ্গললনাদের দেখতে পাওয়া গেল। আর কিছু আমেরিকান এসেছেন, যাঁদের সঙ্গে ভারতের কিছু না কিছু যোগাযোগ আছে, নানা কাজে ভারতে গেছেন, কেউ কেউ বাংলা বা হিন্দিও জানেন।

প্রথমে পার্ক সমূহের পরিচালক আমাদের প্রতি স্বাগত ভাষণ দিলেন। অ্যালেনের পরিচয় জানাতে গিয়ে তিনি বললেন, অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এযুগের ওয়াল্ট হুইটম্যান!

অ্যালেনের আজ নিজস্ব কবিতা পাঠ নেই, সে শুধু আমার অনুবাদগুলি পড়বে। তার আগে সেও আমাদের স্বাগত জানাল চমকপ্রদ উপায়ে। সঙ্গে রয়েছে সেই ছোট হারমোনিয়ামটি, সেটি বাজাতে বাজাতে সে একটি গান জুড়ে দিল। তার ভাষা অনেকটা এইরকম—

মার্কিন দেশ সারা দুনিয়ায়
পাঠায় অস্ত্র এবং খাদ্য
অস্ত্রই বেশি খাবার দু-মুঠো
যদিও রয়েছে অনেক সাধ্য...
ভারতবর্ষ থেকে এসেছেন
বন্ধুরা, কিছু শোনাবেন আজ
ক্রোধের কবিতা, প্রেমের কবিতা,
ইতিহাসে মেশা মায়া কারুকাজ...

লম্বা গানটি শেষ করার পর প্রচুর হাততালি পড়ল। আমি অ্যালেনকে জিগ্যেস করলুম, তুমি কি গানটি আগে থেকে বানিয়েছিলে? অ্যালেন হেসে বলল, না এই মাত্র বানালুম। শুকনো বক্তৃতার থেকে গান ভালো না? কোথাও কিছু বলবার থাকলে আমি আজকাল গান গেয়ে বলি,

আগে থেকে কিছু ভাবি না, যা মনে আসে, প্রথম লাইনটি গাইতে গাইতেই দ্বিতীয় লাইনেই মিল ঠিক এসে যায়। আমার বৌদ্ধ গুরু শিখিয়েছেন যে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে যা মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সেইটাই খাঁটি।

এদিনের কবিতা পাঠে অংশ নিলেন মোট ছ'জন। সবচেয়ে বেশি উপভোগ্য হল দুজনের। নবনীতা আগের দিনের মতনই তার সহাস্য উপস্থিতিতে কবিতাগুলি পড়তে-পড়তে শ্রোতাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে মুগ্ধ করে দিলেন সকলকে। আর শেষ কবি ছিলেন গোপালকৃষ্ণ আদিগা, তিনি প্রবীণ মানুষ, তাঁর কবিতাগুলিও দীর্ঘ, অনুষ্ঠান বেশ দেরিতে শুরু হওয়ায় তিনি যখন কবিতা পড়তে এলেন তখন বিকাল গড়িয়ে এসেছে, শ্রোত-দর্শক কম। কবিতা পাঠের সময় তাঁর তন্ময়তা সত্যি দেখবার মতন! যারা চলে গেল, তারা বঞ্চিত হল।

নিউইয়র্ক ছেড়ে আমাদের দলটি বেরিয়ে পড়ল অন্যান্য শহর সফরে। দুটি গাড়িতে যাত্রা, সদস্য সংখ্যা মোট ন'জন, শ্রীযুক্ত আদিগা তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে এনেছেন, এবং কমিটি ফর ইন্টারন্যাশন্যাল পোয়েট্রির দু'জন প্রতিনিধি মার্ক নেসডর এবং জো সুলেমান নামে একজন প্রাক্তন টার্কিস যুবক, ওই দু'জনই গাড়ির চালক। ঢাউস গাড়ি, জায়গার কোনও অকুলান নেই। আমাদের প্রথম গন্তব্য বলটিমোর, প্রায় চার ঘণ্টার পথ।

এইসব দেশের হাইওয়েগুলি অত্যন্ত একঘেয়ে। এমনভাবে তৈরি করা যাতে কোনও শহরের বিন্দু বিসর্গও চোখে না পড়ে, শহরগুলির নাম দেখা যায় শুধু ট্রাফিক সাইনে। দুপাশে শুধু মাঠ বা জঙ্গল, গাড়ির গতি পঞ্চান্ন মাইলে বাঁধা, দৃশ্যবৈচিত্র্য নেই বলে খানিকবাদে ঘুম পেয়ে যায়, কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারেরও যাতে ঘুম না আসে সে চিন্তাও মাথায় থাকে!

বলটিমোরে আমরা উঠলুম একটি নিরিবিলি ছোট হোটেলে, যার লিফটখানা বোধহয় সিভিল ওয়ারের আমলের। বৃদ্ধ মালিকটির সৌজন্য খুব আন্তরিক মনে হয়। এখানকার তরুণ-তরুণী কবিরা অপেক্ষা করছিলেন আমাদের জন্য, এঁরা আমাদের কবিতার অনুবাদগুলি পড়বেন। কবিতার মধ্যে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ কিংবা ভারতীয় নামের উচ্চারণ নিয়ে খানিকটা আলোচনা হল। আমার একটি কবিতার মধ্যে, ময়দান, চৌরঙ্গি, বড়বাজার এইসব শব্দ ছিল, সেগুলির উচ্চারণ বুঝতে আমার অনুবাদ-পাঠকের বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। অ্যালেন গিন্‌সবার্গের সে অসুবিধে হয়নি, কারণ সে কলকাতা এসে অনেকদিন থেকে গেছে। এই যুবকটি দিনের বেলা একটি গাড়ি-কোম্পানিতে সেল্‌সম্যানের কাজ করে, রাত্তিরবেলা কবিতা লেখে ও একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনায় সাহায্য করে। উর্দু কবিতার অনুবাদ পাঠ করবে একটি কৃষ্ণাঙ্গ তরুণী, সে স্কুল-শিক্ষিকার কাজ করে। অন্যান্যদের সঙ্গেও মৃদু আলাপ হল।

এখানে অনুষ্ঠান হবে দুদিন, মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি হলে। এখানকার ভারতীয়দের একটি প্রতিষ্ঠান এর সহ-উদ্যোক্তা। দর্শকদের মধ্যেও ভারতীয়দের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি। চেনাশুনো কিছু বাঙালির সঙ্গে দেখা হল, তাদের মধ্যে রয়েছেন রমেন পাইন ও তাঁর স্ত্রী জুলি। ওঁরা এসেছেন একশো মাইলের ওপর গাড়ি চালিয়ে। আমার কবিতা পাঠ প্রথম দিনেই, তা শেষ হওয়ার পরই রমেন ও জুলি ধরে নিয়ে গেলেন তাঁদের বাড়িতে, রাত বারোটার পর সেখানে পৌঁছে প্রায় শেষ রাত্তির পর্যন্ত আড্ডা হল।

আমেরিকায় ভারত উৎসব হচ্ছে দেড় বছর ধরে, বিভিন্ন শহরে, বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে। তবে ভারত সরকারের পক্ষে অন্য দেশে, বিশেষ করে মার্কিন দেশের মতন খরচ সাপেক্ষ দেশের নানান শহরে অনুষ্ঠান-উৎসব-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দুঃসাধ্য সেইজন্য আমেরিকার বিভিন্ন সমিতি, মিউজিয়াম ও অন্যান্য বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে হয়েছে। কবিতা পাঠের

অনুষ্ঠানগুলির দায়িত্ব নিয়েছে কমিটি ফর ইন্টারন্যাশন্যাল পোয়েট্রি, কিন্তু তাদের বেশি টাকা নেই, সুতরাং তারাও সহযোগিতার জন্য আবেদন জানিয়েছিল নানান শহরের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের কাছে। কবিতার ব্যাপার সবাই সাড়া দেয় না। বলটিমোরের পাশেই আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটন ডি সি, সেখানে ভারতীয় কবিতা পাঠের কোনও ব্যবস্থা হয়নি। শিকাগো কিংবা সানফ্রান্সিসকোর মতন বড় শহর থেকেও কোনও ডাক আসেনি। আবার নেমন্তন্ন এসেছে কয়েকটি অপ্রত্যাশিত জায়গা থেকে। যেমন নিউ মেক্সিকোর সান্টা ফে। আমাদের পরবর্তী আসর সেখানে।

আমেরিকার এক প্রান্তবর্তী রাজ্য নিউ মেক্সিকোর রাজধানী আলবুকার্কি, সেখান থেকে ষাট-সত্তর মাইল দূরে সান্টা ফে শহর। শহরটি ছোট, কিন্তু উচ্চাঙ্গের নিসর্গচিত্রের মতন সুন্দর। এখানে আমি আগে কখনও আসিনি।

বলটিমোর থেকে আমরা আলবুকার্কি এলাম বিমানে। আমেরিকার মধ্যে এক শহর থেকে অন্য শহরে বিমান যাত্রা এখন বেশ মজার হয়েছে। অনেকগুলি বেসরকারি বিমান কোম্পানি পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় মত্ত। সেই জন্য তারা পাল্লা দিয়ে ভাড়াও কমাচ্ছে। অনেক সস্তার ফ্লাইটের নাম হয়েছে পিপ্‌লস এক্সপ্রেস। আগে থেকে টিকিট ফিকিট কাটার দরকার নেই। ফ্লাইটের দশ-পনেরো মিনিট আগে বিমান বন্দরে এসে টিকিট কেটে চড়ে বসলেই হয়। এমনকী এক মিনিট আগে এসে, টিকিট না কেটেও দৌড়ে এসে উঠে পড়া যায়। মাঝপথে ভাড়া নিয়ে নেবে। বিমানযাত্রা ব্যাপারটা এরা প্রায় জল-ভাত করে ফেলেছে।

আলবুকার্কি শহরে আমাদের অভ্যর্থনার জন্য বিরাট কোনও দল ছিল না, ছিল একটিমাত্র রোগা-পাতলা, প্যান্ট-শার্ট পরা নিরীহ চেহারার, লাজুক-লাজুক তরুণী। তার নাম লিন্ডা। সেই মেয়েটি যে একাই একশো তা বুঝেছিলুম কিছু পরে।

লিন্ডা আমাদের জন্য একটা পেল্লায় স্টেশান-ওয়াগান ভাড়া করে রেখেছে এবং সে সঙ্গে এনেছে তার নিজস্ব একটি ছোট ট্রাক। তার ট্রাকে চাপানো হল আমাদের মালপত্র, যাত্রীরা চাপল স্টেশান ওয়াগনটিতে। লিন্ডা আগে আগে তার ট্রাক চালিয়ে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল।

পথে যেতে-যেতে দেকা যায় দূরের পাহাড়। আমরা এসে পড়েছি রকি মাউন্টেনের এলাকায়। এক জায়গায় দেখি লেখা আছে যে পৃথিবীর দীর্ঘতম ট্রাম লাইন এই দিকে। এখানে ট্রাম লাইন? আমাদের সারথিকে প্রশ্ন করে জানা গেল যে, এই ট্রাম চলে শূন্যপথে, অর্থাৎ আমরা যাকে রোপওয়ে বলি, সেইরকম ঝোলানো ডুলি বসানো রোপওয়ে চলে গেছে পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

আমরাও যে ক্রমশ উঁচু দিয়ে উঠছি তা বোঝা যায় একটু একটু শীতে। সান্টা ফে শহরটির উচ্চতা প্রায় সাত হাজার ফিট, অর্থাৎ দার্জিলিং-এর চেয়েও উঁচুতে, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তেমন ঠান্ডা নেই।

এই শহরে আমাদের থাকার জায়গাটি এতই সুন্দর যে অবিশ্বাস্য মনে হয়। ঠিক যেন সিনেমা-সিনেমা। একটা টিলার ওপরে অনেকগুলি বাড়ির গুচ্ছ, একে হোটেলও বলা যায়, হোটেলের মতন নয়ও। এগুলির নাম কনডিমিনিয়াম। প্রত্যেকটি স্বয়ং সম্পূর্ণ আলাদা বাড়ি, একতলায় সুসজ্জিত বসবার ঘর, দোতলায় দুটি শয়নকক্ষ, সংলগ্ন দু'টি বাথরুম। রান্নাঘরে বৈদ্যুতিক উনুনের পাশে অতি আধুনিক মাইক্রো ওয়েভ যন্ত্রও রয়েছে। ওপরের তাকে সাজানো রয়েছে সাতরকম চা, তিনরকম কফি, দুরকম চিনি, দুরকম দুধ, কয়েকরকম বিস্কুট এবং অনেক রকম মশলা। কেউ এখানে সপরিবারে ছুটি কাটাতে এসে সাতদিন, দশদিন, এক মাসও থেকে যেতে পারে। খরচ নিশ্চয়ই সাংঘাতিক। বসবার ঘরের আসবাবগুলি পুরোনো-পুরোনো, মস্ত বড় সোফা, নড়বড়ে কাঠের আলমারি, পোর্সিলিনের অ্যাশট্রে, দেখলেই বোঝা যায় এগুলি অ্যান্টিক, অর্থাৎ খুব দামি। আমাদের প্রত্যেকের জন্য এরকম এক একটি বাড়ি, কোনও লোকজন নেই, দরজায় চাবি নেই, দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম, তারপর সব কিছু নিজস্ব।

পরে জেনেছিলুম, ওই লিন্ডা নামের রোগা টিংটিংয়ে মেয়েটি এই কনডিমিনিয়াদের মালিকের কাছে কবিতার নাম করে বুঝিয়েসুঝিয়ে এগুলি আমাদের জন্য বিনা পয়সায় আদায় করেছে।

সান্টা ফে-র একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালিকা এই লিন্ডা থর্প। লোকের কাছে চেয়েচিন্তে, চাঁদা তুলে এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলা হয়েছে। অনেকখানি জমির ওপরে বাড়ি, ভেতরে রয়েছে মাঝারি আকারের একটি রঙ্গমঞ্চ ও দোতলা প্রদর্শনী কক্ষ। এখানে নিয়মিত কবিতা পাঠ, সাহিত্য আলোচনা, পরীক্ষামূলক নাটক, ছবি ও ফটোগ্রাফি প্রদর্শনী হয় নিয়মিত, লিন্ডার সহকারী রয়েছে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে। তরুণ লেখক-শিল্পী-নাট্যকর্মীরা প্রায়ই আসে এখানে আড্ডা জমাতে। এখানে আমাদের কবিতা পাঠের আসরে ভারতীয় শ্রোতার সংখ্যা নগণ্য। তিন চারজনের বেশি নয়, বাকি সবাই আমেরিকান, তারা প্রায় সকলেই লেখা বা অনুবাদের ব্যাপারে জড়িত। এখানে একজনও বাঙালি দেখিনি। সান্টা ফে-ই একমাত্র আমেরিকান শহর যেখানে কোনও বাঙালির সঙ্গে আমার পরিচয় হল না। যদিও আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর এমন কোনও জায়গা থাকতে পারে না, যেখানে বাঙালি নেই।

সান্টা ফে শহরটি দৃশ্যতই অন্যান্য শহরের থেকে আলাদা। অধিকাংশ বাড়ির সামনেই উঁচু মাটির দেয়াল, সেই মাটি গেরুয়া রঙের। কোনও-কোনও বাড়ির সামনের বাগানে কঞ্চির বেড়া। এসবই পুরোনো স্প্যানিশ কায়দা। বাড়িগুলির মধ্যে আধুনিকতম আরামের ব্যবস্থা ও যন্ত্রপাতি সবই রয়েছে। এগুলিকে অ্যাডোবি স্টাইলের বাড়ি বলে, বেশ খরচসাধ্য ব্যাপার, যদিও হঠাৎ যেন আমাদের রাঁচি-হাজারিবাগের কিছু-কিছু বাড়ির সঙ্গে মিল খুঁজে পাই।

শহরটি ছোট, কেন্দ্রীয় বাজারের ফুটপাথে এখানকার ইন্ডিয়ানরা পশরা সাজিয়ে বসে থাকে, নানারকম পাথরের মালা, অলঙ্কার, পুতুল ও জামা-কাপড়। দর করতে গিয়ে দেখি আগুন দাম, দার্জিলিং-এ যেরকম ঝুটো পাথর পাওয়া যায়, সেইরকম একটি মালার দাম হাজার টাকা। এসবই বড়লোক টুরিস্ট-ভোগ্য জিনিস।

কাছাকাছি পঞ্চাশ-একশো মাইলের আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের রিজার্ভ আছে। একদিন সকালে সেদিকে বেরিয়ে পড়া গেল সদলবলে। সুন্দর পাহাড়ি পথ, পাশ দিয়ে দিয়ে একটি নদী চলেছে, সেই নদীটিই ঢুকে গেছে মেক্সিকোতে। এখানেই ব্রিটিশ লেখক ডি এইচ লরেন্সের একটি র‍্যাঞ্চ আছে। লরেন্সের এক আমেরিকান প্রেমিকা তাঁকে এই র‍্যাঞ্চটি উপহার দিয়েছিল। র‍্যাঞ্চটি এখনও লরেন্সের নামেই আছে, যদিও বর্তমানে সেটির মালিকানা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিউ মেক্সিকো বিশ্ববিদ্যালয়ের।

আমরা প্রথমে রওনা দিলুম সেদিকে। পথের দুপাশে আরও অনেক র‍্যাঞ্চ পড়ল, দৃশ্যগুলি খুব পরিচিত মনে হয়। জন ওয়েন, গ্যারি কুপার অভিনীত অনেক ওয়েস্টার্ন ছবিতে আমরা এইসব দৃশ্য দেখেছি। শোনা গেল সত্যিই অনেক ওয়েস্টার্ন ছবির শুটিং হয়েছে এখানে।

লরেন্সের র‍্যাঞ্চটি আহামরি কিছু নয়। এখনও সেখানে পশু পালন ও চাষবাস চলছে, কিন্তু বিস্ময়কর লাগল লরেন্সের সমাধি মন্দির দেখে। লরেন্সের মৃত্যু হয় প্যারিসে, কিন্তু কবর দেওয়ার বদলে তাকে পোড়ানো হয়েছিল, তাঁর ছাই এনে রাখা হয়েছে এখানে, তার ওপরে মন্দিরের মতন একটা ঘর বানানো হয়েছে। লরেন্সের এই স্মৃতি-মন্দিরের অস্তিত্বের কথা আমার জানা ছিল না। ফারুকি এবং অশোক বাজপেয়ী দুজনেই লরেন্সের খুব ভক্ত, মাঝে-মাঝেই লরেন্সের কবিতার লাইন বলতে লাগল।

সেখান থেকে ফেরার পথে আদিবাসী ইন্ডিয়ানদের রিজার্ভ দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে লিন্ডা খুঁতখুঁত করতে লাগল। সে মৃদু স্বরে কথা বলে, টুরিস্টরা দলে-দলে গিয়ে ওদের বিরক্ত করে। এই ব্যাপারটা লিন্ডার পছন্দ নয়। ওরা কি চিড়িয়াখানার জীবজন্তু? আমি সঙ্গে-সঙ্গে লিন্ডার সঙ্গে একমত হলাম। এইভাবে গাঁকগাঁক করে গাড়ি হাঁকিয়ে আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে উৎপাত করা অত্যন্ত

অরুচিকর। সুতরাং সেদিকে না গিয়ে আমরা পথের পাশে একটি ছোট শহরে মধ্যাহ্ন ভোজন করে অলসভাবে পায়ে হেঁটে ঘুরে খানিকটা সময় কাটিয়ে দিলাম।

সান্টা ফে-তে পৌঁছেই শুনেছিলাম এখানে একটি ভারতীয় দম্পতি আমাদের অগ্রিম নৈশভোজের নেমন্তন্ন করে রেখেছেন। দুই সন্ধ্যার কবিতাপাঠের আসরে কিন্তু সেই দম্পতির একজনেরও দেখা পাইনি। এইরকম নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা লাগে। কিন্তু সকলেই যাচ্ছে বলে আমাকেও যেতে হল। উপস্থিত হয়ে দেখলাম, তারা বিচিত্র ভারতীয়। ভদ্রমহিলাটি আফগানিস্তানের মেয়ে, তবে বেশ কয়েক বছর দিল্লিতে থেকে নাচ শিখেছেন, এখানে ভারতীয় নাচের ইস্কুল খুলেছেন। স্বামীটি পুরো দস্তুর আমেরিকান, যদিও সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা, পায়ে কোলাপুরি চটি, সে সেতার বাজায়, ভারতে অনেকবার এসেছে, কলকাতায় থেকে গেছে এক বছর, কিছুদিন নিখিল ব্যানার্জির কাছে নাড়া বেঁধেছিল। স্ত্রীর তুলনায় স্বামীটিকে অনেক কমবয়স্ক মনে হয়। এই যুবকটির মতন এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও অহংকারী মুখ আমি কমই দেখেছি। আমি এখন তার বাড়ির দরজা দিয়ে ঢুকছি, আমাদের নাম শুনেই সে বলে দিতে লাগল আমরা কে কোন্ ভাষায় লিখি। তার সঙ্গে কথা বলতে গেলে সে পুরো বাক্যটি শেষ করতে দেয় না, মাঝপথেই বুঝে নিয়ে সে টক করে উত্তর দিয়ে দেয়। এরকম লোকের সঙ্গে কথা চালানো মুশকিল। অবশ্য সে কীরকম সেতার বাজায় তা জানা গেল না।

এ বাড়িতে খাবারের ব্যবস্থা অভিনব। প্রথমে সুরা পরিবেশন করা হল আমেরিকান কায়দায়, কিন্তু ডিনারের স্টাইলটি সম্ভবত আফগানি। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে ওই দম্পতির একমাত্র কন্যা, ষোলো-সতেরো বছর বয়েস বয়েস, তার হাতে একটি জলের ঝারি ও তোয়ালে। সে প্রতিটি অতিথির হাত ধুইয়ে-মুছিয়ে দিচ্ছে। ঘরে কোনও চেয়ার টেবিল নেই। কার্পেটের ওপর বড় বড় পেতলের পরাত, তার কোনওটাতে বিরিয়ানি-গোস্ত, কোনওটাতে রুটি, স্যালাড, আচার ইত্যাদি। প্রত্যেকের হাতে একটি করে প্লেট তুলে দেওয়া হল, কাঁটা-চামচের কোনও বালাই নেই, ওইসব পরাত থেকে যার যা ইচ্ছে খাবার তুলে খেতে হবে, দ্বিতীয়বার তুলতে হলে এঁটো হাতেই চলবে। এই ব্যবস্থায় আমাদের কোনও অসুবিধে নেই, কিন্তু সাহেব-মেমদের কারুর হাত দিয়ে খেতে গিয়ে বেশ বে-কায়দায় পড়তে হল। আমার পাশেই একজন একজন দীর্ঘকায় প্রবীণ ব্যক্তি বসেছিলেন, তিনি একজন খ্যাতনামা অনুবাদক, বললেন, কী আশ্চর্য কথা, আমরা কাঁটা-চামচে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এমনকী চাইনিজদের মতন চপস্টিক দিয়েও খেতে পারি, কিন্তু হাত দিয়ে খেতে ভুলে গেছি।

আমি ভদ্রলোকের চোখের দিকে তাকিয়ে, মনে-মনে বললুম, ন্যাকামি! আমাদের প্র-পূর্বপুরুষ বাঁদরদের অনেক দোষ-গুণ এখনও আমাদের মধ্যে রয়ে গেছে, এমনকী সাহেবদের মধ্যেও রয়েছে, শুধু হাত দিয়ে খাওয়াটাই ওরা ভুলে গেছে, তা কি বিশ্বাসযোগ্য?

সান্টা ফে ছাড়ার সময় মনে হল, এই শহরটিতে আরও দু-চারদিন থেকে যেতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু উপায় নেই। এর পরেই থেকে যেতে হবে লস এঞ্জেলিসে। আবার প্লেন ধরতে হবে।

রকি পর্বতমালার ওপর দিকে উড়ে আমরা লস এঞ্জেলিসে এসে পৌঁছলুম বিকেলের দিকে। আমাদের জন্য হিলটন হোটেলে জায়গা ঠিক করা আছে, কাছেই দক্ষিণ ক্যালিফের্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছড়ানো ক্যাম্পাস। সারা সন্ধে কিছুই করার নেই, ঘরে বসে টিভি দেখা ছাড়া।

আমাদের দলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ সদস্য শ্রীযুক্ত আদিগা এত ঘোরাঘুরিতে কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তা ছাড়া দক্ষিণ ভারতীয় খাবার ছাড়া অন্যকিছু তাঁর মুখে রোচে না। তাঁর স্ত্রী হয় ইংরিজি জানেন না অথবা খুবই লাজুক, তাঁর মুখ দিয়ে আমরা একটা-দুটোর বেশি শব্দ শুনিনি। আদিগা এক সময় ইংরিজির অধ্যাপক ছিলেন, একটি কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে রিটায়ার করেছেন। এমনিতে

বেশ রসিক মানুষ, কিন্তু উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে কাতর হয়ে আছেন বলে তাঁকে আড্ডায় পাওয়া যায় না।

অশোক বাজপেয়ীর সঙ্গে ভারত সরকারের কয়েকজন কর্মচারী দেখা করতে এল, তারপর ওরা একসঙ্গে কোথায় যেন গেল, অরুণ কোলাটকর গেল ওদের সঙ্গে। শামসুর রহমান ফারুকিও পেশায় রাজ কর্মচারী, আই এ এস, ভারত সরকারের কোনও দফতরের যুগ্ম সচিব, তার স্বভাবটি ঠিক আড্ডাবাজ ধরনের নয়, সে গেছে তাদের সঙ্গে দেখা করতে।

বাকি রইল কেদারনাথ সিং। তার জীবিকা যদিও অধ্যাপনা, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দি পড়ায়, কিন্তু মানুষটি লাজুক প্রকৃতির, এই প্রথম তার বিদেশ সফর। একা একা সে রাস্তায় বেরুতে চায় না, তা ছাড়া কে যেন আগে থেকেই তাকে সাবধান করে দিয়েছে যে লস এঞ্জেলিসের পথেঘাটে গুন্ডা ঘুরে বেড়ায়, সন্ধের পর মোটেই নিরাপদ নয়।

এই হোটেলের ব্যবস্থাপনা এমনিতে ভালো হলেও, এখানে এখন আংশিক ধর্মঘট চলছে, তাই ঘরে বসে এক কাপ কফি পাওয়ারও উপায় নেই। কেদারনাথ বলল, খুব কফি খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু কাছাকাছি কোথাও কি হেঁটে যাওয়া যেতে পারে? ভয়ের কিছু আছে? তুমি তো আগে এসেছ, তুমি এখানকার রাস্তা চেনো, একটু যাবে আমার সঙ্গে?

আমি লস এঞ্জেলিসে আগে দুবার এসেছি বটে কিন্তু এখানকার রাস্তা চিনি না, এই প্রকাণ্ড শহরের দিশে পাওয়া খুব শক্ত। তবে খানিকটা হেঁটে আসা যেতে পারে।

কেদার জিগ্যেস করল, এখানকার রাস্তা দিয়ে হাঁটা নিরাপদ তো?

আমি হেসে বললুম, তা বলে কি সব সময় ছুরি মারামারি হচ্ছে?

কলকাতা-দিল্লির রাস্তায় কি গুন্ডামি হয় না? এখানে তার চেয়ে একটু বেশি হয় হয়তো! রাস্তা যথারীতি পথচারী বর্জিত। চলন্ত গাড়ি ছাড়া মানুষের মুখ দেখা যায় না। শন শন করে বইছে ঠান্ডা হাওয়া, বেড়াবার পক্ষে সময়টা তেমন উপযোগী নয়। খানিক দূর গিয়েই ফিরতে হল। ফেরার পথে এক রাস্তার মোড়ে দুটি লোক হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে এসে ভুরু নাচিয়ে জিগ্যেস করল, লাগবে? লাগবে?

আমি মাথা নেড়ে অসম্মতি জানাতে তারা খুব অবাক। কোকেন বা গাঁজার অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য ছাড়া দুটি ব্যাটাছেলে শুধু শুধু রাস্তা দিয়ে হাঁটছে কেন?

এর পরে একটা কফির দোকানে বসে সময় কাটানো গেল কিছুক্ষণ। সেই দোকানে ভাত পাওয়া যায় শুনে কেদার খুব খুশি। সে নিরামিষ খায়, ম্লেচ্ছ খাদ্যে তার খুব অসুবিধে।

পরের দিন আবহাওয়া খুব ভালো হয়ে গেল। ঝকঝকে রোদ, শীতের চিহ্নমাত্র নেই। এমন দিনে সাহেব-মেমরা বাইরে বেরিয়ে পড়ে, সমুদ্রের ধারে গিয়ে শুয়ে থাকে, সেইজন্যই বোধহয় সন্ধেবেলা কবিতা পাঠের আসরে আশানুরূপ শ্রোতা হল না। কিন্তু ছোট আসরে কবিতা পাঠ বেশ জমে গেল।

সে রাত্রে আমার আর হোটেলে ফেরা হল না, একশো মাইল দূর থেকে এসেছে ডাক্তার মদন মুখোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী ডলি, তাদের সঙ্গে চলে গেলুম বেকারস ফিল্ডে। মদন মুখোপাধ্যায় এদেশে আছে অনেকদিন, প্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, এমন ভদ্র ও সজ্জন খুব কম দেখা যায়। তার স্ত্রী ডলিও যেমন হাসিখুশি, তেমনই কাজের মেয়ে ও অতিথিপরায়ণ, এই চমৎকার দম্পতির বাড়িতে আমি আগেও এসে থেকে গেছি।

লস এঞ্জেলিসে দ্রষ্টব্য জিনিস বহু আছে, কিন্তু আমার সেদিকে মন ছিল না। এখানে দ্বিতীয় দিনটা সারাদিনই ফাঁকা পাওয়া গিয়েছিল, আমাদের দলের অন্য কবিরা বেড়াতে গেলো, আমি রয়ে গেলুম হোটেলে, আমার মাথায় ধারাবাহিক উপন্যাস 'পূর্ব-পশ্চিমের' ইনস্টলমেন্ট লেখার চিন্তা। না পাঠাতে পারলে সম্পাদকের কাছে বকুনি খেতে হবে। বেড়াতে না গিয়ে আমি হোটেলে বসে

বসে উপন্যাসের কিস্তি লিখব শুনে অন্যান্য কবিরা অবাক। ওরা চলে যাওয়ার পর আমি কাগজ কলম নিয়ে বসে, মনটাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেলুম দুই বাংলায়।

সুতরাং মদনের বাড়ি গেলুম বেশ হালকা মনে, লেখা শেষ হয়ে গেছে। মদন নিজেও দেশ পত্রিকায় নিয়মিত লেখে, ওর ওপরেই ভার দিলুম আমার লেখা ডাকে পাঠাবার। তারপর ওর সঙ্গে বেড়াতে গেলাম পাহাড়ে। সেখানে তার একটি শৈলাবাস আছে, যেটি সারা বছর প্রায় খালিই পড়ে থাকে।

মদন ও ডলি আমাকে লস এঞ্জেলিসে ফিরিয়ে নিয়ে এল সরাসরি এক রেস্তোরাঁয়। এটির নাম ইচি ফুট, এখানে মধ্যাহ্নভোজের সঙ্গে কবিতা পাঠের ব্যবস্থা রয়েছে। শ্রোতারা টিকিট কেটে এসেছে, ভোজন ও কবিতা শ্রবণ একসঙ্গে। আধুনিক ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে প্রত্যেককে কিছু বলার জন্যও অনুরোধ। কিন্তু এখানে, কবিতা পড়তে বা কিছু বলতে আমার মন লাগল না। অনেকটা দায়সারাভাবে চুকিয়ে দিলুম, কেন যেন মনে হচ্ছিল, শ্রোতাদের আগ্রহ কম।

বোলডারে আমাদের আলাদা-আলাদা থাকার ব্যবস্থা, বব রোজেনথাল আমাকে আগেই বলে রেখেছিল যে একটি বাঙালি পরিবার আমাকে রাখতে আগ্রহী। ওখানে পৌঁছবার খানিকটা আগে শুনলুম, সেই বাঙালিটির নাম শুভেন্দু দত্ত। আমি চমৎকৃত ও খুশি। শুভেন্দু আমার ছাত্র বয়সের বন্ধু, বহুদিন দেখা নেই তার সঙ্গে, এখন সে এদেশের খ্যাতিমান অধ্যাপক, সাহেবদের ইঞ্জিনিয়ারিং শেখায়। তার সঙ্গে এরকম অকস্মাৎ যোগাযোগ সত্যি আনন্দের ব্যাপার। শুভেন্দুর এক শ্যালিকাও আফ্রিকা থেকে এ বাড়িতে অতিথি হয়ে আছে। বিশাখা ও বিপাশা নাম্নী দুই তরুণীর সাহচর্যে যেন চোখের নিমেষে কেটে গেল দুটি দিন।

শুভেন্দুদের বাড়িটি পাহাড়ের গায়ে। হিমালয় বেড়াতে গেলে আমরা যেরকম ডাকবাংলোতে থাকি, সেইরকম মনোহর পরিবেশে ওদের বাড়ি। শুভেন্দু আবার একদিন আমাকে নিয়ে গেল কলোরাডোর বিখ্যাত অরণ্যপর্বত নিসর্গ দেখাবার জন্য। সে দৃশ্য বর্ণনা করবার জায়গা এটা নয়। তবে একটা বিস্ময়ের কথা বলতেই হয়। তুষার-ঢাকা এক একটা পাহাড় চূড়ার দিকে এগোতে এগোতে ক্রমশ উঠে গেলাম এগারো হাজার ফিট উচ্চতায়। এত উঁচুতে হাইওয়ে রয়েছে, দুপাশে জমাট বরফের দেয়াল। গাড়ি থেকে নেমে ঘোরাঘুরি করলুম, বরফের গায়ে হাত রাখলুম, আমার গায়ে শুধু একটা হাফ শার্ট, অথচ শীত করল না। এটা কীরকম ভৌগোলিক ধাঁধা কে জানে!

বোলডারে এসে আবার দেখা পেলুম অ্যালেন গিনসবার্গের।

এখানে নরোপা ইনস্টিটিউট নামে একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। সংস্কৃতি কেন্দ্র বলা যায়, যেখানে রয়েছে আধুনিক, অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন একটি বৌদ্ধ গুম্ফা, ধ্যান ও যোগ সাধনার ছোট ছোট কক্ষ, বৌদ্ধ দর্শন এবং সাহিত্য শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা। অ্যালেন এই প্রতিষ্ঠানের শিষ্যও বটে, গুরুও বটে। এখানে সে সন্ধান পেয়েছে তার গুরুর, এখানে যে যোগ ও দর্শনের পাঠ নিয়েছে আবার অনেক বছর ধরে এখানে সাহিত্য পড়িয়েছে। এই জুনে তার শিক্ষকতা শেষ হল, এর পরে সে ব্রুকলিন কলেজে সম্মানিত অতিথি অধ্যাপকের পদ পাচ্ছে।

এই নরোপা ইনস্টিটিউট-ই আমাদের কবিতা পাঠের আমন্ত্রণ জানিয়েছে কলোরাডোতে। দিনের বেলা অ্যালেন নিজেই আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠানটি ঘুরিয়ে দেখাল। বৌদ্ধ গুম্ফাটিতে আমি কয়েকটি বাঁধানো ফটোগ্রাফ দেখলাম, এর আগে আর কোনও গুম্ফায় আমি তা দেখিনি। প্রত্যেক গুম্ফাতেই অনেক পাণ্ডুলিপি থাকে, আমার ধারণা হল, কিছুদিন পর পাণ্ডুলিপির জেরক্স কপিও দেখতে পাব। ধ্যান কক্ষগুলি কোনওটি গোলাপি, কোনওটি নীল, কোনওটি বাদামি রঙের। এক এক রকম মানসিক অবস্থার জন্য এক এক রঙের কক্ষ নির্দিষ্ট। একটি ক্লাসরুমে দেখলুম, রীতিমতন সংস্কৃত ভাষা শেখানো হচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রী সাত-আট জন। ব্ল্যাক বোর্ডে লেখা অক্ষরগুলি আমি একবর্ণ বুঝতে পারলুম না, কারণ, এই সংস্কৃত দেবনাগরি হরফে নয়, তিব্বতি হরফে।

অ্যালেনের দৃষ্টান্তেই সম্ভবত সারাদেশ থেকে সাহিত্যমনস্ক অনেক তরুণ-তরুণী এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে আসে। কেউ কেউ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিয়েছে, কারুর কারুর পোশাক ও চুল পাংকদের মতন। আমেরিকার ছেলেমেয়েরা যখন যে-জিনিসটা ধরে, তখন গভীরভাবে ধরে। একটি বাড়ির সবুজ ঘাস ভরা লনে মনোরম রোদ্দুরে মধ্যাহ্নভোজের সময় একটি আন্দাজ বছর তিরিশেক বয়েসের যুবক কবি অ্যালেনের সঙ্গে তিব্বতি দর্শন ও সিদ্ধাচার্যদের বিষয়ে আলোচনা জুড়ে দিয়েছিল। আমি তিব্বতী দর্শন বিষয়ে কিছুই জানি না, চুপ করে শুনছিলুম, এক সময় নিছক কথার কথা হিসেবে সেই যুবকটিকে বললুম, জানো, এক সময় উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু বৌদ্ধ হিন্দুদের অত্যাচারে লুকিয়ে থেকে সাংকেতিক ভাষায় কিছু দোহা বা বা গান লিখেছিল...। আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে সে বলল, হ্যাঁ জানি চর্যাপদ তো? সান্ধ্য ভাষায় লেখা, লুইপাদ, কাহ্নপাদ, ভুসুকুপাদ...। আমি যাকে বলে স্তম্ভিত!

এখানে কবিতা পাঠের আসর বেশ জমজমাট হল। শ্রোতাদের আগ্রহ ও অভিনিবেশে একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে, তাতে কবিতার শব্দগুলি সঠিক সুরে বাজে। তখন মনে হয়, সব মিলিয়ে একজনই শ্রোতা।

ইংরিজি অনুবাদগুলি যিনি পাঠ করলেন তারাও সকলেই কবি। অ্যান ওয়াল্ডমান নামে এক বিদ্যুৎশিখাময়ী নারীর উৎসাহটি সবচেয়ে বেশি, এই নরোপা ইন্সটিটিউট যেন তারই রাজ্য। অ্যালেনের একটি কবিতা আছে এই মেয়েটিকে নিয়ে। সে কবিতা পাঠ করে প্রায় নাচের ভঙ্গিতে।

এখানেও অ্যালেন পড়ে দিল আমার কবিতার অনুবাদগুলি। অনুষ্ঠান শেষে অ্যালেন হেসে বলল, আমরা দু'জনে বেশ একটা টিম হয়ে গেছি, এইভাবে আমরা শহরে-শহরে ঘুরলে পারি!

বোলডার ছেড়ে যেতেও একটু একটু মনোকষ্ট হচ্ছিল। এমন সুন্দর জায়গায় আরও কয়েকটা দিন থাকতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু আমাদের যেন যাত্রা পার্টির মতন অবস্থা। যেতে হবে, যেতেই হবে। এখান থেকেই অ্যালেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিলাম, এ যাত্রায় আর বোধহয় দেখা হবে না।

সাময়িকভাবে আমাদের ফিরে আসতে হল নিউ ইয়র্কে। আবার উলটোদিকে ফিরে আসতে হবে ডেট্রয়েটে। পুরো দলটির নেমন্তন্ন নেই, শুধু হিন্দি, মারাঠি ও বাংলার তিনজন এবং অশোক বাজপেয়ী তো আছেই।

একদিন পরেই আমরা চারজন ডেট্রয়েটে এসে পৌঁছলুম দুপুরের দিকে। এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আমাদের নিয়ে আসা হল একটি ভারতীয় রেস্তোরাঁয়। এইসব রেস্তোরাঁর মালিক পাকিস্তানি বা বাংলাদেশিও হতে পারে। বিদেশে প্রাক্তন ভারতীয় উপমহাদেশের সবাই এখনও ভারতীয় হিসেবেও পরিচিত। এক্ষেত্রে দোকানটির মালিক বাংলাদেশি, একগাল হেসে জিগ্যেস করলেন, কেমন আছেন, দাদা?

এই রেস্তোরাঁতেই আমাদের সঙ্গে যোগ দিল তনুশ্রী ও প্রভাত দত্ত, এরা দুজনেই কবি। তনুশ্রী তার বিবাহ পূর্ব নাম তনুশ্রী ভট্টাচার্য নামেই লেখে, আর প্রভাত বিদেশে থেকেই প্রচুর নিষ্ঠার সঙ্গে 'অতলান্তিক' নামে একটি বাংলা পত্রিকা বার করে আসছে অনেকদিন। ওরা এসেছে ওহায়োর কলাম্বাস শহর থেকে, চার ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে কবিতা পাঠ শুনতে তো বটেই, তারপর আমাকে নিয়ে যাবে ওদের বাড়িতে।

ওদের এই প্রস্তাব শুনে অশোক বাজপেয়ী কৃত্রিম কোপের সঙ্গে বলে উঠল, এ কী ব্যাপার হচ্ছে, সুনীল? যেখানেই যাচ্ছি, যেখানেই একটি সুন্দরী মহিলা ও একজন ঝকঝকে পুরুষ এসে তোমাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের কাছ থেকে। আমরা 'দেশ' পত্রিকায় লিখি না বলেই কি আমাদের কেউ ডাকে না?

প্রভাতের কাছে 'দেশ' দু-একটি টাটকা সংখ্যা ছিল, সবাই আগ্রহের সঙ্গে দেখতে লাগল। সকলেই মত প্রকাশ করল যে 'দেশ'-এর মতন পত্রিকা অন্যকোনও ভাষাতে নেই। কেদারনাথ সিং

বাংলা পড়তে পারে, সে পাতা উলটে দেখে রায় দিল যে আমার উপন্যাসের ইনস্টলমেন্ট লেখার কাহিনিটি আজগুবি নয়।

ডেট্রয়েটের কবিতা পাঠের আসর অন্যান্য কয়েকটি জায়গার তুলনায় বেশ জমজমাট হল, বলটিমোর বা লস এঞ্জেলিসের তুলনায় তো অনেক সার্থক বটেই। আমেরিকার কোনও কবিতা পাঠের আসরেই 'আর একটা পড়ুন' বলে কেউ চ্যাঁচায় না। সব কিছুই পূর্বনির্দিষ্ট। তবে, এখানে কবিদের সংখ্যা কম বলে আমাদের বেশি করে কবিতা পড়তে হয়েছিল, বেশ রাত হয়ে যাওয়াতে শ্রোতারা কেউ উঠে গেল না তো!

মাধুরী হাজরা এখানকার অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা। তাঁর বাড়িতে রাত্রির নেমন্তন্ন এবং সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা। প্রভাত-তনুশ্রীর ইচ্ছে রাত্তিরের নেমন্তন্ন খেয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি মাঝ রাত্তিরে, তারপর সারারাতের ড্রাইভ। কিন্তু সেটা একটু বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়। মাধুরী হাজরার স্বামী-পুত্র ছাড়াও তাঁর মা-বাবা, দেওর, ভাই-বোন সবাই কাছাকাছি থাকেন। আরও অনেকে এসেছেন, সব মিলিয়ে বিরাট হইচই, প্রচুর খাওয়াদাওয়া। রাত দুটোর সময় শুতে গিয়ে ভোর হতে না হতেই বেরিয়ে পড়া।

পরের রাতে প্রভাত-তনুশ্রীদের বাড়িতেও আবার পার্টি। আবার রাত্রি জাগরণ। এক একটা শহরে বিছানা গরম হতে না হতেই আমি চলে যাচ্ছি অন্য শহরে। একদিন অন্তরই নতুন মানুষ, নতুন পরিবেশ। তার মধ্যে এই বাড়িতে এসেই অনেকটা কলকাতার ছোঁওয়া পাওয়া গেল। তনুশ্রীর বাবা, দুই ভাই, এক ভাইয়ের স্ত্রী সদ্য এসেছে কলকাতা থেকে, গায়ে এখনও কলকাতার গন্ধ লেগে আছে, তাঁদের দেখে আমার যেমন ভালো লাগল, তাঁরাও আমাকে বেশি বেশি যত্ন করতে লাগলেন। ব্যস্ততার জন্য আমাকে অবিলম্বে চলে যেতে হয়, যাওয়ার সময় মনে হয় আবার ফিরে আসব এমন সুন্দর জায়গায়।

আমাদের শেষ অনুষ্ঠান হার্ভার্ডে। দলের অন্যান্যরা আবার নিউ ইয়র্ক ছুঁয়ে আলাদাভাবে সেখানে চলে গেছে। আমাকে যেতে হল কলাম্বাস থেকেই সোজা। বস্টন এয়ারপোর্টে একটি রোগা পাতলা যুবক এসে বলল, আমার নাম রাহুল রায়। আপনি আমাদের বাড়িতে থাকবেন।

মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে আবার অন্য পরিবেশ, অন্য মানুষ।

চার্লস নদীর একপাশে বস্টন অন্যপাশে কেম্ব্রিজ। রাহুলরা থাকে কেম্ব্রিজে। তার স্ত্রী চন্দ্রা ও একটি স্বাস্থ্যবান সুন্দর শিশুকে নিয়ে ছোট্ট সংসার। তাদের ফ্ল্যাটে পৌঁছে সুটকেস খোলার আগেই তিনটি যুবক এসে হাজির হল।

নিউ ইয়র্কে থাকার সময় আমার হোটেলে একদিন তিন গৌতম আড্ডা মারতে এসেছিল, গৌতম রায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও গৌতম দত্ত। তিনজনই সুদর্শন, বুদ্ধিমান, চৌকোশ ও হাস্য-পরিহাস প্রবণ। এদের মধ্যে গৌতম রায়ের ভালোনাম ডঃ কল্যাণ রায়, সে নিউইয়র্কের কোনও কলেজে ইংরিজি পড়ায়, তার লেখা ইংরিজি কবিতা ওদেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার প্রবল টান, বাংলা কবিতা যখন তখন কোট করে। কিছু আধুনিক বাংলা কবিতা ইংরিজিতে অনুবাদও করেছে।

ছুটির দিন বলে এই তিন গৌতম নিউইয়র্ক থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা বস্টনে উপস্থিত, পাঁচ-ছ' ঘণ্টার ড্রাইভ বোধহয়। আমি কোথায় উঠব, তা আগে এখানে টেলিফোন করে জেনে নিয়েছিল। জমে গেল তুমুল আড্ডা।

সন্ধেবেলাতেই কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান। হার্ভার্ডের অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা করেছে অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান, কল্যাণ চক্রবর্তী নামে একজন আই এ এস অফিসার হার্ভার্ডে গবেষণারত, তিনিই যোগাযোগটি ঘটিয়েছেন। কিন্তু কবি-সম্মেলনের পক্ষে দিনটি সুবিধেজনক নয়, এখানে এখন লং উইক এন্ড চলছে, অর্থাৎ শনি-রবির সঙ্গে সোমবারটাও ছুটি, এরকম লম্বা ছুটির সুযোগ পেলে অনেকেই

শহর ছেড়ে বাইরে চলে যায়। বিকেল থেকে আবার টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। এসব সত্ত্বেও এত শ্রোতা সমাগম সত্যি বিস্ময়কর, দেখতে-দেখতে হল প্রায় অর্ধেক ভরে গেল। এদেশের কবিতাপাঠের আসরে আড়াইশো-তিনশো শ্রোতাই যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয়, এই সন্ধ্যায় শ্রোতার সংখ্যা তার চেয়ে কিছু বেশিই মনে হল।

বড় গৌতম ওরফে ডঃ কল্যাণ রায় আমার দু-একটি কবিতা অনুবাদ করেছে, তার ইচ্ছে অনুবাদগুলি সে-ই পাঠ করে। এখানকার প্রত্যেকটি কেন্দ্রেই আমাদের কবিতার অনুবাদের কপি আগে থেকে পাঠানো ছিল, নির্দিষ্ট এক একজন স্থানীয় কবি এক একজনের অনুবাদ পাঠ করার জন্য আগে থেকেই তৈরি হয়ে থাকছেন। হার্ভার্ডে যিনি আমার অনুবাদ পড়বেন বলে ঠিক করা আছে তিনি একজন বয়স্ক ব্যক্তি। তাঁকে যখন বললুম, আমার দু'একটি কবিতা অন্য একজন পড়তে চান, তিনি ঠিক খুশি হলেন না মনে হল। তিনি ক্ষুণ্ণভাবে বললেন, আমি এগুলো আগে থেকেই অনেকবার পড়ে রেডি হয়ে এসেছি...। আমি তখন বললুম, আপনি এগুলো পড়ুন, আর একটি নতুন কবিতার অনুবাদ পড়বেন আমার বাঙালি বন্ধুটি। তিনি তাতে রাজি হলেন। কল্যাণ অনুবাদ করেছে "কবির মৃত্যু ঃ লোরকা স্মরণে", সেটি একটি দীর্ঘ কবিতা, তাই সেটার বাংলাটা আর আমি পড়লুম না সময় বাঁচাবার জন্য।

এই ভারতীয় কবির দলটিতে প্রত্যেকের কবিতার সুরই আলাদা। হিন্দি কবি কেদারনাথ সিং-এর লেখাগুলি বর্ণনামূলক নয়, উপমাবহুলও নয়, বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অ্যাবস্ট্রাকশান মেশানো, এবং গভীর চিন্তার ছায়া আছে। মহারাষ্ট্রের অরুণ কোলাটকারের কবিতাগুলি আবার খুবই বর্ণনামূলক। কখনও মজার, কখনও শ্লেষপূর্ণ, শুনলেই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়, শ্রোতারা হাসে, তার কবিতার সমসাময়িক ভারতীয় বাস্তবতার বিদ্রূপমাখা ছবি ফুটে ওঠে। উর্দু কবি শামসুর রহমান ফারুকির কবিতাগুলি ছোট-ছোট, সূক্ষ্ম রসের, কোনও-কোনওটি গজল, শুনতে ভালো লাগে, তবে এইসব কবিতা অনুবাদে মার খায়। গোপালকৃষ্ণ আদিগার কবিতাগুলি আবার ঠিক বিপরীত, তাঁর কবিতাগুলি লম্বা লম্বা, সামাজিক অনাচার-অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমূলক, একটু উচ্চকণ্ঠ। তাঁর কবিতাগুলির মধ্যে তথাকথিত কিছু-কিছু অশ্লীল শব্দও আছে পাকা চুল মাথায় এই প্রবীণ কবির মুখে সেইরকম শব্দ শুনে কেউ-কেউ চমকে-চমকে ওঠেন। এমার্জেন্সি ও ইন্দিরা গান্ধির বিরুদ্ধে তাঁর একটি চড়া সুরের কবিতা শুনে কলোরাডোর কিছু ভারতীয় আপত্তি জানিয়েছিল।

অমৃতা প্রীতম না এলেও সফরের সময় কবির সংখ্যা ছ'জনই ছিল। অশোক বাজপেয়ী নিজেও হিন্দি ভাষার একজন উল্লেখযোগ কবি, সে-ও কবিতা পাঠে অংশ নিয়েছে, তার ছোট-ছোট নিটোল প্রেমের কবিতাগুলি বেশ সুখশ্রাব্য।

হার্ভার্ডের শ্রোতারা অত্যন্ত মনোযোগী। কবিতা পাঠ শেষ হওয়ার পরেও অনেকে থেকে গিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন, খোঁজ নিলেন সাম্প্রতিক ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে, কেউ কেউ আমাদের কবিতার অনুবাদের কপি চেয়ে নিলেন। একজন প্রৌঢ়া মেমসাহেব কল্যাণ রায়কে বললেন, তোমার কবিতা পাঠ সুন্দর হয়েছে, কিন্তু তোমার ইংরিজিতে একটু যেন স্কটিশ অ্যাকসেন্ট আছে! শুনে আমরা অবাক। কল্যাণ সলজ্জভাবে জানাল, আপনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, আমার ওপর প্রভাব থাকতে পারে, আমি বিয়ে করেছি একটি স্কটিশ মেয়েকে!

হার্ভার্ডের শ্রোতারা অন্য একটি দিক থেকে আলাদা। এর আগে আমরা অন্যান্য যে সব শহরে কবিতা পড়ে এসেছি, সেখানে দেখেছি, এদেশি শ্রোতাদের মধ্যে অনেকেরই ভারতীয় কবিতা সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। কেউ-কেউ বেদ-উপনিষদের কথা জানে, কারুর-কারুর ধারণা ভারতীয় কবিতা সবই ধর্ম-বিষয়ক। আধুনিক ভারতীয় কবিদের কবিতা শুনে তারা অবাক হয়ে গেছে। হার্ভার্ডে অবশ্য বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় কবিতার বিবর্তন সম্পর্কে কেউ কেউ কিছু জানেন বোঝা গেল। ভারতীয় কবিদের এই আমেরিকা সফরে এখানকার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আধুনিক ভারতীয় কবিতা

সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণার সৃষ্টি করা গেছে, এইটুকুই যা লাভ। প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের পরই দু-চারজন আগ্রহের সঙ্গে জিগ্যেস করেছেন, তোমাদের কবিতার অনুবাদ বই নেই? কোথায় পাওয়া যায়? এদেশে পাওয়া যায় না কেন?

সেই রাতে চন্দ্রা ও রাহুলের আতিথেয়তায় ওদের ফ্ল্যাটে প্রচুর খাদ্য পানীয় সহযোগে আর একটি কবিতা পাঠের আসর বসল। এখানে শুধু নির্ভেজাল বাংলা কবিতা। তিন গৌতমের মধ্যে দুজন তাদের কবিতা শোনাল, গৌরী দত্ত নামে একজন মহিলা ডাক্তার তিনিও লাজুক-লাজুক গলায় শোনালেন তাঁর নিজের কবিতা, আমাকেও পড়তে হল কয়েকটি। যেহেতু সন্ধেবেলা আমি 'কবির মৃত্যু' পড়িনি, সেইজন্য ওদের সকলের অনুরোধে পড়তে শুরু করলুম সেটা। পড়তে-পড়তে আমার ভালো লেগে গেল, তারপর আমি স্বেচ্ছায় পড়ে যেতে লাগলুম একটার পর একটা। কবিতার প্রায় প্রতিটি শব্দই যাদের বোধগম্য, তাদের সামনে কবিতা পাঠের আনন্দই আলাদা।

মধ্যরাত পেরিয়ে আমাদের আড্ডা গড়িয়ে চলল ভোর রাতের দিকে।

হার্ভার্ডে সন্ধেবেলার অনুষ্ঠানের শ্রোতাদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম আমার পূর্ব পরিচিতা চিত্রিতা ব্যানার্জি-আবদুল্লা ও তাঁর বান্ধবী এলিজাবেথ ভোগ্‌লোকে, এই মার্কিন তরুণীটি ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্রী, এর সঙ্গেও একবার পরিচয় হয়েছিল কলকাতায়। এরা দুজন বলেছিল, তুমি কি একদিন এখানে থেকেই পালাবে? তা চলবে না। আরও কয়েকদিন থেকে যেতে হবে হার্ভার্ডে।

সুতরাং পরদিন আমাদের দলের আর সবাই এখান থেকে প্রস্থান করলেও আমি আরও কয়েকদিন রয়ে গেলুম কেম্ব্রিজে।

কিন্তু সে তো অন্য গল্প!

॥ একুশ ॥

ওখরিড নামে যে একটি সুবৃহৎ হ্রদ আছে কোথাও তা আমার জানা ছিল না। আমার বাড়িতে যে অ্যাটলাস আছে, তাতে স্ট্রুগা নামে কোনও শহরের নাম তন্নতন্ন করেও খুঁজে পাওয়া গেল না। ম্যাসিডোনিয়ার কথা আমি পড়েছি ইতিহাসে, ভূগোলে নয়। ম্যাসিডোনিয়ার রাজা ফিলিপের ছেলে দুঃসাহসী আলেকজান্ডার দিকবিজয় করতে-করতে ভারতের সিন্ধু নদীর পারে এসে থেমেছিলেন। সেই ম্যাসিডোনিয়া যে এখন আধুনিক যুগোশ্লাভিয়ার একটি রিপাবলিক, সরলভবে সত্যি কথাটা স্বীকার করছি, তা আমি জানতুম না আগে।

সেই ম্যাসিডোনিয়ার ওখরিড হ্রদের তীরে স্ট্রুগা নামে অতি ছোট্ট একটি শহরের কবি-সম্মেলনে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পেলাম হঠাৎ। সেখানকার বাৎসরিক কবি সম্মেলনের পঁচিশ বছর পূর্তি হচ্ছে, সেই উপলক্ষে পৃথিবীর বহু দেশের কবিদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা দেবেন আতিথেয়তা, ভারত সরকারের সংস্কৃতি সম্বন্ধ পরিষদ (আই সি সি আর) স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রস্তাব পাঠালেন আমার বিমান ভাড়া দেওয়ার।

এই সময় আমার খুব কাজের চাপ। কয়েকদিন আগেই বিদেশ থেকে ফিরেছি, কয়েক মাস পরেই আবার বিশ্ব বইমেলায় যোগদানের কথা আছে, এর মাঝখানে শারদীয় সংখ্যার লেখাটেখা শেষ করতে হবে। কিন্তু ভ্রমণের কথা উঠলেই আমার পায়ের তলা সুড়সুড় করে, তা ছাড়া ম্যাসিডোনিয়া নামটির রোমাঞ্চ অনুভব করি শরীরে, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়েও যে যুগোশ্লাভিয়া জোট-নিরপেক্ষ হয়ে আছে, সেই দেশটি চাক্ষুষ দেখার আগ্রহও ছিল অনেকদিন ধরে। সুতরাং সাগরদা-নীরেনদা-রমাপদ চৌধুরী-সেবাব্রত গুপ্ত প্রমুখ বাঘা বাঘা সম্পাদকদের উষ্মা ও রক্তচক্ষুর সম্ভাবনা

সত্ত্বেও রাজি হয়ে গেলুম এককথায়।

সুতরাং অগাস্ট মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আবার আকাশযাত্রা। যেতে হবে বেশ কয়েকবার বিমান বদল করে। বারবার নামা-ওঠা, এক একটা বিমান-বন্দরে কয়েক ঘণ্টা করে অপেক্ষা বেশ বিরক্তিকর, কিন্তু নতুন দেশ দেখার আনন্দে তা সহ্য করা যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই তারপর বিরাট এক লাফে জুরিখ, সেখান থেকে বেলগ্রেড। আপাতত বেলগ্রেডে রাত্রিযাপন। বিমান কোম্পানিই সেখান হোটেল ঠিক করে রেখেছে।

বেলগ্রেডের আসল নাম বেওগ্রাড। খুবই প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর। এই শহরটিকে বলা যায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মাঝখানের দরজা। কত যে যুদ্ধ, ধ্বংস ও রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটেছে এখানে তার ইয়ত্তা নেই। বিকেলবেলা পৌঁছে পরেরদিন সকালের মধ্যে, একা একা, এই শহর ভালোভাবে দেখার সুযোগ পাওয়া যাবে না, কিন্তু একটা জিনিস দেখবই, তা আগে থেকেই ঠিক করে এসেছি। কোনও নতুন জায়গায় গেলে সেখানকার নদী না দেখলে আমার মন আনচান করে। বেলগ্রেডের পাশ দিয়ে গেছে একটা নয়, দু-দুটো নদী। একটির নাম সাভা, আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু অন্যটি হল ইউরোপের প্রধান নদী দ্যানিয়ুব। এই শহরেরই এক প্রান্তে ওই দুই নদীর সঙ্গমস্থল।

পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, সমাজতান্ত্রিক দেশে রাত্তিরবেলাও একলা একলা নির্ভয়ে চলাফেরা করা যায়। রাস্তা হারিয়ে ফেলতে পারি, কিন্তু কেউ অন্ধকারে ছুরি দেখাবে না। পকেটে পয়সা-কড়ি কম, ট্যাক্সি চড়ার বিলাসিতা মনেও আসে না। তবে এই শহরে ট্রাম চলে। ট্রামে চেপে, লোকজনকে জিগ্যেস করতে-করতে পৌঁছে গেলুম আমার অভীষ্ট স্থলে। দ্যানিয়ুবের তীরে দাঁড়িয়ে শুনতে পেলুম ব্লু দ্যানিয়ুবের স্বর্গীয় মূর্ছনা।

যুগোশ্লাভিয়ার ম্যাপে, এমনকী ম্যাসিডোনিয়ার ম্যাপেও স্ট্রুগা শহরের নাম নেই। যেমন ভারতবর্ষের, এমনকী পশ্চিমবাংলার মানচিত্রেও চম্পাহাটি বা কৈখালির নাম পাওয়া যাবে না। এত ছোট শহরে এরকম একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ডাকা প্রথমে বিস্ময়কর মনে হলেও পরে বুঝতে পারলুম, এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। আমাদের সব কিছুই রাজধানীতে হয়, তার ফলে ছোট ছোট শহরগুলির মানুষরা আঞ্চলিকতা ছাড়িয়ে বিপুল বিশ্বের স্বাদ পায় না কখনও। কিন্তু দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরও কি সমান অধিকার নেই? রাজধানীর মানুষদের তুলনায় তারা অনেক কিছু থেকে কেন বঞ্চিত থাকবে?

ইংরিজি বানানে OHRID, উচ্চারণে ওখরিড নামে বিশাল হ্রদটির গায়ে এই স্ট্রুগা শহর। জায়গাটি বড় সুন্দর। যেদিকেই তাকাও, বড় বড় পাহাড়ের গা। হ্রদের জল স্বচ্ছ নীল। বাড়িগুলির সামনে আপেল-ন্যাশপাতির বাগান। স্বাস্থ্যকর জায়গা হিসেবে খ্যাতি আছে বলে ইউরোপের অনেক ভ্রমণকারী আসে এখানে, তাই কয়েকটি বেশ বড় বড় হোটেল আছে। সুতরাং এতগুলি অতিথির স্থান সঙ্কুলানের অসুবিধে নেই।

হোটেলে ঘর পাওয়ার পর অনুষ্ঠানসূচিতে চোখ বোলালুম। বাইরের চল্লিশটি দেশ থেকে আশিজন কবিকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, এ ছাড়া রয়েছে যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা। ভারতীয় হিসেবে নাম রয়েছে তিনজন, অন্য দুজন হলেন সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন—অজ্ঞেয় এবং এল এল মেহোত্রা। অজ্ঞেয় হিন্দি ভাষায় প্রবীণ কবি, তাঁর কথা জানি, কিন্তু মেহোত্রার নাম আমি আগে কখনও শুনিনি। পরে জানলুম, এই মেহোত্রা যুগোশ্লাভিয়ায় আমাদের রাষ্ট্রদূত। বিকেলবেলা দেখা হল তাঁর সঙ্গে। অজ্ঞেয়জি তখনও এসে পৌঁছোননি, পরদিন আসবার কথা।

অন্যান্য দেশের কবিদের তালিকায় বেশ কয়েকটি নাম আমার পূর্ব পরিচিত, অন্যান্য সম্মেলনে দেখা হয়েছে, বিশেষত বেলজিয়ামের কাব্য-উৎসবে। বাংলাদেশ থেকে এসেছেন আলাউদ্দিন আল-আজাদ, এঁর সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না, আসবার পথে বিমানেই আলাপ হয়েছে। আমেরিকা থেকে এসেছেন পাঁচ জন, রাশিয়া থেকে দুজন। এই দুদেশের তালিকায় রয়েছে দুজন বিশ্ববিখ্যাত

কবির নাম, অ্যালেন গিনসবার্গ এবং আন্দ্রেজ ভজনেসেনস্কি। এই দুজনকে ঘিরেই বেশি লোকের কৌতূহল।

গোটা ম্যাসিডোনিয়ার জনসংখ্যাই সাড়ে উনিশ লাখ, কলকাতার অর্ধেকও নয়। স্ট্রুগা শহরের জনসংখ্যা দশ-পনেরো হাজার হবে। তবু এই পুঁচকে শহরে আছে একটি স্থায়ী আন্তর্জাতিক কবিতা-ভবন ও সংগ্রহশালা। সেখানে রক্ষিত আছে পৃথিবীর বহু ভাষার কবিতার বই, কবিদের ছবি ও পাণ্ডুলিপি। এ ছাড়া রয়েছে আর একটি কবিতা-কেন্দ্র। যেটি স্থানীয় কবিদের জন্য। যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান ভাষা সার্বোক্রোয়াশিয়ান। কিন্তু তার চাপে ম্যাসিডোনিয়ান ভাষা যাতে হারিয়ে না যায়, সেইজন্য ম্যাসিডোনিয়ান ভাষার উন্নতির খুব চেষ্টা হচ্ছে। গোটা কবি সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম চলল ওই ভাষায়। আমার ধারণা হল, এখানে এই আন্তর্জাতিক কবি সম্মেলনের উদ্যোগের অন্যতম কারণ, বিশ্বের লোকেরা জানুক, ম্যাসিডোনিয়ার একটি নিজস্ব ভাষা আছে।

কবিতা-ভবনের চূড়ায় একটি বিশাল আলো জ্বালিয়ে হল সম্মেলনের উদ্বোধন। সামনেই একটি ছোট নদী। কবিতা শুনতে সারা শহরের লোকই চলে এসেছে, সম্ভবত এটাই এই শহরের প্রধান বার্ষিক উৎসব। প্রত্যেক বছর এই উৎসবে একজন কবিকে প্রধান কবির সম্মান-পুরস্কার দেওয়া হয়। সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি আন্দ্রেজ ভজনেসনস্কি এই পুরস্কার পেয়েছেন কয়েক বছর আগে, আমাদের অজ্ঞেয়জিও পেয়েছেন গত বছর, এ বছর পাচ্ছেন অ্যালেন গিনস্‌বার্গ।

প্রতিদিন কবিতা পাঠের আসর দুবার। সন্ধ্যায় ও মধ্যরাত্রে। এ দেশের সন্ধ্যা শুরু হয় আটটার পর, শ্রোতারা খাওয়াদাওয়া করে আসে। যেহেতু কবিদের সংখ্যা অনেক, তাই প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কবিদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। সবাই একটি করে কবিতা পড়বেন। আর একটি অনুষ্ঠান মধ্যরাত্রি থেকে শুরু, তাতে যার যত খুশি কবিতা পড়তে পারেন, সারা রাত চললেও ক্ষতি নেই। দর্শক-শ্রোতারা অধৈর্য না হলেই হল। শ্রোতাদের রাত দুটো তিনটেয় বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িঘোড়া পাওয়ার চিন্তা নেই। যে-যার হেঁটেই বাড়ি ফিরতে পারে। এ ছাড়া অনেকেরই নিজস্ব গাড়ি আছে। এই গ্রাম-প্রতিম ছোট শহরেও ইচ্ছে করলে সারা রাত ট্যাক্সি পাওয়া যায়।

খুব সম্ভবত স্বাস্থ্যের কারণেই অজ্ঞেয়জি শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছলেন না। স্থানীয় উদ্যোক্তারা অনেকেই তাঁর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। রাষ্ট্রদূত মেহোত্রা একদিন থেকেই ফিরে গেলেন। সুতরাং ভারতীয় বলতে একা আমি। এত বড় রাষ্ট্রের ভার কি একা আমার ঘাড়ে সামলাতে পারি? তার জন্য অনেক ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হয়েছে। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। তৃতীয়দিন সকালে আমি সবেমাত্র ঘুম চোখে নিজের ঘর থেকে নেমে এসে হোটেলের ডাইনিং রুমে চা খেতে এসেছি। অর্ডার দেওয়া হয়েছে, তখনও চা আসেনি। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আর যত গুণই থাক, হোটেল-রেস্তোরাঁয় খাবারদাবার পেতে বড্ড দেরি হয়। যেহেতু সমস্ত হোটেলই সরকারি, তাই পরিচালকদের ব্যবহার অবিকল সরকারি কর্মচারিদের মতনই তাঁরা আস্তে হাঁটেন, অনেক কথা কানে শুনতে পান না। এখানে আবার ইংরিজিও বোঝেন না।

চায়ের প্রত্যাশায় বসে আছি, এমন সময় উদ্যোক্তাদের একজন প্রতিনিধি ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বললেন, সেদিন প্রভাতী অনুষ্ঠানে কয়েকটি দেশের নামে গাছ পোঁতা হবে। ভারতবর্ষের নামের গাছটির গোড়ায় মাটি ঢালতে হবে আমাকে।

আমি বললুম, ঠিক আছে, চা-টা খেয়ে নিই?

প্রতিনিধি বললেন, কিন্তু সবাই তৈরি হয়ে আছে। আপনার জন্য শুরু করা যাচ্ছে না, অনুগ্রহ করে এক্ষুনি চলুন।

ভদ্রলোকের চোখমুখ দেখে মনে হল, ওঁর ওপর যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা ঠিকঠাক পালিত না হলে উনি ওপরওয়ালার কাছ থেকে বকুনি খাবেন।

আমি বললুম, তা বলে, এক কাপ চা খাওয়ারও সময় হবে না?

উনি বললেন, তাহলে বড্ড দেরি হয়ে যাবে।

অর্থাৎ উনিও জানেন যে আশু চা পাওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমাকে উঠে পড়তেই হল।

আমাদের হোটেল থেকে মাইলদেড়েক দূরে একটি উদ্যানের নাম দেওয়া হয়েছে 'কবিতার উদ্যান'। সেখানে প্রতি বছরই কিছু-কিছু কবিকে নিয়ে গাছ পোঁতানো হয়। অজ্ঞেয়জি এলে প্রবীণ ও খ্যাতিমান হিসেবে এ কাজটি নিশ্চয়ই তাঁকেই করতে হত। সকালবেলা প্রথম কাপ চা পানের আগে আমার মেজাজ খোলে না। তা ছাড়া আগেরদিন একটা ভারী সুটকেস তুলতে গিয়ে আমার ডান হাতে হঠাৎ ব্যথা লেগেছে।

চারা গাছ নয়, মাঝারি আকারের একটি পাইন গাছ অন্য জায়গা থেকে এনে লাগানো হচ্ছে, সুতরাং অনেকখানি মাটি দিতে হবে। আমি মনে-মনে ভাবছি, গাছ পোঁতার জন্য এত আদিখ্যেতার কী দরকার। আমি এক চামচে মাটি ফেলার পর বাকি কাজটা তো বাগানের মালিরা করে দিলেই পারে। তা নয় পুরোটাই করতে হবে আমাকে, ভারী কোদালটা তুলতে হাত টনটন করছে আমার। কিন্তু মুখ বিকৃত করা উপায় নেই, হাসি হাসি মুখ করে থাকতে হবে। কারণ টি.ভি-র জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। অজ্ঞেয়জি না এসে কী বিপদেই ফেললেন আমাকে!

এই অনুষ্ঠান শেষে অ্যালেন গিনসবার্গ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে এসে জড়িয়ে ধরে বলল, সুনীল, কী আশ্চর্য আবার এত তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

আমি বললুম, তুমি পুরস্কার পেয়েছ, সেজন্য তোমাকে অভিনন্দন, অ্যালেন! আজকাল বড় বড় প্রতিষ্ঠান তোমাকে পুরস্কার দিচ্ছে।

অ্যালেন হেসে বলল, মায়া! সবই মায়া!

আমি বললুম, কাল সন্ধেবেলা থেকে তোমাকে দূর থেকে দেখছি। কত লোকের সঙ্গে তুমি অনবরত কথা বলে যাচ্ছ। খুব ব্যস্ত। সব লোকের সঙ্গে তুমি ঠান্ডা মাথায় সবরকম প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাও কী করে, অ্যালেন?

অ্যালেন সেই রকমই হেসে বলল, বড় কঠিন কর্ম। কঠিন কর্ম।

অ্যালেন মায়াকে বলে মাইয়া কর্মকে বলে কার্মা। তবে এর দু-একদিন বাদে সে "জয় জয় দেবী, চরাচর সারে, কুচযুগ শোভিত মুক্তা হারে"...এই শ্লোকটি নির্ভুল উচ্চারণে মুখস্ত বলেছিল, যদিও সে সংস্কৃত জানে না।

ম্যাসিডোনিয়ায় (এখানকার উচ্চারণে ম্যাকেডোনিয়া) প্রত্যেক ছোট ছোট শহরেই আছে আলাদা বেতারকেন্দ্র। এ ছাড়া রাজধানী স্কেপিয়ায় টি.ভি. সেন্টার, খবরের কাগজ বেরোয় বেশ কয়েকটি, এরা সবাই মিলে বহিরাগত কবিদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য ব্যস্ত। কান একেবারে ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়। অ্যালেনের মতন এই সব 'কঠিন কর্ম' আমি ঠিক পারি না। একই কথা বারবার বলতে একঘেয়ে লাগে। আমি ওদের কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, তার চেয়ে প্রকৃতি দেখা অনেক আনন্দের।

স্ট্রুগা শহরের মাঝামাঝি বয়ে যাচ্ছে একটি ছোট নদী, বেশ স্রোত। দুপাড় বাঁধানো, মাঝে মাঝে গাছের নীচে বেঞ্চ পাতা। কেউ-কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা দাপাদাপি করছে জলে। কিছুদূর অন্তর অন্তর একটা করে ব্রিজ। একটি ব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে আমি উঁকি মেরে চমকে উঠলুম। সেই নদীতে অসংখ্য মাছ, ছোট-ছোট চেলা জাতীয় ওই মাছ ধরা ও বাচ্চাদের দাপাদাপি দেখে আমার পূর্ববঙ্গের বাল্যস্মৃতি মনে পড়ে যায়।

নদীটি গিয়ে পড়েছে লেক ওখরিডে, সেই মোহনায় দলে-দলে নারী-পুরুষ এসেছে রোদ পোহাতে। পশ্চিমি দেশগুলির সমুদ্রতীরে এই রকম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এই হ্রদও প্রায় সমুদ্রের মতন। তবে পশ্চিমি দেশগুলিতে এই সব জায়গায় একটা জমজমাট ভাব থাকে, তার কারণ কাছাকাছি অনেক দোকানপাট ও গানবাজনা। সেই তুলনায় সেই জায়গাটা বেশ শান্ত।

কবির দলকে ছেড়ে, একলা একলা হাঁটতে-হাঁটতে আমি অনেক দূরে একটি গ্রাম্য বাজারে চলে যাই। পাশেই অভ্রভেদী পাহাড়। মানুষগুলি একবিন্দু ইংরেজি বোঝে না। কিন্তু মুখের ভাবে যে সারল্য তা বিশ্বজনীন। কিছু কিছু মানুষের চেহারা ও পোশাক এবং কোনও-কোনও বাড়ির গড়ন দেখলে বেশ চেনা-চেনা লাগে, মনে হয় আমাদের দেশের মতন। এর কারণ, তুর্কিরা এখানে বেশ কয়েক শতাব্দী রাজত্ব করে গেছে, সেই প্রভাব এখনও রয়েছে কিছু-কিছু। এদেশে কিছু তুর্কি এবং মুসলমান আছে, মাঝে-মাঝে মসজিদও চোখে পড়ে।

এদেশের মুদ্রার নাম দিনার। আরব-পারস্য কাহিনিতে দিনারের উল্লেখ পেয়েছি অনেক। দশ দিনারে এক ক্রীতদাসী পাওয়া যেত, রাস্তায় কেউ এক-এক দিনার কুড়িয়ে পেলে আনন্দে লাফাত। সেই দিনারের এখন কী দুর্দশা। দু-মাইল ট্যাক্সি চাপলে এক হাজার দিনার লাগে। আমাদের এক টাকায় ওদের প্রায় তিরিশ দিনার। তবে কম মূল্যের দিক থেকে দিনার এখনও ইটালির লিরাকে হারাতে পারেনি।

এখানকার খাদ্যদ্রব্যের খুব একটা গুণগান করা যায় না। পেট ভরাবার উপযোগী খাদ্য আছে ঠিকই, কিন্তু সুস্বাদু নয়। রান্না বৈচিত্র্যহীন। হোটেলে আমাদের খাদ্যদ্রব্য বিনামূল্যে, বাঁধাধরা মেনু, অতিরিক্ত কিছু নিতে গেলে দাম দিতে হয়। একদিন এক পরিচারক আমার পাশ দিয়ে এক প্লেট মাছ ভাজা নিয়ে যাচ্ছে দেখে বললুম, আমাকে ওই মাছ ভাজা দাও তো এক প্লেট। মাংস খেয়ে খেয়ে মুখ পচে গেছে, তা ছাড়া বাঙালির বাচ্চা মাছ দেখলে তো ইচ্ছে জাগবেই। একটি প্লেটে বড় সরপুঁটি জাতীয় মাছের দুটি টুকরো এনে দিয়ে সেই পরিচারক প্রায় আমার গালে থাপ্পর মেরে তিন হাজার দিনার নিয়ে নিল! অত দামের জন্যই বোধ হয় সেই মাছের স্বাদ আমার কাছে গাছের বাকল ভাঙার মতন মনে হল! সম্মেলন কর্তৃপক্ষ আমাদের প্রত্যেককে আট হাজার দিনার করে দিয়েছিলেন হাতখরচ হিসেবে। তার মধ্যে তিন হাজার চলে গেল এক প্লেট মাছ ভাজায়। লোভ থেকে যে পাপ, এটা সেই পাপের বেতন!

একদিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হল পিকনিকে। মাইলপঞ্চাশেক দূরে পাহাড়ের ওপরে। সেন্ট লাউম নামে এক প্রাচীন মনাস্টারির চত্বরে। বড় মনোহর সেই স্থান। মনাস্টারিটি বেশ প্রাচীন, জানলাগুলিতে ছবি আঁকা রঙিন কাচ। এদিককার অধিকাংশ মানুষই গ্রিক অর্থোডক্স চার্চের অন্তর্গত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও ধর্মচর্চা লোপ পায়নি।

এই পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে ওখরিড হ্রদটি অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। কাছেই দেখি এক জায়গায় জলের ওপর সরল রেখার অনেকগুলো সাদা সাদা বল ভাসছে। একজন জানাল যে প্রাচীন ম্যাসিডোনিয়া রাজ্যের মতন এই হ্রদটিও অনেক ভাগ হয়ে গেছে। কিছু অংশ গেছে গ্রিসে, কিছু অংশ আলবেনিয়ায়। আমরা যে বলগুলি দেখছি, সেটা হল আলবেনিয়ার সীমারেখা। এই সেই আলবেনিয়া, যেখানে পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের মানুষের প্রবেশ নিষেধ।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল আমার পূর্বপরিচিত মার্ক নেসডর নামে এক মার্কিন তরুণ কবি। সে বলল, সুনীল, তুমি যদি মনের ভুলে ওই সীমান্ত পেরিয়ে যাও, তা হলেই গুলি খেয়ে মরবে!

আমি বললুম, তোমার সে ভয় থাকতে পারে, আমার নেই। আমি মাদার টেরিজার কলকাতা থেকে এসেছি।

স্ট্রুগায় কবিতা উৎসব হল চারদিন। এর মধ্যে দুটি সন্ধ্যা খুবই অভিনব। একটি সন্ধ্যা পুরোপুরি এবারের পুরস্কার বিজয়ী অ্যালেন গিনসবার্গকে কেন্দ্র করে। সেই আসর বসল ওখরিড শহরের সেন্ট

সোফিয়া গির্জার অভ্যন্তরে, রাত দশটায়। এখানে অ্যালেনের কবিতা পড়া হল বিভিন্ন ভাষায়, তারপর অ্যালেন ছোট্ট বক্তৃতা দিল। নিজের কবিতা পড়ল, অনেকগুলি এবং গান তো সে গাইবেই। সঙ্গে আছে খুদে হারমোনিয়ামটি। তার প্রথম গানটিই হল, 'সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড'।

স্ত্রুগার শেষ সন্ধ্যাটি যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনই বর্ণাঢ্য। অনুষ্ঠানের নাম দা ব্রিজেস। অর্থাৎ পৃথিবীর নানা দেশের কবিদের মধ্যে সেতুবন্ধন। মঞ্চ সাজানো হল নদীর ওপরে সত্যিকারের একটি সেতুর ওপরে। দর্শক শ্রোতারা বসেছে নদীর দুধারে। প্রত্যেক দেশের একজন মাত্র কবি একটি করে কবিতা পড়বেন। এমনকী আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকেও একজন করে। সুসজ্জিত মঞ্চটি নদীর ধার থেকে এমন অপরূপ দেখাচ্ছিল যে আমার ইচ্ছে করছিল দর্শকদের মধ্যেই বসতে। অজ্ঞেয়জি এলে আমি নিস্তার পেয়ে যেতুম, কিন্তু অগত্যা আমাকেও উঠতে হল মঞ্চে।

এ এক এমনই বিচিত্র কবি সম্মেলন, যেখানে মঞ্চোপরি উপবিষ্ট কবিরা কেউ কারুর কবিতা প্রায় এক অক্ষরও বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেক কবি কবিতা পাঠ করেছেন তাঁদের মাতৃভাষায়, তারপর স্থানীয় কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী এসে আবৃত্তি করছে সেই কবিতার ম্যাসিডোনিয়ান ভাষায় অনুবাদ। ইংরেজির মধ্যস্থতা নেই। অর্থাৎ আমরা ফরাসি-জার্মান-ইজিপশিয়ান-গ্রিক-ইতালিয়ান-স্প্যানিশ-পোলিশ-নরওয়েইনিয়ান-টার্কিশ ইত্যাদি ভাষার মূল কবিতাও বুঝছি না, ম্যাসিডোনিয়ান অনুবাদ আমাদের কাছে সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। কবিরা পড়ছেন নদীর দিকে তাকিয়ে। আমি মনে মনে বললুম, আর কেউ না বুঝুক, নদী বুঝবে।

অত্যাশ্চর্য ব্যাপারটি এই যে, এই আসরে গ্রিক-জার্মান-ইতালিয়ান ইত্যাদি ভাষা মাত্র একবার করে শোনা গেলেও বাংলা ভাষা শোনা গেছে দুবার। ভারত ও বাংলাদেশ থেকে।

মঞ্চে শাড়ি পরা মহিলাও ছিলেন একজন, তিনি এসেছেন শ্রীলঙ্কা থেকে, তিনি কবিতা পড়লেন ইংরিজিতে। সব শেষে পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হল অ্যালেন গিনসবার্গের হাতে। সেটি একটি গোল্ডেন রিথ্ বা স্বর্ণ-শিরোমাল্য। সত্যি সত্যি সোনার। সেটি গ্রহণ করে অ্যালেন মাইকে তিনবার শুধু বলল, ওম্ ওম্ ওম্। এই ধ্বনির মর্ম বোধ হয় অন্য কেউই বোঝেনি, অ্যালেন চোখ টিপল আমার দিকে, দর্শকদের মধ্যে থেকেও অনেকে ওম্ ওম্ বলে চেঁচিয়ে উঠল।

এর পরদিন কবিতার আসর ছড়িয়ে গেল বিভিন্ন শহরে; কবিরা ভাগ হয়ে গেল কয়েকটি দলে। উদ্দেশ্য এই যে ম্যাসিডোনিয়ার সব অঞ্চলের মানুষই যেন এই আন্তর্জাতিক সমাবেশের কিছুটা অংশ নিতে পারে।

আমি আগে থেকেই বলে রেখেছিলুম, আমি খুব ছোট শহরে যেতে চাই। ছোট জায়গা আমার অন্তরঙ্গ লাগে, রাস্তাঘাটও ভালো করে দেখা যায়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ ও আমি একই দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে এলুম স্টিপ নামে একটি ছোট্ট শৈলশহরে। পথে প্রিলেপ নামে এক জায়গার এক দোকানে প্রকৃত টার্কিশ খাবার খাওয়া হল, বেশ ঝাল ঝাল খাদ্য, বেশ আমাদের রুচিমতন। এখানকার ওখানকার ওয়াইন বিখ্যাত। কিন্তু যুগোশাভিয়ায় এসে দেখেছি, এরা ওয়াইনের সঙ্গে সোডা কিংবা মিনারেল ওয়াটার মিশিয়ে দেয়। ইউরোপের অনেক দেশে ওয়াইনের সঙ্গে জল মেশালে বাঙাল বলবে।

স্টিপ শহরটি ক্ষুদ্র হলেও এখানেও একটি সংস্কৃতি ভবন আছে। কবিতা পাঠ হল তার চত্বরে, আমাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করলেন কিছু কিছু স্থানীয় কবি। সেই সব কবিদের সঙ্গে আড্ডা জমাল রাত্রে ভোজসভায়। সেই আড্ডা চলল রাত পৌনে তিনটে পর্যন্ত। কবিতা পাঠের আসরের চেয়েও আমার এই সব আড্ডা বেশি ভালো লাগে। আমরা কেউ কারুর কবিতা বুঝতে পারিনি, কিন্তু আড্ডায় চলে এলুম অনেক কাছাকাছি। এর মধ্যেই এক সময় প্রস্তাব উঠল, প্রত্যেককে নিজের দেশের দু-একখানা করে গান শোনাতে হবে। প্রথমে শুরু করল কিউবার মেয়ে মারলিন বোবেস, তারপর চেকোশ্লোভাকিয়ার লিডিয়া ভাদকের গ্যাভেরনিকোভা, তারপর হাঙ্গেরির পেটার কানট্রর...একে একে

প্রত্যেকে। আলাউদ্দিন আল-আজাদ শোনালেন রবীন্দ্রসঙ্গীত। যুগোশ্লাভিয়ার কবিরা দলে ভারী, তাঁরা শোনালেন অনেকগুলি পল্লিগীতি থেকে আধুনিক। আমাকেও বেসুরো হেঁড়ে গলায় গাইতেই হল দু-একখানা।

সারা ম্যাসিডোনিয়া ঘুরে সমস্ত কবির দল আবার জমায়েত হল এখানকার রাজধানী স্কোপিয়া-য়। (বানান Skopje) এখানেও কবিতা পাঠ করতে হল একটি কারখানায়। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শ্রমিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তাদেরও কবিতা শোনাবার প্রথা আছে।

তবে, কারখানায় কবিতা শোনাবার কথা মানে এই নয় যে, শ্রমিকরা ওভারঅল পরে যন্ত্রপাতি হাতে নিয়ে বড়-বড় মেশিনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, আর আমরা সেখানে কবিতা পড়ে যাচ্ছি। সে রকম ব্যাপারই নয়। মস্ত বড় কারখানা, প্রায় দশ হাজার লোক কাজ করে, তাদের রয়েছে নিজস্ব সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চ। সেখানে এসেছেন বিশেষ নিমন্ত্রিতরা। তবে এঁদের নিজস্ব বেতার ব্যবস্থা আছে। এখানকার কবিতা পাঠ সরাসরি শ্রমিকদের কাছে রিলে করা হবে, শ্রমিকরা ইচ্ছে করলে শুনতে পারেন, বন্ধ করে দিতে পারেন।

এই আসরে আমার পাশেই বসেছেন ভজনেসেনস্কি। এর আগে দু-তিনবার দেখা হলেও আমি ওঁর সঙ্গে আলাপ করিনি। কারণ, প্রথমত, আমি নিজে থেকে কারুর সঙ্গে আলাপ করতে পারি না। দ্বিতীয়ত ভজনেসেনস্কির ভাবভঙ্গি দেখে তাঁকে আমার অহঙ্কারী মনে হচ্ছিল। অহঙ্কারের কারণ আছে, তিনি সোভিয়েত দেশের জনপ্রিয় কবি। যুগোশ্লাভিয়ানরা অনেকেই রুশ ভাষা মোটামুটি বোঝে সুতরাং এঁর কবিতার সঙ্গে পরিচিত, তিনি এখান থেকে পুরস্কারও পেয়ে গেছেন।

আমার লাজুকতাও বোধ হয় এক ধরনের অহংকার, তাই আমি বিখ্যাত কোনও ব্যক্তির সঙ্গে যেচে কথা বলতে পারি না। সুতরাং পাশাপাশি বসেও আমাদের দুজনের কোনও কথা হল না।

ভজনেসেনস্কির কবিতা পাঠের ভঙ্গিটি নাটকীয়। মঞ্চে মাইক্রোফোনটি ছিল একটি ডেস্কের ওপর, তিনি সেটি সরিয়ে আনলেন ফাঁকা জায়গায়, যাতে তাঁর সম্পূর্ণ শরীরটি দেখা যায়। তাঁর পরনে সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট, মধ্যবয়েসি সুগঠিত দেহ, মাথার চুল ঈষৎ পাতলা হয়ে এসেছে। একটা পা সামনে এগিয়ে, এক হাত তুলে কখনও চেঁচিয়ে কখনও নীচু গলায় পড়লেন দুটি কবিতা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারলুম না, তবে স্ট্রুগা শব্দটি গেল কয়েকবার, এই উল্লেখ থাকলে স্থানী লোকেরা খুশি হয়।

এই সব আসরে অনেককেই খুব চেঁচিয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে কবিতা পড়তে দেখি। ম্যাক্স মোয়ার্টস নামে একজন আমেরিকান কবি, অতি দীর্ঘকায় কাউবয়ের মতন চেহারা, সে প্রায় নাচতে-নাচতে লম্বা একটা কবিতা মুখস্ত বলে। মালয়েশিয়ার কবি আবদুল গফ্ফার ইব্রাহিম এমন হুঙ্কার দিয়ে, ডেস্ক চাপড়াতে-চাপড়াতে কবিতা পড়লে যেন সে মেঠো রাজনৈতিক বক্তৃতা দিচ্ছে। আবার অনেক লাজুক, মৃদু গলার কবিও আছেন।

অ্যালেন গিনসবার্গ এই আসরে ছিল না, তাকে পাঠানো হয়েছিল অন্য কারখানায়। তার সঙ্গে দেখা হল সন্ধেবেলা হোটেলের লবিতে। সে বলল, সুনীল, তোমার সঙ্গে তো এবার ভালো করে গল্পই করা গেল না। আমি বললুম, তুমি এখানে বড্ড ব্যস্ত। অনেকে তোমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে থাকে।

অ্যালেন আমার কাঁধ ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, সত্যি, ক্লান্ত হয়ে গেছি। শোনো, আর কারুকে বোলো না, তুমি ঠিক পৌনে সাতটায় হোটেলের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়ে থেকো।

নির্দিষ্ট সময়ে অনেটা নামে এক পথপ্রদর্শিকা (অনেকেই তাকে ডাকছিল অনীতা বলে) অ্যালেন,

ভজনেসেনস্কি ও আমি হোটেল থেকে কেটে পড়লুম আড্ডা দিতে। অ্যালেনের সঙ্গে ভজনেসেনস্কির খুব বন্ধুত্ব, পৃথিবীর অনেক দেশের কবি সম্মেলনে দেখা হয়েছে। ভজনেসেনস্কি আমেরিকাতেও গেছেন কয়েকবার, অ্যালেনও সোভিয়েত দেশে গেছে, যুগোশ্লাভিয়াতেও এসেছে দুবার।

পরিচয় হওয়ার পর দেখা গেল ভজনেসেনস্কি যথেষ্ট নম্র ও ভদ্র, তাঁর মঞ্চের নাটকীয়তার সঙ্গে বাইরের ব্যবহারে কোনও মিল নেই।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা চলে এলুম টার্কিস বাজার নামে একটি বিচিত্র এলাকায়। বেশ পুরোনো জায়গা, খোয়া পাথরের পথ, আঁকাবাঁকা, দুপাশে অসংখ্য দোকান, বেশিরভাগই খাবারের, কোনও কোনও দোকান উপচে এসেছে রাস্তায়। সেখানেই চেয়ার টেবিল পাতা। এটা যেন একটা আলাদা নগরী, এখানে শুধু তরুণ-তরুণীর ভিড়। অনেকেই কোনও দোকানে বসার জায়গা পায়নি। তারা আড্ডা দিচ্ছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। এই তারুণ্যের জগৎ দেখে নিমেষে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে।

অনেটা-র চেনা, রাস্তার ওপর একটা খোলামেলা দোকানে একটা টেবিল নিয়ে বসলুম আমরা। সামান্য কিছু খাবার নেওয়া হল, আর চা। আড্ডা জমতে লাগল আস্তে আস্তে। অ্যালেন ভজনেসেনস্কিকে জিগ্যেস করল, তুমি ইন্ডিয়ায় যাওনি কখনও?

ভজনেসেনস্কি মাথা নেড়ে ক্ষুণ্ণভাবে বলল; না। ইন্দিরা গান্ধির আমলে একবার নেমন্তন্ন পেয়েছিলাম। সব ঠিকঠাক, কিন্তু সেই সময়েই কিয়েভ শহরে দু-জায়গায় আমার কবিতা পাঠের ব্যবস্থা হয়েছিল, লোকজন টিকিট কেটে ফেলেছিল তাই ইন্ডিয়ায় যাওয়া হল না। আবার কোনও কারণে কিয়েভের অনুষ্ঠানও শেষ মুহূর্তে বাতিল হয়ে গেল!

আমি বললুম, এরপর আসুন একবার!

অ্যালেন বলল, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ায় গিয়ে অবশ্য কলকাতায় যাব। গঙ্গার ধারে, নিমতলা শ্মশানে, দক্ষিণেশ্বরে। কী চমৎকার সময় কেটেছে আমার।

তারপর অ্যালেন মহা উৎসাহে শক্তি ও জ্যোতির্ময় দত্তের গল্প শোনাতে লাগল ওকে।

সর্বক্ষণই যে আমরা কলকাতা নিয়ে পড়ে রইলুম তা নয়। আড্ডার নিয়ম অনুসারে কথা গড়িয়ে যেতে লাগল প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। রাত্রি গাঢ় হল কিন্তু যুবক-যুবতীদের ভিড় বাড়ছে ক্রমশ। চতুর্দিকে হাসিখুশি হল্লা। অনেটা নামের মেয়েটি খুব বুদ্ধিমতী। ইংরেজি সাহিত্যের যথেষ্ট খবর রাখে, সে খুব সাবলীলভাবে মিশে গেল আড্ডায়। টেবিল যাতে ছাড়তে না হয় সেজন্য আমরা কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। এখানে মদটদও পাওয়া যায়। কিন্তু সেদিকে কারুর ঝোঁক নেই। অনেটা যথেষ্ট তরুণী, আমি ও ভজনেসেনস্কি প্রায় সমবয়েসি। অ্যালেনই বয়ঃজ্যেষ্ঠ। সে সদ্য ষাট পূর্ণ করেছে। সে খাবারদাবারের ব্যাপারে কিছুটা সাবধানি হয়েছে এখন, কিন্তু বার্ধক্যের ছোঁয়া লাগেনি শরীরে।

কথায় কথায় প্রসঙ্গ এল পৃথিবীর ধ্বংস-সম্ভাবনায়। পরমাণু যুদ্ধে পৃথিবীর থেকে কি একদিন মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? ভজনেসেনস্কি কোনও উত্তর না দিয়ে কাতর, উদাসীনভাবে তাকিয়ে রইলেন। অ্যালেন আমার দিকে চাইতেই আমি বললুম, আমার নৈরাশ্যবাদী হতে ইচ্ছে করে না। অনেটা জোর দিয়ে বলল, না, না, পৃথিবী বাঁচবে। মানুষ বাঁচবে, মানুষের সমাজ আরও সুন্দর হবে।

অ্যালেন হেসে বলল, এই যৌবনের তেজই হয়তো একমাত্র বাঁচাতে পারে পৃথিবীকে।

॥ বাইশ ॥

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি ব্যাংক, বারবণিতা ও বইমেলার জন্য বিখ্যাত। শহরটি পুরোনো নয় আবার নতুনও বলা যাবে না। নতুন বলা যাবে না এইজন্য যে এই নামের শহরটি জন্ম প্রায় দেড় হাজার বছর

আগে। তবু প্রাচীন নয় এই কারণে যে আসল শহরটির নব্বই ভাগই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দু-একটা গির্জা ও প্রাসাদ ইত্যাদি ছাড়া মধ্যযুগীয় এই নগরীটির আসল সৌন্দর্যের বিশেষ কিছু চিহ্নই এখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না, তার বদলে গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কেজো, আঁটসাঁট, দেশলাই-এর বাক্সের মতন বাড়ি। মহাকবি গ্যেটে যেমন জন্মেছিলেন এই শহরে, সেই রকম ধনকুবের, আন্তর্জাতিক ব্যাংক-ব্যবসায়ী রথসিল্ড পরিবারের আদি নিবাসও ছিল এই শহরে। ফ্রাঙ্কফুর্ট নামটির মানে হল, ফ্রাংক জাতির যাতায়াতের রাস্তা, এক কালে ফ্রাংকরা এখান দিয়েই আলেমান্নিদের তাড়া করে গিয়েছিল।

বরাবরই ব্যাবসা বাণিজ্যের জন্যই এই শহরটির সমৃদ্ধির নানারকম বাণিজ্যমেলা এই শহরে বসছে প্রায় সাত-আটশো বছর ধরে। সেই বাণিজ্যমেলার সূত্র ধরে ডাচ্ ইটালিয়ান ও ফ্রেঞ্চ দালাল ও ফাট্‌কাবাজেরা এখানে এসে আসর জমায় ও ব্যাংকের ব্যাবসা শুরু করে। আর যেখানেই টাকার ওড়াউড়ি সেখানেই রূপসি নারী ও শিল্পীদের আনাগোনা। ধনী ব্যবসায়ীরা কেউ-কেউ শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে, সেইজন্য ফ্রাঙ্কফুর্টে উচ্চাঙ্গের আর্ট গ্যালারি ও থিয়েটারেরও অভাব নেই। ইহুদিরা বাড়িয়ে তোলে এই শহরের ধনসম্পদ আর রিফিউজিরা সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও নেদারল্যান্ডস থেকে তাড়া খাওয়া প্রটেস্টান্ট—নিয়ে আসে উন্নত মানের শিল্প-সংস্কৃতি। তারপর ফ্রাঙ্কফুর্ট যখন উন্নতির শিখরে তখন হিটলার আরম্ভ করল ইহুদি নিধন-বিতাড়ন যজ্ঞ, ইঙ্গ-মার্কিন বোমায় এই গর্বিত নগরীটি মিশে গেল ধুলোয়।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার এক-দেড় দশকের মধ্যেই আলাদিনের প্রদীপের দৈত্য এই শহরটিকে আবার নতুন করে নির্মাণ করেছে।

ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে সাহিতের আবহাওয়া বিশেষ নেই কিন্তু বই প্রচুর। বই এখানে একটি দ্রব্য। বাণিজ্য মেলায় অভিজ্ঞ এই নগর সারা বছর ধরেই নানারকম দ্রব্যের পরপর মেলা বসায়। আন্তর্জাতিক গাড়ির মেলা, জামাকাপড়ের মেলা, জুতো ও পশমের মেলা, সেইরকমই বইমেলা। এখানে বিশাল, বিস্তীর্ণ মেলা প্রাঙ্গণ আছে, অনেকগুলি বহুতল আধুনিক অট্টালিকা সমেত, তলা থেকে ওপরে ওঠার জন্য আছে এসকেলেটর আর মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য বাস চলাচল করে, তাতে টিকিট লাগে না। শহরে সব বাস, ট্রাম, ট্রেন রুটেই মেলাপ্রাঙ্গণে যাওয়ার নির্দেশ আছে। মেলার জার্মান প্রতিশব্দ হল মেসে, সারা বছরই কোনও না কোনও মেলা চলে, অক্টোবরের গোড়ার বুক মেসে অনেকে বলে, এটাই নাকি এখন বিশ্বের সর্ববৃহৎ বইমেলা।

আমি '৮৬ সালেই এই বিশ্ব বইমেলা দেখতে গিয়েছিলাম। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নয়, যাওয়া-আসার ভাড়া ও থাকা-খাওয়ার খরচের আশ্বাস পেয়ে ও আমন্ত্রিত হয়ে। এই বছরে মেলা কর্তৃপক্ষ মেলা শুরু হওয়ার আগে দুদিন ধরে একটি সেমিনারের আয়োজন করেছিলেন। সেটির বিষয়; ইন্ডিয়া—চেইঞ্জ ইন কনটিনিউইটি। এই বছর ভারতের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল, ভারতের নামে তৈরি হয়েছিল একটি আলাদা প্যাভিলিয়ান। কেন হঠাৎ ভারতের প্রতি গুরুত্ব আরোপ? তার উত্তর জানি না। তবে এর আগে বই ও সাহিত্য নিয়ে এরকম সেমিনার ইত্যাদি হয়েছিল। আফ্রিকার পর ভারত, একটা বোধহয় যোগসূত্র আছে।

যাই হোক, এই সেমিনারে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল পঁচিশ জন ভারতীয় লেখক-লেখিকাকে। তাঁরা হলেন ঃ অজ্ঞেয় (দিল্লি), মুল্‌করাজ আনন্দ (বম্বে), ইউ আর অনন্তমূর্তি (মহীশূর), অশোক মিত্রণ (মাদ্রাজ), মন্নু ভাণ্ডারি (দিল্লি), দিলীপ চিত্রে (বম্বে), কমলা দাস (প্রন্নায়ারকুলম), অনীতা দেশাই (দিল্লি), বিজয় দান দেতা (যোধপুর), মহাশ্বেতা দেবী (কলকাতা), সিসিম ইজিকিয়েল (বম্বে), কুরাত-উল-আইন হায়দার (দিল্লি) বিষ্ণু খারে (দিল্লি), অরুণ কোলাটকর (বম্বে), সীতাকান্ত মহাপাত্র (ভুবনেশ্বর), আর কে নারায়ণ (মহীশূর), দয়া পাওয়ার (বম্বে), অমৃতা প্রীতম (দিল্লি), এ কে রামানুজম (শিকাগো), রঘুবীর সহায় (দিল্লি), কবিতা সিংহ (কলকাতা), বিজয় তেণ্ডুলকর

(বম্বে), নির্মল ভার্মা (দিল্লি), সিতাংশু যশচন্দ্র (বরোদা) এবং বর্তমান লেখক।

এই তালিকায় দিল্লির প্রাধান্য থাকলেও তাঁদের মধ্যে আছেন অনেক ভাষার লেখক যাঁরা কার্যসূত্রে দিল্লিতে থাকেন। সব মিলিয়ে এইসব লেখকরা নির্বাচিত হয়েছেন বাংলা, গুজরাতি, হিন্দি, কানাড়া, মালয়ালম, মারাঠি, ওড়িয়া, পাঞ্জাবি, তামিল, উর্দু, এবং ইংরাজি ভাষা থেকে। অসমিয়া, তেলেগু ইত্যাদি কেন বাদ গেল জানি না। নির্বাচনের মাপকাঠি হিসেবে প্রচার পুস্তিকায় বলা হয়েছে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে "প্রবীণ ও তরুণ লেখকদের, কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার এবং অচ্ছুৎ ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের সাহিত্যের প্রতিনিধিদের। নারী-লেখকেরা (আক্ষরিক অনুবাদ) ভারতীয় নারীদের সাহিত্যের প্রয়োজনীয় ভূমিকার কথা বলবেন।"

এই পঁচিশজনের মধ্যে অবশ্য অমৃতা প্রীতম এবং বিজয় তেণ্ডুলকর শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি। অমৃতা প্রীতমকে কট্টর ফেমিনিস্ট হিসেবে জানি, তিনি না যাওয়াতে ভারতীয় নারীদের বক্তব্য অনেকখানিই অব্যক্ত রয়ে গেল, আর বিজয় তেণ্ডুলকরের অনুপস্থিতিতে নাট্য জগতের কোনও প্রতিনিধিত্বই রইল না।

দু-দিনের চারবেলার সেমিনারের আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল, ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্নতা; বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্যের; ভারতীয় সাহিত্যের প্রকাশনা ও বই-ব্যাবসা; ভারতীয় সাহিত্যের সমাদর। বিভিন্নবেলায় সভাপতি ছিলেন ডঃ লোথার লুৎসে, পিটাই ওয়াইডহাস, ডঃ রাইমেনস্নাইডার এবং অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অলোকরঞ্জন এই পদে মনোনীত হয়েছিলেন বাঙালি বা ভারতীয় বলে নয়, একই সঙ্গে ভারতীয় ও জার্মান ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য। আমাদেরই সমসাময়িক এই কবি ও অধ্যাপকের এরকম সম্মাননায় আমি গর্বিত বোধ করেছি।

সেমিনার কেমন হয়েছিল? বেশ ভালোই তো হয়েছিল, যে-রকম সব সেমিনার হয়। এইসব সেমিনারে বক্তৃতা, হাস্য পরিহাস ও ক্বচিৎ উত্তেজনার সঞ্চার হয়। কেউ কেউ মন দিয়ে শোনে, কেউ কেউ শুনতে-শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। বক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ সর্বক্ষণ নিজে কী বলবে মনে মনে তার মহড়া দিয়ে যায়। কেউ-কেউ জ্বালাময়ী ভাষণ দেয় এবং অন্যদের ভাষণের সময় বাইরে সিগারেট টানতে চলে যায়। কেউ-কেউ বিনামূল্যে প্রাপ্ত প্যাডে পেন্সিল দিয়ে অনবরত কী নোট করে যায় কে জানে! কেউ অন্যের বক্তৃতার সময় পাশের লোকের সঙ্গে গল্প করে, কেউ কান চুলকোয়।

চার বেলাতেই সব লেখক-লেখিকারা ভাগ-ভাগ করে মাতৃভাষায় (ইংরেজিতে যাঁরা লেখেন তাঁর বিমাতৃভাষায়) নিজের রচনা থেকে খানিকটা অংশ পাঠ করেছেন। তারপর সেই অংশের পূর্বকৃত জার্মান অনুবাদ পড়ে দিচ্ছিলেন একজন অভিনেত্রী। আলোচনার ভাষা ইংরেজি (ভারতীয়দের ক্ষেত্রে, একজন শুধু হিন্দিতে বলেছিলেন) এবং জার্মান। তবে জার্মান দর্শক-শ্রোতাদের জন্য জার্মান ছাড়া অন্য ভাষায় কিছু বলা হলেই সঙ্গে-সঙ্গে তার জার্মান অনুবাদ শুনিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এইসব ব্যবস্থা প্রায় নিখুঁত। প্রায় বললাম এই কারণে যে যন্ত্র সভ্যতায় অগ্রগণ্য জার্মান জাতির ব্যবস্থাপনাতেও দু'একবার মাইক্রোফোনের কিছু গোলমাল হয়েছিল।

এই আলোচনা সভা, কোনও খোলা জায়গাতে নয়, বইমেলার মধ্যেও নয়, নগরের কেন্দ্রস্থলে বসেছিল একটি ঐতিহাসিক কক্ষে। শ্রোতারা সবাই আমন্ত্রিত। শ্রোতারা অধিকাংশই বই প্রকাশনার ব্যাপারে জড়িত, কিছু ভারত-বিশেষজ্ঞ এবং ভারত-কৌতূহলী এবং কিছু স্থানীয় ভারতীয়, যাঁদের মধ্যে বাঙালি মুখ নজরে পড়ার মতন। শ্রোতারা প্রশ্নোত্তরে আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন।

শ্রোতাদের মধ্যে নাকি জার্মান লেখকরা কেউ ছিলেন না কিংবা জার্মান লেখকদের সঙ্গে ভারতীয় লেখকদের ঠিক মতন পরিচয় বা মেলামেশার সুযোগ করিয়ে দেওয়া হয়নি, এরকম অভিযোগ ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ-কেউ করেছেন।

প্রত্যাশা বেশি থাকলে আশাভঙ্গের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। আমার সেরকম কিছু প্রত্যাশা ছিল না, জার্মান লেখকদের সঙ্গে পরিচয় বা আলাপ আলোচনার জন্য আমার কোনও ব্যগ্রতাও ছিল না। আমি গিয়েছিলাম বিনা পয়সায় ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে। সেই আনন্দে। আমি মনে করি, প্রত্যেক লেখকেরই বিশ্ব ভ্রমণ করা উচিত, কারণ লেখকেরা তো নিছক কোনও দেশের অধিবাসী নন, তাঁরা এই পৃথিবীর একজন মানুষ, তাঁদের রচনায় পৃথিবী শব্দটা আসে অসংখ্যবার, অথচ তাঁরা পৃথিবীটা স্বচক্ষে দেখবেন না? পরিতাপের বিষয় এই যে, আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকেরই নিজের দেশের বাইরে পা বাড়াবার সুযোগ নেই, (অনেকে নিজের দেশটাও পুরোপুরি ঘুরে দেখতে উৎসাহ পান না, তাও অবশ্য স্বীকার করা উচিত) ইচ্ছে থাকলেও অর্থের অনটন এবং ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝামেলার জন্য প্রবাসে যাওয়া সম্ভব হয় না। জার্মান লেখক গুন্টার গ্রাসের মতন পশ্চিমি লেখকরা যেমন দুর্দশা নগরী কলকাতাকে সশরীরে অনুভব করার জন্য মাসের পর মাস এখানে থেকে যেতে পারেন। সেইরকম কোনও ভারতীয় লেখকের যদি মনে হয় জার্মান জাতির মানসিক অধোগতির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ওদেশে কয়েক মাস থেকে আসা দরকার, তিনি তা পারবেন না, সেটা প্রায় এক অসম্ভব প্রস্তাব।

বিদেশের বেশ কয়েকটি সেমিনার দেখে আমার এই উপলব্ধি হয়েছে যে স্বদেশের সেমিনারগুলির সঙ্গেও তার কোনও তফাত নেই। দু-তিন দিনের সেমিনারে পৃথিবীর কোনও উপকার হয় না। কোনও ক্ষতিও হয় না। সাহিত্য বিষয়ক সেমিনারে সাহিত্যের গায়ে আঁচড়ও লাগে না। কিছু কথার খেলা হয়, সেমিনারের বাইরে কফিখানায় বা পানশালায় চমৎকার গুলতানি হয়। সেমিনারের প্রত্যক্ষ উপকারিতা তাতে গৌরী সেনের টাকায় প্রবাস ভ্রমণ হয়। কেউ সেই সুযোগে আর্ট গ্যালারি, থিয়েটার ও গ্রন্থাগার দেখে আসে, যার সামর্থ্য থাকে সে বিদেশি দ্রব্যের শপিং করে। প্রবীণ ঔপন্যাসিক আর কে নারায়ণকে জার্মান টেলিভিশানের সাক্ষাৎকারে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আপনি ফ্রাঙ্কফুর্টে কেন এসেছেন? সুরসিক বৃদ্ধ মৃদুহাস্যে চোখের চশমা খুলে বললেন, এসেছি দু'এক জোড়া চশমা কিনতে। শুনেছি ফ্রাঙ্কফুর্টে ভালো চশমা পাওয়া যায়।

আমি মোটেই আশা করিনি যে ভারতীয় সাহিত্যের সেমিনার হচ্ছে বলেই জার্মান জনগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগবে। এরা ব্যস্ত মানুষ, এদের অন্যান্য ভালো-ভালো কাজ আছে। জার্মান লেখকরাই বা কেন ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ক সেমিনার শুনতে রবাহূত, অনাহূত, এমনকী নিমন্ত্রিত হলেও ছুটে আসবে? আফ্রিকা বা ভারত সম্পর্কে যাদের মনে দয়া-দাক্ষিণ্যের ভাব আছে তাদের কথা আলাদা। আমাদের দেশে যদি কোরিয়ান বা অস্ট্রেলিয়ান (কথার কথা) সাহিত্যের দু-একজন প্রতিনিধি আসে, সরকারি বা কোনও দূতাবাসের উদ্যোগে সেমিনার হয়, যেমন প্রায়ই হয়, তাতে আমরা, ভারতীয় লেখকরা কি ছুটে যাই? আমন্ত্রণ পেলেও তো গড়িমসি করি। অবশ্য পশ্চিমি কয়েকটা দেশ বা সোভিয়েত দেশের লেখক প্রতিনিধি এলে তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য যে আমন্ত্রণ আসে, তার সঙ্গে খাদ্য-পানীয়ের চাপা প্রলোভন থাকে, এই গরিব দেশের অনেক লেখক সেইসব সমাবেশে গেলেও আমি কোনও দোষ দেখি না। জার্মানিতেও কোনও আমেরিকান, ফরাসি, ইংরেজ, রুশ লেখক এলে জার্মান লেখরাও তাঁদের সঙ্গে আলাপ করতে যাবেন হয়তো, খাদ্য-পানীয়ের লোভে নয়, আগে থেকেই ওইসব লেখকের নাম জানেন কিংবা তাঁদের রচনা পড়েছেন বলে। ভারতীয় লেখকদের ক্ষেত্রে সে প্রশ্নও ওঠেই না। এবারে ফ্রাঙ্কফুর্টের এই দলের দুই প্রধান প্রবীণ মূলকরাজ আনন্দ এবং অজ্ঞেয়কেও বিশেষ কেউ চেনেন বলে মনে হল না। মিডিয়া ওদের বিশেষ পাত্তা দেননি।

আমি তো ঠিক করেই ফেলেছি, কলকাতায় বিদেশি কোনও লেখক এলে, তিনি বা তাঁরা যদি আমার বাড়িতে দেখা করতে আসেন তো খুব ভালো কথা, সময় থাকলে নিশ্চিত আমি তাঁদের জন্য সময় ব্যয় করব, চা-টা খাওয়াব, গল্প করব, কিন্তু আমি নিজে থেকে তাঁদের সঙ্গে কোথাও

দেখা করতে যাব না। কী দরকার। নিজের বাড়িতে বসে যদি আমি বাংলাভাষা খানিকটা গর্বিত ভাব পোষণ করি, তাতে এমনকী দোষ হয়? অবশ্য যে বিদেশি লেখকের লেখা আমি আগে পড়েছি বা যাঁর লেখা আমার প্রিয়, তাঁর ক্ষেত্রে এ নিয়ম খাটে না। প্রিয় লেখকের কাছে তো আমি একজন পাঠক মাত্র, তাঁর কাছে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে তো অসুবিধের কিছু নেই।

আরও একটা কথা এই প্রসঙ্গে মনে আসে। কোনও একটা জাতির প্রতিনিধিত্ব করা একটা বিড়ম্বনা। বিদেশে আমার গায়ে কেউ ভারতীয় বলে মার্কা মেরে দিলে আমার অতি বাজে লাগে। যখন আমি একলা থাকি, তখন তো আমি বাঙালিও নই, ভারতীয়ও নই, একজন শুধুই মানুষ, গোটা মানব সভ্যতার একজন অংশীদার, তাই না? শেকসপিয়ার-ডিকেন্স, টলস্টয়-গোর্কি, উগো-বদলেয়ার, গ্যেটে-হাইনে পড়ার সময় কি তাঁদের জাতের বিচার করি, না মনে করি ওরা আমাদের আত্মীয়? হ্যামলেটের শোকগাথায় আমাদের চক্ষু সজল হয় কেন, ইংল্যান্ড বা ডেনমার্কের রাজবংশের খুনোখুনিতে একজন ভারতীয় হিসেবে আমার কী আসে যায়! ডস্টয়েভস্কি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মানুষ কি কোনও বিশেষ দেশ বা জাতির সীমানায় আবদ্ধ? বিদেশের কোনও কোনও সাহিত্য সমাবেশে এক এক সময় আমার চিৎকার করে, রুক্ষ কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হয়, না, না, আমি ভারতীয় নই, ভারতীয় নই, আমি একজন মানুষ, মানুষ!

এইবারে জার্মান সংবাদপত্রগুলি, বেতার ও দূরদর্শন দুজন ভারতীয় লেখক-লেখিকার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিল। সেই দুজন হলেন দয়া পাওয়ার এবং মহাশ্বেতা দেবী। দয়া পাওয়ারের কোনও লেখা আমি আগে পড়িনি, শুধু এইটুকুই জানি যে তিনি একজন দলিত লেখক, জাতে হরিজন, তাঁর কাছাকাছি মানুষের কথাই লেখেন। আমাদের মহাশ্বেতা অতি শক্তিশালিনী লেখিকা, ইদানীং তিনি আদিবাসী-উপজাতীয়দের কথাই প্রবলভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর সম্মানে আমাদের গর্ব। জার্মান মিডিয়ায় হরিজন-আদিবাসী প্রসঙ্গেই বারবার উত্থাপিত হচ্ছিল। দলিত, নির্যাতিত, হরিজন, আদিবাসী; উপজাতি, সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে সহানুভূতি নিশ্চিত শ্রদ্ধেয়, কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মিডিয়া যখন ভারতের এই দিকটিরই বেশি প্রচার করে, তখন কীরকম যেন একটা সন্দেহ হয়!

ফ্রাঙ্কফুর্ট বুক মেসের কর্তৃপক্ষ দুদিনের সেমিনার শেষ হতেই আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাননি। পরবর্তী সাতদিনের বইমেলা দেখার ও থেকে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছিলেন। সে জন্য তাঁরা অশেষ ধন্যবাদার্হ। কিন্তু থাকার ব্যবস্থাটি যে খুব একটা উপভোগ্য ছিল, সত্যের খাতিরে সেকথা বলা যাবে না। আমাদের অবশ্য ভারতের লম্বা রাস্তার পাশেপাশে ধাবার হোটেলে খাটিয়ায় শুয়ে রাত কাটানোর অভিজ্ঞতা আছে। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মেও কত রাত কাটিয়েছি, সেই তুলনায় সাহেবদের দেশে যে-কোনও হোটেলের সাদা বিছানা তো স্বর্গ। তবু কেন যেন মনে হচ্ছিল, শ্বেতাঙ্গ জাতের লেখকরা এলে নিশ্চিত উৎকৃষ্টতর আপ্যায়ন পেতেন। আন্তর্জাতিক অতিথি সৎকারে একটা নির্দিষ্ট মান আছে। এর কিছু দিন আগেই আমরা কয়েকজন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ভারত-উৎসবের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমেরিকা সফরে গিয়েছিলাম। সেখানে দরিদ্র ভারত মাতা তাঁর সন্তানদের কিন্তু আন্তর্জাতিক মানেই রক্ষণাবেক্ষণ করেছিলেন।

ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলাটি বিরাট তো বটেই এবং বিচিত্র প্রকৃতির। এ এমন এক মেলা যেখানে বই অঢেল, দর্শকও প্রচুর কিন্তু একজনও ক্রেতা নেই। কলকাতার বইমেলার সঙ্গে তো মেলেই না, এমনকী মেলা বলতে আমরা যা বুঝি তার সঙ্গেও মেলে না। বই কি মেয়েদের মুখ বা জঙ্গলের হরিণ বা শিল্পীর তুলির টান, যা শুধু দেখতেই সুখ? বই দেখতে-দেখতে, ঘাটতে-ঘাটতে যদি হঠাৎ একটি বই পছন্দ হয়, পকেট যদি তখন একেবারে নিঃস্ব না হয়, তাহলে তখুনি সেই বইটি পড়ার জন্য হস্তগত করার ইচ্ছে দমন করা কি ভয়াবহ কোনও অবদমনের পর্যায়ে পড়ে না? এই অবদমনের কোনও মানসিক চাপ নেই? ব্যবসায়ী শহর ফ্রাঙ্কফুর্টে বইমেলায় খুচরো বই বিক্রির কোনও ব্যবস্থা

নেই। এখানে এক দেশের প্রকাশকরা আসেন অন্যদেশের প্রকাশকদের সঙ্গে দরাদরি ও চুক্তির সম্ভাবনা নিয়ে, অনুবাদ সত্ত্ব, সংস্করণ ক্রয় হ্যানোত্যানো নিয়ে কথাবার্তা হয়, নিছক একজন পাঠক বা বইপ্রেমীর কোনও ভূমিকা নেই। বইমেলা নাম হলেও এটি আসলে একটি বাণিজ্যমেলা, বা উদ্দেশমূলক প্রদর্শনী, এখানে লেখকদের বিশেষ যাতায়াত নেই। পরে একসময় গুন্টার গ্রাস কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, তিনি ওই বইমেলায় কদাচিৎ যান।

সাতটি প্যাভেলিয়ান ভরা অসংখ্য বই। দু-একদিন ঘুরে-ঘুরে দেখার পর ক্লান্ত লাগে, একঘেয়ে লাগে। দর্শকদের হাতে শুধু বিভিন্ন প্রকাশকের পুস্তক তালিকা, কেউ-কেউ আবার বিনামূল্যে প্রাপ্তব্য নানানরকম মনোহারী ঠোঙা সংগ্রহ করতে আগ্রহী। একটি গোটা প্যাভিলিয়ান এবারে আলাদাভাবে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের গ্রন্থাবলির জন্য। মণ্ডপটির সম্মুখভাগ সুন্দরভাবে সজ্জিত, সেখানে ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন। এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট বড় দোকানে ভারতের বিভিন্ন ভাষার প্রকাশকরা তাঁদের বই সাজিয়ে বসেছিলেন। এ বছর ভারতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও এই মণ্ডপটিতে জন সমাগম হয়েছে সবচেয়ে কম। বিশ্ব সাহিত্যে এবং বিশ্বের বইয়ের বাজারে ভারতের ভূমিকা এখন নগণ্য। ল্যাটিন আমেরিকার যে-কোনও ছোট দেশের তুলনায়ও ভারতীয় লেখকদের বইয়ের অনুবাদ অনেক কম। পশ্চিমি দেশগুলির ঝোঁক এখন চিনের দিকে, ভারত যেন শুধুই ধর্ম আর দারিদ্র্যের দেশ। ভারতেও যে আধুনিক সাহিত্য রচিত হয় তা অনেকেই জানে না, জানার জন্য মাথাব্যথাও নেই। সোভিয়েত ইউনিয়নে তবু যা ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ হয়, পশ্চিমি ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে তার দশ ভাগের একভাগও না। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলা কর্তৃপক্ষ অবশ্য আগামী বছর থেকে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পুরস্কার ঘোষণা করেছেন।

বইমেলার দিনগুলি আমাদের কাছে কিছুটা উপভোগ্য হয়েছিল বাঙালি আড্ডায়। এ বছর বইমেলা ও দুর্গাপুজো প্রায় কাছাকাছি সময়ে পড়েছিল। ফ্রাঙ্কফুর্টে রাইন-মাইন ক্লাব নামে একটি বাঙালিদের ক্লাব আছে, তাঁরা পুজোর আয়োজন করেন। ফ্রাঙ্কফুর্টে বিদেশির সংখ্যা কম নয়, প্রতি সাত জনে একজন তবে তাদের মধ্যে যুগোশ্লাভ, ইটালিয়ান, তুর্কি, স্প্যানিয়ার্ড ও গ্রিকরাই বেশি। ভারতীয়দের সংখ্যা অকিঞ্চিৎকর, তবু তারই মধ্যে বাঙালিদের উপস্থিতি বেশ চোখে পড়ে। এখানকার বাঙালিরা বেশ করিতকর্মা, এবং অতিথিপরায়ণ ও সজ্জন। দুর্গাপুজোর সময় তাঁরা সাহিত্য সভারও আয়োজন করেছিলেন, সেই উপলক্ষে স্বদেশ থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট লেখককে নিমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এসেছিলেন সমরেশ বসু, বুদ্ধদেব গুহ, বিজয়া মুখোপাধ্যায়; কলকাতার প্রকাশকদের মধ্য থেকে গিয়েছিলেন সুপ্রিয় সরকার, বিমল ধর, অভীককুমার সরকার, অরূপকুমার সরকার, প্রসূন বসু, বাদল বসু ও আরও কেউ কেউ, এদের মধ্যে কয়েকজনের স্ত্রী। আমার স্ত্রী স্বাতীও গিয়েছিল দেব-দর্শন মানসে। পশ্চিম জার্মানির অন্যান্য শহর থেকে বেড়াতে আসা বেশ কয়েকজন বাঙালি পুরুষ ও রমণীরও সাক্ষাৎ পেয়েছি। সুতরাং মেলায় কিছুক্ষণ ঘুরেই ফিরে আমরা এসে বসতুম বাংলা বইয়ের দোকানে। দু-পাঁচ মিনিটের বেশি ইংরিজি বলতে হলে আমি ভেতরে ভেতরে হাঁপিয়ে উঠি, বাংলা আড্ডাতেই আমার পরম সন্তোষ। দেশে যাঁদের সঙ্গে প্রায়ই সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়, বিদেশে গিয়েও তাঁদের কারু সঙ্গে দৈবাৎ দেখা হলে সেই আড্ডায় একটা অন্যরকম স্বাদ আসে।

কলকাতায় কোনও বইয়ের দোকানে বেশিক্ষণ বসে থাকার সুযোগ আমাদের হয় না। কিন্তু ফ্র্যাঙ্কফুর্টে বাংলা বইয়ের দোকানে বসে আমি দেখেছি বিদেশি দর্শকদের ভাবলেশহীন মুখ। যেসব বিখ্যাত বাংলা বই স্বদেশের শত-সহস্র পাঠকের মন আন্দোলিত করেছে, সেই বই সম্পর্কে বিদেশি পাঠকের বিন্দুমাত্র আগ্রহও নেই। কেনই বা থাকবে? ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, সেই ভাষাই আবার মানুষের বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি করেছে। চিত্রশিল্প কিংবা গণিতের আন্তর্জাতিক সমমর্মিতা আছে, সাহিত্যের নেই। সাহিত্যকে নির্ভর করতে হয় অনুবাদের

ওপর। তা বলে নিজেদের উদ্যোগে প্রকৃতভাবে ভারতীয় সাহিত্যের ইংরেজি-ফরাসি-জার্মান অনুবাদ করানোর আমি পক্ষপাতী নই। তাতে কিছু সুফলও হয় না। ওদের যদি ইচ্ছে হয় ওরা করে নেবে, না করলেও ক্ষতি কিছু নেই। প্রায় পনেরো-ষোলো কোটি লোক বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাদের জনই কি বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট নয়? ওরা যদি বাংলা সাহিত্য না পড়ে তাহলে ওরাই ক্ষতিগ্রস্ত হল, সারা জীবন একটা ভালো সাহিত্যের সন্ধান না পেয়ে কিছুটা মূর্খ থেকে গেল। সেই তুলনায় আমরা বাংলাও পড়ি আবার কিছু কিছু ইংরেজি-ফরাসি-জার্মানি ইত্যাদি সাহিত্যেরও রসগ্রহণ করি। সুতরাং ওদের তুলনায় নিশ্চিত আমরা শিক্ষিততর।

সাতদিনের বইমেলায় পুরো সাতদিন থাকা হয়নি। শুধু ঘুরেঘুরে বই দেখা, খুচরা-খাচরা সাহিত্য-বাসর ও আড্ডার পক্ষেও সাতদিন বড় লম্বা সময়, তাই দিন চারেক পরেই আমরা কয়েকজন বেরিয়ে পড়লুম জার্মানির অন্যান্য অঞ্চল ভ্রমণে। টাটকা বাতাসে নিশ্বাস ও দু' চক্ষু ভরে সবুজ দেখার আনন্দ তো সব দেশেই সমান।

॥ তেইশ ॥

না, এটা মানস সরোবরের কথা নয়। অতদূর আমি এখনও যাইনি, যাওয়ার ইচ্ছে আছে।

আসামের একটি সংরক্ষিত অরণ্যের নাম মানস। কেউ কেউ বলেন মনাস বা মানাস। কিন্তু মানস নামটিই বেশি প্রচলিত এবং পছন্দসই। ভারতে যে ক'টি সংরক্ষিত বন আছে, তার মধ্যে আয়তনে এটিই সবচেয়ে বড় এবং অনতিগম্য। অনেকদিন থেকে বিশ্বস্ত লোকজনের মুখে এর সৌন্দর্যের কথা শুনেছি; পড়েওছি কিছু জায়গায়, প্রখ্যাত লেখক ই পি জি মানসের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত। বেশ কয়েক বছর ধরে আমি মানস দর্শনের বাসনা মনে মনে পুষে রেখেছি, যদিও জানতাম, একার চেষ্টায় ওখানে যাওয়া সহজ নয়।

সুতরাং অসম সাহিত্য সভার বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেয়েই সঙ্গে -সঙ্গে ঠিক করে নিলাম, এই সুযোগে মানস ঘুরে আসতে হবে। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন আসামের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পরদিন তাঁর দূতের সঙ্গে যোগযোগ হতেই আমার অভিপ্রায়ের কথা জানিয়ে দিলুম। এ বৎসর অসম সাহিত্য সভার অধিবেশন হল অভয়াঁপুর নামে একটি ক্ষুদ্র শহরে। ম্যাপ খুলে দেখে নিলাম, সেখান থেকে মানস অরণ্য বিরাট দূর নয়।

অসম সাহিত্য সভার তুল্য কোনও প্রতিষ্ঠান আমাদের বাংলায় নেই বলে এর কার্যক্রম সম্পর্কে আমাদের অনেকের সঠিক ধারণা করা সম্ভব হবে না। আসামের যে-কোনও রাজনৈতিক দলের চেয়েও এই সভা বেশি শক্তিশালী এবং জনপ্রিয়। এঁদের বার্ষিক অধিবেশন প্রতি বছরই কোনও এক শহরে হয় না। বেছে নেওয়া হয় আসামের যে-কোনও একটি অঞ্চল, সাহিত্য-সভাটি ধারণ করে বিশাল একটি মেলার আকার, আসে দূর-দূর থেকে গ্রামীণ মানুষ এই এক একটা উৎসবে যোগ দিতে। সভার বক্তৃতা দশ-বারো হাজার মানুষ টুঁ শব্দটি না করে শোনে, সবকিছু না বুঝলেও এটুকু অন্তত বুঝে যায় যে সাহিত্য বলে একটা ব্যাপার আছে, মাতৃভাষার একটা গৌরব আছে। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সরকারি আনুকূল্য প্রায় পুরোপুরি। মুখ্যমন্ত্রী সব কাজ ফেলে দু-তিন দিনের জন্য চলে আসেন এবং যে-দিন তাঁর বক্তৃতা থাকে না সেদিনও মঞ্চে দু-তিন ঘণ্টা বসে থেকে শোনেন সবকিছু। অন্যান্য অনেক মন্ত্রী বড়-বড় আমলা এবং রাজনৈতিক নেতারা ঘোরাফেরা করেন সাধারণ অতিথির মতন, দুপুরে কয়েক হাজার অভ্যাগতর সঙ্গে বসেন পংক্তিভোজনে। আসেন আসামের অধিকাংশ লেখক, কবি, শিল্পী, গায়ক। যে-শহরে সাহিত্য সভা হয়, সেখানকার রাস্তাঘাটের ঝটতি উন্নতি হয়ে যায়, তৈরি হয় নতুন বাড়ি-ঘর। সাহিত্যের জন্য আসাম এতটা করে।

*

চারপাশে ছোট-ছোট পাহাড়ে ঘেরা অভয়াপুর শহরটি প্রায় গ্রামের মতন, অত্যন্ত ঝকঝকে সুন্দর। এককালে ছিল ছোট একটি রাজ্য বা জমিদারি, প্রাক্তন রাজাদের বাড়িটিতে এখনও বসতি আছে। এইখানকার মেয়ে বাসন্তী দেবীকে বিয়ে করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ, তাই প্রবীণেরা এখনও দেশবন্ধুকে অভয়াপুরের জামাই বলে মনে করেন। এই জায়গাটি গোয়ালপাড়া জেলার মধ্যে, এবং গোয়ালপাড়া আর ভুটান রাজ্যের সীমান্তেই মানস অরণ্য।

কথা ছিল, আমার জন্য থাকবে একটি গাড়ি, সঙ্গে যাবেন আরও দু-তিন জন এবং বন বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অতি উৎসাহী ব্যক্তি। কিন্তু সাহিত্য সভার কাজে অনেকে নিযুক্ত, তা ছাড়া হঠাৎ-ঘোষিত নির্বাচনের জন্যও সবাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, সুতরাং বন্দোবস্তে অনেক ফাটল দেখা দেয়।

যাঁদের সঙ্গে যাওয়ার কথা, তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায় না, গাড়ির জোগাড় হয় না ঠিক মতন, আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রচারসচিব শ্রী দাশ খানিকটা বিব্রত হয়ে পড়েন। তিনি প্রস্তাব দেন, আমি যদি পরে আবার কখনও আসি, তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন, এবার ঠিক সম্ভব হবে না। কিন্তু আমি যাব ঠিক করেছি, যাবই। অন্তত শেষ পর্যন্ত চেষ্টা দিতে হবে।

শেষ চেষ্টার জন্য অভয়াপুর থেকে শ্রী দাশের গাড়িতে চলে এলাম বরপেটা রোডে। গাড়ি চালাচ্ছিলেন শ্রী দাশ নিজে, তাঁর মুখে চিন্তার রেখা। একা-একা আমায় ছেড়ে দিলে আমার কোনও বিপদ ঘটতে পারে, তিনি ভাবছিলেন। মানসে একা-একা কেউ যায় না। মানসে খাবার-দাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই। ওখানে হিংস্র জন্তু, বিশেষ করে হাতির উপদ্রব খুব। এরকম জায়গায় একলা কোনও অতিথিকে কেউ পাঠায় না। তবে জেলার অরণ্য-অফিসার শ্রী লাহানকে পাওয়া গেলে আর কোনও চিন্তা নেই, তিনি অতি উৎসাহী মানুষ, তিনি সঙ্গে যাবেন এবং সব ব্যবস্থা করে দেবেন। বরপেটা রোডে শ্রী লাহানের বাড়িতে গিয়েও তাকে পাওয়া গেল না। তিনি হঠাৎ গৌহাটি চলে গেছেন। শ্রী দাসের মুখ আরও শুষ্ক হল।

আমি কিন্তু মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলাম। যত শুনছি আর কোনও সঙ্গী পাওয়া যাবে না, তত আমার উৎসাহ বাড়ছে। আমি একাচোরা মানুষ, একা-একা বেড়াতেই ভালোবাসি।

বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দল বেঁধে অনেক জায়গায় গেছি অবশ্য, কিন্তু কোথাও গিয়ে নতুন কারুর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে আমার উৎসাহ কম। আমি সু-আলাপী নই। তা ছাড়া দল বেঁধে দেখা আর এই দেখার স্বাদই আলাদা। মানস অরণ্য আমি আপন মনেই দেখতে চাই। আমার চাই শুধু একটা গাড়ি, কেন না, পায়ে হেঁটে কিছুতেই একদিনে মানসে পৌঁছনো যায় না, সেখান থেকেই অন্তত পঁয়ত্রিশ মাইল রাস্তা।

উলটো দিকে পনেরো-কুড়ি মাইল উজিয়ে আসা হল বরপেটা শহরে। সেখানে শ্রী দাশের জেলা-সহকারীর অফিসে যদি সেই সহকারীকে পাওয়া যায়। তিনিও নেই। সেদিন রবিবার কে কোথায় যাবে ঠিক নেই তো। সেই অফিসে আছে একটি জিপ। জিপই দরকার, জঙ্গলের পাহাড়ি রাস্তায় অ্যামবাসেডর সুবিধা-জনক নয়। কিন্তু জিপটা আছে, নেই তার ড্রাইভার। ছুটির দিনে সে-ও কোথায় যেন গেছে।

শ্রী দাশ অত্যন্ত ভদ্রতাসম্মত উপায়ে আমাকে নিরস্ত করার আরও অনেক চেষ্টা করলেন। নেহাত আমি অতিথি, তাই রূঢ় কথা বলতে পারেন না। আমিও ততোধিক ভদ্রতার সঙ্গে আমার গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করছিলাম।

আসলে, আমাকে মানস-ভ্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও তিনি যে সুচারু বন্দোবস্ত করে উঠতে পারছেন না, এজন্য তিনি লজ্জিত ও আমার নিরাপত্তা বিষয়ে চিন্তিত বোধ করছিলেন। আমি তাঁর

ওই লজ্জাটুকুর সুযোগ নিচ্ছিলাম পুরোপুরি। আমি সাহিত্যসভা-টভা এড়িয়ে চলি, যদি না তার সঙ্গে আলাদা ভ্রমণের আনন্দ যুক্ত থাকে। অনেক তেতো ওষুধের অনুপান যেমন মধু।

শ্রী দাশের গাড়িতে, তাঁর পাশে একটি ষোল-সতেরো বছরের ছেলে বসেছিল। শ্রী দাশ তাকে জিগ্যেস করলেন, কী রে, তুই পারবি? ছেলেটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। তিনি বললেন, তাহলে দ্যাখ, জিপটা চালু অবস্থায় আছে কি না।

ছেলেটি নেমে যাওয়ার পর শ্রী দাস আমাকে বললেন, এই ছেলেটি আমার গাড়ি চালায়। কিন্তু ও কোনওদিন জিপ চালায়নি। ওকে নিয়ে যাওয়া কি ঠিক হবে আপনার?

আমি বললাম, কেন, অসুবিধে কী আছে?

উনি বললেন, যেতে-যেতেই অন্ধকার হয়ে যাবে, রাস্তা খুব খারাপ, এই ছেলেটা কোনওদিন জিপ চালায়নি, যে-কোনও সময় অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে—

আমি বললাম, কিচ্ছু হবে না, কোনও চিন্তা নেই। উনি বললেন, সন্ধের পর রাস্তার ওপর হাতি বসে থাকে।

আমি বললাম চমৎকার! তা হলে তো যেতেই হবে।

শ্রী দাশ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বিকেল গাঢ় হয়ে এসেছে। পশ্চিম দিকে লম্বা লম্বা ছায়া। এর মধ্যে সেই ছেলেটি জিপ গাড়িটি বার করে এনেছে রাস্তায়। গাড়িটি থেকে মাঝেমধ্যে অদ্ভুত গর্জন রব বেরুচ্ছে—নতুন সওয়ারিকে পিঠে নিয়ে অবাধ্য ঘোড়া যেমন বিরক্তি প্রকাশ করে! জিপটিকে তেল-জল-মোবিল দিয়ে সুস্থির করতে আরও আধঘণ্টা কাটল, ততক্ষণে পুরোপুরি সন্ধ্যা। চিন্তা ভারাক্রান্ত শ্রী দাশের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা এগিয়ে পড়লুম।

ষোলো-সতেরো বছরের অসমিয়া ছেলেটির নাম অতুল ওঝা। সে অত্যন্ত কম কথা বলে। কিংবা জীবনে প্রথম জিপ চালনার দায়িত্ব পেয়ে সে এতই ব্যস্ত যে কথা বলার সময় নেই। আমার সব প্রশ্নের সে শুধু হ্যাঁ বা না উত্তর দেয়।

যাত্রার আগে কয়েকটি তথ্য আমরা সংগ্রহ করে নিয়েছিলাম। বরপেটা রোডের বাজারে রাত্রির আহার সেরে পরের দিনের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে হবে। কেন না, তারপর মাইল পঁচিশেকের মধ্যে আর কোনও দোকান নেই। চেক পোস্ট থেকে প্রায় মাইল পনেরো দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে ডাক বাংলোতে খাদ্যব্যবস্থা রাখা সম্ভব হয় না। তবে বাংলোতে আমার নামে একটা ঘর আগে থেকেই রিজার্ভ করা আছে, সে জন্য চৌকিদার আমাকে ফেরাবে না, এবং আমি সঙ্গে চাল ডাল নিয়ে গেলে সে রান্না করে দেবে। মানস অরণ্যে দর্শনার্থী অধিকাংশই সাহেব হয়, তারা সঙ্গে টিনের কৌটোয় খাদ্য ও পাঁউরুটি নিয়ে যায়। ডাকবাংলোয় আলো নেই, আমাদের মোমবাতিও নিতে হবে সঙ্গে করে। বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছোবার আগেই নিকষ কালো রাস্তায় জিপ গাড়িটা দু-বার হেঁচকি তুলে থেমে গেল। আমি সচকিতে ওঝাকে জিগ্যেস করলাম, কী হল?

সে কোনও উত্তর না দিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলল। আমি নিজেও কখনও জিপ চালাইনি, গাড়ির যন্ত্রপাতি বিষয়ে কিছু বুঝি না। ছেলেটির পাশে গিয়ে এমনই উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলুম। ফিনফিনে ধারালো হাওয়ায় বেশ শীত। কলকাতায় এই সময় শীত অনেক কমে গেছে বলে বেশি কিছু গরম বস্ত্র আনিনি। সিগারেট ধরিয়ে ঘন-ঘন টান দিতে লাগলুম। এতক্ষণ আমি বেশ মজাই পাচ্ছিলুম সব কিছুতেই, কিন্তু রাস্তার মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়াটা একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মাঝেমাঝে দু-একটা ভারী চেহারার গাড়ি যাচ্ছে এদিক-ওদিক দিয়ে, আমার ভয় হল, এই অন্ধকারে কোনও লরি হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে জিপটি আমাদের ঘাড়ের ওপর ফেলে না

দেয়। ছেলেটি আমাদের গাড়ির ব্যাকলাইট জ্বেলে রাখেনি। সেটা জ্বেলে দিয়ে জিগ্যেস করলাম, কী হে ওঝা, এ গাড়ি যাবে তো?

সে বলল, হ্যাঁ, যাবে।

আবার কিছুক্ষণ খুটকাট।

এক এক সময় মনে হয়, গাড়িরও বুঝি প্রাণ আছে। অন্তত ইচ্ছা-অনিচ্ছা শক্তি আছেই। এই জিপটা বোধহয় তার নিজের ড্রাইভার ছাড়া অন্য কারুর হাতে যেতে চাইছে না। বিশেষত এই রকম একটা বাচ্চা ছেলের হাতে। নইলে, জিপটার বেশ নতুন-নতুন চেহারা, হঠাৎ এরকম পঙ্গু হওয়ার কথা নয়।

ছেলেটিও জেদি কম নয় কিন্তু, লেগে রইল অনেকক্ষণ, এবং শেষ পর্যন্ত কিছু আওয়াজও বার করে ছাড়ল। এবার সে আমাকে জিগ্যেস করল, আমি স্টিয়ারিং-এ বসে সুইচ দিয়ে অ্যাকসিলেটর পা দিয়ে বসতে পারব কি না। এটুকু আমি পারি। সেরকম বসবার পর, কয়েকবারের চেষ্টায় ইঞ্জিন আবার গর্জন করে উঠল। তার ফলে, বরপেটা রোড বাজারে পৌঁছতে আমাদের সাড়ে সাতটা বেজে গেল।

একটা ছোট হোটেলে ঢুকে আমরা দুজনে খেয়ে নিলাম গরম গরম ভাত আর মাংস। অত্যন্ত সুখাদ্য। যাঁরা পাঁঠার মাংস খেতে ভালোবাসেন, তাঁরা এইসব দূরের ছোটখাটো জায়গায় মাছ ডিম বা মুরগি না চেয়ে মটন কারিই চাইবেন। কারণ এইসব জায়গায় পাওয়া যায় নরম কচি পাঁঠার ঝোল তার স্বাদই আলাদা। কলকাতার বাজারে ওঠে শুধু ধেড়ে ধেড়ে ছাগল আর রাম ছাগল।

রাত্রির খাওয়া সেরে নিয়ে পরের দিনের জন্য বাজার। চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ সব এক কিলো করে। ডিম পাওয়া গেল না, মাখনও না। ঠিক আছে, একদিন নিরামিষেই চালাতে হবে। এক ডজন মোম কেনার পর একটা টর্চও কিনে ফেললাম। সিগারেট দেশলাইয়ের স্টকও রইল।

একটা জিনিস নিতে ভুলে গিয়েছিলাম, গাড়িতে ওঠার পরও ওঝাকে আবার পাঠালাম দোকানে। কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা যা সঙ্গে না থাকলে আমি খাদ্যে কোনও স্বাদই পাই না।

এবারেও গাড়ি স্টার্ট নিতে চাইল না।

অ্যাকসিলেটরে চাপ দিলে খানিকটা ঘ্যাসঘেসে শব্দ করেই থেমে যায়। গাড়িটি সত্যিই বেয়াদপি করছে। লোকালয়ের মধ্যে গাড়ি খারাপ হলেই কিছু কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমে। অনেকে অযাচিতভাবে আমাকে জিগ্যেস করল, কোথায় যাবেন?

আমি মানস যাব শুনে কেউ-কেউ ভুরু তুলল। মানসে তো কেউ রাত্তিরবেলা যায় না, ঢুকতেই দেয় না ভেতরে।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমার জন্য ব্যবস্থা আছে। আমাকে ঢুকতে দেবে।

তখন দু-একজন বলল, এরপর রাস্তা খুব খারাপ। আর কোনও মানুষজন বা দোকানপাট নেই। গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে খুব বিপদে পড়বেন।

ওরা এমনভাবে কথা বলছে, যেন এখানেই সভ্য জগতের শেষ। এরপর শুধু অরণ্য প্রকৃতির রাজ্য।

খানিকটা পরে অবশ্য আমরাও অনেকটা সেরকমই মনে হল। লোকজনের সামনে আত্মসম্মান রক্ষা করার জন্যে গাড়িটা একটু বাদেই চলতে শুরু করেছিল। কাছাকাছি একটা রেল লাইন পেরিয়ে যাওয়ার অল্প কিছু পরেই পথ গৃহ-বিরল হয়ে এল, তারপর দুপাশে শুধু ধুধু মাঠ। পথের অবস্থা সাংঘাতিক। পথটা এককালে কেউ পাকা করে বানিয়েছিল, তারপর এর কথা একদম ভুলে গেছে। মাঝে-মাঝেই প্রকাণ্ড গর্ত, ঠিক ঘোড়ার পিঠে সওয়ারের মতন লাফাতে-লাফাতে চলেছি।

দুপাশ খোলা জিপ। হু-হু করা ঠান্ডা হাওয়ায় আমার হাত-পা আড়ষ্ট করে দিচ্ছে একেবারে। গায়ে শুধু একটা পাতলা সোয়েটার। ব্যাগে এক বোতল ব্র্যান্ডি ছিল, সেটা খুলে কয়েকবার কাঁচা চুমুক দিতেই হাত পায়ের সাড়া একটু ফিরে এল।

জিপ গাড়িটি সত্যিই বড় বেয়াদপ। বেশ বড় কোনও একটা গর্ত লাফাবার পরই হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায়। গিয়ার বদলাবার সময় মড়-মড় মড়াৎ করে বীভৎস শব্দ ওঠে। যেন সে আমাদের নিয়ে যেতে খুবই অনিচ্ছুক। রেলগাড়ির চলার শব্দের যেমন অনেক রকম ভাষা আছে, তেমনি এই জিপ গাড়িটির গর্জনের মধ্যেও ফুটে ওঠে একটা কথা। 'এখনও ফেরো, এখনও ফেরো'। কিন্তু কিশোর ড্রাইভারটি কিছুতেই অবদমিত হয় না। যতবার স্টার্ট থামে, ততবার সে লাফিয়ে নেমে গিয়ে বনেট খুলে কীসের যেন টুং টাং শব্দ করে। সে আগে কখনও জিপ না চালালেই বা, জিপের যন্ত্রপাতি ঘাঁটাঘাঁটি করতে তার কোনও দ্বিধা নেই। প্রতিবারই জিপটা একটু পরে চলতে বাধ্য হয়। সেইজন্য আমার আর ভয় করে না। মনে হয়, হাতে একটা চাবুক থাকলে ঘোড়ার মতন, এই জিপটিকে বারবার ছপটি মেরে শায়েস্তা করা যেত।

জেনে এসেছি, এর পর আমাদের যেতে হবে একটা চা বাগানের ঠিক মাঝখান দিয়ে। দুপাশে চা গাছের সারি দেখে বুঝলাম, আর বেশি দেরি নেই, চা বাগানটা পেরুলেই আমরা জঙ্গলের চোকপোস্টে পৌঁছে যাব। সেখানে যখন এলাম, তখন রাত ঠিক ন'টা।

চেকপোস্টে তালা ঝুলছে, পাশে একট বড় বোর্ডে এই মর্মে নোটিশ লেখা আছে যে সন্ধে ছ'টার পর আর কারুকে এই অরণ্যে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় না। সেটা দেখায় বিচলিত বোধ করলুম না আমি। ওরকম অনেক লেখা থাকে, সবাই সবকিছু মানে না।

কাছেই ফরেস্ট অফিস, সেখানে ড্রাইভার ছেলেটিকে পাঠালাম গেটম্যানকে ডেকে আনবার জন্য। এখানে আরও কয়েকটি বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে, সম্ভবত চা-বাগান সংক্রান্ত লোকেরা থাকে। একজন লোক গান গাইতে গাইতে পায়চারি করছে রাস্তায়। টপ্পা অঙ্গের গান। সম্ভবত শীতের জন্য লোকটির গলায় টপ্পার কাজ বেশি খেলছিল। আমিও গুনগুন করে একটা গান ধরলাম। 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না' গানটার 'তোমায়' জায়গাটার কাজ আমার গলায় আসে না, কিন্তু এখন বেশ পেরে গেলাম। আহা, কেউ শুনল না।

ওঝা ফিরে এল বেশ খানিকক্ষণ পরে। মুখ শুকনো করে জানাল, গেটকিপার বলছে, এখন গেট খুলবে না।

আমি বিরক্তভবে বললাম, এখন খুলবে না তো কখন খুলবে।

—সারারাত খুলবে না, কাল সকালে খুলবে।

—সারারাত তাহলে আমরা এখানে বসে থাকব নাকি? চলো, আমি যাচ্ছি ওর কাছে। টপ্পা গায়কটি এবার গান থামিয়ে পাশে এসে বলল, গেট খুললেও তো আপনি যেতে পারবেন না। হাতি মহারাজ আটকে দেবে!

আমি বললাম, হাতি জিপ গাড়িকে কী করবে? পাশ দিয়ে চলে যাব।

লোকটি বলল, সরু রাস্তা, হাতির পাল ওই রাস্তা দিয়ে যেতে ভালোবাসে, ঠিক এই সময় রোজ বেরোয়—আপনি গাড়ি ঘোরাতে পারবেন না। হঠাৎ ধাক্কা মেরে ফেলে দেবে!

পথের উটকো লোকেদের কথা আমি একদম বিশ্বাস করি না, কিছু লোক সব সময়েই আলটপকা উপদেশ দিতে আসে।

আর কোনও উত্তর না দিয়ে ড্রাইভার ছেলেটির সঙ্গে আমি গেলাম গেটকিপারের ঘরে।

গেটকিপার নিতান্ত হেলাফেরার লোক নয়। প্যান্ট সার্ট পরা, দু-একটা ইংরিজি বলে, তার ঘরে একটা রেডিও টেলিফোনের সেট আছে। সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে সে আমার প্রস্তাব একেবারে উড়িয়েই দিল। বলল, অসম্ভব, এত রাতে আমরা কারুকে যেতে দিই না, আপনি যেতে পারবেনই

না। সাতদিন আগে হাতি একটা লোককে মেরে ফেলেছে। ভুটানের ডি এফ ও সাহেব রাত্তিরের দিকে দুবার যেতে গিয়েও ফিরে এসেছেন।

আমি বললাম, আমরা তো আর জঙ্গলের মধ্যে রাত্তিরবেলা ঘুরতে যাচ্ছি না! সোজা গিয়ে বাংলোতে উঠব। বাংলোতে আজ রাত্তিরের জন্য আমার ঘর রিজার্ভ করা আছে।

লোকটি বলল, এখান থেকে বাংলো একুশ কিলোমিটার দূরে। পুরোটা পথ আপনাকে যেতে হবে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে, এর মধ্যে কোনও এক জায়গায় হাতি রাস্তা আটকে দিলেই আর কোনও যাওয়ার উপায় নেই! আপনি গাড়ি ঘোরাতেও পারবেন না। মারা পড়বেন। আজ ফিরে যান, কাল সকালে আসবেন!

আমি একটু দমে গেলাম, এত দূর এসে ফিরে যাব? এখন আবার বরপেটা শহরে ফিরতে হলে ঘণ্টা দু-এক লেগে যাবে। অত রাত্রে যেখানে গিয়েই বা থাকবো কোথায়, কারুকে তো চিনি না। সারারাত জিপের মধ্যে কাটাতে হবে, এই শীতের মধ্যে? তার চেয়ে ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়াই ভালো। যে-কোনও কারণেই হোক, হাতি সম্পর্কে খুব ভয় জাগছে না মনের মধ্যে। অতবড় একটা জানোয়ারকে দূর থেকে দেখে কোনওভাবে নিশ্চয়ই পালিয়ে বাঁচা যাবে।

এইসব জায়গায় কয়েকটা বড়-বড় নাম উচ্চারণ করলে অনেক সময় কাজ দেয়। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আমি আসামের হোম মিনিস্টারের গেস্ট। চিফ কনজারভেটার অব ফরেস্টের কাছে আমার বন্ধু আমার নামে চিঠি লিখেছেন, আমি আজ অসম সাহিত্য সভায়...

ফল হল একেবারে উলটো। লোকটি বলল, আপনি গভর্নমেন্টের গেস্ট বলেই তো এত চিন্তা করছি। আপনি যে আসবেন, সেকথা আর টি-তে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই দেখুন না, আমার খাতায় আপনার নাম লেখা আছে। কিন্তু আপনার প্রাণের দায়িত্ব কে নেবে? আপনার কিছু হলে আমাদের কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

আমি বললাম, আপনাদের কাছে পটকা থাকে না?

লোকটি অবাক হয়ে বলল, পটকা? পটকা কি?

এর আগে একবার উত্তরবঙ্গেও জঙ্গলে একরকম পথজুড়ে হাতি চলাচলের কথা শুনেছিলাম। রাজা-ভাত-খাওয়া ছাড়িয়ে জয়ন্তী নদীর ওপরে যে বন, তার ভেতরের রাস্তার ওপর দিয়ে এক এক সময় পারাপার করে পঞ্চাশ ষাটটা হাতির পাল। এদিকে, বক্সাইট না ডলোমাইট কী যেন আনবার জন্য ওই রাস্তা দিয়ে কিছু ট্রাকও যায়। হাতির পালের মুখোমুখি পড়ে গেলে ট্রাক থেকে দুম দাম করে পটকা ফাটানো হয়। সেই আওয়াজে হাতির পাল সরে যায়। বুঝলাম, এখানে সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই।

বললাম, আমার প্রাণের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সে কথা আমি লিখে দিয়ে যেতে রাজি আছি। এতদূর এসে আমি ফিরে যাব না।

লোকটি দু-এক মিনিট চুপ করে রইল। তারপর অসন্তুষ্টভাবে বলল, রেঞ্জার সাহেব এখনও ফেরেননি, তিনি থাকলে দায়িত্ব নিতে পারতেন। আমি একা...তা ছাড়া...

এবার সে ড্রাইভার ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, তা ছাড়া এইটুকু একটা ছেলেকে নিয়ে আপনি ওই সাংঘাতিক রাস্তায় যাবেন? এ তো পারবেই না যেতে! এই ছোকরা, তুই যেতে পারবি?

আমি দম বন্ধ করে অতুল ওঝার দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই বিপদের সম্ভাবনার কথাটা আমার মনেই পড়েনি। এ যদি রাজি না হয়, তা হলে আমার আর কোনও আশাই নেই!

অতুল ওঝা বীরের মতন উত্তর দিল, হ্যাঁ আমি সাহেবকে ঠিক পৌঁছে দিতে পারব। আমি ভয় পাই না।

আমি বুক খালি করা একটা নিশ্বাস ছাড়লাম। ছেলেটিকে আমার মনে হল বন্ধুর মতন।

সেই সঙ্গে মনে হল, ভাগ্যিস, কোনও পুরোনো অভিজ্ঞ ড্রাইভারকে পাওয়া যায়নি। অনেকদিন ধরে সরকারি চাকরি করছে, এমন কোনও ড্রাইভার হয়তো এই অবস্থায় যেতে রাজি হত না। বহুদিন চাকরি করতে-করতে কীরকম যেন একটা ক্ষয়াটে ঘুণধরা মন হয়ে যায়। তখন 'ডিউটি' ছাড়া আর কিছু সম্পর্কেই উৎসাহ থাকে না। নিছক চাকরির খাতিরে কেন একজন ড্রাইভার আমাকে এরকম ঝুঁকির রাস্তায় নিয়ে যাবে এই রাত্তিরে। সে অনায়াসেই বলতে পারত, না স্যার পারব না, আমি এখন বাড়ি গিয়ে ঘুমবো! জোর করার কোনও উপায় ছিল না আমার, কারণ আমি অতিথি মাত্র, সরকারি কেউকেটা তো নই!

অতুল ওঝার কাঁধে হাত দিয়ে আমি ফিরে এলাম। গেটম্যান অনিচ্ছার সঙ্গে তালা খুলে দিয়ে বলল, আমি আধঘণ্টা অপেক্ষা করব। খানিকটা গিয়ে বেগতিক দেখলে ফিরে আসবেন। তার পরে এলে কিন্তু আমায় আর পাবেন না। আমার ডিউটি ওভার হয়ে গেছে।

আমি বললাম, ঠিক আছে, জেনে রাখলাম, ধন্যবাদ!

অতুল ওঝা বয়েসে প্রায় কিশোর হলেও বেশ বুদ্ধিমান, তা এই সময় বুঝলাম। সে জিপটার স্টার্ট বন্ধ করেনি। এতক্ষণ ধরে জিপটা ধকধক করেছে। এই সময়, গেটম্যানের সামনেই যদি জিপটা স্টার্ট নিয়ে গোলমাল করত, তাহলে অপমানের একশেষ হতে হত নিশ্চয়ই। তার বদলে, গেট পেরিয়ে সামনের অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়ল জিপটা।

গেট পেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই অন্যরকম অনুভূতি হয় এখন আমরা জঙ্গলের মধ্যে। যদিও সেখানে তেমন কিছু জঙ্গল নেই। সেটা পূর্ণিমার কাছাকাছি রাত, ফিকে জ্যোৎস্নায় দেখা যায়, চারপাশে প্রায় ফাঁকা মাঠ, এখানে ওখানে দু-একটা গাছ। তবু তো এক ঘোষিত অরণ্যের মধ্যে এসে পড়েছি, এ জায়গাটা বাইরের থেকে আলাদা।

প্রায় দু-কিলোমিটার পথ পার হওয়ার পর জঙ্গল শুরু হয়। তাও এমন কিছু নয়, রাস্তর দুপাশে বড়-বড় ঘাস, এখানে সেখানে ছড়ানো গাছপালা। দেখলে কোনও ভয়ের অনুভূতি হয় না। রাস্তা বেশ খারাপ, মাঝেমাঝে কাঠের ব্রিজ।

ব্রিজগুলোর চেহারা সুবিধাজনক নয়, দুপাশে দুটো কাঠের পাটাতন যার ওপর দিয়ে গাড়ি যাওয়ার কথা। অনভ্যস্ত হাতে আমার ড্রাইভার এক একবার সেই পাটাতন থেকে বিচ্যুত হচ্ছে আর শব্দ উঠছে ঘট-ঘটাং।

আমি অতুল ওঝার কাঁধে হাত রেখে জিগ্যেস করলাম, তুমি এ রাস্তায় আগে কখনও এসেছ। সে বলল, না স্যার।

—এরকম জঙ্গলের রাস্তায় গাড়ি চালিয়েছ কখনও?

—না, সাব!

—ভয় করছে?

—না, সাব!

—আমরা ঠিক পৌঁছে যাব, কী বলো?

—হ্যাঁ, সাব।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে হেড লাইটের আলোয় রাস্তার ওপরেই দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। ঠিক সচেতনভাবে নয়, অচেতনভাবেই বোধহয় আমি দেখে নিলাম চোখ দুটির উচ্চতা কতখানি। খুব বেশি নয়। এবং কাছাকাছি আরও কয়েকটি চোখ।

আর একটু কাছে আসবার পর দেখা গেল কয়েকটি চিত্রল হরিণ ও একটি বড় সম্বর। হরিণগুলি জিপ গাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল দু-তিন পলক, তারপর এক পলক ফেলার চেয়েও কম সময় তাদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে লাফিয়ে উঠে, বায়ুতে সাঁতার কেটে অদৃশ্য হয়ে গেল পাশের অন্ধকারে। সম্বরটি দাঁড়িয়েই আছে, দুটি সরল নির্বোধ চোখ, আমরা যখন খুব কাছে, যখন প্রায়

একটা লাঠি বাড়িয়েই তাকে ছোঁয়া যায়, সেই সময় তার ঘোর ভাঙল, পেছন ফিরেই উন্মত্তের মতন লাফিয়ে পড়ল একটা ঝোপে, হুড়মুড় করে শব্দ হল।

এরপর দেখতে পেলাম কয়েকটি ময়ূর। তারা লীলায়িত ভঙ্গিতে রাস্তা পার হচ্ছিল, আলোয় তাদের পালকের বর্ণসম্ভার চকিতে ঠিকরে ওঠে, তারা প্রত্যেকেই গ্রীবা ঘুরিয়ে একবার তাকায় গাড়ির দিকে। কী অসম্ভব ক্রুর ভয়াল তাদের চোখ! রাত্রিবেলা যে-কোনও জন্তু জানোয়ারের চোখই অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ কোনও বিড়াল বা বা গরুর চোখও অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ আলোয় অচেনা নিষ্ঠুর হয়ে যায়। রাত্রিবেলা মোষের চোখের চেয়ে উজ্জ্বল কোনও জিনিস আমি এ পর্যন্ত দেখিনি। ময়ূরের চোখও অন্যরকম। এদের চোখের মধ্যে থেকে যেন ঝিলিক দিয়ে ওঠে একরকমের বেগুনি ধরনের আলো।

এক ধরনের পাখির চোখেও এরকম আলো দেখলাম। শুধু এই জঙ্গলে নয়। এর আগেও রাত্রির ড্রাইভে বাইরের ফাঁকা রাস্তায় এই ধরনের পাখি চোখে পড়ে। এরা রাস্তায় শুয়ে থাকতে ভালোবাসে। এগুলো কী পাখি? বাদুড় নয়, গায়ের রং গাঢ় খয়েরি, ডানা মেলে শুয়ে থাকে পিচের রাস্তায়, চোখ দুটি আগুনের ফুলকির মতন, গাড়ি খুব কাছে এলে এরা ডানা ঝটপটিয়ে উড়ে যায়।

আরও কয়েকটি হরিণ ও সম্বর পার হয়ে এলাম। হরিণ যতই সুন্দর প্রাণী হোক, রাত্রিবেলা তারা আমাদের মুগ্ধ করে না। রাত্তিরবেলা দলবেঁধে সংরক্ষিত অরণ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার অনেক আছে। প্রত্যেকবারই দেখেছি, কেউ হরিণ পছন্দ করে না। কারণ ঘুরতে-ঘুরতে হরিণ বা বুনো শুয়োরই বেশি চোখে পড়ে, বারবার। কেউ-কেউ বিরক্তির সঙ্গে বলে ওঠে, 'আঃ হরিণ দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল।' কেন না, তখন সকলেরই আগ্রহ আরও কোনও বড় জানোয়ারের জন্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদের দেখা পাওয়া যায় না। আপাতত আমাদের অধীর অপেক্ষা যেমন হাতির জন্য।

খানিক পরে পাশের ঝোপ থেকে দুটি বেশ বড় প্রাণী বেরিয়ে এসে আমাদের গাড়ির ঠিক সামনের দিকে ছুটতে লাগল। জিপের চেয়েও তাদের ছোটার গতি বেশি দ্রুত। প্রথমে বেশ চমকে ও ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছিল গন্ডার। সেই রকমই দেহের আকার। জলদাপাড়া ও কাজিরাঙ্গার মতন মানসেও বেশ কিছু এক-খড়্গা গন্ডারের বাস। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পরে ভুল ভাঙলো। গন্ডার নয়, মোষের মতন কোনও জানোয়ার, কারণ খড়্গা নেই, বিরাট পাকানো শিং। হতে পারে বাইসন, নাও হতে পারে, বন-গরু হওয়াও বিচিত্র নয়, শুনেছি বন-মোরগের মতন বন-গরুও আছে এ তল্লাটে। এদের মাথা দুটি আমরা ভালো করে দেখতে পেলাম না, কিছুক্ষণ আমাদের সামনে রেস দিয়ে ওরা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর দশ-পনেরো মিনিট আর কিছু নেই। একটা পাখি পর্যন্ত না। সব দিক নিঃসাড়, নিঃশব্দ। রাত দশটা বেজে গেছে। রাস্তার সামনের দিকে তাকালে মনে হয় যেন একটা সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি। দুপাশের বড়-বড় গাছ ওপরের দিকে গোল হয়ে এসে মিলে গেছে, রাস্তার দুপাশে উঁচু উঁচু ঘাস। এগুলোকেই বোধহয় এলিফ্যান্ট গ্রাস বলে।

রাস্তা ফাঁকা দেখে ওঝা বেশ জোরে চালাচ্ছে। ছেলেটির আত্মবিশ্বাসের অভাব নেই। কিন্তু আমি ওকে একটু সংযত হতে বললাম। হঠাৎ একটা শায়িত হাতির গায়ে ধাক্কা মারা কোনও কাজের কথা নয়। তখন আর কোনও উপায়ই থাকবে না। তা ছাড়া রাস্তা এত খারাপ যে দুর্ঘটনায় মরার সম্ভাবনাই বেশি।

শীতের জন্যই কি না জানি না, হঠাৎ শরীরে একটা শিহরন জাগল, আর কোনও জন্তু-জানোয়ারের দেখা পাচ্ছি না বলেই যেন মনে হচ্ছে, আমরা এবারেই সবচেয়ে বিপদের এলাকায় এসেছি। ভয় ও অস্বস্তি কাটাবার জন্য ব্র্যান্ডির বোতল থেকে আর একটা লম্বা চুমুক দিলাম। চোখ

দুটি যথাসম্ভব খর করে সামনের দিকে স্থির। দূরের ঝুপসি-ঝুপসি গাছপালাকে মনে হচ্ছে হাতির পাল। যেন, যে-কোনও মুহূর্তে আমাদের পথ আটকে যাবে।

হঠাৎ মনে হল, আমি যাচ্ছি কেন? এতগুলি লোক নিষেধ করেছে যখন, তখন নিশ্চিত কিছুটা প্রাণের ঝুঁকি আছে। পথ জুড়ে যদি হাতির পাল শুয়ে থাকে তাহলে এখন কী করব? অর্ধেকের বেশি রাস্তা পার হয়ে এসেছি। এখন আর ফেরার উপায় নেই। রাস্তার অবস্থা ক্রমশ আরও শোচনীয় হচ্ছে, বিরাট-বিরাট গর্তে চাকা পড়ে লগবগ করছে স্টিয়ারিং। একবার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেলেই শেষ। তাহলে এত ঝুঁকি নিয়ে এলাম কেন? আমি তো কোনও দুঃসাহসী অভিযাত্রী নই, সাধারণ ভ্রমণকারী মাত্র। রাত্তিরটা নিরাপদে কাটিয়ে কাল সকালে নিশ্চিন্তে নির্ভরযোগ্য ড্রাইভার নিয়েই তো আসা যেতে পারত। তাতে দিনের আলোয় প্রাণ বাঁচিয়ে প্রকৃতি দর্শন হত। কিংবা, কাল সকালেও যদি আসবার অসুবিধে থাকত, এ যাত্রায় হত না মানস ভ্রমণ, তাতেই বা কি ক্ষতি এমন? এ জীবনে কত কিছুই তো দেখা হয়নি। আমার মনের একটা অংশ আর একটা অংশকে খুব জেদিভাবে প্রশ্ন করতে লাগল, কেন যাচ্ছি? এমনভাবে যাওয়ার কী মানে হয়, উত্তর দাও। অনেকক্ষণ কোনও উত্তর আসে না। তাতে অস্বস্তি আরও বাড়ে। তারপর মরিয়াভাবে একটা উত্তর পেয়ে যাই। অস্ফুটভাবে বলি, যাচ্ছি, তার কারণ না-যাওয়ারও কোনও মানে হয় না।

এরপর ভেতরটা বেশ হালকা হয়ে যায়। এভারেস্টের শিখর আরোহণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একজন অভিযাত্রীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তুমি বারবার ওখানে যাও কেন? উত্তরে তিনি, সেই বিখ্যাত অভিযাত্রীর নাম মালোরি, সংক্ষেপে জানিয়েছিলেন, 'বিকজ ইট ইজ দেয়ার।' আমার উত্তরটাও অনেকটা সেইরকম ভেবে আমি নিজের কাছেই একটু অহংকার দেখাই। এর আগেও তো কত জঙ্গলে গেছি, কতরকম ব্যবস্থা ট্যবস্থা করে, মানসে নিশ্চয়ই এইরকম ভাবেই আমার যাওয়ার কথা ছিল? তা ছাড়া অনিশ্চয়তা বরাবরই আমার প্রিয়।

মাঝেমাঝে কাঠের সেতু পেরুতে হচ্ছে। সেতুগুলোর অবস্থাও সাংঘাতিক, মনে হয় যেকোনও মুহূর্তে সবশুদ্ধু ভেঙে পড়বে। এইরকম চতুর্থ সেতুটি পেরিয়ে রাস্তাটি সবেমাত্র বাঁক নিয়েছে, এই সময় সারা জঙ্গল কাঁপিয়ে শব্দ হল উম্ ম্ ম্ আঁ আঁ—। যেন একটা বাজ পড়ল! খুব কাছ থেকে এবং এত অসম্ভব জোরে সেই শব্দ যে মনে হল তা আমার বুকে প্রবল ধাক্কা মেরে আমার হৃৎস্পন্দন থামিয়ে দিয়েছে। ভয়ে আমি চোখ বুজে ফেললাম।

চিড়িয়াখানায় বাঘের ডাক শুনেছি আগে। কিন্তু নিস্তব্ধ জঙ্গলে তার ভয়াবহ জোর যেন একশো গুণ বেশি। তা ছাড়া এমনই আকস্মিক। বাঘের কথা আমি একবারও চিন্তা করিনি তাই কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার ভয়-প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল, মনে হল যেন আমি মরে গেছি। এবং এত জোরালো শব্দের প্রতিক্রিয়া এই যে তারপর কিছুক্ষণ মনে হয়, পৃথিবীতে আর কোনও শব্দই নেই। সব শব্দ মৃত্যুতে নীরব।

আবার চোখ মেলেই পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি, ওঝার মুখ একেবারে ফ্যাকাসে, স্টিয়ারিং-এর ওপর তার একটুও দখল নেই, জিপটা এঁকেবেঁকে পাশের দিকে গড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে গেল। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম স্টিয়ারিং-এর ওপর। ডান-পা বাড়িয়ে ওঝার পায়ের ওপর দিয়েই এক লাথি কষলাম ব্রেকে।

গাড়িটা থামতেই দ্বিতীয়বার আকাশ ফাটিয়ে বাঘটা ডাকল। এবার আরও জোরে। মনে হয় পঁচিশ ত্রিশ গজ দূরেই বাঘটা রয়েছে। বাঁ-পাশের জঙ্গলে।

বীর বালকটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। দ্বিতীয়বার বাঘটা ডাকতেই সে হুড়মুড়িয়ে আমার কোলে মাথা গুঁজল। আমিও মাথা নীচু করে ফেললাম কেন তা জানি না। আমরা হাতির জন্য চিন্তিত ছিলাম, বাঘের কথা মনেও স্থান দিইনি, তাই ভয়টা কাটানোর কোনও উপায়ই মনে এল না। সম্পূর্ণ শরীরটা কাঁপছে।

খোলা জিপ, বাঘটা আক্রমণ করলে আমাদের বাঁচার কোনও উপায়ই নেই। অস্ত্র বলতে শুধু আমার হাতের ব্রান্ডির বোতল। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করলাম, বাঘটা আসুক, আমাদের খেয়ে নিক।

কিন্তু বাঘটা খোলা জায়গায় এল না। নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে তীব্র চোখে আমাদের দেখছে। যে-কোনও মুহূর্তে লাফিয়ে পড়বে।

নির্বোধের মতন আমরা গাড়ি থামিয়ে সেখানে চুপচাপ বসে রইলাম দু-তিন মিনিট, যাতে বাঘটার কোনও রকম অসুবিধেই না হয়। বাঘের গর্জনের মধ্যেই বোধহয় এরকম মৃত্যুচুম্বক থাকে। তারপর অতিকষ্টে সেই ঘোর কাটিয়ে আমাদের বেঁচে থাকার চিন্তা ফিরে এল। বুঝলাম, থেমে যাওয়ার চেয়ে এগিয়ে যাওয়া সব সময়ই ভালো। চলন্ত গাড়িতে আমরা তবু খানিকক্ষণ বেশি বাঁচব। যেখানে পিছিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, সেখানে সামনে এগোতেই হবে।

জিপ গাড়িটাও নিশ্চয়ই বাঘের ডাক শুনে ভয় পেয়েছিল। কারণ এবার সে স্টার্ট দিতে একটুও দেরি করল না। সেখানে যদি জিপটা আবার গণ্ডগোল করত, তাহলে এ কাহিনি নিশ্চয়ই অন্যরকম হত। কিন্তু এবার অ্যাক্সিলেটারে চাপ দিতেই জিপটা ব্যস্ত হয়ে সামনের দিকে দৌড়াল। ওঝার সঙ্গে আমিও ধরে রাখলাম স্টিয়ারিং। গাড়ি চলল মাঝারি গতিতে।

বাঘটা সামনে এল না, আর ডাকলও না। এবং এক হিসেবে সে আমাদের বাঁচিয়ে দিল। বোধহয় তার জন্যই আমাদের বিপদ কেটে গেল, এরপর আর কোনওরকম জন্তু-জানোয়ারই চোখে পড়ল না। যদিও বাঘের পরপর দু-বার গর্জন শুনে যে ভয় পেয়েছিলাম, তা কাটতে সময় লাগল যথেষ্ট। বেশ কিছুক্ষণ মাথাটা দুর্বল হয়ে রইল।

আরও আধঘণ্টা পর পথের ওপর একটা সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। 'ওয়ে টু আপার বাংলো'। তার পাশে লেখা, অরণ্যের স্তব্ধতা নষ্ট করবেন না। ডানদিকে ঘুরে একটা টিলার ওপরে বাংলোয় পৌঁছে গেলাম। হাত-পায়ের জড়তা ছাড়িয়ে গাড়ি থেকে নেমে একটা বড় নিশ্বাস নিলাম। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেছি দেখে বেশ খুশি ভাব হল। বেঁচে থাকার অমলিন আনন্দ।

হাঁক-ডাক করে তোলা হল চৌকিদারকে। সে অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। ঘুমের থেকেও বেশি বিস্ময়ভরা চোখ নিয়ে সে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াল। এগারোটা বেজে গেছে, এত রাত্রে কেউ কোনওদিন তাকে ডেকে তোলেনি। আমরা বে-আইনি আগন্তুক।

আমি তাকে আশ্বস্ত করলুম যে আমাদের খাবার-দাবারের কিছু দরকার নেই। বাংলোর একটি ঘর আমার নামে রিজার্ভ করা আছে, সেটি খুলে দিলেই চলবে।

চৌকিদার জিগ্যেস করল, আপনারা এ সময় এলেন কী করে? হাতিতে রাস্তা আটকায়নি?

আমি গম্ভীরভবে বললাম, না, হাতি কিছু করেনি। কিন্তু বাঘের কথা কেউ আমাকে বলেনি কেন?

বরপেটাতেও বলেনি, চেক-পোস্টেও বলেনি। শুধু হাতির ভয় দেখিয়েছে। যদি জানতাম রাস্তায় বাঘ পড়বে, তাহলে আমি আসতাম না। বাঘের সঙ্গে চালাকি চলে না। কেন কেউ বলেনি?

চৌকিদার বললো, বাঘ? চার নম্বর ব্রিজটার কাছাকাছি?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

চৌকিদার বললো, এখানে চার-পাঁচটা বাঘ মাঝে-মাঝে আসে একসঙ্গে।

একটা নয়। চার-পাঁচটা? কিন্তু সে ব্যাপারে কেউ আমাকে সাবধান কয়ে দেয়নি কেন?

চৌকিদার বলল, ওরা এ পর্যন্ত কোনও মানুষ মারেনি। মানুষ দেখলে সরে যায়। আমিও কয়েকবার দেখেছি।

কোন বাঘ মানুষ মারবে আর কোন বাঘ মারবে না, গভীর রাত্রে জঙ্গলের মধ্যে সে বিচার করার সাধ্য আমার নেই। ডাক শুনেই বুকের অতি পরিচিত শব্দটা থামবার উপক্রম হয়েছিল। এবং

পিলে পর্যন্ত চমকে যাওয়া কাকে বলে, সেই তখনই বুঝেছিলাম।

বাংলোটি প্রকাণ্ড। দোতলা অন্তত আটখানা ঘর। চৌকিদার আমার ঘরটা খুলে দিল। এরপর তার শুধু আর একটা কাজ বাকি।

আগে থেকেই আমার জানা ছিল যে ভোর পাঁচটায় পোষা হাতির পিঠে চেপে এখানে জঙ্গলে ঘোরার ব্যবস্থা আছে। ঠিক সেই সময় সেই হাতি আনবার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এখনই।

চৌকিদার বলল, কিন্তু সে তো আগে থেকেই খবর দিয়ে রাখতে হয়। তা ছাড়া আপনি একা...আপনার একার জন্য হাতি...

আমি বললাম, হ্যাঁ আমার একার জন্যই হাতির ব্যবস্থা করতে হবে। যা খরচ লাগে আমি দেব।

তারপর তার কাঁধে হাত দিয়ে বললাম, ভাই, আগে থেকে খবর দিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু এসে যখন পড়েছি তোমার অতিথি হয়ে, কষ্ট করে একটা ব্যবস্থা করে দাও।

লোকটি গজগজানি ধরনের নয়। শান্ত মুখেই রাজি হল। তাকে এখন কিছু দূরে মাহুতের ঝোপড়িতে গিয়ে খবর দিতে হবে। আমি বললাম, আর একটা কাজ, ভোর পাঁচটার যদি আমার ঘুম না ভাঙে, একটু ডেকে দিও, আর সেই সঙ্গে যদি এককাপ চা...

সে বলল, সঙ্গে চা-চিনি-দুধ এনেছেন?

এই রে, আর সবই তো বাজার করে এনেছি, চা কেনার কথা মনেই ছিল না। ভোরবেলা এককাপ চা না পেলে কী করে চলবে?

চৌকিদার বলল, তার কাছে শুধু চা-পাতা আছে। দুধ-চিনি নেই। আমি বললাম, তাই-ই সই। শুধু লিকার গরম গরম—

চৌকিদার চলে গেল। ড্রাইভার ওঝাও গেল তার সঙ্গে। তারপর আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে গেলাম। এতবড় বাংলোটিতে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বাকি সব ঘর তালাবন্ধ।

এতখানি রাস্তা লম্ফমান জিপে চড়ে এসে বেশ ক্লান্ত লাগছে। জামাকাপড় ছেড়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম। চমৎকার নরম বিছানা, নতুন মশারি ও কম্বল। কাল ভোরে উঠতে হবে।

কিন্তু আধঘণ্টা শুয়ে থাকার পরও আমার ঘুম এল না। এতবড় একটা বাড়িতে আমি একা।

ভাগ্যিস আমার সঙ্গে আর কেউ আসেনি এ যাত্রায়। কত দুর্লভ এই একাকিত্ব। শহরে সব সময় মানুষ, সব সময় কেউ না কেউ, সব সময়ে আমাকে থাকতে হয় নিজের পরিচয়ে। আমি কারুর বন্ধু, কারুর ভাই, কারুর কাছে দেনাদার, কারুর কাছে কৃপাপ্রার্থী। এখানে এই মুহূর্তে আমি কেউ না। আমি শুধু আমি।

এরকম রাতটা ঘুমিয়ে নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না।

কাচের গ্লাসের ব্র্যান্ডি ঢেলে সেটা হাতে নিয়ে উঠে এলাম দোতালায়। হঠাৎ যেন আমার চোখ জুড়িয়ে গেল। অসাধারণ জ্যোৎস্না ফুটে আছে দিগন্ত জুড়ে। সামনের দিকে যতদূর তাকাই অরণ্য। যেন সত্যিই আমি পৃথিবীর সমস্ত ইটে গড়া সভ্যতা ছাড়িয়ে চলে এসেছি, এরপর বাকি পৃথিবী জোড়া অরণ্য রাজ্য। আমার ডান পাশে একটা বিশাল চওড়া নদী। এই নদীরও নাম মানস। মানস সরোবর থেকে নেমে এসে এই নদী এখানে পড়েছে সমতলে, তাই সব সময় সমুদ্রের মতন গর্জমান।

বাংলোর ওপরতলায় একটি বেশ প্রশস্ত কাচের ঘর। সেখান থেকে দেখা যায় নদীর ওপারের স্তব্ধ অন্ধকার বনভূমি। বহুদূর থেকে দুটি পাখি একটানে ডেকে চলেছে, টিউ...টিউ...টিউ। রাতে কোন পাখি ডাকে আমি জানি না। এমন মধুর সুরেলা স্বরও তো কখনও শুনিনি। মাঝে-মাঝে বন থেকে আর একটা শব্দ আসছে, এটা ধোপার কাপড় কাচার শব্দের মতন অবিকল। এটা নিশ্চিত

কোনও জানোয়ারের ডাক। এত রাতে জঙ্গলের মধ্যে বসে কে আর কাপড় কাচবে। কোন জানোয়ার জানি না।

জ্যোৎস্নার মধ্যে আমি নিজেই একটি ছায়ামূর্তি হয়ে সারা বাংলোটি ঘুরে দেখলাম। হাওয়ায় কোনও জানলা একবার খোলে আর বন্ধ হয়। একটা শুকনো পাতা উড়ে এসে বারান্দায় পড়ে হঠাৎ আপন মনে ঘুরে-ঘুরে খেলা শুরু করে। আমি তন্ময় হয়ে সেই খেলা দেখি। যেন বহুদিন আগে থেকেই ঠিক করা ছিল যে, একদিন রাত্রি সাড়ে বারোটায় মানস ডাকবাংলোয় একটি শুকনো পাতা এইভাবে উড়ে এসে খেলা দেখাবে এবং আমি তা দেখব।

ডাক বাংলোটির সামনে ধাপ ধাপ ফুলের বাগান নেমে গেছে নীচের দিকে। ঘোরানো পথ চলে গেছে নদীপ্রান্তে। বাংলো থেকে বেরিয়ে এসে সেই পথ ধরলাম। রাত-চরা পাখি দুটি এখনও ডেকে চলেছে, শোনা যাচ্ছে কাপড় কাচার শব্দ। আমার একটু একটু গা ছমছম করছে। কিন্তু ভয়েরও একটা নেশা আছে। যেমন রাত্রির আছে আলাদা জীবন। সচরাচর তো তার সন্ধান পাই না, তাই পা টিপেটিপে এগিয়ে চললাম। বাঘের জন্যই বেশি ভয় এবং এই ভয় বহু শতাব্দীর। তবে বাংলোর এত কাছে নিশ্চয়ই বাঘ আসবে না। যদিও বা আসে, একটু আগে চৌকিদারের মুখে শুনলাম, এখানকার বাঘ এ পর্যন্ত মানুষ মারেনি। তাহলে আমাকেই বা প্রথম মারবে কেন? কোনও ব্যাপারেই প্রথম হওয়ার যোগ্যতা নেই আমার।

সম্পূর্ণ অচেনা জায়গা, অচেনা অন্ধকার, অচেনা পথ। একবার ভাবলাম আসবার সময় একটা টর্চ কিনেছিলাম তো! কিন্তু ফিরে গিয়ে সেটা নিয়ে আসার ইচ্ছে হল না। এই নিস্তব্ধতার মধ্যে মনে হয় যে টর্চের আলোও শব্দ করে উঠবে।

কয়েকবার সামান্য হোঁচট খেতে খেতেও সামলে নিয়ে পৌঁছে গেলাম নদীর কিনারে। নদীর জল এমন সাদা যে, মনে হয় জমাট জ্যোৎস্নার ধারা। একটু ঝুঁকে সেই নদীর জলে হাত দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে হাত সরিয়ে নিলাম। পাহাড়ি নদী সম্পর্কে আমার যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। কোথাও-কোথাও স্রোত এতই প্রবল হয় যে, ঝোঁক সামলানো যায় না, টেনে নিয়ে যায়।

বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম সেখানে। সাধারণ পাহাড়ি নদীর চেয়ে অনেক বেশি প্রশস্ত এলাকায় মানস নদী। তাও শেষ-শীতকাল। বর্ষায় এর রূপ আরও খুলবে। ওপারের ঘন অন্ধকার অরণ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হয়, ওদিকের সাদা বালির চড়ায় নড়াচড়া করছে একটি প্রাণী। মানুষ? না, হতে পারে না। বাঘ কিংবা হাতিও নয়, তার চেয়ে ছোট। হতে পারে কোনও কুকুর, শেয়াল বা হরিণ। ভালো করে দেখা যায় না, তবু আমার হরিণী বলে মেনে নিতেই সাধ হল। আমি নিজের কাছে আবার জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই হরিণী।

হরিণীটি সম্ভবত জলপান করতে এসেছিল, বেশি দেরি করল না, চট করে আবার আঁধারে মিলিয়ে গেল। তবু সে তার ক্ষণিক উপস্থিতিতে যেন ধন্য করে দিয়ে গেল আমাকে। এই নির্জন প্রদেশে সে আমার সঙ্গিনী ছিল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। এমন জ্যোৎস্না বোধ হয় আমি ইহজীবনে আর কখনও দেখিনি। এই শান্ত নীরবতায় তা যেন উদ্ভাসিত হয়েছে সহস্রগুণ বেশি। এই অরণ্যের মধ্যে চন্দ্রকিরণে ভেসে যাওয়া একা এক নদী, তার পাশে একজন একা মানুষ—এই দৃশ্যটি যেন বহু হাজার বছরের পুরোনো। এবং আমার চতুষ্পার্শের যে রূপ, তার মধ্যে আমি যেন এক নারীসৌন্দর্যের আভাস পাই। এই জ্যোৎস্নার যে-কোনও উপমাই নারী। এই স্তব্ধ গহন বনভূমির উপমাও নারী। আমার কাছে নারীসৌন্দর্যই সব সৌন্দর্যের সার। তাই প্রকৃতির কাছে এসেও আমি বাস্তব কোনও নারীর সান্নিধ্য টের পাই। এই জ্যোৎস্নালোক, তার হাস্য, এই আঁধার অরণ্য, তার রহস্যময়তা।

সত্যিই আমি জন্মরোমান্টিক, আমি না মরলে আমার এই দোষ শুধরোবে না!

এই অপরূপ রাত্রিকে একটি নারী হিসাবে কল্পনা করে আমি রীতিমতন রোমাঞ্চিত হয়ে

উঠি, এত শীতের মধ্যেও আমার শরীরে উত্তাপ জেগে ওঠে। বিছানা থেকে কম্বলটা উঠিয়ে এনেছিলাম, সেটা গা থেকে খুলে ফেলে আমি আমার সম্মুখবর্তী শূন্যতাকে আলিঙ্গন করি এবং প্রগাঢ় চুম্বন দিই। চুম্বনটি বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়। এমনকী শুয়েও পড়ি বালির ওপরে এবং রীতিমতন প্রণয় খেলা শুরু হয়ে যায়।

এর আগে কখনও প্রকৃতির সঙ্গে এত নিবিড়ভাবে প্রণয় আমার হয়নি। প্রকৃতিকেও এমন বহু ইপ্সিতা, সম্পূর্ণ নারী হিসেবে আমি পাইনি কখনও। আমি তার শরীরের গন্ধ নিই, বারবার গরম আদর দিই তার ওষ্ঠে, তার শরীরের সঙ্গে শরীর মেশাই।

আবেশে কখন একটু তন্দ্রা এসেছিল, হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে শরীর কেঁপে উঠল। ভয়ে কিংবা শীতে। আর যাই হোক, এখানে ঘুমিয়ে থাকা যায় না। ঘড়িতে দেখলাম, দুটো পাঁচ। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে বেশি করে শীত নামে। প্যাকেটের শেষ সিগারেটটা ধরিয়ে আমি উঠে পড়লাম। এখনও ঘণ্টা আড়াই বিছানায় শুয়ে আরাম করা যেতে পারে।

ঠিক পৌনে পাঁচটার সময় চৌকিদার চা এনে আমাকে জাগিয়ে তোলে। আমি জড়তা কাটিয়ে তড়াক করে বিছানা থেকে নেমে পড়ি। আলস্য করতে গেলেই আলো ফুটে যাবে। তাড়াতাড়ি মুখটুখ ধুয়ে দৌড়োলাম। এবার টর্চটা সঙ্গে নিতে ভুল হল না।

ডাকবাংলো থেকে রাস্তাটা নেমে গেছে একটা বাঁধের মতন হয়ে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় একটা উঁচু সিমেন্টের মঞ্চ তৈরি করা। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমার ড্রাইভার ওঝাও চোখ ডলতে ডলতে উঠে এসেছ। সেও জঙ্গল দেখবে।

কাছেই দুটো হাতি বাঁধা, একটি বেশ বড়, আর একটা বাচ্চা। অন্ধকারের মধ্যে সে দুটি জমাট অন্ধকার হয়ে আছে। তাদের গায়ে টর্চের আলো ফেললে কান লটপট করে। এরই কোনও একটাতে যেতে হবে। কিন্তু মাহুত কোথায়?

মিনিট দশেক পরে মাহুত এল তৃতীয় হাতি নিয়ে। এই হাতিটির আকার মাঝারি। মাহুতের চেহারাটি দেখে বেশ পছন্দ হল। আজকাল অনেক কিছুই ঠিক-ঠাক মেলে না। রাখাল বলতেই যে ছবিটা আমাদের চোখে ভেসে ওঠে, সেরকম রাখাল মাঠে-ঘাটে দেখা যায় না। গয়লানিদের যে-রকম ছবি আঁকা হয় সেরকম গয়লানি বহুদিন দেখিনি। সেদিক থেকে এই হাতিটাকে তো হাতির মতন দেখতে বটেই, মাহুতটিও অবিকল মাহুতের মতন। কুচকুচে কালো এবং ছিপছিপে মেদবর্জিত শরীরের একটি যুবক মাথায় পাগড়ি, কোমরে ছুরি গোঁজা ও হাতে ডাঙস। যে কোনও কথা বলল না, ইশারায় আমাকে হাতির পিঠে চেপে বসার কথা জানাল।

হাতির পিঠে হাওদা নেই। একটা দুটো তোশক ফেলে তার ওপর মোটা দড়ি বাঁধা। ঘোড়ার পিঠে বসার মতন এখানেও বসতে হবে দুদিকে ঝুলিয়ে। কিন্তু ঘোড়ার দু-দিকে পা ঝোলানো আর হাতির দুদিকে পা ঝোলানো কি এক কথা হল? পা দুটি বিসদৃশ অবস্থায় থাকে এবং একটু পরেই বেশ ব্যথা করে। দড়িটাও শক্ত করে ধরে থাকতে হয়। নইলে যেকোনও মুহূর্তে টাল খেয়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা।

রাস্তা পেরিয়ে হাতি ঢুকল বনের মধ্যে। তখন সবেমাত্র অন্ধকার পাতলা হতে শুরু করেছে। একটু পরেই বুঝলাম, হাতি যেখান দিয়ে চলেছে, সেখানে গাড়ি-টাড়ি তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটেও মানুষের পক্ষে যাতায়াত সম্ভব নয়। সম্পূর্ণ দুর্ভেদ্য জঙ্গল, গাছে গাছে কোনও ফাঁক নেই বললেই চলে, তা ছাড়া রয়েছে লতাপাতার ঝোপ। কিন্তু হাতির গতির মধ্যে একটা বেপরোয়া ভাব আছে, সে কিছু মানে না, মাঝারি সাইজের গাছও সে মট মটাং করে ভেঙে ফেলে। আমরা মাথা নীচু করে মাথা বাঁচাই। এই সময় মনে হল, কাল রাত্রে আসবার সময় পথের দুধারে এরকম অনেক আধভাঙা গাছ দেখেছি, সেগুলি তবে হাতিরই কীর্তি।

ভোরের প্রথম সিগারেটটা ধরালেই বেশ কিছুক্ষণ কাশি হওয়ার কথা। স্মোকারদের এই এক

অভিশাপ। কিন্তু সিগারেট ধরিয়েও আমি জোর করে মুখ চেপে রইলাম। কিছুতেই কোনও শব্দ করা চলবে না। সমস্ত বনে হাতির পায়ে চলার শব্দ ছাড়া আর একটাই শব্দ হচ্ছে শুধু। একটা বনমোরগের ডাক। তীক্ষ্ণ স্বরটা ভেসে আসছে একটা ঘন ঝোপ থেকে। আমরা সেইদিকেই এগোচ্ছি। ভোরবেলা প্রথম সূর্যালোকের বার্তা দিকে দিকে ঘোষণা করার দায়িত্ব এই মোরগজাতিকে কে দিয়েছে কে জানে! আর কোনও পাখির ডাক এখনও শোনা যাচ্ছে। সেই রাত পাখি দুটিও বুঝি এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঝোপটার কাছে আসতেই ঝটপটিয়ে বেরিয়ে এল বন মোরগটা, অসম্ভব গাঢ় লাল আর হলুদ তার পাখনার রং, আমাদের দিকে একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি মেলে সে উড়ে গেল অনেক দূরে। যেন মাঝপথে বিঘ্ন ঘটানো হয়েছে তার সঙ্গীতের। তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

হাতিটা মাঝেমাঝে কোনও ছোট টিলার ওপর দিকে উঠছে। কখনও নেমে যাচ্ছে কোনও শুকনো নদীগর্ভে। সেই সময় দুহাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে দেহের ভারসাম্য রাখতে হয়। হাত আলগা হলেই ধপাস্। সমতলে চলার সময় এত জোর লাগে না।

পোষা হাতির পিঠে চেপে বনের মধ্যে ঘোরার অভিজ্ঞতা আমার আরও হয়েছে কয়েকবার। তখন সঙ্গে অনেক লোক। দু-তিনটে হাতি, এবং কেউ না কেউ কথাবার্তা বলে ফেলেছে। কিন্তু এবার মাহুতকে নিয়ে আমরা মাত্র তিনজন, এবং আধঘণ্টা হয়ে গেল তবু টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করিনি। এই স্তব্ধতাটাও উপভোগ্য।

ক্রমশ কয়েকটি হরিণ ও সম্বর দেখা দিতে লাগল। চিত্রল হরিণগুলিই বড় সুন্দর, দেখলে আশ্রমমৃগের কথাই মনে হয়। আজ সকালের আলোয় শুধু সম্বর নয়, হরিণগুলিও আমরা খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত পালাচ্ছে না। প্রথমে এর কারণ ভেবে অবাক হয়েছিলাম। হরিণগুলিও কি টুরিস্ট দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছে? অপেক্ষা করছে কখন আমি ক্যামেরা বার করব? তত টুরিস্ট তো এখানে আসে না। একটু পরেই কারণটা সম্যক বুঝলাম। জঙ্গলে হাতির পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, এই আওয়াজ হরিণদের চেনা এবং নিরামিষাশী হাতি সম্পর্কে তাদের কোনও ভয় থাকার কথাও নয়। তারপর হঠাৎ যখন তারা হাতির পিঠে কয়েকটি দু-পেয়ে ভয়াবহ প্রাণীকে দেখছে, তখনই তারা পালাচ্ছে। হরিণের পলায়নদৃশ্য সত্যি দেখবার মতন। বিস্মিত হয়ে তারা লাফিয়ে উঠছে শূন্যে, তারপর সময়কে সময়হীনতায় এনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর সম্বরের পলায়নটা একটা জবরজং ব্যাপার, পেছন ফিরতেই অনেক সময় লেগে যায়। আহা, বেচারা সম্বরগুলো এই জন্যই এত সহজে শিকৃত হয়।

আর একটু দূর যাওয়ার পর মাঝে-মাঝেই একটা শব্দ কানে আসতে লাগল। এই পরিবেশে অ-মানানসই। অনেকটা যেন রেলের পুরোনো কয়লা-ইঞ্জিনের মতন। ঘ্যাস-ঘ্যাস, ঘ্যাস-ঘ্যাস! যতবার শব্দটা শুনি, ততবার চমকে উঠি।

কাছাকাছি কি কোনও রেল লাইন আছে? তা হলে আর এমনকী দুর্ভেদ্য অরণ্য! মাহুতকে সে কথাটা জিগ্যেস করতে যাচ্ছিলাম, এমন সময় আবার সেই শব্দ হল ঠিক মাথার ওপরে।

দেখলাম, শকুনের চেয়েও বড় আকারের দুটি পাখি, হলদে আর কালো রঙের, উড়ে যাচ্ছে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে। উড়ন্ত এত বড় কোনও পাখি আমি আগে কখনও দেখিনি। একটু পরেই, আরও কয়েকটি দেখেই চিনতে পারলাম। ধনেশ পাখি ওগুলো, এখানে রয়েছে শয়ে শয়ে। সে বড় বিচিত্র দৃশ্য। তাদের ডানায় অবিকল রেল ইঞ্জিনের শব্দ।

নিস্তব্ধ, অতি আগ্রহী, অধীর মন ও চোখ নিয়ে তাকিয়ে আছি সামনে। মাঝে-মাঝে কোনও জীবন্ত প্রাণী দেখলেই মনে হয় কিছু যেন একটা পেলাম। এক সময় মাহুতকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলাম, গন্ডার নেই? গন্ডার কোথায়?

মাহুত বলল, আছে সাহেব, বহুৎ। কিন্তু এই সময় পাহাড়ের ওপর দিকে উঠে যায়। মাঝেমাঝে

দেখা যায়—পরশুদিন আমি দুটো দেখেছি।

আমি তাকে গন্ডার খোঁজার জন্য তাগিদ দিলাম। সে হাতিকে চালনা করল বন-বাদাড় ভেদ করে, অন্যদিকে। তারপরেও বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে গন্ডার পাওয়া গেল না। তখন বেশ নিরাশ হয়ে পড়েছিলাম, যেন সবটাই ব্যর্থ হয়ে গেল, তারপর নিজেকে এক ধমক দিলাম।

অরণ্যে এসে অনেক সময়ই অরণ্য দেখাই হয় না। ছেলেমানুষের মতন শুধু জন্তু-জানোয়ার দেখার ইচ্ছেই জাগে। আমারও এরকম হয়! গন্ডার না দেখলে কী এমন ক্ষতি হবে? গন্ডার কি কখনও দেখিনি? শুধু চিড়িয়াখানাতেই নয়, উত্তর বাংলার জলদাপাড়াতেও আমার অরণ্যচারী গন্ডার দর্শন হয়ে গেছে আগে। এখানেও শুধু গন্ডারের জন্য ছোটাছুটি করে কী লাভ? গন্ডারের চিন্তা যেই মনে থেকে মুছে ফেললাম, অমনি সমগ্র অরণ্যটাই আমার চোখের সামনে জাজ্বল্যমান হয়ে উঠল।

ইতিমধ্যে সন্তর্পণে খুব কোমল ও বিনীত সূর্য উঠেছে। এটা সেই ধরনের দুর্লভ একটি ভোর, যখন প্রথম সূর্যের আলো ঠিকরে লাগে চাঁদের গায়ে। আমার সামনের দিকে সূর্য, ঘাড় ফিরিয়ে একবার চাঁদকেও দেখে নিলাম। মনে হয়, এমন যে দেখলাম, এর জন্য নিশ্চয়ই আমার অনেক সুকৃতি জমা ছিল। থোকা থোকা সাদা ফুল ভোরের আলোয় হঠাৎ রক্তিম মনে হয়। ওড়িশার সিমলিপাল জঙ্গলে এক জায়গায় দেখেছিলাম শুধু অজস্র হালকা ভায়োলেট রঙের ফুল, আর কোনও রঙের ফুল নেই! এক বন্ধু বলেছিলেন, ভূতলে তামা থাকলে নাকি সেখানকার ফুল ওইরকম বেগুনি হয়ে যায়। মানস অরণ্যে বেগুনি ফুল নেই, শুধু সাদা, আর কিছু কিছু টকটকে লাল। কোনওটারই নাম জানি না।

ফুলের চেয়েও এই জঙ্গলে পাখির সমারোহই বেশি। বন-মোরগরা তাদের কর্তব্য সাঙ্গ করেছে। এখন অসংখ্য জাতের পাখি তাদের আলাদা আলাদা সুরে শুরু করে দিয়েছে উষার বন্দনা। যেন অরণ্যের শিখরে শিখরে একটা গানের জলসা বসে গেছে।

মাঝে মাঝেই ছোট ছোট জলাশয়। সেরকম একটির কাছে পৌঁছতেই দেখলাম, পিঠটা কালচে আর বুকের কাছটা সাদা রঙের একজাতীয় হাঁস ঝাঁক বেঁধে দারুণ জোরে এসে জলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েই উঠে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে, চক্রাকারে বাতাস কেটে ঘুরে এসে তারা আবার ওইরকম ভাবে জল ছুঁচ্ছে। এটা কি একটা খেলা? নাকি শীতের জন্য স্নান করতে এসেও ওরা বেশিক্ষণ জলে থাকতে পারছে না? এত ভোরে স্নান না করলেই বা কি দোষ ছিল? আবার অন্য একটি ডোবায় অন্যরকম। সেখানে খয়েরি রঙের একটু আলাদা চেহারার কয়েকশো হাঁস নিশ্চিন্তে জলে ভেসে আছে। এদের শীতবোধ নেই? আমাদের হাতিটি অবলীলাক্রমে সেই ডোবাটিতে নেমে পড়তেই ফরফর করে অসংখ্য প্রজাপতির মতন তারা উড়ে গেল। ভাগ্যিস ডোবাটিতে হাতিটির হাঁটুজল।

ডোবাটি পেরিয়ে খানিকটা যাওয়ার পর খানিকটা প্রশস্ত প্রান্তর। তার একেবারে শেষ সীমায় গোটা ছয়েক মোষের মতন প্রাণী গোল হয়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে কিছু একটা ঘরোয়া সভা করছে। মাহুতটি উত্তেজিতভাবে বলল, সার বাইসন! প্রাণীগুলি বেশ দূরে এবং ওদিকটায় ঠিক মতন আলো পড়েনি বলে আমি ভালোমতন দেখতে পাচ্ছি না। বললাম, আর একটু কাছে চলো না। মাহুতটি রাজি হল না। আমিও অবশ্য খুব পীড়াপীড়ি করলাম না তাকে। জঙ্গলের নিয়ম সে-ই ভালো বোঝে। কাল রাত্রেও বুঝতে পারিনি, আজ সকালেও তেমন মোষের তুলনায় বাইসনের আলাদা কী বৈশিষ্ট্য তা ঠিক অনুধাবন করতে পারা গেল না।

হাতির মুখ ফিরিয়ে মাহুত জিগ্যেস করল, এবার ফিরব। বেলা হয়ে গেছে আর বিশেষ কিছু দেখা যাবে না।

আমি একটু জোর করলে সে হয়তো আরও ঘুরতে রাজি হত। কিন্তু আমারই উৎসাহ কমে গেছে। হাতির দু'দিকে পা ছড়িয়ে বসার জন্য একটা পায়ে রীতিমতন আড়ষ্ট ব্যথা। এ ছাড়া ঘণ্টা

দুয়েক ধরে দড়ি আঁকড়ে থাকার জন্য ঘষে গেছে হাতের তালু। হাতিটা যখন হুড়মুড় করে জলাডোবায় নামে কিংবা উঁচুতে ওঠে, তখন যে-কোনও মুহূর্তে পড়ে যাওয়ার ভয় হয়। বললাম, চলো।

ফিরছিলাম অন্যদিক দিয়ে। এক সময় জঙ্গলের মধ্যকার যে পথ দিয়ে আমরা কাল জিপে এসেছি, সেটা পার হতে হল। এবং তার একটু পরেই পেছন থেকে অতুল ওঝা আমার পিঠে একটা খোঁচা মেরে বলল, সাব। ডাইনে—

ডানদিকে তাকাতেই আমি একটি বিশাল দৃশ্য দেখতে পেলাম। একটি অতিকায় দাঁতালো হাতি, তার সাদা দাঁত ঝকঝক করছে রোদে এবং নিউ থিয়েটার্সের প্রতীক চিহ্নের মতন সে শুঁড়টা উঁচু করে আছে।

সেটিকে দেখে আমাদের বাহন এবং মাহুত দুজনেই বেশ চঞ্চল হয়ে উঠল। মাহুত ডাঙস কষাতেই আমাদের হাতিটা দ্রুতগতিতে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে স্থির হয়ে রইল। সেখানটা রীতিমতন অন্ধকার।

আমি অতি চুপিচুপি জিগ্যেস করলাম, কী হল?

মাহুত বলল, ওই হাতিটা একলা ঘোরে, ওটা বড় বদমাশ, গুন্ডা—

একলা হাতিটা যে বিপজ্জনক তা আমার জানা ছিল। সুতরাং বেশ খানিকটা রোমাঞ্চিত হয়ে ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম তাকে।

গুন্ডা হাতিটা কিন্তু আমাদের দেখতে পেয়েছিল। আমাদের পলায়নকালে সে মাথা ঘুরিয়ে তার খুদে চোখে তাকিয়েছিল কয়েক পলক। কিন্তু সম্ভবত তার মেজাজ এখন প্রসন্ন। সে খুব মন্থরগতিতে হাঁটতে লাগল। ঠিক যেন মনে হয়, বড়বাবু মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন। চোখের সামনে মাত্র পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে একটি জলজ্যান্ত দাঁতালো গুন্ডা হাতিকে আমি দেখতে পাচ্ছি, এটাকে যেন একটা অবিশ্বাস্য সত্য বলে মনে হয়।

মাহুত দাঁতে দাঁত চেপে বলল, শালা রোডের দিকে যাচ্ছে। এই শালা যখন তখন রোডের ওপর শুয়ে থাকে। তখন মানুষ যেতে পারে না।

তাহলে কাল রাত্তিতে এই হাতি মহারাজের জন্যই সবাই আমাদের ভয় দেখাচ্ছিল? আমি পেছন ফিরে অতুল ওঝার দিকে তাকালাম। সেও আমার দিকে চেয়ে হাসল।

কিন্তু হাতিটা রাস্তার ওপরেই শুয়ে থাকে কেন? অন্য কোথাও শুতে পারে না?

মাহুত যা বলল, তাতে বোঝা গেল যে অতবড় একটা হাতির শুয়ে থাকার মতন ফাঁকা জায়গা এই জঙ্গলে বেশি নেই। সেই তুলনায় রাস্তাটাই ফাঁকা, সেটাই ওদের বিশ্রামের জায়গা।

গুন্ডা হাতিটা দৃষ্টির আড়ালে চলে যাওয়ার পর আমরা ঝোপ থেকে বেরিয়ে ফেরা-পথ ধরলাম। এবং বাংলোয় পৌঁছোবার আগে গন্ডার না দেখার ক্ষতিপূরণ হয়ে গেল আরও দুটি হাতির পাল দেখে। এক-এক দলে দশ-বারোটা হাতি, বুড়ো বাচ্চা মিলিয়ে। একটি দল একটা জলাশয়ে নেমে গরু-মোষের মতন স্নান করছে! হাতিরা বেশ কৌতুকপ্রবণ। এ ওর গায়ে জল ছিটিয়ে মেতে আছে খেলায়। আমরা পাশ দিয়ে চলে গেলুম। ভ্রূক্ষেপও করল না।

বাংলোয় ফিরে এক কাপ দুধ-চিনিহীন চায়ের অর্ডার করলাম চৌকিদারকে। গায়ের ব্যথা মারবার জন্য বিছানায় গিয়ে একটু শুয়েছি, অমনি শুনলাম, নারীর কলকণ্ঠ। সঙ্গে সঙ্গে আবার চলে এলাম বাইরে। ঝলমলে রঙিন পোশাক পরা কয়েকটি ভুটিয়া মেয়ে পিঠে একরাশ বোঝা নিয়ে বাংলোর গা-ঘেঁষা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে নদীর দিকে। আমার দিকে তারা কৌতূহলের সঙ্গে তাকাল, হঠাৎ একটু থমকে দাঁড়িয়ে তারপর আকস্মিক হাসির ঝিলিক দিয়ে আবার চলে গেল।

কাল রাত্রে ভেবেছিলাম, চৌকিদার ও আমার ড্রাইভারকে বাদ দিলে এই জঙ্গলে সম্পূর্ণ একা কিন্তু মানুষ কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে?

শুধু চা নয়, কয়েকটা বিস্কুটও জোগাড় করে এনেছে অতুল ওঝা। তার কাছ থেকে কিছু

খবর পেলাম। এবং একটু পরে, এজন তরুণ বিট অফিসার এসে আমায় সবকিছু জানাল। এই মানস নদীর ওপারেই ভুটান রাজ্য। এমনকী নদীর এপারেও কিছুটা অংশ ভুটানের এলাকায়। ওদিকে কাছাকাছি কোনও শহর বা বাজার নেই। তাই ভুটানিরা এদিকে আসে বাজার করতে, অনেক সময় দুদিন তিনদিনের পথ হেঁটে ওরা বাজার করে আনে।

আমি উৎসাহিত হয়ে বললাম, তাহলে এই নদী পার হওয়া যায়? ওপারে আমরাও যেতে পারি? কোনও বাধা নেই?

বিট অফিসারটি বললেন, না, না, কোনও বাধা নেই। সবাই যেতে পারে।

তৎক্ষণাৎ আমি ওপারে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লুম।

কাল রাত্রে আমি নদীর কিনারে যেখানে এসেছিলাম, তার পাশ দিয়েই রাস্তা চলে গেছে উজানের দিকে। খানিক দূরে খেয়াঘাট। স্বচ্ছ, নীলবর্ণ জল। তাকিয়ে থাকলে মাছেদের খেলা দেখা যায়। এই জায়গাটি ট্রাউট ফিশিং-এর জন্য বিখ্যাত, তাই সাহেবদের কাছে আকর্ষণীয়। ছিপ থাকলে আমিও বসে যেতাম। কিছুদিন আগেই নাকি এখান থেকে একজন ত্রিশ কেজি ওজনের একটি মাছ ধরেছে।

মানস নদী বেশ খরস্রোতা বলেই পার হওয়ার কায়দাও আলাদা। সরাসরি এপার-ওপার করা যায় না। নদীর গা দিয়েই লাঠি ঠেলে-ঠেলে বেশ খানিকটা উজিয়ে যেতে হয়। তারপর স্রোতের মধ্যে এসে কোণাকুণি খানিকটা পিছিয়ে এসে ওপারে ওঠা যায়।

এপারেও নিবিড় বন। কিছুক্ষণ সেই বিট অফিসার ও স্থানীয় কিছু লোকের লোকের সঙ্গে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ালাম। এখানে সেই কাপড়-কাচার মতন শব্দটির রহস্যের মীমাংসা হল। দু-একবার সে-রকম শব্দ হতেই আমি বিট অফিসারটির দিকে তাকালাম। সে বলল, ও হচ্ছে বার্কিং ডিয়ারের ডাক। এই জঙ্গলে খুব আছে। ওরা দিনে-রাত্রে সবসময় ডাকে।

বিট অফিসারটি আর একটি দুর্লভ জিনিস আমাকে দেখাবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করল। বনে বনে প্রায় ঘণ্টাখানেক ঘুরে তা দেখতে পেলাম। ডজনখানেক গোল্ডেন লাঙ্গুর। এরা এক জাতের হনুমান। মুখ কালো দারুণ লম্বা লেজ আর গায়ের রং ঝকঝকে সোনালি। খুব উঁচু গাছের মগডালে এরা থাকে দেখলাম, গায়ে রোদ পড়লেই প্রায় চোখ ঝলসানো সোনালি আভা বেরোয় এদের গা থেকে। এই জাতের হনুমান এখন অবলুপ্তির পথে। সব সমেত বারো কি চোদ্দোটি হনুমানের সেই দলটির দিকে তাকিয়ে বড় বিষণ্ণ মায়া বোধ করলাম। এরা ধ্বংস সামনে নিয়ে বসে আছে।

এই বনেও ধনেশ পাখির সংখ্যা প্রচুর। এক-এক সময় চেনা যায় যুগল ধনেশ-ধনেশী লম্বা ডানা আছড়ে নদী পার হয়ে চলে যাচ্ছে। ডাকবাংলোর চৌকিদার বলেছিল, কয়েকদিন আগে দিনে-দুপুরে সে একটি বাঘকেও নদী সাঁতরে এদিকে আসতে দেখেছে। জন্তু-জানোয়াররা এখনও সীমান্ত মানতে শেখেনি। মানস নদীর দু-দিকের অরণ্যের নামই মানস। তাই অরণ্য ও পশুদের সংরক্ষণের যৌথ দায়িত্ব নিয়েছেন ভারত ও ভুটান সরকার।

বিট অফিসারটি শহরের ছেলে, নতুন চাকরিতে ঢুকেছে, অবিবাহিত, জঙ্গলে সে একলা থাকে। কী করে তার সময় কাটে? কিছু বই আছে তার সঙ্গী, তা ছাড়া এরই মধ্যে অরণ্য তার ভালো লেগে গেছে। অরণ্যে সবচেয়ে যা তার ভালো লাগে, সে আমাকে বলল, তা হল অরণ্যের স্তব্ধতা। 'বুঝলেন, এই যে নদীর স্রোতের শব্দ, এটাও সেই স্তব্ধতারই অঙ্গ।' আমার সন্দেহ হল, সে কবিতা লেখে।

ভুটানের দিকে কয়েকটি বাড়িঘর আছে। কিছু কিছু কাট-কাটার ব্যাপারও রয়েছে। রয়েছে ভূটানের রাজার একটি সুদৃশ্য বাড়ি। দু-পাঁচ বছরের মধ্যেও তার তালা খোলা হয় না। আর একটি বাংলো রয়েছে এদিকে। এখন কেউ নেই। নদীর এপার-ওপারে ভারত-ভুটানের দুটি বাংলোতেই এখন আমিই একমাত্র অধীশ্বর। বিট অফিসারটি বলল, আমি ইচ্ছে করলে ভুটানের বাংলোতেও

এসে থাকতে পারি। সেরকম ব্যবস্থা করা যায়।

কারা আসে এখানে? উত্তর পাওয়া খুব শক্ত নয়, সাহেবরা। ভারতের দিকে যে আটখানি ঘরওয়ালা বিশাল বাংলোটি প্রস্তুত, সেটিও তো সাহেবদের মুখ চেয়েই। আমাদের দেশে পর্যটনের সব কিছুই তো সাহেব নির্ভর। ভিখারির জাত, সবসময় কোল পেতে বসে আছি, কখন দয়া করে কোনও সাহেব-দেবতা আসবে। এসো সাহেব, বসো সাহেব, যো-হুজুর সাহেব, একটু ফরেন এক্সচেঞ্জের ঝুমঝুমি বাজাও তো সাহেব—এই তো আমাদের পর্যটন উন্নয়নের মন্ত্র।

এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতেই আর একটি আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। নদীর খুব কাছে একটি খড়ের চালের কুঁড়েঘর। তার কাছেই একটা গাছের গুঁড়িতে একটা তক্তা সাঁটা, সেটাতে খড়ি দিয়ে ইংরেজিতে লেখা 'বার'। আমি স্তম্ভিতভাবে বললাম, এখানে বার?

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম। বার রীতিমতন খোলা। কোমরে ভোজালি গুঁজে ভুটানের জাতীয় পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বার-টেন্ডার। অপরূপ সারল্যে উদ্ভাসিত তার মুখ।

বিট অফিসারটি একটু অপ্রসন্নভাবে বলল চলুন, এখানে দেখবার কিছু নেই, এদিকে পাহাড়ের কাছে অনেক পাখি আছে। বুঝলাম সে একটু নীতিবাতিকগ্রস্ত। আমি হেসে বললুম, 'একজন যখন এমন নির্জন জায়গায় বার খুলে রেখেছে, তখন কারুকে তো সেটা পেট্রোনাইজ করতেই হবে।'

সে বুঝল না, বলল, চলুন, চলুন! তখন আমি তাকে বিদায় জানালুম। সে প্রকৃতি দর্শনে গেল, আমি রয়ে গেলাম সেখানেই।

কিন্তু আমার বিস্ময়ের আরও বাকি ছিল। সেই খড়ের ঘরের বারে পরপর সাজানো রয়েছে শুধু স্কচ হুইস্কির বোতল। এখানে স্কচ হুইস্কি? বিট অফিসার ও আমি ছাড়া আর একটিও প্যান্ট-শার্ট পরা লোক নেই সেখানে। দাম জিগ্যেস করলাম। কলকাতার তুলনায় খুবই সস্তা হলেও এমন সস্তা নয় যে জঙ্গলের মানুষ কিনতে পারবে। তাদের আয়ত্তের যথেষ্ট বাইরে। তবে, কে খায় এসব?

উত্তর সেই একই। আমাদের মতন দুর্বল দোনা-মোনা নীতি নেই ভুটান সরকারের।

তাঁদের টুরিস্ট বাংলো থাকলেই সঙ্গে বার থাকবে। এই সুদূর জঙ্গলে, যেখানে হয়তো বছরে একবার দুবার সাহেবরা আসে, তাদের জন্য। এবং মানুষ থাক বা না থাক বার-টেন্ডার ঠিক তার দোকান খুলে রাখে। পাহাড়ি মানুষরা তাকিয়ে দেখে চলে যায়।

জানি বাঙালি লেখকদের শুধু লেবুর জল খাওয়াই নিয়ম। কোনও সাহেবসুবোর পার্টিতে লেখকের নিজের উপস্থিতি বর্ণনা দিতে গেলে অনিবার্যভাবে এই লাইনটি এসে পড়ে, 'না, আমার চলে না।'

শরৎচন্দ্র মদ খাওয়ার কমপিটিশান দিতে গিয়ে এক সাহেবকে মেরে ফেলেছিলেন, কিন্তু নিজের লেখার মধ্যে কোথাও সেকথা স্বীকার করেননি।

আমি ওসব বুঝি না। এইরকম পরিবেশে আমি কোনোদিন কোনও স্কচ হুইস্কির দোকান দেখিনি। এখানে স্বাদ নিশ্চয়ই আলাদা হবে। সেদিকে এগিয়ে গেলাম।

কয়েকটি জ্যান্ত গাছকে মাঝখান থেকে কেটে ফেলা হয়েছে, গুঁড়িগুলোই এখন বসবার জায়গা। চমৎকার ব্যবস্থা। একপাত্র 'কালো-সাদা'-র অর্ডার দিলাম। সুশ্রী বারম্যানটি আমরা দিকে পানীয় সমেত গেলাস এগিয়ে দিতে, আমি বললাম থোড়া পানি হোগা? সে তরতর করে ছুটে গিয়ে নদী থেকে এক বোতল জল নিয়ে এলে। সেই পবিত্র মানস সরোবরের জল মিশিয়ে স্কচ পান করতে-করতে আমি মুচকি হাসতে লাগলাম। আমি এইসব মজা একা-একা বেশ উপভোগ করি।

মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একঝাঁক টিয়াপাখি। নদীর ধারে রাস্তা দিয়ে উঠে এল সাত-আটটি ভুটানি যুবতী। তাদের পোশাকে সবুজ ও লাল রঙের প্রাধান্য। তদের দিকে তাকালে তারা চোখ সরায় না, হঠাৎ হঠাৎ হেসে ওঠে। টিয়াপাখির ঠোঁটের রঙের সঙ্গে তাদের ঠোঁটের মিল আছে। একটু পরেই তারা জঙ্গলের মধ্যে মিশে যায়। আবার আর একটি দল- জল থেকে উঠে আসে।

একটু দূরে পাহাড়ের গায়ে ঘন জঙ্গলের মধ্য থেকে একটি বার্কিং ডিয়ার অনাবশ্যকভাবে ডেকে ওঠে দুবার। দুটি সারস ধরনের পাখি মানসের ঠিক মাঝখানে জলের কাছেই গোল হয়ে ঘুরছে, ঢেউয়ে ভেঙে যাচ্ছে তাদের ছায়া।

মাথার টুপিতে লম্বা একটা ধনেশ পাখির পালক গোঁজা এক বুড়ো আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার মুখে সহস্র ভাঁজ। সে আমাকে বলল, সেলাম সাব! আমিও বললাম, সেলাম। সে আবার বলল, সেলাম। আমিও। সে-ও আবার। এই খেলাটা আমি জানি। গহন অরণ্য হোক বা ধূ-ধূ করা মরুভমি হোক, যেখানেই পানশালা আছে, সেখানেই এরকম একটি চরিত্র থাকবেই। বৃদ্ধটি আমার গেলাসের দিকে সতৃষ্ণভাবে তাকিয়ে।

'আমি বললাম, ওরে বাবা, বড্ড দামি জিনিস। তোমায় বেশি খাওয়াতে পারব না। আচ্ছা দাও ওকে এক পেগ।

সে তৎক্ষণাৎ আমার পাশের কাটা-গাছের গুঁড়িতে বসে পড়ে বলল, সাহেব, শের দেখবে? আমি তোমাকে শের দেখাতে পারি। আর রাইনো, সাব, এক এক শিং রাইনো, পাইথন, ইতনা মোটা—

বুঝলাম, অ্যামেরিকান টুরিস্টদের সে এইভাবে ভোলায়। আমি বললাম, আমার কিছু দরকার নেই। কিন্তু তোমাকে বেশি খাওয়াতে পারব না।

তিন পাত্তর খেয়েই আমি উঠে পড়লাম। লোকটি বড় বেশি কথা বলছিল। কিন্তু মানুষের কণ্ঠস্বর আমার পছন্দ হচ্ছিল না তখন।

নদীর ধার দিয়ে একা একা হাঁটতে লাগলাম ওপরের দিকে। নানা আকারের পাথর ছড়ানো। ভাবতে ভালো লাগে যে, এইসব পাথর এসেছে শ-শ মাইল দূরের মানস সরোবর থেকে। কয়েকটি পাথর কুড়িয়ে নিই, রং ও আকৃতি দেখে সংগ্রহ করতে করতে দু-হাত ভরে যায়। এসব কিছুই জমানো যায় না, তাই আবার একটি একটি করে ছুড়ে দিই জলের মধ্যে। একটা পাথরও নদীর এপার থেকে ওপারে পৌঁছে দিতে পারি না।

এক জায়গায় পাতলা জঙ্গল দেখে বসে পড়লাম। বেশ চড়া হয়ে রোদ উঠলেও এখানে গাছের ছায়া। পরিষ্কার বালি। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ি। দুপাশে গম্ভীর পাহাড় আমাকে দেখছে। জঙ্গল থেকে যে-কোনও সময় যে-কোনও একটি জন্তুর বেরিয়ে আসা বিচিত্র কিছু নয়। কিন্তু ভয় আসে না। শুয়ে শুয়ে দেখি পাখিদের ওড়াউড়ি। কী অদ্ভুত তীব্র নীল এখানকার আকাশ। মানস সরোবর কীরকম, এই আকাশের মতন? একদিন যেতে হবে।

হাত থেকে খসে পড়ে সিগারেট, ঘুম আসে। মনে হয়, এখানেই শুয়ে থাকব, আর কোনওদিন কোথাও যাব না। বহুদিন আগে আমি এখানেই ছিলাম, কেন দূরে চলে গিয়েছিলাম ভুল করে? আর ভুল করব না। পাতার ফাঁক দিয়ে একটি রোদের রেখা এসে পড়ায় আমি দু'হাতে চোখে চাপা দিই।

আমার এই অরণ্যবৈরাগ্য মাত্র দেড়ঘণ্টা স্থায়ী হয়। অতুল ওঝা ঠিক আমাকে খুঁজে বার করেছে। ডাকবাংলোতে ততক্ষণে খিচুড়ি রান্না তৈরি বলে সে আমাকে তাড়া দেয়।

আমিও উঠে পড়ি। এবার ফিরতে হবে। ফিরতে তো হয়ই।

॥ চব্বিশ ॥

নদীর নাম হাতানিয়া-দোয়ানিয়া। কোনও নদীর এমন অদ্ভুত নাম আমি আর শুনিনি। কী এর মানে? কোন উদ্দাম কল্পনায় এরকম নাম দেওয়া যায়! অথচ নামটা বেশ সুন্দর, বেশ ঘরোয়া, খুব আপন আপন। সুন্দরবন এলাকায় অনেক নদীর নামই খুব মধুর। যেমন ঠাকুরান, যেমন মৃদঙ্গভাঙা। তবু

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া নামটিই আমার বেশি পছন্দ। এর সমতুল্য নামের আর একটা নদী আমি পেয়েছিলাম, সেটি আসামে, তার নাম ঝাটিংগা।

হাতানিয়া-দোয়ানিয়া ছোট নদী হলেও বেশ তেজি। কলকাতা থেকে মাত্র সত্তর-আশি মাইল দূরে সমুদ্র থাকলেও আমরা যে সরাসরি বাসে চেপে বা গাড়িতে সমুদ্রের কাছে পৌঁছে যেতে পারি না, তার কারণ এই নদীটি শুয়ে আছে নামখানার পাশে। এর ওপর এটা সেতু বানানো যায় না? যায় নিশ্চয়ই, তবে যেমন-তেমন সেতু বানালে চলবে না, সেটি বানাতে হবে বেশ উঁচু করে কারণ এই নদী দিয়ে অনেক বড়-বড় মাছবাহী নৌকো যায়, স্থানীয় বাণিজ্যের জন্য যেগুলি জরুরি। তবু সেরকম একটা সেতুও কি বানানো যায় না? যাবে না কেন, কিন্তু কে-ই বা তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে?

হাতানিয়া-দেয়ানিয়ার বুকে একটা ছোট্ট ছিমছাম সপ্রতিভ লঞ্চে চড়ে যাত্রা শুরু হল। বিকেলের পাতলা রোদকে চাদরের মতন উড়িয়ে সুপবন বইছে। আমরা কয়েক বন্ধু লঞ্চের ওপরের ছোট ক্যাবিনে জমিয়ে বসলাম। খানিকটা দূরে যেতে যেতেই নদীর দুধার গৃহ-বিরল হয়ে এল, ধুধু করা মাঠ, মাঝে-মাঝে এক-একটা একলা গাছ। নদীর ধারে এখানে সেখানে প্রতীক্ষমান এক পায়ে-খাড়া হয়ে থাকা বক। পরিচিত দৃশ্য।

এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা এসে পড়লাম একটা বড় নদীতে। এ নদীর নাম সপ্তমুখী। নদী তো নয়, গোলোকধাঁধা। সাতনরি হারের মতন নদীটি ছড়িয়ে আছে, এর কোন মুখ যে কোথায় গিয়ে পড়েছে একবার দুবার যাতায়াতে তা বুঝে ওঠা দুঃসাধ্য।

এবার আর নদীর দু-ধার রুক্ষ নয়, ঘন গাছের দেওয়াল। আমার ঢুকে পড়েছি সুন্দরবনে। বুকের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা, চোখ দুটি যেন সবকিছু হাঁ করে গিলতে চায়। এর আগে আমি আসাম, বিহার, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশের অনেক জঙ্গলে ঘুরেছি, এমনকী জঙ্গল দেখতে গেছি সুদূর আন্দামানও, কিন্তু ঘরের কাছেই সুন্দরবন, পৃথিবীর বিখ্যাত অরণ্যগুলির একটি তা-ই আমার দেখা হয়নি এতদিন। এক একটা ব্যাপার ঠিক যেন হয়ে ওঠে না। যেমন, আমি শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাস-খানা পড়িনি। শরৎচন্দ্রের অন্য সবই বই একাধিকবার পড়া, অথচ এই বইখানা হাতের কাছে পাইনি বা যে-কারণেই হোক, পড়া হয়ে ওঠেনি। লোকে যখন 'গৃহদাহ' নিয়ে আলোচনা করে, চুপ করে থাকি। তেমন সুন্দরবন সম্পর্কেও।

আমরা যে-দিকটায় যাচ্ছি সেদিকটা সুন্দরবনের আসল ভয়াবহ দিক নয়। ক্যানিং থেকে গোসাবা হয়ে ঢোকা যায় নিবিড় সুন্দরবনে, সেখানকার চামটা ব্লক ইত্যাদি রোমহর্ষক জায়গা। সেদিকে এখনও যাওয়া হয়নি, একদিন যাব নিশ্চয়ই। অবশ্য আমরা যেদিকে চলেছি সেদিকেও ধনচে ব্লকে বাঘ আছে। তাই নামখানার টাইগার প্রজেক্টের বোর্ড ঝোলে।

ছলাৎ-ছলাৎ করে ঢেউগুলো ধাক্কা মারে তীরের নরম মাটিতে। মাঝেমাঝে ঝুপ-ঝুপ করে পাড় ভেঙে পড়ে। সেইদিকে তাকিয়ে আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। এক-একজনের এক একরকম অনুষঙ্গ। আমার ছেলেবেলার সঙ্গে জড়িয়ে আছে নদী-নালা-খাল-বিল। জলের দেশে বাল্য ও কৈশোরের কিছু বছর কাটিয়েছি। এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে খেলা করতে যাওয়ার সময় মাঝখানের খানিকটা জায়গা সাঁতরে পার হয়ে যেতে হত। একা-একা ঘুরে বেড়িয়েছি নৌকোয়, ছোট পাল, দুপাশে ঝুঁকে পড়েছে গাছপালা, স্বচ্ছ জলের মধ্যে দেখা যায় খলসে আর চাঁদা মাছ। (খলসে মাছ কি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেছে? বহুকাল দেখিনি।) ফরিদপুরে আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দূরে ছিল এক দুর্ধর্ষ নদী, নাম আড়িয়েল খাঁ—পাড় ভাঙার জন্য বিখ্যাত। কতদিন সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে দেখেছি ঝুপঝাপ করে পাড় ভেঙে জলে পড়ে যাচ্ছে। তখন নদীর কূল ভাঙার সঙ্গে জীবন বা সংসারের কোনও উপমা মনে আসত না, এমনিই দেখতে দেখতে শিহরন জাগত।

—ওই যে একটা কুমির।

ডেক থেকে কে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। কুমির দেখার জন্য আমরা হুড়মুড় করে বাইরে এলাম। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বরুণ চৌধুরী, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ও আমি। এ ছাড়া সেচ ও শিক্ষা বিভাগের কয়েকজন অফিসার, আমরা যাঁদের অতিথি। কিন্তু আমরা ঠকে গেলাম, চিৎকারকারী আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করেছিলেন। কুমির টুমির কিছু নয়, চরের ওপর পড়ে আছে এক খণ্ড পোড়া কাঠ। কুমির এরকমভাবে শুয়ে থাকে বটে কিন্তু আমাদের খুশি করার জন্য সেদিন কোনও কুমির একবারও চরের ওপর রোদ পোহাতে এল না। আমরা ক্যাবিনের জানলা দিয়ে এমন ব্যগ্রভাবে তাকিয়েছিলাম যেন যে-কোনও মুহূর্তেই একপাল হরিণ কিংবা একটা জ্যান্ত বাঘ দেখে ফেলব। কিন্তু একটাও জনপ্রাণী চোখে পড়ে না। শুধু একটানা বোবা জঙ্গল।

প্রথম দর্শনে সুন্দরবনকে একটুও সুন্দর লাগে না। মনে মনে আমি এই অরণ্যের অন্য একটি চিত্র এঁকে রেখেছিলাম। বস্তুত, আগেকার দেখা অন্য কোনও বনের সঙ্গেই সুন্দরবন মেলে না। অন্য সমস্ত নিবিড় বনে দেখেছি বিশাল বিশাল বনস্পতি, শাল, সেগুন, জারুলের গগনচুম্বী স্পর্ধা। কিন্তু সুন্দরবনের গাছগুলো ছোট ছোট, একতলা দেড়তলা বাড়ির চেয়ে বেশি উঁচু নয়। ভেড়ার গ্রামের মতন অত্যন্ত ঘনভাবে জড়ামড়ি করে আছে গাছগুলো। দেখলেই বোঝা যায়, তারা অত্যন্ত জেদি ও শক্তিশালী, তাদের মোটামোটা শেকড় লম্বা হয়ে মাটির ওপর দিয়ে এগিয়ে এসেছে অনেকখানি। জোয়ারের সময় নদী অনেকটা ঢুকে যায় বনের মধ্যে, আবার জল নেমে আসার পর জমে থাকে থকথকে কাদা, সেই কাদা ফুঁড়ে মাথা উঁচু করে থাকে অজস্র মূল। এবং সেই কাদার ওপরে কানকো দিয়ে হাঁটা-চলা করে একরকমের মাছ। মেঘ ডাকলে কই মাছকে অনেক সময় ডাঙার ওপর দিয়ে চলতে দেখেছি—এ ছাড়া যখন তখন স্থলে ভ্রাম্যমাণ এই একটাই মাছ আমার চোখে পড়েছে চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন জায়গায় যে মাছের সঠিক বাংলানাম কেউ জানে না, এক-একজন এক-একরকম বলে। নোনা জল ঢুকলে খেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, আর সেই নোনা জল খেয়েই সুন্দরবনের গাছপালা এত তেজি ও স্বাস্থ্যবান। শুনেছি সুন্দর ওরফে সুঁদরি গাছের জন্যই সুন্দরবন নাম। সে গাছ একটাও দেখলাম না। শোনা গেল, পূর্ববাংলা ওরফে বাংলাদেশের দিকে কিছু আছে। এপাশে আর চোখে পড়ে না। আর এক রকম গাছ খুব বেশি, যার স্থানীয় নাম বাইন। আর সব গাছের নাম জানি না।

নদীর ধারের দিকের গাছগুলি অধিকাংশই হিন্তাল বা হেঁতাল, এরকম শুনলাম। আবার অবাক হওয়ার পালা। মনসামঙ্গল কাব্যে পড়েছিলাম, চাঁদ সদাগরের হাতে সব সময় একটা হিন্তালের লাঠি থাকত। আগে জানতাম না হিন্তাল গাছ কীরকম, কিন্তু চাঁদ সদাগরের লাঠি নিশ্চয়ই একটা বেশ শক্তপোক্ত জিনিস হবে। কিন্তু এ গাছগুলো তো বেঁটে ঝোপের মতন অনেকটা বেত ও খেজুর গাছের সংমিশ্রণ বলে মনে হয়। পাতাগুলো সবুজ হলদেতে মেশানো, বাঘের ক্যামুফ্লাজের পক্ষে আদর্শ। বাঘেরা এই হিন্তালের ঝোপেই লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। পরে অবশ্য কাছ থেকে দেখেছি, হিন্তালের দু-একটা ডাল বেশ লম্বা হয়, তা দিয়ে ভালো লাঠি বানানোও যায়। হেঁতালের ঝোপগুলো দেখে মনে পড়ছিল মানগ্রোভের কথা, যা প্রচুর দেখেছি আন্দামানে। সেখানে অবশ্য নদী নেই, খাঁড়ি বা ক্রিক। তার মধ্যে এক গলা নোনা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েও মানগ্রোভগুলোর ডাকাতের মতন স্বাস্থ্য।

খানিক বাদেই অন্ধকার হয়ে এল। এখন দুপাশে শুধু নিবিড় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। একটাও বাঘের ডাক শুনিনি তবু কীরকম গা ছমছম করে। নদীর বুকে আমাদের লঞ্চের জোরালো সার্চলাইট একটা আলোকপথ তৈরি করে রেখেছে, তাতে মাঝেমাঝে দেখা যায়, দু-একটা মাছ ধরার নৌকোর টিমটিমে আলো। দূরে এক জায়গায় দেখা যায় জলের বুকে যেন দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলছে। না আলেয়া নয়, কাছে গেলে দেখা যায়, একটা বড় স্টিমার বা গাধাবোট, তাকে ঘিরে সাত আটটি নৌকো।

এরা বাংলাদেশের ব্যাপারি এরকমভাবে থেমে থেমে সাত আট দিনে পৌঁছোয়। এখানকার ডাঙায় যেমন বাঘ-কুমির, তেমনি জলে বড় ডাকাতের উপদ্রব।

ওয়ালস ক্রিক, কারজন ক্রিক, চালতাবুনিয়া, জগদ্দল—এইসব অদ্ভুত নামের খাঁড়ি-নদীর পাশে পাশে পাথরপ্রতিমা, শিবগঞ্জ, কিশোরী নগর—এ ধরনের নামের গ্রাম। এরই মধ্যে একটি ভাগবতপুর; এখানে আছে কুমিরের চাষ। আমরা ভাগবতপুরে দিনের আলো থাকতে থাকতেই একবার লঞ্চ থামিয়ে নেমে পড়েছিলাম। লঞ্চ থেকে একটা কাঠের তক্তা বেয়ে নামতে গিয়ে একজন পড়ল কাদার মধ্যে, আমি ভাঙা-ঝিনুকে পা কেটে ফেললাম। ভাগবতপুর—এরকম জমকালো নাম সত্ত্বেও ঘড়বাড়ি ক্বচিৎ চোখে পড়ে। এখানে নারকোল চাষের সরকারি পরিকল্পনায় খুব ধুমধাম করে নারকোলের চারা লাগানো হয়েছিল কয়েক হাজার। তার অধিকাংশই শুয়োরে খেয়ে গেছে কিংবা লোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। কুমির প্রকল্পটি অবশ্য সদ্য তৈরি হচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে এখন আর কুমির নেই, তাই ভারত সেইসব দেশে কুমির বিক্রি করে বিদেশি মুদ্রা আনবে। বাঘ-সিংহ-কুমির জাতীয় প্রাণীরা স্মরণাতীত কাল থেকে এই সেদিন পর্যন্ত ছিল মানুষের শত্রু, মানুষ ওদের হাতে মরেছে কিংবা ওদের মেরেছে। এখন সেই মানুষই যত্ন করে ওদের বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। এখন বাঘ যদি মানুষ মারে, তার কোনও শাস্তি হবে না, কিন্তু মানুষ যদি বাঘ মারে তার জেল হবে নির্ঘাত। মানুষ বড় মজার জাত।

সুন্দরবনের নানা জায়গা থেকে ধরে আনা হচ্ছে কুমির, কিংবা খুঁজে আনা হচ্ছে কুমিরের ডিম। তারপর জলের উত্তাপ মেপে, তাদের রুচিমতন খাদ্য দিয়ে অনেক তরিবত করে লালন করা হচ্ছে তাদের। পটাসিয়াম পারমাঙ্গানেট মেশানো জলে পা ধুয়ে আমরা ঢুকলাম একটা হলঘরের মতন খাঁচা ঘরে কুমিরের বাচ্চা দেখতে। চল্লিশ বেয়াল্লিশটা বাচ্চা কুমিরকে ডিম ফুটিয়ে রাখা হয়েছে বিভিন্ন চৌবাচ্চায়। এক একটা গিরগিটির চেয়ে একটু বড়, কাছে গেলেই ধারালো দাঁত মেলে হাঁ করে আসে। একবার ধরতে পারলে খুবলে মাংস তুলে নেবে। আমরা মুখ দিয়ে উৎকট শব্দ করে ওদের ভয় দেখাই। একসঙ্গে এতগুলো কুমিরের বাচ্চা। জীবনে আরও কত কিছু দেখব। সন্ধে হওয়ার আগেই লঞ্চে ফিরে এলাম।

আমাদের গন্তব্য সীতারামপুর। সেখানে সেচ বিভাগের একটা ছোট বাংলো আছে। এর পর আর জনবসতি নেই বললেই চলে। অদূরে সমুদ্র। আমরা কয়েক বন্ধু রাত্রে লঞ্চেই থেকে গেলাম হই-হই করে জেগে, আধো-ঘুমিয়ে। ওপারের ধনচে জঙ্গলের বাঘরা আমাদের সেই কোলাহলে বিরক্ত হয়েছিল কি না কে জানে।

সকালবেলা সাগরের মোহনা পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টা করেও ফিরে আসতে হল। জোয়ারের জল ঢুকছে তার মধ্যে আমাদের লঞ্চটা মোচার খোলার মতন টাল-মাটাল। সারেং চটপট লঞ্চের মুখ ঘুরিয়ে ফেলল।

ফেরার পথ ওপারের জঙ্গল ঘেঁষে। পারমিট ছাড়া এই জঙ্গলে প্রবেশ নিষেধ। আমাদের কাছে সেসব কিছুই নেই। ঠাসা, জমজমাট অত্যন্ত বন্য ধরনের বন, এর ভেতর হাঁটতে গেলে দুহাতে বন *ঠেলে-ঠেলে* যেতে হবে। তবু একবার যেতে ইচ্ছে করে। চরের ওপর বসে আছে এক ঝাঁক খয়েরি রঙের বুনো হাঁস, হাওয়ায় গাছের ডগাগুলো দুলে-দুলে উঠছে, জোয়ারের জল বেড়ে উঠছে লকলক করে। এ সময় কোনো ভয়ের চিন্তা মনে আসে না। ইচ্ছে হয় এক ছুটে জঙ্গলটা একবার ঘুরে আসি।

সারেংকে বললাম, একবার লঞ্চটা থামান না। এখানে তো দেখবার কেউ নেই। আমরা একটুখানি ঘুরেই চলে আসব।

সারেং কিছুতেই রাজি নয়। মানুষটি বেশ সদালাপী-এর আগে আমাদের অনেক উপদ্রব সহ্য করেছেন। কিন্তু এবার বললেন, না বাবু, আপনারা জানেন না সুন্দরবনকে বিশ্বাস নেই। কখন কোথা

থেকে যে বিপদ ঘটে যায়, কিছুই বলা যায় না এই তো সেদিন একজনকে...পাড়ে নামা মাত্তরই বাঘ এসে...

এরপর তিনি আমাদের একটি রোমহর্ষক কাহিনি শোনান। সুন্দরবনের বাঘের এরকম অত্যাচার কাহিনি আমরা আগেও পড়েছি বা শুনেছি। এই টাটকা কাহিনিটিও যে সত্য তার প্রমাণ হিসেবে, সারেং বললেন, আহত ব্যক্তিটিকে এখনও মুমূর্ষু অবস্থায় কাকদ্বীপের হাসপাতালে দেখা যেতে পারে। অবিশ্বাস করার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমরা একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে রইলাম।

একটু পরে দেখি যে একটা খুব সরু খাঁড়ি দিয়ে একটি ছিপ নৌকোয় দু'তিনজন লোক ঢুকছে ওই জঙ্গলে। আমরা বললাম, ওই যে লোকগুলো যাচ্ছে ওদের ভয় নেই?

এ প্রশ্নে উত্তর না দিয়ে সারেং বিচিত্রভাবে হেসে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

তখনই বুঝলাম আমাদের মূর্খামি। যারা প্রতিদিন না খেতে পেয়ে মরে যাওয়ার দুশ্চিন্তা নিয়ে বেচে আছে, তাদের কি বাঘের ভয় পেলে চলে? এ আর নতুন কথা কী?

॥ পঁচিশ ॥

দহিজুড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা যেতেই জিপ গাড়িটা থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। ড্রাইভারের পাশে আমি, তারপর স্বাতী। পেছনে কল্যাণ এবং চারটি মুরগি।

প্রথমে একটু একটু ধোঁয়া, তারপর মোষের শিং-এর মতন, তারপর কারখানার চিমনির মতন। আমরা টপাটপ নেমে পড়লুম, ড্রাইভার এসে বনেটটি খুলে ফেললেন। 'যত্র ধূমাৎ তত্র বহ্নি' লজিকের এই সূত্রটিকে সত্যি প্রমাণিত করে হুহু করে জ্বলে উঠল আগুন, ড্রাইভার যুবকটি ব্যাটারি সংলগ্ন তারটি টানাটানি করে ছেঁড়ার চেষ্টা করেও পারলেন না। এর মধ্যে পথের দু'মুখে অনেকগুলি গাড়ি থেমে পড়েছে। তার মধ্যে একটা বাস এবং তাদের সবগুলির ড্রাইভার এক যোগে নানারকম বিপরীত পরামর্শ দিতে লাগল ও লাগলেন, ব্যাটারির তারটা টেনে ছেঁড়ার সাধ্য হল না কারুরই।

স্ত্রী জাতি সহজেই উদ্বিগ্ন হয়, আর এখানে তো যথেষ্ট কারণই রয়েছে। স্বাতী শুকনো মুখে বলল, যাঃ। অর্থাৎ আমাদের আর যাওয়া হবে না।

আমি তাকালুম কল্যাণের দিকে। পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরা কল্যাণ একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে নির্লিপ্ত মুখে। সে যেন একজন পথের দর্শক, অন্য কারুর গাড়িতে আগুন লেগেছে, সে দেখছে। বেশ সুস্থিরভাবে পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে একটি ধরাল। পায়জামা, পাঞ্জাবিতে কল্যাণকে বেশ নিরীহ দেখায়, প্যান্ট শার্টে তার দৃঢ়-চওড়া চেহারাটা বেশ পরিষ্কার হয়। তখন তাকে মনে হয় বহুযুদ্ধে পোড় খাওয়া একজন সৈনিক।

তার পোড়ার পট পট শব্দ হচ্ছে, আমার ধারণা এক্ষুনি এই পুরো জিপ গাড়িটি দাউ-দাউ করে জ্বলবে, মালপত্রগুলো অন্তত নামিয়ে ফেলা যায় কি না ভাবছি, এই সময় একজন ড্রাইভার একটা ছোট হাত-করাত এনে ব্যাটারির তার কেটে দিতেই আগুনের মূল প্রতাপটা কমে গেল। তারপর জ্বলন্ত তারগুলোকে নেভাবার চেষ্টা।

কল্যাণ রাস্তার পাশে মাঠের দিকে তাকিয়ে আছে। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই বলল, দেখেছেন সুনীলদা, এই সময় মাঠ ধানে ভরে যাওয়ার কথা, কিন্তু এবার এখনও ভালো করে বৃষ্টিই হল না—

আমি জিগ্যেস করলুম, গাড়িটার কী হবে। কল্যাণ বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, ও ঠিক হয়ে যাবে।

আমি দেখতে পাচ্ছি, গাড়ির বনেটের নীচে যে তারের জঙ্গল থাকে তা অধিকাংশই পুড়ে কালো কালো, এই অবস্থায় গাড়ি চলার কোনও প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবু কল্যাণের কথায় অবিশ্বাস করতে পারি না।

সেই কবে ছেলেবেলায় পড়েছিলুম রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট অন দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট', তার একটি চরিত্র কাটসিনস্কির কথা মনে পড়ে। যে-কোনও পরিবেশের মধ্যে এই ধরনের মানুষ একটুও ঘাবড়ায় না। সবসময় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলতে পারে, সব ঠিক হয়ে যাবে! কল্যাণ কথা বলে খুব কম, অনেক কথায় উত্তর দেয় শুধু হেসে। ঝাড়গ্রামে ওকে বলেছিলুম, কল্যাণ, অনেকবার তো এদিকে এলুম, কাঁকড়াঝোড়টা একবারও দেখা হল না, স্বাতীরও খুব যাওয়ার ইচ্ছে, একটা জিপ-টিপ জোগাড় করা যাবে? 'উইদাউট ব্যাটিং অ্যান আইলিড' যাকে বলে, কল্যাণ বলেছিল, হ্যাঁ, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি ভেবেছিলুম কিছুক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হবে এ বিষয়ে, কিন্তু কল্যাণ সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জানাল, কাল সকাল দশটা-এগারোটায় বেরিয়ে পড়ব।

ঝাড়গ্রামে এসেছিলুম রাধানাথ মণ্ডলদের গল্পচক্রের অধিবেশনে। সন্তোষকুমার ঘোষ মধ্যমণি। এক সন্ধের ব্যাপার। পরদিন সকালে সন্তোষদা সদলবলে ফিরে গেলেন কলকাতায়, বাংলোয় শুধু স্বাতী আর আমি। এগারোটা বেজে গেল, কল্যাণের পাত্তা নেই। স্বাতী কল্যাণকে আগে দু-একবার মাত্র দেখেছে, সুতরাং সেই একটু উতলা হয়ে উঠতেই পারে। সাজ পোশাক করে, জিনিসপত্র গুছিয়ে আমরা তৈরি। এখন যদি কল্যাণ এসে বলে, জিপ পাওয়া গেল না—এই ধরনের চিন্তা।

সাড়ে এগারোটায় কল্যাণ এল, শুধু জিপ নিয়ে নয়। সেই সঙ্গে চাল-ডাল-তেল-নুন-আলু-লঙ্কা-পেঁয়াজ-পাউরুটি-ডিম-মুরগি ইত্যাদি যাবতীয় বাজার করে। কাঁকড়াঝোড়ে কিছু পাওয়া যায় না। এসব কথা কল্যাণ আমাকে একবারও বলেনি। জিপ থেকে নেমে শুধু বলেছিল, কাছেই ফরেস্ট অফিস আপনি ডি-এফ-ও-র সঙ্গে একটু কথা বলে বাংলোটার বুকিং করে নিন। গেলুম ডি-এফ-ও'র কাছে। ইনি, শ্রীসুবিমল রায় আমাদের বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরীর সহপাঠী, তা ছাড়া কাঁকড়াঝোড়ে বেশি লোক যায় না, সুতরাং বাংলো রিজার্ভেশানের ব্যাপারে কোনও সমস্যা সৃষ্টি হয়নি। সমস্যা যে কিছু হবে না, সবই যেন কল্যাণের আগে থেকে জানা।

ড্রাইভার যুবকটি পোড়া তারগুলো টেনে-টেনে বার করছেন, অন্যান্য ড্রাইভাররা উপদেশের ঝড় বইয়ে দিচ্ছে, আমার মনে হল, এই অবস্থায় এই গাড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়াই একটা সমস্যা হবে, আমাদের যাওয়া তো দূরের কথা।

কল্যাণ বলল, ওই জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি!

আমি বললুম, তার মানে?

—যার কাছ থেকে জিপটা এনেছি, তার দুটো জিপ। ভালো, নতুন জিপটা নবগ্রামে চলে গেছে, সেটা পেলে ভালো হত। এটাতেও কাজ চলে যায়।

—কিন্তু এখন কী হবে?

—সব ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন না!

আমাদের জিপ চালক অন্যান্য ড্রাইভারদের কারুর কাছ থেকে একটা স্ক্রু-ড্রাইভার, কারুর কাছ থেকে প্লাস ইত্যাদি ধার চেয়ে চলেছেন, তারপর শুধু একটা লম্বা তার দিয়ে কীসের সঙ্গে কী জুড়ে দিতেই গাড়ির ইঞ্জিন আবার গ-র-র-গ-র করে উঠল। আমি হতবাক। এতগুলো বড় তারের বদলে মাত্র একটি তার!

কল্যাণ বলল। ওই জন্যই তো ড্রাইভার আনিনি। রাস্তায় গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে ড্রাইভাররা কিছু করতে পারে না। এ একজন মেকানিক। গাড়ির মিস্ত্রি। গ্যারেজে কাজ করছিল, জোর করে তুলে নিয়ে এসেছি।

অর্থাৎ সেইজন্যই কল্যাণের আসতে আধ ঘণ্টা দেরি হয়েছিল।

সত্যিই আবার দিব্যি জিপটি চলতে শুরু করল। দহিজুড়ি ছাড়বার কিছু পরেই তরুণ শালের জঙ্গল শুরু হয়। এ রাস্তা আমার বেশ চেনা। এ পথ দিয়ে অনেকবার বেলপাহাড়িতে এসেছি।

আমরা বেলপাহাড়িতে এসে পৌঁছলাম বিকেলের দিকে। গাড়িকে একটু বিশ্রাম দেওয়া দরকার। আমরা নেমে পড়লুম কল্যাণের চেনা একজন লোকের বাড়িতে। জিপ-চালক আবার বনেট উঁচু করলেন। এবার ব্যাটারির সঙ্গে তারটি লাগানো হয়েছে খুব আলগাভাবে, যাতে আবার কোনও গণ্ডগোল হলে একটানে খুলে ফেলা যায়।

যাঁর বাড়িতে নেমেছি, তিনি জাতিতে সিন্ধি, চমৎকার মেদিনীপুরের টানে বাংলা বলেন, ইনি একজন বিড়ি পাতা ব্যবসায়ী। লক্ষপতি বললে খুব কম বলা হবে, অর্ধকোটিপতি বলাই বোধহয় সঙ্গত। এঁর বাড়িটির ছাদ টিনের, পেছন দিকে দু'আড়াই শো মজুর-মজুরনি কাজ করছে। কল্যাণ নিজেও বিড়ি পাতার ব্যবসায়ে নেমেছিল, বেশ কিছু টাকা লোকসান দিয়ে পিছু হটে এসেছে। বিড়ি পাতার ব্যাবসায়ে যেমন ঝুঁকি, তেমনি লাভ, এরকম জানা গেল, এ অঞ্চলে সিন্ধিরাই একচেটিয়াভাবে এ ব্যাবসা করেছে এতদিন। সরকার আদিবাসী উন্নয়ন সমিতির হাতে বিড়ি পাতার জঙ্গলের ইজারা দিতে চান, কিন্তু যা হয়, সিন্ধি ব্যবসায়ীদের দক্ষতার তুলনায় কেউ কিছু না। সরকারি উদ্যোগে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি হয় প্রতি বছর।

চকচকে কাঁসার গেলাসে জল এবং পরে সর-ভাসা বেশি দুধের চা খেয়ে আমরা আবার যাত্রা শুরু করলুম। বেলপাহাড়ি জায়গাটি সমতল ও পাহাড়ি এলাকার ঠিক সংযোগ স্থলে। যতবার আসি, দেখি যে, বেলপাহাড়িতে মানুষ ও বাড়ির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই মানুষ বাড়ছে তো বেলপাহাড়িতেই বাড়বে না কেন?

পাহাড় জঙ্গলে ঢোকবার মুখে একজন ফরেস্ট গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে নিলুম। কারণ, ঝাড়গ্রামেই ডি-এফ-ও বলেছিলেন, কাঁকড়াঝোড়ে কয়েকদিন ধরে এক পাল হাতি দেখা যাচ্ছে। প্রতি বছরই ওরা আসে, তবে এবার যেন একটু আগে এসেছে। উত্তর বাংলার হাতিদের মতন এখানকার হাতি তেমন হিংস্র নয়, তবে একেবারে সামনাসামনি পড়ে গেলে দুষ্টুমি করে জিপটা উলটে দিতেও পারে।

ফরেস্ট গার্ডটির শুকনো ক্ষয়াটে চেহারা। এমনই রোগা যে ওর কোমরের বেল্টে নিশ্চয়ই নতুন ফুটো করতে হয়েছে। হাতে একটা লাঠি, হাতি সামনে এসে পড়লে এই ব্যক্তি কীভাবে আমাদের সামলাবে?

কল্যাণ বলল, জঙ্গলের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলার খুব ভয়। এ অন্তত রাস্তা চিনবে।

এ কথায় আমাদের জিপ-চালক জানালেন, আমি কাঁকড়াঝোড় সাত আটবার এসেছি, রাস্তা আমার মুখস্থ।

পাকা রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে জঙ্গলের মধ্যে পাথুরে রাস্তায় ঢুকতেই বুঝতে পারলুম, কেন, কাঁকড়াঝোড়ে বেশি লোক আসে না। কলকাতা থেকে কতই বা দূর, দুশো-আড়াইশো মাইলের মধ্যে। আজকাল কয়েকটি বেশ স্মার্ট ট্রেন চলে, তাতে আড়াই বা তিন ঘণ্টায় পৌঁছনো যায় ঝাড়গ্রাম। সেখান থেকে মজবুত জিপ পেলে আর তিন ঘণ্টার মধ্যে কাঁকড়াঝোড়। এবং পথ চেনার জন্যও সঙ্গে কারুর থাকা দরকার, কেন না, বনের মধ্যে দিয়ে চোদ্দো কিলোমিটার যেতে-যেতে অনেক শাল পথ, তার যে-কোনও একটি ধরে হারিয়ে যাওয়া খুব সোজা।

এ রাস্তা বিপজ্জনক নয়, দুর্গম। প্রায়ই বড় বড় চড়াই-উতরাই, মাঝে-মাঝে গর্ত। এক-একবার কোনও গর্তে পড়ে গাড়িটি লাফিয়ে উঠলেই আমি ভাবি, ব্যাটারির তারটা ছিঁড়ে গেল না তো?

স্বাতী ব্যগ্রভাবে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। যদি হাতি দেখতে পাওয়া যায়। একটু দূরে যে-কোনও গাছপালার জটলার দিকে তাকালেই যেন মনে হয়, ওখানে কোনও হাতি ঘাপটি মেরে আছে। কল্যাণের ধারণা পথে হাতি পড়বেই, কারণ সে এদিকে আগে হাতি দেখেছে নিজের চোখে। এক জায়গায় হাতির 'গোবর' পড়ে থাকতে দেখে কল্যাণ বলল, ওই যে এই রাস্তা দিয়েই গেছে। আমি অভিজ্ঞ শিকারির ভাব নিয়ে ওকে জানালুম যে, ওটা অন্তত দু'দিনের পুরোনো।

কল্যাণেরর মতে, এই জঙ্গলে বাঘ নেই বটে, কিন্তু নেকড়ে আছে। ডি-এফ, ও'-ও আমায় বলেছিলেন, জঙ্গলের মধ্যে জিপের পেছনে-পেছনে কখনও-কখনও নাকি কুকুরের মতন কোনও প্রাণীকে ঘাড় নীচু করে ছুটে আসতে দেখা গেছে। যদিও নেকড়ে আজকাল খুবই দুর্লভ। জঙ্গলের নেকড়েগুলোই এখন অ্যালসেশিয়ান হয়ে শহরের অনেক বাড়িতে শোভা পায়।

হাতি কিংবা নেকড়ে কিছুরই দর্শনলাভ ঘটল না। আমরা বাংলোর কাছে এসে পৌঁছলাম বিকেলের ব্রাহ্ম মুহূর্তে। জিপ থেকে নেমেই বললুম, বা।

বাংলোটি এমনই জায়গায়, যেখানে গোল হয়ে ঘুরে তাকালে দেখা যাবে শুধু জঙ্গল-মাখা পাহাড়। এখানে দাঁড়ালে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় যে আমরা চলে এসেছি পৃথিবীর এক প্রান্তসীমায়, সভ্যতা থেকে অনেক দূরে। যদিও দুপুরবেলাতেই আমরা একটা শহরে ছিলাম।

শেষ বিকেলের রক্তাক্ত আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে বাংলোটি আমাদের মন কেড়ে নেয়। তা বলে এমন নয় যে এর থেকে ভালো বাংলো আমরা আগে কখনও দেখিনি। বস্তুত, ফরেস্ট বাংলোগুলির চেহারা একই রকম হয় প্রায়। তবু এক একটি সময় আসে, যখন সুন্দরের মধ্যে কোনও তুলনার কথা মনে আসে না, চোখের সামনের বস্তুটিকেই মনে হয় পরম প্রাপ্তি। বড় বড় শাল গাছের মধ্যে একটি কাজু বাদাম গাছ দেখে স্বাতী মুগ্ধ। ও আগে কখনও ওই গাছ দেখেনি।

কল্যাণ জিগ্যেস করল, আপনি চন্দন গাছ দেখেছেন?

স্বাতী তা-ও দেখেনি। কল্যাণ সংক্ষেপে জানাল, কাল সকালে আপনাকে দেখাব!

দেখতে না দেখতেই ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে এল। আমরা বাংলোর মধ্যে ঢুকে ব্যাপৃত ছিলাম পোশাক পরিবর্তনে। এবং অল্প ক্ষণের মধ্যেই কল্যাণ জানাল যে চা, ডিম সেদ্ধ ইত্যাদি তৈরি।

বাংলোর বারান্দায় বসে দ্বিতীয় কাপ চা খাচ্ছি, এমন সময় একজন লোক দু-বোতল মহুয়া এনে রাখল কল্যাণের পায়ের কাছে। কল্যাণ বোতল দুটি তুলে প্রথমে টোকা দিয়ে টংটং শব্দ শুনল, তারপর ছিপি খুলে দু-তিনবার ঘ্রাণ নিয়ে বলল, হ্যাঁ, খাঁটি জিনিস। আমি হাসলুম।

কল্যাণের ব্যবস্থার কোনও ত্রুটি নেই। শালের জঙ্গলে এসেছি, মহুয়া তো পান করবই। আমরা পৌঁছনো মাত্রই কল্যাণ ঠিক মনে করে মহুয়া আনতে পাঠিয়েছে। কিন্তু হাসলুম এই জন্য যে, সময়ের কত বিচিত্র রকম খেয়াল! কল্যাণকে আগে যতবার দেখেছি, ওর দুরন্তপনায় হতবাক হয়ে গেছি, ওর শরীরে ও মনে অসাধারণ শক্তি, এক বোতল মহুয়া ও এক চুমুকে শেষ করে দিতে পারে। সারারাত জেগে তাস খেলে, সকালবেলা একটুও না ঘুমিয়ে তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ে, যখন যে জিনিসটি চায় সেটা পেতেই হবে...। সেই কল্যাণ যেন ধীর, শান্ত এবং কিছুদিন আগে তীব্র শ্বাসকষ্টের অসুখ

হওয়ায় ও আগামী ন' মাস এক বিন্দুও অ্যালকোহল পান করবে না। ঠিক ন'মাস কেন, তা অবশ্য রহস্যময়।

নিজেই একটি গেলাসে খানিকটা মহুয়া ঢেলে কল্যাণ বলল, আগে একটু টেস্ট করে দেখুন, সুনীলদা। বউদিও একটু চেখে দেখবেন নাকি? দেখুন না খাঁটি মহুয়ার মতন এমন ভালো জিনিস...

নিজে পান না করলেও অপরকে পান করাবার ব্যাপারে কল্যাণের উৎসাহ একই রকম আছে। একটু পরে সে মাংস রান্নার ব্যাপারে চৌকিদারকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য উঠে চলে গেল।

জঙ্গলটা ডুবে আছে অরব অন্ধকারে। সৌভাগ্যের কথা, আকাশ খুব পরিষ্কার। এত বেশি তারা একসঙ্গে দেখবার জন্য মাঝে-মাঝে অরণ্যে আসা দরকার। আকাশ তার এমন রূপ আর অন্য কোথাও দেখায় না। ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাঝে মাঝে নক্ষত্র পতন দেখা যায়। নক্ষত্র কিংবা উল্কা, পরিষ্কার চোখে পড়ে, একটা আলোর বিন্দু আকাশ থেকে খসে পড়তে-পড়তে, যেন আকাশের খুব কাছাকাছি এক দীর্ঘকায় শাল গাছের মাথার কাছে এসে নিভে গেল।

কল্যাণ মাংস রান্নার ফাঁকে-ফাঁকে আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিচ্ছে। একবার সে বলল, বউদি ওই যে দেখুন! ওটা কিন্তু তারা নয়!

আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, একটা আলোর বিন্দু আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে যাচ্ছে, নীচে খসে পড়ছে। সত্যিই সেটা তারা নয়, বিমানও নয়, সেটা কোনও রকেট নিশ্চিত। অসংখ্য রকেট তো এখন আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে খালি চোখে তারই একটাকে দেখতে পেয়ে আমরা বেশ রোমাঞ্চিত বোধ করি।

জঙ্গল আর অরব রইল না, একটু পরে দূরে, বহু দূরে শোনা গেল দ্রিদিম-দ্রিদিম শব্দ। মাদল কিংবা খোল। কিন্তু এমনই আধোজাগা, গম্ভীর সেই শব্দ যে রীতিমতন রহস্যময় মনে হয়। যেন আদিম কালের পৃথিবীতে কেউ কারুর কাছে কোনও সংকেত পাঠাচ্ছে। আমরা চুপ করে শুনি। নৈশভোজের পর আমরা অন্ধকারের মধ্যে একটু হাঁটতে বেরোলুম। স্বাতী একবার খুব মৃদুভাবে জিগ্যেস করল, এখানে সাপ আছে? কল্যাণ বলল, তা তো থাকতে পারেই!

এবং হাতির দলও কাছাকাছি কোথায় রয়েছে সুতরাং রাত্রে বেশি দূর অ্যাডভেঞ্চার করা যায় না। এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে, একদিকে আঙুল দেখিয়ে কল্যাণ বলল, ওইখানে আলো দেখতে পাচ্ছেন?

চোখ সরু করে আমরা দেখলুম, জঙ্গলের ফাঁকে, বোধহয় দুই পাহাড়ের মাঝ দিয়ে, একটা আলোর রেখা, অনেক দূরের।

কল্যাণ বলল, ওই দিকে ঘাটশিলা। কপার মাইনসের আলো।

অর্থাৎ ঘাটশিলায় গিয়ে আমরা দূরে যে পাহাড়ের রেখা দেখি সেই পাহাড়েরই কোনও চূড়ায় আমরা রয়েছি। ঘাটশিলায় কতবার গেছি, কখনও ভাবিনি, দূরের ওই পাহাড়গুলোতে কখনও থাকব। চাঁদে যাওয়ার পর কেউ যদি আঙুল দেখিয়ে বলে ওই দ্যাখো, দূরে পৃথিবীর আলো—অনেকটা সেই রকম বোধহয়। সেখানে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। পাহাড়ের অন্যদিকে কোথাও তখনও দ্রিদিম দ্রিদিম শব্দ—সেই গম্ভীর, রহস্যময় মাদলের শব্দ। বোধহয় সারারাতই সেই শব্দ শুনেছিলাম।

অরণ্যে দিন ও রাত্রি সত্যিই আলাদা। সকাল বেলা অনেক কিছুই আর রহস্যময় বা রোমাঞ্চকর থাকে না। ভারতবর্ষে বোধহয় এমন অরণ্য একটিও নেই, যা সম্পূর্ণ নির্জন। দিনের বেলা আমি সব জঙ্গলেই মানুষের যাতায়াত দেখেছি। শুধু যাতায়াত নয়, বসতিও।

সন্ধের পর আমরা এই বাংলোটিকে যত নিরিবিলি ভেবেছিলুম, সকালে উঠে দেখা গেল, আসলে ততটা নয়। বাংলোটি টিলার ওপরে, একটু নেমে গেলেই বেশ কিছু কোয়ার্টার, ফরেস্ট

ডিপার্টমেন্টের। এবং জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে কয়েকটি গ্রামও রয়েছে। অনেক জায়গায় চাষ আবাদও হয়। প্রকৃতির শোভা দেখলেই তো চলবে না, মানুষকে তো বাঁচতেও হবে!

সকালের প্রথম চা আমরা পান করলুম বাংলোর পেছন দিকে একটা বেশ উঁচু মিনারের মতন জায়গায়। এখান থেকে পাহাড়ের গোল মালাটি স্পষ্ট দেখা যায়। অরণ্য সবুজ, কিন্তু সবুজ মোটেই একটা রং নয়, অন্তত সাত রকম সবুজ তো এই এখানেই রয়েছে।

কল্যাণ খুব সন্তর্পণে একটি ঘাস ফুলকে আদর করে। তারপর একটি শাল গাছের গা থেকে খানিকটা আঠা ভেঙে এনে স্বাতীকে বলে, জানেন, এর থেকেই ধূপধুনোর ধুনো তৈরি হয়? স্বাতী জানত না, এই সম্পূর্ণ নতুন তথ্যে ও অবাক হয়ে বলল, ওমা, তাই নাকি?

আমাদের তুলনায় স্বাতীই সবচেয়ে কমবার বন জঙ্গলে এসেছে। ও শাল ও সেগুন গাছের তফাৎ জানে না। ও জানত না যে কুসুম গাছ বলে কোনও গাছ থাকতে পারে, যার ফলের নাম কুসুম ফল, এবং লোকে তাই খায়। কচি অবস্থায় যে গাছের পাতা থেকে হয় বিড়ির পাতা সেই গাছই বেশ বড় মোটা, আর কালো হয়, তার নাম কেন্দু। তখন তার পাতা কোনও কাজে লাগে না, কিন্তু কেন্দু ফল জঙ্গলের লোকদের খাদ্য। আমাদের তুলনায় স্বাতীর বিস্ময়বোধ অনেক টাটকা বলে, এই জঙ্গলকে ও উপভোগ করছে বেশি।

কল্যাণ আমার একটা অচেনা গাছের পাতা ছিঁড়ে বলল, দেখুন কী সুন্দর শেপ, শিরাগুলো কেমন চমৎকারভাবে ছড়িয়ে গেছে—!

প্রতি বছর জঙ্গলের কিছু অংশ ইজারা নিয়ে গাছ কাটা কল্যাণের পেশা। কিন্তু ও গাছটাকে ভালোবেসে ফেলেছে। প্রতিটি গাছ ওর চেনা, ও জানে, কোন-কোন গাছ কাটতে নেই, হঠাৎ হঠাৎ এক একটা গাছের দিকে তাকিয়ে ও বলে, দেখুন দেখুন, কী সুন্দর!

কল্যাণের এই পরিচয় আমি আগে জানতুম না। আগে প্রত্যেকবার দেখেছি এক দুরন্ত কল্যাণকে। সেই দুর্দান্তপনা এবং অনর্গল নেশা করার স্বভাব ত্যাগ করেছে বলে অন্য অনেকদিকে ওর মন খুলে গেছে। ও খালি চোখে আকাশের রকেট দেখতে পায়, দারুণ মুরগির মাংস রান্না করে, গাছের পাতার গড়নে মুগ্ধ হয় এবং আদিবাসীদের জীবন নিয়ে চিন্তা করে। এখন ওর হাতে অনেক সময়।

জঙ্গলে এসে সবচেয়ে ভালো লাগে এইটাই যে কিছুই করবার থাকে না। যতক্ষণ ইচ্ছে চুপচাপ বসে থাকা যায়, অথবা ইচ্ছে করলে যে-দিকে খুশি ঘুরে বেড়ানোও যায়। অলসভাবে সেখানে অনেকক্ষণ কাটিয়ে তারপর আমরা বেরিয়ে পড়লুম একটা মন্দির দেখবার উদ্দেশ্যে।

স্বাতীর খুব মন্দির দেখার শখ, বিশেষত যদি পুরোনো মন্দির হয়। কল্যাণ ইতিমধ্যেই এই মন্দির সম্পর্কে একটা রোমহর্ষক গল্প শুনিয়েছে। কাল ভৈরবের মন্দির, এককালে নাকি ওখানে নিয়মিত মানুষ বলি হত, এখনও মাঝেমধ্যে হয় লুকিয়ে চুরিয়ে। মন্দিরের ঠিক মাঝখানে গর্তের মধ্যে একটা বিরাট সাপ আছে, বলির রক্ত সেই সাপটা এসে চুকচুক করে খেয়ে যায়।

বাংলো থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে চন্দন গাছ দর্শন করলাম। কিছুদূরে কমলালেবুর গাছও লাগানো হয়েছে। চন্দন গাছের পাতায় বা ডালে কোনও গন্ধ নেই শুনলাম, ওই গাছে সুগন্ধ আসতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। শিকড়ে একটু-একটু গন্ধ পাওয়া যায়, তাই কারা যেন মাটি খুঁড়ে খানিকটা শিকড় কেটে নিয়ে গেছে।

এদিকে জঙ্গল অনেক পাতলা। পরপর দুটি মকাই-খেত। তারপর একটি লাল রঙের ঝরনা। হাঁটু-জল সেই ঝরনা পেরিয়ে, একটা ছোট পাহাড় ডিঙিয়ে আবার এলাম একটা সমতল মতন জায়গায়, যার পাশে একটি বেশ ছোট্টখাট্টো খরস্রোতা নদী, আলগা-আলগা ভাবে দাঁড়ানো কয়েকটি বহু পুরোনো বিশাল শাল তরু। তার মধ্যে একটি গাছের গায়ে হাত দিয়ে কল্যাণ বলল, এ গাছটার দাম কম করেও অন্তত দশ হাজার টাকা!

বিস্ময়ে আবার স্বাতীর ভুরু উঠে যায়। সানগ্লাস খুলে সে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভালোভাবে গাছটিকে দেখে।

কল্যাণ বলল, তবে এত বড় গাছ না-কাটাই উচিত।

এখানে মাঝে মাঝেই ছোট-ছোট মাটির তৈরি হাতির মূর্তি ছড়ানো। মন্দিরের তীর্থযাত্রীরা মানত করে গেছে। বাঁকুড়ায় যেমন ঘোড়া, এখানে সেরকম হাতি। তবে, মন্দিরটি আমাদের হতাশ করল। কল্যাণকেও। আগে সে দেখে গিয়েছিল, খুব পুরোনো একটি মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি—তাতে পুরোনো-পুরোনো গন্ধ ছিল। এখন তার বদলে ইঁট-সুরকি দিয়ে একটা বদখত চেহারার মন্দির বানানো হয়েছে।

জায়গাটি অবশ্য সম্পূর্ণ জনশূন্য। মন্দিরের পূজারি-টুজারিও কেউ নেই। মন্দিরের সামনে একটি কাঠগড়া, তাতে এখনও শুকনো রক্ত লেগে আছে। মানুষের রক্ত নিশ্চয়ই নয়। মোষ বলিরই চলন বেশি আদিবাসীদের মধ্যে। মোষের নাম এখানে কাড়া। কল্যাণের মুখে শুনলাম, এখানে কাড়া বলির পর মুণ্ডুটা পায় পূজারি, আর বাকি মাংস ভাগ-যোগ করার উপায় তাকে না। তার আগেই সব লোক ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়েখুঁড়ে যে যতখানি পায় নিয়ে পালিয়ে যায়।

জায়গাটা বেশ পরিচ্ছন্ন, শান্ত ও আবিষ্ট ধরনের। আমরা তিনজনে তিনদিকে বসে রইলাম। একটা সিগারেট ধরিয়ে কল্যাণ বলল, ভুল হয় গেল, একটা মহুয়ার বোতল সঙ্গে আনলে ভালো হত। এটাও ওর নিজের জন্য নয়, আমার জন্য। ওর পূর্ব জীবনের স্মৃতি, এইরকম পরিবেশে একটু মহুয়ায় চুমুক দিলে বেশ জমে।

কতক্ষণ বসে ছিলাম খেয়াল নেই। কথা বলারও প্রয়োজন হয় না। বড় বড় শাল গাছগুলো মাথার ওপর ছত্রছায়া বিছিয়ে রেখেছে। মাঝে-মাঝে উড়ে যাচ্ছে টিয়া পাখির ঝাঁক। এই বনে পাখিদের মধ্যে টিয়ারই প্রাধান্য। মুনিয়া পাখির চেয়েও ছোট একটা পাখির ঝাঁক দেখেছিলাম। আর দূরে কোথাও একটা কুবো ডেকে চলেছে।

সাপটাকে প্রথমে স্বাতীই দেখল। জঙ্গলে আমাদের প্রথম সাপ। খানিকটা যেন অবিশ্বাসের সুরেই স্বাতী বলল, ওটা কী, সাপ না? আমরা থমকে তাকালুম।

সাপটা আমাদের তিন জনের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাটায় কী করে কখন এল বুঝতেই পারিনি। আমরা যেমন অবাক হয়েছি, সাপটাও তার চেয়ে কম অবাক হয়নি। কয়েক মুহূর্ত আমাদের দেখেই সে বিদ্যুতের মতন এঁকেবেঁকে একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

কল্যাণ বলল, চন্দ্রবোড়া!

এটাই সেই মন্দিরের সাপ বলে বিশ্বাস করা যায় না। সাপটি বয়েসে বেশ তরুণ। বহুকাল ধরে এ বলির রক্ত পান করে যাচ্ছে, এ কথা মানতে পারি না, এর পিতৃ-পিতামহ কেউ এ কাজ করলেও করতে পারে। সাপটা এখনও ঝোপের মধ্যেই রয়েছে, সুতরাং এ সংসর্গে আর বেশিক্ষণ থাকা উচিত নয়, শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

ফেরার পথে কল্যাণ এক জায়গায় এসে দুঃখিত হল। একটি মাঝবয়েসি শালগাছ পরাজিত যোদ্ধার মতন মাটিতে শুয়ে আছে। কোনও কাঠ-চোর এটিকে কেটেছে, সবটা নিয়ে যেতে পারেনি। ছেঁটে নিয়ে গেছে ডালগুলো। শুয়ে থাকা গাছ দেখলে আরও কষ্ট হয়। বিশেষত, 'দা সিক্রেট লাইফ অব প্লান্টস' বইটা পড়বার পর থেকে গাছ সম্পর্কে আমার ধারণা আমূল বদলে গেছে।

আর একটু এগোবার পর আমরা একটি উপহার পেলাম। একটি কাচ পোকা কিংবা টিপ পোকা। সমস্ত বন মাতিয়ে বোঁ-বোঁ শব্দ করতে-করতে উড়ে এসে সে আমাদের সামনেই একটা নীচু গাছে এসে বসল এবং কল্যাণ অমনি খপ করে ধরে ফেলল সেটাকে। এত বড় টিপ পোকা আমি আগে কখনও দেখিনি। কী অপূর্ব সুন্দর তার রং, উজ্জ্বল নীল ও সোনালি। পাখিদের মধ্যে যেমন ময়ূর, পোকাদের মধ্যে তেমন এই টিপ পোকাদের কেন যে এত রঙের সৌভাগ্য, তা কে

জানে। মজা এই যে, পোকাটিকে ধরে কল্যাণ ওর বাঁ-হাতের তালুতে উলটো করে শুইয়ে রাখতেই সে দিব্যি গুটিসুটি মেরে শুয়ে রইল। যেন তাকে কেউ দেখছে না।

লাল রঙের ঝরনাটা পার হওয়ার পর আমরা মাদলের শব্দ শুনতে পেলুম। কল্যাণ বলল, কাছেই একটা ছোট গ্রাম আছে, চলুন, সেদিক দিয়ে ঘুরে যাই।

গ্রাম মানে কী। আট দশটা কাঁচা বাড়ি। তারই একটা বাড়ির মধ্যে একজন লোক মাদল বাজাচ্ছে, আর একজন নাচছে, আর তাদের ঘিরে হাসছে অনেকে। বাজনদার বা নাচুনে, কারুরই শরীর নিজের বশে নেই, পা টলমল, মহুয়ার নেশায় একেবারে চুর চুর। কিন্তু বাজনা বা নাচের উৎসাহ ওদের একটুও কম নয়।

আমাদের খাতির করে একটা খাটিয়ায় বসতে দেওয়া হল।

এই জঙ্গলে তিন জাতের মানুষ থাকে। লোধা বা শবর, তারা এখনও বাউণ্ডুলে, শিকার টিকার করে খায়, বা দিন মজুরির কাজ করে, চুরির দক্ষতার ব্যাপারেও তাদের সুনাম আছে, কিন্তু তারা চাষবাস জানে না। দ্বিতীয় দল সাঁওতালরা বেশ সুসভ্য, তারা শিকার ও চাষ দুটোই জানে এবং দুপুরবেলা মহুয়া খেয়ে নাচ-গান নিয়ে আনন্দ করতে জানে শুধু তারাও। আর আছে মাহাতোরা, তারা অন্যদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছল।

এ বাড়িটা যে সাঁওতালদের, তা দেখেই বোঝা যায়। লোকজনের পায়ে পায়ে ঘুরছে—কয়েকটি একেবারে সদ্যোজাত, একদিন বা দুদিন বয়েসি মুরগির ছানা। ওগুলোকে ঠিক চলন্ত কদম ফুলের মতন দেখায়। একটু দূরে বাঁধা একটা ছাগলও নাচ দেখছে একদৃষ্টে। স্বাতীর কাছে এ সবই নতুন। আগেকার দিনে হলে আমিও মহুয়া খেয়ে ওদের সঙ্গে নাচে যোগ দিতাম। স্বাতী সঙ্গে রয়েছে বলেই শান্ত, সুশীল হয়ে বসে রইলুম। কল্যাণ আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি-মুচকি হাসছে।

দরজার কাছে দাঁড়ানো একজন মাঝবয়েসি রমণী মাঝে-মাঝে নাচ চাঙ্গা করবার জন্য একটা গান ধরেছে। বেশ গলাটি। গানের ভাষা কিন্তু একেবারেই দুর্বোধ্য নয়, পুরোপুরি বাংলা, পথের মাঝে বৃষ্টি আসিল, বন্ধু আমার বান্ধা পড়িল—এই ধরনের। যে নাচছে এবং যে ঢোল বাজাচ্ছে, এই দুজনের মধ্যে কেউ একজন ওই মহিলাটির স্বামী, ঠিক কোনজন তা বুঝতে পারলুম না, বাজনার তালে ভুল হলে কিংবা নাচনেটি বেশি ঢলে পড়লে সে বকছে দুজনকেই। নাচুনেটির স্বাস্থ্য চমৎকার, চকচকে কালো শরীরটি ঘামে ভেজা, এত নেশাগ্রস্ত অবস্থাতে সে কিন্তু একবারও মাটিতে পড়ে যাচ্ছে না। সে যেন আজ সারাদিন ধরে নাচবার জন্য বদ্ধপরিকর। মহিলাটির গানের প্রতি আমি একবার তারিফ জানাতেই সে অপ্রত্যাশিতভাবে বলল, বাবু, আমার ন'খানা ছেলেমেয়ে। অর্থাৎ সে যেন জানাতে চায় যে নটি সন্তানের জননী হওয়া সত্ত্বেও সে গান গাইতে পারে। এটা একটা জানাবার মতন কথাই বটে।

আমি একটু কৌতুক করে বললুম, পুরোপুরি দশটা হলেই তো ভালো হত!

তার উত্তরে সে উদাসীন গলায় বলল, হয়ে যাবে। দশটাও হয়ে যাবে। এই তো আমাদের একমাত্র সুখ!

স্বাতী আমার দিকে চেয়ে ভ্রূভঙ্গি করল। প্রায় ঘণ্টাখানেক নাচ দেখার পর আমরা উঠে পড়লুম। একটু দূরে এসেছি, তখন দেখি পেছনে-পেছনে সেই মহিলাটিও আসছে। অযাচিতভাবেই সে বলল, ওটা আমার বাড়ি নয়, আমার বাড়ি ওই সামনে। আমার বাড়ি দেখবে না?

বিশেষত সে স্বাতীকে বলল, ও মেয়ে, তুমি আমার বাড়ি দেখবে না?

গেলুম তার বাড়িতে। এর বাড়ির উঠোনটিও অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে নিকোনো। এক পাশের চালাঘরে একটি ঢেঁকি, তার পাশের খাটিয়ার বসলুম আমরা। মহিলাটি কথা বলতে ভালোবাসে।

আমাদের সব বৃত্তান্ত জিগ্যেস করে জানবার পর সে বলল যে তার বড় মেয়ে অনেকদিন পর বাপের বাড়িতে এসেছে বলে সেই আনন্দের চোটে তার মেয়ের বাপ মহুয়া খেয়ে নাচতে গেছে।

ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত কৌতুকের, এইভাবে সে হাসতে লাগল খিলখিল করে।

তিন গেলাস কুয়োর জল খেয়ে আমরা উঠে পড়তে যাচ্ছি, তখন মহিলাটি অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলল, এ কি, তোমরা চলে যাচ্ছ? খেয়ে যাবে না, আমি যে ভাত চাপাচ্ছি?

আমরাও হতভম্ব। এদের দারিদ্র্যের প্রকৃত স্বরূপ বোঝা আমাদের পক্ষে সত্যিই বুঝি অসম্ভব। অচেনা কোনও মানুষ বাড়িতে এলে আমরা কোনওদিনই তাকে খেয়ে যেতে বলতে পারব না।

রমণীটি আবার দুঃখিতভাবে বলল, আমার বাড়িতে এসে তোমরা না খেয়ে চলে যাবে?

আমরা অত্যন্ত অপরাধীর মতন, বিনীতভাবে বললুম আজ নয়, আর একদিন আসব, নিশ্চয়ই এসে খেয়ে যাব!

সে অবিশ্বাসের সুরে বলল, হ্যাঁ, আর এসেছ!

সারা বছর ভাত খাওয়া ওদের কাছে বিলাসিতা। মন্দির থেকে ফেরার পথে একজন স্ত্রীলোককে দেখেছিলাম, তার কাঁকালে একটি রোগা শিশু। মাথায় এক বোঝা শুকনো ডালপালা আর হাতে দুটি সবুজ পাতায় মোড়া কী যেন। সে স্ত্রীলোকটি বাংলা বুঝতে পারে না, কল্যাণ তার সঙ্গে আদিবাসীদের ভাষায় কথা বলে ঠোঙা দুটি দেখতে চাইল। তাতে আছে কিছু থেঁতলানো বুনো জাম আর কিছু ব্যাঙের ছাতার মতন জিনিস।

কল্যাণ আমাদের বলেছিল, ওইগুলোই ওই মা-ছেলের সারাদিনের খাদ্য। এই জঙ্গলের অনেকে মাটি খুঁজে-খুঁজে এক ধরনের বুনো আলু পায়, তাই খেয়েই দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয়। অনেকে শাল গাছের ডগার কচি পাতাও সেদ্ধ করে খেয়ে নেয়। আর ওই স্ত্রীলোকটি আমাদের তিনজনকে অকারণে ভাত খেয়ে যেতে বলছিল। হয়তো, কিছু বিক্রি করে হাতে কিছু ধান এসেছে।

বাংলোয় ফিরে এসে আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসলুম। এখান থেকে সেইসব বাড়িঘর কিছুই দেখা যায় না। শুধু দিগন্ত-ছোঁয়া জঙ্গল আর পাহাড়। চোখকে আরাম দেওয়া প্রকৃতি। এরই মধ্যেমধ্যে রয়ে গেছে ক্ষুধার্ত মানুষ, আবার দুপুরবেলা নেশা করে নাচবার মতন মানুষ, অতিথি সেবার জন্য ব্যাকুল মানুষ। কয়েকটি ক্ষুধার্ত, অসহিষ্ণু হাতিও ঘুরছে কাছাকাছি।

কল্যাণ টিপ পোকাটাকে পাতায় মুড়ে লতা দিয়ে বেঁধে একটা প্যাকেট বানিয়ে নিয়েছিল। সেই প্যাকেটটা বারান্দার ওপর রাখতেই পাতার একটু অংশ কেটে টিপ পোকাটি মুখ বার করল। বেশ কৌতূহলী চোখ দিয়ে দেখতে লাগল আমাদের।

স্বাতী বলল, ওটাকে ছেড়ে দিন। পোকাটাকে মেরে টিপ পরবার ইচ্ছে আমার নেই।

কল্যাণেরও সেই রকমই ইচ্ছে। পাতাটা খুলে সে পোকাটাকে হাতে করে উড়িয়ে দিল।

টিপ পোকাটা বোঁ শব্দ করে দু-পাক ঘুরল আমাদের মাথার ওপরে, তারপর দুর্দান্ত গতিতে মিলিয়ে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

॥ ছাব্বিশ ॥

আমি হাসতে-হাসতে বললুম, যদি বলি, আমার বুকে বাঘের ছাপ আছে, কেউ বিশ্বাস করবেন?

সত্যিই কেউ বিশ্বাস করল না, সবাই এমনভাবে চক্ষু অবনত করল যেন এই নিস্তব্ধ, নিমীল সন্ধ্যায় আমি কোনও অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করেছি। এখানে এসব কথা মানায় না।

আমি আবার বললুম, সত্যিই বলছি কিন্তু, ইয়ার্কি নয়। একবার একটা বাঘ দু-পা তুলে দাঁড়িয়েছিল আমার বুকে।

এবার শ্রোতারা চক্ষু তুলল। চোদ্দো-পনেরো বছর বয়স্ক কিশোর মাঝিটি জিগ্যেস করল, সার্কেসের বাঘ, বাবু।

কথা হচ্ছিল সুন্দরবন অঞ্চলে এক বিশাল চওড়া নদীবক্ষে একটি খোলা নৌকোর ওপর। বেরিয়েছিলুম সারাদিনের মনে, এই নৌকোর ওপরেই খিচুড়ি ভোগ হলে, রান্না করলুম নিজেরাই। আর এমন খিচুড়ি জীবনে খাইনি, কী অমৃতের মতন স্বাদ।

আমার সঙ্গে আমার এক কলকাতার বন্ধু, তার এক স্থানীয় বন্ধু, একজন স্কুল শিক্ষক। আমি ছাড়া বাকি এই তিনজনেরই সুন্দরবনের সঙ্গে সংযোগ দীর্ঘদিনের, এই অঞ্চলের অনেক কিছুর খবরাখবর রাখেন। মাঝিদের মধ্যে একজনের বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে যে কোনও জায়গায়, রোদ-বৃষ্টিতে পোড়া-ভেজা লোহার মতন গড়া-পেটা শরীর, মুখে অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ। আর একজন ওই পূর্বোক্ত কিশোর।

সুন্দরবনে এলেই বাঘের কথা মনে পড়ে। এর আগে কয়েকবার লঞ্চে চড়ে সুন্দরবন ঘুরে গেছি, কিন্তু সে শুধু প্রকৃতি দেখা। এবারে এসে আশ্রয় নিয়েছি একটি গ্রামে। যার পাশের গ্রামেই একটি ছটকে আসা বাঘ ধরা পড়েছে কিছুদিন আগে। সে বাঘটিকে রাখা হয়েছে কলকাতার চিড়িয়াখানায়, তার নাম দয়ারাম। আমি এখানে এসে পৌঁছবার পরের দিনই নদী সাঁতারে মোল্লাখালিতে এসে উঠেছিল একটা বাঘিনী, গ্রামের লোকজন সেটাকে ঘিরে রেখেছিল, ভেবেছিলুম সেটাকে দেখতে যাব, বিকেলেই খবর পেলুম ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের নীতির তোয়াক্কা না করে সেটিকে মেরে ফেলেছে। সুন্দরবনে ভগবানের চেয়েও বাঘের কথাই বেশি স্থান পায় আলাপচারিতে। এবারে নৌকোয় বেরিয়ে বুঝলুম, লঞ্চ-ভ্রমণের সঙ্গে এর কোনও তুলনাই হয় না। নৌকোয় বসে নদীকে অনেক কাছে পাওয়া যায়, দুপাশের জঙ্গলকে আমরাই শুধু দেখি না, জঙ্গলও আমাদের দেখে।

বাঘ সম্পর্কে আমাদের এক ধরনের শহুরে কৌতূহল আছে। সেইজন্য আমি বারবার সবাইকে জিগ্যেস করছিলুম, আপনারা কেউ বাঘ দেখেননি? নিজের চোখে?

আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার নৌকার সহযাত্রীরা সবাই নেতিবাচকভাবে মাথা নাড়ল। এরা সবাই সুন্দরবনের নাড়ি নক্ষত্র জানে, এতদিন এখানে রয়েছে, অথচ কখনও বাঘ দেখেনি! আমি বাঘ সম্পর্কে রোমাঞ্চকর একাধিক গল্প শুনব আশা করেছিলুম। বেশ নিরাশ নিরাশ লাগল। তখন আমি শুরু করলুম এক লোমহর্ষক কাহিনি।

কিশোর মাঝিটির প্রশ্ন শুনে আমি পালটা প্রশ্ন করলুম, ধরো যদি সার্কাসের বাঘই হয়। একটা সার্কাসের বাঘ যদি তোমার বুকে পা তুলে দাঁড়ায়, তুমি ভয় পাবে না?

ছেলেটি হে হে করে হাসতে লাগল।

ইস্কুল মাস্টার এবার জিগ্যেস করলেন আপনি সত্যিই সার্কাসের বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন নাকি?

আমি বললুম, না। বাঘের থেকেও আমি শত হস্ত দূরেই থাকাই ভালো মনে করব। পাকচক্রে একবার আমি সত্যিই একটা মস্ত বড় কেঁদো বাঘের খপ্পরে পড়েছিলুম। ব্যাপারটা হয়েছিল উড়িষ্যায় যোশীপুরে—।

আমার কলকাতার বন্ধুটি যার নাম শিবাজী, সঙ্গে-সঙ্গে বলল, ও, খৈরি?

নৌকোর অন্যান্য সুন্দরবনবাসী সঙ্গীরা কেউ খৈরির নাম শোনেনি। এদিকের লোকের সঙ্গে কাগজের বিশেষ সম্পর্ক নেই। বড়-মাঝি জিগ্যেস করল, খৈরি কী দাদা?

রায়মঙ্গল নদী ছাড়িয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি সমুদ্রের দিকে। ডানদিকে দত্ত ফরেস্ট, সেখানে বাঘ নেই খুব সম্ভবত। বাঁ-দিকের জঙ্গলটা বাঘের এলাকা বলে নির্দিষ্ট, আমরা চলেছি সেই ধার ঘেঁষেই। একটা জায়গায় নদীর জল খানিকটা খাঁড়ির মতন ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, সেখানকার নাম কালীর চর সেখানে হাজার হাজার হাঁস এসে বসে। আমাদের গন্তব্য সেইদিকেই।

সেখানে বাঘের উপদ্রবের ভয় আছে, আমরা কেউ শিকারি নই। সঙ্গে অস্ত্রও নেই, দূর থেকে পাখিগুলি দেখে আসাই উদ্দেশ্য।

এই পরিবেশে আমি জমিয়ে বাঘের গল্প শুরু করলুম।

অভিজ্ঞতাটা আমার কাছে সুখকর ছিল না মোটেই, খানিকটা হাস্যকর হলেও হতে পারে। সেবারে যাওয়ার কথা ছিল সিমলিপাল জঙ্গলে। কলকাতা থেকে ট্রেনে ঝাড়গ্রাম, সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বারিপদা, সেখান থেকে আবার একটা গাড়ি কোনওক্রমে জোগাড় করে যোশীপুর। অবশ্য সিমলিপাল যাওয়ার জন্য এত ঘুর পথে যাওয়ার কোনও দরকার হয় না, কিন্তু আমাদের ভ্রমণটাই উলটোপালটা। যোশীপুরে রাতটা কাটিয়ে পরদিন ভোরবেলা আমরা জিপ নিয়ে ঢুকব জঙ্গলে, সেই অনুযায়ী যোশীপুরে বাংলো বুক করা ছিল। কিন্তু তখন খৈরির কথা মনেই পড়েনি।

যোশীপুর বাংলোর কম্পাউন্ড মস্ত বড়, মনে হয় যেন বাংলোর পেছন থেকেই জঙ্গল শুরু হয়ে গেছে। ঘরগুলোর সামনে বেশ বড় একটি ঢাকা বারান্দা। লোহার গেট খুলে ভেতরে ঢোকার পরই দেখলুম, একটু দূরে গাছপালার মধ্যে ঘুরছে একটা হলুদ-কালো ডোরাকাটা কী যেন। সত্যিই একটা বাঘ! আমরা এসে গেলে বারান্দাটায় বসতে না বসতেই বাঘটা চলে এল সেখানে। ডি এফ এ শ্রীযুক্ত চৌধুরীও সেখানে বসে বন কর্মচারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন, সংক্ষেপে আমাদের জানালেন, ভয় পাবেন না। ও কিছু করে না!

বাঘটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে এসে গন্ধ শুঁকতে লাগল। আমাদের মধ্যে কারুকে তার পছন্দ হবে কি হবে না, কে জানে! আমি বড় সাইজের কুকুরও সহ্য করতে পারি না। কারুর বাড়িতে অ্যালসেশিয়ান কুকুর থাকলে সে বাড়িতে পারতপক্ষে যাই না। আমি লক্ষ করেছি, যাদের অ্যালসেশিয়ান থাকে, তারাও ঠিক ওই ভাবেই বলে, "ভয় পাবেন না! ও কিছু করে না!" কিছু করে না মানে কী, কাছে এসে গন্ধ শুঁকবেই বা কেন?

একটু বাদে বাঘটা আবার বাগানে চলে গেল। আমরা চলে এলুম আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে। জামা কাপড় ছাড়ব কি না ভাবছি, হঠাৎ শুনি জানালার কাছে মৃদু গর্জন। এবং বাঘের মুখ। বাঘটা জানলা দিয়ে আমাদের একটুক্ষণ দেখল, তারপর ঢুকে এল আমাদের ঘরে। তার আগেই আমরা দরজা বন্ধ করে দিতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু একজন মহিলা (পরে জেনেছি, তাঁর নাম নীহার চৌধুরী) বলে উঠলেন, দরজা বন্ধ করবেন না! ও বন্ধ-দরজা দেখলে রেগে যায়!

একটা বাঘকে খুশি করার জন্য আমাদের দরজা খোলা রাখতে হবে। কিন্তু ঘরের মধ্যে বাঘ এসে ঘোরাঘুরি করবে, এটাই বা কেমন কথা। সারা ঘরে বাঘ-বাঘ গন্ধ। আমরা বিনা বাক্যব্যয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম তাড়াতাড়ি। আবার এসে বসলুম বারান্দায়। যোশীপুরের এই বাঘটি সাধারণ বনের বাঘের চেয়েও আয়তনে অনেক বড়। একে রোজ আট কেজি মাংস ও একটিন আমুল গুঁড়ো দুধ খাওয়ানো হয়। বনের বাঘ রোজ এত খাবার পাবে কোথায়? এর পেটে চর্বি থলথল করছে। বারান্দায় বসে শ্রীমতী চৌধুরী তাঁর পালিতা কন্যা এই খৈরি বিষয়ে নানা কাহিনি শোনাতে লাগলেন। আমরা গল্প শুনছি বটে, কিন্তু আমাদের সকলের চোখ লক্ষ রাখছে বাঘটা কত দূরে। আমাদের পাঁচজন বন্ধুর দলের মধ্যে রয়েছে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সে ওই খৈরি বিষয়ে ইতিমধ্যেই একটি ছোটদের বই লিখে ফেলেছে। সুতরাং তার ভয় পেলে চলে না। শ্রীমতী চৌধুরীর সঙ্গেও তার আগে থেকে চেনা, সুতরাং ওইসব গল্প সেই উপভোগ করতে লাগল বেশি।

এরপর হল বাঘের ভোজন পর্ব। বাগানে এক জায়গায় ধপাস করে পড়ল খৈরি, আর মা যেমন নিজের শিশুর মুখে খাদ্য তুলে দেয়, সেইভাবে শ্রীমতী চৌধুরী ওর মুখে মাংস পুরে দিতে

লাগলেন কিন্তু বাঘ এক জায়গায় বসে খায় না। এক-এক গেরাস মুখে দিয়েই সে উঠে পড়ছে, চলে যাচ্ছে বাগানের দিকে, অনেক সাধ্য সাধনা করে ডেকে আনা হচ্ছে তাকে। এক সময় বাঘটা হঠাৎ উঠে এল বারান্দায়, এবং নিমাই নামে আমাদের এক বন্ধুর বাঁ-হাতের কনুই শুদ্ধু অনেকখানি মুখে ভুরে দিল। এবার একটু চাপ দিলেই নিমাইয়ের বাঁ-হাতখানা চিরতরে বাঘের পেটে চলে যাবে। বাঘটার হঠাৎ এরকম মতি গতির কারণ কী? ওর কি মোষের মাংস পছন্দ হয়নি বলেও টাটকা মাংসের সন্ধানে এসেছে? ডি এফ ও শ্রীযুক্ত চৌধুরী যথারীতি বললেন, ভয় পাবেন না, ও কামড়াবে না।

ভয়ে মানুষের চুল খাড়া হয়ে যাওয়ার কথা শুধু বইতেই পড়েছিলুম, এবার স্বচক্ষে দেখলুম নিমাইয়ের মাথার চুল সত্যিই খাড়া হয়ে গেছে, কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল, ওকে সরিয়ে নিন, নইলে নইলে আমরা অজ্ঞান হয়ে যাব! ভয়ের চোটে নিমাই আমির বদলে আমরা বলে ফেলেছে। আমরা সশঙ্ক চিত্তে অথচ খানিকটা হাসতে-হাসতেও, দেখতে লাগলুম ওকে। এই হাসির শাস্তি আমি পেলুম সঙ্গে-সঙ্গেই!

বাঘটা নিমাইকে ছেড়ে এদিক-ওদিক চেয়ে গজরাতে লাগল। বাঘের ডাকের সঙ্গে মানুষের জন্ম জন্মান্তরের ভয়ের সম্পর্ক। পোষা বাঘ হোক আর যাই হোক, এরকম ডাক শুনলে বুক আপনিই কেঁপে ওঠে।

বাঘটা এবার চলে এল সোজা আমার দিকে। তারপর সে আমার ডান দিকের বগলের মধ্যে ঢুঁ মারতে লাগল। যেন সে আমার বগলের মধ্যে অতবড় মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে চায়। আমি অসহায়ভাবে তাকালুম শ্রীমতী নীহার চৌধুরী দিকে! তিনি স্নেহের হাসি দিয়ে বললেন, ও কিছু না। ও ঘামের গন্ধ শুঁকতে ভালোবাসে। তখন ঘাম মানে কী। আমার সারা শরীর দিয়ে কুলকুল করে ঘামের নদী বইছে!

বাঘটা আর একবার ঢু মারতেই আমি অটোমেটিক্যালি উঠে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে বাঘটাও দাঁড়িয়ে দুটো থাবা রাখল আমার বুকে। সেই কয়েকটি মুহূর্ত আমি জীবনে কখনও ভুলব না। আমার শরীরের ওপরে একটা বিরাট কেঁদো বাঘ, আমার চোখের সামনে ওর জ্বলন্ত চোখ, সেই অবস্থায় বাঘটা ফ-র্-র্-র করে থুতুতে ভিজে গেল আমার মুখ ও জামা। ওরই মধ্যে আমি ভাবলুম বাঘটা যদি আমায় না-ও কামড়ায়, আমি যদি বাঘটাকে শুদ্ধু মাটিতে পড়ে যাই, তাহলে ওর অতবড় দেহের ভারেই আমি ছাতু হয়ে যাব। শ্রীমতী চৌধুরী বারবার বলতে লাগলেন, ভয় পাবেন না, নড়বেন না, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিন। কিন্তু হাত তোলার সাধ্য আমার নেই, আমার সারা শরীর অসাড়। আমারও মাথার চুল খাড়া হয়ে গিয়েছিল কি না তা তো আমি নিজের চোখে দেখিনি, তবে ওই অবস্থায় আর একটুক্ষণ থাকলে আমি নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে যেতুম।

ইতিমধ্যে 'খৈরি, আমার খৈরি' গ্রন্থের প্রণেতা শক্তি আমার পাশ থেকে সুট্ করে উঠে গিয়ে সোজা চলে গেছে গেটের দিকে। নিমাই বাংলোর বাইরে দাঁড়িয়ে বলল, আমি সারারাত এই মাঠে শুয়ে থাকব, তবু ওর মধ্যে আর যাব না। আমাদের দলনেতা পার্থসারথি চৌধুরী বলল, নাঃ ওই বাঘের সঙ্গে রাত্রিবাস করা মোটেই কাজের কথা নয়। চলো, এক্ষুনি জঙ্গলে চলে যাই! তাই হল, আমরা রওনা দিলুম সেই দণ্ডেই! গল্প বলা শেষ করে আমি আমার বুকে হাত বুলিয়ে বললুম, এই যে ঠিক এই জায়গায় বাঘটা তার থাবা রেখেছিল।

শ্রোতারা সবাই চুপ। একটু পরে বড় মাঝিটি শুধু খানিকটা বিস্ময় খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে বলল, শখ করে কেউ বাঘ পোষে? থুঃ! ওটাকে মেরে ফেলে না কেন?

আমি বললুম, মারবে কী? ওই বাঘটা খুব বিখ্যাত, সারা পৃথিবীর অনেক পত্র পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হয়েছে।

বড় মাঝি আবার নদীর জলে থুতু ফেলল। টাইগার প্রজেক্টের জন্য সুন্দরবনে বহু টাকা খরচ করে কতরকম বন্দোবস্ত হচ্ছে, কিন্তু সুন্দরবন এলাকার যতজনের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তারা সকলেই বাঘকে শত্রু বলে মনে করে, এবং তাদের মতে বাঘ নামক প্রাণী জাতিটাকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আস্তে-আস্তে বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে! কালীর চরের বেশ কাছাকছি এসে পড়েছি আমরা। খাড়ির মধ্যে অনেক হাঁসের অস্তিত্ব টের পাচ্ছি বটে, কিন্তু আলো কমে আসায় আর ঠিক মতন দেখা যাচ্ছে না। আমি আর একটু ভেতরে যাওয়ার কথা বললুম, কিন্তু মাঝি বা অন্য কেউ রাজি হল না। একটু পরেই ভাঁটা শুরু হলে ফেরা মুশকিল হবে। তা ছাড়া জায়গাটা ভালো নয়। এই বনে বাঘ আছে তো বটেই, কিন্তু তার চেয়েও বেশি ভয় ডাকাতের। আমি বললুম, আমাদের কাছে তো টাকা পয়সা কিছু নেই, ডাকাত আমাদের কী করবে? মাস্টার মশাইটি বললেন, এখানকার ডাকাতদের ব্যাপার আপনারা জানেন না। কিছু না পেলে ওরা জামা কাপড় খুলে নেয়। আপনি যে প্যান্ট-শার্ট পরে আছেন, তার দামও তো কিছু না হোক সত্তর আশি টাকা। আর এই নৌকোটা, এরও দাম আছে। জামা প্যান্ট খুলে নিয়ে ওরা লোককে এই জঙ্গলের পাশে নামিয়ে দিয়ে যায়।

আমি পাশের জঙ্গলের দিকে তাকালুম। দিনের বেলা দেখতে চমৎকার লাগছিল। এখন অন্ধকার হয়ে যাওয়ায় সেই জঙ্গলের দিকে তাকাতেই গা ছমছম করছে। নগ্ন অবস্থায় রাত্রিবেলা এই জঙ্গলের পাশে পড়ে থাকা মোটেই উপাদেয় চিন্তা নেয়।

সকলেরই মত হল, তা হলে এবার ফেরা যাক! কিন্তু খুব নির্বিঘ্নে ফেরা গেল না। একটুক্ষণের মধ্যেই শুরু হল ভাঁটার টান, এখন উলটো দিকে যাওয়া যাবে না। আমাদের নৌকো একটা চরে আটকে গেল। জোয়ার আসব ঘণ্টা দেড়েক বাদে।

আমাদের নৌকোটা অবশ্য জঙ্গলের খুব কাছে নয়। কোনও বাঘ হঠাৎ এক লাফে নৌকোর ওপর পড়তে পারবে না, সাঁতরে আসতে হবে। এই নদীর জলেও খুব কামঠের উপদ্রব, এবং কুমির প্রকল্পের উদ্যোগে কিছুদিন আগেই এই নদীতে চল্লিশটি কুমিরের বাচ্চা ছাড়া হয়েছে।

চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। জঙ্গলের দিকে তাকালেই মনে হয়, একটা বাঘ বুঝি আমাদের একদৃষ্টে দেখছে। খুবই নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এ জঙ্গলে জোনাকিও জ্বলে না। কিন্তু বাঘের চেয়ে ডাকাতের কথাই আমার মনে পড়তে লাগল বেশি।

বড় মাঝিকে আমি আবার জিগ্যেস করলুম, আপনি এতদিন সুন্দরবনের নদীতে নৌকো চালাচ্ছেন, সত্যিই কখনও বাঘ দেখেননি?

বড় মাঝি বললেন, না!

তারপর যেন একটু ধমকের সুরেই আমায় আবার বলল, বাবু একটু চুপ করেন তো! অথবা এই সময়টা আপনি একটু ঘুমিয়ে লিন বরং।

আমি একটু ক্ষুণ্ণ হলুম। এই ভর সন্ধেতে হঠাৎ আমি ঘুমোতে যাব কেন? তবে নৌকোর অন্য আরোহীদের মধ্যে যেন একটা ঝিমুনির ভাব এসে গেছে। কেউ কোনও কথা বলছে না। অগত্যা আমিও চুপ করে গেলুম।

এক সময় নৌকোর তলায় জলের কলকল শব্দেই টের পাওয়া গেল জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন একসঙ্গে জেগে উঠল। নৌকো চলল আবার। রাত সাড়ে দশটায় আমরা ফিরে এলুম আমাদের গ্রামের কাছে।

জেটিতে নৌকো বেঁধে ওপরে উঠে আসার পর বড় মাঝি বলল, দাদা, আপনি বাঘের কথা জিগ্যেস কচ্ছিলেন না? এই দ্যাখেন। টর্চটা মেরে দ্যাখেন।

এই বলে সে জামাটা তুলে পিঠ ফিরে দাঁড়াল। টর্চের আলোয় দেখলুম, তার পিঠে গভীর ক্ষত। খুব বেশি পুরোনোও মনে হল না।

মাস্টার মশাই বললেন, ওর কী কড়া জান, বাঘে কামড়ে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরও বেঁচে উঠেছে।

বড় মাঝি দম্ভ করে বলল, আমারে খাবে, এমন বাপের ব্যাটা বাঘ আজও জন্মায়নি, বোঝলেন।

মাস্টারমশাই বলল, ও বাঘের গুনিন। সবাই ভাবে, সেই জন্যই বাঘে ধরার পরও বেঁচে উঠেছে। ওদের মুখ থেকে আরও শুনলুম, এই মাঝি তার এই নৌকো নিয়ে প্রায়ই জঙ্গলে যায় বে-আইনি কাঠ কাটতে। সুন্দরবনের অনেকেরই জীবিকার সঙ্গে কাঠ জড়িত। একবার নয়, মোট পাঁচবার, ওই মাঝি দলবল নিয়ে বাঘের সামনে পড়েছে তবু আবার যায়। ডাকাতের পাল্লায়ও পড়েছে অনেক বার। অন্য বন্ধুটি বলল, দীনেশ নামে একটি ছেলে তার বাড়িতে কাজ করত, মাত্র মাস খানেক আগে সে এই রকম একটি কাঠ কাটার দলের সঙ্গে জঙ্গলে গিয়ে আর ফেরেনি।

এদের সকলেরই বাঘ বা ডাকাত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু নৌকোর ওপর বসে আমি যখন এদের কাছ থেকে দু-একটা ঘটনা শুনতে চাইছিলুম, তখন সবাই চুপ করে ছিল কেন? মাস্টারমশাই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেন, জঙ্গলের কাছে বাঘের এলাকার মধ্যে গিয়ে বাঘের গল্প করা তো দূরের কথা, কেউ বাঘের নামও উচ্চারণ করে না। ওই প্রসঙ্গ তুলে আমিই ভুল করেছিলুম।

সত্যিই আমার ভুল হয়েছিল।
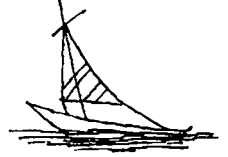
তিন সমুদ্র সাতাশ নদী

প্রায় পাঁচ হাজার মানুষের ভিড়ের মধ্যেও আমার ঠিক চোখে পড়ল, চারটি বাঙালি ছেলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে হাত-পা নেড়ে গল্প করছে। আমার থেকে তারা অনেকখানি দূরে, তাদের কথা আমি শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু তারা যে বাঙালি তা চিনতে আমার একটুও ভুল হয় না। মনটা একটু চঞ্চল হয়ে উঠল।

বাঙালি দেখলেই যে ছুটে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। বাঙালিরা এমন কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার নয়। মাত্র কিছুদিন আগেই তো বাংলার জনসমুদ্র ছেড়ে এসেছি, আবার কিছুদিন বাদেই সেখানে ফিরে যাব। তবু বিদেশে এসে অনবরত অপর ভাষায় কথা বলতে-বলতে এক সময় যেন মুখে ফেনা উঠে যায়। তখন ইচ্ছে করে দুটো বাংলা কথা কইতে, একটু বাংলায় হাসাহাসি করতে। কিন্তু সেধে কারুর সঙ্গে ভাব জমাতে আমি কখনোই পারি না। তা ছাড়া বিপদও আছে। লন্ডন শহরের বড় রাস্তায় হামেশাই বাঙালির দেখা পাওয়া যায়। একবার পিকাডেলি স্কোয়ারে একজন বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে ডেকে কথা বলতে গিয়েছিলুম, তিনি গম্ভীর দায়সারাভাবে দুটি একটি কথা বলে চলে গেলেন। হয়তো তিনি খুব বড় চাকরি করেন, আমার মতন এলেবেলে বাঙালিকে পাত্তা দিতে চাননি।

এটা অবশ্য লন্ডন নয়, আমস্টারডাম শহরের কেন্দ্রস্থল। জায়গাটার নাম ডাম-স্কোয়ার, একটা পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদের সামনে বিশাল চত্বর, দেশ-বিদেশের ভ্রমণকারীরা প্রায় সবাই বিকেলের দিকে এখানে এসে ভিড় জমায়। অনেকে অলসভাবে বসে থেকে পায়রাদের ছোলা খাওয়ায়। বড়-বড় হোটেলগুলো এ-পাড়াতেই। চত্বরটার চার পাশে বহু দোকান পর্যটকদের পকেট কাটবার জন্য হাজার রকম মনোহর দ্রব্য সাজিয়ে রেখেছে। এখানেই কাছাকাছি হল্যান্ডের অতি মূল্যবান হিরে এবং সুলভ রমণী পাওয়া যায়।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমার তো কোথাও জরুরি যাওয়ার তাড়া নেই, খানিকটা সময় কাটানো নিয়ে কথা। রাত সাড়ে আটটা বাজে, আকাশে রোদ্দুরহীন দিনের আলো। পৃথিবীর বহুদেশের মানুষের মুখ আলাদাভাবে চেনা যায়, আর সব পোশাকের কী বিচিত্র রং! এত মানুষের ভিড়েও নিজেকে সব সময় একলা মনে হয়।

একটু বাদে বাঙালি ছেলে চারটির মধ্যে দুজন চলে গেল ডানপাশের রাস্তায়, আর দুজন এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে। এসব দেশে অচেনা-মানুষের সঙ্গেও চোখাচোখি হয়ে গেলে হাসিমুখ করতে হয়। আমি তৈরি হয়ে রইলুম।

ছেলে দুটির সঙ্গে আমার চোখাচোখি হল না, ওরা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল। এক্ষেত্রে পিছু ডাকা চলে না। আমি আড়-চোখে দেখতে লাগলুম ওদের। ওরা একটু দূরে গিয়েও থমকে গেল। তারপর পিছিয়ে এসে আমার মুখোমুখি দাঁড়াতেই আমি একগাল হেসে বললুম, কী খবর?

একটি ছেলে তার উত্তরে ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, পাকিস্তানি?

আমি মাথা নাড়লুম দুদিকে।

অন্যজন জিগ্যেস করল, কামিং ফ্রম বাংলাদেশ?

এবারও আমি দুদিকে মাথা নেড়ে বললুম, না, ভারত।

ছেলে দুটি বাঙালি নয়। বেশ খানিকটা নিরাশই হলুম বলতে গেলে।

ওদের একজন আবার ইংরেজিতে জিগ্যেস করল, নতুন এসেছেন মনে হচ্ছে। কী চাকরি নিয়ে এলেন?

আমি বললুম, আমাকে আবার কে চাকরি দেবে? আমি এমনি ভবঘুরে হয়ে এসেছি।

— কী রকম লাগছে আমাদের দেশ? হল্যান্ড বড় সুন্দর জায়গা কি না বলুন? আমরা অনেক দেশ দেখেছি, কিন্তু আমাদের হল্যান্ডের মতন এত ভালো আর কোথাও লাগে না।

আমাদের হল্যান্ড? এই বাঙালি-চেহারার ছেলে দুটি হল্যান্ডের নাগরিক? আমার চট করে মনে পড়ল, সুরিনামের অনেক লোক এখন হল্যান্ডে থাকে। সুরিনাম এক সময় ডাচ কলোনি ছিল, সেখানকার অনেকেই হল্যান্ডের নাগরিক হয়ে আছে, তারা ভারতীয় বংশোদ্ভূত, এখনও পুজো-আচ্চা করে, হিন্দি গান শোনে। এরা কি তবে সুরিনামিজ?

ওদের একজন বলল, আমরাও এক সময় ভারতীয় ছিলাম, মানে, আমাদের বাবা-মায়েরা। আমরা জন্মেছি ভারতে, তারপর পাকিস্তানে চলে যাই। এখন অবশ্য দশ বছর এ-দেশে আছি।

—তা হলে আপনারা পাকিস্তান থেকে এসেছেন! 'আমাদের হল্যান্ড' বললেন কেন?

একটি ছেলে অন্যজনের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ও এখানকার সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছে। আমি এখনও পাইনি, তবে শিগগির পেয়ে যাব।

অন্য ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, প্রথমে ছিলাম ভারতীয়, তারপর পাকিস্তানি, তারপর ডাচ। এক জীবনে তিনদেশের নাগরিক। চলুন না, কোথাও একটু বসে গল্প করা যাক? আমাদের আরও দুজন বন্ধু ছিল, এখনও গেলে তাদের ধরা যাবে। আপনার বিশেষ কোনও কাজ নেই তো? উঠেছেন কোথায়? আপনি হিন্দি জানেন?

যুবক দুটির বয়েস তিরিশ-বত্রিশের মতন। একজনের নাম আলম, আর একজনের নাম মুনাব্বর। দুজনেরই স্বাস্থ্য চমৎকার। ওদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলুম চত্বরটার ডান পাশ দিয়ে। একটা রেস্তোরাঁর সামনে উঁকি দিয়ে আলম বলল, ওই তো ভেতরে শমীম আর ইমতিয়াজ রয়েছে। চলুন, এখানে বসা যাক। এটা আমাদের আড্ডাখানা।

আমি প্রথমে একটু ইতস্তত করলুম। এ তো আর কলকাতার চায়ের দোকান নয় যে চার আনা পয়সা দিয়ে এক কাপ চা খেয়ে তিন ঘন্টা কাটিয়ে যাব। এখানে এক কাপ চায়ের দাম অন্তত চার টাকা, তা ছাড়া এ-পাড়ার দোকানে চা পাওয়া যায় কিনা তাও সন্দেহ। বিদেশে এলে কৃপণের মতন প্রতিটি পাই পয়সা হিসেব করে চলতে হয়। কিন্তু এতদূর এসে আর ফিরে যাওয়া যায় না।

শমীম আর ইমতিয়াজ আমাদের দেখে হইহই করে উঠল এবং হিন্দিতে স্বাগত জানাল। হিন্দি কিংবা উর্দুও হতে পারে। এদের মধ্যে ইমতিয়াজের বয়েস একটু বেশি, মাথায় টাক আর শমীমের চেহারা ক্রিকেট খেলোয়াড়ের মতন। আমার পরিচয় পেয়ে ওরা হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে বলল, বসুন, বসুন! আপনার কাছে দেশের খবর শোনা যাক। এখানকার কাগজে আমাদের দেশের কোনও খবর থাকে না।

দেশের খবর মানে কোন দেশ? পাকিস্তানের কতটুকু খবরই বা আমি জানি? ভারতের খবর জানতে কি এদের আগ্রহ হবে? এদের মধ্যে শমীম এসেছে জার্মানি থেকে বেড়াতে, ইমতিয়াজ তার দুলাভাই অর্থাৎ জামাইবাবু। চারজনেই কাজ করে জাহাজ কোম্পানিতে। গত আট বছরের মধ্যে কেউই পাকিস্তানে যায়নি।

আমাকে কিছু জিগ্যেস না করেই ওরা আমার জন্য একটা বিয়ারের অর্ডার দিল। মুনাব্বর কিছু নিল না, রোজার মাস, সে উপোস রেখেছে। শমীম তাকে উপরোধ করতে লাগল, আরে ব্রাদার, খাও এক ঢোঁক। এই দূর দেশে কে আর দেখছে তোমাকে।

মুনাব্বর বলল, না, ভাই, জোর কোরো না। অনেক দিনের অভ্যেস, রোজার সময় সারাদিন আমি কিছু খেতে পারি না।

আমি বললুম, এখানে রোজা রাখা তো মহা জ্বালা। রাত দশটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকে।

মুনাব্বর বলল, শুধু কী তাই, রাত তিনটে থেকেই আকাশে দিনের আলো ফুটে বেরোয়, তার আগে জেগে উঠে নাস্তা সেরে নিতে হয়।

আলম বলল, এখন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠারো-উনিশ ঘণ্টাই দিন বলতে পারেন। আবার শীতকালে মোটে পাঁচ-ছ'ঘণ্টা দিনের আলো থাকে।

শমীম বলল, বিয়ার খাচ্ছ না বটে, কিন্তু মুনাব্বর খাঁ, সিগারেট টানছ যে অনবরত? তাতে রোজা থাকে?

মুনাব্বর লাজুকভাবে হেসে বলল, বিদেশে অত নিয়ম মানলে চলে না। কী বলেন, নীললোহিতদাদা? হিন্দুস্তানে তো সবাই সবাইকে দাদা বলে, তাই না?

আমি বললুম, সারা ভারতবর্ষে বলে না, বাঙালিরা বলে। কিন্তু আপনি তা জানলেন কী করে?

—আমি ঢাকায় ছিলাম যে। প্রায় সাত-আট বছর ছিলাম। সেভেন্টি ওয়ানের ওয়ারের সময় চলে আসি, কিছুদিন করাচিতে থেকে তারপর একেবারে এই দেশে। হিন্দুস্তানের ভরতপুরের নাম শুনেছেন? উত্তরপ্রদেশে, সেখানে আমার জন্ম, সেখান থেকে আমরা চলে যাই ঢাকায়।

আমি বললুম, আমার ঠিক আপনার উলটো। আমার জন্ম ঢাকায়, সেখান থেকে চলে আসি ভরতপুরে।

মুনাব্বর বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইল একটুক্ষণ। তারপর বলল, ঠিক বলছেন?

আমি বললুম, ঠিক ঢাকায় নয়, আমার জন্ম ফরিদপুরে। আর ভরতপুরের বদলে আমি চলে এসেছি কলকাতায়। কিন্তু একই তো ব্যাপার, তাই না?

ওরা চারজনে হোহো করে হেসে উঠল, মুনাব্বর বলল, তা ঠিক বলেছেন। তবে আমাকে আবার ঢাকা ছাড়তে হয়েছিল, আপনাকে তো আর কলকাতা ছাড়তে হয়নি এর পরে।

আমি বললুম, ভবিষ্যতের ইতিহাসের কথা কে বলতে পারে? হয়তো এরপর কলকাতায় এক সময় বিদেশি খেদাও আন্দোলন শুরু হবে, তখন আমাদের আবার পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে হবে অন্য কোথাও। ধরা যাক, আন্দামানে।

শমীম বলল, ইতিহাসের মুখে মারো গোলি!

ইমতিয়াজ বলল, ইতিহাস আপনা-আপনি হয় না, কিছু বদমায়েশ লোক এইভাবে ইতিহাস তৈরি করে।

এত বিদেশিদের মধ্যে এই চারজন চেনামুখের যুবককে আমার খুব আপন মনে হয়। এরা বেশ অবলীলাক্রমে জোরে-জোরে হিন্দি-উর্দুতে কথা বলে যাচ্ছে। রেস্তোরাঁটি বেশ বড়, অনেকগুলো টেবিল, আমরা বসেছি মাঝখানের একটা বড় টেবিলে। এদের ব্যবহারে কোনও রকম আড়ষ্টতা নেই, আমাদের পানীয় অর্ডার দেওয়ার সময় এরা কথা বলছে বেশ চোস্ত ডাচ ভাষায়, তারপরই আবার আড্ডা শুরু করছে হিন্দি-উর্দুতে। আমি হিন্দি-উর্দু প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু ইংরিজির বদলে ভাঙা-ভাঙা ওই ভাষায় কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে।

এর মধ্যে তিনবার বিয়ারের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এ-দেশি বিয়ার খুব হালকা, সেরকম নেশা হয় না। একমাত্র আলমকেই দেখছি ভদ্‌কা চেয়ে নিয়ে মিশিয়ে নিচ্ছে ওর বিয়ারের সঙ্গে। আলম একটু বেশি হাসছে, বেশি জোরে কথা বলছে, জিভও একটু জড়িয়ে গেছে। সে সিগারেটও খায় সবচেয়ে বেশি। তিনটে পাঁচ মার্কা সিগারেটের একটা পুরো প্যাকেট এরই মধ্যে শেষ করে, অন্য একটা নতুন প্যাকেট খুলেছে। মুনাব্বর তাকে ভদ্‌কা নিতে বারণ করল দুবার,

আলম শুনল না।

আমি পকেটে হাত দিয়ে গোপনে গিল্ডারের হিসেব করতে লাগলুম। এক রাউন্ডের অর্ডার আমার দেওয়া উচিত। স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে আঙুল তুলতেই ইমতিয়াজ বলল, না, না, ওসব চলবে না। আপনি আমাদের অতিথি। আপনি বিদেশ ঘুরতে এসেছেন, অযথা পয়সা খরচ করবেন না। আপনি কোন হোটেলে উঠেছেন? হোটেলে পয়সা দেবেন কেন, আমার বাড়িতে চলে আসুন। দেশ থেকে অনেকেই এসে আমার ওখানে ওঠে। আমার তিনখানা ঘর আছে।

মুনাব্বর বলল, ও এখনও শাদি করেনি, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না।

কথায়-কথায় জানতে পারলুম, শমীম বিয়ে করেছে নিজের দেশের মেয়েকে, মুনাব্বরের স্ত্রী ডাচ, আর আলম একটি ডাচ মেয়ের সঙ্গে লিভিং টুগেদার করে। এই লিভিং টুগেদার এখন এসব দেশে বেশ চালু হয়ে গেছে। হল্যান্ডে এসে কেউ কোনো ডাচ মেয়েকে বিয়ে করতে পারলেই তার নাগরিকত্ব পেতে আর কোনও অসুবিধে হয় না, তার কোনও সময় চাকরি না থাকলেও সে মোটা টাকা ভাতা পাবে।

ইমতিয়াজ বলল, এখানে ইণ্ডিয়ার লোকও বেশ কয়েকজন আছে। তাদের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে আপনার? আমি আলাপ করিয়ে দিতে পারি।

আমি বললুম, তাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আমি খুব ব্যস্ত নই। আপনাদের সঙ্গে গল্প করতেই তো আমার বেশ চমৎকার লাগছে।

আলম আমার পিঠে একটা চাপড় মেরে নেশাগ্রস্ত গলায় বলল, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এদেশে এসে বুঝলুম, ধর্মটর্মতে কিছুছু আসে যায় না। গায়ের রঙে কিছু আসে যায় না। তুমিও মানুষ, আমিও মানুষ, খাটো, রোজগার করো, খাও-দাও, ফুর্তি করো। আয়ু ফুরিয়ে গেলে মরে যাও। ব্যস, সোজা কথা।

শমীম বলল, দুঃখের বিষয় এ কথাটা আমরা নিজের দেশে থাকার সময় বুঝতে পারি না। বুঝতে হল কিনা সাহেবদের দেশে এসে! দেশে থাকলে নীললোহিতের সঙ্গে এরকম আড্ডা মারতে পারতুম?

আমি বললুম, কেন, আমার তো মনে হচ্ছে, কলকাতারই কোনও দোকানে বসে আছি। আপনারা আমার কলকাতার বন্ধুদের মতন অনায়াসেই অমল, কমল, ফিরোজ, শামসের হতে পারতেন।

মুনাব্বর বলল, এটা আপনি ঠিক বললেন না, এটা আপনি একটু বেশি মিষ্টি করে বললেন। দেশে থাকলে আমাদের পেছনে স্পাই লেগে যেত।

কথা ঘোরাবার জন্য ইমতিয়াজ বলল, চলো এবার ওঠা যাক। ওহে মুনাব্বর, দেরি করে ফিরলে তোমার বিবি মাথায় কিল মারবে না?

মুনাব্বর বলল, আমার বিবি গেছে তার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে। আজ রাতে ফিরবে না। বরং আলমের গার্লফ্রেন্ডই বকাবকি করবে। আলম কত বেশি খাচ্ছে দেখেছ?

আলম বলল, আরও খাব, লাগাও আর এক রাউন্ড।

ইমতিয়াজ বলল, না, আর না।

আলম বলল, আলবত আর এক রাউন্ড হবে। এই নীললোহিত আমাদের মেহমান।

ইমতিয়াজ বলল, ওনার জন্য আর একটা দেওয়া যেতে পারে, আমিও সঙ্গ দিতে পারি ওঁকে, কিন্তু তুমি আর না। সিগারেটের প্যাকেটটা আমাকে দাও, আর একটাও খাবে না।

আলম বলল, ভয় পাচ্ছ কেন! মরি তো মরব, নিজের খুশিতে মরব। মুনাব্বর বলল, বুঝলেন নীললোহিতদাদা, এই আলমের হার্টে একটা জবর গোলমাল দেখা দিয়েছে। সামনের মাসে অপারেশন হবে, খুব বড় অপারেশন। সিগারেট আর মদ খাওয়া একেবারে নিষেধ, কিন্তু

ও কিছুতে মানবে না।

হার্টের রুগি এত সিগারেট খাচ্ছে শুনে আমিও আঁতকে উঠলুম। আলমের চোখ দুটো লালচে হয়ে গেছে, মাথার চুল উশকোখুশকো। সিগারেট টানছে গাঁজার মতন।

আলম জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বুঝলেন দাদা, আমার এই অপারেশনে দু-লক্ষ টাকা খরচ হবে। তাতেও বাঁচব কি মরব ঠিক নেই। দেশে থাকতে গরিবের ছেলে ছিলুম, এত টাকা দিয়ে অপারেশন হত আমার? এমনিই মরতুম না? জাহাজের চাকরি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়েছিলুম, এদেশে আছি এখন, এখানকার সোসাইটি সব চিকিৎসার খরচ দেয়...সেইজন্যই তো জীবন নিয়ে এত ফুটানি। দু-লাখ টাকার চিকিৎসা...হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ...

তারপরই সে আবার হাঁক দিল স্টুয়ার্টের উদ্দেশ্যে।

আমি জিগ্যেস করলুম, দু-লাখ টাকার চিকিৎসা? কী হয়েছে ওর হার্টে?

ইমতিয়াজ বলল, এমনিতেই এদেশে চিকিৎসার খুব খরচ। তা ছাড়া ওর হার্টের একটা ভাল্‌ভ কাজ করছে না, সব টেকনিক্যাল ব্যাপার আমি বুঝি না, মোটমাট বেশ শক্ত অপারেশন। তবে ডাক্তার বলেছে, সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এরকম ভাবে যদি অত্যাচার করে...

আলম বলল, জীবনটা কার, আমার না তোমাদের? আমার জীবন আমি ইচ্ছে মতন খরচ করব। অপারেশনের সময় যদি মরেই যাই, তা হলে তার আগে যে ক'টা দিন বাকি আছে একটু খুশি মতন কাটিয়ে যাব না?

মুনাব্বর আমাকে বলল, আপনি ওকে একটু বারণ করুন না। আমাদের কথা তো শোনেই না, আপনি নতুন লোক, যদি একটু পাত্তা...

মাত্র ঘণ্টা দু-এক আলমের সঙ্গে আমার আলাপ। আমার কথা ও শুনবে কেন? আলম বরং আমার পাশে উঠে এসে বলল, আমার সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়েছে, আপনার থেকে দিন তো একটা। আপনার দেশের সিগারেট? চার্মিনার? দিন তো খেয়ে দেখি। আমি কয়েকটা বাংলা কথা জানি, বাংলা সিনেমা দেখেছি...হার্টের দরদ হলে আপনারা বলেন, মন খারাপ, তাই না?

মোট কথা প্রায় জোরজবরদস্তি করেই আলমকে নিয়ে আমরা উঠে পড়লুম একটু বাদেই।

সেই রাতে আমি আলমকে বহুক্ষণ স্বপ্নে দেখলুম।

॥ ২ ॥

আর্ট গ্যালারি কিংবা মিউজিয়াম খুব ভালো জিনিস, কত দেখার জিনিস থাকে, দেখলে কত জ্ঞান বাড়ে, কিন্তু বড্ড পা ব্যথা করে। আমাদের শরীরের মধ্যে পা দুটিই সবচেয়ে নগণ্য, কখনও আমরা পায়ের প্রতি বিশেষ নজর দিই না। পা দুটো আছে ভারবাহী গাধার মতন, আপন মনে নিজের কাজ করে যাবে, এই রকমই কথা। কিন্তু সেই গাধা দুটো হঠাৎ বিদ্রোহ করলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পও নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমারও হল সেই রকম দশা।

হল্যান্ডের আমস্টারডাম যেমন ছবির মতন সুন্দর শহর, সেই রকমই পৃথিবী-বিখ্যাত বহু ছবিতে ভরা। আমস্টারডামে এসে শুধু ডাচ চিজ, মাছ ভাজা আর হাইনিকেন বিয়ার খেলেই তো হয় না, ডাচ শিল্পীদের ভুবন-বিজয়ী ছবিগুলি না দেখলে জীবন বৃথা। কোন কোন ছবি দেখব, তা আগেই ঠিক করে এসেছিলুম, কিন্তু দেখা কি অত সোজা!

একে তো দেশ ছেড়ে বিদেশে এলেই আমার মতন লোকের বুকের ভেতরটা সব সময় শুকনো-শুকনো লাগে, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম, এই বুঝি হারিয়ে গেলুম মনে হয়। তা ছাড়া, এই

সব জায়গায় সব সময় আমাদের পকেটের পয়সা আর সময় খরচ করতে হয় টিপেটিপে। সাহেবদের দেশে ট্যাক্সি চড়বার সৌভাগ্য নিয়ে আমি জন্মাইনি। আমস্টারডাম শহর অপূর্ব, সুশ্রী, ঝকঝকে ট্রাম চলে অবশ্য, কিন্তু একবার চড়বার পরই যখন টিকিটের দাম হিসেব করে দেখি আমাদের দেশের প্রায় দশ টাকার সমান, তখন গা কচকচ করে। সুতরাং পা দুটিই প্রধান ভরসা।

হল্যান্ডের অধিকাংশ লোক ঠিক ততটাই বাংলা জানে, আমি যতটা ডাচ ভাষা জানি। সুতরাং তারা তাদের ভাষা আর আমি আমার ভাষা বললে যথেষ্ট হাস্যকৌতুক হয় বটে, কিন্তু রাস্তা চেনা যায় না। ইংরেজি জানা লোক এদেশের এয়ারপোর্টে কিংবা হোটেলে পাওয়া গেলেও পথে ঘাটে সব সময় তাদের সন্ধান মেলে না। সুতরাং ম্যাপ হাতে নিয়ে ঘুরতে হয় আন্দাজে। তিন-চার চক্কর ঘুরে আসবার পর দেখা যায়, আমি যে মিউজিয়ামটি খুঁজছি, সেটা ঠিক পেছনের রাস্তায়।

দ্রষ্টব্যস্থল খুঁজে পেলেও হাঁটার শেষ হয় না। এক একটা আর্ট গ্যালারি বা মিউজিয়ামে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, সবক'টি ঘর ঘুরে দেখা মানেও তো কয়েক মাইলের পথ। অথচ কোনওটাই বাদ দিতে ইচ্ছে করে না। শুধু ভ্যান গঘের (এখানকার লোকেরা এই নাম অন্যরকম উচ্চারণ করে, আমাদের বাঙালি উচ্চারণই ভালো) ছবি নিয়েই একটি পাঁচতলা বাড়ির আর্ট গ্যালারি, তার সবটাই না দেখলে কি চলে! তারপর মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়াম, রেমব্র্যান্ডটের বাড়ি...সকাল থেকে ঘুরতে-ঘুরতে যখন রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালুম, তখন বুকটা হঠাৎ দমে গেল।

এ যে এক বিশাল প্রাসাদ, এর সবটা এখন দেখতে হবে? পা দুটো যে আর চলতে চাইছে না। পায়েরও যে তেমন দোষ নেই। অথচ আমস্টারডামে এসে রিজ্‌কস্ মিউজিয়াম না দেখা তো মহা পাপের সমান। বেশি ভালো-ভালো জিনিস একদিনে দেখতে নেই, কিন্তু আজকে এখানে ইতি দিয়ে যে আবার কালকে দেখব তারও উপায় নেই, তা হলেই আর একদিন বেশি হোটেল খরচ।

কলকাতার ছেলে, অধিকাংশ সময়ই চটি পরে ঘোরবার অভ্যেস, কিন্তু সাহেবদের দেশে সর্বক্ষণ মোজা আর বুটজুতো পরে থাকতে হয়। পা দুটো চাইছে সেই বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেতে। আগেকার আমলের পাথরের তৈরি প্রাসাদ, এখানে খালি পায়ে হাঁটতে তবু ভালো লাগত। আমাদের দেশের মন্দির টন্দিরের মতন, এরাও এসব জায়গায় জুতো খুলে ঢোকবার নিয়ম করলে পারে না?

রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে ঢোকবার মুখেই নোটিশ ঝুলছে, 'চোর ও গাঁট কাটাদের থেকে সাবধান।' জিনিসটা বেশ চেনা চেনা লাগল। প্রথমেই ছবি দেখতে শুরু না করে ডান দিকে ঢুকে গেলুম রেস্তোরাঁয়। কিছু খাদ্য-পানীয় দিয়ে শরীরকে কিছুটা তোয়াজ করা যাক। কিন্তু ওতে পেট এবং মন সন্তুষ্ট হলেও পা নামের গাধা দুটো খুশি হল না। খাদ্য-পানীয় তো পা পর্যন্ত পৌঁছোয় না। তারা এখনও টনটনে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে ছবির শুরু পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত এসে পৌঁছোতে অনেক ঘর পার হতে হয়। তা ছাড়া আছে মহান শিল্পীদের আলাদা-আলাদা ঘর। এই সব ছবি কি একদিনে সঠিকভাবে দেখা সম্ভব? কিন্তু এই জীবনে আর হয়তো কখনও আমস্টারডামে আসব না, আর দেখাও হবে না।

ভ্রমর যেমন গোটা ফুলটার সৌন্দর্যের তোয়াক্কা করে না, শুধু মধুর সন্ধানে ঠিক মাঝখানটায় ঢুকে যায়, সেই রকমই, অধিকাংশ ভ্রমণকারী রিজ্‌কস্ মিউজিয়ামে এসে প্রথমেই ছুটে যায় রেমব্র্যান্ডন্টের 'নাইট ওয়াচ' ছবিখানা দেখতে। এই বিশাল ছবিখানার নাম অনেকেই আগে থেকে শুনে আসে। লুভর-এর যেমন মোনালিজা, রিজ্‌কস্-এর সেরকম নাইট ওয়াচ। এখানে যে রেমব্র্যান্ডন্টের আরও অনেক ছবি আছে, কিংবা কাছাকাছি ঘরে ভারমিয়ের, গোইয়া, মুরিল্লো এবং ভ্যান ডাইকের দুর্লভ ছবি, তা গ্রাহ্য করে না অনেকেই।

আমারও প্রায় সেই অবস্থাই হল। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে 'নাইট ওয়াচ' দেখার পর ভারমিয়ের-এর ঘরে সবে মাত্র চোখ বুলোতে শুরু করেছি, এমন সময় আমার পোষা গাধা দুটি বলল, এবার

ছুটি দেবে কি না বলো, নইলে কিন্তু তোমায় গাছের ওপর রেখে আমরা তলা থেকে মই কেড়ে নেব!

সুতরাং অন্যান্য অ-দেখা শিল্পীদের উদ্দেশ্যে সেখান থেকেই প্রণাম জানিয়ে ও ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লুম, তারপর প্রায় সোজা দৌড়ে গিয়ে হোটেলের বিছানায়।

ঘণ্টা দু-এক বাদে আবার পা দুটি স্ববশে এল। শরীর ও মন ঝরঝরে। আবার নতুন উদ্যোগে কিছু শুরু করা যায়। কালই এই শহর ছেড়ে চলে যাব, আজকের শেষ দিনটা এমনভাবে হোটেলের ঘরে শুয়ে নষ্ট হবে? ঘড়িতে বাজে মাত্র সাতটা, এটা সন্ধে না বিকেল না দুপুর তা বলা মুশকিল। বাইরে ঠিক দুপুরেরই মতন ঝকঝকে রোদ। আমাদের হোটেলের ঘরের জানালার ঠিক সামনেই দুটো বেশ বড় ঝাঁকড়া-চুলো সাইপ্রেস গাছ, ভ্যান গঘের অনেক ছবিতে এই সাইপ্রেস গাছ দেখা যায়, সুতরাং বাইরের দৃশ্যটি ভ্যান গঘের আঁকা একটা ছবি বলেই মনে হয়।

কিছুক্ষণ একটা বই খুলে বসে রইলুম, কিন্তু মনঃসংযোগ হল না। বিদেশের মূল্যবান একটি অপরাহ্ন এমনভাবে নষ্ট করতে ইচ্ছে করে না। আবার বেরিয়ে পড়লুম হোটেল থেকে।

কয়েক পা হাঁটার পর এমনই চমক লাগল যে দাঁড়িয়ে পড়লুম হঠাৎ। স্বপ্ন দেখছি না তো? এটা কি বাস্তব কোনও শহর না রূপকথার একটা পৃষ্ঠা? ঘড়িতে দেখলুম, আটটা বেজে দশ, এখনও আকাশে রয়েছে পরিষ্কার দিনের আলো, এর মধ্যে চতুর্দিকের রাস্তাঘাট একেবারে জনশূন্য। চৌরাস্তার মোড়ে যেদিকে তাকাই, কোথাও একটাও মানুষ নেই, আমি ছাড়া। এ-ও কি সম্ভব? দুপুরবেলা এই পথ দিয়ে গেছি, সেই সব দোকান চিনতে পারছি, কিন্তু কোথাও কোনও প্রাণের চিহ্ন নেই। সব দোকানেই কাচের দেওয়াল, ভেতরে আলো জ্বলছে, বাইরে থেকে ভেতরের সব কিছু দেখা যায়, কিন্তু ক্রেতা-বিক্রেতা নেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। খুব মিহি ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, বাতাসে শীত-শীত ভাব, আমি শুধু একটা সোয়েটার পরে আছি, ওর ওপরে আর একটা কোনো গরম জামা চাপালে আরাম লাগত, কিন্তু আর কিছু আনিনি আমি। আমার রোমাঞ্চ হল। এত বিখ্যাত এই শহরের এক চৌরাস্তায় আমি দাঁড়িয়ে আছি, চারপাশে বড়-বড় বাড়ি, প্রত্যেক দিকে লাইন করা অজস্র দোকান, অথচ মাত্র সন্ধে আটটায় সব একেবারে নিঃসাড়, একটা মানুষেরও দেখা পাওয়া যায় না।

আমার হোটেলটা শহরের এক প্রান্তে। কিন্তু কল্পনা করা যায় কি যে সন্ধে আটটার সময় টালিগঞ্জ বা দমদমের রাস্তায় একটিও মানুষ নেই?

একটা ট্রামের আওয়াজে চমক ভাঙল। তা হলে ট্রাম চলছে! এখানকার ট্রাম এক-কামরা, আমাদের মতন ফার্স্ট ক্লাস-সেকেন্ড ক্লাস নেই। তাকিয়ে দেখলুম, গোটা ট্রামে ঠিক তিনজন মানুষ বসে আছে। তারপর দেখলুম, গাড়িও চলছে রাস্তা দিয়ে। শহরটা ঘুমিয়ে পড়েনি। মনে পড়ল, এখানকার সমস্ত দোকানপাট ছ'টার সময় বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আর কেউ রাস্তা দিয়ে হাঁটে না। বড়-বড় বাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সমস্ত জানালার পরদা টানা। রাস্তার ধারে বহু গাড়ি পার্ক করা আছে। এই সব গাড়ির ওয়াইপার কেউ চুরি করে না, হেড লাইট খুলে নেয় না! দোকানগুলোর কাচের দেওয়াল ভেঙে কেউ চুরি করে না! পথ দিয়ে মানুষ হাঁটে না, তবু দোকানগুলোর মধ্যে আলো জ্বেলে রেখেছে কেন? মোড়ের ফোয়ারা থেকে জল পড়েই যাচ্ছে, কেউ দেখবার নেই, তবুও!

সোজা হাঁটতে লাগলুম আপন মনে। খানিকবাদে কোনও-কোনও দোকানের ভেতর থেকে শব্দ পেতে লাগলুম। সেই সব দোকানের অন্দরমহল বাইরে থেকে দেখা যায় না, গাঢ় রঙের পরদা ফেলা। সাইনবোর্ডে দেখলুম, সেটা একটা বার। অর্থাৎ হোটেল-রেস্তোরাঁ এখনও খোলা। একটা ওই রকম দোকান থেকে পুতুলের মতন সুন্দর দুটি নারী-পুরুষ বেরিয়ে সামনের গাড়িতে উঠল। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি মিনিট পরে আমি খুব কাছাকাছি দুজন জীবন্ত মানুষ দেখলুম। নির্জনতা জিনিসটা পাহাড়

কিংবা সমুদ্রের ধারে ভালো, কিন্তু কোনও বড় শহরের রাস্তায় এরকম নির্জনতা খুবই অস্বস্তিকর।

খানিকক্ষণ হাঁটার পর মনে হল, আমিও তো কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে একটুক্ষণ বসলে পারি। তবে ঠিক কোনটায় ঢুকব, তা ঠিক করতে একটু সময় লাগল। যদি আমি ঢোকামাত্র সবাই আমার দিকে তাকায়? একটা রেস্তোরাঁর দরজা ঠেলে ভেতরে এক পা দিয়েও আবার বেরিয়ে এলুম। সেখানে অনেক ছেলেমেয়ে নাচছে। হয়তো ওখানে সবাই সবার চেনা, একমাত্র আমিই হব বাইরের লোক!

আরও একটু হাঁটবার পর, আর একটা মোড়ে এসে মনঃস্থির করে একটা ছোট দোকান দেখে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লুম। ভেতরে আবছা আলো। চোখ সইয়ে নেওয়ার পর বুঝলুম, সেটা একটা ট্যাভার্ন জাতীয় জায়গা, ইংরেজরা যাকে বলে পাব্। এক পাশে গোটাচারেক টেবিল, অন্য পাশে লম্বা কাউন্টারের সামনে অনেকগুলো হাই স্টুল, রেকর্ডে বাজনা বাজছে। প্রত্যেক টেবিলেই দুজন করে নারী-পুরুষ বসে আছে বলে আমি গিয়ে বসলুম কাউন্টারের সামনের একটা হাই স্টুলে।

তারপর বারটেন্ডার মহিলার দিকে তাকিয়ে আমি ঠিক ভূত দেখার মতন চমকে উঠলুম। মহিলাকে দেখতে অবিকল আমার ছোট পিসিমার মতন। বছর পঞ্চাশেকের মতন বয়েস হবে, একটু মোটার দিকে চেহারা, নাক-চোখ-ঠোঁটের ভাব এমনকী থুত্নিতে পর্যন্ত হুবহু আমার ছোট পিসিমার সঙ্গে মিল। ইনি মেমসাহেব বলে গায়ের রং তো ফর্সা হবেই, তা আমার ছোট পিসিমাও খুব ফরসা ছিলেন। আমার ছোট পিসিমাকে আমি স্মরণকাল থেকেই বিধবা অবস্থায় দেখেছি, সরু কালো পাড়ের ধুতি পরতেন, তাঁকে একটা গাউন পরিয়ে দিলে একদম এই মহিলার মতনই দেখাত।

মহিলা আমার সামনে এসে ডাচ ভাষায় অনেক কিছু বললেন। উত্তরে আমি একটা আঙুল দেখিয়ে বললুম, বিয়ার। মদের নামগুলো আন্তর্জাতিক, বুঝতে কোথাও কারুর অসুবিধে হয় না।

মধ্যবয়স্কা মোটাসোটা মহিলাটি প্রায় নাচের ভঙ্গিতে উড়ে গিয়ে একটা পিপে থেকে এক গেলাস বিয়ার ঢেলে আনলেন, একটা প্লেটে খানিকটা চিজ আর বাদাম আমার সামনে রেখে একগাল হাসি উপহার দিলেন সেই সঙ্গে। যাক, তা হলে আমি এখানে অনধিকারী নই।

বিয়ারের চুমুক দিতে-দিতে আড় চোখে পরিবেশটা ভালো করে দেখে নিলুম। কাউন্টারে আমার পাশাপাশি আরও পাঁচ-ছ'জন নারী-পুরুষ বসে আছে, তারা বেশ জোরে-জোরে হাসাহাসি ও গল্প করছে নিজেদের মধ্যে। সবাই সবাইকে চেনে। ঘরের এক দিকের দেওয়ালে একটা রঙিন বোর্ড, মাঝখানে একটা বৃত্ত আঁকা, একটু দূর থেকে একজন মহিলা ও তার এক সঙ্গী পালকের তীর ছুড়ে-ছুড়ে মারছে সেই বৃত্তের দিকে। একে ডার্ট খেলা বলে, কিন্তু মনে হল যেন এখানে কিছু জুয়ার ব্যাপার আছে। একবার মহিলাটি তাঁর সঙ্গীকে কিছু পয়সা বার করে দিলেন।

আমার পাশেই বসে আছেন এক হাসিখুশি প্রৌঢ় তার পাশে অতিশয় পৃথুলা এক মহিলা। এঁরা স্বামী-স্ত্রী মনে হয়। বারটেন্ডার মহিলাকে এরা নাম ধরে ডাকছে। কয়েকবার মনোযোগ দিয়ে শুনবার পর বুঝলাম, ওঁর নাম লিলি। আমার সেই পিসিমার নাম ছিল শেফালি। নামেও বেশ মিল আছে দেখছি। আমার ছোট পিসি মারা গেছেন বেশ কয়েক বছর আগে, হঠাৎ তার জন্য আমার কষ্ট হল। বিধবা অবস্থায় ছোট পিসিমা একটা ম্লান জীবন কাটিয়ে গেলেন, আর এই লিলি কী রকম নাচতে-নাচতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

শুধু নাচ নয়, লিলি এক সময় গান গেয়েও উঠল। রেকর্ডে একটা নতুন গান শুরু হতেই লিলি তার সঙ্গে গলা মেলাল, তারপর সেই পাবের সবাই। নিশ্চয়ই খুব একটা চেনা গান, এরা সবাই জানে। বেশ সহজ সুরের গান, অনেকটা আমাদের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা'র মতন। গানটা শেষ হতেই একটা টেবিল থেকে একজন লোক কী একটা রসিকতা করতেই সবাই একেবারে হেসে গড়াগড়ি যেতে লাগল এক সঙ্গে। কাউন্টারের একজন লোক গলা বাড়িয়ে ফটাস করে একটু চুমু দিয়ে ফেলল লিলির ঠোঁটে, আর লিলি কৃত্রিম কোপে একটা কিল মারল সেই লোকটির মাথায়। হায়, আমার ছোট পিসিমাকে কেউ কোনওদিন এইভাবে আদর করেনি। এইটুকু আনন্দ তো আমার

ছোট পিসিমা পেতেও পারতেন, কী আর এমন দোষ আছে এতে।

হঠাৎ আমার এই জায়গাটাকে খুব চেনা মনে হল। যেন আগে অনেকবার দেখেছি। জর্জ সিমেনোঁর উপন্যাসে ঠিক এইরকম ছোটখাটো কোনও ট্যাভার্নের মাঝ বয়েসি ফুর্তিবাজ নারী পুরুষের ছবি থাকে। সিমেনোঁ অবশ্য বেলজিয়ামের কথা লিখেছেন, কিন্তু বেলজিয়াম আর হল্যান্ড কাছাকাছি দেশ, প্রায় একইরকম পরিবেশ। আমি যেন সেইরকম একটা উপন্যাসের মাঝখানে ঢুকে পড়েছি।

নাচতে-নাচতে গান গাইতে-গাইতে লিলি একবার আমার খালি গেলাসটা নিয়ে গিয়ে ভরতি করে নিয়ে এল। আমাকে জিগ্যেসও করল না, আমি আবার চাই কি না। একটু অবাক চোখে তাকিয়েছি, লিলি আঙুল দিয়ে পাশের লোকটিকে দেখাল। পাশের লোকটি এক আঙুলে নিজের বুকে টোকা মেরে তারপর আমার গেলাসটার দিকে আঙুল ফেরাল, অর্থাৎ সে আমাকে ওই বিয়ার খাওয়াচ্ছে। প্রত্যাখ্যান করা অভদ্রতা, তাই আমি বললুম, থ্যাঙ্ক ইউ। লোকটি তখন একগাদা কথা বলে গেল গড়গড় করে। এক বর্ণ বুঝলাম না। এখানে হাসির ভাষা ছাড়া অন্য কিছু দেওয়া যায় না। তার পাশের মহিলাটি বলল, সে নো নো ইংলিশ। ইউ জাপান।

আমাকে জাপানি বলে কস্মিনকালে কেউ ভুল করতে পারে, এরকম আমার ধারণা ছিল না। না হয় আমার নাকটা একটু বোঁচা, তা বলে গায়ের রং তো হলদে নয়। বললুম, নো, আই অ্যাম অ্যান ইন্ডিয়ান।

মহিলাটির ইংরিজির দৌড় খুবই কম। তিনি আমায় জিগ্যেস করলেন, ইন্দোনেশিয়া? সিঙ্গাপুর?

আমি মাথা নেড়ে পুনরুক্তি করলুম।

এবারে তৃতীয় একজন মাথার পেছনে হাত দিয়ে হাতটা নাড়তে-নাড়তে বলল, ইন্ডিয়ান? ইন্ডিয়ান?

অর্থাৎ মাথায় পালকের মুকুট বোঝাচ্ছে? আমাকে আমেরিকার লাল ইন্ডিয়ান ভেবেছে? কেন, আমাদের যে এত বড় একটা দেশ, সে দেশের নাম ওদের মনে পড়ছে না? ভাবতে লাগলুম, আমাদের দেশের কোন প্রতীক আছে যে যা দিয়ে চট করে এদের ভারতবর্ষ বোঝাতে পারি। হাতি? মহারাজা? তাজমহল?

আর একজন লোক জিগ্যেস করল, টুরিস্ট? আফ্রিকা?

এ তো মহা মুশকিলের ব্যাপার দেখছি। এরা কি কখনও ভারতীয় দেখেনি? আমাদের দেশ থেকে তো অনেকেই এখানে বেড়াতে আসে। এই আমস্টারডাম শহরেই তো বেশ কয়েকটি ভারতীয় দোকান দেখেছি। হয়তো এই পাড়ার লোকেরা আমাকেই প্রথম দেখছে। ম্যারি ম্যাকার্থির একটা উপন্যাসে পড়েছিলুম বটে, হল্যান্ডের লোকেরা নিজেদের দেশের বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে খুব কম জানে, তারা বাইরেও খুব কম যায়। আমরা অবশ্য আমাদের দেশের ওলন্দাজ জলদস্যুদের অনেক গল্প পড়েছি, কিন্তু সে তো ইতিহাসের ব্যাপার। এখনকার ওলন্দাজরা নিজেদের দেশের মধ্যে গুটিয়ে রেখেছে।

সকলেরই অল্প-অল্প নেশা হয়েছে। ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়, কিন্তু ভাবের আদান-প্রদানের কোনও উপায় নেই। লিলিও থুতনিতে আঙুল দিয়ে মাঝে-মাঝে আমার দিকে কৌতূহলে তাকাচ্ছে। এর মধ্যে আরও একজন লোক আর একটি বিয়ার অর্ডার দিল আমার জন্য। প্রতিদান হিসেবে আমিও অর্ডার দিলুম তিনটি বিয়ারের। তারপর মনে পড়ল, বার টেন্ডারদেরও অফার করা যায়। লিলির দিকে আঙুল তুলে জিগ্যেস করলুম, ইউ? ওয়ান?

লিলি একগাল হেসে রাজি হয়ে গেল। আমার মনটা খুব হালকা হয়ে গেল এই জন্য যে, এরা আমাকে গ্রহণ করেছে, বাইরের লোক হিসেবে মুখ ফিরিয়ে রাখেনি।

ভাষা না বুঝেও বেশ মিশে গেলুম ওদের সঙ্গে। একটু বাদে দরজা ঠেলে ঢুকল একজন

লম্বা মতন লোক। দু-তিন জন লোক চেঁচিয়ে উঠল, হেংক, ইংলিশ, ইংলিশ!

সেই লোকটি কাউন্টারে এসে লিলিকে একটা ব্র্যান্ডির অর্ডার দিয়ে ওদের কী সব জিগ্যেস করতে লাগল। ওরা আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ইংলিশ, ইংলিশ।

অর্থাৎ হেংক নামের লোকটি ইংরেজি জানে, তার মারফত আমার সঙ্গে কথা হতে পারে।

হেংক আমার দিকে ফিরে বলল, টুরিস্ট? হুইচ কানট্রি?

আমি বললুম, ইন্ডিয়া।

লোকটি বললো, ও, ইন্ডিয়া? হাফ অফ দি পপুলেশান ভেরি পুয়োর, রাইট? নো ফুড, নো ড্রিংক, স্টার্ভ, রাইট?

লোকটি পাশ ফিরে এই কথা আবার অন্যদের বোঝাল নিজস্ব ভাষায়। অন্যরা এবার সবাই মাথা ঝাঁকাল। তারা এবার বুঝেছে। পৃথুলা মহিলাটি আমার দিকে চেয়ে বলল, হিন্দু? হিন্দু। নো ইট, ভেরি পুয়োর?

কে যেন ঠাস করে একটা চড় মেরেছে আমার গালে।

হায় আমার জনম দুঃখিনী জননী, পৃথিবীর কাছে এই তার পরিচয়। ভারতের নাম চিনতে পেরেই প্রথমেই ওদের মনে পড়ল ভারতের দারিদ্র্যের কথা? এদেশে এত প্রাচুর্য তাই দারিদ্র্য ওদের কাছে কৌতূহলের বস্তু। আমি একটু আগে ভারতের একটা প্রতীক খুঁজছিলুম, হাত পেতে যদি এদের কাছে ভিক্ষে চাইতুম এরা ঠিক বুঝতে পারত।

হেংক-এর মারফত সবাই জানতে চাইছে ভারত কেন গরিব, সেই সব গরিবরা কী খেয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে, আর এদের সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে নেই। ভারতের দারিদ্র্যের কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই, কিন্তু লোকে ভারতের শুধু সেই পরিচয়টাই জানবে।

ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একটু বাদেই বেরিয়ে পড়লুম সেই পাব্ থেকে। দশটা বেজে গেছে, এখনও ঠিক মতন অন্ধকার নামেনি। পা দুটো আবার ক্লান্ত লাগছে। গরিব ভারতীয় হয়ে একটু-একটু মন খারাপ নিয়ে আবার হাঁটতে লাগলুম আস্তে-আস্তে।

॥ ৩ ॥

পটল জিনিসটা যে কত মূল্যবান, তা বোঝা গেল প্যারিসে এসে। আমি খুব একটা তরিতরকারির ভক্ত নই, যা পাই তাই খেয়ে নিই। খাওয়ার পাতে মাছ-মাংস আসবার আগে শাক-চচ্চড়ি যেন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে প্রেমিকার দাদার সঙ্গে পাড়া-পলিটিক্স নিয়ে আলোচনা। সৈয়দ মুজতবা আলি লিখেছিলেন, যেন পণ্ডিত মশাইয়ের হাতে বেত খাওয়ার আগে কানমলা।

পটলের সঙ্গে পটল-তোলার সম্পর্ক আছে বলে বরং ও জিনিসটা সম্পর্কে আমার মনে একটু বিরাগ ভাবই আছে। প্যারিসে বসে যে পটলের গুণগান শুনতে হবে, তা কোনওদিন কল্পনাই করিনি।

দেশ ছেড়ে বাইরে এলে টের পাওয়া যায়, বাঙালি যুবকরা রান্নায় কত পটু। যে-কোনও বাঙালি আড্ডায় রান্নার প্রসঙ্গ উঠবেই। তখন জানা যাবে যে অমুক ইঞ্জিনিয়ার কত ভালো মাছের ঝাল রান্না করেন, আর তমুক পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ধোঁকার ডালনা রেঁধে কতজনকে মুগ্ধ করেছেন। এঁরা অবিবাহিত। আর যাঁরা মাঝখানে একবার দেশে গিয়ে বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে এনেছেন, তাঁদের গিন্নিরাও কম যান না। ব্রেবোর্ন বা লোরেটোতে পড়া যেসব বাঙালি মেয়ে দেশে থাকতে কোনওদিন রান্না ঘরে ঢোকেননি, রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতেন কিংবা ভারত নাট্যম নাচতেন, তাঁরাও বিদেশে এসে

চিংড়িমাছের মালাইকারি কিংবা ডিম-সন্দেশ বানাতে শিখে যান।

এক বাঙালি আড্ডায় ডঃ দাস হঠাৎ আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করলেন সামনের শনিবারে। তা শুনে রায়বাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত খাওয়াবেন তো? আপনার হাতে কিন্তু পোস্তর রান্না দারুণ খোলে।

দাসবাবু বললেন, ঝিঙে-পোস্ত তো অনেকবার খেয়েছেন, আসুন না। এই শনিবারে আপনাদের মোচার ঘণ্ট খাওয়াব!

তাই শুনে এক মুখার্জি বললেন, মোচা? আপনি মশাই মোচা কোথায় পেলেন? আমি তো কখনও দেখিনি!

যেন দারুণ একটা রহস্যের সন্ধান দিচ্ছেন, এইভাবে দাসবাবু বললেন, শুধু মোচা কেন, আমি থোড় পর্যন্ত পেয়েছি। কোথায় জানেন? ভিয়েতনামি বাজারে!

আমার মতন নতুন-আসা লোকের কাছে এসব কথা ধাঁধার মতন লাগে। ঝিঙে-পোস্ত, মোচার-ঘন্টা, থোড়...এরপর কি নিম বেগুনের কথাও শুনতে হবে? এ যে আমার বিধবা দিদিমার রান্নার লিস্টি। প্যারিসের সব বিখ্যাত খাদ্যদ্রব্য ছেড়ে এসব কী?

রায়বাবু বললেন, আমি ভিয়েতনামি বাজারে যাই মাঝে-মাঝে কাঁচা লঙ্কা কিনতে। একদম আমাদের দেশের মতন কাঁচা লঙ্কা কিনতে পাওয়া যায়, দারুণ ঝাল!

সদ্য দেশ থেকে আসা আর একজন রায়বাবু বললেন, কাঁচা লঙ্কা? চলুন, চলুন, আজই কিনে আনি। কতদিন কাঁচা লঙ্কা খাইনি! আমি তো লঙ্কা ছাড়া কোনও জিনিসের স্বাদই পাই না।

আমি জিগ্যেস করলুম, ভিয়েতনামি বাজার ব্যাপারটা কী?

তখন সবাই মিলে আমাকে বোঝালেন যে গত কয়েক বছর ধরে প্যারিসের শহরতলিতে প্রচুর ভিয়েতনামের শরণার্থী এসে বসতি নিয়েছে। এমনকী তারা নিজস্ব বাজারও বসিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। ভিয়েতনামিদের খাদ্য-অভ্যেসের সঙ্গে বাঙালিদের খুব মিল। দশ-পনেরো বছর ধরে যেসব বাঙালি এ দেশে আছেন, মাংস খেয়ে খেয়ে তাঁদের অরুচি ধরে গেছে, সেইজন্যই তারা বাঙালি খাবারের সন্ধানে ওই সব বাজারে যান।

আমি বেশ ছেলেবেলায় একবার এই সব বিলেত টিলেত দেশ ঘুরে গিয়েছিলুম। তখন আমার ধারণা হয়েছিল, বিদেশেও বাঙালিরা ভাত খায় বটে, আর ফুলকপি-বাঁধা কপি-ঢ্যাঁড়শ এইসব কিছু কিছু তরকারিও পায়, তবে দেশের মতন রুই-কাতলা-ইলিশ মাছ কিংবা পাঁঠার মাংস তো পায় না, কতগুলো বিদঘুটে নামের সমুদ্রের মাছ খেয়ে মাছের স্বাদ মেটায় আর পাঁঠার মাংসের বদলে ভেড়ার মাংস খায়, যাতে বেশ বোঁটকা গন্ধ। লন্ডন কিংবা নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহরে, যেখানে অনেক ভারতীয়। সেখানে সিন্ধি বা গুজরাটিদের দোকানে পাঁপড়-আচার কিংবা মুসুরির ডাল পাওয়া যেত।

এবার এসে দেখছি সে সব কিছুই বদলে গেছে। এখন আর কিছুরই অভাব নেই, পাওয়া যায় সব কিছুই।

সদ্য দেশ থেকে আসা দ্বিতীয় রায়বাবু জিগ্যেস করলেন, কাঁকড়া? কাঁকড়া যদি পাওয়া যেত, আমি নিজেই রান্না করে আপনাদের খাওয়াতুম।

দাসবাবু বললেন, কেন পাওয়া যাবে না! আমার বাড়িতে টিনের কাঁকড়া আছে। আর যদি ফ্রেস চান তাও এনে দিতে পারি, আমাদের বাজারে প্রায়ই ওঠে।

কাঁকড়া পাওয়া যাবে শুনে দ্বিতীয় রায়বাবুর চোখ খুশিতে চকচক করে উঠল।

এক মহিলা আমেরিকা থেকে ফেরার পথে প্যারিসে এসে থেমেছেন। তিনি বললেন, নিউ ইয়র্কে কী চমৎকার ইলিশ মাছ খেয়ে এলুম। বিশ্বাসই করা যায় না।

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, ইলিশ? নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে নিয়ে গেছে। নাকি ঢাকা থেকে?

তখন দু-তিনজন মিলে প্রায় ধমকে উঠে বললেন, কলকাতা-ঢাকা থেকে কেন আনবে? এ দেশে পাওয়া যায় না? ইলিশ কি আপনাদের নিজস্ব। ইলিশ সমুদ্রের মাছ, নদীতে ঢুকলে তখন বাংলায় তার নাম ইলিশ।

আমেরিকা-ফেরত মহিলাটি বললেন, ও-দেশে বলে শ্যাড। অবিকল আমাদের ইলিশের মতন, তবে সাইজে আমাদের চেয়েও বড়। আমাদের দেশে কখনও আট-ন পাউন্ড ওজনের ইলিশ দেখেছেন? অত বড় ইলিশের স্বাদও কিন্তু খুব ভালো।

আমি জিগ্যেস করলুম, নিউ ইয়র্কে কোনও বাঙালি ইলিশের দোকান খুলেছে? মহিলাটি হেসে বললেন, বাঙালির দোকান কেন হবে? বাঙালিরা কোথাও দোকান খোলে না! সাহেবদের দোকান।

আমি একটু নিরাশই হলুম। সারা ভারতবর্ষে বাঙালি ছাড়া আর কেউ ইলিশ খায় না। আমার ধারণা ছিল ইলিশটা একেবারে বাঙালিদের নিজস্ব ব্যাপার। বাঙালি-সংস্কৃতি, বিশেষত বাঙাল-সংস্কৃতির প্রধান অঙ্গ। কিন্তু নিউ ইয়র্কে সাহেবদের দোকানে যখন ইলিশ পাওয়া যায়, তখন নিশ্চয়ই সাহেবরাও খায়। হায়, হায়!

আমেরিকা ফেরত মহিলাটি বেশ মাছ-রসিক। তিনি বললেন, ওখানে বাফেলো বলে আর একরকম মাছ আছে, সেটা ঠিক কাতলা মাছের মতন। আর কার্প মানে যে রুই, তা তো জানেনই। আর আছে ক্যাট ফিস, ঠিক আমাদের দেশের বড় আড় মাছ।

দ্বিতীয় রায়বাবু বললেন, মাছের নাম বাফেলো? ক্যাট? দরকার নেই আমার, আমি কোনদিন ওসব মাছ ছুঁয়েও দেখতে চাই না। তার চেয়ে আমার কাঁকড়াই ভালো।

মহিলাটি বললেন, বাফেলো একবার খেয়ে দেখবেন, কলকাতার রুই-কাতলার স্বাদ ভুলে যাবেন। আমার তো ইচ্ছে আছে একবার নিউ ইয়র্ক থেকে একটা পাঁচ কেজি শ্যাড মাছ নিয়ে যাব কলকাতায়, দেশের লোকদের দেখাব।

আমি বললুম, এসব দেশে ভালো-ভালো খাবার পাওয়া যায় জানি। কিন্তু আমাদের দেশের সব খাবারও যে পাওয়া যায়, তা জানতুম না।

তখনই উঠল পটলের প্রসঙ্গ।

দাসবাবু বললেন, শুধু একটা জিনিস খেতে চাইলেও খাওয়াতে পারব না। আলু-পটলের তরকারি!

প্রথম রায়বাবু বললেন, এত বছর ধরে অনেক খুঁজেও আমি পটল পাইনি কখনও।

চৌধুরীবাবু বললেন, দেশে গিয়ে সেই জন্যই আমি রোজ পটল ভাজা খাই!

সেনবাবু বললেন, কতদিন যে দেশে যাইনি!

তিনি যে দীর্ঘশ্বাসটি ফেললেন, সেটা দেশের জন্য, না পটলের জন্য তা ঠিক বোঝা গেল না। আমাদের দেশের আর সব তরকারি এই সব দেশে আসে, শুধু পটলের এই একগুঁয়ে গোয়ার্তুমি কেন? ভিয়েতনামিরাও কি পটল খায় না?

চৌধুরীবাবু বললেন, যাই বলুন, আমাদের দেশে শীতকালে পটল ভাজা এক অপূর্ব জিনিস। এখানে শীত পড়লেই আমার সেই কথা মনে পড়ে।

আমেরিকা-ফেরত মহিলাটি হার মানবার পাত্রী নন। তিনি বললেন, আমরা কিন্তু ওদেশে পটল পাই। ফ্রেস নয় অবশ্য, টিনের।

দাসবাবু বললেন, ও জিনিস আমিও খেয়েছি। আমি টিনের খাবার তেমন পছন্দ করি না, তা ছাড়া ও জিনিসটার স্বাদও ঠিক পটলের মতন নয়।

মহিলাটি বললেন, স্বাদ ঠিক আমাদের পটলের মতন নয় বটে, কিন্তু দেখতে পটলের মতন তো বটে। কলকাতায় যেরকম পটল পাওয়া যায়, নর্থ ইন্ডিয়াতেও তো সেরকম পাওয়া যায় না।

আমরা ওই টিনের পটল দিয়েই তরকারি করে খাই।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমেরিকা আজব দেশ, সে দেশে নিশ্চয়ই বাঘের দুধও পাওয়া যায়। আমরা ছেলেবেলায় শুনতুম, কলকাতায় নিউ মার্কেটে পয়সা ফেললে বাঘের দুধও পাওয়া যেতে পারে, সেটা কলকাতার ব্যাপারে সত্যি না হলেও নিউ ইয়র্কের ব্যাপারে নিশ্চয়ই সত্যি।

রায়বাবু বললেন, বাঘের দুধ পাওয়া যায় কি না খোঁজ করে দেখিনি, তবে হাতির মাংস পাওয়া যায় শুনেছি।

সবাই হেসে উঠলেও রায়বাবু সজোরে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে কথাটা সত্যি। এমনকী প্রমাণ হিসেবে তিনি একটা নিউজ উইক পত্রিকা এনে ছবি দেখালেন।

আমি বললুম, ফ্রান্সে যখন ঘোড়ার মাংস বিক্রি হয়, তখন আমেরিকায় হাতির মাংস তো পাওয়া যেতেই পারে!

দাসবাবু বললেন, আজকাল অনেক হাতির মতন চেহারার আমেরিকান দেখতে পাচ্ছি, বোধহয় ওই মাংস খেয়েই...।

চৌধুরীবাবু বললেন, আর একটা জিনিস পাই না, সেটা হচ্ছে পান। আমি অবশ্য পানের ভক্ত নই, কিন্তু গত বছর বাবা-মা বেড়াতে এসেছিলেন আমার কাছে, পান পাওয়া গেল না বলে মা তো বেশিদিন থাকতেই চাইলেন না।

রায়বাবু বললেন, পান বোধহয়, লন্ডনে পাওয়া যায়। ওখানে একটু যদি খোঁজ নিতেন ...কিংবা আমি তো প্রায়ই লন্ডন যাই, যদি আমাকে বলতেন...

সেনবাবু বললেন, আমেরিকায় পান পাওয়া যায় না?

আমেরিকা-ফেরত মহিলা বললেন, খোঁজ করে দেখিনি, কিন্তু ক্যানাডায় পাওয়া যায়। টোরেন্টোতে জানেন তো রেডিয়োতে হিন্দি গান বাজে, হিন্দি সিনেমার হল আছে, তার সামনে পানের দোকান, ফুচকা, ঝাল মুড়ি...।

আর একজন মহিলা একটু দূরে বসে এক মনে একটা ছবির বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। এতক্ষণ একটিও কথা বলেননি। মহিলাটির রোগা পাতলা চেহারা, প্রথম বেড়াতে এসেছেন ফরাসি দেশে।

এবার তিনি বললেন, এসব কী হচ্ছে বলুন তো? প্যারিসে বসে শুধু খাওয়া-দাওয়ার আলোচনা! প্যারিসে জগৎ বিখ্যাত সব আর্ট গ্যালারি, মিউজিয়াম সেসব বাদ দিয়ে শুধু খাওয়ার কথা! এই মুহূর্তে একজন ফরাসি ভদ্রলোক এ-ঘরে ঢুকে পড়লে বাঙালিদের সম্পর্কে কী ভাববে বলুন তো!

প্রথম রায়বাবু হাসতে লাগলেন।

দাসবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, কী ভাববে আপনি জানেন? ভাববে, বাঙালিরা সত্যিই রসিক। তক্ষুনি আমাদের এই আলোচনায় যোগ দেবে। ফরাসিরা দারুণ খেতে ভালোবাসে।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমাদের দেশের অনেকের ধারণা, ফরাসিরা বুঝি সবাই কবি আর শিল্পী।

আমি বললুম, প্রথমবার আসবার সময় আমারও সেই ধারণা ছিল। এয়ারপোর্টে পা দিয়েই দেখলুম, দুটি ছেলে হাত-পা নেড়ে খুব কথা বলছে। আমার ধারণা হয়েছিল, ওরা কবি।

চৌধুরীবাবু বললেন, এয়ারপোর্টে কবি? খুব সম্ভবত তারা জোচ্চোর।

রোগা-পাতলা মহিলাটি ঝাঁজালো সুরে বললেন, আপনারা নিশ্চয়ই আসল ফরাসিদের সঙ্গে মেশেন না, বাঙালিরা শুধু বাঙালি খাওয়া নিয়েই ব্যস্ত। ফরাসিদেশ নিশ্চয়ই কবি আর শিল্পীদেরই দেশ।

রায়বাবু-দাসবাবুরা সমস্বরে হাসতে লাগলেন।

চৌধুরীবাবু বললেন, আমরা ইংরেজদের বেনে বলি, কিন্তু ফরাসিরাও কম বেনে নয়। আমেরিকার মতন বড় বড় ডাকাত এ দেশে না থাকলেও ঠগ-জোচ্চোর অসংখ্য। কবি-শিল্পী তো মাত্র হাতের এক মুঠো, বাকি সব ফরাসিরা বেশ স্বার্থপর ধরনের।

সেনবাবু বললেন, বেনেগিরি আর ডাকাতিতে ইংরেজরা যখন ওয়ার্ল্ডের টপ, সেইসময়ই সেদেশে শেক্সপিয়র জন্মায়। ফরাসিরাও যখন ব্যাবসা বাণিজ্যে খুব উন্নতি করে, তখনই এদেশের কিছু লোক ভালো কবিতা লেখে, ছবি আঁকে।

চৌধুরীবাবু বললেন, ফরাসিরা কলোনিগুলোতে যা অত্যাচার করেছে, সেই তুলনায় ইংরেজরা তো অতি ভদ্র! এখনও তো ফ্রান্স নির্লজ্জের মতন সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যাবসা করে।

প্রথম রায়বাবু বললেন, ওসব কথা ছেড়ে দিন। ফরাসিরা শিল্প-সাহিত্য সত্যিই ভালোবাসে বটে, তবে খেতেও খুব ভালোবাসে। ভালো-ভালো জিনিস খাওয়াও এদের কাল্‌চারের একটা অঙ্গ! চিজ আর ওয়াইন নিয়ে কত সূক্ষ্ম আলোচনা হয়...।

চৌধুরীবাবু বললেন, রাখুন মশাই কালচার। আমার অফিসের ফরাসিদের দেখছি তো, লাঞ্চের সময় হলেই ওদের আর জ্ঞান থাকে না। অমনি ছুটে গিয়ে গপ্‌গপ্‌ করে খাবে। অত বেশি খায় বলেই এদের অনেকেরই পেটের রোগ।

রোগা-পাতলা মহিলাটি আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, আমরা কি পঁপিদু সেন্টারে যাব না? বসে-বসে এইসব আলোচনাই শুনব?

আমি বললুম, যাক বাবা, আমার কী দোষ? সবাই গেলেই আমি যেতে পারি।

দাসবাবু বললেন, আজ ছুটির দিন, আজ সেখানে মস্তবড় লাইন হবে। দু-তিন ঘণ্টা দাঁড়াতে হবে।

মুখার্জিবাবু বললেন, চলুন, তবু যাওয়া যাক। এঁরা মাত্র কয়েকদিনের জন্য এসেছেন। সবক'টা আর্ট গ্যালারি দেখা হবে না। পঁপিদু সেন্টার তো অবশ্যই দেখা উচিত।

চৌধুরীবাবু বললেন, যাচ্ছেন যান। কিন্তু গুণে দেখবেন তো সেখানে কতজন ফরাসি আছে? দেখবেন, বেশিরভাগই বাইরের লোক।

যাওয়ার উদ্যোগ-আয়োজন করতে-করতেই বৃষ্টি এসে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে কারুর নেই। রোগা-পাতলা মহিলাটি বেশ মনমরা হয়ে গেলেন। আবার শুরু হল আড্ডা।

আড্ডাস্থলটি প্রথম রায়বাবুর বাড়ি। দুপুর বেশ গাঢ় হতে তিনি প্রস্তাব করলেন, আজ আর বেরিয়ে কী হবে? এখানেই খিচুড়ি-টিচুড়ি কিছু রেঁধে পিকনিক করা যেতে পারে।

দ্বিতীয় রায়বাবু সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, আমি রান্না করতে রাজি আছি।

চৌধুরীবাবু বললেন, চলুন, তা হলে কিছু চিংড়িমাছ কিনে আনা যাক। আর ফুলকপি। খিচুড়ির সঙ্গে জমে যাবে!

ছোট একটা দল বাজারে যাবার জন্য তৈরি হতেই আমি জুটে গেলুম তাদের সঙ্গে। বাজারে যাওয়াও একটা অপূর্ব অভিজ্ঞতা।

বাজার মানে মার্কেট তো নয়, আজকালকার ভাষায় একে বলে শপিং মল। বিশাল জায়গা জুড়ে এক চমৎকার আধুনিক স্থাপত্যের নিদর্শন। এখানে সূঁচ-সুতো থেকে মোটরগাড়ি পর্যন্ত সবই পাওয়া যায়। দোতলা-তিনতলায় ওঠবার জন্য সিঁড়ির বদলে এলিভেটর, চতুর্দিকে শুধু কাচের দেয়াল, তার মধ্যে আলাদা-আলাদা জিনিসের ঘর। ইন্দ্রপুরীর মতন ঝকঝক করছে সব কিছু। আমার ছেলেবেলায় দেখা ফরাসিদেশের সঙ্গে এখনকার ফরাসিদেশের যেন অনেক অমিল। সে বারে দেখেছি প্রাচীন ঐতিহ্য, এবারে অনেক কিছুই টাটকা-নতুন। মাঝখানের দু-দশকে ফরাসিদেশ যেন হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছে।

মাছ-মাংসের দোকানে গিয়ে চোখ একেবারে ছানাবড়া হবার জোগাড়। এত রকমের খাদ্য! চিংড়ি মাছই পাঁচ-ছ'রকম, বিরাট-বিরাট লম্বা বান মাছ, তা ছাড়া গোল-চ্যাপ্টা-মোটা কতরকমের যে নাম না জানা মাছ, তার ঠিক নেই। মাংসের দোকানের বাইরে আস্ত-আস্ত খরগোশ ঝোলানো। খাঁচার মধ্যে পায়রা রাখা রয়েছে, যেটা পছন্দ হবে, সঙ্গে-সঙ্গে সেটা কেটেকুটে ঠিক করে দেবে। সেসব এক-একটা পায়রার সাইজ আমাদের দেশের পায়রার তিনগুণ। তারপর হাঁস, ঘোড়া, হরিণ, ভেড়া, গরু, শুয়োর আরও যে কত ছাল ছাড়ানো জন্তু তার ঠিক নেই। এক সঙ্গে এত খাবার দেখলে গা গুলিয়ে ওঠে। পাশের তরকারির দোকানও কম যায় না, রাবণের সাইজের ফুলকপি আর ভীমের গদার সাইজের বেগুন। তার পাশের দোকানে অন্তত একশো রকমের কেক আর দুশো রকমের চিজ। মনে হয় যেন এত খাবার এক অক্ষৌহিণী সৈন্যও খেয়ে শেষ করতে পারবে না।

আমি চৌধুরীবাবুকে চুপিচুপি জিগ্যেস করলুম, আচ্ছা, ফ্রান্সের অনেক দোকানেই এত থরে থরে খাবার সাজানো দেখি। এত খাবার কে খায়? অথচ পাশের দেশ পোল্যান্ডে এখন দারুণ খাদ্যাভাব চলছে। কাগজে রোজই পড়ি, সেখানে মাংসের দোকানের সামনে লম্বা লাইন। তাও সবাই পায় না। বাচ্চাদের খাবারের পর্যন্ত শর্টেজ। ফ্রান্সের এত খাবার, এর কিছুটা এরা পোল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলে পারে না?

চৌধুরীবাবু বললেন, নীললোহিতবাবু, আপনাকে আমি বেশি সরল বলব, না বোকা বলব? এরকম প্রশ্নের কোনও মানে হয়? বড়লোকের বাড়িতে কত খাবারদাবার থাকে, কত খাবার নষ্ট হয়, তা বলে কি বড়লোকরা সেইসব খাবার গরিবদের দিয়ে দেয়?

আমি থতোমতো খেয়ে চুপ করে গেলুম। সত্যিই আমি মাঝে-মাঝে বড্ড বোকার মতন কথা বলে ফেলি। সেইজন্যই আমার চেনাশুনো লোকেরা মাঝে-মাঝে বলে, নীললোহিতটা একটা হাবা গঙ্গারাম!

॥ ৪ ॥

রোমে গিয়ে রোমানদের মতন আচরণ করাই বিধিসঙ্গত, এবং মোগলদের হাতে পড়লে মোগলাইখানা খাওয়াই উচিত হলেও ফ্রান্সে এসে ফরাসি ভাষার কথা বলার চেষ্টা করা খুব একটা সুবিধাজনক নয়। ফরাসিরা ইংরেজি বোঝে না, কিংবা বুঝতে চায় না আর ভাঙা-ফরাসি শুনলে ভুরু একেবারে কপালের শেষ সীমায় তুলে আনে।

আমার এক বন্ধু ফ্রান্স ঘুরে এসে বলেছিল, প্যারিসের চ্যাম্পাস এলিসিস্ রাস্তাটা বড় সুন্দর। তাই শুনে আমরা হেসেছিলুম। আমরা জানি, ইংরেজি বানানে প্যারিসের ওই বিশ্ববিখ্যাত রাস্তাটির নাম ওই রকম হলেও, আসলে ওই রাস্তাটির নাম সাঁজেলিজে। কিন্তু আমাদের এই অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী সম্বল করে ফ্রান্সে এলে কোনও লাভ হয় না। পথে কোনও ফরাসিকে যদি জিগ্যেস করি, সাঁজেলিজে কোন দিকে, সে অমনি ভুরু দুটো ধনুক করে ফেলে। পাঁচবার বললেও বোঝে না। আসলে, সাঁ জে লি জে এই প্রত্যেকটা মাত্রার উচ্চারণ অন্য রকম, যা আমাদের জিভে চট করে আসে না। একটু উচ্চারণের হেরফেরে খুব চেনা জিনিসও দুর্বোধ্য হয়ে যায়। কী এক প্রসঙ্গে একজন ফরাসি আমাকে পাঁচবার ধরে বলল, হ্রাদিয়ো, হ্রাদিয়ো! তখন আমারও ভুরুর অবস্থা সেইরকম। কী করে বুঝব যে সে বলতে চাইছে রেডিও!

এক অক্ষর ফরাসি না জানলেও কিন্তু ফরাসিদেশের ট্রেনে চলাচল করতে কোনো অসুবিধে হয় না। এই চমৎকার ব্যবস্থা দেখে চমৎকৃত না হয়ে উপায় নেই। হাতে একটা ম্যাপ থাকলে কারুকে কিছু না জিগ্যেস করেও ইচ্ছে মতন যেকোনও ট্রেনে চলাফেরা করা যায়। শুধু একটু ধৈর্য লাগে,

প্রথম দু-একবার হয়তো স্টেশন ভুল হয়ে যায়। কিন্তু তাতে ক্ষতি নেই, এদেশে একবার ট্রেনে চাপবার পর বারবার স্টেশন বদলাবদলি করলেও অতিরিক্ত পয়সা লাগে না।

হোটেলে থাকার পয়সা নেই, তাই উঠেছি এক বাঙালির বাড়িতে। অসীম রায় মশাইয়ের সঙ্গে আগে থেকে একটু চেনা ছিল, তিনি দয়া করে আশ্রয় দিয়েছেন। তাঁর বাড়ি একটু শহরতলিতে, প্যারিস থেকে কুড়ি-পঁচিশ মাইল দূরে। এদেশে শহরতলিতে থাকার তো কোনও অসুবিধে নেই, আমাদের কলকাতার মতন তো হাওড়া-শিয়ালদার দুই বিরাট সিংহ দরজা দিয়ে শহরে ঢুকতে হয় না লোকাল ট্রেন নামক আলুর বস্তায় বন্দি হয়ে।

অসীমবাবু প্রথম দিন একটু ট্রেনের ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিলেন, তারপর থেকে আমি স্বাধীন। যখন খুশি যাই আসি। জানি যে, যে-কোনও স্টেশনে নেমে দাঁড়ালেই পনেরো-কুড়ি মিনিটের মধ্যে ট্রেন আসবেই। ট্রেনে জায়গা পাওয়ার কোনও সমস্যা নেই। যেকোনও স্টেশন থেকেই দু-তিন বার ট্রেন বদলে আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছোতে পারব। এক টিকিটেই যতবার খুশি ট্রেন বদলানো যায়। প্রত্যেক স্টেশনেই বিভিন্ন লাইনের ট্রেনের সব স্টেশনের তালিকা লেখা আছে বড়-বড় অক্ষরে।

এক-একটা স্টেশনকে মনে হয় ভূতুড়ে স্টেশনের মতন। কুলি-কামিন তো নেই বটেই, ইস্টিশন মাস্টার নেই, টিকিট চেকার নেই, এমনকী টিকিট ঘরও নেই। টিকিট কাটার যন্ত্র আছে, সেখানে পয়সা ফেললে টিকিট বেরিয়ে আসবে। পাতলা কাগজের টিকিট। গেট দিয়ে ঢোকার মুখে একটা ফুটোর মধ্যে সেই টিকিটটা ঢুকিয়ে দিলেই একটু দূরের আর একটা ফুটো দিয়ে টিকিটটা বেরিয়ে আসবে। সেখানে যে লোহার ডান্ডাটা পথ আটকে ছিল, সেটাও সরে গিয়ে পথ করে দেবে সঙ্গে -সঙ্গে।

আগের দিনের একটা পুরোনো টিকিট ঢুকিয়ে দিলে কিন্তু সেটা আর বেরিয়ে আসবে না। ডান্ডাটাও সরে যাবে না। ঠিক চিনতে পারে। আবার এখানে সাত দিনের জন্য সিজন টিকিট কিনতে পাওয়া যায় বেশ সস্তা, সে-ও একখানাই পাতলা কাগজের টিকিট, আপাত দৃষ্টিতে দৈনিক টিকিট আর সিজন টিকিটের চেহারার কোনও তফাত নেই, গেটের ফুটোয় সেই টিকিট ঢোকালে গেটের যন্ত্র ঠিক বোঝে, দরজা খুলে টিকিটখানা ফেরত দেয়। সাত দিনের বেশি আট দিন ব্যবহার করতে গেলেই টিকিটখানা হজম হয়ে যাবে। আজব কাণ্ড একেই বলে।

স্টেশনে ঢোকবার গেট মাত্র কোমর সমান উঁচু। ডান্ডা খুলুক বা না খুলুক লাফিয়ে পেরিয়ে যাওয়া কিছুই শক্ত নয়। একটু হাই-জাম্প দিতে পারলেই হয়। তা ছাড়া দেখবার তো কেউ নেই। এমনও হয়েছে যে-কোনও দুপুরে আমি এরকম কোনও স্টেশনে দ্বিতীয় কোনও যাত্রী পর্যন্ত দেখিনি। সুতরাং টিকিট না কেটেও কেউ হয়তো কখনও এরকম লাফিয়ে গেট পার হয়ে যায়। আমি একবারও চেষ্টা করিনি। যা সব ময়দানবের কারবার এদেশে। লাফিয়ে ডিঙোতে গেলে ওই লোহার ডান্ডাটাও লাফিয়ে উঠে মাথায় মারে কি না তাই-ই বা কে জানে!

বাঙালি পাঠক মাত্রই জানে যে প্যারিস শহরের ট্রেনের নাম মেত্রো, এবং তা মাটির নীচে। শহরতলির ট্রেন কিন্তু বেশিরভাগ জায়গাতেই মাটির ওপর দিয়ে যায়, দু-ধারের সব দৃশ্য চোখে পড়ে। তবে শহরতলিতেও অনেক স্টেশনই বেশ উঁচুতে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসতে হয়। আমার স্টেশনটা সেই রকম। একদিকে সিঁড়ি, অন্যদিকে এলিভেটর। সে এলিভেটর সারা দিন আপনাআপনি চলছে, লোক থাকুক বা না-ই থাকুক। এমনও হয়েছে যে দুপুরবেলা ট্রেনে চেপে দেখেছি, গোটা ট্রেনে সবশুদ্ধ দশ-পনেরো জন যাত্রী, আমার কামরায় আমিই আলেকজান্ডার সেলকার্ক!

ভূতুড়ে স্টেশন এই জন্য বলছি যে, স্টেশন মাস্টার, কুলি, টিকিটবাবু এইসব কিছু নেই তো বটেই, সিগন্যাল বদলটদলও আপনা-আপনি হয়। সবই নাকি কমপিউটার নামক দৈত্যের কীর্তি। ট্রেন একেবারে কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময় প্লাটফর্মের ঠিক নির্দিষ্ট জায়গায় এসে থামে। আপনা-আপনি দরজা খুলে যায়, ঠিক এক মিনিট পরে আবার আপনিই দরজা বন্ধ হয়ে যায়, ট্রেন চলতে শুরু

করে। আমার ধারণা, এই সব ট্রেনের কোনও ড্রাইভার থাকে না, অন্তত তাদের চোখে দেখা যায় না। আমি তো কখনও দেখিনি।

কামরার দুপাশে বিরাট-বিরাট কাচের জানলা। এক-এক সময় মনে হয় পুরো ট্রেনটাই কাচ দিয়ে তৈরি। কাচের এত বেশি ব্যবহার যে সম্ভব, ভারতবর্ষের বাইরে না এলে বোঝা যায় না। আমস্টারডার্মের ভ্যানগগ মিউজিয়ামের চার-পাঁচতলা বাড়িটার সব দেয়ালই তো বলতে গেলে কাচের। পুরোনো মিউজিয়ামগুলোর সামনে বিশাল মোটা-মোটা থাম, পুরু দেওয়াল, অট্টালিকার সৌন্দর্যই প্রথমে চোখ টানে। মনে হয় রাজপ্রাসাদ। লুভ্‌র্‌ মিউজিয়াম তো এককালে ফরাসি সম্রাটদের রাজপ্রাসাদই ছিল। সেই তুলনায় আধুনিক শিল্প ভবনগুলি অতি ছিমছাম। প্যারিসের নবতম শিল্প ভবন, যেটি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পঁমপিদু-র নামে নামাঙ্কিত, সেই বাড়িটির স্থাপত্য নিয়ে তো দেশ-বিদেশে পক্ষে-বিপক্ষে বহু আলোচনাই হয়েছে। অনেকে এখনও খেদের সঙ্গে বলেন, ওটা দেখলে কি আর্ট গ্যালারি মনে হয়, না কারখানা?

দূর থেকে পঁমপিদু সেন্টার দেখে প্রথমে আমিও খানিকটা হতাশ হয়েছিলুম বটে, প্রথম নজরে কারখানার মতনই মনে হয়। কিংবা মনে হয় একটা অসমাপ্ত অট্টালিকা, এখনও অনেক কাজ বাকি; শুধুমাত্র কঙ্কালটা তৈরি হয়েছে। চতুর্দিকে মোটামোটা পাইপ, আর নানা রকম তার ঝুলছে, দেওয়াল-টেওয়াল তোলা হয়নি। পরে, ভালো করে ঘুরে দেখে আমি বাড়িটির প্রতি রীতিমতন মুগ্ধ হয়ে পড়ি। মনে হয় যেন ভবিষ্যৎকালের ভাস্কর্য, আগামী শতাব্দীর কোন প্রাসাদে এসেছি। অত বড় বাড়িতে সত্যিই কোনও দেওয়াল নেই, সবই জানলা, ইস্পাত আর কাচ ছাড়া সিমেন্ট-কংক্রিটের ব্যবহারই হয়নি। বাড়িটাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে আছে কাচের সুড়ঙ্গ, যার নাম স্যাটেলাইট, তারমধ্যে আছে চলন্ত সিঁড়ি। প্যারিসের নতুন বিমান বন্দরেও এই স্যাটেলাইটের খুব প্রাবল্য। প্রায় মাইলখানেকের পথ এক পা-ও না হেঁটে পার হওয়া যায়। যেকোনও মিউজিয়ামে বা আর্ট গ্যালারিতে ঘোরাঘুরি করতে-করতে পা ব্যথা হয়ে যায়, পঁমপিদু সেন্টারে সে অসুবিধে নেই, মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে, সিঁড়ি দৌড়োয়।

প্যারিস-মুখী ট্রেনের কাচের জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে নিজের দেশের কথা মনে পড়ে। বেশ মনে আছে, ছেলেবেলায় আমরা প্রায়ই ট্রেনের জানলা দিয়ে ওঠানামা করতুম। তখন অত আগে থেকে রিজার্ভেশানের ব্যবস্থা ছিল না, যে আগে উঠে দখল করতে পারে, তারই জায়গা। পুজোর সময় দেওঘর-মধুপুরে যাবার সময় প্রত্যেক কামরার কাছে ভিড় ঠেলাঠেলি, সেই সময় বাবা-কাকারা আমাদের মতন ছোটদের চট করে জানলা গলিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেন।

এখন সব ট্রেনের জানলায় লোহার গরাদ। তাতে জানলা দিয়ে লোকজনের ওঠানামা বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু আর একটা জিনিস বন্ধ করা যায়নি। বছরখানেক আগে আমি একদিন মেচেদা লোকালে চেপে হাওড়া ফিরছিলুম, তখন ঠিক দুপুর। কামরায় যথেষ্ট ভিড় থাকলেও আমি সৌভাগ্যবশত জানলার পাশে একটা সিট পেয়ে দুধারের পানা-পুকুর ও সদ্য ধানকাটা শূন্য প্রান্তরের সৌন্দর্য উপভোগ করছিলুম, এমন সময় থপ করে এক তাল গোবর আমার কানের পাশে ও ঘাড়ে এসে লাগল। এমনই চমকে উঠেছিলুম যে মনে হয়েছিল কেউ আমায় গুলি করেছে। সহযাত্রী অনেকেই হেসে উঠল, যারা দাঁড়িয়ে ঝুলতে-ঝুলতে যাচ্ছিল তাদের মনের ভাব যেন, খুব তো আরামে জানলার কাছে বসে যাওয়া হচ্ছিল, এবার হল তো? কয়েকজন বলল, তবু তো আপনার কিচ্ছু হয়নি, শুধু গোবর, এসব জায়গায় এই এত বড় সব থান ইট ছুড়ে মারে, এই তো পরশুদিনই একজনের মাথা ফেটে গেসল....।

এখানেও আমি এক দুপুরের ট্রেনের যাত্রী। এই কাচের ট্রেনে যদি কেউ ইট ছুড়ে মারে...কিন্তু কে মারবে, রাস্তায় তো একটাও লোক নেই! এই সব শহরতলি অঞ্চলে দুপুর কেন, সকাল বা সন্ধেবেলাতেও ক্বচিৎ পায়ে-হাঁটা মানুষ দেখা যায়। আর ফ্রান্সে এসে এ পর্যন্ত একটাও বাচ্চা ছেলে-

মেয়ে দেখেছি কি না মনেই পড়ে না। ছোট ছেলেমেয়েদের যে এরা কোথায় লুকিয়ে রাখে তা কে জানে!

বাইরের দুধারের দৃশ্যকেও দৃশ্য না বলে কাল্পনিক ছবি বললেই ভালো মানায়। পুতুলের বাড়ির মতন সব রঙিন, চুড়োওয়ালা বাড়ি। আমরা সমতল ছাদ দেখতে অভ্যস্ত, এদের সব বাড়ির ছাদ ত্রিকোণ। ফ্রান্সে আকাশ-ঝাড়ু বাড়ি অর্থাৎ স্কাই-স্ক্র্যাপার এখনও তেমন বেশি নয়। প্যারিস শহরে কয়েকটি উঠতে শুরু করেছিল, পরে, শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হবে বলে সেরকম বাড়ি তৈরি নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এখন শহরতলির দিকে সেরকম কিছু বাড়ি উঠলেও এখনও চোখকে তেমন পীড়া দেয় না। ট্রেনের জানলায় দুপাশে অধিকাংশ বাড়িই ছবির বাড়ির মতন। ফরাসিদের বাড়ির সামনে যাহোক ছোটখাটো একটা বাগান থাকবেই। সেই সব বাগানে প্রধান ফলের গাছ দুটি, আপেল ও ন্যাসপাতি। এ ছাড়া আঙুর, বেদানা, স্ট্রবেরি ইত্যাদি। আমরা বরাবর জানি, খুব অসুখ-বিসুখ করলে সান্ত্বনা হিসেবে ওই সব দামি ফল খেতে দেওয়া হয়। কিংবা হাসপাতালে কারুকে দেখতে গেলে নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সেই সব দুর্মূল্য ফল রাস্তার দুপাশে ঝুড়ি-ঝুড়ি ফলে আছে, এ কি আমাদের বাঙালি চোখে সহজে বিশ্বাস হয়।

এ ট্রেনের কামরায় আমি যখন উঠেছিলুম, তখন আর কেউ ছিল না। দু-স্টেশন পরে একজন বছরপঁয়তিরিশেক বয়েসের ভদ্রমহিলা উঠেছেন, তার তিন স্টেশন পরে একটি কুচকুচে কালো যুবক। তার শরীরটি এমনই মজবুত যে কয়েক পলক তাকিয়ে দেখতে হয়। মহিলাটি একটি রঙিন পত্রিকা খুলে রেখেছেন চোখের সামনে, আর যুবকটি পা ছড়িয়ে প্রায় ত্রিভঙ্গ মুরারি অবস্থায় বসে বেশ গলা ছেড়ে গান শুরু করে দিল। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ, এ দেশে কারুর কোনও ব্যবহারেই কেউ বাধা দেয় না। অন্যের খুব একটা অসুবিধে না হলেই হল। ট্রেনের কামরায় গান জিনিসটা নিশ্চয়ই কোনও অসঙ্গত ব্যাপার নয়। আমি তো আমার দেশে যখন লোকাল ট্রেনে চাপি, তখন ভিড় আর গরমের মধ্যে যখন যখন ভিখারিরা এসে গান শোনায়, সেইটুকু সময়ই স্বস্তি পাই। আমাদের লোকাল ট্রেন খানিকটা সহনীয় করে রেখেছে ওইসব গায়করাই।

এই কালো ছেলেটির গানের গলা বেশ ভালো। এমন সুদেহী একজন যুবকের কণ্ঠস্বরও যে এত সুরেলা হবে, তা যেন ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো সে একজন পেশাদার গায়ক। গানের কথাগুলি ফরাসি, সুতরাং আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না। কিন্তু সুরটা খুব বিষাদ মাখা। এই ছেলেটি ন্যাট কিং কোলের কোনও ভাইটাই নয়তো? প্রকৃতির কি বিচিত্র খেলা, গান আর ঘুঁষোঘুঁষির মতন দুটি পরস্পর বিরোধী ব্যাপার কুচকুচে কালো মানুষরাই প্রায় একচেটিয়া করে রেখেছে।

আবার নিজের দেশের কথা মনে পড়ল। তুলনাও এসেই যায়। ভাবা যায় কি, খড়দা কিংবা এঁড়েদা স্টেশান থেকে আমি লোকাল ট্রেনে চেপে শিয়ালদায় যাচ্ছি, কামরায় মাত্র তিনজন যাত্রী, তার মধ্যেও একজন আবার ন্যাট্ কিং কোলের ভাই, যে বিনা পয়সায় দুর্দান্ত গান শোনাচ্ছে। একটা দেশে যে কত লোক বেকার, তা বোঝা যায় দুপুরবেলার ট্রেনে বা রাস্তায় জনসংখ্যা দেখে। আমাদের দেশে তো প্রত্যেকটি নিশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে কয়েক হাজার জনসংখ্যা বাড়ে। ফ্রান্সে নাকি জনসংখ্যা কমতির দিকে। এদেশে নাকি যে মা বেশি সন্তানের জন্ম দেয়, সেই মা সরকারের কাছ থেকে টাকা পায়। সত্য, সেলুকাস!

দুপাশের রৌদ্র ঝলমল প্রকৃতি ছেড়ে ট্রেনটা যখন অন্ধকারে ডুব দেয়, তখন বুঝতে পারি প্যারিস শহরের হৃৎপিণ্ডের কাছাকাছি এসে গেছি। দিনে-দুপুরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে ট্রেন যাত্রা আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না। এবারে নামবার জন্য তৈরি হই।

এক সময় প্যারিসে লে আল অঞ্চলে একটি বিখ্যাত কাঁচা বাজার ছিল। আগেকার অনেক গল্প-উপন্যাসে সেই নৈশ বাজারের বর্ণনা আছে। এখন সেই প্রাচীন বাজার ভেঙেচুরে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে সেখানে সব নতুন হর্ম্য আর বিপণি তৈরি হয়েছে। সেটাই তো যুগের নিয়ম। কিন্তু আমি

ছেলেবেলায় একবার ক্যানিং শহরের রাতের বাজার দেখতে গিয়েছিলুম। প্রায় কুড়ি বছর পরে আবার ক্যানিং-এ গিয়ে দেখি, বাজারের চেহারা অবিকল একই রকম আছে, শুধু রাস্তাঘাট বেশি ক্ষয়ে গেছে আর জলকাদা বেড়েছে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসে জলকাদা মাখা প্যারিসের লে আল বাজারের যে বর্ণনা পড়েছি সে তুলনায় এখনকার লে আল চিনতেই পারা যায় না।

লে আল নামে দুটি স্টেশন আছে। একটি শুধু লে আল আর অন্যটি সাত্‌লে-লে আল। কিন্তু আমি যে ট্রেনে চেপেছি, তার কামরার নির্দেশনামা পড়ে দেখলুম, এ ট্রেন ও দুটো স্টেশনের কোনওটাই ছোঁবে না। যাবে শুধু সাত্‌লে নামে আর একটি স্টেশনে। চিন্তার কিছু নেই, ওই সাত্‌লে-তে নেমে ট্রেন বদলে আমার অভীষ্ট স্টেশনে চলে গেলেই হবে।

সবগুলো নয়। কিন্তু প্যারিসের মেট্রোর কয়েকটি স্টেশন এতই সুন্দর আর চাকচিক্যময় যে শুধু স্টেশনটাই ঘুরে-ঘুরে দেখতে ইচ্ছে করে। একতলা-দোতলা-তিনতলায় আলাদা-আলাদা লাইন তো আছে বটেই তা ছাড়া গঠন শৈলীও বড় অপরূপ। লুভ্‌র্‌ নামে স্টেশনটিতে নামলেই বোঝা যায় যে বিশ্ব বিখ্যাত মিউজিয়ামের পাড়ায় এসে পড়া গেছে। কারণ, স্টেশনেই সমস্ত বড়-বড় শিল্পীদের কাজের নমুনা রয়েছে। কোনও-কোনও স্টেশন যেন পাতালের রাজপুরী। এত আলো, এত সাজ সজ্জা, এত দোকানপাট যে মনেই থাকে না, মাটির দুতিন তলা নীচে রয়েছি।

সাত্‌লে স্টেশনটিও এরকম বৃহৎ ও সুসজ্জিত। সেখানে নেমে একটি বৃত্তান্ত জেনে চমৎকৃত হলাম। সেখান থেকে সাত্‌লে-লে আল যেতে হলে ট্রেন বদলেও যাওয়া যায়, অথবা দুই স্টেশনের মাঝখানে চলন্ত রাস্তা ও চলন্ত সিঁড়ি আছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়ালে বিনা পরিশ্রমেই পৌঁছনো যাবে। ধরা যাক, আমাদের বালি আর উত্তরপাড়ার মতন কাছাকাছি স্টেশন, ইচ্ছে করলে ট্রেনেও যেতে পারি, অথবা চলন্ত রাস্তাই আমায় নিয়ে যাবে।

আমি মস্কো যাইনি এখনও। প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনেছি, মস্কোর পাতালরেল নাকি আরও সুন্দর, স্টেশনগুলি প্রত্যেকটিই অপরূপ, মনোহর। আগে মস্কো যাই একবার, তারপর নিজের চোখে দেখে বিশ্বাস করব। আমি বিলেতে একাধিকবার গেছি বটে, কিন্তু কার্যকারণবশত একবারও টিউবে চড়া হয়নি। কেন জানি না, বিলেতের লোকেরা আমাকে বোধহয় কোনও মহারাজা-টহারাজা বলে ভুল করে। সেই জন্য গাড়িতে-গাড়িতে ঘোরায়। যাই হোক, বিলেতের টিউব ট্রেন সম্পর্কেও খুব একটা আহামরি প্রশংসা শুনিনি কারুর মুখে। নিউ ইয়র্ক বা শিকাগো সাবওয়ে চাপলে সর্বক্ষণ মনে হয় দমবন্ধ হয়ে আসছে। তা ছাড়া বেশ নোংরা। নিউ ইয়র্কের সাবওয়ের প্রত্যেক ট্রেনের ভেতরে-বাইরে হিজিবিজি দাগ কাটা। স্টেশনগুলো নিছক কালো, নিষ্প্রাণ, রাতের দিকে নিরিবিলিতে গেলে গা ছমছম করে। নিউ ইয়র্কের একমাত্র গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশন ছাড়া আর কোনও স্টেশনেরই কোনও সৌন্দর্য নেই। নিউ ইয়র্ক কিংবা শিকাগোর শহরতলির ট্রেন অবশ্য বেশ জমকালো, শিকাগোতে দোতলা ট্রেনও আছে। কিন্তু ভাড়া ভয়ানক বেশি। আর, দু-একটা জিনিস দেখলে আমাদেরও হাসি পায়।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে পৃথিবীর যে-কোনও দেশের তুলনায় আমেরিকার ট্রেন অনেক বেশি যন্ত্র নির্ভর হবে। কিন্তু ঠিক তার উলটো। শিকাগো বা নিউ ইয়র্কের শহরতলির ট্রেনে চাপা মাত্র চেকার এসে টিকিট দেখতে চায়। শহরতলির স্টেশনগুলো এঁড়েদা-খড়দার চেয়েও খারাপ। সব চেয়ে মুশকিল, রাত্তির বেলা ঠিক স্টেশন খুঁজে পাওয়া। স্টেশনগুলোতে টিমটিম করে আলো জ্বলে, কোথায় যে সে স্টেশনের নাম লেখা থাকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। ফ্রান্সের মতন প্রত্যেক কামরায় পরপর সব স্টেশনের নাম লেখাও থাকে না। সেইজন্য, এই যন্ত্রযুগেও, প্রতিটি স্টেশন এলে ট্রেনের কন্ডাক্টরবাবু হেঁড়ে গলায় সেই স্টেশনের নামটা শুনিয়ে দেন। কিন্তু বাইরের লোকের পক্ষে সেই উচ্চারণ শুনে বোঝা অতি দুষ্কর। 'ম্যা ভ্যানন্‌' শুনে কার বাপের সাধ্য বোঝে, যে সেটা মাউন্ট ভার্নন? নিউ ইয়র্ক থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরের স্টেশনে এখনও কাঠের সিঁড়ির ওভারব্রিজ

আছে, প্যারিসে বসে যা বিশ্বাসই করা যায় না।

অবশ্য, গোটা আমেরিকাতেই এখন ট্রেন-ব্যবস্থা অতি মুমূর্ষু। অর্ধেক রেল-রুট এর মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে, দশ-পনেরো বছর পর হয়তো ট্রেন নামক প্রাণীটি এ দেশ থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে দেশ এখন আকাশে উড়ন্ত। কোথাও-কোথাও বাস ভাড়ার চেয়ে প্লেন ভাড়া সস্তা।

আমি প্যারিস ও শহরতলির ট্রেন ব্যবস্থার কথা সবিস্তারে লিখলুম এই জন্য যে কয়েক বছর পরেই তো কলকাতার পাতালরেল চালু হচ্ছে। তখন মিলিয়ে দেখতে হবে। আমার তো ধারণা, কলকাতার পাতালরেল প্যারিসের চেয়ে, এমনকী, মস্কোর চেয়েও সুন্দর ও আধুনিক হবে অনেক বেশি।

॥ ৫ ॥

প্যারিস থেকে লন্ডনে বিমানে উড়ে আসতে সময় লাগে একঘন্টা। দুই দেশের মধ্যে সময়ের ব্যবধানও একঘন্টা। অর্থাৎ বিকেল পাঁচটার প্লেনে প্যারিস থেকে যাত্রা করলে আবার বিকেল পাঁচটাতেই লন্ডনে পৌঁছোনো যায়। মাঝখানকার একটা ঘন্টা যে আমার আয়ু খরচ হয়ে গেল সেটা কী করে মেলাব কে জানে! কিংবা এই এক ঘন্টা আয়ু অন্য কোন সময়ে আবার ফেরত দিতে হবে।

হিথ্‌রো বিমানবন্দর সম্পর্কে আমাদের পূর্ব সংস্কার মোটেই ভালো নয়। অনেক রকম গল্প শুনেছি, খবরের কাগজেও অনেক রকম অপ্রীতিকর ঘটনার কথা পড়া আছে। ভারতীয়দের সেখানে নানারকম হয়রানি করা হয়, একবার আমাদের এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে পর্যন্ত ঢুকতে দেওয়া হয়নি, ভারতীয় মেয়েদের নাকি বিবস্ত্র করে কুমারীত্বের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি।

অনেকেই বিলেত যাওয়ার আগে এনট্রি পারমিট সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। আমার সেসব কিছুই নেই। হুড়ুড়-ধাড়ুস করে বেরিয়ে পড়া, ওসব জোগাড় করার সময়ই পাইনি। হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে আমার একটু-একটু অস্বস্তি বোধ হল। ঢুকতে দেবে তো?

অনেকদিন আগে, প্রায় বাল্যকালে আমি যখন লন্ডনে এসেছিলুম, সেবার আমার ছবি হাতে নিয়ে এক মেমসাহেব এই এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করেছিল আমার জন্য। আমাকে সে চেনে না, আমিও তাকে চিনি না, সেইজন্য আমার ছবি সে উঁচু করে তুলে ধরেছিল। এবার সেরকম কোনও ব্যাপার নেই, তা ছাড়া অবস্থাও অনেক বদলে গেছে। এখন যা সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে, তাতে আমার মনে হয়, কমনওয়েল্‌থ ব্যাপারটা ন্যাকামি ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য যে-কোনও দেশের মতন ব্রিটেনের সঙ্গেও ভারতের সরাসরি ভিসা ব্যবস্থা রাখাই উচিত। ভারতের অন্য কমনওয়েল্‌থ দোস্ত কানাডাও তো কয়েকদিন আগে ভারতীয়দের জন্য ভিসার সম্পর্ক করে দিল।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারে শ্বেতাঙ্গদের জন্য একরকম ব্যবস্থা, আর আমার মতন কালো বা খয়েরিদের জন্য অন্যরকম। দাঁড়ালুম একটা লাইনে। আগের লোকদের নানারকম জেরা করা হচ্ছে। তখনই ঠিক করে রাখলুম, যদি বেশি উলটোপালটা কথা বলে, সাফ বলে দেব, যাব না তোমাদের দেশে, যাও! বিলেত যেতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি। ফেরার টিকিট পকেটেই আছে, পরের প্লেনেই ফিরে যাব।

আমার কাউন্টারে এক তরুণী মেম। ব্যবহারের হেরফেরের জন্য সুশ্রী মুখকেও যে কত অসুন্দর লাগে, তা বোঝা যায় এই সময়। মেয়েটির বয়েস পঁচিশের বেশি না, চোখ-নাক-ঠোঁট সবই সুন্দর, কিন্তু মুখে একটুও হাসি নেই, আর কী কঠোর দৃষ্টি! আমার পাসপোর্টটা বেশ খানিকক্ষণ উলটোপালটা দেখল, তারপর নীরব নীরস গলায় বলল, তুমি লন্ডনে এসেছ কেন?

কেন? সেরকম তো কোনও গূঢ় জরুরি উদ্দেশ্য নেই। সাঁওতাল পরগনা কিংবা সুন্দরবনে

যাই কেন? সেইরকমই আলগা উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি। এসেছি আমার বাল্যবন্ধু ভাস্করের সঙ্গে আড্ডা দিতে আর পিকাসোর একটা আলাদা ধরনের ছবির প্রদর্শনী হচ্ছে সেটা দেখতে। কিন্তু এই কথা কি এই রূঢ়লোচনা যুবতীটি বিশ্বাস করবে? নাকি বলব, ওগো, আমি তোমাদের দেশে চাকরিও খুঁজতে আসিনি কিংবা বেশিদিনের জন্য তোমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটির ভারবৃদ্ধিও করতে চাই না।

সে কথা না বলে আমি শুধু বন্ধুর সঙ্গে আড্ডা আর ছবির প্রদর্শনীর কথাই জানালুম। মেয়েটি কয়েকপলক তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। আমি ভাবলুম, এবার সে নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে সেই বন্ধুর ঠিকানা কিংবা তার কোনও চিঠিপত্র দেখতে চাইবে। কাঁধের ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে চিঠি খুঁজছি, মেয়েটি অকস্মাৎ তার চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল।

তারপর সে আর আসে না, আসেই না। আমি দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাসপোর্টটা তার টেবিলের ওপর রাখা। একটুবাদে পাশের কাউন্টার থেকে একজন উঠে এসে আমার পাসপোর্টটা নেড়েচেড়ে দেখে বলল, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? তোমায় তো ছেড়ে দিয়েছে।

খানিকটা বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে আমি দিব্যি বেরিয়ে গেলুম বাইরে, আর কেউ একটাও প্রশ্ন করল না।

হিথরো এয়ারপোর্টে যে আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে তা আমি বলতে পারি না। একটিমাত্র প্রশ্ন করে আমায় ছেড়ে দিয়েছে, কোনওরকম কাগজপত্রও দেখতে চায়নি। কিন্তু ওই মেয়েটি একবারও হাসল না, আর হঠাৎ উঠে চলে গেল কেন? ওই তাচ্ছিল্যটাই ভীষণভাবে গায়ে বেঁধে।

ভাস্কর বাইরেই দাঁড়িয়েছিল, উঠলুম ওর গাড়িতে। ও আবার শুধুমাত্র বাঁ-হাতের দুটো আঙুল স্টিয়ারিং-এ রেখে গাড়ি চালায়। রাস্তার লোকজনদের ও ধুলো জ্ঞান করে। অনেকদিন আগে ভাস্কর দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে বিলেতে এসেছিল। ইংরেজ মুচি দিয়ে জুতো পালিশ করাবে আর লন্ডনে নিজের নামে একটা রাস্তা করে দিয়ে তারপর দেশে ফিরবে। ওর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি প্রায় সফল হয়ে এসেছে।

কয়েকদিন তো তুমুল আড্ডা ও ঘোরাঘুরি হল। কিন্তু আমার মাঝে-মাঝেই মনে পড়ে ইমিগ্রেশান কাউন্টারের সেই মেয়েটির কথা। কেন সে অমন অদ্ভুত ব্যবহার করল? তার চোখে আমি কি একটা মানুষ না? রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে কিংবা যে-কোনও জায়গায় কোনও ইংরেজ নারী-পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমার দ্বিধা হয়, যদি ওই রকম নীরব অভদ্রতা দেখায়।

মন ভালো করার জন্য গেলুম রাজকীয় শিল্প প্রদর্শনী ভবনে। টেম্‌স নদীর ধারে লন্ডন ব্রিজের অদূরে নতুন তৈরি হয়েছে একই সঙ্গে নাট্যশালা, শিল্প প্রদর্শনী ভবন, চলচ্চিত্র ও কনসার্ট হল মিলিয়ে বিশাল এক সুরম্য হর্ম্য। সঙ্গে আছে রেস্তোরাঁ, অথবা ইচ্ছে করলে ছাদে বসে নদী ও নগরীর শোভা দেখতে-দেখতে নিজস্ব ওয়াইন ও স্যান্ডউইচের জলখাবার সেরে নেওয়া যায়।

এখানেই মহাসমারোহে চলছে পিকাসোর প্রদর্শনী, যার নাম পিকাসো'জ পিকাসো। অর্থাৎ পিকাসোর নিজের কাছে তাঁর নিজের আঁকা সারা জীবনের যে ছবির সঞ্চয় ছিল, তার উত্তরাধিকারীরা এই প্রথম তা বার করে দেখাচ্ছেন সর্বসাধারণকে। নিজের ছবির ব্যাপারে পিকাসো খুব আঁটিসুঁটি ছিলেন, অনেক ছবি ব্যাঙ্কের ভল্টে রেখে দিতেন, তা সবাই জানে। এই প্রদর্শনীটি বিশাল তো বটেই, এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পিকাসোর প্রথম যৌবন থেকে তার পরবর্তী শিল্পী-জীবনের পরিবর্তনগুলো পরিষ্কার বোঝা যায়।

এই সব ছবি সম্পর্কে বিশদ করে কিছু বলা আমার সাজে না। সে ভার রয়েছে শিল্পবোদ্ধাদের ওপর। আমি সাধারণ মানুষ, ছবি দেখতে ভালো লাগে তাই দেখি। তবু একটা কথা না বলে পারি না। ছবিগুলো দেখতে-দেখতে অনেক সময় যেমন বিস্মিত হয়ে যাই; তেমনি মাঝে-মাঝে আবার মর্মাহতও হতে হয়। অনেক ছবিতেই পিকাসোর শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে হতবাক হয়ে যাওয়ার মতন, মনে হয় এ-লোকটা মানুষ নয়, দৈত্য, রেখা-রং-আয়তনকে ব্যবহার করার এক অলৌকিক

শক্তি ছিল এর দখলে। নইলে এত বিস্ময়কর আর এত বেশি ছবি একটা মানুষ আঁকতে পারে এক জীবনে? আবার অনেক ছবি দেখে একথাও মনে হয়, এসব কি ছবি, না ইয়ার্কি? পৃথিবীর যাবতীয় শিল্প-বোদ্ধাদের বোকা বানাবার জন্য পিকাসো এসব নিজস্ব মজা করেছেন। এ কথাও বলতে ইচ্ছা করে, জীবনের অর্ধেক পর্যন্ত এই লোকটা প্রকৃত শিল্পী ছিল, বাকি জীবনটা ছিল উন্মাদ, আর স্রেফ প্রচারের জোরে বিশ্বের এক নম্বর শিল্পী হয়েছে।

একখানা বিকট মুখের সামনে দাঁড়িয়ে আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, কী বুঝছিস? এটাও শিল্প?

ভাস্কর বললে, ব্যাটাচ্ছেলে এখান থেকে ফর্ম ভাঙা শুরু করেছিল। এরপর থেকে ও মানুষকে ক্রমাগত ভেঙে তুবড়ে দিয়েছে।

আমি বললুম, কিন্তু যে ছবি দেখে ভয় হয় কিংবা মুখ ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হয়, সেরকম ছবি আঁকার মানে কী?

—ছবির বুঝি মানে থাকে?

ক্রমশ ভাস্কর আর আমি দূরে দূরে সরে গেলুম। আমার গোড়ার দিককার ছবি দেখতেই ভালো লাগছিল। মনে হয় যেন নারীজাতি সম্পর্কে পিকাসোর সারাজীবনের কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। প্রথমদিকে নগ্ন নারী শরীর নিয়ে তিনি অনেক কাণ্ড করেছেন। কিন্তু সেই সব নারীরা আমাদের কাছে কোনও ভাষাই প্রকাশ করে না। একজন ভাঙাচোরা চেহারার বৃদ্ধ বেহালাবাদকও পিকাসোর ছবিতে কত বাঙ্ময়, সেই তুলনায় পিকাসোর নারীরা শুধুই যৌন-অবয়ব।

একজোড়া ব্রিটিশ দম্পতি মনোযোগ দিয়ে একটি ছবি দেখছিল, আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সরে গেল অন্যদিকে। তখন খেয়াল করলুম, আরও দু-একটা ছবি দেখার সময় আমি যেতেই এরা সরে গেছে। আমার ছায়া গায়ে লাগলে কি ওদের এঁটো হয়ে যাওয়ার ভয়? শিল্প প্রদর্শনীতে সাধারণত এমনভাবে আলোর ব্যবস্থা থাকে যাতে কারুর কোনও ছায়া না পড়ে। তবে কি আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের হাওয়া ওদের গায়ে লাগলে গা জ্বলে যায়?

কিংবা এমনও হতে পারে, এটা আমার মনের ভুল। নিছক কাকতালীয়। আমি পাশে দাঁড়িয়েছি। ওরা এমনিই অন্য ছবির কাছে চলে গেছে। ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য এবারে আমি ইচ্ছে করে আবার ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালুম। পুরুষটি তার সঙ্গিনীকে কী যেন বোঝাচ্ছিল, মাঝপথে কথা থামিয়ে ওরা সরে গেল তাড়াতাড়ি। এটাও কাকতালীয়? আমার আবার মনে পড়ে গেল, এয়ারপোর্টের কাউন্টারের সেই তরুণীটির মুখ।

বিলেতে সকলেরই দু-চারজন পরিচিত ইংরেজ থাকে। কোথাও কোনও কবির সঙ্গে দেখা হয়, কোনও বন্ধুর সাহেব-মেম, বন্ধু-বান্ধবীর সঙ্গে আলাপ হয়। তারা কি কথা বলে না? হাসে না? তা কেন করবে না? হাতে হাত ঝাঁকায়, অনর্গল গল্প করে।

কিন্তু অন্য কোথাও অপরিচিত ইংরেজের সঙ্গে চোখাচোখি হলেই, আমি যেন টের পাই, তারা সঙ্গে-সঙ্গে মুখে একটা কঠিন আবরণ টেনে আনে। সারা শরীরে ফুটে ওঠে অপছন্দের ইঙ্গিত। ইংরেজ জাতি এমনিতেই থাকে খোলসের মধ্যে, চট করে কোনও অচেনার সঙ্গে ভাব করে না, কিন্তু আমাকে দেখামাত্র কেন কোনও ইংরেজের হাসি-হাসি মুখ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যাবে? কলকাতার রাস্তায় কোনও সাহেবকে দেখলে আমি তো মুখ গোমড়া করি না।

আর একদিন একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেছি, পাশের টেবিলে এক প্রৌঢ় দম্পতি। আমরা বসবার খানিকটা পরেই সেই দম্পতি তাদের খাবার অসমাপ্ত রেখে উঠে চলে গেল। যতক্ষণ তারা বসেছিল, ততক্ষণ তারা একটিবারের জন্যও আমাদের দিকে চায়নি। আমি চোরা চাহনিতে ওদের লক্ষ করছিলুম, ওরা পরস্পর একটাও কথা বলেনি পর্যন্ত।

আমি ভাস্করকে জিগ্যেস করলুম, ওরা হঠাৎ উঠে গেল কেন রে?

ভাস্কর বলল, নিশ্চয়ই বড় বাথরুম।

আমি বললুম, আমাদের পাশে বসে খাবে না, সেইজন্য উঠে গেল?

ভাস্কর আমার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন আমি একটা উদ্ভট কথা বলছি।

তাহলে কি এটাও আমার মনের ভুল? হয়তো ওরা এমনিই উঠে গেছে। আমরাও অনেক সময় পুরো খাবার খাই না। কিংবা ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া চলছিল। কিংবা ওরা স্বামী-স্ত্রী নয়, লোকটি এসেছে পরস্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, দূরে, অন্য কোনো লোককে দেখে উঠে গেছে।

কিংবা, ভাস্কর চোদ্দো-পনেরো বছর ধরে আছে বলেই ওর এসব চোখে পড়ে না, আমি নতুন এসেছি বলেই টের পাচ্ছি। কিংবা এয়ারপোর্টের সেই মেয়েটি আমার মাথার মধ্যে এই চিন্তা ঢুকিয়ে দিয়েছে।

শুনেছি, একসময় আমাদের দেশের ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাসের কামরায় কোনও ভারতীয়কে দেখলে ইংরেজরা জোর করে নামিয়ে দিত। ইংরেজদের জন্য আলাদা পাড়া, আলাদা ক্লাব, আলাদা সুইমিংপুল ছিল, যেখানে ভারতীয়দের তারা ঢুকতে দিত না। ইংরেজদের সেই প্রতাপ অনেকদিন আগেই শেষ হয়ে গেছে। এখন খোদ লন্ডন শহরে বসে ভারতীয়রা ইংরেজ পুলিসদের ঠ্যাঙানি দেয়। আমাদের মতন কালো মানুষদের গায়ের জোরে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে না বলেই কি ওরা এখন নিজেরাই দূরে-দূরে সরে যায়? নিজের দেশে বসেও!

জওহরলাল নেহরু যে স্কুলে পড়তেন, সেই হ্যারো স্কুলের কাছাকাছি আমার বন্ধুর বাড়ি। ছোট টিলার ওপর স্কুল, তার পাশের উপত্যকাটি বসতি এলাকা। বেশ শান্ত, নির্জন পাড়া। লন্ডনে দাঙ্গাহাঙ্গামা হলে আমরা কলকাতায় বসে উদ্বেগ বোধ করি আমাদের চেনাশুনো বন্ধুদের জন্য। কিন্তু সেরকম কোনও গোলমাল এই মিডলসেক্সে হয়নি। সেরকম পাড়া আছে লন্ডনে যেখানে সন্ধেবেলা রাস্তায় হাঁটলে মনে হতে পারে গুজরাট কিংবা পাঞ্জাবে চলে এসেছি। শুধু হিন্দি জানলেই সেখানকার দোকান-টোকানে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়। সিঙারা-কচুরির গন্ধ রাস্তায় ভুরভুর করে। একলা কোনো ইংরেজকে ক্বচিৎ দেখা যায় সেসব পাড়ায়।

কিন্তু আমরা যেখানে আছি সেটা পুরো সাহেবপাড়া। দু-একজন বাঙালির বাড়ি আছে এখানে।

সন্ধেবেলা জমিয়ে আড্ডা হচ্ছে, আরও কয়েকজন এসেছেন, কথায়-কথায় আমরা চলে যাচ্ছি প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে। একসময় অশোক বলল, ভাস্করদা, আপনার চেনা কেউ বাড়ি কিনবে? আমাদের পাশের বাড়িটা বিক্রি আছে, বেশ সস্তায় ছেড়ে দিচ্ছে...

ভাস্কর বলল, তোমাদের পাশের বাড়ি? কোনটা? সেই বুড়োর, জেম্‌সন না কী যেন নাম...

—হ্যাঁ সেই বাড়িটা!

—মাত্র তো বছরদেড়েক আগে বাড়িটা বানাল...সুন্দর বাগান করেছে, আমি একদিন দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলুম, বুড়োর সঙ্গে আলাপও হল,...হঠাৎ বাড়িটা বিক্রি করে দেবে কেন?

—তার পরের বাড়িটাতে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি এসে উঠেছে।

—কবে?

—গত মাসে। ওরা সে বাড়িটা কিনেছে কি না বোঝা যাচ্ছে না, মোটকথা উঠেছে একটা নিগ্রো ফ্যামিলি (ওদেশে এখন নিগ্রো কথাটা উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ, বলতে হয় ব্ল্যাক)...

—সেইজন্য বুড়ো তার অত শখের বাড়ি বেচে দেবে?

—মিসেস জেম্‌সনের একটু ইচ্ছে নেই, অত যত্ন করে বাগান করেছে, কিন্তু বুড়ো জিদ ধরেছে কোনও নিগ্রোর পাশে সে কিছুতেই থাকবে না। আমাদের সঙ্গে অবশ্য বুড়ো কোনওদিন খারাপ ব্যবহার করেনি...কিন্তু নিগ্রো শুনেই...

আমি মুচকি হাসলুম। বুড়ো জেম্‌সন কোনওক্রমে খয়েরি ভারতীয়দের প্রতিবেশী হিসেবে সহ্য করেছিল, কিন্তু কুচ্‌কুচে কালো ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান তার পক্ষে অসহ্য। খোদ লন্ডন শহরে বসেও

পাশের বাড়ি থেকে একটা নিগ্রো পরিবারকে তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই, সেইজন্য রাগ করে, সে নিজের বাড়ি ছেড়ে দূরে সরে যাচ্ছে।

এত সরতে-সরতে শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা কোথায় যাবে?

॥ ৬ ॥

ব্রিটিশ মিউজিয়াম একদিনে দেখে ফেলা আর পাঁচ মিনিটে মহাভারত পড়ে শেষ করা একই ব্যাপার। অদ্ভুতকর্মা প্রতিভাবানদের পক্ষেই শুধু তা সম্ভব।

সব কিছুই যে দেখতে হবে, সে রকম মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। গপগপ করে গিলে খেলে কোনও খাবারেরই স্বাদ পাওয়া যায় না।

আমি অলসভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম ব্রিটিশ মিউজিয়ামের পাণ্ডুলিপি বিভাগে, হঠাৎ মনে হল, একটু চা-ফা খেলে মন্দ হয় না। শিল্প নাকি মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়ে দিতে পারে, আমার তো দেখছি উলটো ব্যাপার। দু-একঘণ্টা বাদে-বাদেই চায়ের তেষ্টা পায়। তা ছাড়া এইসব জায়গায় সিগারেট টানা যায় না, মাঝে-মাঝেই বাইরে যাওয়ার ছুতো খুঁজতে হয়। ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই এক জায়গায় স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের ছবি দেখে আমি মনে-মনে বলেছিলুম, কেন দাদা তামাকের ধোঁয়া টানার ব্যাপারটা চালু করেছিলে? এখন আমরা ওই নেশার দাস হয়ে গেছি আর রাজ্যের লোক আমাদের ক্যানসারের ভয় দেখাচ্ছে।

রাস্তা খুঁজে ক্যান্টিনে পৌঁছে লন্ডনের বিখ্যাত বিস্বাদ স্যানডুইচ আর ট্যালটেলে চা নিয়ে বসলুম। এত খারাপ খাবার খেয়েও ব্রিটিশ জাতি যে কী করে বিশ্বজয় করেছিল, তা ভাবলে অবাক লাগে। মোগলদের বুঝি, তারা মোগলাই খানা খেয়েছে, সেই রকম জবরদস্ত লড়াইও করেছে। আর ব্রিটিশরা নাকি সমরক্ষেত্রের তাঁবুতেও সন্ধেবেলা পোশাক না বদলে ডাইনিং টেবলে যেত না। ডাইনিং টেবলে গিয়ে যত রাজ্যের আলুনি-আঝালি সেদ্ধ খাবার খেত! লন্ডন শহরের পাড়ায়-পাড়ায় প্রচুর 'ফিস অ্যান্ড চিপসের' দোকান দেখতে পাওয়া যায়। মাছ জিনিসটাকেও যে কত অখাদ্য করা যায়, তার প্রমাণ দিয়েছে ইংরেজরা।

বিলিতি চা মানে তো আসলে আমাদেরই বা বাংলাদেশি বা সিংহলি চা। তবু এখানে চা খেয়ে যেন কিছুতেই দেশের মতন স্বাদ পাই না। একমাত্র সিগারেটের স্বাদটা এদেশে ভালো। তাও আমার মতন চার্মিনার খোরদের পক্ষে বেশ মুশকিল। এদেশে চার্মিনার বা সমতুল্য কোনও সিগারেট পাওয়া যায় না।

আমার থেকে দুটো টেবিল দূরে তিনটি ছোকরা বসে বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে। চেহারা দেখে বোঝা যায় ওরা ভারতীয়, কিন্তু বাঙালি নয়, কারণ ওদের পারস্পরিক ভাষা ইংরেজি। আমার সঙ্গে একবার চোখাচোখি হল কিন্তু আমাকে পাত্তাই দিল না। প্রবাসে ভারতীয় মাত্রই ভারতীয়ের আত্মীয় নয়। অচেনা সাহেবেরা অনেক সময় ডেকে কথা বলে, কিন্তু এক ভারতীয়ের সঙ্গে অন্য ভারতীয়ের দেখা হলে দুজনেই মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি ওদের আলোচনা শুনছিলুম। যুবক তিনটিই চাকরি করে জার্মানিতে, ছুটিতে বেড়াতে এসেছে, কিন্তু লন্ডন ওদের একটুও ভালো লাগছে না। ওদের কথা শুনে আমি রীতিমতন চমৎকৃত হলুম। লন্ডন ওদের ভালো লাগছে না, কারণ এখানে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত বেশি, শহরটাও নোংরা, ছোট-ছোট রাস্তা, বড্ড ভিড়, খাবারদাবারের সুবিধে নেই, হোটেলের ঘরটা খুব ছোট আর বন্ধ, পাঁচবার ডাকলেও কারুর সাড়া পাওয়া যায় না...। আমি একবার ভাবলুম, ওরা কি কলকাতার বর্ণনা দিচ্ছে?

দ্বিতীয় সিগারেটটি সবে শেষ করেছি, এই সময় দূর থেকে একজন মধ্যবয়সি ভদ্রলোক হেঁটে এলেন আমার দিকে। দু-দিন ধরে বেশ গরম পড়েছে লন্ডনে, আমার মতন যারা সদ্য আগত, তারা প্রায় সবাই শুধু হাওয়াই শার্ট পরে বেরিয়েছে, কিন্তু এই ভদ্রলোকের পরনে পুরোদস্তুর সুট-টাই। মুখে পাইপ। আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তিনি প্রথমে আপাদমস্তক আমায় নিরীক্ষণ করলেন, তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, আপনি...তুমি...নীলু না? দেবপ্রিয়র ভাইপো? তখন থেকে মনে হচ্ছে চেনা-চেনা।

ভদ্রলোকের গায়ের রং এত পরিষ্কার আর হাবভাব এত সাহেবি যে আমি স্প্যানিশ বা ইটালিয়ান ভেবেছিলুম। কিন্তু ওঁর বাংলা উচ্চারণে একটুও টান নেই।

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো আমি...

উনি বললেন, দেবপ্রিয়র সঙ্গে আমি পড়তুম। তা ছাড়া, তুমি পদ্মনাথ লেনে আমাদের পাশের বাড়িতে খুব আসতে, ভাস্করের বন্ধু ছিলে...তোমাকে হাফ-প্যান্টুল পরা অবস্থায় দেখেছি...

আমি সবিস্ময়ে বললুম, নীতিশদা?

উনি বললেন, ঠিক ধরেছ। তাহলে তোমার সঙ্গে একটু বসি? আমার হাতে আরও মিনিট কুড়ি সময় আছে।

নীতিশদার মাথার চুল কাঁচাপাকা হয়েছে, চোখের নীচে ভাঁজ পড়েছে, কিন্তু চিনতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। চোখ দুটি বেশি ঝকমকে, অতি তীক্ষ্ণ নাক, এই রকমই দেখেছি ছেলেবেলায়। নীতিশদার দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। উনি ঘুড়ি ওড়াতে খুব ভালোবাসতেন এবং ইংরেজির দুর্ধর্ষ ছাত্র ছিলেন। আমরা জানতুম, নীতিশদার প্রথম থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত পুরো হ্যামলেট মুখস্ত। কিন্তু শেষ যতদূর জানতুম, উনি চাকরি করতেন পুণায়।

অবশ্য লন্ডনে এসে যে-কারুর সঙ্গে দেখা হলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেকোনও সময় যে-কারুর বাবার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে, এবং তিনি জিগ্যেস করতে পারেন, আরে; তুই এখানে?

অবশ্য, আমার বাবা বেঁচে নেই এই যা। আমার বাবার সঙ্গে অন্তত দেখা হবার সম্ভাবনা নেই লন্ডনে।

নীতিশদা জিগ্যেস করলেন, তুমি এখানে কী করছ?

আমি বললুম, ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

—চাকরি-বাকরি পাওনি?

—না, আছে নাকি আপনার সন্ধানে?

নীতিশদা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে পাইপ ধরালেন। আমি একসময় নীতিশদাকে গুরুজনের মতন সম্ভ্রম করতুম, কিন্তু প্রবাসে নিয়ম নাস্তি এই ভেবে ফস করে জ্বেলে ফেললুম আর একটি সিগারেট।

—আপনি এদেশে কতদিন আছেন, নীতিশদা?

—তা বছর বারো হবে। ঠিক হিসেব ধরতে গেলে বারো বছর চার মাস, আমি জুনে এসেছিলুম।

অল্প বয়েস থেকেই যার হ্যামলেট মুখস্ত, তার পক্ষে পুণার বদলে লন্ডনে বসতি নেওয়াই তো স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্যে এত বছর কেটে গেছে?

—তুমি কোন ইয়ারে এসেছ, নীলু?

মাত্র চারদিন আগে।

এবারে আমাকে আর একবার ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নীতিশদা বললেন, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল, তোমার গায়ে, জামা-কাপড়ে এখনও টাটকা দেশের গন্ধ। সিগারেট টানছও ঠিক

কলকাতার ছেলের মতন। তুমি কি এখানে কিছু পড়তে-টড়তে এসেছ নাকি? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে মেম্বারশিপ পেয়েছ? সে ব্যাপারে আমি সাহায্য করতে পারি।

—আমি এখানে মাত্র দু-চারদিন থাকব।

—কোথায় যাচ্ছ?

—বালটিমোরে। সেখানে বিশ্ব-বখাটে সম্মেলন হচ্ছে, কিংবা বিশ্ব-নিষ্কর্মা সম্মেলনও বলতে পারেন, আমি সেখানে নেমন্তন্ন পেয়েছি।

নীতিশদা একটু হেসে বললেন, অসম্ভব কিছু না, ও দেশে সবই সম্ভব। ওরা বিশ্ব নর্দমা পরিষ্কার থেকে শুরু করে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত যাবতীয় অবান্তর জিনিস নিয়েই কনফারেন্স করে। কিছুদিন আগেই শুনলুম, ওখানে বিশ্ব অনিদ্রা রোগীদের একটা সেমিনার হয়ে গেল। সবই বিশ্ব! যাই হোক এখানে একলা বসে আছ, কোনও মেয়ে বন্ধুটন্ধুর জন্য অপেক্ষা করছ নাকি?

— সেরকম একজনও জোটেনি এখনও। সিগারেট টানতে এসেছি। আপনি?

— আমার চারটের সময় একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। কিছুক্ষণ এখানে সময় কাটাতে এসেছি। আমি প্রায়ই আসি। তোমার লন্ডন কেমন লাগছে?

—লন্ডনের অনেক রাস্তাঘাট দেখলে বড্ড এলগিন রোড কিংবা ভবানীপুরের জন্য মন কেমন করে। ঠিক আমাদের ওইসব জায়গার মতন দেখতে, আমাদের মতন দোতলা বাস হেলে দুলে চলে, ছাতা হাতে নিয়ে লোকেরা বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থাকে —

—তুমি ভুল করছ, কলকাতার মতন বাস এখানে চলে না, লন্ডনের দোতলা বাসের গরিব সংস্করণ কলকাতায় চলে। এলগিন রোড-টোড অঞ্চল লন্ডনের অনুকরণে তৈরি।

—তাই বুঝি! ভুলে গিয়েছিলুম।

—তোমরা লন্ডন দেখে মুগ্ধ হও না, জানি। ওই যে ওই টেবিলের ছেলেগুলো তখন থেকে চ্যাঁচাচ্ছে, ওই রকমভাবে লন্ডনের নিন্দে করা...একটুও সভ্যতা বোধ নেই।

—কেন লন্ডনে বসে বুঝি লন্ডনের সমালোচনা করা যায় না?

—তা করুক না, কিন্তু এদেশে আস্তে কথা বলাই নিয়ম, তাও মানবে না? আর ওই রকম ভুল ইংরিজি শুনলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। ওরা জার্মানি থেকে এসেছে...জার্মানিতে যারা চাকরি করে, তারা আজকাল নিজেদের খুব বড়লোক মনে করে। ওরা ভাবে ওদের চেয়ে আমরা অনেক গরিব হয়ে গেছি।

আমার হাসি পেয়ে গেল। বেশ মজার ব্যাপার। ওরা আর আমরা? ওরাও ভারতীয়, নীতিশদাও ভারতীয়। দেশ ছেড়ে বাইরে এসে দশ-বারো বছর থাকবার পর অনেকেই বেশ সৎ-মায়ের ভক্ত হয়ে পড়ে। ফ্রান্সের ভারতীয়রা বলে, ইংল্যান্ডটা আবার একটা দেশ নাকি, সর্বক্ষণ প্যাচপেচে বৃষ্টি, নয়তো কুয়াশা, ভালো চিজ বা ওয়াইন কিছুই পাওয়া যায় না, হোটেলগুলোতে গলাকাটা দাম...। ইংল্যান্ডের ভারতীয়রা বলে, ফ্রান্স তো শুধু প্যারিস নিয়েই গর্ব করে, একটু ভেতরের দিকে যাও, দেখবে অনেক বাড়িতে এখনও খাটা-পায়খানা রয়েছে....লোকগুলো নিজেদের ভাষা ছাড়া দুনিয়ার আর কোনো ভাষা বোঝেও না, বুঝতেও চায় না। আর কী কঞ্জুস। ফ্রান্সের যে-কোনও মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারিতে যাও, সব জায়গায় হাত বাড়িয়ে আছে, পয়সা দাও। লন্ডনের টেট গ্যালারি বা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে কারুর এক পয়সা দিতে হয়?

সৎমায়ের পক্ষ নিয়ে কথা বললেও এই সব ভারতীয়দের সৎ-ভাইরা কিন্তু কখনও ওদের আপন মনে করে না।

নীতিশদা বললেন, আসল ব্যাপার কী জানো, এইসব ছেলেরা, যারা ফর্টিসেভেনের পর জন্মেছে, তাদের ইংল্যান্ড বা ইংরেজ জাত সম্পর্কে আলাদা কোনও মোহ নেই। আমরা যারা পরাধীন আমলে জন্মেছি, আমাদের মোহই বলো, শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভয়, ঘৃণা—এইসব মিলিয়ে একটা অন্যরকম

ধারণা আমাদের মনের মধ্যে গেঁথে আছে এদের সম্পর্কে। আমাদের বাবা-কাকারা এখনও বলেন বিলেত, অর্থাৎ রাজার দেশ, এখনকার ছেলেমেয়েরা বলে লন্ডন। এই যে ট্রাফালগার স্কোয়ার, পিকাডেলি সার্কাস, হাইড পার্ক কর্নার এইসব জায়গা সম্পর্কে ছেলেবেলা থেকে এত পড়েছি যে ছবির মতন সব দেখতে পেতুম, কোনওদিন এসব জায়গায় পা দেব ভাবলেই রোমাঞ্চ হত। এখনকার ছেলেমেয়েদের পক্ষে এগুলো কিছুই না জাস্ট কতকগুলি টুরিস্ট স্পট...।

আমি জিগ্যেস করলুম, নীতিশদা, এখানে প্রথম পা দেওয়ার সময় আপনার যে রোমাঞ্চ হয়েছিল, এই বারো বছর পরেও কি সেই রোমাঞ্চ টিকে আছে?

নীতিশদা বেশ জোর দিয়ে বললেন, নিশ্চয়ই! লন্ডন আমার কাছে কখনও পুরোনো হয় না। এখন ব্রিটিশ জাতটা একটু নিস্তেজ হয়ে গেছে, পাউন্ডের দাম রোজই হু-হু করে নেমে যাচ্ছে, তবু লন্ডন হচ্ছে লন্ডন। এরকম ওপ্‌ন সিটি পৃথিবীতে আর একটাও আছে? বিশ্বের যত বড়-বড় জ্ঞানী-গুণী তাদের সবারই স্থান আছে এখানে।

—প্যারিসের লোকেরাও প্যারিস সম্পর্কে এই কথা বলে। যারা নিউইয়র্কে থাকে, তাদের মতে নিউইয়র্কের মতো ওপন সিটি নাকি আর হয় না।

—আরে প্যারিস শহরটাই হচ্ছে কৃত্রিম। শুধু সুন্দর করে সাজানো। ফ্রান্সের বাগানগুলো দেখেছ? একেবারে নিখুঁত না? ওরকম বাগান কি বাস্তব মনে হয়? সব গাছগুলোকে কাঁচি দিয়ে ছেঁটে-ছেঁটে একেবারে খেলনার মতন করে রাখে। বীভৎস। প্যারিস শহরটাই সন্ধেবেলাকার পরের শহর। দিনের বেলা কী করতে হয় ওরা জানেই না। আর নিউইয়র্ক তো উটকো ব্যাপার, ওরা ভাবে কোনও কিছুই খুব বড় হলে তবে সুন্দর হয়। মানুষের চিন্তায় যা কিছু শ্রেষ্ঠ ফসল, তা তুমি পাবে লন্ডনে। রবি ঠাকুর বলো আর কার্ল মার্কসই বলো, সবাইকেই আসতে হয়েছিল এখানে। এই লন্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় গোটাকতক সেঞ্চুরির ইতিহাসের ধুলো মিশে আছে।

—এখন বড্ড বেশি ধুলো জমে গেছে মনে হয় না আপনার?

নীতিশদা বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে, একটুক্ষণ চুপ করে থেকে, তারপর বললেন, আমার সময় হয়ে গেছে, এবার আমায় উঠতে হবে। একদিন আসবে নাকি আমার ওখানে?

—নিশ্চয়ই, ঠিকানা দিন। বউদি কি বাঙালি, না মেমসাহেব?

নীতিশদা প্রথমে কোটের ভেতরের পকেট থেকে পার্স বার করলেন, তারপর তার থেকে একটা কার্ড নিয়ে আমার হাতে দিয়ে বললেন, সাড়ে পাঁচটার পর আমি বাড়িতেই থাকি, যে-কোনও দিন এসো। বউদি-টউদি কেউ নেই...।

একটু অন্যমনস্কের মতন মাটির দিকে তাকিয়ে থেকে উনি আবার বললেন, তোমার থাকার জায়গার কোনও অসুবিধে নেই তো? আমার কাছেও এসে থাকতে পারো কয়েকদিন, তবে নিজে রান্না করে খেতে হবে।

—আমার থাকার জায়গা আছে নীতিশদা।

—তা হলে আমি চলি। সম্ভব হলে এসো...বাই-বাই।

নীতিশদা চলে যাওয়ার পর আমিও উঠে পড়লুম। একটা ব্যাপারে খটকা লাগল। নীতিশদা একবারও তো কলকাতার খবর জিগ্যেস করলেন না। সাধারণত অন্য সবাই জিগ্যেস করে, কলকাতার লোডশেডিং-এর বর্তমান পরিস্থিতি, রাস্তার খোঁড়াখুঁড়ি, বাড়ি ভাড়া এবং রান্নার গ্যাস ঠিক মতন পাওয়া যায় কি না, জ্যোতি বসু আর ইন্দিরা গান্ধী ইত্যাদি। অন্তত পুরোনো চেনাশুনো লোকেরা কে কেমন আছে সে সম্পর্কেও নীতিশদার কোনও আগ্রহ নেই!

আরও কিছুক্ষণ ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ঘোরাঘুরি করবার পর একটি অভিজ্ঞতা হল।

মিউজিয়ামের দিকটায় বিভিন্ন ঘরে-ঘরে প্রহরী থাকে। তাদের মধ্যে অনেকেই কালো মানুষ। কয়েকজনকে ভারতীয় বলেও মনে হয়। বড্ড বাজে চাকরি, সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শুধু একটা

ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা আর লোকজনের হাতের দিকে নজর রাখা। একটুক্ষণের জন্যও বসবার নিয়ম নেই।

সেইরকম একজন প্রহরীকে আমি জিগ্যেস করলুম, মিশরীয় সংগ্রহের দিকটা কোথায়?

প্রহরীটা সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলল, তুমি কি ভারতবর্ষ থেকে আসছ?

আমি ঘাড় নাড়তেই সে আবার বলল, এখানে কী দেখতে তোমরা আসো? এই ব্রিটিশ জাতটা পৃথিবীর সব জায়গা থেকে চুরি করে কিংবা লুট করে এইসব জিনিস নিয়ে এসেছে, তা দেখতে তোমাদের ভালো লাগে? রাগ হয় না।

বেশ অবাকই হলুম আমি। এখানকার প্রহরীর চাকরি করেও এমন কথা বলছে? তা ছাড়া কথা বলছে ইংরেজিতে, অন্য কেউ শুনেও তো ফেলতে পারে!

লোকটি নিজের থেকেই আবার বলল, আমি এসেছি উগান্ডা থেকে। এক সময় আমরা ভারতীয় ছিলুম। এখন আমার ব্রিটিশ পাসপোর্ট, কিন্তু এদেশের সরকার আমাদের সঙ্গে কীরকম খারাপ ব্যবহার করেছে জানো? আমাকে আসতে দিয়েছে, কিন্তু আমার মা আর ছোট ভাইকে ঢুকতে দেয়নি এদেশে। উগান্ডা থেকে ইদি আমিন আমাদের তাড়াল, ব্রিটিশ সরকারও আমাদের কোনও প্রোটেকশান দিল না...এ জাতটা এত স্বার্থপর...

লোকটির চোখমুখ দিয়ে তিক্ততা আর ঘৃণা ঝরে পড়ছে। আমি বেশ একটু অপ্রস্তুত বোধ করলুম। উগান্ডার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সমস্যার কথা খবরের কাগজে পড়েছি, তাদের কারুকে আগে চোখে দেখিনি। লোকটি আমায় ছাড়তে চায় না। চাপা গলায় অনবরত ব্রিটিশ জাতির নিন্দে করে যেতে লাগল। তার যোগ্যতা অনেক বেশি থাকলেও সে এখানে একটা বাজে চাকরি পেয়েছে, থাকার জায়গার দারুণ সমস্যা...ছোট ভাইটা মাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কানাডায় আশ্রয় পেয়েছে বটে কিন্তু চাকরির পারমিট জোগাড় করতে পারেনি, তাদের জন্য দুশ্চিন্তা...।

—তোমরা ভারতে ফিরে গেলে না কেন? সেখানে তোমাদের পুরো পরিবারটা একসঙ্গে থাকতে পারতে।

—ভারতে কি চাকরি পাওয়া যায়? সেখানে কে আমাদের খেতে দেবে? রিফিউজিদের প্রতি ভারত সরকার কী রকম ব্যবহার করে তার কিছু-কিছু খবর আমরা শুনেছি, বাংলাদেশ ওয়ারের সময়কার ছবিও দেখেছি...। তুমি বলতে পারো, ভারতে গেলে আমাদের কিছু সুবিধে হবে?

এই লোকটিও একজন রিফিউজি। আমাদের পুরো জীবনটাই কেটে গেল রিফিউজিদের সমস্যা দেখতে-দেখতে। লন্ডনে এসেও নিস্তার নেই। খুব জোর নিয়ে লোকটিকে বলতে পারলুম না যে, ভারতে গেলে ওর সমস্যার সুরাহা হবে।

লোকটির পূর্বপুরুষ ছিল গুজরাটি। আমরা গুজরাটি শুনলেই ভাবি ব্যবসায়ী আর ধনী। এই লোকটি উগান্ডার কাম্‌পালায় ছিল একটি ব্যাঙ্কের কেরানি ও কবি। ওর দুটি কবিতার বই আছে। এখানে এসে খুবই খারাপ অবস্থার মধ্যে আছে, কবিতা লেখা মাথায় উঠে গেছে।

মিউজিয়ামের একজন শ্বেতাঙ্গ অফিসারকে এদিকে আসতে দেখেও লোকটি সন্ত্রস্ত হল না, বেপরোয়া ভঙ্গিতে আমার কনুই ধরে রেখে বলল, ভাবছি এখানে এই অপমানের মধ্যে থাকার চেয়ে ভারতে গিয়ে আধপেটা খেয়ে থাকাও ভালো। আমেদাবাদ শহরটা কীরকম বলতে পারো? সেখানে কোনও কেরানির চাকরিও পাওয়া যাবে না?

লোকটির কাছ থেকে অতিকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেলুম অন্যদিকে। জীবন্ত মানুষের সমস্যার কথা শুনলে মিউজিয়াম দেখায় আর মন বসে না।

যে বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি সে সন্ধেবেলা মিউজিয়ামের সামনে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করবে, যথাসময়ে উপস্থিত হলুম তার কাছে। লন্ডনে অসংখ্য বাঙালি, কে আর কজনকে চেনে, তবু আমার বন্ধুটি নীতিশদার নাম শুনে চিনতে পারল। সে বলল, হ্যাঁ, ভদ্রলোক বেশ ভালো মানুষ।

কিন্তু এখন বেশ অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। যে কোম্পানিতে উনি চাকরি করতেন, সে কোম্পানিটা উঠে গেছে। এখন পটাপট এরকম অনেক কোম্পানিই উঠে যাচ্ছে। এই ডিপ্রেশানের বাজারে কোনও নতুন চাকরি পাওয়াও মুশকিল। তবে ওই নীতিশবাবু খুব অহংকারী, কারুর কাছে নিজের অসুবিধের কথা বলেন না।

নীতিশদা যে কতটা অহংকারী তা আমিও বুঝতে পারলুম। উনি আমাকে একবারও দেশের অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করেননি। যদি আমি ভেবে ফেলি যে উনি দেশে ফেরার ইচ্ছে পোষণ করছেন। এই স্বর্গপুরী লন্ডন ছেড়ে দেশে ফেরা!

॥ ৭ ॥

লন্ডন থেকে আবার প্যারিসে ফিরে আসাই ঠিক করলুম।

প্যারিসের একটা মস্ত গুণ কী, কোনও কিছু না করলেও, কোনও দ্রষ্টব্য স্থানে না গেলেও এমনি-এমনিই ভালো লাগে। দ্রষ্টব্য জায়গাগুলিতে বড্ড ভিড়।

শরৎকালটাতে যেন সারা পৃথিবীর ভ্রমণকারীরা ধেয়ে আসে ফ্রান্সে। এই সময় ঝকঝকে রোদ ওঠে, নীল আকাশ দেখা যায়, দিনের বেলায় বাতাসে একটুও শীতের ধার থাকে না, আমেরিকান ছেলেমেয়েরা তো শুধু একটা গেঞ্জি গায়ে ঘুরে বেড়ায়। প্যারিসে পার্কের অন্ত নেই, সবক'টি পার্কে এই সব ভিন্‌দেশি ছেলেমেয়েরা ঘাসের ওপর গড়াগড়ি দেয় আর সারাদিন ধরে রোদ শুষে নেয় গায়ে। রিভিয়েরা কিংবা ওই ধরনের বিখ্যাত সমুদ্রতটে নিশ্চয়ই রোদ-শোষকদের ভিড় আরও অনেক বেশি, কিন্তু সেসব জায়গায় যাওয়া আমার পকেটের সাধ্যে কুলোবে না।

ইংল্যান্ডে আমার বন্ধু ভাস্কর ওই রকম একটা ছোটখাটো সমুদ্রতীরে নিয়ে গিয়েছিল। জায়গাটার নাম শুবেরিনেস, লন্ডন থেকে গাড়ি-দূরত্ব ঘন্টাদুই-আড়াই। রোদ্দুর বড় ভালোবাসে ইংরেজরা, রোদ ওদেশে দুর্লভ। লন্ডনের থেকে প্যারিসে রোদ বেশি। রোদ কম পায় বলে ইংরেজ মেয়েরা ফরাসিনীদের চেয়ে বেশি ফরসা। আমাদের চোখে অবশ্য এটা ধরা পড়ার কথা নয়, কিন্তু শুনেছি প্যারিসের ফলি বার্জার কিংবা বিখ্যাত নৈশ ক্লাবগুলিতে যেসব স্বল্পবাসা সুন্দরীদের নাচ দেখানো হয়, সেই সব মেয়েদের বেশিরভাগই আনা হয় ইংল্যান্ড থেকে। কারণ, মঞ্চের আলোয় তাদের উরু বেশি ফরসা দেখায়। ব্রিটিশ দ্বীপুঞ্জের চতুর্দিকেই সমুদ্রতীর, কিন্তু ওদের তেমন বিখ্যাত কোনও বিচ নেই। শুবেরিনেসকে তো বিচ না বলে তার অ্যাপোলজি বলা উচিত। আমাদের দীঘার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা, সমুদ্রকে মনে হয় এঁদো ডোবা, ঢেউ টেউ কিচ্ছু দেখা যায় না, সমুদ্র একটা আছে এই পর্যন্ত। সেখানেই বেলাভূমিতে পা ফেলার জায়গা নেই, বালির ওপর নিঃসাড়ভাবে শুয়ে আছে হাজারখানেক নারীপুরুষ, ঠিক যেমন সিনেমায় দেখা যায়। সেখানকার মেয়েদের পোশাক, সৈয়দ মুজতবা আলির ভাষায়, "আমার টাই দিয়ে তিনটে মেয়ের জাঙিয়া হয়ে যায়!"

আমাদের তো অত রোদ-প্রীতি নেই আর অত সাহেব-মেমদের সামনে আমরা খালি গাও হতে পারি না, সুতরাং আমি রীতিমতো দরদর করে ঘেমেছিলুম। ওই ঘামেই আবার সাহেবদের আনন্দ। একটা নাকি পারফিউম বেরিয়েছে, যা মাখলে ঘামের গন্ধ পাওয়া যায়। যাই হোক, শুবেরিনেস-এর নমুনা দেখেই বুঝেছিলুম এই রকম সময় বিখ্যাত সমুদ্রতীরগুলিতে কত ভিড়।

শুধু পার্কে নয়, শরৎকালীন প্যারিসের অনেক রাস্তাও এমন ভিড়ে গিস্‌গিস্ করে যে হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগে। এমন ভিড় আমার পছন্দ নয়। তার চেয়ে একটু জনবিরল কোনও পথে চুপ করে বসে থাকা অনেক ভালো। রাস্তার ওপরেই অনেক রেস্তোরাঁর চেয়ার টেবিল, সেখানে এক কাপ কফি নিয়ে বসে থাকা যায়, অনেকক্ষণ পার হয়ে গেলে পরিচারকটি যদি কাছে এসে

ঘোরাঘুরি করে তখন আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলেই হল, কিংবা এক বোতল সাদা ওয়াইনের অর্ডার দিতে পারলে তো আর কোনও কথাই নেই।

বসে-বসে শুধু পথের মানুষ দেখা।

অনেক বেশি সংখ্যায় টুরিস্টদের শুভাগমনে সরকার খুশি হয়, ব্যাবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হয় বটে কিন্তু অভিজাত ফরাসি নাগরিকরা নাক সিঁটকোয়। টুরিস্টদের অত্যাচার এড়াবার জন্য তারা এই সময় প্যারিস ছেড়ে চলে যায়। অনেকে বলে, শরৎকালে প্যারিসের রাস্তায় ফরাসিদের দেখতেই পাওয়া যায় না, সবাই বিদেশি। কথাটা অতিরঞ্জিত নিশ্চয়ই, শহরসুদ্ধ সব লোক চলে গেলে অফিস-দোকানপাট চলছে কী করে, তা ছাড়া সবাই বেড়াতে যাবে, এত পয়সা ফরাসিদের নেই।

টুরিস্টদের দেখলেই চেনা যায়। আমি প্রথমে রাস্তার চলন্ত মানুষদের পায়ের বিভিন্ন রকম জুতো দেখি, তারপর পোশাক, তারপর মুখ। বিশেষ-বিশেষ মেয়েকে দেখে একাধিকবার তাদের সর্বাঙ্গে তাকাতেই হয় অবশ্য।

আমাদের ধারণা, টুরিস্ট বুঝি বেশিরভাগই আমেরিকান। তা ঠিক নয়। প্যারিসে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে, এখন টুরিস্টদের মধ্যে জাপানিদের মুখ বেশ চোখে পড়ে। এখন তো জাপানিরাই বড়লোক। তা ছাড়া টুকরো টাকরা কথাবার্তা শুনে চিনতে পারা যায় জার্মান এবং রাশিয়ানদের। এ ছাড়াও অনেককে দেখে বোঝা যায়। তারা আর যে জাতই হোক, আমেরিকান নয়। ভারতীয়ও কিছু আছে, হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে কোনও রঙিন শাড়ির উড়ন্ত আঁচল, প্যারিসের রাস্তায় বাংলা কথা শোনাও আশ্চর্য কিছু নয়। একটি যুগল আমার পাশ দিয়ে বাংলা বলতে বলতে চলে গেল। স্পষ্ট বুঝতে পারলুম তারা চাপা গলায় ঝগড়া করছে। ওরা স্বামী-স্ত্রী নিঃসন্দেহে এবং স্বামীটির জন্য মায়া হল আমার। নিউ ক্যাসেলে কয়লা কিংবা বেরিলিতে বাঁশ নিয়ে যাওয়ার মতন লোকটি প্যারিসে এসেছে নিজের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে, এখন তার ঠ্যালা তো সামলাতে হবে।

অল্পবয়েসি টুরিস্টদের মধ্যে অবশ্য অ্যামেরিকানই বেশি। আমেরিকান ছেলেমেয়েরা ছাত্র অবস্থাতেই যত পয়সা রোজগার করতে পারে, সেরকম পয়সা রোজগারের সুযোগ বোধহয় পৃথিবীর আর কোনও দেশের ছাত্রছাত্রীদের নেই। তা ছাড়া দুনিয়া চষে বেড়াবার ঝোঁকও ওদের আছে। সতেরো-আঠেরো বছরের ছেলেমেয়ে যখনতখন দেশ ছেড়ে বিশ্বের যেকোনও প্রান্তে চলে যায়, এটা আমাদের দেশে বসে কল্পনা করাও শক্ত।

ছেলেবেলায় আমাদের কাছে সাহেবদের যে ইমেজ ছিল, তা একেবারে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। হ্যাট-কোট-টাই পরলে তবেই না সাহেব! এখন হাজারজনের মধ্যে পাঁচ জন টুপি পরে কিনা সন্দেহ, অফিস-চাকুরে ছাড়া অন্যরা একশো জনের মধ্যে দশ জনও বোধহয় টাই পরে না। আমেরিকান ছেলেরা তো তোয়াক্কাই করে না এসব কিছুর, একটা ব্লু জিন আর যে-কোনও ধরনের একটা গেঞ্জিই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। মেয়েরাও ব্লু জিন পরে কিন্তু তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাকের কোনও ফ্যাশান নেই। আমি অন্তত একশোটি আমেরিকান মেয়ে দেখলুম, তাদের মধ্যে কোনও দুজন এক রকম জামা পরেনি। রূপের জন্য অবশ্য আমেরিকান মেয়েদের তেমন খ্যাতি নেই, সে দেখতে হয় সাধারণ ফরাসি মেয়েদের। অফিস ভাঙার সময় টুরিস্টদের ছাপিয়ে যায় সাধারণ ফরাসিদের ভিড়। তাদের আলাদা করে চেনা যায়, কারণ তাদের চলার গতি দ্রুত, যেন বাড়ি ফেরার খুব তাড়া। ফরাসি মেয়েরা উগ্র সাজপোশাক করে না। নিশ্চয়ই তারা সযত্ন প্রসাধন করে বাড়িতে, কিন্তু সে প্রসাধনকে তারা চাপা দিতেও জানে, তাদের মুখ চোখ দেখে কক্ষনো তা বোঝা যায় না। এ ছাড়াও তাদের মধ্যে কী যেন একটা আলগা লাবণ্য আছে, চোখ টেনে রাখে। রূপ নিয়ে সবাই জন্মায় না, অথচ ফরাসিদের মধ্যে কুরূপা মেয়ে প্রায় চোখেই পড়ে না। তার মানে ওরা অন্য একটা কিছু জানে।

মেয়েদের প্রসঙ্গে অন্য একটা কথা বলতে ইচ্ছে হল।

প্যারিসে মমার্ত আর প্লাস পিগাল্-এর মাঝখানে একটা এলাকায় নারী মাংসের বাজার আছে।

নারী মাংস যে কতরকমভাবে রান্না করে পরিবেশনের ব্যবস্থা আছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। পিপ শো, লাইভ শো, সেক্স শপ, সেক্সসাইটমেন্ট, এরোটিকা হ্যানো আর ত্যানো। এরকম এলাকা লন্ডনে আছে, হামবুর্গে আছে, আরও কোন-কোন দেশে আছে কে জানে। আমস্টারডামে ওই পাড়াটি তো জগৎ সুখ্যাত বা কুখ্যাত। ওরকম একটা শো-ও দেখার ইচ্ছে আমার হয়নি। তা বলে আমি নীতিবাগীশ তো নই, বরং মেয়েদের প্রতি আমার বেশি আসক্তির দুর্নাম আছে। বেশি আসক্তি আছে বলেই মেয়েদের নিয়ে এরকম ঢালাও ব্যাবসার ব্যাপারটায় আমার গা ঘিনঘিন করে। এই ব্যাবসা চালায় পুরুষেরা, পুরুষ-শাসিত সমাজ এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখেছে।

মমার্ত থেকে প্লাস পিগাল্-এর দিকে রাত্তিরবেলা হেঁটে আসতে-আসতে চোখে পড়ে রাস্তার ধারে-ধারে গালে রং মেখে মেয়েরা দাঁড়িয়ে আছে আধো অন্ধকারে। তাদের চোখের ভাষা বুঝতে ভুল হয় না, তারা তাদের শরীর কিছুক্ষণের জন্য বিক্রি করতে চায়। কাছাকাছি পিপ্ শো বা লাইভ শো-গুলোর কুৎসিত বিজ্ঞাপনের তুলনায় এইসব মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকা আমার একটুও খারাপ মনে হয় না। পেটের দায়ে মানুষ কত কী করে, রিকশা টানে, ধনীদের ঘাড়ে চাপিয়ে পাহাড়ের ওপর তীর্থস্থানে নিয়ে যায়, খনির মধ্যে বিষাক্ত গ্যাসের ভেতরে গিয়ে জীবনের ঝুঁকি নেয়, সেই রকম মেয়েরাও শরীর খাটিয়ে গ্রাসাচ্ছাদন জোগাড় করতে পারে। কোন মেয়ে কার সঙ্গে শোবে এবং তার বিনিময়ে সে টাকা নেবে কিংবা গয়না উপহার নেবে কিংবা শুধুই ভালোবাসা চাইবে, সেটা মেয়েরাই ঠিক করবে। কিন্তু মেয়েদের শরীরটা নিয়ে পুরুষেরা রোজগার করবে, এই ব্যাপারটাই আমার সহ্য হয় না।

মমার্ত প্লাস পিগাল্-এর ওই রাস্তায় হেঁটে আমার একটা নতুন শিক্ষাও হল। ওই সব লাইভ শো, পিপ্ শোতে কিন্তু দলে দলে লোভী লোকরা ছুটে যায় না। ক্রমশই ওই সব ব্যবসায়ীরা রেট কমাতে বাধ্য হচ্ছে। এককাপ কফির চেয়ে একবারের রমণ দৃশ্য দেখতে খরচ কম হয়। চার আনা আট আনাতেও পিপ্ শো দেখা যায়। দালাল আর ফড়েরা বাইরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করে, পারলে রাস্তা থেকে লোক ধরে নিয়ে যায়। অর্থাৎ ভেতরে অনেক জায়গা তখনও খালি আছে। অথচ, প্যারিসের যেকোনও আর্ট গ্যালারির সামনে প্রতিদিনই লম্বা লাইন।

প্যারিসে এখন 'লেডি চ্যাটার্লির প্রেমিক' নামে নতুন ছবিটি দেখানো হচ্ছে, সিনেমা হলের সামনে তার বিশাল হোর্ডিং। সেই হোর্ডিং-এর পুরো বর্ণনা না লেখাই ভালো। কিন্তু সে সিনেমা হলের সামনে একটুও ভিড় নেই, হাউস ফুল হওয়া তো দূরের কথা। কিছু কিছু সিনেমা হলে হার্ড-কোর পর্নোগ্রাফি এখন দেখানো হয় অবাধে। সেখানেও বেশি ভিড় হয় না। লোকে ছুটে যায় না। অথচ, এসব দেশে সত্যিকারের কোনো ভালো থিয়েটার দেখতে গেলে টিকিট কাটতে হয় অন্তত একমাস আগে, তাও সহজে পাওয়া যায় না। কুরুচি জেতে না। শেষ পর্যন্ত শিল্পই জেতে।

প্যারিসের দুটি দোকানে আমার দু-রকম অভিজ্ঞতা হল।

পঁতনফ অঞ্চলে একদিন একটা ঠিকানা খুঁজে গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেললুম। তারপর এ-রাস্তা সে-রাস্তার গোলোকধাঁধা। বাড়ি ফেরার কোনও অসুবিধে নেই, মাটির নীচে নেমে গিয়ে যেকোনও মেত্রো ধরলেই হল। কিন্তু সেই ঠিকানায় একবার যেতে হবে, শহরের ম্যাপটাও সঙ্গে আনিনি। পথের লোককে জিগ্যেস করি, কিন্তু ভাষার মস্ত বাধা।

আমি ইংরিজিও জানি না, ফরাসিও জানি না। তবু ব্যাকরণ-ভুলো ইংরিজিতে কোনও রকমে কাজ চালাতে পারি, আর ফরাসিজ্ঞান বলতে কয়েকটি মাত্র শৌখিন বাক্য আর কবিতার লাইন, রাস্তার ঠিকানা প্রসঙ্গে তা বলতে যাওয়াও বিপদ। অনেক চেষ্টা করেও কারুর কাছ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া গেল না। একটা বিস্ত্রোতে ঢুকে সেখানকার পরিচালকটিকে বোঝাবার জন্য ইংরেজি-ফরাসি নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি, লোকটি কিছুই বুঝছে না, এক সময় সে দোকান থেকে বেরিয়ে রাস্তার উলটোদিকে কিছু দূরের আর একটা দোকান দেখিয়ে দিল। সে দোকানের নাম লেখা ইংরিজিতে,

হ্যামবার্গার কর্নার। তা হলে নিশ্চয়ই ওই দোকানে কেউ ইংরিজি জানে।

সে-দোকানে ঢুকতেই একটি তরুণী মেয়ে বলল, ইয়েস, মে আই হেল্‌প ইউ?

কানে যেন সুধাবর্ষণ হল। ইংরেজি ভাষাকে আগে কোনও দিন এত ভালো লাগেনি।

খাবারের দোকানে ঢুকে কিছু না কিনে প্রথমেই ঠিকানা জিগ্যেস করা কি উচিত? একটু একটু খিদেও পেয়েছে, আমি তাই প্রথমেই সস্তা দেখে একটা হট্‌ ডগের অর্ডার দিলুম। সেটি পাওয়ার পর বললুম, চিলি সস্‌ নেই?

মেয়েটি বলল, না, তা তো নেই, তবে তুমি কেচ্‌ আপ নেবে, মাস্টার্ড নেবে?

দোকানে আর একটি মাত্র খরিদ্দার এক কোণে বসে আছে, আমি বসলুম কাউন্টারে। তারপর বললুম, আমি একটা ঠিকানা খুঁজছি, তুমি এই রাস্তাটা কোথায় বলতে পারো!

মেয়েটি হেসে ফেলে বলল, আমিও তো প্যারিসে নতুন এসেছি। এদিককার রাস্তা চিনি না। তুমি কি ভারতীয়?

—হ্যাঁ। আর তুমি?

—আমি ব্রিটিশ। তিন মাসের জন্য চাকরি নিয়ে এসেছি, আবার লন্ডনে ফিরে গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ব। তুমি ভারতবর্ষের কোন জায়গা থেকে এসেছ?

—কলকাতা। তুমি নাম শুনেছ?

হ্যাঁ। কেন শুনব না। তার মানে তুমি বেঙ্গলি? আমি আগে লন্ডনে দু-একজন বেঙ্গলি মিট করেছি।

দোকানের মেয়ে সাধারণত কোনও খরিদ্দারের সঙ্গে এত কথা বলে না। কিন্তু মেয়েটি বেশ আলাপি ধরনের। অনেক কথা বলতে চায়। সে কি শুধু ইংরেজিতে কথা বলবার জন্য? ভুলভাল হলেও আমাদের ইংরিজি তো আমেরিকানদের মতন নয়, পুরোনো দাসত্বের সূত্রে তাতে এখনও কিছু ব্রিটিশ ঝোঁক আছে।

কথা বলতে-বলতে হটডগ শেষ করার পর আমি বললুম, কফি?

মেয়েটি আঙুল দিয়ে পাশে দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ এখানে কফি বানিয়ে পরিবেশন করা হয় না, পাশে মেশিন আছে সেখান থেকে নিজেকে নিয়ে আসতে হয়। আমি উঠতে যাচ্ছি, মেয়েটি বলল, আচ্ছা, বসো, বসো, আমি এনে দিচ্ছি।

মেশিন থেকে কাপে কফি ঢেলে মেয়েটি আবার আমাকে মিষ্টি হেসে জিগ্যেস করল, তুমি দুধ চিনি খাও তো?

আমি আগেই লিখেছি যে লন্ডনে চেনাশুনো ইংরেজরা ছাড়া অন্য অচেনা ইংরেজরা কেমন যেন আলগা আলগা ব্যবহার করে। পাশে দাঁড়ালে সরে যায়। কথা বললে উত্তর দিতে চায় না। কিন্তু দেশের বাইরে এসেছে বলেই কি এই মেয়েটি আমার সঙ্গে এমন ভালো ব্যবহার করছে? যেন ইংরেজি ভাষার সূত্রে আমার সঙ্গে ওর দূর সম্পর্কের একটা আত্মীয়তা আছে। আমি ভারতীয় জেনেও আমাকে কফি বানিয়ে দিল!

ঠিকানা জানা হল না বটে কিন্তু একটি অপরিচিতা ইংরেজ মেয়ের হাসি তো উপহার পাওয়া গেল।

দ্বিতীয় দোকানটি মমার্তে। বিদ্যুৎ-গাড়িতে চেপে উঠে এসেছি টিলার ওপরে। ধপধপে সাদা গির্জাটির পেছনেই জ্বলজ্বল করছে পূর্ণিমার চাঁদ। ঠিক যেন আকাশে আঁকা। কিন্তু সে সৌন্দর্য রসিয়ে উপভোগ করার উপায় নেই, এত ভিড় চারদিকে। এক সময়ে এখানে বড়-বড় শিল্পীরা আসতেন, এখন নকল শিল্পীতে ভরে গেছে জায়গাটা। একটুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে মনে হল, এবার ফিরে যাওয়াই ভালো।

কাল সকালে প্যারিস ছেড়ে চলে যাব, কিন্তু এখান থেকে কোনও জিনিস তো কেনা হল

না। একটা ছোটখাটো কিছু স্মৃতিচিহ্ন। ঢুকে পড়লুম একটা সুভেনিরের দোকানে। সব জিনিসের আগুন দাম, টুরিস্টদের গলা কাটবার জন্যই এগুলো তৈরি। এ তো আমার পোষাবে না। দোকানে ঢুকে কিছু না কিনলে খারাপ দেখায়, তাই একটা ডটপেন পছন্দ করলুম।

কাউন্টারে দাম দিতে গেছি, মেয়েটি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ফরাসিতে অনেক কিছু বলে গেল। তার মধ্যে শুধু হিন্দু শব্দটি বুঝতে পারলুম। মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ।

মেয়েটি তার ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা হার বার করে দেখাল আমাকে। সেটা একটা ছোট ছোট রুদ্রাক্ষের মালা।

তারপর সে খুবই ভাঙা ইংরিজিতে, ফরাসি উচ্চারণে বলল, আমি তোমার দেশে যাচ্ছি।

আমি জিগ্যেস করলুম, কোথায়?

সে আবার বলল, তোমাদের দেশে।

আমি বললুম, তা তো বুঝলুম, কিন্তু আমাদের দেশ তো অনেক বড়, তুমি ঠিক কোন জায়গাটায় যাচ্ছ?

সে আমারই ডটপেনটা নিয়ে একটা কাগজে বানান করে লিখল। ভুল বানান সত্ত্বেও বোঝা গেল সেটা হরিদ্বার। তারপর আবার সে কী একটা নাম বলতে গিয়ে উচ্চারণ করতে না পেরে কাগজে লিখল। এবার লিখেছে মুক্তানন্দস্বামী। তার গুরু।

মেয়েদের বয়েস আন্দাজ করার মতন শক্তি আমার নেই। তবু মনে হয়, পঁচিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে ফেলা যায় তাকে। ওই বয়েসের একটা ফরাসি মেয়ে এমন চালু দোকানের মায়া ছেড়ে কেন কোনও এক মুক্তানন্দস্বামীর শিষ্যত্ব নেবে, আর কেনই বা হরিদ্বারের মতন মাছ মাংস বিহীন জায়গায় গিয়ে থাকবে? কিন্তু মেয়েটিকে এই প্রশ্ন করেও কোনও লাভ নেই, তার ইংরেজি জ্ঞান এতই কম। দুটো একটা ইংরেজি শব্দের সঙ্গে বাকিটা সব ফরাসি মিলিয়ে সে আমাকে অনেক কিছু জিগ্যেস করছে, মনে হয় ওই মুক্তানন্দস্বামী বিষয়ে সে আমার কাছ থেকে শুনতে চায়। কিন্তু আমি তো ওই স্বামীজির নাম আগে শুনিনি, হরিদ্বার বিষয়েও আমার বিশেষ আগ্রহ নেই।

মেয়েটি আমার কাছে যা জানতে চায়, সে বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। মেয়েটির কাছ থেকে আমি যা জানতে চাই, তা-ও ও আমায় বোঝাতে পারবে না। সুতরাং আমি হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম ওর মুখের দিকে।

॥ ৮ ॥

বিমানটি দোতলা।

মোট কত মাইল এখন পাড়ি দিচ্ছি, ঠিক আন্দাজ নেই। সাত-আট হাজার মাইল তো হবেই। নীচে আটলান্টিক মহাসমুদ্র। জানলার ধারে সিট জোগাড় করেছি, কিন্তু বাইরে চোখ মেলে কিছুই দেখার নেই। প্রথমে যেন কিছুক্ষণ নীচে সমুদ্রের অস্পষ্ট চেহারা চোখে পড়েছিল, তারপর শুধু পাতলা ধোঁয়া-ধোঁয়া। কলকাতা থেকে আসামে কিংবা ত্রিপুরায় বিমান যাত্রায় নানারকম মেঘের খেলা দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও যেন দুর্গ, কোথাও মর্মর প্রাসাদ, কোথাও ধপধপে সাদা রঙের শিশুরা ছুটোছুটি করছে বরফের মধ্যে—এইসব কল্পনাতেই দিব্যি সময় কেটে যায়। কিন্তু এই সব জাম্বো-মাম্বো বিমানে কোনও বাইরের বৈচিত্র্য নেই, মেঘের খেলা নেই। এত উঁচুতে কিছুই দেখা যায় না। আর উঁচু মানে কি, মাউন্ট এভারেস্টের ডগার চেয়েও অনেক উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এই বিশাল রূপালি পাখি।

আমি ইকোনমি ক্লাসের যাত্রী, অর্থাৎ ট্রেনের থার্ড ক্লাসের মতন, সেইজন্য বসতে দিয়েছে

একেবারে লেজের দিকে। কিন্তু বিমানটি দোতলা, একথা জানবার পরই খালি মনে হচ্ছে, একবার ওপরটা দেখে আসব না? কিন্তু প্রথম-প্রথম ঠিক সাহস হয় না।

আমার পাশের দুজন যাত্রীই দুজন গোমড়ামুখো মধ্যবয়সি পুরুষ। একজন তো ওঠামাত্র কোমরের কষি আলগা করে (সিট বেল্ট খুলে) ঘুমোতে লাগলেন, যেন এই সকাল দশটাই তাঁর ঘুমোবার সময়। অন্য লোকটি প্রায় একটি দৈত্য, প্রথমে দু-তিনবার ঘনঘন আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বোধহয় আমাকে একটি চুনোপুঁটি জ্ঞান করলেন। তারপর আমার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে, এবং আমাকে দারুণ বিস্মিত করে তিনি লোরকার একটি কবিতার বই খুলে বসলেন। আমার ধারণা ছিল, বিমানযাত্রীরা আর্থার হেইলি ছাড়া অন্য কারুর বই পড়ে না। এইরকম দৈত্যাকার লোকও কবিতা পড়ে?

এই সব বিশালবপু বিমানে তিন থাক করে বসবার জায়গা থাকে প্রত্যেক সারিতে। মাঝখানের দিকে যারা বসে আছে, তাদের মধ্যে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে এক শ্বেতাঙ্গিনী আর একটি বছরচারেক বয়েসের বাচ্চা। মেয়েটি প্রায় যুবতিই মনে হয়, পরনে একটা লম্বা গেরুয়া রঙের সেমিজ, (যার অন্য নাম ম্যাক্সিও হতে পারে) গলায় রুদ্রাক্ষের আলখাল্লা। ছেলেটির পায়ে জুতো নেই।

ছেলেটি বেশ সুন্দর রকমের দুরন্ত, প্রায়ই ছুটে চলে যাচ্ছে এদিক-ওদিক। তার মায়ের অবশ্য সেজন্য একটুও ব্যস্ততা নেই, সে মন দিয়ে পাশের এক যাত্রীর সঙ্গে গল্পে ব্যস্ত। বাচ্চাটি একবার আমার কাছে চলে এল, সে জানলার কাছে দাঁড়াতে চায়। ফুটফুটে বাচ্চাটি, মাথায় সোনালি চুল। কিন্তু সাহেবের বাচ্চা খালি পায়ে ছুটছে, এটা যেন কেমন-কেমন লাগে। যদিও প্লেনের মধ্যে পুরু করে কার্পেট পাতা, তা হলেও তো চার-পাঁচশো লোকের জুতোর ধুলো রয়েছে এই কার্পেটে। ছেলেটা কি জুতো খুলে ফেলেছে? প্লেন তো বেশিক্ষণ ছাড়েনি। সাধারণত বাচ্চারা জুতো খুলে ফেলতে চাইলে মায়েরা বেশ আপত্তি করে, সে রকম কিছু শুনিনি।

বাচ্চাটিকে আদর করতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস পাই না। আমি হাঁটু গুটিয়ে তাকে জানলার কাছে জায়গা করে দিয়ে হেসে বললুম, হ্যালো। বাচ্চাটি অবিকল সত্যজিৎ রায়ের ছবির বাচ্চাদের মতন গাঢ় চোখে আমার দিকে তাকায়, কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না। বরং পট করে মুখে একটা আঙুল পুরে দেয়। ছি ছি ছি, সাহেব-বাচ্চার এরকম খারাপ অভ্যেস? তারপরই ছেলেটি আবার আমাদের ঠেলেঠুলে চলে যায় অন্যদিকে। বাচ্চাটি সত্যিই জুতো খুলে রেখেছে, না খালি পায়েই বিমানে উঠেছে, তা জানবার জন্য দারুণ কৌতূহল হয় আমার। উঁকিঝুঁকি দিয়েও কিন্তু তার জুতো দেখতে পেলুম না।

দু-তিন ঘণ্টার বিমান যাত্রা একরকম আর এ যাত্রা অন্যরকম। অন্তত দশ-এগারো ঘন্টা থাকতে হবে এই এক জায়গায়। সুতরাং কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিবেশটা অনেকটা বৈঠকখানার মতন হয়ে গেল, অনেকেই উঠে ঘোরাঘুরি করতে লাগল এদিকে ওদিকে, কেউ-কেউ অন্যদের সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করল। বাথরুমগুলোর সামনে দু-তিনজন করে নারী-পুরুষ দাঁড়িয়ে, চোখে-মুখে উদাসীন-উদাসীন ভাব।

আমিও জায়গা ছেড়ে উঠে পড়লুম।

প্রথম থেকেই ইচ্ছে, দোতলাটা একবার দেখে আসা। দোতলা বাস দেখেছি, কিন্তু দোতলা প্লেন তো আগে দেখা হয়নি। ওখানে কি বিশেষ কেউ বসে, ডবল ভাড়া দেয়, আমি উঠতে গেলে বাধা দেবে? সবাই যখন ঘোরাঘুরি করছে, তখন মনের ভুলে একবার ওপরে ঘুরেই আসা যাক না।

ফার্স্ট ক্লাসের পাশ দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। একটু-একটু গা ছমছম করছে। এখন তো আর রাজা-মহারাজা নেই, ওপরে উঠলেই একালের কোটিপতিদের দেখতে পাব। উঠে এসে একটু নিরাশ হলুম। বিমানের একতলাটি যত বড়, সেই তুলনায় দোতলাটি বেশ ছোট, সেখানে যারা বসে

আছে তাদের কারুর চেহারাই কোটিপতিদের মতন নয়। অবশ্য কোটিপতি আমি কখনও দেখিনি, তাদের চেহারায় কী বিশেষত্ব থাকে তাও আমার জানা নেই, তবু একটা কিছু তো আলাদা থাকবে! এ যে সব সাধারণ চেহারা! এদের মধ্যে শাড়ি-পরা এক মহিলা এবং আরও একজন দাড়িওয়ালা ভারতীয়কেও দেখলুম। এরা কি কোটিপতি? নাঃ, তাহলে হয়তো ওপরের জায়গাগুলোর আলাদা কোনও ব্যাপার নেই, দোতলা বাসের মতন ওপরেও এক ভাড়া।

ফার্স্ট ক্লাসে যারা বসে আছে, তাদের মুখে একটা আলাদা ছাপ ঠিকই নজরে পড়ে। কারুর-কারুর মুখে স্পষ্ট অহংকার, কেউ-কেউ অহংকার চাপা দিয়ে ঔদার্যের ভাব ফুটিয়ে তোলা রপ্ত করে। বড় মানুষদের একটা বৈশিষ্ট্য হল, তারা অন্যদের সামনে হাসে না। যে যত বড় মানুষ, সে তত গম্ভীর।

ফার্স্ট ক্লাসের ঠিক পরের সারিতেই পাশাপাশি তিনজন লোক বসে আছে, তিনজনের গায়েই এক রকমের ওভারকোট। অন্যরা কোট ফোট খুলে রেখেছে, কিন্তু এরা তিনজন কোটপরা অবস্থাতেই পরস্পর কী একটা আলোচনায় মগ্ন।

লোকজন স্টাডি করার আর বিশেষ অবকাশ হল না, কারণ লক্ষ করলুম খাবার দেওয়া হচ্ছে। পাছে আমারটা ফস্কে যায়, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়লুম নিজের জায়গায়।

প্লেন ছাড়বার কিছুক্ষণ পরেই একবার চা আর কেক দিয়েছে, এর মধ্যেই আবার খাবার! দূরপাল্লার বিমান যাত্রায় শুনেছি খুব ঘনঘন খাবার দেয়। তাতে খানিকটা একঘেয়েমি কাটে। দশ-বারো ঘন্টা ধরে ঠায় বসে থাকা, এর মধ্যে কাজ তো মাত্র দুটো, খাওয়া আর বাথরুমে যাওয়া। আমার অবশ্য বিমানের বাথরুমে ঢুকতে ভয় হয়, মনে হয়, ভেতরে ঢোকবার পর দরজা যদি আর না খোলে? কেউ যদি আমার চিৎকারও শুনতে না পায়?

খাবারের বহর দেখে চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার উপক্রম। একটা গোল রুটি ও মাখন, এক গেলাস ফলের রস, বড় এক চাকা মাংস, খানিকটা ভাত, অনেকটা আলু সেদ্ধ, একবাটি স্যালাড, দুরকম সস্, এক প্যাকেট চিজ আর এক কৌটো আইসক্রিম। এত খাবার কেউ একসঙ্গে খেতে পারে? খাবার নষ্ট করতেও গা কষকষ করে। এত দামি সুখাদ্য!

আমার পাশে কবিতা পাঠক দৈত্যটি খাবারের সঙ্গে ওয়াইনের অর্ডার দিয়েছিলেন। পরপর দু-বোতল ওয়াইন সমেত সে সমস্ত খাবারদাবার চেটেপুটে শেষ করল। তারপর তৃপ্তির সঙ্গে একটি সিগারেট ধরিয়ে আড়চোখে তাকাল আমার দিকে।

আমি অন্য খাবারগুলোর যতদূর সম্ভব যত্ন করলেও পাঁউরুটি-মাখন, চিজ ও আইসক্রিম ছুঁইনি। কত লোক আইসক্রিম ভালোবাসে, অথচ আমাকে ওটা ফেলে দিতে হবে, আইসক্রিম আমার জিভে ঠেকাতেই ইচ্ছে করে না কক্ষনো। এত ঘোরাঘুরির পরও মাঝে-মাঝে সব কিছুই আমার কাছে অবিশ্বাস্য লাগে। সত্যি কি পঁয়তিরিশ হাজার ফিট উঁচুতে আটলান্টিক মহাসাগরের ওপরে একটা জেট বিমানের পেটের মধ্যে বসে আছি? সেই আমি, যে কি না এইমাত্র কয়েক বছর আগেও কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতুম, যদি চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হয় তা হলে ভেতরে ঢুকে এক কাপ কফি খাওয়াতে বলব তাকে। কতদিন পকেটে ট্রাম-বাস ভাড়া থাকেনি বলে হেঁটে গেছি শ্যামবাজার। সেই আমি বিলিতি আইসক্রিম ফেলে দিচ্ছি?

চিজের প্যাকেটটা না খুলেই টপ করে রেখে দিলুম কোটের পকেটে। মাখন আর আইসক্রিম তো পকেটে নেওয়া যায় না, গলে যাবে। পাশের লোকটা দেখে ফেলেছে নাকি?

ঘুমন্ত লোকটি জেগে উঠে খাবারটাবার ঠিক খেয়ে নিয়েছে। এবার সে আমাদের উদ্দেশ করে বলল, ইট ওয়াজ ড্যাম হট ইন প্যারিস। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, নিউ ইয়র্কও গরম হবে এই সময়।

দৈত্যটি বলল, গরমতর।

পাক্কা সাহেবেরা প্রথম আবহাওয়া সমাচার দিয়ে আলাপ শুরু করল। তারপর তাদের কথাবার্তা চলল এই প্রকার ঃ

—গত মাসে আমি টরেনটোতে ছিলুম, বড্ড গরমে কষ্ট পেয়েছি।

—আসল গরম হচ্ছে ওয়াশিংটন ডি সি-তে। প্যাচপেচে ঘাম।

—আমি তো এ সময় ওয়াশিংটন ডি সি-তে যাই না। তবে জেনিভায় বেশ মনোরম আবহাওয়া।

—তা ঠিক।

—আমি টরেনটোতে মাত্র দুদিন থাকব, তারপরই ফিরে আসছি জেনিভায়। সেখানেই থাকব কিছুদিন। অবশ্য মাঝখানে একবার জাপান ঘুরে আসতে হবে।

—তোমার কি জেনিভাতেই অবস্থিতি?

—হ্যাঁ। সেখানে আমার শাখা অফিস। বাকি সময়টা আমায় মনট্রিয়েলে থাকতে হয়।

—আমিও মনট্রিয়েলেই যাচ্ছি।

—সেখানে তুমি...

—না, সেখানে আমার অফিস নয়, এমনিই।

এক মাসের মধ্যেই ওদের একজন টরেন্টো-জেনিভা-জাপান ঘোরাঘুরি করবে, যেন ব্যাপারটা কিছুই না। এই সব লোকের পক্ষেই তো বিমানে উঠেই সঙ্গে-সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়া স্বাভাবিক।

এ সব কথাবার্তার চেয়ে উঠে পড়া ভালো। এক চক্কর ঘুরে আসা যাক আবার। মনে করা যেতে পারে, আমি মহাসমুদ্রের ওপর দিয়ে হাঁটছি।

বাথরুমের কাছের ফাঁকা জায়গাটায় সেই গেরুয়া শেমিজ-পরা শ্বেতাঙ্গিনীটি একজন সাফারি-সুট পরা ভারতীয় যুবকের সঙ্গে হাত-পা নেড়ে অনেক কথা বলছে। সিগারেট টানার ছলে আমি একটু কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম এবং আবিষ্কার করলুম যে মেয়েটির পায়েও জুতো নেই। যুবকটির মুখ ভরতি কালো দাড়ি, সে বেশ সাবলীলভাবে কথা বলে যাচ্ছে মেয়েটির সঙ্গে।

দু-একটা কথাতেই বোঝা গেল ব্যাপারটা। আচার্য রজনীশকে ভারত থেকে উৎখাত করায় মেয়েটি খুবই ক্ষুব্ধ। সে বলছে, এই কি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের স্বরূপ? সেখানে যেকোনও মানুষের ধর্মচর্চার অধিকার আছে, তাহলে আচার্য রজনীশের কী দোষ?

ভারতীয় যুবকটি বলল, ধর্ম কাকে বলে? আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে আছে...

শ্বেতাঙ্গিনী বললে, তোমাদের দেশে তন্ত্রচর্চা হয়নি? আচার্যও তো এক রকম তন্ত্র সাধনাই করছিলেন...

—শোনো, গুরু হতে গেলে যোগসাধনায় যে ঊর্ধ্বমার্গে উঠতে হয়...

—কী করে তুমি জানলে যে ভগবান রজনীশ সেই ঊর্ধ্বমার্গে ওঠেননি? আমি পাঁচ বছর পুণায় ওই আশ্রমে ছিলুম।

এই সব ধর্মটর্ম আমার মাথা গুলিয়ে দেয়। এ আলোচনাও আমায় আকৃষ্ট করল না। শুধু একটা খটকা রয়ে গেল। মেয়েটি পাঁচ বছর ধরে পুণার আশ্রমে থাকার পর মনের দুঃখে ভারত ছেড়ে ফিরে যাচ্ছে। তা হলে ওই চার বছরের শিশুটি জন্মাল কী করে? ও কি প্রকৃতির দান?

অন্য প্রান্তে হেঁটে গিয়ে সেই ছোট ছেলেটিকে আবার দেখতে পেলুম। সে একজন যাত্রীর ওয়াইনের বোতল উলটে দিয়েছে, বিমান-সখীরা তাই নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যাত্রীটি কিন্তু বাচ্চাটাকে কোলে বসিয়ে আদর করছে।

হঠাৎ মনে হল, এই সময় একটা হাইজ্যাকিং হলে মন্দ হত না। একঘেয়েমির বদলে বেশ একখানা নাটক দেখা যেত। প্রত্যেক মাসে দুটো-তিনটে হাইজ্যাকিং-এর কথা কাগজে পড়ি, এই প্লেনে সে রকম হতে দোষ কী? প্লেনখানা ত্রিপোলি কিংবা হাভানায় ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে, বেশ একখানা

জমজমাট মজা হবে। সর্বক্ষণ পিস্তল আর হাতবোমা নিয়ে শাসাবে দু-তিনটে ছোকরা, তার মধ্যে একটি মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই। পরে আমি রয়টারের প্রতিনিধির কাছে রসিয়ে-রসিয়ে বলব আমার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা।

ওই যে একই রকম ওভারকোট-পরা তিনজন, এখনও ফিশফিশ করে কথা বলে যাচ্ছে, ওরা হাইজ্যাকার হতে পারে না? ওভারকোট খোলেনি কেন? ওরা কি আরব? প্যালেস্টাইনের বিপ্লবী? তিনজনই বেশ শক্ত সমর্থ যুবা পুরুষ। হাইজ্যাকার হওয়ার সমস্ত যোগ্যতাই ওদের আছে। হয়তো ওদের আরও দু-চারজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অন্য জায়গায়।

ঠিক এই সময় ওভারকোটের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়াতেই আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল।

এইবার কি সত্যি শুরু হবে সেই নাটক? ছেলেটি দৃঢ় পা ফেলে-ফেলে ককপিটের দিকেই যাচ্ছে না? এবার পাইলটের ঘাড়ের কাছে রিভলভার উঁচিয়ে ধরবে?

ইচ্ছে হল, লোকটির পেছনে-পেছনে যাই। অন্য দুই ওভারকোটের দিকে তাকালুম। তাদের মুখ পাথরের মতন স্থির। ওদের ওভারকোটের আড়ালে কী, বোমা না মেশিনগান?

হঠাৎ প্লেনের ভেতরের সব আলো নিভে গেল। এমনই চমকে গেলুম যে ঢাকঢোল বাজতে লাগল বুকের মধ্যে। তাহলে তো আর কোনও সন্দেহই নেই। এত প্লেনে চড়েছি আগে, কোনওদিন তো এক সঙ্গে সব আলো নিভে যেতে দেখিনি?

টুংটাং শব্দের পর মাইক্রোফোনে ভেসে উঠলো একটি ঘোষণা :

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ আপনারা দয়া করে যে-যার নিজের আসনে বসুন। অনুগ্রহ করে জানলার শেড্‌গুলো টেনে দিন যাতে বাইরের আলো না আসে। আপনাদের এক্ষুনি একটা ফিল্ম দেখানো হবে। সুপারম্যান টু।

দূর ছাই। আশা করেছিলুম জলজ্যান্ত নাটক, তার বদলে সিনেমা।

॥ ৯ ॥

দিল্লি থেকে আমস্টারডাম আসবার পথে এক মধ্যবয়স্কা ভারতীয় মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তিনিই ডেকে আলাপ করেছিলেন আমার সঙ্গে। বিমানসেবিকা সেই ভদ্রমহিলার কথা কিছুই বুঝতে পারছিল না, সেই জন্য ভদ্রমহিলা আমায় ডেকে হিন্দিতে অনুরোধ করেছিলেন যে, তিনি নিরামিষ ছাড়া আর কিছু খান না, সেকথা ওই মেম-মেয়েটিকে বুঝিয়ে দিতে।

ভদ্রমহিলা একা চলেছেন এবং একবর্ণ ইংরেজি জানেন না। ওর হিন্দিও এত দুর্বোধ্য যে আমার পক্ষে সব কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। আর পাশের সিটটা খালি ছিল বলে তিনি বারবার ডেকে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন।

তাঁর বৃত্তান্ত যেটুকু আমি বুঝলুম, তাতেই আমি চমৎকৃত হলুম।

ভদ্রমহিলার বাড়ি পাঞ্জাবের একটি গ্রামে। ওঁর তিন ছেলের মধ্যে একজন সাত বছরের মেয়াদে জেল খাটছে, সে আছে দিল্লির তিহর জেলখানায়। বাকি দু' ছেলের মধ্যে একজন লন্ডনে অন্যজন কানাডায়। ওঁর স্বামী মারা গেছেন এক বছর আগে। এক মেয়ে আছে বিবাহিতা। শরিকদের অত্যাচারে উনি নিজের বাড়িতে একা-একা আর টিকতে পারছিলেন না, তাই কিছুদিন ছিলেন মেয়ের কাছে। কিন্তু মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে অনেক লোক, সেখানে তাঁর বেশিদিন থাকা ভালো দেখায় না বলে তিনি আবেদন জানিয়েছিলেন প্রবাসী পুত্রদের কাছে। এর মধ্যে সাড়া পাওয়া গেছে এক ছেলের কাছ থেকে, যে লন্ডনে থাকে। সে একটি বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

ভদ্রমহিলার এক ছেলে কেন জেল খাটছে, সেকথা আমি জিগ্যেস করিনি তবু, সাত বছরের

মেয়াদ যখন, তখন পেটিকেস নিশ্চয়ই নয়, রক্তারক্তির ব্যাপার আছে মনে হয়।

মেয়ের দেওরকে ভজিয়ে, তাকে নিয়ে ভদ্রমহিলা এসেছিলেন দিল্লি। জীবনে তাঁর সেই প্রথম দিল্লি আসা। তিহর জেলে গিয়ে ছোট ছেলের সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তারপর মেয়ের দেওর তাঁকে তুলে দিয়েছে এই বিমানে।

অবস্থায় পড়লে মানুষ কত কী করতে পারে। আমাদের বাংলার কোনও গ্রামের ইংরেজি না-জানা প্রৌঢ়া মহিলা একা-একা প্লেনে চেপে বিলেত যাচ্ছেন, এ কথা কল্পনা করতেই আমাদের কষ্ট হয়।

ভদ্রমহিলা শাড়ি পরেননি, পরেছিলেন সালোয়ার-কামিজ। বিলেত যাওয়ার জন্য বিশেষ কিছু সাজপোশাক করেছেন এমন মনে হয় না। পাঞ্জাবের ট্রেনের থার্ড ক্লাসে এরকম পোশাক ও চেহারার মহিলা আগে অনেক দেখেছি। বয়েস পঞ্চান্নর কম নয়, আবার পঁয়ষট্টিও হতে পারে। মনে হয়, ওঁর স্বাস্থ্য এই কিছুদিন আগেও বেশ মজবুত ছিল, সদ্য ভাঙতে শুরু করেছে। সঙ্গের হাতব্যাগটি এমনই ক্যাটকেটে সবুজ রঙের যে সেদিকে তাকানো যায় না। আমাদের ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই বর্ণ-কানা। বেশিরভাগ জিনিসপত্রের ডিজাইনেই রঙের এমন অসামঞ্জস্য যে চক্ষুকে পীড়া দেয়।

আমি বারবার উঠে গেলেও উনি আমার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই হাতছানি দিয়ে ডেকে এটা ওটা জিগ্যেস করছিলেন। ওঁর প্রতিটি বাক্য আমি দু-তিনবার জিগ্যেস না করে বুঝতে পারছিলুম না। সেই বিমানে অন্য আরও কয়েকজন ভারতীয় যাত্রী ছিল। আমার হিন্দিতে অল্প-জ্ঞানের জন্য আমার মনে হচ্ছিল, উনি আমার বদলে অন্য কোনও হিন্দি জানা কারুকে ডেকে ওঁর মনের কথা বললে পারতেন। কিন্তু উনি আমায় ডাকলে তো আমি অন্য লোক ভজিয়ে দিতে পারি না।

একবার উনি একটা খাম খুলে ওঁর ছেলের ঠিকানা দেখিয়ে জিগ্যেস করলেন, আমি লন্ডনের এই রাস্তাটা চিনি কি না।

আমাকে উনি কেন লন্ডন বিশেষজ্ঞ ভেবে বসলেন কে জানে! যাই হোক, ঠিকানাটা সাসেক্সের। এইটুকু জানি, লন্ডন শহর থেকে বেশ দূরে। আশা করি, ওঁর ছেলে ঠিক সময় হিথ্‌রো বিমানবন্দরে উপস্থিত থাকবে।

জিগ্যেস করলুম, ছেলেকে চিঠি দিয়েছেন তো?

এমনই ভাষার ব্যবধান যে উনি আমার এ প্রশ্নটাও বুঝতে পারছিলেন না। বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কেয়া দিয়া? কেয়া দিয়া?

তখন আমার মনে পড়ল, খত। চিঠির হিন্দি খত। বললুম, খত ভেজ দিয়া তো?

এবার উনি বললেন যে, হ্যাঁ, তাঁর মেয়ের দেওর একটা তার ভেজে দিয়েছে লন্ডনে।

আমি আবার মনে-মনে প্রার্থনা করলুম, মেয়ের দেওরটি আশা করি ঠিকানা ঠিক লিখেছে এবং ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ সুপ্রসন্নভাবে তারটি যথাসময়ে পাঠিয়েছে।

এরপর ভদ্রমহিলা আর একটি চমকপ্রদ কথা বললেন। লন্ডন-প্রবাসী সেই ছেলেকে তিনি আট বছর দেখেননি। তিনি শুনেছেন যে, সে একটি আংরেজি মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার স্বামী মারা যাওয়ার পরও আপনার ছেলেরা কেউ দেশে আসেনি?

উনি বললেন, না। এবং এমনভাবে বললেন যে এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।

হয়তো ওঁদের সমাজে পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপারে অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি নেই।

অনেকে বলে পাঞ্জাবে এখন এমনই সমৃদ্ধি এসেছে যে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আলাদাভাবে পাঞ্জাবকে ইটালি বা স্পেনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তা হয়তো ঠিকই। ভদ্রমহিলার ছেলেরা তো বেশ সাহেবই হয়ে গেছে মনে হয়। বাঙালি ছেলেরা বোধহয় এখনও বিধবা মাকে একা বিদেশের

প্লেনে চাপাতে সাহস পায় না।

একটা চিন্তা মনের মধ্যে খচখচ করছিল। আট বছর যে ছেলে দেশে ফেরেনি এবং যে মেম বিয়ে করেছে, তার বিলেতের সংসারে কী করে সে এই ইংরেজি না জানা গ্রাম্য মাকে মানিয়ে নেবে? আশা করি, ভদ্রমহিলা সুখেই থাকবেন।

আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে নামবার জন্য তৈরি হচ্ছি, ভদ্রমহিলা আমাকে জিগ্যেস করলেন, লন্ডন এসে গেছে?

আমি বললুম, না, এখান থেকে আপনাকে প্লেন পালটাতে হবে।

তিনি জিগ্যেস করলেন, তবে কি এই জায়গাটার নাম পারস্?

ভদ্রমহিলা লন্ডনকে বলেন লোন্দন আর কানাডাকে বলেন কান্ডা। সুতরাং পারস্ যে প্যারিস হবে, তা আমি বুঝতে পারলুম একবারেই।

আমি জানালুম যে প্যারিস নয়, আমরা এক্ষুনি পৌঁছচ্ছি আমস্টারডামে।

এতক্ষণে ভদ্রমহিলার চোখ মুখে ভয়ের ছাপ দেখা দিল। তিনি বললেন, আমি তো লোন্দন যাব, তবে কি আমি ভুল হাওয়াই জাহাজে উঠেছি?

ভুল বাস বা ভুল ট্রেনের মতন ভুলে বিমানে চড়া অত সহজ নয়। অনেকগুলো চেকিং হয়। তবু আমি সিট বেল্ট খুলে ভদ্রমহিলার কাছে এসে বললুম, দেখি আপনার টিকিট।

টিকিট কে এল এম-এরই বটে। এবং ওই বিমান কোম্পানির সব প্লেন আমস্টারডামে থামবেই। ভদ্রমহিলাকে এখান থেকে অন্য প্লেন ধরতে হবে লন্ডনের জন্য। কিন্তু উনি এবার আমার কথা বিশ্বাস করলেন না। উনি লন্ডনে যাবেন, অন্য কোথাও নামবেন না। ওঁকে তো কেউ এই জায়গায় নামবার কথা আগে বলে দেয়নি। মেয়ের দেওর ওঁকে বলেছে যে একবার হয়তো পারসে নামতে হতে পারে। কিন্তু এটা কোন জায়গা?

হয় দেওর মশাই ভুল করেছে কিংবা আমস্টারডাম একটু শক্ত নাম বলে ভদ্রমহিলা ভুলে গেছেন। আমি দু'-তিনবার বোঝাবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু উনি আমায় বেশ সন্দেহ করতে লাগলেন।

তখন আমি ভাবলুম, দূর ছাই। আমার কী দায়িত্ব! যাদের প্যাসেঞ্জার, সেই কোম্পানি বুঝবে কী করে ওঁকে পাঠাতে হবে লন্ডনে।

আমি নেমে পড়লুম।

তারপর কোন দিকে কাস্টমস্, কোন দিকে ইমিগ্রেশন এই সব খোঁজাখুঁজি করছি, সেই সময় ভদ্রমহিলা ভিড়ের ভেতর থেকে দৌড়ে এসে আমার হাত চেপে ধরে বললেন, এ বেটা! তুমি কোথায় চলে যাচ্ছ? আমি এখন কোথায় যাব?

অন্য দেশের বিমানবন্দরে সদ্য নেমে অন্য কারুর ব্যাপারে মাথা ঘামাবার সময় থাকে না। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত। মালপত্র ছাড়াবার জন্য উদ্বেগ, বাইরে যদি কেউ অপেক্ষা করে থাকে তার সঙ্গে দেখা করার তাড়াহুড়ো তো থাকবেই। তবু একজন বয়স্কা মহিলা বেটা বলে ডেকে যদি বিপদের সময় কোনও সাহায্য চান, তবে কি এড়িয়ে যাওয়া যায়?

ওঁকে সঙ্গে নিয়ে আমি বিমান কোম্পানির কাউন্টারে গিয়ে ওঁর টিকিটের এনডোর্সমেন্ট করিয়ে ফ্লাইট নম্বর জেনে নিলুম। তারপর নির্দেশ অনুযায়ী সেই ফ্লাইটের বিমানের রাস্তাটা দেখিয়ে বললুম, এবার এদিকে চলে যান, ওরা আপনাকে লন্ডনে পৌঁছে দেবে।

তিনি তখনও আমার হাত ধরেছিলেন। এরপর একটা অদ্ভুত কথা বললেন, তুমিও আমার সঙ্গে লোন্দন চলো। এখান থেকে কতদূর?

আমার হাসি পেল। একি অমৃতসর থেকে লুধিয়ানা যে ওঁকে এখন আমি লন্ডনে পৌঁছে দিয়ে আসব। আমার এখন থাকার কথা আমস্টারডামে।

অনেক মিষ্টি কথায় বুঝিয়ে আমি ওঁকে ওঁর বিমানের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলুম এবং

একজন কোমল-মুখ এয়ার হস্টেসকে দেখে তাঁকে বুঝিয়ে দিলুম যেন লন্ডনে নামার পর মহিলাকে একটু সাহায্য করেন। ভদ্রমহিলা জলে-পড়া মানুষের মতন মুখ করে বারবার আমার দিকে পেছন ফিরে তাকাতে-তাকাতে চলে গেলেন ভেতরে।

ভদ্রমহিলা পাঞ্জাবিনী বলেও ওঁর নাম জিগ্যেস করা হয়নি। সুতরাং ওঁর কি ধর্ম তা আমি জানি না। সেইজন্য আমি মনে-মনে বললুম, হে গুরু নানক, হে হজরত মহম্মদ, হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনারা দয়া করে এই অসহায় মহিলাকে ঠিকঠাক ওঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবেন লন্ডন বিমান বন্দরে।

সেই মহিলার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল ভূমধ্যসাগর পেরুবার সময়। এরপর অনেকদিন কেটে গেছে, আমি যখন আবার আটলান্টিক মহাসমুদ্র ডিঙিয়ে যাচ্ছি, সেই সময়, যাত্রার একেবারে শেষ দিকে লক্ষ করলুম যে বিমানের এক কোণে সেই মহিলা বসে আছেন।

বেশ চমকে উঠলুম প্রথমে।

এর মধ্যেই তিনি লন্ডন ছেড়ে কানাডায় চলেছেন? উনি বলেছিলেন যে দুই ছেলের কাছেই সাহায্য চেয়ে চিঠি দেওয়ায় কানাডার ছেলে উত্তর দেয়নি, লন্ডনের ছেলে টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাহলে বোধহয় কানাডার ছেলেটির সুমতি হয়েছে। মাকে সে বেশি ভালোবাসে। সে হয়তো লন্ডনের ভাইকে জানিয়েছে যে, মা তোর কাছে থাকবে কেন, আমার কাছে পাঠিয়ে দে।

কিংবা এর উলটো দিকও থাকতে পারে।

আমার গল্প বানানো অভ্যেস কি না, তাই মনে-মনে একটা অন্য রকমও ভেবে ফেললুম। লন্ডনের মেম বিয়ে করা ছেলে মাকে নিয়ে বোধহয় বিড়ম্বনায় পড়েছিল। হয়তো তার বাড়িতে খুব মদ খাওয়ার পার্টি হয়, ওঁর মেম বউয়ের বান্ধবীরা প্রায়ই এসে নাচানাচি করে, সেখানে এই গ্রাম্য মহিলার উপস্থিতি তো একটা মূর্তিমান অসঙ্গতি। বাচ্চা-কাচ্চা থাকলে অনেক সময় মা-কে কাছে রাখলে সুবিধে হয়, বুড়ি মাকে দিয়ে বিনা পয়সার ন্যানি কিংবা আয়ার কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় বেশ। কিন্তু মেমের বাচ্চারা কি এই ইংরেজি না-জানা ঠাকুমার কাছে থাকতে চাইবে। সেইজন্যই কি তিতিবিরক্ত হয়ে তাঁর লন্ডনের ছেলে মাকে এখন ক্যানাডার ভাইয়ের কাঁধে চালান করে দিচ্ছে?

ভদ্রমহিলার সঙ্গে দেখা করব কি করব না, এই নিয়ে ইতস্তত করছিলুম। কে আর সাধ করে অন্যের সমস্যা কাঁধে নিতে চায়। আগেরবার তবু আমাদের গন্তব্য ছিল আলাদা, এবার তো নামতে হবে টরেন্টোতেই একসঙ্গে।

ভদ্রমহিলা আমাকে দেখেননি, দেখলে নিশ্চয়ই ডাকতেন। আমি কিছুক্ষণ ওই দিকটা এড়িয়ে রইলুম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্পটা জানবার অদম্য কৌতূহলই আমাকে ঠেলে নিয়ে গেল। কী হল লন্ডনে?

কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলুম, নমস্তে, ভালো আছেন?

ভদ্রমহিলা সাদা চোখ তুলে তাকালেন আমার দিকে। চিনতে পারেননি।

মুখখানা ম্লান, তবে সেই জলেপড়া ভাবটি আর নেই। এক মাসের লন্ডনের অভিজ্ঞতা ওঁকে অনেকখানি পালটে দিয়েছে মনে হয়। পোশাক অবশ্য একই রকম, শুধু আগেরবার পায়ে সস্তা রবারের চটি দেখেছিলুম, এবারে নতুন জুতো। লন্ডনের ছেলে মাকে অন্তত একজোড়া জুতো দিয়েছে।

বললুম, সেই যে আগেরবার প্লেনে দেখা হয়েছিল, তারপর আমস্টারডাম এয়ারপোর্টে...

উনি বললেন, হাঁ হাঁ।

কণ্ঠস্বরে সে রকম কোনও উৎসাহ নেই। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে।

আবার জিগ্যেস করলুম, লন্ডনে দেখা পেয়েছিলেন আপনার ছেলের? কোনও অসুবিধা হয়নি তো?

উনি বললেন, না। ছেলে তার পায়নি। সেইজন্য হাওয়াই আড্ডায় আসেনি। ওখানে একজন দেশি লোক নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল, পরদিন ছেলের ঠিকানায় পৌঁছে দিল।

—তা লন্ডন কি আপনার ভালো লাগল না? এত তাড়াতাড়ি চলে এলেন?

আগেরবারের মতন এবারে আর গল্প করার মতন কোনও উৎসাহ নেই ভদ্রমহিলার। শুধু বললেন, এবার কান্ডায় অন্য ছেলের কাছে যাচ্ছি।

সিট বেল্ট বাঁধার নির্দেশ শোনা গেল বলে আমি ফিরে এলুম নিজের জায়গায়। তবু কৌতূহল জেগে রইল। লন্ডনের মতন অচেনা শহরে এই ভারতীয় গ্রামের মহিলা প্রথম দিন প্লেন থেকে নেমে ছেলেকে দেখতে পাননি! তখন কীরকম মনের অবস্থা হয়েছিল ওঁর?

দিল্লির টেলিগ্রাম ঠিক সময়ে লন্ডনে পৌঁছয়নি। বিলেতের টেলিগ্রাম ঠিক সময় কানাডায় পৌঁছেছে তো? কানাডার ডাকব্যবস্থার ওপরেও খুব একটা ভরসা করা যায় না। ভারতের মতন এখানেও ঘনঘন ডাক ধর্মঘট হয়। চিঠি আসতে পনেরো-কুড়ি দিন লেগে যায়। টরেন্টোর ছেলে ঠিকঠাক উপস্থিত থাকবে তো? লন্ডনে যে দিশি লোকটি ওঁকে একদিনের জন্য আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই খুব দয়ালু, এখানে যদি সেরকম দয়ালু লোক না থাকে? তা ছাড়া আগেই শুনেছি, খালিস্তানের দাবিতে অনেক পাঞ্জাবি এসে টরোন্টো বিমান বন্দরে আস্তানা গেড়ে আছে, তাদের জন্য কানাডার সরকার বিব্রত। যদি ভদ্রমহিলাকে কানাডায় ঢুকতে না দেয়?

টরেন্টো থেকে বিমান বদলে আমার এডমান্টন যাওয়ার কথা। আমার ভিসা, কাস্টমস্ চেকিং সেখানেই হবে। ভেবেছিলুম, টরেন্টোতে নেমে কিছুক্ষণ সময় পাব, ততক্ষণ দেখে যাব ভদ্রমহিলার কোনও গতি হয় কি না।

কিন্তু টরেন্টোতে নামামাত্র ঘোষণা শুনতে পেলুম, এডমান্টনের ফ্লাইট এক্ষুনি ছাড়বে। তার জন্য যেতে হবে ইন্টারন্যাল এয়ারপোর্টে, যেটা অন্য বাড়িতে। সুতরাং ছুটতে হল সঙ্গে-সঙ্গে। পাঞ্জাবি মহিলাটির কাহিনির শেষ পরিণতি আমার জানা হল না।

॥ ১০ ॥

টরেন্টোর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ঘরোয়া বিমান বন্দরে হুড়োহুড়ি করে যেতে হবে, সুটকেসটা তুলতে গেছি, এমন সময় একজন লোক পাশে এসে সেটির দিকে হাত বাড়াল। চেহারা দেখলেই চেনা যায়।

কুলি না বলে পোর্টার বলাই উচিত। কুলি শুনলেই মনে হয় যারা মাথায় করে মালপত্র বয়ে নিয়ে যায়। আর পোর্টার মানে স্মার্ট পোশাক পরা, ছোট ঠেলা গাড়ি নিয়ে ঘোরে। আমার সুটকেসটা যে কারুর বয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার তা-ও নয়, এতদিন তো নিজেই বয়েছি। তা ছাড়া ইওরোপের নানান বিমান বন্দরে অনেক ছোট-ছোট হাতে ঠেলা গাড়ি ছড়ানো থাকে, যেকোনও একটা টেনে এনে নিজের মালপত্র নিজেই যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায়। দিল্লি ছাড়বার পর কুলি বা পোর্টার দেখিনি এ পর্যন্ত। বহু ঘন্টা বিমান যাত্রার পর মাথা ভোঁভোঁ করে, সম্পূর্ণ নতুন দেশে একটু হকচকিয়েও যেতে হয়। ভাবলুম এদেশে বুঝি এরকমই নিয়ম, তাই লোকটিকে সুটকেস নিতে দিলুম।

তারপর কাস্টমস ইত্যাদির ফর্মালিটি মেটাবার পর পরবর্তী বিমানের অপেক্ষা স্থলে এসে পৌঁছুতেই সেই লোকটি এসে আমার হাতে লাগেজ ট্যাগ গুঁজে দিল। অর্থাৎ আমার সুটকেস আবার যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছে।

ভালো কথা। এবার?

লোকটি লম্বা-চওড়া, কুচকুচে কালো। গম্ভীরভাবে বাঁ-হাতের তালুটা বাড়িয়ে দিল আমার দিকে।

একটা কিছু রেট থাকা উচিত, কিন্তু কোথাও তা লেখা নেই। কিংবা, পয়সা নেবার নিয়ম আছে কি না কে জানে, লোকটির ভাবভঙ্গি একটু গোপন-গোপন। যেন প্রকাশ্যে পয়সা চাইতে সে লজ্জা পাচ্ছে।

পকেটে হাত দিয়েই আমি প্রমাদ গুণলুম! যাঃ টাকা বদলানো তো হয়নি! এক-একটা দেশে যাওয়া মানেই নতুন করে টাকা পয়সার হিসেব রাখা। তা ছাড়া প্রত্যেক দেশের আলাদা-আলাদা সিকি আধুলি সহজে চেনাও যায় না। আমেরিকান ডলার আর কেনেডিয়ান ডলারের চেহারা প্রায় এক রকম হলেও মূল্য আলাদা। আমেরিকান ডলার আমাদের ন-টাকা, আর কেনেডিয়ান ডলার পৌনে আট টাকার মতন।

আমার পকেটে রয়েছে ফ্রেঞ্চ ফ্র্যাংক। সেই এক ফ্র্যাংকের দাম আবার দু-টাকার কাছাকাছি। সেই হিসেবে কত টাকা একে দেওয়া যায়? আমাদের দেশে দু-টাকা দিলেই চলে, সাহেবদের দেশে দশ টাকা দিলে হবে না।

একটা পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের নোট বার করতেই পোর্টার বলল, নো, নো, নো, ডলার, ডলার!

আমি তাকে কাঁচুমাচুভাবে বললুম, ক্ষমা করবেন, আমার টাকা বদলানো হয়নি। এখন আর সময়ও নেই। আপনি দয়া করে এটাই নিন, আপনি তো এয়ারপোর্টের কাউন্টার থেকে যেকোনও সময়ই বদলে নিতে পারেন।

লোকটি আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার কাছে সত্যিই ডলার নেই?

আমি বললুম, সত্যি।

এবার সে জিগ্যেস করল, এটা কত?

এই রে, আবার জটিল অঙ্কের হিসেবের মধ্যে ফেললে। পাঁচ ফ্র্যাঙ্কে তো এক কেনেডিয়ান ডলারের কাছাকাছিই হবে। সেটা তো আমার চেয়ে এদেরই ভালো করে জানবার কথা। কানাডার এক অংশে প্রচুর ফরাসির বাস, তারা আন্দোলন করে নিজেদের দাবি আদায় করে নিয়েছে। ফরাসি এখন কানাডায় অন্যতম রাষ্ট্রভাষা, সব জায়গায় ইংরেজির পাশাপাশি ফরাসি লেখা থাকে। সুতরাং খোদ ফরাসি দেশের টাকার হিসেব এরা জানে না?

বললুম, এক ডলার।

লোকটি এমন একটা চোখ করে তাকাল যেন আমার মতন বে-আদপ সে জন্মে দেখেনি। মাত্র এক ডলার দেওয়ার অসম্ভব প্রস্তাব করছি তাকে?

ঝটিতি আর একখানা পাঁচ ফ্র্যাঙ্কের নোট বার করে লজ্জা-লজ্জা মুখে দিলুম তার হাতে। সাহেব কুলিকে অপমান করে ফেলছিলুম আর একটু হলে। হোক না গায়ের রং আমার চেয়েও কালো, তবু তো ইংরিজি বলে!

লোকটি তখনও হাত বাড়িয়েই আছে। মুখখানা অপ্রসন্ন।

এবার আমার পকেট থেকে বেরুল একটা দশ ফ্র্যাঙ্কের নোট। পাঁচ ফ্র্যাঙ্ক আর নেই। এত বড় নোটটা দিয়ে দেব? উপায় কী!

এবারে লোকটি নোটগুলি ভাঁজ করতে লাগল। আমি খুব চাপা ব্যাঙ্গের সুরে জিগ্যেস করলুম, ঠিক আছে? এবারে ঠিক আছে তো?

লোকটি একটি ধন্যবাদ পর্যন্ত দিল না। চলে গেল।

আমার তখন গা কচ্‌কচ্ করছে। প্রায় চল্লিশটা টাকা চলে গেল কুলি খরচ? অথচ সুটকেসটা আমি নিজেই বইতে পারতুম। লোকটি বোধহয় আমার জন্য ঠিক পাঁচ মিনিট সময় খরচ করেছে।

নতুন দেশে এলে এরকম একটা না একটা বোকামি হয়েই যায়। কালো পোর্টারটি আমায় ঠকিয়েছে। ফরসা, রাঙা কোনও পোর্টার হলে কি এমনিভাবে আমার কাছ থেকে বেশি নিত?

ফ্লাইট নাম্বার দেখে গেটের দিকে এগোচ্ছি, সেই সময় সেই পোর্টারটি আবার স্বতঃপ্রবৃত্ত

হয়ে আমার কাছে এসে বলল, তোমার ফ্লাইট দু-ঘণ্টা বাদে ছাড়বে।

যাচ্চলে! তা হলে তো ধীরেসুস্থে সুটকেস আনা যেত, টাকা বদলে নেওয়া যেত, শুধু-শুধু চল্লিশটা টাকা গচ্চা যেত না!

ইচ্ছে হল, লোকটিকে দু-একটা কড়া কথা শোনাই। কিন্তু সাহস নেই। লোকটির চোখেমুখে একটা রাগ-রাগ ভাব, যেন আমার মাথায় আরও কিছু কাঁঠাল ভাঙার মতলবে আছে।

সে বলল, অনেক সময় আছে, তুমি ইচ্ছে করলে এখন টাকা বদলে নিয়ে আসতে পারো।

আমি বললুম, দরকার নেই।

লোকটিকে এড়াবার জন্য চলে গেলুম টেলিফোন বুথের দিকে।

পয়সা না থাকলেও টেলিফোন করার কোনও অসুবিধে নেই। আহা, এসব দেশের টেলিফোন দেখলে নিজের দেশের টেলিফোনের জন্য বড্ড মায়া হয়। আমাদের দেশের টেলিফোন যেন অবোধ শিশু, ভালো করে কথা বলতেই শেখেনি এখনও। কিংবা কখনও-কখনও টেলিফোনকে মনে হয়, কানা-খোঁড়া-বোবা। আমাদের তুলনায় এদের টেলিফোন যেন আগামী শতাব্দীর।

প্রথম কথা, ডায়াল করার ব্যাপারটাই উঠে গেছে। দেওয়ালে দেওয়ালে ঝোলানো থাকে শুধু রিসিভারটা, তার গায়েই আছে এক-দুই লেখা বোতাম। সেগুলো টিপলেই পিঁপিঁ শব্দ হয়, আর সঙ্গে-সঙ্গে কানেকশান হয়ে যায়। ঠিক যেন একটা খেলনা। অথচ সেই খেলনার বোতাম টিপেই তক্ষুনি-তক্ষুনি দেশের যেকোনো জায়গায় তো বটেই, প্যারিস-লণ্ডন, জাপান-হংকং-সিঙ্গাপুর পর্যন্ত কানেকশন পাওয়া যায়, কোনও অপারেটরের সাহায্য ছাড়াই। একমাত্র ভারতবর্ষের সঙ্গে এভাবে কথা বলা যায় না।

যেকোনও পাবলিক জায়গাতেই গাদাখানেক টেলিফোন ছড়ানো। পকেটে পয়সা থাক বা না থাক, এমনকী নম্বর জানা না থাকলেও যে-কোনও দূরের বন্ধুর সঙ্গে কথা বলা যায়। পয়সা না থাকলে অবশ্য অপারেটরের সাহায্য নিতে হয়। অপারেটর আমার নামটা জেনে নিয়ে আমার চাওয়া নম্বরটায় রিং করে জিগ্যেস করবে, এই নামের লোকের সঙ্গে তোমরা কথা বলতে চাও? তখন সে হ্যাঁ বললেই হল। পয়সাটা অবশ্য তাকে দিতে হবে।

টেলিফোন করলুম এডমান্টনে দীপকদার বাড়িতে। মহিলা কণ্ঠ শুনে বুঝলুম, টেলিফোন ধরেছেন জয়তীদি। এই রে, জয়তীদি কি আমায় চিনতে পারবেন? গত বছর দীপকদা এসেছিলেন কলকাতায়, তখন বলেছিলেন, একবার চলে এসো না আমাদের দিকে। তোমাদের অ্যাডভেঞ্চার করতে ইচ্ছে করে না? কোথায় থাকি জানো? প্রায় আলস্কার কাছে, আমাদের বাড়ি থেকে সোজা হেঁটে গেলেই উত্তর মেরু। এক্সকারশান টিকিট সস্তায় পাওয়া যায়, চলে এসো!

সেই ভরসাতেই এসেছি, অবশ্য ইওরোপ থেকে চিঠিও দিয়েছি একটা। এখন জয়তীদি যদি আমায় চিনতে না পারেন...।

যথাসম্ভব মধুর গলা করে বললুম, জয়তীদি, আমার নাম নীললোহিত...কলকাতায় দু-তিনবার দেখা হয়েছিল...মনে আছে কি? দীপকদা বাড়িতে আছেন?

জয়তীদি ঝরঝর করে হেসে বললেন, কেন চিনতে পারব না? তোমার জন্যই তো রান্না করছিলুম, হ্যাঁ, ভালো কথা, তুমি ঝাল খাও তো? আচার খাও? তুমি কোথা থেকে কথা বলছ?

—টরেন্টো থেকে, রাত দশটায় পৌঁছোব।

—জানি...দীপকদা বেরিয়ে গেছেন ফেরার পথে এয়ারপোর্ট থেকে তোমায় নিয়ে আসবেন।

—তাহলে দেখা হচ্ছে।

ফোন রেখে বেশ নিশ্চিন্ত মনে একটা চেয়ারে এসে বসলুম। কত সহজে ব্যাপারটা মিটে গেল। টরেন্টো থেকে এডমান্টন ঘড়ির হিসেবে আরও চার ঘন্টার পথ। এজন্য গ্রাহাম বেলকে ধন্যবাদ দিতে হয়।

সদ্য আমেরিকা-ফেরত তাপসদার একটা কথা মনে পড়ল। তিনি আফশোশ করে বলেছিলেন, ভাই কলকাতায় কি এমন কোনওদিন আসবে, যখন কেউ বাড়িতে টেলিফোন রাখতে চাইলে টেলিফোন কোম্পানিতে খবর দেওয়া মাত্র একদিনের মধ্যে টেলিফোন এসে যাবে, আর কোনওদিন খারাপ হবে না।

আমি বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে নিশ্চয়ই সেরকম দিন আসবে।

তাপসদা আর একটা অত্যাশ্চর্য গল্প বলেছিলেন। উনি ছিলেন আমেরিকার খুব ছোট একটা শহরে। সেখানে টেলিফোনের অফিস একটা দোকানের মতন। নানা রকম রং ও আকৃতির টেলিফোন সেখানে সাজানো থাকে, লোকে ফার্নিচার পছন্দ করবার মতন এসে টেলিফোন কিনে নিয়ে যায়। কয়েকটি মেয়ে সেই দোকানে থাকে, তারাই টেলিফোনের কানেকশানের ব্যবস্থা করে, তারাই বিল নেয়।

একবার তাপসদা বিশেষ দরকারে কলকাতায় ট্রাঙ্ককল করেছিলেন। মাসের শেষে বিল এলে দেখা গেল, তাঁকে ভুলে দুবার ট্রাঙ্ককলের চার্জ করেছে। উনি বিল নিয়ে গেলেন সেই দোকানে। অভিযোগ-বাক্যটি শেষ করবার আগেই একটি মেয়ে বলল, তুমি ওই টেলিফোনে সরাসরি অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে কথা বলো। এক কোণের টেবিলে একটি টেলিফোন রাখা আছে, যেটা তুললেই পার্শ্ববর্তী শহরের হেড অফিসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের কেউ ধরবে। তাপসদা সেখানে বললেন তাঁর ব্যাপারটা। অ্যাকাউন্টসের অদৃশ্য মেয়েটি এক মিনিট মাত্র সময় নিয়ে রেকর্ড দেখে নিয়ে বলল, কিন্তু তোমার তো দুটো কল-ই হয়েছে, একটা সন্ধে সাড়ে সাতটায়, আর একটা পৌনে দশটায়। তাপসদা বললেন, না, তা ঠিক নয়। প্রথম কলটায় কলকাতার বাড়িতে রিং হয়ে গেছে, কেউ ধরেনি। দ্বিতীয়বার কথা হয়েছে। সুতরাং প্রথমবার বিল হবে কেন? মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বলল, ও, প্রথমবার কথা হয়নি? ঠিক আছে! তুমি তোমার বিল থেকে প্রথম কলের চার্জটা বাদ দিয়ে বিল জমা দিয়ে দাও!

ব্যস, মিটে গেল সমস্যা!

তাপসদাকে বলেছিলুম, সামনের সেঞ্চুরিতে আমাদের কলকাতাতেও নির্ঘাত এসবও এরকম সহজ হয়ে যাবে।

বসে-বসে এই সব কথা ভাবছি এমন সময় সেই কালো পোর্টারটিকে আবার আমার দিকে আসতে দেখলুম। কী ব্যাপার, আবার কী চায়? একটু ভয়-ভয় করতে লাগল এবার। আমায় খুব বোকা মনে করেছে নিশ্চয়ই লোকটা! আমি তাড়াতাড়ি একটা বই খুলে মেলে ধরলুম চোখের সামনে।

লোকটি আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে লাগল। কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু ওর সঙ্গে গল্প করবার বিশেষ উৎসাহ বোধ করলুম না। বিলেত-আমেরিকা থেকে যতজন আমাদের দেশে ফিরে আসে, কারুর মুখে আজ পর্যন্ত আমরা কোনও নিগ্রো (ইংরেজিতে এখন নিগ্রো কথাটা নিষিদ্ধ হলেও বাংলায় অচল নয়। বাংলায় আমরা কোনও খারাপ অর্থে নিগ্রো কথাটা ব্যবহার করি না, বরং কালো কথাটাই বাংলায় একটু কেমন কেমন) বন্ধুর গল্প শুনিনি। অনেকে মেম বিয়ে করে আসে, কিন্তু কেউ আজ পর্যন্ত নিগ্রো বিয়ে করে ফিরেছে শোনা গেছে কি? অথচ কালো মেয়েদের মধ্যে সুন্দরী কম নেই। কালো লোকরা কালোদের ধার ঘেঁষে না। শুনেছি নিগ্রোরাও ভারতীয়দের তেমন পছন্দ করে না।

এ লোকটাও তো মওকা বুঝে আমার কাছ থেকে চল্লিশ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে, ওর সঙ্গে আবার কথা কীসের?

মনে হচ্ছে লোকটির বিশেষ কোনও কাজ নেই, এদিকে-ওদিকে অলসভাবে ঘুরছে। বোধহয় আর কারুর সুটকেস হাতাবার মতলবে আছে। কিন্তু নতুন বিমান না এলে সে সুযোগ পাবে কেন?

বই পড়ায় ডুবে গিয়েছিলুম, হঠাৎ চমকে গেলুম। ক'টা বাজে? আমার ঘড়িতে তো এখনও

ইওরোপের সময়। এখানে ফ্লাইট ছাড়ার আগে তেমন অ্যানাউন্সমেন্ট হয় না, টি ভি-তে দেখানো হয় কোন প্লেন কখন ছাড়ছে। আমার প্লেন ছেড়ে গেল নাকি?

এইরকম সময়ে দারুণ একটা আতঙ্ক এসে যায়। এই প্লেনে যদি উঠতে না পারি তা হলে টিকিট নষ্ট হয়ে যাবে কি না...দীপকদা ফিরে যাবেন এয়ারপোর্ট থেকে...আমি এখানে সারা রাত কোথায় থাকব...

পড়িমরি করে ছুটলুম গেটের দিকে। সত্যি দেরি হয়ে গেছে। প্লেনটা ছেড়ে যায়নি অবশ্য, কিন্তু শেষ দু-তিন জন লোক বোর্ডিং পাশ জমা দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। আমার বোর্ডিং পাশ পকেট থেকে বার করে হাঁপাতে-হাঁপাতে দাঁড়ালুম সেখানে।

সেই সময় পিঠে একটা টোকা। মুখ ফিরিয়ে দেখি সেই কালো পোর্টারটি। দারুণ বিরক্ত হয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই সে হাত বাড়িয়ে হ্যান্ড ব্যাগটা এগিয়ে দিল। আমার হ্যান্ড ব্যাগ। সর্বনাশ, অতি ব্যস্ততায় আমি ওটা ফেলে এসেছিলুম। ওর মধ্যে আমার পাসপোর্ট, টাকাপয়সা, টিকিট-ফিকিট সব!

লোকটিকে ধন্যবাদ জানাবারও অবকাশ পেলুম না, শুধু এক ঝলক হাসি কোনও রকমে ছুড়ে দিয়ে চলে গেলুম বিমানের দিকে।

॥ ১১ ॥

আমাদের দেশের সঙ্গে তুলনা করলে কানাডাকে মনে হয় মরুভূমি। না, মরুভূমির তুলনাটা ঠিক হল না। বরং বলা উচিত একটি উর্বর, অতি জনবিরল দেশ। কয়েকটা বড় শহর বাদ দিলে শত-শত মাইল যেন জায়গা খালি পড়ে আছে। আমেরিকায় যেমন গ্রাম নেই, আছে অসংখ্য ছোট শহর, সেইরকম ছোট শহর কানাডাতেও আছে, আরও ছোট, ধূ-ধূ করা মাঠের মধ্যে দু-তিনটে মাত্র বাড়ি, এমনও চোখে পড়ে।

কানাডার রাস্তাগুলোও আমেরিকার চেয়ে বেশি চওড়া মনে হয়, কারণ রাস্তায় গাড়ি কম। তা বলে যে এদেশের লোক গাড়ি কিনতে পারে না তা নয়, প্রত্যেক পরিবারেই অন্তত দুটো করে গাড়ি, কিন্তু লোক সংখ্যাই তো কম। তবু সারা দেশটায় আষ্টেপৃষ্টে চওড়া-চওড়া মসৃণ রাস্তা ছড়িয়ে আছে।

ইতিহাসেই দেখা যায় মানুষের মধ্যে যাযাবর বৃত্তি রয়ে গেছে এখনও। নিজ বাসভূমি শস্য-ফলমূলের অনটন দেখলেই মানুষ বারবার অন্য বাসভূমির সন্ধানে ছুটে যায়। স্বদেশপ্রেম একটা আইডিয়া মাত্র, যা নিয়ে কবিরা অনেক আবেগের মাতামাতি করেছে এবং যুদ্ধবাজ ও রাজনীতিবিদরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে এসেছে নিজেদের স্বার্থে। আসলে, যেখানে ভালো খাবারদাবার, স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তা আছে, সেখানে ছুটে যাওয়াই মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। গ্রাম ছেড়ে যেকারণে মানুষ শহরে চলে আসে, সেই কারণেই কলকাতা-বোম্বাই-লন্ডনের মতন পিঁপড়ে শহর ছেড়ে মানুষ কানাডা-অস্ট্রেলিয়ায় গেছে নতুন সম্ভাবনার প্রত্যাশায়।

সাহেবরা আগে গিয়ে দখল করে নিয়েছে বলে কানাডা সাহেবদের দেশ। কিন্তু পিছু পিছু অ-সাহেবরাও গেছে। ভারতীয়রা গেছে এ শতাব্দীর গোড়া থেকেই, জাপানিরা গেছে, আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে গেছে, আর চিনেরা গিয়ে বসতি স্থাপন করেনি, পৃথিবীতে এমন কোনও জায়গাই নেই। কিন্তু তেলে-জলে যেমন মিশ খায় না, সেই রকম সাদা-কালো-হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে মেশামিশির কোনও ব্যাপারই ঘটেনি, ক্রমশ দূরত্ব যেন আরও বেড়েই চলেছে।

সাদায়-কালোয় ভেদাভেদের কথা যেমন প্রায়ই শোনা যায়, তেমনি দূরত্ব ঘোচাবার কথাও

মাঝে-মাঝেই ওঠে। কিন্তু কালো-হলদে-খয়েরি জাতিগুলির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের কোনও উদ্যমই নেই। খয়েরিরা কালোদের চেয়ে সাদাদের বেশি পছন্দ করে, তাদের সঙ্গে কাঁধ ঘষাঘষি করতে চায়, আবার সাদারা এখন খয়েরিদের চেয়ে বেশি পছন্দ করে হলদেদের। এইরকম রঙের খেলা চলছে আর কি। ভারতী মুখার্জি নামে একজন লেখিকা, যাঁর স্বামী কেনেডিয়ান, অনেক দিন ছিলেন ওদেশে, বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যাপারে তিতিবিরক্তি হয়ে তিনি গত বছর কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে, জীবনে আর তিনি ওদেশে ফিরবেন না।

বর্ণবিদ্বেষ নিয়ে অবশ্য কিছু বলা আমার মানায় না। কারণ আমি আসছি এমন একটা দেশ থেকে, যার মতন বর্ণবিদ্বেষী দেশ সারা পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমাদের দেশে এখনও কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপনে পাত্রীর রং ফরসা না কালো সেটাই প্রধান ব্যাপার। আমাদের দেশে হরিজনদের এখনও পুড়িয়ে মারা হয়, আরও যা সব আছে তা বলার দরকার নেই।

এই প্রসঙ্গে একটা মজার ঘটনা মনে পড়ল।

অনেক সময় হয় না যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে গিয়ে একজনের সঙ্গে নতুন আলাপ হল, তারপর কথায়-কথায় জানা গেল, উনি আমার ভাইবোন, অনেক আত্মীয় বন্ধুকে চেনেন, আর আমিও ওঁর আত্মীয়-বন্ধুদের অনেককে খুব ভালো চিনি, শুধু আমাদের দুজনেরই আগে দেখা হয়নি! সেইরকমই এ দেশে এসে আলাপ হল মীর চন্দানি নামে একজনের সঙ্গে, তাঁর স্ত্রী উগান্ডার ক্রিশ্চান, এককালের ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল আমাদের দেশের গোয়ার সঙ্গে। মীর চন্দানির সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরই আমরা আবিষ্কার করলুম যে, এককালে উনি কলকাতায় আমাদের ঠিক পাশের বাড়িতেই থাকতেন, ওঁর দাদার ছেলে আমার খুব বন্ধু, উনিও আমার বাবাকে খুব ভালো চিনতেন। তখন উনি ছিলেন অবিবাহিত, সে প্রায় পনেরো বছর আগেকার কথা। মীর চন্দানি খুব আবেগের সঙ্গে কলকাতার স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলেন। কথায়-কথায় জিগ্যেস করলেন, অশোককে মনে আছে? সে কেমন আছে?

আমি জিগ্যেস করলুম, কোন অশোক?

উনি বললেন, সেই যে অশোক...পড়াশুনোয় খুব ভালো ছিল, ওর পদবি ছিল বোধহয় মিত্র, তাই না?

এখন ব্যাপার হয়েছে কী, সেই সময় আমরা কলকাতায় যে পাড়ায় থাকতুম, সেই পাড়ায় একই রাস্তায়, খুব কাছাকাছি বাড়িতে দুজন অশোক মিত্র থাকতেন, দুজনেই পড়াশুনোয় ভালো। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই, সাংবাদিকতার জগতে যদি দুজন অমিতাভ চৌধুরী থাকতে পারেন, তাহলে এক পাড়ায় দুজন অশোক মিত্র থাকা কিছু অস্বাভাবিক নয়। একজন ফরসা ছিপছিপে, লম্বা, অন্যজন কালো, মাঝারি উচ্চতা। দুজনকে আলাদা করে বোঝাবার জন্য আমরা বলতুম, কালো অশোক, ফরসা অশোক।

সেই জন্যই জিগ্যেস করেছিলুম, কোন অশোক বলুন তো? কালো রঙের?

মীর চন্দানি বললেন, না, না, সে বেশ ফরসা ছিল, কোয়াইট হ্যান্ডসাম...

আমি বললুম, বুঝেছি, তবে সেই অশোক মিত্রের সঙ্গে আমার ভালো পরিচয় ছিল না, কালো অশোককেই বেশি চিনতুম।

মীর চন্দানি বললেন, নাও আই রিমেমবার কালো অশোকও একজন ছিল বটে...

কথাবার্তা হচ্ছিল ইংরেজিতে, হঠাৎ পাশ থেকে শ্রীমতী মীর চন্দানি দারুণ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন তোমাদের লজ্জা করে না, তোমরা ভারতীয়দের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়েও একজনকে কালো বলছ?

আমি প্রথমটায় হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলুম। ভদ্রমহিলা এমন রেগে উঠলেন কেন?

কোনওরকমে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে, না, না, না, এর মধ্যে বর্ণবিদ্বেষের কোনও ব্যাপার

নেই, একই নামের দুজন লোকের একজন কালো, অন্যজন ফরসা, সেটা বোঝাবার জন্যই—

ভদ্রমহিলা আবার ধমক দিয়ে বললেন, ফের বলছ কালো-ফরসা? অল ইন্ডিয়ানস আর ব্ল্যাকস। সেটা তোমরা মানতে চাও না। কালো-জাতি বলে তোমাদের গর্ববোধ নেই, দ্যাখো তো চিনে বা জাপানিদের...।

সাহেবদের চোখে সব ভারতীয়ই যে কালো, এটা সত্যিই আমাদের মনে থাকে না। আমরা আফ্রিকান বা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান কালোদের অপছন্দ করি, নিজেরা খয়েরি সেজে সাদাদের কাছাকাছি যেতে চাই। অবশ্য আমার গায়ের রং এমনই ছাতার কাপড়ের মতন যে আমার পক্ষে কোনওদিন খয়েরি সাজবারও উপায় নেই।

কানাডার জনসংখ্যা যে বিরল সেটা সব সময়েই মনে পড়ে। একটি বাঙালি মেয়ে কানাডায় এসে বলেছিল, ইচ্ছে করে গড়িয়াহাট থেকে এক গুচ্ছের লোক এনে এখানে ছড়িয়ে দিই!

গড়িয়াহাটের চেয়েও শ্যামবাজার কিংবা শিয়ালদায় ভিড় অনেক বেশি। হাঁটতে গেলে মানুষের গায়ে ধাক্কা লাগেই। পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শহর বোধ হয় এখন মেক্সিকো সিটি। একটি মেক্সিকান মহিলাকে জিগ্যেস করেছিলুম, তোমাদের শহরে হাঁটতে গেলে কি মানুষের সঙ্গে মানুষের ধাক্কা লাগে? সে আমতা-আমতা করে বলেছিল না, মানে, বাজারে কিংবা মেলায় হাঁটতে গেলে সেরকম হতে পারে,...না কিন্তু রাস্তায়...তো। টোকিও, নিউইয়র্কের মতন বাঘা-বাঘা শহরের তুলনায় আয়তনে বা জনসংখ্যায় কলকাতার স্থান বেশ নীচে। তবু কলকাতার মতন এমন ভিড় বোধ হয় আর কোথাও নেই।

কানাডা এত ফাঁকা বলে যে আমাদের দেশের বেকাররা সে দেশে দলে-দলে ছুটে যেতে পারবে, সেরকম সুদিন আর নেই। এখন কড়াকড়ি এবং ভিসা ব্যবস্থা হয়েছে। সাদা মানুষ হলে এখনও কানাডায় বসতি নেওয়ার সুযোগ আছে অবশ্য, কিন্তু ভারতীয়দের প্রবেশ অধিকার কমে আসছে ক্রমশই। মাঝে-মাঝে শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে ভারতীয়দের মারামারিও হয়। সেরকম খবর তো আমরা দেশের কাগজেও পড়ি। এখানে এসে টরেন্টোর একটা ঘটনা শুনলুম। একটি বাঙালির নতুন তৈরি সুদৃশ্য বাড়ির জানলার কাচ পাড়ার কোনও লোক ঢিল মেরে ভেঙে দেয়। একবার নয়, দুবার। বাঙালি ভদ্রলোকটি পুলিশে খবর দিলেও সুরাহা হয় না। পুলিশ বলে, কে ভেঙেছে সেটা না বলতে পারলে পুলিশ কাকে ধরবে? পরের বার ভদ্রলোক তক্কে ছিলেন। একটি ছোকরা যেই কাচে ঢিল ছুঁড়েছে, অমনি তিনি ছুটে গিয়ে ছেলেটিকে জাপটে ধরলেন, এবং টানতে-টানতে তাকে নিয়ে গেলেন থানায়। এবারেও পুলিশের কোনও গা নেই। ছেলেটিকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশ ওই ভদ্রলোককে বললেন, এ ছেলেটিই যে ঢিল ছুঁড়েছেন তার প্রমাণ কী? আর কেউ দেখেছে? কোনও সাক্ষী ছিল?

অর্থাৎ শুধু চোর ধরলেই হবে না, চুরি বা গুন্ডামির সময় একজন সাক্ষীও রাখতে হবে, আর তাকেও ধরে নিয়ে যেতে হবে থানায়। সাহেব পুলিশের কী অপূর্ব কৃতিত্ব।

সেই বাঙালি ভদ্রলোককে তাঁর এক পাঞ্জাবি বন্ধু পরামর্শ দিয়েছিলেন, ওসব পুলিশ-টুলিশে অভিযোগ করে কোনও কাজ হবে না, বাড়িতে ডান্ডা রাখবেন, কেউ কাচ ভাঙতে এলে সোজা কয়েক ঘা কষিয়ে দেবেন!

বাঙালিরা অবশ্য ডান্ডা চালাতে তেমন দক্ষ নয়, অনেক জায়গাতেই তাদের চুপ করে সহ্য করে যেতে হয়। কিন্তু পাঞ্জাবিরা ছেড়ে কথা কয় না, বেশ কয়েকবার তারা হামলাবাজদের বেধড়ক মার দিয়েছে।

দীপকদার বাড়ি এডমান্টন শহর থেকে একটু দূরে সেই সেন্ট অ্যালবার্ট নামে একটা ছোট্ট ছিমছাম সুন্দর জায়গায়। কানাডায় টরেন্টো, মন্ট্রিয়েল, কুইবেকের মতন শহরগুলোর তুলনায় এডমান্টন আমাদের কাছে তেমন পরিচিত নয়। কিন্তু এখন ওদের এডমান্টনই সবচেয়ে দ্রুত বর্ধমান শহর, কারণ যে-প্রদেশের এটি প্রধান শহর, সেই আলবার্টায় সম্প্রতি প্রচুর পেট্রল বেরিয়েছে। পেট্রল

মানেই বহু টাকার ছড়াছড়ি, অনেক রকম নতুন ব্যাবসা এবং মধু-সন্ধানী বহু মানুষের ভিড়। এডমান্টনে এমন ঝকঝকে ও বিশাল শপিং মল দেখেছি যে, মনে হয় ওরকম দোকান-সমারোহ ইওরোপেও নেই।

এডমান্টন থেকে সেন্ট অ্যালবার্টে যেতে মাঝখানে একটি নদী পড়ে। সে নদীর নাম সাস্‌কাচুয়ান। যাওয়া-আসার পথে সেই নদীটার দিকে বারবার উৎসুকভাবেই তাকাই। নতুন নামের নদী দেখতে পেলেই আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

সাস্‌কাচুয়ান নদীর পাশে উদ্যান আছে, জলে বোটিং হয়, ছিপ নিয়ে কেউ মাছ ধরার জন্য বসেও থাকে, কিন্তু কোনওদিন কারুকে স্নান করতে দেখিনি। নদীর জলে কিছু লোক দাপাদাপি না করলে সে নদীকে যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখায়। ঠান্ডার জন্য নয়, কিন্তু, জুলাই-আগস্টে কানাডায় বেশ গরম পড়ে। জামার তলায় গেঞ্জি ভিজে যায়। ভয়টা বোধ হয় পলিউশনের। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা স্নান করতে বা সাঁতার কাটতে খুব ভালোবাসে, সেই রকমই ওদের আবার পরিষ্কার বাতিক। অনেক বাড়িতেই নিজস্ব পুকুর আছে, যার পোশাকি নাম সুইমিং পুল। সেগুলো আসলে বড়সড়ো চৌবাচ্চা, আগাগোড়া সিমেন্ট বাঁধানো, জলের রং কৃত্রিম নীল, সামান্য ধুলোবালি বা একটা গাছের পাতা পর্যন্ত পড়বার উপায় নেই। প্রত্যেক শহরে পাবলিক সুইমিং পুলও আছে অনেক, যেখানে পয়সা দিয়ে সাঁতার কাটা যায়। কিন্তু বাড়ির কাছে নদী থাকলেও কেউ নামবে না। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতাকে বলা চলে নদী-ঘাতক। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদীগুলোকে নানানভাবে বেঁধে দুর্বল করে ফেলেছে। তা ছাড়া দু-পাড়ের নদীগুলোকে অনবরত সব নদীতে নোংরা ঢালছে।

জয়তীদির এক বান্ধবীর ভাই একদিন কাছাকাছি একটা ছোট হ্রদে গিয়েছিল মাছ ধরতে। তারপর সে সত্যি কয়েকটা মাছ পেয়েছিল, ফেরার পথে জয়তীদিকে একটা মাছ উপহার দিয়ে গেল। মাছটার চেহারা একটু অদ্ভুত, অনেকটা যেন শোল মাছ আর কাতলা মাছ মেশানো। একটা নতুন জাতের মাছ খাওয়া হবে ভেবে আমি বেশ উৎসাহিত হয়েছিলুম, রাত্তিরবেলা জয়তীদি অম্লানবদনে বললেন, সে মাছটা তো আমি ফেলে দিয়েছি।

দীপকদা মাছের ভক্ত নন, তাঁর কোনও তাপ-উত্তাপ দেখা গেল না। কিন্তু আমি চমকে উঠে বললুম, সে কী! আস্ত মাছটা?

জয়তীদি বললেন, কী জানি কী অচেনা মাছ, তা ছাড়া যে লেক থেকে ধরেছে, সেটা পলিউটেড কি না কে জানে! এখানকার জল যা নোংরা...।

নতুন ধরনের মাছ অবশ্য খাওয়া হল কয়েকদিন পরেই। দীপকদাদের এক বন্ধু দিলীপবাবু একদিন আমাদের খাওয়ার নেমন্তন্ন করলেন। খাওয়ার টেবিলে যখন মাছ এল, তখন তিনি বললেন, এ মাছ কোথাকার জানেন তো, উত্তর মেরুর।

দীপকদা একটু বাড়িয়ে বলেছিলেন, ওদের বাড়ি থেকে উঁকি দিয়ে উত্তর মেরু দেখা যায় না। তবে অ্যালবার্টার ওপর দিকেই কানাডার সীমান্ত প্রদেশ, তারপর হিম রাজ্য। ম্যাপে দেখলে এখান থেকে উত্তর মেরু খুব দূর মনে হয় না। দীপকদার বন্ধু দিলীপবাবু সরকারি কর্মচারী, কাজের জন্য তাঁকে সীমান্ত প্রদেশে যেতে হয়, সেখান থেকে তিনি নিয়ে এসেছেন উত্তর মেরুর রুই মাছ।

উত্তর মেরুর মাছ খাচ্ছি, ভাবলেই রোমাঞ্চ হয় না? অবশ্য এস্কিমোরাও কোনওদিন গঙ্গার ইলিশ খেলে একই রকম রোমাঞ্চিত বোধ করবে বোধ হয়।

কয়েকদিন কানাডায় থেকেই আমি বেশ পুরোনো হয়ে গেলুম। মাঝে-মাঝে দীপকদাদের বাড়িতে আমি একদম একাই থাকি। দীপকদা পণ্ডিত মানুষ, তিনি এখানকার একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক। জয়তীদি কলকাতা থেকে অর্থনীতিতে এম এ পাশ করে এসে অনেকদিন কানাডায় ঘরসংসার করেছেন। ইদানীং তাঁর শখ হয়েছে আবার পড়াশুনো করার, তিনি ভরতি হয়েছেন আর একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওদের দুটি মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া কাছাকাছি একটা স্কুলে পড়ে। সকাল

বেলা ছোট-হাজরি খেয়ে ওরা চারজনেই চলে যায়। তারপর বাড়িতে আমি একলা।

একদিন মনে হল, শুধু-শুধু জয়তীদিদের বাড়িতে রয়েছি আর দু-বেলা অন্ন ধ্বংস করছি, বিনিময়ে আমারও কিছু করা উচিত। এদেশে সবাই কাজের মানুষ, চুপচাপ কেউ বসে থাকে না। জয়তীদির বাড়ির ঘর ঝাঁট দিয়ে, বাসনপত্তর মেজেও তো খানিকটা সাহায্য করা যায়।

এ দেশে কেউ কাজ করলেই তার জন্য পারিশ্রমিক পায়। শারীরিক কাজে বেশি দক্ষিণা। ছেলেও যদি বাড়ির বাগান পরিষ্কার করে, তা বলে বাবার কাছ থেকে মজুরির টাকা চায়। ঘর মোছা, বাসন মাজার জন্য আমিও জয়তীদির কাছ থেকে বেশ মোটা মাইনে দাবি করতে পারি! তা হলে আমার চিন্তা কী, পরবর্তী বেড়াবার খরচটাও এইভাবে তুলে ফেলা যাবে!

॥ ১২ ॥

জয়তীদিকে যাদবপুরের ছাত্রী অবস্থায় যেরকম দেখেছিলুম, এখনও চেহারাটা ঠিক সেই রকমই আছে। ছিপছিপে লম্বা তন্বী, ঠোঁটে সব সময় একটা চাপা হাসির ভাব, জীবনটাকে যেন উনি একটা কৌতুক হিসেবে নিয়েছেন। সাহেবদের দেশে প্রবাসী হয়ে আছেন প্রায় চোদ্দো-পনেরো বছর, উনি যখন মাঝে-মাঝে দেশে বেড়াতে আসেন, তখন সবাই ওঁকে দেখে অবাক হয়। ইওরোপ-আমেরিকার খাদ্যে এখন এত বেশি প্রোটিন আর দুধ-মিষ্টির আধিক্য যে সকলেরই ধাত মোটা হয়ে যাওয়ার দিকে। সাহেব মেমদের মধ্যে এত বেশি মোটা-মোটা চেহারা আগে দেখা যেত না। এমনকী অনেক তরুণ-তরুণীর চেহারাও ভীম ভবানী বা হামিদা বানুর মতন। চেহারা ঠিক রাখার জন্য এখন ওরা শুরু করেছে জগিং, অর্থাৎ আস্তে-আস্তে দৌড়োনো। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত নেই দেখা যাবে কোনও নির্জন রাস্তায় একজন নিঃসঙ্গ মানুষ আপন মনে ছুটে চলেছে। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, কোনও অফিসের বড় সাহেব লাঞ্চ আওয়ারের বিরতির সময় কোট-প্যান্ট-টাই খুলে একটা গেঞ্জি আর জাঙিয়া পরে নিয়ে ছুটতে বেরিয়ে গেলেন!

অনেক বাড়িতে গেলেই খাওয়া সম্পর্কে একটা আতঙ্কের ভাব দেখা যায়! এটা খাব না, ওটা খাব না। খেলেই ওজন বৃদ্ধি। অথচ কোনও রকম বাড়াবাড়ি না করেই জয়তীদি ফিগারটি রেখেছেন বেতস লতার মতন। অবশ্য মানিকদাও যেমন রোগা সেই রকম লম্বা। মানিকদার খাদ্য হচ্ছে দুটি কফি আর সিগারেট, দিনে প্রায় তিরিশ কাপ কালো কফি আর পঞ্চাশ-ষাটটা সিগারেট। মাঝে দু-একদিন জয়তীদির অনুরোধে মানিকদা সিগারেট একটু কমালেন, তখন কফি আর সিগারেট সমান হয়ে গেল, দুটোই পঁয়ত্রিশ!

ওঁদের দুই মেয়ে, জিয়া আর প্রিয়া। জিয়ার বয়েস এগারো, সে ইংরিজিতে কবিতা লেখে, পিয়ানো বাজায় এবং বাংলা ভোলেনি। কিন্তু প্রিয়ার বয়েস মাত্র ছয় হলেও তার ব্যক্তিত্ব অনেক বেশি, বাড়িতে তার উপস্থিতি সে কক্ষনো অন্যদের ভুলতে দিতে চায় না। তার প্রতি কারুর অমনোযোগী হওয়ার উপায় নেই। দুই বোনে কখনও ঝগড়া হলে ছোট বোনটিই প্রত্যেকবার জেতে এবং বড় বোনটি কেঁদে ফেলে। প্রিয়াও কবিতা লেখে। পিয়ানো বাজায়, বাংলা সে বলতে ভুলে গেলেও বুঝতে পারে সবই এবং তার মধ্যে অলিম্পিক-বিজয়িনী বালিকা-জিমনাস্ট হওয়ার সব রকম সম্ভাবনাই আছে।

এসব দেশে যেমন ভালো টাকা রোজগার করা যায়, সেই রকম খাটতেও হয় প্রচণ্ড। ফাঁকি দেওয়ার কোনও উপায় নেই। হঠাৎ ছুটি নেওয়ার উপায় নেই। সারা সপ্তাহ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কারুর প্রায় নিশ্বাস ফেলারও সময় নেই বলা যায়। সবাই তাকিয়ে থাকে শনি-রবিবারের জন্য। সে ছুটির দিন দুটো ফুরিয়ে যায় দেখতে-দেখতে, কারণ তখন সারতে হয় সারা সপ্তাহের

জমে থাকা বাড়ির কাজ।

এ দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরও ফাঁকি দেওয়ার কোনও পথ নেই। কারণ পড়াশুনোর খরচ খুব বেশি। আমাদের মতন সবাই তো আর ঢালাও ভাবে বি-এ, এম-এ ক্লাসে ভরতি হয়ে যায় না। স্কুল-ফাইনালের সমতুল্য পড়া শেষ করলেই একটা কিছু চাকরি পাওয়া যায়। কোনও দোকান-কর্মচারী কিংবা ট্রাক-ড্রাইভারের উপার্জন কোনও অফিস-কেরানির চেয়ে কম নয়। গ্রে-হাউন্ড বাসের ড্রাইভারদের তো রীতিমতন ভারিক্কি অফিসার-অফিসার মনে হয়। সুতরাং উচ্চ শিক্ষার ইচ্ছে যদি থাকে কারুর, তাকে বেশ টাকা খরচ করে কষ্ট করে পড়তে হবে। যেহেতু এদেশের ছেলেমেয়েরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে টাকা নেয় না, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার খরচ জোগায় নিজের রোজগারে, সেই জন্য তারা জানে, একটা টার্মে ফেল করলে, পরের টার্মের জন্য তাকেই আবার টাকা জোটাতে হবে, তাই সে দিনরাত পড়াশুনো করে তাড়াতাড়ি পাশ করার চেষ্টা করে।

উচ্চ শিক্ষার কোনও বয়েস নেই এদেশে। আর্থিক কারণে কেউ পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে দু-পাঁচ বছর বাদে আবার শুরু করতে পারে। চাকরিতে উন্নতির কারণে যোগ্যতা অর্জনের জন্যও অনেকে মাঝবয়েসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নেয়। পঁয়ষট্টি বছরের কোনও ঠাকুমার হঠাৎ মনে হল, জীবনে ভালো করে অঙ্কটা শেখা হয়নি, এখন শিখলে কেমন হয়? তিনি নিয়ে নিলেন একটা অঙ্কের কোর্স। কিংবা কেউ হয়তো যৌবন বয়সে পড়াশুনো অসমাপ্ত রেখে চাকরি বা বাণিজ্যে ঢুকে পড়েছিলেন, তারপর জীবনে টাকাপয়সা রোজগার হয়েছে অনেক, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেওয়া হয়নি বলে মনে একটা ক্ষোভ থেকে গেছে, সেই জন্য পরিণত বয়েসে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে গেলেন।

অবশ্য সবাইকেই কলেজে গিয়ে নিয়মিত ক্লাস করতে হয় না। তার জন্য আছে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে চিঠিপত্রে কিংবা টেলিফোনেও পাঠ নেওয়া যায়। বিজ্ঞানসম্মত পাঠব্যবস্থা আছে, পরীক্ষার মান সমান। মানিকদা এরকমই একটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বিভাগীয় প্রধান। তাঁর চাকরি, বলতে গেলে, ঘুমের সময়টুকু বাদ দিয়ে আর সব সময়ের জন্য। তিনি এ শহর ছেড়ে যখন তখন বাইরে চলে যেতে পারেন না, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়ে যেতে হবে। ইউনিভার্সিটিতে তিনি তো সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত কাটান বটেই, তা ছাড়াও তাঁর বাড়িতে যখনতখন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা ফোন করে যেকোনও প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইতে পারে।

জয়তীদিরও এতদিন পরে পড়াশুনো করবার শখ হয়েছে। বিদেশে এসে প্রায় বারো বছর চুপচাপ থাকার পর উনি আবার ভরতি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি থাকতে থাকতেই জয়তীদির পরীক্ষা শুরু হল। ওরে বাবা, সে কি পরীক্ষার পড়া, সারা বাড়ি একেবারে তটস্থ। জয়তীদি শোওয়ার ঘরে পড়ছেন, বসবার ঘরে পড়ছেন, রান্না ঘরে পড়ছেন, এমনকী বোধহয় বাথরুমে গিয়েও পরীক্ষার পড়া পড়ছেন। সন্ধের সময় একটু ঘুমিয়ে নিয়ে ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাত বারোটার সময় জেগে সারা রাত পড়াশুনো। অবশ্য জয়তীদির খাটুনি সার্থক, রেজাল্ট বেরুলে দেখা গেল উনি নব্বই-এর ঘরে নম্বর পেয়েছেন। জয়তীদিকে জিগ্যেস করলুম, আপনি ফার্স্ট হয়েছেন নিশ্চয়ই? উনি ফরাসি কায়দায় কাঁধে ঢেউ তুলে বললেন, কী জানি।

এ দেশে বেশিদিন থাকলে একাকিত্ব বোধ আসতে বাধ্য। সারা সপ্তাহ কাজ, আর শুধু নিজের পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকা। এর মধ্যেই আনন্দের উপকরণ সংগ্রহ করে নিতে হয়। জয়তীদি অধিকাংশ সময় নিজেকে ডুবিয়ে রাখেন গানের মধ্যে। রবীন্দ্র-অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতের কত যে স্টক ওঁর গলায় তার ঠিক নেই। যখনতখন মুক্তোর মতন নিখুঁত সুরের কথাগুলো ওঁর কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে। দীপকদারও খুব রেকর্ড কেনার শখ, একদিন হঠাৎ ঝাঁ করে ঋতু গুহর নতুনতম এল পি খানা কিনে নিয়ে এলেন। সেদিন বাইরে বর্ষা, পাশে চায়ের সঙ্গে মুড়ি-বাদাম-কাঁচা লঙ্কা, তার সঙ্গে ঋতু গুহর গলার গান শুনতে-শুনতে ভুলে যাই কানাডায় না কলকাতায় আছি।

এরকম মাঝে মাঝে ভুলে যাওয়া যায়। কাছাকাছি, অর্থাৎ পনেরো-কুড়ি মাইলের মধ্যে বেশ কিছু বাঙালি আছেন। পনেরো-কুড়ি মাইল তো এদেশে কোনও দূরত্বই না, কুড়ি-পঁচিশ মিনিটের ব্যাপার। গাড়ি ছাড়া রাস্তায় ঘোরাঘুরির কথা কেউ চিন্তাও করে না। এরকম দুপুরে জয়তীদির এক পিস্‌তুতো দিদি-জামাইবাবুরা থাকেন, সেখানে যাওয়া হয় মাঝে মাঝে। তা ছাড়া আরও কয়েকটি বাঙালি পরিবারের সঙ্গে ওঁদের ঘনিষ্ঠতা আছে। এক এক সপ্তাহান্তে এক এক বাড়িতে আড্ডা বসে।

সব বড় শহরেই ভারতীয়দের ক্লাব আছে। ভাষার ব্যবধানের জন্য বাঙালি-গুজরাতি-পাঞ্জাবিদের আলাদা প্রতিষ্ঠানও থাকে। এডমান্টনের বেঙ্গলি ক্লাবের উদ্যোগে মাঝে মাঝে নাচ-গানের জলসা, থিয়েটার হয় নিজেদের, কখনও-সখনও দেখা হয় বাংলা ফিল্ম। বাচ্চাদের বাংলা শেখাবার জন্য একটা সানডে স্কুলও করেছেন এঁরা। অবশ্য যেখানে বাঙালি থাকবে, সেখানে যে দলাদলিও থাকবে, তা বলাই বাহুল্য। এঁর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া, ইনি উপস্থিত থাকলে উনি আসবে না, অমুকের স্ত্রী তমুক বাড়িয়ে গিয়ে অন্য একজনের নামে কী যেন বলেছে, এরকম টিপিক্যাল বাঙালি ব্যাপারও যে এখানে বেশ স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত, তা দুদিন থেকেই টের পেয়ে যাই।

দীপকদাদের বিশিষ্ট বন্ধু বিমল ভট্টাচার্য ওসব সাতে পাঁচে নেই। প্রথম দিন আলাপেই উনি আমাকে একটা বিড়ি উপহার দিলেন। অতি দুর্লভ বস্তু। গত বছর দেশ থেকে এক বান্ডিল বিড়ি এনেছিলেন, তার মধ্যে শেষ দুটি মাত্র বাকি ছিল।

এরপর থেকে উনি ক্রমাগত নানা রকম জিনিস উপহার দিয়ে যেতে লাগলেন। দেশলাই-এর ছদ্মবেশে রেডিও, কলমের ছদ্মবেশে লাইটার কিংবা আলপিনের মধ্যে ঘড়ি, এইসব জিনিস ওঁর খুব পছন্দ। অতদিন দেশ ছাড়া, তবু চেহারায়-পোশাকে ও ব্যবহারে উনি একেবারে মজলিশি বাঙালি। ওঁর স্ত্রী মীরার মুখখানি সব সময় হাসিতে ঝলমল আর অফুরন্ত প্রাণশক্তি। দারুণ রান্না করেন, আর সবাইকে ডেকে ডেকে খাওয়াতে ভালোবাসেন। রাত দুপুরে একদল ছেলে যদি ঘুম ভাঙিয়ে তুলে ওঁকে বলেন, মীরাদি, আপনার হাতের খিচুড়ি খেতে খুব ইচ্ছে করছে, উনি অমনি ঝাঁ করে খিচুড়ির সঙ্গে আরও নানান পদ রেঁধে ফেলবেন।

ওদের আর এক বন্ধু দিলীপ চক্রবর্তী, যিনি আমাকে উত্তর মেরুর রুই মাছ খাইয়েছিলেন, তিনি একটু স্বভাব-লাজুক। মানুষটি অতি মাত্রায় ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী পর্ণার যেমন মিষ্টি স্বভাব, তেমনই রান্নার হাত। দেশে থাকলে এই সব মহিলারা অতি উচ্চপদস্থ অফিসারের স্ত্রী হিসেবে গণ্য হতেন। কোনওদিন রান্না ঘরে ঢুকতেন কিনা সন্দেহ, সংসারের ভার থাকত ঠাকুর-চাকরের ওপর। কিন্তু এখানে যেহেতু সবাইকেই নিজের হাতের রান্না করতে হয়, সেইজন্য রান্নার নানারকম এক্সপেরিমেন্ট করতে-করতে হাতটি অতি সুস্বাদু হয়ে যায়। জয়তীদিও ছানার সন্দেশ বানাতে জানেন। দেশে থাকতে আমি যত না মিষ্টি খেয়েছি, তার চেয়ে বেশি মিষ্টি খেতে হয়েছে এখানে এসে। যেকোনও বাড়িতে গেলেই সন্দেশ-রসগোল্লা খেতে হয়, সবই বাড়িতে তৈরি।

একটু দূরে থাকেন ডাক্তার মিহির রায়। ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ধরনের মানুষ। তাঁর স্ত্রী সুপর্ণাও খুব সপ্রতিভ আর হাসিখুশি মহিলা। ওঁদের বাড়িতে একদিন নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে ডাক্তার রায় অনেক পুরোনো-পুরোনো বাংলা গানের রেকর্ড বাজিয়ে শোনালেন। সেই সন্ধ্যায় সেই ঘরের আবহাওয়া যেন পুরোপুরি কলকাতার হয়ে গেল। কিংবা বড়জোর বলা যায় শিলং কিংবা পুণা।

দীপকদা, বিমলবাবু আর দিলীপবাবু এক সঙ্গে হলেই তাস খেলতে বসেন। ব্রিজ। আমার অনেকদিন তাস খেলার অভ্যেস নেই, বিদ্যেটা একটু ঝালিয়ে নিয়ে ওঁদের পার্টনার হতে লাগলুম প্রায়ই। অনেক বাড়িতে যেমন একটা বেকার গলগ্রহ ভাগ্নে বা ভাইপো থাকে, আমার অবস্থা প্রায় সেই রকম। দীপকদা-জয়তীদিদের বাড়িতে আশ্রিত হয়ে আছি, ওঁদের যেখানে যেখানে নেমন্তন্ন হয়, আমিও সেখানে সেখানে ওঁদের সঙ্গে যাই, অনেকে চোখের ইশারায় জিগ্যেস করে, এ আবার কে?

দীপকদা আমাকে ছাড়ছেনও না, আর এখানে আমার কিছু করবারও নেই। সারাদিন ফাঁকা

বাড়িতে শুয়ে বসে বইটই পড়ি, কারণ একা-একা শহরে ঘুরে বেড়াবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সন্ধেবেলা ওঁরা বাড়ি ফিরলে কিছুক্ষণ আড্ডা হয়।

এখানে বাঙালিদের আর একটি মিলন-উপলক্ষ্য হল হিন্দি ফিল্ম। ভিডিও ক্যাসেটে সমস্ত হিন্দি ফিল্ম পাওয়া যায়, এমনকী যেসব ছবি এখনও ভারতে রিলিজ করেনি, সেইসব টাটকা ছবিরও। কিছু কিছু দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্মেরও ক্যাসেট পাওয়া যায় কিন্তু বাংলা ফিল্মের এখনও সে সৌভাগ্য হয়নি। এই ক্যাসেটগুলো কেনারও দরকার নেই, ভাড়া পাওয়া যায় সব জায়গায়, তাও ক্রমশই বেশ সস্তা হয়ে যাচ্ছে, যেমন ধরা যাক এক ডলার। বাড়ি থেকে বেরুতে হবে না, ঘরে বসেই ভি সি আর-এ দেখা যাবে পুরো একটা ফিল্ম। সিনেমা যেহেতু একা দেখে সুখ নেই তাই শুক্কুর-শনিবার রাত্তিরে কোনও না কোনও বাড়ি থেকে ডাক আসে, এই আমার বাড়িতে সিলসিলা এসেছে চলে এসো। কিংবা ইয়ারানা কিংবা এক দুজে কে লিয়ে কিংবা কাতিলোঁ কি কাতিল! মার-দাঙ্গা-কান্নাকাটি-নাচ-গান-প্রেম-বিরহ-স্নেহ-প্রতিহিংসা ইত্যাদি সব কিছুই থাকে প্রত্যেক ফিল্ম।

এই রকম ডাক এলে দীপকদাদের সঙ্গে আমিও চলে যাই। কয়েক সপ্তাহ পরেই আমি আবিষ্কার করলুম, যে-আমি দেশে থাকতে কক্ষনো ওই সব সিনেমা দেখি না, সুদূর কানাডায় এসে সেই আমি রীতিমতন হিন্দি-সিনেমার ফ্যান হয়ে গেছি। অন্যদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ধর্মেন্দ্রর ও অমিতাভ বচ্চনের তুলনামূলক আলোচনা করছি।

॥ ১৩ ॥

মাঝে মাঝে আমি ভাববার চেষ্টা করি, এইসব দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের কোথায় কোথায় মিল।

একটু ফাঁকা জায়গা দিয়ে গাড়ি করে যেতে-যেতে মনে হয়, এখন অনায়াসেই ভাবতে পারি যে নিজের দেশেরই কোনও জায়গা দিয়ে যাচ্ছি। আকাশ তো একই রকম, দূরের মাঠও একই রকম। গাছপালার, চেহারা একটু আলাদা হলেও কিছু আসে যায় না, কাশ্মীর বা শিলং-এর গাছ আর পুরুলিয়া-বর্ধমানের গাছও তো আলাদা। রাস্তার পাশে খানাডোবা দেখলে আমার বড্ড আনন্দ হয়, খুব চেনা লাগে। নোংরা জলের সেরকম খানাডোবা এদেশে একেবারে দুর্লভ নয়।

কিন্তু তফাত আসলে অনেক। পৃথিবীর এ-পিঠ আর ও-পিঠ, তফাত হবে না?

যেকোনও বাড়ি দেখলেই মনে পড়ে যায়, অন্য দেশে আছি। খুব বরফ পড়ে বলে কোনও বাড়িরই ছাদ সমতল নয়। এ দেশের সাধারণ লোকের বসত বাড়ি একতলা বা দোতলা এবং প্রায় পুরোটাই কাঠের তৈরি, এইসব বাড়ির ছাদ সমতল হলে ওপরে বরফ জমে ছাদ ভেঙে পড়বে। এরকম চুড়োওয়ালা বাড়ি আমাদের দেশের শৈল নিবাসগুলিতে কিছু-কিছু চোখে পড়লেও সেগুলোকে আমরা সাহেবি বাড়ি বলেই জানি।

বাড়ির পরেই গাড়ি। এতরকমের গাড়ি তো আমাদের দেশে দেখবার উপায় নেই। এক জায়গায় যদি তিরিশটা গাড়ি থেমে থাকে, তবে তিরিশটাই আলাদা মডেলের। গাড়িগুলি চলে নিঃশব্দে, ভেতরে বসে থাকলে তো কোনও আওয়াজই পাওয়া যায় না, আর প্রায় প্রতিটি গাড়িই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। গাড়িতে হর্ন থাকে একটা অলঙ্কার হিসেবে, কেউ হর্ন বাজায় না। দৈবাৎ কারুর হর্নে হাত লেগে গেলে সে লজ্জায় জিভ কাটে। কোনও গাড়ির পিছনে হর্ন দেওয়া মানে তাকে প্যাঁক দেওয়া। একমাত্র যারা নতুন বিয়ে করে চার্চ থেকে বেরোয়, তখন তারা প্যাঁপ্যাঁ করে হর্ন বাজাতে বাজাতে যায়। সেরকম ভাবলে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি গাড়িই নতুন বিবাহিতদের।

এরা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের গাড়ি কেনে। যার যেরকম গাড়ি পছন্দ তা কিনতে বাধা নেই। আমাদের ভারতবর্ষে যে বিদেশি গাড়ি নিষিদ্ধ তার জন্য আমাদের গর্ব হওয়ার কথা। আমরা

নিজেদের গাড়ি বানাই, এশিয়ার অনেক গরিব দেশ মোটর গাড়িতে স্বনির্ভর নয়। বেশ ভালো কথা। কিন্তু এদেশের লোকরা যখন জিগ্যেস করে, তোমাদের গাড়ি দিন দিন খারাপ হচ্ছে কেন, তখন উত্তর খুঁজে পাই না। আমরা অনেকেই বলি, পুরোনো মডেলের অ্যাম্বাসাডর কিংবা ফিয়াট এখনকার নতুনগুলোর তুলনায় অনেক ভালো। এদেশের বিচারে এটা অত্যন্ত অদ্ভুত। যন্ত্রপাতির জিনিস তো দিন দিন আরও উন্নত, আরও ভালো হওয়ার কথা। আমাদের দিশি গাড়িগুলোর কলকবজা দিন-দিন নিকৃষ্ট হচ্ছে আবার দামও বেড়ে যাচ্ছে। এদের গাড়ি দিন দিন উন্নত মানের ও বেশি আরামদায়ক হচ্ছে, সেই তুলনায় দামও কমছে। জাপানি গাড়ির সস্তা দামের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে তো আমেরিকায় গাড়ি-কোম্পানিগুলির ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। জাপান না হয় শিল্প-জাদুকরদের দেশ, কিন্তু শুনছি ছোট্ট দেশ উত্তর কোরিয়া আরও সস্তা আরও মজবুত গাড়ি নিয়ে এখানকার বাজারে ধেয়ে আসছে। তবে কেন ভারতীয় গাড়ি এখানকার রাস্তা দিয়ে চলবে না?

চালককে সাবধান করে দেওয়ার জন্য এখানকার গাড়িতে নানা রকম শব্দ হয় ও আলো জ্বলে ওঠে তো বটেই, কোনও-কোনও গাড়ি আবার কথাও বলে। কেউ হয়তো ব্যাক লাইট না নিভিয়ে ভুল করে নেমে পড়ছে, অমনি গাড়ি বলে উঠল, ওগো প্রিয়, তুমি যে বাতি নেভাতে ভুলে গেছ। নিভিয়ে দিয়ে যাও, লক্ষ্মীটি! তাও পুরোনো স্ত্রীর মতন ঘ্যানঘ্যানে গলায় নয়, নতুন প্রেমিকার মতন সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরে।

গাড়ির পরে রাস্তা। ভালো রাস্তা যে আমাদের দেশে নেই তা নয়, চওড়া রাস্তাও কিছু কিছু আছে, কিন্তু মাইলের পর মাইল, একশো, দুশো, পাঁচশো, হাজার মাইল একইরকম মসৃণ বিশাল রাস্তার কথা কি আমরা কল্পনা করতে পারি? একটাও ট্রাফিক লাইটে থামতে হবে না এইরকমভাবে একশো-দুশো মাইল চলে যাওয়া যায়। শহরের বাইরে সব রাস্তায় যাওয়া-আসার পথ আলাদা। দু-দিকে চারটে-চারটে আটটা গাড়ি চলতে পারে, এমন রাস্তা উত্তর-আমেরিকা মহাদেশটাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

দেখে শুনে মনে হয়, এদেশে গাড়ি চালানো খুব সহজ। এত সহজ বলেই বোধহয় এদেশে গাড়ি দুর্ঘটনা হয় বেশি।

পুরো দেশটাই গাড়িনির্ভর। ছুতোর মিস্ত্রি, কলের মিস্ত্রি, পোস্টম্যান, স্কুল শিক্ষক এমনকী অনেক ছাত্রছাত্রীরও নিজস্ব গাড়ি আছে। যেকোনও লোক তার দু-তিন মাসের মাইনে জমিয়ে বেশ ঝকমকে তকতকে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনতে পারে। আর একেবারে নতুন গাড়িও কেনা যায় পাঁচ-ছ'মাসের মাইনেতে। একটা পরিসংখ্যান দেখছিলুম, আমেরিকায় লোকের নিম্নতম আয় সাড়ে আটশো ডলার। ডলারকে টাকাই ধরতে হবে এদেশের মান অনুযায়ী। আমাদের দেশের গরিবদের কথা বাদ দিচ্ছি, কিন্তু ব্যাঙ্কের পিওন বা কয়লাখনির শ্রমিকের আয় ওইরকমই টাকা। তারা গাড়ি করে ঘুরছে, এমন চিন্তা করা যায়? এদেশে কিন্তু আড়াই-তিন হাজার ডলারে বেশ চালু গাড়ি পাওয়া যায়। আর পরিসংখ্যান যাই বলুক, দোকান কর্মচারি বা ছুতোর মিস্তিরির রোজগার মাসে বারো-চোদ্দোশো ডলারের কম নয়।

মনে করুন, আপনার বাড়ির জলের পাইপে গুরুতর গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। শীতের সময় কলে গরম জল না এলে কিংবা কমোডের ফ্ল্যাশ ঠিক মতন কাজ না করলে সারা বাড়িতে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। আপনার বাড়ির নোংরা জল তো আর রাস্তায় যাওয়ার উপায় নেই, তেমন হলে মিউনিসিপ্যালিটি এমন ফাইন করবে যে আপনার ঘটি-বাটি বন্ধক দিতে হবে। সুতরাং জলের পাইপ খারাপ হওয়া মাত্র আপনি ডাক্তারকে কল দেওয়ার মতন টেলিফোনে কলের মিস্তিরিকে খবর দিলেন। মিস্তিরিমশাই যে-মুহূর্তে টেলিফোন ধরলেন, সেই মুহূর্ত থেকে তাঁর সময়ের হিসেব হবে। অবশ্য তিনি আসবেন ঝড়ের বেগে নিজস্ব গাড়ি হাঁকিয়ে, এসেই চটপট কাজ শুরু করে দেবেন। ধরা যাক, উনপঞ্চাশ মিনিট পর আপনার কল দিয়ে আবার ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল, আপনি

সন্তুষ্ট হয়ে ঘাড় নাড়লেন। তখন মিস্তিরিমশাই পকেট থেকে ক্যালকুলেটর বার করে, ধরুন মিনিটে দেড় ডলার হিসেবে তাঁর মজুরি কত হয় তা হিসেব করে ফেললেন। আপনার সাড়ে তিয়াত্তর ডলার খসে গেল।

আপনার মনে হতে পারে, ওরে বাপ্‌রে, এত রেট কলের মিস্তিরির। তা তো হবেই, কারণ তিনি তো প্রত্যেকদিনই ঘনঘন কল পান না। খরচ বাঁচাবার জন্য প্রত্যেকেই বাড়ির ছোটখাটো কাজ নিজের হাতে করে। মিস্তিরি মশাই হয়তো গড়ে মাসে তিরিশবার কল পান, সেইজন্যই তিনি উচ্চ রেট করে রেখেছেন, যাতে সমাজের আর পাঁচজনের মতন তিনিও সমান মর্যাদায় জীবন কাটাতে পারেন। কলের মিস্তিরির কাজ করেন বলে তিনি আর পাঁচজনের চেয়ে কোনও অংশে ছোট নন!

হাতি কেনা সহজ, কিন্তু তার প্রতিদিনের খাদ্য জোগাড় করাই যে আসলে বিরাট খরচের ব্যাপার, গাড়ির বেলাতেও সেইরকম তেল। ভারতে দিন দিন তেলের দাম আকাশ ছুঁচ্ছে, সেই তুলনায় এদেশে তেলের দাম অবিশ্বাস্য রকম সস্তা। এক গ্যালন (সাড়ে চার লিটার) তেলের দাম পাঁচ সিকে থেকে এক টাকা চল্লিশ পয়সার মধ্যে। এটা অবশ্য ডলারের হিসেব, টাকার হিসেবেও মাত্র এগারো-বারো টাকা! আমাদের দেশে যে ব্যক্তির আয় এক হাজার টাকা, সে যদি দেড় টাকায় পাঁচ লিটার পেট্রোল পেত, তাহলে নিশ্চয়ই ট্রাম-বাস এড়াবার জন্য যেকোনও উপায়ে মরিয়া হয়ে একটা গাড়ি কিনে ফেলত।

এদেশে তেল পাওয়া যায় দু-তিন রকম, লেডেড, আন লেডেড, সুপার লেডেড। গাড়ির তেলপোড়া ধোঁয়ায় স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় বলে এরা এখন চিন্তিত। সেই জন্য গাড়ির যন্ত্রপাতি পালটানো হচ্ছে, তেলও শুদ্ধ করা হচ্ছে।

এখানে একজন অধ্যাপকের একটি চমৎকার সুদৃশ্য দোতলা বাড়ি আছে, তাঁর দুটি গাড়ি, একটি স্ত্রীর জন্য, একটি নিজের জন্য, দুটি টিভি, তার মধ্যে একটি বাচ্চাদের ভিডিও খেলার জন্য, ডিস ওয়াশিং মেশিন আছে। তিনি তিনটি মেয়েকে পড়াবার খরচ চালান। এর মধ্যে একজন তাঁর স্ত্রী। তা ছাড়া এই অধ্যাপকের প্রচুর বই ও রেকর্ড কেনবার এবং ছবি তোলা ও ভ্রমণের শখ আছে। এবং আমার মতন ভ্যাগাবন্ড ঘুরতে-ঘুরতে এখানে এসে পড়লে তিনি অম্লানবদনে দিনের পর দিন আশ্রয় দেন। অর্থাৎ আমি দীপকদার কথা বলছি।

এঁর সঙ্গে আমাদের দেশের অধ্যাপকদের তুলনা করলে নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে। অবশ্য দীপকদা নিজের গাড়ি নিজেই ধোওয়া মোছা করেন, বাড়ির বাগানের ঘাস কাটেন, বাড়ি রং করার সময় নিজেই ব্রাশ আর রং নিয়ে বাড়ির ছাদে উঠে যান এবং একদিন অন্তর অন্তর বাড়ির বাসনপত্তর মাজেন। আমাদের দেশের অধ্যাপকরা করেন এসব কি কাজ?

হঠাৎ দেশ থেকে জয়তীদির মেজদি এসে উপস্থিত হলেন।

এঁরও চেহারা বেশ ছিপছিপে, তবে জয়তীদির মতন অতটা নন। চোখে চশমা, দারুণ ছটফটে। ভদ্রমহিলার চশমা দিনে অন্তত দশবার হারায়। সারা বাড়ির লোক চশমা খোঁজায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রতি এক ঘন্টা-দু'ঘন্টা অন্তরই মেজদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে অসহায় মুখ করে বলবেন, এই, আমার চশমাটা কোথায় রেখেছি? অমনি আমরা সবাই বেসমেন্ট থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত সব জায়গায় চশমা খুঁজতে শুরু করি। কখনও হয়তো মেজদির চশমা চোখেই আছে, তবু দীপকদা মজা করে জিগ্যেস করেন, মেজদি, আপনার চশমা? অমনি তিনি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠেন, তাই তো, কোথায় রাখলুম এই মাত্র?

মানুষের নাম ভুল করার ব্যাপারেও জুড়ি নেই মেজদির। আমার সংক্ষিপ্ত নীলু নামটির বদলে তিনি কখনও শম্ভু, কখনও মহেন্দ্র, কখনও ধনঞ্জয় ইত্যাদি কত নামেই যে ডাকেন, তার ঠিক

নেই। আমি অবশ্য প্রত্যেকবারই সাড়া দিয়ে যাই।

জয়তীদির ব্যক্তিত্ব আছে খুব, তিনি ছটফট করেন না, তিনি তাঁর এই ভুলোমনা মেজদিটিকে সামলাবার চেষ্টা করেন সব সময়। এক এক সময় বোঝাই যায় না, ওঁদের দুজনের মধ্যে কে বড় কে ছোট।

যাই হোক, এই মেজদি এসে পড়ায় বেশ জমে গেল। জয়তীদির পরীক্ষা হয়ে গেছে, তাঁর মেয়েদেরও ছুটি, দীপকদা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এক মাসের ছুটি নিয়েছেন, সুতরাং প্রায়ই নানান জায়গায় বেড়াতে যাওয়া শুরু হল। কোনওদিন বাইরের হোটেলে খাওয়া, কোনওদিন সিনেমা, কোনোদিন দূরের কোনও শপিং মহল ঘোরাঘুরি।

এ ছাড়া সপ্তাহান্তে এর ওর বাড়ি নেমন্তন্ন তো লেগে আছেই।

এর মধ্যে একদিন একটা জিনিস দেখে চমৎকৃত হলুম।

দীপকদা জয়তীদি এই বাড়িটা বিক্রি করে আর একটা বড় বাড়ি কেনার কথা ভাবছেন। এদেশে ভাড়া বাড়িতে থাকা সাংঘাতিক খরচের, তার চেয়ে কিছু টাকা জমিয়ে বাড়ি কিনে ফেলা অনেক সহজ। অনেক রকমের ঋণ পাওয়া যায়, বাড়ি কিনলে ইনকামট্যাক্সের অনেক সুবিধে হয়। এদেশে যেমন লোকেরা ঘনঘন গাড়ি বদল করে, সেইরকম কয়েক বছর অন্তর বাড়িও পালটায়। পুরোনো বাড়ি বিক্রি করে নতুন বাড়ি কেনার মধ্যে কী সব অঙ্কের ব্যাপারও আছে।

মেজদি আসার পর জয়তীদি নতুন বাড়ি দেখতে শুরু করলেন। আমিও ওঁদের সঙ্গী।

এমনভাবে যে বিক্রির জন্য বাড়ি সাজানো থাকে, তা কোনওদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

এখানে বাড়ি তৈরি ও বিক্রির নানারকম কোম্পানি আছে। তারা বাড়ি তৈরি করে নিখুঁতভাবে সাজিয়ে রেখে দেয়, ইচ্ছুক ক্রেতারা সেই সব বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখতে পারে। সেসব কী বাড়ি, দেখলে চোখ কপালে উঠে যায়।

কোনও কোনও পাড়ায় এরকম নতুন বাড়ি পরপর সাজানো আছে। এগুলোকে বলে শো-হাউজ। কোনও একটা বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টা বাজালেই একজন কেউ দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা করবে। তারপর সেই লোকটি বা ভদ্রমহিলাটি সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সারা বাড়ি দেখাবে, অথবা, ইচ্ছুক ক্রেতারা নিজেরাই ইচ্ছে করলে যেকোনও জায়গায় ঘুরে দেখতে পারে। সমস্ত বাড়িতে কার্পেট পাতা, জানালায় রং মেলানো পরদা, দেওয়াল আলমারির রং ও ডিজাইন অনুযায়ী বিশেষ রকমের চেয়ার ও টেবিল, খাট, বিছানা। এমনকী বসবার ঘরে যেটা তাস খেলার টেবিল, তার ওপরে রাখা আছে দু'সেট তাস, টেবিলে কাপ-ডিশ ও টি পট, কোনও কোনও দেওয়ালে ছবি পর্যন্ত। অর্থাৎ এই মুহূর্তে দাম চুকিয়ে দিয়ে যে-কেউ এক্ষুনি এই বাড়িতে বসবাস করতে পারে।

ঠিক যেন হলিউডের কোনও সিনেমার সেট, এক্ষুনি শুটিং শুরু হবে।

বাড়ি বিক্রি কোম্পানির যে প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত, তাকে বললে যেকোনও আসবাব বা কার্পেট-এর রং বদলে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। দাম কীরকম? দাম বলবে, দেড় লক্ষ টাকা...আস্কিং। অর্থাৎ ওই টাকা চাওয়া হলেও দরাদরির সুযোগ আছে।

বাড়িগুলো বাইরে থেকে প্রায় একরকম দেখতে হলেও, প্রত্যেক বাড়িরই ভেতরের ব্যবস্থা আলাদা। কত রকম ডিজাইনই যে মন থেকে বার করতে পারে।

আমরা ঘুরে ঘুরে এরকম বেশ কয়েকটা বাড়ি দেখে ফেললুম। আমি নিজেই এমন ভাব করতে লাগলুম, যেন এক্ষুনি একটা বাড়ি কিনে ফেলতে পারি, নেহাত দোতলায় ওঠার সিঁড়িটা পছন্দ হচ্ছে না। কোনও বাড়ি দেখতে গিয়ে রক্ষয়িত্রীকে গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করি, বাথরুমে পিঙ্ক রঙের বাথটবটা বেশ ভালোই লাগছে কিন্তু সনা বাথের ব্যবস্থা নেই?

আমরা কালো লোক হলেও এই সব বাড়ি কোম্পানির প্রতিনিধিরা আমাদের মোটেই অবজ্ঞা করে না, আমরা সত্যিই ক্রেতা কিনা তাতেও সন্দেহ করে না। কানাডায় ভারতীয়রা বেশ সচ্ছল

সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত।

কুড়ি-পঁচিশটা বাড়ি দেখার পরও জয়ন্তীদির বা তাঁর মেজদির একটাও বাড়ি পছন্দ হল না। আমিও বাড়ি দেখে ক্লান্ত হয়ে গেলুম।

অতিথি কথাটার মানে বোধহয় এই যে, এক তিথির বেশি থাকে না। দীপকদার বাড়িতে আমার পনেরো দিনের বেশি কেটে গেছে। ইংরেজিতে একটা কথা আছে যত তোমার আতিথ্যকে লম্বা করবে, তত তোমার সমাদর কমে যাবে। কিংবা, আরও বলে, মাছ এবং অতিথি দুদিন পরেই পচা গন্ধ ছাড়তে শুরু করে। সুতরাং এবার আমার কেটে পড়াই উচিত।

একদিন কাঁচুমাচু মুখ করে দীপকদাকে বললুম, দীপকদা...মানে...এবার তাহলে আমি যাই...আমার অন্য জায়গায় যাওয়ার কথা আছে...যদি দয়া করে একটু এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেন...।

দীপকদা বললেন পাগল নাকি! এক্ষুনি কোথায় যাবে? তোমায় কি আটকে রেখেছি এমনি-এমনি? মেজদি এসে গেছেন, এবার আমরা অনেক দুরে বেড়াতে যাব।

সত্যি-সত্যি এর দুদিন পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লুম দূরপাল্লার ভ্রমণে।

॥ ১৪ ॥

আজ সকালে ছিলুম মিদ্‌নাপুরে, কাল দুপুরে চলে গেলুম ম্যাড্রাসে। এমনিতে শুনলে এমন কিছু আশ্চর্য মনে হয় না, কিন্তু এই মিদ্‌নাপুরের সঙ্গে মেদিনীপুরের কোনও সম্পর্ক নেই, আর ওই ম্যাড্রাস আমাদের ম্যাড্রাস থেকে প্রায় চোদ্দো-পনেরো হাজার মাইল দূরে।

ক্যানাডার ক্যালঘেরি শহরের একটা অঞ্চলের নাম মিদ্‌নাপুর। কেন ওই নাম তা কেউ জানে না। খুব সরল অনুমান এই যে বাংলার মেদিনীপুর জেলা থেকে কোনও সাহেব কোনও সময়ে কানাডায় চলে গিয়ে বসতি নিয়েছিলেন, এবং মেদিনীপুরের প্রিয় স্মৃতি অক্ষুণ্ন রাখবার জন্য সেই নামটিই রেখেছেন।

এরকম নাম অনেক আছে।

এই বিশাল দেশে এসে মুষ্টিমেয় শ্বেতাঙ্গরা নিশ্চয়ই প্রথমে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। প্রায় কুমারী, উর্বর ভূমি, ভেষজ ও খনিজ সম্পদেও প্রকৃতি অকৃপণ। একটার পর একটা অঞ্চল দখল করতে-করতে এগিয়ে নাম রাখার ব্যাপারে অভিযাত্রীরা খুব সমস্যায় পড়েছিল। প্রথম অভিযাত্রীদল যত বেশি যোদ্ধা ছিল, তত কল্পনাশক্তি তাদের ছিল না। তাই জায়গার নাম রাখার ব্যাপারে তারা অনেকসময় পূর্ব পরিচিত নামের সঙ্গেই একটা করে নিউ জুড়ে নতুন উপনিবেশ বানিয়েছে। যেমন নিউ ইয়র্ক, নিউ ইংল্যান্ড, নিউ অর্লিয়েন্স, নিউ হ্যাম্পশায়ার, ইত্যাদি। তারপর যার যা পরিচিত নাম এলোপাতাড়ি বসিয়ে দিয়েছে। দিল্লি-বোম্বাই কলিকাতা-মাদ্রাজ এর নামেও শহর আছে উত্তর আমেরিকায়। কলকাতা নামে একাধিক জায়গা এখানে আছে শুনেছি। কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখিনি বা যাইনি। মাদ্রাজ দেখেছি। এমনকী মস্কো নামের একটা শহরের পাশ দিয়েও আমরা গেছি। সেই শহরটি আইডাহো আর ওয়াশিংটন রাজ্যের সীমানায়।

এরকম নতুন নাম এখনও হচ্ছে। এরই মধ্যে একদিন কাগজে পড়লুম, আচার্য রজনীশ ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর দলবল সমেত আমেরিকার উত্তর অঞ্চলে একটা কলোনি করেছেন। তার নাম হয়েছে রজনীশনগর। স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই নতুন নাম পত্তনে আপত্তি জানিয়েছে, কাগজে চিঠি লেখালেখি হচ্ছে যে আচার্য রজনীশ এবং তাঁর চ্যালারা ব্যভিচারী এবং কমুনিস্ট, সুতরাং তাদের কলোনিকে যেন শহরের মর্যাদা না দেওয়া হয়!

এডমান্টন থেকে বেরিয়ে আমরা প্রথমে এসে থেমেছিলুম ক্যালঘেরিতে। দুশো মাইলের কিছু

বেশি দূরত্ব, সে রাস্তা দীপকদা মেরে দিলেন পৌনে তিন ঘন্টায়।

দীপকদার দুখানা গাড়ির মধ্যে একটি ছোট্ট ছিমছাম, অন্যটি ঢাউস। এই দ্বিতীয় গাড়িটিই নেওয়া হয়েছে। এ গাড়িতে ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাস, থার্ড ক্লাস আছে। সামনের সিট অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাসে তিনজন বসতে পারে। সেকেন্ড ক্লাসে চারজন। আর থার্ড ক্লাসে মুখোমুখি দুসারি সিট, প্রয়োজনে সেগুলো তুলে দিলে দু-তিনজন বিছানা পেতে শুয়েও যেতে পারে।

অত যাত্রী নেই অবশ্য আমাদের। দীপকদা, জয়তীদি আর ওঁদের দুই মেয়ে জিয়া আর প্রিয়া। এ ছাড়া জয়তীদির মেজদি, শিবাজি রায় নামে আর একজন যুবক আর আমি তো আছিই।

ক্যালঘেরিতে একদিন থামা হল। কারণ এখানে মেজদির ঘনিষ্ঠ বান্ধবী থাকেন একজন। কলকাতায় যিনি এষা মুখার্জি নামে খ্যাতনাম্নী ছিলেন, তিনি এখানে এসে হয়েছেন এষা চৌধুরি। এষা দেবীর মুখ দিয়ে সর্বক্ষণ কথার ফুলঝুরি ছোটে আর সর্বক্ষণ মুগ্ধ হয়ে তা শুনতে ইচ্ছে করে। মেয়েদের মধ্যে এরকম 'কথাশিল্পী' কদাচিৎ দেখা যায়। ওঁর স্বামী শ্যামলবাবু মৃদুভাষী কিন্তু সুরসিক। মাঝে-মাঝে টুকটুক করে এক আধটা মন্তব্য ছাড়েন। বান্ধবীকে পেয়ে এষা চৌধুরি দারুণ খুশি হয়ে হইচই এবং পার্টি লাগিয়ে দিলেন। সেই সুবাদে আমরাও বেশ খাতির যত্ন পেলুম।

ক্যালঘেরি শহরটি অতি মনোরম। পেট্রোলিয়ামের কল্যাণে দিন-দিন শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এখানে অলিম্পিক সংঘটনের জন্য শহরটি তৈরি হচ্ছে।

ক্যালঘেরি টাওয়ার একটি বিশাল উঁচু ব্যাপার, যার ওপরে উঠলে পুরো শহরটি দেখা যায়। এ শহরেও সত্তর-আশিতলা বাড়ির অভাব নেই। টাওয়ারটি তার চেয়েও উঁচু, এবং চূড়ায় যে রেস্তোরাঁটি রয়েছে, সেটি আস্তে-আস্তে ঘোরে। অর্থাৎ এক জায়গায় টেবিল নিয়ে বসে খাবার খেতে-খেতেই আমরা পুরো শহরের দৃশ্যপটটি উপভোগ করতে পারলুম।

এষা দেবী এত হাসিখুশি মানুষ, তবু মাঝে-মাঝে তাঁর খুব মন খারাপ হয়। এখানে মন টিকছে না। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। আমাদের দেখে যেন দেশের জন্য আরও উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু দেশে ফেরার অনেক বাস্তব অসুবিধে আছে। শ্যামলবাবু যে বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, সে ব্যাপারের উপযুক্ত চাকরি আমাদের দেশে বেশি নেই।

এষাকে আমাদের কলকাতার এক বিখ্যাত মহিলা নাকি বলে দিয়েছিলেন, দ্যাখ, যখন খুব মন খারাপ হবে, তখন রেফ্রিজারেটারের দরজা খুলে ভেতরটাতে তাকিয়ে থাকবি। ওসব তো আর দেশে ফিরে গেলে পাবি না। খুব ন্যায্য কথা। ওরকম খাঁটি দুধ, পাঁচ রকমের মাংস, পনেরো রকমের কেক প্যাসট্রি ইত্যাদি যা সব সময় সবার বাড়িতে মজুত থাকে, তা কলকাতায় পাওয়ার কথা চিন্তাও করা যায় না।

কিন্তু আমি ভাবলুম, উপনিষদের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিগ্যেস করেছিলেন, যা নিয়ে আমি অমৃত হব না, তা নিয়ে আমি কী করব! আর কলকাতার মৈত্রেয়ী কি না বললেন, খাবারদাবারের কথা? কালের কী বিচিত্র গতি! অবশ্য, ইস্কুল-কলেজের 'এসে'-তে ছেলেমেয়েরা অনেকেই মৈত্রেয়ীর ওই উক্তির কোটেশন দেয় বটে, কিন্তু মৈত্রেয়ীর ওই আদিখ্যেতার কথা শুনে যাজ্ঞবল্ক্য তার উত্তরে যে কী রকম কড়কে দিয়েছিলেন, তা অনেকেই জানে না। জানাবার দায়িত্বও আমার নয়। সুতরাং একালের মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য-এর মতন সঠিক জ্ঞানের কথাই বলেছেন বটে। রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন, "জেনো, বাসনার সেরা বাসা রসনায়"!

ক্যালঘেরি থেকে বেরুবার পরই আমাদের সত্যিকারের যাত্রা শুরু হল। বলতে গেলে নিরুদ্দেশ যাত্রা।

আমাদের শেষ পর্যন্ত একটা লক্ষ্যস্থল আছে বটে, কিন্তু কোন পথে কিংবা কবে সেখানে পৌঁছব, তার ঠিক নেই। অনেকগুলো ম্যাপ সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। নেভিগেটারের দায়িত্ব প্রথমে শিবাজি রায় নিয়েছিলেন যদিও, কিন্তু একদিন পরেই আমরা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে পদচ্যুত করলুম, সে দায়িত্ব

নিলেন জয়তীদি। তাঁর যেমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তেমনি চোখ সজাগ। এসব রাস্তায় একবার ডানদিক বা বাঁদিক ঘুরতে ভুল করলেই পঞ্চাশ-একশো মাইল ঘোরপথের ধাক্কা। নেভিগেটার হওয়ার বদলে শিবাজি রায় মজার কথা বলে আমাদের আনন্দ দেওয়ার ভার নিলেন। আমার ওপর ভার রইল, যথা সময়ে কফি কিংবা আপেল খাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেওয়া আর মেজদির চশমা খোঁজার। চলন্ত গাড়িতেও সেই মহিলা ঘন্টায় দু-বার করে চশমা হারাতে লাগলেন।

ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার নাম বাল্যকালে ভূগোলে পড়েছি শুধু। সেই রাজ্য ধরে এখন চলেছে আমাদের গাড়ি। পথের দু-পাশে জঙ্গলময় পাহাড়। এগুলোই বোধহয় রকি মাউন্টেনস। এদিকে জনবসতি খুবই কম। তবে আধ ঘণ্টা, এক ঘণ্টা পরপরই এসে যাবে গ্যাস স্টেশন, খাবার জায়গা, রাত্রি বাসের জন্য মোটেল।

পথ দিয়ে যেতে-যেতেই রাস্তার দুধারে অনবরত নির্দেশ দেখা যাবে, আর কত মাইল দূরে গ্যাস স্টেশন। সেখানে কী কী সুযোগ-সুবিধে আছে। মোটেল আছে কি না। এদেশের রাস্তাটাই যেন একটা শিল্প। এই শিল্পকে নিখুঁত করার জন্য এদের যত্নের অন্ত নেই।

আরও একটা চমৎকার জিনিস আছে রাস্তার ধারে-ধারে। তার নাম রেস্ট এরিয়া। গাড়ি চালাতে-চালাতে যদি কখনও ক্লান্তি বা একঘেয়েমি আসে তার জন্য এই বিশ্রামের ব্যবস্থা রয়েছে। তরু ছায়াময় একটি চমৎকার নিরিবিলি জায়গা, সেখানে রয়েছে বসার জায়গা, পানীয় জল, বাথরুম, আর টেলিফোনের ব্যবস্থা। সবই বিনা পয়সায়। গাড়ি থামিয়ে সেখানে যতক্ষণ খুশি আলস্য করা যায়। সঙ্গের খাবারদাবার খেয়ে নেওয়া যায়। এই জায়গাগুলিকে দেখলে আমার ঠিক মরুদ্যানের কথা মনে হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ মাইল অন্তর-অন্তর এরকম একটি করে মরুদ্যান। এখানকার গাছগুলো অধিকাংশ ইউক্যালিপটাস, তাই বাতাসে চমৎকার সুগন্ধ।

সঙ্গে খাবার থাক বা না-ই থাক, খিদে বা তেষ্টা পেলে পছন্দমতো খাবার জায়গা পেতে একটুও অসুবিধে নেই। পকেটের উত্তাপ অনুযায়ী নানা রকম পান-ভোজনালয়। যার পকেট গরম সে যদি ওয়াইন বা বিয়ার সহযোগে পাঁচ-সাত কোর্সের লাঞ্চ-ডিনার খেতে চায়, তারও ব্যবস্থা আছে। আবার সস্তায় চট করে কিছু একটা খেয়ে নেওয়ার জায়গাও অসংখ্য। সস্তায় সবচেয়ে ভালো খাবারের দোকানের রাজা হল ম্যাকডোনাল্ড। এদের দোকানের সংখ্যা যে কত লক্ষ তা বলা আমার পক্ষে অসাধ্য। যেকোনও ছোট শহরেই একটা করে ম্যাকডোনাল্ড। আর আশ্চর্য ব্যাপার, এদের সব দোকানেই এদের খাবার একই রকমের ভালো, আর দামও এক। সুরা বা মদিরা বিক্রি করে না এরা, এদের মতন চমৎকার আলুভাজা ও কফি পাঁচতারার হোটেলগুলোও দিতে পারে না, আর এদের হামবার্গারের স্বাদ তো জগৎ বিখ্যাত। এদের সব দোকানই দারুণ খোলামেলা, বাইরে ভেতরে প্রচুর বসবার জায়গা, সেই রকমই পরিচ্ছন্ন, ঝকঝকে, তকতকে। কাউন্টার থেকে নিজেদেরই খাবার আনতে হয়। এঁটো গেলাস-প্লেট খরিদ্দাররা নিজেরাই যথাস্থানে রেখে দিয়ে আসে। ম্যাকডোনাল্ডের তুল্য সস্তা, বিশুদ্ধ ও সুস্বাদু খাবারের দোকান আমাদের সারা দেশে একটাও নেই। এদেশে ম্যাকডোনাল্ড তো কয়েক লক্ষ বটেই, তা ছাড়াও ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া 'বার্গার কিং' বা ওই জাতীয় নামের আরও অন্যান্য কোম্পানির দোকান আরও কয়েক লক্ষ।

ব্রিটিশ কলম্বিয়া ছেড়ে আমরা ওয়াশিংটন প্রদেশের সীমানা দিয়ে ঢুকে পড়লুম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

এখানকার চেক পোস্টে ইমগ্রেশন অফিসারটির বয়েস বাইশ-তেইশ বছরের বেশি নয়। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট লম্বা হলেও মুখখানা একেবারে বালকের মতন। প্রথমে সে মন দিয়ে আমাদের ভিসা ইত্যাদি পরীক্ষা করল, তারপর সন্তুষ্ট হতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমাদের সঙ্গে খুব আন্তরিক ব্যবহার করতে লাগল। কোন রাস্তা দিয়ে গেলে আমাদের পথ সংক্ষিপ্ত হবে, কোথায় রাত কাটানো বেশি আরামদায়ক, আর ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢোকবার সময় গাড়িতে কিন্তু আপেল-টাপেল জাতীয় কোনও

ফল রেখো না, জানো তো মেড্ ফ্লাই (ভূমধ্যসাগরের মাছি) নিয়ে ওখানে কত ঝামেলা হচ্ছে। আমাদের গাড়ি ছাড়ার সময় সে হাতছানি দিয়ে আমাদের বিদায় জানাল পর্যন্ত। কোনও বিমানবন্দরে আমরা কক্ষনো এরকম ভালো ব্যবহার পাই না। বিমান বন্দরের অফিসাররা যেন মানুষ নয়, সবাই এক-একটি যন্ত্র।

আমেরিকা ও কানাডার প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রথম-প্রথম এক রকম হলেও আমেরিকার ধরন-ধারণই যেন একটু আলাদা মনে হয়। রাস্তার নিয়মকানুনের বেশ কড়াকড়ি। এখানকার হাইওয়েতে গতি সীমা পঞ্চান্ন মাইল মাত্র, সেটা সত্যি দুঃখের ব্যাপার। এখানকার গাড়িগুলো অশ্বশক্তির বদলে যেন বাঘ-শক্তিতে চলে, ঘন্টায় একশো কুড়ি কী দেড়শো মাইল বেমালুম চলে যেতে পারে, সেই সব গাড়িকে পঞ্চান্ন মাইলের বল্গায় বেঁধে রাখার কোনও মানে হয়! এক দশক আগেও মার্কিন দেশের গাড়ি গড়ে সত্তর থেকে নব্বই মাইল গতিতে চলত। কিন্তু মাঝখানে একবার তেল সংকটের সময় নাকি হিসেব করে দেখা হয়েছে যে, পঞ্চান্ন মাইল গতিতে চললেই গাড়ির তেল সবচেয়ে কম খরচ হয়। তা ছাড়া দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কম।

গতিসীমা ভঙ্গ করলেই ফ্যাসাদ। জরিমানা, লাইসেন্স বাতিল থেকে কারাদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। মোড়ে-মোড়ে ট্র্যাফিক পুলিশ থাকে না বটে কিন্তু হেলিকপ্টার, এরোপ্লেনে উড়ে-উড়ে পুলিশ রাস্তার গাড়ির গতি মাপে। তা ছাড়া আছে র‍্যাডার যন্ত্র। এবং ভ্রাম্যমাণ পুলিশের গাড়িতো আছেই। নির্জন রাস্তায় ঝোপঝাড়ের আড়ালে মোটরবাইক চেপে লুকিয়ে থাকে পুলিশ, কোনও গাড়ি একটু নিরিবিলি দেখে নিয়মভঙ্গ করলেই এসে ক্যাঁক করে চেপে ধরবে।

গাড়ি চালাবার সময় মদ্যপান নিষিদ্ধ। এমনকী গাড়িতে ছিপিখোলা কোনও মদের বোতল রাখাও অপরাধ। যখন তখন পুলিশ এসে গাড়ি থামিয়ে চেক করতে পারে। আগে থেকে মদ খাওয়া থাকলেও তিন পেগের বেশি হলেই ব্রিদালাইজার পরীক্ষায় ধরা পড়ে যাবে।

দীপকদা এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প শোনালেন।

একবার তিনি এক পার্টি থেকে তাঁর এক বন্ধুর গাড়িতে ফিরছিলেন। সঙ্গে ছিলেন বন্ধুর স্ত্রী। মধ্যরাত্রি পেরিয়ে গেছে। বন্ধুটি বেশ খানিকটা হুইস্কি পান করলেও বেপরোয়াভাবে ধরেছিলেন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইল, ভেবেছিলেন ঠিক বাড়ি পৌঁছে যাবেন। গাড়িটা মাঝে-মাঝে দু-একবার লগবগ করতেই হঠাৎ কোথা থেকে একটা পুলিশের গাড়ি প্যাঁ-পোঁ করতে-করতে এসে ধরে পড়ল। একেবারে শেষ মুহূর্তে গাড়ি থামিয়ে বন্ধুটি বুদ্ধি খাটিয়ে চট করে নিজে স্টিয়ারিং থেকে সরে গিয়ে নিজের স্ত্রীকে বসিয়ে দিলেন সেই জায়গায়। যেন উনিই চালাচ্ছিলেন গাড়ি। ভদ্রমহিলার পায়ে তখন জুতো নেই, উনি গুটিশুটি মেরে ঘুমোচ্ছিলেন একটু আগে। সেই অবস্থাতেই কোনওক্রমে সামনে সপ্রতিভ হয়ে বসলেন।

পুলিশ ভদ্রমহিলাকে বললেন, নেমে এসো! তুমি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছ।

ভদ্রমহিলা বললেন, বাজে কথা। আমি এক ফোঁটা খাইনি।

পুলিশ বলল, বটে! এই রাস্তার মাঝখানের লাইন দিয়ে একশো গজ সোজা হেঁটে দেখাও তো।

ভদ্রমহিলা দিব্যি একশো গজ সোজা হেঁটে দেখিয়ে দিলেন।

তখন সেই পুলিশ অফিসার তার টুপি ছুঁয়ে বললেন, লেডি, তুমি একটু আগে যেরকম গাড়ি চালাচ্ছিলে, তাতে আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি তুমি অন্তত দশ পেগ খেয়েছ। কিন্তু তোমার সহ্য করার ক্ষমতা আছে বটে। বাপস! তোমার ক্ষুরে-ক্ষুরে দণ্ডবৎ!

তারপর পুলিশটি ভদ্রমহিলার মট্‌কা-মারা স্বামীকে ডেকে বলল, এই, তোমার লাইসেন্স আছে? দয়া করে তুমি তোমার এই ভয়ংকরী স্ত্রীটির বদলে নিজে গাড়ি চালাও!

গল্পটা শুনে আমরা হেসে উঠলুম। তারপর আমি জিগ্যেস করলুম, দীপকদা, গল্পটা তো

খুব আপনার এক বন্ধুর নামে চালালেন। আসলে নিশ্চয়ই আপনার আর জয়তীদির অভিজ্ঞতা?

জয়তীদি হাসতে-হাসতে বললেন, না, তখন আমি ছিলুম না, তার মানে তখনও আমাদের বিয়ে হয়নি। সেই আমলে ও-ও মাঝে-মাঝে হুইস্কিতে টইটম্বুর হত নিশ্চয়ই। নইলে বন্ধুর বদলে ও নিজে সেদিন গাড়ি চালায়নি কেন?

সত্যি এখানকার পুলিশের গাড়ি দেখলেই গা ছমছম করে। গাড়ির মাথায় লাল-নীল আলো সব সময় ঘোরে, আর পুলিশের গাড়ি যখন কারুকে তাড়া করে তখন এক সঙ্গে অনেকগুলো শিয়ালের ডাকের মতন শব্দ হয়। আর কী স্মার্ট চেহারা ও পোশাক এখানকার পুলিশদের, যেন আইন ভঙ্গকারীদের ধরাই ওদের ধ্যান জ্ঞান।

আমেরিকার রাজপথের প্যাট্রোল পুলিশকে কেউ কোনওদিন ঘুষ দিতে পেরেছে এমন কথা শুনিনি।

হয়তো আমরা কখনও অপূর্বসুন্দর এক হ্রদের পাশ দিয়ে যাচ্ছি, অন্য পাশে নানা রঙের গাছের সারি, হঠাৎ পাশ দিয়ে একটা পুলিশের গাড়ি যেতেই আমরা শিউরে উঠি। দৃশ্য উপভোগ করার বাসনা মাথায় উঠে যায়। যেন আমরা অপরাধী। এখানকার পুলিশদের অসীম ক্ষমতা, যেকোনও ছোট জায়গার শেরিফ ইচ্ছে করলেই আমাদের বিনা বিচারে জেলে ভরে দিতে পারে।

দীপকদা একটু হাত খুললেই আমাদের গাড়িটা একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেন বটে কিন্তু অসীম ধৈর্যের সঙ্গে পঞ্চান্ন মাইলেই চালাচ্ছেন।

কিছু একটা হিসেবের ভুলে আমরা চলে গেলুম আইডাহো প্রদেশে। এখানে তো আমাদের যাওয়ার কথা নয়। আমাদের পথ তো অরিগন রাজ্য দিয়ে, সেখানে স্পোকেন নামে মোটামুটি একটা বড় জায়গায় আমরা রাত কাটাব ঠিক করেছি।

আইডাহো একটা পাণ্ডব বর্জিত দেশ বললেই হয়। শহর যেন নেই, শত-শত মাইল ফাঁকা জায়গা। সন্ধের পর গা ছমছম করে। সবাই ঝুঁকে পড়ে ম্যাপ দেখতে লাগলুম, এ জায়গা ছেড়ে আমাদের অরিগনে ঢুকতেই হবে।

অন্যমনস্কভাবে দীপকদা বুঝি অ্যাকসিলারেটারে একটু জোরে চাপ দিয়ে ফেলেছিলেন, হঠাৎ দেখি মোড়ের মাথায় আলো জেলে পুলিশের গাড়ি অপেক্ষা করছে আর আমাদের থামতে ইঙ্গিত করছে।

থামতে আমরা বাধ্য। বুক দুপদুপ করছে। সবাইকে জেলে পাঠাবে? দীপকদার লাইসেন্স কেড়ে নেবে?

পুলিশ অফিসারটি বলল, তোমরা বাষট্টি মাইল স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছিলে।

দীপকদা কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, হয়তো!

পুলিশটি বলল, হয় তো নয়, সত্যি।

তারপর গাড়ির মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখল আমাদের। খুব সম্ভবত ভারতীয় নারীদের দেখেই মন গলে গেল তার। সে বলল, ঠিক আছে এই তোমাদের ফার্স্ট ওয়ার্নিং দিয়ে ছেড়ে দিলুম, আর এরকম কোরো না!

॥ ১৫ ॥

গায়ে যদি জামা না থাকে
পায়ে যদি জুতো না থাকে
তা হলে কেউ খাবারও দেবে না!

প্রথম একটি দোকানের দরজার বাইরে এরকম লেখা দেখে অবাক হয়েছিলুম। এর মানে কী? তাহলে আমাদের ঢুকতে দেবে তো?

কলকাতায় যেমন প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট আর চটি পরে ঘুরে বেড়াই, এদেশে এসে এখনও সেই বেশ পরিবর্তনের কোনও প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি টাই পরেছিলুম জীবনে মাত্র একবারই। বন্ধুদের কাছ থেকে গিঁট বাঁধা শিখে নিয়ে একদিন তো টাই পরে আয়নার সামনে দাঁড়ালুম। তারপর সাংঘাতিক চমকে উঠলুম। এ কে? আমার মনে হল, আমি যেন আমার বাবা-মায়ের ছেলেই নয়, অন্য কেউ, মারামারির সিনেমায় খলনায়কের শাগরেদ! সেই যে টাই খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলুম, আর জীবনে ছুঁইনি। কত লোককে টাই পরলে কী সুন্দর দেখায়, শুধু আমাকেই কিনা অন্য লোকের মতন, তাও আসল খলনায়ক নয়, তার শাগরেদের মতন!

টাই পরতে পারি না বলেই নিজের দেশে আমার ভদ্রগোছের কোনও চাকরিও জুটল না। খোদ ইংল্যান্ডেও বোধহয় এখন অনেক ছেলে গলায় টাই না বেঁধে চাকরির ইন্টারভিউ দিতে যায়, কিন্তু ভারতবর্ষে তা হওয়ার উপায় নেই। মৃণাল সেন একটা সিনেমায় এ ব্যাপার খুব ভালো দেখিয়েছেন।

আমি পারতপক্ষে মোজা আর শু-ও পরতে চাই না, চটি দিয়েই কাজ চালাই। অবশ্য তেমন ঠান্ডার জায়গায় গেলে পরতেই হয়।

আমাদের সঙ্গের শিবাজি রায় নামের যুবকটি বিলেত-আমেরিকায় আসবে বলে দামি নতুন বুটজুতো কিনে এনেছে। আর একেবারে নতুন জুতো আনলে যা হয় তাই হয়েছে, দুই গোড়ালিতে বিরাট ফোস্কা। তাকে তো চটিজুতো পরতেই হচ্ছে, তা ছাড়া গোড়ালিতে ব্যান্ডেজ।

সুতরাং দোকানের বাইরে যখন লেখা দেখি, 'নো শার্ট, নো শু, নো সার্ভিস', তখন আমাদের পা সম্পর্কে সচেতন হতে হয়। শু মানে তো আর চটিজুতো নয়। দেখাই যাক না কী হয়, এই ভেবে ঢুকে পড়া গেল। কেউ কোনও আপত্তি করল না, কেউ আমাদের পায়ের দিকে তাকালও না।

তা হলে 'নো শু' মানে খালি পা। 'নো শার্ট' মানে খালি গা? খালি গায়ে, খালি পায়ে কেউ সাহেবদের দোকানে খেতে আসে? একি আমাদের হরিদাসপুরের চায়ের দোকান? কিন্তু সাহেবদের দেশে সবই সম্ভব। সত্তরের দশকে যখন এই দেশটা হিপিতে ভরে গিয়েছিল, তখন সেই সব ছেলেমেয়েরা প্রথমেই পা থেকে জুতো বর্জন করেছিল, তারপর ছেলেরা খুলে ফেলেছিল গায়ের জামা, এমনকী, প্রথম-প্রথম টপ্‌লেসের যুগে, অনেক মেয়েও ঊর্ধ্বাঙ্গ কোনও পোশাকে ঢাকত না।

হিপিদের যুগ প্রায় শেষ। খানিকটা সেই ফ্যাশান চলে যাওয়ার জন্য। খানিকটা মরাল মেজরিটি এবং অন্যান্য সংস্থার দমননীতির জন্য। মার্কিন দেশের অভিভাবকশ্রেণি এখন ছেলেমেয়েদের সুপথে আনবার জন্য বদ্ধপরিকর। সেই জন্যই এরকম ব্যবস্থা।

ক্রমশ প্রায় দোকানের বাইরেই এইরকম নোটিশ চোখে পড়ে। বুড়ো সাহেব মেমরা দোকানে ঢোকবার আগে এই নিয়ে ঠাট্টাও করে। বুড়ি হয়তো তার স্বামীকে বলল, ডিয়ার, তুমি জুতো পরে এসেছ তো? বুড়ো বলল, ডার্লিং, তুমি জামা পরে আসতে ভুলে যাওনি তো, চোখে ভালো দেখতে পাচ্ছি না।

ম্যাকডোনাল্ড বা বার্গার কিং জাতীয় ফাস্ট ফুডের দোকানে এরকম নোটিশ চোখে পড়ে না অবশ্য। অনেকক্ষণ গাড়ি চালাবার পর কেউ সেখানে থেমে খালি পায়ে গেঞ্জি গায়ে ঢুকে পড়তে পারে। হিপি না হলেও খুব গরমের সময় অনেক ছেলে খালি গায়েও বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু ছোট-ছোট কিছু সাজানো গোছানো ব্যক্তিগত মালিকানার হোটেলে অনেক রকম মজার নিয়মকানুন। প্রথম দরজা ঠেলে ঢুকলেই একটা ছোট অপেক্ষা করার জায়গা, সেখানে কিছু আসন পাতা, এবং আর একটি নোটিশ, প্লিজ ওয়েইট হিয়ার টু বি সিটেড। অর্থাৎ ভেতরে অনেক খালি

টেবিল পড়ে থাকলেও ইচ্ছে মতন যে-কোনওটায় গিয়ে বসা যাবে না। একজন পরিচারিকা এসে জিগ্যেস করবে, আপনারা কজন? কোন ধরনের টেবিল পছন্দ। তারপর সে সঙ্গে করে আমাদের একটি টেবিলে নিয়ে গিয়ে বসাবে।

এইসব ছোট হোটেলেও দাম খুব বেশি লাগে না, কিন্তু এইটুকু বিলাসিতা করা যায় যে মেনিউ কার্ড দেখে অর্ডার দেওয়া যায় ইচ্ছে মতন, বাচ্চাদের জন্য দুধের কথা বলা যায়। একটা খাবারের সঙ্গে আর একটা খাবার মিশিয়ে নতুন কিছু বানিয়ে নেওয়া যায়। এবং অধিকাংশ জায়গাতেই পরিচারিকাদের ব্যবহার বেশ আন্তরিক। অবশ্য আমরা যাকে পরিচারিকা ভাবছি, সে-ই হয়তো মালিক। সে নিজেই অর্ডার নেয়, খাবার বানায়, টেবিলে এনে দিয়ে যায় এবং ক্যাশ কাউন্টারে সে-ই দাম নেয়।

এখানে পরিবেশনের কায়দাটাও অদ্ভুত।

বাংলাদেশের লোকেরা প্রথমে মাছ-মাংস দিয়ে শুরু করে, একেবারে শেষকালে খায় ডাল। ভারতের কোনও কোনও প্রদেশে খাওয়া শুরু হয় মিষ্টি দিয়ে, শেষকালে নোনতা। সেই রকম এখানেও প্রথমেই এনে দেবে কফি। অর্থাৎ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খালিপেটে খেতে হবে দু-তিন কাপ কফি। তারপর এনে দেবে স্যালাড। সেটাও শুধু খেতে হবে। স্যালাডের ব্যাপারেও অনেক কায়দা আছে, অর্ডার নেওয়ার সময় পরিচারিকা খুব সিরিয়াস মুখ করে জিজ্ঞাসা করবে, স্যালাডের সঙ্গে আপনি কী ড্রেসিং চান? যেন এর উত্তরের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। কোন স্যালাডের সঙ্গে কোন ড্রেসিং চলে, এটা আপনার জানা দরকার। আপনি চুপ করে থাকলে পরিচারিকা অনেকগুলি ড্রেসিং-এর নাম বলবে। আমরা অনভিজ্ঞ হিসেবে ইতস্তত করলে জয়তীদি আমাদের সাহায্য করবার জন্য বলেন, তোমরা কি এইটা, না ওইটা, না সেইটা চাও? এর মধ্যে একটার ওপর একটু বেশি জোর দেবেন, যাতে, আমরা বুঝতে পারি, ওইটাই এক্ষেত্রে বলা উচিত। আমি অবশ্য দেখেছি, চোখ-কান বুজে 'ফ্রেঞ্চ ড্রেসিং' বললেই সব জায়গায় বেশ কাজ চলে যায়।

স্যালাড নামের তেল মেশানো ঘাস-পাতা খাওয়া শেষ করলে তারপর আসবে আসল মাংস-টাংস।

জয়তীদির মেজদি নিজে সর্বক্ষণ নানান কিছু হারাচ্ছেন বা ভাঙছেন বটে, কিন্তু অন্য কেউ যাতে কোনও রকম নিয়মকানুন না ভাঙে, সে ব্যাপারে খুব সজাগ।

কফি খাওয়ার পর হয়তো আমি ফস করে সিগারেট ধরিয়েছি, অমনি মেজদি বলে উঠলেন, এই গোবিন্দ, তুমি যে এখানে সিগারেট খাচ্ছ—

আমি নিরীহ মুখে জিগ্যেস করলুম, গোবিন্দ কে?

মেজদি বললেন, ও গোবিন্দ নয়, কী যেন, বিশ্বম্ভর। তুমি যে সিগারেট ধরালে—।

আমি আবার বললুম, বিশ্বম্ভর বলেও তো কারুকে দেখতে পাচ্ছি না।

জয়তীদি হাসতে-হাসতে বললেন, মেজদি, তুই কী রে! নীলু এই ছোট্ট নামটা তুই মনে রাখতে পারিস না। যত সব খটকা খটকা নাম...।

মেজদি এতে লজ্জিত না হয়ে বরং অবাক হয়ে বললেন, সত্যি রে, আমার যে কী হয়, কিছুতেই নামটা...জানিস, একদিন আমি বাবাকে দাদা বলে ডেকেছিলুম? দু-তিনবার বলেছি, দাদা শোনো, দাদা শোনো—। বাবা তো অবাক।

দীপকদা বললেন, মেজদি, আপনি আমাকেও একদিন দর্জি বলে ডেকেছিলেন। একবার না তিনবার!

মেজদি এবার প্রতিবাদ করে বললেন, যাঃ, মোটেই আমি দর্জি বলিনি—

দীপকদা বললেন, হ্যাঁ, বলেছেন। আমি প্রতিবাদ না করে চুপ করে ছিলুম, কারণ, আমি তখন বাথরুম পরিষ্কার করছিলুম, আপনি ভাগ্যিস আমায় মেথর বলেননি!

জয়ন্তীদি বললেন, বাথরুম পরিষ্কারের সঙ্গে দর্জির কি সম্পর্ক রে, মেজদি? তুই আমাকে দু-একবার খুকুমা বলে ডেকে ফেলিস, তার না হয় মানে রয়েছে।

শিবাজি বলল, আমাকে উনি একবার বিপ্লব, আর একবার মহেন্দ্র বলে ডেকেছেন।

প্রিয়া বলল, ছোট্টিমা ওয়ান্‌স অর টোয়াইস আমায় ডেকেছেন পুপ্‌লু! বাঃ! বাঃ!

এমনকী প্রিয়াও বলল, সি ওয়ান্‌স কল্‌ড মি পুঁচকি।

যাক সবারই যখন নতুন নাম হয়েছে, তখন আর ক্ষোভের কোনও কারণ নেই।

অপ্রতিভ ভাবটা কাটাবার জন্য মেজদি বললেন, কিন্তু নীলু যে এখানে সিগারেট ধরাল, ওরা যদি কিছু বলে?

মেজদির দুশ্চিন্তার কারণ হল এই যে, এখানকার হোটেল-রেস্তোরাঁয় যেখানে সেখানে বসে সিগারেট খাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে বেশ কড়াকড়ি আছে। সিগারেটের বিরুদ্ধে প্রচুর আন্দোলন চলছে। ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ বলেই আইন করে সিগারেট খাওয়া বন্ধ করা যায় না, তা ছাড়া ব্যবসায়ীদের স্বার্থও আছে নিশ্চয়ই। আমেরিকান পুরুষরা তো ক্যানসারের ভয়ে সিগারেট খাওয়া ছেড়েই দিয়েছে বলতে গেলে, মেয়েরা অবশ্য এখনও অকুতোভয়ে চালিয়ে যাচ্ছে। সিনেমায়, বাসে, ট্রেনে, হোটেলে কয়েকটি মাত্র সিট নির্দিষ্ট করা থাকে, যেখানে ধূমপায়ীরা বসতে পারে শুধু, সে নিয়মভঙ্গ করলে অনেক টাকা জরিমানা হতে পারে।

মেজদিকে আশ্বস্ত করবার জন্য আমি টেবিলের ওপরের অ্যাসট্রেটা দেখিয়ে বললুম, এখানে নিষেধ থাকলে কি এটা রাখত।

আমার থেকে মনোযোগ সরিয়ে মেজদি এবার বললেন, ইস, শিবাজির কিছু খাওয়া হল না।

সত্যি, এই যুবকটিকে নিয়ে আমরা খুব বিপদে পড়েছি।

দেশে সে বাবা-মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে যে গরু কিংবা শুয়োর খাবে না। এই ম্লেচ্ছদের দেশে গরু-শুয়োর বাদ দিয়ে কি চলা সম্ভব? অনেক দোকানে ও ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না। কোথাও হয়তো মুরগি পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মুরগিও যে গরু বা শুয়োরের চর্বির তেলে ভাজা নয়, তা হলফ করে বলা যাবে না। তা ছাড়া এদেশের মুরগি অতি বিস্বাদ। ইঞ্জেকশন দিয়ে ফোলানো-ফাঁপানো ঢাউস চেহারার মুরগি, দু-একদিন খাওয়ার পরেই অখাদ্য লাগে। কোথাও-কোথাও মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে যে কোন জাতের মাছ তা কে বলবে! এদেশের প্রায় সবই সমুদ্রের মাছ। আমাদের এই শিবাজির শুধু পুকুরের রুই-কাতলা আর ভেড়ির ভেটকি ছাড়া অন্য কোনও মাছ পছন্দ নয়।

তবে মনের জোর আছে বটে ছেলেটির, অন্য সব কিছু অপছন্দ বলে সে শুধু, আলুভাজা আর কফি খেয়ে ডিনার সেরে নেয়।

কিন্তু আমরা ভালো-ভালো খাবার খাচ্ছি, আর একজন শুধু আলু ভাজা আর কফি, এ কি সহ্য করা যায়? আমাদের বিবেকের যন্ত্রণা হয়। বিশেষত মেজদি খুবই কাতর হয়ে পড়েন। ঘরের ছেলেকে ঠিকঠাক কীভাবে ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে, সেই নিয়ে আমরা চিন্তা করি।

মাঝে-মাঝে এই রকম খাওয়ার জন্য থামা, আবার পথ চলা। এক একদিনে আমরা সাতশো-আটশো মাইল এগিয়ে যাই। পথে পুলিশের কাছ থেকে আর কোনও বিপদ আসে না। আসলে পুলিশ সম্বন্ধে আমরা যত ভয় পেয়েছিলুম, ততটা কিছু ভয়ের নয়। এদেশের পুলিশ ঠিক ভক্ষক নয়, রক্ষকই বটে।

আইডাহো কিংবা অরিগন রাজ্যে বাইরের টুরিস্ট বেশি আসে না। আমেরিকার নাম ডাকওয়ালা রাজ্যগুলির তুলনায় এরা অপাঙক্তেয়। এখানে বড়-বড় শহর নেই, সেরকম কিছু দ্রষ্টব্য নেই। তবে প্রকৃতির সমারোহ বড় অপূর্ব। কত পাহাড়, বন, নদী আমরা পেরিয়ে যাই। রাস্তার পাশে মাঝে-

মাঝে এক-একটা হরিণের ছবি আঁকা বোর্ডে লেখা থাকে ডিয়ার ক্রসিং। মনে হয় ওটা কথার কথা। কিন্তু সত্যি-সত্যি একদিন রাতে আমরা মস্ত শিংওয়ালা একটা হরিণকে হুড়মুড়িয়ে রাস্তা পার হতে দেখলুম। সামনের গাড়ি হর্ন বাজিয়ে পেছনের গাড়িগুলোকে জানিয়ে দেয়, হরিণ যাচ্ছে, দেখো, দেখো, চাপা দিও না যেন!

আমরা সবাই দেখলুম, শুধু মেজদিই দেখতে পেলেন না। চশমা খুঁজে পাননি সেই মুহূর্তে।

আমেরিকায় গ্রাম নেই, সবই ছোট শহর। প্রত্যেকটি শহরে ঢোকবার মুখে লেখা থাকে, সেখানকার জনসংখ্যা কত, সেখানে কী কী পাওয়া যায়। কোনওটার জনসংখ্যা তিনশো উনিশ, কোনওটার দুশো সাতাশি। কোনওটার বা শুধু উনচল্লিশ। এইসব শহরেও কিন্তু একটা ব্যাঙ্ক বা একটা সুপার মার্কেট আছে। নামও কি সুন্দর সুন্দর সেইসব শহরের, বিড়ালের থাবা, শুকনো ঝরনা, বুনো ফুল...এইরকম।

এক জায়গায় আমরা চমকে উঠলাম। সেই শহরটির নাম গোস্ট টাউন। তার জনসংখ্যা সাতাশ। ম্যানড্রেকের গল্পে আমরা সবাই ভূতের শহরের কথা পড়েছি। এই কি সেই? রাস্তার দু'পাশে বাড়ি, কিন্তু পথ একেবারে জনশূন্য। সাতাশজনই তাহলে ভূত!

জিয়া লাফিয়ে উঠল, আমরা এখানে থাকব! আমরা এখানে থাকব!

এমনকী মেজদিরও খুব উৎসাহ!

কিন্তু সবদিক বিবেচনা করে সেখানে থামা হল না। মোটেল নেই, কোনও ভূতের বাড়িতে তো আশ্রয় চাওয়া যায় না?

রাত দশটার পর আমরা মোটেল খুঁজি রাত্রিবাসের জন্য। আমাদের অন্তত দুটো ঘর দরকার, একটি মেয়েদের আর একটি ছেলেদের জন্য। অনেক মোটেলের বাইরে নো ভ্যাকেন্সির আলো জ্বলে। দু-এক জায়গায় দামে পোষায় না। কোথাও বা একটির বেশি ঘর খালি নেই।

দ্বিতীয় রাত্রে আমরা রাত প্রায় একটার সময় মনমতন একটি মোটেল পেলুম। একটি উনিশকুড়ি বছরের মেয়ে একলা কাউন্টারে জেগে বসে আছে। সম্ভবত কোনও কলেজের মেয়ে, রাত্রে চাকরি করে। এ-দেশের মেয়েদের এই সাহস আর কাজ করার ক্ষমতা দেখে সত্যিই মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মনোমতন ঘর পাওয়া গেল। মেয়েটি নিজেই এসে ঘর খুলে সাজিয়ে দিয়ে গেল বিছানাটিছানা।

জামাকাপড় ছেড়ে সবে আমরা সুস্থ হয়ে বসেছি, শিবাজি তার অভ্যাস মতন রঙিন টিভির চ্যানেল ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কোনও ওয়েস্টার্ন ফিল্ম খুঁজছে, এমন সময় বাইরে পরপর দুবার গুলির শব্দ হল।

আমরা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালুম।

দীপকদা বললেন, যাই হোক না কেন, দরজা খুলে বাইরে যাওয়ার কোনও দরকার নেই।

॥ ১৬ ॥

গভীর রাতে দু-বার গুলির শব্দ ও কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ শুনেও আমরা বাইরে আসিনি। নিজের দেশ হলে অন্তত জানলার খড়খড়ি তুলে উঁকি মারতুম, কার কী হল জানবার চেষ্টা করতুম। এখানে সব সময় এই কথাটা মনে থাকে, এটা আমার দেশ নয়, এখানে কোনওরকম ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার দরকার নেই। বেশি কৌতূহল থাকাও ভালো নয়।

ঘুম ভাঙার পর প্রথম দরজা খুলে বাইরে এসে মনে হয়, সব কিছুই ছিল রাত্রির দুঃস্বপ্ন। কী সুন্দর, কী শান্ত এই সকাল, আকাশ কী পরিচ্ছন্ন নীল, অদূরেই নিবিড় সবুজ গাছপালা, মনে

হয় একটু হেঁটে গেলেই দেখতে পাব, ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে শিউলি ফুল।

মোটেলটিতে প্রায় পঞ্চাশটি ঘর, এর চত্বরে প্রায় গোটা চল্লিশেক গাড়ি। আগেকার দিনের সরাইখানার চত্বরে এরকমই গাড়ির বদলে ঘোড়া বাঁধা থাকত।

অধিকাংশ ঘরেরই দরজা জানলা বন্ধ, যাত্রীদের এখনও ঘুম ভাঙেনি।

কাল রাত্তিরে লক্ষ করিনি, আজ দেখলুম, ঘরের বাইরে একটা নোটিশ আছে, 'অনুগ্রহ করে শয়নকক্ষে মাছ রাখবেন না।'

স্বভাবতই অবাক হলুম। এ আবার কী ব্যাপার? এখানে কি শুধু বাঙালিদের আড্ডা নাকি? নইলে এমন মৎস্য-প্রীতি আর কার হবে?

দীপকদা বুঝিয়ে দিলেন যে, কাছাকাছি নিশ্চয়ই কোথাও মাছ ধরার বিখ্যাত জায়গা আছে। মৎস্য শিকারিরা সন্ধের পর ক্লান্ত হয়ে ফিরে মাছ আর বঁড়শি-টঁড়শি ঘরেই রেখে শুয়ে পড়ে। তাতে ঘরের মধ্যে আঁশটে গন্ধ হয়ে যায়।

শিবাজি বলল, কাল রাত্তিরেই আমি বলেছিলুম না যে মাছের গন্ধ পাচ্ছি?

তা সে বলেছিল বটে। কিন্তু আমরা পাত্তা দিইনি। আমরা ভেবেছিলুম, অনেকদিন ও মাছ খায়নি বলে মনের দুঃখে মাছের গন্ধ কল্পনা করেছে।

এখানে মাছ ধরার ব্যাপারটা অদ্ভুত। অনেকেরই মাছ ধরার নেশা বটে, কিন্তু ধরলেও অনেকেই সে মাছ খায় না। শুধু ধরাতেই আনন্দ। কিছু সরকারি নিয়মেরও কড়াকড়ি আছে। এক পাউন্ড ওজনের কম কোনও মাছ কেউ ধরলেও সেটা আবার জলে ছেড়ে দিতে হবে। ছিপ ফেলে পুঁটি কিংবা মৌরলা মাছ ধরার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

হায়, ধনে-জিরে-কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুচো মাছের ঝোলের যে কী অপূর্ব স্বাদ, তা এরা কোনওদিন জানল না।

আমাদের চা তেষ্টা পেয়েছে। মোটেলে আমরা যে সুইট নিয়েছি, তাতেই রান্নার ব্যবস্থা আছে বটে কিন্তু আমাদের সঙ্গে কোনও সরঞ্জাম নেই। তবে সব মোটেলের কাছাকাছিই বা সংলগ্ন রেস্তোরাঁ থাকে।

দোকানটি ছোট। তবে বাইরে লেখা আছে 'মাইক্রোওয়েভ ইজ অন'। অর্থাৎ চটপট গরম খাবার পাওয়া যাবে।

বিলেত-আমেরিকার খুব আধুনিক যন্ত্রপাতিও আমাদের দেশের ধনীদের কাছে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসে। মাইক্রোওয়েভ উনুনও এসে পড়েছে কি না জানি না, তবে আমি কোথাও দেখিনি। এ দেশে এখন মাইক্রোওয়েভ-এর ধুম চলছে।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না, তবে ব্যাপারটা মোটামুটি এই রকম। একটা চৌকো কাচের বাক্সের মতন উনুন। এতদিন পর্যন্ত যত রকম উনুনেই আমরা রান্না করেছি, তা সে কয়লা-গ্যাস-ইলেকট্রিক যাই হোক না কেন, তার উত্তাপ আসে শুধু তলা থেকে। কিন্তু মাইক্রোওয়েভ উনুনে উত্তাপ আসে তলা-ওপর ডানপাশ বাঁ-পাশ অর্থাৎ সব দিক থেকে। সুতরাং বেগুন ভাজতে গেলে যেরকম বারবার ওলটাতে হয়, কিংবা মাংস চাপিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে হয় অনেকবার, এতে তার কিছু দরকার হচ্ছে না। চার পাশ দিয়ে উত্তাপ আসছে বলে রান্নাও হয়ে যাচ্ছে, খুব তাড়াতাড়ি। বিভিন্ন পদের রান্নার জন্য উত্তাপ কম-বেশি করার ব্যবস্থা তো আছেই।

দোকানে-দোকানে এই জিনিসের খুবই চল হয়ে গেলেও সবাই বাড়িতে এখনও মাইক্রোওয়েভ-উনুন কেনেনি। আমাদের কলকাতায় যখন প্রথম গ্যাসের উনুন চালু হয়, তখন অনেকে বলেছিল, গ্যাসের রান্না খেলে পেটেও গ্যাস হবে। গত শতাব্দীতে কাঠের জ্বালের বদলে কয়লা চালু হওয়ার সময় অনেকে বলেছিল, কয়লার রান্না হজম হয় না। এখনও অনেকে মাইক্রোওয়েভ সম্পর্কে ওই রকম কথাই বলছে। মানুষের স্বভাব বিশেষ বদলায়নি তা হলে।

দোকানটিতে প্রথম খরিদ্দার হিসেবে ঢুকলুম আমরা সদলবলে। একটি সোনালি-চুল মহিলা সহাস্যে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন। ঘরটা টাটকা কফির সুগন্ধে মদির।

দোকানটির নাম সিডার কাফে। জায়গাটির নাম সিডার সিটি। শহর মানে নিশ্চয়ই আড়াইশো-তিনশো নাগরিক, কারণ এখানে ইতস্তত ছড়ানো কয়েকটি বাড়ি ছাড়া শহরের আর কোনও চিহ্ন দেখতে পাইনি। একটু পরেই এখানে একটা দৃশ্য দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছিলুম।

মেনিউ দেখে আমরা খাবারের অর্ডার দিলুম। জিয়া আর প্রিয়াকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই, ওরা এদেশে জন্মেছে, কোন দিন সকালে মন ভালো করবার জন্য ঠিক কোন রকম খাবার দরকার, তা ওরা জানে। ঝটপট নিজেদের পছন্দ জানিয়ে দেয়। আর শিবাজির কোনও খাবারই পছন্দ হবে না বলে তাকে নির্বাচনের কোনও সুযোগই দেওয়া হয় না। জয়তীদিই কার্ডে চোখ বুলিয়ে বলে দেন, শিবাজি, তুমি এগ্-স্যান্ডুইচ খাও, তা ছাড়া তোমার কিছু নেই।

কোনওরকম ভোট না নিয়েই জয়তীদি আমাদের দলের নেত্রী হয়ে গেছেন। আমরা যাতে গয়ংগচ্ছ ভাব না দেখিয়ে তাড়াতাড়ি আবার পথে বেরিয়ে পড়তে পারি, সেই জন্য আমাদের তাড়া দেওয়ার ভার তাঁর ওপর। সেই জন্য আমাদের চোখের দিকে তাকিয়ে তিনি বলতে লাগলেন, তোমরা কে কী নেবে, চটপট বলো, চটপট...।

সবচেয়ে মুশকিল মেজদিকে নিয়ে। কিছুতেই উনি মন ঠিক করতে পারেন না। সসেজ বা হটডগের মতন সাধারণ খাবার ওঁর পছন্দ নয়, উনি চান নতুন-নতুন নাম। কালকেই উনি বেশ কায়দায় স্প্যানিশ নাম দেখে একটা অর্ডার দিয়েছিলেন, আসলে দেখা গেল সেটা কাবলিছোলার মিষ্টি ঘুঘনি। অখাদ্য।

আজও তিনি একটা ফ্রেঞ্চ নামের খাবার চাইলেন। আমরা কফি দিয়ে প্রাথমিক পর্ব শুরু করলুম।

ঠিক এই সময় কাচের দরজা ঠেলে ঢুকল দুটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ওরা এসে বসল ঠিক আমাদের পাশের টেবিলে।

প্রথম দর্শনেই কেমন যেন চেনা-চেনা লাগল ওদের। এমনিতে সাহেব মেমদের মতোই চেহারা ও পোশাক, কিন্তু মাথার চুল যেন বেশি কালো, একটি মেয়ের মাথায় লম্বা চুল, একটি ছেলের মাথায় বাবরি। ওদের ধরনধারণ দেখে আর একটা ব্যাপারও মনে হয়, ওরা ঠিক আমাদের মতন ভ্রমণকারী নয়, কাছাকাছি কোনও জায়গা থেকে এসেছে চা-জলখাবার খেতে।

জয়তীদি ওদের দিকে মৃদু ইঙ্গিত করে আমাদের বললেন, ওরা লাল ভারতীয়।

শিবাজি উত্তেজিত ভাবে বলল, রেড ইন্ডিয়ানস্?

জয়তীদি ধমক দিয়ে বললেন, আস্তে! বাংলায় কথা বলো। ওদের শোনাবার কী দরকার।

আমরা আড় চোখে বারবার ওদের দেখতে লাগলুম। রেড ইন্ডিয়ান শুনলে রোমাঞ্চ হয়ই। হলিউডের কল্যাণে ওদের সাংঘাতিক সব মারামারির ছবি আমরা কত দেখেছি। এখনও সিনেমায় মাথায় পালকের টুপি আর মুখে লাল রং মাখা দুর্ধর্ষ ইন্ডিয়ানদের দেখতে পাই বটে, কিন্তু বাস্তবে ওদের সে রকম অস্তিত্ব নেই। আসল রেড ইন্ডিয়ানদের মেরে-মেরে প্রায় নিঃশেষই করে ফেলা হয়েছে। এক সময় এই কথাটা খুব চালু ছিল ঃ একজন ভালো ইন্ডিয়ান হচ্ছে একজন মৃত ইন্ডিয়ান! মুষ্টিমেয় যারা বেঁচে ছিল, এই কিছুদিন আগে পর্যন্তও তাদের আমেরিকার বিভিন্ন জায়গায় এনক্লেভে ঘিরে রাখা হত, অনেকটা খোঁয়াড়ের জানোয়ারের মতন। এখন অবশ্য ততটা বাধা নিষেধ নেই। ওদের ছেলেমেয়েরাও ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া করে, মূল জনজীবনের সঙ্গে মিশে গেছে। দেশের ব্যাপারে ওদের কোনও ভূমিকাই নেই। সিনেমায় এক্সট্রার পার্ট করবার সময় ওরা অনেকে মাথায় পালকের টুপিফুপি পরে নেয়।

ভারতীয় হিসেবে অবশ্য, আমাদের চেয়ে ওরা অনেক বেশি বিখ্যাত। আমরাই শুধু ওদের

রেড ইন্ডিয়ান বলি, কিন্তু বাকি পৃথিবী ওদের জানে শুধু ইন্ডিয়ান হিসেবে। উচ্চারণটা অনেকটা ইনজান্-এর মতন। অসংখ্য গল্পের বইতে, কমিক স্ট্রিপে ওই ইন্ডিয়ানদের কথাই থাকে। ইওরোপ-আমেরিকার শিশু-কিশোররা জানেই না যে ওই ইন্ডিয়ান ছাড়া আর কোনও ইন্ডিয়ান আছে। অনেক জায়গাতে আমি নিজেই দেখেছি, আমি ইন্ডিয়ান শুনে অনেক ছোট ছেলে-মেয়ে আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়েছে।

আমিও এই প্রথম 'লাল ভারতীয়' চাক্ষুষ দেখলুম, ওরা নিজেদের মধ্যে মগ্নভাবে মৃদু স্বরে গল্প করছে।

লুই লামুর নামে একজন মারামারির গল্পের লেখকের খুব ভক্ত আমাদের শিবাজি। ওই সব বই পড়ার ফলে লাল ভারতীয়দের বিষয়ে তার অনেক জ্ঞান। সে বলল, এই দেশটা তো ওদেরই ছিল, সাদা চামড়ারা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে...।

অধিকাংশ বাঙালির মতনই শিবাজিরও আবেগের সময় বাংলার বদলে অনর্গল ইংরিজি কথা এসে যায়। সেই জন্য বারবার সে জয়তীদির কাছে ধমক খায়।

এরপর, নাটকের ঠিক দ্বিতীয় দৃশ্যের মতনই দরজা ঠেলে ঢুকল আর একটি দল। এই দলে নারী নেই, তিনজন পুরুষ ও একজন কিশোর।

ওদের দেখে আমি দারুণ চমকে উঠলুম। এও কি সম্ভব? ওদের একজন তো জন ওয়েন! সেই রকম লম্বা চওড়া, সেই বৃষস্কন্দ, সেই মুখে একটু অবহেলার হাসি। পোশাকও অবিকল। মাথায় স্টেট্‌সান, কোমরে চওড়া বেল্ট, দুদিকে দুই রিভলভার। এক্ষুনি দু-হাতে দুটো রিভলভার তুলে নিয়ে দুমদুম শুরু হয়ে যাবে। কত ছবিতে জন ওয়েনকে এরকম দেখেছি।

তারপর মনে পড়ল, জন ওয়েন তো বেঁচে নেই। কিছুদিন আগে ক্যানসারে মারা গেছেন। তাহলে কি কেউ ইচ্ছে করে জন ওয়েন সেজেছে? পাশের লোক দুটোও চেনা-চেনা, একজন রবার্ট ডি নিরো আর একজন ক্লিন্ট্ ইস্টউড নয়? প্রত্যেকেই সশস্ত্র, কিশোরটির হাতে একটা রাইফেল। চকচকে খাঁকি প্যান্ট আর সাদা গেঞ্জি পরা সবাই।

প্রথমে ভাবলুম, এখানে কি সিনেমার কোনও শুটিং হবে? আমরা ভুল করে ঢুকে পড়েছি?

আমি ফিসফিস করে জয়তীদিকে জিগ্যেস করলুম, এদের মধ্যে কি কেউ সিনেমার...

জয়তীদি হেসে বললেন, যাঃ।

তবু আমার মনে হল, এরা যেন অতীতের একটা পৃষ্ঠা থেকে উঠে এসেছে। এরকম অস্ত্রধারী আমেরিকানদের তো রাস্তা ঘাটে চলাফেরা করতে আগে কখনও দেখিনি। এরা পুলিশও নয়, কারণ পুলিশ সাদা গেঞ্জি পরে রাস্তায় বেরুবে না। আর তিনজনের সঙ্গেই জন ওয়েন, রবার্ট ডি নিরো আর ক্লিন্ট ইস্টউডের কী আশ্চর্য সাদৃশ্য!

জন ওয়েন প্রথমে ঘাড় ঘুরিয়ে দুই টেবিলের দুরকম ভারতীয়দের দেখলেন। তারপর কিশোরটির দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, হোয়াট উইল য়ু হ্যাভ, সন্?

ঠিক সেই রকম গলা, আর এইরকম সংলাপও আমি জন ওয়েন-এর অনেক ছবিতে শুনেছি। নিজের ছেলেকে 'সন্' বলে সম্বোধনটা আমার বেশ ভালো লাগে। বাংলায় আমরা এরকম বলি না। অবশ্য সংস্কৃতে 'বৎস' ছিল।

দীপকদা বললেন, কাছাকাছি বোধহয় শিকারের জায়গা আছে। কাল রাত্তিরে আমরা নিশ্চয়ই শিকারের গুলির শব্দই শুনেছিলুম।

আমি অবশ্য কথাটা খুব একটা বিশ্বাস করতে পারলুম না। কোমরে পিস্তল গুঁজে কেউ শিকারে যায়? এদের তিনজনেরই চেহারা ওয়েস্টার্ন ছবির নায়কের মতন। এমনও তো হতে পারে, কোনও কারণে এই জায়গাটা গত শতাব্দীতে রয়ে গেছে। এই তিনজন আউট ল এসেছে এই শহর দখল করতে, এখুনি এসে পড়বে গ্যারি কুপার কিংবা বার্ট ল্যাঙ্কাস্টারের মতন চেহারার কোনও

শেরিফ, তারপর শুরু হয়ে যাবে ডিসুম্ ডিসুম্!

ক্লিন্ট ইস্টউডের দেখা গেল ভারতীয় মেয়েদের খুব পছন্দ। সে প্রায়ই ত্যারচা চোখে চাইছে জয়তীদির ও মেজদির দিকে। রবার্ট ডি নিরো মনোযোগ দিয়েছে এক প্লেট সসেজে। জন ওয়েন এক আঙুলে টেবিলে টকটক করে কী যেন বাজনা বাজাচ্ছে। আর কিশোরটি তার রাইফেলটি একবার নিজের ডান পাশে আবার বাঁ-পাশে রাখছে।

'লাল ভারতীয়'দের টেবিল থেকে একটি তরুণী মেয়ে উঠে দাঁড়াল। আমাদের ডিঙিয়ে সে ফিল্মের নায়কদের টেবিলটার দিকে চাইল, সে দৃষ্টিতে কী রাগ না বিদ্রূপ না ঘৃণা? মেয়েটি কি ভাবছে, এই লোকগুলোই আমাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে, ওদের জন্যই আমরা নিজের দেশে পরবাসী।

এইবার কি শুরু হবে লড়াই? 'লাল ভারতীয়'-দের কাছেও নিশ্চয়ই লুকানো অস্ত্র আছে। মেয়েটি ওরকম উঠে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে চেয়ে আছে কেন? এবার ও কোনও গালাগালি দেবে?

মেয়েটি বলল, হাই এড্!

রবার্ট ডি নিরো খাওয়া থেকে মুখ তুলে মেয়েটিকে দেখলেন। তাঁর মুখ ভরে গেল ঝলঝলে হাসিতে। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, হাই জোয়ি! হাউ হ্যাভ য়ু বিন!

সে প্রায় দৌড়ে গিয়ে মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে ফটাফট চুমু খেল তার দুই গালে। মেয়েটির সঙ্গীরা উঠে দাঁড়িয়ে হাত ঝাঁকাল ওর সঙ্গে। তারপর রবার্ট ডি নিরো ওদের নিয়ে এল নিজের টেবিলে অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করাবার জন্য। জন ওয়েন মেয়ে দুটির গালে পিতার মতন স্নেহে চুম্বন ছোঁয়ালেন।

তারপর কী একটা কথায় সবাই মিলে এক সঙ্গে হেসে উঠল।

॥ ১৭ ॥

আমরা চলেছি একটার পর একটা পাহাড় ডিঙিয়ে, উপত্যকার মাঝখান দিয়ে। প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে-ধারে কোস্ট রেঞ্জ, অন্যদিকে কাস্কেড রেঞ্জ আর সিয়েরা নেভাডা পর্বতমালা, এর মাঝখানের উপত্যকাতেই প্রধান জনবসতি।

প্রকৃতি এখানে খুবই উদার আর উন্মুক্ত। আমরা এখানে সমুদ্র দেখিনি বটে কিন্তু মাঝে-মাঝে এক একটা হ্রদ দেখেই সমুদ্র বলে ভ্রম হয়। আর সেই সব হ্রদের নামও কত মজার, গুজ্ লেক, ক্লিয়ার লেক, হনি লেক, পিরামিড লেক, মোজেজ লেক ইত্যাদি। এক সময় এখানে আগ্নেয়গিরিও ছিল, কারণ একটি বিশাল হ্রদের নাম ক্রেটার লেক।

মাঝে-মাঝেই পার হতে হয় নদী। কিন্তু নদীগুলোর নাম জানতে না পারলে বড় অস্বস্তি লাগে। একটা নদীর বুকের ওপর দিয়ে বেয়াদপের মতন গাড়ি চালিয়ে চলে গেলুম, সেই নদীটির নামও জানলুম না, তাকে কোনও ধন্যবাদও দিলুম না, এ বড় অন্যায়। এর মধ্যে একটা নদীর নাম পেলুম স্নেক। আর বিশাল কলমবিয়া নদীকে চিনতেও কোনও ভুল হওয়ার কথা নয়। পাস্কো নামের জায়গাটা ছাড়িয়ে কলমবিয়া নদীর তীরে আমরা একটু থামলুম। আর কোনও কারণে নয়, সেই নদীকে একটু সম্মান জানাবার জন্য।

প্রকৃতির সুন্দর জায়গাগুলিকে এরা আরও বেশি আকর্ষণীয় করে রাখে। কত রকম থাকবার জায়গা আর নানান যানবাহনের সুযোগ। দশ-পনেরো মাইল দূর থেকেই অনেক রকম প্রলুব্ধকর বিজ্ঞপ্তি। এই রকম রয়েছে অনেকগুলি ন্যাশনাল পার্ক আর ঝরনা আর পার্বত্য নিবাসের খবর।

চিলকুইন নামে একটা চমৎকার জায়গায় আমরা মধ্যাহ্নভোজ সেরে আবার যাত্রা শুরু করতেই ক্ল্যামাথ ফল্সের অনেক রকম নিশানা দেখা যেতে লাগল পথের পাশে। এটা বেশ নাম করা জলপ্রপাত,

ওই নামে একটা মস্ত বড় হ্রদও আছে। এমন নিবিড় জঙ্গল ঘেরা পথ যে ওই দিকে মন টানে।

দীপকদা জিগ্যেস করলেন যাবে নাকি ক্ল্যামাথ ফল্‌সে? তবে ওখানে একদিন থাকতে হবে, সব দেখতে অনেক সময় লাগবে।

আমরা সবাই রাজি, কিন্তু একটা ছোট অসুবিধে দেখা দিল। জিয়া আর প্রিয়া নাম্নী বালিকাদুটিকে ডিজ্‌নিল্যান্ড দেখাবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, ওরা সে জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছে। পুরো দুটো দিন কেটে গেছে গাড়িতে, ওই বয়সে সর্বক্ষণ গাড়ির মধ্যে চুপচাপ ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতে কেনই বা ভালো লাগবে!

সুতরাং আমরা ঠিক করলুম, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়াই ভালো।

আজ শনিবার, তাই পথে গাড়ির ভিড় অনেক বেশি। অনেক গাড়ির মাথায় তাঁবু কিংবা নৌকো চাপানো। কেউ-কেউ গাড়ির সঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে একটা ট্রেলার, অর্থাৎ নিজের শয়নকক্ষটি সঙ্গে নিয়েই বেড়াতে বেরিয়েছে। যেটা অদ্ভুত লাগে, সেটা হল বেশিরভাগ গাড়িই চালাচ্ছে কোনও নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ কিংবা বৃদ্ধা, এরা একলা একলা বেড়াতে যায়, কোনও সঙ্গী জোটেনি। কোনও কোনও গাড়িতে রয়েছে শুধু দুটি বা তিনটি মেয়ে, তাদের কোনও পুরুষ বন্ধু নেই।

ইচ্ছে করেই কি না কে জানে, দীপকদা পথ ভুল করে চলে এলেন ক্ল্যামাথ ফলসের কাছাকাছি। জিয়া আর প্রিয়া ঠিক বুঝতে পেরে আপত্তি জানাল। এত কম বয়েসে নিছক প্রকৃতি মন টানে না। আমরা ক্ল্যামাথ হ্রদের এক পাশে এক চক্কর মেরে আবার অন্য পথ ধরলুম।

পাহাড় থেকে রাস্তা নেমে এল সমতলে। বনরাজিও বিরল হয়ে এল ক্রমশ। জায়গাটার নাম উইড্‌। নামের সঙ্গে খুব মিল আছে পরিবেশের। দুপাশে খয়েরি রঙের আগাছা শুধু, এই রকমই মাইলের পর মাইল। রীতিমতন এক ঘেয়ে। এইরকম জায়গা দিয়ে যেতে-যেতে ঘুম পেয়ে যায়। শুধু দীপকদার ঘুমোবার উপায় নেই, সারা পথ ওঁকে একাই গাড়ি চালাতে হচ্ছে। যেমন খাওয়া, সেইরকম ঘুম সম্পর্কেও বিশেষ আগ্রহ নেই দীপকদার। সারাদিনের এত ধকলের পর রাত্রে যেখানে আমরা থাকি, সেখানে পৌঁছেও দীপকদা ঘুমের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন না। তখন হাত-পা ছড়িয়ে অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আড্ডা না দিলে তাঁর চলে না।

জয়তীদি হঠাৎ বলে উঠলেন, ওই দ্যাখো শাস্তা!

আমরা চমকে উঠলুম। শাস্তা, তার মানে মাউন্ট শাস্তা, তা হলে তো আমরা ক্যালিফোর্নিয়ায় ঢুকে পড়েছি।

আমি জিগ্যেস করলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেক পোস্ট পড়ল না? কোনও ঝঞ্ঝাট হল না?

আমরা আসবার পথেই বারবার শুনে আসছিলুম, ক্যালিফোর্নিয়ার চেকপোস্টে নাকি অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। বাক্স-প্যাঁটরা সব খুলে দেখবে।

কিছুদিন ধরেই কাগজে পত্রে খবরের নায়ক হয়েছে ভূমধ্যসাগরের মাছি, যার সংক্ষিপ্ত নাম মেড-ফ্লাই। ভূমধ্যসাগর থেকে নাকি এক ঝাঁক দুষ্টপ্রকৃতির মাছি উড়ে এসে এখানকার সব ফল বিষাক্ত করে দিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিরই আর এক নাম অরেঞ্জ স্টেট। এখানকার আঙুর খুব বিখ্যাত। ক্যালিফোর্নিয়ার ওয়াইন এখন ফরাসি ওয়াইনের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছে। সুতরাং ওই মাছির উপদ্রবে হইহই পড়ে গেছে এখানে, মাছি দমন করার কতরকম প্রস্তাবই শোনা যাচ্ছে। এমনকী বিখ্যাত কলামনিস্ট আর্ট বুখওয়াল্ডও এক দারুণ মজার রচনা লিখে ফেলেছেন এই মাছি বিষয়ে। যাই হোক, এইসব কারণেই, বাইরের কোনও রাজ্য থেকে আর কোনওরকম বিষাক্ত ফল যাতে এখানে না ঢুকতে পারে, সেই জন্য সীমান্তে খুব কড়াকড়ি চলছে। আমাদের সঙ্গে যে কলা আর আপেল ছিল, তা সব শেষ করে ফেলতে হয়েছে সকালেই। মেজদি বারবার আমাদের বলছিলেন, কলা খাও। কলা খাও, শিগগির।

জয়তীদি বললেন, চেক পোস্ট তো কখন পেরিয়ে এসেছি, তোমরা তখন ঘুমোচ্ছিলে।

—বাক্সটাক্স খোলেনি!

—নাঃ! আমি বললুম আমাদের সঙ্গে ফল টল কিছু নেই, তাই শুনেই ছেড়ে দিল।

আমি বললুম, দেখা যাচ্ছে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র!

জয়তীদি এমন একটা ভ্রূভঙ্গি করলেন, যার অর্থ, ছেলেমানুষ হয়ে আর অত পাকামি করতে হবে না!

দীপকদা বললেন, দ্যাখো, এবার মাউন্ট শাস্তা খুব ভালো করে দেখা যাচ্ছে।

মাউন্ট শাস্তার চূড়াটি সত্যি বড় সুন্দর। ঠিক মনে হয়, একটা সাদা রঙের টুপি পরে আছে। এই পাহাড়টির উচ্চতা চোদ্দো হাজার ফিটের চেয়ে সামান্য কিছু বেশি। আমরা হিমালয়ের দেশের লোক, আমাদের কাছে চোদ্দ হাজার ফিটের পাহাড় তো নিছক ছেলেমানুষ।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার এই পাহাড়টির বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মাথায় সারাবছর বরফ থাকে, সেইজন্য এই গ্রীষ্মেও এর মাথায় সাদা টুপি।

ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যটিকেই অবশ্য চির বসন্তের দেশ বলা যায়। পাহাড়, জঙ্গল এমনকী এক প্রান্তে মরুভূমি থাকলেও ক্যালিফোর্নিয়ার অধিকাংশ জায়গাতেই সারা বছর বড় মনোরম আবহাওয়া, বেশি গরমও নেই, শীতও নেই। গাছপালাও আমাদের অনেকটা চেনা। দুদিকের দুই রাস্তার মাঝখানে চোখে পড়ে দোপাটি ফুলের গাছ। অজস্র ফুল ফুটে থেকে আপনা-আপনি ঝরে যায়।

রাস্তাটা গেছে মাউন্ট শাস্তার পাশ দিয়ে ঘুরে-ঘুরে। এক-এক জায়গা থেকে পাহাড়টিকে এক-এক রকম দেখায়। কোনও সময় বেশ রোগা, কোনও সময় হৃষ্টপুষ্ট। মাথার টুপিটা কখনও গোল, কখনও মেক্সিকানদের মতন, আবার কখনও গান্ধি টুপির মতন। পাহাড়ের কোলে-কোলে নির্জন সবুজ উপত্যকা দেখলেই আমার মন কেমন করে। যেন এইখানে একটা কুটির বেঁধে আমার থেকে যাওয়ার কথা ছিল। চুপচাপ, অনেক দিন। কিন্তু থাকা হয় না, এই সব জায়গা স্মৃতিতে ছবি হয়ে যায়।

খুব ভালো করে মাউন্ট শাস্তাকে দেখবার জন্য আমরা এক জায়গায় থামলুম। খাড়া পাহাড়ের এক পাশ অনেকখানি ঢালু হয়ে নেমে গেছে, নীচে এক জলাশয়, সেটা নদী, না হ্রদ না কোনও বাঁধ তা বোঝবার উপায় নেই। একেবারে জনশূন্য স্থান, শুধু রয়েছে একটা টেলিফোন বুথ আর একটা ময়লা ফেলার জায়গা। স্থানটির রম্যতার জন্য এখানে অনেকেই গাড়ি থামিয়ে কিছুক্ষণ বসতে চাইবে। খাবারদাবারের প্যাকেট ও টিন যেখানে-সেখানে ফেলে যাতে নোংরা করা না হয়, তার জন্য প্রায়ই নোটিশ থাকে যে যেখানে-সেখানে ওই সব ফেললে পাঁচশো ডলার ফাইন হবে। বিশেষ কেউ তা মানে না অবশ্য। এখানে সেখানে বিয়ারের টিন গড়াতে দেখা যায়।

শুরু হল ছবি তোলার পালা। দীপকদা ছবি তোলার ব্যাপারে একজন শিল্পী, তাঁর ক্যামেরায় নানারকম লেন্স, অনেক ভেবে চিন্তে তিনি একখানা দুখানা ছবি তোলেন মাত্র। কিন্তু এদেশের বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও ফটাফট ছবি তুলতে পারে। যেমন জিয়ার আছে পোলারয়েড ক্যামেরা, সে পটপট করে শাটার টিপছে আর অমনি হাতে গরম রঙিন ছবি বেরিয়ে আসছে। এমনকী সাত বছরের মেয়ে প্রিয়াও ওই ক্যামেরায় ছবি তুলে ফেলল কয়েকখানা।

জয়তীদি বললেন, বড্ড ভালো লাগছে জায়গাটা, তাই না?

দীপকদা বললেন, বেশি ভালো লাগা ভালো নয়। তা হলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না।

মেজদি বললেন, সত্যিই আমার এ জায়গাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমি একটু দূরে বসেছিলুম। হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললুম, সাপ! সাপ! র‍্যাটল্‌ স্নেক।

অমনি একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। প্রথমে সবাই নিরাপদ দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আবার কাছে এল। র‍্যাটল স্নেকটিকে দেখা গেল না, আমি পুরোপুরি বানিয়ে বলেছি কিনা তা-ও ঠিক বোঝা গেল না। আমি অবশ্য বারবার বলতে লাগলুম, আমি র‍্যাটল স্নেকটার লেজের দিকের শুকনো হাড়ের

খটাখট শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি।

যাই হোক, সাপের নাম উচ্চারণ করার পর জায়গাটার মাধুর্য অনেকটা নষ্ট হয়ে এল। অবশ্য বেলাও ঢলে এসেছে, আলো শুষে নিচ্ছে আকাশ। আবার শুরু হল যাত্রা।

গাড়ি চেপে যাওয়ায় যদিও শারীরিক পরিশ্রম কিছুই নেই, তবু খিদে পায় ঘনঘন। মনে হয় খাইয়াটাই এক মাত্র কাজ। অন্ধকার নামবার পরই আমাদের মনের মধ্যে একটা খাইখাই রব ওঠে। আমরা কোন শহরে যাওয়ার জন্য থামব, তা আমরা পছন্দ করতে শুরু করি। ইচ্ছে করলে কোনও বড় শহরের মধ্যেই না ঢুকে হাজার দেড়হাজার মাইল চলে যাওয়া যায়। আবার ইচ্ছে করলেই বাইপাস দিয়ে ঢুকে পড়া যায় যে-কোনও শহরে।

দীপকদার গাড়িতে তেল ফুরিয়ে গেছে, তাই ঢুকে পড়লেন একটা শহরে। শহরটির নাম রেডিং। কস্মিনকালেও এ জায়গাটার নাম আগে শুনিনি, কিন্তু এখানেই আমাদের খাদ্য বরাদ্দ ছিল। গাড়ির খিদে ও আমাদের খিদে এক সঙ্গেই মিটিয়ে নেওয়ার জন্য আমরা এখানে নেমে পড়লুম।

কোন দোকানে খাব, এটা ঠিক করাও একটা খেলার মতন। দোকানের সংখ্যা অনেক, সেই জন্যই পছন্দ করা দুষ্কর। এই রেডিং-এর মতন একটা নাম-না-জানা জায়গাতেও পাশাপাশি অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা ভোজনালয়। টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ছিল বলে আমরা বেশি বাছাই না করে সামনের একটা চিনে দোকান দেখে ঢুকে পড়লুম। এমনিতেই কলকাতার মানুষদের চিনে খাবারের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আছে, এখানে এসে আমরা অনেকদিন ওই খাবার খাইনি।

দোকানটিতে ঢুকে প্রায় তাজ্জব হওয়ার মতন অবস্থা। এই ধাধ্ধাড়া গোবিন্দপুরে এত বড় চিনে হোটেল? মনে করুন বেলমুড়ি কিংবা মানকুণ্ডুর মতন জায়গায় পাঁচশো লোকের এক সঙ্গে খাবারের মতন চিনে রেস্তোরাঁ। কলকাতাতেও এত বড় দোকান আজও হয়নি। অবশ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় চিনে অধিবাসীর সংখ্যা অনেক এবং চিনের সঙ্গে বর্তমান আঁতাত হওয়ার আগে থেকেই আমেরিকানরা চিনে খাবারের খুব ভক্ত। তা হলেও এত বড় দোকান দেখে চমকে যেতেই হয়।

দোকানটি তিনটি অংশে ভাগ করা, এর মধ্যে যে-যে অংশে মদ পাওয়া যায়, সেখানে বাচ্চাদের প্রবেশ নিষেধ বলে আমরা বসলুম সর্বসাধারণের এলাকায়। সেখানেও অন্তত পঞ্চাশটি টেবিল, কিন্তু প্রায় সবগুলোই খালি। প্রায় রাজকীয় খাতির পেলুম আমরা। একাধিক পরিচারিকা বারবার আমাদের তদারকি করে গেল। খাবারগুলোও বেশ ভালো, তবে আমাদের কলকাতার মতন নয়। কলকাতার চিনে খাবার সত্যিই অপূর্ব।

বিল মেটাবার সময় আমি যথারীতি পুরোনো কায়দায় পকেটে হাত ঢুকিয়ে, 'আমি দিই, আমি দিই' বলতে থাকি, হাতটা আর পকেট থেকে বেরোয় না, তার মধ্যেই জয়তীদি ধমক দিয়ে বলেন, তুমি ছেলে মানুষ, খবরদার দেবে না...। দীপকদাই দিয়ে দেন টাকাটা। আমি কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি, আপনারা কি আমায় একবারও সুযোগ দেবেন না।

খুচরো ফেরত আসবার সময় প্লেটে সাজিয়ে নিয়ে এল সাতখানা বেশ বড় সাইজের করবী ফুলের বিচি। দেখেই চিনতে পারলুম, ওগুলো হল ফরচুন কুকি। এর আগে অন্য কোনও দোকানে ফরচুন কুকি দেয়নি। ওগুলো আসলে বিস্কুটে তৈরি, ভাঙলে ভেতরে টুকরো কাগজ পাওয়া যায়, তাতে সেদিনের ভাগ্য লেখা থাকে।

ছোটদের দাবি আগে, তাই প্রিয়া প্রথমে একটা তুলে নিয়ে ভাঙল। তাতে লেখা আছে, তুমি যা স্বপ্ন দেখবে, তাই সত্যি হবে। আমরা হাততালি দিলুম। এবার খুলল জিয়া। তার ভাগ্যলিপি ঃ আগামী কালকের দিনটি তোমার জীবনের একটা চমৎকার দিন। শিবাজি রায় পেল ঃ ঘর ছেড়ে বেশিদিন দূরে থেকো না। মেজদিরটা, যা হারিয়ে যায় তার জন্য দুঃখ করে লাভ নেই, নতুন কিছু শিগগির পেয়ে যাবে। জয়তীদির ঃ খুব তাড়াতাড়ি তুমি একটা সুখবর পাবে।

আমারটা অতি সাধারণ এবং খুব সত্যিও বটে ঃ তোমার বন্ধু ভাগ্য খুব ভালো।

দীপকদা হাসতে-হাসতে বললেন, দ্যাখো, আমি কী পেয়েছি! এ যে সত্যিই ভবিষ্যৎবাণী।

আমরা সবাই দীপকদার কাগজটা দেখলুম ঃ যদি আজ কোথাও যাত্রা শুরু করে থাকো, তা হলে মাঝপথে থেমো না, এগিয়ে চল!

দীপকদা বললেন, তার মানে আমাকে রাত্তিরে থামতে বারণ করছে। তা হলে কি সারা রাত গাড়ি চালাব?

এই নিয়ে একটুক্ষণ বিতর্ক হল। দীপকদার ইচ্ছে সারারাত গাড়ি চালিয়ে যতদূর সম্ভব এগিয়ে যাওয়া। জয়তীদি বললেন তোমার স্ট্রেন হবে। মেজদি বললেন, বাচ্চাদের কষ্ট হবে। বাচ্চারা না না বলে উঠল।

শেষ পর্যন্ত ফরচুন কুকির নির্দেশই মান্য করা হবে ঠিক হল। গাড়ির পেছনের দিকে জিয়া আর প্রিয়ার শোওয়ার জায়গা করে দেওয়া হল। আমরা সারারাত গল্প করতে-করতে যাব। আমাদের ঘুমোলে চলবে না।

শিবাজি গাড়িতে উঠেই ঘোষণা করল ঃ চলন্ত গাড়িতে আমি কক্ষনও ঘুমোই না।

বলেই ঘুমিয়ে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গে। তারপর চোখ জুড়িয়ে এল মেজদির। একটু বাদে জয়তীদিরই মাথাটা ঝুঁকে এল বুকের ওপরে।

দীপকদা এক মনে, একরকম স্পিডে গাড়ি চালাচ্ছেন, আমি মাঝে-মাঝে ওঁকে সিগারেট এগিয়ে দিচ্ছি আর বাইরের অন্ধকার দেখছি। রাস্তায় অনেক গাড়ি। দূর পাল্লার যাত্রায় অনেকেই নাইট ড্রাইভিং পছন্দ করে। দুদিকের রাস্তায় এক দিকে উজ্জ্বল হেড লাইটের মিছিল, অন্য দিকে লাল ব্যাক লাইট। এ দেশে গুন্ডামি বদমাইশি খুনোখুনি হচ্ছে অহরহ, কিন্তু সারারাত রাস্তায় গাড়ির মধ্যে থাকায় কোনও বিপদ নেই, এটা আশ্চর্য না?

লেখকদের অনেক সুবিধে। আমি অনায়াসে এর পর লিখতে পারতুম যে পেছনের সিটে অন্যরা সবাই ঘুমোলেও আমি সারারাত বীরের মতন জেগে রইলুম দীপকদার পাশে। কেউ অবিশ্বাস করত না।

কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, হঠাৎ এক গুচ্ছ হাসির শব্দে, আমি চমকে উঠলুম এক সঙ্গে। অন্যরা সবাই অনেক আগে জেগে উঠেছে, শুধু আমিই কাত হয়ে এমন ঘুমোচ্ছিলুম যে অনেক ডাকাডাকিতেও উঠিনি। শেষ পর্যন্ত একজন রুমাল পাকিয়ে আমার কানে সুড়সুড়ি দিতেই...।

বাইরে তাকিয়ে দেখি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে।

॥ ১৮ ॥

লস এঞ্জেলিস শহরটির ডাক নাম এল এ। এরকম একটা জগঝম্প মার্কা শহর সারা দুনিয়ায় আর আছে কিনা সন্দেহ। এটা একটা শহরই না। অনেকগুলো উপনগরী সুতো দিয়ে জুড়ে-জুড়ে তৈরি হয়েছে এই এল এ।

নিউ ইয়র্ক শহর যেমন ওপর দিকে বাড়ছে, উঁচু হতে-হতে প্রায় আকাশ ছুঁয়ে ফেলেছে, লস এঞ্জেলিস বাড়ছে তেমন লম্বায়। এই শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত ইচ্ছে মতন ঘুরে বেড়াবার কথা কল্পনাও করা যায় না। এই শহরে পনেরো-কুড়ি বছর ধরে আছেন এমন নাগরিকরাও যখন তখন এ শহরে রাস্তা হারিয়ে ফেলেন। কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেলে, শুধু সে বাড়ির ঠিকানা জানাই যথেষ্ট নয়, নিমন্ত্রণকর্তার কাছ থেকে সে বাড়িতে পৌঁছবার নির্দেশ দু-তিনবার শুনে মুখস্ত করে নিতে হয়। রাত আটটায় নেমন্তন্ন, রাত সাড়ে দশটায় পঞ্চাশ-ষাট মাইল ঘোরাঘুরি করে বিধ্বস্ত চেহারায় অতিথি এসে ঢুকলেন, এটাও আশ্চর্য কিছু নয়।

নিউ ইয়র্কের সঙ্গে লস এঞ্জেলিসের তুলনা এসেই পড়ে বারবার। এই দুই শহরের মধ্যে বেশ একটা রেষারেষির ব্যাপার আছে, ঠাট্টা-ইয়ার্কির সম্পর্কও আছে, অনেকটা আমাদের ঘটি-বাঙালের ঝগড়ার মতন। আমাদের ঘটি বাঙাল, ওদের ইস্ট কোস্ট-ওয়েস্ট কোস্ট। এর মধ্যে পূর্ব উপকূল হল ঘটি আর পশ্চিম উপকূল বাঙাল।

কারণ, পূর্ব উপকূল তুলনামূলকভাবে পুরোনো অর্থাৎ বনেদি, আর পশ্চিম উপকূলের শহর টহর তো সেদিনকার ছোকরা! লস এঞ্জেলিস শহরটার নামের উচ্চারণের মধ্যেই যেন আছে টাকার ঝনঝনানি, যদিও নিউ ইয়র্ক শহরেই আছে সেই বিখ্যাত ওয়াল স্ট্রিট, যেখানে চলে ক্যাপিটালিস্ট দুনিয়ার সব বড়-বড় ধন-দৈত্যদের ফাটকা।

সবচেয়ে মজার কথা শুনেছিলুম টেলিভিশনে একটি 'সাবান নাটকে'। (সাবান নাটকের ব্যাপারটা পরে বিস্তৃতভাবে বলা যাবে এখন) সেই নাটকের এক নায়ক (এই সব নাটকে অনেক নায়ক-নায়িকা থাকে) বলছিল, কীরকম মেয়ে তার পছন্দ। সে বলল, তার স্বপ্নের নায়িকা হচ্ছে সেই রকম, যার রূপ হবে ওয়েস্ট কোস্টের মতন, আর মন হবে ইস্ট কোস্টের। এক সাহেবকে এই ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে বলেছিলুম। সে বলল, ব্যাপারটা কী জানো, পশ্চিম উপকূলের মেয়েদের মাথার চুল সত্যিকারের সোনালি হয়, মুখ ও শরীরের ডৌল বেশ কোমল আর নিখুঁত। কিন্তু বুদ্ধি? বুদ্ধিতে নিউ ইয়র্কের মেয়েরা অনেক তীক্ষ্ণ। সুতরাং এই-এই দুটোকে যদি মেলানো যায়...।

শুধু নারী নয়, নগরী হিসেবেও তুলনা করলে নিউ ইয়র্কের তুলনায় এল এ শহরটি দেখতে অনেক বেশি সুন্দর। তবু, আমায় যদি কেউ জিগ্যেস করে এই দুটি শহরের মধ্যে কোনটি আমার বেশি পছন্দ, আমি বিনা দ্বিধায় নিউ ইয়র্কের নাম বলব। নিউ ইয়র্কের অনেক রাস্তা বেশ ভাঙাচোরা, এখানে সেখানে ময়লা পড়ে থাকে, অনেকটা কলকাতা-কলকাতা ভাব, তবু অসাধারণ প্রাণচাঞ্চল্য আছে ওই শহরটির। সেই তুলনায়, এল এ একেবারে ঝকঝকে তকতকে এবং কৃত্রিম।

এল এ শহরটির আর একটি দুর্ভাগ্য এই যে, এই শহরটি আমার, আমি একে ভালোবাসি, এইরকম গর্ব করার কেউ নেই। এই শহরটা বারো ভূতের। সবাই আসে এটাকে লুটেপুটে নেওয়ার জন্য। কিন্তু নিউ ইয়র্কের নাগরিকরা তাদের শহরটির জন্য গর্ব বোধ করে। 'আই লাভ এন ওয়াই' এরকম লেখা বড় বোতাম কিনতে পাওয়া যায়, অনেকেই সেরকম বোতাম কিনে বুকে লাগিয়ে ঘোরে। যারা খাঁটি আমেরিকান নয়, যেমন ইহুদি বা কৃষ্ণকায়রা (খাঁটি আমেরিকান হচ্ছে বোলতারা। বোলতা অর্থাৎ ওয়াস্‌প, অর্থাৎ হোয়াইট—আঙ্গলো-স্যাক্সন এবং প্রোটেস্টান্ট) তাদেরও সাহিত্য পড়লে দেখা যায়, তারা নিউ ইয়র্ক শহরটাকে খুব প্রিয় আর নিজস্ব মনে করে। এল এ নিয়ে সেরকম কোনও সাহিত্যও নেই।

লস এঞ্জেলিস বলতেই প্রথমে মনে পড়ে হলিউডের কথা। যদিও এই বিশাল শহরে হলিউড একটা পাড়া মাত্র। দূর থেকে দেখা যায় পাহাড়ের গায়ে হলিউডের নাম খোদাই করা।

হলিউডের প্রতিষ্ঠা নিয়ে একটা বেশ মুখরোচক গল্প আছে। চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়ার দিকে আমেরিকান সিনেমার কেন্দ্র ছিল নিউ ইয়র্ক, বড়-বড় কোম্পানিগুলোর অফিস ছিল ওখানেই। সেই যুগের একজন পরিচালক, যার নাম সিসিল বি ডিমিল (যিনি মার্কিনি ভাষায় ঢাউস-ঢাউস হিন্দি ফিলম বানাবার জন্য বিখ্যাত) একটা ছবির আউটডোর শুটিং-এর জন্য দলবল নিয়ে এসেছিলেন আরিজোনা রাজ্যের একটি জায়গায়। ট্রেন থেকে নেমেই সিসিল বি ডিমিল বললেন, ওরে বাস্‌রে, এ কী পাণ্ডববর্জিত জায়গা! উঃ কী গরম। এ যে মরুভূমি। না, না, এখানে শুটিং চলবে না। ট্রেনটা তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, সেই ট্রেনেই আবার সবাই হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়ল। ডিমিল সদলবলে নামলেন একেবারে ট্রেন শেষ পর্যন্ত যেখানে গিয়ে থামল, সেখানে। সেখানকার আবহাওয়া খুব মনোরম, নাতিশীতোষ্ণ। সমুদ্রের ধারে, সন্ধের পর চমৎকার বাতাস দেয়, এখানে লোকজনের ভিড়ও তেমন নেই। শহরের উপকণ্ঠে একটা নিরিবিলি পাহাড়ি গ্রাম মতন জায়গা বেছে নিয়ে ডিমিল

কোম্পানিকে টেলিগ্রাম পাঠালেন, শুটিং-এর খুব ভালো জায়গা পেয়েছি।

সেই গ্রামটির নামই হলিউড। প্রথমে নাকি একটা মাছের গুদাম ভাড়া করে স্টুডিও বানানো হয়েছিল। এখন সেখানে এলাহি কারবার।

একদিন দেখতে গিয়েছিলুম স্টুডিও পাড়া।

এমনি-এমনি তো ঢুকে পড়া যায় না, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। একটি কোম্পানি তাদের স্টুডিও এলাকায় প্রত্যেকদিন টুরের ব্যবস্থা করে। তা-বলে সত্যি সত্যি শুটিংও দেখা যায় না কিংবা শুকনো কয়েকটা সেট বা ক্যামেরা দেখিয়েও ছেড়ে দেয় না। এন্টারটেইনমেন্ট ব্যাপারটা এরা ভালো জানে, আপনার কাছ থেকে পয়সা নিলে তা যাতে পুরোপুরি উসুল হয়, সে দিকে এদের নজর আছে। দশ টাকার টিকিটে সারাদিন ধরে এরা কতরকম জিনিস যে দেখায়, তার ইয়ত্তা নেই।

মূল সফরটি হয় একটি ট্রামে। টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকবার পরই একজন জানিয়ে দেবে যে তখন থেকে দেড় কি দু-ঘণ্টা বাদে আপনার জন্য সেই ট্রামে জায়গা নির্দিষ্ট থাকবে। এতক্ষণ সময় কিন্তু কোনও বেঞ্চে বসে বাদাম চিবিয়ে কাটাতে হবে না, তারও ব্যবস্থা আছে। আলাদা-আলাদা জায়গায় কয়েকটি নাটকীয় প্রদর্শনী আছে, তার যেকোনও একটায় ঢুকে পড়া যায়। যেমন একটাতে আছে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের বাড়ি, সেখানে সত্যিকারের জ্যান্ত ভূত ও ভ্যামপায়ার আসে, নানারকম কাণ্ডকারখানা হয়, তারপর শেষে লাগে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন ও হাল্‌কের (মানুষ-দৈত্য) মধ্যে মারামারি। অন্য একটি জায়গায় দেখানো হয় যত রাজ্যের পোষা জন্তু-জানোয়ারের খেলা। আর একটিতে থাকে কোনও ওয়েস্টার্ন ছবির একটি দৃশ্য, ছবি নয়, বাস্তব। এক বাড়ির ছাদ থেকে অন্য বাড়ির ছাদে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে নায়ক, নীচ থেকে ভিলেন তাকে গুলি করল, রক্তাক্ত দেহে নায়ক সেই তিনতলা থেকে এক তলায় পড়ে গিয়েও বাঁ-হাতে হাঁটুর তলা দিয়ে গুলি চালিয়ে দিল। অর্থাৎ এই সব দৃশ্যে যে ট্রিক ফটোগ্রাফি নেই, স্টান্টম্যানদের কৃতিত্ব, দেখিয়ে দেওয়া হল সেটাই।

এইরকম সব নানা ব্যাপার দেখে সময় কাটবে। পুরো এলাকাটা সাজানো কোনও অষ্টাদশ শতাব্দীর শহরের মতন, সেইরকম সব দোকান, সেইরকম সাইন বোর্ড। এরই মধ্যে এক জায়গায় চোখে পড়ে যাবে জ'স ফিলমের নকল হাঙরটি।

এরপর মূল সফর।

ট্রামে চড়লে একজন গাইড নানা রকম রঙ্গকৌতুক করে হলিউডের বিভিন্ন সব মজার ঘটনা শোনাবে। মাঝে-মাঝে ট্রাম থামিয়ে নিয়ে যাবে এক-একটা স্টুডিয়োতে, দেখাবে স্টার ওয়ার ছবির সেট, বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মেকআপ রুম, কিংবা সুপারম্যান কীভাবে আকাশ দিয়ে উড়ে যায় সেই কায়দা। দর্শকদের মধ্যে দু-একজনকে বেছে নিয়ে তাদেরও উড়িয়ে দেবে।

ট্রামটার যাত্রাপথেও নানা রকম রোমাঞ্চ আছে। একটি নড়বড়ে কাঠের ব্রিজ পার হওয়া মাত্রই ভেঙে পড়ে যাবে ব্রিজটি। কোথাও সামনে জলাশয়, কিন্তু ট্রামটি জলের ওপর দিয়ে চলতে চাইলেই জল দু-পাশে সরে গিয়ে রাস্তা করে দেবে। মোজেস যে-ভাবে দলবল নিয়ে সমুদ্র পার হয়েছিলেন, দেখিয়ে দেবে সেই দৃশ্যটি। কোথাও মুখোমুখি অন্য গাড়ির সঙ্গে কলিশন হতে-হতেও বেঁচে যাওয়া যাবে। কিংবা গাইড বলবে, এবার কিন্তু বৃষ্টি নামবে। সঙ্গে-সঙ্গে ঝুপঝুপ করে প্রবল বর্ষণ। কিংবা বলবে, ডান পাশে দেখুন উত্তর মেরু। অর্থাৎ একটা বিরাট সমতল মাঠে ময়দা ছড়িয়ে উত্তর মেরুর বরফ তৈরি করা হয়েছে। শেষের দিকে ট্রামটা ঢুকে যায় একটা গুহার মধ্যে, মনে হয় যেন পৃথিবীর পেটের মধ্যে চলে যাচ্ছে। জার্নি টু দা সেন্টার অফ দা আর্থ।

পুরো জায়গাটা যে কত বড়, তা ঠিক ধারণা করা যায় না। কী যেন একটা হিসেব দিয়েছিল, বোধহয় আট-দশ বর্গ কিলোমিটার। এই হল একটা মাত্র স্টুডিয়োর নমুনা।

কন্ডাকটেড টুর আমার কখনও বিশেষ পছন্দ হয় না। কিন্তু এ রকম টুর না নিলে তো হলিউডের স্টুডিয়ো দেখবার অন্য কোনও উপায়ও নেই। আমার সঙ্গে তো ডাস্‌টিন হফ্‌ম্যান কিংবা

এলিজাবেথ টেলরের খাতির নেই যে আমাকে ওদের শুটিং দেখাতে নিয়ে যাবে! টিকিট কেটে এ জিনিস দেখাও একটা সত্যিকারের নতুন অভিজ্ঞতা।

এল এ-র অন্য বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হল ডিজনিল্যান্ড।

সেখানে গিয়ে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার চেনা যত বাচ্চা ছেলেমেয়ে আছে, তাদের জন্য কষ্ট হয়। আমার বদলে ওদেরই তো আসা উচিত ছিল এখানে।

পুরো ডিজনিল্যান্ডটিকেই একটি স্বপ্নরাজ্য করে রাখা হয়েছে। যন্ত্রপাতির সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে এক অপরূপ রূপকথা।

ডিজনিল্যান্ডের প্রধান আকর্ষণ এর বিশালত্ব। আমেরিকানদের সব কিছুই খুব বড়-বড়। এবং বড় হলেই যে তা আকর্ষণীয় বা সুন্দর হবে, তার কোনও মানে নেই। কিন্তু ডিজনিল্যান্ডের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন ওঠে না। সত্যিই এটা অভাবনীয় রকমের বড় এবং সুন্দর।

টিকিট কেটে ঢুকতে হয় এবং সব জায়গাটাই ঘেরা। কিন্তু এরই মধ্যে আছে একাধিক পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল, বেশ চওড়া নদীও একাধিক, অনেকগুলি পার্ক, এক একটা শহরের টুকরো এবং বহু মণ্ডপ। এবং এর পরেও অনেক কিছু দ্রষ্টব্যই মাটির নীচে।

ডিজনিল্যান্ডেও যেতে হয় সকালে, ফিরতে হয় মধ্যরাতে। তাতেও অবশ্য সব কিছু দেখে শেষ করা যায় না।

ডিজনিল্যান্ডের বর্ণনা দিয়ে কোনও লাভ নেই, কেন না, এর কোনওটাই চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এবং নিজের রুচি অনুযায়ী বেছে নেওয়ার অজস্র দ্রষ্টব্য এবং উপভোগ্য ব্যাপার আছে। যার উত্তেজনা কিংবা বিপদের অভিজ্ঞতা ভালো লাগে, তার জন্যও যেমন আছে ব্যবস্থা, আবার যে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান বা মহাশূন্য পছন্দ করে, তাকে পাঠিয়ে দেওয়া যায় সেখানে, কেউ ভূতের বাড়িতে গিয়ে অজস্র ভূত-পেত্নি দেখতে পারে, আর যে ভালোবাসে নরম মধুর দৃশ্য বা সঙ্গীত, সে তাও খুঁজে পাবে। অথবা কোনও মণ্ডপে না ঢুকে চুপচাপ মাঠে বসে থাকতেও তো ভালো লাগতে পারে। সেজন্য আছে অনেক খাবারের জায়গা এবং সুরম্য বিশ্রাম স্থান। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাওয়ার জন্য আছে ঘোড়ায় টানা ট্রাম কিংবা পুরোনো আমলের ছাদখোলা দোতলা বাস, কিংবা আকাশ ট্রেন, সব বিনামূল্যে।

শুধু একটি প্রদর্শনীর কথা বলি, যেটি আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, এটি দেখতে হয় একটি ছোট নৌকোয় চেপে, যেটি আপনা-আপনি চলে। পুরো মণ্ডপের মধ্যে খাল কাটা আছে, তার মধ্য দিয়ে এ রকম যাত্রীবাহী বহু নৌকো চলছে। এখানে দেখা যাবে মানুষের চেয়ে একটু ছোট সাইজের সব পুতুল এবং তাদের বাড়ি ঘর এবং পারিপার্শ্বিক। এই রকম পুতুল নিছক পঞ্চাশ বা একশোটা নয়, হাজার-হাজার। এখানে রয়েছে সমস্ত পৃথিবীর মানুষের আদল, সেই রকম বিভিন্ন দেশের সাজপোশাক, সেই রকম পরিবেশ, এবং অন্তরীক্ষে বাজে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট জায়গার আলাদা সঙ্গীত। সব মিলিয়ে এমন একটা ব্যাপার যা মনকে একেবারে অভিভূত করে দেয়। এই প্রদর্শনীটির নাম 'ইট্স আ স্মল স্মল ওয়ার্লড'। ওই শব্দগুলি দিয়ে একটি গানও বাজে শেষকালে, সেই গানের সুরটি যেন এখনও আমার কানে লেগে আছে।

এল এ শহরে দর্শনীয় ব্যাপার আরও আছে। কিন্তু আমার বুক কেঁপে উঠেছিল একজনকে দেখে। প্রথম দিন সন্ধেবেলাতেই তাঁকে দেখতে যাই। তাঁর নাম প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের চেহারাই মোটামুটি এক রকম। কিন্তু ইনি প্রশান্ত মহাসাগর। সব সমুদ্রের রাজা। জলধিপতি, এই অনুভূতিতেই শ্রদ্ধা জাগে। মাউন্ট এভারেস্টকেও তো দূর থেকে দেখলে আর পাঁচটা বরফওয়ালা পাহাড়ের মতন দেখায়। তবু, মাউন্ট এভারেস্টের নাম শুনলেই বুক কেঁপে ওঠে না?

সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে একটা সেতু অনেকখানি টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার মাথায় একটা জেটি। সেখানে অনেকে বেড়াতে যায়। সেখানে যাওয়ার আগে আমি জলের কিনারায় গিয়ে খানিকটা জল আঁজলা করে তুলে প্রশান্ত মহাসাগরকে প্রণাম জানালুম।

॥ ১৯ ॥

আমি কেন ফিরে যাব, বলতে পারেন?

যুবকটির তীব্র প্রশ্ন শুনে আমি খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে যাই। এই সব কঠিন প্রশ্ন আমাকে জিগ্যেস করবার কোনও মানে হয়? কে দেশে ফিরে যাবে, কে অন্য দেশে থেকে জীবনে উন্নতি করবে, তার আমি কি জানি। ও সব তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আমি অন্যদের সাতে পাঁচে থাকতে চাই না।

তবু যুবকটি আমার কাছে ঘুরে আসছিল বারবার।

বিশাল পার্টি, অন্তত শ' খানেক নারী-পুরুষ তো হবেই। এর মধ্যে কুড়ি পঁচিশ জনের মাত্র বসবার জায়গা আছে, বাকি সবাই দাঁড়িয়ে। আমেরিকান পার্টির মতন ভয়াবহ জিনিস আর নেই। এক সঙ্গে এত মানুষ, সুতরাং সকলের সঙ্গেই সঠিক চেনা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। তবু এসব জায়গায় একটা অলিখিত নিয়ম আছে, প্রত্যেকের সঙ্গেই ঘুরে-ঘুরে কথা বলতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সে এক হৃদয়হীন ব্যাপার। একজন এসে প্রথমে নিজের পরিচয় দিয়ে খুবই আন্তরিক গলায় জিগ্যেস করবে, তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ, সেখানকার আবহাওয়া কীরকম, তোমাদের ভাষা সমস্যার কীভাবে সমাধান করো, ইত্যাদি। মনে হবে যেন, এইসব বিষয় জানবার জন্য তার কত না আগ্রহ। কিন্তু ঠিক পাঁচ-ছ'মিনিট পরে হঠাৎ 'এক্সকিউজ মি' বলে পট করে মুখ ঘুরিয়ে আর একজনের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দেবে। আর আমাকে চিনতেই পারবে না। এই রকম একের পর এক।

সেই জন্যই, বাধ্য হয়ে কখনও এই সব পার্টিতে যেতে হলে আমি প্রথমেই জায়গা বেছে নিয়ে এক কোণে বসে থাকি, কেউ কাছে এসে কথা বললে তো বলল, কেউ কথা না বললেও আমার জীবনের কোনও ক্ষতি হয় না।

এই পার্টিতে অবশ্য জনা আষ্টেক ভারতীয়ও আছে। শুধু ভারতীয় কজন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জটলা করলে ভালো দেখায় না বলে তারাও আছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে। আমি যথারীতি জানলার ধারে একটা কাঠের টুল নিয়ে আসন গেড়ে বসে উত্তম-উত্তম পানীয়ের সদ্ব্যবহার করছি। কারুকে আমার দিকে আসতে দেখলেই চট করে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি জানলার বাইরে। একেই তো ইংরেজি বলতে-বলতে চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়, তাতে প্রত্যেকের সঙ্গে একই ধরনের কথা বলারও কোনও মানে হয় না।

এই বাঙালি যুবকটি কিন্তু বারবার ধেয়ে আসছে আমার দিকে।

বছরতিরিশেক বয়েস, বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ, চোখ দুটিতে বুদ্ধি ও মেধার চিহ্ন আছে। সঙ্গে তার স্ত্রী, সেও বেশ সুন্দরী, কথাবার্তা খুব নরম ধরনের। মেয়েটি প্রথমে আমাকে চিনতে পারে। আমার ছোট মাসির মেয়ে টুলটুল ওর বান্ধবী, সেই সূত্রে কয়েকবার আমায় কলকাতায় দেখেছে। এবং, কী আশ্চর্য ব্যাপার, সে নীললোহিতের লেখাটেখাও পড়েছে দু-একটা। সুতরাং, সে একটু উচ্ছ্বাস দেখাল।

তার স্বামী কিন্তু উচ্ছ্বাস-টুচ্ছ্বাসের ধার ধারে না। নীললোহিত-ফিললোহিত বলে কারুর নামও সে শোনেনি। আমি টাটকা কলকাতা থেকে এসেছি, এটাই আকৃষ্ট করল তাকে।

প্রথম আলাপেই ভদ্রলোক বক্রকণ্ঠে জিগ্যেস করলেন, কলকাতাটা সেই একই রকম নরক হয়েই আছে? সেই লোডশেডিং, সেই রাস্তায় ঘাটে নোংরা...

আমি হেসে বললুম, আপনি শেষ কবে কলকাতা দেখেছেন?

—সেই নাইন্টিন সেভেন্টি ওয়ানে।

—তা হলে বিশেষ কিছু বদলেছে বলে মনে হয় না। তবে হাওড়া ব্রিজের কাছে ফ্লাই ওভার

হয়ে গেছে, শিয়ালদারটাও শিগগির খুলবে শুনে এসেছি...আর হাওড়ার সাবওয়ে কি আপনারা দেখেছিলেন?

—বুল শিট! ওসব কে শুনতে চাইছে? মানুষের অবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে? কলকাতার রাস্তায় একটা লোক মরে পড়ে থাকলে তাকে সরাতে ক'ঘন্টা লাগে? টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স? ফরটি এইট?

সত্যি কথা বলতে কী আমি কলকাতার রাস্তায় কোনওদিন কোনও মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখিনি। এরকম হয় জানি, কিন্তু আমার চোখ দুটি ভাগ্যবান, এরকম দৃশ্য কোনওদিন সহ্য করতে হয়নি। একদিন দুপুরে শুধু মেট্রোপলিটান বিল্ডিং-এর সামনে একজন লোককে শুয়ে থাকতে দেখেছিলুম, তার মুখের ওপর মাছি উড়ছিল। কাছে গিয়ে দেখেছিলুম সে আসলে একটি অজ্ঞান মাতাল। সেটা কৌতুক দৃশ্য, করুণ কিছু ব্যাপার নয়।

সুতরাং চুপ করে রইলুম।

— কলকাতার মতন একটা এত বড় মেট্রোপলিস, অথচ এখনও সেখানে রাস্তায় লোক পড়ে থাকে, না খেয়ে মানুষ মরে, তার চেয়েও খারাপ আধমরা হয়ে লাখ লাখ লোক বেঁচে থাকে...পৃথিবীর আর কোনও দেশ...ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর...এই সব মাইনর কান্ট্রিজেও এখন এরকম অবস্থা নেই। চিনের কথা তো বাদই দিলুম।

—তা আপনি ঠিকই বলেছেন।

—কেন, কেন এরকম হয়? তার কারণ, পলিটিক্যাল পার্টিগুলো...ওদের কোনও ইডিয়লজিই নেই...দেশের কথা কেউ ভাবে না...শুধু বড় বড় কথা বলে, সব ফালতু বাত।

গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে ভদ্রলোকের পেটে এর মধ্যেই গেলাস চারেক হুইস্কি চলে গেছে। এই রকম সময় অনেকের মনেই আদর্শবাদ জেগে ওঠে। দেশের কথা মনে পড়ে। তা পড়ুক। কিন্তু উনি এমনভাবে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে কথা বলছেন, যেন এইসব দুরবস্থার জন্য আমিই দায়ী।

ভদ্রলোকের স্ত্রী একটু অপ্রস্তুত হয়ে স্বামীকে ফিসফিস করে কী যেন বললেন।

ভদ্রলোক তবু তেড়িয়া হয়ে বললেন, আর কলকাতার টেলিফোন! সেই বর্বর যুগেই আছে না। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে...আর দু-মাস টেলিফোন ডেড থাকলেও সাতশো টাকা বিল। আপনারা মশাই মহা ইডিয়েট, যে যার বাড়ির রিসিভারগুলো বাড়ির সামনের রাস্তায় আছড়ে ভেঙে ফেলতে পারেন না?

ভদ্রমহিলা এবার স্বামীর জামা ধরে বললেন, এই, তোমাকে মিসেস ওয়াল্টার্স ডাকছেন বললুম না। চলো—

প্রায় টানতে-টানতে তিনি নিয়ে চলে গেলেন স্বামীকে।

কিন্তু দশ মিনিট বাদেই যুবকটি আবার ফিরে এলেন। হাতে আর একটি ভরা গেলাস। চোখ লালচে, মাথার চুল খাড়া হতে শুরু করেছে।

আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে আবার কড়া গলায় জিগ্যেস করলেন, শিবপুর না যাদবপুর?

এই রে, ভদ্রলোক আমাকে প্রথম থেকেই স্বজাতি বলে ভুল করেছেন। প্রবাসে বাঙালি দেখলে চোখকান বুজেই বলে দেওয়া যায় ইঞ্জিনিয়ার। একশো জনের মধ্যে অন্তত আশিজন তো বটেই। আর বাকিরা ডাক্তার কিংবা শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

আমি জানালুম যে, আমি ইঞ্জিনিয়ার কিংবা ডাক্তার নই।

—তবে প্রেসিডেন্সির ছাত্র?

—আজ্ঞে না। আমি ইস্কুল ফাইনালই পাশ করেছি তিনবারের চেষ্টায়, তারপর কোনও ক্রমে একটা মফস্সল কলেজে...

—স্টেটসে এসেছেন কেন?

—এই...বলতে পারেন...বেড়াতে।

—টুরিস্ট!

এমন একটা ধিক্কারের সঙ্গে বললেন কথাটা, যেন আমি একটা কেঁচো কিংবা আরশোলা। তারপর আবার যোগ করলেন, বাপের অনেক পয়সা আছে বুঝি?

আমি বললুম, আপনার মতন কোনও বড়লোক বন্ধু এদেশ থেকে তো টিকিট পাঠিয়ে দিতেও পারে। তারপর স্রোতের ফুলের মতন এখানে ওখানে ভেসে বেড়ানো।

মুখের ভাব না বদলেই তিনি বললেন, হ্যাঁ, অনেকেই এরকম টিকিট চায় বটে। আমি দু-বছর আগে আমার এক মামার জন্য টিকিট পাঠিয়ে ছিলুম। আমার বাবা-মাও এসে ঘুরে গেছেন একবার। আমার স্ত্রী...ওর তো প্রত্যেক দু-বছর অন্তর দেশে যাওয়া চাই-ই। গতবার ওর বোনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরেছিল। এই ক্যাপিটালিস্ট দেশে আপনারা কী দেখতে আসেন? কতকগুলো বড় বড় বাড়ি আর রাস্তাঘাট, আর ফরসা-ফরসা মেয়েছেলে...দেশ থেকে অনেকে এসে যা পায় গপগপ করে খেয়ে নিয়ে যায়...যত সব হ্যাংলা, বুভুক্ষু পার্টি।

মাতালের ওপর রাগ করা নিয়মবিরুদ্ধ তাই আমি চুপ করে মিটিমিটি হাসতে লাগলুম।

প্রবাসে বাঙালিরা প্রায় সবাই খুবই পরিমিত মদ্যপায়ী। সকলের বাড়িতেই ওসব জিনিসপত্তর মজুত থাকে, কিন্তু নিজেরা এক-দু-ঢোঁকের বেশি খান না। একেবারে টিটোটালারও অনেক দেখা যায়। বিশেষত পার্টিতে মাতাল হওয়া একেবারেই নিয়মবিরুদ্ধ, তাই সেরকম অবস্থায় কোনও বাঙালিকে ক্বচিৎ দেখা যায়। এই যুবকটি যে একটু বেশি পান করে ফেলেছেন, তার কারণ বোধ হয় ওঁর মনের মধ্যে বিশেষ কোনও অস্থিরতা আছে।

ভদ্রলোক আবার বললেন, এদিকে দেশটা দিনদিন গোল্লায় যাচ্ছে...এখানে যখন বেটাচ্ছেলে সাহেবরা জিগ্যেস করে, তোমাদের ইন্ডিয়া এত বড় দেশ। সেখানে ওয়ার্ক-ফিলসফি নেই কেন? কাজ করাটা যে একটা পবিত্র ব্যাপার, সেটা এখনও কেউ বোঝাল না...কী উত্তর দোব। বলি, তোমরা, ক্যাপিস্টলিস্টরাই তো আমাদের দেশটাকে চুযে-চুযে ছিবড়ে করে দিয়েছ...। কী, ঠিক কি না? হাঁ করে বসে আছেন কেন, আমি যা বলছি, তা মাথায় ঢুকছে?

— আপনি তো ঠিকই বলছেন?

— আলবাত ঠিক বলব। বিকজ আই নো-ও-ও-ও। আমি নিজে এক সময় মাঠে ঘাটে ঘুরেছি, ভূমিহীন চাষিদের মধ্যে কাজ করেছি...কিন্তু কী লাভ! সবাই বড় বড় বাকতাল্লা দেয়! শ্রেণি-সংগ্রাম! হুঁঃ! মুখের কথা! আজ অবধি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে একটাও কথা বলেছে? এমনি-এমনি শ্রেণি-সংগ্রাম হয়? যত সব বামুন কায়েতের লিডারশিপ...

আমি দুবার উদ্দেশ্যমূলকভাবে কাশলুম। কারণ, ভদ্রলোক খুব জোরে জোরে বাংলায় কথা বলছেন বলে কাছাকাছি অনেকে অবাক হয়ে ফিরে তাকাচ্ছেন।

এবারও ওঁর স্ত্রী ছুটে এলেন। ভদ্রলোকের জামার হাতা ধরে বললেন, এই, তোমার খাবার প্লেট ফেলে এসেছ...আমাদের বাড়ি যেতে হবে না? চলো, চলো। আজ কিন্তু আমি গাড়ি চালাব।

হুংকার দিয়ে তিনি বললেন, হোয়াই। আমি চালাতে পারব না? আমি ঠিক আছি, আমার কিচ্ছু হয়নি।

যেতে-যেতে আমার দিকে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তিনি বললেন, ভ্যাড়া! আপনারা সব ভ্যাড়ার পাল! সেই জন্যই তো আমাদের নেতাগুলো সব রাখাল টাইপের, তাই একবার বাঁশি বাজাচ্ছে আর একবার ফাঁকা মাঠে লাঠি ঘোরাচ্ছে।

ওঁর স্ত্রী লজ্জিত মুখ করে তাকালেন আমার দিকে।

জয়তীদি এসে জিগ্যেস করলেন, অমুক কী বলছিল তোমাকে? খুব রেগে গেছেন মনে হল।

আমি বললুম, রেগে গেছেন কিনা জানি না, তবে আমায় কিছু বলছিলেন না, স্বগতোক্তি করছিলেন মনে হল।

জয়তীদি বললেন, ও খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে জানো তো...এখানে এসে এত কম বয়েসে যা উন্নতি করেছে...বড়-বড় কম্পানি থেকে ওকে ডাকাডাকি করে...তবে ওই একটা দোষ, একটু হুইস্কি পেটে পড়লেই চ্যাঁচামেচি শুরু করে দেয়।

—বেশি খাটতে হয় বোধহয়, তাই রিলাক্সেশানের জন্য।

—তোমার দীপকদার সঙ্গে তো কতবার ওর তর্ক হয়েছে। তবে ওর মনটা খুব ভালো...

জয়তীদি আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। অন্য একজন তাঁকে ডেকে নিয়ে চলে গেল।

আমি যুবকটির কথা ভাবতে লাগলুম। বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। দশ বছর কলকাতাতেই যায়নি। তাহলে বিয়ে হল কোথায়? কুড়ি বছর বয়েসেই কি বিয়ে করে এসেছিল? অথবা মেয়েটি এসেছিল এদেশে, তারপর দুজনের মন-বিনিময়।

আবার যুবকটি চলে এল আমার দিকে। এবার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই। ওঁর স্ত্রী ওঁকে অনবরত কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু নাটকীয় কিছু ঘটে যাওয়ার আশঙ্কায় বেশি জোর করতে পারছেন না।

যুবকটির হাতে আর একটা ভরতি গেলাস। এবার অবস্থা বেশ টলটলায়মান।

এবারও বেশ জোর গলায় সে বলল, শুনুন মশাই, আমার বউ প্রায়ই দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য ন্যাগ করে, কিন্তু আমি কেন ফিরে যাব বলতে পারেন? গিভ মি ওয়ান সিংগ্‌ল সলিড রিজন।

এর কোনও উত্তর হয় না। তাই আমি মুখ নীচু করে সিগারেট ধরাবার জন্য অনেক সময় নিলুম।

উনি আবার বললেন, কেন ফিরে যাব। এখানে আই হ্যাভ মাই ওউন হাউজ...সুইমিং পুল আছে, তিনটে গাড়ি...পৃথিবীর যেকোনও জায়গায় আমি যখন তখন বেড়াতে যেতে পারি...। দেশে গেলে শালা কেউ আমার কাজের দাম দেবে? নিজেরাই কেউ কাজ করতে জানে না...গভর্নমেন্টের একটা অর্ডার বেরুতে আঠারো মাস...রেড টেপ আর বিউরোক্রেসি...একটা ফালতু চাকরি দেবে, তারপর ফ্ল্যাট খুঁজে পেতে হয়রান...কেন যাব?

হঠাৎ আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আমি অসহিষ্ণুভাবে বললুম, কে আপনাকে ফিরে যাওয়ার জন্য মাথার দিব্যি দিয়েছে? আপনাদের মতন লোকেরা দেশে ফিরে গিয়ে এটা নেই, সেটা নেই, উঃ কী গরম, উঃ কী নোংরা, এইসব নিয়ে অনবরত ঘ্যানঘ্যান করেন, তা আমাদের মোটেই শুনতে ভালো লাগে না। আপনারা যেন সবাই এক একটি বাইবেলের প্রডিগ্যাল সন্, দেশে ফিরলেই রাজার মতন আদর করতে হবে। আপনাদের বাদ দিয়েও তো দেশটা কোনওক্রমে চলে যাচ্ছে, ডুবে তো যায়নি।

এক তোড়ে বলে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়ল। তাঁর মুখ থেকে সনির্বন্ধ মিনতি ঝরে পড়ছে। যেন তিনি বলতে চাইছেন, দয়া করে, এই সময় আমার স্বামীর কথায় কিছু মনে করবেন না, ওঁর সঙ্গে তর্ক করবেন না।

তৎক্ষণাৎ আমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত বোধ করলুম।

ভদ্রলোক একটু দুলতে-দুলতে বললেন, হুঁ, রাগ আছে তাহলে? বিষ নেই তার কুলোপানা চক্র। দেশে বসে এই রাগ দেখাতে পারেন না? সব ব্যবস্থা চুরমার করে দিতে পারেন না। আমেরিকাতে এসেছেন মজা মারতে?...আমার কথা আলাদা, আই অ্যাম আ প্রিজনার অব ইনডিসিশান...ওয়াক্।

ভদ্রলোক ছুটে চলে গেলেন বাথরুমের দিকে। বুঝলাম, এখন বমি করবেন।

অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁর স্ত্রী।

পার্টি প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এরপর খাবারটাবার নেওয়ার জন্য আমায় উঠে যেতে হল টেবিলের দিকে।

একটু পরে দেখলুম সেই ভদ্রলোক বাথরুম থেকে বেরিয়ে একটা চেয়ারে মাথা হেলান দিয়ে বসে আছেন, চোখ দুটি ওপরের দিকে।

সেরকম দুঃখী, অসহায়, বিভ্রান্ত, করুণ মুখ আমি আর কখনও দেখিনি।

॥ ২০ ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের বেলাভূমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম বালির ওপর দিয়ে। একটু আগে সারা আকাশ রঙে ভাসিয়ে সূর্যদেব ডুব দিয়েছেন সমুদ্রে, তবু এখনও দিনের আলো আছে। লস এঞ্জেলিসের সূর্যাস্ত একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য ব্যাপার। এখানে একটা বিখ্যাত রাস্তারও নাম সানসেট বুলেভার।

এখানে খুব একটা ভিড় নেই। ক্যালিফোর্নিয়ায় ভিড় হয় শীতকালে, যখন এ-দেশের প্রায় সব জায়গাই বরফে ঢাকা থাকে, শুধু ক্যালিফোর্নিয়ায় পাওয়া যায় বসন্তের হাওয়া।

তবে অনেকগুলো ছেলেমেয়ে সার্ফিং করছে জলে। এ এক বিচিত্র খেলা, ঢেউ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্রমশই সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। এইরকম খেলা চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, ঠিক যেন পাগলামির মতন। শুনেছি অনেক ছেলেমেয়ে সারা রাতই জলে থাকে।

একটা ধপধপে সাদা রঙের ক্যাডিলাক গাড়ি থেকে নেমে একজন মহিলা ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন জলের দিকে। ভদ্রমহিলা পরেছেনও সাদা লম্বা স্কার্ট, মাথায় সাদা টুপি, দু-হাতে সাদা রঙের গ্লাভ্‌স। জলের কাছাকাছি এসে শ্বেতবসনা সুন্দরীটি মাথা থেকে টুপি খুললেন, হাতের গ্লাভ্‌সও খুলতে লাগলেন। মনে হয়, তিনি সমুদ্রের জলে মুখ ধুতে চান।

টুপি খুলতেই দেখা গেল মহিলার মাথাভরতি সোনালি চুল। বয়েস অন্তত চল্লিশ তো হবেই, তবু এখনও মুখখানা বেশ সুন্দর, চোখের মণিদুটি নীল।

মহিলাকে দেখে জয়তীদি দারুণ চমকে উঠে তাঁর মেজদিকে বললেন, মেজদি, দ্যাখ, দ্যাখ! কে চিনতে পারছিস?

মেজদি প্রথমে একেবারে উলটো দিকে একটা লম্বা লোককে দেখে জিগ্যেস করলেন, কই? কই? কে রে?

আমরাও সবাই উৎসুক হয়ে দেখতে লাগলুম মহিলাকে। চেনা-চেনা লাগছে, কিন্তু ঠিক যে কে তা বুঝতে পারছি না।

জয়তীদি ফিসফিস করে বললেন, শার্লি ম্যাকলেইন!

আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলুম। মাত্র দুদিন আগেই আমরা টিভি-তে জ্যাক লেমন-এর সঙ্গে শার্লি ম্যাকলেইনের একটা চমৎকার ফিল্ম দেখেছি। সেই ফিল্মের তুলনায় এখন বয়েসটা বেশি দেখালেও সেই একই মুখ।

হলিউডের শহরে এসে এক জলজ্যান্ত হিরোইনকে দেখতে পাওয়ার রোমাঞ্চই আলাদা। বোম্বাই-এর কোনও হিরোইন একলা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে নিশ্চয়ই ভিড় সামলাবার জন্য পুলিস ডাকতে হয়, কিন্তু এখানে সেরকম কোনও ব্যাপার নেই। এখানে ফিল্ম স্টারদের কিছুটা স্বাধীনতা আছে মনে হচ্ছে।

শার্লি ম্যাকলেইন পা থেকে জুতো খুলে ফেলে খানিকটা জলে নেমে গেলেন, তারপর দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন উদাসভাবে।

কয়েকদিন আগেই ন্যাটালি উড নামের আর একজন নায়িকার মর্মান্তিক মৃত্যু সংবাদ আমরা

কাগজে পড়েছি। 'ওয়েস্ট সাইড স্টোরি'-তে দারুণ অভিনয় করেছিলেন ন্যাটালি উড। তিনি এখানে একটা ছবির শুটিং-এর অবসরে একলা কিছুক্ষণ সময় কাটাবার জন্য একটা ছোট্ট নৌকো নিয়ে ভেসে পড়েছিলেন সমুদ্রে। কিছুক্ষণ বাদে দেখা গেল নৌকোটি ফাঁকা। সমুদ্রে ফাঁকা নৌকো দেখলেই অন্য নৌকো চালকরা বিচলিত হয়ে ওঠে। পরে ন্যাটালি উড-এর জলে ডোবা শরীর উদ্ধার করা হয়েছিল। দুর্ঘটনা না তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তা বোঝা গেল না। উনি সাঁতার জানতেন। সার্থকতা অনেক সময় মানুষকে চরম অসুখী করে দেয় বোধহয়। ন্যাটালি উডের পেটে অনেকখানি অ্যালকোহল পাওয়া গিয়েছিল।

আমরা ভাবলুম, ন্যাটালি উড নিশ্চয়ই শার্লি ম্যাকলেইন-এর খুব বান্ধবী ছিলেন, সেই জন্য উনি এখনও সেই দুঃখ ভুলতে পারছেন না।

দীপকদা বললেন, এই রে, এই নায়িকাটিও আবার আত্মহত্যা করবে না তো? অনেকখানি জলে নেমে যাচ্ছে যে।

আমি বললুম, না, না, শার্লি ম্যাকলেইন খুব ভালো মেয়ে। মদটদ খায় না।

মেজদি বললেন, তুমি এমনভাবে বলছ, যেন ও তোমার বান্ধবী?

আমি বললুম, বান্ধবী না হলেও ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। একদিন অনেকক্ষণ একসঙ্গে থেকেছি।

সকলে আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন আমি একটা ডাহা মিথ্যুক। সত্যি কথা সরলভাবে বললে কেউ বিশ্বাস করে না। এরা ভাবছে শার্লি ম্যাকলেইন হলিউডের টপ্ হিরোইনদের একজন, বিরাট বড়লোক, আর আমি কলকাতার একটা ফ্যাফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো ছোকরা, আমাদের মধ্যে পরিচয় হওয়া অসম্ভব। কিন্তু এরকম অসম্ভবও সম্ভব হয় মাঝে মাঝে।

আমি বললুম, শার্লি ম্যাকলেইন প্রায়ই কলকাতায় যান। অন্তত দুবার যে গেছেন, তা আমি নিজেই জানি। ডায়মন্ডহারবারের কাছে একটা অনাথ আশ্রম আছে। একজন বিদেশি পাদরি সেই আশ্রমটি চালান। শার্লি ম্যাকলেইন সেই আশ্রমকে অনেক সাহায্য করেন, টাকা তুলে দেন।

এবারে মেজদি এবং শিবাজি দুজনেই স্বীকার করল যে এরকম একটা খবর দেশে থাকতে তারা কাগজে পড়েছে বটে একবার। গ্র্যান্ড হোটেলে শার্লি ম্যাকলেইন কী যেন একটা ফাংশান করেছিল।

আমি বললুম, একজ্যাকট্‌লি। সেই ফাংশান উনি করেছিলেন অনাথ আশ্রমের টাকা তোলার জন্য। তারপর নিজে ডায়মন্ডহারবারের সেই আশ্রমেও গেছেন।

দীপকদা বললেন, তোমার সঙ্গে কোথায় দেখা হল? তুমি কি সেই অনাথ আশ্রমে অনাথ বালক হয়ে ছিলে নাকি?

—প্রায় তাই বলতে পারেন। আমার এক মাসতুতো দাদা ওই অনাথ আশ্রমের সঙ্গে খানিকটা যুক্ত। সেই জন্য আমি ওখানে কয়েকবার গেছি। সবচেয়ে বড় কথা এই, কলকাতা থেকে শার্লি ম্যাকলেইন যখন ডায়মন্ডহারবারে যাচ্ছিলেন, তখন সেই গাড়িতে আমি জায়গা পেয়েছিলুম। গাড়িটা প্রায় খালিই যাচ্ছিল, উনিই বললেন, দু-একজন এই গাড়িতে আসুক না। তারপর আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, এই, তুমি এসো। তারপর যেতে-যেতে অনেক গল্প হল।

দীপকদা বলেন, শার্লি ম্যাকলেইন নাচ-গানের ছবিতে অভিনয় করে বটে, কিন্তু এমনিতে খুব তেজি মহিলা। আমি একটা ঘটনা জানি, ওঁর একটা ছবি ইন্ডিয়াতে রিলিজ আটকে দেওয়া হয়েছিল। তারপর কী একটা উপলক্ষে লন্ডনে ওঁর সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধির দেখা। একগাদা লোকজনের মাঝখানে শার্লি ইন্দিরা গান্ধিকে জিগ্যেস করল, আপনাদের দেশে নাকি ডিমক্রেসি আছে? তাহলে আমার ছবিটা দেখাতে দিচ্ছেন না কেন? ইন্দিরা গান্ধি অপ্রস্তুতের একশেষ। দেশে ফিরেই ছবিটি রিলিজের ব্যবস্থা করে দেন।

জয়তীদি মুচকি হেসে আমার পিঠে একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়ে বললে, তবে তো দেখছি তোমার গার্ল ফ্রেন্ড। যাও, গিয়ে কথা বলো।

আমি বললুম, ধ্যাৎ। আমায় উনি চিনতে পারবেন কেন?

মেজদি বোধহয় তখনও পুরোপুরি আমার কথা বিশ্বাস করেননি, তাই বললেন, না, না, ওর কথা বলার দরকার নেই।

শার্লি ম্যাকলেইন স্কার্ট ভিজিয়ে প্রায় হাঁটু পর্যন্ত জলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার আস্তে আস্তে উঠে এলেন।

তারপরেই সেই চমকপ্রদ ঘটনাটি ঘটল।

শার্লি ম্যাকলেইন কৌতূহলী চোখে আমাদের দলটির দিকে তাকালেন। শাড়িপরা মহিলা দেখলে এ-দেশের মহিলারা বেশ আকৃষ্ট হয়।

শার্লি আমাদের উদ্দেশে বললেন, হাই!

আমাদের মধ্যে জয়তীদিই সবচেয়ে সপ্রতিভ। উনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, হাই।

শার্লি কয়েক পা এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। তারপর আমাদের আর একটু ভালো করে দেখে নিয়ে জিগ্যেস করলেন, বাই এনি চ্যান্‌স, আর ইউ অল ফ্রম খ্যালখাটা?

জয়তীদি বললেন, ইয়া।

এরপর সেই ভুবনমোহিনী সরাসরি আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জিগ্যেস করলেন, ডিড্‌নচাই মিট য়ু সামহোয়ার বাফোর?

চিত্রতারকার এরকম অত্যাশ্চর্য স্মৃতিশক্তি? এ যে অবিশ্বাস্য। হাজার হাজার মানুষের সঙ্গে এঁদের দেখা হয়। তবে কি আমার বোঁচা নাক এবং ছোট ছোট কুতকুতে চোখের জন্য বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অসুন্দর পুরুষ হিসেবে আমায় উনি মনে রেখেছেন?

আমি থতোমতো খেয়ে বললুম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার কি ডায়মন্ডহারবার বলে একটা জায়গার কথা মনে আছে? সেখানকার অনাথ আশ্রম...আমি সেবারে আপনার সঙ্গে অনেক কথা বলেছিলাম...

শার্লি বললেন, ডায়মন্ডহারবার। অফ খোর্স। কী চমৎকার নাম। সেই বয়েজ হোম...তার অবস্থা এখন...

কথা বলতে-বলতে থেমে গিয়ে তিনি সকলের দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, তোমাদের এখন কি খুব জরুরি কাজ আছে? এসো না আমার বাড়িতে...কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আমি ডায়মন্ডহারবারের সেই বয়েজ হোম সম্পর্কে খবরটবর জানতে চাই।

আমি সগর্বে আমার সঙ্গিনী ও সঙ্গীদের দিকে তাকালুম। সব সময় আমায় হেলা তুচ্ছ করো, কিন্তু বেভার্লি হিলস, যেখানে রাজা-রাজড়ারাও সহজে প্রবেশ অধিকার পায় না, সেখানে নেমন্তন্ন জোগাড় করার হিম্মত তোমাদের কারুর আছে?

এক কথায় এরকম নেমন্তন্ন গ্রহণ করা উচিত কি না এই ভেবে দীপকদারা ইতস্তত করছিলেন, কিন্তু শার্লি আমাদের দ্বিধার বিশেষ সুযোগ দিলেন না। মেজদি আর জয়তীদির দিকে এগিয়ে এসে খুব আন্তরিকভাবে বললেন, এসো, এসো। বেশিক্ষণ আটকে রাখব না।

জয়তীদির দুই মেয়েকে রেখে আসা হয়েছে দীপকদার এক বোনের বাড়িতে। ওরা খুব মিস করল। আমরা ভাগাভাগি করে দুটি গাড়িতে উঠলুম। এবারও আমার স্থান হল শার্লি ম্যাকলেইনের গাড়িতে। শার্লি নিজেই গাড়ি চালান।

বেভার্লি হিল্‌স-এ আমরা আগেও একবার ঘুরে গেছি। পাহাড়ের গায়ে গায়ে এক-একটা বাড়ি আর নিরিবিলি ঝকঝকে রাস্তা। এর মধ্যে এক-একটা বাড়ি এক-একজন বিখ্যাত স্টারের, কোনটা কার বাড়ি তা অবশ্য বোঝবার উপায় নেই। আগেরবার আমরা কল্পনাই করতে পারিনি যে এই রকম কোনও বাড়িতে ঢুকব।

শার্লি ম্যাকলেইন কতবার বিয়ে করেছেন কিংবা বর্তমানে তাঁর কোনও স্বামী আছে কি না তা আমি জানি না। জিগ্যেসও করা যায় না। জয়তীদির বড় মেয়ে জিয়া সব খবর রাখে, সে থাকলে নিশ্চয়ই বলতে পারত। ওঁর বাড়িতে ঢুকে প্রথমেই যেটা নজরে পড়ে, তা হল নির্জনতা। বেশ বড় বাড়ি, সামনে বাগান, কিন্তু কোনও লোকজন চোখে পড়ে না। একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। গেটে কোনও দরোয়ান নেই, সেক্রেটারি বা বডিগার্ড জাতীয় কেউ অভ্যর্থনা করতে ছুটে এল না। এত বড় বাড়িতে এই ধনী মহিলা একা থাকেন নাকি? প্রথমেই মনে হয়, এসব বাড়িতে ডাকাতি করা তো খুব সোজা।

বাড়ির মধ্যে আমাদের দ্বিতীয় চমকটি অপেক্ষা করছিল।

বসবার ঘরটি অতি প্রশস্ত। এক সঙ্গে অন্তত পঞ্চাশজন লোক এঁটে যায়। ফিল্ম স্টারদের বাড়িতে প্রায়ই বড় বড় পার্টি হয়, সেই জন্যই এরকম ঘর দরকার। সেই ঘরের এক কোণে দুজন বেশ বুড়ো লোক গেলাস হাতে নিয়ে প্রায় ফিসফিস করে কথা বলছে। শার্লি ঘরে ঢুকে ওঁদের দেখতে পেয়ে বললেন, হাই গ্রেগ্! হাই অ্যাল!

আমার প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার জোগাড়। গ্রেগরি পেক আর অ্যালেক গিনেস। এই দুজনই যে আমার প্রথম যৌবনের হিরো। গ্রেগরি পেকের ছবি এলে পাগলের মতন দেখতে ছুটতাম। আর অ্যালেক গিনেস, সেই ব্রিজ অন দা রিভার কোয়াই-এর নায়ক। পরদার দুই দেবতা জলজ্যান্ত অবস্থায় বসে আছে আমাদের সামনে।

দুজনেই বেশ বুড়ো হয়ে গেছেন। কিছুদিন আগেই 'বয়েজ ফ্রম ব্রাজিল' নামে একটা ফিল্মে গ্রেগরি পেককে বুড়ো অবস্থাতেই দেখেছি, সেইজন্য চিনতে অসুবিধা হল না। তবে রোমান হলিডের নায়কের সেই হাসিটি এখনও একই রকম আছে মনে হল।

আমাদের সঙ্গে শার্লি ওঁদের পরিচয় করিয়ে দিতে ওঁরা দুজনেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু আমাদের দেখে ওরা খুব খুশি হয়েছেন বলে মনে হল না। ওঁরা বোধহয় শান্ত নিরিবিলি সন্ধ্যা কাটাতে চেয়েছিলেন, তার মধ্যে এই ভারতীয় উৎপাত পছন্দ হবে কেন?

গ্রেগরি পেক তাঁর সেই বিখ্যাত গলায় শার্লিকে বললেন, অ্যাল প্যাচিনো আর মেরিল স্ট্রিপ একটুবাদেই আসবে। ওরা কি একটা জরুরি ব্যাপারে মিটিং করতে চায়। তোমাকে ফোন করেছিল, মনে নেই।

শার্লি বললেন, হ্যাঁ, মনে আছে। অ্যাল প্যাচিনো পরে আবার ফোন করে জানিয়েছে যে সে আটটার আগে আসতে পারবে না। তার আগে আমার কলকাতার বন্ধুদের সঙ্গে একটু গল্প করে নিই।

শার্লি সুমধুর টুংটাং রবে একটা ঘণ্টা বাজাতেই সঙ্গে-সঙ্গে একজন জাপানি পরিচারক এসে হাজির হল, তাহলে বাড়িটা একেবারে জনহীন নয়। কিন্তু এরা এরকম নিঃশব্দে থাকে যে বোঝাই যায় না।

শার্লি জিগ্যেস করলেন, আমরা কে কী পানীয় নেব। উনি নিজের জন্য চাইলেন শুধু এপ্রিকটের রস।

তারপর আমরা গল্প করতে বসলুম।

কিন্তু গল্প ঠিক জমল না। শার্লির অনবরত ফোন আসতে লাগল। উনি উঠে-উঠে ফোন ধরছেন আর কথা থেমে যাচ্ছে। টুকরো-টুকরো ফোনের সংলাপ শুনে বুঝতে পারলুম, আরও অনেকে এ বাড়িতে আজ আসবে। কী একটা ব্যাপারে চিত্র তারকারা বেশ উত্তেজিত।

জয়তীদি আমায় বললেন, এই শোনো, উনি আমাদের ডেকে এনে খুবই ভদ্রতা করেছেন। এখন আমাদের পক্ষে ভদ্রতা হল খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া। এঁরা আজ ব্যস্ত আছেন।

সুতরাং আমরা সবাই এক সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম। শিবাজি সকলের অটোগ্রাফ নিল। শার্লি

ম্যাকলেইন বললেন, শিগগিরই ওঁর একটা শুটিং আছে জাপানে, তখন একবার কলকাতায় যাবেন। তখন আবার নিশ্চয়ই দেখা হবে?

আমরা বললুম, নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

বাইরে বেরিয়ে এসে শিবাজি বলল, গ্রেগরি পেক আমার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেছে, কলকাতায় কেউ শুনলে বিশ্বাস করবে?

এবার আমার প্রশ্ন ঃ সরলমতি পাঠকপাঠিকারা আমার এই কাহিনিটি বিশ্বাস করেছেন তো? এরকমভাবেও যে ভ্রমণ কাহিনি লেখা যায়, তার একটি নমুনা দেখাবার জন্যই এবারের এই রচনা। পুরো ব্যাপারটাই বানানো। এমনকী শার্লি ম্যাকলেইনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়েরও ব্যাপারটাও গুল। লস এঞ্জেলিসে বেভার্লি হিলে ঘুরে-ঘুরে কোনও নায়ক-নায়িকার দর্শন পাওয়া তো দূরে থাকুক, চিনতে পারা যায় এমন কোনও একস্ট্রাকেও আমরা দেখতে পাইনি।

॥ ২১ ॥

লস এঞ্জেলিসে আমরা যাঁর বাড়িতে উঠেছি, ধরা যাক, তাঁর নাম তাপসবাবু। তিনি ছেলেবেলায় কোনও বইতে ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সুন্দর বর্ণনা পড়ে ঠিক করেছিলেন, জীবনে কোনও না কোনওদিন ক্যালিফোর্নিয়া দেখতে যাবেনই। তারপর চাকরি জীবনে নানা জায়গা ঘুরতে-ঘুরতে, ইউরোপ হয়ে, শেষ পর্যন্ত সেই ক্যালিফোর্নিয়াতেই থিতু হয়ে বসেছেন। এবং তাঁর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়নি, তাঁর কল্পনার ক্যালিফোর্নিয়ার সঙ্গে বাস্তবের জায়গাটিও মিলে গেছে।

ইওরোপেও এরকম একজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, যিনি স্কুল জীবনে মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'লাফা যাত্রা' পড়ে মনে মনে সংকল্প নিয়েছিলেন যে-কোনও উপায়ে একদিন না একদিন তিনিও হিচ হাইকিং করে সারা ইওরোপ ঘুরবেন। আজ তিনি কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে ইওরোপ প্রবাসী। এখন আর হিচ হাইকিং করেন না অবশ্য। নিজের গাড়ি চালিয়েই যখন তখন ফ্রান্স থেকে জার্মানি কিংবা সুইটসারল্যান্ড কিংবা ইতালি চলে যান।

ক্যালিফোর্নিয়ার তাপসবাবুর চেহারা আর পাঁচজন বাঙালিবাবুর মতন হলেও তিনি কিন্তু আর বাঙালি নন। তিনি এখন আমেরিকান। বেশ কয়েক বছর আগেই তিনি পুরোদস্তুর মার্কিন নাগরিকত্ব পেয়েছেন, এখানকার নির্বাচনে ভোট দেন, এখানকার ফুটবল খেলায় তাঁর নিজস্ব প্রিয় দল আছে, সেই দলের জয়ে তিনি উল্লসিত হন, পরাজয়ে মুহ্যমান। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ব্যাপারে তাঁর কোনও আগ্রহ নেই। ভারতবর্ষ এখন তাঁর পূর্বপুরুষদের দেশ। যেমন অনেক শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান মাঝে-মাঝে পূর্বপুরুষদের দেশ দেখবার জন্য আয়ারল্যান্ডে কিংবা জার্মানিতে কিংবা রাশিয়ায় যায়, সেই রকম তাপসবাবুও ক্বচিৎ কখনও কলকাতায় যাওয়ার কথা ভাবেন। ওঁর স্ত্রী-ও অবশ্য বাংলার মেয়ে। ঝুমুর দেবী পড়াশুনো করতে বিদেশে এসেছিলেন, তারপর চাকরি, তারপর এঁর সঙ্গে পরিচয় এবং বিবাহ। ঝুমুর দেবীর বরং প্রাক্তন স্বদেশ সম্পর্কে টান একটু বেশি মনে হয়। নানা প্রসঙ্গে সেই কথা এসে পড়ে। এই ঝুমুর দেবী আমাদের দীপকদার মাসতুতো কিংবা পিসতুতো বোন।

আবার এর উলটোটাও দেখা যায়। পনেরো-কুড়ি বছর ধরে প্রবাসী বাঙালি দম্পতির হঠাৎ একদিন মনে হয়, আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, এবার তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে ফেরা যাক। বিশেষত ছেলেমেয়েরা বড় হতে শুরু করলেই মন এরকম উন্মনা হয়। এ দেশের নিয়ম অনুযায়ী ছেলেমেয়ে আঠারো বছর বয়সে পা দিলে ঘরছাড়া হয়ে যাবেই। সারা জীবনে আর ক'বার তাদের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে সেটাই সন্দেহ। স্বাবলম্বিনী হওয়ার আগেই মেয়ে তার বয় ফ্রেন্ডের সঙ্গে ডেটিং করতে চলে যাবে, সারারাত হয়তো বাড়িই ফিরল না। বাঙালি বাবা-মায়েদের হৃদয় এখনও এটা ঠিক মেনে নিতে পারে না। সুতরাং তার আগে আগেই যদি দেশে ফেরা যায়...। সমস্যা অনেক, এখানকাব

জীবনযাত্রার মান দেশে ফিরে গিয়ে পাওয়া অসম্ভব। একটা ভদ্রমতন, সম্মানজনক চাকরি পাওয়াও খুব শক্ত, উপযুক্ত বাসস্থান জোগাড় করারও সমস্যা আছে। গুণী সন্তানদের দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য ভারত সরকার অনেক রকম ব্যবস্থা নিয়েছেন বলে শোনা যায়। তবে অবস্থাটা অনেকটা সেই রকম, "খোকন, সত্বর ফিরিয়া আইস। মা শয্যাশায়ী। তুমি যাহা চাহিয়াছিলে তাহাই পাইবে—" এই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর খোকন যেদিন সত্যিই বাড়ি ফিরে এল, সেদিন তার পিঠে বাবা-জ্যাঠার লাঠির ঘা পড়তে লাগল দমাদ্দম করে। তবু, এরকম ঝুঁকি নিয়ে স্বামী ফিরে আসতে চাইলেও স্ত্রীর দ্বিধা কাটতে চায় না। অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিতে পুরুষরা যতটা উৎসুক, মেয়েরা ততটা নয়।

অবশ্য, পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের ছোট করবার জন্য এ কথা বলছি না। হিসেবি, কৃপণ, ভীতুর ডিম পুরুষ মানুষ কি নেই? পুরুষের তুলনায় অনেক বেশি বেপরোয়া, দুঃসাহসিনী নারীও আমি দেখেছি। আসল কথাটা হল, বিদেশে মেয়েরা অনেকখানি স্বাধীনতা পায়, যতটা সমান অধিকার সেখানে ভোগ করে, যেমন আত্মসম্মান বজায় রেখে চলতে পারে, তেমন তো দেশে ফিরে এসে পারে না। তাই তারা ইতস্তত করে বেশি। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী এ ব্যাপারে একমত, তবু সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব হয়। ছেলেমেয়েদের মতামতেরও তো প্রশ্ন আছে। যেসব শিশুরা এইসব দেশে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, এখানেই বেড়ে উঠেছে, এখানকার তুষারের মধ্যে খেলা করেছে, এখানকার স্কুলে বন্ধুবান্ধব পেয়েছে, এখানকার জল হাওয়া রোদে যাদের শরীর গড়ে উঠেছে, তাদের তো এইসব জায়গাই প্রিয় হবে। বাংলার মাটি কিংবা কলকাতার ধুলো সম্পর্কে তো তাদের কোনও নস্টালজিয়া থাকার কথা নয়।

অনেকরকম বাঙালির সঙ্গে দেখা হয় এখানে ঘুরতে-ঘুরতে। একদিন একটা বাড়িতে গেছি। পাশের ঘরে একজনের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিলুম। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশে এসেছেন নাকি? ঠিক যেন তিন পয়সার পালার সংলাপ শুনছি। পরে আলাপ হল, অজিতেশ নন, তাঁর ভাই মোহিতেশ। একইরকম গলার আওয়াজ, একইরকম সদালাপী ও সুরসিক। তবে দৈর্ঘ্যে অজিতেশের চেয়ে একটু কম। মোহিতেশ একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, পেট্রোল অনুসন্ধানের ব্যাপারে একজন বিশেষজ্ঞ, একটি আন্তর্জাতিক কোম্পানির উচ্চপদে কাজ করতেন, আমরা থাকতে থাকতেই ওঁর আরও উঁচু পদে প্রমোশন হল। দেশের প্রতি ওঁর আন্তরিক টান আছে, দেশের অবস্থার জন্য উনি গাঢ় দুঃখ বোধ করেন। দেখা হলেই এ বিষয়ে আলোচনা হত। ভারতবর্ষের তো এমন দরিদ্র থাকার কোনও কারণ নেই, খাদ্যে ভারত স্বয়ম্ভর, যন্ত্রপাতি উৎপাদনেও কারুর থেকে পিছিয়ে নেই। অভাব শুধু পেট্রোলের, যা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা অচল। যত বৈদেশিক মুদ্রা ভারত রোজগার করে, তা সবই খরচ হয়ে যায় শুধু পেট্রোল কেনবার জন্য। মোহিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ভারতেও যথেষ্ট পেট্রোল আছে, কিন্তু তা উদ্ধার করার জন্য যুক্তিযুক্ত ব্যবস্থা যে কেন গ্রহণ করা হচ্ছে না তা কে জানে। একজন আন্তর্জাতিক পেট্রোল বিশারদের মতে, বড়-বড় নদীগুলোর মোহনায় পেট্রোল পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। সেই অনুযায়ী গঙ্গার মোহনায় নিবিড় অনুসন্ধান হল না কেন? মোহিতেশ আরও বললেন, জানেন ভারত সরকার অনেক সময় আমেরিকা বা কানাডা থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে যান, তাদের মাইনে হয় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের চেয়ে পঁচিশ-তিরিশ গুণ বেশি। এরকম পরিবেশে কাজ হয়? অথচ, অনেক ভারতীয় বিশেষজ্ঞ (যেমন মোহিতেশ নিজেই একজন, এটা আমার সংযোজন) এদেশে অনেক আমেরিকান-কেনেডিয়ানের চেয়ে উঁচু পোস্টে, বেশি মাইনের কাজ করেন।

বিজ্ঞানী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ভালো ছাত্র ছাড়াও আরও অনেক রকম বাঙালির সন্ধান পাওয়া যায় এদেশে। ট্যাক্সি চালক কিংবা হোটেলের পরিচারক হিসেবে কোনও বাঙালিকে দেখলে চমকে উঠি। অনেক ভাগ্যান্বেষী বাঙালি এদেশে এসে ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলেছে। বাঙালি ব্যাবসা করছে শুনলে আমরা এখনও আশ্চর্য হই। কিন্তু আলামোহন দাস ধরনের দু-একজন বাঙালিকেও এদেশে দেখা যায়। অবশ্য পাঞ্জাবি এবং গুজরাতিরাই এ ব্যাপারে অনেক বেশি অগ্রণী।

একজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে আলাপ হল এখানে। প্রথম কিছুদিন টুকটাক চাকরি ও নানারকম কষ্ট সহ্য করবার পর এখন তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর ব্যাবসা রিয়েল এস্টেটের, অর্থাৎ জমি ও বাড়ি বিক্রি করা। ক্যালিফোর্নিয়ায় জনসংখ্যা হু-হু করে বাড়ছে, সেই জন্য বাড়ির খুব চাহিদা। ইনি পতিত জমি উদ্ধার করে সেখানে বাড়ি তৈরি করে বিক্রি করেন। এই ব্যাপারে তাঁর বেশ সুনাম হয়ে গেছে। ভারতীয় ব্যাবসায়ীরা দেশ থেকে যেসব অভিজ্ঞতা নিয়ে যান, তার মধ্যে প্রধান হল ঘুষ দেওয়া। ঘুষের ব্যাপারে বেশ একটা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা আছে। সেখানে ভারতীয়রাও পিছপা হয় না। ওই যুবকটির কাছ থেকে একটা গল্প শুনেছিলুম। উনি এক জায়গায় জমি কিনে অনেকগুলি বাড়ি তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু সেই জায়গাটি বসত বাড়ির উপযুক্ত নয়, এই কারণ দেখিয়ে নগর স্থপতি প্ল্যানটি বানচাল করে দিলেন। তখন উনি নগরীর মেয়রকে প্রস্তাব দিলেন যে আস্ত একটি বাড়ি তাকে উপঢৌকন দেবেন। সঙ্গে-সঙ্গে সব প্ল্যান পাস হয়ে গেল। আমেরিকায় সব কিছুই তো বড়-বড়, তাই ঘুষের ব্যাপারটাও ছোটখাটো হলে চলে না। পঞ্চাশ-একশো টাকা ঘুষ দিতে গেলে এরা খুব নীতিবাগিশ হয়ে যাবে, কিন্তু এক লাখ টাকা দিলে আনন্দের সঙ্গে লুফে নেবে। ঘুষ নিয়ে ধরা পড়াটা দারুণ অপরাধ। প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট কার্টারের ভাই তার দাদার নাম ভাঙিয়ে এক জাপানি কোম্পানির কাছ থেকে ঘুষ নিয়েছিল, কাগজওয়ালারা সেটা ফাঁস করে দিয়ে বেচারিকে একেবারে নাজেহালের একশেষ করে দিয়েছে।

লস এঞ্জেলিসের অনেক দোকানের বাইরে দুটি বিজ্ঞাপন দেখে আমি বড্ড মজা পেয়েছি। একটি হল, "এখানে খাঁটি ইম্পোর্টেড জিনিসপত্র পাবেন।" আর অন্যটি "আমরা আসল বিদেশি জিনিস রাখি।" ফরেন জিনিসের প্রতি ভারতীয়দের আসক্তি নিয়ে আমরা অনেক ঠাট্টা ইয়ার্কি করি। কার বাড়িতে ক'টা ইম্পোর্টেড গুডস আছে, তাই দিয়ে ঠিক হয় সামাজিক পদমর্যাদা। এইসব ফরেন বা ইম্পোর্টেড গুডস বলতে অধিকাংশ সময়েই বোঝায় আমেরিকান। অথচ খোদ আমেরিকাতেও বিদেশি ও ইম্পোর্টেড জিনিসের প্রলোভন দেখিয়ে বিজ্ঞাপন থাকে। আবার মনে হল, মানুষের চরিত্র সব জায়গাতেই এক।

আমেরিকানদের কাছে এই লোভনীয় বিদেশি দ্রব্য অবশ্য সবই প্রায় জাপানি। বিশেষত জাপানি গাড়ি ও গাড়ির পার্টস!

লস এঞ্জেলিস ছাড়বার আগের দিন আমরা গেলুম সান ডিয়েগোর 'সমুদ্র জগৎ' দেখতে। অনেক দেশ ঘুরে অনেক কিছু দেখতে-দেখতেও এরকম অনুভূতি খুব কমই হয় যে, আঃ, আজ এটা যা দেখলুম, এটা একেবারে অকল্পনীয় ছিল। সান ডিয়েগোতে এসে আমার সেইরকম অনুভূতি হয়েছিল। এ একেবারেই অভাবনীয় এবং সত্যিকারের নতুন।

সান ডিয়েগোতে প্রধান দ্রষ্টব্য দুটি, চিড়িয়াখানা এবং সমুদ্র জগৎ। পুরো একদিনে একটার বেশি দেখা যায় না। সময়াভাবে আমাদের যেকোনও একটা বেছে নিতে হবে, তাই আমরা 'সমুদ্র জগৎ' যাব ঠিক করলুম। অন্যটি দেখিনি বলে জানি না আমাদের নির্বাচন ঠিক হয়েছিল কি না, কিন্তু যা দেখেছি, তার তুলনা নেই।

লস এঞ্জেলিস থেকে সান ডিয়েগো ঘণ্টাতিনেকের পথ। একদিন সকালে আমরা সবাই মিলে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। জিয়া আর প্রিয়া নামের বালিকা দুটির উৎসাহই বেশি, কারণ, এর মধ্যে দু-একদিন ওদের বাড়িতে রেখে আমরা বড়রা একটু আলাদা ঘোরাঘুরি করেছিলুম। আবার আমরা সকলে এক সঙ্গে। জয়তীদি যেদিন শাড়ি পরেন সেদিন তাঁর চেহারা একরকম, আবার যেদিন জিন্‌স পরেন সেদিন একেবারে সম্পূর্ণ অন্যরকম। তা ছাড়া শাড়ি পরলে উনি বেশ নরম মেজাজে থাকেন আর দুঃখী দুঃখী বাংলা গান করেন। আর যেদিন জিন্‌স পরেন সেদিন একেবারে টম বয়। কোনদিন কোনটা পরবেন, সেটা অবশ্য ওঁর খেয়ালের ওপর নির্ভর করে। আজ জয়তীদি নিজে জিন্‌স পরেছেন তো বটেই, ওঁর লাজুক মেজদিকেও ওই পোশাক পরিয়েছেন। মেজদির ধারণা,

উনি শাড়ির বদলে জিন্‌স পরেছেন বলে সারা পৃথিবীর লোক ওঁর দিকে তাকিয়ে আছে। যদিও এখানকার লোকেরা কে কী পোশাক পরল তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপও করে না। বাচ্চা মেয়ে দুটি সব সময়ই জিন্‌স পরে। আর দীপকদার পোশাক তো একটাই। একটা রংচটা জিন্‌স আর একটা মেটে সিঁদুর রঙের ইষৎ ছেঁড়া গেঞ্জি। ছ'দিন সাত দিন ধরে দীপকদাকে ওই একই বস্ত্রে দেখা যায়। জয়তীদির ঝাঁজালো অনুরোধে উনি যদি বা কোনও এক সকালে পাট ভাঙা জামা-প্যান্ট পরলেন, কিন্তু বিকেলেই তা ছেড়ে আবার জিন্‌স ও গেঞ্জিতে প্রত্যাবর্তন। আজ আমি ও শিবাজিও জিন্‌স পরে ফেলায় আমাদের পুরো দলটাকেই জিন্‌স পার্টি বলা যায়।

জিন্‌স নামের এই প্রায় চটের কাপড়ের প্যান্টালুন এক সময় ছিল আমেরিকার শ্রমিক শ্রেণির পোশাক, এখন বাকি সবাই জিন্‌স পরে, শুধু শ্রমিক শ্রেণি অন্য পোশাকে বাবুয়ানি করে।

প্রশান্ত মহাসাগরের পাশ দিয়ে দিয়ে চমৎকার পথ। দীপকদার গাড়িটি বাতানুকূল, তা সত্ত্বেও আমরা কাচ নামিয়ে দিলুম সমুদ্রের হাওয়া খাওয়ার জন্য। দূর থেকে সান ডিয়েগোকে অলকাপুরীর মতন সুন্দর দেখায়। এক সময় আমাদের গাড়ি এসে থামল সি ওয়ার্ল্ড-এর গেটের সামনে। ডিজনিল্যান্ডের মতন এখানেও দশ টাকার টিকিট কিনে ঢুকলে সারাদিন ধরে সব কিছু যতবার খুশি দেখা যায়।

দেখবার যে কতরকম জিনিস, তার ইয়ত্তা নেই। এখানেও সেই আমেরিকান বিশালতা। অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার জাত এরা নয়। ডিজনিল্যান্ডে যেমন অনেক উদ্দাম কল্পনাকে চাক্ষুষ করা হয়েছে নানারকম যন্ত্রপাতি দিয়ে, এখানে তেমন শুধু জল ও জলজ প্রাণীর খেলা। না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

সমুদ্রের জলকে টেনে আনা হয়েছে অনেকখানি ভেতরে। এক এক জায়গায় বাঁধন দিয়ে সেখানে স্টেডিয়াম বা গ্যালারি বা সিনেমা হলের মতন, সেখানে বসে-বসে প্রতিবার এক-একটি অদ্ভুত জিনিস প্রত্যক্ষ করছি।

ডলফিন বা শুশুক মানুষের পোষ মানে জানতুম, কিন্তু হাঙর? সিন্ধুঘোটক, এমনকী তিমি? মানুষের এই বিস্ময়কর ক্ষমতায় স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ওয়ালরাস ও ডলফিন নিয়ে নাটক, কালো তিমি মাছের নাচ? এর মধ্যে কোনওটাই কৃত্রিম বা সাজানো নয়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে-ঘুরে এসব দেখতে-দেখতে আমাদের কৌতূহল ও বিস্ময় ক্রমশই বেড়ে যায়। এসব দৃশ্য দেখবার, বর্ণনা করবার নয়। তবে শামুর কথা বলতেই হয়। শামু একটি খুনি তিমির আদরের ডাক নাম। তার ওজন সাত টন না চোদ্দো টন কত যেন। পৃথিবীর বৃহত্তম এবং ভয়ংকরতম প্রাণী। গ্রিক দেবতার মতন রূপবান একজন যুবকের নির্দেশে সে নানান খেলা দেখায় আমাদের, এমনকী একবার হুকুম শুনে জল থেকে তিরিশ-চল্লিশ ফিট উঁচুতে লাফিয়ে উঠে আমাদের অভিবাদন জানায়। যুবকটি তাকে এক বালতি মাছ খেতে দিয়ে আদর করে এবং শামুর পিঠে চড়ে বসে। তারপর সেই অতিকায় তিমি ও গ্রিক দেবতা জলের ওপর দিয়ে চলে যায় রূপকথার জগতে।

এইসব দেখতে-দেখতে আমি জিয়া ও প্রিয়ার দিকে তাকাই। বালিকা দুটির চোখের মুগ্ধতা দেখে বোঝা যায়, ওরা এখানে নেই, ওরা রয়েছে এখন ওদের কল্পলোকে।

॥ ২২ ॥

পৃথিবীটা যে আসলে কত ছোট তার প্রমাণ পেলুম এক রাতে।

জয়তীদিদের এক আত্মীয়ের আত্মীয়-বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেছি, প্রচুর লোকজন সেখানে, একতলা-দোতলা জুড়ে নিমন্ত্রিতরা ঘোরাঘুরি করছে। আমি যথারীতি বসে আছি এক কোণে একটা

চেয়ারে, হঠাৎ এক সময় একজন কেউ ঘুরে-ঘুরে বলতে লাগল, এখানে নীললোহিত নামে কে আছে? তার ফোন এসেছে।

বিশ্বাস করাই শক্ত আমার পক্ষে। এই অচেনা বাড়িতে আমায় কে ফোন করবে? আমি যে এখানে থাকব, তা তো কারুর জানার কথা নয়। এমনকী এই সন্ধেবেলাতেও আমি দোনামোনা করছিলুম আসব কি না। তা ছাড়া এই মাঝরাতে কে আমার খোঁজ করবে?

উঠে গিয়ে ফোন ধরে বললুম, হ্যালো?

প্রথমে একটা হাসির শব্দ। তারপর একটি নারী কণ্ঠ প্রশ্ন করল, কোনও সুন্দরী মেয়ের পাশ থেকে তোমায় উঠে আসতে হল বুঝি? ডিসটার্ব করলুম তো?

শুনেই চিনেছি, আমার বন্ধু বরুণ চৌধুরীর স্ত্রী মীনার গলা।

কলকাতা ছাড়ার কয়েকদিন আগেই ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। এর মধ্যে ওদের মার্কিন দেশে বেড়াতে আসা আশ্চর্য কিছু নয়, কিন্তু আমায় এখানে টেলিফোন করা পরমাশ্চর্য ব্যাপার। কারণ, এ বাড়ির টেলিফোন নাম্বার আমি নিজেও জানি না।

তারপর বরুণ চৌধুরী বলল, খুব টোটো করে ঘুরে বেড়াচ্ছ তো, কিন্তু আমরা ঠিক ধরে ফেলেছি।

কথায়-কথায় জানলুম, ওরা রয়েছে শ' তিনেক মাইল দূরে মার্সেড শহরে। দিন দু-এক আগে লাস ভেগাস যাওয়ার পথে এসেছে ওখানে, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের ভাই ডাক্তার চিত্ত চট্টোপাধ্যায়ের বাড়িতে। সেখানে আজ সন্ধেবেলা আড্ডা দিতে-দিতে আমার প্রসঙ্গ উঠেছিল। কোথায় আমাকে পাওয়া যেতে পারে? আমি ভ্রাম্যমাণ, আমার কোনও ঠিকানা নেই। কিন্তু আমার সম্পর্কে একটা ব্যাপার অনায়াসে আন্দাজ করা যায়, আমি নিশ্চয়ই পয়সা বাঁচাবার জন্য কোনও হোটেলে উঠব না, কোনও বাঙালির বাড়িতেই আশ্রয় নেব। লস এঞ্জেলিস-এ বাঙালির সংখ্যা কম নয়, ঠিক কোন বাড়িতে আমি উঠব তা বোঝা প্রায় অসম্ভব। তবু ওরা অসম্ভবকেও সম্ভব করেছে। কয়েক জায়গায় ফোন করে নাম জেনেছে আমার আশ্রয়দাতার। সেখানে ফোন করে জেনেছে আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি এখানে।

টেলিফোনে এমনভাবে ওদের সঙ্গে গল্প হল, যেন এলগিন রোডের সঙ্গে গড়িয়াহাটের আড্ডা।

মিনা ও বরুণ চৌধুরী দুদিন পরে এসে পৌঁছবে লস এঞ্জেলিসে, আর আমাদের কাল সকালেই এ জায়গা ছেড়ে যাওয়ার কথা। জিয়া আর প্রিয়া উতলা হয়ে উঠেছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য, তা ছাড়া দীপকদার বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে।

কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় এসে সানফ্রান্সিসকো যাওয়া হবে না, এ কি চিন্তা করা যায়? বিশ্বের বিখ্যাত নগরীগুলিকে যদি সৌন্দর্য প্রতিযোগিতায় লাইন দিয়ে দাঁড় করানো যায়, তাহলে অনেক বিচারকই সান ফ্রান্সিসকোকে প্রথম স্থান দেবেন। আমি অবশ্য দেব না, কারণ বিচারক হিসেবে আমি বড্ড খুঁতখুঁতে। এখনও পৃথিবীর যেসব স্থান আমি দেখিনি, আমার মনে হয়, তারা আরও বেশি সুন্দর। সানফ্রান্সিসকো আমার আগে একবার দেখা।

লস এঞ্জেলিস থেকে সানফ্রান্সিসকো যাওয়ার পথে মাঝামাঝি জায়গায় বেকার্সফিল্ড নামে একটা মাঝারি শহর আছে। এখানে থাকেন ডাক্তার মদনগোপাল মুখোপাধ্যায়, তিনি আগে থেকেই কড়ার করে রেখেছেন, তাঁর ওখানে একবার যেতেই হবে।

পরদিন সকালে জয়তীদি ও মেজদিরা গেলেন লস এঞ্জেলিস-এর বাজার উজাড় করে আনতে, আমি আর দীপকদা আড্ডা দিতে বসলুম। শিবাজি তার অতি প্রিয় একটা ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, বিছানায় শুতে না শুতেই ঘুম।

দীপকদা পদার্থ বিজ্ঞানী, কিন্তু আধুনিক সাহিত্য থেকে শুরু করে সমাজতত্ত্ব এমনকী মহাকাশ অভিযান পর্যন্ত নানান বিষয়ে তাঁর উৎসাহ ও পড়াশুনো, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে বসলে

কখন যে সময় কেটে যায়, বোঝাই যায় না।

বেরুতে-বেরুতে আমাদের অনেক দেরি হয়ে গেল। এক হিসেবে এটা আমাদের উলটো যাত্রা। কানাডা থেকে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসবার সময় আমরা সানফ্রান্সিসকোকে পাশ কাটিয়ে লস এঞ্জেলিসে এসেছিলুম। যে পথ দিয়ে আমরা এসেছিলুম, অনেকটা সেই পথ ধরেই ফিরে যাচ্ছি।

বেকার্সফিল্ডে পৌঁছতে কেন যে আমাদের রাত দুটো বেজে গেল তা জানি না। মাত্র আড়াইশো মাইলের ব্যাপার, তাই তাড়া ছিল না। দীপকদা দু-তিনবার কফি খাওয়াবার জন্য গাড়ি থামিয়েছেন। অবশ্য বেকার্সফিল্ডে এসে ঠিকানা খুঁজতেও অনেকটা সময় গেছে। এত রাতে কি কারুর বাড়িতে যাওয়া যায়? পাড়া একেবারে শুনশান। বাড়িগুলো দেখলেই বোঝা যায় বেশ অভিজাত পাড়া। কোনও বাড়িতে আলো জ্বলছে না। এদেশে রাস্তায় কুকুর থাকে না, নইলে এই নিঝুম রাতে আমাদের গাড়ি থেকে নামতে দেখলে নিশ্চয়ই কুকুর তেড়ে আসত।

কিন্তু সন্তর্পণে গিয়ে বেল টেপা মাত্র দরজা খুলে গেল। ডাঃ মুখার্জি আমাদের প্রতীক্ষায় জেগেই ছিলেন। সহাস্য মুখে বললেন, আসুন, আসুন।

ডঃ মদনগোপাল মুখোপাধ্যায় অতি সদালাপী ও অমায়িক মানুষ। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি আমার মদনদা হয়ে গেলেন। অবশ্য নামটা যত ভারিক্কি, সেই তুলনায় বয়েস বেশি নয়। নিম্ন-চল্লিশেই তিনি ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হিসেবে এদেশে যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

আমরা অনেকগুলো মানুষ, সকলের জন্যই আলাদা-আলাদা ঘরে শোওয়ার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে। এত রাত্রে আর আড্ডা জমবে না, আমরা শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করলুম। আমাদের মধ্যে শিবাজিকেই বেছে নিয়ে মদনদা বললেন, দেখবেন, মনের ভুলে যেন জানালা খুলে ফেলবেন না। তা হলেই পুলিশ ছুটে আসবে।

কাছাকাছি কয়লাখনি আছে বলেই বোধহয় লস এঞ্জেলিস-এর তুলনায় বেকার্সফিল্ড একটু গরম। সুতরাং রাত্রে জানলা খুলতে আপত্তি কেন?

মদনদা বুঝিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক দরজা-জানালায় বার্গলার্স অ্যালার্ম লাগানো আছে। চোর-ডাকাত কিছু ভাঙবার চেষ্টা করলেই শুধু যে এখানেই সতর্ক ঘন্টা বেজে উঠবে তা নয়, থানায় একটা বোর্ডে আলো জ্বলে উঠবে, তা দেখে বোঝা যাবে, কোন বাড়িতে হানাদার এসেছে, সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশ এসে যাবে।

এ দেশের পুলিশ খুব ভালো দারোয়ানগিরি করতে পারে।

পরদিন বেশ বেলা করে উঠে ঘুরে-ঘুরে দেখলুম মদনদার বাড়ি। এর আগে যত বাঙালির বাড়িতে গেছি, এত বড় ও ঝকঝকে তকতকে বাড়ি আর দেখিনি। বাড়ির সঙ্গে আছে বাগান, সুইমিং পুল, টেনিস কোর্ট ইত্যাদি। দুটি বসবার ঘর, যার মধ্যে একটির নাম ফ্যামিলি রুম। অর্থাৎ একটিতে বাইরের লোক এলে বসানো হবে, অন্যটিতে বাড়ির বাচ্চারা খেলবে কিংবা বড়রা টিভি দেখবে। সেইরকম খাবারের ঘরও দুটি। একটি বাইরের লোকদের জন্য বেশি সাজানো, অন্যটি প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য। এ ছাড়া আছে বার কাউন্টার। ঠিক যেন সিনেমার বাড়ি। বসবার ঘরের কার্পেট এত গভীর যে পা ডুবে যায়।

এইসব বাড়িতে ঘোরাফেরা করতে অস্বস্তি লাগে। কখন যে কোথায় দাগ লেগে যাবে, কিংবা মেঝেতে সিগারেটের ছাই ফেললে কী কেলেঙ্কারি হবে, এই চিন্তাতেই সর্বক্ষণ কাঁটা হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনীর ব্যবহারের আন্তরিকতায় এই অস্বস্তি দূর হয়ে যায়। যারা বস্তুর চেয়ে মানুষকে বেশি মূল্য দেয়, তাদের কাছে কোনও অসুবিধে নেই। ডলিবউদি চমৎকার হাসিখুশি মানুষ, ওঁদের এক ছেলে ও এক মেয়ে, তাদের নাম মিষ্টি আর মিঠাই। বোঝাই যাচ্ছে, ডলিবউদি সন্দেশ-রসগোল্লা খুব ভালো বানাতে পারেন।

মদনদা খুব ব্যস্ত ডাক্তার হলেও তাঁর নানা রকমের শখ আছে। উনি বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

ও তলোয়ার সংগ্রহ করেন, বই ও ছবি কেনেন। এ ছাড়া আছে ওঁর গাড়ির শখ। আপাতত ওঁর চারখানা গাড়ি। মার্সিডিজ, ক্যাডিল্যাক, বি এম ডব্লু ও আর একটা কী যেন! নীহাররঞ্জন গুপ্তর রহস্য-উপন্যাসে রাজা মহারাজারা সবসময় ক্যাডিলাক গাড়ি চেপে আসত, সেই ক্যাডিলাকে আমিও চাপব ভেবে বললুম, ক্যাডিলাক। ওরেঃ বাবা!

আমার দিকে অন্যরা এমনভাবে তাকাল, যেন আমি একটা ঘোর বাঙাল!

ক্যাডিলাকের তুলনায় মার্সিডিজ বেঞ্জ, বি এম ডব্লু নাকি আরও উঁচু জাতের গাড়ি। বিশেষত যে গাড়িটার নাম আগে শুনিনি, শুনলেও মনে রাখতে পারি না, দুশো চল্লিশ না চারশো আশি কী যেন, সেটা নাকি পৃথিবীর সেরা।

দীপকদা সেই গাড়িটার পিঠে সস্নেহে হাত বুলিয়ে বললেন, বুঝলেন মদনবাবু আমারও খুব গাড়ির শখ। কিন্তু আমি মাস্টার মানুষ, এসব গাড়ি কেনবার কথা ভাবতেই পারি না।

মদনদা ভদ্রতা করে বললেন, বাঃ, আপনিও যে এত বড় পনটিয়াক গাড়িটা এনেছেন, এটা কম কীসে?

আমি গাড়ি বিষয়ে কিছুই বুঝি না। আমার ধারণা, যে গাড়ি থেমে থাকে না, চলে, সেটাই ভালো। শুধু-শুধু বেশি দামের গাড়ি কেনার কী মানে হয় কে জানে। যাই হোক, পর্যায়ক্রমে মদনদার সব গাড়িতেই একবার করে চেপে জীবন ধন্য করে নিয়েছি, বিশেষ তফাত অবশ্য বুঝতে পারিনি।

উন্মুক্ত জায়গায় লোহার ঘোরানো উনুন এনে সন্ধেবেলা বারবিকিউ ডিনার হল। এই ব্যাপারটা দীপকদাও বেশ ভালো পারেন, এডমান্টনে আমাদের একাধিক দিন খাইয়েছেন। পুরুষ রাঁধুনিদের একটা স্বভাব হল, তাঁরা কে কার চেয়ে ভালো রান্না করেন, তার প্রমাণ দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। দীপকদা বারবার বলতে লাগলেন, মদনবাবু, আপনি আঁচটা একটু বেশি করে ফেলেছেন। আর মদনদা বলতে লাগলেন, আরে মশাই, আমি বারবিকিউ করতে-করতে ঝুনো হয়ে গেলুম, যে-কোনও রেস্তোরাঁয় চাকরি পেতে পারি...। শেষ পর্যন্ত ডলিদি বললেন, তোমরা দুজনেই সরো তো, আমি দেখছি।

মদনদা খুব দুর্লভ জাতের ওয়াইন সংগ্রহ করে রেখেছিলেন, ঝলসানো মাংসের সঙ্গে সেই আঙুরের রস যা জমল, তা আর বলার নয়। মেয়েদেরও জোর করে খাওয়ানো হল খানিকটা করে ওয়াইন, কিংবা খুব একটা জোর করতে হয়নি বোধহয়, প্রথম গেলাসের পর নিজেরাই বাড়িয়ে দিয়েছেন দ্বিতীয় গেলাস। অল্পতেই ওঁদের ফুরফুরে নেশা হয়, একটু পরেই শুরু হল জয়তীদি ও মেজদির গান। প্রথমে 'জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে', তারপর যার যেটা মনে পড়ে। একটু পরে আমরা ছেলেরাও হেঁড়ে গলায় যোগ দিলুম। সত্যিই যেন চাঁদের আলোয় পিকনিক হচ্ছে। অফুরন্ত আনন্দ।

তখনও আমরা বুঝতে পারিনি, মিলিতভাবে এটাই আমাদের শেষ রাত।

মদনদা এক সময় একটা প্রস্তাব দিলেন, কাল থেকে তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিচ্ছেন, সবাই মিলে একসঙ্গে কোথাও বেড়াতে গেলে হয় না?

মদনদা ছুটি নিচ্ছেন শুনে আমরা অবাক হলুম। ডাক্তাররা কখনও ছুটি পায় নাকি? মদনদা এখানকার একটি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত, তা ছাড়া তাঁর প্রাইভেট প্র্যাকটিসের এলাকা বহুদূর বিস্তৃত। চারখানা গাড়ি থাকা সত্ত্বেও তিনি একটি ছোট প্লেন কেনার কথা ভাবছেন। নিজেই চালাবেন। প্লেনে রুগি দেখার অনেক সুবিধে, অনেক সময় বাঁচে।

—সত্যি ছুটি নিচ্ছেন?

মদনদা বললেন যে, অনেকদিন ছুটি নেওয়া হয়নি, কোথাও বেড়াতে যাওয়া হয়নি, সুতরাং তাঁর মন উচাটন হয়ে উঠেছে।

কাছাকাছির মধ্যে দুটির যে-কোনও একটি জায়গায় যাওয়া যায়। লাস ভেগাস কিংবা সানফ্রান্সিসকো। দু-জায়গাই দু-রকম আকর্ষণ। মদনদার ঝোঁক লাস ভেগাসের দিকেই বেশি। শিবাজি প্রচুর সিনেমায় লাস ভেগাস দেখেছে, সে-ও লাফিয়ে উঠল। দীপকদারও অনিচ্ছে নেই। মেজদি দুটো জায়গাতেই যেতে চান।

কিন্তু এই পৃথিবী বিখ্যাত জুয়ার শহরে যেতে আমিই প্রথম আপত্তি তুললুম। আমার মনের মধ্যে একটা বিষম জুয়াড়ি আছে। কিন্তু লাস ভেগাসে জুয়া খেলতে যাব; সে মুরোদ আমার কোথায়? 'যত সাধ ছিল সাধ্য ছিল না'। পকেট গড়ের মাঠ নিয়ে কেউ জুয়ার আসরে যায়? সেই জন্যই আমি এখন মনে-মনে একা-একা জুয়া খেলা পছন্দ করি।

মদনদা বোঝালেন যে, লাস ভেগাসে শুধু জুয়া নয়, নাচগানের অনেকগুলো শো হয়, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সেখানে আসে। এই তো ফ্রাঙ্ক সিনাত্রা দলবল নিয়ে সেখানে একটা শো করছেন। কিন্তু তাতেও আমি গললুম না, কারণ একেবারে গরিব হয়ে লাস ভেগাসে যাওয়া যায় না। আর জুয়ার শহরে গিয়ে জুয়া খেলব না, শুধু নাচ-গানের আসরে যাব, তারই বা কোন মানে হয়?

লাস ভেগাস যাওয়ার বিরুদ্ধে আর একটা বড় যুক্তি, আমাদের সঙ্গে বাচ্চারা রয়েছে, তারা ওখানে কী করবে? ওই শহর বাচ্চাদের জন্য নয়।

পরদিন বেরিয়ে পড়ল দুটো গাড়ি।

সানফ্রান্সিসকো যাওয়ার আগে, আমরা ঠিক করলুম, একটু মার্সেড ঘুরে যাওয়া হবে। যদি সেখানে মীনা ও বরুণ চৌধুরীকে এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু পৌঁছে দেখলুম পাখি উড়ে গেছে। বরুণ ও মীনার উপস্থিতির উত্তাপ এখনও রয়েছে সেখানে, কিন্তু ওরা চলে গেছে লস এঞ্জেলিসে। সেখান থেকে ওদের ধরে আনা যায় না? মাত্র দুশো মাইল, যাওয়া-আসায় বড়জোর ছ'ঘণ্টা লাগবে। ফোন করা হল ওদের, কিন্তু উপায় নেই, ওরা জানাল যে, পরদিনই ওদের এদেশ ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্লেনে রিজার্ভেশান হয়ে আছে।

চিত্ত চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর স্ত্রী আলো, দুজনেই ডাক্তার। আমাদের পেয়ে হইহই করে উঠলেন। আমাদের কিছুতেই ছাড়বেন না। চিত্তর বাড়ির সুইমিং পুলের ধারে বসে আড্ডা হল অনেকক্ষণ। এর আগেই আমরা চুপিচুপি ঠিক করে রেখেছি যে, এখানে রাত কাটানো হবে না, আজ রাত্তিরের মধ্যেই সানফ্রান্সিসকো পৌঁছতে হবে।

চিত্ত আর তার স্ত্রীকে অনেক বুঝিয়ে, খাওয়াদাওয়া সেরে আমরা যখন বিদায় নিয়ে বাইরে এসে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছি, তখন জয়তীদি বললেন, ওঁরা আর সানফ্রান্সিসকো যাবেন না। ওঁরা এবার বাড়ির দিকে রওনা হবেন।

প্রথমে বিশ্বাস করতে পারিনি। এতদূর পরিকল্পনা করে এসে হঠাৎ এরকম সিদ্ধান্ত? কিন্তু, জয়তীদি বললেন, এতদিন ধরে গাড়িতে ঘুরে-ঘুরে ওঁর মেয়েরা ক্লান্ত। কানাডায় ফিরে স্কুলে যাওয়ার আগে দু-একদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। সানফ্রান্সিসকো ওঁরা আগে দেখেছেন, সুতরাং...বিশেষত আমাদের নিয়ে ঘোরাবার জন্য মদন মুখার্জিকে যখন পাওয়া গেছেই...।

জয়তীদির সঙ্গে আমরা যুক্তিতে হেরে গেলুম। কোনও যুক্তি না থাকলেও অবশ্য উনিই জিততেন। এক একজনের ইচ্ছেটাই যুক্তি। ঠিক হল, ওঁর মেজদি আমাদের সঙ্গেই যাবেন, পরে তাঁকে কানাডায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

একটা ব্যাপারে আমি সাহেব। বিদায় নেওয়ার সময় বেশি বেশি আবেগের বিমোচন আমার পছন্দ হয় না। বাঙালিদের তো আশিবার আসি না বললে বিদায় নেওয়াই হয় না ঠিক মতন। আমি দীপকদার গাড়ির কাছে গিয়ে সবার দিকে তাকিয়ে শুধু বললুম, আচ্ছা, আবার দেখা হবে। তারপর উঠে পড়লুম মদনদার গাড়িতে।

দুটো গাড়ি দুদিকে চলে গেল।

॥ ২৩ ॥

বেশ কয়েক বছর আগে এক মুখচোরা বাঙালি ছোকরা এসেছিল সানফ্রান্সিসকো শহরে। গ্রেহাউন্ড বাস ডিপোতে এসে নেমেছিল সন্ধেবেলা, সঙ্গে একটা মাঝারি ব্যাগ, বলতে গেলে প্রায় সহায়সম্বলহীন, নিছক ভ্রমণের জেদেই সে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

কোনও নির্দিষ্ট থাকার জায়গা না থাকলে সানফ্রান্সিসকো শহরটি সন্ধেবেলা একা পৌঁছবার পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়। এই নগরীটি যেমন সুন্দরী তেমনই ভয়ংকরী। গোটা মার্কিন দেশেই অপরূপ সৌন্দর্যের সঙ্গে মিশে আছে নিদারুণ হিংস্রতা। সেই ছেলেটির কোনও থাকার জায়গার ঠিক নেই, পকেটে টাকাপয়সা যৎসামান্য, নতুন শহরে এসে সে ওয়াই এম সি এ-তে ওঠবার চেষ্টা করে। এর থেকে সস্তায় আর কোথাও থাকা যায় না।

ছেলেটি বাস স্টেশনেই টেলিফোন ডিরেক্টরি দেখে ফোন করল ওয়াই এম সি এ-তে। নিদারুণ দুঃসংবাদ, সেখানে একটাও জায়গা খালি নেই, আগামী দু-দিনের মধ্যে কোনও জায়গা পাওয়া যাবে না। নাম লিখিয়ে রাখলে তারপর ঘর পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আজকের রাত্রিবাস কোথায় হবে?

ব্যাগটি পিঠে ঝুলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। টিপি-টিপি বৃষ্টি পড়ছে। সেই সঙ্গে ছেলেটির গা ছমছম করছে। বন্দর-শহরে এমনিতেই লুঠেরা-বখেরাবাজ আর খুনে গুন্ডাদের আড্ডা থাকে, তার ওপরে সানফ্রান্সিসকো শহরে আছে একটি বিশাল চিনা উপনিবেশ। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের রহস্য লহরি সিরিজে ভয়াবহ সব চিনে গুন্ডাদের কাহিনি সে পড়েছে, চিনে-খুনিদের ছুরিগুলো হয় সরু লিকলিকে, পিঠে গাঁথলে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে যায়, যাকে গাঁথা হল, সে কিছু না বুঝেই অক্কা পায়। রাস্তা দিয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে ছেলেটি হাঁটছে আর তার পিঠ শিরশির করছে।

ছেলেটির কাছে একটি মাত্র ঠিকানা আছে। সিটি লাইটস বুক স্টোরের আংশিক মালিক, তার নাম লরেন্স ফের্লিংগেটি। কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ এই ঠিকানাটা তাকে দিয়ে বলেছিল, যদি কখনও সানফ্রান্সিসকো যাও, এর সঙ্গে দেখা কোরো। ছেলেটি ভাবল, এখুনি কি একবার ফের্লিংগেটিকে ফোন করা উচিত? কিন্তু ওর কাছে কি আশ্রয় চাওয়া যায়? সাহেবদের বাড়িতে তো হঠাৎ কোনও অতিথি আসে না, এ দেশে সবই অ্যাপয়েন্টমেন্টে চলে। ছেলেটি লাজুক, তাই সে ফোন করল না, সস্তার হোটেল খুঁজতে লাগল।

একটার পর একটা হোটেলের দরজা থেকে ফিরে যাচ্ছে সে। কোথাও ঘর খালি নেই, কোথাও দাম অতিরিক্ত চড়া। এর মধ্যেই বৃষ্টিতে ভিজে জবজবে হয়ে গেছে সে, ভাগ্যিস সানফ্রান্সিসকোতে তেমন শীত পড়ে না। সারা আকাশ চিরে বিরাট-বিরাট বিদ্যুৎ আর প্রচণ্ড বজ্রের গর্জন হচ্ছে মাঝে-মাঝে, যেন আকাশে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে।

ডাউন টাউন ছাড়িয়ে আসতেই রাস্তা একেবারে ফাঁকা, শুধু গাড়ি, কোনও পথচারী নেই। অচেনা শহরে এক কচি বয়েসের বঙ্গ সন্তান হেঁটে চলছে অসহায়ভাবে। এইরকম অবস্থায় একটা নেশার ভাব হয়, এক সময় সব ভয় কেটে যায়, মনে হয়, যা হয় হোক, চারটে ডাকাত ঝাঁপিয়ে পড়ুক, পেটে ছুরি চালিয়ে দিক, টাকা-পয়সা ব্যাগ-ট্যাগ কেড়ে নিয়ে চলে যাক, কিছু যায় আসে না। দেখা যাক না কে কত মারতে পারে।

দূরে একটা হোটেলের আলো দেখা যাচ্ছে, ছেলেটি এগোচ্ছে সেই দিকে, হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে দাঁড়াল তার সামনে একটা কালো দৈত্য। সাদা ধপধপে দাঁতে হেসে সে বলল, গট্ আ লাইট?

ছেলেটি প্রথমে দারুণ চমকে কেঁপে উঠলেও সঙ্গে-সঙ্গে স্থির হয়ে গেল। সে বুঝেছে যে চরম মুহূর্ত এসে গেছে। সে দেশলাই খোঁজার জন্য পকেটে হাত দেওয়া মাত্র এই কালো দৈত্যটি তার পেটে ছুরি মারবে। এই রকমই নিয়ম। বাধা দিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ এই কালো দৈত্যটি

ইঁদুরছানার মতন তার টুঁটি চেপে ধরে শূন্যে তুলে লোপালোপি করতে পারে।

ছেলেটি অভিমানভরা কণ্ঠে বলল, আমার কাছে তো দেশলাই নেই?

এই কথাগুলি বলায় এবং তার পরবর্তী উত্তর শোনার মাঝখানে যেন কেটে গেল একযুগ। এখনও সে মরেনি? নাকি ছুরি চালিয়ে দিয়েছে, সে টের পাচ্ছে না?

কালো দৈত্যটির হাতে সিগারেটের প্যাকেট, তখনও ছুরি কিংবা রিভলভার দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, হোয়াইয়ু গোয়িং, ম্যান!

অল্প দূরে 'হোটেল সিসিল' লেখা বাতি স্তম্ভটি দেখাল ছেলেটি আঙুল তুলে।

কালো দৈত্যটি কী যেন একটু চিন্তা করে বলল, কম্ কম্।

তারপর সে ছেলেটির সঙ্গে-সঙ্গে চলতে লাগল। এতক্ষণেও মরে না যাওয়ায় ছেলেটি বেশ অবাকই হয়েছে। কালো মানুষটি তাকে এত দয়া করছে কেন? এত জনশূন্য রাস্তায় তাকে ঝট করে খুন করে ফেললে কেউ তো দেখবার নেই। অন্তত ব্যাগটা তো কেড়ে নিয়ে অনায়াসেই পালাতে পারে।

হোটেলের কাউন্টারে যে ফরসা মেয়েটি বসেছিল তার সঙ্গে কালো লোকটিই প্রথমে কিছুক্ষণ কথা বলল। সে কথার মর্মোদ্ধার করা শক্ত। তবে মনে হচ্ছে, কালো লোকটি ফরসা মেয়েটিকে বেশ অনুরোধ করছে।

একটু বাদে ফরসা মেয়েটি ছেলেটিকে বলল, শোনো, আমাদের হোটেলেও জায়গা নেই। এইরকম সময়ে তুমি হোটেল রিজারভেশন ছাড়াই সানফ্রান্সিসকো শহরে এসেছ? যাই হোক, তোমার বন্ধুর অনুরোধে একটা ব্যবস্থা করতে পারি, যদি তুমি রাজি থাকো।

ছেলেটি আকাশ থেকে পড়ল। বন্ধু? মাত্র দেড় মিনিট আগে দেখা, পরস্পরের নামও জানে না, এর মধ্যে ওরা বন্ধু হয়ে গেল? এ আবার কী ধরনের চক্রান্ত?

মেয়েটি বলল, একটা ডব্‌ল বেড রুমে একটা বেড খালি আছে। যে লোকের ঘর, সে এখন নেই, যে-কোনও সময় এসে পড়তে পারে, তবে তাকে বলা আছে যে তার ঘরের অন্য বিছানাটি আর একজনকে দেওয়া হতে পারে। তুমি সেটা নিতে রাজি আছ?

অচেনা লোকের সঙ্গে রাত্রিবাস? সে কীরকম কে জানে? এই কালো লোকটি কোনও মতলবে নিয়ে তাকে ওই ঘরে ঢোকাচ্ছে? কিন্তু ভাড়া এত অবিশ্বাস্যরকমের সস্তা যে ছেলেটি এক কথায় না বলতে পারল না।

কালো লোকটি কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সে হঠাৎ বলল, হে! ইয়ু, লুক সো স্কেয়ার্ড...হ্যা হ্যা হ্যা হ্যা।

ফরসা মেয়েটি কিন্তু হাসে না। সে বলল, যদি রাজি থাকো, তবে তোমার গাড়িটা পেছন দিকে রেখে এসে রেজিস্টারে নাম লেখো—

গাড়ি ছাড়া, এমনকী ট্যাক্সিও না নিয়ে, পায়ে হেঁটে কেউ সানফ্রান্সিসকো শহরে রাত্তিরবেলা হোটেল খুঁজতে বেরুতে পারে, এ কথা এরা বিশ্বাসই করতে পারবে না। খুনে-ছিনতাইবাজরা সবাই কি আজ ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছে?

ছেলেটি বলল, আমার গাড়ি নেই, কোথায় নাম লিখতে হবে বলো।

কালো লোকটি ঝুঁকে কাউন্টারের ওপাশ থেকে একটা দেশলাই তুলে নিয়ে কী একটা দুর্বোধ্য বিদায় বাক্য বলে হঠাৎ নেমে গেল রাস্তায়। মেয়েটি নিজেই ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে লিফ্‌টে উঠল, সাততলায় একটা ঘরের দরজা খুলে দিয়ে, এতক্ষণ বাদে একটু মুচকি হেসে বলল, হ্যাভ আ নাইস টাইম।

তারপরেই সে প্রায় একটা পাখির মতন উড়ে গেল ফুরুৎ করে।

এরকম অবস্থায় শুধু একটা কথাই মনে হয়, এ কোথায় এসে পড়লুম রে, বাবা!

ঘরটি মাঝারি, মধ্যে টেবিল ল্যাম্প সমেত ছোট টেবিল, দুপাশে দুটো খাট। একটি বিছানা নিভাঁজ পরিচ্ছন্ন, অন্য বিছানাটি এলোমেলো। ওয়ার্ডরোবের দরজাটা হাট করে খোলা, তার মধ্যে কয়েকটা জামা-প্যান্ট আর একটা ওভারকোট ঝুলছে। নীচে একটা সুটকেসও রয়েছে, সেটাও তালাবন্ধ নয়, উঁচু হয়ে আছে ডালাটা। এ ঘরের আসল মালিক কীরকম মানুষ কে জানে। ওভারকোটের সাইজ দেখে মনে হচ্ছে বেশ লম্বা-চওড়া। সে যদি এসে বলে তার কোনও জিনিস চুরি গেছে? কিংবা মাঝ রাত্তিরে সে যদি কোনও বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে এসে তাকে বলে, গেট আউট! না, না, গেট আউট তো ভদ্র ভাষা, সে নিশ্চয়ই বলবে, গেট দা হেল আউট অব হিয়ার!

ছেলেটি বিমর্ষভাবে নিজের খাটে বসে জুতো-মোজা খুলে ফেলল। তার মাথায় এখন আকাশপাতাল চিন্তা। রাস্তার কালো লোকটি কেন তাকে এই হোটেলে পৌঁছে দিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করে দিল? বিনিময়ে পয়সাকড়ি কিছু চাইল না, একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত নেওয়ার জন্য দাঁড়াল না! ও কি দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ? কাউন্টারের মেয়েটি যাওয়ার সময় মুচকি হেসে গেল কেন? তাকে নিয়ে কোনও মজার খেলা হবে? এঘরের মালিক রাত্তিরবেলা এসে তাকে তুলোধোনা করবে?

বাঙালি ছেলেদের স্বভাব হচ্ছে এই যে, তারা এক কথায় মরে যেতে একটুও ভয় পায় না, কিন্তু মার খাওয়া বড্ড অপছন্দ করে।

ভয়ের সঙ্গে একটা খিদের সম্পর্ক আছে। ছেলেটি যদিও বিকেলবেলা একটা বেশ বড় হ্যামবার্গার আর কফি খেয়েছে, তবু এর মধ্যে তার খিদে পেয়ে গেল। কিন্তু খাবার জন্য তাকে আবার বাইরে যেতে হবে? কোনও দরকার নেই। তার ব্যাগে বিস্কুট, চিজ আর আপেল আছে।

কিন্তু খাওয়ার আগে অন্য একটা কাজের কথা তার মনে পড়ে গেল। সে যে এই শহরে এসেছে তা কেউ জানে না। এখন তো থাকবার জায়গা জুটেছে, এখন শ্রীযুক্ত লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যেতে পারে। রাত আটটাও বাজেনি, বইয়ের দোকান খোলা থাকাই সম্ভব। ঘরেই ফোন আছে, সহজেই সিটি লাইট বুক স্টোরস পেয়ে গেল সে। কিন্তু তারপরই দুঃসংবাদ। মিঃ ফের্লিংগেটি ইজ নট ইন টাউন! কাল-পরশু ফিরে আসতে পারেন। যাঃ, এ শহরের সঙ্গে ছেলেটির একমাত্র যোগসূত্রও নষ্ট। এখন যদি সে এখান থেকে নিঃশব্দে হারিয়ে যায়, কেউ টেরও পাবে না।

ঘরের সংলগ্ন একটি বারান্দাও আছে। আপেল কামড়াতে-কামড়াতে ছেলেটি খালি পায়ে এসে বারান্দায় দাঁড়াল। এতক্ষণ বাদে তার খেয়াল হল যে প্রায় দু-ঘণ্টা আগে সে সানফ্রান্সিসকোয় পৌঁছলেও নানারকম দুর্ভাবনা নিয়ে এমন ব্যস্ত ছিল যে এ-শহরের কিছুই তার চোখে পড়েনি। এ-শহরের এত নাম সে শুনেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত সে দেখেছে শুধু কয়েকটি রাস্তা আর বড়-বড় বাড়ি, যা সব শহরেই আছে। এই বারান্দা থেকেও বিশেষ কিছু দেখা যায় না, তবে দূরে দেখা যাচ্ছে একটা উজ্জ্বল আলোর আভা, ওখানে কিছু আছে নিশ্চয়ই। এমন কিছু রাত হয়নি, এখনও সে বেরিয়ে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারে, এইসব শহর রাত্রিরই শহর, এরা রাতমোহিনী। কিন্তু ছেলেটির আর উৎসাহ নেই, তার বিমর্ষ ভাব কিছুতেই কাটছে না।

যে-কোনও বড় শহরেই একাকিত্ব অতি সাংঘাতিক। যেন দম আটকে ধরে। তা ছাড়াও এই ধরনের অদ্ভুত রাত্রির আশ্রয়ে সে কিছুতেই সুস্থির হতে পারছে না। কল্পনায় ইতিমধ্যে সে তার রুমমেটের প্রায় পঁচিশ রকম চেহারা ভেবে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ বাস জার্নি করে এসেছে বলে আজকের রাতটা সে বিশ্রামই নেবে ঠিক করল। সাহেবরা স্লিপিং সুট পরে ঘুমোয়, ছেলেটির তা নেই, তার আছে পাজামা আর পাঞ্জাবি। যদি এই পোশাক দেখেই তার রুমমেট রেগে যায়? কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় তো নেই, সেই পোশাকেই শুয়ে পড়ল সে।

অবশ্য ঘুম আসবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। প্রতি মুহূর্তে সে তার রুমমেটের প্রতীক্ষা করছে।

এই বুঝি দরজায় খুট করে একটা শব্দ হয়। যত রাত বাড়ছে, তত আশঙ্কা বাড়ছে। কারণ বেশি রাতে যে ফিরবে, সে নিশ্চয়ই বদ্ধ মাতাল হয়েই ফিরবে। ওরে বাপ রে, সাহেব-মাতাল, তার একটা কথাও বুঝতে পারা যাবে না...।

ছেলেটি নিজের ওপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবল, দূর ছাই, কেন যে নাস্তিক হতে গিয়েছিলাম। নইলে এই সময়টায় তো ভগবানকেও ডাকা যেত উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য।

একটু বাদে-বাদেই সে উঠে টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বেলে ঘড়ি দেখছে। রাত সাড়ে দশটা...বারোটা...পৌনে একটা...দুটো...আড়াইটে...এখনও সে মক্কেলের ফেরার নাম নেই।

ফাঁসির আসামিও তো আগের রাত্রে ঘুমোয়, সেই রকম সে-ও ঘুমিয়ে পড়েছিল একসময়। কী একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যেতেই সে চোখ মেলে দেখল সকালের আলোয় ঘর ভরে গেছে। আর তার ঠিক মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। লোকটি অস্বাভাবিক লম্বা কিন্তু রোগা, চোখ দুটো একেবারে নীল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তার হাতে কী একটা অদ্ভুত জিনিস, মেশিনগান-টান কিছু হবে নিশ্চয়।

বোবায় ধরা মানুষের মতন সদ্য ঘুম ভাঙা ছেলেটি ভয়ার্ত আঁ আঁ শব্দ করে উঠে বসল। হাতজোড় করে বাংলায় ক্ষমা চাইতে গেল—।

সেই রোগা লম্বা লোকটি কিন্তু খুবই বিনীতভাবে এবং নরম, পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে বলল, আমি খুব দুঃখিত, তোমার ঘুম ভাঙালুম। আমি জানতুম না আমার ঘরে কেউ আছে, অবশ্য আগে আমায় জানানো হয়েছিল কেউ এসে থাকতে পারে, আমি খুবই দুঃখিত, তুমি আবার ঘুমোও, আমি কোনও শব্দ করব না...।

লোকটির হাতে মেশিনগান নয়, একটা বেহালার বাক্স!

ছেলেটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, না, না, আমি আর ঘুমোব না। আপনার যদি কোনও অসুবিধে হয়, আমি তা হলে বাইরে যেতে পারি।

নীল-চক্ষু লোকটি বলল, সে কি, বাইরে যাবে কেন? প্লিজ, তুমি আর একটু ঘুমোও, কিংবা যা খুশি করো, আমার কোনও অসুবিধে নেই। তুমি কি ইজিপ্টের লোক?

ছেলেটি বলল, না আমি ভারতীয়।

লোকটি বলল, দেখেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম, তুমি খুব প্রাচীন কোনও দেশের মানুষ, তোমার ঘুমন্ত মুখে এমন একটা শান্তির ভাব ছিল যা আমাদের নেই।

একটু বাদেই খুব আলাপ হয়ে গেল দুজনের। নীল চক্ষু লোকটি একটি নাইট ক্লাবে বেহালা বাজায়। খুবই নম্র স্বভাবের মানুষ। দিনের বেলা সে ঘুমোয়। সন্ধে থেকে সারারাত সে ঘরে থাকে না। সুতরাং বাঙালি ছেলেটি সারাদিন ঘুরে বেড়াতে পারবে, সন্ধের পর এই ঘরটি তার নিজস্ব হয়ে যাবে।

এরপর দিনচারেক ছিল ছেলেটি ওই শহরে। তার একটুও অসুবিধে হয়নি, কোনও জোচ্চোর-খুনে-বদমাইসের পাল্লায় পড়েনি। লরেন্স ফের্লিংগেটির সঙ্গে দেখাও হয়েছিল, খুব খাতির করেছিল। আর তার রুমমেটের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল যে একদিন বিনা পয়সায় নিয়ে গেল নাইট ক্লাবে। সেই কালো দৈত্যটির সঙ্গেও পরে দেখা হয়েছিল, অতিশয় সহৃদয় মানুষ...।

এবার সানফ্রান্সিসকো ঢোকার মুখে আমার মনে পড়ছিল সেই আগের বারের অভিজ্ঞতার কথা। প্রথম রাত্রির ভয়াবহ স্মৃতি। এখন ভাবতে অবশ্য মজা লাগছে, কিন্তু সেদিন যে বেদম ভয় পেয়েছিলুম, তাও তো ঠিক।

এবার সানফ্রান্সিসকোতে প্রবেশ করছি সম্পূর্ণ অন্যভাবে। মদনদার ঝকঝকে নতুন মার্সিডিজ বেঞ্জ গাড়িতে আমরা সবাই মিলে বাংলায় গান গাইতে-গাইতে। যেন আমরা এই শহরটা জয় করতে চলেছি।

॥ ২৪ ॥

এবার তাহলে সেই ঘটনাটা লিখি? যে-ঘটনাটার এক চুল এদিক-ওদিক হলেই আমি এতদিনে স্বর্গে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সঙ্গে বেলের পানা খেতুম কিংবা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিমপাতার রস খেতে-খেতে আধুনিক কবিতা বিষয়ে তর্ক করতুম কিংবা কার্ল মার্কসের সঙ্গে চা খেতে-খেতে চিন ও রাশিয়ার ঝগড়া বিষয়ে তাঁর মতামত জেনে নিতুম। কিংবা ওসব কিছুই না করে একালের উর্বশী মেরিলিন মনরোর সাহচর্য লাভে ধন্য হতুম।

কিন্তু একটুর জন্য আমি আমার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাবার সেই সুবর্ণ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

মদনদাদের সঙ্গে দিন দু-এক তো দারুণ হইচই করে কাটল সানফ্রান্সিসকো শহরে। যেমন সুন্দর শহর, তেমনই ঝকঝকে দিন আর নরম রাত্রি। এই শহরটির বৈশিষ্ট্য হল, যে-কোনও দিকে মিনিট পাঁচ-দশ গেলেই সমুদ্র চোখে পড়ে। এই শহরে এখনও আছে পুরোনো আমলের ট্রাম, আবার এমন অত্যাধুনিক বহুতল বাড়ি আছে যে দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। শহরের মাঝামাঝি রয়েছে বিরাট চিনে পাড়া, যেখানে গেলে মনে হয় মূল চিন ভূখণ্ডে পৌঁছে গেছি। রাস্তায় টাটকা চিনে শাক সবজি বিক্রি হচ্ছে, সিনেমা হলে চিনে ছবি, ব্যাঙ্কের নাম চিনে ভাষায় লেখা। এখানকার কোনও কোনও চিনে খুবই বড়লোক। একবার শুনেছিলুম, কোনও একজন চিনে ব্যাঙ্কার গোটা সানফ্রান্সিসকো শহরটাই কিনতে চেয়েছিল।

নানান দ্বীপের সঙ্গে সানফ্রান্সিসকো শহরটি জোড়া। এখানকার গোল্ডেন গেট ব্রিজ জগদ্বিখ্যাত। এমন নিখুঁত স্মার্ট চেহারার ব্রিজ দেখলে সত্যিই আনন্দ হয়। কোনও প্রয়োজন নেই, তবু এমনি এই ব্রিজে বারবার এপার-ওপার হতে ইচ্ছে করে। যে-দ্বীপটিতে বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় অধিষ্ঠিত, মূল শহরের সঙ্গে সেই দ্বীপটি একটি সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রিজ দিয়ে জোড়া। অবশ্য এক লাফে সমুদ্রলঙঘনের সময় হনুমান যেমন মাঝখানে একবার এক ডুবো পাহাড়ে একটু পা ছুঁয়েছিল, সেই রকম এই সাড়ে আট মাইল লম্বা ব্রিজটিও একবার এক জায়গায় কিছু পাথরের স্তূপে পশ্চাৎদেশ ঠেকিয়েছে।

একদিন সকালবেলা গিয়েছিলুম বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে। হার্ভার্ড বা ইয়েলের মতন তেমন কুলীন নয় বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়, তবু এর খ্যাতি অন্য কারণে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই নানান আন্দোলনের জন্ম হয়েছে, সিভিল রাইট্‌স, উইমেন্‌স লিব্‌, ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবাদ, আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বিরোধী মিছিল ইত্যাদি। অনেক হাঙ্গামা হয়েছে এখানে, পুলিশি আক্রমণে অনেক রক্ত ঝরেছে, তবু এখানকার ছাত্রছাত্রীরা অসম সাহস দেখিয়েছে।

আমরা যেদিন গেলুম, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি। সব দিক অসম্ভব শান্ত। এখানে-সেখানে ঘাসের ওপর অলসভাবে শুয়ে আছে এক জোড়া করে ছেলেমেয়ে, অতিরিক্ত পড়ুয়া কেউ-কেউ সাইকেলের পেছনে এক গাদা বইপত্র চাপিয়ে চলেছে লাইব্রেরিতে। আমেরিকার অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসই এত বড় যে ভেতরে বাস চলে, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে যাওয়ার জন্য। বার্কলের ক্যাম্পাস যেন আরও বড়। কতটা যে বড় তা এক সঙ্গে দেখবার জন্য একটা ব্যবস্থা আছে। মাঝামাঝি একটা জায়গায় আমাদের মনুমেন্টের মতন একটা স্তম্ভ আছে, তার ভেতরে লিফ্‌ট চলে, আট আনার টিকিট কাটলেই ওপরে ওঠা যায়।

ওপরে উঠে শুধু যে চোখ জুড়িয়ে গেল তাই নয়, একটা দীর্ঘশ্বাসও পড়ল। আমাদের দেশে এমন সুন্দর ক্যাম্পাস কোনওদিন হবে না? শান্তিনিকেতনে অনেক গাছপালা আছে, কিন্তু বার্কলে ক্যাম্পাসের বড়-বড় বৃক্ষরাজি ও ফুলের সৌন্দর্য আরও অনেক বেশি। তা ছাড়া, পেছনে রয়েছে পাহাড়ের পটভূমি আর তিন দিকে সমুদ্র।

এই প্রসঙ্গে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা একটু বলি। বার্কলে শুধু চোখে দেখেছি কিন্তু সেখানকার কারুর সঙ্গে আলাপের সুযোগ সেদিন হয়নি। কিন্তু শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে একটা চমকপ্রদ তথ্য জানি। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড-ইয়েলের মতন অভিজাত তো নয়ই, পড়াশুনোর কৃতিত্বেও বার্কলের চেয়েও কিছু নীচে। তবু সেই শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসেই বেয়াল্লিশজন নোবেল লরিয়েট অধ্যাপক থাকেন। তাহলে হার্ভার্ড-ইয়েল-বার্কেলেতে ওনারা কতজন আছেন কে জানে!

যাই হোক, আমাদের সানফ্রান্সিসকো সফরের পালা এবার ফুরিয়ে এল। সব সুখের দিনই তো একদিন-না-একদিন শেষ হয়। এবার মদনদারা ফিরে যাবেন, আমাকে একলা যেতে হবে অন্যদিকে।

ওঁরা সবাই মিলে আমায় তুলে দিতে এলেন গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনে। এরা বাস ডিপো বলে না, স্টেশন বলে, ঠিকই বলে। বড়-বড় শহরের বাস স্টেশন অনেক রেল স্টেশনের চেয়ে বড়। যাত্রীদের জন্য ওয়েটিং প্লাটফর্মে এক-একটি চেয়ারের হাতলের সঙ্গে ছোট-ছোট টিভি সেট লাগানো আছে, যাতে তাদের সময় কাটাতে অসুবিধে না হয়।

আমার বাসটি এক্ষুনি ছাড়বে। আমি "একেলা এসেছি এই ভবে, একেলাই চলে যেতে হবে" এই গান গাইতে-গাইতে উঠে পড়লুম। জানলার কাছে গিয়ে ওঁদের দিকে একটু হাত দেখাতেই বাস চলতে শুরু করল। তারপরই ঢুকে পড়ল অন্ধকার সুড়ঙ্গে। ব্যাস, আবার শুরু হল আমার একাকী ভ্রাম্যমান জীবন।

গ্রে-হাউন্ড বাসের চেহারা বাইরে থেকে এমন শক্তপোক্ত যে কুকুরের বদলে গন্ডারের সঙ্গেই এর তুলনা দেওয়া উচিত। ভেতরটা অবশ্য শীততাপ এবং শব্দ নিয়ন্ত্রিত, একশো কুড়ি মিটার বেগে বাস চললেও ভেতরে বসে বিশেষ কিছু টের পাওয়ার উপায় নেই। পেছনে বাথরুম আছে। আপাতত প্রায় বেয়াল্লিশ ঘণ্টা আমাকে এই বাসে থাকতে হবে, সুতরাং আমি ঘাড় ঘুরিয়ে আমার সহযাত্রীদের দেখে নিলুম। জনাআষ্টেক চিনে, জনাপনেরো কালো মানুষ, জনাকুড়িক ফরসা। খয়েরি বলতে আমি একাই। আমার পাশে বসেছে...এখানে আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করছিল যে আমার পাশে বসেছে একটি ফুটফুটে সুন্দরী তরুণী মেয়ে, অধিকাংশ ভ্রমণ কাহিনিতেই যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু আমার যা ভাগ্য! আসলে আমার পাশে বসেছে এক বুড়ি মেমসাহেব, যার মাথার উল্‌কো-ঝুল্‌কো চুল দেখলে মনে হয় নির্ঘাত উকুন আছে।

বুড়ি মেমদের সঙ্গে আলাপ করার জন্য কোনও চেষ্টা করতে হয় না, এরা নিজেরাই আলাপের জন্য মুখিয়ে থাকে। বুড়োবুড়িরা এদেশে অতি নিঃসঙ্গ, তাদের কথা শোনবার সময় কারুর নেই, তরুণ সমাজ তাদের পাত্তাই দেয় না। সেইজন্য এরাও নতুন লোক দেখলেই কথার ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয়।

মুশকিল হচ্ছে এই যে, এরাও অনেকেই বার্ধক্যটাকে প্রসন্নভাবে মেনে নিতে পারে না। প্রাণপণে বয়েসটা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে যায় শেষ দিন পর্যন্ত। আমার পাশে যে বুড়ি মেমসাহেব বসে আছেন, তিনি নিশ্চয়ই আমার দিদিমার বয়েসি, কিন্তু ঠোঁটে ও গালে উগ্র রং মাখা, পোশাকের রং খুনখারাবি, একটা বিরাট চকোলেট-বার নিয়ে কচরমচর করে খাচ্ছেন। বেশ একটা লাল পেড়ে সাদা খোলোর শাড়ি পরিয়ে, চুল টানটান করে আঁচড়ে দিলে এবং মুখে এক খিলি পান গুঁজে দিলে বরং বেশ মানিয়ে যেত।

বুড়ি মেমটির সঙ্গে যেন আমার কতকালের চেনা এই ভঙ্গিতে সে প্রথমেই আমাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কি রিনোতে নামবে?

দু-দিকে ঘাড় নেড়ে আমি বললুম, না।

তিনি বেশ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, নামবে না? পঁয়তাল্লিশ মিনিট থামবে?

এবার মুখে কোনও উত্তর না দিয়ে আমি 'সে দেখা যাবে এখন' এই রকম একটা ভাব করে কাঁধ ঝাঁকালুম। তারপরই কথাবার্তা থামাবার জন্য খুলে ফেললুম একটা বই।

রিনো শহরটির বিষয়ে আমি জানি। লাস ভেগাস যেমন বিশ্ববিখ্যাত জুয়া খেলার জায়গা, তার কাছাকাছি এই রিনো শহরটিও জুয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। লাস ভেগাসে আমাদের বাস থামবে না, কিন্তু রিনোতে চা খাবার স্টপ আছে। সব রেস্তোরাঁর মধ্যেই জুয়া খেলার যন্ত্র বসানো থাকে, অনেক যাত্রী ওইটুকু সময়ের মধ্যেই ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টায় লেগে যায়।

এ কথা ঠিক, আমেরিকার সমস্ত জুয়ার আসরে বুড়িদের সংখ্যারই প্রাধান্য। এটাও তাদের নিঃসঙ্গতা কাটাবার একটা উপায়।

গ্রে-হাউন্ড বাসের ড্রাইভারদের ভাবভঙ্গি উচ্চ পদস্থ অফিসারের মতন। খুব সম্ভবত সেই রকমই মাইনে পায়। এরা স্বভাব-গম্ভীর ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে না, কিন্তু মাঝে-মাঝে বক্তৃতা দেয়। সেজন্য এদের কাছে মাইক্রোফোন থাকে। বক্তৃতায় এরা বাস যাত্রার নিয়মকানুন স্মরণ করিয়ে দেয় এবং মেজাজ প্রসন্ন থাকলে কখনও-কখনও পথের দুপাশের বিশেষ দ্রষ্টব্য জিনিসগুলো সম্পর্কেও দু-চার কথা বলে।

অনেকের ধারণা, বাস থাকলেই একজন কন্ডাকটর থাকবে, সেইজন্যই জানিয়ে দিতে চাই যে গ্রে-হাউন্ড বাসে ড্রাইভারই একমাত্র কর্মচারী।

আমাদের বাসটা ছাড়বার একটু বাদে ড্রাইভার মহোদয় যে বক্তৃতাটি দিলেন, তা শুনে তো আমার মাথায় হাত। নতুন নিয়মে বাসে ধূমপায়ী এবং অধূমপায়ী এলাকা ভাগ করা হয়েছে। একদম পেছন দিকের তিনটি রো-তে যারা বসেছে, শুধু তারাই সিগারেট টানার অধিকারী, বাকি সিটের যাত্রীদের ধূমপান নিষিদ্ধ।

আমি তো আগে এই কথাটা চিন্তাই করিনি। তাড়াতাড়ি উঠে সামনে যে-জায়গা পেয়েছি, তাতেই বসে পড়েছি। জায়গাটা অবশ্য ভালোই, সামনের দিকে, ড্রাইভারের কাছাকাছি এবং জানলার পাশে। কিন্তু বিয়াল্লিশ ঘণ্টা সিগারেট না খেয়ে থাকতে হবে? অবশ্য তিন-চার ঘণ্টা অন্তর-অন্তর বাস এক-একটি স্টেশনে থামবে, সেখানে নেমে ফুকফুক করে দু-একটা সিগারেট টেনে নেওয়া যায়, কিন্তু তাতে কি আরাম হয়! সিগারেট তো আর শারীরিক ক্ষুধাতৃষ্ণা মেটাবার কোনও খাদ্য-পানীয় নয়, সিগারেট হল মনকে আকাশে ভাসাবার জন্য একটা বায়ু যান। মন যখন চাইবে তখন না পেলে আর পকেটে সিগারেট রাখার কী মানে হয়।

বেশ মনমরা হয়ে গেলুম।

আমার চোখ বইয়ের প্রতি নিবদ্ধ দেখেও বুড়ি মেম একটুবাদে জিগ্যেস করলেন, তুমি মেক্সিকো থেকে এসেছ?

—না।

—সাউথ আমেরিকা?

—না।

—আরব দেশ? ইরান?

—না।

—তুমি কোথা থেকে এসেছ?

—সান ফ্রান্সিসকো থেকে।

—ও!

আমি ইচ্ছে করেই ভারতবর্ষের নাম করলুম না, তা হলেই অনেক কথা বলতে হবে। যাকে-তাকে ভারতবর্ষ বিষয়ে জ্ঞান দেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। বুড়ি মেমসাহেবের মুখ থেকে আমি পরিষ্কার জিনের গন্ধ পাচ্ছি। বাস ছাড়বার দেড় ঘণ্টার মধ্যেই উনি দু-বার বাথরুম ঘুরে এসেছেন। খুব সম্ভবত

বাথরুমে গিয়ে উনি জিনের বোতলে একটা করে চুমুক দিয়ে আসছেন। আমি যে বাথরুমে গিয়ে সিগারেট টেনে আসব তার উপায় নেই, কারণ ড্রাইভার সাহেব আগেই নিষেধ করে দিয়েছেন, ওটা নাকি বিপজ্জনক।

রিনো শহরের কাছাকাছি আসতেই বুড়ি মেমের কী উৎসাহ। ঝলমলে মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এসে গেছে। এসে গেছে। তুমি আমি এক সঙ্গে খেলব। শোনো, এক মেশিনে বেশিক্ষণ খেলতে নেই, কমপিউটার প্রোগ্রামিং করা থাকে, সেই জন্য নানান মেশিনে চান্স নিতে হয়।

রিনোয় আমি নামলাম ঠিকই, কিন্তু চট করে চলে গেলুম উলটোদিকের অন্ধকারে। তারপর একটুবাদে চুপিচুপি একটা কফি কাউন্টারে বসলুম। বুড়ি মেম সাহেবের পাল্লায় পড়ে জুয়া খেলতে হলেই গেছি আর কি। পকেট যে গড়ের মাঠ তা তো ও জানে না।

ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ফিরে এলুম বাসে। বুড়ি মেমসাহেব এখনও ফেরেননি। ড্রাইভার যাত্রী সংখ্যা গুণে দেখলেন একজন কম। এইরকম অবস্থায় রেস্তোরাঁয় মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে দেওয়া হয় যে অমুক নম্বর বাস এক্ষুনি ছাড়বে, যাত্রীদের শেষ আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এর পরেও বুড়ি মেমসাহেব এলেন না। বাস ছেড়ে দিল। তাহলে কি ওঁর এখানেই নেমে যাওয়ার কথা ছিল? সেটা তো বুঝিনি, একটু পরেই আমার নজরে পড়ল, ওপরের র‍্যাকে একটা নীল ব্যাগ রয়েছে, ওটা তো বুড়ি মেমের। তাহলে? আমি উত্তেজিতভাবে উঠে গিয়ে ড্রাইভারকে কথাটা বললুম। তাঁকে বোঝাবার জন্য আমাকে ব্যাপারটা দু-তিনবার বলতে হল। ড্রাইভার ঘাড় ঘুরিয়ে ব্যাগটা একবার দেখে নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আমায় বলল, ফরগেট ইট!

আমার কেমন যেন একটা অপরাধ বোধ হল। বুড়ি মেম কি নীল ব্যাগটা ভুল করে ফেলে গেছে? অথবা, এখানে তার নামবার কথা ছিল না, জুয়ায় মেতে গিয়ে ও ওখানেই থেকে গেল। আমি সঙ্গে থাকলে হয়তো ওকে ফিরিয়ে আনতে পারতুম।

এরপর ঘুমিয়ে পড়লুম। মাঝরাত্রে একবার চোখ মেলে দেখলুম এর মধ্যে কোনও এক স্টেশন থেকে একজন মাঝবয়েসি সাহেব উঠে আমার পাশের সিটে বসেছে। কিছুই শেষ পর্যন্ত খালি থাকে না, প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না।

তারপর খানিকটা ঘুম আর খানিকটা জাগরণে কাটতে লাগল সময়। এর মধ্যে পাহাড়, গভীর অরণ্য, মরুভূমি পেরিয়ে ছুটতে লাগল বাস। মাঝে একবার ড্রাইভার বদল হয়ে গেল।

সকাল সওয়া ন'টায় বাস থামল সল্টলেক সিটিতে। সেখানে পেছনের সিট থেকে নেমে গেল একজন, অমনি আমি পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে বসে পড়লুম সেই সিটে। যাক নিশ্চিন্ত আশ্রয় পাওয়া গেছে। নিজের জিনিসপত্র সেখানে রেখে নামলুম ব্রেকফাস্ট খেতে।

বাস ছাড়ল দশটায়। পাঠক বিশ্বাস করুন, এবার কিন্তু সত্যিই আমার পাশের সিটে এক তরুণী নারী বসেছিল। সে অবশ্য আমার সঙ্গে কথা বলার কোনও চেষ্টাই না করে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। আমি আরাম করে একটা সিগারেট ধরালুম। পেছনের দিকের সিটে একটু ঝাঁকুনি লাগে, তা হোক, চলন্ত বাসে যেতে-যেতে সিগারেট খাওয়ার আনন্দই আলাদা।

এর পর দশ মিনিটও কাটেনি, আমার সিগারেটটা সবে মাত্র শেষ হয়েছে, এমন সময় কী যেন হল। আমি সিট থেকে লাফিয়ে উঠে বাসের ছাদে ধাক্কা খেয়ে তারপর লুটিয়ে পড়লুম মাটিতে। প্রথমে মনে হল মরে গেছি। কিন্তু শরীরে কোনও ব্যথা নেই। তারপরই শুনতে পেলুম, তিন-চারজন একসঙ্গে চিৎকার করছে। হি ইজ ডেড্। হি ইজ ডেড্।

কে মারা গেছে? আমি? কোনও রকমে উঠে দাঁড়ালুম। বাসের সমস্ত লোক চিৎকার করছে, কয়েকজন কাঁদছে। অন্যদের কথায় বুঝতে পারলুম, মারা গেছে ড্রাইভার। উঁকি দিয়ে দেখলুম, ড্রাইভারের শরীর একেবারে ছিন্নভিন্ন, বাসের সামনের দিকটা তুবড়ে ঢুকে এসেছে ভেতরে।

কিন্তু ড্রাইভারহীন বাস তখনও চলছে।

হয়তো কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার, কিন্তু মনে হচ্ছিল অনন্তকাল। সারা বাস জুড়ে ভয়ার্ত চিৎকার আরও বেড়ে গেল, কারণ, পরিষ্কার বোঝা গেল, বাসটা রাস্তা ছেড়ে পাশের খাদের দিকে নামছে। কত নীচে আছড়ে পড়বে কিংবা কোথায় ধাক্কা খাবে জানি না। সিনেমায় এইরকম সময় দেখা যায় দপ করে একটা শব্দ হয়ে পেট্রোল ট্যাঙ্ক ফেটে যায়, তারপরে সমস্ত বাসটায় আগুন জ্বলে। আমার ঠিক ওই সিনেমার দৃশ্যের কথাই মনে হচ্ছিল, প্রতীক্ষা করছিলুম কখন আগুন জ্বলবে।

কিছুতে ধাক্কা লেগে বাসটা উলটে গেল একদিকে, কিন্তু আগুন জ্বলল না। সেই ধাক্কার সময় আমি আবার মাটিতে গড়াগড়ি খেলুম। তখনও মনে হল, মরিনি? বেঁচে আছি? হ্যাঁ, বেঁচেই তো আছি। বাসটা যেদিকে উলটে গেল, আমি ছিলাম তার ওপরের দিকে। কয়েকজনের গায়ের ওপর পড়েছিলুম, আমার ওপর সেই মেয়েটি। অত্যন্ত সাহসিনীর মতন সে আগাগোড়া চুপ করে ছিল। কোনওরকমে এটা সেটা ধরে উঠে দাঁড়ালুম দুজনে। এতক্ষণে অনেকে দমাদ্দম লাথি মারছে বাসের জানলায়। যে-কোনও মুহূর্তে আগুন জ্বলবে। একটা জানলা ভেঙে যেতেই আমরা কয়েকজন লাফিয়ে পড়লুম সেখান থেকে। অত উঁচু থেকে লাফিয়ে পড়ায় আমার একটা গোড়ালি মচকে গেল, সেই আমার প্রথম ব্যথা। তরুণী মেয়েটিকে আমরা কয়েকজন সাহায্য করলুম নামবার জন্য, তারপর সবাই আগুনের ভয়ে দৌড়ে গিয়ে উঠলুম উলটো দিকের রাস্তায়।

আগুন অবশ্য শেষ পর্যন্ত জ্বলেনি। আমাদের বাসটার সঙ্গে একটা ট্রাকের ধাক্কা লেগেছিল, দুটোই ছিল দুর্দান্ত স্পিডে, সামান্য ধাক্কাই যথেষ্ট। দুই গাড়ির ড্রাইভারই মারা গেছে সঙ্গে-সঙ্গে। ট্রাকটাও উলটে পড়ে আছে একটু দূরে।

দু-তিন মিনিটের মধ্যে যেন মন্ত্রবলে গোটাদশেক পুলিশের গাড়ি-দমকল-অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। আমাদের বাস থেকে যাত্রীদের উদ্ধার কার্য চলছে, আমি দূরে বসে অলস চোখে দেখছি। থ্যাঁতলানো-চ্যাপটানো, হাত-পা ভাঙা এক-একটা শরীর বেরুচ্ছে, বাসের বডি কেটে-কেটে বার করা হচ্ছে। সামনের দিকটায় যাত্রীরাই নিহত ও আহত হয়েছে বেশি।

হঠাৎ আমার একটা সাংঘাতিক উপলব্ধি হল। খানিকটা আগেই আমিও তো সামনের দিকে বসে ছিলাম। সিগারেট খাওয়ার টানে পেছনে চলে গিয়েছি। যদি না যেতাম! তাহলে এতক্ষণে আমিও ওই রকম থ্যাঁতলানো একটা শরীর, হাত কিংবা পা নেই...। ভেবেই আমার শিহরন হল।

কে বলে সিগারেটের উপকারিতা নেই? জয় সিগারেট।

তক্ষুনি সিগারেট ধরালুম একটা। কিন্তু আমার হাত কাঁপছে। সিগারেটে কোনও স্বাদ পাচ্ছি না। কপাল থেকে টপটপ করে রক্ত পড়ছে, কপালে যে কেটে গেছে তা খেয়ালই করিনি এতক্ষণ।

আমি মরে যেতে পারতুম, আমি মরে যেতে পারতুম। দশ-বারো মিনিট আগে সামান্য একটা সিদ্ধান্তের জন্য...। যদি পেছনের সিটটা খালি না হত, তাহলে এতক্ষণে এই বিদেশ-বিভুঁইয়ে আমি একটা লাশ হয়ে যেতাম?

কে যেন বলেছিল মৃত্যুর উপলব্ধি খুব মহান? আমার তো সেরকম হল না? মৃত্যুর অত কাছাকাছি যাওয়ার পর আমি বেশ কিছুক্ষণ যেন বোধহীন, জড়ের মতন হয়ে রইলাম।

॥ ২৫ ॥

দুর্ঘটনা তো সব দেশেই হয়। তাদের চরিত্রও মোটামুটি একই রকম। দুর্ঘটনার পরবর্তী অংশটির অভিজ্ঞতাই আলাদা।

আমাদের বাসটি দুর্ঘটনা ঘটাল সকাল দশটার সময়, প্রকাশ্য দিবালোকে এবং অপেক্ষাকৃত

নির্জন রাস্তায়। সারারাত আমরা পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে এসেছি, তখন কিছুই হয়নি, অথচ বিপদ ঘটল কিনা নিরাপদ সমতলে। গ্রে-হাউন্ড বাস এমনিতেই খুব নির্ভরযোগ্য, ড্রাইভাররা খুবই অভিজ্ঞ এবং পরে শুনেছিলাম, আমাদের বাসের ড্রাইভারটি টানা পঁচিশ বছর নির্ভুল বাস চালাবার জন্য অতি সম্প্রতি কোম্পানির কাছ থেকে মেডেল পেয়েছিল। কিন্তু সকাল দশটায় গ্রে-হাউন্ড বাসটি একশো কুড়ি কিলোমিটার বেগে যাওয়ার সময় অন্য একটি ট্রাক তার নাকের কাছে ছোট্ট একটি ধাক্কা দিল, সঙ্গে-সঙ্গে দুই ড্রাইভারের শরীরই চিঁড়েচ্যাপটা। একে নিয়তি ছাড়া আর কীই-বা বলা যায়।

আমি প্রাণে বেঁচে যাওয়ার পর উলটো দিকের রাস্তায় ঘাসের ওপর বসে রইলুম। বারবার শরীরের নানা জায়গায় হাত বুলিয়ে দেখছি। চোখ দুটো ঠিক আছে, নাক ঠিক আছে, দুটো হাত, দুটো পা অক্ষতই আছে, মাথার খুলিও উড়ে যায়নি। বাঁ-ভুরুর ওপরে খানিকটা গর্ত হয়েছে। ডান পায়ের গোড়ালি মচকে গেছে, শুধু এইটুকুই যা বোঝা যাচ্ছে।

আমাদের বাসটির বডি কেটে-কেটে নামানো হচ্ছে অন্য যাত্রীদের। কজন নিহত, কজন আহত এখনই বোঝা যাচ্ছে না। অনেকেরই হাত-পা ভাঙা। পুলিশ ও অ্যাম্বুলেন্স এত তাড়াতাড়ি চলে এল কী করে, সেটাই বিস্ময়ের। রাস্তা দিয়ে পুলিশ পেট্রোল অনবরত ঘোরে, তা ছাড়া রাস্তার অন্য যেসব গাড়ি এই দুর্ঘটনা দেখেছে, তারা ওয়্যারলেসে খবর দিয়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই, এক মিনিটও সময় নষ্ট হয়নি।

আমাদের দেশে এরকম একটা বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটলেই তারপর যেন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে হাজার-হাজার মানুষ, তারা ভিড় করে দাঁড়ায় এবং প্রবল চ্যাঁচামেচির মধ্যে তৎক্ষণাৎ দুর্ঘটনা বিষয়ে পাঁচ রকম গল্প তৈরি হয়ে যায়। এখানে দৃশ্যটি একেবারে অন্যরকম। এ-দেশের রাস্তায় মানুষ থাকে না, কয়েকটি যাত্রীগাড়ি থেমেছে বটে, কিন্তু তাদের কোনও সাহায্যের দরকার আছে কি না, এইটুকু জেনে নিয়েই চলে যাচ্ছে। এদেশের লোকেরা অকারণে কণ্ঠনালির ব্যবহার করে না। একটুও গোলমাল নেই। আমাদের মতন যেসব যাত্রীরা অনাহত হয়ে বসে আছি এক জায়গায়, সেখানেও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা, শুধু একটি বাচ্চা ছেলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে। শিশুটির বয়েস পাঁচ-ছ'বছর, ফুটফুটে চেহারা, ওর সোনালি চুলে রক্ত মাখা। ওর মা একবার আমাদের জানিয়ে দিয়েছে যে ওই রক্ত ওই শিশুটির নয়, অন্য একজন আহত লোকের রক্ত ওর চুলে লেগে গেছে।

অজস্র মেরিপোসা আর বুনো লিলি ফুটে আছে রাস্তার ধারে। সেখানে পা ছড়িয়ে বসে আমি উদ্ধার কার্য দেখছি। শরীর ও মন অবশ হয়ে আছে, দৈবাৎ প্রাণ ফিরে পাওয়ার তীব্র আনন্দও বোধ করছি না।

আমরা যেখানে বসে আছি, সেই রাজ্যটির নাম ওয়াইওমিং। এখানে জনবসতি খুব বেশি নেই। মাইলপনেরো দূরে একটা ছোট শহর আছে, একটু পরেই সেখানকার নাগরিকরা এলেন আমাদের আতিথ্য দিতে। সঙ্গে দু-তিনজন ডাক্তারও এসেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করতে লাগলেন আমাদের। গুরুতর আহতদের তো বার করার সঙ্গে-সঙ্গেই অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে হাসপাতালে। কিন্তু আমাদের শরীরে সেরকম কিছু আঘাত না লাগলেও মানসিক আঘাত লেগেছে কি না সেটা পরীক্ষা করে দেখতে চান।

একজন বৃদ্ধ ডাক্তার আমার সামনে এসে বললেন, জীবনে তো এরকম অনেক কিছু হয়ই। সুতরাং এখন আর দুশ্চিন্তা করে লাভ নেই।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালুম।

ডাক্তারটি আবার বললেন, মানুষের জীবন অনেক কিছুই সহ্য করতে পারে, তাই না?

আমি আবার ঘাড় নাড়লুম।

ডাক্তারটি এবার বেশ ধমক দিয়ে বলল, সে সামথিং!

ওঃ হো, ইনি বুঝি ভাবছেন আমি আকস্মিক শক-এ বোবা হয়ে গেছি? সুতরাং জোর করে

ঠোঁটে খানিকটা হাসি টেনে এনে বললুম, আই অ্যাম অল রাইট।

আমার পাশের যে তরুণী মেয়েটি আগাগোড়া চুপ করে ছিল, ডাক্তারবাবুটি তাকেও জেরা করলেন ওইভাবে। সে মেয়েটিও শুধু ঘাড় নাড়ছিল। ডাক্তারটি একবার তাকে জিগ্যেস করলেন, তুমি কথা বলতে পারো না? মেয়েটি জানাল, অকারণে কথা বলি না।

বিভিন্ন গাড়িতে তোলা হল আমাদের। মাইলপনেরো দূরের শহরটিতে এসে একটা বড় বাড়ির সামনে থামল গাড়িগুলো। সে বাড়ির একতলায় একটা হলঘর, মনে হল থিয়েটার হল, এর মধ্যেই অনেকগুলো ক্যাম্প খাট পেতে ফেলা হয়েছে। আমাদের বলা হল সেখানে শুয়ে পড়তে। শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে-সঙ্গে এল চা আর ডো-নাট। শুধু চা খেয়ে ডো-নাটগুলো রেখে দিলুম। তারপরেই এল কোল্ড ড্রিংক্স, পেপ্সি আর কোকা কোলার টিন। চায়ের পরেই এটা খেতে হবে? কিন্তু ওরা বলছে বলে খেয়ে নিচ্ছি। মনটা এমনই অবসন্ন যে যে-যা বলছে শুনছি।

তবু খানিকটা বাদে মনে হল, শুধু-শুধু এই দিনের বেলা রুগির মতন খাটে শুয়ে থাকব কেন? অনেক মহিলা আমাদের সেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করছেন, আমাদের কার কী দরকার জিগ্যেস করছেন। এর মধ্যে একজন আমার কপালের ক্ষতটা সিল করে দিয়েছেন। আমি খাট থেকে উঠে বাইরে চলে এলুম। এখন আমাদের আবার পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেই তো হয়।

শুনলুম, তার উপায় নেই। টেলিভিশনের লোক, রেডিয়োর লোক, বিমা কোম্পানির লোক, গ্রে-হাউন্ড কোম্পানির লোক এবং পুলিশের কাছে আলাদা-আলাদা বিবৃতি দিতে হবে। একসঙ্গে সবার কাছে একেবারে বলে দিলে চলবে না, কেউ কোনও কিছু গোপন করছে কি না, কিংবা কেউ দুর্ঘটনার সঠিক কারণ সম্পর্কে কোনও আলোকপাত করতে পারে কি না তা জানবার জন্য ওরা নিজেরা গোপনে জেরা করবে। সব মিলিয়ে অনেক সময়ের ব্যাপার।

এরকম দুর্ঘটনা থেকে এদেশে অনেকে প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারে। যারা আহত ও ক্ষতিগ্রস্ত, তারা তো ক্ষতিপূরণ পাবেই। নিহতদের নিকট আত্মীয়রা যেমন খুশি টাকা দাবি করবে। যাদের কোনও বাইরের আঘাত লাগেনি, তারাও মানসিক আঘাত লেগেছে কিংবা গুরুতর কোনও কাজ নষ্ট হয়ে গেছে, এই দাবিতে এক লাখ দু-লাখ টাকা পেতে পারে। সেজন্য অবশ্য মামলা করতে হবে। পশ্চিমবাংলায় দ'খনোদের খুব মামলা করার ব্যাপারে সুনাম আছে, সে হিসেবে আমেরিকানরা প্রায় সবাই খুব দ'খনো। কথায়-কথায় মামলা করে। 'আই উইল স্যু ইউ' এটা একটা কথার লব্‌জ। এমনকি বাবাও যদি ছেলেকে বা মেয়েকে খুব বকাবকি করে, তখন ছেলে-মেয়ে বলতে পারে, ড্যাডি, ইউ আর হর্টিং মাই ফিলিং! সেই অভিযোগেও মামলা হয় এবং প্রমাণিত হলে বাবাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

কিন্তু মামলা-মোকদ্দমা করে বড়লোক হওয়ার সাধ আমার একটুও নেই, আমি এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

আর একটি হল ঘরে জেরা চলছে। খুব সাজগোজ করা মহিলাদের ভিড়ও বাড়ছে। এক সময় কয়েকজন মহিলা একদিকের একটা টেবলে বিরাট এক ঝুড়ি আপেল এনে রাখলেন। আর কয়েকজন মহিলা আর একটা টেবলে রাখলেন এক ঝুড়ি আইসক্রিমের কাপ। তারপর দুদলই ডাকাডাকি করতে লাগলেন আমাদের।

এক সঙ্গে আপেল আর আইসক্রিম খাব? দুদলের পেড়াপিড়িতে নিতেই হল।

আর একটু পরে এসে গেল মিষ্টি বিস্কুট (এ দেশের ভাষার যার নাম কুকি) এবং ততোধিক মিষ্টি, তলতলে পিঠে (এ দেশে যার নাম পাই)। এ কী রে বাবা, এত সব খেতে হবে নাকি? একটু পরেই জানতে পারলুম যে এই ছোট শহরটির বিভিন্ন মহিলাদের ক্লাবের মধ্যে অতিথি পরায়ণতার একটা প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। দলে-দলে মহিলারা রুজ-লিপস্টিক মেখে, তাঁদের শ্রেষ্ঠ পোশাকটি পরে সাজো-সাজো রবে ছুটে আসছেন দুর্গতদের সেবা করবার জন্য। রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব,

অল মাদারস ক্লাব, সিস্টারস অব চ্যারিটি—এঁরাও নাকি এসে পড়বেন খানিকটা পরেই। অনেকদিন এখানে নাকি এরকম বড় গোছের দুর্ঘটনা ঘটেনি, অনেকদিন এঁরা পরোপকার করবার কোনও সুযোগ না পেয়ে উপোসি ছারপোকা হয়ে আছেন, আজ এমন সুবর্ণসুযোগ কেউ ছাড়তে চান না।

একদিকে পুলিশ-ইনসিওয়েন্সের কাছে জেরা চলছে, অন্য দিকে আমরা অনবরত খেয়ে চলেছি। অত খাবার অবশ্য আমার পক্ষে খাওয়া সম্ভব নয়। মহিলারা হাতে একটা কিছু গুঁজে দিচ্ছেন আর আমি বাইরে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপাস করে ফেলে দিচ্ছি। এইভাবেই, দুর্ঘটনার বিভীষিকা মন থেকে মুছে গিয়ে সব কিছুই বেশ হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। আমাদের উপকার করার জন্য সুন্দরী-সুন্দরী মহিলাদের চোখে মুখে কী দারুণ উৎকণ্ঠা। পাঁচ মিনিট অন্তর-অন্তর একজন করে এসে জিগ্যেস করে যাচ্ছেন, তোমার কিছু লাগবে? তুমি কিছু অসুবিধে বোধ করছ? আমার কিছুই চাই না শুনে তাঁরা দারুণ নিরাশ হয়ে চলে যাচ্ছেন।

আমার সহযাত্রীদের মধ্যে দুজন ডাকাতের মতন চেহারার যুবক এক সময় আমার পাশে এসে বসল। এরা খুব সিগারেট খোর, সেইজন্যই এরাও আহত হয়নি। মাথার চুল উস্কোখুস্কো, লালচে চোখ, লম্বা গোঁফ দুজনেরই। খুব গম্ভীরভাবে এরা আমার সঙ্গে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলতে শুরু করল।

এরকম অভিজ্ঞতা আমার আগেও হয়েছে। এই যুবক দুটি নিশ্চয়ই মেক্সিক্যান। এরা ভারতীয়দের দেখলেই নিজেদের স্বজাতি বলে ভুল করে। আমি দু-হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম যে আমি স্প্যানিশ ভাষা জানি না। ওরা মানতে চায় না। ওদের মুখে ভয়ের ছাপ। এমনও হতে পারে, ওরা বে-আইনিভাবে মেক্সিকো থেকে স্টেট্সে ঢুকে পড়েছে। আর ধরা পড়ার সম্ভাবনাও ছিল না, কিন্তু এই দুর্ঘটনার পর পুলিশ জেরা করার সময় ওদের কাছে কাগজপত্র দেখতে চাইবে। আমাকেও এর মধ্যে একবার পাসপোর্ট দেখাতে হয়েছে।

ওরা দুজনে একসঙ্গে অনেক কথা বলে যেতে লাগল আমাকে। আমি এক বর্ণ বুঝলুম না, তবু ওরা বলবেই। মহা মুশকিলে পড়া গেল। ওদের দুটি সিগারেট দিয়ে একটুক্ষণের জন্য নিরস্ত করে আমি উঠে গিয়ে পরোপকারী মহিলাদের কয়েকজনকে ইংরিজিতে বললুম, আপনারা কেউ স্প্যানিশ ভাষা জানেন? তাহলে ওই লোক দুটির খুব উপকার হয়। ওদের কথা কেউ বুঝতে পারছে না।

ওই মহিলারা কেউ স্প্যানিশ জানেন না বটে, তবে ওঁদের একজনের স্বামীর বন্ধু কিছুদিন মেক্সিকোতে ছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামীর বন্ধুকে ফোন করলেন। এবং সে ভদ্রলোক আসতে রাজি হওয়ায় ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন তাকে আনতে। পরোপকারের একটা সুযোগ পেয়ে সে মহিলার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, অন্যদের দিকে তিনি একটা গর্বিত দৃষ্টি দিয়ে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে প্রাশান্ জেনারেলের মতন চেহারার একজন মহিলা এসে ঘোষণা করলেন যে অতিথিদের দুপুরের আহারের ভার তিনি নিয়েছেন। অতিথিরা যেন দয়া করে তাঁর পিছু-পিছু আসেন।

এতক্ষণ ধরে এত রকমের খাওয়ার পর এর মধ্যেই আবার দুপুরের খাওয়া? মাত্র একটা বাজে। আমরা কেউ উঠছি না, মহিলা আবার বললেন, দয়া করে আসুন, দেরি করবেন না, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অগত্যা আমাদের যেতেই হল। খানিকটা হাঁটা পথে আমরা গেলুম আর একটি বাড়িতে। এটাও কারুর ব্যক্তিগত বাড়ি নয়, একটা কোনও প্রতিষ্ঠান। আমরা ঢুকলুম পেছনের দরজা দিয়ে। বিশাল ডাইনিং হলে অনেক টেবল পাতা। আমরা অনাহত বাসযাত্রী বাইশ-তেইশ জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসলুম। আমাদের দেওয়া হল, এক প্লেট ভুট্টা সেদ্ধ, রুটি-মাখন, একটা বোল্ ভরতি সুপ্, তাতে বেশ বড়-বড় মাংসের টুকরো আর একটা আপেল। বেশ পুষ্টিকর খাদ্যই বলতে হবে, কিন্তু কেন জানি না, সে খাবারের মধ্যে আমি জেলখানার গন্ধ পেলুম। অবশ্য এ কথাটা কারুকে বলা যায় না।

ফিরে গিয়ে আবার বসলুম জবানবন্দি দিতে। গ্রে-হাউন্ড কোম্পানি আমাদের জন্য আলাদা একটা বাস আনিয়ে রেখেছে এর মধ্যে, এখানে আমাদের কাজ মিটে গেলেই রওনা করিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কতক্ষণে মিটবে ঠিক নেই। আমার সহযাত্রীদের মধ্যে বেশ কয়েকজন অনেক কিছু দাবি করেছে। পুলিশের লোক বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চায়, দুর্ঘটনার জন্য আসল দোষটা কার। আর ইনশিয়োরেন্সের লোক এই সময় চোখ পাকিয়ে থাকে। অর্থাৎ এর উপরেই অনেক কিছু নির্ভর করছে। আমি কারুর সাতে-পাঁচে নেই, আমি যা সত্যি কথা তাই বলছি, অর্থাৎ আমি পেছন দিকে বসেছিলুম, আমি কিছু দেখিনি।

সাড়ে তিনটে বাজতে-না-বাজতেই গটগট করে ঢুকলেন আর কয়েকজন মহিলা। আবার আমাদের খাবার খেতে যেতে হবে? আমরা আকাশ থেকে পড়লুম। এর মধ্যে আবার খাবার? এ কি পাগলের কাণ্ড নাকি?

এবার সবাই আমরা একযোগে প্রতিবাদ করলুম। ভদ্রমহিলারাও নাছোড়বান্দা, প্রত্যেকের কাছে গিয়ে বলতে লাগলেন, প্লিজ এসো, তোমাদের খাবার টেবলে দেওয়া হয়ে গেছে, নষ্ট হবে, প্লিজ এসো।

পরস্পরের দিকে মুখ চাওয়াচাওয়ি করে বাধ্য হয়েই যেতে হল আমাদের। এবারেও সেই দুপুরের জায়গাটাতেই। তবে এবারের সেখানকার ডাইনিং হলে আরও পঞ্চাশজন নারী পুরুষ বসে আছে। এবারেও আমাদের দেওয়া হল সেই ভুট্টা সেদ্ধ, সেই রুটি-মাখন, সুপ আর আপেল। এ কি, এরা কি ভুলে গেছে নাকি যে আমরা দুপুরে একবার খেয়েছি? অন্য যারা বসে আছে তারা সবাই কী রকম যেন চোখ করে চেয়ে আছে। আমার ঠিক পাশের টেবিলেই বসে আছে খুব লম্বা মতন একটি যুবতি, তার চোখ দুটি ছলোছলো, সে অযাচিতা হয়েই আমাকে বলল, জানো, আমি কবিতা লিখি, কিন্তু আমার কবিতা কেউ পড়ে না। আমার সব কবিতা নদী নিয়ে, ছোট নদী, বড় নদী, লাল নদী, নীল নদী, কিন্তু কেউ পড়ে না।

কথাগুলো শুনে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল। আর একজন বলল, একটা বাস উলটে গেছে, তাতে এক হাজার জন লোক মরে গেছে, তাই না? কিংবা দুহাজার? তিন হাজার? চার হাজার? কিছু দূর থেকে কে যেন একটা আপেল ছুড়ে মারল, সেটা দুম করে লাগল দেওয়ালে। তারপর আরও পাঁচ-ছ'টা আপেল এসে পড়ল দেওয়ালের দিকে। অনেকে একসঙ্গে 'হা-হা' করে হেসে উঠল।

আমার এক সহযাত্রী উঠে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, ও বয়! দিজ্ আর অল লুনিজ্! বলেই সে দৌড় লাগাল।

তা হলে তো দুপুরে আমার ঠিকই মনে হয়েছিল। এখানকার খাবারে জেলখানার গন্ধ। এটা একটা মানসিক রোগগ্রস্তদের প্রতিষ্ঠান। আমার সহযাত্রীরা সবাই সরে পড়তে লাগল। আমার পাশের লম্বা মেয়েটি তখনও ঝুঁকে পড়ে আমায় কী সব বলছে, আমি যেতে পারছি না। ভয়ে আমার বুক কাঁপছে। একবার যদি এদের মধ্যে আটকে পড়ি, জীবনে বোধহয় আর কখনও বেরুতে পারব না। আমি উঠে দাঁড়াতেই লম্বা মেয়েটি দু-তিনটে আপেল আমার হাতে ঠেসে দিয়ে বলল, এগুলো নাও। আমি বললুম, না, না, আমার চাই না। অন্য টেবল থেকে কয়েকজন আপেল নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগল আমার দিকে।

অন্য দিকে তাকিয়ে দেখি, আমার যেসব সহযাত্রী চলে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, মেট্রন-ধরনের মহিলারা তাদের তাড়া করতে-করতে বলছে, এই, যাচ্ছ কোথায়। খেয়ে যাও। না খেয়ে যেতে পারবে না। তাহলে কি ওরাও পাগল। পাগলেরাই আমাদের ডেকে এনেছে।

দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমি দৌড় মারলুম। সোজা গিয়ে উঠে বসে রইলুম আমাদের জন্য নির্দিষ্ট বাসটায়। বাপরে বাপ, ওয়াইওমিং-এর পাগলদেরও এত পরোপকারের নেশা? নমস্কার ওয়াইওমিং, তোমাকে সারাজীবন মনে থাকবে।

॥ ২৬ ॥

নিউ ইয়র্ক শহরে হারিয়ে গেলে কোনও ক্ষতি নেই। যেকোনও সময়ে মাটির নীচে নেমে গেলেই হল, তারপর পাতালরেলে চেপে যেকোনও জায়গায় আবার থেমে মাটির ওপর উঠে পড়লেই চোখ জুড়িয়ে যাবে। এই শহরের যেকোনও জায়গাই দর্শনীয়।

গোটা আমেরিকার মধ্যে একমাত্র নিউ ইয়র্ক শহরে এসেই কলকাতার মানুষরা খুব স্বস্তি বোধ করবে। বেশ চেনা-চেনা লাগবে। রাস্তাঘাট মাঝে-মাঝেই ভাঙা, দু-এক জায়গায় খোদলে জল জমে আছে, পথচলতি লোকেরা খালি সিগারেটের প্যাকেট, কোকাকোলার টিন কিংবা চকলেটের রাংতা যেখানে-সেখানে ছুড়ে ফেলে দেয় অবলীলাক্রমে। অনেক রাস্তাতে কলকাতার মতন ভিড়, নারীপুরুষরা ব্যস্ত সমস্তভাবে হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে, কেউ কারুর দিকে না তাকিয়ে। রাস্তায় এত গাড়ি যে মাঝে-মাঝেই ট্রাফিক জ্যাম হয়।

ম্যানহাট্‌ন দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে আমার মনে এমনই কলকাতা-কলকাতা ভাব হয় তা আমি রাস্তার দু-পাশের আশি-নব্বইতলা বাড়িগুলোর কথা ভুলে যাই, দু-ধারের দোকানগুলোতে যেসব ফরেন জিনিস তাও খেয়াল থাকে না, আমি বরং এদিক-ওদিক তাকিয়ে কোনও ষাঁড়, কুষ্ঠরোগী ভিখারি কিংবা উলঙ্গ পাগল খুঁজি।

আমেরিকার আর কোনও শহরেই রাস্তা দিয়ে এত লোক হাঁটে না। ম্যানহাট্‌নের প্রায় সব রাস্তাই যেন মানুষের ভিড়ে গিসগিস করছে। তার একটা কারণ, এখানে গাড়ি পার্ক করা প্রায় একটা অসম্ভব ব্যাপার, অফিসবাবুরা গাড়ি চড়ে এলে, দু-তিন মাইল দূরে গাড়ি রেখে বাকিটা পায়ে হেঁটে আসতে হবে বলে অনেকেই গাড়ি আনে না, ট্রেনে যাতায়াত করে। দ্বিতীয় কারণ, এ শহরে অনেকেরই গাড়ি নেই। এ শহরে অনেক গরিব লোক থাকে। আমাদের কলকাতায় যেমন কোটি-কোটিপতি মাড়োয়ারিরাও আছে আবার ফুটপাথে শুয়ে থাকা গরিবও অসংখ্য, সেই রকমই, নিউ ইয়র্কেও সাহেব-মাড়োয়ারি ও গরিবদের সহাবস্থান চলছে। তবে তফাতের মধ্যে এই যে, এখানকার সাহেব-মাড়োয়ারিরা আমাদের মাড়োয়ারিদের চেয়ে অনেক বেশিগুণ বড়লোক আর গরিবরাও রাস্তায় শোয় না, তারা লম্বা-লম্বা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে আর শীতকালে প্রত্যেকের গায়েই একটা ওভারকোট চাপে। এখানকার রাস্তায় ষাঁড় বা উলঙ্গ পাগল নেই বটে কিন্তু গুপ্ত-ভিখিরি আছে। প্রকাশ্যে ভিক্ষে চাইলে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়।

এই শহরে এত গরিব তার কারণ প্রচুর বেকার ভাগ্যান্বেষী সারা পৃথিবী থেকেই নিউ ইয়র্কে এসে জোটে। তা ছাড়া, ইহুদি, পোর্টুরিকান, গ্রিক, ইটালিয়ান যারা আগে থেকেই এখানে এসে বসতি নিয়েছিল তাদের দেশোয়ালি ভাইরা এখনও অনবরত আসছে জীবিকার সন্ধানে, কোনও রকমে মাথা গুঁজে থাকছে। এত মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত আছে বলেই এ শহর শিল্প-সংস্কৃতিতে সকলের সেরা। গোটা আমেরিকার সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এই নিউ ইয়র্ক। দেখা যাচ্ছে, শিল্প সংস্কৃতির ব্যাপারটা খুব বড়লোক কিংবা খুব গরিবরা সৃষ্টি করতে পারে না। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

কোনও গির্জার সিঁড়িতে কিংবা কোনও ফুটপাথের দোকানে বসে থেকে রাস্তায় লোক চলাচল দেখতেও বেশ লাগে। এত বিচিত্র রকমের মানুষ এক সঙ্গে আর কোথাও দেখতে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। নিউ ইয়র্কের মতন স্বাধীন শহরও আর বুঝি নেই। যার যা খুশি করতে পারে। ধুতি, লুঙ্গি, আফ্রিকান জোব্বা কিংবা শুধু জাঙিয়া পরে রাস্তা দিয়ে হাঁটলেও কেউ ভ্রূক্ষেপ করবে না।

শুধু দুটি ব্যাপারে শহরের মেয়র সম্প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। হরে-কৃষ্ণ বৈষ্ণবের দল রাস্তায় যখন খুশি নাচানাচি শুরু করে দিত তাতে ট্রাফিক জ্যাম হয়ে যেত বলে এখন প্রকাশ্য রাস্তায় নৃত্য-গীত নিষিদ্ধ হয়েছে। আর, এখানকার কম-বয়েসি ছেলেমেয়েদের বাতিক ছিল পথে

হাঁটবার সময়ও রেডিয়ো বা টেপরেকর্ডার বাজানো। এতই তাদের সঙ্গীতপ্রীতি যে রাস্তায় যেতে-যেতেও গান না শুনলে চলে না। কিন্তু অনেকে মিলে ওসব বাজালে তো বিচিত্র এক ক্যাকোফোনির সৃষ্টি হয়, সেই জন্য প্রকাশ্যে রেডিয়ো, টেপরেকর্ডার বাজানোও নিষেধ। এটা সাউন্ড পলিউশন রোধ করবার কারণে।

অবশ্য কমবয়েসি ছেলেমেয়েরা এতেও দমেনি। তাদের পকেটে বা কাঁধের ঝোলায় এখনও রেডিয়ো রেকর্ডার থাকে, আর দু-কানে লাগানো হেডফোন, অন্যদের বিরক্ত না করে তারা নিজেরা ঠিকই গান শুনতে-শুনতে যায়। এরকম হেডফোন আঁটা ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায় প্রায়ই।

রাস্তায় ঘুরতে-ঘুরতে খিদে পেলেও কোনো অসুবিধে নেই নিউ ইয়র্কে। অজস্র সস্তায় খাবারের দোকান আছে এই শহরে। ড্রাগ স্টোর, হ্যামবাগরি, জয়েন্ট, পিৎসা হাট, হট ডগ কর্নার ইত্যাদি। ইচ্ছে মতন পৃথিবীর যে-কোনও দেশের খাবারও বেছে নেওয়ার সুবিধে আছে। চিনে-জাপানি-ইটালিয়ান-গ্রিক-ভারতীয়-পাকিস্তানি-তিব্বতি ইত্যাদি। আমার মতন আরও অনেক বাঙালও তো নিউ ইয়র্কে যায়, তাদের দু-একটা কথা জানিয়ে দিচ্ছি। হ্যামবার্গারে কক্ষনো হ্যাম থাকে না, থাকে গো-মাংসের কিমা আর হট ডগের সঙ্গে কুকুরের কোনও সম্পর্ক নেই, ওটা শুয়োরের মাংস আর বিশুদ্ধ সর্ষে বাটার সঙ্গে রুটি। চিনে আর জাপানি খাবার প্রায় একই ভেবে যারা জাপানি দোকানে ঢুকবেন, তারাও ঠকবেন। জাপানি খাবারের দাম বেশি, পরিমাণে কম, স্বাদও ভালো না। মূল জাপানের কথা জানি না, নিউ ইয়র্কের জাপানি দোকানের এই অবস্থা। ভারতীয় দোকানে ঢুকলে আপনি ভারতীয় বলেই ভালো ব্যবহার পাবেন না, এ কথা আগেই বলে রাখছি। সস্তায় ভালো মাংস-রুটি খেতে হলে যাওয়া উচিত গ্রিক দোকানে।

নিউ ইয়র্কের মেয়র আর একটা খুব ভালো আইন জারি করেছেন। ম্যানহাটানে এখন আর ফাঁকা জমি একটুও নেই, থাকলেও আগুন দাম, অথচ জনসংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়ছে, শহরটা ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে, সেই তুলনায় পার্ক বা জনসাধারণের বিশ্রামের জায়গা বাড়ছে না। বড়-বড় কোম্পানিগুলো ছোট বাড়ি কিনে নিয়ে সেখানে একশো তলা বাড়ি তুলে ফেলছে। সেই জন্যই এখন নিয়ম হয়েছে, ওই রকম বহুতল বাড়ি তৈরি করতে গেলেই গাড়ি রাখবার জায়গা করতে হবে মাটির নীচে আর এক তলাটা ফাঁকা রাখতে হবে। সেই এক তলার অর্ধেকটায় থাকবে বাগান আর বাকি অর্ধেকটায় খাবারের দোকান। সেখানে যে-কেউ এসে বসতে পারবে। মনে করুন, চৌরঙ্গিতে টাটা ম্যানসন কিংবা চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারের মতন লম্বা বাড়িগুলোর একতলা থাকবে জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। আমাদের মেয়রহীন কলকাতায় এরকম আইন কে জারি করতে পারেন জানি না।

সেইরকমই একটা নতুন বাড়ির নীচের খাবারের দোকানে বসেছিলুম একটা সুপ নিয়ে। পাশেই ফোয়ারা, তলার জলের রঙিন মাছ খেলা করছে, তাই দেখছি। হঠাৎ আমার টেবিলের পাশে একজন কেউ এসে দাঁড়াল, দু-দিকের কোমরে দুটি আঙুল দিয়ে। আস্তে-আস্তে চোখ তুলে তাকিয়ে একটা হাসিমুখ দেখতে পেলুম।

—যামিনীদা!

তিনি বললেন, ওই দিকের টেবিলে বসে অনেকক্ষণ ধরে দেখছি, চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। তুই সত্যিই তা হলে নীলু?

আমি খুব একটা অবাক হইনি কিন্তু। নিউ ইয়র্কের রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরলে দু-চারজন বাঙালির সঙ্গে তো দেখা হবেই, চেনা কারুর সঙ্গে দেখা হওয়াও আশ্চর্য কিছু না। লন্ডনের মতন অত না হলেও নিউ ইয়র্কের বাঙালির সংখ্যা নেহাত কম নয়।

আমার পাশের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে যামিনীদা বললেন, তুই জ্যান্ত এসেছিস না মরে ভূত হয়ে এসেছিস?

রাস্তায় বাস দুর্ঘটনায় যে সত্যিই মরে যেতে পারতুম, সে কথা চেপে গিয়ে বললুম, বালাই

ষাট, মরব কেন? হঠাৎ ওকথা বলছ যে?

—ভাবছিলুম যে আমাদের দেশের বেকাররা আর কতদিন বেঁচে থাকতে পারে?

যামিনীদা ছিলেন কলকাতার কফি হাউসের ইনটেলেক্‌চুয়াল। অনেক বিষয়ে পড়াশুনো। এখনও চেহারাটা বিশেষ বদল হয়নি দেখছি। মেদহীন ঝকঝকে শরীর। ঠোঁটের কোণে এমন একটা হাসি, যাতে মনে হয় সবসময় কিছু একটা উপভোগ করে চলেছেন।

—কবে এসেছিস?

—কাল।

—বাঙালের মতন এর মধ্যেই এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং, ওয়ার্লর্ড ট্রেড সেন্টার, স্ট্যাচু অব লিবার্টি ফিবার্টি সব দেখে নিয়েছিস তো?

উত্তর না দিয়ে আমিও মুচকি হাসলুম। আমিও নানা রকম হাসি দিতে জানি।

—শোন নিউ ইয়র্কে শুধু একরকমই দেখার জিনিস আছে, তা হল থিয়েটার। এতরকম থিয়েটারের এক্সপেরিমেন্ট আর কোথাও হয় না। এসেছিস যখন, ভালো করে দেখে যা। 'সত্যাগ্রহ' নামে একটা থিয়েটার হচ্ছে, জানিস? দেখলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।

আমি একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হলুম। যামিনীদা এখনও ইনটেলেকচুয়াল আছেন, নিছক ডলার জমাবার ধান্দায় মজে যাননি।

যামিনীদা বললেন, আর যদি দৃশ্য দেখতে চাস, তা হলে ঠিক সন্ধের একটু আগে ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর দাঁড়াবি। শেষ সূর্যের আলোয় দেখতে পাবি ঠিক যেন সোনা দিয়ে তৈরি ম্যানহাটান, ঠিক যেন অমরাবতী। ব্রুকলিন ব্রিজের ওপর সেই বিখ্যাত কবিতাটা পড়েছিস? ওই যে ইয়ের লেখা, কী যেন নাম, ওই যে লোকটা আত্মহত্যা করেছিল...

—হার্ট ক্রেন।

যামিনীদা ভুরু কুঁচকে তাকালেন আমার দিকে। আমি একখানা সাহেব-কবির নাম বলে ফেলেছি, আন্দাজে কি না বোঝার চেষ্টা করলেন। তারপর হোহো করে হেসে উঠে বললেন, ও, মনে পড়েছে, তুই তো আগেও একবার নিউ ইয়র্কে এসেছিলি, এসব তোর জানা। তাই না? কোথায় উঠেছিস?

আমি গ্রিনিচ ভিলেজের একটা সস্তা হোটেলের নাম বললুম।

—চল, তোর মালপত্তর নিয়ে আসি। তুই আমার ওখানে থাকবি। কিন্তু তোকে রান্না করতে হবে। তোর বউদি গত কাল বোস্টন চলে গেছেন, আমাকেও যেতে হবে দু-একদিনের মধ্যে। তুই একা থাকতে পারবি তো?

—অন্যের বাড়িতে একা থাকার মতন আনন্দের আর কিছু আছে কি?

—আমি গত বছরই একবার কলকাতায় গিয়েছিলুম, সুতরাং কলকাতার খবর মোটামুটি জানি। তোর খোঁজ করেছিলুম, তুই ছিলি না শহরে।

—হয়তো আসামে বা মধ্যপ্রদেশে গিয়েছিলুম।

—সবসময় টোটো করে ঘুরে বেড়াস বুঝি? চল, উঠে পড়া যাক।

বাইরে বেরিয়ে যামিনীদা একটু থমকে দাঁড়িয়ে কিছু চিন্তা করে বললেন, তুই এক কাজ কর, নীলু, তুই হোটেলে চলে যা। আমাকে দু-একটা কাজ সারতে হবে। তোকে রাত্তিরের দিকে আমি হোটেলে ফোন করব। কিংবা, আমার বাড়ির ঠিকানা দিলে তুই রাস্তা চিনে চলে আসতে পারবি?

আমি বললুম, কেন পারব না? তুমি কোন পাড়ায় থাকো?

—ব্রুকলিনে। তা হলে তাই কর, মালপত্র নিয়ে তুই আমার অ্যাপার্টমেন্টে চলে আয়। বেশি রাত করবি না, রাস্তাঘাট ভালো না, সন্ধে-সন্ধে চলে আসবি। আমি না থাকলেও গণেশ বলে একটা

সাউথ ইন্ডিয়ান ছেলে থাকবে। খুব ভালো ছেলে, তাকে তোর কথা বলে রাখব।

এরপর যামিনীদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি সময় কাটাবার জন্য মেট্রোপলিটন মিউজিয়ামে ঢুকে পড়লুম।

নিউ ইয়র্কের মিউজিয়ামগুলোর বর্ণনা দিতে গেলে সাত কাণ্ড রামায়ণ লিখে ফেলতে হয়। সে কাজ জ্ঞানী-গুণীরা করবেন। মেট্রোপলিটান মিউজিয়ামের এমন একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যা অন্য কোনও দেশের মিউজিয়ামে দেখিনি। এখানে প্রতিটি ছবির তলায় লেখা আছে সেই ছবি আঁকার ইতিহাস, সমসমায়িক ঘটনা, সেই ছবি সম্পর্কে তখন কে কী মন্তব্য করেছিলেন ইত্যাদি। মোটেই রসকষহীন তথ্য নয়, প্রত্যেকটাই পাকা হাতের রচনা এমনই সরস যে না পড়ে উপায় নেই। সেই লেখা পড়বার পর আবার নতুনভাবে ছবিটা দেখতে ইচ্ছে করে। ইম্প্রেশনিস্টদের মাত্র পঁচিশ-ছাব্বিশখানা ছবি দেখতেই আমার ঘণ্টাতিনেক লেগে গেল। এখনও বাকি আছে ঘরের পরঘর। শত-শত ছবি। আমি অবশ্য একটানা বেশিক্ষণ ধরে শিল্প উপভোগ করায় বিশ্বাস করি না। তিন ঘণ্টা যথেষ্ট।

বিকেল পড়ে গেছে, ফিরে এলুম হোটেলে। বিল চুকিয়ে বেরিয়ে এলুম মালপত্র নিয়ে। ব্রুকলিন ব্রিজ পার হওয়ার সময় একবার মনে করলুম হার্ট ক্রেনের কবিতা, আর একবার দেখে নিলুম যামিনীদা-বর্ণিত সোনার ম্যানহাটান। সূর্যাস্তের আলোয় হর্ম্যসারিকে সত্যিই ওরকম দেখায়।

যামিনীদার বাড়িতে রাত্তিরটা খুব জমে গেল। যামিনীদা এরই মধ্যে ভাত-ডাল-বেগুনভাজা আর দু-তিনরকম মাছ রান্নার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। দক্ষিণ ভারতীয় ছেলেটির নাম বোধহয় গণেশন, তাকে বাংলায় গণেশ বলে ডাকা হয়। সে যামিনীদার এখানে থেকে লেখাপড়া করছে। মৃদুভাষী ছেলেটি ইংরিজি মিশিয়ে মোটামুটি বাংলা বলে। গৌতম আর সংঘমিত্রা নামে এক তরুণ দম্পতি এসেছে। শুরু হয়ে গেল তুমুল আড্ডা।

যামিনীদা ওঁর চাকরি জীবনের কয়েকটা ঘটনা বললেন। ওঁর বর্তমান চাকরিটা, আমাদের চোখে বিচিত্র মনে হবে। উনি এখানকার লেবার ইউনিয়নের সেক্রেটারি জাতীয় কিছু। এ দেশের লেবার ইউনিয়ান অসম্ভব শক্তিশালী, ইচ্ছে করলে তারা সারা দেশ কাঁপিয়ে দিতে পারে। ইউনিয়ানের কাজ চালাবার জন্য এরা মাইনে করা প্রফেশনাল লোক রাখে। যামিনীদা বললেন, বুঝলি, এদেশে এসে অনেকদিন সরকারি কাজ করেছি। তারপর এক সময় মনে হল, এবার অন্য দিকটা একটু দেখা যাক তো। তাই শ্রমিকদের দলে ভিড়েছি।

ভাবতে ভালো লাগে যে কলকাতার এক বাঙালির ছেলে মার্কিন দেশের শ্রমিকদের পক্ষ নিয়ে ওদেশের সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়া করে।

খেতে বসে যামিনীদার আর একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পেলুম। এতদিন বিদেশে থেকেও উনি বাংলা বলার সময় অনর্থক ইংরিজি মিশিয়ে দেন না, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর রাখেন, মনে প্রাণে সম্পূর্ণ বাঙালি। কিন্তু খাওয়ার টেবিলে উনি একেবারে সাহেব। টেবিলে এক ফোঁটা জল বা একটা ভাত পড়লে চলবে না তক্ষুনি পরিষ্কার করতে হবে। সাইড ডিসে স্যালাড যেমন তেমন করে দিলে চলবে না, সুন্দর করে সাজিয়ে রাখতে হবে। আলাদা-আলাদা মাছের ঝোলের জন্য আলাদা আলাদা হাতা চাই। একজন কে যেন ডালের হাতাটা মাছের ঝোলে ডোবাতে উনি একেবারে হায়হায় করে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওতে নাকি সব স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়। উনি বললেন, বুঝলি না, পরিবেশনটাই তো একটা আর্ট, আমাদের ঠাকুমা-দিদিমারা যখন বড় থালায় ভাত পরিবেশন করতেন, কী রকম পরিপাটি করে সাজিয়ে দিতেন...।

আমরা খাওয়া শুরু করেছি, যামিনীদা ঘুরে-ঘুরে পরিদর্শন করছেন, আমি জিগ্যেস করলুম, আপনি বসবেন না?

যামিনীদা বললেন, না, আমি তো এসব খাই না; পরে একটা যা হোক বানিয়ে নেব।

—সে কী? আপনি এই ভালো-ভালো মাছ খাবেন না?

—না রে, আমি রাত্তিরে দুটো স্যান্ডুইচ ছাড়া আর কিছু খাই না।

তারপর একটু থেমে, আবার মুচকি হেসে বললেন, আমার কাছে কয়েকটা বাংলা কবিতার বই আছে, কিছু গানের রেকর্ড আছে, মাঝে-মাঝে সেই কবিতাগুলো পড়ি কিংবা গান শুনি, তখন আমি বাংলাদেশে ফিরে যাই মনে-মনে। বাঙালি থাকবার জন্য আমার ভাত কিংবা ইলিশ মাছ খাবার দরকার হয় না।

॥ ২৭ ॥

নিউ ইয়র্কের কুইন্‌স পাড়ায় বাঙালিদের একটা উৎসব হচ্ছে শুনতে পেয়ে গেলুম এক সকালবেলা। গিয়ে চমৎকৃত হলুম একেবারে। এ তো শুধু উৎসব নয়, এ যে পুরোপুরি ফাংশান। একটা ইস্কুল বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছে, সেখানে গিসগিস করছে শুধু বাঙালি, এটা যে সাহেবদের দেশ তা বুঝবার কোনও উপায়ই নেই।

মনে হল যেন কানপুর বা জব্বলপুরের কোনও বাঙালি ফাংশানে হাজির হয়েছি। মঞ্চের ওপর গান বাজনা হয়েই চলেছে, একাধিক ঘোষক এক-একরকম ঘোষণা করছেন মাঝে-মাঝে, হঠাৎ হঠাৎ ড্রপ সিন পড়ে যাচ্ছে ভুল করে, মাইক্রোফোনে মাঝে মাঝে চো-ও-ও-ও করে অদ্ভুত আওয়াজ হচ্ছে, কয়েকজন কর্মকর্তা অহেতুক ব্যস্ততায় দৌড়োদৌড়ি করছেন এদিক-ওদিক। এদিকে অডিটোরিয়ামে যুবক-যুবতীরা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও আছে মাসি-পিসি, ঠাকুরদা-ঠাকুমারাও, অনেকে বেশ জোরে জোরেই গল্প করছেন ও পাড়া-প্রতিবেশীদের খবর নিচ্ছেন, কাচ্চা-বাচ্চারা ছুটোছুটি করছেন আপন মনে। বেশ কয়েকজন পুরুষ সিগারেট টানতে-টানতে আড্ডা দিচ্ছেন বাইরে দাঁড়িয়ে, মাঝে-মাঝে কে যেন চেঁচিয়ে বলে উঠছে, বড্ড গোলমাল হচ্ছে, আস্তে! আস্তে!

একেবারে পুরোপুরি মফস্‌সলিয় বাঙালিদের ছবি।

গোড়ার দিকে লোকাল আর্টিস্টদের গান ও নাচ টাচ হচ্ছিল, শুনলুম কলকাতা থেকে কয়েকজন ভালো ভালো আসল রেডিয়ো আর্টিস্টও এসেছেন। কারুর-কারুর কথা থেকে জানতে পারলুম। ভূপেন হাজারিকা নাকি এসে ঘুরে গেছেন। তা ছাড়া রয়েছেন সলিল চৌধুরী, পূর্ণদাস বাউল ও তাঁর স্ত্রী, লক্ষ্মীশঙ্কর ও তাঁর সম্প্রদায়, আরও যেন কে কে। একজন সাহিত্যিকও নাকি রয়েছেন। তারপরই মঞ্চে ঘোষণা করা হল, এবারে ভাষণ দেবেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

শুনেই আমার বুকটা ধক করে উঠল। সুনীলদা! সলিল চৌধুরী কিংবা পূর্ণদাস বাউলদের সঙ্গে আমার আলাপই নেই, সুতরাং তাঁরা আমাকে পাত্তা দেবেন কেন? কিন্তু সুনীলদার সঙ্গে আমার অনেক দিনের পরিচয়।

বক্তৃতার ব্যাপারে সুনীলদা চিরদিনের ফাঁকিবাজ। স্টেজে দাঁড়িয়ে তিন-চার মিনিট কী সব এলেবেলে কথা বলেই নেমে এলেন। বসলেন সামনের দিকের একটা চেয়ারে। আমি দৌড়ে গেলুম সেখানে। আরও সহর্ষ বিস্ময়ে দেখলুম, সুনীলদার সঙ্গে স্বাতীদিও রয়েছেন।

সুনীলদাকে চমকে দেওয়ার জন্য একেবারে কানের কাছে মুখ নিয়ে বললুম, ভালো আছেন, সুনীলদা? আমায় চিনতে পারছেন?

সুনীলদা চমকে মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে একটু দেখে নিয়ে বললেন, খানিকটা চেনা চেনা লাগছে। তুমি কে বলো তো?

আমার বুকটা দমে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। হায়, সময় কী নিষ্ঠুর! সুনীলদা আমায় চিনতে পারলেন না? অথচ এক সময় সুনীলদা আর আমি কত কাছাকাছি ছিলুম,

প্রায় হরিহর আত্মা বলতে গেলে। সেই সুনীলদা এখন অনেক দূরে সরে আছেন। পুরোপুরি এস্টাবলিশমেন্টের মধ্যে ঢুকে পড়েছেন, চেহারাও অনেকটা ভারিক্কি হয়ে গেছে। মুখে খানিকটা উদাসীন ভাব, আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কিন্তু যেন আমায় দেখছেন না। যেন আমার মতন ছোটখাটো মানুষদের দিকে তেমন মনোযোগ না দিলেও চলে।

স্বাতীদি কিন্তু ঠিক আগের মতনই আছেন। আন্তরিক উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ওমা, নীলু! তুমি কবে এলে? দারুণ ভালো লাগছে তোমায় দেখে। এত সব অচেনা মানুষের মধ্যে হঠাৎ একজন চেনা লোক দেখলে এত ভালো লাগে।

পাশে একটা চেয়ার দেখিয়ে স্বাতীদি বললেন, বসো। তোমার মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন? সকালে কিছু খাওনি তুমি?

আমি মুখটা নীচু করলুম। প্রবাসে একাকী ভ্রাম্যমাণ জীবনে হঠাৎ কারুর কাছ থেকে একটা স্নেহের কথা শুনলে চোখে জল এসে যায়। যামিনীদার বাড়িতে ক'দিন একা-একা নিজে রান্না করে খাচ্ছি। কিন্তু রোজ-রোজ কি আর শুধু নিজের জন্য রান্না করতে কারুর ইচ্ছে করে?

এই সময় ঘোষক পরবর্তী নাচের অনুষ্ঠানের প্রস্তুতির জন্য দশ মিনিটের বিরতি চাইলেন। সুনীলদা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, চলো, বাইরে চা খেয়ে আসি।

তিনজনে চলে এলুম বাইরে। এদেশে মাটির ভাঁড় পাওয়া যায় না, তার বদলে পেপার কাপ। সেই কাগজের ভাঁড়ে তিনটে চা জোগাড় করে আনলুম উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে। চা শেষ হওয়ার পর চারমিনারের প্যাকেট বাড়িয়ে দিয়ে সুনীলদাকে জিগ্যেস করলুম, নেবেন?

সুনীলদা এবারে আমার প্রতি একটু উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, কোথায় পেলে? আমার তো স্টক শেষ, তাই এখন আমি ক্যামেল খাচ্ছি, অনেকটা এই রকমই।

আমি বললুম, আমার কাছে কয়েক প্যাকেট মাত্র আছে, সাবধানে জমিয়ে রেখেছি, খুব স্পেশাল কারুর সঙ্গে দেখা হলে একটা করে দিই। আপনারা কতদিন হল এসেছেন, সুনীলদা?

—মাসতিনেক হয়ে গেল বোধহয়? এবারে ফিরে গেলেই হয়।

—আপনি এখানে লেকচার টেকচার দিতে এসেছেন বুঝি?

—ধ্যাৎ, লেকচার কে দেয়। এক জায়গায় সত্যজিৎ রায়ের "অরণ্যের দিন রাত্রি" আর "প্রতিদ্বন্দ্বী" দেখানো হল, সেইসঙ্গে আমি বই দুটো বিষয়ে সামান্য দু-চার কথা বলেছি মাত্র, ব্যাস, তাতেই আমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। এখন স্রেফ বেড়ানো।

—দেশে থাকতে শুনেছিলুম আপনার কী একটা অপারেশান হয়েছিল?

খুব একটা অগ্রাহ্যের ভাব দেখিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে সুনীলদা বললেন, সে কিছু নয়। তারপর বললেন, কবিতা সিংহও এসেছেন জানো তো?

—কোথায়? এখানে আছেন?

—না, এখন নিউ ইয়র্কে নেই। কবিতা সিংহ এসেছেন আয়ওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্টারন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রামের নেমন্তন্ন নিয়ে...আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল।

আরও দু-একটা টুকিটাকি কথার পর জিগ্যেস করলুম আপনার কেমন লাগছে সুনীলদা?

মুখখানা আগের মতন উদাসীন করে উনি বললেন, আমার এবার খুব যে ভালো লাগছে তা বলতে পারি না। তবে স্বাতীর খুব ভালো লাগছে।

সুনীলদা ধুতি-পাঞ্জাবিও পরেননি, আবার সুট-টাই-ও পরেননি। সাধারণ প্যান্ট-শার্ট, সামান্য শীত পড়েছে বলে তার ওপরে একটা পাতলা কোট। স্বাতীদি একটা চওড়া নীল পাড়ের শাড়ি পরেছেন, তার ওপরে রোঁয়া-রোঁয়া তুলোর মতন একটা বেশ জমকালো সোয়েটার। একটু স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে স্বাতীদির, মুখখানা উৎফুল্ল।

—আপনার খুব ভালো লাগছে বুঝি স্বাতীদি।

স্বাতীদি হেসে বললেন, হ্যাঁ। খুব ভালো লাগছে। তাতে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেছি। জানো, নীলু, আগে আমেরিকা বিষয়ে আমার তেমন আগ্রহই ছিল না। আমেরিকায় বেড়াতে আসার শখও ছিল না। আমার স্বপ্ন ছিল ফ্রান্স। ছেলেবেলা থেকেই ভেবে রেখেছিলুম, একদিন না একদিন ফ্রান্সে যাবই। আর্ট গ্যালারিগুলো দেখব। এবারে সত্যি-সত্যি ফ্রান্সে এসে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে, প্রাণ ভরে গেছে। খুব ভালো ছিলুম প্যারিসে। তারপর প্যারিস থেকে দেশে ফিরে গেলে আমার খুব একটা আপত্তি ছিল না। তারপর ও এখানে একটা নেমন্তন্ন পেল, তখন ভাবলুম একবার ঘুরে আসাই যাক। এখানে এসে কিন্তু অবাক হয়ে গেছি। যত মানুষ জনের সঙ্গে মিশছি, ততই ভালো লাগছে।

—দেখবারও অনেক কিছু আছে।

—দেখবার জিনিস তো আছেই। কিন্তু আমেরিকানদের সম্পর্কে আমার আগে অন্যরকম ধারণা ছিল, একটু অহংকারী আর মাথা মোটা ধরনের। কিন্তু আমি এখানে এখানে এসে অল্পবয়সি ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে দেখছি, বেশিরভাগই কী সরল আর সুন্দর, কত রকম বিষয়ে আগ্রহী। এক একজনের হাসি দেখলেই বোঝা যায়, তাদের মনটা কত পরিষ্কার। আমরা বেশ কিছুদিন একটা খুব ছোট জায়গায় থেকেছি। সেটা একটা ইউনিভার্সিটি-টাউন, প্রায় সবাই ছাত্রছাত্রী বা পড়ান। তাদের সঙ্গে মিশে দেখলুম, এমন আন্তরিক ব্যবহার...আমার অনেক বন্ধু হয়ে গেছে...ও কিন্তু বিশেষ কারুর সঙ্গে মেশে না, বেশিরভাগ সময়ই বই মুখে নিয়ে শুয়ে থাকে কিংবা টিভি দেখে।

সুনীলদা বললেন, একটা নতুন দেশে এসে সে দেশের টিভি পরদায় ক'দিন মন দিয়ে দেখলে সেখানকার সমাজ ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু জানা যায়।

আমি জিগ্যেস করলুম, আপনার কেন ভালো লাগছে না সুনীলদা?

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে সুনীলদা বললেন, স্বাতী অনেকটা ঠিকই বলেছে, এদেশের মানুষ জনের সঙ্গে মিশলে ভালোই লাগে। অনেকেই সরল ও আন্তরিক, বেশ একটা পরোপকারের ঝোঁক আছে। কিন্তু টিভি, রেডিয়ো বা খবরের কাগজে এদেশের সরকারি নীতিগুলো যখন দেখি বা শুনি, তখন রাগে গা জ্বলে যায়। মানুষ হিসেবে আজও আমেরিকানদের বেশ পছন্দ হয়, কিন্তু রাষ্ট্র হিসেবে আমেরিকাকে আমি ঠিক পছন্দ করতে পারি না।

—একটা দেশের অধিকাংশ লোকই যদি ভালো হয় তবে সে দেশের সরকার খারাপ হয় কী করে?

—তাই তো হয় দেখছি। এদেশের লোক কী করে তা মেনে নেয়, তাও বুঝি না। এদেশের নির্বাচন ব্যবস্থাটা আমাদের বোধগম্য হয় না। রীতিমতো বড়লোক না হলে কারুর পক্ষে প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে দাঁড়ানোই অসম্ভব। রুজভেল্ট-এর পর সত্যিকারের কোনও ভদ্দরলোক এদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছে? কেনেডি ছাড়া? তাও কেনেডির চেহারা ও কথাবার্তায় খানিকটা চাকচিক্য থাকলেও মানুষ হিসেবে তিনি যে খুব সুস্থ ছিলেন না, সেটা তাঁর জীবনীকাররা ফাঁস করে দিয়েছেন জানো তো? এদেশে কত নোবেল লরিয়েট, কত জ্ঞানী-গুণী, কত উদার মানুষ রয়েছে, তবু এদের প্রেসিডেন্ট হয় নিক্সনের মতন খিস্তিবাজ কিংবা রেগনের মতন দ্বিতীয় শ্রেণির এক সিনেমার ভিলেন? এটা একটা ট্রাজিডি নয়! আসলে এদের সরকার চালায় কয়েকটা বড়-বড় ব্যাবসা প্রতিষ্ঠান, এদেশে যাদের বলে কর্পোরেশন, আমরা যাদের বলি মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি। লাভের জন্য এরা মানুষের রক্ত শুষে নিতেও দ্বিধা করে না। এরাই নিজেদের স্বার্থে পৃথিবীর এক-এক জায়গায় যুদ্ধ লাগায়।

—আপনি বেশ রেগে আছেন দেখছি, সুনীলদা।

—ভারতীয় হিসেবে এই সরকারের অনেক আচার আচরণ দেখলে তোমার, রাগ হতে বাধ্য। রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষকে এরা পাত্তাই দেয় না, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। আমি টানা তিন মাস এদের টিভি দেখেছি, তুমি বিশ্বাস করবে কি, মাত্র একদিন একটা ভারতীয় বিমানের হাইজ্যাকিং ছাড়া আর কোনও দিন একবারও ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটাও খবর দেয়নি। এদের খবর শুনলে মনে হয়,

পৃথিবীতে এখন পোল্যান্ড ছাড়া আর কোনও দেশ নেই। সবসময় রুশ বিরোধী প্রচার একেবারে বিরক্তিকর পর্যায়ে চলে গেছে। এমন অবস্থা, এদেশে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের মনেও রুশ জুজুর ভয় দানা বেঁধে যাচ্ছে। এটা কী সুস্থ ব্যাপার? রাশিয়াতেও এরকম প্রচার হয় কি না আমি জানি না। আমি কিন্তু এদেশে বসেই অনুভব করছি, রুশ-মার্কিন যে আণবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলছে, তাতে রাশিয়ার চেয়ে মার্কিন দেশের দায়িত্বই যেন বেশি। এক একটা আণবিক মিসাইলের জন্য যা খরচ, সেই খরচে তেরো লক্ষ শিশুকে এক বছর খাদ্য দেওয়া যায়। শুধু আমাদের দেশে কেন, এদেশেও অপুষ্টিতে ভোগা শিশু আছে। এদিকে এখন চিনের সঙ্গে এদের খুব ভাব, কারণ চিনের সঙ্গে চুটিয়ে ব্যাবসা চলছে কিনা।

—কিন্তু সুনীলদা, আমি যতদূর জানি, আণবিক অস্ত্রের স্টক পাইল আমেরিকানদের চেয়ে রাশিয়ারই বেশি।

—রাশিয়ার বেশি হলে এরা আরও বেশি রাখতে চায়। আবার এদের যদি একটা দুটো বেশি হয়ে যায়, তখন রাশিয়া আবার বেশি বানাবে। এই রকম করতে করতে পৃথিবীটা এক দিন হঠাৎ দুম ফটাস হয়ে যাবে।

স্বাতীদি বললেন, আমরা সেই যে একটা কোম্পানি অফিসে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলুম—

স্বাতীদিকে থামিয়ে দিয়ে সুনীলদা বললেন, একটা ওইরকম মাল্‌টি ন্যাশনাল কোম্পানি আমাদের অনেককে খেতে নেমন্তন্ন করেছিল, আমাদের দলে কয়েকজন চিনে লেখক লেখিকাও ছিলেন। সে এক এলাহি ব্যাপার। কোম্পানিটির নাম জন্ ডিয়ার কোম্পানি, আমাদের দেশে অনেকে নাম শোনেনি, কারণ আমাদের দেশে এদের ঠাঁই গাড়তে দেওয়া হয়নি। এরা পৃথিবীতে কৃষির যন্ত্রপাতি বানাবার বৃহত্তম কোম্পানি। ট্রাকটর ফ্রাকটর বানায়। এদের অফিস বাড়িটি দেখলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়, বিশ্ববিখ্যাত সব শিল্পীদের আসল ছবি দিয়ে সাজানো, স্বয়ং হেনরি মুরকে ডেকে এনে ভাস্কর্য গড়িয়ে রাখা আছে বাগানে। খাওয়াদাওয়াও হল দারুণ। কথায়-কথায় এই কোম্পানির একজন ডিরেকটর খুব আহ্লাদ করে আমাদের জানালেন যে ইদানীং চিনে এরা কত হাজার কোটি ডলারের যেন কয়েকটা কারখানা বসিয়েছে। তখন আমার মনে হল, এই যে আড়ম্বর ও বিলাসিতা, তার অনেকটাই নিশ্চয়ই সাম্যবাদী চিনকে শোষণ করা টাকায়। সাম্যবাদী চিনও হঠাৎ কেনই বা নিজেদের এখন মার্কিনিদের দিয়ে শোষিত হতে দিচ্ছে, তাই বা কে জানে!

আমি বললুম, যাক গে, ওসব বড়-বড় রাজনীতির ব্যাপার। সুনীলদা আপনার সঙ্গে এখানকার অনেক লেখকদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে নিশ্চয়ই?

স্বাতীদি অনুযোগের সুরে বললেন, দ্যাখো না, ও কারুর সঙ্গে আলাপই করতে চায় না। আজকাল ভীষণ অমিশুকে হয়ে গেছে।

সুনীলদা বললেন, যখন বয়েস কম ছিল, তখন ঝোঁক ছিল বিখ্যাত লেখকদের সঙ্গে আলাপ করব। তাঁদের কথা শুনব। এখানে অনেক ভালো লেখক আছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু আজকাল তাঁদের সঙ্গে কথা বলার উৎসাহ পাই না। ওদের সামনে গেলে একটা হীনমন্যতা জাগে। কারণ কী জানো, ওরা আমাদের বিষয়ে কিছুই জানে না, আমাদের কারুর লেখা পড়েনি। অথচ আমরা এদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানি, অনেক লেখা পড়েছি। এখানে সব আলোচনাই একতরফা হতে বাধ্য। তাতে আমার রুচি নেই। আমি মনে করি, আমাদের বাংলা সাহিত্যের মান এখানকার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়, এদের কিছু লেখা খুব ভালো হলেও অধিকাংশ লেখাই তো রাবিশ। এরা যদি বাংলা সাহিত্য পড়তে না চায় তা হলে নিজে গিয়ে সেধে-সেধে কিছু জানবার আগ্রহ আমার একটুও নেই। তার চেয়ে এদেশটা বেড়াবার পক্ষে ভালো, টাকাপয়সা জুটলে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে যেতে বেশ ভালোই লাগে।

—আপনাকে যদি অনেক টাকা দেওয়া হয়, তাহলে আপনি এদেশে থেকে যাবেন?

—যদি আমায় মাসে এক লাখ ডলারও দেয়, তা হলেও আমি এদেশে থাকব না। যদি আমায় জেলে বন্দি করে রাখে পরের দিনই আমি আত্মহত্যা করব।

সুনীলদার এমন তীব্র মন্তব্য শুনে আমি আর স্বাতীদি দুজনেই হাসতে লাগলুম। তাতে সুনীলদা একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। বেশি বড়-বড় কথা বলা হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে নিজেকে একটু সামলে নিলেন। তারপর নিজেও হাসতে-হাসতে বললেন, আরে বাবা, বাংলায় কিছু লিখতে গেলে আমাকে তো নিজের দেশের মানুষের মধ্যেই থাকতে হবে। নিজের দেশের মানুষকে না জানলে তো কিছু লেখা যায় না।

স্বাতীদি বললেন, আমারও খুব বেশিদিন এসব দেশে থাকবার খুব একটা ইচ্ছে নেই। জানো তো, ও ক্যালঘেরি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরও চার মাস থেকে যাওয়ার একটা প্রস্তাব পেয়েছিল, কিন্তু ও নিতে রাজি হয়নি। ভালোই করেছে। বেড়াতে এসেছি, বেড়িয়ে ফিরে যাব।

সুনীলদা আবার হঠাৎ মেজাজ বদলে কড়া গলায় আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি আমায় এত কথা জিগ্যেস করছ কেন? তুমি কি আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছ নাকি?

—না, না, এমনি। এসব কথা আর কাকে জিগ্যেস করব, বলুন?

—এসব আবার কোথাও ছাপিয়ে টাপিয়ে দিও না।

—এখন আবার ফাংশান শুনবেন না একটু রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াবেন? আজ কিন্তু চমৎকার রোদ উঠেছে।

স্বাতীদি খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চলো-চলো, সেই ভালো। এইসব গান-বাজনা তো আমরা কলকাতায় রোজই শুনি—।

আমরা তিনজনে বেরিয়ে পড়লুম পথে।

॥ ২৮ ॥

এখন নিউ ইয়র্কে রাত দেড়টা, তা বলে কলকাতায় এখন ক'টা বাজে? খুব সম্ভবত দশ ঘণ্টার তফাত। অর্থাৎ কলকাতায় এখন বেলা সাড়ে এগারোটা। নিউ ইয়র্কে শনিবার রাত, কলকাতায় এখন রবিবারের দুপুর সবে মাত্র আসছে।

তখন পরিষ্কার দেখতে পেলুম কলকাতায় রবিবারের সকাল-দুপুরের ছবি। প্রত্যেক রবিবার আমাদের একটা আড্ডা আছে। সাধারণত সেই আড্ডাটা সাড়ে এগারোটা-বারোটা থেকেই শুরু হয়, চলে বিকেল পর্যন্ত। কোনও-কোনও দিন সন্ধেও গড়িয়ে যায়। নিয়ম না-মানা, বলগা-ছাড়া আড্ডা।

হঠাৎ আমার ভীষণ মনটা ছটফট করে উঠল। দূর ছাই, কিচ্ছু ভালো লাগছে না! এই সাহেবদের দেশে আমি কী করছি? আমার এক্ষুনি চলে যেতে ইচ্ছে করছে। জলের মাছকে জলে ফিরিয়ে দিলেই যেমন সে সবচেয়ে সাবলীল থাকে, কলকাতাটা আমার সেই রকম নিজস্ব জলাশয়।

বেশ বড় অ্যাপার্টমেন্ট, তিন খানা শোওয়ার ঘর, একটা মস্ত লিভিং-কাম-ডাইনিং রুম। গৃহস্বামী অনুপস্থিত, আমাকে চাবি দিয়ে গেছেন, সারাদিন ঘুরে ফিরে এখানে রাত্রে চলে আসি।

কিছুতেই ঘুম আসছে না আজ। এক-একবার সব অন্ধকার করে দেখছি বাইরের আলো। আবার হঠাৎ সব ঘরের আলো জ্বেলে দিচ্ছি। কিছুরই অভাব নেই, ফ্রিজ-ঠাসা খাবার, সেলারে অনেক রকম পানীয়, তিনটে ঘরের তিন রকমের বিছানাতেই শুতে পারি, তবু মনে হচ্ছে এক ছুটে কলকাতায় গিয়ে নিজের বালিশে শুয়ে পড়ি।

মন খারাপটা শুরু হয়েছিল বিকেল থেকেই।

নিউ ইয়র্কের মতন পেল্লায় শহরের রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ একজন চেনা লোকের সঙ্গে

দেখা হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কিছু না। কিন্তু পরপর দুদিন একই লোকের সঙ্গে এখানকার রাস্তায় দেখা হয়ে যাওয়া সত্যিই অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমার কিন্তু সেই রকমই হল।

গতকাল বিকেলে গুগেনহাইম মিউজিয়াম থেকে সবেমাত্র বেরিয়েছি, একজন আমার পিঠে ঘুষি মেরে বলল, হ্যাল্লো, নীলু।

চমকে পেছন ফিরে আমার আক্রমণকারীকে দেখে আমি খুবই খুশি হলুম। এক একজন মানুষ থাকে, যাদের দেখলেই ভালো লাগে। এই মানুষটি সেইরকম।

ইংরিজি বানানে এর নাম জর্জ, কিন্তু আসল উচ্চারণ ইয়র্গো। এই ইয়র্গো একজন গ্রিক লেখক। কিছুদিন আগে একটা ছোট শহরে এর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। লেখক-টেখকদের সংস্পর্শে যেতে আমার ভয় করে, কারণ সাহিত্য-আলোচনা ফালোচনা আমার দ্বারা কিছুতেই হয় না। সাহেব-লেখকদের সম্পর্কে তো আমার আরও ভয়, ওদের সঙ্গে আবার ইংলিশে সাহিত্য আলোচনা করতে হবে, বাপরে!

কিন্তু ইয়র্গোর চেহারায় কিংবা ব্যবহারে একদম সাহিত্যিক-সাহিত্যিক ব্যাপার নেই। বেশ রুক্ষ চেহারা, নাকের নীচে ঝোলা গোঁপ, অতিরিক্ত ধূমপানের জন্যই বোধহয় দাঁত একটু ক্ষয়ে গেছে। গোঁফের ফাঁক দিয়ে ও মিচকি-মিচকি হাসে আর সবসময় মজার কথা বলতে ভালোবাসে। সাহিত্য ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য বহু বিষয়ে ওর টগবগে আগ্রহ। যদিও গ্রিসে ইয়র্গো খুব নাম করা নাট্যকার এবং চলচ্চিত্র-নাট্যকার। নিজের দেশে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়েছে। লেখক হিসেবে ওর খুব সম্মান আছে। পুরো নাম ইয়র্গো কুরটিস।

প্রথম দিন আলাপেই ইয়র্গো আমাকে একটা অদ্ভুত কথা বলে চমকে দিয়েছিল। সেটা ছিল বেশ বড় গোছের একটা সম্মিলন, নানা জাতের লোক, তার মধ্যে সাহেবই বেশি। সবাই সবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে কথা বলছে, এর মধ্যে ইয়র্গো এক সময় আমার পাশে এসে ওর স্বভাবসিদ্ধ মুচকি হেসে বলল, একটা জিনিস লক্ষ করেছ, নীল্লু? আমরা যারা কালো লোক, আমরা কক্ষনো কোনও পার্টির ঠিক মাঝখানে থাকি না, আস্তে-আস্তে কোনও না কোনও দেওয়ালের দিকে সরে যাই। তুমি দ্যাখো, সব কালো লোকরাই দেওয়ালের পাশে।

আমি চমকে ইয়র্গোর দিকে তাকিয়ে ছিলুম। ও নিজেকে কালো লোক বলছে কেন? গ্রিকরাও তো পুরোপুরি সাহেব। আর ইয়র্গোর গায়ের রং-ও হাতির দাঁতের মতন।

—তুমি নিজেকে কালো বলছ কেন, ইয়র্গো? আমরা ভারতীয়রা কালো হতে পারি, কিন্তু তুমি...

—আরে, কালো মানে তো গরিব। গ্রিকরাও আমেরিকানদের তুলনায় ভীষণ গরিব! সুতরাং তোমরা আমরা সমান। আর গায়ের রং-এর কথা যদি বলো, তা হলেও, ইওরোপের দেশগুলো, যেমন সুইডেন, নরওয়ে, ওয়েস্ট জার্মানি—ওরা গ্রিকদের প্রায় কালোর মতনই অবজ্ঞা করে বুঝলে?

আমি বললুম, তুমি সত্যি আমাকে নতুন কথা শোনালে, ইয়র্গো। আমরা বাঙালিরা এখনও কোনও সুন্দর দেখতে ছেলের বর্ণনা দিই 'গ্রিক যুবকের মতন' কিংবা 'তরুণ গ্রিক দেবতা'।

ও বলল, সে তো তিন হাজার বছর আগেকার গ্রিসের মানুষের কথা তোমরা ভাবো। মুশকিল হচ্ছে কী, সবাই ক্লাসিকাল আমলের গ্রিসের কথা জানে, কিন্তু এখনকার গ্রিসের অবস্থা কেউ জানারও চেষ্টা করে না। আমরা আবার বড়লোক হই, তখন আবার সুন্দর হয়ে যাব। তোমরা ভারতীয়রাও যদি এখন হঠাৎ বড়লোক হয়ে যাও, তাহলেই দ্যাখো, তোমাদের ওই জলপাই রঙের চামড়া নিয়ে ইংরেজিতে কাব্য লেখা হবে, মেমসাহেবরা তোমার পেছনে ছুটোছুটি করবে।...

এ হেন ইয়র্গোকে নিউ ইয়র্কের রাস্তায় হঠাৎ দেখতে পেলে আমার তো ভালো লাগবেই। ইয়র্গো একটি ছোট শহরের মাঝারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে কয়েক মাসের জন্য এখানে এসেছে।

আমি মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে বাংলায় কথা বলি। ও বাংলা এক বর্ণও বোঝে না। কিন্তু আমাকে

ও বলেছিল যে বাংলা শব্দ ঝংকার শুনতে ওর ভালো লাগে।

আমি ওর হাতে চেপে ধরে বললুম, কী গো ইয়র্গো সাহেব, তুমি কোথা থেকে হঠাৎ এখানে উদয় হলে? আকাশ থেকে খসে পড়লে নাকি?

ইয়র্গো আমার প্রশ্ন বুঝল না বটে কিন্তু উত্তরে বলল, এই নিউ ইয়র্কে কয়েকদিনের জন্য একটু ফুর্তি করতে এসেছি। শুনেছিলুম নিউ ইয়র্কের পথে পথে জুনিপার ফুলের মতন ছড়ানো থাকে সুন্দরী মেয়ে, যেন কারুর দিকে একটু ভুরুর ইশারা করলেই সঙ্গে সঙ্গে আসে। দুদিন ধরে ভুরুর ইশারা করতে-করতে আমার চোখ ব্যথা হয়ে গেল। কই একজনও তো এল না।

ইয়র্গো ভালো ইংরিজি জানে না। ভাঙা-ভাঙা বলে। মাঝে-মাঝে ঠিক শব্দটা খুঁজে না পেয়ে হাওয়ায় হাতড়াতে থাকে।

কোনও সাহেবের মুখে ভাঙা ইংরিজি শুনলে আমার বড্ড আরাম হয়। আমিও তার সঙ্গে বেশ স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে পারি।

ইয়র্গোর কথা শুনে আমি হাসতে লাগলুম।

ইয়র্গো জিগ্যেস করল, তুমি কোনও বান্ধবী পেয়েছ নিউ ইয়র্কে?

আমি ডান হাতের বুড়ো আঙুল নেড়ে বললুম, লবডঙ্কা।

ইয়র্গো প্রথমে একটা গ্রিক গালাগালি দিল। সেটা নিশ্চয়ই শালার প্রতিশব্দ। তারপর বলল, আমাদের দেশের যেসব লেখকরা এদেশ ঘুরে গিয়ে ভ্রমণ কাহিনি লেখে, সব্বাই ডাহা গুল মারে।

দুঃখের বিষয় এরকম সরস গল্প আমরা বেশিক্ষণ জমাতে পারিনি। কারণ কাল বিকেলে আমাদের দুজনেরই তাড়া ছিল। আমার একটা থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা, ইয়র্গো কেটে রেখেছে একটা ফরাসি সিনেমার টিকিট। সুতরাং কাছাকাছি একটা ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে ঢুকে আমরা চটপট কফি খেয়ে নিলুম এবং লিখে দিলুম পরস্পরের ঠিকানা।

কিন্তু ঠিকানা খুঁজে যোগাযোগ করবার আগেই আজ সন্ধেবেলা আবার ইয়র্গোর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রাস্তায়। একই থিয়েটার দেখে বেরুলাম দুজনে।

আজ ইয়র্গোর সঙ্গে একটি স্বাস্থ্যবতী যুবতী, ঝলমলে মুখ, ডাগর-ডাগর চোখ, তার স্কার্টে অত্যুজ্জ্বল লাল-নীল ফুল।

ইয়র্গো আর আমি প্রথম বিস্ময় বিনিময় করবার পর সে জিগ্যেস করল, নীল্লু, আজ এর পর তোমার কোনও কাজ আছে? কোথাও যাবার কথা আছে?

আমি কাঁধ ঝাঁকালুম। অর্থাৎ সেরকম কোনও কথা থাকলেও কিছু আসে যায় না।

—তাহলে কিছুক্ষণ কোথাও বসে আড্ডা মারা যাক? হ্যাঁ?

—নিশ্চয়ই!

মেয়েটি পৃথিবীর দুর্বোধ্যতম ভাষায় ইয়র্গোকে কী যেন বলল। ইয়র্গোও সেই একই ভাষায় উত্তর দিয়ে তারপর আমাকে আবার মিষ্টি ভাঙা ইংরিজিতে বলল, এই মেয়েটি থাকতে চাইছে না, ওর বাবা ওর সঙ্গে আজ দেখা করতে আসবে বলছে, তা হলে ওকে ছেড়ে দিই, কী বলো।

আমি আর কী বলব, হাসি হাসি মুখ করে তাকিয়ে রইলুম। মেয়েটিও আমার দিকে একঝলক হেসে গুডবাই বলে নেমে গেল মাটির তলায় ট্রেন ধরতে।

কিছুক্ষণ ইয়র্গো আর আমি পাশাপাশি হাঁটবার পর আমি বললুম, এই তো আজ বেশ একটি সুন্দরী সঙ্গিনী পেয়ে গিয়েছিলে দেখছি!

ইয়র্গো দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বলল, দূর দূর! ও তো গ্রিক মেয়ে! এখানে এসে উঠেছি এক গ্রিকের বাড়িতে, নেমন্তন্ন খাচ্ছি গ্রিকদের বাড়িতে, আলাপ হচ্ছে গ্রিক মেয়েদের সঙ্গে...তাহলে আর নিউ ইয়র্কে আসা কেন? এথেন্সেই তো এসব পাওয়া যায়। আমার নাম শুনলে গ্রিক মেয়েরা আমার সঙ্গে প্রেম করতে আসে, নিউ ইয়র্কেও সেই একই ব্যাপার!

আমি যতদূর জানি, বাঙালি লেখকদেরও প্রায় একই অবস্থা। তারাও বিদেশে গেলে বাঙালিদের বাড়িতে ওঠে। বাঙালিদের নানান বাড়িতে নেমন্তন্ন খায়। তবে বাঙালি মেয়েরা লেখকদের নাম শুনে প্রেম করতে আসে কি না তা অবশ্য আমি জানি না। অন্তত আমার কোনও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই।

ইয়র্গো জিগ্যেস করল, নিউ ইয়র্ক তোমার কেমন লাগছে?

আমি পালটা প্রশ্ন করলুম, কারুর কি খারাপ লাগতে পারে?

ও বলল, ইত ইজ এ গ্রেত্ সিতি...সবসময় জীবন্ত...এত রকমের নাটক...এত ধরনের ফিল্ম...মিউজিক কনসার্ট...আর্ট গ্যালারিগুলো তো আছেই, সব দেখে শেষ করা যায় না...বাত্ আই দোনত লাইক ইত্। ইত ইজ দিপ্রেসিং।

রাস্তায় দুপাশের অতিকায় বাড়িগুলো দেখিয়ে ইয়র্গো আরও কী যেন বলতে গেল, ভাষা না খুঁজে পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, ঠোঁট উলটে বুঝিয়ে দিল।

তারপর থমকে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করল, তুমি কখনও উজো খেয়েছ? আজ দেখলুম এখানকার দোকানে পাওয়া যায়। দেখেই কেমন মন খারাপ হয়ে গেল। তুমি খাবে?

—উজো কী?

—আমাদের গ্রিসের দেশি মদ। খেয়ে দ্যাখো না একটু।

—কেন খাব না? জানো, আমার মা আমায় ছেলেবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছেন, পরের বাড়িতে গিয়ে এটা খাব না, সেটা খাব না বলতে নেই। যে যা দেবে মুখ বুজে খেয়ে নেবে।

ইয়র্গো এক গাল হেসে বলল, চলো তাহলে।

ম্যানহাটানে বার অসংখ্য। কিন্তু উজো অতি সস্তা দামের পানীয়, বারে বোধহয় সার্ভ করে না। তা ছাড়া আমরা দুজনেই গরিব দেশের মানুষ, ডলারকে ভক্তি করি। বারে বসে পেগের দামে অনেক খরচ পড়ে যাবে।

হাঁটতে-হাঁটতে আমরা গ্রিনিচ্ ভিলেজে এসে পড়েছি। ইয়র্গো সট্ করে এক দোকান থেকে এক বোতল উজো কিনে নিয়ে এল। তারপর বলল, এখানেই কোথাও বসে যেতে হবে। দাঁড়াও ব্যবস্থা করছি।

রাত প্রায় দশটা বাজে। গ্রিনিচ্ ভিলেজের সেই আগেকার রব্‌রবা এখন আর নেই। বাউণ্ডুলে শিল্পী সাহিত্যিকরা নগর-উন্নয়নকারীদের অত্যাচারে অনেকেই এ পাড়া ছেড়ে পালিয়েছে। তবু এখনও এখানকার পথে বেশ ভিড়।

একটা ফাঁকা ধরনের রেস্তোরাঁর ফুটপাথের টেবিলে বসলুম আমরা। পরিচারিকাকে ডেকে খুব সরলভাবে ইয়র্গো বলল, আমাদের দু-কাপ কফি দাও। আর দুটো কাচের গেলাস দাও। আর বেশ বড় এক জাগ জল দাও। আমরা কফির দাম দেব কিন্তু কফি খাব না। আমরা অন্য জিনিস খাব।

মেয়েটি বিনা বাক্যব্যয়ে কফি, গেলাস ও জল নিয়ে এল। তারপর জিগ্যেস করল, তোমরা কী খাবে?

কাঁধের ঝোলা থেকে বোতলটি বার করে ইয়র্গো গেলাসে ঢালল। আমাকে বলল, প্রথমে নিট্ খেয়ে দ্যাখো। যদি বেশি কড়া লাগে, তাহলে জল মিশিয়ে নিও। তবে তাড়াতাড়ি খেও না কিন্তু, হঠাৎ কিক করে।

পরিচারিকাটি ইয়র্গোর গেলাসটা তুলে নিয়ে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। একটুক্ষণ সময় নিয়ে জিনিসটা উপলব্ধি করে সে বলল। হ্যাঁ, খেতে পারো। আমি ঘুরে-ঘুরে আসব, আমাকে একটু-একটু দিও।

আমি প্রথমে সাবধানে চুমুক দিলুম। মোটেই অচেনা লাগল না। উজো একেবারে জলের মতন স্বচ্ছ পানীয়। সাঁওতাল পরগনায় আমি অনেকবার মহুয়া খেয়েছি, স্বাদটা অনেকটা সেই রকমই লাগল। কিংবা গোয়ার কাজু ফেনির মতনও বলা যায়। মেক্সিকোর টাকিলা আমি অনেকবার খেয়েছি,

তার চেহারা ও স্বাদও এর কাছাকাছি। জল না মিশিয়েই দুজনে চুমুক দিতে লাগলুম চুকচুক করে।

একটুবাদে ইয়র্গো বলল, তুমি গ্রিসে যাওনি, না? চলে এসো। ছোট-ছোট দ্বীপ...গ্রিসে এলে তুমি বুঝতে পারবে জল কত সুন্দর দেখতে হয়। এই যে নিউ ইয়র্ক শহর, এটা কি মানুষের বসবাসযোগ্য? দেখলে মনে হয় না এটা দৈত্যদের জন্য বানানো হয়েছে? তার বদলে...গ্রিস...মানুষ আর প্রকৃতি সেখানে এখনও এক সঙ্গে মিশে আছে অনেকখানি...অভাব আছে, দারিদ্র্য আছে...কিন্তু এখনও মানুষের মন টাটকা আছে...

ব্যস, অমনি শুরু হয়ে গেল আমার বুকে ব্যথা। কলকাতা শহরের রূপের কোনও খ্যাতি নেই, কিন্তু সে যে বিষম আপন, তাই নিউ ইয়র্কের তুলনায় সেই মুহূর্তে কলকাতাকে মনে হল স্বর্গের মতন প্রিয়। গ্রিসের মতন আমাদের বাংলা হয়তো তত সুন্দর নয়, কিন্তু তারও তো একটা আলাদা রূপ আছে। শুধু বাংলা কেন, গোটা ভারতবর্ষটাই তো আমার। সেই জনম দুখিনী দেশটার জন্য টনটন করতে লাগল হৃৎপিণ্ড।

দুজনে মিলে ফিসফিস করে গল্প করতে লাগলুম দুজনের দেশের। বোতল প্রায় শেষ। আমার এখন একা থাকতে ইচ্ছে করছে খুব। শেষের দিকে পরিচারিকাটি খুব ঘনঘন এসে চুমুক দিচ্ছিল গেলাসে, আমি তাই ইয়র্গোকে বললুম, এর দিকে ভুরুর ইশারা করলে বোধহয় কাজ হবে। তুমি চেষ্টা করে দ্যাখো না।

ইয়র্গো পরিচারিকাটির নামধাম জিগ্যেস করল। তারপর সে বসে যেতেই বলল, ধুর। ও তো ইটালিয়ান। সবেমাত্র কিছুদিন হল এসেছে। আমাদের গ্রিসেও তো কত ইটালিয়ান মেয়ে কাজ করতে যায়।

হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে ইয়র্গো বলল, আমরা বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে যাচ্ছি, না? এটা ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে। চলো, অন্য কোথাও যাই, যেখানে অনেক লোক, সেখানে খানিকটা হইচই করব...।

কিন্তু খানিকবাদে আমি ইয়র্গোর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে এলুম। ফেরার পর অবশ্য বুঝলুম ভুল করেছি। এক মুহূর্ত স্থির থাকতে পারছি না। কলকাতা যেন বিরাট এক লাটাই গুটিয়ে আমায় ঘুড়ির মতন টানছে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে ফিরে যাই। আমার কাছে রিটার্ন টিকিট আছে। বিমান কোম্পানিকে ফোন করব, যদি পরের ফ্লাইটেই জায়গা পাওয়া যায়! কিন্তু এত রাত্রে...।

শুধু আমার মন নয়, আমার শরীরও যেন কলকাতার জন্য মোচড়াচ্ছে। এখন রোববার সাড়ে এগারোটা, আড্ডাধারীরা যে-যার বেরুচ্ছে বাড়ি থেকে এই সময়। আজ কোথায় আড্ডা? এর বাড়ি, বা ওর বাড়ি, না তার বাড়ি! কিংবা লেকের গাছতলায় চেয়ার টেবিলে।

নিজেই এক সময় হেসে উঠছি। আমি এত সেন্টিমেন্টাল? তা হোক, এখন সম্পূর্ণ একা, যতই সেন্টিমেন্টাল হই, যতই ছেলেমানুষি করি, কেউ তো দেখছে না।

হঠাৎ মনে হল, এখন একটু বাংলায় কথা বললে তবু ভালো লাগবে। অনেক দিন দীপকদা-জয়তীদির সঙ্গে যোগাযোগ নেই। ওঁদের ওখানে এখন কত রাত? যাই হোক, ওঁদের জাগানো যেতে পারে। আমি টেলিফোন তুলে ওঁদের নম্বর ঘোরালুম।

॥ ২৯ ॥

ইংল্যান্ডের নিসর্গদৃশ্য সম্পর্কে সেখানকার কবি ও শিল্পীরা বরাবরই উচ্ছ্বসিত। রোমান্টিক প্রকৃতি বর্ণনা ইংরেজি কবিতায় যেমন সুন্দর আছে, অন্য ভাষায় তার তুলনা পাওয়া ভার। সেই জন্যই

বোধহয় ইংরেজ ঔপনিবেশিকরা আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে এই নতুন দেশে এসে যখন আস্তে-আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, তখন ম্যানহাটান দ্বীপ ছাড়িয়ে তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলি দেখে হয়তো তারা মুগ্ধ ও চমকিত হয়েছিল। সেখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল খুঁজে পেয়েছিল নিজের দেশের। সেই জন্যই তারা এই এলাকার নাম রাখে নিউ ইংল্যান্ড। ম্যাসাচুসেট্স, রোড আয়ল্যান্ড, কানেটিকাট ইত্যাদি জায়গা এই নিউ ইংল্যান্ডের মধ্যে পড়ে।

সত্যি বড় অপূর্ব এখানকার প্রকৃতি। নিউ ইয়র্ক শহর থেকে ট্রেনে চেপে খানিকটা দূরে গেলেই দুপাশের দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে যায়। খুব যে আহামরি সাংঘাতিক কিছু দ্রষ্টব্য ব্যাপার আছে তা নয়, ছোট-ছোট টিলা, হালকা-হালকা গাছ আর খুদে-খুদে নদী। সৌন্দর্য এটাই যে প্রকৃতিকে এখানে অবিঘ্নিত রাখা হয়েছে, গাছপালাগুলোকে ছেঁটে-ছেঁটে সাজানো হয়নি, নদীগুলো চলেছে আপন মনে। ঝোপঝাড়ে ফুটে আছে অজস্র ফুল। তাদের নামও বেশ মজার, বাটারকাপ, ইন্ডিয়ান পেইন্ট ব্রাশ, লেডিজ শ্লিপার, কুইন অ্যানিজ লেস, মারিপোসা লিলি, নিউ ইংল্যান্ড অ্যাস্টর। তাদের কতরকম রং।

একদিন এরকম একটা পথ দিয়ে গাড়িতে যেতে-যেতে আমাকে নদীর ধারের একটা জায়গা আঙুল তুলে দেখিয়ে একজন বলেছিলেন, ওই গাছতলায় আমার এক বান্ধবীর বিয়ে হল কিছুদিন আগে।

আমি জিগ্যেস করলুম, গাছতলায় বিয়ে?

তিনি বললেন, হ্যাঁ। খুব চমৎকার বিয়ে। পাত্র আর পাত্রী ছাড়া আরও আমরা দশ-বারোজন এসেছিলুম সকালবেলা। নদীর ধারে গাছের ছায়ায় বসে প্রথমে ছেলেটি আর মেয়েটি পরস্পরকে উদ্দেশ্য করে একটা করে কবিতা পড়ল। তারপর বরযাত্রী আর কন্যাযাত্রীদের প্রত্যেককেই পড়তে হল নিজেদের পছন্দমতো একটা করে কবিতা। ব্যস, হয়ে গেল বিয়ে।

আমি আকুল, সতৃষ্ণ নয়নে অনেকক্ষণ সেই ছোট্ট নদীর ধারে ছায়াময় জায়গাটির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলুম অনেকক্ষণ।

সেই রকমই একটা নিরিবিলি ছিমছাম, সুশ্রী জায়গার নাম স্কারস্‌ডেল। এখানে থাকেন ডঃ অম্বুজ মুখোপাধ্যায় এবং স্নিগ্ধা মুখোপাধ্যায়। অম্বুজ মুখোপাধ্যায় ভারতের বাইরে এসেছিলেন প্রথম যৌবনে, এখন তিনি প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে গেছেন। তিনি অধ্যাপক এবং শান্ত ধরনের মানুষ, চাকরির সময়টুকু ছাড়া বাকি সময়টুকু বাড়িতে বসে শুধু বই পড়েন। কতরকম বই আর পত্রপত্রিকা, তার মধ্যে 'দেশ' এবং অনেক বাংলা বইও আছে। স্নিগ্ধা দেবী তাঁর জীবনের যেক'টা বছর স্বদেশে কাটিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বছর কেটে গেল বিদেশে। কিন্তু কলকাতার বনেদি বাড়ির মহিলাদের মুখে যে একটা বিশেষ ছাপ থাকে, সে ছাপ তাঁর মুখে এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। রূপও ফেটে পড়ছে এখনও।

এঁদের দুই ছেলেমেয়ে হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। স্নিগ্ধা দেবীও সকালবেলা কয়েক ঘণ্টার জন্য একটা চাকরি করতে যান, ফিরে এসে শিল্পীর মতন যত্ন করে নানারকম রান্নাবাড়া করেন। শুধু নিজেদের জন্য নয়, এঁদের বাড়িতে প্রায়ই অতিথি আসে। এঁরা দু-তিন বছর অন্তর নিয়ম করে একবার দেশে যান।

এইসব বাড়িতে এলে মনে হয়, আমেরিকা আসলে খুব একটা কিছু দূরের দেশ নয়। এক সময় বাঙালিবাবুরা পশ্চিমে চাকরি করতে যেত, পশ্চিম মানে লাহোর, দেরাদুন, মীরাট এই ধরনের জায়গা। তখন সেই সব জায়গাই ছিল বহু দূরে। দু-তিন বছর অন্তর তাঁরাও বাংলাদেশে আসতেন ছুটি নিয়ে, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। সঙ্গে আনতেন প্রচুর রোমাঞ্চকর গল্প, মেওয়া-খোবানি জাতীয় নতুন ধরনের খাদ্য আর স্থানীয় রংচঙে পোশাক।

এখন মস্কো-নিউইয়র্ক-টরোন্টো হয়েছে সেই লাহোর, দেরাদুন, মীরাট।

অম্বুজবাবু ও স্নিগ্ধা দেবীকে পূর্ব উপকূলের বাঙালিরা প্রায় সকলেই চেনে। শুধু বাঙালি

কেন, অনেক ভারতীয়রাও, কারণ প্রধানত এঁদেরই উদ্যোগে স্থাপিত হয়েছে 'টেগোর সোসাইটি'। এই টেগোর সোসাইটির নানান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বাঙালি-অবাঙালি অনেকেই।

উত্তমকুমার এসে উঠেছিলেন এই বাড়িতে। তা ছাড়া হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা সেন, সুবিনয় রায় প্রমুখ আরও সব অনেক নামকরা মানুষ এবাড়িতে এসে থেকেছেন কিংবা অনুষ্ঠান করে গেছেন। কী একটা সূত্রে যেন সুনীলদা আর স্বাতীদি এখানে অতিথি। সেইজন্য আমারও নেমন্তন্ন হল।

সেইখানে খেলুম ইলিশ মাছ। ইলিশের মতন ইলিশ বটে। কলকাতার বাজারে মাঝে মাঝে এক রকম ইলিশ পাওয়া যায়, তাকে বলে খোকা ইলিশ। সেই অনুযায়ী ওই ইলিশকে বলা যায় মহারাজ ইলিশ। এক একটির ওজন আট-দশ পাউন্ড, চেহারাও অপূর্ব। এই মাছের স্থানীয় নাম শ্যাড্। কিন্তু ইলিশ বলে চিনতে আমাদের কোনও অসুবিধেই হওয়ার কথা নয়। স্বাদ-গন্ধ সবই ঠিকঠাক। নিমন্ত্রিতরা সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলেন। কিন্তু আমার মতন কাঠ-বাঙাল অত চট করে ইলিশকে সার্টিফিকেট দিতে পারে না। স্নিগ্ধা দেবীর রান্না অতি চমৎকার, আর সবই ঠিকঠাক আছে, কিন্তু মাছটা কেমন যেন একটু তুলতুলে ধরনের। পেটির মাছে সেই তৈলাক্ত তেজি ভাবটা যেন নেই।

এই বাড়িতেই আলাপ হল দুজনের সঙ্গে। একটি মেয়ের নাম প্রীতি, সে আমাদের যাদবপুরের চন্দন সেনগুপ্ত নামে এক সুদর্শন ও মেধাবী যুবকের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ। চন্দনকে বেশি দেখা যায় না, সে খুবই লাজুক, তা ছাড়া নিজের কাজকর্মে খুব ব্যস্ত, সারাদিন অফিস করবার পর সন্ধের সময় সে আবার এক স্কুলে পিয়ানো শিখতে যায়। প্রীতি আগে একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে কাজ করত, এখন ছেড়ে দিয়েছে, তাই তার হাতে এখন অনেক সময়। প্রীতি আমাদের বন্ধু, 'দার্শনিক ও পথপ্রদর্শিকা' হয়ে পরে অনেক দ্রষ্টব্য স্থান নিয়ে গেছে।

প্রীতি মেয়েটি গুজরাটি। চন্দনের সঙ্গে নিউইয়র্কেই তার পরিচয়। কলকাতায় না এসেই সে তার স্বামীর ভাষা বাংলা পড়তে, লিখতে এবং বলতে শিখে নিয়েছে। আমি অবশ্য আগেও অনেক জায়গায় দেখেছি যে গুজরাটি নারীপুরুষরা অনেকেই বেশ চট করে বাংলা শিখে নিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। বোম্বাইতে নলিনী মাড়গাঁওকর নামে একজন কবি এবং অধ্যাপিকা বাংলা বলতে পারেন তো খুব ভালোই, লেখেনও চমৎকার। এই নলিনী গুজরাটের মেয়ে, এঁর স্বামী বলবন্ত্ মহারাষ্ট্রীয়। এই বলবন্ত্-এর কৃতিত্ব আরও বেশি। ইনি কখনও একটানা কলকাতায় থাকেননি, শান্তিনিকেতন একবার দেখতে গিয়েছেন মাত্র, তবে নিজের শখে ইনি রবীন্দ্রসঙ্গীত এতই ভালো শিখেছেন যে বোম্বাইতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্লাস নেন। বলাই বাহুল্য এঁর ক্লাসের অনেক ছাত্রছাত্রীই বাঙালি। নতুন গান শেখাবার আগে বলবন্ত যখন ছাত্রছাত্রীদের সেই গানটা লিখে নেওয়ার জন্য ডিকটেট করেন, তখন মুশকিল হয় এই যে, অনেক বাঙালি ছাত্রছাত্রীই বাংলা অক্ষর লিখতে পারে না। তারা বলে, স্যার, গানের কথাগুলো আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে লিখিয়ে দিন।

প্রীতি বাংলা শিখেছে নিছক নিজের শখে, কেন-না সে ইচ্ছে করলেই তার স্বামীর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে দিতে পারত। তা ছাড়া সে কবিতা ভালোবাসে, গান ভালোবাসে, ছবি ভালোবাসে। সে কখনও শাড়ি পরে, কখনও স্কার্ট, কখনও বা গুজরাটি বা রাজস্থানি পোশাক, কিন্তু কখনও তার পোশাক বেশি জমকালো নয়, বরং তাতে সূক্ষ্ম রুচি মিশে থাকে।

সবচেয়ে আশ্চর্য হল তার ভ্রমণের নেশা। প্রীতি এক সময় ট্র্যাভেল এজেন্সিতে কাজ করত, তখন কম দামে কিংবা বিনা দামে টিকিট পাওয়ার সুযোগ ছিল। এখন সে সুযোগ নেই, তবু তার সেই নেশা রয়ে গেছে। আমরা ভারতবর্ষে বসে ভাবি টোকিও, পিকিং বা কায়রো কত দূরে। কিন্তু নিউ ইয়র্কে এলে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই খুব কাছে। এখানকার ছেলেমেয়েদের মুখে প্রায়ই শোনা যায়, এই তো গত মাসে চিনে গিয়েছিলুম, পরশুই আবার ভিয়েনা যেতে হবে, সেখান থেকে ফিরেই আবার ভেনেজুয়েলায়...। প্রীতি বেড়াতে যায় বিনা উদ্দেশ্যে। তার স্বামীকে যখন অফিসের কাজে

কোথাও যেতে হয়, তখন একা একা নিউ ইয়র্কে থাকতে ভালো লাগে না প্রীতির, সে-ও বেরিয়ে পড়ে পৃথিবীর পথে। ইজিপ্ট কিংবা মেক্সিকো কিংবা চিনে সে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে একলা ঘুরে আসে। তবে এত দেশ ঘুরেও প্রীতি দারুণ ভালোবাসে নিউ ইয়র্ক শহরটিকে। এরকম প্রাণবন্ত শহর নাকি আর একটাও নেই। এ বিষয়ে আমি ঠিক মতামত দিতে পারি না, কেন না আমি আর এ পৃথিবীর কতটুকু দেখেছি।

আমাদের সঙ্গে ডাউন টাউন বেড়াতে এসে ট্রেন থেকে নেমেই প্রীতি একটা বড় গোল বোতাম কিনে নেয়, তাতে লেখা, 'আই লাভ নিউ ইয়র্ক'।

আর একজনের নাম কামাল। তার পুরো নাম মুস্তাফা কামাল ওয়াহিদ, কিন্তু সবাই তাকে কামাল বলেই চেনে, এমনকী তাকে শুধু 'কে' বলে ডাকলেই নাকি চলে। কামাল হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ, যার সঙ্গে যে-কারুর মাত্র পাঁচ মিনিট আলাপেই ভাব জমে যায়।

প্রথম আলাপে সাধারণত আমরা সৌজন্যবশত নমস্কার বলে চুপ করে থাকি। এর পর কে কথা শুরু করবে, তাই নিয়ে খানিকক্ষণ দ্বিধা চলে। কিন্তু কামাল ওই সব অযথা আদবকায়দার ধার ধারে না, প্রথম আলাপের সঙ্গে-সঙ্গেই সে আগ্রহী হয়ে পড়ে, সেই মানুষটির কাজকর্ম বিষয়ে জানতে চায়, এবং বিদেশে তার কোনও রকম সাহায্যের দরকার আছে কি না, তাই নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে। পরোপকার করাটা যেন তার ডাল-ভাত খাওয়ার মতন জীবনযাপনের একটা অতি স্বাভাবিক অঙ্গ।

কামাল চাকুরিজীবী নয়, সে ব্যাবসা করে। সে কীসের ব্যাবসা করে জিগ্যেস করলেই টপ্ করে উত্তর দেবে, আলপিন টু এলিফ্যান্ট যেকোনও কিছুর! এর সরল অর্থ হল, ভারতীয় উপমহাদেশের যেসব জিনিসের চাহিদা আছে আমেরিকায়, সেগুলো সে আনিয়ে বিক্রির ব্যবস্থা করে। যেমন চটের থলে, হ্যান্ডব্যাগ, পাথরের মূর্তি ইত্যাদি। কিন্তু কামালের সঙ্গে কয়েকদিন মেশার পর আমি বুঝতে পেরেছিলুম, খাঁটি ব্যবসায়ী হওয়া ওর দ্বারা কোনওদিন বোধহয় সম্ভব হবে না। কারণ ওর কোনও টাকার লোভই নেই। কিছু একটা করতে হবে, এই জন্য ও এক-একদিন এক-একটা কাজের নেশায় ছোটে। কাজটা আসল নয়, ওই ছোটাতেই ওর আনন্দ। কামাল কোনও নেশা-ভাঙ করে না, পোশাক-পরিচ্ছদের প্রতি মনোযোগ নেই, খায়ও অতি সামান্য। মাঝে-মাঝে সে তার ভবিষ্যৎ কোনও ব্যাবসা থেকে লাখ-লাখ কিংবা কোটি-কোটি টাকা লাভের রঙিন স্বপ্ন শোনায়। একদিন আমি জিগ্যেস করেছিলুম, অত টাকা পেলেই বা তুমি তা নিয়ে কী করবে, কামাল? একটু থমকে গিয়ে ও উত্তর দিল, কাজে লেগে যাবে, অনেকের কাজে লেগে যাবে।

লম্বা, সুগঠিত চেহারা কামালের বয়স বছর পঁয়তিরিশেক হবে। আমি তার নাম দিয়েছি গেছোবাবা। কামালও একজন গ্লোব ট্রটার বা বিশ্ব পথিক। আজ নিউ ইয়র্ক, কাল কলকাতা, পরশু ঢাকা, তারপর কাঠমান্ডু, তারপর লন্ডন, তারপর টরেন্টো, তারপর আবার কলকাতা...এইরকম চলে তার বছরে তিন-চারবার। কিন্তু কামাল ঠিক ভ্রমণকারী নয়, সে নতুন দেশ বা প্রকৃতি দেখবার জন্য ঘোরে না। কিংবা এতবার ঘোরাঘুরিতে ওর ওসব আগেই দেখা হয়ে গেছে বলে এখন আর ওসব দিকে তাকায় না। সে ঘুরে বেড়ায় তার স্বপ্নের ব্যাবসার অছিলায়। কোনও একদিন সে এক কোটি টাকা লাভ করবে, যে টাকাটা, 'অনেকের কাজে লাগবে'।

যে সন্ধেবেলা কামালের সঙ্গে আলাপ, সেদিনই সে ওয়াশিংটন ডি সি থেকে একটানা গাড়ি চালিয়ে এসেছে স্কারসডেলে। আধ ঘণ্টাখানেক গল্প করবার পরই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বলল, একটা জরুরি কাজের কথা মনে পড়েছে, এক্ষুনি ঘুরে আসছি। চলে গেল চল্লিশ মাইল দূরে। ফিরে আসার পর আমাদের আলোচনায় একটু উঁকি দিয়েই কামাল বুঝল যে আমাদের সিগারেট ফুরিয়ে গেছে, এখানে কোথায় সিগারেট পাওয়া যায়, সেই কথা ভাবছি অমনি আবার বেরিয়ে গেল কামাল, সেই রাত্রে কোথা থেকে যেন নিয়ে এল এক পাহাড় সিগারেট! আমি লক্ষ করলুম, সে পাঁচ মিনিটও

এক জায়গায় চুপ করে বসে কথা বলতে পারে না।

খাওয়াদাওয়ার পর সবে আমরা জমিয়ে গল্প করবার জন্য বসেছি, কামাল আবার দপাস করে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, চলি! সকলের প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল যে সে সেই রাত্রেই বস্টন চলে যাবে। সবাই অবাক। স্নিগ্ধা দেবী কামালের রাত্রিবাসের জন্য বিছানার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন পর্যন্ত। কিন্তু কামাল বলল, শুধু-শুধু রাত্তিরটা নষ্ট করে কী লাভ! ভোরের মধ্যে বস্টন পৌঁছে গেলে কাল সকাল থেকেই আবার কাজ করা যাবে।

সত্যি-সত্যি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল কামাল। সারা রাতের যাত্রা। দু-একজন আশঙ্কা প্রকাশ করল, একলা গাড়ি চালাতে-চালাতে ঘুমিয়ে পড়বে না তো। স্নিগ্ধা দেবী বললেন, না, ওর এরকম অভ্যেস আছে। আমারও মনে হল, ঘুমোবে না, চোখ চেয়ে-চেয়েই ও সেই অলীক রঙিন স্বপ্নটা দেখতে-দেখতে রাত্রির অন্ধকার পার হয়ে যাবে।

॥ ৩০ ॥

প্রথম দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে মা আর মেয়ে এসে ঢুকছে একটা সদ্য ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটে। মেয়ের বয়েস সতেরো, রোগা আর লম্বা; মায়ের বয়েস চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে। সবে মোটা হতে শুরু করেছে শরীর, অসভ্য ধরনের রঙিন মুখখানা দেখলেই তার পেশা মোটামুটি অনুমান করা যায়। আগেকার ফ্ল্যাটের ভাড়া ফাঁকি দিয়ে তারা এই নতুন জায়গায় এসেছে। জিনিসপত্র গোছাবার আগেই মা ক্লান্ত হয়ে হুইস্কি খেতে শুরু করে, হুইস্কি এবং মায়ের প্রতি মেয়ের একই রকম ঘৃণা। এদের কথাবার্তা শুনে মনে হয় এরা খুব ঘনিষ্ঠ ধরনের শত্রু, পরস্পরের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসার তিলমাত্র অস্তিত্ব নেই। বাড়িটি ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টারে এক অতি গরিব পাড়ায়, কাছাকাছি রয়েছে কবরখানা, কসাইখানা আর কারখানার চিমনি অনবরত ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। ঘরটিও অতি অস্বাস্থ্যকর ও অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে। যার তুলনা দেওয়া হয়েছে, 'ব্ল্যাক হোল অফ ক্যালকাটা'র সঙ্গে।

একটু পরেই এক চোখে ঠুলি লাগানো জলদস্যুর মতন চেহারার একজন লম্বা লোক এসে হাজির হয়। সে আধা মাতাল ও মায়ের প্রাক্তন প্রেমিক। মা অবাক হয় তার এই প্রেমিককে দেখে। এত তাড়াতাড়ি সে কী করে তার নতুন ঠিকানা খুঁজে বার করল। আর লোকটি অবাক হল মেয়েকে দেখে, কারণ তার প্রেমিকার যে অত বড় মেয়ে আছে তা সে জানত না। মায়ের নাম হেলেন, মেয়ের নাম জো এবং এই লোকটির নাম পিটার।

পিটার বেশ একটা ফুর্তির মুডে আছে, হেলেনকে নিয়ে সে বেরুতে চায় কিংবা জোকে ঘরের বার করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিতে চায়। জো প্রথম দর্শনেই পিটারকে অপছন্দ করেছে এবং সে কিছুতেই ঘরের বাইরে যাবে না। তাদের ওই একখানাই ঘর। হেলেনেরও আজ ওসবের প্রতি উৎসাহ নেই, এমনকী পুরুষ ও যৌন খেলা সে একেবারেই ছেড়ে দেবে বলে ভাবছে। পিটার তখন তাকে একটি ম্যাজিক শব্দ শোনায়, সে হেলেনকে বিয়ে করতে চায়। মা-মেয়ে কেউই প্রথমে একথা বিশ্বাস করে না। জো তার মায়ের সমস্ত দোষের তালিকা দেয় পিটারকে। পিটার তা শুনে হাসে। হেলেনও বলে, তুমি আমায় বিয়ে করবে কী, জানো আমি প্রায় তোমার মায়ের বয়েসি। তাতে পিটার সগর্বে জানায় যে মা-মা ধরনের মহিলাদের কাছ থেকে সে সবচেয়ে বেশি যৌন আনন্দ পায়! পিটারের পকেটে এক গাদা খুচরো টাকা ও অনেক মেয়েমানুষের ছবি। পিটার অবশ্য জলদস্যু নয়, পেশায় সে গাড়ির সেলসম্যান।

পরের দৃশ্যে আমরা মা ও মেয়ের কথা শুনে জানতে পারি যে হেলেনের একবার বিয়ে হয়েছিল, তার স্বামী তাকে ডিভোর্স করেছে অনেক বছর আগেই। জো অবশ্য তার সেই স্বামীর

সন্তান নয়। তাদের গ্রামের একটি আধপাগলা লোকের সঙ্গে মাত্র পাঁচ মিনিটের ভুলে জো-র জন্ম। তবে, হেলেনের জীবনে সেটাই প্রথমবার। সেই হিসেবে জো পবিত্রতার সন্তান। জো ভাবে, তা বলে কি সেও পাগল হয়ে যাবে? জো-র খাতায় হেলেন আবিষ্কার করে অনেকগুলো চারকোলে আঁকা ছবি, মেয়ের যে আঁকার এত ভালো হাত মা তা এই প্রথম জানল। মেয়েকে কোনও আর্ট স্কুলে ট্রেনিং নেওয়ার কথা সে বলে, কিন্তু মেয়ে রাজি নয়। কারণ মা তো তার পড়াশুনোর ব্যাপারে কোনও দিন মনোযোগ দেয়নি। তাতে মা নির্লজ্জভাবে জানায় যে সে নিজের প্রতি মনোযোগ দিয়েই আর অন্য কিছুর জন্য সময় পায়নি।

জো স্কুল থেকে ফেরার পথে একটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলের সঙ্গে ভাব করে। ছেলেটি ভালো গান করে এবং নৌবিভাগে কাজ করে। ছেলেটি ওদের বাড়িতে ঢোকে না কিন্তু জো-কে কোনও নির্জন জায়গায় নিয়ে যেতে চায়। জো বলে, জানি, তুমি আমার কাছে কী চাও। আমি তা দিতে পারি, কারণ তোমাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে। ছেলেটি বলল, তুমি যা ভাবছ, আমি ঠিক তা-ই চাই, সেইসঙ্গে তোমাকে বিয়ে করতেও চাই। এনগেজমেন্ট রিং-ও সে আগেই কিনে রেখেছে। আংটিটা জো-র আঙুলে একটু ঢলঢলে হয়। সে সেটা একটা সুতোয় বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে রাখে।

এর মধ্যে পিটার এসে আবার উপস্থিত হয়। হেলেনকে বিয়ে করার ব্যাপারে সে এখনও সিরিয়াস। হেলেনকে নিয়ে সে বাইরে ফুর্তি করতে যেতে চায়। হেলেন যতক্ষণ সাজপোশাকে ব্যস্ত তখন জো-র সঙ্গে পিটারের কথা কাটাকাটির খেলা চলে। হেলেন এই অবস্থায় মেয়েকে সহ্য করতে পারে না। সে এখন হনিমুনে যাওয়ার আনন্দে মশগুল, মেয়েকে একলা এখানে রেখে যাওয়ার ব্যাপারে ক্ষণিক মাত্র চিন্তা করে, মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় কি না একবার ভাবে। হনিমুনে এতবড় মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব শোনামাত্র বাতিল করে দেয় পিটার। হেলেন ও পিটার জো-কে ফেলে রেখেই চলে যায়। তারপর আসে জো-র কৃষ্ণাঙ্গ প্রেমিকটি। সে মনভাঙা জো-কে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার পাশে শুয়ে পড়ে।

পরের দৃশ্যে দেখা গেল জো গর্ভবতী, তার কৃষ্ণাঙ্গ নাবিক প্রেমিকটি তাকে পরিত্যাগ করে সুদূর সমুদ্র যাত্রায় চলে গেছে। জিওফ নামে একটি আর্ট স্কুলের ছাত্র জো-র সঙ্গে থাকে। জিওফ একটু মেয়েলি ধরনের, তার মেয়েদের সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ নেই, সে কেক বানাতে পারে, ঘর পরিষ্কার করতে জানে, সে জো-র সেবা করে। এরকমভাবে এক সঙ্গে থাকতে-থাকতে ওদের মধ্যে একধরনের ভালোবাসা জন্মে যায়। জিওফ গর্ভবতী অবস্থাতেই জো-কে বিয়ে করে তার সন্তানের একটা পরিচয় দিতে চায়, জো এই দয়া নিতে রাজি হয় না। এমনকী সেই কৃষ্ণাঙ্গ ছেলেটির খোঁজখবর করতেও তার সম্মানে বাধে। সেই ছেলেটির প্রতি তার কোন রাগ নেই, সে যে সুন্দর গান গাইত সেই কথাই তার মনে পড়ে।

জো-র যখন খুব অ্যাডভান্সড অবস্থা, সেই সময় এসে হাজির হয় তার মা হেলেন। বলা বাহুল্য, ফুর্তি শেষের পর পিটার তাকে পরিত্যাগ করেছে। সে জন্য অবশ্য হেলেনের আপসোস নেই, সে আগের মতোই চপলমতি, সে বারবার বলে, ইট ওয়াজ গুড হোয়াইল ইট লাস্টেড। মেয়ের বাচ্চা হওয়ার সময় সে মা হিসেবে সত্যিকারের দায়িত্ব নিয়ে সাহায্য করবার আশ্বাস দেয়। তার আগে বাক্যবাণের জ্বালায় সে জিওফ-কে তাড়িয়ে দেয়, কারণ এরকম অ-পুরুষ পুরুষের সান্নিধ্য তার সহ্য হয় না। হেলেন তার ভবিষ্যৎ নাতি বা নাতনির জন্য অনেক খেলনাটেলনা কিনে আনে, কিন্তু যখন শোনে তার মেয়ের প্রেমিক ছিল কৃষ্ণাঙ্গ এবং বাচ্চাটার রং-ও কালো হতে পারে, তখন সে বিতৃষ্ণায় আবার মেয়েকে ছেড়ে চলে যায়।

নিঃসঙ্গ গর্ভবতী কুমারী জো খালি ঘরের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে একটি ছেলে-ভুলোনো ছড়া বলতে থাকে আস্তে-আস্তে।

এই হল 'আ টেস্ট অফ হানি' নাটকের কাহিনি। শেলাগ ডেলানি নামে একটি উনিশ বছরের

ব্রিটিশ চাকুরে-মেয়ে এই নাটকটি রচনা করেছিল। এক সময় স্ট্রাটফোর্ডের থিয়েটার রয়ালে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছিল। ইংল্যান্ডের অ্যাংরি ইয়ংম্যানদের পর শেলাগ ডেলানিকে বলা হয়েছে রাগি যুবতি। এখন নাটকটি চলছে ব্রডওয়ের সেঞ্চুরি থিয়েটারে। পাঁচটি মাত্রা চরিত্রের একটি পরীক্ষামূলক নাটক, তাও প্রচুর দর্শক টানে। নাটকটির কাহিনি আমি বিস্তৃতভাবে লিখলুম একটি আধুনিক নাটকের পরিপূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য। আমাদের কাছে এর বিষয়বস্তু খুবই ডিকাডেন্ট মনে হবে। এখানে যেন জীবনের সমস্ত মূল্যবোধই মূল্যহীন। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার, আমাদের দেশে যেমন গরিবদুঃখীদের নিয়ে প্রগতিশীল নাট্যরচিত হয়, সেই রকম এই নাটকের পাত্রপাত্রীও পশ্চিমি সমাজের একেবারে নীচের তলার গরিবদুঃখী। প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখযোগ্য যে এই নাটকে দৃশ্যত কোনওরকম অশ্লীলতা এমনকী সামান্য যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ দৃশ্যও নেই। দু-ঘণ্টার নাটকটি টানটান হয়ে জমে যায় শুধু এর তীক্ষ্ণ সংলাপের জন্য।

লংএকার থিয়েটারে চলছে মার্কমেডফ্-এর লেখা একটি অদ্ভুত নাটক 'চিলড্রেন অফ এ লেসার গড'। নির্বাক ছায়াছবির মতন এটাও যেন নির্বাক নাটক। এই নাটকটি গড়ে উঠেছে মূকবধিরদের জন্য এক শিক্ষাকেন্দ্রের এক ছাত্রী ও তার শিক্ষককে নিয়ে। শিক্ষকটি কথা বলতে পারে। কিন্তু সে তার ওই ছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে হাতের আঙুলের ভাষায়। আমরা দর্শকরা কেউ ওই আঙুল-ভাষা বুঝি না। তবু আস্তে-আস্তে জমে ওঠে নাট্য কৌতূহল। আমরা বোবাদের জগতকে অপূর্ণ, অসমাপ্ত, অক্ষম বলে মনে করি, কিন্তু ক্রমে-ক্রমে নাট্যকার দেখিয়ে দেন যে বোবাদের চোখে এই তথাকথিত সুস্থ জগতেও কত অপূর্ণতা, কত ব্যর্থতা।

আশ্চর্য, এই রকম নাটকও দর্শক টানে। পশ্চিমি দেশগুলিতে নাটক দেখা একটা উচ্চস্তরের সামাজিক কাজ। যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত ও রুচিবান বলে মনে করেন, তারা নিয়ম করে নাটক দেখতে যান। নাটক দেখার দিনে তাঁরা বেশ যত্ন নিয়ে সাজগোজ করেন, এতে নাকি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রতি বিশেষ সম্মান জানানো হয়। এই জন্যই অনেক সিনেমা হল খালি থাকে কিন্তু যেকোনও ভালো নাটকের টিকিট পাওয়াই মুশকিল। নাটকের টিকিটের দামও সাংঘাতিক, খুব কম করেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ ডলার, অর্থাৎ আমাদের টাকার হিসেবে প্রায় তিনশো-সাড়ে তিনশো টাকা। ওদের টাকার হিসেবেও যদি ধরি, তা হলেও তিরিশ-পঁয়তিরিশ টাকা দিয়ে কজন আমাদের দেশে থিয়েটার দেখতে যাবে?

নাটকের টিকিট কিছু সস্তায় পাওয়ারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্রডওয়ে পাড়ার মাঝখানে একটা ছোট পার্কে একটা টিকিট কাউন্টার আছে। ও পাড়ার সব থিয়েটারেরই কিছু টিকিট বিক্রি হয় ওইখান থেকে, দাম অর্ধেক বা তিন চতুর্থাংশ। ভোরবেলা থেকে সেখানে লম্বা লাইন পড়ে। সংঘমিত্রা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গেছে নিউইয়র্কে। নক্শাল আন্দোলনের সময় কলকাতার অনেক বাবা-মা চেষ্টাচরিত্র করে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বিলেত-আমেরিকায়। সংঘমিত্রা সেই রকমই একজন। কিছুদিন লন্ডনে পড়াশুনো করে তারপর বেশ কিছুদিন নিউ ইয়র্কে আছে। নাটক ও চলচ্চিত্র বিষয়ে তার খুব আগ্রহ। এই সংঘমিত্রাই আমাদের ওই সস্তায় টিকিট কাটার জায়গাটির সন্ধান দেয় এবং আমাদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে সে নাটক নির্বাচনেও সাহায্য করে।

টিকিটের দাম বিষয়ে একটি চমকপ্রদ সংবাদ এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। চার্লস ডিকেন্সের নিকোলাস নিক্লবি উপন্যাসটির নাট্যরূপ দিয়ে একটি ব্রিটিশ দল অভিনয় করছে ব্রডওয়েতে। নাটকটি চলবে টানা সাড়ে আট ঘণ্টা এবং এর টিকিটের দাম একশো ডলার অর্থাৎ ন'শো কুড়ি টাকা। সাড়ে আট ঘন্টা নাটক দেখার সুযোগ আর জীবনে ঘটবে না বলে বুক ঠুকে গিয়েছিলাম টিকিট কিনতে। কাউন্টারে গিয়ে শুনলুম আগামী দেড় মাস হাউস ফুল। এক মাস দশ দিন পরের একটা শো-র দুখানা টিকিট পাওয়া যেতে পারে বটে, তাও পার্শিয়াল ভিউ, অর্থাৎ কোনও থামের আড়ালে বসে দেখতে হবে। নমস্কার ঠুকে চলে এলুম সেখান থেকে।

সবাই জানে, আমেরিকানরা সদা ব্যস্ত জাতি। অথচ তারা সাড়ে আট ঘন্টার নাটকও ধৈর্য ধরে দেখতে জানে!

এই 'নিকোলাস নিক্লবি'ই কিন্তু ব্রডওয়ের দীর্ঘতম নাটক নয়। সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে আলোচনায় দেখলুম, কয়েক বছর আগে আর একটা নাটক হয়ে গেছে, যার নাম 'দা লাইফ অ্যান্ড ডেথ্ অফ জোসেফ স্ট্যালিন', সেটির দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে বারো ঘন্টা। তার টিকিটের দাম কত ছিল কে জানে।

নিউ ইয়র্কের নাট্য আন্দোলন নানা ভাগে বিভক্ত। ব্রডওয়েতে দেখানো হয়, তথাকথিত কমার্শিয়াল নাটক। এ ছাড়া আছে অফ্-ব্রডওয়ে, অফ-অফ্ ব্রডওয়ে। যেখানে চলে নানা রকম পরীক্ষা। অফ্-ব্রডওয়ের একটি সাড়া জাগানো নাটকের নাম সত্যাগ্রহ। নাটকটি ইংরেজিতে হলেও এর গানগুলি সব সংস্কৃত ভাষায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে অর্জুনের দ্বিধা ও গীতার জন্ম, দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধিজির সত্যাগ্রহ আন্দোলন, মার্টিন লুথার কিং-এর অহিংস প্রতিরোধ ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছে নাটকটি। টিকিট সংগ্রহের ঝঞ্ঝাটে নাটকটি শেষ পর্যন্ত আমার দেখা হয়ে উঠল না। তবে যামিনীদার মুখে শুনেছি এর সঙ্গীতের প্রয়োগ নাকি অপূর্ব।

ব্রডওয়ের পেশাদারি দলের নাটকগুলি দর্শক টানে জমজমাট অভিনয় দিয়ে এবং প্রোডাকশনের চাকচিক্যে। নাটকগুলির বিষয়বস্তুও বিচিত্র ধরনের। যেমন একটি নাটকের নাম 'টেকসাসের শ্রেষ্ঠ ছোট্ট বেশ্যালয়', আবার আর একটি নাটকের নাম 'ইভিটা'। এর মধ্যে প্রথমটি দেখার সুযোগ আমার হয়নি, দ্বিতীয়টি দেখেছি। তার বিষয়বস্তুই অভিনব। ইভাপেরন-এর নায়িকা, যিনি নিজেও পরে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রপতি হয়েছিলেন। সামান্য নীচু অবস্থায় থেকে এক মহিলার উত্থানের কাহিনিই এর উপজীব্য, এর মধ্যে এসেছে দক্ষিণ আমেরিকার সেই দেশটির জন জাগরণ ও বিপ্লব-উত্থান। সেগুলি মাঝে-মাঝে দেখানো হয়েছে টুকরো-টুকরো চলচ্চিত্রে, অনেকটা ডকুমেন্টরির কায়দায়। নাটকটি দেখতে-দেখতে মনে হয়েছিল, এই যদি পেশাদারি নাটক হয়, তা হলে আমাদের দেশের শৌখিন নাটক অনেক পিছনে পড়ে আছে।

থিয়েটার হলগুলি তাদের প্রাচীনত্ব যথাযথ বজায় রাখবার খুব চেষ্টা করে। আধুনিক সিনেমা হলগুলিতে অনেক রকম কায়দা, কিন্তু থিয়েটার হল যেন এখনও পঞ্চাশ বা একশো বছর পুরোনো অবস্থায় রয়ে গেছে। এরা সহজে ঐতিহ্য বদলাতে চায় না। তবে এই ধরনের প্রাচীন চেহারার মঞ্চ ও অডিটোরিয়মেও ইনফ্রারেড লিসনিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে, যার জন্য মঞ্চে মাইক্রোফোন ঝুলতে দেখা যায় না, আর যেকোনও জায়গায় বসলেই কুশীলবদের কণ্ঠস্বর একই রকম শুনতে পাওয়া যায়।

ব্রডওয়ের আসল কৃতিত্ব তার মিউজিক্যালস্‌গুলিতে। এমন সুচারু ও দক্ষ মিউজিক্যালস আর কোনও দেশে দেখা যায় না। আমি আর যেসব নাটক দেখেছি, তার মধ্যে এরকম একটি মিউজিক্যালের কথা বলি। নাটকটির নাম 'কোরাস লাইন' অসম্ভব জনপ্রিয় এবং অনেকগুলি পুরস্কার পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু খুব সামান্য। একটি নাটকের কোরাস নাচ-গানের দৃশ্যের জন্য কয়েকজন নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী নেওয়া হবে। এর জন্য দরখাস্ত পড়েছে অসংখ্য, তার মধ্যে থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছেলে মেয়েকে ডেকে ইন্টারভিউ নেওয়া হচ্ছে। এইটুকুই গল্প। কত সামান্য এই চাকরি, তার জন্যই দেশের দূরদুরান্ত থেকে এসেছে যুবক-যুবতিরা, কেউ-কেউ অসাধারণ রূপসি ও রূপবান, কেউ এসেছে বাড়ি থেকে পালিয়ে, কেউ এসেছে খুবই গরিব ঘর থেকে, কেউ-কেউ এসেছে ভবিষ্যতে নায়ক বা নায়িকা হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে, কেউ এসেছে অসুখী সংসার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এসেছে একটি জাপানি মেয়ে, দু-তিনটি কৃষ্ণাঙ্গ ছেলে-মেয়ে। পঞ্চাশ জনের মধ্যে নেওয়া হবে মাত্র চার-পাঁচ জনকে, কে-কে হবে সেই সৌভাগ্যবান ও সৌভাগ্যবতী তা নিয়ে উৎকণ্ঠা থেকে যায় আগাগোড়া, পরীক্ষকের কাছে কেউ-কেউ আপ্রাণভাবে নেচে কুদে গেয়ে তাদের প্রতিভা প্রমাণের

চেষ্টা করে, কেউ হঠাৎ নার্ভাস হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ফুটে ওঠে তাদের জীবনের রেখাচিত্র। সমস্ত সংলাপই গানে। নাটকটি দেখতে-দেখতে ধন্য-ধন্য করতে হয় এর পরিচালককে, যিনি এতগুলি নামহীন চরিত্রের প্রত্যেকেই জীবন্ত করে তুলতে পেরেছেন।

এই প্রসঙ্গ শেষ করার আগে আর একটি খবর দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ইংরাজিতে যাঁদের বলে 'ফিল্‌ম বাফ্‌' আর বাংলায় বলে 'সিনেমা আঁতেল' তাঁরা নিশ্চয়ই ক্লদেৎ কোলবার্টের নাম শুনেছেন। নির্বাক চলচ্চিত্র যুগে তিনি ছিলেন খুব নাম করা নায়িকা। সবাক যুগেও কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করে তিনি হারিয়ে যান। ক্লদেৎ কোলবার্ট বেঁচে আছেন কি না তা-ই জানে না এখন অনেকে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন। ইনি মঞ্চেও প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী ছিলেন, ব্রডওয়েতে প্রথম মঞ্চ নাটকে নায়িকা হন ১৯২৭ সালে। তাহলেই ভাবুন, এর এখন কত বয়স হতে পারে। সেই ক্লদেৎ কোলবার্ট এতদিন বাদে 'আ ট্যালেন্ট ফর মার্ডার' নাটকে নেমে অভিনয়ের জোরে হইহই ফেলে দিয়েছেন। প্রতিদিন সে নাটক হাউস ফুল। এই রকমই আর একজন লরিন বাক্‌কল ছিলেন আগেকার দিনের নায়িকা, ক্যাসাব্লাঙ্কা ছবিতে অপূর্ব অভিনয় করেছিলেন, ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন হামফ্রি বোগার্টের স্ত্রী। সেই হামফ্রি বোগার্ট কবে মারা গেছেন, সেই সব সিনেমার যুগও কবে শেষ হয়ে গেছে, তবু নতুনভাবে মঞ্চে নেমে লরিন বাক্‌কল এখন জনপ্রিয় নায়িকা। অনুমান করুন তো, আমাদের চন্দ্রাবতী দেবী বা কানন দেবী কোন নাটকের নায়িকা হয়েছেন, আর সেই নাটক দেখার জন্য কলকাতার লোক রোজ ছুটে যাচ্ছে।

॥ ৩১ ॥

এক জনের নাম শক্তি, অন্য জনের নাম ধ্রুব। এঁরা দুজনে বেশ বন্ধু, কিন্তু সম্প্রতি একটা ব্যাপারে দুজনে রয়েছেন দুই বিপরীত মেরুতে। শক্তি অনেকদিন 'ফরেন'-এ কাটাবার পর এক সময় ভাবলেন, যথেষ্ট হয়েছে। কলকাতার টানে, বাড়ির লোকজনের টানে, এবং হয়তো দেশের টানে তিনি একদিন আমেরিকা ছেড়ে ফিরে গেলেন কলকাতায়। চাকরি পেতেও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু একবছর থাকবার পর ফিরে এসেছেন। নিউ ইয়র্কের বাঙালি মহলে এখন শক্তিই প্রধান আলোচ্য বিষয়। একজন আরেকজনের সঙ্গে দেখা হলেই বলে ওঠে, জানো, শক্তি ফিরে এসেছে? এর অবধারিত উত্তরটি শোনা যায়, জানতুম, আসতেই হবে।

নিউ ইয়র্ক শহরের উপকণ্ঠেই নিউ জার্সি। সেখানকার বাঙালিদের একটি ক্লাব আছে। সেই ক্লাবের কয়েকজন সদস্য এক সন্ধেবেলা আমাকে ডেকেছিলেন আড্ডা মারার জন্য। নিউ জার্সিতে অনেক বাঙালি। একজনের বাড়িতে কাঁচা লঙ্কা ফুরিয়ে গেলে প্রতিবেশী বাঙালির বাড়ি থেকে চেয়ে আনা যায়। সেই আড্ডাতেই দেখা হল শক্তি ও ধ্রুবর সঙ্গে। শক্তিকে নিয়েই আলোচনা চলল অনেকক্ষণ। আমি একবার জিগ্যেস করলুম, থাকতে পারলেন না? কী অসুবিধে হল? শক্তি একটু লাজুক হেসে বললেন, নাঃ। কিছুতেই পারা গেল না। ট্রাম-বাসের ভিড়, মশা, লোডশেডিং এসবও আমি গ্রাহ্য করিনি, কিন্তু অফিসের পরিবেশটাই এমন যে টেকা যায় না।

আমেরিকায় চাকরি করার যোগ্যতা হিসেবে সরকারের কাছ থেকে গ্রিন কার্ড পাওয়া যায়। সেই গ্রিন কার্ড যারা পেয়েছে, তারা এক বছর দু-বছর অনুপস্থিত থাকলেও ফিরে এসে আবার চাকরি পেতে পারে। তাই শক্তির কোনও অসুবিধে হবে না এখানে।

পাশেই বসে আছেন ধ্রুব। তাঁর সুঠাম, বলিষ্ঠ চেহারা। চিবুকে দৃঢ়তার ছাপ আছে। ধ্রুব এখানে ভালো চাকরি করেন, বেশ সচ্ছল অবস্থা, তবু তিনি হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যেসব ছেড়েছুড়ে তিনি দেশে ফিরে যাবেন। তাঁর পরিচিত বন্ধুবান্ধবরা শুধু যে অবাক হয়েছে তাই-ই নয়, সবাই

শক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে বলছে, এতেও তোমার শিক্ষা হল না? তুমিও সেই একই ভুল করবে? কেউ বা ঠাট্টা করে বলে, যাক না, গোঁয়ারের মতন যেতে চাইছে যাক। জানি তো বছর ঘুরতে-না-ঘুরতেই আবার দৌড়ে ফিরে আসবে।

ধ্রুব কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অবহেলার সঙ্গে বললেন, আমায় ওসব কথা বলে কোনও লাভ নেই। আমি অনেক ভেবে চিন্তেই যাচ্ছি। গ্রিন কার্ড ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে যাব। আমি বুড়ো বয়েসে একা-একা সেন্ট্রাল পার্কে ঘুরে বেড়াব না!

আমার দিকে ফিরে ধ্রুব জিগ্যেস করলেন, আপনি বলুন তো, আমি দেশে গিয়ে থাকতে পারব না?

আমি আমতা-আমতা করলুম। এই সব সিদ্ধান্ত এমনই ব্যক্তিগত যে অন্যের পরামর্শ কোনও কাজে লাগে না।

আড্ডা হচ্ছিল যাঁর বাড়িতে, তাঁর নাম ভবানী মুখার্জি, বেশ সুপুরুষ ও সুরসিক যুবা। এই ভবানীর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়ল যে ওঁর দাদা নারায়ণ মুখার্জি আমার অনেকদিনের চেনা। নারায়ণকে আমরা কলকাতায় ফরাসিভাষাবিদ বলে জানি। ওঁদের ছোট ভাই, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গায়ক পিনাকী মুখার্জির কথাও অনেক শুনেছি। একবার এইরকম চেনাশুনো বেরিয়ে পড়লেই কথাবার্তা অনেক সহজ হয়ে যায়।

ভবানীর স্ত্রীর নাম আলোলিকা, এঁর রূপ ও ব্যবহারের মধ্যে বেশ একটা সঙ্গতি আছে। খুবই সুশ্রী ও কোমল। ইনি একজন লেখিকা এবং এখানকার বাচ্চাদের নিয়ে নাচ-গান ও নাটক করান। এঁদের বাড়ির পরিবেশটি চমৎকার। এসেছেন আরও কয়েকজন।

রাত্রি বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডা বেশ জমতে লাগল। তবে প্রায়ই ঘুরে-ঘুরে প্রসঙ্গ উঠতে লাগল শক্তি আর ধ্রুবের প্রত্যাবর্তন ও প্রস্থানের ব্যাপারটা। শক্তির মুখে খানিকটা লজ্জিত অস্বস্তির ভাব আর ধ্রুব-র মুখে জেদ।

উত্তমকুমারের মার্কিন দেশ সফর নিয়ে অনেক মজার মজার গল্প বলছিলেন ভবানী। এঁদের সকলের কথা থেকেই একটা জিনিস ফুটে উঠছিল যে উত্তমকুমারের ভদ্র ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হয়েছেন। কোনও চিত্রতারকার কাছ থেকে এরকম ব্যবহার যেন আশা করা যায় না।

কথায়-কথায় ভবানী আমায় জিগ্যেস করলেন যে, উত্তমকুমার তো এখান থেকে নায়েগ্রা ফল্‌স দেখতে গিয়েছিলেন, আপনি যাবেন না?

আমি বললুম, নায়েগ্রা বোধহয় এমনিতে এমন কিছু দ্রষ্টব্য স্থান নয়। তবে উত্তমকুমার যখন দেখেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমারও দেখা উচিত।

ভবানী সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, তা হলে আমার বোন ওখানে থাকে, আপনি ওখানেই উঠবেন।

আলোলিকা বললেন, আমি এক্ষুনি টুনুকে ফোন করে দিচ্ছি।

আমি বললুম, না, না, এক্ষুনি দরকার নেই। কবে যাব, তার ঠিক নেই।

—আপনি কবে কোথায় যাবেন, এখনও কিছু প্ল্যান করেননি?

আমি বললুম, ওই একটা জিনিসই করা হয়ে ওঠেনি।

এবারে ধ্রুব জিগ্যেস করলেন, আপনি কাল কী করছেন?

আমি বললাম, জানি না তো।

ধ্রুব বললেন, আমার কোম্পানি আমাকে নতুন গাড়ি দিয়েছে। আমার তেলের খরচ লাগে না। কাল আমার কোনও কাজ নেই। আপনি কাল যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চান, নিয়ে যেতে পারি।

আমি বললুম, এ যে আকাশ থেকে একটা হিরের টুকরো খসে পড়ার মতন প্রস্তাব। কিন্তু কোথায় যাওয়া হবে?

—আপনি আটলান্টিক সিটিতে গেছেন কখনও?

—আমি আটলান্টিক সিটির নামই শুনিনি। সেখানে কী আছে?

—চলুন, ভালো লাগবে?

তক্ষুনি প্রোগ্রাম হয়ে গেল। অনেকেই বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী। কিন্তু সপ্তাহের মাঝখানে কাজের দিন বলে অনেকেরই অসুবিধে। ভবানী যেতে পারবেন না, তাঁর অফিসের কাজ আছে। কিন্তু আলোলিকার খুব আগ্রহ।

কে যেন একজন বললেন, ধ্রুবর সঙ্গে যাচ্ছেন, খুব সাবধান। ও কিন্তু গাড়ির ড্যাসবোর্ডে রিভলবার রাখে।

ধ্রুব বললেন, এখনও রাখিনি, তবে রাখবার ইচ্ছে আছে। আমায় এদেশে কেউ অপমান করলে আমি তাকে ছাড়ব না।

সে রাত্রে বাড়িতে ফিরে মনটা খুব ভালো হয়ে গেল। নায়েগ্রা যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না। অথচ একটা ব্যবস্থা হয়ে গেল কত সহজে। সদ্য পরিচিত একজন গাড়িতে আটলান্টিক সিটি নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিল। একেই আমাদের ভাষায় বলে পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল। সাহেবরা পূর্ব জন্ম মানে না, তবু তারাও এরকম কোনও ব্যাপার বিশ্বাস করে। সাউন্ড অফ মিউজিকে জুলি অ্যান্ড্রুজ একটা গান গেয়েছিল, আমার অল্প বয়েসে নিশ্চয়ই আমি কোনও ভালো কাজ করেছিলুম, এখন তার ফল পেলুম।

পরের দিন আমাদের গাড়িতে যাত্রী সংখ্যা একটু বেড়ে গেল। অম্বুজ মুখার্জির বাড়িতে প্রীতি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সে যেতে চায়। এবং তার সঙ্গে ছোট্টিমা নামে তার এক বান্ধবী। এই ছোট্টিমা বাঙালি মেয়ে, মুখচোরা স্বভাবের। এবং আলোলিকা তো আছেনই।

মহিলারা বসলেন পেছনে আমি আর ধ্রুব সামনে। ধ্রুবর পুরো নাম ধ্রুব কুণ্ডু। তার ব্যবহারে বেশ একটা বনেদিয়ানা আছে, কথার মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের সুর। যাওয়ার পথে একটা গ্যাস স্টেশনে ঢুকে সে বলল ট্যাঙ্ক ভরতি করে দিতে। কী একটা কারণে অ্যাটেনড্যান্ট একটু দেরি করছিল, ধ্রুব গাড়ি থেকে নেমে তাঁকে প্রচণ্ড এক ধমক লাগালেন। বাঙালি হয়েও তাঁর এত সাহস যে সাহেবদের দেশে তিনি সাহেব জাতিকে এমন ধমক দিতে পারেন। ধ্রুব এদেশে আছেন পুরো ডাঁটের সঙ্গে, তিনি এদেশ ছেড়ে যাচ্ছেন স্বেচ্ছায়।

এক সময় ধ্রুব আমাকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, আমার তো এদেশে কোনও কিছুরই অভাব নেই, তবু আমি দেশে ফিরে যেতে চাই কেন বলুন তো?

আমি বললুম, অনেকের কাছে বন্ধুবান্ধব, কলকাতার নিজস্ব আড্ডার টানই বেশি মনে হয় বোধহয়—

—ঠিক তা-ও নয়, আমার অনেক বন্ধুবান্ধব এদেশে। ইন ফ্যাক্ট আমাদের ব্যাচের অনেক ছেলেই এদেশে চলে এসেছে। এদেশে আড্ডা দেওয়ারও কোনও অসুবিধে নেই।

—তা হলে কেন যাচ্ছেন। আপনিই বলুন।

—যাচ্ছি, আমার যেতে ইচ্ছে করছে বলে। আমি জানি, আর বেশিদিন থাকলে, ফেরা যাবে না। এখানে শেকড় গজিয়ে যাবে।

নিউ ইয়র্ক শহর থেকে আটলান্টিক সিটি শ' দেড়েক মাইল দূর। প্রশস্ত, নতুন রাস্তা। আড়াই ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে গেলুম। শহরে ঢুকবার মুখেই বাতাসে পেলুম সামুদ্রিক গন্ধ। শহরটি একেবারে সমুদ্রের ওপরেই। আগে এখানে ছোটখাটো শহর ছিল, এখন সেটিকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। এখানে তৈরি হচ্ছে বিরাট একটি জুয়া খেলা ও প্রমোদ কেন্দ্র।

আমেরিকার পশ্চিম দিকে লাস্ ভেগাস জুয়া ও ফুর্তির জন্য জগৎবিখ্যাত। পূর্বদিকে সে রকম কিছু ছিল না। সেই অভাব পূরণ করার জন্যই গড়ে তোলা হচ্ছে আটলান্টিক সিটিকে। এখন

সব বাড়িগুলো সম্পূর্ণ হয়নি। তবে যা হয়েছে তা-ই এলাহি জগঝম্প ব্যাপার। এক-একটা হলের মধ্যে অন্তত দু-তিন হাজার লোক এক সঙ্গে বসে জুয়া খেলতে পারে। শুধু একতলায় নয়। অনবরত এসকেলেটর চলছে, তা দিয়ে ওপরে উঠে গেলে দোতলা তিনতলাতেও প্রায় একই ব্যাপার। এরকম পরপর অনেকগুলো বাড়ি। জুয়া খেলার পদ্ধতিও আছে নানারকম, মেশিন-জুয়া, ব্ল্যাক-জ্যাক, রুলেৎ, ডাইস, তাস। শনি-রবিবারেই এখানে ভিড় বেশি হয়। আমরা এসেছি সপ্তাহের মাঝখানে, তাও লোক কম নয়। তবে অধিকাংশই বুড়ো-বুড়ি, এবং বুড়ির সংখ্যাই বেশি। জুয়াড়ি বুড়ি মানেই পাগলিনীর মতন চেহারা। এক সঙ্গে হাজার-হাজার উন্মাদিনী দেখাও একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা।

আমরা তো খেলতে আসিনি, আমরা দেখতে এসেছি। দেখার জিনিসও অনেক আছে। রয়েছে নীল জল বিধৌত চমৎকার বেলাভূমি, অনেক নাচ-গানের আসর। উপহার দ্রব্যের অনেক দোকান।

নিছক লঘু কৌতুকেই আমি বললুম, একবার একটু চেষ্টা করে দেখিই না।

নতুন খেলুড়েদের পক্ষে মেশিনই প্রশস্ত। অনেক রকম মেশিন আছে, কোনওটায় পাঁচ পয়সা ফেলতে হয়, কোনওটায় দশ পয়সা, কোনওটাতে সিকি, কোনওটাতে টাকা। আমি একটা খালি মতন মেশিন দেখে তাতে একটা কোয়ার্টার অর্থাৎ সিকি ফেললুম। তারপর একটা অলৌকিক কাণ্ড হল। মেশিনটায় ঝকঝকাং শব্দ হতে-হতে অনবরত পয়সা পড়তে লাগল নীচে। পড়ছে-তো-পড়ছেই। মেশিনটা খারাপ হয়ে গেল নাকি। পয়সার একটা স্তূপ জমে যাওয়ার পর মেশিনটা থামল।

ধ্রুব বললেন, আপনি একশোটা পেয়েছেন।

একটা সিকির বদলে একশো? এ যে সাংঘাতিক ব্যাপার। চার আনা দিয়ে পঁচিশ টাকা। সেই স্তূপ থেকে একটা সিকি তুলে নিয়ে আমি ফেললুম পাশের মেশিনটায়।

আবার সেই একই ব্যাপার। ঝকাং-ঝকাং শব্দ ও পয়সা বর্ষণ। আবার একশো সিকি।

আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করছে।

আলোলিকা বললেন, বিগিনার্স লাক। আপনি আর খেলবেন না।

কথাটা আমার মোটেই পছন্দ হল না। মেশিনের কি চোখ আছে না মন আছে যে বুঝতে পারবে আমি নতুন খেলতে এসেছি? আজ আমার ভাগ্য ফেরাবার দিন।

কিন্তু এত খুচরো পয়সা নেবো কী করে? কোটের পকেটেও তো রাখা যাবে না।

মাঝে-মাঝে এক-এক জায়গায় শক্ত কাগজের গেলাস রাখা আছে। সেখান থেকে একটা গেলাস এনে ধ্রুব আমাকে বললেন, পয়সাগুলো এতে ভরে নিন। কাছেই কাউন্টার আছে, আপনি খুচরো বদলে টাকা করে আনতে পারেন।

কিন্তু ততক্ষণে আর একটা মেশিনের দিকে আমার চোখ পড়ে গেছে। তাতে লেখা পাঁচটা সিকি এক সঙ্গে দিলে পাঁচ হাজার পাওয়া যাবে।

গেলাসটা নিয়ে গিয়ে সেই মেশিনে পাঁচটা সিকি ফেলে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলুম। মেশিনটা নিঃশব্দে রইল। বেমালুম হজম করে ফেলল। আবার ফেললুম পাঁচটা, আবার সেই একই ব্যাপার। তা হলে আমার পাঁচ হাজারের জন্য আর লোভ করা উচিত নয়।

তার পাশের মেশিনটাতেই অন্য প্রলোভন। এখানে এক ডলার ফেললে পাঁচ হাজার ডলার পর্যন্ত আসবে। এ তো সুবর্ণসুযোগ। একবার পাঁচ হাজার ডলার পেলেই আমার অনেক সমস্যা মিটে যায়। আরও কত জায়গায় নিশ্চিন্তে বেড়াতে পারব।

সিকিগুলো সব বদলে টাকা করে নিয়ে এলুম।

এই ডলার মেশিনটাও টপটপ টাকা খেয়ে ফেলে। কোনও শব্দ করে না। আমি মনে-মনে হিসেব করলুম, যদি পঞ্চাশ ডলার ফেলেও পাঁচ হাজার ডলার পাই, তাতেও তো আমার দারুণ লাভ। পঞ্চাশ বারের মধ্যে আমার ভাগ্য ফিরবে না? তার মধ্যে মেশিনের একবার না একবার দয়া হবে নিশ্চয়ই।

পঞ্চাশ ডলার ফেলতে আমার পনেরো মিনিটও লাগল না। এ মেশিন মহা পেটুক। কিছু বার করে না। আমার সঙ্গের মহিলারা আমায় অনবরত বারণ করে চলেছেন। আমি কর্ণপাত করছি না। পাঁচ হাজার ডলারের দাম যে আমার মতন বেকারের কাছে কতখানি তা ওরা কী বুঝবে!

এই সময় এক বৃদ্ধ আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললেন, ওহে ছোকরা, এক মেশিনে বেশিক্ষণ খেললে লাক নষ্ট হয়ে যায়। মেশিন পালটে-পালটে খেলতে হয়।

সেই শুনে আমি যেই সেখান থেকে সরে গেলুম, অমনি সেখানে সেই বৃদ্ধটি ডলার ফেলতে লাগল। তিনবার ফেলার পরই মেশিন শুরু করল ঝকাং-ঝকাং আওয়াজ ও ডলার বৃষ্টি। আমি হাঁ। আর তিনবার ফেললে ওই টাকা তো আমারই ভাগ্যে ছিল।

পাঁচ হাজার নয় অবশ্য, সেই বৃদ্ধ পেল পাঁচশো ডলার। কাঁটাটা কোথায় যায় তার ওপর নির্ভর করে কত টাকা পড়বে। পাঁচশো টাকা কুড়িয়ে নিতে-নিতে বৃদ্ধটি আমার দিকে চেয়ে একখানা দুষ্টুমির হাসি হাসল।

আমার তখন মাথায় রক্ত চড়ে গেছে। আমি খেলতে লাগলুম একটা ছেড়ে আর একটা মেশিনে। তারপর রুলেৎ খেলায়। তারপর তাসের বাজিতে। আমার পকেটে নিজের যা ছিল তাও নিঃশেষ। আমি মেয়েদের কাছে ধার দেওয়ার জন্য ঝুলোঝুলি করতে লাগলুম।

ওরা না, না করতে লাগল সমস্বরে। প্রীতি বলল, কত সুন্দর-সুন্দর মেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আপনি তাদের পর্যন্ত দেখছেন না। এত খেলার নেশা?

আমি রক্তচক্ষে বললুম, টাকা দেবে কিনা বলো!

ধ্রুব কিছুই না বলে মুচকি-মুচকি হাসছেন আর মাঝে-মাঝে নিজেও খেলে যাচ্ছেন এখানে সেখানে। ধ্রুবর ঠিক করাই আছে ঠিক পঁচিশ ডলার খেলবেন, তাতে হার জিৎ যাই হোক।

শেষ পর্যন্ত মেয়েরা আমাকে প্রায় জোর করেই টেনে নিয়ে এলেন বাইরে।

প্রীতি আমাকে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী হয়েছিল আপনার?

শূন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে আমি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললুম, আমি সত্যিই পাগল হয়ে গিয়েছিলুম, তাই না।

॥ ৩২ ॥

শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে, এর মধ্যে দুদিন তুষারপাত হয়ে গেল। পাতলা কোটে আর চলছে না, এবার আমার একটা ওভারকোট দরকার।

বঙ্গসন্তানের পক্ষে ওভারকোট একটা অত্যুক্তি বিশেষ। কিংবা অবাস্তব জিনিসও বলা যায়। দু-মাস, ছ'মাসের জন্য কলকাতা থেকে যারা পশ্চিম গোলার্ধে বেড়াতে যায়, তারা সাধারণত চেনাশুনো, বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে ধার নিয়ে আসে। আমার সে সুযোগ ঘটেনি। খুব একটা চেষ্টাও করিনি, কারণ আমি এদেশে এসেছি ঘোর গ্রীষ্মে, কলকাতা থেকে ওভারকোট নিয়ে এলে সারা গ্রীষ্ম ও শরৎকাল আমাকে অকারণে সেই বোঝা বইতে হত।

সুতরাং আমাকে একটা ওভারকোট কিনতে হবে।

একটা ভদ্রগোছের গরম কাপড়ের ওভারকোটের দাম অন্তত আড়াইশো ডলার। এ ছাড়া সিনথেটিক জিনিসের হাওয়া বন্ধ-করা, শীত জব্দ-করা একরকমের জ্যাকেট পাওয়া যায় কিছু সস্তায়। সেগুলোতেও কাজ চলে বটে, কিন্তু কাউ বয়, মোটর রেসিং-এর চাম্পিয়ন কিংবা ব্যাঙ্ক-ডাকাতদের মতন যাদের চেহারা তাদের গায়েই ওই জিনিস মানায়। আমি ওই রকম জ্যাকেট পরলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই হাসব।

অতএব আমি একটা ওভারকোট কিনে ফেললুম। সেটা দেখতে বেশ জমকালো ও প্রথাসম্মত। প্রথম-প্রথম অনেকেই দেখে বলত, এই ওভারকোটটা নতুন কিনলে বুঝি? বাঃ, বেশ সুন্দর দেখতে তো। কাপড়টাও বেশ ভালো। যথেষ্ট গরম হয়, তাই না?

আমি যদি বলতুম, নিউ ইয়র্ক তথা আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ দোকান (কেউ-কেউ বলে সারা পৃথিবীরও) মেসি থেকে তিনশো ছিয়াত্তর ডলার দিয়ে এটা কিনেছি, তা হলে বোধহয় কেউ অবিশ্বাস করত না এখানে। কিন্তু কলকাতায় আমার বন্ধুবান্ধবরা ঠিক ধরে ফেলত। তারা ভুরু তুলে বলত, এঃ। তুই দু-পয়সার খদ্দের, তুই কিনেছিস পৌনে চারশো ডলার দিয়ে ওভারকোট। বললেই হল।

আসলে, আমি ওই চমৎকার ওভারকোটটা কিনেছি মাত্র দশ ডলার দিয়ে। কী করে অত সস্তার পেলুম, সে রহস্য আমি একটু পরেই খুলে বলছি।

এ দেশে দোকানের নাম নিয়ে চাল মারার খুব রেওয়াজ আছে। কারুর বাড়িতে নতুন কোনও জিনিস দেখলেই সেটা কোন দোকান থেকে কেনা সেটাও শুনিয়ে দেবে। অর্থাৎ কোনও বিখ্যাত দোকান। জিনিসের দামও দোকান অনুযায়ী বদলায়। প্রায় একই জিনিস কোনও সাধারণ দোকানে যা দাম, বিখ্যাত দোকানে দাম তার দ্বিগুণ। মেয়েরা এইসব বিখ্যাত দোকানগুলোর দাম খুব মুখস্থ রাখে। আবার বেশ সস্তারও দোকান আছে যেমন কে-মার্ট। এই কে-মার্ট দোকান এদেশের প্রায় প্রত্যেক শহরেই একটা করে আছে। এইসব দোকানে জুতোর ফিতে থেকে টিভি রেফ্রিজারেটার সবই পাওয়া যায়। দাম এমনিতেই সস্তা তারপর প্রায়ই লেগে থাকে 'সেল'। 'সেল'-এর সময় জিনিসের দাম অর্ধেকও কমে যায়। সেই জন্যই হিসেবি গৃহিণীরা প্রায়ই সন্ধের দিকে একবার কে-মার্ট ঘুরে যায়। কোন দিন কোন জিনিসের 'সেল' দিচ্ছে দেখবার জন্য। ক্যালিফোর্নিয়ার মোহিতেশ ব্যানার্জি বলেছিলেন, 'কে-মার্ট হল বাঙালি মেয়েদের নাইট ক্লাব।'

আমি কিন্তু আমার ওভারকোটটা কে-মার্ট থেকেও কিনিনি। কারণ কে-মার্টেও সস্তার একটা সীমা আছে, সেখানে তিনশো ডলারের জিনিস দেড়শো ডলারে দিতে পারে বড় জোর, দশ ডলারে তো দেবে না।

আরও এক রকমের দোকান আছে, যেগুলোর নাম বাজেট স্টোর, নেক্স্ট টু নিউ, সেকেন্ডস, র‍্যাগ-স্টক এই ধরনের। এই সব দোকানে ছাত্র ছাত্রীরাই বেশি যায়, আর মধ্যবিত্তরা সেখানে যায় লুকিয়ে, ঘোর দুপুরবেলা, যখন অন্য কেউ দেখবে না। আর ভারতীয়রা তো অতি মাত্রায় হিপোক্রিট, তারা মরলেও স্বীকার করবে না যে কেউ কোনওদিন ওই সব দোকান থেকে জিনিস কিনেছে। সেই হিসেবে আমিই বোধহয় প্রথম ভারতীয় যে ওই রকম দোকানের ক্রেতা হল। সোজা বাংলায় ওগুলো হল সেকেন্ড হ্যান্ড জিনিসের দোকান।

সেরকম একটি বাজেট স্টোরে ঢুকে আমার তো চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম। কতরকমের জিনিস, আর দাম কি অবিশ্বাস্য সস্তা। একটা সিল্কের সার্টের দাম দু-ডলার, একটা লিভাইজ জিনস্-এর দাম তিন ডলার, পাঁচ ডলারে একটা জ্যাকেট। দশ ডলারের একটা বইয়ের দাম এক সিকি, একজোড়া বরফের জুতোর দাম দেড় টাকা। ইচ্ছে হয় সব কিছু কিনে নিই।

সব জিনিসই যে ব্যবহৃত তা নয়। কিছু-কিছু জিনিস নতুনও আছে। যেসব পোশাকের ফ্যাশান বদলে গেছে, অনেক বড় দোকান সেই সব পোশাক লট ধরে জলের দরে বিক্রি করে দেয়। যেমন ধরা যাক, হাত কাটা, সামনে-খোলা সোয়েটার, এর আর ফ্যাশান নেই ইদানীং, বড়-বড় রাস্তার নাম করা সব দোকানে মাথা খুঁড়লেও সেরকম সোয়েটার খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাজেট স্টোরে সেই রকম সোয়েটার সারি-সারি ঝুলছে।

অনেক পরিবার তাদের বাড়ির অব্যবহৃত জিনিসপত্র স্যালভেশান আর্মিকে দান করে দেয়। যেমন, কোনও মহিলার স্বামী তাকে ছেড়ে শহরের অন্য প্রান্তে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে বসবাস করছে কিংবা কোনও ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গিয়ে সিনেমার অভিনেত্রী হয়েছে, এই সব

প্রাক্তন স্বামী বা স্ত্রীর জামাকাপড় এরা জমিয়ে রাখে না বেশি দিন, বিক্রিও করে না, দান করে দেয় কোনও সেবা প্রতিষ্ঠানকে। এরা যখন গৃহত্যাগ করে, তখন সব জিনিসপত্র নিয়ে যায় না, শুধু গয়নাগাটি আর দু-একটা জরুরি পোশাক একটা ছোট সুটকেসে ভরে বেরিয়ে যায়। সেবা প্রতিষ্ঠানগুলি সেইসব বিনা পয়সায় পাওয়া জিনিসগুলো এই সব দোকান মারফৎ বিক্রি করে। স্বাস্থ্য ব্যাপারে খুঁতখুঁতে বলে আগে এরা ভালোভাবে সব কিছু জীবাণুমুক্ত করে নেয়। ঘনঘন ফ্যাশান বদলাবার কারণে বাতিল জামা কাপড়ের সংখ্যা এত বেশি, তাই দামও এরকম সস্তা।

অপরের ব্যবহৃত রুমাল বা অন্তর্বাস ব্যবহার করা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অন্যের ব্যবহার করা ওভারকোট গায়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার কোনও শুচিবাই নেই। আমেরিকার একজন বিখ্যাত কবি একবার আমার ব্যবহৃত টুথব্রাশ দিয়ে দিব্যি অবলীলাক্রমে দাঁত মেজেছিলেন। এটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। কিন্তু সেই কবি বলেছিলেন, ভালো করে ধুয়ে নিলে সব কিছুই নাকি ব্যবহারযোগ্য হয়।

আমাকে বাজেট স্টোরে চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উরুগুয়ের এক লেখক বন্ধু। তার নাম পেপে। পেপে অতি সুসজ্জিত ও সুপুরুষ। সে একগাদা জামা-প্যান্ট-কোট কিনে ফেলল। তিনটে বেশ বড় বোঁচকা হয়ে গেল। আমি পেপে-কে জিগ্যেস করলুম, তুমি এত পোশাক নিয়ে কী করবে? পেপে বলল, আমার স্বভাব কি জানো, পরি আর না পরি, আমার ওয়ার্ডরোবে অনেক জামাকাপড় ঝুলিয়ে রাখতে খুব ভালো লাগে।

আমি অবশ্য ওভারকোট ছাড়া অন্য জিনিসপত্রে আর লোভ করলুম না, কারণ অনেক ঘোরাঘুরি করতে হবে, বেশি জিনিসপত্র বইবার ঝামেলা নিতে চাই না।

ওভারকোটটা পরে একটু ঘোরাঘুরি করতেই নিজেকে বেশ সাহেব-সাহেব মনে হল। ওভারকোটের পকেটে দু-হাত ঢুকিয়ে দিলে হাঁটার স্টাইলই পালটে যায়। আমার এই ওভারকোটটায় প্রায় সাত-আটটা পকেট। প্রথম দিন ভালোভাবে দেখিনি, দ্বিতীয় দিনে সবকটি পকেটে তদন্ত করতে আমি পেয়ে গেলুম কিছু খুচরো পয়সা, কয়েকটা কাগজ আর দুটো লাল-পাথরের দুল। এই দুল জোড়া হাতে নিয়ে আমি বিমূঢ় হয়ে গেলুম। ওভারকোটটা যে-কোনও পুরুষের তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সেই কোটের পকেটে মেয়েলি দুল কেন? এ যে রহস্য-কাহিনির মতন।

দুল দুটো সোনালি হলেও সোনার নয়, পাথর দুটোও দামি মনে হয় না, এগুলোকে এদেশে বলে কস্টিউম জুয়েলারি। রহস্য কাহিনি বানাবার প্রতিভা আমার নেই, কিন্তু দুল দুটো নিয়ে আমি বেশ চিন্তায় পড়ে গেলুম। আমার কোটের ভূতপূর্ব মালিক কীরকম লোক ছিল? সে ডাকাত নিশ্চয়ই না, তার পকেটে এত সস্তার দুল কেন? তা হলে কি সে ছিল খুব প্রেমিক ধরনের? কিংবা খুনি?

টিউব ট্রেনে যেতে-যেতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলুম। হঠাৎ ভাবলুম, কোথায় যাচ্ছি? এ যে আমার গন্তব্যের উলটোদিক। পরের স্টেশনেই নেমে ওপরে উঠে দেখলুম ফিফ্‌থ অ্যাভিনিউ আর ফিফটি নাইন্‌থ স্ট্রিটের মুখে এসেছি। এ-পাড়ায় তো আমার কোনও দরকার নেই, এখানে এলুম কেন? এ তো বড়লোকের পাড়া। ওভারকোটের ভূতপূর্ব মালিক কি এ পাড়াতেই থাকত?

সেন্ট্রাল পার্কের গা ঘেঁষে হাঁটতে লাগলুম ধীর পায়ে। মিহিন তুষারপাতে হচ্ছে, তার ওপর জুতোর দাগ ফেলতে বেশ লাগে। ওভারকোটের সঙ্গে একটা টুপিও দিয়েছে, সেটা পরে নিলুম মাথায়। এখন মনে হচ্ছে সিগারেটের বদলে একটা পাইপ ধরাতে পারলে বেশ হত।

হাঁটতে-হাঁটতে চলে এলুম প্লাজা হোটেলের কাছে। এই হোটেলের সামনে যতবারই এসেছি, একটা অভিনব দৃশ্যের দিকে চোখ আটকে যায়। লাইন করে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকটি ফিটন। যে দেশে এখন মোটরগাড়িতে-মোটরগাড়িতে ধূল পরিমাণ, সেখানে এখনও কয়েকটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি টিকিয়ে রাখার চেষ্টা সত্যি বেশ মজার।

আমি একবার ভাবলুম, প্লাজা হোটেলে ঢুকে একটু চা-টা খেয়ে তারপর একটা ফিটন গাড়ি ভাড়া করে সেন্ট্রাল পার্কে এক চক্কর ঘুরে এলে কেমন হয়?

পরক্ষণেই ভাবলুম, আমার কি মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি সাহারার জমিদার যে প্লাজা হোটেলে চা খাওয়ার শখ হয়েছে? ভেতরে ঢুকলেই কুচ করে গলা কেটে নেবে। আর ফিটন গাড়ির ভাড়া ট্যাক্সি ভাড়ার প্রায় কুড়ি গুণ বেশি। এদেশে এসে আমি ট্যাক্সি চড়ারই সাহস পাই না। হঠাৎ আমার মাথায় এরকম উটকো খেয়াল আসছে কেন?

ছেলেবেলায় 'ওভারকোট' নামে কার যেন একটা গল্প পড়েছিলুম, খুব সম্ভবত নিকোলাই গোগোল-এর। আমারও কি সেই রকম কিছু হল নাকি? ওভারকোটের আগেকার মালিকের ভূত ভর করছে আমার ওপর? নইলে এরকম বড়লোকি হুজুগ মনে আসছে কেন? দশ টাকা দিয়ে ওভারকোট কিনে শেষ পর্যন্ত কি আমি সর্বস্বান্ত হব, না জেলে যাব?

ঝাঁ করে একটা বাসে চেপে চলে এলুম গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল স্টেশনের কাছে। এখান থেকে আবার অন্য ট্রেন ধরতে হবে। কিন্তু বেশ খিদে পেয়েছে, একটা কিছু না খেলে চলে না। স্টেশনের সামনেই ঠ্যালাগাড়িতে নানারকম মুখরোচক খাবার বিক্রি করে। মাইওনেজ সহযোগে কয়েকটি চিংড়ি মাছের বড়া ও এক কাপ কফি খেলুম। এক ডলার ষাট সেন্ট দিতে হবে। দুটি ডলারের নোট বাড়িয়ে দিতে দোকানের মালিকানি জিগ্যেস করল, তুমি খুচরো দিতে পারো?

আমি বললুম, হ্যাঁ, পারি।

বলেই হাত ঢুকিয়ে দিলুম ওভারকোটের চার নম্বর পকেটে। খুচরোগুলো তুলে আনবার পরই আমি একটা বিষম খেলুম।

তখন মনে পড়ল, এই পয়সাগুলো আমার নয়। ওভারকোটের আগের মালিকের। এ পয়সা কি আমার নেওয়া উচিত? আগের মালিক কি এরকম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ঠ্যালাগাড়ির দোকানের খাবার খাওয়া অনুমোদন করত? আমি কি ওভারকোটটার অপমান করছি?

ধুত, এসব কুসংস্কারের কোনও মানে হয় না ভেবে সে-দোকানের দাম চুকিয়ে দিয়ে চলে এলুম। কিন্তু মনের মধ্যে খচখচ করতে লাগল। খুচরো পয়সাগুলো বোধহয় আমার ফেরত দেওয়া উচিত। লাল পাথরের দুল জোড়া নিয়েই বা আমি কী করব? কিন্তু এসব ফেরত দেবই বা কাকে? পকেটে যে কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলো অতি সাধারণ, কয়েকটা হোটেলের চেক অর্থাৎ বিল।

জিনিসগুলো একমাত্র ফেরত দেওয়া যায় যে-দোকান থেকে আমি কোটটি কিনেছি, সে-দোকানের মালিককে। আমি শুধু কোটটাই কিনেছি, তার সঙ্গে এক জোড়া দুল আর কিছু খুচরো পয়সা তো ফাউ হিসেবে আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু এইটথ স্ট্রিটের সেই দোকানে আবার যেতে আসতেই আমার যা খরচ পড়বে, তাতে কোটটির দাম বেশ বেড়ে যাবে। তা ছাড়া এই সামান্য জিনিস ফেরত দিতে গেলে দোকানের মালিক যদি আমার প্রতি একটা হুংকার দেয়? তিনশো ডলারের ওভারকোট মাত্র দশ ডলারে যারা বিক্রি করে, তারা সামান্য কিছু খুচরো আর দুটো ঝুটো পাথরের দুল ফেরত নিতে রীতিমতন অপমানিত বোধ করতে পারেন।

কলকাতা হলে কোনও সমস্যাই ছিল না। কোনও ভিখিরিকে দিয়ে দিতুম পয়সাগুলো, আর রাস্তায় যেসব ছেলেমেয়েরা শুয়ে থাকে, তাদের মাথার কাছে দুল দুটো ফেলে দিয়ে বিবেকের দায় থেকে মুক্ত হতে পারতুম। কিন্তু ওদের খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

বেজার মুখ করে স্টেশনে ঢুকে আমার নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে গিয়ে একটা ট্রেনে চেপে বসলুম। সিঁড়ি দিয়ে নামতে-নামতে ঠিক করেছিলুম, কোনও ফাঁকা জায়গা দেখে ট্রেনের জানলা দিয়ে দুল জোড়া ছুড়ে ফেলে দেব। ট্রেনে উঠবার পর বুঝতে পারলুম সেটা সম্ভব নয়। এয়ার কনডিশন্ড ট্রেন, সব জানলাই পুরো কাচ দিয়ে ঢাকা, শীতকালে কেউ জানলা খোলার কথা কল্পনাও করে না।

ট্রেনটা মোটামুটি ফাঁকাই ছিল, দুটি স্টেশন যাওয়ার পর একজন লোক ঠিক আমার মুখোমুখি আসনটিতে এসে বসল। বছর চল্লিশেক বয়েস, বেশ হাসিখুশি মানুষটি।

কয়েকবার আমার আপাদমস্তক চোখ বুলিয়ে লোকটি উচ্ছল গলায় বলল, হাউডি!

আমি বললুম, হ্যালো!

—মনে হচ্ছে আজ রাত্তিরে আবার বরফ পড়বে, তাই না?

—তাই তো মনে হচ্ছে।

—আজ খেলায় কারা জিতেছে বলতে পারো?

—আমি ঠিক বলতে পারছি না।

এইরকম খাজুরে আলাপ কিছুক্ষণ চলল। এর আগে কোনও পুরুষ মানুষ ট্রেনে আমার সঙ্গে যেচে কথা বলেনি। নিউ ইয়র্কের নাগরিকদের স্বভাবই হল ঠোঁট বন্ধ করে রাখা। ট্রেনে উঠেই তারা মুখের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে অথবা চোখ বন্ধ করে থাকে। কথাবার্তা কদাচিৎ শোনা যায়।

আজ এই লোকটি যে আমার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে, তা নিশ্চয়ই আমার ওভারকোটের জন্য। সাধারণত ট্রেনে উঠে সকলেই ওভারকোটটা খুলে ভাঁজ করে পাশে রাখে, আমি অন্যমনস্কভাবে সেটা গায়েই পরে আছি।

এটা টিউব ট্রেন নয়, মফস্বলে যাওয়ার ট্রেন। এতে চেকার ওঠে। একটু বাদেই চেকার মহাশয় এসে টিকিট দেখতে চাইলেন। আমার রিটার্ন টিকিট কাটা ছিল সেটা বার করে দিলুম।

চেকার একগাল হেসে বললেন, তুমি ভুল ট্রেনে উঠেছ। এটা তো অন্য দিকে যাচ্ছে।

আমি আকাশ থেকে পড়লুম। এরকম ভুল তো আমার হয় না। টিপে-টিপে পয়সা খরচ করতে হচ্ছে, এরকম ভুল মানেই তো গচ্চা। সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালুম, যত দূরে যাব ততই ক্ষতি।

চেকার খুব সহৃদয়ভাবে আমাকে বলল, তা হলে এই ভাড়াটা দিয়ে দাও।

ট্রেনটি আবার এক্সপ্রেস, পরপর চারটি স্টেশন ছেড়ে গিয়ে তারপর থামল। বেশ সুন্দর, নির্জন একটা স্টেশন। কিন্তু স্টেশনটিকে দেখেই আমার গা জ্বলে গেল। এখানে আমায় কে এনেছে, নিশ্চয়ই এই ওভারকোটের মালিকের ভূত আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছে। এখানে তার কে ছিল? প্রেমিকা? যার জন্য এই দুল কিনেছিল সাহেবটি?

ওভারব্রিজ পেরিয়ে অন্যদিকে গিয়ে টিকিট কাটতে হবে। দুপুর বেলা টিকিটের দাম সস্তা থাকে, কিন্তু এখন সন্ধে ছ'টা, এখন টিকিটের দাম বেশি। উপায় নেই, ফিরতে তো হবেই।

ফেরার ট্রেন আসতে কুড়ি মিনিট দেরি, বসলুম গিয়ে টিকিট ঘর সংলগ্ন ওয়েটিং রুমে। আমিই একমাত্র যাত্রী এখানকার। টিকিট বিক্রয়িত্রী রমণীটি দু-তিনবার কৌতূহলী চোখে তাকাল আমার দিকে। ওভারকোটটা ওর চেনা-চেনা লাগছে নিশ্চয়ই। এই মেয়েটিই আমার পূর্বসুরির প্রেমিকা ছিল নাকি?

ট্রেন আসার শব্দ পেয়ে উঠে দাঁড়ালুম। বেপরোয়াভাবে দুল দুটো আর কাগজপত্রগুলো বেঞ্চের ওপর ফেলে রেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়লুম ট্রেনে। প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল, মেয়েটি বুঝি ছুটে আসবে আমায় ধরতে। ট্রেন ছাড়ার পর আমার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল।

ভুল ট্রেন ভাড়ার গচ্চা গেল প্রায় সতেরো ডলার। অর্থাৎ এখন ওভারকোটটার দাম পড়ল সাতাশ ডলার। অনেকটা ভদ্রমতন দাম, এরপর আর আগেকার মালিককে নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও মানে হয় না।

॥ ৩৩ ॥

হঠাৎ একদিন ঠিক করলুম ওয়াশিংটন ডি সি ঘুরে আসা যাক। এলোমেলো ভ্রমণে যদি শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটন ডি সি না যাওয়া হয় তা হলে বড় দুঃখের ব্যাপার হবে। রাজধানী বলে নয়, আমেরিকায়

বেড়াতে এসে ওয়াশিংটন ডি সি-র স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট না দেখে ফিরে যাওয়া একটা অমার্জনীয় অপরাধ।

বন্ধুরা আমাকে বাস স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল। ওয়াইওমিঙে আমার সেই সাংঘাতিক বাস দুর্ঘটনার কথা শুনে নিউ ইয়র্কে অনেকে বলেছিলেন, তুমি আবার বাসে ঘোরাঘুরি করছ, তোমার ভয় করে না? এর উত্তরে সেই পুরোনো কথাটাই বলতে হয়, রোজ কয়েক লক্ষ লোক তো বিছানায় শুয়ে মরে যাচ্ছে, তাহলে তো বিছানায় শুতেই মানুষের ভয় পাওয়া উচিত।

নিউ ইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটনের বাস এক ঘন্টা অন্তর ছাড়ে। ঘণ্টাপাঁচেকের জার্নি। আমি অ্যাকসিডেন্টে পড়েছিলুম বটে তবু গ্রে-হাউন্ড বাস সার্ভিসের মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করতে হয়। কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক সময়ে বাস ছাড়ে, আর হাজার মাইল পেরিয়েও অবিকল নির্দিষ্ট সময় পৌঁছোয়।

আমি পৌঁছোতে পাঁচ মিনিট দেরি করে ফেলেছি বলে পরবর্তী বাসের জন্য পঞ্চান্ন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। সময় কাটাবার কোনও সমস্যা নেই। প্রত্যেক বাস স্টেশনেই আছে সস্তার খাবার দোকান। তার চেয়েও সস্তা চাইলে মেশিন থেকেই পাওয়া যায় ঠান্ডা ও গরম পানীয় এবং নানান ধরনের স্ন্যাক্স। একটা বাস স্টেশনের মেশিন থেকে আমি চিকেন সুপ পর্যন্ত পেয়েছিলুম, বেশ সুস্বাদু আর জিভে-গরম। সেদিন সত্যি খুব অবাক হয়েছিলুম। এদেশের এসব ছোটখাটো ব্যাপারই বেশি বিস্ময়কর।

আগে গেলুম একটা টেলিফোন করতে। ওয়াশিংটন ডি সি-তে রমেন পাইনের বাড়িতে আমার আশ্রয় নেওয়ার কথা, তাঁকে জানিয়ে দিতে হবে আমার বাসের সময় বদলে যাওয়ার কথা। কিন্তু টেলিফোন বুথগুলোর কাছে একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলুম।

একটি মেয়ে তার বয়েস ষোলো সতেরোর বেশি নয়, মাটিতে বসে পড়ে নিঃশব্দে শরীর মুচড়ে-মুচড়ে কাঁদছে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে, আর একটি আঠারো-উনিশ বছরের ছেলে ফিসফিস করে খুব আন্তরিকভাবে তাকে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি পরে আছে একটা গাঢ় হলুদ রঙের স্কার্ট, তার মাথার চুল সম্পূর্ণ সোনালি। আর ছেলেটি পরে আছে একটা নীল কর্ডের ট্রাউজার্স আর সাদা গেঞ্জি, তার চোখ দুটি নীল, তাকে দেখতে অবিকল অল্পবয়েসি অ্যান্টনি পারকিন্সের মতন। ছেলেটি একবার করে একটা টেলিফোনের রিসিভার হুক থেকে নামিয়ে জোর করে মেয়েটির হাতে দিচ্ছে, আর মেয়েটি ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে সেটা। দেওয়ালে ধাক্কা লেগে টেলিফোনটি ঝুলছে কর্ডে। একবার মেয়েটি নো-ও-ও-ও বলে এত জোরে টেলিফোনটি ছুড়ে দিল যে তার অর্ধেকটা ভেঙে উড়ে গেল।

কাছাকাছি দশ-বারোটা টেলিফোন বুথ। তিন-চারজন নারীপুরুষ অন্য বুথগুলোতে নির্বিকারভাবে ফোন করে যাচ্ছে, কেউ ওদের দিকে একবারও তাকাচ্ছে না। বোধহয় তাকাবার নিয়মও নয়। এমনকী ওরা কেন একটি টেলিফোন ভেঙে ফেলছে, সে ব্যাপারেও কেউ আপত্তি জানাতে আসছে না।

কিন্তু আমার ছোটখাটো বাঙালি হৃদয় ওরকম নির্বিকার থাকতে পারে না। কান্নার দৃশ্য আমি একেবারেই সহ্য করতে পারি না। ফট করে আমার নিজেরও কান্না পেয়ে যায় ক্যাবলার মতন। ওই ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটি কাঁদছে কেন অমন বুক উজাড় করে? কী ওর দুঃখ?

ওদের পাশে দাঁড়িয়ে এখন আমার পক্ষে টেলিফোন করা সম্ভব নয়। আমি ওখান থেকে সরে গেলুম। একেবারে দূরেও চলে যেতে পারলুম না। একটা কোকাকোলা মেশিনের আড়ালে এমনভাবে দাঁড়ালুম যেখান থেকে ওদের দেখা যায়। দৃশ্যটা একই রকম। ছেলেটি বারবার মেয়েটিকে অনুরোধ করছে কোথাও টেলিফোন করার জন্য, মেয়েটি কিছুতেই টেলিফোন করবে না, সে এক-একবার রেগে উঠছে, আবার অঝোরে কাঁদছে। আমি মেয়েটির মুখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছি না, তার মুখ দেওয়ালের দিকে।

প্রথমেই মনে হয়, এরা দুজনে নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। এটা এখানকার নিত্য

নৈমিত্তিক ঘটনা। হাজার-হাজার ছেলেমেয়ে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশে চলে যায়। এই নিয়ে কত নাটক, কত সিনেমা হয়েছে। কিন্তু কখনও তো কোনও ছেলেমেয়েকে কাঁদতে কিংবা পরাজয় স্বীকার করতে দেখিনি। আমেরিকান যৌবন সবসময় দুঃসাহসের পতাকা তুলে ধরে থাকে। এই মেয়েটি কাঁদছে যেন বুক নিঙড়ে-নিঙড়ে। আর ছেলেটির মুখেও একটা অপরাধী-অপরাধী ভাব।

এক সময় মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, ছেলেটি তার কাঁধ ধরল। কয়েকপা মাত্র এগিয়েই মেয়েটি কান্নায় ভেঙে পড়ল আবার। আবার সে মাটিতে বসে পড়ল। এবারে আমি তার মুখ দেখতে পেয়েছি চোখের জলে একেবারে মাখামাখি। মুখখানা যেন কোনও বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা। মাথা ভরতি ওরকম সোনালি চুলের জন্যই মনে হয় মেয়েটি যেন এই পৃথিবীর নয়। অন্য কোনও গ্রহ-ট্রহ থেকে এসেছে। মেয়েটির শরীরের নিখুঁত গড়নের তুলনায় ওর কোমরের কাছটা যেন একটু স্ফীত। খুব সম্ভব মেয়েটি গর্ভবতী। এই বয়েসের ছেলে মেয়ের বিবাহ কিংবা একসঙ্গে থাকা তো খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এরা যৌবনের একটুও বাজে খরচ করতে চায় না।

মনে হয়, ওরা দুজনে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে, হয়তো দূরের কোনও শহরে থাকত, নিউ ইয়র্কে এসে টাকাপয়সা সব ফুরিয়ে ফেলেছে, তার ওপরে এই বিপদ। টাকাপয়সা না থাকলে নিউ ইয়র্কের মতন বড় শহর বড় নির্দয়। ছেলেটি কি মেয়েটিকে বলছে ওর বাবা-মা-র কাছে ফোন করে সাহায্য চাইতে? ছেলেটি নিজে তো ফোন করছে না!

এই রকম অবস্থায় সাধারণত সবাই ছেলেটিকেই দোষ দেয়। সবাই বলবে, বদমাস ছেলে, একটা কাঁচাবয়েসি মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে এখন এই অবস্থায় ফেলেছে। কিন্তু ছেলেটি মেয়েটির চেয়েও অনেক বেশি রূপবান, এমন সরল আর নিষ্পাপ মুখ আমি আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছেলেটি কোনও ভুল করতে পারে, কিন্তু ওর মনে কোনও কু-মতলব থাকতে পারে না। তা ছাড়া, এই সব ব্যাপারে ছেলে আর মেয়ের দায়িত্ব সমান। এদেশে ষোলো বছরের মেয়ে কচি খুকি নয়, তারা ছেলেদের সঙ্গে সব ব্যাপারে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে চলে।

এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকলে মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। কাছাকাছি অনেক বসবার জায়গা থাকতেও আমি কোকাকোলা মেশিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আমি পয়সা ফেলে একটা কোকাকোলার টিন বার করে অন্য দিকে চলে গেলুম।

ওদের জন্য আমার মন কেমন করতে লাগল। বাস স্টেশনে কত লোক, কেউ ওদের একটা কথা জিগ্যেস করছে না। এরা ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যন্ত সম্মান দেয়, কিন্তু আমার মনে হল তারও একটা সীমা থাকা দরকার। ওই বয়েসের দুটি বিভ্রান্ত ছেলে-মেয়ে, এখন কারুর কাছ থেকে সামান্য একটা সান্ত্বনা বা সহানুভূতির কথা শুনলেই অনেক ভরসা পায়। দারুণ কোনও মানসিক সংকটে না পড়লে আমেরিকার মেয়ে প্রকাশ্যে কিছুতেই কাঁদবে না।

আমার নিজেকে খুব অসহায় বোধ হল। আমি কি কিছু করতে পারি? সব সময়েই মনে হয় আমি বিদেশি। আমার আর সাধ্য কতটুকু? তা ছাড়া আমি কিছু বলতে গেলেই যদি ওরা আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকায়?

বেশিক্ষণ দূরে থাকতে পারলুম না। তা ছাড়া আমায় তো টেলিফোন করতেই হবে।

এখন সেই একই দৃশ্য। সেই রকম ভাবেই কেঁদে চলেছে মেয়েটি, ছেলেটিও তার পাশে বসে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে এমনিই এদের শিক্ষা যে মেয়েটির কান্নায় ফোঁপানি ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই, ছেলেটিও কথা বলছে যথা সম্ভব নিম্ন স্বরে। তিন-চারজন নারীপুরুষ ওদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে টেলিফোন করে যাচ্ছে। এদের এই নির্লিপ্ততা এক-এক সময় আমার হৃদয়হীনতা বলে মনে হয়।

টেলিফোন করতে-করতে আমি আসলে কান খাড়া রাখলুম ওদের দিকে। যদি ওদের একটি কথাও শুনতে পাওয়া যায়। শুধু শুনতে পেলুম ছেলেটি বলছে, প্লিজ, রোজি, প্লিজ, প্লিজ...। আর

মেয়েটির শরীর দুলে-দুলে উঠছে কান্নায়। আমার মনে হল, এই পুরো বাস স্টেশনের এমনকী বাইরেও আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে গেছে একটি সপ্তদশী মেয়ের কান্না।

টেলিফোনে কথাবার্তা সেরে আমি আবার একটি যন্ত্র থেকে এক গেলাস কফি নিলুম। আমার বাস ছাড়তে আরও তেইশ মিনিট বাকি। এদিকে-ওদিকে জোড়ায়-জোড়ায় নারী-পুরুষ গল্প করছে, কেউ হাসছে, এক বৃদ্ধা মহিলাকে সম্ভবত তার ছেলে ও ছেলের বউ (কিংবা মেয়েজামাইও হতে পারে) চুমু খাচ্ছে দুদিকের গালে, মাইক্রোফোনে নানান জায়গার বাস আগমন-নির্গমনের কথা ঘোষিত হচ্ছে, অনেক গেটে যাত্রীদের লাইন পড়েছে, ছুটোছুটি করছে দুটি শিশু...জীবন চলেছে জীবনের নিয়মে। এখানেই একটি মেয়ে যে বুক ভাসিয়ে কেঁদে যাচ্ছে, সেদিকে কারুর খেয়াল নেই।

আমার আর একটা ঘটনা মনে পড়ল। সেটাও আর একটা বাস স্টেশনের। সেখানে বাস বদলের কারণে ঘণ্টা দু-এক অপেক্ষা করার ব্যাপার ছিল। সময় কাটাবার জন্য কেউ-কেউ টিভি দেখে। কেউ-কেউ ঘুমোয়। আমি একটা বই পড়ছিলুম। আমার হ্যান্ডব্যাগটা আমার পায়ের কাছে রাখা। মাঝে-মাঝে সেদিকে নজর রাখছি। বন্ধুবান্ধবের মুখে শুনেছি আজকাল স্টেশন থেকে ব্যাগ-ট্যাগ চুরি যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়, যদিও আগে এরকম ছিঁচকে চোর ছিল না।

একটি তিন-চার বছরের ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে দৌড়োদৌড়ি করছে ওয়েটিং রুমে। এক-একবার সে এসে আপন খেয়ালে টানাটানি করছে আমার হ্যান্ডব্যাগটা। আমি মুখ তুলে সস্নেহ হাসি দিচ্ছি। পাশের সিট থেকে মা ধমকাচ্ছে মেয়েকে। মেয়েটির মাথায় বেশ বড় একটা ব্যান্ডেজ বাঁধা। যা দুষ্টু মেয়ে, নিশ্চয়ই আছাড় খেয়ে মাথা ফাটিয়েছে। মেয়েটি একবার আমার ব্যাগটা খুলে ফেলবার চেষ্টা করতেই ওর মা বেশ জোরে বকুনি দিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে ভদ্রতা করে বললুম, থাক, থাক। কিছু হয়নি। ও তো খেলা করছে। ওর মাথায় অতবড় ব্যান্ডেজ কেন?

মহিলা তীব্র গলায় বললেন, ওর বাবা ওকে মেরেছে। ওর বাবা মাতাল, বর্বর, নরপশু।

আমি চমকে গেলুম। অপরিচিত লোককে তো কেউ এভাবে এসব কথা বলে না। ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, ভদ্রমহিলার বয়েস বছর পঁয়তিরিশেক হবে, সাজ পোশাকে কোনও মনোযোগ দেননি, চুল এলোমেলো, চোখ দুটো ফোলাফোলা। কোলে আর একটা বাচ্চা।

ভদ্রমহিলা আবার বললেন, ওর বাবা আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে। হি জাস্ট কিক্‌ড আস আউট, লাইক অ্যানিম্যালস, ডিডন্‌ট গিভ আস আ নিকল...একটা পয়সা দেয়নি, স্রেফ মারতে-মারতে বার করে দিয়েছে।

আমি হতবাক। এতো আমাদের রাধার মা। আমার ছোট মাসির বাড়িতে বাসন মাজার কাজ করত রাধার মা। একদিন তার জীবন কাহিনি শুনেছিলুম। চব্বিশ পরগনার এক গ্রামে তার বিয়ে হয়েছিল। তিনটি বাচ্চা হয় তার, তিনটিই মেয়ে, সেই অপরাধে তার স্বামী তাকে বাচ্চা সমেত মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে। কলকাতার অনেক বাড়ির দাসী রাঁধুনীই স্বামী বিতাড়িতা এদেশেও তা হলে রাধার মায়েরা আছে। এদেশে অবশ্য মামলা-মোকদ্দমা করে স্বামীর কাছ থেকে মোটা খোরপোশ আদায় করা যায়। কিন্তু মামলা করতে গেলেও তো খরচ লাগে। এই মহিলা তো দেখছি নিঃসম্বল, ইনি কী করে মামলা করবেন? মেয়েরা সব দেশেই এখনও অসহায়।

আমার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে মহিলা কেঁদে ফেললেন। সেদিনও আমি খুব অসহায় বোধ করেছিলুম। আমি তাঁকে কী সাহায্য করতে পারি? দশ-কুড়ি ডলার দিয়ে তো সাহায্য করা যায় না। তার বেশি সামর্থ্যও আমার নেই। বাচ্চা দুটিকে নিয়ে ভদ্রমহিলা কোথায় চলেছেন তা জিগ্যেস করার সাহসও আমি পাইনি। শুধুই মহিলাকে বলেছিলুম, আমি কফি খেতে যাচ্ছি, তোমার বা তোমার বাচ্চাদের জন্য কি কিছু এনে দিতে পারি? তিনি তাঁর বড় মেয়েকে একটি চকলেট বার নেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন শুধু।

...আমার বাস ছাড়তে আর সাত মিনিট দেরি আছে। পাঁচ মিনিট আগে লাইনে দাঁড়াতে হবে। ওই সপ্তদশী মেয়েটি আর কতক্ষণ কাঁদবে?

টেলিফোন বুথের দিকে ওদের আবার দেখতে গেলুম। ছেলেটি আর মেয়েটি ওখানে নেই। ওরা যেখানে বসে ছিল সেখানে এখনও কয়েকটি চোখের জলের ফোঁটা রয়েছে। ঠিক যেন রক্ত।

কোথায় গেল ওরা। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলুম, এক কোণের দিকে একটা বেঞ্চে বসে আছে ওরা। মেয়েটি সম্ভবত এখনও কাঁদছে, সে দু-বাহুর মধ্যে ঢেকে রেখেছে মুখ। ছেলেটি নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানছে ঘনঘন, তার একটা হাত মেয়েটির পিঠে।

এখান থেকে এর মধ্যে অনেক জায়গার বাস ছাড়ছে। ওরা বাস স্টেশনে এসেছিল কেন, কোথাও যাওয়ার জন্য? ওদের কাছে কি বাস ভাড়াও নেই?

আমি যা ভাবছি, হয়তো সেসব কিছুই ঠিক নয়। ওদের সমস্যা বোধহয় অন্য। কিন্তু মেয়েটির কান্নাটা তো সত্যি।

আমি বাসে উঠে গেলুম, আর ওদের দেখা গেল না। জানি না ওরা এরপর কী করবে। অনেকক্ষণ ওদের দুজনের জন্য আমার বুক টনটন করতে লাগল।

॥ ৩৪ ॥

রাত সাড়ে ন'টা আন্দাজ ওয়াশিংটন ডি সি বাস স্টেশনে পৌঁছতেই পরিচিত, সুদর্শন, দীর্ঘকায় মানুষটিকে দেখতে পেলুম। ভারী একটা ওভারকোট পরা, ফরসা গায়ের রং, মাথায় একটা টুপি থাকলেই সাহেব মনে হত। বাঁ হাতে বড় ব্যান্ডেজ বাঁধা। ইনি রমেন পাইন, কলকাতার টিভি দর্শকদের নিশ্চয়ই মনে আছে এঁর কথা।

রমেনদা তাঁর সুস্থ হাতটি দিয়ে আমার সুটকেসটি তুলে নিতে যাচ্ছিলেন, আমি বললুম, আরে, ছাড়ুন, ছাড়ুন। আপনার হাতে কী হল? অতবড় ব্যান্ডেজ?

রমেনদা নির্লিপ্তভাবে বললেন, এই একটু পড়ে গিয়ে ফ্রাকচার হয়েছে। এমন কিছু না।

—আপনি এক হাতে গাড়ি চালাবেন নাকি?

—কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ?

আমি হেসে বললুম, না। আমার ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। কারণ, আমি জেনে গেছি, গাড়ির অ্যাক্সিডেন্টে আমার মৃত্যু নেই। আমি ভাবছিলুম আপনার অসুবিধের কথা।

বাইরে ছিপছিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সুচ ফোটানো ঠান্ডা বাতাস। আমার হাত জমে আসছে, এবারে এক জোড়া গ্লাভস আর না কিনলেই নয়।

রাস্তা পেরিয়ে এসে একটু দূরে পার্ক করা লাল রঙের গাড়িটায় উঠে বসলুম। সিনেমার স্টান্টম্যানদের কায়দায় রমেনদা হুস করে দারুণ স্পিডে গাড়ি চালিয়ে দিলেন।

ওয়াশিংটন ডি সি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী হলেও জায়গাটি ছোট। এখানে যারা কাজ করে, তারা অনেকেই থাকে এর বাইরে। রমেনদা থাকেন ভার্জিনিয়ায়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা বাইরের শীত থেকে রমেনদার অ্যাপার্টমেন্টের উষ্ণতায় পৌঁছে গেলুম। এই উষ্ণতা শুধু আবহাওয়ার নয়, আন্তরিকতারও।

অনেকদিন বাদে আমি বেশ একটা বাড়ি-বাড়ি পরিবেশ পেলুম। এর আগে যেসব বাঙালি পরিবারে গেছি, প্রায় সব জায়গাতেই স্বামী-স্ত্রীর সংসার ও একটি বাচ্চা, বড় জোর দুটি। তারা সন্ধে একটু গাঢ় হলেই শুতে চলে যায়, তারপর থেকে বাড়ি একেবারে চুপচাপ। রমেনদার দুটি মেয়েই বেশ বড় হয়েছে, ওদের ছেলেটিও অনেক রাত জাগে, সবাই মিলে এক সঙ্গে বসে আড্ডা

দেওয়া যায়। ওঁদের ছেলে রঞ্জন অবশ্য একটাও কথা বলে না, সে শুধু দেখে, আর মজার কথা শুনলে হাসে।

জুলি বউদির বোধহয় দুটি নয়, আটখানা হাত। একই সঙ্গে তিনি রান্না করছেন, জামাকাপড় কাচছেন, বিছানা পাতছেন, চা-কফি বানাচ্ছেন, ছেলেকে খাবার দিচ্ছেন, আমাদের জন্য বাদাম ও বরফ এনে দিচ্ছেন, অথচ এইসব কাজ করতে-করতেও আমাদের সঙ্গে বসে হাসিমুখে গল্পও করছেন। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। জুলি বউদির আরও নানান গুণপনার পরিচয় আমি আস্তে-আস্তে পেতে থাকি।

রমেনদা-জুলি বউদি এখানে সাত-আট বছর কাটিয়ে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। কলকাতাতেই থাকবেন ভেবেছিলেন, আমেরিকায় আর ফিরে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। টানা চার বছর কলকাতায় ছিলেন চাকরি জীবনের নানান দলাদলির সঙ্গে যুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত আবার এদেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। সে যাই হোক, কৈশোরের শেষ দিকটায় চার বছর কলকাতায় কাটানো ও পড়াশুনো করার ফলে ওঁদের দুই মেয়ে বাংলা তো শিখেছে বটেই, বাঙালি হিসেবে আত্মমর্যাদাবোধও এসেছে। আবার শৈশব ও যৌবনে আমেরিকায় এসেছে বলে ওরা অনেক ব্যাপারে স্বাবলম্বী ও জড়তাহীন। অর্থাৎ দু-দেশেরই গুণ বর্তেছে ওদের মধ্যে। মেয়ে দুটির নাম মুনু আর মোম।

আমরা পৌঁছনোর পরই রমেনদা পোশাক পালটে পাঞ্জাবি আর পাজামা পরে ফেললেন। তারপর বললেন, বুঝলে নীললোহিত, তুমি আসবে বলে আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে ফেলেছি। কদিন আর কোথাও বেরুব না, শুধু আড্ডা হবে।

প্রথম রাতে আড্ডা চলল প্রায় রাত দুটো পর্যন্ত। পরদিন আমরা চা খেলুম সকাল দশটায়। তারপর আবার আড্ডা। রমেনদা আগে থেকেই যে কত রকম খাদ্য পানীয় এনে জমিয়ে রেখেছেন, তার ঠিক নেই। মুনু আর মোম কলেজে পড়ে আবার চাকরিও করে, সারাদিন ধরেই তারা ব্যস্ত। কেউ ভোরে বেরিয়ে যাচ্ছে দুপুরে ফিরছে, কেউ দুপুরে বেরুচ্ছে, অন্য জন বেরুবার পর আর একজন ফিরছে, এই রকম চলতে থাকে রাত পর্যন্ত। এবাড়ির দুটি গাড়ির মধ্যে কে কোনটা নিয়ে কখন যাচ্ছে, তার হিসেব রাখতে হয় জুলি বউদিকে। কারণ, টুকিটাকি জিনিসপত্র কেনার জন্য তাঁকে প্রায়ই গাড়ি নিয়ে বেরুতে হয়।

রমেনদার মেজাজটা অনেকটা জমিদার ধরনের। যখন ছুটি নিয়েছেন, তখন আর বাড়ি থেকে বেরুবার কোনও মানে হয় না। বসবার ঘরে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর বারবার চা, কফি ও অন্যান্য জিনিসের হুকুম করবেন। আজকালকার স্বামীরা অবশ্য বউদের হুকুম করার সাহস পায় না, বউদের ভুরু তোলা কিংবা ঝাঁজালো কথা শোনার ভয়ে সব সময় তটস্থ থাকাই বিংশ শতাব্দীর বাঙালি যুবকদের নিয়তি। অবশ্য বাড়িতে কুমারী কন্যা থাকলে স্নেহময় পিতার পক্ষে তাদের যেকোনও হুকুম করা যায়, মেয়েরা সাধারণত বাবার খুব বাধ্য হয়।

রমেনদা কিন্তু অকুতোভয়। তাঁর দুটি বড়-বড় মেয়ে থাকলেও তিনি মেয়েদেরও হুকুম করেন, বউকেও হুকুম করেন। জুলি বউদি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, দেখেছো, দেখেছ ও নিজে কোনও কাজই করবে না। সব সময় হুকুম! আমার যদিও ধারণা হয় যে, জুলি বউদি স্বামীকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে ভরসাও পান না। ওর বদ্ধমূল বিশ্বাস যে, রমেনদা নিজের হাতে এক গেলাস জল গড়াতে গেলেও হয় মেঝেতে জল ফেলে কার্পেট ভেজাবেন অথবা গেলাসটা ভাঙবেন।

এডমান্টনে দীপকদা বলেছিলেন, আমাদের দেশের লোকদের সবচেয়ে সুখ কীসে জানো? খাবার পরে থালাটা রেখে উঠে যেতে পারে। আর এই দেশে আমাদের খাওয়ার পরে লঙ্গরখানার ভিখিরির মতন এঁটো থালাখানা হাতে নিয়ে উঠে যেতে হয়, তক্ষুনি গিয়ে থালাবাসন মাজতে হয়।

সত্যি কথা, এদেশে, সব জায়গাতেই ওই এক নিয়ম দেখেছি। এমনকী নিমন্ত্রিত অতিথিদেরও নিজের থালা ধুয়ে দেওয়াই প্রথা। একমাত্র রমেনদাকেই দেখলুম এ ব্যাপারে তোয়াক্কা করেন না।

খাওয়ার পর বেমালুম এঁটো থালা টেবিলে রেখে উঠে যান। একবার রমেনদাকে এ ব্যাপারটা উল্লেখ করায় রমেনদা বললেন, আরে যাও, যাও ওসব থালাবাসন মাজায় আমি বিশ্বাস করি না। আমেরিকায় এসেছি বলে কি মাথাটাও বিকিয়ে দিয়েছি নাকি?

ওঁর দুই মেয়ে এই কথা শুনে খলখলিয়ে হাসে। মেয়েরা এই ব্যাপারে বাবাকে সস্নেহ প্রশ্রয় দেয়।

দু-দিন টানা আড্ডা মারার পর আমি একটু উসখুস করতে লাগলাম। আড্ডার চেয়ে প্রিয় জিনিস আমারও কিছু নেই। বাছা-বাছা দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আমায় দেখতেই হবে, এরকমও কোনও ঝোঁক আমার নেই। অনেক কিছুই তো ছবিতে দেখা যায়। নতুন কোথাও এসে সেই জায়গাটা অনুভব করাই আসল ব্যাপার। কিন্তু স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট? সেখানে একবার না গেলে যে মনে ক্ষোভ থেকে যাবে!

একবার মিনমিন করে এই প্রসঙ্গ তুলতেই রমেনদা উদারভাবে বললেন, হবে, হবে! অত ব্যস্ততা কীসের?

জুলি বউদি রান্নাঘর থেকে বললেন, ওর কথা শুনলে তোমার আর কোনওদিনই যাওয়া হবে না, নীলু। আমি বরং নিয়ে যাব তোমাকে।

পরদিন সকাল দশটায় জুলি বউদি আমায় স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের স্পেস মিউজিয়ামের দরজায় ছেড়ে দিয়ে বললেন, তুমি ঘুরে-ঘুরে দ্যাখো, তোমায় আমি আবার বিকেল ছ'টার সময় তুলে নিয়ে যাব এখান থেকে।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট শুধু একটা বাড়িতে আবদ্ধ নয়, বিশাল একটি পাড়া জুড়ে এই ব্যাপার। একটি মাত্র হিসেব দিলে এই এলাহি কারবারের কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। এখানে যতগুলি দেখবার জিনিস আছে, তার প্রত্যেকটির সামনে যদি মাত্র এক মিনিট করে দাঁড়ানো যায়, তাহলেই সময় লাগবে আড়াই বছর!

সুতরাং কারুর পক্ষেই পুরোটা দেখা সম্ভব নয়। যার যাতে আগ্রহ, সে শুধু সেই অংশটুকু দেখে। তার মধ্যে স্পেস মিউজিয়াম অবশ্য দ্রষ্টব্য। আকাশ ও মহাকাশ বিষয়ে এমন বিপুল সম্ভার পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। এখানে সবই গোটা-গোটা ব্যাপার। চার্লস লিন্ডবার্গ যে প্লেনটি চেপে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, সেটা অটুট অবস্থায় রয়েছে এখানে। যেসব রকেট মহাশূন্য থেকে ফিরে এসেছে, সেরকম কয়েকটি রাখা আছে। এগুলো দেখলেই রোমাঞ্চ লাগে। নীল আর্মস্ট্রং যে যানটি চেপে চাঁদে নেমেছিলেন, দেখলুম সেটাও। শুধু এই প্রদর্শনী ভবনটিই যে কত বিরাট, তা ঠিক বলে বোঝানো যাবে না। মানুষের আকাশে ওড়ার প্রথম চেষ্টা থেকে আধুনিকতম আবিষ্কার পর্যন্ত দেখানো হয়েছে স্তরে-স্তরে। কোথাও রয়েছে প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের এক-একটি দৃশ্যের মডেল। আমরা অবশ্য প্রদর্শনীর মডেল বলতেই ভাবি কৃষ্ণনগরের ছোট-ছোট পুতুল। এখানে সবই জীবন-প্রমাণ সাইজের, কোথাও তার চেয়েও বড়।

একটি ফিলমের কথাই বলি। এরকম ফিল্ম দেখার অভিজ্ঞতা আমার জীবনে আগে হয়নি। এখানে নানান বৈজ্ঞানিক ব্যাপার নিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ার তোলা ফিল্ম দেখাবার ব্যবস্থা আছে, আমার মাত্র দুটিই দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে টিকিট কেটে লাইন দিয়ে ঢুকলুম। বসবার ব্যবস্থা বেশ উঁচু গ্যালারির মতন। ছবি দেখার পরদা অন্তত ছ' গুণ বড়। অর্থাৎ একটি হাতি, বা নারকোল গাছ বা ছোট ডাকোটা প্লেনকে দেখা যায় তাদের অবিকল আকারে। একটা বাংলো বাড়ির ছবি ঠিক সেই বাড়িটিরই সমান। প্রথম ফিল্মটি হচ্ছে একটি আগেকার দিনের চারটি ডানাওয়ালা, প্রপেলার সমেত বিমানের অ্যাডভেঞ্চার। বিমানটি যখন একটা নির্জন নদীর খাতে ঘুরতে-ঘুরতে পড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি আঁতকে উঠে আমার চেয়ারের হাতল শক্ত করে চেপে ধরেছিলুম। যেন আমিই সেই বিমানে বসে আছি। আমিই পড়ে যাচ্ছি। সত্যিকারের বিমান যাত্রায় আমার কখনও এরকম ভয়

হয়নি।

আর একটি ছবি পৃথিবীতে জীবনবৈচিত্র্য বিষয়ে। এই ছবির নির্মাতার ভারতবর্ষ সম্পর্কে দুর্বলতা আছে, কারণ বারবার ভারতবর্ষের ছবি ফিরে-ফিরে আসছিল আর আমি উৎফুল্ল হচ্ছিলুম। ছবির কলাকৌশলে আমি নিজেই যেন উপস্থিত হচ্ছিলাম ভারতবর্ষের গঙ্গাতীরে।

ওয়াশিংটন ডি সি-তে যিনি বেড়াতে যাবেন তিনি এই ফিল্মগুলি না দেখলে এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেন।

এর পাশাপাশি আছে মুদ্রার বিবর্তনের প্রদর্শনী, অস্ত্রের বিবর্তন, প্রাণীতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ইত্যাদি। আমি দুদিনে শুধু ওই আকাশযান ও অভিব্যক্তিমূলক চিত্রকলার প্রদর্শনী দেখে উঠতে পেরেছি।

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউটের পুরো পাড়াটা বাইরে থেকে ঘুরে দেখতেও ভালো লাগে। মনে হয় যেন প্রাচীন রোমের কোনও অভিজাত এলাকায় এসে পড়েছি, বাড়িগুলি এই রকম। এদের অনেক টাকা, পৃথিবীর যে-কোনও প্রান্ত থেকে দুর্লভতম শিল্প সামগ্রী সংগ্রহ করতে এরা সদা-উৎসাহী।

এ সম্পর্কে একটি কাহিনি আছে। একবার এই সংস্থার কর্তৃপক্ষ আগাগোড়া সোনা দিয়ে একটি মূর্তি গড়িয়ে রাখার সংকল্প করলেন। সেইজন্য তাঁরা আমেরিকার সবচেয়ে বিখ্যাত ভাস্করের কাছে জানতে চাইলেন, তাঁর ইচ্ছে মতন পারিশ্রমিক পেলে তিনি খাঁটি সোনার কোনও ভাস্কর্য গড়তে পারবেন কি না। ভাস্করটি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন পারব না, নিশ্চয়ই পারব। তবে তৈরি করার পর আমি মূর্তিটি কালো রং করে দেব।

প্রথম দিন জুলি বউদি এলেন আমাকে তুলে নিতে। বাড়ি ফেরার পথে জুলি বউদি বললেন, একটু মাছ কিনতে হবে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে মাছের দোকানে?

ভাগ্যিস রাজি হয়েছিলুম, তাই আর একটা নতুন জিনিস দেখা হয়ে গেল। অবশ্য বাজারে যেতে আমার সব সময়ই ভালো লাগে।

এ দেশের সব গ্রসারি স্টোরেই মাছ পাওয়া যায়। নানা রকমের মাছ, কুচো মাছ, কাটা মাছ, বড়-বড় আস্ত মাছ, আধ সেদ্ধ মাছ, কিন্তু সবই ফ্রোজেন। বরফে জমিয়ে কাঠ। বাড়িতে এনে সেগুলো অনেকক্ষণ ধরে থ করার পর রাঁধতে হয়।

কিন্তু জুলি বউদি আমায় নিয়ে এলেন টাট্‌কা মাছের বাজারে। এ-এক অপূর্ব বাজার, এখানে প্রত্যেকটি দোকানই ভাসমান। বন্দরের জেটির চার পাশ ঘিরে রয়েছে অনেকগুলো লঞ্চ। সেই সব লঞ্চের বারান্দা কিংবা সামনে পেতে রাখা পাটাতনেই বিক্রি হচ্ছে মাছ। খুব ছেলেবেলায় দেখা পদ্মার বুকে ইলিশ মাছের নৌকোগুলোর কথা মনে পড়ল। এখানেও এক-এক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক-একটা ছোকরা হাঁকাহাঁকি করছে, এদিকে আসুন, এদিকে, ভালো মাছ, টাটকা মাছ!

মাছ অনেক রকম, ভেটকির মতন, কাতলার মতন, পার্শের মতন, বান মাছের মতন, আড় মাছের মতন। সবই কিন্তু মতন, আসল নয়, এগুলো সামুদ্রিক মাছ। আরও নানা রকম অদ্ভুত চেহারায় মাছ, যার সঙ্গে আমাদের চেনা কোনও মাছই মেলে না। সামুদ্রিক জীবজন্তুও বিক্রি হচ্ছে মনে হয়। একমাত্র চিংড়িটাই আসল। তবে বাগদা বা গলদা নয়, কলকাতার বাজারে যাকে বলে চাবড়া চিংড়ি, সেইগুলোই রয়েছে। অর্থাৎ সাদা রঙের চিংড়ি।

জুলি বউদি অনেক চিংড়ি কিনলেন। এক দোকানে বেশ বড়-বড় কাঁকড়া রয়েছে, তা দেখে জুলি বউদির চোখ চকচক করে উঠল। আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কাঁকড়া খাও, নীলু?

আমি হুতোমের অনুকরণে উত্তর দিলুম, জলচরের মধ্যে নৌকো, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি আর চতুষ্পদের মধ্যে খাট ছাড়া আমি সবই খাই!

জুলি বউদি মুখ ম্লান করে বললেন, আমিও কাঁকড়া খুব ভালোবাসি, আমার ছেলেমেয়েরাও ভালোবাসে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কী জানো, তোমার রমেনদা নিজে তো কাঁকড়া খায়ই না, বাড়িতে

রান্না হলেও সে গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

একই চিন্তা করে জুলি বউদি আবার বললেন, এক কাজ করলে হয়। কাঁকড়া নিয়ে তো যাই। ও বাথরুমে ঢুকলে রান্না করে ফেলব। ও বাথরুমে ঢুকলে অন্তত এক ঘন্টা লাগে, তার মধ্যে রান্না হয়ে যাবে। তারপর...তারপরও ও যদি এবার বাড়ি থেকে বেরোয়, তখন আমরা চট করে খেয়ে নেব। কী বলো? ঘরে রুম ফ্রেশনার ছড়িয়ে দেব, তাহলে ও আর গন্ধ পাবে না।

সেই রকমই হল। কাঁকড়া কিনে নিয়ে যাওয়া হল, রমেনদা স্নান করতে ঢুকলে রান্নাও সেরে ফেলা হল। কিন্তু খাওয়া হবে কী করে? রমেনদার অফিস ছুটি, ওঁর তো বাড়ি থেকে বেরুবার কোনও প্রয়োজনও নেই, ইচ্ছেও নেই। জুলি বউদি মাঝে-মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছেন, মেয়েরা মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি করছে, কিন্তু রমেনদার বাইরে বেরুবার কোনও লক্ষণই নেই।

জুলি বউদি একবার জিগ্যেস করলেন, তুমি ড্রিংকস বা সিগারেট কিনতে যাবে না?

রমেনদা গম্ভীরভাবে বললেন, আমার সব স্টক আছে।

ঘন্টাখানেক বাদে একটা টেলিফোন এল। ওঁদের এক মেয়ে ফোন করছে ইউনিভার্সিটি থেকে। তার গাড়িটা খারাপ হয়ে গেছে। এখন সে কী করবে?

রমেনদা দারুণ বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এখন তাঁকে যেতেই হবে। তিনি না গেলে গাড়ি সারাবার কোনও ব্যবস্থা করা যাবে না।

রমেনদা বললেন, এই জন্যই আমি আমেরিকান গাড়িগুলো একদম পছন্দ করি না। এর চেয়ে আমাদের দেশের অ্যামবাসেডর গাড়ি কত ভালো! পানের দোকানেও পার্টস পাওয়া যায়, যে কেউ সারিয়ে দিতে পারে। এখানে গাড়ি খারাপ হলেই খরচের রাম ধাক্কা।

অন্য গাড়িটা নিয়ে রমেনদা বেরিয়ে গেলেন। আমরা অমনি তাড়াতাড়ি কচর মচর করে কাঁকড়া খেয়ে নিলুম। যে মেয়েটি আত্মত্যাগ করল, তার জন্য কিছুটা রেখে দেওয়া হল আলাদা করে। সে পরের দিন কোনও এক সুযোগে খেয়ে নেবে। রমেনদা ফেরার আগেই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলা হল সব কিছু।

রমেনদা ফিরলেন অনেকটা প্রসন্ন মুখে। গাড়িটার বিশেষ কিছু হয়নি, স্টার্ট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল শুধু, আবার ঠিক হয়ে গেছে।

এবার আমায় অফিসিয়ালি খেতে বসতে হল রমেনদার সঙ্গে। কিন্তু আমি আর খাব কী করে, পেটে আর জায়গা নেই। খাবারগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছি শুধু।

রমেনদা মুখ তুলে বললেন, কী যে আজে-বাজে রান্না করো, ও বেচারি খেতেই পারছে না। ভালো কিছু করতে পারো না? এখানে ভালো কাঁকড়া পাওয়া যায়, কাল কাঁকড়া এনে নীললোহিতকে খাইয়ো।

রমেনদা এবার জুলি বউদির দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

॥ ৩৫ ॥

কয়েকদিন বেশ এক টানা আড্ডা হল। এলেন আরও বাঙালিরা। সন্ধের পর জমল গান ও কাব্য-টাব্য পাঠ। তারপর একদিন সকালবেলা রমেনদা গা ঝাড়া দিয়ে বললেন, চলো, নীললোহিত, তোমায় একটা মনে রাখবার মতন জায়গা দেখিয়ে আনি।

ওঁদের দুই মেয়ে মুনু আর মোম ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারবে না। কারণ ওদের ক্লাস আছে। বেলাবেলি বেশ মিষ্টি রোদে আমরা বেরিয়ে পড়লুম, সঙ্গে কফির ফ্লাস্ক আর ফলটল। রাস্তার দু-পাশে ঝুরো-ঝুরো বরফ পড়ে আছে, মাঝে-মাঝে দু'এক পশলা তুষারপাত হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি চলেছে

নির্জন প্রকৃতির মধ্য দিয়ে। মাঝে-মাঝে দু-একটা ছোট গ্রাম, যা শহরও বলা যায়। এই ছোট্ট গ্রাম-শহরগুলোই যেন এক-একটা স্বাস্থ্যকর বেড়াবার জায়গা, এখানে রয়েছে বড়-বড় কয়েকটা হোটেল আর পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্য লোভনীয় বিজ্ঞাপন। বড় শহরের টানটান করা জীবন থেকে বেরিয়ে এসে দু-চার দিনের জন্য এই পাহাড়ের কোলে আর জঙ্গলের পাশে কয়েকদিন কাটিয়ে যাওয়া বেশ চমৎকার ব্যাপার। কয়েক ঘন্টা মাত্র গাড়ির যাত্রা।

যেতে-যেতে রমেনদা এক সময় বললেন, এদেশে আমি কোনও জিনিসটা খুব মিস করি জানো? মনে করো খুব একটা বৃষ্টির দিন, তার মধ্যে বেরিয়ে পড়লুম, সুবর্ণরেখা কিংবা রূপনারায়ণ নদীর ধারে একটা ছোট্ট চায়ের দোকান, সেখানে বসে বসে মুড়ি, তেলেভাজা আর কাঁচা লঙ্কা খেতে-খেতে বৃষ্টি দেখা। সে আনন্দ এ দেশে পাওয়ার উপায় নেই!

বুঝলুম, রমেনদার মধ্যে এখনও একটা বেশ রোমান্টিক মন রয়ে গেছে। এই ধরনের লোকরা প্রায়ই দুঃখ পায়।

নদীর ধারে ছোট্ট চায়ের দোকান নয় অবশ্য, আমরা মধ্যাহ্নভোজ সারতে ঢুকলুম বার্গার কিং-এ। ম্যাকডোনালড্স এ যেমন কফি ও আলুভাজা বিখ্যাত, বার্গার কিং-এর হ্যাম বার্গারের স্বাদে ও চেহারায় বেশ বিশেষত্ব আছে। এক-একটি দোতলা হ্যামবার্গার একা খেয়ে প্রায় শেষ করা যায় না।

এই দোকানে একটা বিজ্ঞপ্তিতে দেখলুম যে কোনও কোকাকোলার ছিপিতে বিশেষ একটা চিহ্ন থাকলে আর একটি কোকাকোলা বিনামূল্যে পাওয়া যাবে। আমরা তিনটি কোকাকোলা নিয়েছিলুম, তিনটিতেই সেই চিহ্ন। নিয়ে এলুম বিনে পয়সায় তিনটে। সেগুলোর ছিপিতেও আবার সেই চিহ্ন। এ তো মহা মুশকিল। এত কোকাকোলা নিয়ে আমরা কী করব? এক সঙ্গে এত তো খাওয়া যায় না। শেষের তিনটি কোকাকোলার বোতলের ছিপি আর আমরা ভয়ে খুললুম না, সঙ্গে নিয়ে চললুম গাড়িতে।

ক্রমশ রাস্তা জনবিরল হয়ে আসছে। পাশে কোথাও ফসলের খেত, কোথাও বা জঙ্গল। এখানে জঙ্গলের মধ্যেও কিন্তু মানুষ থাকে, অবশ্য তারা জংলি নয়। এক এক সময় দেখতে পাই এই জঙ্গলের রাস্তা দিয়েই চলেছে স্কুলের বাস, মাঝে-মাঝে দাঁড়িয়ে আছে মায়েরা, তাদের বাচ্চারা বাস থেকে নেমেই ছুটে যাচ্ছে মায়ের কাছে। এক কালে এই অঞ্চলে রেড ইন্ডিয়ানদের ঘন বসতি ছিল, এখন আর একজনও চোখে পড়ে না।

আরও একটু দূর যাওয়ার পর চোখে পড়ল ব্লু রিজ পর্বতমালা। দূর থেকে সব পাহাড়কেই দেখতে এক রকম। কিন্তু এই ব্লু রিজ পর্বতমালা পৃথিবীর প্রাচীনতমদের মধ্যে একটি। এর বয়েস প্রায় একশো কোটি বছর। আমাদের হিমালয় এর তুলনায় ছেলে মানুষ। আল্পস বা অ্যান্ডিজও এর চেয়ে বয়েসে ছোট। এই পৃথিবীতে যখন কোনও জন্তুজানোয়ার ছিল না, ঝোপঝাড় বা বৃক্ষও জন্মায়নি, সেই আদিম যুগে এই প্রস্তরস্তূপ দানা বেঁধেছে।

এই ব্লু রিজ পর্বতমালার গায়েই আছে বিখ্যাত শেনানডোয়াহ উপত্যকা এবং শেনানডোয়াহ ন্যাশনাল পার্ক। কিন্তু আমাদের গন্তব্য সেদিকে নয়। আমরা যাচ্ছি একটা গুহা দেখতে। গুহা বললে অবশ্য কিছুই বোঝা যায় না। লুরে ক্যাভার্ন সারা পৃথিবীর বিখ্যাত দ্রষ্টব্য স্থানগুলির অন্যতম।

বিকেল-বিকেল আমরা পৌঁছোলুম সেখানে। ওপরটা দেখলে কিছুই বোঝবার উপায় নেই। গোটাকয়েক দোকান, জিনিসপত্রের ও খাবারদাবারের। টিকিট কেটে লিফটে নামতে হয় নীচে।

রমেনদারা অনেকবার দেখেছেন বলে নীচে নামবেন না, তাঁরা ওপরেই রয়ে গেলেন। আটজনের একটা দলে আমি জায়গা পেলুম, সেই দলে রয়েছেন আর একজন বাঙালি মহিলা। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন গাইড, আমি আবার ওই বাঙালি মহিলার গাইড।

মাটির অনেক নীচের গুহায় ঘুটঘুটে অন্ধকার থাকবার কথা। কিন্তু কোথাও-কোথাও সেই

অন্ধকার অবিকৃত রাখা রয়েছে, আবার কোথাও-কোথাও ব্যবস্থা করা হয়েছে লুকোনো আলোর। এমনই চমৎকার ব্যবস্থা যে কোথাও আলোর নগ্ন বাল্‌ব বা টিউব দেখতে পাওয়া যায় না, যেন অনৈসর্গিক এক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

প্রকৃতি দেবী চল্লিশ কোটি বছর ধরে শিল্পীর মতন খোদাই করে নির্মাণ করেছেন এই লুরে ক্যাভার্ন। মাটির অনেক নীচে যেন এক অমরাবতী। দেখতে-দেখতে বিস্ময়ে চোখ জুড়িয়ে আসে।

বারবার বাঙালি মেয়েটি আমাকে জিগ্যেস করতে লাগলেন, সত্যিই। এসব মানুষে তৈরি করেনি? এমনি-এমনি হয়েছে?

আমার তখন মনে হয়, মানুষ এখনও এত সুন্দর স্থাপত্য নির্মাণ করতে শেখেনি। যেমন আকাশের অনেক রকম রং দেখি, কোনও শিল্পীর তুলিতে আজও তো যথাযথ সেইরকম রং দেখলুম না।

পৃথিবীতে যখন বিপুল উত্থানপতন চলছিল, সেই সময় সৃষ্টি হয় এই বিশাল গুহাটি। প্রায় এক বর্গ মাইল। এর মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল কিছু জল ও বাতাস। সেই জল ও বাতাসের তুলি ও বাটালিতে তৈরি হয়েছে নানা রকম রঙের ডিজাইন এবং অনেকরকম আকার। কোথাও মনে হয় পাতা আছে একটা সিংহাসন, কোথাও উঠে গেছে বিরাট মন্দিরের মহান কারুকার্য করা থাম। নিউ ইয়র্ক শহরটিকে দূর থেকে যেরকম দেখায়, এক জায়গায় দেওয়ালে ফুটে উঠেছে অবিকল সেই রকম একটি মডেল। এক জায়গায় রয়েছে যেন সদ্য ভাজা একটা ডিমের পোচ, অবশ্য সেটা রক পাখির ডিম হতে হবে। এক জায়গা পুরোপুরি একটা গির্জার অভ্যন্তরের মতন, সেই জায়গাটির নামও দেওয়া হয়েছে "ক্যাথিড্রাল"। সেখানে রাখা আছে একটি অর্গান, তাতে একটু ঝংকার তুললেই গমগম করে এক অপূর্ব রাগিণীর সৃষ্টি হয়।

খানিকটা ঘুরতে-ঘুরতে শরীরে রোমাঞ্চ লাগে। মনে হয়, আমরা যেন দেবতাদের গোপন আস্তানায় হঠাৎ এসে হাজির হয়েছি। এখানে জোরে কথা বলতে ইচ্ছে করে না, মনে হয়, তা হলে এর পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে।

মাঝে-মাঝে কাকচক্ষু জল জমে আছে। তার মধ্যে পড়ে আছে প্রচুর পয়সা। এদেশের লোকরা পবিত্র জল দেখলে মানত করে পয়সা দেয়, আমাদের দেশে যেরকম লোকে গঙ্গায় পয়সা ছুড়ে দেয়। এক-এক জায়গায় দেখলুম, খুচরো পয়সায় প্রায় দশ বারো-হাজার টাকা হবে। নীচু হয়ে হাত বাড়ালেই সে পয়সা তুলে আনা যায়। কিন্তু কেউ নেয় না। আমাদের মহিলা গাইডটি বললেন, বছরের শেষে এরকম প্রায় সত্তর-আশি হাজার ডলার পাওয়া যায়, সে টাকা দিয়ে দেওয়া হয় কোনও অনাথ আশ্রমকে।

যদিও একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান প্রথমে এই গুহাটি "আবিষ্কার" করে এবং এখন তারাই এটা পরিচালনা করছে, তবু এই বিস্ময়কর গুহাটির অস্তিত্ব জানা ছিল রেড ইন্ডিয়ানদের। এর মধ্যে একটি রেড ইন্ডিয়ান কিশোরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। দূর অতীতে কোনও একদিন সে এই গুহায় ঢুকে পথ হারিয়ে ফেলেছিল।

আর একটি জায়গায় পাওয়া গেছে কিছু পোড়া কাঠকয়লা ও জন্তুর হাড়। সম্ভবত রেড ইন্ডিয়ানদের একটি ছোট দল এখানে লুকিয়ে ছিল এক সময়, তারা রান্নাবান্না করে খেয়েছে।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের লোকেরা দৈবাৎ দেখতে পায় যে এক জায়গায় মাটি ফুঁড়ে ঠান্ডা হাওয়া বেরুচ্ছে। তখন জায়গাটি অনেকখানি খুঁড়ে ফেলে তারা দেখতে পায় তাদের স্বপ্নের অতীত এক বিশাল প্রাকৃতিক রাজপ্রাসাদ। এখানকার বাতাস এতই ঠান্ডা যে সেই বাতাস নিয়ে সে যুগে প্রথম এয়ার কন্ডিশানিং ব্যবস্থা চালাবার চেষ্টা হয়েছিল।

এখনও লুরে ক্যাভার্নের পরিচালনা সেই ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের হাতেই এবং তারা লাভও করে নিশ্চয়ই। কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তারা এই অতল গুহায় কোনও রেস্তোরাঁ বসায়নি। বিরাট চিৎকারের

গানবাজনার ব্যবস্থা করেনি এবং প্রকৃতির ওপর খোদকারি করে আরও সুন্দর করবার চেষ্টা করেনি। তারা পুরো জায়গাটিকে নিখুঁত অবিকল রাখার ব্যবস্থা করেছে।

আমাদের দেশে এরকম সুবৃহৎ কিংবা অপূর্ব সৌন্দর্যময় গুহা কোথাও আছে কি না আমি জানি না। হয়তো এখনও সেরকম আবিষ্কৃত হয়নি। তবে ছোট আকারের যেগুলি আছে, সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার কথা ভাবলেই হৃৎকম্প হয়। মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারিতে আমি এর থেকে অনেক ছোট হলেও একটা চমৎকার গুহা দেখেছিলুম। আমাদের দেশের যে-কোনও প্রাকৃতিক বিস্ময়কর জায়গাতেই তো একটা মন্দির বানিয়ে তোলা হবেই। আর মন্দির মানেই নোংরা আবর্জনা, দুর্গন্ধ। ওই পাঁচমারিতেই এক জায়গায় পাথরের বুকে রোদবৃষ্টি বাতাসের ভাস্কর্যে একটি মহাদেবের ছবির আদল ফুটে উঠেছিল। এরকম একটা জিনিসকে যেমন আছে ঠিক তেমনটি রাখলেই যে সৌন্দর্য খোলে, সেটা অনেকেই বোঝে না। সেই মহাদেব মূর্তিটির গায়ে বিকট হলুদ আর নীল রং বুলিয়ে দিয়েছে কেউ, মাথায় আবার একটা সাপ এঁকে দিয়েছে। ফলে, সেটার দিকে আর তাকানোই যায় না।

লুরে ক্যাভার্নের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরলেও ক্লান্তি লাগে না। গাইডের কাছ ছাড়া হয়ে পথ হারিয়ে ফেললে খুবই বিপদের সম্ভাবনা। এক-একবার আমার লোভ হচ্ছিল অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাই। তারপর বহুকাল পরে সেই রেড ইন্ডিয়ান কিশোরটির মতন এই ভারতীয়টিরও হাড়গোড় অন্যরা খুঁজে পাবে।

তা অবশ্য হল না, ওপরে উঠে এলুম যথা সময়ে।

বাড়ি ফিরলুম ঘোর সন্ধের পর। একটু পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। রমেনদা ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমায় ডাকছে।

আবার বিস্ময়। টেলিফোন করছে কামাল। নিউ ইয়র্কের কাছে স্কারসডেলে ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একদিন। কামালের জানার কথা নয় যে আমি এখানে এসেছি। এসে কার বাড়িতে উঠেছি তা তো কেউ জানে না। তবু কোন মন্ত্রবলে কামাল ঠিক এখানে টেলিফোন করেছে।

কামাল বলল, একি, তুমি নিউ ইয়র্ক থেকে বস্টনে না এসেই ওয়াশিংটন ডি সি-তে চলে গেলে যে? ওটা তো উলটো দিকে? না, না, ওসব চলবে না। শিগগির বস্টনে চলে এসো। কালই—।

॥ ৩৬ ॥

একটা আশি-নব্বই বছরের অট্টালিকা ইওরোপের মানদণ্ডে এই তো সেদিনকার, আর মার্কিন দেশের বিচারে রীতিমতন প্রাচীন। অনেক হাইওয়ের পাশে-পাশে নির্দেশ থাকে, কাছেই একটা ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য স্থান, দেখবার জন্য এখানে থামুন। কয়েকবার থেমে বেশ ঠকেছি। এইখানে সত্তর বছর আগে প্রথম ঘোড়ার গাড়ি ও মোটর গাড়ির রেস হয়েছিল, কিংবা 'নব্বই বছর আগে এইখানে অমুক চন্দ্র অমুক প্রথম ঘুড়িতে চেপে শূন্যে উঠেছিল', এইরকম। আমরা পাঁচ-সাতশো বছরের কম কিছু হলে তাকে ঠিক ইতিহাস বলে মানতে চাই না। কিন্তু অত বছর আগে আমেরিকান নামে কোনও জাতই ছিল না পৃথিবীতে।

এ দেশের তুলনায় বস্টন বেশ বনেদি শহর। এখানেই রয়েছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হার্ভার্ড এবং এম আই টি। দু-একটি পাড়া দেখলে চমকে উঠতে হয়। মনে হয় মার্কিন দেশ তো নয়, হঠাৎ যেন লন্ডনে চলে এসেছি। বাড়িগুলির শ্রী-ছাদ একেবারে ব্রিটিশ ধরনের। আমেরিকার নতুন শহর মানেই অতি ঝকঝকে চকচকে ঢাউস-ঢাউস সড়কে ভরতি। কিন্তু বস্টনে এখনও কিছু সরু-সরু রাস্তা আছে, কলেজ-পাড়ায় সেরকম কোনও রাস্তায় গেলে আমাদের মনে

পড়তে পারে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কথা। মানুষের অভ্যেসই হল নতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুরোনোকে মিলিয়ে দেখা। এক-একজন মহিলা থাকেন যাঁরা কোনও নতুন লোক দেখলেই বলেন, একে ঠিক ছোট বউদির ভাইয়ের মতন দেখতে না? কিংবা, আমাদের পাড়ার দর্জির মতন, কিংবা সঞ্জয় গান্ধির মতন, কিংবা উত্তমকুমারের ছোট ভাইয়ের মতন।

হয়তো বস্টনের কলেজ পাড়ার সেই রাস্তার সঙ্গে কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের কোনও মিল অ-কলকাতাবাসী কারুর চোখে পড়বে না। কিন্তু আমরা মিল খুঁজে পাই। মনে হয় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের স্বভাবও একইরকম।

বাস স্টেশন থেকে কামাল নিয়ে এল তার বাড়িতে। সেখানে এসে পেয়ে গেলুম চমৎকার এক আড্ডার পরিবেশ। ব্যবসায়ী কথাটার সঙ্গে বোহেমিয়ান চরিত্রটি কিছুতেই মেলানো যায় না। কিন্তু কামালকে বলা যায় সত্যিকারের বোহেমিয়ান ব্যবসায়ী। তার পায়ের তলায় সর্ষে, সে প্রায়ই সারা দুনিয়া টোটো করে ঘুরে বেড়ায়, তার মুখে সব সময় নানারকম ব্যবসার পরিকল্পনা, কিন্তু আসলে সে রয়েছে একটা স্বপ্নের জগতে।

কামালের সঙ্গে থাকে তার ভাগ্নে খুসনুদ। এই খুসনুদ কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র, এখন এখানে পড়াশুনো করতে এসেছে, তার মুখে এখনও লেগে আছে কৈশোরের শ্রী। এক-একটা মুখ থাকে, যা প্রথম দেখলেই খুব ভালো লেগে যায়। খুস্‌নুদের মুখখানা সেই ধরনের। সবসময় একটা দুষ্টু-দুষ্টু হাসি লেগে আছে ঠোঁটে। পড়াশুনোতে সে খুবই ভালো, আবার হাসিমুখে সে যে কত রকম কাজ করতে পারে তার ঠিক নেই। এই চা বানাচ্ছে সকলের জন্য, কিংবা ডিম সেদ্ধ করে ফেলল ডজনখানেক, আবার ধাঁ-করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মাখন কিংবা চাল কিনে আনতে।

এই খুস্‌নুদের মাকে আমি কলকাতায় দেখেছি। কোনও-কোনও মানুষকে সময় স্পর্শ করতে ভয় পায়। ওর রয়েছে সেই রকম স্থির লাবণ্য।

বসবার ঘরে বসে আছেন সলিল চৌধুরী। নিউ ইয়র্কের বাঙালিদের অনুষ্ঠানে তাঁকে ক্ষণেকের তরে দেখেছিলুম। এখানে তাঁকে খুব কাছাকাছি দেখার সৌভাগ্য অর্জন করলুম। একটি দক্ষিণ ভারতীয় তরুণীও রয়েছে সেখানে, সে সেতার বাজায়। আধুনিক সঙ্গীত জগতে সলিল চৌধুরী যে কত বড় প্রতিভা এ মেয়েটি বোধহয় তা ঠিক জানে না, তাই সে অকুতোভয়ে ওঁর সঙ্গে তর্কে মেতে উঠেছে। তরুণীটি শুধু বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতের অনুরাগিনী। তর্কের বিষয়বস্তু হল, সঙ্গীতের জনপ্রিয়তা। তরুণীটির বক্তব্য, বিশুদ্ধ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সকলের জন্য নয়, ইনিসিয়েটেড বা অনুপ্রাণিতদের জন্য। প্রকৃত সমঝদার ছাড়া এই সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা রক্ষা পাবে না। আর সলিল চৌধুরী বলতে লাগলেন, সমস্ত মানুষ, সাধারণ গরিব-দুঃখী মানুষের কাছেও সঙ্গীতকে পৌঁছতে হবে। অন্তত পৌঁছবার চেষ্টা করতে হবে।

এ তর্কের কোনও মীমাংসা নেই, তাই আমি চুপ করে বসে-বসে শুনতে লাগলুম। অবশ্য তর্কযুদ্ধ তো নয়, নিজের-নিজের মত প্রতিষ্ঠার চেষ্টা, তাই ওঁদের দুজনেরই যুক্তিগুলো শুনতে বেশ লাগছিল।

প্রথম দিনের আড্ডা শেষ হল প্রায় রাত দুটোয়। পরের দিন দুপুর থেকেই একটা পিকনিকের আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। বাইরে অবিশ্রান্ত বরফ পড়ছে। ঠিক আমাদের বর্ষার মতন, এইরকম দিনে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খুব জমে। তারই কাছাকাছি কিছু একটা বিকল্প রান্না হবে, এক-এক জন এক-একটা পদ রান্না করবে। অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের ইংরেজি প্রবাদ হল অধিক পাচকে তরকারি নষ্ট। সুতরাং আমি রান্না টান্নার ব্যাপার থেকে দূরে রইলুম।

আস্তে-আস্তে চড়ুইভাতির দলটাও বেশ বড় হল। খুস্‌নুদ্ ডেকে আনল তার বন্ধুদের। এসেছে সলিল চৌধুরীর ছেলে বাবুন। এই সপ্রতিভ যুবকটি নিউইয়র্কে সাউন্ড রেকর্ডিং-এর ব্যাপারে পড়াশুনো করছে, এখন বোস্টনে এসেছে বেড়াতে। ডেকে আনা হল শর্মিলা বসুকে। নেতাজি পরিবারের মেয়ে শর্মিলা শরৎ বোসের পৌত্রী, যেমন রূপসি, তেমন বিদুষী আবার তেমনই ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত

গায়। খুব ঠান্ডা স্বরে আস্তে-আস্তে কথা বলে শর্মিলা, কিন্তু কুটুস-কুটুস করে মাঝে-মাঝে বেশ মজার মন্তব্যও করে।

শর্মিলা আলাদা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে থাকে, সে জন্য প্রায়ই তাকে নিজের রান্না করতে হয়। সেই জন্য সেও পিকনিকের রান্নার ঝামেলায় গেল না। সে আলাদা বসে টিভি খুলে একটা মহাজাগতিক বিষয়ের অনুষ্ঠান দেখতে লাগল খুব মন দিয়ে। একটু বাদেই সে নিজেও নিমগ্ন হয়ে গেল মহাকাশে।

কামালের বাড়িতে ঘরের সংখ্যা অনেক, কিন্তু একটিমাত্র ঘরেই তিনখানা টিভি। এর কারণ শুধু ক[illegible]লই জানে।

আর একটি মেয়ের নাম মহুয়া মুখার্জি। এর মুখে বাংলা শুনলে যেন কেমন-কেমন লাগে। মনে হয় যেন লক্ষ্ণৌ কিংবা দেরাদুনের প্রবাসী বাঙালি পরিবারের মেয়ে। তা কিন্তু নয়। মহুয়া প্রায় জন্ম থেকেই আছে ভারতবর্ষের বাইরে, বাবা-মায়ের সঙ্গে কাটিয়েছে, বিভিন্ন দেশের ভারতীয় দূতাবাসে, এখনও ওর বাবা-মা রয়েছেন ভিয়েনায়, ইন্দ্রাণী এখানে এসেছে পড়াশুনো সমাপ্ত করতে।

অনেক দেশ ঘোরার জন্য অনেকগুলো ভাষা শিখেছে মহুয়া। কলকাতার সঙ্গে তার যোগাযোগ ক্ষীণ হওয়া সত্ত্বেও সে বাংলা শিখেছে নিজের চেষ্টায়। সে একটু সচেতন উচ্চারণে পরিষ্কার বাংলা বলে। আমি তাকে জিগ্যেস করলুম। তুমি কেন বাংলা শিখলে, মহুয়া?

সে অবাক হয়ে উত্তর দিল, বাঃ, বাংলা না শিখলে এরকম একটা সুন্দর ভাষা থেকে বঞ্চিত থাকতুম যে!

সত্যি কথা বলতে কী, মহুয়ার মতন একটি সরল, তেজস্বিনী মেয়ের সঙ্গে আগাগোড়া ইংরেজিতে কথা বলতে হলে আমি বেশ দুঃখিতই হতুম!

আরও এলেন একটি বাঙালি দম্পতি এবং আর কয়েকজন, কিন্তু সকলের সঙ্গে আর সেরকম আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হল না।

সদা ব্যস্ত কামালকে মাঝে-মাঝে দেখতে পাচ্ছি, আবার হঠাৎ-হঠাৎ সে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তার কত কাজ। এরই মধ্যে অন্তত পঞ্চাশ জায়গায় তাকে দেখা করতে যেতে হবে, এবং প্রত্যেক জায়গাতেই সে ঠিক সময়ে ঘুরে আসে। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়েটি আজই চলে যাবে। তাকে পৌঁছে দিয়ে আসে এয়ারপোর্টে, আবার আমাদের আড্ডাতেও তাকে দু-পাঁচ মিনিটের জন্য বসতে হবে কিংবা রান্নায় সাহায্যের জন্য কুচিয়ে দিতে হবে পেঁয়াজ। আবার আমাদের নিয়ে সে শহরটা দেখিয়ে আনতে চায়। রাস্তার ধারের কোনও দোকানে বসে কফি খাওয়াও দরকার। এত সব কাজকর্ম নিয়ে কামাল যেন প্রত্যেক দিনের চব্বিশ ঘন্টাকে টেনে আটচল্লিশ ঘন্টা লম্বা করে ফেলে।

মামা ভাগ্নের সংসারটি খুস্‌নুদই চালায় বোঝা গেল। স্বপ্ন-পাগল মামাটিকে খানিকটা সামলে রাখার দায়িত্বও তার। এদের সংসারটি খুব মজার। ব্রেকফাস্ট খেতে বসে মনে পড়ে নুন নেই, তখুনি একজন গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় নুন কিনতে। মাছ ভাজার জন্য উনুনে প্যান চাপাবার পর দেখা যায় তেলের শিশি শূন্য। আবার একজন ছুটল দোকানে। কিন্তু বাড়ির যত লোকই আসুক, সকলেই সুস্বাগতম, সকলকেই বলা হবে, আরে, বসো-বসো। এখানে খেয়ে যাও আজ।

বাঙালির আড্ডা মানে জায়গা ছেড়ে নড়া নেই। রান্না ঘরেই আমরা যে-যার এক-একটি চেয়ার নিয়ে বসে গেছি। কামালই এক সময় আমাদের জোর করে তুলল। শহরটা এক চক্কর ঘুরিয়ে দেখাবে।

তার স্টেশন ওয়াগানটিই তার দ্বিতীয় সংসার। এতে থাকে তার জামাকাপড়, সংক্ষিপ্ত বিছানা, কাগজ-টাগজ আর ব্যাবসার জিনিসপত্র। এটা নিয়ে সে প্রায় অর্ধেক আমেরিকা চষে বেড়ায়। সেই সব জিনিস টিনিস টেনে নামিয়ে সে আমাদের জন্য জায়গা করে দিল। তারপর হুস করে ছেড়ে দিল গাড়ি।

কামালকে গাইড হিসেবে নিলে দুমিনিটে তাজমহল দেখা হয়ে যায়, এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং

দেখতে লাগবে এক মিনিট, গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখা হয়ে যাবে তিন মিনিটে আর মাউন্ট এভারেস্ট ঘুরে আসতে বড়জোর পাঁচ মিনিট লাগতে পারে।

চলন্ত গাড়ি থেকেই সে বলতে লাগল, ওই দ্যাখো এম আই টি, ওই যে হার্ভার্ড, আর এটা কী যেন, খুব বিখ্যাত জায়গা এখন নাম মনে পড়ছে না, আর ওইটা হল—।

সলিল চৌধুরীই এক সময় বললেন, ওহে মুস্তাফা, এবারে একটু থামাও তো। কোথাও একটু চুপ করে দাঁড়াই।

গাড়ি চলছিল একটা পার্কের পাশ দিয়ে, সেখানেই ব্রেক কষে কামাল বলল, এই পার্কে যাবেন?

নামা হল সেখানেই। প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে, বরফ পড়া বন্ধ হয়ে দারুণ ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে। সেই জন্য পার্কটি এখন জনবিরল।

সেই পার্কে পা দিয়েই আমার মনে পড়ল ভের্লেনের কবিতা ঃ 'শীতের নির্জন পার্ক, চতুর্দিকে ছড়ানো তুষার/দুটি ছায়ামূর্তি এইমাত্র হল পার।' সত্যিই বরফ ছড়িয়ে আছে এখানে-সেখানে। পার্কের মাঝখানের হ্রদটির জলও প্রায় অর্ধেকটা জমে শক্ত হয়ে গেছে। শনশনে হাওয়া লেগে কাঁদছে উইলো গাছগুলো। নিষ্পত্র চেরিগাছগুলোর ডালে এমন থোকা-থোকা বরফ জমে আছে যে ঠিক মনে হয় ফুল।

হঠাৎ আমার খেয়াল হল, আমরা সবাই গরম জামাকাপড় পরে এসেছি। কিন্তু কামালের গায়ে শুধু একটা জামা। আমি ওভারকোট আনতে ভুলে গেছি। পরে আছি অন্য একটা জ্যাকেট, তাতেই আমার শীত লাগছে। আস্তে-আস্তে কাঁপুনি দিচ্ছে শরীরে। আর কামাল শুধু একটা জামা পরে দাঁড়িয়ে আছে কী করে?

আমি জিগ্যেস করলুম, কী ব্যাপার, তুমি কোট-ফোট আনোনি?

বুকের ওপর দুহাত আড়াআড়ি রেখে কামাল বলল, ঠিক আছে। আমার অত শীত লাগে না।

আমার এরকম অবস্থা হলে আমি দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠতুম। কারণ গাড়ির ভেতরটা গরম। কিন্তু কামাল সত্যি দাঁড়িয়ে রইল। ক্যামেরা বার করে ছবি তুলতে লাগল অনেকে, তখনও কামাল শীতে কাঁপছে না।

আমাদেরই গরজে আমরা ফিরে এলুম গাড়ির উষ্ণতায়। এবার প্রস্তাব উঠল, গরম কফি খাওয়ার।

সলিল চৌধুরী বললেন, তার সঙ্গে যদি গরম-গরম পেঁয়াজি কিংবা ফুলুরি পাওয়া যেত, তা হলে আরও ভালো হত।

কামাল বলল, চলুন, সেরকম জিনিসই খাওয়াব।

শহর ছাড়িয়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা নিরিবিলি দোকানের সামনে গাড়ি থামাল কামাল। পরিষ্কার, ঝকঝকে বেশ বড় দোকান, কিন্তু এখন প্রায় ফাঁকা। কাউন্টারে একজন মহিলা। খাদ্যতালিকা দেখে কোনটা যে কী তা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু খুস্‌নুদ সব জানে। সে অর্ডার দিয়ে দিল চটপট। কামাল গাড়ি পার্ক করে এল একটু পরে। তার মধ্যেই অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে দেখে সে নিজে আবার একটা কিছু যোগ করে দিল।

ছোট্ট-ছোট্ট বেতের ঝুড়িতে এল পকৌড়ার মতন একটা কিছু। বেশ সুস্বাদু। তারপর চিংড়ি মাছ ভাজা। কফির স্বাদও উত্তম। গল্প জমে গেল আমাদের।

এক সময় দেখি টেবিলের ওপরে কতকগুলো ছাপানো কাগজ পড়ে আছে। এই দোকানের পরিচারিকাদের ব্যবহারের কিংবা খাদ্যের গুণাগুণ কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যদি খদ্দেরদের কোনও অভিযোগ থাকে, তবে তা জানাবার জন্যই এই ফর্ম। খাদ্য বিষয়ে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই,

কিন্তু আমরা সকলেই একমত হলুম যে এই দোকানটির বাইরের চাকচিক্যের তুলনায় বাথরুমটি বেশ নোংরা। আমেরিকানদের পরিচ্ছন্নতার বাতিক আছে তারা বাথরুম-সজাগ এবং জলের ব্যবহারে অকৃপণ। সুতরাং এরকম অপরিচ্ছন্ন বাথরুম সত্যিই ব্যতিক্রম। অভিযোগ জানাবার সুযোগ পেলেই কিছুটা লিখে দিতে ইচ্ছে করে। তাই সেই ছাপানো ফর্মে আমরা বাথরুম বিষয়ে খুব কড়া করে লিখলুম।

তারপর সবাই মিলে উঠে যখন বেরিয়ে যাচ্ছি তখন কাউন্টারের মহিলাটি এমন মিষ্টি করে হাসল যে আমার মাথা ঘুরে গেল। বিনা পয়সায় এমন মিষ্টি হাসি কজন দেয়? অন্যরা বেরিয়ে যাচ্ছে, আমি থমকে দাঁড়িয়ে বললুম, আমি আসছি।

টেবিলের কাছে ফিরে গিয়ে সেই অভিযোগ পত্রটি তুলে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললুম। জীবনে আর কোনও দিন আমি এই রেস্তোরাঁয় হয়তো আসব না; শুধু-শুধু এরকম একটা বাজে অভিযোগ লিখে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

বেরুবার সময় মেয়েটি আর একবার সেই রকম হাসি দিয়ে ধন্য করে দিল আমাকে। ইস্ট কোস্টের মেয়েদের হাসির খ্যাতি আমি ওয়েস্ট কোস্টেই শুনে এসেছিলুম, এই প্রথম তার চাক্ষুষ প্রমাণ পেলুম।

॥ ৩৭ ॥

এবারে একটা ক্যামেরা না কিনলেই নয়। এত জায়গায় ঘোরাঘুরি করছি, এসব ছবিতে ধরে রাখলে পরে সে সব ছবির দিকে তাকিয়ে বেশ দীর্ঘশ্বাস ফেলা যাবে। সকলেই সে রকম করে। যেকোনও বিখ্যাত জায়গাতে গেলেই দেখি অন্য সবাই ক্যামেরা বার করে ঝিলিক মারতে শুরু করেছে। আমার ক্যামেরা নেই, তাই একটু বোকাবোকা লাগে। শুধু তাই নয়, অন্য কারুর ক্যামেরার ফোকাসের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি কি না, সে ভেবেও সন্ত্রস্ত থাকতে হয়। আমার মতন এলেবেলে লোকের ছবি অন্য কেউ তুলবেই বা কেন।

আমি অনেক পাহাড়ে-জঙ্গলে গেছি বটে, কিন্তু বন্দুক-পিস্তল বা ক্যামেরা কখনও ব্যবহার করিনি। সঙ্গে অতিরিক্ত কোনও জিনিসপত্র রাখার অভ্যেসই আমার নেই।

বেশ ছেলেবেলায় আমার বন্ধু আশু আমায় একবার ছবি তোলার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তার ছিল ক্যামেরার নেশা, তার নিজেরও ছিল বেশ দামি-দামি কয়েকটা ক্যামেরা। আমাকে হাত পাকাবার জন্য সে একটা বক্স ক্যামেরা দিয়েছিল। আমি তা দিয়ে মনুমেন্ট, ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির ইত্যাদি তুলেছিলাম সারা দিন ঘুরে। পরে দেখা গেল, বারো খানা ফিল্মের একটাও ওঠেনি। এটা নাকি ব্যর্থতার একটা বিশ্ব রেকর্ড। একেবারে নভিসরাও বক্স ক্যামেরায় বারো খানার মধ্যে ছ'খানা তুলতে পারে। সেই থেকে আমি আর ক্যামেরায় হাত দিইনি।

কিন্তু বিদেশে ঘোরাঘুরির সময় একটা ক্যামেরার অভাব খুবই বোধ করতে লাগলুম। মাস তিনেক ধরে দোনামনা করার পর একদিন ভাবলুম, নাঃ, এবারে একটা কিনতেই হয়।

ছবি তোলার ব্যাপারটা আজকাল অনেক সহজ হয়ে এসেছে। অ্যাপারচার, ফোকাস ঠিক করা, আলো মাপামাপির দরকার হয় না। কিংবা হয়তো এখনও দরকার হয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফি প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাওয়ার উচ্চাকাঙক্ষা তো আমার নেই, কোনও রকম কাজ-চালানো ছবি তোলার জন্য অনেক সহজ ক্যামেরা বেরিয়েছে।

সবচেয়ে সহজ হচ্ছে পোলারয়েড ক্যামেরা। চোখের সামনে ক্যামেরাটি ধরে শাটার টেপো, আর সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসবে ছবি, একেবারে হাতে গরম। দোকানে যাওয়ার ঝঞ্ঝাটও নেই।

কিন্তু এ ক্যামেরা এদেশে একেবারে বাচ্চারা ব্যবহার করে। জয়তীদি-দীপকদার ছ'বছরের মেয়ে ছুটকি এই ক্যামেরায় পটাপট ছবি তুলত। সুতরাং রাস্তায়-ঘাটে ওই রকম ক্যামেরা আমার হাতে দেখলে লোকে হাসবে।

সস্তায় আরও নানা ধরনের ইনস্টোম্যাটিক ক্যামেরা পাওয়া যায়, যাতে ছবি তোলা খুবই অনায়াসের ব্যাপার, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে সে রকম ক্যামেরা দেশে নিয়ে গেলে একেবারে অকেজো হয়ে যাবে। ওদের ফিলম্ বা ব্যাটারি আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। আজকাল অধিকাংশ ক্যামেরাতেই নানা রকম ব্যাটারির কারসাজি থাকে।

বিখ্যাত, দামি যেসব ক্যামেরার নাম শুনলে আমাদের দেশের অনেক শৌখিন ফটোগ্রাফারের চোখ চকচক করে ওঠে, সেরকম কোনও ক্যামেরা কেনার সাধ্যও আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। এখনকার পরিচিতরা আমায় পরামর্শ দিয়েছিল, মাঝারি দামের মধ্যে মজবুত ক্যামেরা যদি কিনতে চাও, তা হলে ইন্ডিয়ান দোকান থেকে কিনো। কারণ, ওরা বলতে পারবে, কোন ক্যামেরার ফিলম্ বা ব্যাটারি দেশে পাওয়া যাবে, দরকার হলে মেরামতও করা যাবে।

গিয়েছিলুম নিউইয়র্কের সেরকম একাধিক দোকানে। এদেশের "ইন্ডিয়ান" দোকানগুলির প্রায় অধিকাংশেরই মালিক পাকিস্তানি। এত দূর দেশে ভারতীয় ও পাকিস্তানিরা অনেক ব্যাপারেই একরকম। সবাই যে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষ, সেই একাত্মতা এখানে এলে ভালো করে বোঝা যায়।

কিন্তু ওই সব "ইন্ডিয়ান" দোকানে মাঝারি বলেই যে-সব ক্যামেরা আমাকে দেখিয়েছে, তার দাম আমার পকেটের সাধ্যের বাইরে। পারলে হয়তো আমি অতি সস্তায় কোনও সেকেন্ডহ্যান্ড ক্যামেরাই কিনে ফেলতুম, কিন্তু যেহেতু ওভারকোট আর ক্যামেরা এক নয়, তাই ঠিক ভরসা হয় না তবে, ওয়াশিংটনে থাকবার সময় একটা ক্যামেরার দোকানে অবিশ্বাস্য রকমের রিডাকশান সেল-এর বিজ্ঞাপন দেখে ঢুকে পড়েছিলুম। কোনও জিনিস দোকানে বেশি দিন জমে গেলেই এরা এরকম করে। সুতরাং রমেনদার কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন নিয়ে নতুনের প্রায় অর্ধেক দামে কিনে ফেললুম একখানা ক্যামেরা। অলিমপাস টু। ছোট্টখাট্টো স্মার্ট চেহারা, কলকবজার বিশেষ ঝামেলা নেই, এমনকী ভুল-প্রতিষেধক কয়েকটি ব্যবস্থাও আছে। দোকানদারের কাছ থেকেই শিখে নিলুম নিয়মকানুন। সেই সঙ্গে পেলুম আরও অনেক ছাপানো কাগজপত্র, যা পড়লে প্রচুর জ্ঞান লাভ হয়। মোদ্দা কথা, এ ক্যামেরায় অন্ধও ছবি তুলতে পারে।

পৃথিবীর ঠিক উলটো দিকে বলেই এ দেশে অনেক ব্যাপারও উলটো। আমাদের দেশে কালো-সাদা ছবিরই চল এখনও বেশি, রঙিন ছবির ফিল্‌মের দামও বেশি আর পরিস্ফুটন ও ছাপানোতেও অনেক ঝকমারি। আর এ দেশে সাদা-কালো ফিল্‌ম অতি দুর্লভ, যদি বা পাওয়াও যায়, তার ডেভলপিং-প্রিন্টিং-এর খরচ রঙিনের চেয়ে অনেক বেশি, অনেক জায়গায় সাদা কালো ছবি ফোটানো ও ছাপানোর ব্যবস্থাই নেই। সুতরাং আমি ভরে নিলুম রঙিন ফিল্‌ম।

একটা ক্যামেরা হাতে থাকার সুবিধে এই যে রাস্তায় ঘাটে যখন তখন এক চোখ টেপা যায়। ভদ্রসমাজে এক চোখ টেপার অধিকার শুধু ফটোগ্রাফারদেরই আছে। তা ছাড়া এক গাদা লোকের সামনে হঠাৎ ঝপাং করে হাঁটু গেড়ে বসা যায়, কোনও বিখ্যাত দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে একটা ক্যামেরা খুলে অনায়াসেই কাছাকাছি লোকদের সরে দাঁড়াতে বলতে পারা যায়।

প্রথম দফায় অতি উৎসাহে বারোখানা ছবি তুলে ফেললুম মাত্র দুদিনে। নদীর ছবি, গাছের ছবি, সূর্যাস্তের ছবি, পার্কে সুন্দরী মেয়েদের নাচের ছবি, অর্থাৎ যা-যা তুলতে হয় আর কি। এদেশে অনেক ক্যামেরার দোকানে একদিনের মধ্যেই, এমনকী এক ঘন্টার মধ্যে নেগেটিভ ফোটানো ও ছাপানো হয়ে যায়। সেরকম এক দোকানে আমার রোলটি জমা দিয়ে এলুম।

পরদিন ছবি আনতে গিয়েই চমক। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে এক ভাবুক ও দার্শনিক চেহারার যুবক। আমার রসিদ দেখাতেই সে অনেকগুলি খামের মধ্য থেকে আমার খামটি খুঁজে বার করে

আনল। তারপর সেটি খুলে সে ছবিগুলো দেখতে লাগল গভীর মনোযোগ দিয়ে। ছবিগুলো সে দেখে আর এক একবার আমার মুখের দিকে তাকায়। আস্তে-আস্তে তার ললাটে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও চিন্তার ঢেউ।

আমার বুক ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। ব্যাপার কী, এবারেও কি আমার একটাও ছবি ওঠেনি? জাপানের বিখ্যাত অলিমপাস টু ক্যামেরা দিয়েও কি এতখানি ব্যর্থতা সম্ভব? কিংবা, আমি এমনই ভালো ছবি তুলে ফেলেছি যে এই যুবকটি বিশ্বাসই করতে পারছে না।

ছেলেটি অস্ফুটভাবে বলল, স্ট্রেঞ্জ! ভেরি স্ট্রেঞ্জ!

আমি আবার ফাঁপরে পড়লুম। না হয় আমার ছবিগুলো খারাপ হয়েছে, কিংবা একটাও ওঠেনি, তাতে স্ট্রেঞ্জ বলার কী আছে?

আমি পকেটে হাত দিয়ে বললুম, কত দিতে হবে?

ছেলেটি বলল, তোমার ক্যামেরাটা একটু দেখতে পারি কি?

আমি ঝোলা থেকে ক্যামেরাটা বার করে দিলুম ওর হাতে। সে ক্যামেরাটা নেড়ে চেড়ে, ভেতরটা খুলে দেখে বলল, এটা তো ঠিকই আছে মনে হচ্ছে।

আমি এবারে বুক ঠুকে জিগ্যেস করলুম, আমার ছবিগুলো ঠিক নেই বুঝি?

সে খানিকটা ইতস্তত করে বলল না, মানে, ছবিগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু রঙের ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না, তুমি বরং নিজেই দ্যাখো।

আমি খামটা টেনে নিয়ে ছবিগুলো ছড়িয়ে ফেললুম। অদ্ভুত ব্যাপার! অলৌকিক! আমার তোলা নদী, গাছ, সূর্যাস্ত, পার্কে মেয়েদের নাচ—সবই উঠেছে, সবাইকেই চেনা যায়, কিন্তু সকলেরই রং শুধু হলদে! গাছ-নদী-মেয়েরা তো বটেই, এমনকী সূর্যাস্ত পর্যন্ত হলুদ। আজকালকার রঙিন ছবিতে লাল-নীল-গোলাপি ইত্যাদি সব রংই ফোটে, আমার ছবি শুধু হলুদ কেন?

যুবকটির মুখের দিকে তাকাতেই সে বলল, আমি আগে কখনও এরকম দেখিনি। ঠিক বিশ্বাসই করতে পারছি না।

আমাদের দেশে ব্যাঙ্কের চেক ফেরত দেওয়ার সময় যেমন একটি ছাপানো কাগজ দেয়, অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটাতে টিক দেওয়া থাকে। এরাও ছবি ছাপানোর সঙ্গে দেয় সেই রকম একটা ছাপানো কাগজ, কিন্তু আমারটাতে কোনও ছাপানো কারণেই দাগ দেওয়া নেই, তলায় হাতে লেখা আছে। সম্ভবত রোলটা ক্যামেরায় ভরার সময় কিছু গন্ডগোল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ আমার ছবির খুঁতের আসল কারণটা এরা ধরতে পারেনি, ব্যাপারটা অভিনব।

ছেলেটি অপরাধীর মতন বলল, হয় সব রং আসবে, অথবা ছবিগুলো কালো হয়ে যাবে, কিন্তু শুধু হলদে রংটা কী করে এল...

কিছুকাল আগে একটা স্ক্যান্ডিনেভিয়ান ফিল্ম খুব হইচই তুলেছিল। ফিল্মটির নাম 'আই অ্যাম কিউরিয়াস—ইয়োলো।' টাইম সাপ্তাহিকে ছবিটির সমালোচনার হেডিং দেওয়া হয়েছিল, 'আই অ্যাম ফিউরিয়াস—রেড।' এই হলদে ছবিগুলো দেখে আমারও টাইম পত্রিকার সমালোচকের মতন মনের অবস্থা। পল গগ্যাঁ হলদে রঙের মেয়ে এঁকেছেন। কিন্তু ফটোতে শুধু হলদে রঙের মেয়ে যে এত খারাপ দেখায় তা আমি কি আগে জানতুম! হলদে রঙের গাছও অতি বিকট ব্যাপার।

আমি বললুম, ওসব আমি জানি না। তোমরা আবার ভালো করে প্রিন্ট করে দাও।

ছেলেটি বিনীতভাবে বলল, তোমার এই নেগেটিভে নতুন করে প্রিন্ট করলে আর ভালো করা যাবে না। তুমি বরং আর একটা রোল তুলে দিয়ে যাও, সেটা আমরা বিনা পয়সায় করে দেব।

কিন্তু ততদিনে সেই শহর ছেড়ে আমি চলে গেছি।

তা বলে আমি হতোদ্যম হয়ে ছবি তোলায় ইস্তফা দিলুম না, আবার নতুন রোল ভরে নিলুম

ক্যামেরায়। আবার ছবি তুলতে লাগলুম ঝপাঝপ।

দ্বিতীয় রোলটি ডেভেলপ করতে দিলুম বস্টনে। এবারে আর কোনওরকম এদিক ওদিক নয়, সবক'টি ছবিই উঠেছে। সেটা আমার কৃতিত্ব না হোক, জাপানি ক্যামেরার কৃতিত্ব তো বটেই। লাল-নীল-সবুজ-হলদে সব রংগুলোও ঠিকঠাক। তবে ছবিগুলো একটু ঝাপসা-ঝাপসা, কিন্তু সে দোষ আমার নয়, সব সময় ঝিরিঝিরি বরফ পড়লে আমি কী করব? দোষটা আকাশের।

সুতরাং ছবি তোলার ব্যাপারে আমার বেশ একটা আত্মবিশ্বাস জন্মে গেল। এখন আমি মাটিতে শুয়ে কিংবা রেলিং-এর ওপরে দাঁড়িয়ে নতুন নতুন কায়দায় অস্থিরকে শাশ্বত করে রাখি। অন্ধকারেও পরোয়া নেই, ফ্ল্যাশ আছে। এমন স্পর্শকাতর শাটার যে একটু আঙুলের ছোঁয়া লাগতে না লাগতেই সেটা পড়ে যায়। ফলে আমার বুট জুতোর ছবি, আমার বাঁ-হাতের তিনটি আঙুলের ছবি, গাড়ির চাকার অর্ধেকটার ছবি, এমনকী নিছক শূন্যতার ছবিও উঠে গেল বেশ কয়েকটা। এ হল নিউ ওয়েভ ফটোগ্রাফি! কোনও বিখ্যাত ফটোগ্রাফার শুধু একজোড়া বুট জুতোর ছবি তোলার কথা কখনও স্বপ্নেও ভেবেছে? ভ্যান গঘ্ সেই কবে বুট জুতোর ছবি এঁকেছিলেন, তারপর এতদিন পরে আমি সেরকম ছবি ক্যামেরায় তুললুম।

বস্টন থেকে আবার ফিরে এসেছি নিউ ইয়র্কে। গত মাসের নিউ ইয়র্ক ছিল শুধু আমার নিজের চোখে দেখা, এবারে ক্যামেরার চোখে। আগেরবারে আমি ছিলুম স্বাধীন, যখন যেখানে খুশি গেছি। এবারে আমার মধ্যে একটু বেশ টুরিস্টের মতন ভাব এসেছে, অবশ্য-দ্রষ্টব্য স্থানগুলো আর না দেখলেই নয়।

যেমন এর আগে যতবার নিউ ইয়র্কে এসেছি, কোনওবারই স্ট্যাচু অব লিবার্টি দেখা হয়নি। ওই মর্মর মহিলাটিকে দূর থেকেই স্তুতি জানিয়েছি। কিন্তু এবারে মনে হল, ওর কাছে গিয়ে আমার নিজের হাতে ছবি তোলা অবশ্য কর্তব্য।

কাছাকাছি যাওয়ার ঝামেলা আছে। হাডসন নদীর ওপর একটা ছোট দ্বীপে আছে ওই বিশ্ববিখ্যাত মূর্তিটি। ম্যানহাটানের হৃৎপিণ্ডের কাছে একটা পার্ক, সেখান থেকেও দূরবিনে দেখা যায়, অথবা ফেরি স্টিমারে কাছাকাছি যাওয়া যায়। আমি এসে পড়েছি রবিবারে, ফেরির জন্য লম্বা লাইন। কিছুক্ষণ একটা বেঞ্চে বসে রইলুম। একবার গেলুম একটা দোকানে কফি-হ্যামবার্গার খেয়ে আসতে, তখনও লাইন খুব বড়। অত বড় লাইনে দাঁড়াবার ধৈর্য আমার নেই। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছি।

হঠাৎ খেয়াল হল, ক্যামেরা? যাঃ! সেটা তো নেই। এর মধ্যে কোথায় যেন ফেলে এসেছি। কোথায়? যে-বেঞ্চটায় বসেছিলুম একটু আগে, সেখানে নিশ্চয়ই। দৌড়োতে-দৌড়োতে গেলুম সেদিকে।

কাছাকাছি গিয়েই একটা স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল। যাক, পাওয়া গেছে। এক জোড়া তরুণ দম্পতি দাঁড়িয়ে আছে, স্বামীটির হাতে আমার ক্যামেরা, তার স্ত্রী নদীর দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে পোজ দিয়ে আছে। তা তুলছে তুলুক না। আমি ঠিকানা জেনে নিয়ে পরে ওদের ছবির কপি পাঠিয়ে দেব।

ওরা দু-তিনখানা ছবি তোলার পর আমি কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালুম। স্বামীটি আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাতেই আমি হেসে বললুম, ভুল করে আমার ক্যামেরাটা ফেলে গিয়েছিলুম, অলিমপাস টু।

ছেলেটি ততোধিক ভুরু কুঁচকে বলল, কী বলছ? কার ক্যামেরা?

আমি বললুম, তোমার হাতে অলিমপাস টু দেখছি, মানে আমিও আমারটা ফেলে গেছি, ওটা কি তোমার?

ছেলেটি বলল, নিশ্চয়ই।

বলেই সে একটা অতি সুদৃশ্য কেসের মধ্যে ক্যামেরাটা ভরে ফেলল। তা হলে কি আমি আমারটা এখানে ফেলিনি? স্টিমার ফেরির কাউন্টারের কাছে? ওখানে একবার খোঁজ নিতে

গিয়েছিলাম।

আবার দৌড়োলুম সেদিকে। সেখানেও একজন লোকের হাতে অলিমপাস টু। এবারে সতর্ক হয়ে জিগ্যেস করলুম, আমি এখানে একটা ক্যামেরা ফেলে গেছি, এই খানিকটা আগে।

লোকটি কোনও উত্তর না দিয়ে নিজের ক্যামেরাটা লুকিয়ে ফেলল।

সেই লাইনে আরও দু-তিন জনের হাতে আমি দেখলুম ওই একই ক্যামেরা। এখানেও নিশ্চয়ই ফিফ্‌টি পারসেন্ট রিডাকশন সেল দিচ্ছে।

শেষ চেষ্টা হিসেবে গেলুম কফির দোকানে। তার কাউন্টারের ওপর জ্বলজ্বল করছে আর একটা অলিমপাস টু। আমি অবশ্য কাউন্টারে দাঁড়াইনি, টেবিলে বসেছিলুম, তবে ওখানে ক্যামেরাটা গেল কী করে? কোনও সহৃদয় লোক বোধহয় ওটা পেয়ে এখানে রেখে গেছে।

দোকানদারকে কিছু জিগ্যেস না করে ক্যামেরাটা তুলে নিয়েই বেরিয়ে গেলুম গটগট করে। ঠিক সেই মুহূর্তে বাথরুম থেকে একটা লোক বেরিয়ে কী যেন বলতে লাগল, আমি আর তাতে কান না দিয়ে হাঁটতে লাগলুম জোরে জোরে। একেবারে পার্ক ছেড়ে বাস স্টপের দিকে।

পরের দিন সেই ছবির রোল ডেভেলপ করে আবার একটি সাংঘাতিক চমক। ওর একটা ছবিও আমার তোলা নয়। সব অচেনা নারী পুরুষ ও অদেখা দৃশ্য।

কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে ভাবলুম, কী আর করা যাবে।

মানুষের জীবনটাই নশ্বর, নিছক কিছু ছবি আমার তোলা কিংবা অন্য কারুর, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে আর কী হবে!

॥ ৩৮ ॥

নিউ ইয়র্কে সারা বছর ধরেই আন্তর্জাতিক ফিল্‌ম ফেসটিভাল চলছে বললে বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। অসংখ্য সিনেমা হল, তাতে দেখানো হয় সারা পৃথিবীর বাছাই করা চলচ্চিত্র। এ ছাড়া বিভিন্ন মিউজিয়াম ও শিল্প প্রতিষ্ঠানে থাকে বিখ্যাত পরিচালকদের রেট্রোসপেকটিভ। আর প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়ের আছে নিজস্ব অডিটোরিয়াম ও সারা বছরব্যাপী নির্বাচিত চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। সেখানে টিকিটের দাম সস্তা এবং বাইরের লোকেরও সেখানে প্রবেশের কোনও বাধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শুধু আমেরিকান ছবি দেখে না, তারা দেখে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রগুলি।

আমেরিকান সিনেমার এখন বেশ খারাপ অবস্থা চলছে। হলিউড একসময় রোমান্স ও হাই ড্রামার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছিল। সেই সব বিষয়বস্তু এখন আর চলে না। বীভৎস রকমের হিংস্রতা কিংবা যৌনতার বাড়াবাড়ি দেখিয়ে কিছুদিন বাজার মাৎ করার চেষ্টা চলেছিল, এখন তাও পুরোনো হয়ে গেছে। 'স্টার ওয়ারস' খুব চলেছিল কল্প-বিজ্ঞানের চাকচিক্যের জন্য, কিন্তু তার পরের ছবি, 'এম্পায়ার স্ট্রাইকস ব্যাক' তত বেশি দর্শক টানতে পারেনি। সেই ফর্মুলায় 'সুপার ম্যান' বেশ চললেও, 'সুপার ম্যান টু' একঘেয়ে লেগেছে। অনেকদিন পর 'রেইডারস অফ দা লস্ট আর্ক' নামে একটা ভয়াবহ শিহরণ-জাগানো ছবি আবার বক্স-অফিস ফাটিয়েছে। এর বিষয়বস্তু খানিকটা অলৌকিক, খানিকটা কল্প-বিজ্ঞান আর অনেকটাই হিংস্রতা। যতক্ষণ ছবিটা চলে ততক্ষণ কাঁটা হয়ে বসে থাকতে হয়, আমি তো বেশ কয়েক জায়গায় চোখ বুজে ফেলেছি। মানুষের মুখ মোমের মতন গলে যাচ্ছে, এই দৃশ্য কি দেখা যায়?

হলিউডের ছবির সম্মান বর্তমানে হুহু করে নেমে যাচ্ছে। খুব বড় কোনও পরিচালক নেই, সিরিয়াস ফিল্‌মের সংখ্যা খুবই কম। 'রেড্‌স', 'র‍্যাগ টাইম' ইত্যাদি কিছু সিরিয়াস ধরনের চেষ্টা দেখেও মন ভরল না। 'ফ্রেঞ্চ লিউটেনান্টস্ উয়োম্যান' সম্প্রতিকালের একটি বিখ্যাত উপন্যাস, তার

চিত্ররূপ দেখেও হতাশ হলুম। এর চিত্রনাট্য লিখেছেন বিখ্যাত নাট্যকার হ্যারল্ড পিন্টার। পিন্টার অতিরিক্ত কায়দা করতে গিয়ে ছবিটির রস নষ্ট করলেন। গল্পটি গত শতাব্দীর একটি প্রেমকাহিনি, পিন্টার তাঁর চিত্রনাট্যে মাঝে-মাঝে ইন্টার কাট করে এই ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের ব্যক্তি জীবনের টুকরো দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন, প্রেমের সমস্যা এ যুগেও একরকম। তবে এই ছবির নায়িকা হিসেবে মেরিল স্ট্রিপ অসাধারণ। মেরিল স্ট্রিপ এই দশকের প্রধান আবিষ্কার। ভারতীয় দর্শকরাও অনেকে মেরিল স্ট্রিপকে চেনেন নিশ্চয়ই, 'ক্রেমার ভার্সাস ক্রেমার'-এর নায়িকাকে মনে নেই?

বর্তমান কালের ছবির যখন এরকম দৈন্য দশা চলে, তখন হঠাৎ-হঠাৎ পুরোনো আমলের কিছু-কিছু ছবি আবার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পুরোনো কোনও অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে নিয়ে হুজুগ ওঠে। যেমন, দু-এক বছর ধরে খুব শোনা যাচ্ছে, হামফ্রি বোগার্ট অসাধারণ অভিনেতা ছিলেন, তাঁর জীবৎকালে তাঁর প্রতিভার ঠিক সম্মান দেওয়া হয়নি। সমস্ত শহরগুলিতে দেখানো হচ্ছে হামফ্রি বোগার্টের পুরোনো ছবি। আফ্রিকান কুইন, কাসাব্লাঙ্কা, স্যাব্রিনা ইত্যাদি। ছেলে-ছোকরারা বোগার্টের অনুকরণে কথা বলছে ঠোঁট চেপে। আমি হামফ্রি বোগার্টের ভক্ত, এই সুযোগে তাঁর অনেক পুরোনো ছবি দেখে নিলুম। জন ওয়েন-কেও এইভাবে এখন সম্মান দেখানো হচ্ছে। সেই তুলনায় চার্লি চ্যাপলিন আর তেমন জনপ্রিয় নেই মনে হল। চার্লির 'লাইম লাইট' দেখতে গিয়ে দেখি হল ফাঁকা।

ফ্রান্স, জার্মানি, পোল্যান্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, জাপান, সুইডেন, ইটালি ইত্যাদি যেসব দেশের চলচ্চিত্রের বিশেষ খ্যাতি আছে, সেসব দেশের ভালো-ভালো ছবি আমেরিকায় বসে অনায়াসেই দেখা যায়। চলচ্চিত্রের ওপর এ দেশে কোনোরকম সরকারি নিয়ন্ত্রণই নেই, এমনকী সেনসরশিপও নেই, তাই এখানকার প্রদর্শকরা পৃথিবীর যেকোনও দেশ থেকেই ভালো ছবি এনে দেখাতে পারে। এমনকী, চিন ও রাশিয়ার ফিল্মও দেখার সুযোগ আছে।

একটি রাশিয়ান ফিল্মের কথা এখানে বলতে চাই। আইজেনস্টাইন পুড্ভকিনের যুগ কেটে গেছে কবে, সম্প্রতিকালের রুশ চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমাদের খুব একটা উচ্চ ধারণা নেই। কারণ, ভারতে বসে আমরা যেসব রাশিয়ান ফিল্ম দেখি, সেগুলি হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘটনা, নয় হালকা-অ্যাডভেঞ্চার ধরনের এবং কয়েকটি শেকসপিয়রের পুনর্নির্মাণ। কিন্তু আমেরিকায় বসে আমি একটি অসাধারণ রুশ ছবি দেখলুম।

ছবিটি বছর দশেকের পুরোনো, নাম সোলারিস। আন্দ্রেই টারকোভস্কি পরিচালিত কল্প-বিজ্ঞান কাহিনি। আমার মতে, এ যাবৎ আমেরিকা যতগুলো বিজ্ঞানভিত্তিক চলচ্চিত্র তুলেছে, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল স্ট্যানলি কুবরিক পরিচালিত 'স্পেসঅডিসি'। আর এই 'সোলারি' যেন সেই 'স্পেস অডিসি'রই যোগ্য প্রত্যুত্তর। মহাকাশ অভিযানে রাশিয়া অনেক এগিয়ে থাকলেও এই ছবিতে সেসব নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করা হয়নি। চোখ ধাঁধানো কৃত্রিম রকেট-ফকেটও নেই, বরং এই ছবিতে মিশেছে বিজ্ঞানের সঙ্গে দর্শন। দূর মহাশূন্যে সোলারিস নামে অজ্ঞাত ভয়ঙ্কর সমুদ্রের কাছাকাছি এক শূন্যযানে বসে কয়েকজন মানুষ অভিভূত হয়ে যাচ্ছে তাদের মনের রহস্যময় শক্তি অনুভব করে।

ফরাসি ছবি প্রায় সবই দেখা যায় এদেশে। বোধহয় ফরাসিরা প্রত্যেক ছবিতেই ইংরেজি সাব-টাইটল বসিয়ে দেয় এ দেশের বিশাল বাজার পাওয়ার জন্য। ফরাসি ফিল্ম মাত্রই ভালো নয়। কিছু ছবি বেশ বাজে। তবে মাঝারি ধরনের ঝকঝকে তকতকে ছবি তুলতে ফরাসিরা বেশ দক্ষ। সেই সব ছবির বেশ চাহিদা আছে এদেশে। এর পাশাপাশি ত্রুফো, গদার, রেনে'র ছবিও বেশ চলে। ত্রুফোর 'গার্ল নেক্সট ডোর' ছবির জন্য একমাস আগে থেকে টিকিট কাটতে হয়।

কায়দাকানুনের ব্যাপারে ফরাসি পরিচালকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি টেক্কা দেন অ্যালাঁ রেনে। এর একটি ছবি দেখলুম, যার নামটিতে বেশ মজা আছে। মঁনক্ল দা মেরিক অর্থাৎ 'আমার আমেরিকান কাকা'। আমেরিকার দর্শকদের কথা ভেবেই এইরকম নাম দেওয়া কি না, সেরকম সন্দেহ জাগতে

পারে। কারণ এ ছবিতে আমেরিকার ছিটেফোঁটাও নেই, আমেরিকান কাকার কোনও চরিত্রও নেই, ফরাসি নারী-পুরুষদেরই গল্প, শুধু একটি লোক বারদুয়েক বলেছে যে তার এক কাকা আমেরিকায় গিয়ে খুব উন্নতি করেছে। ফিল্মটি প্রায় প্রবন্ধ ঘেঁষা, এমনকী এতে ফরাসি জীববিজ্ঞানী আঁরি লেওরি-র কয়েকটি তত্ত্ব এবং পরীক্ষাও দেখানো হয়েছে। সাদা ইঁদুর ও খাঁচার বন্দি বাঁদরের সঙ্গে মানুষের যে কত মিল, তা ফুটে উঠেছে এক একটা সংকট মুহূর্তে। ছবিটি শেষ পর্যন্ত সার্থক হয়ে ওঠে পরিচালকের মুনশিয়ানায়। এই ধরনের ছবি দেখলে একরকমের আরাম হয়, মনে হয়, চলচ্চিত্র জগতে তবু কেউ-কেউ এখনও নতুন ধরনের চিন্তা করছে।

কিছু-কিছু ছবি দেখলেই দীর্ঘশ্বাস ফেলে মনে হয়, এইসব ছবি অন্তত বিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতবর্ষে দেখাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। কোনও-কোনও চলচ্চিত্র-উৎসবে দু-চারটে দেখানো হতে পারে। সেইসব সময় টিকিটের জন্য হুড়োহুড়ি ও হ্যাংলামির কথাও সবাই জানে। সাধারণ ভারতীয় দর্শক এইসব ছবি দেখার যোগ্য নয়, কারণ, এর মধ্যে নগ্ন নারী ও পুরুষেরা আছে, সুতরাং আর সব গুণ নষ্ট। এইরকমই একটি ফিল্ম হল 'টিন ড্রাম'। যদিও আমেরিকায় অস্কার পেয়েছে, তবু চলচ্চিত্র হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের বলে আমার মনে হয়নি। কিন্তু এর আকর্ষণ অন্য, এটি গুনটার গ্রাস-এর নোবেল পুরস্কারজয়ী উপন্যাসের চিত্ররূপ। পরিচালক ভল্কার শ্লোনড্রফ্ মোটামুটি বর্ণনামূলক চিত্ররূপ দিয়ে গেছেন।

টিন ড্রামের গল্প নিশ্চয়ই অনেকেই জানেন। তিন বছরের একটি পোলিশ ছেলে অস্কার বড়দের জগৎ যৌন-লাম্পট্য, হিংস্রতা ও হিটলারের নাজিবাদের উত্থান দেখে তিক্ত হয়ে আর বড় হয়ে উঠতে চায়নি। তার শরীর সেখানেই থেমে ছিল। ক্রমে তার বয়েস বাড়ল কিন্তু তার শরীরটা তিন বছরেই রয়ে গেল। তার গলায় ঝোলে একটা টিনের ড্রাম, মন খারাপ হলে সেটা সে বাজায়, মন খারাপ হলে সে এমন একটা চিৎকার করে যাতে সব কাচ ভেঙে যায়। তার মা ও বাবা দুজনেই ব্যভিচারী। হিটলারের দাপটে সমস্ত জার্মান জাতটাই মানসিক রোগী। অস্কার এর মধ্যে দিয়ে রেখে যাচ্ছে তার নিজস্ব বামন-প্রতিবাদ। কাহিনির অভিনবত্বই মনকে দারুণ স্পর্শ করে এবং পরিচালক এর সাহিত্যরূপটা যথাযথ রাখবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু এর যৌন দৃশ্যগুলো দেখলে গা শিউরে ওঠে। তিন বছরের ছেলের ভূমিকা তো প্রায় ওই বয়েসি কোনও শিশুকে দিয়েই করানো হয়েছে, সেই শিশু যখন একটি সতেরো বছরের মেয়ের সঙ্গে যৌন সহবাস করতে যায়, তখন আমি মনে-মনে আতঙ্কিত হয়ে ভাবি, সত্যিই কি সবটা দেখাবে? আভাসে সারবে না? কিন্তু এরা সবটাই দেখিয়ে দেয়।

আমাদের দেশের সাধারণ সিনেমা-দর্শকদের ধারণা আছে যে আমেরিকান সিনেমায় বুঝি খুব অসভ্য ব্যাপার থাকে। এটা এক সময়ে হয়তো সত্যি ছিল, কিন্তু এখন নেই, আমেরিকানরা এ ব্যাপারে বেশ পিছিয়ে পড়েছে। আমেরিকানরা ভেতরে-ভেতরে আসলে রক্ষণশীল ও গোঁড়া, খানিকটা ভণ্ডও বটে। আমরা এক সময় নিরামিষ বাংলা ছবির পাশাপাশি আমেরিকান ছবিতে চুম্বন, খানিকটা নগ্ন বুক ও উরুর ঝলক দেখে রোমাঞ্চিত হতুম, বেশিরভাগ আমেরিকান ছবি এখনও সেই স্তরেই আছে। কিন্তু জার্মান, ইটালিয়ান, ফরাসিরা এখন আর কিছুই বাদ রাখছে না। সেইসঙ্গে যোগ দিয়েছে জাপানিরা। হাঙ্গেরিয়ান ছবিতেও নগ্নতা জল-ভাত। এক হাঙ্গেরিয়ান লেখক দম্পতি সত্যজিতের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' দেখে মহাবিস্ময়ে আমাকে বলেছিল, সে কি এতগুলো ছেলে-মেয়ে এতক্ষণ একসঙ্গে রইল, কেউ কারুকে চুমু খেল না, একবারও জড়িয়ে ধরল না?

আমেরিকায় সরকারি সেন্সরশিপ উঠে গেলেও প্রযোজকদের নিজস্ব একটা স্তর-বিন্যাসের ব্যবস্থা আছে। প্রযোজক সংস্থা ছবিগুলো সম্পর্কে আগে থেকে জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। অর্থাৎ কোন ছবি সপরিবারে দেখার যোগ্য, কোন ছবি নয়। বিভিন্ন স্তরের ছবির নির্দেশ দেওয়া থাকে। যেমন, কোনও ছবির পরিচয় পত্রে লেখা থাকে পি জি, অর্থাৎ পেরেন্টাল গাইডেন্স,

অর্থাৎ সে ছবি বাচ্চাদের দেখা উচিত কি না তা বাবা-মা বুঝবেন। 'আর' মার্কা অর্থাৎ রেসট্রিকটেড। ষোলো বছরের কম ছেলেমেয়েদের এই ছবি না দেখাই কাম্য। এর পরেরটি হল 'এক্স', তা অবশ্যই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য। শুধু যৌন দৃশ্যের জন্যই নয়, বিষয়বস্তুর জন্যও।

এর পরেও আছে 'ডবল্ এক্স'। সেগুলো একেবারেই হার্ড কোর পর্নোগ্রাফি। আমি আগেই বলেছি, এদেশের ভদ্র-শিক্ষিত লোকরা তো বটেই, এমনকী ছাত্র-ছাত্রীরাও ওইসব ছবি দেখা পছন্দ করে না। সেই জন্যই ডবল এক্স ছবির বাজার মোটেই ভালো নয়। তবু যে ওইসব ছবি তৈরি হচ্ছে, তার কারণ ওগুলো তোলার খরচ খুব কম। পাহাড়, সমুদ্র বা ঘোড়া ছোটানোর আউটডোর শুটিং তো দরকার হয় না, কয়েকখানা শরীর পেলেই কাজ চলে যায়। ওইসব ছবির বেশিরভাগ দর্শকই নাকি বিদেশি টুরিস্টরা। বিদেশে গিয়ে অনেকেই একটু-আধটু দুষ্টুমি করতে চায়।

এক বিশ্ববিদ্যালয়ের রত্ন রঙ্গালয়ে (বিজু থিয়েটার) একই দিনে দুটি ছবি ছিল। ইটালির পাওলো পাসোলিনির 'অ্যারেবিয়ান নাইটস' আর গ্রিফিথ্-এর বহু পুরোনো ছবি বার্থ অব আ নেশান। পাসোলিনির অ্যারেবিয়ান নাইটস এক্স মার্কা ছবি, তা ছাড়াও এর রগরগে যৌন দৃশ্যের কথা অনেক পত্র-পত্রিকায় লেখা হয়েছে। সুতরাং ধরেই নিয়েছিলুম, অ্যারেবিয়ান নাইটসের টিকিটের জন্য বিরাট লাইন পড়বে, এমনকী মারামারিও হতে পারে। টিকিট কাটতে গিয়ে আমি অবাক। গ্রিফিথ-এর ছবির জন্যই লাইন অনেক বড়। বার্থ অফ আ নেশান ১৯১৫ সালের ছবি, তা দেখার জন্য একালের যুবক-যুবতিদের এত উৎসাহ সত্যি বিস্ময়কর। একটি যুবককে আমি জিগ্যেস করলুম, তোমরা অ্যারেবিয়ান নাইটস দেখতে আগ্রহী হলে না? সে বলল, ওই ছবিটা সম্পর্কে আগেই কাগজে পড়েছি, বুঝেছি, এমন কিছু দেখবার মতন নয়।

এই রকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আরেকবার। এটা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, তার বাইরে।

পাশাপাশি দুটো সিনেমা হলের একটিতে হচ্ছে 'বডি হিট', অন্যটিতে 'ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট লাইক ডে অ্যান্ড নাইট'। প্রথম ছবিটির অনেকখানি পরিচয় আছে তার নামের মধ্যে। এক ধনী ব্যবসায়ী তরুণী স্ত্রী তার শরীরের অত্যধিক উত্তাপের তাড়নায় গোপন প্রেমিককে নিয়মিত শয়ন কক্ষে নিয়ে আসে। তারপর তারা দু-জনে মিলে স্বামীটিকে খুন করে ইত্যাদি। অর্থাৎ যৌনতা ও রহস্যকাহিনি মেশানো। এক্স মার্কা ছবি। আর দ্বিতীয়টি একটি জার্মান ছবি, বিশ্ব দাবা প্রতিযোগিতার এক অংশগ্রহণকারীর মানসিক ঝড় ও অতিরিক্ত আত্মগরিমার বিশ্লেষণ। এই দ্বিতীয় ছবিটি লোকে উৎসাহ নিয়ে দেখছে, আলোচনা করছে। আর প্রথম ছবিটির হলে মাত্র পঁচিশ-তিরিশজন দর্শক, টিকিটের দাম কমিয়ে দিয়েও তারা লোক টানতে পারছে না।

সেন্সর ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এই একটা লাভ হয়েছে, নিষিদ্ধ দৃশ্য বলতে এখন আর কিছু নেই, সেইজন্যই শুধু ওই ধরনের দৃশ্য দেখবার জন্যই কেউ এখন আর সিনেমা হলে যাওয়ার আগ্রহ বোধ করে না।

॥ ৩৯ ॥

একদিন বিকেলবেলা ভাবলুম, তা হলে নায়েগ্রাটা ঘুরে আসা যাক। এত কাছে এসে একবার নায়েগ্রা দর্শন না করে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

কাছে মানে অবশ্য তিনশো সাড়ে তিনশো মাইল। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি যেমন কাছেই। বাসে লাগে ছ-সাত ঘন্টা। কেটে ফেললুম রাত্তিরের বাসের টিকিট। ঝাঁকুনিহীন রাস্তা, নিশ্চিন্তে ঘুমোনো যায়, ভোরবেলা চোখ মেলেই দেখলুম বাফেলো পৌঁছে গেছি।

প্রথমবার জব্বলপুর যাওয়ার সময় আমার ধারণা ছিল, ট্রেন থেকে নেমেই মার্বেল রক

দেখতে পাব। কিন্তু জব্বলপুর স্টেশন থেকে কোনও পাহাড়ই দেখতে পাওয়া যায় না, মার্বেল রক দেখতে হয় নৌকোয় চেপে। সেই রকমই, আমার মনে বোধহয় এই রকম একটা ছবি ছিল যে বাফেলো স্টেশনে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই শুনতে পাব বিশাল জলপ্রপাতের শব্দ, বাতাসে উড়বে জলকণা, আকাশে আঁকা থাকবে রামধনু।

বলাই বাহুল্য, সেসব কিছুই দেখলুম না, বাফেলো বাস স্টেশনটি অন্য আর পাঁচটা স্টেশনেরই মতন। বরং একটু যেন নিষ্প্রাণ।

কোনও নতুন জায়গায় পৌঁছলে কিছুক্ষণ একটা অনিশ্চয়তার অস্বস্তি থাকে। এখানে অবশ্য আমার তা নেই। নিউ জার্সি থেকে ভবানী আর আলোলিকা আগেই এখানে ওঁদের আত্মীয় কল্লোল আর টুনুকে খবর দিয়ে রেখেছেন। আমার সঙ্গেও কল্লোলের একবার টেলিফোনে কথা হয়েছিল, সুতরাং সবই ঠিকঠাক। তবে, কার কাছে যেন শুনেছিলুম, কল্লোল একটু ঘুমকাতুরে, খুব ভোরে তাকে বাস স্টেশনে উপস্থিত হতে বলা একটা নিষ্ঠুরতা। আমি পৌঁছেছি ভোর সাড়ে পাঁচটায়। এক্ষুনি কল্লোলকে ফোন না করে আমি কফি আর হট ডগ নিয়ে বসে গেলুম এক জায়গায়। তারপর সময় আর কাটতেই চায় না। একটা স্থানীয় সংবাদপত্র টেনে নিলুম। এইসব স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে এত বেশি স্থানীয় খবর থাকে যে তাতে বাইরের লোক কোনও রস পায় না। বাফেলো শহরের ট্রাফিক জ্যাম নিয়ে এক পৃষ্ঠা জোড়া আলোচনা পড়ে আমার কী লাভ! কিংবা এখানকার পুরোনো জেলখানাটি ভেঙে আধুনিক ধরনের জেলখানা ভবন বানানো হবে কি না সে সম্পর্কে আলোচনা। আমি এখানে দু-এক দিনের বেশি থাকব না। ট্রাফিক জ্যামে ভোগবার ভয় আমার নেই কিংবা এখানকার জেলখানায় পদার্পণ করার গৌরবময় সুযোগও বোধহয় আমার জুটবে না।

সাতটা পনেরোর সময় যখন বাইরে বেশ চড়া রোদ উঠেছে, তখন আমি ফোন করলুম কল্লোলকে। সে বলল, নীললোহিত, তুমি এসে গেছ। দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি। বাস স্টেশন থেকে ওদের বাড়ি যথেষ্ট দূরে। তবু সে প্রায় কয়েক মিনিটের মধ্যেই এসে গেল ঝড়ের বেগে। দেখলেই বোঝা যায়, সে সদ্য বিছানা ছেড়ে উঠেই কোনও ক্রমে জামা-প্যান্ট গলিয়ে চলে এসেছে। চোখ এখনও ভালো করে খোলেইনি।

কল্লোলকে আমি আগে কখনও দেখিনি, কিন্তু প্রথম দেখেই চেনা-চেনা লাগল। পাতলা, মজবুত শরীর, মুখে হালকা দাড়ি। ওর চেহারাতেই যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ছাপ আছে। ঠিক তাই, কল্লোল বসু যাদবপুরের ইঞ্জিনিয়ার। আমি নিজে যদিও কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকবার যোগ্যতাই অর্জন করতে পারিনি, তবু বন্ধুবান্ধবদের পয়সায় চা-খাবার জন্য কলকাতা-যাদবপুর-রবীন্দ্রভারতী ইত্যাদি সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেই গেছি। সেই জন্য ছাত্রদের আলাদা-আলাদা টাইপগুলো জানি।

কল্লোলকে যদিও এখনও ছাত্র-ছাত্র দেখায়, কিন্তু আসলে সে এখানে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে। তার এখানকার কোম্পানি তাকে প্রায়ই চিনে পাঠায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে।

গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার পর কল্লোল বলল, বুঝলে ভাই, নীলু, প্রত্যেকদিন ভোরবেলা আমায় চাকরির জন্য দৌড়োতে হয়। এ দেশের চাকরিতে বড্ড খাটিয়ে মারে। আজ আমার ছুটির দিন, সেই জন্য বিছানা থেকে উঠতেই ইচ্ছে করছিল না।

আমি কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলুম, আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে আবার বলল, না, কিন্তু-কিন্তু করবার কিছুই নেই, আমাদের এখানে কেউ এলে আমরা খুব খুশি হই, খুব চুটিয়ে আড্ডা দিই।

আর কিছুক্ষণ যেতে-যেতেই ওর সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। বেরিয়ে পড়ল অনেক চেনা শুনো। ওর দুজন বন্ধু আমারও বন্ধু। তাদের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল আন্দামান যাওয়ার পথে জাহাজে।

কল্লোল আমায় জিগ্যেস করল, তুমি তো এদেশের অনেক জায়গায় ঘুরছ। কেমন লাগছে?

এক কথায় এর উত্তর দেওয়া যায় না। আর যদি একটামাত্র শব্দেই উত্তর দিতে হয়, তা হলে বলতে হয়, ভালোই।

কল্লোল বলল, আমাদের মতন এত বেশিদিন থাকতে হলে ভালো লাগত না।

আমি চমকে উঠে বললুম, কেন, তোমার ভালো লাগে না?

—আমি তো প্রায়ই ফিরে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি!

এটা খুবই আশ্চর্যের কথা। কারণ, কল্লোলের দাদা-বউদি, বাবা-মা সবাই থাকেন এখানে। একই বাড়িতে নয়, কাছাকাছি। বলতে গেলে গোটা পরিবারটাই এ দেশে। সবাই সুপ্রতিষ্ঠিত। তবু তার মন দেশের জন্য ব্যাকুল, এটা বিস্ময়কর তো বটেই।

বাফেলো শহরটি তেমন সুদৃশ্য নয়। কেমন যেন ন্যাড়া-ন্যাড়া ভাব। কল্লোলরা থাকে শহর ছাড়িয়ে খানিকটা বাইরে, ওদের রাস্তার নাম প্যারাডাইজ রোড, এই নামটিকে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষী বলা যায়। কিন্তু ওদের বাড়িটি চমৎকার। বাড়িটি নতুন কেনা হয়েছে, এখনও বেশি আসবাবপত্র আসেনি। এইরকম বাড়িই আমার দেখতে ভালো লাগে, বেশ একটা খোলামেলা ভাব পাওয়া যায়। অত্যধিক জিনিসপত্রে ঠাসা বাড়িগুলোতে ঢুকলে যেন দম বন্ধ হয়ে আসে।

দরজা খুলে দিল কল্লোলের স্ত্রী টুনু। তাকে দেখে চমকে উঠলুম। ঠিক মনে হয় আগে দেখেছি। দেশপ্রিয় পার্কের সামনে কিংবা সাদার্ন এভিনিউ ধরে রঙিন ছাতা মাথায় এরকম একটি যুবতিকে কি আমি হাঁটতে দেখিনি? কিংবা ছবিতে দেখেছি? দক্ষিণ কলকাতার সুন্দরী বললেই এইরকম চেহারার একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে।

কল্লোল তার স্ত্রীকে বলল, তুমি একে চা-টা খাওয়াও, আমি ততক্ষণে আর একটু ঘুমিয়ে নিই!

টুনু শুধু উজ্জ্বল রূপসি নয়, তার বেশ একটা ব্যক্তিত্ব আছে। খুব সুন্দর গল্প বলতে পারে সে। লুচি ভাজতে-ভাজতে সে আমায় অনেক গল্প শোনাল। সত্যিই সে দক্ষিণ কলকাতার একটি বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে। অনেক ভাইবোনের সঙ্গে সে মানুষ হয়েছে, সেই সব স্মৃতি তার মনে এখনও জ্বলজ্বল করে। তার মায়ের অনেক কথা সে এমন চমৎকারভাবে বর্ণনা করল যে আমার মনে হল, টুনু যদি লিখত, তা হসে সে নিখুঁত চরিত্র সৃষ্টি করতে পারত।

টুনুর যে মানুষের চরিত্র পর্যবেক্ষণ করার বিশেষ ক্ষমতা আছে, তার পরিচয় পরে আরও পেয়েছি। আমরা যাদের কাছাকাছি যাওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারি না, যেমন কোনও নামকরা সাহিত্যিক বা সিনেমা পরিচালক বা অভিনেতা-অভিনেত্রী বা গায়ক-গায়িকা, তাঁদের অনেককেই এরা বেশ ভালো চেনে। যাঁরা নিউ ইয়র্কে বেড়াতে আসেন, তাঁরা অনেকেই একবার নায়েগ্রা দেখবার জন্য বাফেলো ঘুরে যান। তাঁদের আতিথ্য দেয় কল্লোল বা তার দাদা কুশল। কলকাতা থেকে কখনও নাটকের দল বা গানের দলও নিয়ে যায় এরা। মৃণাল সেন, উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, স্মিতা পাতিলের মতন সব খ্যাতিমানরা এখানে এসে থেকেছেন শুনেই তো আমি রোমাঞ্চিত বোধ করলুম। ভাগ্যিস নেহাত চেনাশুনোর জোরে আমিও এখানে জায়গা পেয়ে গেছি!

বিখ্যাত লোকদের নানান দুর্বলতাও বেশ লক্ষ্য করে দেখেছে টুনু। স্মিতা পাতিলের বেশি বেশি বিদ্যা জাহিরপনা কিংবা শর্মিলা ঠাকুরের মেমসাহেবির নানা কাহিনি শুনে আমি বেশ কৌতুক বোধ করি।

দুপুরবেলা কল্লোলের দাদা-বৌদি এসে পড়ায় আরও জমাট আড্ডা জমে গেল। কলকাতা থেকে কত দূরে এই বাফেলো, কিন্তু আড্ডাটা ঠিক কলকাতার মতন।

কুশলের খুব ঝোঁক সিনেমার দিকে। সে বাংলা সিনেমার অনেক খবর রাখে, একটা মুভি ক্যামেরা কিনেছে। কোনও একদিন সে নিজেই একটা ফিল্ম তুলবে।

এইবার তো একবার নায়েগ্রা দেখতে যেতেই হয়। কিন্তু কে নিয়ে যাবে? কল্লোল বলল,

আমি নিয়ে যাচ্ছি, কুশল বলল, না, না, তুই থাক আমি নিয়ে যাচ্ছি। অর্থাৎ দুজনের কারুর খুব ইচ্ছে নেই। কল্লোলের বউদি কিংবা টুনু যে যাবে না, তা তারা আগেই বলে দিয়েছে। এই অনিচ্ছে খুব স্বাভাবিক। আমার বন্ধু পার্থসারথি চৌধুরি এক সময় ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন দার্জিলিং-এ। কলকাতা থেকে যারাই বেড়াতে যেত সকলেই বায়না ধরত টাইগার হিলে বিখ্যাত সূর্যোদয় দেখার। এইভাবে দু'বছরে অন্তত পঞ্চাশ বার টাইগার হিলে গিয়ে সূর্য ওঠা দেখতে হয়েছে তাঁকে। আমিই তো তাঁর সঙ্গে অন্তত তিনবার গেছি। তার ফলে টাইগার হিলে সূর্যোদয়ের ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব বীভৎস ও বিকট মনে হয় এখন তাঁর কাছে। কেন যে লোকে ভোরবেলা উঠে ওই জিনিস দেখবার জন্য ছোটে।

নায়েগ্রা সম্পর্কেও কল্লোলদের এই রকমই মনোভাব হবে নিশ্চয়ই।

আমি সঙ্কুচিত বোধ করলুম একটু। বেশ তো আড্ডা হচ্ছে, এই আড্ডা ভেঙে নায়েগ্রা কি দেখতেই হবে? না দেখলেই বা ক্ষতি কী? ছবি টবিতে তো অনেকবার দেখা আছে।

কিন্তু আমাকে বাফেলোতে এসেও নায়েগ্রা না দেখে ফিরে যাওয়ার রেকর্ড করতে দিতে ওরা রাজি নয়। এবং অতিরিক্ত ভদ্রতা দেখিয়ে দুই ভাই-ই এক সঙ্গে যেতে উদ্যত হল, আমার আপত্তি তারা শুনল না।

ওদের বাড়ি থেকে নায়েগ্রা প্রায় দশ-বারো মাইল দূরে। কিংবা কিছু বেশিও হতে পারে। গুঁড়ো-গুঁড়ো বৃষ্টির মধ্যে আমাদের গাড়ি ছুটে চলল, জলপ্রপাতের দিকে।

নায়েগ্রা নদীতে আমেরিকা ও কানাডার সীমানা। নদীটি যেখানে প্রপাতিত হয়েছে, সেই মুখের কাছটাতেই একটা দ্বীপ, ফলে প্রপাতটি দু-ভাগ হয়ে গেছে। এক দিকেরটি আমেরিকার, অন্য দিকেরটি কানাডার। তবে এই একটা ব্যাপারে কানাডা জিতে আছে, তাদের দিকের নায়েগ্রাই বিশাল এবং আসল দর্শনীয়। শুধু আমেরিকান দিকটি দেখে ফিরে এলে কিছুই প্রায় দেখা হয় না।

আগে ভারতীয়দের কানাডায় যাওয়ার ব্যাপারে কোনও বাধা ছিল না। এই যাত্রার প্রথমে আমিই তো কানাডায় ঢুকেছি বিনা বাধায়। কিন্তু এর মধ্যে খালিস্তান আন্দোলনকারী একদল শিখ কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় চাওয়ার ফলে কানাডার সরকার এখন ভারতীয়দেরও বিনা ভিসায় কানাডা সীমান্ত পার হতে দেয় না। আমি অবশ্য এই সব খবর টবর জেনে আগেই ওয়াশিংটন ডি সি থেকে ভিসা করিয়ে এসেছি।

বিশাল ব্রিজ পেরিয়ে চলে এলুম কানাডার দিকে। কল্লোল ও কাজলের ভিসার দরকার নেই, কারণ ওরা আমেরিকায় বসবাসকারী। জলপ্রপাতটির দিকে এগোতে-এগোতে আমি একটু-একটু নিরাশ হলুম। মানুষের দাপটে প্রকৃতির মহিমা এখানে খর্ব হয়ে গেছে। আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে ডঃ লিভিংস্টোন যেদিন প্রথম ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেন, তাঁর সেই বিস্ময়ের কথা আমরা একটু-একটু অনুমান করতে পারি। একদিন এখানেও নিশ্চয়ই জঙ্গল-টঙ্গল ছিল, তার মধ্যে এই এক নদীর বিরাট অধঃপতন নিশ্চয়ই সবাইকে চমকে দিত। কিন্তু এখন এই জলপ্রপাতকে উপলক্ষ করে গড়ে উঠেছে রীতিমতন এক বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রচুর দোকানপাট, হোটেল, টাওয়ারে উঠে দেখবার ব্যবস্থা, রাত্তিরবেলা আলোকসম্পাত, আরও কত কাণ্ড! প্রকৃতি নিয়ে এমন ব্যাবসাদারি আমার পছন্দ হয় না। হোটেল-ফোটেল থাকবেই জানি, কিন্তু কিছুটা দূরে সেসব করা যেত না? অন্তত এক মাইল ফাঁকা জায়গা দিয়ে হেঁটে হঠাৎ দেখতে পেলে কত বেশি ভালো লাগত! তার বদলে গাড়ি চেপেই উপস্থিত হলুম একেবারে নায়েগ্রার গায়ের ওপর।

আমরা ইস্কুলের ভূগোলে 'নায়েগ্রা' নামটাই পড়েছি, কিন্তু বানান অনুযায়ী এর সঠিক উচ্চারণ বোধহয় 'নায়েগ্রা' কিংবা 'নায়েগারা'। আমরা অবশ্য নায়েগ্রাই বলব। প্রথম দর্শনে এর বিশালত্ব সত্যিই বুকে ধাক্কা মারে। আমরা ছেলেবেলায় রাঁচির হুড্রু জলপ্রপাত দেখে মুগ্ধ হয়েছি। হঠাৎ সেই হুড্রুর কথা মনে পড়ায় একটু দুঃখ হয়। হুড্রুও বেশ জমকালো জলপ্রপাত ছিল, এখন শুকিয়ে গেছে,

কেন তা কে জানে! নায়েগ্রা যাতে শুকিয়ে না যায়, সেজন্য অবশ্য দুই দেশের সরকার আগেই চুক্তি করে রেখেছে, জলবিদ্যুতের জন্য কেউই নির্দিষ্ট পরিমাণ জলের বেশি টানতে পারবে না।

কল্লোল ও কাজল জানাল যে নায়েগ্রা জলপ্রপাতের একেবারে তলা পর্যন্ত নৌকোয় যাওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু এখন শীত পড়ে যাওয়ায় সেই নৌকো সার্ভিস বন্ধ আছে। আর কিছুদিন পরে এই জলপ্রপাতটিই বরফে জমে যাবে প্রায় সবটা। এখন আর একরকমভাবে খুব কাছাকাছি গিয়ে দেখা যায়। সেখানে আমার যাওয়া উচিত।

ওরা দুই ভাই আমার জন্য অনেক স্বার্থত্যাগ করেছে, কিন্তু সেই পর্যন্ত আর কেউ সঙ্গে যেতে রাজি হল না। ওরা আমাকে ব্যবস্থাটা বুঝিয়ে দিয়ে ওপরে অপেক্ষা করতে লাগল।

পাথর কেটে বিরাট সুড়ঙ্গ বানিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে নামতে হয় লিফটে। তারপর ভাড়া করা ওয়াটার প্রুফ ও জুতো পরে যেতে হয় এক ল্যাবিরিনথের মধ্য দিয়ে। এখানেই সাহেব জাতির কারিকুরি। অত বড় সাংঘাতিক এক জলপ্রপাতের একেবারে মাঝখানে নিয়ে যায় দর্শকদের। হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যায়। অবশ্য জল ছুঁতে গেলে আর রক্ষে নেই, প্রচণ্ড ঝাপটে টেনে নিয়ে যাবে কিংবা হাত ভেঙে দেবে।

এখানে সঙ্গী হিসেবে এক বাঙালি দম্পতিকে পেয়ে আমার বেশ সুবিধেই হল। বেশ বাংলায় গল্প করতে-করতে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে দেখা গেল বিভিন্ন সুড়ঙ্গ থেকে বিভিন্ন রকমের এই বিশাল ব্যাপারটি। ওপরে উঠে আসবার পর আমাদের খুশি করবার জন্যই যেন কুয়াশা কেটে গিয়ে বেরিয়ে এল রামধনু। বেশ ছবি-টবিও তোলা হল।

ফেরার পথে কল্লোল হঠাৎ জিগ্যেস করল, নীলু, তুমি এবারে পুজো সংখ্যাগুলো পড়েছ; তোমার সঙ্গে কিছু আছে?

আমি বললুম, না, আমি তো চার পাঁচ মাস ধরে ঘোরাঘুরি করছি। এ বছরই প্রথম একটাও বাংলা পুজো সংখ্যা চোখে দেখিনি।

কল্লোল বলল, জানো, আমি যখন প্রথম এদেশে প্লেন থেকে নামি, আমার হাতে ছিল দু-তিনটে মোটা-মোটা পুজো সংখ্যা। বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গে পুজো সংখ্যা না পড়লে আমার ভাত হজম হত না। তারপর প্রথম কয়েক বছর দেশ থেকে পুজো সংখ্যা আনাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতুম। এখন...সব কিছু বদলে গেছে...বছরের পর বছর কেটে যায়, একটাও পুজো সংখ্যা চোখে দেখি না। মানুষ এভাবেও বদলে যায়।

॥ ৪০ ॥

বসে আছি ক্লিভল্যান্ড বাস স্টেশনে। এই শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, তাই এখানে আর থাকা হবে না। যদিও ক্লিভল্যান্ডে বাঙালির সংখ্যা অনেক, বেশ ধুমধাম করে দুর্গাপুজো হয় শুনেছি।

আমি যদিও এদেশের দুর্গাপুজো দেখিনি একটাও, তবে অনেক গল্প শুনেছি। যুক্তরাষ্ট্রের সব বড় শহরেই বাঙালির দুর্গাপুজো হয়, কোনও-কোনও শহরে একাধিক। এখানকার বাঙালিরা পুজোর ব্যাপারটা বেশ আধুনিক করে নিয়েছে। পঞ্জিকার তোয়াক্কা করে না। যেহেতু ছুটি পাওয়ার কোনও উপায় নেই, তাই পশ্চিমবাংলার দুর্গাপুজোর দিনের কাছাকাছি কোনও শনি বা রবিবারে পুজো হয় এখানে। চারদিন ধরে নয়, একদিনেই। কোথাও নাকি পুজো হয় মোট চার ঘন্টা, প্রথম ঘন্টায় সপ্তমী আর চতুর্থ ঘন্টায় বিজয়ার কোলাকুলি। শাস্ত্রকাররা তো বলেই দিয়েছেন, প্রবাসে নিয়ম নাস্তি।

আমার ইচ্ছে এখন শিকাগো যাওয়ার। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে নিউ ইয়র্কের দিকে চলে আসার পর আবার শিকাগোর দিকে ফিরে যাওয়াটা অনেকের কাছে পাগলামি মনে হতে পারে। কিন্তু বাসের

সিজ্‌ন টিকিট কেটে নিয়েছি, এখন এত বড় দেশটার যেখানে খুশি যেতে পারি। আমার আর অতিরিক্ত ভাড়া লাগে না।

চোখে কালো চশমা, হাতে একটা ছড়ি, মাথার চুল লালচে রঙের একজন প্রৌঢ় বলশালী সাহেব আমার পাশে এসে বসলেন। তারপর পকেট থেকে সিগারেট দেশলাই বার করে ধরাতে গিয়ে দেশলাই-এর পাতাটা পড়ে গেল মাটিতে। লোকটি নীচু হয়ে হাতড়ে-হাতড়ে দেশলাইটি খুঁজতে লাগলেন, কিন্তু ঠিক সেটা ছুঁতে পারছেন না। আমি দেশলাইটি তুলে দিলুম ওঁর হাতে।

লোকটি বললেন, থ্যাঙ্কস্‌! আচ্ছা বলো তো, পাঁচ নম্বর গেটে যে বাসটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটা কি ডেট্রয়েটের?

আমি বললুম, না। ও বাসটা তো দেখছি সল্টলেক যাচ্ছে।

প্রৌঢ়টি বললেন, আমার বাসটা যে কোন গেটে আসবে, কখন ছাড়বে কিছুই বুঝতে পারছি না। আজকাল এই এক ফ্যাশান হয়েছে। অ্যানাউন্স করে না, বাস টাইমিং টিভি-তে দেখায়। তাতে আমার মতন লোকের কী সুবিধে হয়?

এবারে লক্ষ করলুম, লোকটির হাতের ছড়িটি সাদা রঙের। অর্থাৎ লোকটি অন্ধ।

সত্যিই তো, এখন অনেক জায়গাতেই টিভি-তে বাসের খবরাখবর দেখা যায় শুধু। তাতে আমাদের সুবিধে হলেও অন্ধদের কথা তো চিন্তা করা হয়নি।

আমি বললুম, আপনি কোথায় যাবেন? আমি জেনে দিতে পারি?

তুমি আমার জন্য এটুকু কষ্ট করবে? দ্যাট্‌স অফুলি কাইন্ড অফ্‌ ইউ!

ঘুরে এসে জানালুম, ওঁর ডেট্রয়েটের বাস ছাড়তে আরও ঠিক এক ঘন্টা বাকি আছে। পাঁচ নম্বর গেটেই্‌ বাস ছাড়বে।

ভদ্রলোক আবার প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তারপর জিগ্যেস করলেন, তুমি কি ব্রিটিশ? তোমার উচ্চারণ শুনে মনে হচ্ছে—

আমি চমৎকৃত হলুম। আমার টুটো-ফুটো ইংরেজি শুনে এরকম কমপ্লিমেন্ট আগে আর কেউ দেয়নি।

—না আমি ভারতীয়। এ দেশের ভারতীয় নয়, ভারতের ভারতীয়।

লোকটি একটু চিন্তা করে বলল, তোমাদের ভারত এক সময় ব্রিটিশ কলোনি ছিল না? আমার মনে আছে, আমার গ্র্যান্ডফাদার তোমাদের দেশের খুব প্রশংসা করতেন। উনি ওঁর বাবার সঙ্গে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে চলে এসেছিলেন এখানে। ওঁদের খুব রাগ ছিল ব্রিটিশদের ওপর।

—আপনারা আইরিশ?

—না, না, আমি আইরিশ নই। আমি অ্যামেরিকান। আমার পূর্বপুরুষ ছিল আইরিশ। অবশ্য, আয়ারল্যান্ড সম্পর্কে আমার মনে একটু দুর্বলতা আছে ঠিকই। এখন যে আয়ারল্যান্ডে মারামারি চলছে, সে জন্য আমি কনসার্নড হয়ে পড়ি মাঝে-মাঝে।

—আপনি সিস্টার নিবেদিতার নাম শুনেছেন?

—সে কে?

—আগে নাম ছিল মিস্‌ মাগারেট নোবল। তিনি আমাদের দেশে গিয়ে হিন্দু হয়েছিলেন, আমাদের দেশের জন্য অনেক কাজ করেছেন।

—না, শুনিনি। আমি অনেক কিছুই জানি না। আমি বেশি লেখাপড়া জানা লোক নই। সারাজীবন কাজ করেছি একটা এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরিতে। এমনকী আয়ারল্যান্ড আমি কখনও দেখিনি। ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনেছি শুধু। ভেবেছিলুম রিটায়ার করার পর সারা পৃথিবী ঘুরতে বেরুব, তখন একবার আয়ারল্যান্ডেও যাব। কিন্তু দু-বছর আগে অ্যাকসিডেন্ট হল, তাতে চোখ দুটো গেল। কোম্পানি অনেক টাকা দিয়েছে অবশ্য, কিন্তু আয়ারল্যান্ড আর আমার দেখা হবে না। তবে ঈশ্বরকে অশেষ

ধন্যবাদ, তিনি শুধু চোখ দুটো নিয়ে আমার প্রাণটা তো বাঁচিয়ে রেখেছেন—

বুঝলুম, ভদ্রলোক কথা বলতে ভালোবাসেন। চোখাচোখি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে সব কথা না শুনলেও চলে। শুধু মাঝে-মাঝে হুঁ-হাঁ দিয়ে গেলেই হল। আমি সন্তর্পণে একটা গল্পের বই খুলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় তিনি জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা বলো তো, অন্ধ হয়ে থাকার চেয়ে কি একেবারে মরে যাওয়া ভালো ছিল?

এরকম অদ্ভুত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সুতরাং আমতা-আমতা করে ধোঁয়াটেভাবে বললুম, সেটা নির্ভর করে, কে কতটা জীবনকে ভালোবাসে—

ভদ্রলোক বললেন, আমি জীবনকে খুবই ভালোবাসি। শুধু বেঁচে থাকাই খুব সুন্দর। যখন কম বয়স ছিল, তখন মনে হত, মৃত্যুটা কিছুই না, যে কোনো সময় মরে গেলেই হয়। কিন্তু এখন বুঝতে পারি, মৃত্যুকে যতক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা যায়, ততই ভালো। তা ছাড়া, জানো, অন্ধ হলে এমন অনেক কিছু দেখতে পাওয়া যায় যা আমি আগে দেখিনি।

—যেমন?

—আমার স্ত্রী অ্যালাবামার মেয়ে। অ্যালাবামা কোথায় জানো?

—দক্ষিণ অঞ্চলে।

—এখানে কি কাছাকাছি কোনও নিগ্রো অর্থাৎ কালো লোক বসে আছে?

—আমি নিজেই তো কুচকুচে কালো।

—ভারতীয় কালো নয়, আমেরিকান কালো?

—না, এখানে আর কেউ বসে নেই।

—আমার স্ত্রী ওই কালোদের একদম দেখতে পারে না। আমার নিজেরও কিছুটা প্রেজুডিস ছিল। আমার মেয়ে একটা কালো ছেলের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করত, আমার ছেলের বন্ধুরা তাকে খুব ঠ্যাঙাল। তাতে আমরা খুশিই হয়েছিলাম। এখন বুঝতে পারি। মাই গড়, হোয়াট স্টুপিডিটি। মানুষের গায়ের রঙে কী আসে যায়? চোখ থাকতে সেটা বুঝতে পারিনি, সেজন্য এখন আমার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে।

এত সরল ব্যাখ্যা শুনে আমি ঠিক সন্তুষ্ট হতে পারলুম না। আমি কালো লোক বলেই কি লোকটি আমায় খুশি করার জন্য এই কথা বললেন? অবশ্য ওঁর গলায় বেশ একটা আন্তরিকতা আছে।

লোকটি আসলে খুব সরলই। এর পরেও উনি এমন সব সাদামাটা কথা বলতে লাগলেন, যা আসলে খুব সার সত্য হলেও সেসব কথা আমরা আজকাল আর মুখে আলোচনা করি না। যেমন এর পরেই তিনি বললেন, আগে আমার খুব টিভি দেখার বাতিক ছিল। কারখানা থেকে বাড়ি ফিরেই আঠার মতন চোখ আটকে রাখতুম টিভি'র পরদায়। এখন আর টিভি দেখি না। তবে রেডিও শুনি। মাই গড়, চারদিকে শুধু যুদ্ধের খবর আর খুনোখুনি। জীবন এত মূল্যবান, তবু মানুষ মানুষকে মারে কেন? ভগবান আমাদের জীবন দিয়েছেন, অথচ মানুষই তা নষ্ট করে দেয়।

এত সাদাসিধে আমেরিকানের সঙ্গে আগে আমার পরিচয় হয়নি। সুতরাং খানিকটা কৌতুকের সঙ্গেই আমি ওঁর কথা শুনতে লাগলুম।

হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলে উনি আমায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কি রিপাবলিক্যান?

আমি বললুম, আপনি ভুল করছেন, আমি এদেশের নাগরিক নই, বেড়াতে এসেছি মাত্র।

ভদ্রলোক আমার উত্তর গ্রাহ্য না করে বললেন, এই যে রেগান, তুমি একে সাপোর্ট করো? মাই গড, এ তো দেশটার সর্বনাশ করে ছাড়বে। তুমি জানো, এবারের বাজেটে শিক্ষার জন্য টাকা কমিয়ে দিয়ে সেই টাকা ঢালছে অস্ত্র বানাবার জন্য। ইস্কুলের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের খাবারের খরচ পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। মাই গড, এ লোকটা কি বাচ্চাদেরও ভালোবাসে না? এ কি চায়,

ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ায় চর্চা ছেড়ে দিয়ে সবাই সেনাবাহিনীতে নাম লেখাবে?

এরকম আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে রীতিবিরুদ্ধ হবে বলে আমি চুপ করে রইলুম।

ভদ্রলোক আবার বললেন, আমি কালকেই খবরে শুনলুম, নেভাডায় মাটির নীচে আবার একটি আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। এসব কীসের জন্য, বলতে পারো? আমরা আমেরিকানরা শান্তিতে থাকতে চাই। তুমি জানো নিশ্চয়ই, আমাদের সংবিধানে আছে আমরা কোনোদিনই অন্য দেশ আক্রমণ করব না। এটা আমি জানতুম না, রেডিয়োতেই একজন বলল। পেন্টাগানে কতকগুলো বাজপাখি বসে আছে, তাদের ডানায় ভর দিয়ে পৃথিবীটাকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়ার জন্য উড়ে চলেছে এই রিপাবলিকান রেগন। এটা আমি একদিন স্বপ্নে দেখলুম, জানো! মাই গড্, ক্যালিফোর্নিয়ায় একটা যুদ্ধ-বিরোধী শান্তি মিছিলের ওপর পুলিশ হামলা করেছে। এ রকম কথা আগে কখনও শুনেছ?

ভদ্রলোক তাঁর একটা হাত তুলে মাথার চুলে বুলোতে লাগলেন। কালো চশমা-পরা চোখ দুটি আমার দিকে ফিরিয়ে বললেন, আমি যে কারখানায় এতদিন কাজ করেছি, সেখানে অস্ত্র বানানো হয়। আমি নিজেও এতদিন তা বানিয়েছি। সেইসব অস্ত্র পৃথিবীর অন্য অন্য দেশে যায়। এখন আমি বুঝতে পারছি, আমার মতন আরও কত মানুষ অন্ধ হয়, মানুষের হাত-পা ভাঙে, প্রাণও যায়। মাই গড এটা এতদিন আমি খেয়াল করিনি, আমি এত বোকা ছিলাম!

তারপর ধরা গলায় তিনি বললেন, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, তিনি আমায় অন্ধ করেছেন বলেই এখন আমি এসব বুঝতে পারছি। আসলে, যাদের চোখ আছে, তারাই বেশি অন্ধ। তাই না, তুমি এ কথা মানো না?

আমি বললুম, আপনার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগল। আমার বাস এসে গেছে, আমি এবার উঠি?

—যুবক, তুমি কোথায় যাচ্ছ জিগ্যেস করতে পারি?

—আপাতত শিকাগো শহরে।

—যদি সময় পাও, পরশুদিন একবার ডেট্রয়েটে এসো। সেদিন ওখান থেকে আর একটা শান্তি মিছিল বেরুবে। তাতে যোগ দেওয়ার জন্যই আমি যাচ্ছি।

প্রৌঢ় এবারে তাঁর একটা হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি সেই হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলুম। সেই হাতখানি বেশ আত্মীয়ের মতন উষ্ণ।

॥ ৪১ ॥

শিকাগো শহরের নামটির মধ্যেই একটা রোমাঞ্চ আছে। বাল্যকাল থেকেই আমাদের কাছে এই শহরটির সঙ্গে দুটি নাম জড়িত। স্বামী বিবেকানন্দ এবং আল্ কাপন। অবশ্য বাংলায় স্কুল পাঠ্য বিবেকানন্দ-জীবনীতে এখনও এই শহরটির নাম চিকাগো কেন লেখা হয় তা জানি না। আর এযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দস্যু আল্ কাপনের অনেক রোমহর্ষক কীর্তির কথাও আমরা নানান বইতে পড়েছি, ফিল্মেও দেখেছি।

অনেকদিন আগে প্রথমবার শিকাগো শহরে পা দেওয়ার মুহূর্তেও আমার ধারণা ছিল, এই শহরের পথেঘাটে বুঝি সব সময় মাফিয়ারা গিসগিস করছে। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতায় আমার সেই ধারণা খানিকটা সমর্থিতও হয়েছিল। সেবারে উঠেছিলুম ডাউন টাউনে ওয়াই এম সি এ হস্টেলে। দুপুরবেলা খাবারের সন্ধানে সেখান থেকে সদ্য বেরিয়েছি, সাউথ ওয়াবাশ নামে রাস্তার ওপরে হঠাৎ দুদল লোক একটা খণ্ডযুদ্ধ শুরু করে দিল। ঠিক দু-মিনিটের মধ্যে এসে গেল পুলিশের গাড়ি, ততক্ষণে রাস্তা ফাঁকা, শুধু মাঝখানে পড়ে আছে একজন ছুরিবিদ্ধ মানুষ।

আমি এমনই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলুম যে পালাবার কথাও মনে পড়েনি। দাঁড়িয়ে ছিলুম দেওয়াল সেঁটে। একজন পুলিশ আড়চোখে কয়েকবার আমাকে দেখেও কিছু বলেনি অবশ্য। বোধহয় আমাকে ধর্তব্য বলেই মনে করেনি।

কোনও শহরে এসেই এরকম একটা প্রথম অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই সুখকর নয়। কিন্তু আরও কয়েকদিন কাটিয়ে দেওয়ার পর ওরকম দ্বিতীয় ঘটনা কিন্তু আমার আর চোখে পড়েনি। পরে আমার মনে হয়েছিল, শিকাগো শহর ওই ছোট্ট ঘটনাটি মঞ্চস্থ করেছিল বোধহয় শুধু আমাকেই ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য। নইলে, এরকম একটা দৃশ্য কলকাতা, দিল্লি, বোম্বাইতেও এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। মানুষ তো সব জায়গাতেই মানুষকে ছুরি মারছে, নইলে ছুরির ব্যাবসা চলবে কেন?

শিকাগো শহরকে আসলে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। অন্যান্য বড় শহরের মতনই এই শহরটি হিংস্র, তার বেশি কিছু নয়। এক সময় বোধহয় হিংস্রতর ছিল, কিন্তু সেই আল্ কাপনদের দিন আর নেই, এখনকার দিনের মাফিয়াদের কায়দা অনেক সূক্ষ্ম হয়েছে, পথেঘাটে যখন তখন খুনোখুনির দরকার হয় না।

শিকাগো শহরের একটা উগ্র সৌন্দর্যও আছে। আমেরিকার একদিকে নিউ ইয়র্ক অন্যদিকে লস এঞ্জেলিস, মাঝখানে এই শিকাগো। দুই প্রান্তের দুটি শহরের তুলনায় শিকাগো-ও কিছুতেই কম যায় না। নিউ ইয়র্ক আর লস এঞ্জেলিস দুটিই সমুদ্র-উপকূলবর্তী, শিকাগোর কাছে সমুদ্র নেই বটে, তবে আছে লেক মিশিগান। এই হ্রদটিও সমুদ্র-প্রতিম, এর বুকে রীতিমতন জাহাজ চলে।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থেও শিকাগো বাড়ছে এবং ওপরদিকেও মাথা চাড়া দিচ্ছে। সিয়ার্স কোম্পানির বাড়ি যার নাম সিয়ার্স টাওয়ার, সেটা নাকি বর্তমান পৃথিবীর উচ্চতম হর্ম্য। আরও অনেক লম্বা-লম্বা বাড়ি দেখতে গিয়ে ঘাড় অনেকখানি পেছনে হেলে যায়। এর মধ্যে দু-একটি বিশাল বাড়ির নকশা তৈরি করেছেন বাংলাদেশের একজন স্থপতি। কোনও বাঙালির এমন কৃতিত্বের কথা জেনে আমার গর্ব হয়।

আগের বারে সফরে এসে আমি শিকাগোয় এত লম্বা বাড়ির ছড়াছড়ি দেখিনি। লেক মিশিগানের ধার দিয়ে বেড়াতে-বেড়াতে ঠিক জলের বুক থেকে উঠে যাওয়া এক-একটি প্রাসাদ দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। সত্যি জলের ওপরে বাড়ি, কলকাতার অনেক মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং-এর যেমন নীচের তলাটায় শুধু গাড়ি থাকে, এখানে সেরকম রয়েছে মোটরবোট।

আকাশের অবস্থা ভালো নয়। প্রায়ই গুঁড়ো-গুঁড়ো বরফ পড়ছে। শিকাগোর তুষার ঝড় বিখ্যাত, একবার শুরু হলে আর থামতে চায় না। খবরের কাগজে প্রায়ই সেরকম ঝড়ের পূর্বাভাসের কথা জানাচ্ছে। আমার ইচ্ছে শুধু শিকাগোর আর্ট গ্যালারিগুলো দেখে শেষ করা। কিন্তু তা-ও সম্ভব হবে কি না জানি না।

মদনদা যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বন্ধু গৌতম গুপ্তর সঙ্গে। উঠেছি সেই গৌতম গুপ্তর বাড়িতে। শহরতলিতে সুন্দর নিজস্ব বাড়ি। স্বামী-স্ত্রী ও দুটি ছেলেমেয়ের ছিমছাম সংসার। আমি এখানে চমৎকার আরামে আছি, শুধু একটাই অসুবিধে, এখান থেকে মধ্য শহর বেশ দূরে। আমি সপ্তাহের মাঝখানে এসে পড়ে খুব ভুল করেছি। সারা সপ্তাহ এখানে সবাই খুব ব্যস্ত থাকে, বেরিয়ে যেতে হয় কাক-ডাকা ভোরে, আর সন্ধেবেলা পরিশ্রান্ত হয়ে ফেরার পর আর কারুর বেরুবার উৎসাহ থাকে না। তবে গৌতমবাবু দু-এক সন্ধে আমাকে বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে আমি খুব লজ্জা পাচ্ছিলুম।

দুপুরের দিকে আমি একাই শহরে যাই ট্রেনে চেপে। এখানকার ট্রেনকে যদি আমাদের ট্রাম বলে গণ্য করা যায় তা হলে ভাড়া খুব বেশি। পাঁচ-ছ' ডলার। আমার মতন পকেট-ঠনঠনদের বেশ গায়ে লাগে। এখানে অনেক দোকানের সেলে পাঁচ-ছ'ডলারে একটা জামা কিনতে পাওয়া যায়। সুতরাং ট্রাম ভাড়া একটা জামার দামের সমান?

একদিন দুপুরে বউদির হাতের অতীব সুস্বাদু রান্না খেয়ে সবে মশলা চিবুচ্ছি, এমন সময় বাইরের দরজায় একটা গাড়ি থামল। তারপর এ বাড়ির বেলই বেজে উঠল। বউদি দরজা খুলতেই একটি আঠারো-উনিশ বছরের বাঙালি তরুণ ভেতরে এসে বলল, উঃ রাস্তা খুঁজতে-খুঁজতে হয়রান। যা ঘুরতে হয়েছে না।

ছেলেটিকে আমিও চিনি না, বউদিও চেনেন না।

সে আবার আমার দিকে চেয়ে বললেন, চলুন, চলুন, ব্যাগ গুছিয়ে নিন। আমি বেশি দেরি করতে পারব না।

আমি অবাক হয়ে বললুম, আমায় যেতে হবে? কোথায়?

ছেলেটি একটু ধমকের সুরে বলল, কোথায় মানে? আমাদের বাড়িতে।

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, না, মানে, আমি তো আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না। তা ছাড়া আমি এখানে তো বেশ ভালোই আছি।

ছেলেটি বলল, এখানে আপনি ভালো নেই, তা কি আমি বলেছি? এই বউদি নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক যত্ন করেছেন। অনেক যত্ন তো পেয়েছেন, এবারে আমাদের ওখানে চলুন।

তারপর বউদির দিকে ফিরে সে বলল, কি বউদি, বলুন! আপনার এখানে তো ক'দিন রইলই। এবার নীলুদার কয়েকটা দিন আমাদের কাছে থাকা উচিত নয়?

বউদি বললেন, আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।

ছেলেটি বলল, আমার নাম বললেও আমায় চিনতে পারবেন না। তা ছাড়া নাম দিয়ে কী দরকার? মনে করুন আমি একজন মানুষ। আমার সঙ্গে যেতে আপনার আপত্তি আছে নীলুদা?

আমি বললুম, না, না, আপত্তি থাকবে কেন? তবে ঠিক বুঝতে পারছি না কোথায় যেতে হবে।

ছেলেটি এবার আমার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, মনে করুন আপনাকে আমি কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছি। তারপর আপনার বাড়ির কাছ থেকে র‍্যানসম দাবি করব। কত চাওয়া যায় বলুন তো?

আমি বললুম, আমার বাড়ির লোক বলবে, ওকে যদি আর কখনও না ফেরত পাঠাও তা হলে বরং দু-চার পয়সা দিতে পারি।

ছেলেটি হাহা করে হেসে উঠল।

ছেলেটিকে প্রথম দর্শনেই আমার দারুণ ভালো লেগে গিয়েছিল। ওর মুখে সারল্য আর দুষ্টুমি সমানভাবে মিশে আছে।

সে আবার বলল, আমি কিন্তু সত্যিই আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এসেছি। আমার দাদা বলল, নীললোহিত এসে শিকাগো শহরে থাকবে অথচ আমাদের বাড়িতে একবারও আসবে না? যা তো, ধরে নিয়ে আয়।

—তোমার দাদা কে ভাই?

—সুব্রত চৌধুরি।

এবারে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে গেল। এই সুব্রত চৌধুরিকেও আমি কখনও চোখে দেখিনি বটে, তবে দু-একবার টেলিফোনে কথা হয়েছে। আমার এক বন্ধুর বন্ধু। কিন্তু শুনেছিলুম যে সে এখন পড়াশুনো নিয়ে খুব ব্যস্ত, তাই শিকাগোতে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করিনি। আমি শিকাগোতে এসে যে গৌতম গুপ্তর বাড়িতে উঠেছি, সে খবর ওরা পেল কী করে কে জানে?

বউদির কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে আমি আমার পোটলাপুঁটলি নিয়ে উঠলুম ছেলেটির গাড়িতে। গাড়ি ছাড়বার পর আমি জিগ্যেস করলুম, আমার নাম নীলু, তোমার নামটা এবারে জানতে পারি কি?

সে বলল, আমার নাম টুটুল। হোল ওয়ার্লড আমাকে এই নামে চেনে।

আমি বললুম, তা তো বটেই। এই নাম আমি কত জায়গায় শুনে এসেছি।

—আমি যেতে-যেতে কয়েকবার রাস্তা ভুল করব, পুলিশ টিকিটও দিতে পারে, তবে ভয় নেই, অ্যাকসিডেন্ট হবে না। আমি খুব ভালো গাড়ি চালাই।

—আমার অ্যাকসিডেন্টের কোনও ভয় নেই। গোটা একটা বাস উলটে গেলেও আমি অক্ষত থেকেছি। একবার আমি একটা প্লেনে উঠতে পারিনি সময়ের অভাবে, সেই প্লেনটাই দুর্ঘটনায় পড়ে চুরমার হয়ে যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আমি অমর।

টুটুল হোহো করে হেসে উঠে বলল, যাক বাঁচা গেল। আমি ভেবেছিলুম, আপনি গম্ভীর লোক। আমি গম্ভীর লোকদের বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না।

—আমি কিন্তু একবার কথা বলতে শুরু করলে আর থামি না। আমায় জোর করে থামাতে হয়।

গাড়িটা প্রায় একটা মাঠের মধ্যে পৌঁছে গিয়ে থামল। টুটুল বলল, এইবার কোন দিকে? দেখা যাক, ম্যাপে কী বলে!

টুটুলের চেহারাটা এতই বাচ্চা যে ওর লাইসেন্স আছে কি না তাতেই সন্দেহ হতে পারে। আমার অবশ্য এরকম উলটোপালটা গাড়ি চালানো বেশ ভালোই লাগে। সবাই কি পৃথিবীর সব কিছু ঠিকঠাক নির্ভুলভাবে চালিয়ে যাবে?

অবশ্য খুব বেশি ঘুরতে হল না, বিকেলের মধ্যেই আমরা পৌঁছে গেলুম ওদের বাড়িতে। আলাদা বাড়ি না, অ্যাপার্টমেন্ট, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার একেবারে গায়েই বলতে গেলে। মিশিগান হ্রদও খুবই কাছে।

অ্যাপার্টমেন্টে আপাতত আর কেউ নেই। মাঝখানের বসবার ঘরটি দেখলে মনে হয় এই মাত্র যেন এখানে খুব তুমুল আড্ডা চলছিল, হঠাৎ সবাই এক সঙ্গে উঠে গেছে।

টুটুল এরই মধ্যে আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসে বলল, শোনো, নীলুদা, তুমি কী-কী দেখতে চাও সব ছকে ফ্যালো। তোমাকে আমরা প্রত্যেকটি জিনিস ঘুরে দেখিয়ে দেব। তুমি গঙ্গানগরের নাম শুনেছ?

—গঙ্গানগর?

—শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত সাহেবরা গঙ্গা নাম দিয়ে একটা নতুন শহর বানাচ্ছে। সেটা আমি ছাড়া তোমায় আর কেউ দেখাতে পারবে না।

—বাঃ, খুব চমৎকার।

—এখন তুমি একটু একা থাকো। ইচ্ছে হলে কিচেনে গিয়ে চা-টা বানিয়ে নিতে পারো। খিদে পেলে ফ্রিজ খুলে দেখে নিও কী পাও। আর হুইস্কি টুইস্কি পান করতে চাইলে তাও পেয়ে যাবে। এবাড়িতে আমরা কেউ ড্রিংক করি না, তবে অতিথিদের জন্য সব রাখি। আমি এখন একটু ঘুরে আসছি, আমার ক্লাস আছে।

বলেই সে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। একটি অপরিচিত বাড়িতে আমি সম্পূর্ণ একা। প্রথমে একটু অস্বস্তি লাগলেও সেটা কাটিয়ে ফেললুম।

আরাম কেদারায় বসে বইটই পড়ছি, এমন সময় দরজায় খুটখুট শব্দ হল। কেউ যেন খুব সন্তর্পণে তালা খুলছে। এই রে, চোরটোর নয়তো। শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল।

দরজা খুলে ঢুকল একজন বলিষ্ঠকায় তরুণ। আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, আপনিই কি সুব্রত চৌধুরি?

তরুণটি বলল, না। আমার নাম বাবলু। আপনি নীলুদা তো? টুটুল আপনাকে ঠিক মতন নিয়ে এসেছে, কোনও অসুবিধে হয়নি?

আমি বললুম, না, না। খুব মজাসে গল্প করতে-করতে এসেছি।

—ও খুব ভালো গাড়ি চালায়, তবে রাস্তা ভুলে যায়। আপনি কিছু খেয়েছেন? খাবার বানিয়ে দেব।

—না, না, আমার খিদে পায়নি। দুপুরে খুব ভারী লাঞ্চ খেয়েছি।

বাবলু তবু চা তৈরি করে ফেলল। তারপর খুব কাঁচুমাচুভাবে বলল, আপনার কি একটু একা থাকতে কষ্ট হবে? আমি এতক্ষণ চাকরি করে এলুম, এবার একটা ক্লাস করতে যাব। টুক করে ঘুরে আসব, অ্যাঁ?

আবার আমি একা। আধঘন্টা বাদে আবার দরজায় সেই রকম খুটখাট শব্দ। আমি ভাবছি, এবার কি টুটুল ফিরল, না অন্য কেউ?

দরজা খুলে প্রথমে ঢুকল একটি মেয়ে। মাথায় কোঁকড়া চুল, মুখখানা প্রতিমার মুখের মতন। আমায় দেখে সে একটু থমকে গেল। তারপর ঢুকল একজন ফরসা চেহারার যুবক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা।

আমি জিগ্যেস করলুম, কাকে চাই? আপনারা ঠিক বাড়িতে এসেছেন তো?

ফরসা যুবকটি হেসে বলল, আপনিই নিশ্চয়ই নীললোহিত? আমার নাম পিন্টু।

আমি বললুম, টুটুল, বাবলু, পিন্টু। বাঃ, খুব চমৎকার নাম। কিন্তু এর মধ্যে সুব্রত চৌধুরি কে?

পিন্টু বলল, আমিই। আর এ আমার স্ত্রী প্রভাতি।

প্রভাতি বলল, ও মা, এই নীললোহিত? আমি ভেবেছিলুম বুঝি ভারিক্কি চেহারার কোনও লোক হবে।

পিন্টু বলল, আজ কার ভাত রাঁধার টার্ন?

প্রভাতি বলল, তোমার।

—কিন্তু আমার যে রাত্তিরে একটা ক্লাস আছে।

—তা হলে ভাতটা আমি করে দিচ্ছি। বাবলু এসে মাংস রাঁধবে।

একটু বাদেই আবার বেরুতে হবে। সুব্রত পুরো পোশাক ছাড়ল না। চায়ের কাপ নিয়ে বসে সে বলল, আপনার কোনও অসুবিধা হবে না। আমরা সবাই পড়ি আবার চাকরিও করি। তবে পালা করে একজন আপনাকে সঙ্গ দেব। আর রাত্তিরে আড্ডা হবে একসঙ্গে। তারপর শনিবার-রবিবার এলে তো খুব বেড়ানো যাবে কেমন?

আমি বললুম, আমার একা থাকা নিয়ে আপনারা চিন্তা করবেন না। আমি মাঝে-মাঝে একাই বাইরে থেকে ঘুরে আসব।

সুব্রত বলল, একা ঘুরবেন? গাড়ি ছাড়া? দেখুন, এই জানলার কাছে আসুন।

সুব্রত জানলার পরদা সরাল। বাইরে অঝোর ধারায় বরফ পড়ছে। এর মধ্যে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোর কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

চমৎকার এদের সংসারটি। একটা মেসের ঘর বলে মনে হতে পারত। কিন্তু প্রভাতি থাকায় পারিবারিক আবহাওয়াটা বজায় আছে। প্রভাতিও বলতে গেলে বাচ্চা মেয়ে, মাত্র কিছুদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে, তার দুই দেওর তাকে নানান ছুতোয় রাগিয়ে দেয় মাঝে-মাঝে।

এ দেশে পড়াশুনোর শেষ নেই। মধ্য বয়েসেও অনেকেই ছাত্র থাকে। এদের মধ্যে সুব্রত ইঞ্জিনিয়ার ও খুব বড় চাকরি করে, তবু সে আরও দু-একটি কোর্স নিয়ে যোগ্যতা বাড়াচ্ছে। তার ছোট দুই ভাইকে সে একে-একে আনিয়েছে দেশ থেকে। ওদের আরও দুই দাদা থাকেন এ দেশে।

পিন্টু-বাবলু-টুটুল আর প্রভাতি যেমন অতিথিবৎসল আর পরোপকারী তেমনি লাজুক। ওরা নিজেদের বিষয়ে কিছু বলে না, কিন্তু দুদিনেই বুঝতে পারলুম, শিকাগোতে কোনও ভারতীয় কোনও

বিপদে পড়লে ওরা নিঃস্বার্থভাবে সাহায্য করবার জন্য ছুটে যায়। কার থাকার জায়গা নেই, কে হঠাৎ এয়ারপোর্টে এসে পড়েছে কিন্তু গাড়ি পাচ্ছে না, সবই ব্যবস্থা করা যেন ওদের দায়িত্ব। শুধু ভারতীয় কেন, বাংলাদেশেরও অনেকে এসে থেকে যায় ওদের কাছে।

সকালে উঠে আমি বসবার ঘরে একটা চেয়ারে বসি। ওরা তিন ভাই আর প্রভাতি দাবা খেলার মতন কখনও দুজন থাকে দুজন বেরিয়ে যায়। কখনও একজন একটা আইটেম রান্না করে চলে যায়, আর একজন এসে অন্য কিছু রান্না করে। এরই ফাঁকে-ফাঁকে আড্ডা। আমিই শুধু কনস্ট্যান্ট ফ্যাক্টর।

তারপর এল শনিবার। আজ সবার ছুটি। আজ তো বেড়াতে যেতেই হবে। কিন্তু সারাদিনই ছুটি যখন, তখন তাড়াহুড়োর তো কিছু নেই। কাপের পর কাপ চা খেয়ে যাচ্ছি। ভাইদের মধ্যে বাবলু নিঃশব্দ কর্মী। আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে সে সংসারের অনেক কাজ সেরে ফেলে। আবার বাইরেও ঘুরে আসে। টুটুল সবচেয়ে ছোট ভাই এবং আদরের, তাকে বিশেষ কাজ দেওয়া হয় না। আর সুব্রত এই পরিবারের কর্তা হিসেবে চেয়ারে বসে নানান রকম নির্দেশ দিতে ভালোবাসে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল করলুম সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সারাদিন আমরা একভাবে বসে আড্ডা দিয়েছি। বাইরে বরফ পড়ছে অঝোরে। এখন আর বেরুবার কোনও মানে হয় না। আমারও খুব একটা গরজ নেই। ঠিক হল, পরদিন আমরা খুব ভোরে উঠে তৈরি হব।

পরের দিন রবিবার। সেদিন আমরা ঘুম ভেঙে প্রথম কাপ চা খেলুম দুপুর সাড়ে বারোটায়। আজও বরফ পড়ার বিরাম নেই। কে আর এই দুর্যোগে বেরুতে চায়।

এর মধ্যে আমি যেন ওদের আত্মীয় হয়ে গেছি। বাইরে বরফ আর ঠান্ডা, তার চেয়ে ঘরের মধ্যেকার আন্তরিকতা ও আড্ডার উষ্ণতা অনেক বেশি উপভোগ্য।

॥ ৪২ ॥

নিউ ইয়র্কে আমার স্কুলের বন্ধু সূর্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল দৈবাৎ এক পার্টিতে। সে যে এদেশে আছে আমি জানতুম না, অনেকদিন ওর সঙ্গে যোগাযোগই নেই। কিন্তু স্কুলের বন্ধুদের কেউ কখনও ভোলে না। সুটটাই পরা লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠকায় মানুষকে দেখেও আমি তার মুখে আদল পেলুম আমার সহপাঠী এক কিশোরের। তার কাছে গিয়ে কাঁধে চাপড় মেরে বলেছিলুম, সূর্য না? সূর্যও সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে বলেছিল, নীলু? তুই?

আমার চেয়েও সূর্যই বেশি অবাক হয়েছিল। কারণ আমাকে ও কোনওদিন নিউ ইয়র্কে দেখবে, এরকম ওর সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না। আমার সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই জীবনে যথেষ্ট উন্নতি করেছে, সূর্য নিজেও একজন ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু ওরা সবাই জানে, শুধু আমারই কিছু হল না, লেখাপড়াতেও সুবিধে করতে পারিনি, চাকরির ব্যাপারেও গাড্ডু পাওয়া, আমি এখনও একটা ভ্যাগাবন্ডই রয়ে গেছি।

স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে ফর্মালিটির ব্যাপার নেই। সুতরাং অন্য কেউ এ পর্যন্ত যে কথা জিগ্যেস করেনি, সূর্য সরাসরি তাই জানতে চাইল, তুই এদেশে কী করে এলি রে নীলু? তোকে কে পাঠাল?

আমি বললুম, সুব্রতকে চিনতিস তো? সেই সুব্রতর মামার বিরাট ট্রাভেল এজেন্সি আছে। কেন জানি না, উনি আমায় খুব ভালোবাসেন। উনি আমায় বিনে পয়সায় একটা রিটার্ন টিকিট দিয়েছেন। আর দিয়েছিলেন দুশো ডলার। তাই নিয়ে ভেসে পড়েছি। তারপর এর-ওর বাড়িতে থাকছি। একদম টাকা ফুরিয়ে গেলে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে ভিক্ষে করি। হরে কৃষ্ণ হরে রাম গানটা এখানে বেশ চলে, সবাই পয়সা দেয়।

আমার কথাটা কতটা সত্যি আর কতটা ইয়ার্কি তা সূর্য হয়তো ঠিক বুঝল না। কিন্তু সে

খুব আফসোস করতে লাগল। কারণ, পরের দিন সকালেই সে নাইজিরিয়া চলে যাবে। আমার সঙ্গে সময় কাটাতে পারবে না।

যাই হোক, সেই রাত্রে সূর্য আমাকে একটা চাবি দিয়েছিল। বলেছিল, তুই যদি কখনও শিকাগোর দিকে যাস, তাহলে আমার বাড়িতে একবার যাস। ছোট্ট জায়গা, কিন্তু তোর ভালো লাগবে। তুই ওখানে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারিস। আমার স্টোরে দেখবি চাল-ডাল মজুত আছে প্রচুর, দেশ থেকে আনা আচার আছে। তুই রান্না করে খাবি। মাসদেড়েক পরেই আমি ফিরে আসব—।

আমি বলেছিলুম, তুই চাবি দিচ্ছিস, যদি আমার ওদিকে না যাওয়া হয়?

সূর্য বলেছিল, তাতে কোনও অসুবিধে নেই। চাবিটা তুই একটা খামে ভরে আমার ঠিকানায় পোস্ট করে দিবি। আর যদি যাস তো ফেরার সময় চাবিটা আমার লেটার বক্সে রেখে আসবি।

সূর্যর সেই চাবিটা এতদিন আমার পকেটেই রয়ে গেছে। শিকাগোতে এসে দোনামনা করতে লাগলুম, যাব কি যাব না। নিউ ইয়র্কে সেই দেখা হওয়ার পর মাস দেড়েক কেটে গেছে, এর মধ্যে সূর্য ফিরে আসতেও পারে। তাহলে একটা চান্স নেওয়া যাক। সূর্যকে পেলে কয়েকদিন বেশ চুটিয়ে ছেলেবেলার গল্প করা যাবে।

সিভার র‍্যাপিডস একটা ছোট্ট শহর। দোকানপাট বা রাস্তার বহর দেখলে অবশ্য ছোট্টত্ব বোঝবার উপায় নেই। কয়েকটি দোকান সত্যিই বিরাট। কিন্তু মার্কিন দেশের সিভার র‍্যাপিডস-এর চেয়ে বড় শহর অন্তত দুশোটা আছে।

সূর্য তার বাড়ির অবস্থান বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিল। সুতরাং খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। একটি বিরাট জলাশয়ের প্রান্তে একটি দশতলা অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। বাড়িটিতে প্রায় চারশো অ্যাপার্টমেন্ট আছে। পুরো একটি পাড়াই বলা যায়। এই বাড়ির মধ্যেই রয়েছে দুটি ঢাকা সুইমিং পুল, যেখানে শীতকালেও সাঁতার কাটা যায়, দুটি টেনিস কোর্ট, তা ছাড়া সনা বাথ্ ও নানারকম খেলার ব্যবস্থা ও লাইব্রেরি। ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপক থাকেন এখানে।

সূর্য এখন ফেরেনি, একতলার অফিস ঘরে খোঁজ নিয়ে জানলুম। তারপর তাদের জানিয়ে আমি চলে এলুম সূর্যর ঘরের দিকে। ওর অ্যাপার্টমেন্ট আটতলায়। চাবি খোলার আগেই শুনতে পেলুম। ঘরের মধ্যে কারা যেন বেশ জোরে-জোরে কথা বলছে। তাহলে কি অন্য কেউ আছে? কিন্তু আমি এসে পড়েছি, এখন তো ফিরে যেতে পারব না। কয়েকবার বেল দিলুম, কেউ দরজা খুলল না। অথচ ভেতরে কথাবার্তা চলছেই। যা থাকে কপালে বলে ঘুরিয়ে দিলুম চাবি।

প্রথমে বসবার ঘর। সেখানে কেউ নেই। পাশে রান্নাঘর। উঁকি দিলুম সেখানে, কারুকে দেখতে পাওয়া গেল না। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে পাশের শয়ন কক্ষ থেকে। কয়েকবার সে দরজায় ঠকঠক করলুম, তাও কেউ সাড়া দিল না। তারপর সেই দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলতেই রহস্যটা বোঝা গেল। টিভি-টা খোলা রয়েছে!

হ্যাঁ, ইস্কুল-জীবনেও সূর্য বেশ ভুলোমনা ছেলে ছিল বটে, এখানে এসেও শোধরায়নি। যাওয়ার সময় টিভি বন্ধ করতে ভুলে গেছে, দেড় মাস ধরে সেটা একটানা চলছে। দেশে ফিরে গিয়ে সূর্যর মাকে জানাতে হবে এ কথা।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টটা বেশ বড়, একলা মানুষের পক্ষে অঢেল জায়গা। তার শয়নকক্ষের জানলা দিয়ে দেখা যায় সেই জলাশয়টি, আর বসবার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় একটা জঙ্গল।

সূর্যর ভাঁড়ারেও অনেক জিনিস মজুত আছে, চাল-ডাল-আলু-পেঁয়াজ, সূর্যমুখী তেল, আর নানা রকম গুঁড়ো মশলা, হলুদ-লঙ্কা-জিরে আরও কত কী। আর কিছু না হোক আমি খিচুড়ি খেয়েই বেশ কিছুদিন এখানে চালিয়ে দিতে পারব।

হিসেব করে দেখলুম, আমি প্রায় পাঁচ মাস ধরে ইউরোপ, কানাডা ও আমেরিকায় চরকি

বাজির মতন ঘুরছি। এখন এখানে কয়েকদিন একেবারে চুপচাপ বিশ্রাম নিলে মন্দ হয় না। এই শহরে আমায় কেউ চেনে না। আমিও কারুকেই চিনি না। সুতরাং এখানে আমার হবে অজ্ঞাতবাস।

প্রথম দুদিন একলা এই অ্যাপার্টমেন্ট-এ কাটিয়ে দিলুম। একবারের জন্যও বাইরে পা দিইনি। অবশ্য ঠিক একলা নয়, টেলিভিশন আছে সর্বক্ষণের সঙ্গী। প্রথম এসে সেই যে এক ডেকচি খিচুড়ি রেঁধেছি, চারবেলা ধরে তা-ই খাচ্ছি। ফ্রিজে রাখা খিচুড়ি জমে একেবারে শক্ত হয়ে যায়। তার থেকে এক স্লাইস কেটে নিই, ঠিক যেন মনে হয় খিচুড়ির কেক। সেটার সঙ্গে একটু জল মিশিয়ে গরম করে নিলেই হল। খাবারটা আমি বিছানায় শুয়ে-শুয়েই সেরে নিই। রাত্তিরবেলা টিভি-তে সলিড গোল্ড অনুষ্ঠানে নর্তকীদের নাচ, আমি বিছানায় অর্ধেক হেলান দিয়ে শোওয়া, হাতে খাবারের পাত্র —রোমান সম্রাটের সঙ্গে আমার তফাত কী? ছবিটাকে আর একটু নিখুঁত করার জন্য আমি এতে একটা সুরার পাত্র যোগ করতে চেয়েছিলুম, কিন্তু সূর্যর ঘরে ওয়াইন-জাতীয় কিছু নেই, আছে মস্ত বড় কোকাকোলার বোতল। তার থেকেই ঢেলে নিই গেলাসে, কেউ যদি ছবি তোলে তাহলে এই কোকাকোলাকেই রাম মনে হবে।

তৃতীয় দিন সকালে প্রাণটা একটু আনচান করতে লাগল। আর কিছু নয়, ডিমের জন্য। পশ্চিমি সভ্যতা আমাদের প্রত্যেক দিন সকালে ডিম খাওয়ার বদ অভ্যেস ধরিয়ে দিয়েছে। তা ছাড়া খিচুড়ির সঙ্গে ডিম ভাজা অতি উপাদেয়।

আসবার দিন কাছেই একটা শপিং মল দেখে এসেছিলুম। নিজের গাড়ি না থাকলে এখন বেশি দূরে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। কাল সন্ধে থেকে তুষারপাত থামলেও রাস্তায় জমে আছে বরফ। তা ছাড়া, তুষারপাতের সময়ই শীত একটু কম থাকে, রোদ উঠলেই কনকনে শীত। ধরাচুড়ো সব পরে নিয়ে বেরুলাম। কাছেই একটা ব্যাঙ্কের মাথায় তাপাঙ্ক নির্দেশক ঘড়ি আছে। সেখানে দেখলুম, শূন্যের নীচে সাত ডিগ্রি নেমেছে। এই তো সবে শুরু। এখনও ক্রিসমাসের একুশ দিন বাকি। এই সব অঞ্চলে শূন্যের নীচে তিরিশ পর্যন্ত নেমে যায়।

শপিং মলে গিয়েই একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। সামনেই একটা ছোটখাটো ভিড়, মানুষজন গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি এর আগে এ দেশের কোথাও কোনও রাস্তায় এরকম গোল হয়ে দাঁড়ানো ভিড় দেখিনি। এদেশের রাস্তায় পকেটমার ধরা পড়ে না, গাড়ির অ্যাকসিডেন্ট হলেও অন্য কেউ গ্রাহ্য করে না, এমনকী কেউ কারুকে খুন করলেও অন্যরা ফিরে না তাকিয়ে সোজা হেঁটে যায়।

এগিয়ে গিয়ে উঁকি মেরে আরও অবাক হলুম। ভিড়ের মাঝখানে একটা বিরাট শিংওয়ালা হরিণ। হরিণটির একটা পা কোনও কারণে জখম হয়েছে, উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও সে পারছে না। আমাদের দেশে এরকম একটা ব্যাপার হলে সবাই উত্তেজিতভাবে চ্যাঁচামেচি করত, এখানে জনতা একেবারে নিস্তব্ধ। আমি একজন বয়স্ক লোককে ফিসফিস করে জিগ্যেস করলুম ঘটনাটা কী? উনি আমাকে সংক্ষেপে জানিয়ে দিলেন।

কাছাকাছি কোনও জঙ্গল থেকে এই হরিণটা হঠাৎ শহরে চলে এসেছে। দিনের আলোয় এরকমভাবে কোনও হরিণকে কেউ আগে কখনও আসতে দেখেনি। হরিণটা কেন এসে পড়েছে কে জানে! কিন্তু শপিং মলের সামনে অজস্র গাড়ির সামনে পড়ে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। এদিকে-ওদিকে ছুটতে শুরু করে। গাড়ির চালকরা ওকে বাচাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ওরই দোষে একটা গাড়ির সঙ্গে ওর ধাক্কা লেগেছে।

হরিণটার টানা-টানা কাজল আঁকা চোখ, মাথায় শিং-এর ডালপালা, গায়ের চামড়া হলুদ আর সবুজ মেলানো। অতবড় শরীরটা নিয়ে সে অসহায়ভাবে তাকাচ্ছে।

এ দেশের মানুষ হরিণ খুব ভালোবাসে। গোটা আমেরিকা জুড়ে সরীসৃপের মতন অসংখ্য রাস্তা, তার অনেক রাস্তাই গেছে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সেসব রাস্তায় যেতে-যেতে অনেক বোর্ড দেখেছি,

কশান! ডিয়ার ক্রসিং। সেই সব জায়গা দিয়ে সাবধানে, আস্তে গাড়ি চালানো নিয়ম। একদিন রাত্তিরবেলা দীপকদাদের সঙ্গে গাড়িতে আসতে-আসতে হেড লাইটের আলোয় এরকম একটা হরিণকে রাস্তা পার হতেও দেখেছিলুম। কিন্তু শহরের মোটর গাড়ির জঙ্গলের মধ্যে এরকম একটি বন্য হরিণকে কেমন যেন করুণ আর বেমানান লাগে।

হরিণ মারার ব্যাপারে অনেক বিধিনিষেধ আছে। অথচ আহত হরিণটিকে জঙ্গলে কী করে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে, তাই বা কে জানে। পুলিশ এসে গেছে, নানান রকম জল্পনাকল্পনা চলছে। হরিণটা এত জোর শিং ঝাঁকাচ্ছে যে কাছে গিয়ে ওকে ধরাও খুব শক্ত। এদেশের যা ব্যাপার, হয়তো বিশাল এক ক্রেন এনে হরিণটাকে তুলে নিয়ে যাবে। সে দৃশ্য দেখবার জন্য আমি আর সেখানে দাঁড়ালুম না।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে থাকার সময় আমার আর একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হল।

প্রথম দিন ডিম ভাজতে গিয়েই ঘরের মধ্যে কোথায় যেন বেশ জোরে প্যাঁক করে একটা শব্দ হল। একলা ঘরে এরকম কোনও শব্দ শুনলে চমকে উঠতেই হয়। আওয়াজটা এমন যেন কোনও দুষ্টু ছেলে লুকিয়ে থেকে তালপাতার সানাই বাজাচ্ছে। আরও দু-বার ওইরকম প্যাঁক প্যাঁক হতেই কারণটা আন্দাজ করতে পারলুম।

আমার আনাড়ি হাতে ডিম ভাজার জন্য তেল ঢালতে গিয়ে সসপ্যানে একটু বেশি তেল পড়ে গেছে। গ্যাসের আঁচটাও বেশি। তাই ধোঁয়া হয়েছে। ওই প্যাঁকটা হচ্ছে স্মোক অ্যালার্ম। এইসব বড়-বড় বাড়িতে আগুন লাগার খুব ভয়। তাই একটু ধোঁয়া উঠলেই সাবধান করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

স্মোক অ্যালার্ম যন্ত্রটা আমি আগে দেখেছি। কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্টে সেটা কোথায়? খুঁজে দেখলুম, বসবার ঘরের আর শোওয়ার ঘরের দেওয়ালে দুটো সেই গোল যন্ত্র লাগানো আছে।

ধোঁয়া যতক্ষণ না বেরুবে ততক্ষণ মাঝে-মাঝেই এরকম প্যাঁকপ্যাঁক চলবে। শীতের জন্য জানলা খোলার কোনও উপায় নেই। কে যেন আমায় বলেছিল, জল ছিটিয়ে দিলে ওই প্যাঁকপ্যাঁকানি বন্ধ হয়। কিন্তু জল ছিটাতে আমি সাহস না করে ফ্রিজ থেকে বরফের ট্রে বার করে একটা যন্ত্রের ওপর চেপে ধরলুম। তাতে সাময়িকভাবে সে শান্ত হল।

কিন্তু ততক্ষণে আমার ভয় ঢুকে গেছে। আজই আমি ডিম কিনতে গিয়ে এক দোকানে বেশ টাটকা বাঁশপাতা মাছ দেখতে পেয়ে লোভের বশে কিনে এনেছি। এদেশে এসে বহুদিন কুচো মাছ খাইনি। ভেবেছিলুম মাছ ভাজা খাব।

কিন্তু ধোঁয়াহীন মাছ ভাজা কী করে সম্ভব, তা তো আমি জানি না।

একদিন বাদ দিয়ে পরের দিন ভরসা করে শুরু করলুম মাছ ভাজতে। আঁচ খুব কম, তেলও দিয়েছি যৎসামান্য। বরফের ট্রে-ও রেডি রেখেছি। একটু পরেই শুরু হল পর্যায়ক্রমে প্যাঁকপ্যাঁক। বরফের ট্রে চেপে ধরলুম, কোনও কাজ হল না। ডিমের ধোঁয়া যদি বা সহ্য করেছে, মাছের ধোঁয়া কিছুতেই সহ্য করছে না।

দরজায় কে যেন বেল দিল। আমি দরজা খুলতেই একজন কৃষ্ণকায় লোক রাগি মুখে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বলল, হোয়াটস হ্যাপেনিং?

আমি তাকে ব্যাপারটা বোঝাতে যেতেই সে পুরোটা না শুনে দু-দেওয়াল থেকে টপটপ যন্ত্র দুটো খুলে ফেলল। তারপর সে-দুটো টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে আর কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তারপর আওয়াজ একেবারেই বন্ধ।

আমি মনে-মনে বললুম, কে-হে তুমি উপকারী বন্ধু?

এরপর আমি নিশ্চিন্তে মাছ ভাজলুম। ঘর ধোঁয়ায় ভরতি হয়ে গেল। কিন্তু কেউ আর প্যাঁকপ্যাঁক করল না।

দু-তিনদিন নিশ্চিন্তে কাটল। তারপর হঠাৎ একদিন মাঝরাত্তিরে আমি আঁতকে উঠলুম। দুটি যন্ত্রই পর্যায়ক্রমে প্যাঁকপ্যাঁক শুরু করেছে। আমি ধড়মড় করে উঠে বসলুম। সত্যি কি তাহলে ঘরে আগুন লেগেছে?

সমস্ত অ্যাপার্টমেন্টটা খুঁজে দেখলুম তন্নতন্ন করে। কোথাও আগুন নেই, ধোঁয়া নেই, কোনও আলো জ্বলছে না। কোনও গরম-জলের কলও খোলা নেই। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা। মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলুম না। সারারাত ওইরকমই চলল। আমার চোখের পাতা এক হল না।

সকালবেলা খালি পায়েই সেই যন্ত্রদুটো নিয়ে ছুটলুম একতলার অফিসে। সেখানকার তরুণীটিকে খুব উত্তেজিতভাবে এই অলৌকিক ঘটনাটা বোঝাতে যাচ্ছিলাম, তরুণীটি খুব শান্তভাবে বলল, ও, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। তারপর সে আরেকটু ব্যাখ্যা করল, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে এরকম আওয়াজ করে জানিয়ে দেয়।

ধন্য, বাবা যন্ত্র। আমরা তো জানতুম, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেলে সব জিনিসই চুপ মেরে যায়। মরা ব্যাটারির এমন ডাক আমি আগে কখনও শুনিনি।

॥ ৪৩ ॥

এদেশে এখনও ভগবানের বেশ জনপ্রিয়তা আছে। ভগবানের তল্পিবাহকরাও বেশ জোরদার। টিভি-তে প্রত্যেক রবিবার সকালে যে-কোনও চ্যানেল খুললেই শোনা যায় পাদরিদের বক্তৃতা। আজকাল আর অনেকেই কষ্ট করে রবিবার সকালে গিরজায় যেতে চায় না, তাই টিভি-তেই শোনানো হয় পাদরিদের সারমন।

সকাল মানে অবশ্য সাড়ে ন'টা-দশটা। শনিবার রাত্তিরে পার্টি সেরে রবিবার এর চেয়ে আগে কেউ ঘুম থেকে উঠবে না। ভোরে ওঠে বাচ্চারা। তাই ভোর থেকে শুরু হয় ছোটদের জন্য চমৎকার সব মনোহারী অনুষ্ঠান। তারপর একটু বেলা হলে বাচ্চারা টিভি ছেড়ে যখন খেলতে যাবে, বাবা-মায়েরা বিছানায় শুয়ে দিনের প্রথম কাপ চা বা কফিতে চুমুক দিয়ে সবে মাত্র টিভি-র দিকে তাকাবে, অমনি চোখের সামনে ভেসে উঠবে পাদরিদের মুখ।

পাদরিদের বক্তৃতা সাধারণত অন্তহীন হয়। গল্পে আছে, এক পাদরি তার সুদীর্ঘ বক্তৃতা শেষ করার পর বলেছিলেন, দুঃখিত, আমার হাতে ঘড়ি নেই, তাই বুঝতে পারিনি এতটা সময় কেটে গেছে। তখন শ্রোতাদের একজন উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, দেওয়ালে তো ক্যালেন্ডার রয়েছে, সেটাও দেখেননি?

টিভি-র মতন চাক্ষুষ-মাধ্যমে লম্বা বক্তৃতা সাধারণত দেখানো হয় না। কিন্তু পাদরিদের বক্তৃতা চল্লিশ-পঞ্চাশ মিনিটের কম হবে, এ তো ভাবাই যায় না। সেই জন্য টিভি-র পাদরিরা সকলেই অত্যন্ত জবরদস্ত বক্তা, কথার মায়াজাল বোনায় দক্ষতা অসাধারণ এবং উচ্চাঙ্গের অভিনেতাদের মতন তাঁদের কণ্ঠস্বরও নাটকীয়ভাবে ওঠে-নামে।

আমি নিজেই টিভি-তে এরকম দু-একজন পাদরির বক্তৃতা একটুখানি শোনবার পরই মন্ত্রমুগ্ধের মতন আটকে গেছি। চোখ সরাতে পারিনি। বক্তৃতার মধ্যে ধর্মের নাম গন্ধও নেই, বিষয়বস্তু হচ্ছে বিশ্বশান্তি। ইতিহাস ও সাহিত্য থেকে অজস্র উদাহরণ টেনে আনছেন তিনি, পৃথিবী যে এক অনিবার্য ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে তাও মর্মন্তুদভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত তাঁর সার কথা, ভগবান যিশুর শরণ নিলে এইসব সমস্যাই মিটে যাবে, এমনকী অ্যাটম বোমাও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এ যেন নদীর ঢেউ দেখাতে-দেখাতে সটকে শেখানো।

ভগবানের সঙ্গে ডারউইন সাহেবেরও নতুন করে ঝগড়া লেগেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ

ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বের একেবারে গোড়ায় কোপ বসিয়ে দিয়েছে গত শতাব্দীতে। ডারউইনের মৃত্যু শতবার্ষিকীর বছরে বাইবেলপন্থীরা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন। তাঁদের দাবি, যেসব স্কুল-কলেজে ডারউইনের বিবর্তনবাদ পড়ানো হয়, সেখানে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বও পড়াতে হবে। যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা দুটো দিকই যাচাই করতে পারে। অনেক স্টেটে এই নিয়ে মামলা হয়েছে, টিভি-তেও এর প্রচার খুব জোরদার। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, এই প্রচারে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককেও দেখা যায়। তাঁদের বক্তব্য, ডারউইনের মতবাদ অকাট্য নয়, সুতরাং ধর্মীয় তত্ত্বই বা অগ্রাহ্য করা হবে কেন?

বিজ্ঞানের ডিগ্রি থাকলেই বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব যদি কারুর ঠিক খেয়াল না থাকে, তবে আমি একটু মনে করিয়ে দিচ্ছি। পশু-পাখি, তরু-লতাসমেত সব কিছু এবং মানুষকে ভগবান আস্ত-আস্ত ভাবে সৃষ্টি করেছেন মাত্র ছ'দিনে। সপ্তম শতাব্দীর এক আর্চ বিশপ বাইবেল থেকে হিসেব করে দেখিয়েছিলেন যে, ভগবানের এই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছিল ঠিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার সালে। সপ্তদশ শতাব্দীতে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জন লাইটফুট এই হিসেবটি আরও নিখুঁত করেছিলেন। তাঁর মতে প্রথম মানুষের জন্ম হয়েছিল ঠিক খ্রিস্টপূর্ব চার হাজার চার বছরের তেইশে অক্টোবর সকাল নটার সময়। অর্থাৎ মানুষের ইতিহাস মাত্র ছ-হাজার বছরের। সুসভ্য, সুশিক্ষিত, ইংরেজি-জানা ভদ্রলোকেরা এখনও যে এই মতের সমর্থনে বক্তৃতা করতে পারে, তা নিজের কানে না শুনলে বিশ্বাসই করতুম না আমি। ঈশ্বর বিশ্বাস যে মূককেও বাচাল করে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রায় চব্বিশ ঘন্টা ধরেই টিভি চলে, তার মধ্যে অন্তত এই ধরনের ধর্মীয় প্রচার খুব সামান্য সময় জুড়ে থাকে। তবে যেটুকু সময় নেয়, তা খুব দামি সময়, অর্থাৎ যে-সময় সকলেই টিভি খোলে। এখানকার টিভি-র সিংহভাগ জুড়ে থাকে খেলা। তাও বিশেষ একটি খেলায় যে-খেলার নাম ফুটবল বটে, কিন্তু আমরা যাকে ফুটবল বলে জানি, তা নয়। এই ফুটবল খেলায় পায়ের থেকে হাতের ব্যবহার বেশি, খেলোয়াড়দের শরীরে থাকে বর্ম, মুখে লোহার মুখোশ। বিদেশিদের পক্ষে এ খেলার রস পাওয়া শক্ত। আমি কয়েকবার স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখতে গেছি, কিন্তু নিয়মকানুন ঠিক মাথায় ঢোকেনি। সারা মাঠে যখন দারুণ উত্তেজনা, দর্শকরা উত্তাল, আমি তখন বরফের মতন শীতল ও স্থির।

আমেরিকান টিভি'র সঙ্গে সরকারের কোনও সংস্রব নেই। প্রধান তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্ক হল আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন, সেন্ট্রাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন আর ন্যাশনাল ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন-এরা নানা রকম অনুষ্ঠান বানায়। আর আছে অসংখ্য স্থানীয় অনুষ্ঠান। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আপনি বালুরঘাট কিংবা ঘাটাল কিংবা চুঁচুড়োয় থাকেন। এরকম প্রত্যেক জায়গাতেই আছে নিজস্ব টিভি কেন্দ্র। অর্থাৎ চুঁচুড়োয় বসে আপনার টিভি-তে আপনি চুঁচুড়োর আশে পাশের ঘটনা অনর্গল দেখতে পাবেন। সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠানও দেখবেন। বালুরঘাটের বাসিন্দা টিভি-তে দেখবেন বালুরঘাটের নানা অনুষ্ঠান, সেই সঙ্গে জাতীয় অনুষ্ঠান। ছোটখাটো জায়গায় স্থানীয় অনুষ্ঠানেরই প্রাধান্য। আমেরিকানরা বিশ্বপ্রেমিক যত না, তার চেয়ে বেশি অঞ্চল-প্রেমিক। ওখানকার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ভূগোল ক্লাসে পৃথিবীর মানচিত্রের আগে পাড়ার মানচিত্র আঁকতে শেখে।

তিনটি জাতীয় নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রতিযোগিতা আসে কে কত চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান করতে পারে। সরকারি ব্যাপার তো নয়। সব কিছুই ব্যাবসায়-ভিত্তিক। স্থানীয় কেন্দ্রগুলো কার কাছ থেকে কোন অনুষ্ঠান কিনবে তার ওপর নির্ভর করে ওদের ক্ষতি বৃদ্ধি। এই রকম প্রতিযোগিতা আছে বলেই অনুষ্ঠানের বৈচিত্র্যের শেষ নেই।

এই সব অনুষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা সোপ অপেরার। সংক্ষেপে সোপ। অভিধানে এখনো সোপ-এর অর্থ সাবান হলেও এখানকার খবরের কাগজে 'সোপ' শব্দে একরকম টিভি'র নাটক বোঝায়, যার সঙ্গে অপেরার কোনও সম্পর্ক নেই। সাবানেরও কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। এগুলো হচ্ছে টিভি-র ধারাবাহিক নাটক, এর কোনও শেষ নেই। এর কাহিনির কোনও মাথামুণ্ডু

নেই, নতুন-নতুন চরিত্র আর ঘটনা এনে বছরের পর বছর ধরে চলে। এই সব নাটক কিন্তু সপ্তাহে একদিন নয়, প্রত্যেকদিন। রবিবার বা বিশেষ ছুটির দিন বাদে। এবং প্রত্যেকদিন এরকম ধারাবাহিক নাটক মাত্র একখানা নয়, অন্তত পাঁচ খানা। তাহলে কী বিপুল লোকলশকর আর উদ্যম লাগে এগুলো তৈরি করতে, ভাবতে গেলে থ হয়ে যেতে হয়। খোদ আমেরিকায় এই সব সোপ অপেরা সিনেমার চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয়। এক সময় সাবান কোম্পানিগুলো বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভর করে এই সব নাটক শুরু হয়েছিল বলেই সোপ নামটি চালু হয়ে গেছে। এখন অবশ্য অন্য সব বিজ্ঞাপনদাতাই এরকম ধারাবাহিক, প্যাচপেচে সেন্টিমেন্টাল, কিছুটা রহস্য মেশানো নাটক বানায়। ইদানীং এইসব নাটকের মধ্যে 'ডালাস' জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

এখানকার ঘরে বসে বসে টিভি দেখাই আমার একমাত্র কাজ। এ শহরে আমার চেনা কেউ নেই, সুতরাং কোথাও ঘুরে বেড়াবার প্রশ্ন নেই। গাড়ি না থাকলে এই শীতে পথে ঘোরাঘুরির প্রশ্ন ওঠে না। সুতরাং টিভি-তেই আমি বিশ্বদর্শন করতে চাইলুম। অবশ্য আমেরিকান টিভি-তে বিশ্বদর্শন খুব সহজসাধ্য নয়। এরা নিজেদের নিয়ে বড় বেশি মগ্ন। এমনকী যাকে এরা বলে 'বিশ্ব সংবাদ' তাতেও পৃথিবীর যে-সব দেশ বা ঘটনায় আমেরিকান স্বার্থ জড়িত, শুধু সে সবই দেখাবে। এদের বিশ্ব সংবাদ দেখলে মনে হয় পৃথিবীতে ভারতবর্ষ নামে কোনও দেশ নেই। আর চিন নামে হঠাৎ একটা নতুন দেশ গজিয়ে উঠেছে। খবরেরও মাঝে-মাঝে থাকে বিজ্ঞাপন। আরব দেশে প্রচণ্ড একটি বোমার বিস্ফোরণের পরই কাট। তিন চারটি ছেলে-মেয়ে নাচতে-নাচতে একরকম মাখনের জয়গান গেয়ে গেল। তারপরই আবার যুদ্ধের দৃশ্য।

বিজ্ঞাপনের দৃশ্য থেকেও অবশ্য একটা দেশের রুচির অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। আমেরিকানদের আমরা গরু ও শুয়োরখোর জাতি বলে জানি। কিন্তু ইদানীং নানা বিজ্ঞাপনে গোমাংস ও শূকর মাংসের বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। তার মানে এরা ভারতীয় জীবনযাত্রার মান আদর্শ মনে করছে তা নয়। শারীরিক পরিশ্রম নেই বলে ব্লাড-প্রেসার ও কোলস্টোরল ভীতি এদের সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এতকাল এদেশে মুরগি ছিল গরিবের খাদ্য ও অবজ্ঞার বস্তু, এখন রব উঠেছে মুরগি খাও, মাছ খাও, সবুজ শাকসবজি খাও! হেলথ ফুড নামে নিছক নিরামিষ খাদ্যের দোকানও চলছে খুব। আর এসেছে বিকল্পের যুগ। বেশি কফি খেলে নাকি ক্ষতি হয়, তাই কফির বদলে ডি-ক্যাফিনেটেড কফি। সে বস্তু আমি দু-একবার খেয়ে দেখেছি, অতি অখাদ্য। ভাগ্যিস চায়ের বিকল্প ওরা এখনও তৈরি করেনি। সেই রকম, মাখনের বদলে মার্জারিন, সিগারেটের বদলে তামাকহীন সিগারেট। অ্যালকোহল বর্জিত বিয়ার। মদের বিজ্ঞাপন তো চোখেই পড়ে না, তার বদলে দেখা যায় দুধের বিজ্ঞাপন। একটা ছবি প্রায়ই দেখায়, ধপধপে সাদা একটা দুধের নদী বয়ে চলেছে। সে দৃশ্য দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

বিজ্ঞাপনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মজা লেগেছিল একটা কর্মখালির বিজ্ঞাপন দেখে। মার্কিনদেশে এখন ছাত্রছাত্রীদের বাধ্যতামূলক সমর শিক্ষা নেই, অনেক ছেলেমেয়েই আজকাল আর সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহী নয়। সেইজন্য সরকার থেকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় লোভনীয় শর্তে ছেলেমেয়েদের সৈন্যবাহিনীতে আকৃষ্ট করবার জন্য। গান গেয়ে গেয়ে বলা হয়, এসো, এসো যোগ দাও, কত ভালো মাইনে, কত ভালো খাবার, কত সুন্দর পরিবেশ ইত্যাদি-ইত্যাদি। দুর্ধর্ষ আমেরিকান টমির যে চিত্র অনেকের মনে আঁকা আছে, তার সঙ্গে কি এই বিজ্ঞাপন একটুও মেলে?

টিভি বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে অশ্লীল দিক হল টাকার ঝনঝনানি। সারাদিন ধরে যে কতবার টাকা কথাটা উচ্চারিত হয় তার ঠিক নেই, টাকা পাইয়ে দেওয়ার কতরকম প্রলোভন, এমনকী সত্যি-সত্যি টাকা হাতে গুঁজে দেওয়ার দৃশ্যও দেখা যাবে দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার। কত সামান্য কারণে লোকে হাজার-হাজার টাকা পেয়ে যায়। বড়-বড় কোম্পানিগুলো নির্বাচিত দর্শকদের সামনে ধাঁধা প্রতিযোগিতা চালায়।

আমেরিকান টিভি কিন্তু সব মিলিয়ে বেশ নীতিবাগিশ। মরাল মেজরিটির চাপেই হোক বা

যে-কারণেই হোক, যৌন দৃশ্য টিভি-তে একেবারে নিষিদ্ধ। সাধারণ অনুষ্ঠানে তো বটেই এমনকী কোনও বিজ্ঞাপনচিত্রেও নগ্নতা কিংবা নারীর উন্মুক্ত বক্ষদেশ দেখানো হয় না। তবে চুম্বন যেহেতু চা-জলখাবারের মতন, তাই সেই দৃশ্য দেখা যায় মুহুর্মুহু। সোপ অপেরায় প্রতি পাঁচ মিনিটে একটি করে দীর্ঘস্থায়ী চুম্বন দৃশ্য থাকবেই। আর নগ্নতার পরিবর্তে যা দেখানো হয়, তাও বেশ বিরক্তিকর। একই রকম স্বল্পবাস ঝাঁক-ঝাঁক মেয়ে, যাদের ঠিক মানুষ মনে হয় না। মনে হয় পুতুল। টিভি-তে যেসব সিনেমা দেখানো হয় তাও নিরামিষ ধরনের। অবশ্য কেবল কানেকশন নামে আর একটি ব্যাপার আছে। যাতে একটি চ্যানেলে চব্বিশ ঘণ্টাই একটার পর একটা সিনেমা দেখা যায়, তাতে সব রকম ফিলমই থাকে এবং প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী ফিল্‌ম দেখানো হয় বেশি রাত্রে। কানাডার টিভি-তে এই ব্যাপারটি আরও মজার। সেখানকার অনুষ্ঠান ইংরেজি এবং ফরাসি এই দুই ভাষায় হয়, এর মধ্যে ইংরেজি অনুষ্ঠান যৌন দৃশ্য বিরহিত, কিন্তু ফরাসি অনুষ্ঠানে সবই চলে।

সিরিয়াস ধরনের অনুষ্ঠানও কিছু-কিছু থাকে এবং সেগুলি খুবই সুচিন্তিত। দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে এনে নানান বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা। শুধু বক্তৃতা নয়, অজস্র উদাহরণ ছবি সমেত। এ দেশটার একটা গুণ স্বীকার করতেই হবে। আমেরিকায় বসে আমেরিকাকে যত খুশি গালাগালি দেওয়া যায়। এদেশের প্রেসিডেন্ট কিংবা শাসক দল সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা টিভি-তে শোনা যায় অহরহ। সাধারণ মানুষকে ইন্টারভিউ করেও এক-একজন খুব নাম করে ফেলে। যেমন ডনেহু-র টকশো খুব জনপ্রিয়। তবে এইসব গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাঝখানেও এমনই ঘনঘন বিজ্ঞাপনের বাহুল্য থাকে যে সুর কেটে যায়। আসলে, বিজ্ঞাপনের মাঝখানের জায়গাগুলো ভরাট করার জন্যই যেন অন্য অনুষ্ঠান।

তবে এইসব বিজ্ঞাপনদাতাদের একটা গুণ আছে। ছোটদের অনুষ্ঠানের মাঝখানে শুধু ছোটদের ব্যবহার্য জিনিসের বিজ্ঞাপন এবং সেগুলো এমনই সুন্দর ও মজাদার, যে সেগুলোও আলাদাভাবে দর্শনীয়। এখানকার টিভি-তে ছোটদের অনুষ্ঠানগুলির কোনও তুলনা নেই। এর মধ্যে মাপেট শো তো জগৎবিখ্যাত এবং ছোটবড় সকলের প্রিয়।

ব্যাবসায়িক টিভি-র পাশাপাশি একটি চ্যানেলে সম্পূর্ণ অব্যাবসায়িক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়। এর নাম পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম। এতে একটাও বিজ্ঞাপন নেই এবং নিছক স্থূল রুচি বা ভাঁড়ামোর কোনও অনুষ্ঠানও এতে থাকে না, জাঙিয়া পরা পুতুল মেয়েদের নাচও নেই। এই অনুষ্ঠানগুলি চলে বিভিন্ন কোম্পানির চাঁদায়, তাদের নাম উল্লেখ থাকে শুধু। অনেক বিদেশি অনুষ্ঠানও এরা ধার করে কিংবা কিনে আনে। এই চ্যানেলেই মাঝে-মাঝে দেখা যায় ভারতীয় চলচ্চিত্র। মহাকাশ বিষয়ে কার্ল সেগানের 'কসমস' নামে বিখ্যাত অনুষ্ঠানটিও দেখা যায় এই চ্যানেলেই। ক্লাসিক সাহিত্যের চিত্ররূপও প্রায়ই দেখানো হয়। তবু পাবলিক ব্রডকাস্টিং সিস্টেম-এর অনেক অনুষ্ঠান দেখাবার পর একঘেয়ে লাগতে শুরু করে। মনে হয় যেন বড্ড বেশি জ্ঞানের কথা বলছে।

এবং এতগুলো চ্যানেল, এত অনুষ্ঠান বৈচিত্র্য, এত সিনেমা সত্ত্বেও কোনও এক সময় টিভি-র নব ঘুরিয়ে ঘুরিয়েও কোনও একটা অনুষ্ঠানও মনঃপূত হয় না। তখন ইচ্ছে করে টিভি বাক্সটাকে জোরে একটা লাথি কষাই। এই জন্যই একটি টিভি প্রস্তুতকারক কোম্পানি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন, উই অফার কিক্‌-প্রুফ সেট্‌স।

॥ ৪৪ ॥

অন্য কারুর বাড়িতে একা কয়েকদিন থাকলে মনে হয় আমিও যেন একজন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। এই ঘরের কোথায় কী জিনিসপত্র আছে আমি জানি না। এক একবার এক একটা কিছু আবিষ্কার করি। সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে ভ্যাকুয়াম ক্লিনার খুঁজতে যেয়ে আমি পেয়ে গেলুম তিনখানা ভিডিও খেলনা।

তাই নিয়ে কিছুক্ষণ সময় কাটল। টিভি-তে ভিডিয়ো খেলনা খেলতে-খেলতে আমার মনে হয় আমি অন্য গ্রহের মানুষ।

মাঝে-মাঝে অন্য লোকেরা টেলিফোন করে। প্রথমেই আমাকে সূর্য ভেবে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। এক-এক সময় আমার ইচ্ছে হয় সূর্য সেজে উত্তরও দিতে। কোনও মেয়ে ফোন করলে হয়তো সেরকম করতুমও, কিন্তু সূর্যকে শুধু পুরুষরাই ডাকে।

সূর্যর ঘরে পত্রপত্রিকাই বেশি, বই খুব কম। আজকাল এই এক রকম কালচার তৈরি হয়েছে। ছেলেমেয়েরা অনেক রকম পত্রপত্রিকা পড়েই সব বিষয়ে জেনে যায়, সাহিত্য পড়ে না। ক্লাসিক্স তো পড়েই না।

একখানা বই পেলুম, সেটাও সাংবাদিকতা ঘেঁষা। তবে বইটি চমৎকার। বইটির নাম 'শ্লাউচিং টুয়ার্ডস বেথেলহেম', লেখিকা শ্রীমতী জোন ভিভিয়ন। শ্রীমতী বলা বোধহয় ঠিক হল না, ইনি কুমারীও না, বিবাহিতাও না, অর্থাৎ মিস্ কিংবা মিসেস নন, এম এস। বাংলায় এর প্রতিশব্দ বোধহয় এখনও তৈরি হয়নি।

বইটি নোটবুক ধরনের। এতে আছে কিছু-কিছু সাম্প্রতিক ঘটনা ও বিশেষ কয়েকটি ব্যক্তি সম্পর্কে স্কেচ। সাধারণ বিবরণ নয়। বেশ অন্তর্ভেদী চরিত্র-চিত্রণ, ভাষাও খুব গভীর। এই বইটিতে আমি এক নকশাল নেতার সন্ধান পেয়ে চমকে উঠলুম। না, লেখাটি ভারতীয় কোনও বিপ্লবী সম্পর্কে নয়, আমেরিকান নকশাল নেতা মাইকেল ল্যাসকি সম্পর্কে। আমাদের দেশে যেমন সি পি আই (এম-এল) দল আছে, এ দেশেও সেই রকম আছে সি পি উ এস এ (এম-এল) দল। আমেরিকার কমিউনিস্ট পার্টি অনেক পুরোনো। এখন তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে এই এম-এল গোষ্ঠী পুরোনো আদি কমিউনিস্ট পার্টিকে 'শোধানবাদী বুর্জোয়া ক্লিক' মনে করে। অবিকল আমাদের দেশের মতন।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ওয়াট্‌স শহরে একটি বইয়ের দোকানে এই দলের শাখা অফিস। দোকানটির নাম, 'ওয়ার্কার্স ইন্টারন্যাশনাল বুক স্টোর', ভেতরে মস্ত বড় কাস্তে-হাতুড়ি মার্কা পতাকা ও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে-তুং-এর ছবি। কমরেড ল্যাসকি এই দলের জেনারাল সেক্রেটারি, তিনি ওই দোকান চালান ও 'পিপ্‌লস ভয়েস' ও 'রেড ফ্ল্যাগ' নামে দুটি পত্রিকা বার করেন। আমেরিকায় "শ্রমিক অভ্যুত্থান"-ই এঁদের লক্ষ্য।

জোন্ ভিভিয়ন যখন মাইকেল ল্যাসকির সাক্ষাৎকার নিতে যান, তখন তিনি ওই মেয়েটিকে এফ বি আই-এর এজেন্ট ভেবেছিলেন। তবু তিনি সাক্ষাৎকারটি দিতে রাজি হন, কারণ এই বাজারি কাগজে এই সব লেখা বেরুলে জনগণ এই বিপ্লবী পার্টি সম্পর্কে বেশি করে জানবে। ল্যাসকির ধারণা, মার্কিন সরকার যে-কোনওদিন তাঁদের পার্টিকে নিষিদ্ধ করবে। পার্টি ওয়ার্কারদের মারধোর, কারাবাস এমনকী গুপ্ত-হত্যার জন্য তৈরি থাকতে বলেছেন। অবশ্য, এঁরাও অন্যরকমভাবে তৈরি আছেন, এদের পার্টি অফিসে, অর্থাৎ ওই বইয়ের দোকানের পেছনে রাখা আছে কয়েকটি শট্‌গান ও রিভলবার। আমেরিকায় অস্ত্র রাখা বেআইনি নয়।

লেখাটি পড়বার পর লক্ষ করলুম, এর রচনাকাল ১৯৬৭। আমাদের দেশেও মোটামুটি ওই সময়েই নকশাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল না? ল্যাসকি সাহেবের বয়েস তখন ছিল ছাব্বিশ, এখন তিনি কোথায় আছেন জানি না।

লেখাটি পড়তে-পড়তে আমার একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। আগেরবার নিউ ইয়র্কে গ্রিনিচ্ ভিলেজে এক বাউন্ডুলেদের আড্ডায় একদিন নানারকম গান হচ্ছিল, এক সময় কয়েকজন 'ইন্টারন্যাশনাল' শুরু করতেই আমিও গলা মিলিয়েছিলুম। ছাত্র জীবনে ওই গান আমরা অনেক গেয়েছি তাই মুখস্থ। ওদের তারপর আমি ওই গানের বাংলা ভাষা, "জাগো, জাগো সর্বহারা" (সম্ভবত নজরুলের অনুবাদ) গেয়ে শোনালুম।

সেই আড্ডায় উপস্থিত ছিল কবি অ্যালেন গিন্‌সবার্গ। সে আমাকে পরে আড়ালে বলল, 'ওহে নীলু চন্দর, আমরা এই গান গাইছি বটে, কিন্তু তুমি যেন আর অন্য কোথাও গেও না। তুমি বিদেশি, তোমার পেছনে গোয়েন্দা লেগে যেতে পারে। তোমার ভিসাও বাতিল করে দিতে পারে। আমি অবাক হয়ে বলেছিলুম, কেন? ইট্‌স আ ফ্রি কান্ট্রি। এখানে কোনওরকম গান গাওয়ায় নিষেধ আছে নাকি? অ্যালেন বলেছিল, গানের জন্য তো কিছু বলবে না, অন্য কোনও ছুতোয় তোমাকে জ্বালাতন করবে। জানো তো, শালারা (অ্যালেন অবশ্য শালা বলেনি, অন্য গুরুতর গালাগালি দিয়েছিল) সব সময় কমুনিস্ট-জুজু খোঁজে!

সেই সময়ে নিজের দেশে অ্যালেন গিন্‌সবার্গ বামপন্থী হিসেবে পরিচিত ছিল। যে-কোনও জায়গায় সুযোগ পেলেই সে আমেরিকার সরকার ও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করেছে। কিন্তু সে কমিউনিস্ট নয়, কারণ, সে অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বাসী, সমকামী এবং চরম বাক-স্বাধীনতাপন্থী। চেকোশ্লোভাকিয়া সফরে গিয়ে সে বিতাড়িত হয়েছিল, কারণ সেখানে সে বাক স্বাধীনতার পক্ষে বক্তৃতা দিয়েছিল। আবার পোল্যান্ডে পেয়েছিল বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে সংবর্ধনা।

অ্যালেন জাতে ইহুদি। কুখ্যাত ইহুদি-হন্তা আইখম্যান যখন ধরা পড়ে এবং তাকে কীরকম শাস্তি দেওয়া হবে এই নিয়ে যখন জল্পনাকল্পনা চলছিল, তখন অ্যালেন বলেছিল, কোনও শাস্তি না দিয়ে আইখম্যানকে জেরুজালেম শহরের মেয়র করে দেওয়া উচিত। ইহুদিদের সেবা করলেই ওর পাপ-মুক্তি হবে।

এবারে অনেক চেষ্টা করেও আমি অ্যালেন গিন্‌সবার্গের দেখা পেলুম না। গেছোবাবার মতন সে যে কখন উত্তরে কখন দক্ষিণে যায় তার আর ঠিক নেই। আমি যখন ক্যালিফোর্নিয়ায়, সে তখন কলোরাডোতে, আমি নিউ ইয়র্ক ছেড়ে শিকাগোয় আসবার পরই খবর পেলুম সে নিউ ইয়র্কে কবিতা পড়তে গেছে।

অ্যালেনের সেই নিউ ইয়র্কের কবিতা পাঠের বিবরণ পড়লুম 'টাইম' সাপ্তাহিকে। প্রতিবেদক বেশ-ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছে। বিদ্রূপের সঙ্গে বলেছে যে সেই বিপ্লবী কবি এখন ঠান্ডা হয়ে গেছে, পোশাক ভদ্রলোকের মতন, গলায় টাই পর্যন্ত বেঁধেছে, কবিতাগুলোও শান্ত আর ভদ্র ধরনের। টিভি-র ছবি তোলার সময় আলোর ফোকাস ঠিক মতন তার মুখে পড়ছে কি না সে ব্যাপারেও খেয়াল আছে টনটনে ইত্যাদি।

অ্যালেনের টাইপরা ছবি দেখে আমিও প্রথমে অবাক হয়েছিলুম। কলকাতার রাস্তায় সে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে ঘুরে বেড়াতো আর নিউ ইয়র্কের রাস্তায় মৃতবন্ধুর ট্রাউজার্স আর গেঞ্জি পরে, গালভরতি দাড়ি।

পরে ভেবে দেখলুম, এটাই তো স্বাভাবিক। যে বয়েসে যা মানায়। অ্যালেন গিন্‌সবার্গের বয়েস এখন প্রায় ষাট, এখন তো সুস্থির হওয়ারই সময়। একবার নিউ ইয়র্কের এক কাব্য পাঠের আসরে কয়েকজন চিৎকার করে বলেছিল, আপনার এসব কবিতার মানে কী? মানে বুঝিয়ে দিন। অ্যালেন জামা-প্যান্টের সব বোতাম খুলে মঞ্চের ওপর সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে বলেছিল, এই হল আমার কবিতার মানে। আর একবার অ্যারিজোনায় এক সমালোচকের নাকে ঘুঁষি মেরে বলেছিল, এবারে আমার কবিতার মানে বুঝলে তো? এসব তার ছোকরা বয়েসের কথা। এখনও সে যদি এরকম কিছু করে, তবে সেটা হবে অত্যন্ত ভাল্‌গার ব্যাপার, বুড়ো মানুষের খোকামি। এখন সে শান্ত হয়েছে, তার কবিতাও অনেক ঘন সংঘবদ্ধ হয়েছে।

এখানকার প্রথাসিদ্ধ লেখক যাঁরা, অর্থাৎ যাঁরা কলেজে পড়ান কিংবা ফাউন্ডেশানের টাকা নিয়ে সাহিত্যচর্চা করেন, তাঁরা অ্যালেন গিন্‌সবার্গকে পছন্দ করেন না কেউ। নাম শুনলেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন। এরকম দু-একজনের কাছে আমি অ্যালেনের খোঁজ করতে গিয়েই এ ব্যাপারটা টের পেয়েছি। কেউ কেউ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, ও, অ্যালেন? দ্যাখো গিয়ে সে বোধহয় আগামীবার

মার্কিন প্রেসিডেন্টের পদে দাঁড়াবার জন্য তৈরি হচ্ছে।

এই ঈর্ষার কারণ অ্যালেনের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। এখনও সে কবিতা পাঠ করতে দাঁড়ালে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরা মুগ্ধ হয়ে শোনে। তার কবিতার লাইন অনেকেই কথায়-কথায় মুখস্থ বলে। বিশুদ্ধ কবিতা রচনা থেকে অ্যালেন কখনও সরে যায়নি।

খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে এখানকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্য সভায় গেলুম একদিন। সকলের জন্য দ্বার অবারিত। এখানকার সব বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত লেখকদের ডেকে এনে সাহিত্য সভা করে। এটা লেখকদের একটা উপার্জনের পথও বটে।

এই সভাটিতে জনাপাঁচেক মাঝারি ধরনের লেখক ছিলেন। তার মধ্যে দুজনের নাম আমার পূর্ব পরিচিত। ভ্যান্স বুর্জালি এবং ডনাল্ড যাস্টিস। যথাক্রমে উপন্যাস ও কবিতা লেখার জন্য এঁরা দুজনেই পুলিটজার পুরস্কার পেয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের দেশের আকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের সমতুল্য। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল ইদানীংকালের উপন্যাস ও ছোটগল্পের গতিপ্রকৃতি।

কিন্তু কথাবার্তা শুনে আমার চোখ ছানাবড়া হওয়ার উপক্রম।

পাঁচজন লেখক উপন্যাস-গল্প সম্পর্কে দুচারটে মামুলি কথা বলার পরই তাঁরা শুরু করে দিলেন তাঁদের ট্রেডের নিজস্ব কথাবার্তা। অর্থাৎ বই ছাপার আজকাল কত ঝামেলা, প্রকাশকরা কতরকম গণ্ডগোল করে, ঠিক মতন টাকাকড়ির হিসেব দেয় না, সুপার মার্কেটগুলোতে শুধু সস্তা চটকদার বইগুলোই সাজিয়ে রাখে, সিরিয়াস বই রাখতেই চায় না, বড় বড় পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা বার করা দিন দিন শক্ত হয়ে উঠছে, আর এই হতচ্ছাড়া টিভি কোম্পানিগুলো কত লোককে টক শো-তে ডাকে। লেখকদের ডাকে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

ও হরি, তা হলে সাহেব লেখকদেরও এই অবস্থা। ইংরেজিতে কথা বললেও আমার মনে হচ্ছিল এরা সবাই বাঙালি লেখক। আমরা যে ভাবতুম, সাহেব মানেই বড় লোক আর তাদের হাজার রকম সুবিধে। মহারাষ্ট্রের লেখকদের ধারণা হিন্দি লেখকদের অবস্থা ভালো, হিন্দি লেখকরা ভাবে বাঙালি লেখকদের অবস্থা ভালো, বাঙালি লেখকরা ভাবে ইংরেজিতে যারা লেখে একমাত্র তারাই স্বর্গসুখের অধিকারী। আসলে, ইংরেজিতেই দু-পাঁচজন লেখকই খুব বেশি বিত্তবান, তা-ও তারা থ্রিলার কিংবা হোটেল-এয়ারপোর্ট জাতীয় জিনিস লেখে। বাদবাকি সব লেখকদেরই চাকরি করতে হয় এবং প্রকাশকদের সঙ্গে ঠান্ডা লড়াই চালাতে হয়। পৃথিবীতে সব দেশের লেখকদেরই কি এই অবস্থা? একমাত্র সুইডেনের এক লেখকের মুখে শুনেছিলুম, তাঁর কোনও নালিশ নেই। তাঁর দেশের সরকার লেখকদের যে সম্মানের ব্যবস্থা করেছে, তার চেয়ে বেশি আর কিছু চাওয়া যায় না। সেখানকার লাইব্রেরি থেকে যেসব লেখকদের বই পাঠকরা নেয়, তার জন্যও সেই লেখকরা রয়ালটি পান।

আমেরিকায় একটি তরুণ কবিদের কাব্য পাঠের আসরেও আমি এই ধরনের আলোচনা শুনেছিলুম। বড় বড় পত্রিকায় কবিতা ছাপানো কত শক্ত, সেরকম ভালো কাগজই বা কোথায়, বড় শহরের তুলনায় ছোট শহরের কবিরা তেমন পাত্তা পায় না সম্পাদকদের কাছে ইত্যাদি। এ যে অবিকল কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসের কথাবার্তা।

এক সময় আমি আমেরিকান সাহিত্যের বেশ ভক্ত ছিলুম। কিন্তু সল বেলোর পর সেরকম কোনও বড় লেখকের আর সন্ধান পাইনি। তাও সল বেলোকেও প্রকৃত অর্থে আন্তর্জাতিক লেখক বলা চলে কিনা সন্দেহ, তাঁর লেখা বড্ড বেশিরকম আমেরিকান। বিশেষত ইহুদি প্রথা ও সমাজ ঘেঁষা ডিটেইলসের প্রাবল্য এক এক সময় বিরক্তি ধরিয়ে দেয়। জন আপডাইকের র‍্যাবিট সিরিজের লেখাগুলো একসময়ে ভালো লেগেছিল, এখন তার লেখায় এত বেশি রগরগে যৌন ব্যাপার থাকে যে মনে হয় এসব তো ছেলেমানুষি ব্যাপার! এই বাহ্য, আগে কহো আর! আপডাইকের একটি ভ্রমণ কাহিনি পড়েও বেশ হতাশ হলুম। কোনও ঔপন্যাসিক যখন ভ্রমণ কাহিনি লেখেন, তখন বোঝা যায় তাঁর চিন্তার ব্যাপকতা ও ভাষার ওপর দখল কতখানি। আপডাইক শুধু ইয়ার্কি-ঠাট্টা করেছেন।

মেয়ে গাইডের সঙ্গে শোওয়া যায় কি যায় না, এই চিন্তা যেন পাশ্চাত্য লেখকদের একটা ব্যাধি হয়ে দাঁড়িয়েছে, কত লোকের ভ্রমণ কাহিনিতেই যে এটা পড়তে হয়। এমনকী গুন্টার গ্রাসও এই কাণ্ড করেছেন। আপডাইক রাশিয়া সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সেখানকার সুটকেস কত খারাপ এই নিয়ে বাজে রসিকতা করেছেন আগাগোড়া।

একজন কালো-লেখিকা গল্প পড়ে শোনালেন একদিন। লেখিকাটি ইদানীং বেশ নাম করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে খাতির করে এনেছে। সে গল্প শুনে আমার মনে হল, বাংলা ভাষায় এরকম গল্প অনেক আগেই ঢের লেখা হয়ে গেছে। সদ্য নাম করা আরও অনেকের লেখা পড়তে-পড়তে আমি ভাবি, এসব কী লিখছে এরা, এর চেয়ে বাংলা সাহিত্যে অনেক ভালো লেখা হচ্ছে।

কী জানি, আমার আবার বাংলা-বাংলা বাতিক হয়ে গেল কি না।

॥ ৪৫ ॥

কয়েকদিন ধরেই আমি খাঁচার মধ্যে বদ্ধ সিংহের মতন ছটফট করছি ঘরের মধ্যে। অবিরাম তুষারপাতের জন্য পায়ে হেঁটে বাইরে বেরুবার কোনও উপায় নেই। এশহরে আমার কোনও বন্ধু নেই যে আমায় তার গাড়িতে কোথাও লিফ্‌ট দেবে। এমন পয়সাও নেই যে টেলিফোনে ট্যাক্সি ডাকতে পারি। সুতরাং আমি বন্দি।

অবশ্য আমার চেহারার সঙ্গে সিংহের কোনওই মিলই নেই। সত্যের খাতিরে খাঁচায় বন্দি বাঁদরের সঙ্গেই আমার উপমা দেওয়া উচিত। কিন্তু চেহারা যতই খারাপ হোক, কেই-ই বা নিজেকে বাঁদরের সঙ্গে তুলনা দিতে চায়, হলই বা বাঁদর আমাদের পূর্বপুরুষ!

তাপাঙ্ক নেমে গেছে শূন্যের নীচে কুড়ি-বাইশে। রাস্তার দুপাশে দু-তিন ফুট বরফ জমে আছে। গাড়ি চলাচলের জন্য অবশ্য রাস্তার মাঝখানটা কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর পরিষ্কার করে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রাস্তার ওই কালোত্বটুকু বাদ দিলে বাকি সবই সাদা ধপধপে। বাড়ির মাথায় বরফ, গির্জার চূড়ায় বরফ, পাইন গাছগুলি বরফে ঢাকা। ছোট-ছোট নদী ও হ্রদগুলোও জমে গেছে। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এই শ্বেত দৃশ্যপট দেখতে-দেখতে এখন আমার একঘেয়ে লাগে।

আমি যে কেন এখানে পড়ে আছি তা আমি নিজেই জানি না। সঙ্গে রিটার্ন টিকিট আছে, যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে যেতে পারি। এক-একদিন খুব মন কেমন করে, আবার ভাবি, ফিরে গেলেই তো ফুরিয়ে গেল, আর তো আসা হবে না! দেশে তো কেউ আমার জন্য পায়েসের বাটি সাজিয়ে প্রতীক্ষা করে নেই। তা ছাড়া, মনের মধ্যে মাঝে-মাঝে একটা কাঁটার খোঁচা টের পাই, একটা বিশেষ জায়গা এখনও আমার দেখা হয়নি। সে জায়গাটা আমি দেখতে চাই না, অথচ না দেখেও ফিরে যেতে পারছি না।

আমি যে এখানে আছি, আমার অনুপস্থিত আশ্রয়দাতা তা জানেই না। সূর্যর ফিরে আসার কথা ছিল এতদিনে, কিন্তু ফেরেনি।

আমিও ওর নাইজিরিয়ার ঠিকানাটা নিয়ে রাখিনি, তাই চিঠি লিখতে বা টেলিফোন করতে পারছি না। এখানে অবশ্য আমার খরচ লাগছে না প্রায় কিছুই। সূর্যর ভাঁড়ারের চাল-ডাল এখনও ফুরোয়নি। আমি দিব্যি খিচুড়ি খেয়ে চালিয়ে দিচ্ছি।

এ শহরে কজন বাঙালি আছে তা টেলিফোন গাইড দেখে অনায়াসেই বার করা যায়। যেহেতু সূর্যর ঘরে পাঠ্য বই বিশেষ নেই তাই মাঝে মাঝে আমি টেলিফোন বইখানাই পড়ি, এই পুঁচকে শহরের টেলিফোন গাইড বইটি কলকাতার টেলিফোন গাইডের চেয়েও মোটা। পড়তে-পড়তে আমি একজন মুখার্জি, দুজন দাস, একজন সরকার, একজন মিস্ রায়চৌধুরীর সন্ধান পেলুম। মুসলমান

নামও বেশ কয়েকটি আছে, এরা পৃথিবীর অনেক দেশেরই অধিবাসী হতে পারে, কিন্তু বাঙালি মুসলমানের নাম দেখলে আমি চিনতে পারি। একজন প্যালেস্টিনিয় গেরিলার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, তার নাম আখমেদ, এক ইরানি মহিলাকে চিনি যার নাম তাহেরে সফরজাদে, এক মিশরি নাট্যকারকে চিনি যার নাম হ্যনি এলকাডি। এরকম নাম বাঙালি মুসলমানদের হয় না, কিন্তু সিরাজুল ইসলাম কিংবা রফিকুল আলম নির্ঘাত বাঙালি।

ছাপার অক্ষরে বাঙালিদের সন্ধান পেলেও আমার কোনও সুবিধে হল না। আমার চরিত্রে এই দোষ আছে, অচেনা লোকের সঙ্গে যেচে ভাব জমাতে পারি না। অনেকে বেশ পারে, তাদের আমি ঈর্ষা করি।

এই রকমভাবে কয়েকটা দিন কেটে যাওয়ার পর এসে গেলেন আমার উদ্ধারকর্তা।

সূর্যর ঘরে টেলিফোন প্রায়ই বাজে, নানান বিদেশি কণ্ঠ ওর খোঁজ নেয়। মাঝে-মাঝে আমি টেলিফোন ধরিও না, আপনমনে রুনুরুনু করে বেজে যায়। এক সকালে পরপর তিনবার টেলিফোন বাজতে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে গম্ভীর গলায় বললুম, হ্যালো?

ওপাশ থেকে একটি অকপট বাঙাল ভাষায় শোনা গেল, সূয্যিভাইডি, ফ্যারা হইল কবে? শরীল-টরিল ভালো আছেনি?

আমি বললুম, সূর্য এখনও ফেরেনি। কবে ফিরবে জানি না।

—আপনে কেডা?

—আমি সূর্যর বন্ধু। নিউইয়র্কে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ও আমাকে ওর এই অ্যাপার্টমেন্টের চাবি দিয়ে গেছে।

—এ শহরে বাঙালি আইল অথচ আমি জানি না, এ তো বড় তাজ্জব কথা! কী নাম আপনের?

—আজ্ঞে, নীললোহিত।

—এ আবার কেমনধারা নাম! পদবি কী?

—ধরে নিন আমার পদবি লোহিত!

—ধইরা নেব? পদবি কি ধরার জিনিস? এ তো বাপ, ঠাকুরদার ব্যাপার। লোহিত পদবি জন্মে শুনি নাই।

—মেদিনীপুরের লোকেদের খাঁড়া, ধাড়া, বাঘ, হাতি এইরকম পদবি হয় না? তাহলে লোহিত হতে বাধা কী?

—ব্যাপারটা তেমন সুবিধার ঠ্যাকতাছে না। আপনে মশায় বার্গলার না তো? সূর্যির ঘরে অইন্য মানুষ। আপনি কী উদ্দেশ্যে আইছেন এখানে? কোথায় চাকরি পাইছেন?

—চাকরি পাইনি, বেড়াতে এসেছি।

—বেড়াইতে? এই ডিসেম্বর মাসে? খুবই সন্দেহজনক! আপনে ঘরেই থাকেন, বাইরাবেন না, আমি উইদিন ফিফ্‌টিন মিনিটস্‌ আইতাছি।

আমি বেশ সন্তুষ্টচিত্তেই ভদ্রলোকের প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। বিদেশে এসেও যে লোক এমনভাবে বাঙাল ভাষাটি আঁকড়ে রেখেছে সে মহাশয় ব্যক্তি নিশ্চয়ই।

কাঁটায়-কাঁটায় ঠিক পনেরো মিনিটের মাথায় এসে হাজির হলেন ভদ্রলোক। দরজা খুলে আমি একটু চমকেই উঠলুম, বাঙাল ভাষা শুনলেই একজন ঢিলেঢালা গোছের মানুষের চেহারা মনে আসে। কিন্তু প্রথম দর্শনে এঁকে দেখে প্রায় সাহেব মনে হয়। টকটকে গৌরবর্ণ, বেশ দীর্ঘকায়, নিখুঁত সুট-টাই পরা, বয়েসে প্রায় প্রৌঢ়ই বলা চলে।

তীক্ষ্ণ নজরে প্রথমে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে তিনি ঘরে ঢুকে এলেন, চতুর্দিকে ঘুরে সবকিছু যাচাই করে দেখে তিনি বললেন, বার্গলারির কোনও প্রুফ তো দ্যাখতে পাইতেছি না। আমার নাম শম্ভু মুখার্জি, আমি এখানের সক্কল বাঙালি সন্তানের লোকাল গার্জিয়ান। রহস্যময় আগন্তুক,

আপনে কেডা সেইটা খুইল্যা কন্ তো।

আমি হাসতে-হাসতে সংক্ষেপে আমার পরিচয় জানালুম।

শম্ভু মুখার্জি নীরবে সবটা শুনে বললেন, লালন ফকিরের একটা গান আছে, জানো? মনের মতন পাগল খুঁইজে পাইলাম না! এই এতদিনে আমি পাইছি, একখান পাগল! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ,

তারপর তাঁর বিশাল হাত দিয়ে আমার কাঁধ চাপড়ে দিয়ে আবার বললেন, পাগল না হইলে কেউ এই ধাদ্ধারা গোবিন্দপুরে ডিসেম্বর মাসে আসে, না একা-একা ঘরের মধ্যে বইস্যা থাকে? এখন চলো আমার সঙ্গে! ধড়া-চূড়া পইরা নাও! ওভারকোট আছে তো, নাকি তাও নাই?

সেদিনটা সারাদিনই আমি কাটিয়ে দিলাম শম্ভু মুখার্জির বাড়ি। সিডার র‍্যাপিড্স-এর উপকণ্ঠে ওঁদের সুদৃশ্য নিজস্ব গৃহ, সেখানে ঢুকলেই বোঝা যায় ওঁরা এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। শুনলাম, এদেশে ওঁদের কেটে গেছে উনিশ বছর। শম্ভু মুখার্জি বিশালদেহী পুরুষ হলেও তাঁর স্ত্রী বিনতা বেশ ছোট্টখাটো হাসিখুশি। বিনতাবউদি পুরো ঘটি, একটিও বাঙাল কথা বলেন না। এই দম্পতিটি নিঃসন্তান। রামকৃষ্ণ মিশনের দুটি গরিব ছাত্রের পড়াশুনোর খরচ চালাবার জন্য এঁরা নিয়মিত টাকা পাঠান।

শম্ভু মুখার্জি কাছাকাছি এক বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের অধ্যাপক। রীতিমতন পণ্ডিত মানুষ। আবার অবসর সময়ে ছবি আঁকেন। বিনতা বউদিও পড়ান একটি বিকলাঙ্গের স্কুলে, যা মাইনে পান তা সেই স্কুলকেই দান করেন।

এসব কথা আমি জানতে পারলুম আস্তে আস্তে অন্যদের মুখে। আমার খেয়ালই ছিল না যে আজ রবিবার। ছুটিছাটার দিনে অনেকেই আসে এ বাড়িতে আড্ডা দিতে। শুধু বাঙালিরা নয়, যেকোনও ভারতীয়রই এ বাড়িটি একটি আড্ডাস্থল। যে-কোনও ভারতীয় ছাত্র যদি হঠাৎ বিপদে পড়ে কিংবা কোনও সেমেস্টারে অ্যাসিস্ট্যান্টশিপ না পায়, তাহলে শম্ভু মুখার্জি দম্পতি অতি গোপনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তাদের দিকে।

বিনতা বউদি রান্না করতে এবং খাওয়াতে ভালোবাসেন। আর শম্ভুদা ভালোবাসেন তাস খেলায় হেরে যেতে এবং সেই উপলক্ষে কৃত্রিম রাগারাগি করতে। একটু বেলা পড়তেই এসে হাজির হল নির্মল সরকার, অনন্য দাস, সুধীর পটনায়ক, সিরাজুল ইসলাম, সুরেশ যোশী। তাস খেলায় হেরে গিয়ে শম্ভুদা সবাইকেই কাঠ বাঙাল ভাষায় গালাগাল দেন। এই দিলদরিয়া আড্ডাবাজ মানুষটিকে দেখতে-দেখতে আমার মনে হয়, ইস, সৈয়দ মুজতবা আলি যদি এঁকে দেখতেন, তাহলে কী দুর্দান্ত একটা চরিত্র বানিয়ে ফেলতে পারতেন।

আমার অনুমান নির্ভুল, সিরাজুল ইসলাম আর রফিকুল আলম দুজনেই বাঙালি, একজন পশ্চিম বাংলার, অন্যজন বাংলাদেশের। এর মধ্যে রফিকুল আমায় চেপে ধরল, আপনি একা একা কাটাচ্ছেন কেন? আমার ওখানে চলে আসুন। আরও অনেকেই এই প্রস্তাব দিল, শম্ভুদা বিনতাবউদি তো বটেই। কিন্তু আমি রাজি হলুম না। আসলে একা থাকতে আমার ভালোই লাগে। আমি সাধুসন্ন্যাসী নই। দিনের পর দিন নির্জনতা সহ্য করতে পারি না ঠিকই, কিন্তু দিনের কিছুটা অংশ শুধু নিজের মুখোমুখি বসে থাকাটা আমি বেশ উপভোগ করি।

সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টেই রয়ে গেলুম বটে, কিন্তু প্রতিদিনই কারুর না কারুর বাড়িতে নেমন্তন্ন লেগেই রইল। সকলেরই গাড়ি আছে, তারা আমায় নিয়ে যায়, পৌঁছে দেয়।

প্রচণ্ড শীতেও এখানকার অফিস-কাছারি-দোকানপাট সবই খোলা থাকে, তবে বেশিদূর ঘোরাঘুরি বা বেড়ানোর ব্যাপার বন্ধ হয়ে যায়। কিছু ডাকাবুকো সাহেবের কথা আলাদা, এই শীতেও তারা পাহাড়ে যায় স্কি করতে। বেশিরভাগ ভারতীয়েরই এমন শখ নেই। তারা কাছাকাছি আড্ডা দিতে যায়। এই শীতের সময় হাইওয়েতে রাত্তিরবেলা যদি গাড়ি খারাপ হয়ে যায়, তাহলে ধনেপ্রাণে মৃত্যু অসম্ভব কিছু না। কাগজে এরকম খবর মাঝে মাঝেই বেরোয়।

শীতের মধ্যে বেরুবার ঝক্কি-ঝামেলাটা বেশ বিরক্তিকর। বাইরে বরফ পড়লেও বাড়ির মধ্যে গরম, স্রেফ একটা গেঞ্জি পরে কাটিয়ে দেওয়া যায়। বাইরে বেরুতে হলে সেই গেঞ্জির ওপরে পরতে হবে শার্ট, তারপর সোয়েটার বা জ্যাকেট, তার ওপরে ওভারকোট, হাতে চামড়ার দস্তানা, মাথায় টুপি, পায়ে গরম মোজা আর লম্বা জুতো। এতসব মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য, শুধু বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে হবে—ওই কয়েক পা যাওয়ার জন্য এত সতর্কতা। গাড়ির মধ্যে আবার গরম। যে বাড়িতে পৌঁছব, সেবাড়িও গরম। সেখানে গিয়েই আবার সব খুলে ফেলতে হবে।

পরের শনিবার সন্ধেবেলা শম্ভুদার বাড়িতে বিরাট পার্টি হল। সর্বভারতীয় সম্মেলন তো বটেই, কয়েকজন সাহেব-মেমও এসেছে। এই পার্টিতে হল আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। এখানেই আমি প্রথম সাক্ষাৎ পেলুম একটু শিক্ষিত, শ্বেতাঙ্গ আমেরিকান বেকার যুবকের।

আমি অল্প কয়েকমাস আগে ভারত থেকে এসেছি এবং শিগগিরই ভারতে ফিরে যাব শুনে এই যুবকটি বেশ আগ্রহের সঙ্গে আলাপ করতে লাগল আমার সঙ্গে। ছেলেটিকে সবাই ডিক্ বলে ডাকছিল। (বাংলা রামা-শ্যামা-যদুর ইংরেজি হল টম-ডিক অ্যান্ড হ্যারি। আজকাল বাঙালিদের মধ্যে রাম-শ্যাম-যদু নাম বিশেষ শোনা যায় না, কিন্তু এদেশে টম-ডিক-হ্যারি এখনও অজস্র) ডিকের বয়স তিরিশের কাছাকাছি, মাঝারি উচ্চতা, মাথার চুল কোঁকড়া। অধিকাংশ আমেরিকানের মুখেই একটা অহংকারী আত্মপ্রত্যয়ের ভাব থাকে, সেই তুলনায় এর মুখখানি বেশ বিনীত আর তৈলাক্ত। সেই দেখেই আমার সন্দেহ করা উচিত ছিল, কিন্তু ছেলেটি আমায় পরিচয় দিল যে সে টিভি-তে সোপ-অপেরার স্ক্রিপ্ট লেখে, ছোটখাটো ভূমিকায় অভিনয়ও করে।

ডিক খুব সিনেমায় উৎসাহী, পৃথিবীর মধ্যে ভারতেই সবচেয়ে বেশি সিনেমা তৈরি হয় কেন, সে সম্পর্কে ওর খুব কৌতূহল। আমি আবার এই সব ব্যাপার খুবই কম জানি। হুঁ-হাঁ দিয়ে কাজ চালাতে লাগলুম। ডিক বাংলা ফিলম্ সম্পর্কেও কিছু খবর রাখে। কথায়-কথায় ও আমায় জিগ্যেস করল, তুমি সত্যজিৎ রায়কে চেনো? তিনি তো ক্যালকাটা বেজ্‌ড, তাই না? তোমার সঙ্গে আলাপ আছে নিশ্চয়ই?

সত্যজিৎ রায় পৃথিবীবিখ্যাত মানুষ, আমাদের কাছে অনেক দূরের লোক। দূর থেকে তাঁকে দু-একবার দেখেছি বটে কিন্তু কখনও কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে একটু আধটু মিথ্যে কথা বলার লোভ সংবরণ করা শক্ত। আমি সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললুম, হ্যাঁ হ্যাঁ চিনি।

ছেলেটিও তৎক্ষণাৎ বলল, তুমি সত্যজিৎ রায়কে বলে ওঁর কোনও ফিল্মে আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারো।

এবার আমার আকাশ থেকে পড়ার মতন অবস্থা। চাকরি? সত্যজিৎ রায়ের কাছে? আমি তার ব্যবস্থা করে দেব? আমতা-আমতা করে বললুম, মানে, সত্যজিৎ রায়ের নিজস্ব ইউনিট আছে, তা ছাড়া দেশবিদেশের অনেকেই ওঁর সঙ্গে কাজ করার জন্য উন্মুখ শুনেছি, সেইজন্য সুযোগ পাওয়া খুবই শক্ত।

—তুমি তাহলে অন্য কোনও বাংলা ছবিতে আমার একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারবে? আমার কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে, আমার বেশি টাকা চাই না, আমি কষ্ট করেও থাকতে পারব।

আমি মনে মনে ভাবলুম, বাংলা সিনেমার যা দুরবস্থার কথা শুনেছি, অনেক টেকনিশিয়ানই খেতে পায় না, সেখানে একজন আমেরিকান পোষা তো অসম্ভব ব্যাপার। তা ছাড়া এক বর্ণ বাংলা-না-জানা সাহেব নিয়ে বাংলা সিনেমা করবেই বা কী?

ডিক বলল, তোমায় আমার বায়োডাটা আর কিছু কিছু ক্রেডেনশিয়ালস্ দিয়ে দিতে পারি, তুমি যদি ইন্ডিয়াতে আমার জন্য একটা চাকরির চেষ্টা করো—

আমি একটা অছিলা দেখিয়ে উঠে পড়লুম তার পাশ থেকে, তবু সে সঙ্গ ছাড়ে না। বারবার

ওই একই কথা বলতে লাগল।

অনেক রাত্তিরে পার্টির বেশিরভাগ লোক চলে যাওয়ার পর শম্ভুদার সঙ্গে আমরা কয়েকজন বসলুম জমিয়ে আড্ডা দিতে। বিনতাবউদি জিগ্যেস করলেন, ওই ডিক তোমাকে অত কথা কী বলছিল?

আমি বললুম, আমার কাছে চাকরি চাইছিল। ভেবে দেখুন ব্যাপারটা, ভারতে কোটি কোটি বেকার, আমি স্বয়ং বেকার, আর আমার কাছেই কিনা চাকরি চাইছে একজন আমেরিকান।

বিনতাবউদি বললেন, এখন এদেশেও ষোলো পার্সেন্ট বেকার!

সিরাজুল বলল, সাবধান, ও কিন্তু সুযোগ পেলেই টাকা ধার চাইবে। আমার কাছ থেকে পঁচিশ ডলার নিয়েছে।

শম্ভুদা বললেন, ছেলেটা খুব কষ্টে পড়েছে। একটা কলেজে চাকরি করত, কী কারণে যেন চাকরি গেছে, আমাদের ইউনিভার্সিটিতে আপাতত কোনও পোস্ট খালি নেই, আমি চেষ্টা করছি ওর জন্য...ওর বউটাও পালিয়েছে ওকে ছেড়ে, একটা আট বছরের ছেলেকে নিয়ে ও ট্রেলার হাউসে থাকে, খুব টানাটানির মধ্যে পড়েছে—

আমি বললুম, ও যে বলছিল, টিভি-র নাটকের স্ক্রিপ্ট লেখে, অভিনয় করে?

শম্ভুদা বললেন, ধুৎ! সে সব বাজে কথা। কয়েকটা স্ক্রিপ্ট পাঠিয়েছে, একটাও নেয়নি ওরা। দু-একটা কমার্শিয়ালে শুধু মুখ দেখানো অভিনয় করেছে, তাতে কী হয়!

পরদিন সকালেই ডিক আমার কাছে এসে হাজির! সঙ্গে একগাদা কাগজপত্র। ওর নানান যোগ্যতার সার্টিফিকেটের কপি। বারবার বলতে লাগল ইনিয়ে বিনিয়ে, ইন্ডিয়াতে গিয়ে কাজ করার খুব ইচ্ছে, তুমি যদি একটা কাজ জোগাড় করে দিতে পারো, মাইনে বেশি চাই না, অন্তত তিনশো ডলার হলেই আমি চালিয়ে নিতে পারব—।

তিনশো ডলার ও দেশে খুবই সামান্য টাকা, মাস চালানো কঠিন। কিন্তু ভারতীয় মুদ্রায় তা সাতাশ শো টাকা। অত টাকা এদেশে কজন রোজগার করে!

এ ক্ষেত্রে নিরুপায় হয়ে আমায় মিথ্যে স্তোকবাক্য দিতেই হল, হ্যাঁ হ্যাঁ, চেষ্টা করব, আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব তোমার জন্য—।

॥ ৪৬ ॥

আর কয়েকদিন পরেই ক্রিসমাস। চতুর্দিকে সাজো-সাজো রব। প্রত্যেক পরিবারে পুজোর বাজার চলছে পুরোদমে। কয়েকদিন তুষারপাত বন্ধ আছে, বরফ-ঠিকরানো রোদ্দুরে অতিরিক্ত ঝলমল করছে প্রকৃতি। এই যে বরফ জমে আছে এখন, এই বরফ গলতে শুরু করবে সেই মার্চ-এপ্রিলে। কিন্তু ততদিন আমি থাকব না। আমার মনের মধ্যে যাই-যাই রব উঠে গেছে। ঠিক করে ফেলেছি, ক্রিসমাস আর থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরের উৎসব দেখেই ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাব।

বাইরে অত ঠান্ডা, কিন্তু কাল রাতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দারুণ গরমে। ঘামে ভিজে গিয়েছিল সারা শরীর। বিছানা ছেড়ে ওঠে সেন্ট্রাল হিটিং ব্যবস্থা একেবারে বন্ধ করে রেখেছিলুম কিছুক্ষণের জন্য। সারাক্ষণ কৃত্রিম গরম বাতাস ঢোকানো হচ্ছে ঘরে, এক-এক সময় শরীরে খুব অস্বস্তি হয়, তখন মনে হয়, এর চেয়ে ঠান্ডায় কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আসাও ভালো। কাল রাত দুটোর সময় আমি ঠান্ডা জলে স্নান করেছিলুম।

সকালে ভাবছিলুম, আজ একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসব। এমন সময় মুখার্জিদার ফোন এল।

—ওহে নীলুচন্দর, ঘুম ভাঙছে? চা খাওয়া হইছে?

—গুড মর্নিং মুখার্জিদা। অ্যাম অ্যাট ইওর সার্ভিস।

—বইস্যা বইস্যা কী করত্যাছো?

—সিম্‌পলি ডে ড্রিমিং!

—আমি ডে ময়েন যাইত্যাছি, একখান লেকচার আছে। যাবা নাকি আমার লগে?

—ডে ময়েন?

—হ, ভালো জায়গা। বি রেডি উইদিন হ্যাফ অ্যাওয়ার। আই'ল পিক ইউ আপ!

ফোন ছেড়ে আমি ঝিম মেরে বসে রইলুম কিছুক্ষণ। আমার নিয়তি!

ভেবেছিলুম আমেরিকার আর যেখানেই যাই, আয়ওয়া শহরে যাব না। ও জায়গাটা আমার নিষিদ্ধ এলাকা। কিন্তু ডে ময়েন যেতে হলে আয়ওয়া শহরের পাশ দিয়েই যেতে হবে। আমার নিয়তিই আমাকে টেনে এনেছে এই পর্যন্ত। মুখার্জিদার প্রস্তাবটি যে প্রত্যাখ্যান করব, সেরকম মনের জোরও নেই।

মুখার্জিদার দুটি গাড়ির মধ্যে আজ এনেছেন মার্সিডিজ বেঞ্জখানা। ঝকঝকে নতুন। মুখার্জিদার চেহারাটিও পাক্কা সাহেবের মতন, ইংরেজিও বলেন দারুণ চোস্ত। এই লোকটির মুখে একেবারে নিপাট বাঙাল ভাষা শুনলে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। মুখার্জিদা মদটদ খান না এবং গাড়ি চালাবার সবরকম নিয়মকানুন মেনে চলেন। মুখার্জিদার পাশে বসলেই সিট বেল্ট বাঁধতে হয়।

হাইওয়েতে পড়বার পর মুখার্জিদা জিগ্যেস করলেন, কী বেরাদর, আইজ মুখখান বাঙলার পাঁচের মতন গম্ভীর কইর‍্যা আছো ক্যান?

আমি একটু চমকে উঠে বললুম, কই না তো?

—দ্যাশের জন্য মন কান্দে?

—আপনার কাঁদে না?

—না রে ভাইডি। আমার কোনও দ্যাশ নাই। সে দুঃখের কথা আর কী কমু।

এরপর কিছুক্ষণ আমি মুখার্জিদাকে একলাই কথা বলতে দিলুম। আমার আজ সত্যিই আড্ডার মুড নেই। রোড সাইন দেখে বুঝতে পারছি, আয়ওয়া সিটি আর বেশি দূরে নেই। সব হাইওয়ের চেহারাই এক, সুতরাং চেনা কিছুই চোখে পড়ছে না।

হঠাৎ মন ঠিক করে ফেললুম। মুখার্জিদাকে বললুম, দাদা, একটা কথা বলব? আপনি ডে ময়েন থেকে কখন ফিরবেন?

—সাতটা আটটা হবে। ক্যান, তোমার তাড়া আছে নাকি?

—না। সেজন্য নয়। আপনি বরং এক কাজ করুন। আমাকে আয়ওয়া সিটিতে নামিয়ে দিয়ে যান। ফেরার সময় আবার আমায় তুলে নিয়ে যাবেন। ডে ময়েন শহরে আমার চেনাশুনো কেউ নেই, আপনার বক্তৃতা শুনেও আমি কিছুই বুঝতে পারব না। সেরকম বিদ্যাবুদ্ধি আমার নেই। বরং আয়ওয়া শহরটা ঘুরে দেখি।

মুখার্জিদা দারুণ অবাক হয়ে বললেন, আয়ওয়া সিটি? সেখানে দেখার আছেটা কী? পুঁইচকা একখান শহর, ল্যাজা নেই মুড়া নাই। ডে ময়েন অনেক বড়, ভালো ভালো দোকানপাট আছে...

—না দাদা, আমি এখানেই নামব।

—আয়ওয়া সিটিতে চেনা কেউ আছে?

—হয়তো চেনা কারুকে পাব না। কিন্তু জায়গাটা আমার খুব চেনা। গাছ-পালা, বাড়ি-ঘরগুলোকেও চিনি।

মুখার্জিদা নিরাশ হয়ে বললেন, যাবা না আমার লগে? আমি একলা একলা যামু? চলো না ভাইডি, অনেক কিছু খাওয়ামু। ওয়াইল্‌ড রাইস খাইছ কখনও?

তবু আমি নেমে পড়লুম প্রায় জোর করে। ওয়াইল্‌ড রাইসের লোভ দেখিয়ে কোনও কাজ হল না, ওই চালের ভাত আমি অনেকবার খেয়েছি। এ একরকম বুনো ধান, কেউ চাষ করে না,

জলা জায়গায় জন্মায়, লাল ইন্ডিয়ানরা খুঁজে আনে। লম্বা লম্বা চাল হয়, একটু হলদে ধরনের। তাতে অপূর্ব সুন্দর একটা গন্ধ। আশ্চর্য ব্যাপার, এই আয়ওয়া শহরেই প্রথম একজন ওয়াইল্ড্ রাইস রেঁধে খাইয়েছিল আমায়।

ঠিক হল, ইউনিভার্সিটির ইউনিয়ানের রেস্তোরাঁ থেকে ঠিক রাত আটটার সময় মুখার্জিদা আমায় তুলে নিয়ে যাবেন ফেরার সময়।

অনেক দিন আগে এই ছোট্ট শহরে আমি এক বছর থেকেছি। এখানকার রাস্তার প্রতিটি ধুলোও আমার চেনা, যদিও এদেশের রাস্তায় ধুলো থাকে না। তা ছাড়া আমার ধারণা ঠিক নয়, যে শহরটাকে আমি চিনতুম, সেটা আর নেই। এদেশে সব কিছুই বড় দ্রুত বদলায়। তখন আয়ওয়া সিটি ছিল একটা ছোট্ট, ছিমছাম নিরিবিলি শহর, অধিকাংশ বাড়িই কাঠের দোতলা। এখন সেসব বাড়ি আর প্রায় চোখেই পড়ে না, এদিকে সেদিকে বড় বড় বাড়ি। চারদিকে ছিল ছোট ছোট পাহাড় আর নিবিড় জঙ্গল, এখন পাহাড়ের গায়ে গায়েও বাড়ি উঠেছে, জঙ্গলের মধ্য দিয়ে বড় বড় রাস্তা। দোকান ছিল মাত্র দু-তিনটে, এখন রীতিমতন একখানা ডাউন টাউন, সেখানে সার সার দোকান ও ট্যাভার্ন। যেখানে ছিল বাস স্টেশন, সেটা ভেঙে সেখানে গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য শপিং মল। সেখানে, এমনকী একটা ভারতীয় জিনিসপত্রেরও দোকান রয়েছে দেখছি।

রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালুম অনেকক্ষণ। একটা লোকও আমায় চেনে না। আগে রাস্তায় বেরুলেই দু-তিনজন অন্তত একজন মুখ-চেনা চোখে পড়ত, মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে জিগ্যেস করত, হাই!

শুধু আয়ওয়া নদীটি একই রকম আছে। রোগা, কালো জল। নদীর দুপাশের দৃশ্য বদলে গেছে, সেই নির্জনতা আর নেই, নতুন ব্রিজও তৈরি হয়েছে গোটাতিনেক, তবু নদীটিকে চেনা লাগল। তার কিনারে দাঁড়িয়ে জিগ্যেস করলুম, নদী, তুমি কেমন আছো? আমায় চিনতে পারো?

এই নদীর ধার দিয়ে বিকেলবেলা আমি আর মার্গারিট হাঁটতুম। এই রকম শীতের বেলায়। এখনও যেমন, তখনও তেমন নদীর জলে ভাসত চাঁইচাঁই বরফ, কোথাও কোথাও একেবারে শক্ত হয়ে জমে যাওয়া। দুধারে পপলার গাছের সারি। হাঁটতে-হাঁটতে মার্গারিট আমায় শোনাতো ফরাসি ভাষা, আমি ওকে শেখাতুম বাংলা। আমি জানি না, এর ফরাসি কী? জ্য ন সে পা। তাড়াতাড়িতে বলতে হয়, জ্যন্সেপা! এবার বলো, জ্য পাঁঝ্ দঁক, জ্য সুই! আমি চিন্তা করি, তাই আমি বেঁচে আছি।

মার্গারিটের ফরাসি ঠোঁটে বাংলা শোনাতো বড় মধুর। আ-মি সসেজ কাবো! আ-মি জ-ল কাবো! আ-মি চু-মু কাবো! স-ব কাবো? হাউ অ্যাবসার্ড! হাউ সুইট!

একেবারে পাগলি ছিল মেয়েটা। কবিতা পাগল। দিনরাত কবিতা-তন্ময়। যে কোনও দৃশ্য, যে কোনও ঘটনা দেখলেই জিগ্যেস করত, বলো তো, কার কবিতায় ঠিক এরকম আছে?

আমি কি অত পারি? আমার তো অত কবিতা জ্ঞান নেই। সুতরাং ও-ই শোনাত আমাকে। আমার ঘরে পাশাপাশি বসে ও আমাকে গিয়ম্ অ্যাপোলোনিয়েরের কবিতা পড়ে শোনাতো ঘন্টার পর ঘন্টা। অ্যাপোলিনিয়েরের একটি কবিতায় দুষ্মন্ত শকুন্তলার প্রণয় কাহিনির উল্লেখ থাকায় ও বলেছিল, তুমি আমায় কালিদাসের শকুন্তলা শোনাও! শুধু কাহিনিটা বললে হবে না, কালিদাসের রচনা ওকে পড়ে শোনাতে হবে। দেশ থেকে বাংলা কালিদাস গ্রন্থাবলী আনিয়ে দিনের পর দিন আমার অক্ষম ইংরেজিতে ওকে অনুবাদ করে শুনিয়েছি।

যে বাড়িটায় আমি থাকতুম, খুব ইচ্ছে হল সেই বাড়িটা দেখবার। ঠিকানা এখনও মুখস্ত আছে। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল বাড়িটার নাম ক্যাপিটল। তার চারদিকে চারটে রাস্তা। আমার বাড়ি ছিল তিন শো তিন নম্বর সাউথ ক্যাপিটলে। এক বছর যেখানে থেকেছি, সেই রাস্তা ভুলে যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। তবু আমি পথ চিনতে পারছি না। সাউথ ক্যাপিটল রাস্তাটা ধরে

হাঁটতে হাঁটতেও দিশেহারা হয়ে যাই। এ যে সব কিছুই অন্যরকম। আমার বাড়িটা গেল কোথায়? আমার বাড়িটা ছিল রেল স্টেশনের দিকে। পথ চলতি দু-একজন ছাত্রকে রেল স্টেশনের কথা জিগ্যেস করলে তারা চিন্তিত মুখে থমকে থাকে। রেলস্টেশন? কখনো এর কথা শুনিনি তো? ছাত্র মানেই নতুন আবাসিক, তাই চেনে না। এবার জিগ্যেস করলুম একজন বয়স্ক লোককে। তিনি বললেন, রেলস্টেশন? হ্যাঁ ছিল বটে এককালে। এখন তো সেটাতে আর কিছু হয় না। এখান থেকে রেল উঠে গেছে!

কোনও শহর থেকে রেলস্টেশন উঠে যাওয়ার কথা কেউ আগে শুনেছে? আমরা তো জানি নতুন নতুন রেলস্টেশন হয়, পুরোনোরা উঠে যায় না। আমেরিকাতে ট্রেন ব্যাপারটাই এখন মুমূর্ষু।

অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরির পর বুঝতে পারলুম, সাউথ ক্যাপিটলের অর্ধেকটা আছে, আর বাকি অর্ধেকটা উধাও হয়ে গেছে। সেই রাস্তা ও সেখানকার সব বাড়ি ঘর ভেঙে-গুঁড়িয়ে সেখানে উঠেছে অনেকগুলো মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্ট হাউস। সেই বাড়িটিতে আমার প্রথম যৌবনের অনেক স্মৃতি ছিল। বাড়িটি আর ইহলোকে নেই, মার্গারিটও নেই।

মার্গারিট থাকত হস্টেলে অর্থাৎ ডর্মে। সেই সময় ছাত্র ও ছাত্রীদের আলাদা আলাদা ডর্ম ছিল, এখন তারা ইচ্ছে করলে একসঙ্গেই থাকতে পারে।

এক একদিন রাত একটা দেড়টায় আমি মার্গারিটকে ওর ডর্মে পৌঁছে দিতে আসতুম। প্রায় কাছাকাছি আসবার পর ও বলত, এবার তুমি একলা ফিরবে? চলো, আমি তোমায় খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমি যতই বারণ করি, সে পাগলি কিছুতেই শুনবে না। জোর করে আসবেই। অনেকখানি চলে আসে। তখন আমি পুরুষ হয়ে সেই নিশুতি রাতে একটি যুবতীকে কী করে একলা ছেড়ে দিই। আবার আমি ফিরে যাই ওর সঙ্গে। আবার ও আমাকে এগিয়ে দিতে চায়। প্রথম যৌবনের সেই সব উলটো-পালটা খেলা।

মার্গারিটের মনটা ছিল জলের মতন স্বচ্ছ। টাকাপয়সার কোনও হিসেবই বুঝত না। যে কেউ চাইলে ওর যা কিছু সম্বল এক কথায় দিয়ে দিতে পারত। এমন প্রায়ই হয়েছে, আমাদের দুজনের কাছে একটাও পয়সা নেই, ঘরে কোনও খাবার নেই, আমরা খালি পেটে কবিতা পড়ে কাটিয়েছি। খিদের জ্বালা খুব অসহ্য হলে ঠিক খাওয়ার সময় কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি, যাতে সে কিছু খেতে বলে। আমাদের বাড়ির নীচের তলাতেই থাকত পোল্যান্ডের একটি ছেলে, নাম ক্রিস্তফ, সে খুবই ভালো মানুষ, কিন্তু একটু কৃপণ স্বভাবের। আমি আর মার্গারিট দুজনে মিলে যে কত কৌশলে ক্রিস্তফের ঘাড় ভেঙেছি!

একদিন তিনজন দৈত্যাকার কালো মানুষকে মার্গারিট নিয়ে এসেছিল আমার ঘরে। তারা নাকি রাস্তা হারিয়ে ফেলেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, ওরা বদ্ধ মাতাল আর ওদের মতলব খুব খারাপ। মার্গারিটকে সে কথা বললে ও বিশ্বাসই করতে চায় না। ওর ধারণা, পৃথিবীতে কোনও খারাপ মানুষ নেই।

সেই রকমই কোনও লোককে বেশি-বেশি বিশ্বাস করায় মার্গারিটের কিছু একটা সাংঘাতিক পরিণতি হয়েছিল। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। আমাকে সেই ঘটনার পূর্ণ বিবরণ কেউ জানায়নি। পল এঙ্গেল বলেছিলেন, সে বড় মর্মান্তিক ব্যাপার, সে তোমার শুনে কাজ নেই।

আমি আয়ওয়া শহরে আসতে চাইনি, কারণ আমি ভেবেছিলুম, মার্গারিটের স্মৃতির কষ্ট আমি সইতে পারব না। কিন্তু একলা-একলা অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলুম, কই, তেমন তো কষ্ট হচ্ছে না? আমি তো সব কিছুই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছি। তবে কি আমার হৃদয় খুব কঠিন? সময়ের ব্যবধান কি এতখানি ভুলিয়ে দিতে পারে? ভুলিনি কিছুই, কিন্তু দুঃখের বদলে মার্গারিটের স্মৃতি আমার কাছে মধুর হয়ে আসছে।

।। ৪৭ ।।

এই শহরটির অনেক কিছু বদলে গেলেও একজন মানুষ বদলায়নি। তাঁকে দেখার পর আমি দারুণ চমকে উঠেছিলুম। মানুষের শরীর এত অবিচলিত থাকতে পারে?

রাস্তার টেলিফোন বুথ থেকে টেলিফোন করলুম পল এঙ্গেলকে। প্রথমে তিনি অবাক হয়ে দু-তিনবার বললেন কে? কে? তারপর আমায় চিনতে পেরে জিগ্যেস করলেন, তুমি কোথা থেকে কথা বলছ, কলকাতা? দিল্লি? লন্ডন?

আমি যখন বললুম এই আয়ওয়া শহর থেকেই, তখন পল একটা বিরাট লম্বাভাবে বললেন, হো-য়া-ট? তুমি এক্ষুনি আমার বাড়ি চলে এসো। না, না, তুমি নিজে আসতে পারবে না। তুমি কোথায় আছ? সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো, আমি তোমায় তুলে আনছি।

শীতের জন্য বেশিক্ষণ রাস্তায় থাকা যায় না, সেই জন্য আমি মাঝে-মাঝেই কোনও-না-কোনও দোকানে ঢুকে শরীর গরম করে নিচ্ছিলুম। এখানকার দোকানে কিছু না কিনেও ঘুরে বেড়ালে কেউ কিচ্ছু বলে না। এখন আমি রয়েছি বুক স্টোরে। আগেই বলেছি, আয়ওয়া শহরটি খুবই ছোট, ধরা যাক মানকুণ্ডু কিংবা সোনারপুরের মতন। তবু এখানকার মতন এত বড় বইয়ের দোকান সম্ভবত কলকাতা শহরেও একটি নেই।

পল এঙ্গেল মানুষটি বড় অদ্ভুত। ইনি নিজে একজন কবি, খুব একটা উঁচু জাতের নন যদিও, আমেরিকার আধুনিক কবিদের চোখে ইনি, ধরা যাক, কালিদাস রায়। কিন্তু, পল এঙ্গেল সাহিত্যকে প্রাণের চেয়ে .বেশি ভালোবাসেন। ওঁর মতে, পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যিকরাই এক জাতির লোক এবং সবাই, সবাই-এর আত্মীয়। সেইজন্য উনি প্রতি বছর একটা আত্মীয় সমাবেশ ঘটান এই ছোট শহরে। প্রধানত ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় উনি চালু করেছেন ইন্টার ন্যাশনাল রাইটিং প্রোগ্রাম। সেই প্রোগ্রামে পৃথিবীর নানান দেশের লেখকদের নেমন্তন্ন করে এনে এখানে অতিথি করে রাখা হয় তিন-চার মাস। চিন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি থেকেও লেখকরা আসেন প্রতি বছর। ভারত থেকেও অনেক লেখক এসেছেন, বাংলা থেকে বিভিন্ন বছরে এসেছেন শঙ্খ ঘোষ, জ্যোতির্ময় দত্ত, সৈয়দ মুজতবা সিরাজ প্রমুখ। পলের সঙ্গে আমার আলাপ হয় কলকাতায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের মাঠে। অনেক বছর আগে।

পল একটা স্টেশন ওয়াগন নিয়ে এসে হাজির হলেন সাত মিনিটের মধ্যে। তাঁকে দেখে আমি তাজ্জব। হিসেব মতন পলের বয়স এখন হওয়া উচিত বাহাত্তর, কিন্তু আমি অনেকদিন আগে যেরকম দেখেছিলুম, চেহারাটা এখনও ঠিক সেইরকমই আছে, দীর্ঘকায় মানুষটির শরীরে বার্ধক্যের ছাপ লাগেনি। আমাকে দেখে দ্রুত এগিয়ে এসে সোজা জাপটে ধরলেন। চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন হোয়াট আ প্লেজান্ট সারপ্রাইজ।

তারপর জিগ্যেস করলেন, তোমার লাগেজ কোথায়?

আমি লাজুক মুখে বললুম, কিছু নেই সঙ্গে!

—তার মানে?

—আমি ঘুরতে-ঘুরতে আসছি। থেমে-থেমে। আপাতত আসছি সিডার র‍্যাপিডসের এক বন্ধুর বাড়ি থেকে। আয়ওয়া আসব কি না ভাবছিলুম। অবশ্য তোমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করতুম ঠিকই—

পল চেয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর নরমভাবে বললেন, মার্গারিট ম্যাতিউ?

আমি ঘাড় নাড়লুম।

পল বললেন, আমারও মনে আছে মেয়েটিকে। বড্ড সরল ছিল। এত সরল মানুষের বোধহয় আর জায়গা নেই এ পৃথিবীতে। পৃথিবীটা দিন-দিন যেন আরও নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে। চলো। গাড়িতে ওঠো।

আয়ওয়া নদীর ধার দিয়ে এসে পলের গাড়ি একটা টিলার ওপরে উঠল। দুপাশে জঙ্গল। ঢেউ খেলানো টিলার পর টিলা চলে গেছে, তারই একটার ওপরে পলের নতুন বাড়ি। আগের বার আমি যখন এখানে আসি তখন পল ছিল এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, তার বাড়িটিও ছিল মাঝারি মডেস্ট ধরনের। রিটায়ার করার পর পল এই বাড়িটি কিনেছে, এটা বেশ বড় আর ছড়ানো, সঙ্গে সুইমিং পুল আছে। পল এঙ্গেল এদেশের একজন সচ্ছল মধ্যবিত্ত আমেরিকান, কিন্তু তার তুলনায় আমি আমেরিকা-কানাডার অনেক বাঙালির এর চেয়ে ঢের বড় বাড়ি দেখেছি। পলের দুখানি অতি সাধারণ গাড়ি, এর চেয়ে প্রবাসী বাঙালিরা আরও চাকচিক্যময় গাড়ির মালিক।

বাড়ির মতন পলের স্ত্রীও নতুন। এই নতুন স্ত্রীর নাম হুয়ালিং, ইনি একজন চিনে মহিলা এবং লেখিকা। চিনে এবং ইংরেজি এই দুই ভাষাতেই লেখেন। হুয়ালিং খুবই হাস্যঝলমল নারী এবং ব্যবহারে উষ্ণতা আছে। আমার হাত চেপে ধরে বললেন, তোমার কথা পলের মুখে অনেকবার শুনেছি।

তারপর একটু দুষ্টু হেসে হুয়ালিং বললেন, পল আজকাল বড্ড বেশি পুরোনো গল্প বলে।

পল অট্টহাস্য করে বললেন, তা হলেই বুঝতে পারছ, তোমাকে বিয়ে করার আগের দিনগুলো কত ভালো ছিল।

হুয়ালিং-এর বয়েস নিশ্চয়ই পঞ্চাশের বেশি, কারণ তাঁর আগের পক্ষের দুটি সাবালিকা মেয়ে আছে। কিন্তু হুয়ালিং-এর গায়ের ত্বক বালিকার মতন মসৃণ। শুনেছি চিনেদের নাকি দেরিতে জরা আসে।

পলেরও আগের পক্ষের দুটি মেয়ে। আমি চিনতুম তাদের। খবর নিয়ে জানলুম, বিয়ে করে তারা দুজনেই এখন বিদেশে থাকে। পলের ছোট মেয়ে সেরার সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব ছিল। এই ক'বছরের মধ্যেই সে মোট চারবার বিয়ে করেছে।

পলের আগের পক্ষের স্ত্রী মেরির সঙ্গে ছিল আমার দারুণ ভাব। কারণ, প্রথম দিন আমি তাকে ভুল করে মা বলে ডেকে ফেলেছিলুম। এদেশে কোনও মহিলাকে মা বলা একটা দারুণ অপরাধ। আমি সবে প্রথম দিন এসেছি, কাঠ বাঙাল ইংরেজি আদবকায়দা জানি না। একজন বয়স্কা মহিলাকে কী বলে ডাকব ভেবে পাইনি। এদেশে সবাই সবার নাম ধরে ডাকে কিন্তু আমার বাধো-বাধো লাগছিল, তাই সম্বোধন করেছিলুম মাদার বলে! মেরি অবশ্য রাগেনি। হেসেই খুন হয়েছিল সে ডাক শুনে। তারপর কত লোকের কাছে যে আমার সেই বাঙালত্বের গল্প শুনিয়ে আমায় নাজেহাল করেছে! তবে, মেরি আমায় ডেকে-ডেকে খাওয়াত প্রায়ই।

মেরি ছিল পাগলি। কখন যে রেগে উঠবে তার ঠিক নেই। একবার ক্রিস-মাসের রাতে সে আমাদের উপোস করিয়ে রেখেছিল। সেদিনই টিভি-তে সে কলকাতা সম্পর্কে একটা তথ্যচিত্র দেখাচ্ছিল এখানে। আমরা সবে খেতে বসেছি এমন সময় মেরি অগ্নিমূর্তি হয়ে এসে বললে, কলকাতায় কত মানুষ খেতে পায় না, কত মানুষ সারা রাস্তায় শুয়ে থাকে, আর তোমরা এখানে বসে-বসে এত খাবার খাচ্ছ? তোমাদের লজ্জা করে না? এই বলে সে খাবারের পাত্রগুলো তুলে-তুলে আছড়ে ফেলেছিল মেঝেতে।

মেরি এখন বেঁচে নেই। মেরির একটা শখ ছিল বাদুড়ের ছবি জমানো। পৃথিবীর নানান জাতের বাদুড়ের প্রায় হাজার খানেক ছবি ছিল তার। আমায় সে বলেছিল ভারতীয় বাদুড়ের ছবি পাঠাতে। আমি পাঠাতে পারিনি। আমার চেনা ফটোগ্রাফারদের বাদুড়ের ছবির কথা বললেই তারা শুধু হেসেছে।

হুয়ালিং যতই আমেরিকায় বসবাস করে আধুনিকা হোক, তাঁর শরীরে আছে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত, একটু-একটু সংস্কারও রয়ে গেছে। এরই মধ্যে এক ফাঁকে তিনি জানিয়ে দিলেন যে, পলের স্ত্রী মারা যাওয়ার পর এবং তিনি নিজেও বিধবা হওয়ার পর তারপর তাঁদের বিয়ে হয়েছে। আমি

পলের আগেকার স্ত্রীকে চিনতুম বলেই বোধহয় আমাকে এই কথা জানাবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন তিনি।

পল একটু জোরে কথা বলেন, দারুণ জোরে-জোরে হাসেন, তাঁর হাঁটার সময়ে কাঠের ফ্লোরে দুপদুপ শব্দ হয়। একে বলবে বাহাত্তুরে?

পল পৃথিবী ভ্রমণ করেছেন বেশ কয়েকবার, কলকাতাতেও এসেছেন দু-বার। হুইস্কির বোতল খুলে শুরু করলেন কলকাতার গল্প। সেই যে গঙ্গার ধারে বার্নিং ঘাট, সেখানে রবীন্দ্রনাথ টেগোরকে ক্রিমেট করা হয়েছিল, কী যেন সেই জায়গাটার নাম?

— নিমতলা।

— হ্যাঁ, হ্যাঁ। স্পষ্ট মনে আছে। গঙ্গা নদী, জানো তো হুয়ালিং, আমাদের মিসিসিপির চেয়েও চওড়া, অবশ্য তোমাদের ইয়াংসিকিয়াং আরও বড়, কিন্তু গঙ্গা হচ্ছে হোলি রিভার, সেখানে একবার ডিপ নিলেই সব পাপ কেটে যায়—

হুয়ালিং বললেন, জানি।

— নিউ ইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কের মতন কলকাতার মাঝখানে একটা হিউজ এরিয়া আছে, কী যেন নাম, না, না, বোলো না, মনে পড়েছে, মইডান্! তাই না। তার পাশের রাস্তাটার নাম চৌরিঙিঘ। ঠিক বলিনি? আর একটা রাস্তা, যেখানে কফি হাউস আছে, সেই কফি হাউসে ইয়াং রাইটাররা যায়, খুব ক্রাউডেড রাস্তা, অনেক বইয়ের দোকান, রেলিং-এর গায়ে পুরোনো বইয়ের দোকান।

আমি বললুম, পল, তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি।

হুয়ালিং আবার দুষ্টু হাসি দিয়ে বললেন, জানো তো, পল এই কথাটা শুনতে খুব ভালোবাসে।

—কোন কথাটা?

—এই যে, 'তোমার তো আশ্চর্য স্মৃতিশক্তি!'

পল বললেন, লোকে কি আমায় খুশি করার জন্য মিথ্যে কথা বলে? আমার মেমারি তো সত্যিই ফ্যানটাসটিক।

—কিন্তু এই সব গল্প যে আমরা আগে অনেকবার শুনেছি।

—তাহলে শোনো, নীললোহিতের সঙ্গে আমার এখানকার গল্প বলি। নীলু, তোমার মনে আছে সেই ভ্যান অ্যালেনের পোশাকের ঘটনা।

আমি বললুম, সে কখনও ভোলা যায়?

—চলো, কাল তোমায় অনেক জায়গায় নিয়ে যাব।

—কাল? আমার যে আজই ফিরে যাওয়ার কথা?

—আয়ওয়া থেকে তুমি আজই ফিরে যাবে? তুমি কি ক্রেজি হয়ে গেছ নাকি?

হুয়ালিং জিগ্যেস করলেন, ভ্যান অ্যালেনের গল্পটা কী? সেটা তো আগে শুনিনি।

পল বললেন, তুমি তো ভ্যান অ্যালেনকে চেনো। একদিন তার বাড়িতে গেছি আকাশের তারা দেখতে—

হুয়ালিং বাধা দিয়ে বললেন, তুমি চুপ করো, গল্পটা নীললোহিতকে বলতে দাও!

ভ্যান অ্যালেন আয়ওয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। নোবেল প্রাইজ পাওয়া বিজ্ঞানী। তাঁর অনেক মৌলিক আবিষ্কার আছে। আকাশে তিনি একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড আবিষ্কার করেছেন, তার নামই দেওয়া হয়েছে ভ্যান অ্যালেন'স বেল্ট।

এই ভ্যান অ্যালেন পল এঙ্গেলের বন্ধু। আগেরবার পল আমাকে প্রায়ই নিয়ে যেতেন ভ্যান অ্যালেনের বাড়ি। অত বড় বিজ্ঞানী, কিন্তু নিরহঙ্কার মাটির মানুষ তিনি। আমাদের তিনি আকাশের নক্ষত্রজগৎ দেখাতেন আর জটিল বিজ্ঞানের কথা এমন সরলভাবে বোঝাতেন যে আমার মতন মূর্খও তা অনেকটা বুঝে যেত।

একদিন সেই রকম নক্ষত্র দেখা চলছে, চমৎকার চাঁদনি রাত। ভ্যান অ্যালেনের বাড়িতে সেদিন কেউ নেই। আমাদের খাওয়া হয়নি। হঠাৎ তিনি বললেন, চলো, আজ সবাই মিলে বাইরে কোথায় খেয়ে আসি। তারপর তিনি মাইল পঞ্চাশেক দূরের একটা রেস্তোরাঁর নাম করে বললেন, ওখানকার হাঙ্গেরিয়ান গুলাশ্ খুব ভালো হয় শুনেছি। আর স্যালাড দেয় পঁচিশ রকম।

এ প্রস্তাব শুনে পল খুব একটা উৎসাহ দেখালেন না। আমার দিকে কয়েকবার তাকিয়ে তিনি বন্ধুকে বললেন, ভ্যান, ইউ নো, দেয়ার ইজ আ লিট্‌ল প্রবলেম।

সমস্যাটা আমি তৎক্ষণাৎ বুঝে গেলুম। গ্রীষ্মকাল, আমি পরে ছিলুম হাওয়াই শার্ট, ট্রাউজার্স আর চটি। কোনও-কোনও রেস্তোরাঁয় তখনকার দিনে পুরোদস্তুর পোশাক পরে যাওয়ার নিয়ম ছিল। টাইটা অনেকে বর্জন করলেও ডিনারের সময় জ্যাকেট পরা অবশ্য পালনীয়। আমার জন্য ওঁদের যাওয়া হবে না ভেবে আমার দারুণ অস্বস্তি লাগছিল।

বড় বৈজ্ঞানিকরা এই সব ছোটখাটো সমস্যা চট করে বুঝতে পারেন না। ভ্যান অ্যালেন বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, কেন, কেন, কী হয়েছে? কী প্রবলেম?

পল তাঁকে কয়েকবার অন্য কোনও ছোট রেস্তোরাঁর নাম বলার পর শেষ পর্যন্ত আসল কথাটা খুলেই বললেন। তা হলে আমাকে আবার বাড়ি গিয়ে পোশাক পরে আসতে হয়, আমার বাড়ি উলটো দিকে কুড়ি মাইল।

ভ্যান অ্যালেন বললেন, তাতে কী হয়েছে, আমাদের এই তরুণ ভারতীয় বন্ধুটি দৈর্ঘ্যেপ্রস্থে তো আমারই সমান। আমার জুতো ওর পায়ে লেগে যাবে।

এই বলে তিনি তক্ষুনি নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমায় দিলেন ওঁর জুতো-মোজা আর কোট। হাওয়াই শার্টের ওপর কেউ জ্যাকেট পরে না, সেই জন্য আমার হাওয়াই শার্টটাই গুঁজে নিলুম প্যান্টে। জামা গুঁজে পরার পর বেল্ট না পরলে চলে না। একটা বেল্টও পেয়ে গেলুম। সেটা সবে কোমরে গলিয়েছি এমন সময় পল দারুণ বিস্ময়ে বলে উঠলেন, নীলু, নীলু, তুমি কি জানো, তোমার কোমরে এখন ভ্যান অ্যালেন্‌স বেল্ট?

গল্পটা শুনে খুব হাসলেন হুয়ালিং। এই রকম আরও অনেক গল্পে সন্ধে ঘনিয়ে এল। শীতের বেলা, দেখতে-দেখতে অন্ধকার হয়ে যায়। আমি ওঠবার কথা বলতেই পল আবার এক ধমক দিলেন। বললেন, এখানে অনেক দেশের লেখকরা এসে আছেন। আজ এ বাড়িতে পার্টি আছে, সবাই আসবে। তুমি থাকো, তোমার সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দেব।

থাকতেই হল। সাড়ে ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই আসতে লাগলেন লেখক লেখিকারা। বিভিন্ন রকম চেহারা, কত রকম তাদের পোশাকের বৈচিত্র্য। এদের মাঝখানে আমি এক হংস মধ্যে বকো যথা।

হঠাৎ দেখি শাড়ি পরা এক মহিলা। দারুণ জমকালো সাজসজ্জার জন্য প্রথমটায় চিনতে পারিনি। তারপরই বুঝলাম কবিতা সিংহ।

আমি ছুটে গিয়ে বললুম, কবিতাদি!

॥ ৪৮ ॥

পল এঙ্গেলের অনুরোধে আমি কয়েকদিন থেকে গেলুম আয়ওয়ায়। এ যাত্রায় এই প্রথম আমার কোনও সাহেবের আতিথ্য গ্রহণ। গত কয়েক মাস আমি শুধু বাঙালিদের বাড়িতেই কাটিয়েছি নানান জায়গায়, কখনও পুরোনো বন্ধুদের বাড়িতে, কোথাও বা নতুন বন্ধুত্ব পাতিয়ে। আগেরবার যখন আমি এদেশে এসেছিলুম, তখন বেশিরভাগ সময় সাহেবদের সঙ্গেই কাটিয়েছি, বাঙালিদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল খুব কম।

মুখার্জিদাকে সেই রাত্তিরেই খবর দিয়ে দেওয়া হল, পরের দিন গাড়ি পাঠিয়ে সিডার র‍্যাপিডস থেকে আনানো হল আমার সুটকেস। আয়ওয়াতে আমি জায়গা পেলুম ইউনিভার্সিটি গেস্ট হাউসে। মফস্বল শহরের এই ছোট বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিথিশালায় ঘর আছে প্রায় ষাট-সত্তরটা, ব্যবস্থা প্রায় হোটেলের মতন, তবে আমাকে পয়সা দিতে হবে না এই যা!

আমার চারতলার ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যায় আয়ওয়া নদী। এই নদীটি মোটেই দেখতে সুন্দর নয়। কিন্তু একে সুদৃশ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে অনেকভাবে, কিছুদূর অন্তর-অন্তর এক-একটা সেতু, প্রত্যেকটিরই গঠন আলাদা, আর দুপাশে লাগানো হয়েছে নানারকম গাছ। উইলো, পপলার, চেরি এই সব গাছ চিনতে পারি, এক-একটা গাছ দেখলে দেবদারু মনে হয়। সেগুলো আসলে সাইপ্রেস। অ্যামস্টারডামে এই সাইপ্রেস গাছ অনেক দেখেছি। ভ্যান গঁঘের ছবিতেও অহরহ দেখা যায়।

আর আছে নানারকম বুনো ফুল। আমি আগে থেকেই জানি এ দেশে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বুনো ফুলের গন্ধ খোঁজা নিরাপদ নয়। কী একটা ফুল নাকের কাছে এনে ঘ্রাণ নিলেই হে ফিভার নামে এক উৎকট জ্বর হবেই। সুতরাং ফুল দেখতে হয় দূর থেকে। অবশ্য ফুলের দিন এখন নয়, এখন সবই বরফে ঢাকা।

আয়ওয়া শহরটিকে বলা চলে যৌবনের শহর। যেহেতু ইউনিভার্সিটিই এখানে প্রধান ব্যাপার, তাই রাস্তায়-ঘাটে, দোকানে-বাজারে, সিনেমা-রেস্তোরাঁয় শুধু তরুণ তরুণী। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ক্বচিৎ দেখা যায়, আর শিশু তো অতি দুর্লভ বস্তু।

আস্তে-আস্তে কয়েকজন লেখক-লেখিকার সঙ্গে পরিচয় হল। কবিতা সিংহ একদিন আমায় নেমন্তন্ন করে খাওয়ালেন। কবিতাদি আছেন মে ফ্লাওয়ার নামে একটি বিশাল অ্যাপার্টমেন্ট হাউসে, এলসা ক্রস নামে একটি মেক্সিকান কবির সঙ্গে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাগাভাগি করে। কবিতাদি তাঁর ঘরটা চমৎকার সাজিয়েছেন নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে আনা নানারকম গাছের ডাল আর লতাপাতা দিয়ে, নিজের হাতে আঁকা কয়েকটা ছবিও লাগিয়েছেন দেওয়ালে।

কবিতাদির চেহারাটিও এই শীতের দেশে এসে আরও সুন্দর হয়েছে। কাশ্মীরি মেয়েদের মতন একটা পোশাক পরেছেন, তার ওপর নতুন ঝকঝকে ওভারকোট, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, ঠিক যেন মেমসাহেব।

যত্ন করে রান্না করেছেন নানারকম পদ। খেতে বসে কবিতাদি বললেন, তোমায় দেখে কী দারুণ চমকে গিয়েছিলুম, নীলু। তোমায় এখানে দেখতে পাব, আশাই করিনি। তুমি তো একটা উড়নচণ্ডী আমি জানি, পায়ে হেঁটে-হেঁটেই কলকাতা থেকে এই পর্যন্ত চলে এলে নাকি?

আমি বললুম, হেঁটে আসব কেন? যোগবিদ্যা শিখে নিয়েছি তো, তাই আমি এখন ইচ্ছে করলেই হাওয়ায় উড়তে পারি।

কবিতাদি একটু হেসে বললেন, জানো তো সুনীল আর স্বাতীও এখানে এসেছে। ওরা অবশ্য এখন নেই, কোথায় যেন বেড়াতে গেছে।

আমি বললুম, আমার সঙ্গে নিউইয়র্কে একবার দেখা হয়েছিল, তখন ওঁরা আপনার কথা বলেছিলেন। আপনার এখানে কেমন লাগছে, কবিতাদি?

কবিতাদি বললেন, কী ভালো যে লাগছে, তা তোমায় কী বলব। কত দেশের লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে আলাপ হচ্ছে, কতরকম মানুষ, পল আর হুয়ালিং আশ্চর্য ভালো মানুষ। কী চমৎকার একটা লম্বা ছুটি বলো তো? এটা যেন একটা দৈব উপহার। এ এমন ছুটি, যাতে ইচ্ছে মতন অনেক কাজ করতে ইচ্ছে করে। জানো তো, আমি রোজ লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেক কিছু নোট নিই। এমন মন দিয়ে পড়াশুনো করতে পারিনি অনেকদিন। আর একটা দারুণ খবর তোমায় শোনাচ্ছি, নীলু! এখানকার পুরোনো খবরের কাগজ ঘাঁটতে-ঘাঁটতে আমি আবিষ্কার করলুম, রবীন্দ্রনাথ একবার এসেছিলেন এই শহরে। এই খবর আমি আগে কোথাও পড়িনি। কোনও রবীন্দ্র গবেষক জানে না।

আমি বললুম, সত্যিই তো। আমিও এ খবর কখনও শুনিনি। তবে ডিলান টমাস এসেছিলেন

শুনেছি। ডিলান টমাসকে কবিতা পড়ার জন্য এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি বদ্ধ মাতাল অবস্থায় ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে আছাড় খেয়ে পড়ে যান। পরদিন সেইরকম মাতাল অবস্থায়ই তাঁকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।

কবিতাদি বললেন, আয়ওয়া জায়গাটা ছোট হলে কী হবে, পৃথিবীর সব দেশের লেখকরা এখানে আসেন। আমার তো ইচ্ছে করে এখানে অনেকদিন থেকে যাই, তবে ছেলেমেয়েদের জন্য মাঝে খুব মন কেমন করে। সপ্তাহে একখানা অন্তত চিঠি না পেলে এমন ছটফট করি...।

কবিতাদির অ্যাপার্টমেন্ট-সঙ্গিনী ভারী অদ্ভুত মেয়ে। ছোট্টখাট্টো মিষ্টি চেহারা, মুখে সব সময় হাসি লেগে আছে, কথা বলে নরম গলায়। মেক্সিকোতে এই এলসা ক্রুসের কবি হিসেবে বেশ নাম আছে। ওর সঙ্গেও আলাপ হল। এলসা এরই মধ্যে দুবার বিয়ে ও দুবার ডিভোর্স করেছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে তার। আধুনিক সাহিত্যিকদের মতন এক সময় সে প্রচুর মদ খেত, সিগারেট-গাঁজা টানত। মেক্সিকোতে পিয়োটি নামে আরও একটি মারাত্মক নেশার দ্রব্য আছে, তাও সে চেখে দেখেছে। কিন্তু শুধু অতৃপ্তি আর বিপর্যয়ই পেয়েছে তার বদলে। এখন সে শান্তির সন্ধানে মহারাষ্ট্রীয় গুরু স্বামী মুক্তানন্দের শিষ্যা হয়েছে। এলসা এখন কোনওরকম নেশা করে না, নিরামিষ খায়। তার ঘরে তার গুরুর ছবি, আর শিবঠাকুরের ছবি। শুধু নিজেই সে গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে ক্ষান্ত হয়নি, হিন্দুত্ব প্রচারের ব্রতও নিয়েছে। এখানেও সে আধ্যাত্মিক বিষয়ের ক্লাস নেয়।

অমন মিষ্টি একটি মেয়ের সঙ্গে একদিন আলাপের পরেই আমি তাকে এড়িয়ে-এড়িয়ে চলতে লাগলুম, পাছে সে আমাকেও হিন্দু বানিয়ে ফেলে।

প্রায় কুড়িজন লেখক লেখিকা এসেছেন এখানে, তার মধ্যে মূল চিন থেকেই তিন-চারজন। এঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মাদাম ডিংলিং। এই মাদাম ডিংলিংকে দেখতে অবিকল আমার দিদিমার মতন। তফাত শুধু এই, ইনি শাড়ি পরেন না, পরেন পাজামা আর কুর্তা। বয়েস প্রায় চুয়াত্তর, শুনেছি শরীরে ক্যানসার রোগ বাসা বেঁধেছে, তবু কী অসাধারণ এঁর জীবনীশক্তি, দিব্যি পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ান। দেখা হলেই মাথা ঝাঁকিয়ে তুরতুর করে অনেক কথা বলে যান, তার এক বর্ণও আমি বুঝি না। মাদাম ডিংলিং ইংরিজির ই-ও জানেন না। কিন্তু যখন আমার গায়ে ওঁর স্নেহময় হাতখানি রাখেন, তখন একটা আত্মীয়তা টের পাই।

মাদাম ডিংলিং এক সময় বিপ্লবের ডাকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি সতেরো বছরের যুবতি। তারপর তিনি জীবনের ঘূর্ণাবর্তে কত জায়গায় যে গিয়েছেন এবং থেকেছেন তার ঠিক নেই। তিনি ছিলেন মাও সে-তুং ও প্রখ্যাত লেখক লু সুনের বান্ধবী। চিয়াং কাইসেকের আমলে তিনি দীর্ঘকাল জেল খেটেছেন। তারপর চিনের বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর তিনি গণ্য হন প্রথম সারির লেখিকা হিসেবে। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় তাঁকে আবার জেল খাটতে হয়, সে বড় সাংঘাতিক কারাবাস, তিনি যাতে লিখতে না পারেন সেজন্য এক চিলতে কাগজও দেওয়া হয়নি তাঁকে, তাঁকে কাজ দেওয়া হয়েছিল মুরগি পালন করার। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের ভুল ভ্রান্তির যাবতীয় দায়দায়িত্ব এখন গ্যাং অব ফোর-এর নামে চালালেও, মাদাম ডিংলিং-এর মতে, মাও সে-তুং-এরও যথেষ্ট দায়িত্ব ছিল। মাদাম ডিংলিং পরিষ্কার ভাষায় বলেন, তাঁর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মাও সে-তুং-এর সেই সময়কার ভুলে চিনের অগ্রগতি অন্তত দশ বছর পিছিয়ে গেছে। এই ভুলের সমালোচনা করেছিলেন বলেই তিনি বন্দি হয়েছিলেন।

এখন মাদাম ডিংলিং চিনের প্রধান লেখিকা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর এক একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় কয়েক লক্ষ, তিনি কোনও জনসভায় গেলে মানুষের ভিড় ভেঙে পড়ে।

মাদাম ডিংলিং দুবার বিয়ে করেছিলেন। বর্তমানে তিনি এক অবিবাহিত পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে থাকেন। সেই চিনা ভদ্রলোকও এসেছেন এখানে, তিনি খুব ভাঙা-ভাঙা ইংরিজি জানেন। মাদাম ডিংলিং-এর কথা তিনি অনুবাদ করে বুঝিয়ে দেন। ভারতবর্ষের প্রতি মাদাম ডিংলিং-এর খুব শ্রদ্ধা, উনি রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়েছেন ও পছন্দ করেছেন। আরও দু-একজন বাঙালি লেখকের সঙ্গে

ওঁর দেখা হয়েছে পিকিং-এ কিন্তু এমনভাবে সেই নাম উচ্চারণ করলেন যে আমি কিছুতেই ধরতে পারলুম না তাঁরা কে। মনোজ বসু, মৈত্রেয়ী দেবী হতে পারেন।

একটা ব্যাপারে আমার খুব মজা লাগছিল, উনি ভারতের প্রসঙ্গ উঠলেই বলেন, উঃ কী প্রাচীন তোমাদের সভ্যতা। তোমাদের গান শুনলেই বোঝা যায় কয়েক হাজার বছরের সাধনা ও ঝংকার মিশে আছে তার মধ্যে।

আমরা মনে করি চিনের সভ্যতাই খুব প্রাচীন, আর চিনেরা মনে করে ভারতীয় সভ্যতা খুব প্রাচীন। মাদাম ডিংলিং কট্টর সাম্যবাদী কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা।

আমি মাদাম ডিংলিং-র অটোগ্রাফ নিলুম। তারপর বললুম, আপনার ঠিকানাটাও দিন, যদি কোনওদিন চিনে যাই আপনার সঙ্গে দেখা করব। মাদাম ডিংলিং চিনে ভাষায় নাম সই করলেন, তাঁর সঙ্গী তলায় ইংরেজিতে ঠিকানা লিখলেন শুধু বেইজিং। বললেন, বেইজিং-এ গিয়ে যেকোনও লোককে জিগ্যেস করলেই মাদাম ডিংলিং-এর সন্ধান দিয়ে দেবে।

এরপর, মাদাম ডিংলিং ঠিক আমার দিদিমার মতনই ভঙ্গিতে রসিকতা করে বললেন, আমার আয়ু বোধহয় আর বেশিদিন নেই। তবু, তুমি যদি আসো, সেই অপেক্ষায় আমি বেঁচে থাকব।

আর একজন দক্ষিণ আফ্রিকার কালো লেখকের সঙ্গে আলাপ হল, তার নাম সিপো। ঠিক আলাপ বলা যায় না, এক তরফা কথা। সিপো-র মুখে একটা তিক্ততার ছাপ। মধ্যবয়েসি এই শিক্ষিত মানুষটির সর্ব অঙ্গে অপমানের জ্বালা। সব সময় সেটা প্রকাশ না করে পারেন না। শুধু গায়ের রঙের জন্য এঁরা নিজের দেশে থেকে প্রতিনিয়ত নির্যাতিত হচ্ছেন। সিকো বললেন, সাহিত্য? সাহিত্যে আমাদের জীবন মরণের প্রশ্ন। আমরা কালো লোক, তাই আমাদের দেশে আমাদের কোনও কিছু লেখার অধিকার নেই। কোনও বই ছাপলে আমাদের শ্বেতাঙ্গ সরকার সেই বই বাজেয়াপ্ত করে, লেখককে জেলে ভরে, প্রেসের মালিককে শাস্তি দেয়। তবু আমরা লিখে যাচ্ছি।

নাইজিরিয়ার লেখক এনডুবিসির চোখ দুটো সব সময় লাল টকটকে। একদিন সকালবেলা তাকে একজন জিগ্যেস করল, এই সাত সকালেই তুমি নেশা করে বসে আছ? দৈত্যের মতন বলশালী চেহারার মানুষটি শিশুর মতন সরলভাবে হেসে বলল, না। স্বাধীনতার আগে ব্রিটিশের জেলে আমার পা দুটো বেঁধে উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল সারাদিন। সেই থেকে আমার চোখ এরকম হয়ে গেছে। এনডুবিসি এক ফোঁটা মদ্য পান করে না।

আমি হোটেল-মোটেলে খাই বলে কবিতাদি আমায় প্রায়ই নেমন্তন্ন করতে লাগলেন। একদিন তাঁর ঘরে দেখা পেলুম স্থানীয় দুটি বাঙালির। রঞ্জিত চ্যাটার্জি আর রবীন ঘোষাল। দুজনেই যাদবপুরের ছাত্র ছিল। রঞ্জিত বিয়ে করেছে ভাবনা নামে একটি অতি শান্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী গুজরাটি মেয়েকে। রঞ্জিত আর রবীন দুজনেই চাকরিও করে আবার পড়াশুনো ও গবেষণা চালাচ্ছে। কবিতাদিকে আর আমাকে পেয়ে এরা আনন্দিত হয়েছে ঠিকই, আবার মনের মধ্যে সর্বক্ষণ একটা অস্বস্তি। ভালো করে আড্ডা দিতেও পারছে না। পরদিন ভোরবেলাই কাজে দৌড়োতে হবে। দুজনেই বারবার বলতে লাগল, আপনারা তো বেশ মজায় আছেন কবিতাদি। আমাদের এরা যে কী খাটিয়ে মারে তা জানেন না। একটুও বিশ্রাম নেই, সর্বক্ষণ কাজ, কাজ আর কাজ।

এই কাজ আর ব্যস্ততার কথা আমেরিকার সর্বত্র শোনা যায়। শব্দ দুটো আমার কানে নতুন লাগে। দেশে থাকতে তো এই দুটো শব্দ প্রায় শোনাই যায় না।

॥ ৪৯ ॥

কদিন বাদে আবার ফিরে এলুম সূর্যর অ্যাপার্টমেন্টে। মুখার্জিদা ক্রিসমাসের আগের রাতে তাঁর বাড়িতে নেমন্তন্ন করে রেখেছিলেন আগে থেকেই। এবং বলে রেখেছিলেন, আয়ওয়া থেকে আমি যেদিন

ফিরব, সেদিন ওঁকে খবর দিলেই উনি আমাকে গাড়ি করে নিয়ে আসবেন।

কিন্তু মুখার্জিদাকে আর জ্বালাতন করিনি, বাসেই চলে এলাম। বাস স্টেশন থেকে সুটকেসটা হাতে ঝুলিয়ে হেঁটেই চলে এলুম বাড়িতে। এর মধ্যে শীত অনেকটা সহ্য হয়ে গেছে। মাঝে-মাঝে মাথায় টুপি পরতে ভুলে যাই। তবে গ্লাভ্‌স না পরলে চলে না, আঙুলগুলো কয়েক মিনিটে অবশ হয়ে যায়।

অ্যাপার্টমেন্টের দরজার চাবি খুলতে গিয়ে মনে হল, কী যেন নেই। কী নেই?

সঙ্গে-সঙ্গে দুম করে কেউ যেন একটা ঘুসি মারল আমার বুকে। মাথার মধ্যে বজ্রপাত হল। আমার কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা?

বাস থেকে নামার সময় সুটকেসটা ঠিকই নিয়েছি পেছন থেকে, কিন্তু ঝোলা ব্যাগটা রেখেছিলুম মাথার ওপর র‍্যাকে, সেটার কথা একদম মনে পড়েনি।

ইচ্ছে হল, তক্ষুনি দৌড়ে চলে যাই। কিন্তু দৌড়ে কোনও লাভ নেই, গ্রে হাউন্ড বাস এই দশ মিনিটে অন্তত দশ মাইল দূরে চলে গেছে।

দৌড়ে টেলিফোনের কাছে যেতে গিয়ে আমি ডাইনিং টেবিলে খুব জোর একটা ধাক্কা খেলুম। কিন্তু তখন ব্যথা বোধ করারও সময় নেই। টেলিফোনের পাশেই দেওয়ালে-সাঁটা একটা কাগজে সূর্য কতকগুলো জরুরি টেলিফোন নাম্বার লিখে রেখেছে। তার মধ্যে গ্রে হাউন্ড বাস স্টেশনের নম্বর নেই। সূর্য ভালো চাকরি করে, সে সব সময় প্লেনেই যাতায়াত করে নিশ্চয়ই। সুতরাং টেলিফোন গাইড ঘাঁটতে হল।

তারপর টেলিফোনের বোতাম টিপেই আমি ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলুম, আয়ওয়া থেকে যে-বাসটি একটু আগে এসেছিল, সেটা কি ছেড়ে গেছে?

ওপাশ থেকে একটি মেয়ের ঠান্ডা গলা ভেসে এল, আয়ওয়া থেকে কোন বাস? কত নম্বর? কুড়ি মিনিটের মধ্যে দুটি বাস এসেছে।

নম্বর? এই রে, বাসের নম্বরটা তো খেয়াল করিনি। টিকিটে নম্বর লেখা থাকে না, এক টিকিটে যেকোনও বাসে চড়া যায়। দূরপাল্লার বাসে উঠলে বাসের নম্বর মনে রাখা খুবই দরকার কারণ মাঝে-মাঝে নামতে হয়, তখন অনেক বাসের মধ্যে নিজের বাসটি খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এসেছি মাত্র এক স্টেশন, সেইজন্য মাথা ঘামাইনি।

আমি ব্যাকুলভাবে বললুম, দেখুন, আমি একটা হ্যান্ডব্যাগ ফেলে এসেছি, খুবই দরকারি সব জিনিস আছে, সেটা না পেলে আমি খুবই বিপদে পড়ে যাব—।

ওপার থেকে মহিলাটি বলল, আয়ওয়া থেকে আসা একটি বাস এখনও দাঁড়িয়ে আছে, আপনি একটু ধরুন, আমি দেখে আসছি। কী রঙের ব্যাগ ছিল?

—খয়েরি রঙের, ভেতরে একটা ক্যামেরা, আর আমার প্লেনের টিকিট, তিন প্যাকেট ক্যামেল সিগারেট আর...

মহিলাটি একটুবাদে লাইনে ফিরে এসে বললেন, না। ও-বাসে ওরকম কোনও ব্যাগ নেই। আগের বাসটি ছেড়ে গেছে।

—তা হলে কী হবে?

মহিলাটি নির্লিপ্ত গলায় বললেন, আপনার ঠিকানাটা বলুন, সন্ধান পেলে আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে দেব।

—বাসটা ছেড়ে চলে গেছে, আর কী করে সন্ধান পাবেন?

—বাসটা কোথাকার ছিল?

—নিউ ইয়র্কের।

—তা হলে এরপর শিকাগোয় থামবে। সেখানে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—দয়া করে যদি একটু বিশেষ চেষ্টা করেন। ওই ব্যাগটির মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট

আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইটের—

—নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।

টেলিফোন রেখে আমি নিঝুম হয়ে বসে রইলুম। যেন আমি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছি। ব্যাগটা যদি না পাওয়া যায়, তা হলে আমি ফিরব কী করে? আমার টিকিট...।

তাড়াতাড়ি সুটকেসটা খুললুম। উলটে ফেলে দিলুম সব জিনিসপত্র। যাক, পাসপোর্টটা আছে। অনেকদিন পাসপোর্ট দরকার হয়নি। তাই বার করিনি। প্লেনের টিকিটটা কেন সুটকেসে রাখিনি? হ্যান্ডব্যাগটা যে হারাবে তা কি জানতুম? আমার শেষ সম্বল আর ছাপ্পান্নটি ডলার, তাও ওই ঝোলার মধ্যে, আমার মানিব্যাগ বা পার্স ব্যবহার করার অভ্যেস নেই, টাকা রাখি বইয়ের মধ্যে। আজ যদি ওভারকোটের পকেটেও রাখতুম।

ক্যামেরা ট্যামেরা গেছে তার দুঃখ নেই, কিন্তু প্লেনের টিকিটটা গেছে বলেই খুব অসহায়বোধ করতে লাগলুম। ওটার জন্য সবসময় মনে একটা জোর ছিল, যখন খুশি ফিরে যাওয়ার স্বাধীনতা ছিল।

বাসটা শিকাগো পৌঁছতে চার-পাঁচ ঘন্টা লাগবে, তার আগে কিছুই জানা যাবে না। এই সময়টা কীভাবে কাটাব? অনর্থক বসে-বসে চিন্তা করে তো লাভ নেই, তাই আমি শুয়ে পড়লুম। ওভারকোট কিংবা জুতো মোজাও খুলতে ইচ্ছে করল না। মনের যদি একটা সুইচ থাকত, তা হলে এখন সেটা অফ করে দিতুম। কিংবা সেরকম কোনও ঘুমের ওষুধ, যা খেলে এক নিমেষে ঘুমিয়ে পড়া যায়। ভীষণ রাগ হচ্ছে নিজের ওপর। এরকম ভুল যে করে তার বেঁচে থাকার অধিকার নেই। ব্যাগটা যদি ফেরত না পাই, তা হলে কত রকম যে ঝামেলায় পড়ব, তা ভাবতেই পারছি না।

ফেরত পাব কী? আগে জানতুম, এদেশে কোনও কিছুই হারায় না। এটা ডাকাতদের দেশ, এখানে কেউ ছিঁচকে চুরি করে না। কিন্তু সেই সুদিন আর নেই। নিউ ইয়র্কে একটি মেয়ের হাত থেকে ব্যাগ ছিনতাই-এর ঘটনা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

মুখার্জিদাকে ফোন করা উচিত। উনি এদেশে এতদিন আছেন, উনি নিশ্চয়ই জানবেন কীভাবে খোঁজখবর করতে হয়। কিন্তু নিজের দীনতার কথা বা নির্বুদ্ধিতার কথা কি সাধ করে অন্য কারুকে জানাতে ইচ্ছে করে?

খবরের কাগজ খুললুম। কিছুতেই মন বসে না। টিভি খুললুম, সব কিছুই উৎকট বাঁদরামো মনে হচ্ছে। মনের মধ্যে ঢংঢং করে অবিরাম বাজছে একটিই প্রশ্ন, যদি ফেরত না পাই? যদি ফেরত না পাই?

ওভারকোটের সব ক'টা পকেট উলটে দিলুম। অনেক খুচরো পয়সা জমে আছে। ডাইম আর কোয়ার্টারগুলো আলাদা করে সাজিয়ে নিলুম। সব মিলিয়ে আট ডলার পঁচাত্তর সেন্ট, আরও খুচরো এক সেন্ট আছে কুড়ি-পঁচিশটা। এই এখন আমার যথা সর্বস্ব! কথাটা উপলব্ধি করামাত্র খিদে পেয়ে গেল।

ঠিক পাঁচ ঘণ্টা পরে ফোন করলুম স্থানীয় বাস স্টেশনে। এবারে ফোন ধরেছে একজন পুরুষ।

—আমার হ্যান্ডব্যাগটার কোনও খবর পেয়েছেন?

—কীসের হ্যান্ডব্যাগ?

—দেখুন, আমি আয়ওয়া থেকে...

—আয়ওয়ার বাস এখনও আসেনি, আধঘন্টা পরে আসবে।

—না, শুনুন, অনুগ্রহ করে আমার ব্যাপারটা শুনুন—।

ডিউটি বদলে গেছে, আগের মহিলাটি নেই, এই পুরুষটি আমার ঘটনা কিছুই জানেন না। সব কিছু শোনার পর বললেন, না, শিকাগো থেকে কোনও খবর তো আসেনি, একটু আগেই একটা ফোন এসেছিল, কোনও হ্যান্ডব্যাগের কথা বলেনি—।

—দয়া করে ওদের যদি আর একবার জানান। হ্যান্ডব্যাগটাতে আমার খুবই দরকারি জিনিসপত্র আছে।

—আপনি নিজেই শিকাগো বাস স্টেশনে ফোন করতে পারেন।

—দেখুন, আমি বিদেশি, ভারতবর্ষীয়, যদি একটু সাহায্য করেন, আমি বাসের নম্বরও জানি না, আমি অতি নির্বোধের মতন কাজটি করেছি বটে, কিন্তু ব্যাগটা খুঁজে পাওয়া আমার খুবই দরকার।

আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, লোকটি অন্য একটা টেলিফোন তুলে আর কারুর সঙ্গে কথা বলছে, আমার কথা শুনছেই না।

আমি তবু নাছোড়বান্দার মতন বকবক করে যেতে লাগলুম। লোকটি এক সময় বলল, আপনার নাম ঠিকানা বলুন, খোঁজ পেলে জানাব।

—আপনার আগে যিনি ডিউটিতে ছিলেন, তিনি সব জানেন। আমার নাম এই...

—ও, হ্যাঁ, একটা শ্লিপ লেখা আছে দেখছি। আপনার ব্যাগটার বর্ণনা দিন, আপনার ফোন নম্বর দিন, কোনও খবর পেলে নিজেরাই জানাব। হ্যাঁ, শিকাগো আর নিউ ইয়র্কে খবর দিচ্ছি।

একটি বিনিদ্র রাত্রি কাটাবার পর পরদিন সকালে মুখার্জিদাকে সব ব্যাপারটা খুলে বলতেই হল।

মুখার্জিদা তাঁর বাড়ি থেকে সব মিলিয়ে প্রায় গোটা পনেরো ফোন করলেন। তাতেও বিশেষ কিছু সুরাহা হল না। আমার বিমান কোম্পানির কাছ থেকে জানা গেল যে আমার জন্য একটা ডুপ্লিকেট টিকিট ইস্যু করানো যেতে পারে কিন্তু তার আগে, যেখান থেকে আমার টিকিট ইস্যু করা হয়েছে, অর্থাৎ কলকাতা অফিস থেকে আগে খবরাখবর আনতে হবে। তার জন্য সময় লাগবে।

মুখার্জিদা আমায় উপদেশ দিলেন যে, হয় আমার কোনও ট্রাভেল এজেন্টের শরনাপন্ন হওয়া উচিত কিংবা নিজেই শিকাগো গিয়ে যেন তদবির শুরু করি। আজকাল কোনও কাজই তাড়াতাড়ি হয় না।

ট্রাভেল এজেন্টের কাছে গেলে তাকে পয়সা দিতে হবে, আর শিকাগো যাওয়ার ভাড়াও আমার কাছে নেই। মুখার্জিদা এতটা জানেন না। সে কথা আমি মুখ ফুটে বলতেও পারলুম না।

বাস স্টেশন থেকে আমার হ্যান্ডব্যাগ সম্পর্কে কোনও নতুন খবর পাওয়া গেল না। নিউ ইয়র্ক বা শিকাগোতেও সেরকম কোনও ব্যাগ জমা পড়েনি।

দ্বিতীয় দিন কেটে যাওয়ার পর আমি নিশ্চিন্ত হলুম যে আমার ঝোলা ব্যাগ অন্য কারুর ঘাড়কে পছন্দ করে ফেলেছে। এদেশের ছেলেমেয়েরা ঘনঘন বিয়ে বদলায়, আমার ব্যাগেরও সেরকম শখ জেগেছে নিশ্চয়ই। নইলে, ওর গায়ে আমার ঠিকানা লেখা ছিল, অনায়াসেই ফিরে আসতে পারত।

মুখার্জিদা অতিশয় সহৃদয় মানুষ, কিন্তু মরে গেলেও আমি তাঁর কাছ থেকে টাকা ধার চাইতে পারব না। এর আগেই কয়েক জায়গায় গল্প শুনেছি, আমাদের দেশ থেকে কেউ-কেউ এদেশে বেড়াতে এসে জিনিসপত্র কেনাকাটির লোভে এখানকার কারুর কাছ থেকে টাকা নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায়, দেশে ফিরে তার মা-বাবা বা বাড়ির লোককে ভারতীয় মুদ্রায় ধার শোধ করে দেবে। তারপর দেশে ফিরে অনেকেই সে কথা বেমালুম ভুলে যায়। আমাকেও যদি এরা সেরকম ভাবেন?

তা ছাড়া দেশে ফিরে সঙ্গে-সঙ্গে শোধ দেওয়ার সামর্থ্যও আমার নেই। এদিকে ডুপ্লিকেট টিকিটের ব্যাপারেও কোনও ভরসা পাচ্ছি না।

কিন্তু খুচরো ন'ডলারে আমার আর কতদিন চলবে? সূর্যর ভাঁড়ারের চাল-ডাল ধ্বংস করতে-করতে প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। চিনি ছিল না। চা খাওয়ার জন্য একদিন চিনি কিনতেই হল। এদেশের দোকানে কম-ওজনের কিছু পাওয়া যায় না। চিনির প্যাকেট দু-পাউন্ডের। অগত্যা কিনতেই হল। তারপরেই অবশ্য মনে হল, ম্যাকডোনাল্ডের দোকানে কফি খেতে গেলে টেবিলের ওপর অজস্র ছোট-ছোট চিনির প্যাকেট পড়ে থাকে। তার যত খুশি নেওয়া যায়। ষাট সেন্ট দিয়ে এক কাপ

কফি খেতে গিয়ে ওভারকোটের পকেট ভরতি বিনে পয়সার চিনি নিয়ে আসলেই হত। এই সব ভালো-ভালো বুদ্ধি পরে মাথায় আসে।

রাত্তিরবেলা খুব মন খারাপ লাগছিল। অনেকক্ষণ দোনামনা করার পর কানাডার দীপকদাকে একটা ফোন করলুম।

ফোন ধরলেন জয়তীদি। খানিকটা অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার, এত রাত্তিরে টেলিফোন? অনেকদিন তোমার পাত্তাই নেই। আমরা ভাবছিলুম, তুমি হারিয়ে গেলে কি না। সেই যে তোমার বাস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, তারপর থেকে তো তোমার আর কোনও খবরই পাইনি!

আমি কাঁচুমাচুভাবে বললুম, জয়তীদি, দীপকদা আছেন? ওঁর সঙ্গে আমার একটা দরকার আছে।

— তোমার দীপকদা তো নেই। একটা কনফারেন্সে গেছেন, ভ্যাঙ্কুবারে। তিন দিন পরে ফিরবেন!

আমি নিরাশভাবে বললুম, নেই?

— কেন, কী দরকার? আমাকে বলা যায় না?

— না, মানে, আমার প্লেনের টিকিটটা হারিয়ে ফেলেছি। দীপকদার তো এক বন্ধুর ট্র্যাভেল এজেন্সি আছে শুনেছিলুম। উনি যদি সেই বন্ধুকে বলে আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারতেন।

জয়তীদি উদ্দাম ঝর্নার মতন হাসতে-হাসতে বললেন, টিকিট হারিয়ে ফেলেছ? অ্যাঁ? বেশ হয়েছে! টিকিট হারালে কি আবার বিনা পয়সায় টিকিট পাওয়া যায় নাকি? তুমি পাগল! সে কেউ দেবে না! এখন কী হবে? থাকো, ওই মিড ওয়েস্টে বন্দি হয়ে? ওখানে চাষ বাস শুরু করো। তোমার আর দেশে ফেরা হবে না।

এদিকে আমার এই করুণ অবস্থা আর জয়তীদি মোটেই সেটাকে কোনও গুরুত্বই দিচ্ছেন না। খালি ঠাট্টাইয়ার্কি করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললুম, ঠিক আছে, জয়তীদি তিনদিন পর দীপকদা ফিরলে আমি আবার ফোন করব।

রিসিভার রেখে দিয়ে আরও দমে গেলুম। এই হৃদয়হীনা রমণীর সঙ্গে আর কোনওদিন কথা বলব না! এই বিশাল দেশে যে আমি কপর্দক শূন্য, তা উনি বুঝলেন না। পুরুষ মানুষরা হঠাৎ অসহায় অবস্থায় পড়লে মেয়েরা সেই ব্যাপারটা বেশ উপভোগ করে। দীপকদা আবার এখন বাড়ি নেই। উনি থাকলে একটা কিছু ব্যবস্থা করতেনই। এই তিনদিন আমি কী করে কাটাব?

রাত মাত্র ন'টা। কিছুই করতে ইচ্ছে করছে না। খিদে পেয়েছে, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠে দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে নেওয়ারও উৎসাহ নেই। খালি মনে হচ্ছে, আমার মুক্তি নেই, আমার মুক্তি নেই!

এই কটা মাসে কত রকম মানুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেকের কাছ থেকেই আশাতীত সহৃদয়তা পেয়েছি। এদেশের বাঙালিরা অনেকেই বেশ সচ্ছল। হাজার খানেক ডলার দিয়ে কয়েকজন অবশ্যই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সূর্যর টেলিফোন যত খুশি ব্যবহার করতে পারি, যদি টেলিফোন তুলে কারুর কাছে চাই....। কিন্তু টেলিফোন করতে হাত ওঠে না। কারুর কাছে টাকা চাওয়া, ওঃ, সে যে এক অসম্ভব শক্ত কাজ। বারবার মনে পড়ছে মাইকেলের একটা লাইন, "প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা যদি খসে..."

পরদিন বেলা এগারোটায় একটা ফোন এল। সাহেবের গলা শুনে ধক করে উঠল আমার বুক। তবে কি ফিরে এল আমার ব্যাগ?

সাহেবটি জিগ্যেস করল, তোমার নাম নীললোহিত?

আমি সোৎসাহে বললুম, হ্যাঁ। আপনি বাস স্টেশন থেকে বলছেন?

লোকটি বলল, না, আমি বলছি এয়ারপোর্ট থেকে। তোমার নামে একজন...লেট্‌স সী, খুব শক্ত নাম, মিসেস জ-য়া-টি স-রো-সো-য়া-টি একটি প্লেনের টিকিট পাঠিয়েছেন। কানাডার

এড্‌মান্টনের। তোমার ফ্লাইট বিকেল সাড়ে পাঁচটায়। তুমি এখানকার কাউন্টারে এলেই টিকিট পেয়ে যাবে।

আমি তখনও বুঝতে পারছি না ব্যাপারটা। টিকিট পাঠিয়েছে? আমার জন্য? কানাডা থেকে? জয়াটি কে? ওঃ হো, জয়তী সরস্বতী! জয়তীদি, জয়তীদি!

॥ ৫০ ॥

ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকে প্লেন বদল করে যেতে হবে এডমান্টনে। মাঝখানে হাতে রয়েছে সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময়।

এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে যে শহরটা ঘুরে দেখে আসব তার উপায় নেই। পকেট ঢনঢন। কলোরাডো রাজ্যটিই অতি মনোরম। ছোট-ছোট পাহাড়, নিবিড় জঙ্গল আর নদীমাতৃক এই রাজ্যটির সৌন্দর্যের খ্যাতি আছে সারা পৃথিবীতে। আমার কলোরাডো ঘুরে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, হল না।

আর কয়েক ঘণ্টা বাদে আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে চলে যাব, আর কোনওদিন এখানে আবার আসব কি না কে জানে। হাতে সময় আছে, তাই হিসেব করতে বসলুম, কী-কী দেখা বাকি থেকে গেল এ যাত্রায়।

কাছেই গ্র্যান্ড কেনিয়ান। এই বিশ্ববিখ্যাত উপত্যকাটি সত্যিই প্রকৃতির এক মহান বিস্ময়। যারা এ দেশ ভ্রমণ করতে আসে, তাদের দ্রষ্টব্য তালিকায় প্রথমেই গ্র্যান্ড কেনিয়ানের নাম থাকে। আমি ছবিতে, চলচ্চিত্রে অনেকবার গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখেছি, কিন্তু দু-দুবার এসেও চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য হল না। প্রথমবার ভেবেছিলুম, অনেকদিন তো থাকব, কোন এক সময় দেখে নিলেই হবে। তারপর হঠাৎ ফিরে গেছি। এবারে পাঁচটা মাস কেটে গেল ঝড়ের বেগে, এখন আমি সর্বস্বান্ত। অবশ্য পয়সা থাকলেও এই শীতের মধ্যে গ্র্যান্ড কেনিয়ান দেখা সম্ভব হত না।

অ্যারিজোনার মরুভূমি দেখে গতবার খুব ভালো লেগেছিল। এ এক অন্যরকম মরুভূমি। আগাগোড়া রুক্ষ নয়, মধ্যে মধ্যে রয়েছে অসংখ্য বিরাট ক্যাকটাস। এই সাউয়ারো ক্যাকটাসগুলো এক-একটা দোতলা-তিনতলা বাড়ির সমান উঁচু। অপূর্ব সেই দৃশ্য। ইচ্ছে ছিল সেখানে একবার যাব।

টেক্সাসের দিকে তো যাওয়াই হল না। ওয়েস্টার্ন ছবিতে কতবার যে টেক্সাস দেখেছি, সেখানে আমার পায়ের চিহ্ন পড়ল না। যদিও জিন্‌স আর গেঞ্জি কিনে রেখেছিলুম। রেড ইন্ডিয়ানদের একটা এনক্লেভ-ও আমার দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

আমেরিকার যে চারটি রাজ্যকে সাদার্ন স্টেট্‌স বলে, সেখানে কখনও যাইনি। এরা এখনও নাকি কালো লোকদের ওপর খড়্গহস্ত, কত নৃশংসভাবে যে এখানে নিগ্রোদের খুন করা হয়েছে তার ঠিক নেই। অথচ, এই দক্ষিণ রাজ্যের নাগরিকরাই তাদের ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত!

যাওয়া হল না পাশের রাজ্য মেক্সিকো-তে। যদিও সেখানকার দু-একজন বন্ধু নেমন্তন্ন করে রেখেছিল। কিউবা দেখারও একটা অদম্য শখ রয়ে গেছে আমার মনে। এক সময় ফিদেল কাস্ত্রো ছিল আমার হিরো! হেমিংওয়ের লেখা কিউবার অনেক বর্ণনা পড়েও মন টেনেছে। এই ডেনভার এয়ারপোর্ট থেকেই কিউবাগামী বিমানের জন্য ঘোষণা শুনতে পেলুম কয়েকবার। কিন্তু আমার যাওয়ার উপায় নেই।

দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে যাওয়া খুবই শক্ত আমি জানি। আমাদের দেশ থেকে কেউ, বিনা কাজে, শুধু ভ্রমণের জন্য ওখানে গেছে, এমন শুনিনি। তবু ব্রাজিল, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা, পেরু এইসব রোমাঞ্চকর নামগুলি আমায় হাতছানি দেয়।

বসে-বসে এইসব ভাবতে-ভাবতে আমি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি পদ্যে নিজস্ব সুর দিয়ে গুন-গুন করে গাইতে লাগলুম ঃ

ইচ্ছা সম্যক্ জগদর্শনে
কিন্তু পাথেয় নাস্তি
দু-পায়ে শিক্লি, মন উড়ু উড়ু
এ কী দৈবের শাস্তি!

বেশিক্ষণ এ গানটা গাওয়া গেল না, কারণ সুরটা তেমন জুতসই রকমের করুণ হয়নি। তাই এরপর আমি গাইতে শুরু করলুম দ্বিজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভাইয়ের লেখা ঃ

কী পাইনি
তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি...

কিন্তু একলা বসে-বসে গান গেয়ে তো বেশি সময় কাটানো যায় না। তাই উঠে পায়চারি করতে লাগলুম খানিকটা। ডেনভার এয়ারপোর্টটি বিরাট, এখানে রয়েছে অজস্র দোকানপাট, ওপর তলায় একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম পর্যন্ত রয়েছে। অনেক খাবার দোকান, কিন্তু আমি বাইরে থেকে দেখেই চক্ষু সার্থক করছি।

সিডার র‍্যাপিডস্ ছেড়ে আসতে হয়েছে খুবই তাড়াহুড়োর মধ্যে। মুখার্জিদা এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়েছে এবং বারবার জিগ্যেস করেছেন, তোর ব্যাগ হারাইছে, পয়সাকড়ি ঠিক আছে তো? অসুবিধা থাকলে লুকাইস না, খুইল্যা ক! লজ্জার কিছু নাই, আমি তোরে বেনিফিট অব ডাউটে দুই-তিনশো ডলার ধার দিতে পারি।

আমি জোর দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছিলুম, না, না, আমার কোনও অসুবিধে নেই।

মুখার্জিদার পরামর্শে স্থানীয় পুলিশস্টেশনে একটা ডায়েরি করিয়ে এসেছি আমার ব্যাগ হারাবার বিষয়ে। প্লেনের টিকিট পুনরুদ্ধার করতে হলে এটা নাকি দরকার। সূর্যকে সব খবর জানিয়ে একটা চিঠি লিখে রেখে এসেছি। জয়তীদি হঠাৎ কেন টিকিট পাঠিয়ে দিলেন তা জানবার জন্য দু-বার ওঁকে টেলিফোন করেছিলুম। বাড়িতে পাইনি। ওঁর ছোট মেয়ে ছুটকি কিছুই বলতে পারেনি। যাই হোক, টিকিট নষ্ট করার কোনও মানে হয় না বলে আবার যাত্রা শুরু করে দিয়েছি।

অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ করছিলুম, দুটি শাড়ি পরা মেয়ে ও একটি ধুতি পরা ছেলে হাতে কয়েকটি বই নিয়ে ব্যস্ত যাত্রীদের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে কী সব বোঝাচ্ছে। ছেলেমেয়ে তিনজনেরই পায়ে চটি। এটা অবিশ্বাস্য লাগে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা হলেও বিমানবন্দরের মধ্যে স্বাভাবিক উত্তাপ। কিন্তু ওরা তো কখনও বিমানবন্দরের বাইরেও যাবে, তখন কি চটি পড়ে বরফের ওপর দিয়ে হাঁটবে?

মেয়ে দুটি পরে আছে সাধারণ ছাপা শাড়ি, ছেলেটির গায়ে গেরুয়া রঙের চাদর। তার মস্তক মুণ্ডিত, মাঝখানে একটি টিকি। ওদের চিনতে ভুল হয় না। ওরা কৃষ্ণ কনসাসনেস-এর স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা। ওরা চাঁদা তোলে না, যতদূর জানি, এ দেশে রাস্তায় ঘাটে চাঁদা তোলা নিষিদ্ধ, ওরা নিজস্ব প্রকাশনীর বই বিক্রি করতে চাইছে। উদ্দেশ্য শুধু বই বিক্রি নয়, বৈষ্ণব দর্শনের সম্প্রচার।

ভগবৎ দর্শন বা ধর্মের ব্যাপারটা আমি কিছু বুঝি না, কোনও আগ্রহ নেই। বিরাগও নেই, ও ব্যাপারে আমি উদাসীন। কিন্তু দূর থেকে ওদের দেখতে-দেখতে আমি ভাবছিলুম, কোন টানে ওরা ধর্মের কাছে এতখানি নিবেদন করতে পেরেছে নিজেদের। তিনটি আমেরিকান ছেলেমেয়ে। বয়েস তিরিশের বেশি নয়, এই ডিসেম্বরের সন্ধেবেলা কতরকম আমোদ প্রমোদেই তো সময় কাটাতে পারত। তার বদলে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে নিরলসভাবে এয়ারপোর্টের এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে চলেছে, জাঁদরেল চেহারার অতিশয় ব্যস্ত মানুষদের বোঝাতে চাইছে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা। এ পর্যন্ত একটা বইও বিক্রি হতে দেখিনি। কেউ ওদের কথা মন দিয়ে শুনছেও না। তবু ওদের ধৈর্য নষ্ট হচ্ছে না। যে-কোনও কাজেই এমন নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা দেখলে শ্রদ্ধা জাগেই।

আমি যদিও ধুতি পরে নেই, তবু আমার মুখে একটা দুর্মর বাঙালি ছাপ আছে নিশ্চয়ই। ওদের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ে ঘুরতে-ঘুরতে এক সময় আমাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়াল। মুখে ফুটে উঠল আগ্রহের হাসি। কাছে এগিয়ে এসে ছেলেটি পরিষ্কার বাংলায় আমায় জিগ্যেস করল,

আপনি কি কলকাতা থেকে আসছেন?

আমি মাথা নেড়ে হাঁ বলতেই ছেলেটি আমার হাতে দুখানি বই দিয়ে বলল, আপনি এই বই দুটি দেখেছেন? অবশ্য এসব আপনার পড়া আছে নিশ্চয়ই!

একটি বেদের সংকলন আর একটি গীতার অনুবাদ। ছাপা ও কাগজ অতি চমৎকার, মলাট বেশি রংচঙে, অনেকটা আমাদের ক্যালেন্ডারের ছবির মতন।

বই দুটি নাড়তে-চাড়তে আমার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। এরা কি ভাবে বাঙালি মাত্রেই বেদ-উপনিষদ-গীতা পড়েছে? আমি রাজশেখর বসুর অনুবাদে গীতা পড়েও কিছুই বুঝতে পারিনি, বড্ড খটখটে লেগেছে। আর বেদ? আমার মতন ম্লেচ্ছের কি বেদ পড়ার অধিকার আছে?

আমি বললুম, বাঙালি হলেও আমি এসব পড়িনি, অনেক বাঙালিই পড়েনি।

ছেলেটি বলল, তা আমরা জানি। সকলে পড়ে না। কিন্তু বিশ্বে শান্তি আনতে হলে এইসব পবিত্র পুস্তক কি আবার নতুন করে পড়া উচিত নয়?

আমি বললুম, বাঃ, আপনার বাংলা অ্যাকসেন্ট তো চমৎকার।

কথাটা বলে আমি বেশ শ্লাঘা বোধ করলুম। সাহেবদের কাছ থেকে আমাদের ইংরিজি উচ্চারণ সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য শুনতে হয়, কোনও সাহেবের বাংলা উচ্চারণ সম্পর্কে মতামত দেওয়ার সুযোগ তো সহজে পাওয়া যায় না।

ছেলেটি লজ্জা পেয়ে বলল, না, না, আমি বাংলা তত ভালো জানি না। বাংলা খুব সুন্দর ভাষা।

আমি কলকাতায় ইস্‌কনের সাহেব বোষ্টম-বোষ্টমি অনেক দেখেছি, ওঁদের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরেও গেছি বেড়াতে, কিন্তু কখনও ওঁদের কারুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি। এই প্রথম সেই সম্প্রদায়ের দুজনের সঙ্গে আলাপ হল ডেনভার বিমানবন্দরে।

ছেলেটি বলল তার নাম মাধব দাস। আর মেয়েটির নাম বিনোদিনী। পূর্বাশ্রমে নিশ্চয়ই ওদের অন্য নাম ছিল। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ওরা ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল, তাই গল্প করতে লাগল আমার পাশে বসে। মেয়েটির মতন এমন লাজুক আমেরিকান মেয়ে আমি আগে আর কখনও একজনও দেখিনি। সে কোনও কথা বলে না, শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাকিয়ে থাকে।

ছেলেটি অনেক কিছু জানে। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ, কেশব সেন এই সব নাম বলে যেতে লাগল টপাটপ। এক সময় সে আমাকে জিগ্যেস করল, তুমি বলতে পারো, ব্রহ্মধর্মে এক সময় বৈষ্ণবদের প্রভাব বাড়ল কী করে?

আমি আবার ইতিহাসে খুব কাঁচা। আমাদের দেশের নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির ইতিহাস প্রায় কিছুই জানি না। দেবেন ঠাকুর আর বিদ্যাসাগরের মধ্যে কে বয়েসে বড়, তা আমার গুলিয়ে যায়। কেশব সেন খ্রিস্টান ছিলেন না ব্রাহ্ম ছিলেন, সে সম্পর্কে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। সুনীলদা এই সব বিষয় নিয়ে একটা ঢাউস বই লিখেছেন, তিনি থাকলে এই সাবজেক্টে একটা লম্বা লেকচার দিতেন নিশ্চয়ই।

আমি আমতা-আমতা করে বললুম, ভাই, আমি ঠিক বলতে পারছি না। আপনি কলকাতায় গিয়ে যেকোনও বাংলার এম-একে জিগ্যেস করলেই উত্তর পেয়ে যাবেন।

ছেলেটি নিজেই আমাকে অনেক কিছু বোঝাল। তার মতে ভক্তিই হচ্ছে মুক্তির উপায়। শুদ্ধ ভক্তি মানুষের মনকে একেবারে পরিচ্ছন্ন করে দেয়, ইত্যাদি, ইত্যাদি...। আমি খুব মন দিয়ে শুনছি না বুঝতে পেরেই এক সময় উঠে পড়ল সে। যাওয়ার সময় আমি তাকে বই দুটো ফেরত দিতে যেতেই সে বলল, না, না, ও বই আপনার জন্য। আপনি রাখুন।

আমি যতই বলি যে এই বই দিয়ে আমি কী করব, সে কিছুতেই শুনতে চায় না।

আমি তখন বললুম, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আপনারা তো এই বই বিক্রি করছেন—

আমাকে থামিয়ে দিয়ে সে বলল, না, আমরা বিক্রি করছি না। তবে কেউ যদি আমাদের

সাহায্যের জন্য কিছু দেয়, তবে আমরা খুশি হয়েই নেব।

আমি বললুম, আমাদের তো গোনা গাঁথা ফরেন এক্সচেঞ্জ নিয়ে এদেশে আসতে হয়, সুতরাং আমার পক্ষে এখন কিছুই দেওয়া সম্ভব নয়। কলকাতায় দেখা হলে কিছু দিতে পারি নিশ্চয়ই—

ছেলেটি বলল, আপনাকে কিছুই দিতে হবে না। আপনি রাখুন বই দুটি, অবসর সময়ে পড়বেন। কিংবা অন্য কোনও উৎসাহী ব্যক্তিকে দিয়ে দেবেন।

ওরা চলে যাওয়ার পর আমি একখানা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছি, একটু পরে ফিরে এল সেই মেয়েটি। হাতে একটি ছোট কাগজের বাক্স।

নম্র হেসে মেয়েটি বলল, প্রসাদ। আপনার জন্য।

আমি হাত পেতে নিলুম। সেই বাক্সের মধ্যে কয়েকখানা পুরি আর আলু ভাজা আর খানিকটা মিষ্টি। আমি বহুদিন কোনও পূজা-আচ্চার জায়গায় যাইনি, তাই প্রসাদও খাইনি। কিন্তু পয়সার অভাবে আমি অনেকক্ষণ খিদে চেপে বসেছিলুম। সেই ঠান্ডা পুরি আর আলু ভাজাই অমৃত মনে হল আমার কাছে। চোখের নিমেষে শেষ করে ফেললুম। ওরা কী করে বুঝল যে আমার এমন খিদে পেয়েছে?

খানিক বাদে ফিরে এল আবার মাধব দাস। আমাকে একটা কাগজ দিয়ে বলল, এতে আমাদের মন্দিরগুলির একটা তালিকা আছে। এইসব জায়গায় গেলে আপনি আমাদের মন্দিরে থাকতে পারবেন আর প্রসাদ পাবেন।

ডেনভারে ইস্‌কনের মস্ত বড় মন্দির আছে। তা ছাড়া সারা আমেরিকা-কানাডা জুড়ে যে এদের এতগুলো আশ্রম, এ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই ছিল না। অন্তত আশি-পঁচাশিটা! গোটা আমেরিকাটাকেই ওরা হিন্দু করে ফেলবে নাকি?

কিন্তু সেই মুহূর্তে ওদের সম্পর্কে আমার কোনও ঠাট্টাইয়ার্কি করতে ইচ্ছে হল না। ওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বারবার আমায় সাহায্য করতে আসছে। ওদের তো বিন্দুমাত্র স্বার্থ নেই! আমি বরং কৃতজ্ঞতাই অনুভব করলুম।

আমার চোখ অনেকক্ষণ ওদেরই অনুসরণ করতে লাগল। গ্রে ফ্লানেল সুট পরা অতিশয় কেজো, গম্ভীর চেহারার, বিশালকায় আমেরিকান পুরুষদের কাছে ওরা হিন্দু ধর্মের বই বিক্রি করার অনলস চেষ্টা করে যাচ্ছে। শাড়ি পরা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতি ও গেরুয়া চাদর পরা মার্কিন যুবককে দেখে অন্যরা যেন শিউরে উঠছে, কারুর কারুর মুখে ফুটে উঠছে গভীর অবজ্ঞার ভাব। ওই ছেলে-মেয়েরা কিন্তু বিরক্ত হচ্ছে না, রেগেও যাচ্ছে না। এত কম বয়েসে এতখানি ধৈর্য ওরা আয়ত্ত করল কী করে?

তারপর এক সময় আমার প্লেনের ডাক পড়ল। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি এগিয়ে গেলুম সিকিউরিটি কাউন্টারের দিকে। ডেনভারের মতন সিকিউরিটির কড়াকড়ি আমি পৃথিবীর আর কোনও বিমানবন্দরে দেখিনি। পকেটের সব খুচরো পয়সা, হাতের ঘড়ি, চাবি, কোমরের বেল্ট পর্যন্ত জমা দিতে হয়। এক আধ টুকরো ধাতু সঙ্গে নিয়ে সিকিউরিটি বেরিয়ার পার পাওয়া যায় না কিছুতে। কিউবার পলাতকদের জন্যই নাকি এত সতর্কতা।

বিমানটা রানওয়ে দিয়ে ছুটতে শুরু করতেই মনে পড়ল, এবারের মতন আমায় এদেশ থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে এখানেই। আর হাজার চেষ্টা করলেও ফিরে আসা যাবে না। ভিসায় ছাপ পড়ে গেছে। সেজন্য কোনও দুঃখ হচ্ছে না, চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি ভবিতব্যের উন্মুক্ত দ্বার।

॥ ৫১ ॥

এডমান্টন বিমানবন্দরে চেনা কারুকে পাব এমন আশা করিনি। দীপকদা নেই, জয়তীদি তো মেয়েদের বাড়িতে ফেলে রেখে এতদূরে আসতে পারেন না। যাওয়ার ব্যবস্থা আমাকেই করতে হবে। ট্যাক্সি

নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এখান থেকে দীপকদার বাড়ি অনেক দূর, প্রকৃতপক্ষে ওঁরা থাকেন অন্য একটি শহরে। এখান থেকে দীপকদাদের বাড়ির যা ট্যাক্সি ভাড়া হবে, সে টাকায় কলকাতা থেকে দার্জিলিং-এর প্রথম শ্রেণির ট্রেন ভাড়া হয়ে যায়। সে টাকা আমার নেই-ও, প্রথমেই বেয়ারিং হয়ে জয়তীদির কাছে উপস্থিত হওয়ার কোনও মানে হয় না। আমার কাছে যা খুচরো পয়সা আছে, তাতে কোনওক্রমে বাসভাড়া কুলিয়ে যাবে। একটা সুবিধে এই, এই বিদেশ বিভুঁই-এ দু-একবার বোকা বনে গেলেও কেউ তো তার সাক্ষী থাকছে না।

ইমিগ্রেশান কাউন্টারে প্রথমেই খানিকটা নাকানিচোবানি খাওয়াল আমাকে। মধ্যবয়স্ক সাহেবটি যেন আমাকে নিয়ে ইঁদুর-বেড়াল খেলতে চায়। মুখে মিটিমিটি হাসি আর নানান প্রশ্ন ঃ তুমি তো কয়েক মাস আগেই একবার এডমান্টনে এসেছিলে দেখছি! আবার কেন এলে? এখানে এমনকী দ্রষ্টব্য বস্তু আছে? কার বাড়িতে উঠবে? সে তোমার কে হয়? সে কি তোমায় রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে এসেছে? তুমি দেশে কী চাকরি করো? ইত্যাদি-ইত্যাদি!

টোরোন্টোয় পাঞ্জাবি শরণার্থীদের নিয়ে নানান গোলমালের কথা কাগজে পড়েছি। ভারতীয় আগন্তুকদের কানাডার সরকার এখন বেশ সন্দেহের চোখে দেখছে। এর মধ্যে ভারতীয়দের জন্য ভিসা ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আমার কাছে যদিও মাল্টিপল এনট্রি ভিসা আছে তবু আমার বুক টিপটিপ করছে। যদি রিটার্ন টিকিট দেখতে চায়? সাময়িক ভ্রমণকারীদের কাছে রিটার্ন টিকিট না থাকলে যে এরা ঢুকতেই দেয় না, সেটা তো আমার আগে মনে পড়েনি।

সাহেবটি যে আমায় আটকাতে চায়, তার ভাবভঙ্গি দেখে তা ঠিক মনে হয় না। যেন আমায় নিয়ে খানিকটা মশকরা করাই তার উদ্দেশ্য। সে আমায় জিগ্যেস করল, আমি আগে কখনও তুষারপাত দেখেছি কি না! আরও সব অবান্তর প্রশ্ন। শেষ পর্যন্ত আমি দেওয়ালে-পিঠ-দেওয়া বেড়ালের মতন ফ্যাঁস করে বললুম, যেতে দেবেন কি না বলুন, না হলে আমি এক্ষুনি ফিরে যাচ্ছি। নেহাৎ আমার এক আত্মীয় এখানে ক্রিসমাসের নেমন্তন্ন করেছেন তাই এসেছি।

সাহেবটি এবারে ভুরু তুলে বলল, ও, ক্রিসমাস? ঠিক আছে যাও, আরও দিন পনেরো থেকে যাও, মেরি ক্রিসমাস!

সে আমার পাসপোর্টে ছাপ মেরে দিল, টিকিট দেখতে চাইল না। ততক্ষণে আমার গেঞ্জি ঘামে ভিজে গেছে।

বাইরে বেরিয়েই দেখি একটি পরিচিত মুখ। ভট্টাচার্যি সাহেব! আদি ও অকৃত্রিম বাংলা-হাসি দিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন?

—বিমলবাবু আপনি?

—কী করব, দীপক সরস্বতী নেই এখানে, জয়তী বলল... আমারও এদিকে একটা কাজ ছিল...।

—আপনি কষ্ট করে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন, আমার জন্য!

—আরে মশাই, থামুন তো! খুব ভালো সময় এসেছেন, চমৎকার শীত পড়েছে, জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে!

আমি আগেরবার এসেছিলুম বেশ গরমকালে। তখনও বিমলবাবু বলেছিলেন, খুব ভালো সময়ে এসেছেন। অর্থাৎ জীবনের সব অবস্থা থেকেই বিমলবাবু আনন্দ খুঁজে নিতে জানেন। গল্প করতে-করতে পৌঁছে গেলুম বাড়ি।

জয়তীদি জিগ্যেস করলেন, ফ্লাইট লেট ছিল? তোমার দেরি দেখে আমি ভাবছিলুম, টিকিটটা ঠিক পেলে কি না!

—আপনি হঠাৎ টিকিটটা পাঠালেন কেন, জয়তীদি?

—তুমি শুধু-শুধু ওখানে বসে থেকে কী করতে? টিকিট হারিয়েছে। টাকা পয়সাও সব হারিয়েছে নিশ্চয়ই?

মেয়েদের কিছু একটা ইন্সটিংক্ট থাকে, যাতে তারা ঠিক বুঝতে পারে। আমি হেসে বললুম,

টাকাপয়সা আর বিশেষ কিছু ছিলও না। এবারে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছিলুম, এর মধ্যে টিকিটটা হারিয়ে গেল।

জয়তীদি বললেন, বেশ হয়েছে! আমাদের বাড়িতে থাকো, রান্না করবে, বাসন মাজবে, বাচ্চাদের দেখাশুনো করবে, তার বদলে কিছু মাইনে পাবে।

—আমায় যে মাত্র পনেরো দিনের ভিসা দিয়েছে এবারে?

—তবে তো আরও ভালো। ভিসা ফুরিয়ে যাওয়ার পর যদি ধরা পড়ো, তাহলে জেল খাটবে। তারপর একদিন এদের খরচেই হয়তো দেশে ফিরে যাবে! কানাডার জেলখানা খুব ভালো, দেখো!

—বাঃ, তাহলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলেই তো ভালো।

পরদিনই ফিরে এলেন দীপকদা। আমিই তাঁকে দরজা খুলে দিলুম। আমায় দেখে তিনি যেন ভূত দেখলেন।

—কী ব্যাপার। তুমি?

আমি যতদূর সম্ভব মন-গলানো হাসি দিয়ে বললুম, এই তো, আবার চলে এলুম!

—আবার এডমান্টনে? এই শীতের মধ্যে? জানো, আর কয়েকদিনের মধ্যেই শূন্যের নীচে তিরিশ-চল্লিশ হয়ে যাবে? এখন ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে গেলে বরং তোমার ভালো লাগত।

—ভেতরে আসুন, দীপকদা, তারপর সব কথা বলছি।

দীপকদা দুপদাপ করে পায়ের বরফ ঝাড়লেন, ভেতরে ঢুকে হাতের গ্লাভস খুলে ফেলে বললেন, উঃ, এই সময়টায় ঘোরাফেরা করা এক ঝকমারি। বাড়ির বাইরে থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না। তাই একদিন আগেই ফিরে এলুম।

দুই মেয়ে ছুটে এল বাবার কাছে। জয়তীদি সাড়া দিলেন রান্নাঘর থেকে। আমি কিছুক্ষণের জন্য এই দাম্পত্য দৃশ্যটি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেলুম টিভি'র ঘরে।

খানিক পরে যখন দেখা হল, ততক্ষণে দীপকদা আমার ব্যাপারটা সব শুনে ফেলেছেন। উনিও জয়তীদির মতন গম্ভীরভাবে বললেন, দ্যাখো, আমার গিন্নি টিকিট পাঠিয়ে তোমাকে ইউ এস থেকে নিয়ে এসেছেন বটে, কিন্তু এখান থেকে ভারতবর্ষে তোমাকে টিকিট কেটে ফেরত পাঠাবার ক্ষমতা আমাদের নেই। সে অনেক টাকার ধাক্কা। তা ছাড়া এই উইন্টারে রিসার্ভেশন পাওয়াই শক্ত। গিন্নি তোমায় যে এখানে আনিয়েছেন, ভেবো না, সেটা তোমাকে দয়া দেখাবার জন্য। এর মধ্যে বিশেষ স্বার্থ আছে। আমাদের একজন কাজের লোকের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। আমি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকব, জয়তীও ইউনিভার্সিটিতে কোর্স নিয়েছে। জানো তো, এদেশে যা আগুন লাগার ভয়, কক্ষনো বাচ্চা ছেলে-মেয়েদের একা বাড়িতে রাখা চলে না। বেবি সিটারেরও সাংঘাতিক খরচ। সুতরাং তোমায় আমরা থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে রাখতে পারি।

আমি বললুম, শুধুই থাকা-খাওয়া? বিড়িটিড়ি খাওয়ার জন্য কিছু অন্তত হাত খরচ দেবেন না? আর বছরে দুবার জামাকাপড়?

দীপকদা বললেন, আমার অনেক পুরোনো জামা-টামা আছে, সেজন্য চিন্তা নেই। হাত খরচের কথাটা বিবেচনা করতে হবে।

জয়তীদি বললেন, না, না, ওর হাতে পয়সা দেওয়া ঠিক নয়। যখন তখন সব জিনিস হারিয়ে ফেলে। বিড়িটিড়ি কিংবা ওর নেশার জিনিস যা লাগে তা আমরাই কিনে দেব।

আমি বললুম, আমি কিন্তু মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারি না।

দীপকদা বললেন, ওসব চলবে না। গরু-শুয়োর যা দেব, তাই সোনামুখ করে খেতে হবে।

জয়তীদি বললেন, ভাত? আমরা মোটে সপ্তাহে একদিন ভাত খাই!

আমি বললুম, ইস জয়তীদি, আপনারা কি গরিব! আমরা কিন্তু কলকাতায় প্রত্যেকদিনেই ভাত খাই আর মাছের দাম খুব বেশি হলেও কুচো মাছ অন্তত জুটে যায়। আপনাদের গরু-শুয়োরের মতন অখাদ্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

জিয়া আর ছুটকি এতটা বাংলা বোঝে না, ওরা আমাদের এই কথোপকথনের মর্ম টের পেল না।

দু'দিন বাদেই ক্রিসমাস। বৈঠকখানায় শোভা পাচ্ছে ক্রিসমাস ট্রি। সারাদিন ধরেই ঘুরে ফিরে সেটাকে সাজানো চলছে। এটাই নিয়ম, ক্রিসমাস ট্রি সাজাতে হয় অন্তত দিন দশেক আগে থেকে, অনেকটা দুর্গা পুজোর প্রস্তুতির মতন। সুপার মার্কেটগুলোর সামনে ডাঁই করা থাকে ঝাউগাছের টুকরো যার যেমন পছন্দ সেইরকম ছোট বড় এক একটা টুকরো কিনে নিয়ে যায়।

ক্রিসমাস ইভ-এ দীপকদাদের নেমন্তন্ন আছে ওঁদের এক পাঞ্জাবি বন্ধুর বাড়িতে। অনেকদিন আগে থেকেই ঠিক করা। এইসব পার্টিতে একজন অতিরিক্ত লোককে নিয়ে যাওয়া মোটেই অসঙ্গত নয়। সুতরাং দীপকদা ধরেই নিয়েছিলেন আমি যাব। কিন্তু আমি শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসলুম।

মনটা কীরকম ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে, এখন একগাদা অচেনা মানুষের মধ্যে গিয়ে ভদ্রতার হাসি হাসতে আমার ইচ্ছে করছে না। অনেকেই জিগ্যেস করবে, আমি দ্বিতীয়বার কেন এডমান্টনে এলুম? কী উত্তর দেব।

দীপকদা অনেক অনুরোধ করলেন, জয়তীদি বকুনি দিলেন পর্যন্ত। মেয়েরা বললো, চলো, চলো, তবু আমি অনড় রইলুম। আমি বললুম, আপনারা ঘুরে আসুন, রাত দুটো-তিনটে যাই বাজুক। আমি ঘুমোব না, দরজা খুলে দেব।

বাড়ি ফাঁকা হয়ে যেতেই আমি বেশ আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলুম। গৃহস্বামীর সেলার থেকে বার করে আনলুম এক বোতল ইটালিয়ান ড্রাই ওয়াইন। দুটি গেলাসে সেই ওয়াইন ঢেলে, দু-হাতে গ্লাস দুটো তুলে ঠোকাঠুকি করে বললুম, চিয়ার্স!

এক-এক সময় নিজেকেই নিজের সান্নিধ্য দিতে বেশ লাগে।

দুরকম গলার আওয়াজ করে আমি কথাও বলতে লাগলুম নিজের সঙ্গে। যেন সত্যিই আমার বুকের মধ্যে দুটি সত্তা আছে, তারা বেশ পরস্পরবিরোধী যুক্তিও ফাঁদতে পারে।

জানলার পরদা সরিয়ে দিতেই দেখতে পেলুম এক অপরূপ দৃশ্য। খুব পাতলা, পালকের মতন তুষারপাত হচ্ছে। কিংবা যেন খসে পড়ছে চাঁদের বুড়ির চরকার তুলো। আকাশ ঠিক দেখা যাচ্ছে না, তবু যেন মনে হচ্ছে আজ একটা নীল রঙের চাঁদ উঠেছে। পৃথিবী অদ্ভুত নিঃশব্দ।

বেশ তরতরিয়ে কেটে যেতে লাগল সময়। একটুও নিঃসঙ্গতা বোধ হল না। গোঁফ গজাবার পর থেকেই আমি প্রত্যেক ক্রিসমাস ইভের রাত্রিই বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে প্রচুর হই-হল্লা করে কাটিয়েছি। এই প্রথম এমন বিশেষ দিনে আমার একা এই রাত্রিযাপন। বেশ উপভোগ করতে লাগলুম ব্যাপার।

টিভি খোলাই ছিল, কিন্তু সেদিকে চোখ ছিল না বিশেষ। ঠিক রাত বারোটা বাজার সময় ঘোষণা করতেই আমার খেয়াল হল। এদেশের পার্টিতে এই সময় আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়, যার যাকে ইচ্ছে চুমু খেতে পারে। আমিও নিবিয়ে দিলুম আলো, নিজের ডান হাতে সশব্দে একটা চুমু খেলুম। তারপর গৃহসজ্জার বেলুনগুলো একটার পর একটা ফাটাতে লাগলুম জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে।

তার একটু পরেই টেলিফোন বাজল। নিশ্চয়ই দীপকদা চেক করতে চাইছেন আমি ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা। দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলুম। তারপরই পেলুম পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ খবর।

সিডার র‍্যাপিডস থেকে ফোন করছে সূর্য। সে বলল, সে গতকালই ফিরে এসেছে। ফিরে এসে আমার চিঠি পেয়েছে আর মুখার্জিদার কাছ থেকে সব শুনেছে। আমি কেন আর দু-একদিন থেকে এলুম না ওখানে! এডমান্টনে বুঝি বিরাট পার্টি আছে? আমাকে বুঝি পার্টি ছেড়ে এসে ফোন ধরতে হল?

আমি বললুম, হ্যাঁ, এ বাড়িতে খুব জমজমাট পার্টি চলছে। তোর কী খবর বল!

প্রায় মিনিট পাঁচেক এলেবেলে সংলাপের পর সূর্য বলল, তোর ব্যাগটা ফেরত এসেছে। গ্রে হাউন্ড বাস ডিপো থেকে ফোন করেছিল, আমি গিয়ে নিয়ে এসেছি।

আমি বললুম, ব্যাগ? আমার? এতদিন বাদে?

সূর্য বলল, হ্যাঁ, ওটা নাকি শিকাগোতে পড়ে ছিল। আজই এসেছে এখানে।

—আমার ব্যাগ? তুই ঠিক বলছিস? তার মধ্যে আমার প্লেনের টিকিট আছে? ক্যামেরা? একটা বইয়ের মধ্যে টাকা—

—সব আছে। কিছুই খোয়া যায়নি।

—সূর্য, আমার ব্যাগটা কে ফেরত দিল বল তো? তাহলে কি সত্যিই ভগবান টগবান বলে কিছু আছে নাকি?

—ভগবান থাকলেও তোর মতন পাষণ্ডকে দয়া করবে কেন? তবে গ্রে হাউন্ড কোম্পানি ভগবানের চেয়ে কম এফিসিয়েন্ট নয়।

এরপর এমন সব ঘটনা ঘটতে লাগল যা এক মুহূর্তের জন্য খুব আনন্দের, পর মুহূর্তে দারুণ বিষাদের।

রাত তিনটের সময় দীপকদারা ফিরতেই তো সুখবরটা দিলুম। পরদিন বিকেলেই ব্যাগটা পৌঁছে গেল। দীপকদা বললেন, তোমার টিকিটটা দাও, আমার এজেন্টকে বলে দেখি, সিট জোগাড় করে দিতে পারবে কি না। এই শীতে খুব রাশ থাকে।

টিকিটটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখে দীপকদা বললেন, এটা ফিরে পাওয়া-না-পাওয়া সমান। এটাকে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিতে পারো।

আমি আঁতকে উঠে বললুম, কেন?

দীপকদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তুমি কী বলো তো? জীবনে কি এই প্রথম প্লেনে চাপছ? টিকিটটা একবার পড়েও দ্যাখোনি?

কাঁচুমাচু গলায় বললুম, কী হয়েছে বলুন তো দীপকদা? কিছুই বুঝতে পারছি না। টিকিটটা চলবে না? কিন্তু এটা তো রাউন্ড ট্রিপের...

—এটা তো আউট ডেটেড টিকিট। তোমাকে চিপ কনসেশানাল রেটের রিটার্ন টিকিট দিয়েছে, এটা মাত্র চার মাস ভ্যালিড। এতে তোমার জার্নির তারিখ উল্লেখ করা আছে, তারপর পাঁচ মাসের বেশি কেটে গেছে। এখন এ টিকিট চলবে না। তুমি এই সামান্য জিনিসটাও আগে খেয়াল করোনি?

॥ ৫২ ॥

বিলেত দেশটা যেমন মাটির, সেইরকম ঐশ্বর্যের দেশ আমেরিকা-কানাডাতেও দারিদ্র্যের ছায়া উঁকি মারে মাঝে-মাঝে। অস্ত্রশস্ত্র ও পেট্রোল ছাড়া অন্যান্য অনেক ব্যাবসাতেই মন্দা চলছে। যখন তখন লোক ছাঁটাই হয়। বেকারের সংখ্যাও বাড়ছে দিন-দিন, আমার উচিত নয় এদেশে সেই বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

আমার টিকিটটা যদিও বাতিল হয়ে গেছে, আবার নতুন টিকিট কেনার প্রশ্নই ওঠে না, তবু আমার ফিরে যাওয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করতেই হবে।

দেশে যিনি আমায় টিকিটটা দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য বলেই দিয়েছিলেন যে ওটা নির্দিষ্ট চার মাসের টিকিট, খুব সস্তা বলেই এ রকম সময় বাঁধা। তবে, কোনও কারণে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়ে ম্যানেজ করা যেতে পারে।

সে কথা দীপকদাকে জানাতেই দীপকদা গম্ভীরভাবে বললেন, সেটা সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে জানাতে হয় কোম্পানিকে। একবার সময় পার হয়ে গেলে আর কিছু করবার উপায় নেই। এখন চুপচাপ বসে থাকো!

আমি বললুম, তা হলে কি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকব? না একটু-একটু চিন্তা করব?

দীপকদা বললেন, যত ইচ্ছে চিন্তা করতে পারো, কোনও লাভ হবে না।

পুরো দাম দিয়ে কেনা আন্তর্জাতিক বিমান টিকিটের অনেক সুবিধে। সিট কনফার্মড করেও নির্দিষ্ট দিনে ফ্লাইট ধরতে না গেলেও টিকিট নষ্ট হয় না। এক বছর ধরে টিকিটটা ঘুম পাড়িয়ে কাছে রেখে দেওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই এয়ার লাইনস বদল করা যায়। যাওয়ার সময় ইওরোপ হয়ে গিয়ে ফেরার সময় জাপান ঘুরে আসতে পারে যাত্রীরা। আমারটা খুব সস্তা বলেই তার তিন অবস্থা। যাওয়া-আসা একই পথে, এয়ার লাইনস বদলাবার উপায় নেই আর সময়সীমা চার মাস।

আমার সনির্বন্ধ অনুরোধে দীপকদা তাঁর ট্র্যাভেল এজেন্টকে ফোন করলেন। ইনি একজন ভারতীয় ব্যবসায়ী। ইনি বললেন, আমার টিকিটটা একেবারেই অচল, তবে তিনি সস্তায় আমায় আর একটা টিকিট দিতে পারেন, তার দামটা ভারতে ফিরে গিয়ে দিলেও চলবে, যদি দীপকদা আমার জামিন থাকেন।

এ বার্তা শুনে আমি বললুম, হোপলেস! ফিরে গিয়ে অত টাকা দিতে হলে আমার ব্যাঙ্ক ডাকাতি করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। নভিস ডাকাত হিসেবে আমি নির্ঘাত ধরা পড়ে যাব। তাহলে তো দেখছি আপনার বাড়িতেই আমায় কাজের লোক হয়ে থেকে যেতে হচ্ছে।

এবারে ফোন করা হল এক সাহেব এজেন্টকে। সাহেব খানিকটা ভরসা দিয়ে বললেন, যদি কোনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিতে পারো, তা হলে চেষ্টা করা যেতে পারে।

আমি উল্লসিত হয়ে বললুম, ব্যাস, তাহলে তো হয়েই গেল। ডাক্তারের সার্টিফিকেট জোগাড় করা এমন কী আর শক্ত।

দীপকদা ধমক দিয়ে বললেন, কে তোমায় সার্টিফিকেট দেবে শুনি? তোমার কি সত্যি অসুখ হয়েছে? তোমার কী অসুখ হয়েছে শুনি?

আমি সগর্বে বললুম, অসুখ? আমার অসুখ হবে কেন? আমার একেবারে লোহার মতন স্বাস্থ্য।

—তবে? এ কি ইন্ডিয়া পেয়েছ যে অফিসের ছুটি নিতে হলেই পাড়ার ডাক্তারকে দু-পাঁচ টাকা দিলেই সার্টিফিকেট পাবে? এ দেশে কেউ ফল্‌স সার্টিফিকেট দেয় না। ধরা পড়লে সে ডাক্তারের লাইসেন্স কেড়ে নেওয়া হয় সঙ্গে-সঙ্গে।

আমি বললুম, কিন্তু অনেক বাঙালি ডাক্তারও তো আছেন এ দেশে।

দীপকদা বললেন, তাঁদের তো আরও বেশি অসুবিধে! বিদেশে কাজ করছেন, ধরা পড়ার ভয় তাঁদের আরও বেশি থাকবে। এটাই তো স্বাভাবিক। কোনও বাঙালি ডাক্তারকে এরকম অনুরোধ করে অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলাই অনুচিত।

—তা হলে কী হবে?

—যেরকম অবস্থায় ছিলে, সে রকমই থাকবে!

রয়ে গেলাম নিশ্চেষ্টভাবে দু-তিনদিন। তারপর একদিনেই পরপর দুটি কাচের গেলাস পড়ে গেল আমার হাত থেকে। দীপকদা ও জয়তীদি দুজনেই ভুরু তুলে তাকালেন আমার দিকে। এ রকম কাজের লোককে কতদিন রাখা নিরাপদ সে সম্পর্কে ওঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

বাধ্য হয়েই দীপকদা ফোন করলেন আরও কয়েক জায়গায়। শেষ পর্যন্ত দু-হাজার মাইল দূরের এক সহৃদয় ডাক্তার, তাঁর নাম জানাতে চাই না, একখানা সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দিতে রাজি হলেন। সেটা হাতে পাওয়ার পর দেখা গেল, আমার পায়ের শিরায় থ্রম্বোসিস হয়েছে বলে সেই ডাক্তার মহোদয় সন্দেহ করছেন। এই অবস্থায় আমায় একদম চলাফেরা করা বাঞ্ছনীয় নয়।

এ নাকি এমন এক অসুখ, যা বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই। পরীক্ষা করলেও সহজে ধরা পড়ে না।

দীপকদা বললেন, যাও, চুপচাপ শুয়ে থাকো। মেডিক্যাল বোর্ড যদি তোমায় পরীক্ষা করতে চায়, তা হলে পুরো থ্রম্বোসিস রোগীর মতন হাবভাব করতে হবে কিন্তু!

আমি মনে-মনে চিন্তা করতে লাগলুম, কোনও নাটকে বা সিনেমায় আমি কোনও থ্রম্বোসিস

রোগীর অভিনয় দেখেছি কি না! খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে? কিংবা ওয়েস্টার্ন ছবিতে পায়ে গুলি খাওয়া নায়ক যেরকম বুকে হেঁটে-হেঁটে এগোয় সেরকম...

সাহেব এজেন্ট সেই ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেখে খুশি হয়ে বললেন, বাঃ, বেশ, এই তো চাই! এতেই কাজ হয়ে যাবে। কিন্তু—

আমি ভয়ার্ত গলায় জিগ্যেস করলুম, আবার কিন্তু?

সাহেব বললেন, এরকম অসুস্থ লোককে তো প্লেনে তোলা যায় না। এবারে ফিট সার্টিফিকেট নিয়ে আসুন!

এটা কোনও সমস্যাই নয়। আমি যে ফিট আছি তাতে তো কোনও সন্দেহই নেই! শুধু হাঁটা কেন, আমি লাফিয়ে, দৌড়ে, এমনকী নেচেও আমার ফিটনেস দেখাতে পারি যে-কোনও ডাক্তারের সামনে।

দীপকদার এক বন্ধু ডাক্তার অবশ্য সে সব পরীক্ষা নিলেন না। বরং একদিন নেমন্তন্ন করে খাইয়ে তারপর সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

সব দেখে এজেন্ট সাহেব বললেন, হ্যাঁ, মনে হচ্ছে আর কোনও গণ্ডগোল নেই। এবারে আমি ভ্যাঙ্কুবারে বিমান কোম্পানির কাছে সব কিছু পাঠিয়ে দিচ্ছি।

তারপর আবার প্রতীক্ষা। এবং প্রতীক্ষার অবসানে সুসংবাদ।

দুদিন বাদেই জানা গেল যে আমার টিকিট মঞ্জুর হয়ে গেছে। এখন যে-কোনওদিন আমি যাত্রা করতে পারি।

এবারে সত্যিই আমার আনন্দে নৃত্য করা উচিত। এতদিনের আশানিরাশার দ্বন্দ্ব মিটে গেল। কিন্তু এবারেও হরিষের পরেই বিষাদ। বিমান কোম্পানি আর একটি দুঃসংবাদও পাঠিয়েছে। আমার আর মাঝপথে কোথাও থামা চলবে না। কানাডা থেকেই সোজা ভারতে ফিরতে হবে।

আমি আর্তনাদ করে বললুম, সে কী! আমার যে রোমে নেমন্তন্ন আছে। সেখানে গেলে আমার একটাও পয়সা লাগবে না। আমার বন্ধু ভাস্কর বারবার টেলিফোন করে বলেছে ফেরার পথে একবার লন্ডনে নামতে। আমি লন্ডনে যেতে না পারলেও ও সপরিবারে রোমে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিয়ে সারা ইওরোপ ঘুরবে। তা ছাড়া অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত আমায় বিশেষ স্নেহ করেন, তিনি বলে রেখেছেন পশ্চিম জার্মানির উল্‌মে ওঁর বাড়িতে একবার অবশ্যই যেতে। সেসব হবে না!

আমি বললুম, আমার টিকিটে তো রোমের স্টপ ওভার আছেই। সেখানে তো আমাকে নামতে দিতে বাধ্য।

এজেন্ট মশাই মুচকি হেসে মাথা নেড়ে বললেন, উহুঃ! ও কথা আর এখন খাটবে না। কোম্পানি জানিয়েছে যে, উনি একবার যখন ও রকম গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন আর ঝুঁকি নেওয়া একেবারেই উচিত হবে না। কোথাও থামলে যদি আবার সেই অসুখ হয়, তা হলে কে দায়ী হবে? সুতরাং ওঁকে এখন আমরা সরাসরি দেশে ফিরিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—কিন্তু আমার তো ওরকম অসুখ, মানে, ইয়ে, আমি বলছিলুম যে...

—ব্যস, ব্যস, আর ও কথা উচ্চারণও করবেন না। দুদিন পরের ফ্লাইটেই একটা সিট খালি পাওয়া যাচ্ছে, তাতেই চড়ে বসুন।

বাংলার পাঁচের মতন মুখ করে ফিরে এলুম বাড়ি। জয়তীদি বললেন, কী, সব ঠিকঠাক হয়ে গেল, এখনও মন ভালো হচ্ছে না?

আমি বললুম, কোথায় সব ঠিক হল। শীতকালের ইওরোপ খানিকটা দেখে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ভাস্কর কিংবা অলোকরঞ্জন তো আমার টিকিটের বিচিত্র ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন না। ওঁরা ভাববেন, আমি শীতের ভয়ে তাড়াতাড়ি দেশে ফিরে গেলুম!

রাত্তিরবেলা খাওয়ার টেবিলে আমরা অনেকক্ষণ চুপচাপ। এক সময় জয়তীদি মুখ তুলে

বললেন, সত্যি তুমি পরশু চলে যাচ্ছ? তোমার মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। টিকিট যখন ঠিক হয়ে গেছে, তখন অত তাড়াহুড়ো করার কী আছে? বরং আর ক'টা দিন থেকে যাও।

আমি বললুম, রোমেই নামা হবে না, তা হলে আর শুধু-শুধু এই পচা এডমান্টনে আর বেশিদিন থেকে কী হবে?

জয়তীদি বললেন, এডমান্টন পচা? তুমি ভারী অকৃতজ্ঞ তো?

—এখন এই বরফ-ঢাকা এডমান্টনে আর কী করবার আছে আমার?

দীপকদা বললেন, তোমার যাওয়ার কোনও ঠিক-ঠিকানাই ছিল না, কোনওমতে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিলুম, তার জন্য একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত দিলে না!

আমি মুখ গোঁজ করে বললুম, কত স্বপ্ন দেখেছি ইটালি যাওয়ার। রোম, ভেনিস।

দীপকদা আর জয়তীদি হাসি মুখে পরস্পরের দিকে তাকালেন। তারপর জয়তীদি বললেন, আচ্ছা, এক কাজ করো। তোমাকে তো অ্যামস্টারডমে নেমে প্লেন বদল করতেই হবে। সেখানে নেমে তুমি তোমার এই প্লেনের টিকিটটা ছুঁড়ে ফেলে দাও।

—তারপর?

—তারপর সেখান থেকে কলকাতার আর একটা নতুন টিকিট কেটে নাও!

—টিকিট কেটে যাব মানে? টাকা?

—সে টাকাটা আমরা তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি!

দীপকদা মুখ নীচু করে বললেন, হ্যাঁ, সে টাকাটা আমরা তোমাকে কোনওক্রমে জোগাড় করে দিতে পারব মনে হয়। তুমি ছেলেমানুষ, মন খারাপ করে আছ যখন।

আমি স্তম্ভিত হয়ে একটুক্ষণ বসে রইলুম। এ আমি কী শুনছি? মানুষের কাছ থেকে এতখানি ভালো ব্যবহার পাবার উপযুক্ত কী করেছি আমি? কিছুই তো না! জয়তীদি বললেন, ব্যাস, আর গোমড়া মুখে থেকো না। আমার মেয়েরা তোমার দিকে তাকাতেই ভয় পাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে গেল তো!

দীপকদা বললেন, অ্যামস্টারডাম থেকে তোমার ফেরার টিকিট আমি এখান থেকেই কেটে দিতে পারি। কোথায়-কোথায় স্টপওভার চাও বলো।

আমি এক গাল হেসে বললুম, কোথাও চাইনি। এই যে আপনারা আমাকে অফারটা দিলেন, এতেই তো আমার স্বর্গ দেখা হয়ে গেল!

—না, না, আমরা সিরিয়াসলি বলছি!

—জয়তীদি, লন্ডন, উল্‌ম কিংবা রোম, এইসব জায়গাগুলোতো পালিয়ে যাচ্ছে না। পরে আবার কোনওবার এসে দেখলেই হবে। একেবারেই সব দেখে নিতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। আমি অত পেটুক নই।

এর পরের তৃতীয় দিন ভোরবেলা পড়ে গেল সাজো-সাজো রব। দীপকদারা সবাই আমাকে পৌঁছে দিতে যাবেন এয়ারপোর্টে। জিয়া আর প্রিয়াও জামাকাপড় পরে তৈরি। অত ভোরেই জয়তীদি ব্রেকফাস্ট বানাতে বসে গেলেন। আমি যত বলি যে এত সকালে আমি কিছু খেতে পারি না, তা ছাড়া প্লেনে তো খাবার দেবেই, তবু তিনি শুনলেন না।

যেন বরফের সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। ভালো করে আলো ফোটেনি। তার ওপর আবার তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে। সামনের বা দুপাশের কিছুই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। দীপকদা হেডলাইট জ্বেলে গাড়ি চালাচ্ছেন, এর মধ্যে একবার গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে আর কোনও উপায় নেই। সবচেয়ে মজা লাগে কারখানার চিমনির ধোঁয়াগুলো দেখতে। এ ধোঁয়া উড়ে পালাতে পারে না, চিমনির একটু ওপরেই মেঘ হয়ে জমে থাকে।

দীপকদাদের বাড়ি সেন্ট এলবার্টে। সেটা ছাড়িয়ে এডমান্টন শহরে ঢোকার আগে সাসকাচুয়ান নদী পার হতে হয়। সেই নদী এখন বরফের সড়ক। ব্রিজের দুপাশেও থোকা-থোকা বরফ ঝুলছে।

এরকম সাদা রঙের পৃথিবী আগে কখন দেখিনি, ভবিষ্যতে আর কখনও দেখব কি না কে জানে!

এয়ারপোর্টের ভেতরের চেহারাটা একেবারে অন্যরকম। এত সকালেও সেখানে প্রচুর লোক, ভেতরটা আলোয় ঝলমল করছে। কফি আর হট ডগ ভাজার গন্ধ ম ম করছে বাতাসে।

বিদায় বাক্যটি যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই শুনতে ভালো লাগে। প্রথমে মালপত্র চেক ইন করে কিছুক্ষণ আমরা গল্প করতে লাগলুম একটা বেঞ্চে বসে। তারপর যখন সিকিউরিটির ডাক হতে লাগল বারবার, শেষ মুহূর্তে আমি কিছু না বলে দৌড়ে গেলুম সেদিকে।

সুড়ঙ্গ পথটিতে ঢোকার আগে আমি পেছন ফিরে হাত নেড়ে বললুম, আবার দেখা হবে!

এডমান্টন থেকে টরেন্টো চার ঘণ্টার পথ। স্রেফ ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলুম। টরেন্টো থেকে বড় বিমান এক লাফে পার হয়ে যাবে অ্যাটলান্টিক। তার আগে বিমান বন্দরে ছ'ঘণ্টার অপেক্ষা।

আগেই ব্যবস্থা করা ছিল, এডমান্টনের দিলীপবাবুর এক আত্মীয় এসে আমায় নিয়ে গেলেন এয়ারপোর্ট থেকে। সেখানে তাঁর স্ত্রী চটপট ভাত আর মাছের ঝোল রেঁধে খাইয়ে দিলেন। আরও কয়েকজন বাঙালির সঙ্গে আলাপ হল সেখানে। কোনওরকম উদ্বেগ নেই, বেশ নিশ্চিন্তে ঢিলেঢালা ভাবে সময়টা কাটিয়ে দিয়ে আবার ফিরে এলুম টরোন্টো এয়ারপোর্টে।

এরপর সোজা অ্যামস্টারডাম। বারো না চোদ্দো ঘণ্টার ব্যাপার। আমার একটুও মন খারাপ লাগছে না, বরং একটা অস্থিরতা বোধ করছি। কখন পৌঁছব, কখন পৌঁছব। সুদীর্ঘ জেট যাত্রায় দিনরাত্রির হিসেব গুলিয়ে যায়, কখন ঘুম, কখন জাগরণ তার ঠিক থাকে না। আসবার পথে প্লেনের নানারকম যাত্রীদের লক্ষ করে কত আনন্দ পেয়েছি, ফেরার পথে কারুর সম্পর্কেই কোনও আগ্রহ নেই। বিরক্তি ভোলবার জন্য এরা বারবার খাবার দেয়, আবার সেই খাবার দেখলেই বিরক্ত লাগে।

সব মিলিয়ে প্রায় তেত্রিশ ঘন্টা বাদে দিল্লি পৌঁছলুম আর একটি ভোরবেলা। ল্যান্ডিং-এর আগে প্লেনের জানলা দিয়ে ভারতবর্ষের মাটি দেখতে পেয়েই বুকের মধ্যে বেশ আরাম হল। ওই মাটির ওপরে আমি শক্ত পায়ে দাঁড়াতে পারি।

যে-কোনও দেশেই বিমান থেকে প্রথমে নামার সময় খানিকটা অস্বস্তি লাগে, নিজেকে আগন্তুক মনে হয়। কিন্তু দেশে ফিরলেই মনে হয়, ওই তো একটু দূরেই আমার বাড়ি। যদিও দিল্লির জানুয়ারির শীত বেশ বিখ্যাত। কিন্তু আমার গরম লাগল, ওভারকোট খুলে হাতে নিতে হল।

প্রচুর মানুষের ভিড়, ঠ্যালাঠেলি, কুলিদের ফিশফাশ, বকশিশ-লোভী চোখ, তবু বেশ সাবলীল বোধ করতে লাগলুম। কাঁধ দুটো আর টানটান রাখার দরকার নেই। এখানে যে-কোনও লোকের সঙ্গে দরকার হলে ধমকে কথা বলতে পারি।

এত ভোরেও আমার জন্য মিহির রায়চৌধুরি এসে দাঁড়িয়ে আছে। আমার টেলিগ্রামটি ঠিক সময়ে পৌঁছেছে দেখে আমি ভারতীয় ডাক বিভাগের কৃতিত্বে চমৎকৃত হলুম। এই ক'মাসেই দেশটা বেশ বদলে গেছে দেখছি। কাস্টমসে কোনও গণ্ডগোল হল না, বাইরে বেরিয়ে ট্যাক্সিওয়ালা বেশি ভাড়া চাইল না, এ যে দেখি বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

মিহিরের সঙ্গে এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে মাটির খুড়িতে গরম-গরম চা খেলুম দু'কাপ। তারপর ভাবলুম, এত তাড়াতাড়ি কলকাতায় ফিরে কী হবে? এইরকম সুন্দর শীতকালে একবার সাঁওতাল পরগনা ঘুরে গেলে মন্দ হয় না।

এই কথা বলেছেন এ যুগের
সেরা চলমান লেখক।
সেই শুরুর দিন থেকে 'অর্ধেক জীবন'
ধরে তার 'অনলস' ভ্রমণ।
তাঁর মর্ত্যধামের সমগ্র ভ্রমণগাথা
নিয়ে এই অপরূপ বই।